৯ নভেম্বর ১৯৭৪॥ ৪০ পয়সা

লিওনোরা ল্যাম্পশেড
আজ থেকে বহু যুগ এগিয়ে
আলোর জগতে
ফিলিপ্স-এর সুন্দর-
তম অবদান—বিচিত্র
বিবিধ লিওনোরা
কাঁচের শেড যা
ডিজাইনে, সৌন্দর্যে
গুণপনায় ভবিষ্যতের
সার্থক দিশারী।
কাঁচ, রঙ আর
কল্পনার অপূর্ব
সমন্বয়। আলো
আর রঙ-রূপের
PHL 7316

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা—		...	৮৯
ব্যঙ্গচিত্র—		...	৯০
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত		...	৯১
বৈদেশিকী—দেবরাজ		...	৯২
রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা—		...	৯৩
ঠাকুরঘর (কবিতা)—রাজলক্ষ্মী দেবী		...	৯৪
রিপোর্ট (কবিতা)—অরুণকুমার সরকার		...	৯৪
চাপ সৃষ্টি করুন (কবিতা)—শঙ্খ ঘোষ		...	৯৪
কোথাও ভিতরে (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা		...	৯৪
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত		...	৯৫
সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী—	নকুল চট্টোপাধ্যায়	...	৯৭
গ্রহণের স্নান—সমরেশ মজুমদার		...	১০১
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী		...	১১১
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু		...	১১৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর		... ১১৯
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়		... ১২৩
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—তাপস গঙ্গোপাধ্যায়		... ১২৯
ঢাকার চিঠি—রাহাত খান		... ১৩৩
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		... ১৩৭
আলোচনা—		... ১৩৯
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		... ১৪৫
পুস্তক পরিচয়—		... ১৪৭
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন অধিনায়ক—মুকুল		... ১৫০
খেলার মাঠে—একলব্য		... ১৫১
রঙ্গজগৎ—		... ১৫৩
অরণ্যদেব—		... ১৫৮
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী		... ১৬০

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

AO BRAND PURE
COCONUT OIL

হরলিক্স
আদরণীয় প্রিয়জনের জন্য
পুষ্টি যোগাতে অপরিহার্য্য।
বিশেষ-করে তখন হরলিক্স প্রয়োজন দুজনের জন্যই।
"হরলিক্স পুষ্টির এক প্রধান উৎস।
Horlicks
স্বাস্থ্যের অন্যতম উৎস
হরলিক্স
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়
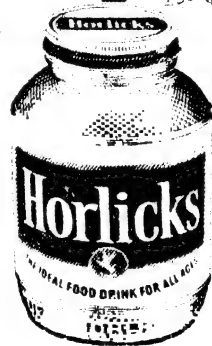
উপন্যাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শজারুর কাঁটা ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর
পিকানক ৫·০০

সুবোধ ঘোষের
কালকেতু ৭·০০

বিমল মিত্রের
রং বদলায় ৫·০০

মনোজ বসুর
স্বর্ণসজ্জা ৪·০০

সুবোধ ঘোষের
বাসরদত্তা ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর
যে যেখানে দাঁড়িয়ে ৫·০০

বিমল মিত্রের
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন ১০·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
সাগিনা মাহাতো ৫·০০

প্রতিভা বসুর
বেলা অবেলার গান ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তুঙ্গভদ্রার তীরে ৭·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দর্শকের ভূমিকায় ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
আমরা যেখানে ৫·০০

কবিতার বই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
উলঙ্গ রাজা ৩·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
ছেলে গেছে বনে ৩·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমার স্বপ্ন ৩·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই ৩·০০

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের
ধ্যানে, ব্যবধানে ৩·০০

সরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য ৩·০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের
মৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা ৩·০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
ছৌ-কাবুকির মুখোশ ৩·০০

তারাপদ রায়ের
নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক ৪·০০

শঙ্খ ঘোষের
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ৪·০০

তুষার রায়ের
মরুভূমির আকাশে তারা ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]
কলিকাতা ৭০০০০৯ । ফোন ৩৪-৪৩৫০

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৩ কার্তিক ১৩৮১

স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা

যত রকমের মারণ-পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সহজতম বোধ হয়—হাতে-মারা। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আর একটি কৌশলের নাম—ভাতে-মারা। পাটনার দুটি দৈনিক 'সার্চলাইট' আর 'প্রদীপ'কে হত্যার জন্য দুটি পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছিল। গত মার্চ মাসে একদিকে যেমন হা-রে-রে-রে করতে করতে আবির্ভূত হয়েছিল মশালধারীর দল, অন্যদিকে তার আগে থেকেই বিহার-সরকার চেষ্টা করছিলেন দানাপানি বন্ধ করার। প্রত্যহ ছাপা হলেও তাঁদের চোখে 'সার্চলাইট' আর 'প্রদীপ' অস্তিত্বহীন পত্র যেন, ওদের জন্য বিজ্ঞাপনের বরাদ্দ বিলকুল বন্ধ। অতএব প্রেস কাউন্সিলের দরবারে কাগজের তরফ থেকে নালিশ। সেই বিখ্যাত মামলার রায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল জানিয়েছেন 'সার্চলাইট' এবং 'প্রদীপ' ভবনে দক্ষযজ্ঞে সরকার সশরীরে সরাসরি তাণ্ডবনৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওই অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের কোনও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল না এমন কথাও হলপ করে বলা যায় না। মনে হয়, এক ফুঁয়ে কাগজ দুটো নিবিয়ে দিতে পারলে তাঁরা খুশীই হতেন, সুতরাং পরোক্ষে আগুনে তাঁরা কিছু হাওয়াও জুগিয়েছেন হয়তো। তবে প্রেস কাউন্সিলের এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, চক্ষুশূল ওই কাগজ দুটিকে ভাতে মারার চেষ্টা করে বিহার সরকার অতিশয় গর্হিত কাজ করেছেন। সেটা শুধু অ-নৈতিক নয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও পরিপন্থী। প্রেস কাউন্সিলের মতে বিহার সরকার কার্যত খবরের কাগজের স্বাধীনতার হত্যাকারীর ভূমিকায়।

বিহার সরকার, যাকে বলে, দু'কান কাটা। তাঁরা যে লোকনিন্দাভয়ে আদৌ ভীত নন, ইদানীং তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিস্তর। ভারতের প্রেস কাউন্সিল ব্রিটেনের মতো স্বেচ্ছা-গঠিত প্রতিষ্ঠান নয়, পঁচিশ জনের এই পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে সংসদের আইন মাফিক। তবু বিহার সরকার কিছুতেই তাঁদের সামনে হাজিরা দিতে নারাজ। প্রেস কাউন্সিলকে পাশ কাটাবার জন্য তারা বিস্তর কোর্টকাচারি করেছেন। প্রথমে শরণ নিয়েছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের, তারপর সুপ্রিমকোর্টের। সওয়াল কোথায়ও ধোপে টেঁকেনি, অতএব বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়েছিল কাউন্সিলের কাঠগড়ায়। এমনই নির্লজ্জ পাটনার সুবাদাররা যে, ইতিমধ্যে ফরিয়াদীদের জব্দ করার জন্য প্রাপ্য আট লাখ টাকা পর্যন্ত জব্দ রেখেছিলেন নিজেদের কাছে। টাকাটা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদে আইনত পাওনা ছিল ওঁদের। প্রেস কাউন্সিল সেজন্য গফুর সরকারকে তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা বলেছেন—বিজ্ঞাপন না-দেওয়ার পক্ষে সরকারী সওয়াল অতি হাস্যকর। প্রথমত, এই শাস্তির উপলক্ষ হিসাবে যে-সব রচনাবলী পেশ করা হয়েছে সেগুলো সরকারের সমালোচনাপূর্ণ হলেও আদৌ জনস্বার্থ বিরোধী নয়। সম্পাদকরা আদৌ তাঁদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। সরকারের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল—কাগজের সম্পাদকরা সরকারবিরোধী নানা জমায়েতে অংশগ্রহণ করেছেন, সক্রিয়ভাবে তাঁরা সমালোচকের ভূমিকায়। কাউন্সিল মনে করেন—সে অধিকার তাঁদের আছে, বিচার্য তাঁদের মৌখিক কথাবার্তা নয়,—তা যত অগ্নিস্রাবীই হোক না কেন,—বিচার্য শুধু লিখিত এবং কাগজের সম্পাদকীয় এলাকায় প্রকাশিত মতামত। তৃতীয়ত, কোনও কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া না-দেওয়া সরকারের মেজাজ মর্জির উপর নির্ভর করে না, জনগণের পয়সা সেখানেই খরচ করা সংগত যেখানে জনস্বার্থের প্রশ্ন জড়িত। প্রেস কাউন্সিল অতএব মনে করেন বিহার সরকার 'সার্চলাইট' আর 'প্রদীপ'কে শাসন করতে গিয়ে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। চোখ রাঙিয়ে অন্য কাগজকে ভয় দেখানোর বাসনা এতে স্পষ্ট। সুতরাং, কাউন্সিলের কাছ থেকে বিহার সরকারের প্রাপ্য একটাই,—ধিক্কার।

প্রেস কাউন্সিল আইনসম্মত সংস্থা হলেও নখদন্তহীন বিচার-সভা। তাঁদের ধিক্কার যত তীক্ষ্ম আর তীব্রই হোক, অপরাধী তা আদৌ কানে না-তুললে করণীয় কিছু নেই। ইতিপূর্বে হরিয়ানা সরকার তাঁদের রায় অক্লেশে অবহেলা করেছেন; প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। বিহার সরকারও অনায়াসে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারতেন, অন্তত হরিয়ানাকে নজির হিসাবে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারতেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য তাঁরা সে-পথে পা বাড়ান নি; গফুর সরকার শেষ পর্যন্ত নতজানু। তাঁরা জানিয়েছেন—'সার্চলাইট' এবং 'প্রদীপ' আবার সরকারী চোখে হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে। তার অর্থ, যথারীতি সরকারী বিজ্ঞাপনও জুটবে তাদের ভাগ্যে।

পাটনার এ-দুটি খবরের কাগজ, বলা নিষ্প্রয়োজন, জনচক্ষে ইতিমধ্যেই উচ্চতর সম্মানের অধিকারী। সে গৌরব অর্জন করেছেন ওঁরা আপসহীন লড়াই চালিয়ে। কিঞ্চিৎ নরম হলে, অর্থাৎ আদর্শ আঁকড়ে পড়ে না-থাকলে অতি সহজেই ওঁরা সরকারী খাতির লাভ করতে পারতেন। তার বদলে ওঁরা বেছে নিয়েছেন দ্বৈরথ। দৃশ্যটা দর্শনীয় বই কি! এই সাহসিকতাকে সম্মান জানিয়ে প্রেস কাউন্সিল স্বাধীনতার প্রহরী হিসাবে নিজেদের যোগ্যতাকেও আবার প্রমাণ করলেন। সাধুবাদ তাঁদেরও প্রাপ্য। বিশেষত, পাটনার ঘটনাবলীই একমাত্র মামলা নয়, একই ভাবে নির্ভীক ভাষায় রায় উচ্চারণ করতে দেখা গেছে তাঁদের চণ্ডীগড়ে সাংবাদিক-শাসন উপলক্ষে সরকারী হঠকারিতার বিরুদ্ধেও। তাঁরা জানিয়েছেন—সরকারের সমালোচনার অপরাধে সাংবাদিকের অভিজ্ঞানপত্র কেড়ে নেওয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা মাত্র। সেই পরুষ হাত চেপে ধরা প্রয়োজন।

কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার শত্রু কি শুধু কিছু হঠকারী মন্ত্রী আর আমলাই? আমাদের সংবিধানে সংবাদপত্রের-স্বাধীনতা বলে স্বতন্ত্রভাবে কোনও স্বাধীনতার উল্লেখ নেই, তা অনুচ্চারিত, বাক্ স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারার অন্তর্গত। এই স্বাধীনতার অর্থ কী, স্বভাবতই তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে হয়তো, কিন্তু এ-বিষয়ে সকলেই বোধ হয় একমত যে গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা নিশ্চয়ই সাংবাদিকের পক্ষে অপরাধ নয়। নির্ভয়ে, ক্ষমতাসীন দল বা গোষ্ঠীর ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে নিজের বিবেক বুদ্ধি বিবেচনামত মত প্রকাশ সম্পাদকের মৌলিক অধিকার। সে-অধিকারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা ছাড়াও কিন্তু অধিকার হরণের নানা মোটা-মিহি কৌশল রয়েছে সরকারের। নিউজপ্রিন্ট আমদানি ও বিলি বন্টন, বিজ্ঞাপনকে দয়ার দান হিসাবে ব্যবহার, কিংবা জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে অন্য ভাবে চাপ সৃষ্টি, দরকার হলে জনতা লেলিয়ে দেওয়া—দণ্ডদানের পন্থা অনেক। পাটনার মামলায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন বিহার সরকার। অন্যদের পক্ষেও অতএব সতর্ক এবং সজাগ থাকা ভালো।

দেওয়ালীর আলোকসজ্জা
সঙ্গতি
পরিকল্পনা
সুব্রমানিয়ম

দৃশ্যপট

পুজোর কলকাতা

গত বারোটা মাসে কোন্ কোন্ দিকে কলকাতা শহরের কতটা অধঃপতন ঘটেছে এবারের পুজোর সঙ্গে গতবারের পুজোর তুলনা করলেই তা বোঝা যায়।

প্রথমত ধরুন কলকাতায় প্লাবনের ব্যাপারটা। এর আগে কলকাতায় যে কখনও পুজোয় বৃষ্টি হয় নি তা নয়। আমিই এই কলকাতায় পুজোয় বেশ কয়েকবার বৃষ্টি দেখেছি। কিন্তু কলকাতায় এত ব্যাপক প্লাবন পুজোর সময় বা অন্য কোনও সময় আমি অন্তত কোনও দিন দেখি নি। অষ্টমী ও নবমীতে ঘণ্টা তিন চার করে একনাগাড়ে বৃষ্টি হতে দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্য কলকাতার বহু অঞ্চল জলে ভেসে গিয়েছে—পথ, ঘাট, আনন্দ, উৎসব সব অবরোধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় শুধু জল আর জল দাঁড়িয়ে থেকেছে।

মনে হচ্ছিল গোটা দেশকে কলকাতার হাল এবং সি এম ডি এ নামক প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য মা দুর্গাই এবারের পুজোয় এই বর্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুজোর সময় কলকাতায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষ আসেন। তাঁরা সবাই স্বচক্ষে দেখে গেলেন কলকাতার হাল এখন কী সি এম ডি এ নামক প্রতিষ্ঠান প্রায় একশ কোটি টাকা খরচা করার পর এই শহরের কতটা উন্নতি হয়েছে!

যে সব এলাকায় আগে কোনও দিন জল জমত না এখন সে সব এলাকায়ও জল জমে। যেমন আপার সার্কুলার রোড। আপার সারকুলার রোডের উত্তর দিকে আগে কোনও দিন জল জমতে দেখি নি। এবার জমেছে। গোটা দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতা নবমীর সন্ধ্যায় কার্যত প্লাবিত ছিল। সাহেব পাড়া যাকে বলা হয় সে অঞ্চলও বাদ যায় নি।

তারপর রাস্তাঘাটের অবস্থা। এত গর্ত এবং খানা আর জঞ্জালের পাহাড় কলকাতায় আগে কোনও পুজোয় দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। গোটা কলকাতা শহরে এখন এমন একটা রাস্তা কেউ খুঁজে বের করতে পারবেন না যেটাকে অক্ষত বলা যায়।

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানেকে কেন কর দেওয়া হবে সেইটাই বোঝা মুশকিল।

সমাদ্দার লড়াই চালাচ্ছেন পৌর প্রতিষ্ঠানকে একটা সুস্থ সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে। সমাদ্দার যদি এই লক্ষে সর্বদা অবিচল থাকেন তা হলে সকলের তাঁকে সমর্থন করা উচিত। সমাদ্দারের লড়াই যাতে সফল হয় সেজন্য সরকারের দৃঢ় সমর্থন প্রয়োজন। সরকারের খাস তালুকে হিসাবে পরিচালিত পৌর প্রতিষ্ঠান কলকাতাকে কীভাবে সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছে পুজোয় তা বাইরের অনেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

*

তারপর কলকাতার যানবাহন পরিস্থিতি।

এমনিতেই বর্ষার জন্য মানুষের দুর্গতির অন্ত ছিল না। তার উপর বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পরিবহণ সংস্থা এবার পুজোয় যা দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। কলকাতায় বাস ট্রামের সংখ্যা দিনকে দিন কমছে। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পুজোর সময় অন্তত ট্রাম বাসের সংখ্যা বাড়াবেন এবং বেশি রাত পর্যন্ত যানবাহন চালাবার ব্যবস্থা করবেন। তা হয় নি। দেখে মনে হয়েছে সাধারণ দিন যত সরকারী ট্রাম-বাস রাস্তায় চলে পুজোর দিনগুলিতে তাও চলেনি।

কলকাতার যানবাহনের অবস্থা এমন কী কলকাতায় যাঁরা থাকেন না তাঁরাও এবার নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছেন। এবং যাঁরা গতবার শহরে পুজো দেখতে আসার পর এই আবার এক বছর পরে কলকাতা এলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন শহরের যানবাহনের অবস্থা এক বছরের মধ্যে কতটা খারাপ হয়েছে।

ভোরবেলা পর্যন্ত চৌরঙ্গী এলাকায় দেখেছি হাজার হাজার মানুষ হাঁটিতে হাঁটিতে উত্তরে বা হাওড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। বাস ট্রামগুলির বাদুড় ঝোলা অবস্থা। সারা রাত কলকাতায় ঠাকুর দেখেন যাঁরা এবারে তাঁদের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু তাঁদেরও ঠাঁই বাসে-ট্রামে হয়নি। কারণ বাস ট্রামের সংখ্যা এবার ভোরেও অত্যন্ত কম ছিল।

*

রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা কী তারও কিছুটা আঁচ এবার বাইরের লোক নিশ্চয়ই কলকাতায়ই পেয়ে গিয়েছেন। হাজার হাজার ভিখারী। এত ভিখারী এই শহরে পুজোর সময় আমি আর কোনও দিন দেখিনি। এবং, এই সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, এরা শহরে ভিখারী নয়। এরা গ্রামের মানুষ। ভূমিহীন কর্মহীন দরিদ্র চাষী। ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে ভিক্ষে করতে এসেছে।

এই একটি মাত্র জিনিস বুঝিয়ে দেয় যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি, যেটা এখনও এই রাজ্যের অর্থনীতির ভিত সেটা কীভাবে ভেঙে পড়ছে। গ্রামে তাঁদের কিছু নেই, শাকপাতাও জুটছে না, তাই তাঁরা হাজারে হাজারে চলে এসেছেন কলকাতা শহরে ভিক্ষে করতে! এই আশায় যে, উৎসবের দিনে হয়তো তাঁদেরও কেউ কেউ কিছু দেবে। বর্ষা অবশ্য তাঁদেরও সর্বনাশ করে গিয়েছে!

আরও একটা দৃশ্য নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে সকলের। সেই দৃশ্যটা হল ভিন্ রাজ্যের মানুষ কীভাবে এই শহরে হাজারে হাজারে এসে বসেছে। ফুটপাথ সবত্র ঢালাও বাজার হয়ে গিয়েছে। ফুটপাথে সবত্র ছোট ছোট দোকান বসে গিয়েছে। পুজামণ্ডপগুলির পাশে বেশি। এর শতকরা আশিটি দোকানই ভিন্ রাজ্যের মানুষের। কলকাতা শহরে ফুটপাথে যত বেশি দোকান খুলতে দেওয়া হবে শহরে ডেরাহীন ভিন্ রাজ্যের মানুষের সংখ্যাও ততই বাড়বে। শহর তত বেশি নোঙরাও হবে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি থেকে ততই টাকা অন্য রাজ্যে চলে যাবে। স্থায়ী দোকানদাররা ততই বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বেন।

২৭-১০-৭৪

নবারুণ গুপ্ত

আঙুর বড় টক

মার্কিন মুলুককে নির্বাচনের আর কামাই নেই। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি-কংগ্রেসের নির্বাচন তো আছেই, আছে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপাল আইনসভার, হরেক আমলার-বিচারক নির্বাচন। এর ওপর আছে বিস্তর ছোটখাটো নির্বাচন শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে, জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায়। এ মাসেই হচ্ছে পুরো প্রতিনিধিসভা অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের, সেনেটের এক-তৃতীয়াংশের আর নানা রাজ্যে রাজ্যপালের নির্বাচন। সেই সঙ্গে ছোট দরের নির্বাচনও হবে এক গুচ্ছ। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের অবশ্য এখনও দু বছর দেরি। সে নির্বাচন হবে ছিয়াত্তরে। এবারের নির্বাচনে তাই তেমন জৌলুস নেই। এক হিসেবে কিন্তু এ নির্বাচনও সেই বড় নির্বাচনেরই মহড়া। আমেরিকার প্রধান দল দুটো তাদের শক্তি যাচাই করে নেয় মাঝের এই নির্বাচনে। তাছাড়া এ নির্বাচনে [illegible] পাচ্ছে না রিপাবলিকান দল। [illegible] চলেছে ডেমোক্র্যাটরা। সেনেট আর প্রতিনিধিসভা [illegible] বেশির ভাগ রাজ্যে রাজ্যপালের গদি দখল করেছে ওরাই। হাওয়া এবারও তাদের দিকেই। [illegible]

তাই [illegible] রিপাবলিকান দলের মোড়লরা, ডেমোক্র্যাটরা [illegible] দু বছর বাদে যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হবে তার জন্যে তাঁরা এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। [illegible] ১৯৭৬ সনে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে [illegible] রিপাবলিকান [illegible]

[illegible]

বৈদেশিকী

দেবরাজ

কোনও পয়লা সারির নেতা নেই যাঁকে দেশে-বিদেশে লোকে এক ডাকে চেনে, যাঁকে লোকে চোখ বুজে ভোট দেবে। নাম উঠেছিল তিন নম্বর কেনেডি—এডওয়ার্ডের। খানদানী বংশ বলতে কিছু যদি আমেরিকায় থাকে তা হলে তাদের মধ্যে পড়ে বস্টনের কেনেডি পরিবার। জন কেনেডি ছিলেন জনতার দুলাল। তিনি খুন হওয়াতে সে পরিবারের ওপর টান যেন আরও লোকের বেড়েছে। নিক্সনের সঙ্গে যদি কেনেডিদের মেজো ভাই লড়তে নামতেন নির্বাচনের আসরে তা হলে কী হতো বলা যায় না। কিন্তু খুনীদের হাত থেকে রবার্ট কেনেডিও রক্ষে পাননি। এখন বাকী ছোটো ভাই এডওয়ার্ড। কথা উঠেছিল ১৯৭২-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে নিক্সনকে রুখতে। কিন্তু সেবার তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন এই কৈফিয়ত দিয়ে যে, দু ভাই খুনীর হাতে প্রাণ হারানোর পর তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না।

এডওয়ার্ড কেনেডির সাফাইটা ছিল কিন্তু "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"র মতো। এটা ঠিক পর পর দুটো খুন তাঁর পরিবারের লোকদের ভাবিয়ে তুলেছিল, তাঁর দাদাদের নাবালক ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার দায়ও বর্তেছে তাঁরই ওপর, তা ছাড়া তখন তাঁর বয়সও তো মোটে [illegible] রাষ্ট্রপতি হবার ঢের সময় তিনি পাবেন। কিন্তু সরে দাঁড়াবার এগুলো ছাড়া আর একটা কারণ ছিল। লোকে বলে সেটাই আসল। ১৯৬৯ সনের ১৮ জুলাই এডওয়ার্ড কেনেডি আরও পাঁচজন পুরুষ আর ছ'জন মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে [illegible] চ্যাপাকুইডিক দ্বীপে এডগারটাউনের ওপারে। মেয়ে ছ'টি ছিলেন রবার্ট কেনেডির নির্বাচনের কর্মী। মেরী জো কোপেকনেও ছিলেন তাঁদেরই একজন। দ্বীপের [illegible] তিনি [illegible] [illegible] মেরী জো [illegible] কেনেডি মেরী জোকে উদ্ধার করতে পারেননি।

ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত অবশ্য হয়েছিল কিন্তু সে যেন কেমন কেমন। কী ঘটেছিল তা সঠিক জানার চেয়ে চেষ্টাটা যেন ছিল কেনেডিকে বেকসুর খালাস করার। এক জবানবন্দী দিয়ে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন কেনেডি। যদিও তাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল তা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডিনি বিশেষ খুঁতখুঁত করেন নি—ওটা এক দুর্ঘটনা বলেই সাব্যস্ত হয়েছিল। মেরী জোর লাসের ময়না তদন্তও হয়নি। তা লোকের মুখ বন্ধ করা অবশ্য যায়নি। এডওয়ার্ড কেনেডি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কেন পুলিসে খবর দেননি এ প্রশ্ন অনেকে তুলছিলেন, তার মনে ধরার মতো কোন জবাব পাওয়া যায়নি। একটা কেলেঙ্কারির গন্ধ অনেকেই পেয়েছিল কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ জল ঘোলা করার চেষ্টা কেউ করেনি। হয়তো করতো যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াতেন কেনেডি। তখন বিপক্ষরা ছেড়ে কইতো না—দিব্যি কেচ্ছা রটতো এডওয়ার্ড কেনেডি আর মেরী জো কোপেকনেকে নিয়ে। দুর্জনের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন কেনেডি পরিবার এডওয়ার্ডকে নির্বাচনী আসর থেকে দূরে সরিয়ে রেখে। তাঁদের আশা ছিল কেলেঙ্কারির কথা লোকে ভুলে যাবে আস্তে আস্তে। সে আশা কিন্তু পোরেনি।

ডেমোক্র্যাটরা ধরে নিয়েছে দু বছর বাদে রাষ্ট্রপতির গদি তারা দখল করবে। যদি এডওয়ার্ড কেনেডিকে আসরে নামানো যায় তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতো তিনি সাফ বলে দিয়েছেন ছিয়াত্তরের নির্বাচনে তিনি দাঁড়াচ্ছেন না—তাঁর কথার আর নড়চড় হবে না। আগে তাঁকে ঘর সামলাতে হবে তারপর দেশের কথা তিনি ভাববেন। তাঁর স্ত্রী মোটেই সুস্থ নন, ছেলে টেডির পায়ে ক্যান্সার হয়েছে একটা পা তার কাটা গেছে, দুই দাদার তেরোটি ছেলেপুলের দেখাশোনা করতে হচ্ছে তাঁকেই। এর ওপর তাঁকে [illegible] করার চক্রান্তও চলছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। কাজেই এবারও এডওয়ার্ড কেনেডি দাঁড়াচ্ছেন না রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। কিন্তু সত্যিই কী ঘরের কথা ভেবে তিনি গদির মোহ ছেড়েছেন? হতেও পারে আবার না হতেও পারে। চ্যাপাকুইডিকের ঘটনা নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাচ্ছে মার্কিনী খবরের কাগজগুলো। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ওয়াটারগেটের সঙ্গে সমান করে দেখছে। ওয়াটারগেটে তো কেউ ডুবে মরেনি, কিন্তু চ্যাপাকুইডিকে একটি মেয়ে তো প্রাণ হারিয়েছে। সে মৃত্যু রহস্য ভেদ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন একদল ঝানু সাংবাদিক। তাতেই কী ঘাবড়ে গিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন এডওয়ার্ড কেনেডি?

ঠাকুরঘর

রাজলক্ষ্মী দেবী

আলো ঢোকে না,   হাওয়া ঝোঁকে না,
তবু এটাই ঠাকুরঘর।
এখানেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
দৈনন্দিন কিছুক্ষণ এই কোণা,
এই বেড়াল-তপস্বী অবসর।
ঈশ্বর, তোমার উদ্যত চাবুক
আমার 'পর।

হাত ধুয়েছিলাম   পাত তুলেছিলাম,
তবু পাতা পড়ে বার বার।
কাঙালী ভোজনের কারবার।
জাত গেলো,   পেট ভরে নিলাম;
দুর্দিন, দুর্ভিক্ষ ছারখার।
ঈশ্বর, তোমার সক্ষম হাতের
মোক্ষম মার॥

কোথাও ভিতরে

রত্নেশ্বর হাজরা

তখন পাহাড়ে রাত্রি একখণ্ড   ইস্পাত
এমনি নীল।   উল্টো দিকে চাঁদ
মাঝখানে রয়েছে কফিন
প্রবল হাওয়ার মুখে সামনের প্রান্তরে যেন কারা
মৃত শিশু ফেলে যায়
এবং মসৃণ
আমার শরীর থেকে রুমানোর গন্ধ উঠে আসে
রাত্রির হাওয়ায়
কোথাও ঝাউবন নড়ে—কোথাও ভিতরে
শান্ত হয় ক্রোধ—আর সাপের খোলসে
হিম পড়ে   ....
তখন বিদ্যুৎ যায় মাটির গভীরে
চাঁদ দেয় আলো
কিন্তু কাকে
পুত্রের যৌবন
নাকি পিতার প্রজ্ঞাকে..................!

রিপোর্ট

অরুণকুমার সরকার

মারা যাবার পর
ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বলব :
আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি
সূর্য যথারীতি তার কর্তব্য পালন করেছে,
সকালে উঠেছে বিকেলে অস্ত গেছে :
সংগ্রাম করেছে শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে।
কিন্তু তবু এক দারুণ অন্ধকার
সারা পৃথিবীকে গিলে খাচ্ছে।

চাপ সৃষ্টি করুন

শঙ্খ ঘোষ

ঝ'রে যাবেন ?   ঝরুন
ঝরুন দাদা ঝরুন।
ভিতর দিকে আছেন যাঁরা
একটু মশাই নড়ুন—
চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন !

হঠাৎ ঝাঁপে উল্টে যাবেন
শক্ত হাতে ধরুন।
খুব যে খুশী পাদানিতেই !
কেউ বা চায় দুঃখ নিতে—
যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে
নাক না ওটা নরুন !

একটু মশাই নড়ুন
ভিতর থেকে নড়ুন
চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন !

বর্তমান খাদ্যসংকট সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী

দেশের খাদ্য সঙ্কট বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বর্তমান খাদ্য সংকটকে "কৃত্রিম" বলে বর্ণনা করেছেন। তবে কৃত্রিম খাদ্য সংকট যারা তৈরি করেছ তাদের এত-দিন ধরে কেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়নি অথবা কেন তাদের কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করতে দেওয়া হল, এবং এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে ব্যর্থতা কতটুকু সে সম্পর্কে শ্রীজগজীবন রাম মুখ খোলেন নি। যে সরকার নিজেই কবুল করেন যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী খাদ্য সংকট 'কৃত্রিম', সত্যিকারের নয়, সেই সরকার নিজেকেই লোকের কাছে হেয় করেছেন। যে সরকার খাদ্য সংকটকে কৃত্রিম রূপ দিতে পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করে থাকেন, (কেননা খাদ্য সংকটের মূলে কারণে আঘাত করতে সেই সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন), সেই সরকারের পক্ষে গরীবী দূর করার বুলি আওড়ানো ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়!

একদিকে যখন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলছেন, বর্তমান খাদ্য সংকট নিতান্তই "কৃত্রিম" অপরদিকে ভারত সরকার ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থাকে ভারতের খাদ্য সংকট সম্পর্কে এমন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন যে সংকটের গুরুত্ব খুবই বেশি এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা ভারতকে এক মিলিয়ন টন খাদ্যসামগ্রী দিতে রাজী হয়েছে। কিছু দিন আগে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে বর্তমান খারিফ ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ মিলিয়ন টন কম হবে বলে অনুমিত হয়েছে। তার আগে রবি শস্যের উৎপাদনও আগেকার বছরগুলির অনুপাতে ২৫ শতাংশেরও বেশি কম হয়েছিল। এ বছর এখন খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১৮ মিলিয়ন টনের মতো। সরকার সহজ শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করলেন ঠিক হয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকেও খাদ্যসামগ্রী আমদানি করার কথাবার্তা চলছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী যদি বলেন যে, বর্তমান খাদ্য সংকট "কৃত্রিম" ছাড়া কিছুই নয়, তবে সাধারণ মানুষ সরকার সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী যা উৎপাদন হয়ে থাকে তা প্রয়োজন থেকে দশ শতাংশ কম। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন আমাদের দুই মিলিয়ন টন করে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। সারের অভাব, উন্নত বীজ ও জল-সেচের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব আমাদের কৃষি উৎপাদনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া, পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী আমদানি করাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) প্রতিবেদনে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বেই খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডিজেলের অভাব, বৈদ্যুতিক সংকট, প্রভৃতিও বর্তমান সংকট-জনক খাদ্য পরিস্থিতির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। গ্রামে পাম্পসেটগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না; সার উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টাও ক্রমেই ব্যাহত হচ্ছে। মেক্সিকোর গম উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে ছয় বার সময়মত জল সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং তাতে একর প্রতি ১২ থেকে ১৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন পাম্পকুপ ব্যবহার করার অসুবিধা এবং ডিজেল তেলের অভাব কৃষকদের 'দেশী' গম উৎপাদনেই প্ররোচিত করছে এবং তার ফলে একর প্রতি গমের উৎপাদন তিন থেকে পাঁচ কুইন্টাল হচ্ছে।

ভারত সরকার বর্তমানে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় দেশের কাছেই খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য হাত পেতেছে। গত বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অনেক গম পাওয়া গিয়েছিল; এ বছরও শ্রীশরণ সিং-এর মাধ্যমে সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ দুই থেকে তিন মিলিয়ন টন গম সাহায্যের প্রস্তাব রেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরই কৃষি উৎপাদন এ বছর খুব আশাপ্রদ নয়। তাছাড়া ভারতকে বেশি করে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার পেছনে স্বাভাবিকভাবেই কিছু রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা থাকবে। ভারতে খাদ্য সংকট এখন এতই তীব্র উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা থেকে অনাহারে লোক মারা যাবার সংবাদও আসছে। সরকার অবশ্য এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। সরকার স্বীকার না করলেও একথা ঠিক যে অনাহারে ও অর্ধা-হারে সাধারণ গরীব মানুষ তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য ও সার আমদানি করা সম্ভব হয় তার জন্য কিছু রাজনৈতিক মূল্যও কি সরকারকে দিতে হবে না? বৃহৎ শক্তিগুলি যে নিঃস্বার্থভাবে ভারতকে সাহায্য দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন তা মনে হয় না; যদি তারা নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসেন তবে তা ভারতের সৌভাগ্য। কিন্তু যে-খাদ্যশস্যই বিদেশ থেকে আমদানি করা হোক না কেন তার জন্য সরকারকে প্রচুর বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা খরচ করতে হবে। ভারতের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সরকার চক্ষ খাদ্যশস্য, সার ও তেল আমদানির জন্য। অথচ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা স্বাধীনতার ২৭ বছর বাদেও সম্ভব হল না। দেশের লোক—যখন না খেয়ে মরছে,—তখন সরকার বলছেন, খাদ্য সংকট 'কৃত্রিম', কিন্তু যদি খাদ্য সংকট "কৃত্রিম"-ই হয়ে থাকে তবে এ জন্য যারা দায়ী তাদের এত-দিন শাস্তি দেওয়া হয়নি কেন? আজ যখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন সরকার মজুত উদ্ধার ও চোরা-কারবারী ধরপাকড়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতদিন সরকার কেন নিশ্চেষ্ট ছিলেন সেই কৈফিয়ত দাবি করার অধিকার সাধারণ মানুষের আছে। দেশে যতটা খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন হয়েছে সেই অনুপাতে সরকারী সংগ্রহ খুবই কম হয়েছে। খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে যাঁরা বাধার সৃষ্টি করেন এবং খাদ্যশস্য সময়মত বণ্টনের কাজে যাঁরা গাফিলতি প্রদর্শন করেন, ও সর্বোপরি যাঁরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠেন, সরকার তাঁদের প্রতিরোধ করতে পেরেছেন কি?

সুব্রত গুপ্ত

সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

নকুল চট্টোপাধ্যায়

গত ৩ অকটোবর সুইডিস অ্যাকাডেমি
লেটারস সুইডেনের ঔপন্যাসিক
ইভিন জনসন এবং কবি ঔপন্যাসিক ও
ধকার হ্যারি মারটিনসনকে নোবেল
রস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত
য়েছেন। পুরস্কার-কমিটি পুরস্কার
পকদের সাহিত্যের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে
লছেন—'জনসনের রচনাশৈলী আকর্ষণীয়
লেখা মুক্তির আদর্শে দেদীপ্যমান।
টিনসনের রচনায় শিশির্বিন্দুর প্রতি-

আইভিন জনসন

লন ঘটেছে। তাঁর কাব্যে ও রচনায়
ন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধান মেলে।'

বর্তমান বছরের পুরস্কার-প্রাপক
নসন (২৯ জুলাই ১৯০০) ও মারটিনসনের
মে ১৯০৪) বয়স যথাক্রমে ৭৪ ও ৭০।
ইডিস অ্যাকাডেমির বয়স্ক সাহিত্যিকদের
ত আকর্ষণটা একটু বেশী। প্রসঙ্গত
র্ট গ্রেভসের উক্তি মনে পড়ে তিনি
লছিলেন যে এ পুরস্কার হচ্ছে দা কিস
ডেথ'। কারণ হিসেবে বলেছেন যে,
পুরস্কার প্রাপ্তির পর ওই সমস্ত
সাহিত্যিকরা আর কিছু ভালো লিখেছেন
বলে জানা নেই। রবার্ট গ্রেভসের উক্তির
সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে ব্যতিক্রম
যে নেই তাও বলা যায় না। বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সুইডিশ অ্যাকাডেমির বর্তমান সিদ্ধান্ত
ঘোষিত হবার পর সুইডিস সাহিত্যিকরাই
বিশেষভাবে অ্যাকাডেমির বিরূপ সমালো-
চনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যিক ও
অ্যাকাডেমির সদস্য মিঃ আর্থার লুণ্ডকভিস্ট
বলেছেন—নোবেল পুরস্কারের সম্ভ্রম রক্ষার
জন্যই ভবিষ্যতে অসুইডিস সাহিত্যিকদের
মধ্যে এ পুরস্কারকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
আরেকজন সুইডিস সাহিত্যিক মিঃ স্ভেন
দেলব্লাংক বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
বিহীন কমিটির এ সিদ্ধান্ত অপরিণাম
দর্শিতার পরিচায়ক'। সুইডিস রাইটার্স
ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ আয়ান গেহলিন
বলেছেন—'আমি এ সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগতভাবে
খুশী, কিন্তু একথা ঠিক যে কমিটি
স্বদেশের লেখককে নির্বাচিত করে এখন
উভয় সংকটে পড়েছে, কারণ অনেকের মতে
নিজের দেশের সাহিত্যিককে পুরস্কার
দেওয়াটা নীতিগতভাবে যথার্থ হয়নি। মিঃ
বো স্ট্রোমস্টেট কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে
গিয়ে বলেছেন যে, সাহিত্য-পুরস্কার রাজ-
নৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—এ পুরস্কার
মূল্যহীন।

উদ্দেশ্য যাই হোক—সাহিত্যে নোবেল
পুরস্কার একটি বিশেষ সংবাদ। তাকে
অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। অন্যান্য বছরের
মত এবারও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে
১০ই ডিসেম্বর। পুরস্কার বিতরণী সভার
আর্তারিক্ত আকর্ষণ রুশ সাহিত্যিক
আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিনের উপস্থিতি।
১৯৭০ সালের পুরস্কার প্রাপক সোলঝে-
নিৎসিন এবারের পুরস্কার প্রাপক মিঃ
জনসন ও মিঃ মারটিনসনের সঙ্গে পুরস্কার
বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকবেন।

যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের রচনা-
বলীর একটি ক্ষুদ্র অংশই ইংরেজীতে
অনূদিত হয়েছে (প্রত্যেক লেখকের ৩ খানা
করে), বাংলা ভাষায় এযাবৎ কোন অনুবাদ
আমাদের চোখে পড়েনি, তাই ধরে নেওয়া
খুব অযৌক্তিক হবে না যে বাঙালী পাঠকের
অনেকেই এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত
নন।

মিঃ জনসন ও মিঃ মারটিনসন শুধু

হ্যারি মারটিনসন

যুগ্মভাবে পুরস্কারই পাননি—জীবনের ও
সাহিত্যেরও মিল দুজনের রয়েছে। দুই
সাহিত্যিকই জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর
মাড়াননি—নিজেদের শিক্ষক এঁরা নিজেরাই।
অল্পবয়েস থেকেই জীবন সংগ্রাম শুরু
করতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। দুজনেই
গোটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক
পি এইচ ডি উপাধিধারী, আবার দুজনেই
সুইডিস অ্যাকাডেমির সভ্য। ব্যক্তিগত জীবনে
দুজনেই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়-

বার বিয়ে করেছেন আর দুজনেই আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি-লাভ করেছেন। যাঁদের মধ্যে এত মিল তাঁদের কি আর পৃথকভাবে পুরস্কার দেওয়া যায়! তাই বোধ হয় তাঁরা এ বছরের যুগ্ম পুরস্কার-প্রাপক।

আইভিন জনসন সুইডিস ভাষায় ও সাহিত্যে নূতন গদ্যরীতি ও উন্নত উপন্যাস রচনা-শৈলীর প্রবক্তা। প্রথম জীবনে প্রুস্ট, জিদ এবং জয়েসের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখতে শুরু করেন। তিনি অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে নিজের যোগ রাখতেন উন্নততর সাহিত্যসৃষ্টি করার জন্য, অনুকরণ করার জন্য নয়। মিঃ জনসন খেটে খাওয়া মানুষের দলের। শৈশব ও কৈশোর কাটে কাঠের গোলা, করাত কল, ইঁটখোলা ঘাটিকাটা ও [illegible] কাজ করতে করতেই [illegible] দিনের ক্লান্তি তোলবার জন্য [illegible] একমাত্র পথ। পড়তে পড়তেই একটি লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

বয়স তখন ১৯। তিনি [illegible] পরিবেশ থেকে পালালেন স্টকহলমে। [illegible] বছর বার্লিনে—সেখান থেকে [illegible]

[illegible] লেখেন 'সিটি ইন ডার্কনেস—১৯২৭; সিটি ইন লাইট—১৯২৮; রিমেমব্রান্স—১৯২৮; এবং 'কমেন্টারীজ অন এ ফলিং স্টার—১৯২৯। একমাত্র 'সিটি ইন লাইট' ছাড়া অন্যান্য সবকয়টি উপন্যাসেই সুইডেনের পরিবেশ-প্রকৃতি ও মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সিটি অব লাইট' উপন্যাসটি পড়তে গেলে নুট হ্যামসুনের 'হাংগার'-এর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। 'সিটী ইন ডার্কনেস' উপন্যাসটি জনসনের পরিণত চিন্তার ফল। 'কমেন্টারি অন এ ফলিং স্টার' জনসনের অন্যান্য উপন্যাসের থেকে স্বতন্ত্র রসের। ধনতন্ত্রের প্রভাবে যে মানসিক হতাশা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তারই কথা লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। 'ফেয়ারওয়েল টু হ্যামলেট —১৯৩০; রেন অ্যাট ডে-ব্রেক—১৯৩৩ উপন্যাসে পৃথিবী ও তার অধিবাসী মানুষ এবং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে অন্যান্য উপন্যাসের মত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ততটা স্পষ্ট নয়। 'রেন অ্যাট ডে ব্রেক' উপন্যাসে অফিস-জীবনের গতানুগতিকতা, প্রকৃতির কোলে স্বাধীন মুক্ত জীবন, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যৌন-স্বাধীনতা যে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে পারে সেকথাই তিনি এ উপন্যাসে বলেছেন। এ উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব দেখা যায়।

জনসনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক রচনাগুলো। এ ধরনের রচনা 'নাউ ইট ওয়াজ—১৯১৪' (১৯৩৪ সালে প্রকাশিত), হিয়ার ইউ হ্যান্ড ইউর লাইফ, ডোণ্ট লুক ব্যাক' এবং 'ইউথস ফাইনাল'—১৯৩৪ সাল থেকে এক বছর অন্তর অন্তর প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীমূলক রচনা-গুলো এপিকধর্মী, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকের নরল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনের মহাকাব্য বললেও বোধহয় বেশী বলা হবে না।

'রিটার্ন টু ইথাকা' গ্রন্থটি পাঠকের বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। উপন্যাসের নায়ক জীবনের মূল্যবোধের সন্ধানী। ইউলিসিস কাহিনীর আধুনিক রূপায়ণ এই উপন্যাসটি। জয়েস ও টমাস মান-এর প্রভাবও উপন্যাসে রয়েছে। আত্মজীবনী-মূলক রচনার পাশাপাশি জনসনের 'ক্রিলন' সিরিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক, শ্লেষাত্মক রচনা উল্লেখ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ও শ্লেষের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে।

হ্যারি মার্টিনসন সুইডিশ সাহিত্যের তিরিশের দশকের অন্যতম প্রধান প্রতিভাধর কবি। সমসাময়িক কালের কবিদের মত অভিজাত পরিবারে জন্ম না হলেও তাঁর [illegible] জীবনের [illegible] এ জীবনের [illegible] অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁর লেখাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। যদি কোনো বিস্তার করত তাহলে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাগুলো চাপা থাকতো না। তাই বোধহয় সুইডিশ অ্যাকাডেমি 'সবহারা'-দের কবি হ্যারি মার্টিনসনকে 'লাইফ বিয়োন্ড ইট বাট ইউ ডিড নট বিয়ে লাইফ' বলে স্বাগত জানিয়েছিল।

মার্টিনসনের মত কোন সুইডিশ সাহিত্যিককেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বোধহয় এত কষ্ট করতে হয়নি। মাত্র ছয় বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে গৃহহারা হতে হয়। বাবা মারা গেলেন আর মা পাড়ি দিলেন আমেরিকার দিকে। বাল্যের দশটি বছর কাটে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দয়ায়। ১৬ বছর বয়সে জাহাজে কয়লা ঠেলার কাজ নিয়ে যাত্রা করেন অজানার উদ্দেশে। তবে এ অভিজ্ঞতা বিফলে যায়নি। বেশ কয়েক-খানা বই-ই এ অভিজ্ঞতার ফল। '[illegible]' এবং 'দা ওয়ে আউট' কাব্যগ্রন্থ [illegible]জীবনের অভিজ্ঞতায় ভরা। আর দুটি ভ্রমণ কাহিনী 'এইমলেস ট্রাভেলস' এবং 'কেপ ফেয়ারওয়েল'; কাব্যসংকলন 'স্পুক শিপ' এবং 'নোমাড' গ্রন্থে আছে সমুদ্র-জীবনের সাতবছরের রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা।

প্রথম গ্রন্থ মার্টিনসনের জীবনে খ্যাতি দেয়নি কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নোমাড' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক ও সমালোচকরা তাঁর মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। ভ্রমণকাহিনী 'কেপ ফেয়ারওয়েল' এবং আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ফ্লাওয়ারিং নেট্‌ল' এবং 'দ্য ওয়ে আউট' মার্টিনসনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বোধহয় মার্টিনসনের মত কোন সুইডিস কবিই পাঠকের কাছ থেকে এত বেশী সম্মানিত হননি।

মার্টিনসনের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনখানি গ্রন্থ—'ড্রিমার অ্যান্ড ড্যাডি—লং লেগস, (১৯৩৭) মিড সামার ভ্যালি, (১৯৩৮) এবং দা সিম্পল অ্যান্ড দা ডিফিকাল্ট (১৯৩৯)। তবে উপন্যাস 'দ্য রোড'-ই ১৯৪৮) তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শুধু সুইডিশ ভাষায় নয়, উপন্যাসটি ইংরেজী-তেও অনূদিত হয়ে (১৯৫৫) অসুইডিশ ভাষীদের মধ্যে আদৃত হয়েছে। উপন্যাসটির গল্পাংশ—সুইডিশ সিগার তৈরীকারক বোল তার বাঁধাধরা জীবন ছেড়ে চলে যেতে চায় আমেরিকায়। সেখানে বন্ধনহীন মুক্ত জীবন যাপন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমে-রিকায় যাবার সুযোগের অপেক্ষা সে করতে [illegible] কিছু [illegible] আর তার [illegible] হলো না। হতাশাই তাকে [illegible] পথে। পথই হলো তার [illegible] ভবঘুরে হয়ে যোল সুইডেনের পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দেয় বাকী জীবন। উপন্যাসটিতে মার্টিনসনের প্রকৃতিপ্রেম ও কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় মেলে। বর্তমান উপন্যাসটিই অনেকের মতে তাঁকে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সভ্যপদে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিল।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন সুইডিশ অ্যাকাডেমির সভ্য হলেন তখন শত্রু-মিত্র প্রত্যেকেই খুশী হয়েছিলেন।

মার্টিনসনের রচিত উপন্যাসে আছে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথমদিকের কাব্য চিত্রময় আর পরবর্তীকালের কাব্যে প্রতি-ফলিত হয়েছে সমস্যাবহুল জীবনের দার্শনিক চিন্তা ভাবনা। শুধু কাব্যে কেন, ভ্রমণ কাহিনীতেও তাঁর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় মেলে। 'কেপ ফেয়ারওয়েল' ও 'নোমাড' গ্রন্থে লেখক ভবঘুরে জীবনের প্রশস্তি গেয়েছেন। লেখকের বক্তব্য—গতিই জীবন। আধুনিক সমাজতন্ত্রের পেষণের হাত থেকে মুক্তির পথ চলমান জীবন। মার্টিনসন পরবর্তীকালে কিন্তু আর এই দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নেই।

আইভিন জনসন ও হ্যারি মারটিনসন দুজনই নরম স্বভাবের মানুষ এবং মান তাঁদের রসজ্ঞান সমৃদ্ধ। দুজনেই যুগ্মভাবে আজ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। দেশে বিদেশে হয়ত এই পুরস্কারকে ঘিরে নানা আলোচনা হবে। তা হোক। আলোচনা তা যদি পংকিলতা ও ঈর্ষা প্রণোদিত না হয় তাতে ক্ষতি কী! স্বাস্থ্যকর আলোচনা সর্বদাই কাম্য।

গ্রহণের স্নান

সমরেশ মজুমদার

সুবিমল চারমিনার খেত অ্যাদ্দিন. পার্ক-স্ট্রীটের মোড়ে বাস থেকে নেমে নগদ সাত টাকা দিয়ে ডানহিলের একটা পুরো প্যাকেট কিনল আজ। মরলাও পানসী বেলঘরিয়া। না মোর হিল্লাবনিকাশ। পেটের ভেতর যেটা গজিয়েছে আগামী মাসের তিন তারিখে সেটা অপারেশন টেবিলে কেটে বাদ দেবার পর—ভাবাই যায় না। ডানহিলের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে ডক্টর থাসনবীশের মুখটা মনে পড়ল। এক্সরে প্লেটটা দেখতে দেখতে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিলেন কি করে বেঁচে আছেন মশাই?

সিগারেটের দোকানের আয়নায় নিজেকে একবার দেখল সুবিমল। এককালে মুখ চোখ চুল দিব্য ছিল। এখন একটা কালো ছোপ ছোপ দাগ এখানে ওখানে। কপাল আর মুখের দাগগুলোর দিকে তাকালে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। নতুন অক্ষর চিনিয়ে মা যখন স্লেটে প্রথম সেটা লিখত তখন দারুণ তরতাজা দেখাত সেটাকে। তারপর পেন্সিল বুলিয়ে সেটার ওপর মকসো করতে গিয়ে সেটা হয়ে যেত বিশ্রীরকমের থ্যাবড়া। রেখাগুলো মোটা হয়ে যেতে যেতে—সুবিমল নাকের পাশের মোটা রেখাটায় আঙুল বুলিয়ে হেসে ফেলল।

প্যাকেট থেকে একটা লম্বা সিগারেট বের করে ধরাল ও। আঃ দারুণ টেস্ট। পৃথিবীতে কত কি সুখের জিনিস আছে। সুবিমল টের পেল চিনচিনে ব্যথাটা সমানে পেটের ভেতর কাজ করে যাচ্ছে। ডক্টর থাসনবীশের কাছ থেকে মেসে ফিরে ন্যাংটো হয়ে পুরো পেটটা দেখেছে ও। বেশ গোল-গাল, মসৃণ পেট। একটাও চুল নেই। কোন দাগ নেই। কেমন আদুরে আদুরে। অথচ শালা এরই মধ্যে কি-না-কি হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে পেটটা পচে যাচ্ছে।

আজ সারাটা দিন সুবিমল ঘর ছেড়ে বের হয়নি। এমনিতে ভাল থাকে, হঠাৎ হঠাৎ পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে তখন অসহ্য ব্যথা—বোধ হয় সেটাকেই বলে মৃত্যু-যন্ত্রণা। মৃত্যু কি জিনিস সুবিমল এই পঞ্চাশ বছরে দেখেনি। বস্তুত তার জানা-শোনা কোন মানুষকে আজ অবধি সে মরতে দ্যাখেনি। সিনেমায় দেখেছে ঠিক মরবার মুহূর্তে মানুষ মাথাটা উঁচু করে, কিছু বলবার চেষ্টা করে এবং পরক্ষণেই মাথাটা বালিশের একদিকে গড়িয়ে পড়ে। ফিনিশ। সব খেলা খতম। সাতদিন আগে সে হয়তো ন্যাংটো হয়ে সহবাস করেছে, তিন পয়সা

করার জন্যে চ করকে পিটেছে, পাঁচ পয়সা লোর জন্যে কণ্ডাকটারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছে। ধাক্কাধাক্কি খেয়েছে। অথচ এই মুহূর্তে সেসব ত্যক্ত মনের মত নিস্ফল এবং সুবিমল র না সেটা কি তেমনি আরামদায়ক?

অথচ এত দীর্ঘ দিন মেসে থেকে বয়স এসব ভাবেনি। কলকাতার পাড়া- া করে চাকরী করার সময়টায় খবর রাখিছল বরিশালের সেই গ্রামটায় আগুন লেছিল—যে আগুন সুবিমলের বাবা মা ং ছোট ভাইটাকে স্নেহ ই দেয়নি। একটা াট কণ্ট, বুকের মধ্যে রুদ্ধ কান্না ন কেমন করে একদিন ফুরফুরে আনন্দ য় গেল সুবিমল টের পায়নি। খাও দাও মাও বেশ তো আছ। নারী এবং নারী- ীর সম্পর্কে আগ্রহ কখনও প্রচণ্ডভাবে কে আলোড়িত করেনি। বিয়ের প্রশ্নই ঠেনি, কারণ সম্বন্ধ করার মত কেউ কাছে ই আর নিজে এসে কোন মেয়ে প্রস্তাব রবে সুবিমলের চেহারার মধ্যে তেমন াকর্ষণ বিন্দুমাত্র নেই।

তাই এখন এই পঞ্চাশে এসে ডক্টর সনবীশের রায় শুনে হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যুকে ন পড়ে যায় ওর। আর তখনই শরীরটা মন গুটিয়ে যায়। এই শরীরটা, সযত্নে লিত শরীরটা খুব শিগ্‌গির আগুনে ড়ে যাবে এবং এই পৃথিবীটায় সুবিমলের ান অস্তিত্ব থাকবে না ভাবলেই কান্না াসে। মৃত্যুর সময় কি খুব যন্ত্রণা হয়! পারেশন টেবিলেই যদি ও মরে যায় াহলে কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু ডাক্তার দি শেষপর্যন্ত অপারেশনে কোন লাভ নই বলে সিদ্ধান্ত নেয়—তাহলে?

পাশের ঘরের গাঙ্গুলীমশাই গুণী- াবার শিষ্য। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ুবিমলকে দলে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ুবিমল তেমন গা দেয়নি কথনো। বললেই লত, দূর মশাই এইতো বেশ আছি, মরার পর কোথায় যাব বা আত্মাকে শুদ্ধ রাখা টাখা এসব আমার দরকার নেই। ডক্টর থাসনবীশের কাছ থেকে ফেরার পর গাঙ্গুলীমশাই বলেছিলেন, 'চলুন মশাই বাবার কাছে, দেখবেন কত বড় বড় ডাক্তার বাবার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনটাও শান্ত হবে আর বাবা যদি চান তাহলে দেখবেন বিলকুল ভাল হয়ে যাবেন। সুবিমল হেসে বলেছিল, 'দেখি।'

সুবিমল যতদূর জানতো পার্কস্ট্রীটের মাঝামাঝি গুণীবাবার আশ্রম। ভক্তরাই করে দিয়েছে। গাঙ্গুলীমশাই বলেছিলেন বাড়ি- টার কাছাকাছি এলেই বুঝতে পারবেন চুম্বকের মত কে যেন আপনাকে টানছে। লোকজন ধূপধুনোর গন্ধ আর নামগান— চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। সুবিমল ধোঝে ভেতরে ভেতরে জোরটা এখন কমে গেছে, দুর্বল সে নিশ্চয়ই, এখন যদি কোথাও একটু সাহস পাওয়া যায়; বিশ্বাস যদি বিনিময়ে উপকার করে ক্ষতি কি। সুবিমল পার্কস্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগল।

এখনও বিকেলের রোদ বেশ ঝলমলে। বেশ চটচটে লাগছে চারধার। ওপরে ডালডোপিলোর বিজ্ঞাপনে যে মেয়েটি হাসছে তার দাঁত মুখে রোদ মাখামাখি। ভর বয়সের যুবতী মেয়ে শরীরের সব দিক যার জানা হয়ে গেছে এবং যে কি না একবার মা হয়ে গেছে সুবিমল দেখছে দূর থেকেই তাদের শরীর থেকে কেমন একটা মধুর আভা ঠিকরোয়। এই রোদটা—শেষ বিকেলের এই রোদটা ঠিক তেমনি। কামনা জাগে না বরং প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার ভাব মেশানো থাকে।

রাসেল স্ট্রীটের মোড়ে এসে সুবিমল দাঁড়ালো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিল ও, পেটের ভিতর চিন চিন করছে, হঠাৎ লক্ষ্য করল ওপাশ থেকে রাস্তা পেরিয়ে কে যেন ওর দিকে হন হন করে এগিয়ে আসছে। ভাল করে দেখল সুবিমল, বছর পঁচিশের একটি ছেলে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোঙ্গা প্যাণ্ট আর চকচকে সার্ট কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। ছেলেটি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চোয়াল শক্ত। হঠাৎ জানে না কেন, সুবিমল ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ওর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল, পেটের ভেতরটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করল ও। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। এরকম হবার কি কারণ! ছেলেটা কি হতে পারে? নক্সাল? ওকে খুন করতে চায়! এই তো গতকালই পাড়ায়—মির্জাপুরের মোড়ে একটা খুন হয়েছে। অফিসে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক খুন হয়ে গেলেন। খুনীর যে বিবরণ শুনেছে সে তার সঙ্গে যে এই ছেলেটির হুবহু মিল! প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সুবিমল এবং তখনই শুনতে পেল একটা চটচটে গলা ওকে বলছে 'চোখটা খুলবেন স্যার, কাইণ্ডলি!'

সুবিমল ধীরে চোখের পাতা খুলতেই দেখতে পেল ছেলেটি ব্যাগের মুখটা খুলছে। কি বের করছে? রিভলবার? কেন? না— সুবিমল অবাক হয়ে দেখল ছেলেটি বেশ বড়সড় একটা ক্যামেরা বের করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেন্সে চোখ রাখছে। হেসে ফেলল সুবিমল। উঃ যা ভয় পেয়ে গিয়েছিল আচমকা। আজকাল চট করে ভয় এসে যায়। আর তখনই ক্লিক করে শব্দটা শুনল সে। একগাল হাসল ছেলেটি, 'দারুণ হবে স্যার। আমি ঐ ফুটপাথ থেকে দেখছিলাম আপনাকে। দারুণ ফটো ফেস আপনার। যা একখানা ছবি দেব না আপনাকে দুশো বছর পর্যন্ত লোকে বলবে জবাব নেই।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল ছেলেটি, নিন স্যার। পরশু বিকেলে আসবেন স্যার। ইচ্ছে হলে পছন্দ হলে নেবেন, কোন জোরজবরদস্তি নেই। আড়াই টাকায় কপি পাবেন। বেকার ছেলে। আসবেন স্যার প্লিজ।'

সুবিমল কার্ডটা হাতে নিয়ে অবাক চোখে দেখল ছেলেটি তেমনি হন হন করে গড়ের মাঠের দিক যাচ্ছে। এখন তার হাতে ক্যামেরাটা ঝোলানো। কেমন যেন থতমত হয়ে গেল ও। ছেলেটা ছবি তুলল, ঐ ক্যামেরার মধ্যে তার শরীরটাকে পুরে নিয়ে চলে গেল। ঐ ক্যামেরার মধ্যে আর একজন

সুবিমল হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার কোন ছবি নেই। বস্তুত এই তিরিশ বছরে সে কোন ছবি তোলার কথা ভাবেই নি। কেমন একটা মায়া হল তার নিজের জন্যে। কার্ডটা পকেটে রেখে ও ঠিক করল, নিশ্চয়ই যাবে ছবিটা আনতে। নিজের একটা ছবি থাকা দরকার, সত্যিই তো।

গুণীবাবার আশ্রমের কাছে আজ বেশ ভিড়। বিরাট বিরাট গাড়ি থামছে আশ্রমের সামনে। বাড়ির চারধারে বাবার বাণী লেখা আছে। যারা আসছে তাদের ব্যবস্থা কতখানি শাঁসালো এক নজরেই ঠাওর হয়। গাঙ্গুলী-মশাইকে দেখতে পেল ও, প্যাসেজের কোণে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুবিমলকে দেখে একগাল হাসলেন ভদ্রলোক। কাছে এগিয়ে হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'এসে… তাহলে! দেখবেন কি খুশী হবেন!'

সুবিমল হাসতে চেষ্টা করল। ভে… থেকে ঘণ্টার শব্দ আসছে। নামগান হ… সেইসঙ্গে। সুবিমল গাঙ্গুলীমশাই… সঙ্গে ভেতরে ঢুকল। চারধারে ধোঁয়া… ঢাকের মত জমাট ভিড়। সুবিমলের চো… পড়ল সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো বাবার বা…

।। মন পবিত্র করার জন্য এক গঙ্গা লাগে না, এক ফোঁটা ভালবাসাই ষ্ট।' 'যা বলবেন পরিষ্কার করে বলুন—নার ভাল লাগবে। কর্মই পুজো।'

গাঢ় একটা ধূপের ধোঁয়া আর তার র গন্ধ পরিবেশটাকে ঘিরে রেখেছিল। গুলীমশাই বললেন, 'বাবা এই মাত্র জপ। করলেন, এবার দেখা দেবেন।' সুবিমল া করল ঘরটা বেশ বড়, সামনে উঁচু াস। লোকজন কেউ তেমন কথা বলছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সবাই। দেখা-খ সুবিমল বসল। বেশ লাগছিল তার। মনে বসা মাড়োয়ারী গিন্নীর খোলা পেটে াট শ্বেতির দাগের ওপর এলিয়ে থাকা নার গয়নাটা লক্ষ্য করতে লাগল সে। টা চমৎকৃত শব্দ—সুবিমল দেখল ন্দ্বজন নামাজের মত প্রণাম করছে। য়াসে এখন যিনি দাঁড়িয়ে তিনিই গুণী-বা! কোত্থেকে এলেন? পেছনের ভেল-চটের পর্দা থেকে? বাবা হাত তুললেন। হর ত্রিশের যুবক। রাস্তায় দেখলে সুবিমল াবতেই পারত না এই লোকটার পৃথিবীতে ত শক্তি। সিল্কের পাঞ্জাবী-ধুতি। আলো ড়ে সর্বাঙ্গ চকচক করছে। গলায় বিরাট ানার হার। কিছুই বললেন না তনি। নামগান হচ্ছে সমানে। লার সোনার হারটা খুললেন তিনি তারপর ুড়ে দিলেন ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে হুটো-পুটি লেগে গেল ঘরের মধ্যে। সুবিমল দখল হারটা যে পেল তার হাতে একটা চমৎকার রজনীগন্ধার মালা। কখন সোনার হার ফুলের চেহারা নিয়ে ফেলেছে শূন্যে। বাবা আবার মিলিয়ে গেলেন পর্দার ওপাশে। ঘরের সবাই মালা যে পেয়েছে তাকেই প্রণাম করছে নমস্কার করছে। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, মালা পাওয়া হচ্ছে কয়েক জন্মের পুণ্যের ফল। যে সে পায় না। বাবা যে ছুঁড়ে দিলেন এমনি এমনি নয়—তিনি জানতেন কাকে দিচ্ছেন, কার পাওয়া দরকার। ও মালা যে কোনদিন বাসী হবে না। আপনি আসুন, নিয়মিত আসুন—একদিন না একদিন মালা পেয়ে যাবেন।'

সুবিমলের ইচ্ছে হল একবার গাঙ্গুলী-মশাইকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি মালা পেয়েছেন কি না—কিন্তু ঠিক সাহস হল না। বাইরে বেরিয়ে এল সে। এই যে এত লোক এখনও আসছে সেটা কি করে সম্ভব হচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার—বাবার প্রতি একটা বিশ্বাস সবাইকে টেনে আনছে। অন্তত ফুলের মালাটা যে খানিক আগে সোনার হার ছিল এটা তো স্পষ্ট দেখা গেল। বিশ্বাস—নিজের ওপর খুব রাগ হল ওর—সময় বড় দ্রুত চলে যাচ্ছে—বিশ্বাস আনতে হবে মনের মধ্যে। সুবিমল পাকস্থলীতে নামল।

ভিন্ন ভিন্ন করে কোন ফাঁকে সন্ধ্যা

নেমেছে জানা ছিল না। দমকে দমকে পার্ক-স্ট্রীটের নিয়নগুলো জ্বলে উঠলো। গুণী-বাবার নামগান এখানেও ভেসে আসছে লাউডস্পিকারে। সুবিমল একটা বারের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। বিরাট ক্যাবারে ড্যান্সারের ছবি—নিচে লেখা ইংরাজীতে—বাংলায় যা দাঁড়ায়—কদিন বই তো নয়—তাহলে লজ্জা কেন?' সুবিমল সত্যি লজ্জা পেল। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না। বার-গুলোর চেহারায় বেশ জেল্লা ফুটেছে আজ-কাল। রমণ হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে মিডলটন রো ছাড়িয়ে গেল ও। হঠাৎ ঘণ্টার ধ্বনির চেয়ে কিছু দ্রুত শব্দ সুবিমলের কানে এল। সুবিমল দেখল একটা রিকশা-ওয়ালা, বেশ নিরীহ চেহারার, ওর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে রিকশা নিয়ে আর সমানে হাতের ঘণ্টি বাজিয়ে ওর দৃষ্টি টানার চেষ্টা করছে। সুবিমল দাঁড়াতেই লোকটা বলল, 'চলিয়ে সাব।'

সুবিমল ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্যাকাটে চেহারা, দাঁতগুলো অর্ধেক ক্ষয়ে গেছে। বিশ্বাস টিশ্বাস এদের ব্যাপারে হয় না বোধে। সুবিমলকে দাঁড়াতে দেখে একগাল হেসে যেন গোপন খবর দিচ্ছে, 'চলিয়ে সাব, কলেজ গার্ল হ্যায়। একদম ফার্স্ট ক্লাশ। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চিনা, জাপানী যো চাহিয়ে—।'

হাসি পেয়ে গেল সুবিমলের, 'ইটালিয়ান?'

মাথা দুলিয়ে হাসল রিকশাওয়ালা—'জরুর।'

আর একটু ভাবল সুবিমল, তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'আফ্রিকান?'

'উ ভি হ্যায়।' বিন্দুমাত্র ভাবল না রিকশাওয়ালা। রিকশা নামিয়ে হাত দেখিয়ে বলল, 'চলিয়ে সাব, পসন্দ না হোয় লোট আইয়ে গা, কই ফিকির নেহি।'

সুবিমল হঠাৎ আবিষ্কার করল ও রিকশার ওপর বসে আর রিকশাওয়ালা পাঁই পাঁই করে ছুটছে। বসতে পেয়ে বেশ ভাল লাগছিল। এতক্ষণ গুণীবাবার আশ্রমে ঢোকার পর থেকে পেটে অস্বস্তিটা ছিল না। চিন চিন শুরু হয়েছে আবার। হঠাৎ উত্তেজনা হলে ব্যথাটা বেড়ে যায়—সুবিমল ভাবল রিকশাওয়ালাকে বলবে একটু আস্তে চালাতে। কথা বলতে হঠাৎ ইচ্ছে করছে না। সুবিমল চোখ বন্ধ করে ভাবল সে কোথাও যাচ্ছে রিকশাওয়ালাটা তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাওয়ার লোক—একটা বাহন থাকলে পৌঁছতে কতটুকু।

পার্কস্ট্রীট থেকে রিকশা রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে ঢুকল। রিকশার ওপর বসে থাকলে নিজেকে সম্রাট মনে হয়। দুলকি চালে যাচ্ছে রিকশাটা। ট্রাম রাস্তা থেকে একটা গলিতে ঢুকল। এ অঞ্চল চেনে না সুবিমল। কোনকালে না আসায় কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। সাপের মত বাঁক নিল গলিটা। দুপাশের বাড়িগুলোয় মোমবাতি জ্বলছে। এ তল্লাটে আজকেই লোডশেডিং হল! মোটামুটি বোঝা যায় এখানকার বাসিন্দারা বাঙালী নয়। খুব জোরে এখানে ওখানে ট্রানজিস্টার বাজছে। সুবিমলের ভয় হল এখান থেকে একা বোধ হয় সে বেরুতে পারবে না। রিকশাওয়ালা একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে রিকশা নামাল।

আবছা অন্ধকারে সুবিমল লোকটাকে হাঁপাতে দেখল। চোখমুখে ঘাম চকচক করছে। গা এলানো সুবিমলকে দেখে লোকটা হেসে বলল, 'আভি আয়া সাব, আপ আরাম কিজিয়ে।'

রিকশাওয়ালা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে সুবিমল ভীষণ নাড়া খেল। এরকমটা সে চায়নি। এ ধরনের কোন ভাবনা তার ছিল না। এখন লোকটা যদি কোন ইটালিয়ান বা আফ্রিকান মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির করে!

সুবিমলের গলাটা শুকিয়ে গেল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো ও। অন্যমনস্ক হলেও ধোঁয়াটা কেমন অচেনা—সুবিমলের মনে পড়ল এটা চারমিনার নয় তার পকেটে ডানহিলের প্যাকেট। কি যে সব হয়ে যায়।

ফুটপাথের অন্যপাশে আরো একটা রিকশা দাঁড়িয়ে। অন্ধকার ক্রমশ চোখের সংগে খাপ খেয়ে গেলে সুবিমল বুঝতে পেল রিকশাটা স্বাভাবিক নয়। পর্দা ফেলা রিকশায়। কিছু একটা হচ্ছে। রিকশাওয়ালাটা চুপচাপ ফুটপাথে বসে। আশেপাশের বাড়িগুলো অন্ধকারে মিলে মিশে একাকার। হঠাৎই মাংসের দোকানে ঝোলানো ছাল ছাড়ানো খাসির রাঙ-এর মত একটা মোটা নগ্ন পা দেখতে পেল সে ঘের রিকশা থেকে বেরিয়ে আসছে। মোটকা মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে কোথাও মিলিয়ে যেতেই রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে চলে গেল।

গা ছমছম করল সুবিমলের। এখন সে একা। কি মনে হতে সামনের পর্দাটা ফেলে দিল। ছোট্ট ঘেরা জায়গাটা অনেক বেশী আরামদায়ক। পেটের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। শাল সময় পায় না। এই সময় রিকশাওয়ালার গলা শুনতে পেল সে, 'আ গিয়া সাব্।'

দমবন্ধ করে বসে রইল সুবিমল। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'আফ্রিকান নেহি চাইয়ে—ইতালিয়ান লিয়াও।'

পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে লোকটা বলল, 'ওহি হ্যায় সাব।'

আর তারপরেই একগাদা সেন্ট পাউডারের গন্ধ নিয়ে একটি মোটা মেয়ে উঠে এল তার পাশে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু বড় রোমাঞ্চ হল সুবিমলের। কোথায় ইতালি কোথায় কলকাতা। এখন সব জগৎপরিবার।

'ইয়েস।' সুরেলা গলায় মেয়েটি সুবিমলের হাত ধরল। স্বল্প জায়গায় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কোন মেয়ের সংগে কোনদিন বসেনি সুবিমল।

'হোয়াটস্ ইওর নেম?'

'নামে কি হবে—ডাকলেই হল!' মেয়েটি ফ্যাস করে হাসল।

সংগে সংগে পেটের ব্যাথাটা যেন ডিগবাজি খেয়ে গেল। সুবিমল বলল, 'আপনি বাঙালী?'

'তাতে কি আছে, অন্ধকারে সব সমান। চলুন যাবেন।'

সমস্ত শরীর গুটিয়ে গেল সুবিমলের। হাত-পা ঝিমঝিম—ওর মনে হল শরীরে কোথাও রক্ত নেই। কোনরকমে বলল, 'আমার পেটে বড় ব্যথা।'

'মাল খান বুঝি খুব। তা কি হয়েছে—আর কোথাও তো বাধা নেই। অটকাবে না—।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কাজ করলে আনন্দ পাবেন।'

সংগে সংগে গুণীবাবার বাণী মনে পড়ল সুবিমলের, কর্মই পূজা। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল ও, 'গুণীবাবার আশ্রমে গিয়েছেন?'

'কোন বাবা?'

'গুণীবাবা?'

'আমার কোন বাবাটাবা নেই। আপনারাই আমার বাবা—চলুন আর ন্যাকামো করবেন না।'

'আজ থাক বরং কাল—।' সুবিমল পেটে হাত বোলাল।

'এ দুখন—ক্যা লিয়ায়া তুম—' সুবিমল শুনল মেয়েটির গলা মুহূর্তেই পাল্টে গেল। সোনার হার বোধ হয় এত দ্রুত ফুলের মালা হয়নি।

'ক্যা হুয়া?' রিকশাওয়ালা পর্দা তুলে ধরে।

'আজকা বাৎ ছোড়কে কালকা বাৎ কর রহে হ্যায়।'

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল সুবিমল। চিন্তাভাবনাগুলো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। বিড় বিড় করে বলল, 'এক গঙ্গা জলে যা ধোয় না এক ফোঁটা ভালবাসা তা পরিস্কার করে।'

'চল শালা, তোমাকে ভালবাসা শেখাচ্ছি। পাগলা কাঁহিকা। এ দুখন হামারা রুপিয়া দেও।'

'এ বাবুজি—আপ নেহি জায়েগা?' রিকশাওয়ালা মুখ ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। আর সেই সময় দপ করে রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। সুবিমল দেখল, কইমাছের ছাইমাখা শরীরের মত একটা মেয়ে, সে এবং একটি গোঁফযুক্ত মুখ, সুন্দর একটা পারিবারিক ছবির মত লাগছে। নিজেকে শিশুর মত মনে হল তার, 'আজ আমার ভাল লাগছে না।'

'হুঃ', শরীর বেঁকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটি, 'আমার ইজ্জত নেই যাতের মজা!' রিকশাওয়ালা মোটা গলায় বলল, 'নেহি বাবু ও ইজ্জতকি সওয়াল হ্যায়। আপকো যানেই হবে। নেহি তো রুপিয়া দিজিয়ে।'

সুবিমল টের পেল আশেপাশে কিছু মানুষের শব্দ, ফিসফাসে উত্তেজনা। হাত জোড় করল সে, মেয়েটি ওর দিকে ঘুরে বসেছিল, যুক্তকর তার স্তনে আঘাত করল, 'না মা, আমার শরীর খারাপ, এবারের মত ক্ষমা দেও। মাইরি বলছি।'

খিলখিল করে হাসল মেয়েটা, 'এ কিরে—এ দুখন—ইসকো ঘর লে চল, হাম ইসকো মা দেখায়গা!'

'ক্যা হুয়া এই রিকশাওয়ালা?' বাইরে থেকে কে হেঁকে উঠল।

'রুপিয়া দিজিয়ে বাবু—বিশ রুপিয়া।' রিকশাওয়ালা সুবিমলের হাত ধরল। বিশ? পেটের ব্যথাটা যেন গলায় উঠে এসেছে। ক্রমশ সুবিমল ঘেমে উঠল। ও বলল, 'দশ টাকা নাও।' কোন রকমে মুক্ত হবার জন্যে প্যান্টের ভেতরে পকেটে রাখা টাকা থেকে একটা নোট টেনে বের করতে গিয়ে ফস করে শব্দ হল। মেয়েটির সামনে টাকাটা ধরতে সে চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'এ দুখন মজা লুটনে ইয়ে টুটা নোট লিয়ায়া।'

আবার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করতে হল ওকে। মেয়েটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখে বুকের খাঁজে গুঁজে নেমে গেল রিকশা থেকে। সুবিমলের মনে হল গভীর জলের তলা থেকে কে যেন তাকে ঠেলে ওপরে তুলে নিল। নিঃশ্বাস নিতে নিতে সে বলল, 'চল।'

কখন রিক্সাওয়ালা ওকে পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে এসেছে টের পায়নি। পেটের যন্ত্রণা সারা শরীরটায় ছড়িয়ে পড়ছে। জন্তুর মত লাগছে এখন। রাস্তার আলোগুলো কখনও গদাবাবা কখনও মেয়েটির মত হয়ে যাচ্ছে।

রিক্সাওয়ালাকে ও পাঁচটা টাকা দিল। একটা চায়নি সে. একটু নম্র গলায় বলল সে, 'ক্যা ফয়দা হুয়া সাব, বিশ রুপিয়া তো আপকা খরচ হুয়া—উসসে তো প্যয়রে মজা মিল যাতা।'

'মজা?' ফিস ফিস করে বলল সে। তারপর দু' টুকরো দশ টাকার নোটটা ওর হাতে দিয়ে দিল।

দুটো হাত মেঝে পড়ে রইল সুবিমল। পাশ ফিরে শুতে গেলে মনে হয় শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। টুকরো টুকরো অনেক চিতা সারা শরীরে সাজানো। মেয়েটাকে ভোলা মুশকিল হয়ে পড়ল ওর। কি অবলীলায় সে বলল, হাম ইসকো মা দেখতা। ঈশ্বরের মত ব্যাপার।

দুদিন পরে আবার সে যখন ডক্টর খাসনবীসের চেম্বার থেকে বেরোল তখন সব পরিষ্কার। অপারেশন টেবিলে যেতেই
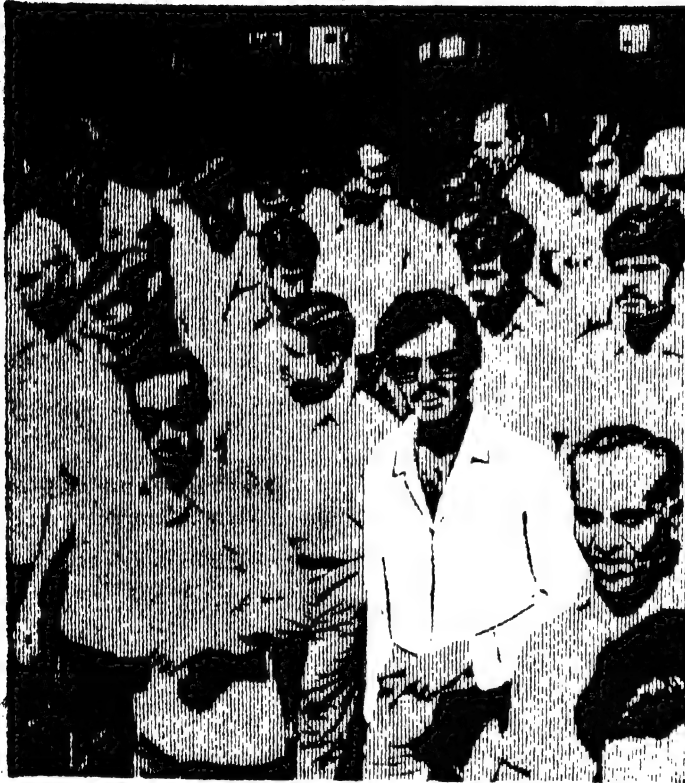
হবে। কলকাতার ট্রাম-বাস এই পরিচিত মানুষগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। নতুন বেরুনো একটা সিনেমার পোস্টার দেখতে দেখতে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আর পড়তেই দারুণ একটা রোমাঞ্চ হল ওর। ছবিটা দরকার—একটা ছবি চাই। কিন্তু কার জন্যে ছবি রাখবে সে। বরং যদি অপারেশান টেবিল থেকে ফিরে আসে সে তাহলেই ছবিটা নেবে। কদিন ছবি তোলেনি সে। একটা ভীষণ কৌতূহলে ক্রমশ ও কার্ডের ঠিকানায় হাজির হল।

ছিমছাম ছোট্ট দোকান। সুবিমল দেখল কাউন্টারে ভীড় নেই, ভেতরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে। সুবিমলকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন! হঠাৎ সুবিমল আবিষ্কার করল ছবিটার কথা বলতে কেমন সংকোচ হচ্ছে। যেভাবে ছবিটা তোলা হয়েছে এ ভদ্রলোক কি জানেন?

'ছবি তুলবেন?'

ঘাড় নাড়লো সুবিমল, না।

'প্রিন্ট করাবেন?'

'না, আমার একটা ছবি তোলা হয়েছে—এই যে কার্ড।' পকেট থেকে কার্ডটা বের করে কাউন্টারে রাখল সে। ভদ্রলোক সেটা দেখে ভেতর থেকে একটা খাম বের করে সামনে রাখলেন। সুবিমল দেখল তার মধ্যে অনেক ছবি।

'দেখুন তো আপনারটা কোনটা? আমার ভাই-এর পাগলামো।'

সুবিমল ছবিগুলো বের করল। কলকাতার রাস্তায় বিভিন্ন মানুষের ছবি। কিন্তু তার ছবি তো নেই। না, পেলাম না তো', সুবিমল হতাশ গলায় বলল।

'সেকি! ও তো মিস করে না। দাঁড়ান, ও ডার্করুমে আছে, ডাকছি।' ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। সুবিমল দেখলো সামনেই একটা এনলার্জ করা পাহাড়ী বৃদ্ধের ছবি। দারুণ জীবন্ত।

পায়ের শব্দে সুবিমল মুখ তুলতেই সেই ছেলেটিকে দেখতে পেল। শক্ত চোয়াল, উস্কোখুস্কো চুল। 'কি ব্যাপার?'

'আমার ছবি!' বিষণ্ণ শোনাল নিজের গলা, সুবিমল হাসল।

'আপনি? ওঃ। সেই পার্ক স্ট্রীটে না?' ছেলেটি ইতস্তত করল।

ঘাড় নাড়ল সুবিমল, 'হ্যাঁ।'

দশ আঙুলে কাউন্টার বাজাল ছেলেটি। তারপর বলল, 'মানে ইয়ে হয়েছে—আপনার আর একটা ছবি তুলে দিচ্ছি—আসুন।'

'কেন সেটার কি হল।' সুবিমল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

'আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। মানে এরকমটা হয় না—একদম অ্যাকসিডেন্ট। আপনি রাগ করবেন না।' অপরাধীর ভঙ্গী ছেলেটির।

'ওঠেনি?'

'উঠেছে, তবে—।'

'দেখান।'

কাউন্টারের ভেতরে আলাদা করে রাখা একটা খাম থেকে ছবিটা বের করল ছেলেটি। তারপর আস্তে করে সুবিমলের সামনে রাখল। ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখল সে। থর থর একটা কাঁপুনি এল হঠাৎ। দু' হাতে আঁকড়ে কাউন্টার ধরল সুবিমল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ছেলেটির দিকে। পোস্টকার্ড সাইজের এনলার্জ করা ছবিটায় কয়েকটি খুশী খুশী শিশুর মুখ হাসছে।

কুণ্ঠার সঙ্গে হাসল ছেলেটি, 'এরকমটা হয় না—মানে—আপনাকে তুলে গাড়ের মাঠে যেতেই এই ব্যাচটার দেখা পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে ডবল এক্সপোজড—'

কথাগুলো কানে যাচ্ছিল না [illegible] ও হঠাৎ আবিষ্কার করল [illegible] আছে। প্রায় সারা ছবি জুড়েই [illegible] তবে একদম আবছা একটা [illegible] পুরো ছবিটা জুড়ে। ওর ক[illegible] ঢাকা টাটকা ছোট্ট মুখে, গালের পাশে একটা বাচ্চার ছোটার ভঙ্গীতে, সারা মুখে একরাশ ফুলের মত মুখের ছড়াছড়ি। অথচ আলাদা করে তাকে চেনা যাচ্ছে না। দারুণ অন্ধকার রাতে আকাশের মতন নিষ্প্রভ।

কোনদিন নেশা করেনি সুবিমল। কিন্তু এখন ও মাতালের মত টলতে লাগল। কিন্তু অদ্ভুত একটা শিরশিরাণি ওর সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছিল। ভীষণ উত্তেজনায় পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে কাউন্টারে রাখল সে: 'একটা অনুরোধ রাখবেন ভাই, প্লিজ, এই ছবিগুলো আরো বড় করে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন; সবার কাছে।'

ছেলেটি বোধ হয় কিছু বলতে চাইল কিন্তু সুবিমল ছবিটা নিয়ে চুপচাপ মেসে ফিরে এল। ঘরের তালা খুলে জুতোটা ছুঁড়ে দিল এককোণে। জানালা বন্ধ, ছায়া ছায়া ঘর। সুবিমল বিছানায় শুয়ে দুটো হাঁটু জোড়া করে বুকের কাছে আনল, দু' হাতের মুঠোয় ছবিটাকে ধরে চোখের সামনে রাখল। আর তারপর, সেই ছেলেবেলাকার মতন ওর চোখের মণি ছবির মুখগুলোর ওপর এক্কাদোক্কা খেলে বেড়াতে লাগল।

লাল ত্রিকোণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে, পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে সরকারী কর্ম-পন্থায় অঙ্গ হিসাবে পরিবার পরিকল্পনাকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। পৃথিবীতে রাজ্য-শাসনের পরিচালনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনাকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে ভারতই প্রথম অগ্রণী হয়ে আসে। হাটে বাজারে, পথেঘাটে ব্যাপক বিজ্ঞাপনের বাহার নিত্য নূতন মাধ্যম দিয়ে সাধারণকে সতর্ক করবার শত শত চেষ্টায় দেখলাম রাজস্থানী পুতুল নাচ থেকে নিয়ে হরিয়ানার হাতি মেলায় মেলে ধরেছে লাল ত্রিকোণ ! শহরে শহরে ক্লিনিক বসলো। শিক্ষিত মেয়ে যাওয়া আসা করলেন। ডাক্তার, মহিলা সমাজ কল্যাণ কর্মী, সরকারী, বেসরকারী মাইনে করা মানুষ, শখের স্বেচ্ছাসেবী ঘটা করে হইচই করে সবাই পরিবার পরিকল্পনার পথ দেখাতে নেমে পড়লেন। নিত্য নানা আয়ুধের আয়োজন হলো। এত বছর পর হঠাৎ যেন সবাই নূতন আতঙ্কে জেগে উঠলেন। পরিবার পরিকল্পনাকে সরকারী মহল আবার ঢেলে সাজাতে চান। বিশ্ব-কনফারেন্স বসলো জনসংখ্যা নিয়ে। সে কনফারেন্সে ভারতের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডাঃ করণ সিং বললেন, পরিবার পরিকল্পনাকে অন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। পরিবার পরিকল্পনা একটি সামগ্রিক অগ্রগতির অংশ। কিন্তু সেই সামগ্রিক অগ্রগতি থেকে তো আমরা এখনও বহু দূরে। যে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অভাব পরিবার নিয়ন্ত্রণকে ব্যর্থ করে দিয়ে চলেছে তার তো এতটুকু কম কোথাও হয় নি। অন্নহীন মা মৃত শিশুর নামে আর এক পাত্র লপ্‌সি সংগ্রহ করে যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, সেখানে পরিবার পরিকল্পনার কি উপদেশ কার্যকরী হতে পারে ?

যদি জন্মহার এভাবে বেড়েই চলে তবে ২০০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। বর্তমান লোকসংখ্যা ভারতে ৫৮·১ কোটি। ২০০০ সালে দ্রুতগতি অক্ষুণ্ণ থাকলে দাঁড়াবে শত কোটি ! ৫৮·১ কোটি যেখানে অন্নহীন বস্ত্রহীন আর আশ্রয়হীনের সংখ্যায় ভারাক্রান্ত, সেখানে ভাবুন শত কোটির কথা ! আধিক্যে অভিভূত সেদিনের মানুষ কোন্ পরিকল্পনার বলে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

যে সব 'শ্লোগান' অর্থাৎ জিগির বা আদর্শ নীতিবাণী পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল তার কতটুকু প্রভাব গাঁয়ের অগণিত নরনারীর উপর পড়েছে? এত বছর কেটে গেছে

ঘরে বাইরে

শ্লোগানগুলি সামান্যই প্রেরণা দিয়েছে. তাই সাধারণ মানুষ প্ররোচিত বা অনুপ্রাণিত হয় নি। এখনও একটিবার তুড়ি মারতে যতটুকু সময় লাগে সেটুকু সময়ে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্রতি দশ সেকেন্ডে সাতটি শিশু এসে যোগ দেয় অগণিত ভারত সন্তান সংখ্যার সঙ্গে। তাই বলা হয় অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে যে অঙ্গুলি-স্ফোট শব্দ হয় তার মধ্যে অর্থাৎ এক থেকে দেড় সেকেন্ডে একটি করে নূতন জন্ম অধিকতর ক্লিষ্ট পিষ্ট উত্তরকালের দিকে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে। সে ভয়াবহ অবস্থার কোনও সুরাহা পরিবার পরি-কল্পনার প্রোগ্রামে কেন হয় নি কে জানে। শুনে সেদিন অবাক হলাম লখনৌর এক বেগম সাহেবার কথা। তাঁর পরিচালিত লোককল্যাণ সংস্থায় লাল ত্রিকোণটি কোন লক্ষণীয় স্থানে রাখতে তাঁর আপত্তি। লাল ত্রিকোণ দেখলে অন্যান্য কল্যাণকর্মের জন্যও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসবে না।

পরিবার পরিকল্পনায় যে শহুরে নিদানিক তথ্য ও শিক্ষার ক্লিনিক হয়েছে সে সম্বন্ধেও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। গাঁয়ের ভাষা আলাদা, পুরুষানুক্রমিক ভাবে বিশ্বাস, প্রথা সবই আলাদা। শহর থেকে সদ্য পাস করা আলোকপ্রাপ্ত আধুনিকা সেখানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা পাবে এ আর আশ্চর্য কি ? এখানেও একটি মজার কাহিনী উল্লেখ না করে পারছি না। কাহিনীটি উত্তর ভারতের এক অজ পাড়া-গাঁর। 'শহরের কুমারী ডাক্তার। অল্প বয়স। সেখানে পরিবার পরিকল্পনার ভার নিয়ে এলেন। কেন্দ্রে যারা আসে যায় তাদের কথার অর্থ এক, আর ডাক্তার মেয়েটির কথার অর্থ আরেক। সেখানে মরদ্ বলতে বোঝায় যে কোন মানুষ. মানে পুরুষ মানুষ। অথচ গাঁয়ে পুরুষকে বলে লোগ আর স্ত্রী লুগাই। আমাদের ডাক্তার বেচারী অথই জলে। একদিন একটি অল্পবয়সী বিবাহিত মেয়ে এলো পরামর্শ নিতে। 'বাত করনা' কথাটির সাধারণ মানে 'কথা বলা'। সেই গাঁয়ের আঞ্চলিক মানে অন্য। মরদের সঙ্গে রাত করনার মানে হলো স্বামী সহবাস। বউটি এসেছে তার সেই সমস্যার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন করতে। আধুনিকা ডাক্তার ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'আমি সারাদিন কত লোকের সঙ্গে বাত্ করি, তাতে তো কোন সমস্যা হয় না !' হায় হায় ! দুদিনে সে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ ডাক্তারটিকে দেখলে টিট্‌কারি দিতে আরম্ভ করলো। নিন্দা আর বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে তাকে কাজে ইস্তফা দিতে হলো। সামান্য একটু ভুল বোঝা থেকে কত বড় এক communication gap সৃষ্টি হয় ভেবে দেখুন! কাজেই পরিবার নিয়ন্ত্রণের বিস্তীর্ণ আয়োজনে Communication gap বা মনের যোগাযোগে ব্যবধান রয়ে গেছে এ আর আশ্চর্য কি ! এখন কর্মকর্তারা বলছেন, আগে জনসংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণের মনে স্বাভাবিক ভাবে সতর্ক হবার মনোভাব আনা দরকার, এবং তারপর তারা আপনা-

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৫৮·১ কোটি
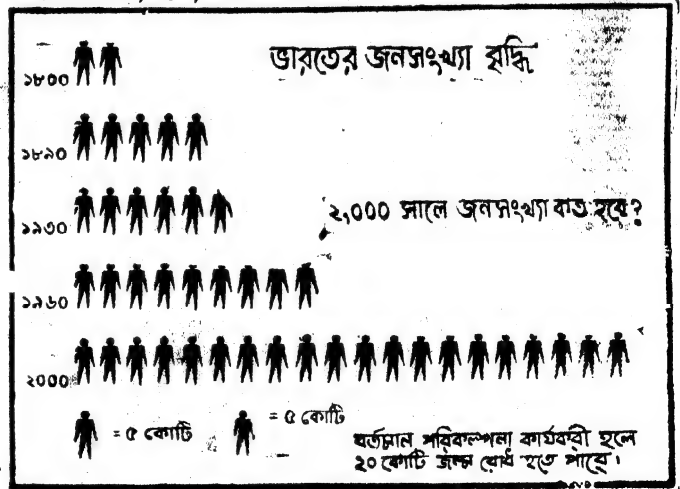
থেকেই জানতে চাইবে কিভাবে সতর্ক হতে পারা যায়। বিজলীর নগ্ন তারে হাত লাগালে হাত পুড়বে, এমনকি বিশেষ দুর্ঘটনা হ'তে পারে, অতএব বিজলীর তার সম্বন্ধে শহরে গাঁয়ে সতর্কতার মহড়া দেওয়া দরকার—এমন তো হয় না। মানুষ প্রথমে জানে বিজলী থেকে সাবধান হওয়া দরকার—তবে সে শেখে সাবধান হ'তে। অনুভূতি গভীর ও বদ্ধমূল হ'লে আপনা থেকেই মানুষ উপায় খুঁজবে। তাকে প্রভাবিত করবার কলকাঠি খুঁজতে হবে না।

অগণিত অজ্ঞ দরিদ্র মানুষকে তাদের সংস্কার থেকে মুক্ত করা সহজ কথা নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তারা দেখতে পায় সন্তানকে সামান্য বড় করে দিতে পারলে সে অর্থনৈতিক সাহায্যে যোগ দিতে পারে। লাঠিখানা ধরতে পারলে ছাগল গরু চরিয়ে আনতে পারে। সে শিশুর ভবিষ্যৎ ভাববার শক্তি তাদের কোথায়! অকরুণ বর্তমান সেখানে বেশী কঠিন। তার উপর চিরকাল তারা জেনে এসেছে নরক থেকে মুক্তি পেতে হ'লে পুত্র চাই। একটি নয়, দুটি নয়, বেশ কয়েকটি! কারণ জীবনের বন্ধুর পথে ক'জন হারিয়ে যাবে কেউ জানে না।

বৃদ্ধ বয়সেও তো সম্বল চাই, অবলম্বন চাই। সেই পিতামাতাকে যুক্তি দিয়ে কি বোঝাতে পারবেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষময় ফল?

প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে দরিদ্র ঘরে সন্তান আসে বেশী। শিক্ষিত মানুষ, সচ্ছল মানুষ যা বুঝতে পারে, তা দরিদ্র অজ্ঞদের বোঝা কঠিন। কাজেই শিক্ষা চাই, চাই motivation বা প্ররোচনা এবং প্রচুর তথ্য। ফাইলে লেখা তথ্য নয়। এমন তথ্য যা ঘরে ঘরে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে। প্রতিটি গাঁয়ের মানুষ বুঝবে নূতন জন্মের সাংঘাতিক ভবিষ্যৎ। সরকারের প্রচেষ্টায় হাত মেলাবে। এ যে জাতীয় সর্বনাশ থেকে বাঁচবার সন্ধান।

সামগ্রিক উন্নতিই অংশ হিসাবে পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে পারে একথা সত্য। কিন্তু সে সামগ্রিক উন্নতির অন্য অপেক্ষা করা অসম্ভব নয় কি? অংশ এবং সমগ্রকে সমানে এগিয়ে চলতে হবে। এতে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। ভয় করে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। বছর কয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এক অর্থমন্ত্রী চেয়েছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে একটি ব্যবস্থা। সন্তান জন্মের জন্য সরকারী কর্মচারীরা যে সুযোগগুলি পান তা দ্বিতীয় সন্তানের পর বন্ধ করা হবে। তার জন্য পার্লামেণ্টে তাঁকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয় এবং প্রস্তাবটি আর অগ্রসর হয়নি। এ ধরনের বিরোধিতায় ভয় পাওয়ার দিন আর নেই। বহু সরকারী ব্যবস্থায় আজও অধিক সন্তানের ক্ষেত্রে অধিক সুযোগের অবসর দেওয়া হয়। ইনকাম ট্যাক্স, জমির মালিকানার পরিমাণ ইত্যাদির বেলায় অধিক সন্তানযুক্ত পরিবার সুবিধা পেলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিপরীতধর্মী আয়োজন তাকে বলা যায় বই কি।

শহরের ক্লিনিকে লাল ত্রিকোণ

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের হিসাবে জন্ম নিরোধে সক্রিয়ভাবে আয়োজনের আওতায় এসেছেন ভারতের বিরাট জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ মাত্র। পঞ্চম পরিকল্পনায় I U D এবং নির্বীজিত করার ব্যবস্থা নিম্নগতি হয়েছে। I U D যতটা জনপ্রিয় হলে সফল হতো তাও হয়নি। তার কারণ I U D থেকে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এখন নূতন ধরনের I U D প্রয়োগ পরীক্ষা করা হচ্ছে। সারা দেশে এক লক্ষেরও অনেক কম মহিলা পরীক্ষামূলকভাবে 'P 11' ব্যবহার করছেন। তাও শহরে শিক্ষিত সমাজে। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রতি সপ্তম মানুষ ভারতীয়। সমগ্র রুশ দেশের যা জনসংখ্যা তার সমান মানুষ ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতে জন্মেছে। তাই দরিদ্র ভারতীয়দের সংখ্যা এত। তাই অন্নের হাহাকার যেন মিটবার আশা কমে আসছে। সরকারী চেষ্টা এবং রাজনীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সার্থক ও সফল করার চেষ্টা যতটা প্রয়োজন, সমাজের সামগ্রিক মনোভাবের আমূল ও কঠোর পরিবর্তনও ততটা বা ততোধিক দরকার। এখানে মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে পুত্রহীনার হাত থেকে ভিখারী ভিক্ষা নেয় না, অতিথি জল গ্রহণ করে না বলে বন্ধ্যাত্বের এত লাঞ্ছনা, সে-দেশে বিপরীত মনোভাব আনতে কষ্ট কম হবে না একথা সত্য। তবু সে কষ্ট ভিন্ন সর্বনাশের গতি রোধের কোন উপায় নেই।

শ্রীমতী

হাতীর হাওদায় লাল ত্রিকোণ

"ও পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'—মাসে
গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন আর সেই সঙ্গে ওয়াটারর‍্যাপ স্ত্রীলোকদের শরীর পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াটাররাপ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিমেষে। তাই আপনার গায়ের ত্বক শুকনো খরখরে থাকে আর কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই—বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য। বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন। এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি "কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা ৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
এখন
নতুন ধরনের
মধ্যে
অ্যাডজাস্টেবল বেল্টও আলাদাভাবে পাওয়া
যায়। কেয়ার ফ্রী স্যানিটারী ন্যাপকিন
যে দোকানে বিক্রী হয় সেখানে এটিও পাবেন।
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন
একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে

।। আটষট্টি ।।
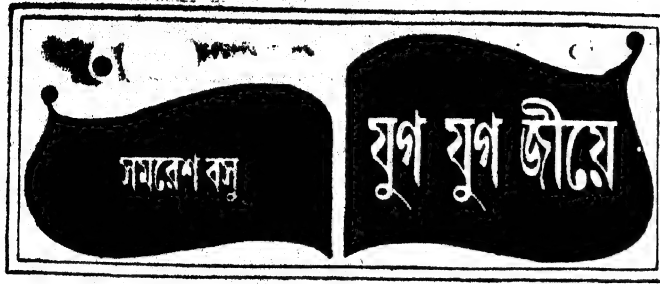
অন্ধকার গভীরতর, সমগ্র মস্তিষ্ক জুড়ে গ্রাস করে এবং অজয়ের মনে হয়, এক বিশাল শক্তিময়ী মূর্তি সেই অন্ধকারের মধ্যে গলে গলে পড়ে, বিবর্ণ হয়ে ধসে পড়ে, যার সঙ্গে তার নিজের শক্তিও গলে যায়, হতাশা থাবা বসায় বুকের গভীরে। এতো তীক্ষ্ম হতাশার থাবা, যন্ত্রণার তীব্রতাই অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়। এ কি কাননের কথা? এই অস্ফুট কান্নার মতো স্বর কি কাননের? অজয়ের মনে হয়, তার চোখের সামনে অতি জীবন্ত প্রতিমা, নিতান্ত মাটির প্রতিমার মতো বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে যায়, জলের ঝাপটায় রঙচটা মাটি কাদার মতো গলে পড়ে। কোথায় সেই ব্যক্তিত্বশালিনীর ভাষা, তার দাপট, যা শুনে ও দেখে অজয় অনেক সময় সন্ত্রস্ত বোধ করেছে। স্ট্যালিনগ্রাডের পতনের থেকেও কাননের এই ভাষা ও অসহায় আচরণ অতি হতাশজনক বিভ্রান্তিকর বোধ হয়, যদিচ সেই হতাশ বিভ্রান্তিকর ঘটনা ঘটেনি। একটু আগে দোতলায় ওঠার মুহূর্তে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে কথিত কাননের উক্তি মনে পড়ে যায়, '...মিথ্যে কথা বলতে পারেন না?' ...বা, 'বাবাকে দেখলে ওরকম হয়ে যান কেন?' কী অর্থ এই কথার? অজয় কেন কাননের বাবার সামনেও নির্ভীক থাকতে পারে না, এই কি বক্তব্যের নিহিতার্থ? কিংবা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যাচারে অপরাধ হয় না? একবার না, একাধিকবার এ-জাতীয় কথা কাননের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, যার মধ্যে স্পষ্টত বিদ্রোহের স্বর ধ্বনিত, অজয়ের বিশ্বাস। কথিত প্রস্তুত স্বভাবতই সংকুচিত অজয় এতদিন দূরে এসেছে কাননের অনায়াস কথা ও আচরণ তার অধিকারকে স্থাপিত করার প্রেরণা যোগায়।

এই কি সেই কানন, মূল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি কাতর কান্নার স্বরে ধ্বনি করে, ও প্রশ্নের জবাব জানে না এবং আশ্রয়হীন অজয়ের বুকে ভেঙে পড়ে। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেই তার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে কাননের আবেগমথিত স্বর ধ্বনিত হয়, 'আপনাকে তো আমি সবই দিতে চাই, নিন।'...কী দিতে চায় কানন, কী নেবে অজয়। যৌবনমণ্ডিত আতপ্ত এই শরীরের স্পর্শ কতকগুলো পলাতক মুহূর্তে? থোকা থোকা ফুলের মতো ফুটে থাকা নিবিড় ঘন পাপড়ির গন্ধে বুক ভরিয়ে নেওয়া এবং সমগ্র শরীরে এক অতিচেতন কেন্দ্র—মুখের অমৃত মুখ ভরে গ্রহণ যার কোনো গন্তব্য নেই, অন্ধকার বন্ধ দরজা থেকে প্রত্যাবর্তন? অজয়ের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় কানন এই বয়সে তার সঙ্গে এক নিরাপদ প্রেম খেলা করতে চায়। সংশয় যে কখনো মনে জাগেনি তা না, প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার অনেকখানি দায় কাননের, কাননের আচার আচরণ। অধঃপতিত পরিবারের হীনমন্যতায় অজয় ততোধিক আক্রান্ত না, কিন্তু দুঃখ দৈন্য আর পরবাসের অসুখে জীবনের কোনো কিছুকে নিয়েই খেলতে সে বিমুখ, মনের গভীরে অটল বাধা।

কাননের ধরে রাখা অজয়ের হাত স্খলিত হয়ে পড়ে। 'আমি তো আপনাকে সবই দিতে চাই, নিন।' কী এর অর্থ। মুখের অপরিণামদর্শী কথাবিলাস অথবা বিদ্রূপ? এ জিজ্ঞাসায় মন ক্লিষ্ট অথচ আলোড়িত হয়। কানন ওর বয়সোচিত মহিমায় বীজের আধার ফসলের অঙ্গীকার শরীরের প্রতিটি অংশ, যা আপাত বিপদসংকেতে বিস্তৃত। স্থান কাল অসহায়ক, যদিচ অজয়ের চঞ্চলতা কুণ্ঠায় আড়ষ্ট, প্রত্যাশার আবেগ যেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপে, সেই কপাটের খিল কেবল কাননের হাতে নেই, অজয়ের আড়ষ্টতার মধ্যেও তা বর্তমান অধিকতর, অজয়ের চাওয়ার স্বরূপ কাননের শরীর অতিক্রান্ত সত্তার আশ্রয়ে।

'তুমি যদি না জানো, কে জানে?' অজয়ের স্বর গম্ভীর অথচ দূরাগত শোনায়।

কানন নিশ্চুপ নিশ্চল না, ওর দুই বাহু অজয়ের গলায় বেষ্টিত, মুখ ওর বুকে ঘর্ষিত হয়। অজয় অনুভব করে কাননের শরীরের স্পর্শ, বুক, যা অতিমাত্রায় স্পন্দিত করে তার পুরুষের ধমনী এবং বিদ্যুতের ঝলকে বিচ্ছুরিত হয়, এবং উরুস্তম্ভের নিবিড়তা এবং বস্তিদেশের ঘন সান্নিধ্য, যা সকলই এক তীক্ষ্ম কণ্টে বিদ্ধ হয়, সুখানুভূতি অবস্থান করে অসহায় আড়ষ্টতায়। সে আবার বলে, 'আর কে বলতে পারে তোমাকে আমি চিরদিনের মতো পাবো কী না?'

অজয়ের বুকের কাছ থেকে কাননের অস্ফুট কাতর স্বর শোনা যায়, 'আমি জানি না।'

অভাবিত, বিস্ময়কর, অজয়ের মনে হয়, 'জানি না' শব্দ কাননও বলতে জানে। অজয়ের এতদিনের ধারণা কাননের জীবনে 'জানি না' শব্দের স্থান নেই। কানন তাকে নির্ভীক প্রেমিক হতে বলে, মিথ্যা বলতে বলে, এ বাড়িতে আসার সময়কে অবাধ করে তোলে, সময়ের বিধিনিষেধকে চূর্ণ করে এবং সাহসের সঙ্গে এই সন্ধ্যারাতে আলোকিত ঘরের কোণে তার বুকে মুখ রাখে অথচ এই বুকে নিজেকে চিরদিন সমর্পণ করবে কী না, ও জানে না। এতদিনের আশ্বাসের প্রশ্ন, সংশয় অমোঘ হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায়। অজয় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, হতাশা গ্রাসে গ্রাসে প্রাণের আশাকে গিলতে থাকে, কিন্তু দীপ্ত যৌবনের স্পর্শ জড়িয়ে থাকে সর্বাঙ্গে, ঘামে ভেজা বুকের জামায় কাননের তপ্ত নিঃশ্বাস চামড়ায় স্পর্শ করে। জীবনকে এত ঝটিতি পরিবর্তনশীল, জটিল আর বিস্ময়কর

কখনো মনে হয়নি। 'উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর...।' পাশের ঘর থেকে খোকার উচ্চ স্বরের ভূগোল পাঠ ভেসে আসে। অজয় মুখ নামিয়ে কাননের দিকে তাকায়। ওর চুলের খোঁপায় আলোর ঝলক, কালো মোটা পাকানো বিনুনি কুণ্ডলী পাকানো, মাথা গুঁজে দেওয়া সাপের মতো দেখায়, এবং চূর্ণকুন্তল বিস্রস্ত, ঘাড়ে ঘামের বিন্দু চিকচিক করে।

অজয়ের প্রাণে আবেগ এবং নিরাবেগের যুগপৎ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কাননের ঘাড়ের নিচে, জামার ফাঁকে পিঠের কিছু অংশ দেখা যায় এবং কেন যেন করুণ মনে হয়। অজয় কাননকে চেনে কিংবা চেনে না, স্থির করতে পারে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হয়, এ মেয়ে অনেক দূরের এবং তৎক্ষণাৎ তীব্র একটা কাঁটের মতো বিঁধে যায় একটা চিন্তা তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে, এ দূরত্ব জড়িত এবং অনিবার্য। কলকাতায় তাদের বাড়ির নিজের এবং দারিদ্র সম্পর্কের ভগিনীদের দৈন্যের অশালীনতা তার অনেক দেখা ও জানা, ভাই ও দাদাদের বুভুক্ষার অভিজ্ঞতাও কম নেই, এবং লিপ্ত হতে পারেনি, বিমুখ ও বিপরীতগামী মনে চিরদিনের একটা ধারণা ও বিশ্বাস, কোনো মেয়ের সঙ্গে তার জীবনের যোগাযোগ ঘটবে না, ভাগ্যের এক অমোঘ নির্দেশ, পৃথিবীর কাল অতিক্রম করে যেতে হবে। কানন তার সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছিল, পরিপূর্ণ ভেঙে দিতে পারেনি, কিন্তু একটি বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল। এই মুহূর্তে কাননের সঙ্গে দূরত্ববোধকে অতএব অদৃষ্টের নির্দিষ্ট পরিণাম মনে হয়। সে কাননের কাঁধে একটি হাত রাখে এবং অন্য হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের একেবারে শেষাংশ মেঝেয় ফেলে ভারি বুটের তলায় পিষে দেয়। কানন মুখ তোলে।

অজয় কাননের মুখের দিকে তাকায়। কাননের এ অভিব্যক্তি—কম্পিত নাসারন্ধ্র, দ্রুত নিঃশ্বাস, আবেগপূর্ণ দৃষ্টি—অজয় চেনে। কাননের চোখের পাতা ভেজা দেখায়, জলে তা টলটল করে না। আবেগ ও নিরাবেগের দ্বন্দ্বে অজয়ের ঠোঁট নেমে আসে না। কানন সহসা উৎকর্ণ হয়, পাশের ঘরে খোকা বা বিনুর স্বর শোনা যায় না। ও অজয়ের বুকের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকায় এবং আলিঙ্গন ছিন্ন করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দালানের দিকে দেখে, দরজার বাইরে যায়, আবার ফিরেও আসে। অজয় সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়। কানন কাছে এগিয়ে আসে।

অজয় কাননের দিকে ফিরে তাকায়, কানন ঘাড় বাঁকিয়ে ঈষৎ ভ্রুকুটি চোখে তাকায়। অজয় হাসবার চেষ্টা করে।

'কলকাতার খবর কী?' কানন জিজ্ঞেস করে।

অজয়ের ভুরু একবার কুঁচকে উঠেই আবার সহজ হয়, বলে, 'একই রকম।'

'কোনো চিঠি এসেছে এর মধ্যেই?' কানন আবার জিজ্ঞেস করে।

অজয় এক মুখ ধোঁয়া সজোরে ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এসেছে, গতকাল।'

'বলেন নি তো কিছু?' কানন বলে, 'আপনার মা ভাই বোনেরা সকলে ভালো আছে?'

'যেরকম থাকে, সেরকমই আছে।' অজয় বলে, 'অভাব সেইরকম, রোজ একবেলা ভাত জোটানো অসম্ভব। সম্ভব হলে যেন কিছু চাল আটা পাঠিয়ে দিই, অথবা আরো কিছু টাকা। কলকাতার রাস্তায় রোজই লোক মরে পড়ে থাকে। আর বাবা—।' সুরহীন স্বরে কথাগুলো বলতে বলতে, অজয় আবার হাসে, এবং কথা শেষ করে, 'আগের মতোই কোনো দিন বাড়ি আসে, কোনোদিন আসে না।' সে অন্য দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান দেয়।

কানন অনুসন্ধিৎসু চোখে অজয়কে দেখে এবং কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু আপনার কী হয়েছে?'

অজয় কাননের দিকে ফিরে তাকায়। কানন ওর আগের জায়গায়, দেওয়ালে শরীর ছোঁয়ানো এবং আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে আজ আপনার?'

চকিত কণ্ঠ মানুষকে বিচলিত করে এবং সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অনেক সময় বৈরাগ্য আসে, প্রকৃতপক্ষে যা হতাশার এক স্বরূপ, আপনাকে করুণা করা। অজয় এখন সেই প্রকার অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত। সে হাসে, বলে, 'নতুন কিছু ঘটে নি। আচ্ছা কানন—।'

সম্বোধন করেও অজয় এক মুহূর্ত থামে এবং কণ্ঠে সে বিচলিত হচ্ছে চায় না। নিজেকে যেন সে প্রস্তুত করে এবং হাসে এবং সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে এবং হঠাৎ প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি কথা এই মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়:

অজয় : 'আমি ভাবতে পারি না।'

কানন : 'কেন?'

অজয় : 'আমি গরীব, অশিক্ষিত।'

কানন : 'অশিক্ষিত আপনি মোটেই নন। গরীব তো কী, তার সঙ্গে ভালব... কী আছে?'

অজয় : 'ভালবাসা? আশ্চর্য! ...লেই আমার কেমন অদ্ভুত মনে হয়।'

কানন : 'অদ্ভুত লোক আ...'

অজয় : 'আমি কোনো মে... সঙ্গে এভাবে মিশি নি।'

কানন : 'এখন থেকে মিশবেন।'

অজয় : 'এভাবে কথাও বলি না।'

কানন : 'এখন বলবেন।'

অজয় : 'ভাবা যায় না, পাগল হয়ে যাবো।'

কানন : 'দোহাই, এটি হবেন না।' এবং, অনিবার্য হাসি, হাসিতে সুখ, হাসিতে আনন্দ।

অজয় আবার সিগারেটে দীর্ঘ টান দেয়, কানন জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছেন, চুপ করে গেলেন কেন?'

'না, চুপ করি নি।' অজয় বলে, 'কানন, তুমি যে বলো, আমাকে সব দিতে চাও, আমাকে নিতে বলো, সে সব কী?'

কানন ভ্রুকুটি চোখে তাকায়, কিন্তু সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না, মুখ নত করে এবং আবার তোলে, ভুরু জোড়া সহজ, মুখে কিঞ্চিৎ বিমর্ষতার ছায়া। বলে, 'কী আবার? আপনি জানেন না?'

'না।' অজয় স্পষ্ট নিচু স্বরে বলে।

কাননের মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটতে গিয়েও ফোটে না, বিমর্ষতার ছায়া ভারি হয়। অজয় বলে, 'সব বলতে তুমি কী বোঝাও? সব কি তুমি আমাকে দিতে পারো? তার কী ফল হতে পারে, তুমি বোঝো?'

কাননের মুখ নত হয় এবং ও ঘাড় কাত করে জানায়, বুঝতে পারে। অজয়ের স্বর যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে আসে, জিজ্ঞেস

জায়, 'তুমি কি তা বুঝেও আমাকে সব দিতে পারো?'

নতমুখী কানন স্থির-প্রস্তরবৎ এবং অজয়ও নিশ্চুপ। কিন্তু মুহূর্তে জিজ্ঞাসা ও জবাবের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করে অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যে আবেগ জাগে, কাননের শরীর কেঁপে ওঠে, ও দু হাতে মুখ ঢাকে এবং স্ফুরিত আতঙ্কের স্বরে বলে, 'আমি জানি না, আমি জানি না।'

অজয় সিগারেটে টান দেয়, অঙ্গার দপদপ্ করে ওঠে, চোখে ছায়া ঘনিয়ে আসে এবং সে আবার হাসবার চেষ্টা করে।

'আমার ভয় করে।' কাননের হাত দিয়ে ঢাকা মুখ থেকে একই স্বরে উচ্চারিত হয়।

অজয় অবাক হয় না, সিগারেটের শেষাংশ জুতোর ফেলে বুটের তলায় চেপে দিয়ে বলে, 'কানন, তোমারো যে ভয় করে, আমি তা ভাবি নি। বরং আমি তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যেতাম, এক এক সময় তোমার কথা শুনে আমারই ভয় করতো।'

কানন মুখ তোলে না, একভাবে থাকে। অজয় আস্তে বলে, 'আমি জানতুম।'

'কী?' কানন মুখ তোলে, হাত সরায়।

ওর চোখ জলে ভেজা।

অজয় বলে, 'আমার অদৃষ্টে এ সব সইবে না। তবু এই সব ঘটে গেল। অদ্ভুত, তাই না? কিছুই নেই, তবু কী যেন আছে।'

কানন বিচিত্র কৈফিয়তের সুরে ভেজা স্বরে বলে, 'আমি কী করবো?'

'কী আর করবে?' অজয় বলে, 'এ বাড়িতে এ কথা তো কখনো জানানো যাবে না। বলা যাবে না, তোমাকে আমি বিয়ে করবো।'

কানন প্রায় কেঁপে ওঠে এবং ওর স্বরে যেন আতংক ফোটে, 'ওহ্, না না, কী করে বলবেন?'

অজয় স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে কাননের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার পরে বলে, 'তুমি শিউলির মতো সব কিছু ছেড়ে কোনো দিন চলে যেতেও পারবে না।'

'অসম্ভব।' কাননের স্বর আর্ত প্রতিবাদের মতো শোনায় এবং তার পরেই মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলে, 'মরে গেলেও তা পারবো না।'

অজয় দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কানন ত্রস্ত বিস্ময়ে বলে, 'চলে যাচ্ছেন?'

'ওয়ার্ডে যাই।' অজয় দরজার কাছ থেকে বলে।

কানন এগিয়ে যায়। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে সহসা ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। চোখে জল এসে পড়ে। অজয় ফিরে এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। কাননের স্বর চাপা পড়ে যায়, ফিসফিস করে বলে, 'আমি কী করবো? আমার ওপর কেন রাগ করছেন?'

অট্টহাসি বা প্রচণ্ড চিৎকার, এই দুই ইচ্ছার মাঝখানে অজয় বিব্রত অপ্রস্তুত হয়ে হাসে, একটা নিষ্ঠুর কষ্ট বুকে নখ বসায়, এবং হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে কাননকে আঁকড়িয়ে ধরে বুকে পিষ্ট করে এবং তৎক্ষণাৎ আবার ছেড়ে দিয়ে প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলে, 'রাগ করি নি কানন। আমি প্রথম দিনই কেমন অবাক হয়েছিলাম আর গুটিয়ে গেছলাম। তুমি এরকম করে বললে, আমার নিজেরই যেন কেমন লাগে।' এবং কথা শেষ করেই কাননের কাঁধে একটি হাত রেখে সে আলতো ভাবে ওর গালে একবার ঠোঁট ছোঁয়ায়। তারপরে মুখ তুলে নেবার উদ্যোগ করতেই কানন দু হাতে তার গলা জড়িয়ে আগ্রাসী চুম্বনে অগ্রগামিণী হয়। অজয় স্থির হয়ে থাকে এবং মুক্তি পেয়ে সে হাসে, একটা তীক্ষ্ম কষ্ট তার কণ্ঠনালিতে, বলে, 'যাচ্ছি।' সে দরজার দিকে ফিরে, চৌকাঠের ওপারে দালানে পা দেয়।

কানন যেন স্বপ্নোত্থিত বিস্ময়ে এক পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রাত্রে খেতে আসবেন না?'

'কেন আসবো না?' জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলে। অজয় দালানের ওপর দিয়ে বুটের শব্দ যথাসম্ভব মৃদুতর করে এগিয়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে নামে। নিচের দালান আগের মতোই অন্ধকার এবং রান্না ঘরের খোলা দরজায় তেমনি আলো দেখা যায়।

'অজয়বাবু নাকি?' প্রমীলার স্বর ভেসে আসে রান্না ঘর থেকে।

অজয় থমকে দাঁড়ায়, তার ঘ্রাণে গরম-মশলা ও ঘৃত সহযুক্ত ব্যঞ্জনের গন্ধ লাগে, বলে, 'হ্যাঁ।'

'শুনুন, দরজায় মুখ বাড়ান।' প্রমীলার আহ্বান শোনা যায়, তাঁর স্বরে রহস্য এবং খুশির তারল্য।

অজয় দরজার কাছে গিয়ে দু পাশে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে ডান দিকে তাকায়। প্রমীলা উনুনের কাছে পিঁড়ির ওপর আসীন, চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। জিজ্ঞেস করেন, 'ঠাকুরঝির মুখে সুখবরটা শুনলেন নাকি?'

'সুখবর?' অজয় অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলুন তো?' হাসবার চেষ্টা করে।

প্রমীলা বলেন, 'ঠাকুরঝি বলে নি বুঝি, এই অঘ্রাণে তার বিয়ে লাগছে?'

'তাই নাকি?' অজয় হাসিকে বিস্তৃত করে। কিন্তু প্রমীলার মুখ সে দেখতে পায় না, কেবল তাঁর খিলখিল হাসি শুনতে পায়।

'হ্যাঁ, অঘ্রাণের প্রথম সপ্তাহেই আপনাদের কলকাতাতেই।' প্রমীলা বলেন, 'কোথায় মোহনলাল স্ট্রিট না কী আছে, সেখানে।'

অজয় হাসে এবং হাসিকে বিস্তৃততর করে। কিন্তু তখনো প্রমীলার মুখ সে দেখতে পায় না, বলে, 'তাই নাকি? আমাদের বাড়ির কাছেই।' এবং প্রকৃতই তার চোখের সামনে মোহনলাল স্ট্রিটের ছবি ভাসে। আবার বলে, 'মজার খবর। পরে কথা হবে বউদি, ঘুরে আসি।'

'আসুন।' প্রমীলা বলেন।

অজয় অন্ধকার দালানের ওপর দিয়ে, বুটের শব্দকে যথাসম্ভব চেপে বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, লক্ষ করে না, সিঁড়ির কাছে কাননের থমকানো ছায়া। বাইরের ঘরের দরজা খুলে রেখে দেওয়ালের কাছে দাঁড় করানো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। সামনে এবং চারদিকে অন্ধকার। অজয় সাইকেল নিয়ে বাঁধানো উঁচু রকের সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামে, পিছন ফিরে তাকায়। দরজায় কাননের অস্পষ্ট মূর্তি।

ক্রমশ

বিশ্ব বিজ্ঞান

বৃহস্পতি কি একটি তরল গোলক ?

বৃহস্পতির উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলের প্রায় শতকরা ৮২ ভাগই হাইড্রোজেন। অবশিষ্ট উপাদানের শতকরা ১৭ ভাগ হিলিয়াম এবং ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাস অথবা গ্যাসীয় যোগের মিশ্রণ। বৃহস্পতির মূল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধাকাশে ২৪০ কিলোমিটার দূরে থেকে শুরু হয়েছে স্তরে স্তরে মেঘের আবরণ। অর্থাৎ ওই দূরত্বের ওপরে সেখানকার পরিমন্ডলে মেঘ দেখা যায় নি। বরং তার নিচে বায়ুমন্ডলের গভীরে মূল ভূখন্ডের দিকে নেমে গেলে চোখে পড়বে পুরু মেঘের আস্তরণ। এবং অবশেষের সৌরজগতের এই বৃহত্তম গ্রহটির অভ্যন্তরে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার গভীরে নেমে গেলে চোখে পড়বে রীতিমত রহস্যাবৃত একটি অঞ্চল। বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন সন্ধি অঞ্চল বা ক্রিটিক্যাল জোন। এখানে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আর এই অঞ্চলটি থেকে আরও প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার গভীরে নেমে গেলে সামনে পড়বে আরও একটি সন্ধি-অঞ্চল। সেখানে তরল হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে বেখাপ্প কঠিন এক ধাতব পরিবেশ। তার সবটাই হাইড্রোজেনের বরফ। অথবা বলা যেতে পারে বরফের চেয়েও বহুগুণ জমাট হাইড্রোজেনে তৈরি পাথরের স্তূপ। এখানকার তাপমাত্রা প্রায় ১১ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবং চাপ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের চাপের চেয়ে তিরিশ লক্ষ গুণ বেশি।

এমনই যদি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে বৃহত্তম এই গ্রহটির কেন্দ্রের অবস্থাটা কী রকম হওয়া উচিত ?

এর উত্তর : পৃথিবীর মত বৃহস্পতিরও নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থল বলে যদি কিছু থাকে তাহলে ওই গ্রহটির ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তার দূরত্ব দাঁড়াবে ৬৬,৭৭০ কিলোমিটার বা ৪১,৪৮০ মাইলের মত। আর সেখানকার তাপমাত্রা ২৯,৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রচন্ড এই তাপমাত্রায় কোন বস্তুরই কঠিন অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়।

মার্কিন আন্তর্গ্রহযান পাইওনিয়ার-১০ এর পাঠান তথ্যাবলী এবং হাজার হাজার ছবি বিশ্লেষণ করার পর সম্প্রতি এ ধরনের

বৃহস্পতি। ডান পাশে সেই অতিকায় রক্ত তিলকের কালো ছবি। বাঁ পাশে বৃহস্পতিকে ঘিরে পরিক্রমণ করছে তার নিকটতম উপগ্রহ আইও। পাইওনিয়ার-১০ এই ছবিটি তুলেছিল ওই গ্রহের ২·৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে থেকে

সিদ্ধান্ত করেছেন মার্কিন দেশের কয়েকজন জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ গ্রীনিচ সময় রাত দুটো বেজে ২৫ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে পাইওনিয়ার-১০ বৃহস্পতির নিকটতম অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। পৃথিবী থেকে তার যাত্রা শুরু ২ মার্চ, ১৯৭২। আন্তগ্রহমন্ডলের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় সৌররশ্মির ধাক্কা, ছুটন্ত উল্কাপিন্ডের গতিবিধি—সমস্ত কিছু এড়িয়ে এবং অবশেষে সৌর মন্ডলের বৃহত্তম ওই গ্রহটির চৌম্বক বলয়টি ফুঁড়ে পাইওনিয়ার-১০ ঠিক যে জায়গাটির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা তার মাত্র ৬৬০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়। পৃথিবী থেকে পাঠান বেতার সংকেত অনুযায়ী মহাকাশযানটির পরিমাপক যন্ত্রগুলি এবং টেলি-ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে। ওই সব যন্ত্রের পাঠান বিভিন্ন তথ্য এবং ক্যামেরার ছবি গত নয় মাস ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার পর ওই গ্রহটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন, বৃহস্পতির অত কাছে [illegible] পাইওনিয়ার-১০ হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। গ্রহটির প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণকে [illegible] তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কোন বিপদ ঘটে নি। পাইওনিয়ার-১০ [illegible] অনুগতের মত তার অনুসন্ধানের [illegible] শেষ করার পর বৃহস্পতির [illegible] উপেক্ষা করে দূরবর্তী গ্রহগুলির [illegible] পাড়ি জমিয়েছে। মহাশূন্যের [illegible] দিয়ে এখন সে ছুটে চলেছে [illegible] দিকে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা আশা [illegible] করছেন পাইওনিয়ার-১০ এর [illegible] পর পাইওনিয়ার-১১ নামে যে আরও একটি আন্তগ্রহযান মহাকাশে [illegible] হয়েছিল, এ বছর ৩ ডিসেম্বর ওই যানটিও বৃহস্পতির নিকটতম [illegible] উপস্থিত হবে। তখন ওই যানটি [illegible] সম্ভাব্য আরও যে সব তথ্য [illegible] সেগুলি বিশ্লেষণ করার পর [illegible] একটি সম্পর্কে আরও কিছু নতুন [illegible] হয়ত অসম্ভব হবে না।

*

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-চক্রে পাইওনিয়ার-১০-এর পাঠান

5 স্টারের স্বাদই একেবারে মজাদার!
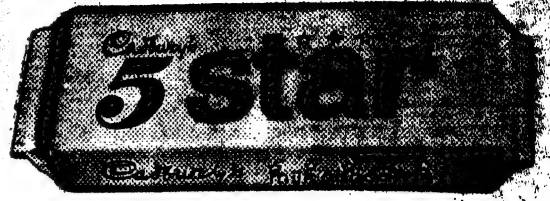
স্নেহভরা ক্যাডবেরিস্ 5 স্টারে রয়েছে
সুস্বাদু ক্যারামেল,
সরেস নুগাটিন আর
পুষ্টিকর মিল্ক চকলেট।

যৌবনের উল্লাসে যৌবনের মিষ্টি বাহার—
ক্যাডবেরিস্ 5 স্টার।

AITARS-C.275 REV. BN

তথ্যাবলী নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করেছেন সে সব থেকে [illegible] পাঠিয়েছে [illegible] মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। এই দুটি সম্পর্কে যে সব ধারণা পোষণ করে এসেছিলেন, তাদের অনেক কিছুই হয়ত অমূলক হয়ে যাবে।

জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমত : বৃহস্পতির বুকে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত যে লাল অঞ্চলটি দেখা যায়—বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন 'রেড স্পট অভ জুপিটার'—সেটা স্থির ভাসমান কোন মেঘ নয়। নিরন্ত সেখানে চলেছে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবর্ত।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনায় অবস্থিত জেট প্রোপালসন ল্যাবোরেটরির বিজ্ঞানী ডঃ জন অ্যানডারসন পাওনিয়ার-১০ এর পাঠান অভিকর্ষ সম্পর্কিত তথ্যাবলী পরীক্ষা করে মন্তব্য করেছেন : দেখে শুনে মনে হচ্ছে বৃহস্পতির বেশির ভাগ অংশই তরল। যদি সেখানে কঠিন প্রস্তরবৎ কোন অঞ্চল থাকেও—সে অঞ্চল রয়েছে বৃহস্পতির কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবীর মত বৃহস্পতির মূল ভূখণ্ডের ওপরের অংশে স্তরীভূত কোন ভূস্তর নেই। আছে তরল বা নমনীয় বস্তু সামগ্রীর আবরণ। ডঃ অ্যানডারসনের এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ উইলিয়াম বি হুবার্ড।

বলা হয়েছে, বৃহস্পতির নিকটতম চন্দ্র 'আইও'র ঘনত্ব পৃথিবীর চাঁদের ঘনত্বের সমান। এবং আরও একটি সিদ্ধান্ত এই : বৃহস্পতির বিভিন্ন গ্রহের ঘনত্ব মূল গ্রহ থেকে তাদের নিজ নিজ দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। সবচাইতে কাছের দুটি উপগ্রহ, আইও এবং ইউরোপার ঘনত্ব দেখে মনে হয় ওই গ্রহ দুটি মুখ্যত কঠিন শিলাস্তর দিয়ে তৈরি। তুলনায় গ্যানিমেড-গ্রহটির দূরত্ব যেমন বেশি তার ঘনত্বও কম। গ্রহটি সম্ভবত জল, তুষার এবং শিলার মিশ্রণে তৈরি। এ ছাড়াও আরও জানা গেছে, পৃথিবীর চাঁদের মত বৃহস্পতির চাঁদ সম্ভবত বায়ুমণ্ডলশূন্য নয়। অন্তত 'আইও'র পরিমণ্ডলে হাল্কা বাতাসের উপস্থিতি যে রয়েছে, পাইওনিয়ার-১০ এর কোন কোন তথ্য পরীক্ষা করার পর সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি এখন স্থির নিশ্চয় হতে পেরেছেন।

*

বস্তুত পাইওনিয়ার ১০এর তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যে সব কথা বলেছেন, তাদের অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত অনুমানের পর্যায়েই রয়েছে বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।

[illegible] অনেকের ধারণা ছিল বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে মূলত মিথেন এবং অ্যামোনিয়া [illegible] পরিমাণেই রয়েছে। এই সঙ্গে সেখানকার আকাশে প্রতি মুহূর্তে চলেছে বিদ্যুতের চকমকি। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ সেখানকার বায়ুমণ্ডলে নানা রকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বছর পাঁচেক আগে ডঃ উরেলার এবং ডঃ পোন্নাপেরুমা ক্যালিফোর্নিয়ার মোফেট ফিল্ড গবেষণা কেন্দ্রে একটি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে বৃহস্পতির অনুরূপ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে ওই পাত্রের মধ্যে মুহুর্মুহু বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ চালিয়ে একটি পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষায় ওঁরা দেখেছেন, বৃহস্পতির বর্ণালী পরীক্ষা করে ওই গ্রহে যে সব বস্তু আছে বলে অনুমান করা গিয়েছিল ওঁরা দেখেন স্পার্ক চালানর পর সেই সব বস্তুর অনেক কিছুই ওই পাত্রের মধ্যে তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে নানারকম জৈব-রাসায়নিক যৌগ। যাদের কোন কোনটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রচণ্ড বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে আরও এক ধরনের বস্তুও এই সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছিল। যার রঙ ঈষৎ লালাভ। বস্তুটি হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগ।

ডঃ পোন্নাপেরুমা এবং ডঃ উরেলারের ধারণা বৃহস্পতির বুকে যে অতিকায় রক্ত-তিলক বা 'রেড স্পট' দেখা যায়—তার মূল উপাদান সম্ভবত হাইড্রোজেন সায়ানাইডেরই কোন যুগ্ম যৌগ।

প্রশ্ন এই, তা না হয় হল, কিন্তু বৃহস্পতির একটি [illegible] অমন ধরনের [illegible] কারণ কী? বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ তো সেখানকার সর্বত্রই ঘটতে পারে? তাহলে অন্য অন্য জায়গায় অমন লাল রঙের চিহ্ন দেখা যায় না কেন?

এ ছাড়াও পোন্নাপেরুমা এবং উরেলার যে বলেছেন ওই গ্রহে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকা সম্ভব—এটা যদি সত্যি হয় তাহলে প্রাণের অস্তিত্বও কি সেখানে থাকা সম্ভব নয়? কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই কিন্তু তৈরি হয় নানা রকমের পেপটাইড এবং অবশেষে প্রাণী কোষের সরলতম পর্যায়। পাইওনিয়ার-১০ থেকে পাঠান তথ্যে দেখা যাচ্ছে ওই গ্রহের শতকরা ৮২ ভাগই নাকি হাইড্রোজেন ১৭ ভাগ হিলিয়াম এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য গ্যাস। হয়ত শুধু এটা সেখানকার বায়ুমণ্ডলেরই উপাদান। তা যদি হয় তাহলে বলা চলে এর আগে বৃহস্পতির আবহাওয়া-মণ্ডল সম্পর্কে যত রকমের তথ্য বিজ্ঞানীদের জানা ছিল পাইওনিয়ার-১০ এর অনুসন্ধানে তাদের অনেক কিছুই এবার হয়ত নাকচ হয়ে যাবে। এবং এতদিন কেউ কেউ যে ধারণা করতেন সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম এই গ্রহটিতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব—সেই সঙ্গে এ ধারণাটাও মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হবে।

সমরজিৎ কর

॥ সাতাশ ॥

অবশেষে একদিন দুপুরে কড়া নড়ে উঠল।

বীণা ভিতরের ঘরে এ সময়টায় দরজা বন্ধ করে ঘুমায়। ননীবালা খুটুর-খাটুর করে কাজকর্ম করেন। একটু শুয়ে চোখ বুজবেন তার উপায় নেই, ঝিম্ হয়ে পড়ে থাকলেই নানা অঘটনের চিন্তা আসে মাথায়। ঘুম যদি আসে তো সেই সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়।

ক'দিন হল শরীরটা ভাল না। মাঝে মাঝে মাথাটা পাক দেয়। প্রেসারটা বেড়েছে বোধহয়। পাড়ার চেনা ডাক্তারের কাছে সময়-মতো গেলেই প্রেসার দেখে দেয়। আলিসাতে যাওয়া হয় না, এ বয়সে ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায় তো হোক। তাতে তাঁর আক্ষেপ নেই। বেঁচে থাকা এক রকমের শেষ হয়েছে। দেখতে না দেখতেই একটা জীবন কেমন শেষ হয়ে গেল। তেমন করে কিছু বুঝতেই পারলেন না ননীবালা। এই তো সেদিনও শিশুটি ছিলেন, বগুড়ায় রেলস্টেশনের ধারে তাঁদের পাড়ার রাস্তায় ঘাটে খেলে বেড়িয়েছেন, ধারে-কাছের কথা তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু শিশু বয়সের কথা মনে পড়ে ঠিকই। স্পষ্ট, যেন বায়স্কোপের ছবি। বিন্দি, কাতু, শৈলী—সব মিলেমিশে সে এক পরীর রাজ্য। বৃষ্টি পড়ত, শীতের কুয়াশা ঘিরে থাকত, রোদ উঠত—সবই কেমন অদ্ভুত গন্ধমাখা, নতুন, বুক-কেমন-করা। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার চাপ ছিল না। কেবল সারাদিন শিশু ভাই বা বোন টানতে হত। সে তেমন খারাপ লাগত না। নাজিরের বারান্দায় থুবা করে বসিয়ে রেখে চুলে আলগা হাতে বড় খোঁপা বেঁধে এক্কা-দোক্কার কোর্টে ঝাঁপিয়ে পড়া, তারপর কিছু মনে থাকত না। ঘামে ভিজে যেত অঙ্গ, গায়ে ধুলোবালি লাগত, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসে, তবু খেলার কী যে নেশা ছিল। একদিন দেড় বছরের খোকা ভাইকে বারান্দা থেকে পাঁচিলে পড়ে কপাল কাটল, যা সেরেছিল খুব চিরদিন দিয়ে। এখনো যেন কম্পাউন্ডারের হাতে ব্যান্ডেজটা ঝিলমিল করে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা সব। শৈলী নাকি বুড়ো হয়ে গেছে। হায়রে! কতটুকু ছিল শৈলী। ফ্যাকাশে চেহারা, ফর্সা, ঠোঁট দুটো একটু ফোকলা, তাতে ফাঁক হয়ে থাকত সব সময়ে, সামনের দাঁতে একটু ফাঁক ছিল মাঝখানটিতে। সাহেবী সব নাম ছিল ওদের। চার বোন ছিল মাইথলী, মেরেয়া, পিকলি আর বিউটি, দুই ভাই ছিল সতীন আর বুয়া। শৈলীর ইস্কুলের নাম ছিল বিউটি। বিলিতি ফ্রক পরত, বিলিতি সাবান মাখত, বিলিতি বিস্কুট খেত, ওদের বাড়িতে আসত সব সাহেব মেম। জজের বাড়ি না হবেই বা কেন! যেকোন মেয়ের সঙ্গে শৈলীরা মিশত না। কেবল ননীবালার চুল দেখে ইস্কুলে সেধে ভাব করেছিল শৈলী। সেই ভাব থেকে সই। এসব কি গতজন্মের কথা! নৌকোর মতো দেখতে ঝকঝকে পালিশওয়ালা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শৈলী আর পিকলি তাঁদের বাড়িতে এসে কতবার একটা বেলাই কাটিয়ে গেছে হয়তো। আবার ননীবালাও গেছেন। ভারী চুপচাপ বাড়িটা ছিল ওদের, সে বাড়িতে কুকুর পর্যন্ত গম্ভীর। জজ নাকি হাসে না। তা হবে। শৈলীর বাবাকে কখনো হাসতে দেখেননি ননীবালা। কিন্তু সেই জজসাহেবও একবার ননীবালার খোলা চুল দেখে বলেছিলেন—বাঃ, এ তো অরণ্য! মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে গলার স্বরটা পর্যন্ত কানে বাজে এখনো। সেই স্বপ্নের ছেলেবেলা থেকে এক হ্যাঁচকা টানে কোন অচেনা, অকূল পাথারে রওনা হলেন একদিন। তখনো তাঁর শরীরটুকু ঘিরে শিশুরই গন্ধ, ভাল করে ভাবতে শেখেননি, বুঝতে শেখেননি। খুলনা থেকে বর এল, টোপর পরে। সে কি ভয়াবহ হুলুধ্বনি শঙ্খনাদ! বুকের ভিতরে ভূমিকম্প, ভেঙে পড়ছে পুতুলের ঘর, ফাটল ধরে গেল এক্কা-দোক্কার কোর্টে। ছিঁড়ে গেল কলাবতী মা-বাবার ভাই বোনের সব বাঁধন। যেন বাঁধ ছিঁড়ে ঝিঁঝির পড়ল সংসার। অচেনা একদল লোক লুটেরার মতো ঘিরে নিয়ে চলল তাঁকে আঁচল বাঁধা একটা অচেনা লোকের আঁচলে, কত কান্নাই কেঁদেছিলেন ননীবালা! সে কান্না যেন ফুরোবার নয়। হিক্কার মতো উঠতে লাগল অবশেষে। ব্রজগোপাল চোরের মতো অপরাধী চোখে চেয়ে দেখছিলেন তাঁকে গোপনে। অবশেষে ননীবালা ভারী অবাক হয়ে দেখেছিলেন,

তাঁর অচেনা স্বামীটি উড়ুনির প্রান্ত দিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছছে। সেই দেখে খানিকটা হতভম্ব হয়েছিলেন মনীবালা, যাহোক একেবারে পাষণ্ডের হাতে পড়েননি। মনটা নরম নরম আছে। ফুলশয্যার রাতে কথাটা উঠতে ব্রজগোপাল প্রথমে স্বীকার করেননি, পরে অনেক খুলোখুঁজি করলে লাজুক মুখে বলেছিলেন—কী জানো, কান্না দেখলে আমার কান্না পায়। কথাটা ঠিক নয়। মনীবালা জানেন, ব্রজগোপাল কান্না দেখে কাঁদেননি। মনীবালার জন্যই কেঁদে-ছিলেন। এসব কি বহুদিনের কথা!

আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়। নাতি নাতনীর নাম ঠিকঠাক মনে থাকে না। সোমেনকে শতবার রণো বলে ডাকেন, চাবির গোছা কোথায় রেখেছেন মনে থাকে না। তবু শিশুবেলার কথা কেন স্পষ্ট মনে থাকে!

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

আজকাল একা থাকলে এই বুড়ো-বয়সটাই জ্বালায়। তাই দুপুরে ঘুমান না বড় একটা। শরীর খারাপ থাকলে পড়ে থাকেন বটে, কিন্তু বড় শান্তি। ক্ষণে ক্ষণে উঠে জল খান, পান মুখে দেন, বেলা ঠাহর করেন জানালায় দাঁড়িয়ে। ছেলেপুলেরা ইস্কুল থেকে ফেরে দুপুরে। বীণার কড়া নিয়ম, বেলায় খেয়ে বাচ্চারা ঘুমোবে, যাতে সন্ধেবেলায় পড়ার সময়ে কারো ঢুলুনী না পায়। সবাই ঘুমোয় বলে নিঃঝুম বাড়িটা ফাঁকা আর বড় হয়ে যায়।

এমনি এক দুপুরে কড়া নড়ল। কত কেউ আসতে পারে। ননীবালা ঝিমুনী ভেঙে উঠে বসতেই পেল্লট অম্বলের ঢাকা নড়ে উঠল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে।

—কে? বলে উঠে এলেন কপ্টে।

বাইরে থেকে সাড়া এল—পিওন। রেজিস্ট্রি চিঠি আছে।

ব্রজগোপালের টাকা এল বোধ হয়। বুকটা থামচে ওঠে হঠাৎ। আনন্দে না দুঃখে ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। দরজা খুলে অল্পবয়সী পিওনকে বললেন—কার চিঠি?

—ব্রজগোপাল লাহিড়ি।

—উনি তো নেই এখানে, দূরে থাকেন। আমি সই করে নিলে হবে? উনি আমার স্বামী।

পিওন একটু ভাবে। তারপর একরকম অনিচ্ছের সঙ্গে বলে—নিন।

উত্তেজনায় কলম খুঁজতে ঘরে ঢুকে খুঁজে পান না ননীবালা। ভীতকণ্ঠে বলেন—দাঁড়াও বাবা, কলম-টলম খুঁজে পাচ্ছি না, একটু দাঁড়াও।

পিওন হেসে বলে—কলম নিন না, আমার কাছেই রয়েছে।

পিওন ছেলেটা সই করার জায়গা দেখিয়ে দেয়, ননীবালা গোটা গোটা বাংলা হরফে দস্তখৎ করার চেষ্টা করেন। অক্ষরগুলো কেঁপে যাচ্ছে, জ্যাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা এল হাতে। ব্রজগোপালের টাকা। বিশ্বাস হতে চায় না।

পিওন ছেলেটা চিঠি দিয়ে ক্ষণকাল বোধহয় বখশিশের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর চলে যায়। ননীবালা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে আসেন। শরীরটা বড় খারাপ করেছে আজ। বুকটা বশ মানছে না। বুকের ধুকধুকুনিটা যেন হঠাৎ হঠাৎ একটু থেমে আবার হঠাৎ আছড়ে পড়ছে বুকের ভিতর।

অনেক টাকা। অনেক। খামটা খুলে চেকটার দিকে চেয়ে থাকেন। টানা হাতের লেখাটা বুঝতে পারেন না। একটা খোপের মধ্যে সংখ্যাটা লেখা। দশহাজারের চেয়ে অনেক বেশী। একটা বাড়ি উঠে যাবে না এতে? খুশী হবে না সবাই?

বোধ হয় হবে। তবু বুকের ভিতরটা কী একরকম যেন লাগে। এতকাল এই টাকা কটার পথ চেয়ে বসেছিলেন ননীবালা। টাকা তুলে ব্রজগোপাল তাঁর হাতে দেবেন তিনি দেবেন ছেলেদের হাতে। জমিটা রেজিস্ট্রি হবে। ছেলেদের আর ছেলের বউয়ের কাছে ননীবালার মুখরক্ষা হবে। এই সংসারে তিনি আর একটু জোরের সঙ্গে ভারের সঙ্গে থাকতে পারবেন।

কিন্তু তাই কি হয়! হয় না। বীণা খুশী হবে না, রণোটাও কি খুশী হবে।

ননীবালা চেকটা পিকদানির নীচে চাপা রেখে শুলেন একটু। শরীর ভাল না মন ভাল না। চোখে হঠাৎ জল আসে কেন যে!

মনে হয়, সংসারে কেউই আসলে কারো নয়, এই যে একা দুপুরে মন-খারাপ হয়ে পড়ে থাকা, দিনের পর দিন, কাছের কেউ থাকলে এ দশা হবে কেন তাঁর! কেন এমন ভার লাগে দিন! সময়ের চাকা ঘোরেই না যেন।

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

চেকটা আর একবারও হাতে নিলেন না তিনি। পিকদানীর নীচে সেটা চাপা রইল। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে, তাতে ফর ফর করে পাখা নেড়ে চেকটা জানান দিতে লাগল সে আছে। ননীবালা একটু বেশী সময় ধরে কাঁদলেন আজ। ঘুম হল না। ঠিকে ঝি কড়া নাড়তে চোখ মুছে উঠলেন।

সন্ধেবেলা রণেন এলে তাকে ডেকে চেকটা হাতে দিলেন ননীবালা, কেবল বললেন—দুপুরে এসেছে।

রণেন খুশী হবে না, এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু রণেন খুশী হল, চেকটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে, জুতো মোজা খুলতে খুলতে সত্যিকারের খুশী হয়ে বলে—এসেছে! যাক, বাঁচা গেল। কালই অজিতকে খবর দেবো। লক্ষ্মণের কোন পিসেমশাই খুব ঘুরঘুর করছেন জমির জন্য।

ননীবালা কথা বললেন না, শরীরটা বশ নেই। এ বেলা বীণা রান্নাঘর সামলাচ্ছে, তিনি ছুটি নিয়েছেন। বীণা কৌতূহল দেখাল না। রান্নাঘরেই বসে রইল। তার ঐ চুপ করে থাকা, ঐ গা-আলগা ভাব দেখে মনে মনে বড় কাহিল লাগে ননীবালার। শ্বশুরের টাকায় তার কোন আগ্রহ নেই। গ্রাহ্যও করে না।

পা ঘেঁষে কুসে নাতিটা দাঁড়িয়ে আছে। বলল—ঠানু, মশা কামড়াচ্ছে। কোলে নাও।

তাকে কোলে নিলেন ননীবালা। আঁচলে পা ঢেকে শিশু-শরীরটায় গায়ের ওম দিতে দিতে মনটা হাল্কা হল। সংসারে এই বিচ্ছু-গুলোকে ভগবান পাঠিয়ে দেন মানুষের মনের ধুলোময়লা ভাসিয়ে নিতেই বোধ হয়।

সোমেন আজকাল অনেক রাতে ফেরে। কোলের ছেলেটা ধাঁ করে ভিন্‌মানুষ হয়ে উঠেছে আজকাল। কথা বলেই না। কারো সংগেই না। কেবল ভাইপো ভাইঝির সংগে একটু আধটু। ননীবালা জানেন, ও অন্য জায়গায় বাসা খুঁজছে। শীলার বাড়িতে গিয়ে একদিন জানতে পেরেছেন। কাউকে বলেননি কিছু। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁর আঁচলে বাঁধা ছেলেটা এ সংসার থেকে বার হতে চাইছে।

সেদিন ব্রজগোপাল এসেছিলেন, যাওয়ার সময়ে সোমেন গেল সংগে। টিউশানী সেরে রাতে ফিরে এসে সে কী চোটপাট ননীবালাকে—তুমি কেন বাবাকে বলেছো যে আমি আলাদা বাসা খুঁজছি! তুমি জানলে কোত্থেকে?

ননীবালা ভয় পেয়ে বলেন—আমাকে শীলা বলেছে তুই নাকি ওদের বাসায় কদিন থাকতে চেয়েছিস!

—তার মানে কি বাসা খোঁজা! দিদির বাড়িতে ভাই গিয়ে থাকলে ভিন্ন বাসা হয় নাকি!

—না হয় ভুল বুঝেছি, রাগিস কেন?

—রাগব না! বাবাকে সংসারের সব কেলেঙ্কারী জানানোর দরকার কি? বাবার না জানলেও চলত।

ননীবালা একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে বলেন—তাকে জানাবো না কেন? সে কি তোদের পর?

রাগী ছেলেটা ফুঁসে উঠে বলে তখন—পর কি না সেকথা জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা হয় না?

এ কথার উত্তরে কিছু বলার নেই, ছেলেরা বড় হলে আলাদা বোধ বুদ্ধি হয়। মায়ের শেখানো কথা তোতা পাখির মতো বলেছে এক সময়ে এই ছেলেই। এখন সংসারের নানা দাঁড়ে বসে নানা কথা শিখেছে। বোধ হয়, বাপের ঐ দূরে দূরে থাকা ছেলেটার ভাল লাগে না। বোধ হয় ছেলেটা বাপের জন্য খোঁড়ে মনে মনে, আর সেজন্য দায়ী করে রেখেছে ননীবালা আর রণেনকে।

তবু সেজন্য ছেলেটার ওপর রাগ হয় না ননীবালার। বরং আলাদা একটা গভীর মায়া জন্মায়। সে লোকটাকে ভালবাসার কেউ তো নেই আর। ছেলেমেয়েরা পর, বউ চোখের বিষ। যদি এই ছেলেটার টান থাকে তবে ব্রজগোপালের ঐটুকুই আছে। ছেলের ভিতর দিয়ে তার বাপের প্রতি এক রকম

আবছা কী যেন ভাব টের পান ননীবালা। বোধ হয় বড়োবয়সের জন্যই।

একেই কি বড়োবয়েস বলে!

আজ ননীবালা রাতে শোওয়ার সময়ে একটু সেধে কথা বলেন ছেলেটার সঙ্গে। বলেন—হ্যাঁরে, চাকরির কিছু হল না।

—কী হবে!

—শৈলীর কাছে আর একবার গেলি না! মুখপোড়া ছেলে, নিজে না পারিস আমাকে একদিন নিয়ে যাস। কতকাল দেখি না।

—গিয়েছিলাম আর একদিন। সোমেন নরম গলায় বলে।

—গিয়েছিলি! কী বলল?

সোমেন বড্ড সিগারেট খায় আজকাল। একটার আগুন থেকে আর একটা ধরিয়ে নিয়ে বলল—বলার অবস্থা নয়।

—কেন?

—ওরা খুব ব্যস্ত।

—কিসে ব্যস্ত? শৈলীর শরীর খারাপ নাকি!

—না, শুনলাম মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত। বলে সিগারেটটা পুরো না খেয়ে ফেলে দেয় সোমেন।

ক্রমশ

বছরে গুনে গুনে চারবার। গত বিশ বছরে আশিবার। কম করেও ষাট-সত্তর জন ভারতীয়কে যিনি এই সময়ে রক্ত দান করে বাঁচিয়েছেন, তাঁকেই আমরা ভারতীয় বলে স্বীকার করিনি। তাঁর আবেদনের জবাবে ইংরেজিতে টাইপ করা পাঁচ লাইনের একটি ছোট চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছি : দুঃখিত, এখন আপনাকে নাগরিকত্ব দান সম্ভব নয়।

ফাদার গেরআরড বেকারস কিন্তু মোটেও দুঃখিত নন এই জবাবে। হাসতে হাসতে সরকারী চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে ট-বর্গের চাপে কাহিল বাংলায় বললেন : নীতিগত কারণে নাকি ভারত সরকার কোন বিদেশীকে এখন নাগরিকত্ব দিচ্ছেন না। তবে ব্যাকিং থাকলে এখনও পাওয়া যায়।

ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আপনি কেন এত আগ্রহী ফাদার—পালটা প্রশ্ন করলাম। দারিদ্র্যের যেন মড়ক লেগে গিয়েছে গোটা দেশে। চারদিকে শুধু অভাব আর অভাব। ঘরে ঘরে বেকার। এমনিতেই অশিক্ষার অন্ধকার, তার ওপর নিত্য লোড শেডিং। আর কলকাতা মানেই তো নোংরা আর আবর্জনা। কেন এখানেই ঘর বাঁধতে চান?

সরাসরি জবাব দিলেন বেকারস : দুঃখের কষ্টই আপনারা দেখেছেন, সুখের কষ্ট কখনো ভোগ করেছেন? পঁচিশ বছরে পা দেওয়ার আগেই মুঠো মুঠো টাকা পকেটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হাতে—চারদিকে সুখের সম্ভাবনা। বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী প্রেমিকা সবাই যা চায় তাই যখন পাওয়া যায়, তখন হঠাৎ এই এইখানটায়—বলতে বলতে বুকের মাঝখানটায় তর্জনী ঠেকালেন ফাদার—ব্যথা অনুভব করে না কেউ কেউ? আমি করেছিলাম।

তখন আমার বয়স পুরো পঁচিশ। একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। আপনারা যাকে বাছুর-প্রীতি বলেন তা নয়। সেই বয়স আগেই পার হয়ে গিয়েছে। ওই মেয়েটির ভালবাসাই আমার চোখ খুলে দিল। প্রেম অতি বৃহৎ ব্যাপার। বুঝতে শিখলাম আমাদের সমস্ত সম্পদের মূলে তোমাদের নিংড়ে নেওয়ার কাহিনীটি গুপ্ত রয়েছে। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, দেশ ছেড়ে কোন অনুন্নত দেশে গিয়ে মানুষের সেবা করব। গোড়ায় ঠিক করেছিলাম যাব উত্তর আফরিকার কোন দেশে—লিবিয়া বা আলজিরিয়া। এমন সময় জেস্যুইট সম্প্রদায়ের নির্দেশ এল : চল কলকাতা।

এলাম চলে কলকাতায়, ১৯৫৮ সাল। সেই থেকে পার্ক স্ট্রীট সেন্ট জেভিয়ারস কলেজের চারতলার চৌষট্টি নম্বর কুঠরিটি ফাদারের পাকা ঠিকানা। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচয়, কেমিস্ট্রির হেড অব দি

ডিপারটমেন্ট। ছাত্রদের কাছে পরিচয়, সম্ভব হলে যিনি কাউকেই ফেরান না। বর্ধমান, হুগলী, চব্বিশ পরগনা বা মুর্শিদাবাদের গাঁয়ের মানুষ তাঁকে চেনেন পাগলা সাহেব বলে। মাটি কাটে, ছেলেদের নিয়ে রাস্তা বানায়, ঘর তোলে, ডাল ভাত খায়—রুটি-পেঁয়াজেও আপত্তি নেই। হাজারিবাগের সাঁওতালদের কাছে তাঁর পরিচয় ফাদার বাবা। ব্লাড ব্যাংকের কর্তারা জানেন, আর

ফাদার বেকারস

কোথাও না পেলে এই মানুষটির কাছে এক বোতল রক্ত পাওয়া যাবেই।

আদি নিবাস : বেলজিয়ামের নামুর শহর। বয়স পঞ্চাশ। গ্রীক ভাস্কর্যের আদলে গড়া কাঠামো। মুখময় দাড়ি গোঁফ। বিরল কেশ। তীক্ষ্ন নাক। কোমল দুটি ঠোঁট। চোখের তারা দুটি গভীর নীল। মমতাময়।

ওই চৌষট্টি নম্বর কুঠরিতে বসেই সেদিন গল্প করছিলাম ফাদারের সঙ্গে। ফাদারের ক্লাস ছিল সেদিন বেলায়। সকালে যেতে বলেছিলেন। ঘরে ঢুকে প্রথমেই যা চোখে পড়ল তা হল বই। দেয়ালজুড়ে কাঠের আলমারিতে স্টীলের র‍্যাকে, কাঠের বাক্সের ওপরে, পড়ার টেবিলে, মেঝেতে—সর্বত্র। গ্রাহাম গ্রীন, তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ইয়ান ফ্লেমিং, এডিংটন, ব্র্যাকে, আইনস্টাইন, লা করবুসিয়ে, সে প্রায় দিশেহারা হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

দেওয়াল, র‍্যাক, আলমারি ঘুরে চোখ জোড়া যখন টেবিলে এসে ঠেকল তখনই কানে এল : আমার বাবা ছিলেন সব্জী ব্যবসায়ী। তবে বড় সাইজের। একসপোরট, ইমপোরটের কারবার। দেশে অবস্থা রীতিমত ভালই ছিল। নামুর শহরের ওপর তিনখানা তেতলা বাড়ি পাশাপাশি। আমরা তিন ভাই বোন। জাতব্যবসা আর স্কুলের শিক্ষা দুয়ে মিলে আমার জীবিকা প্রায় নির্দিষ্টই হয়ে ছিল, কৃষি-ইনজিনিয়ার।

দুটি ঘটনায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা। ১৯৩৩ সাল। বয়স তখন নয়। ক্লাস থ্রিতে পড়ি। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে শুনলাম বাবার ব্যবসা লাটে উঠেছে। বাবার এক পার্টনার, যিনি ইংলণ্ডে থাকতেন, দেউলিয়া হয়েছেন, ফলে আমাদেরও ব্যবসা ফেল করল। ধার শুধতে গিয়ে দুটি বাড়ি বাবা বেচে দিলেন। তারপর আমাদের সবাইকে নিয়ে বাবা ও মা চলে এলেন রাজধানী ব্রাসেলসে। বাবার বয়স তখন ছেচল্লিশ। এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু দেখলাম মুখ একটুও মচকান নি। সারাজীবন ধরে উনি সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মনের দিক থেকেও সংগ্রামী। নতুন করে আবার শাক-সব্জী, ফল-ফলাদির ব্যবসা শুরু করলেন। আমরাও স্কুলে যেতে শুরু করলাম। বাবাকে দেখে 'লড়াই' কথাটার প্রকৃত মানে সেদিনই শিখেছিলাম।

আমাদের দেশে বারো বছরের স্কুল। প্রথম ছ' বছর প্রাইমারি, পরের ছ' বছর সেকেন্ডারি। কম করেও ছটি ভাষা একটি ছেলেকে স্কুলেই শিখতে হয়। যেমন প্রাইমারিতে পড়ার সময়ই আমি শিখেছিলাম ফরাসী ও ডাচ ভাষা। সেকেন্ডারিতে উঠে শিখলাম গ্রীক, ল্যাটিন, জরমন ও ইংরাজি। এ ছাড়া মাতৃভাষা ওয়ালুন তো আছেই। সেই ওয়ালুন আবার তিন রকমের। যেমন আপনাদের বাংলা। চাটগাঁ আর কলকাতার যতটা ফারাক ঠিক ততটাই ফারাক আমাদের নামুরের সঙ্গে লিয়াজে'র, আর লিয়াজে'র সঙ্গে শারলরোয়া শহরের চলতি ভাষা ওয়ালুনের।

ষোল বছর পর্যন্ত ওদেশে সব ছেলেকেই স্কুলে যেতে হয়। তারপর ক্লাস টেন পাস করে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কারিগরী লাইন বেছে নেয়। খুব কম ছেলেই বারো ক্লাস শেষ করে। বুঝতেই পারছেন, যে দেশের নব্বই ভাগ মানুষ খাটে কলে কারখানায়, সেখানে

উচ্চশিক্ষা মানেই বছর নষ্ট—কাজের লোকের অভাবে সব অচল হয়ে পড়বে।

ক্লাস টেন শেষ করে সে বছরই ইলেভেনে উঠেছি, ১৯৩৯ সাল, লেগে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানি আক্রমণ করল। মার সঙ্গে আমরা ভাই-বোনেরা গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বাবা রয়ে গেলেন ব্রাসেলসে। ওই গাঁয়ের বাড়িতে থাকতে থাকতে চাষের কাজ শিখলাম। বাবা আমাদের কোনদিন পকেটমানি দিতেন না। আগে স্কুলের ছুটির সময় গাঁয়ে গিয়ে গম কেটে, গাছ কেটে, দুধ দুয়ে চাষীদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা পেতাম। এবার সেই ব্যাপারটা'ই পাকা হয়ে উঠল।

চাষ করি। গরু, শুয়োর, খরগোস, ভেড়া, মুরগি, হাঁস ইত্যাদি পালি। কাগজে পড়ি যুদ্ধের খবর। মনে দারুণ উত্তেজনা। লোকের মুখে শুনি এ যুদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। আগেভাগে খাবার জিনিসপত্র সরিয়ে না রাখলে পরে বিপদে পড়তে হবে।

গাঁয়ে থাকতেও স্কুলে যেতাম। বাড়ি থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। বাহন সাইকেল। একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম জারমান প্যানজার বাহিনী ঢুকে পড়েছে আমাদের দেশের ভিতর। জাতীয় সরকার সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলছেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ—দক্ষিণ ফ্রান্সে যাও, সেখান থেকে শুরু কর লড়াই। স্কুল থেকেই বাড়িতে মাকে ফোনে বললাম, ফ্রান্সে যাচ্ছি, তোমরাও এসো।

লুকিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ফ্রান্সের ভেতরে একটি গাঁয়ের স্কুলে আশ্রয় নিলাম। দিন-কয়েকের মধ্যে বাবা ও মা এবং ভাই-বোনদের নিয়ে চলে এলেন ওই গাঁয়ে। কিন্তু বেশী দিন এখানে থাকতে পারিনি। কারণ জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের অস্ত্রবিরতি চুক্তি হল। তখন ওই গ্রাম থেকে বাবার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে পালিয়ে গেলাম। আরো দক্ষিণে। এবার ভূমধ্যসাগরের লাগোয়া একটি ছোট্ট বন্দর 'পারভানদ্র'-এ বাবার এক বন্ধুর পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলাম।

আমাদের তখন এক অদ্ভুত অবস্থা। 'নাৎসী' কথাটির আসল সংজ্ঞা তখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়, আবার ইংরেজদেরও আদৌ বিশ্বাস করি না। মনের ভাবটা অনেকটা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আমরা উলুখাগড়া-বেলজিয়া কেন প্রাণ দিই। স্থির করলাম, পড়াশোনা কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না।

বন্দরে কুলির কাজ একটা জোটালাম। দিন কয়েকের মধ্যে কুলির কাজ ছেড়ে লরির খালাসী হলাম। মাইল পঞ্চাশেক ভেতরে ফ্রান্সের তুলুজ শহর। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়। বন্দর থেকে রাতে শাক-সব্জী, ফল-টল লরিতে চাপিয়ে রওনা দিতাম। ভোর চারটা, সাড়ে চারটায় এসে পৌঁছতাম তুলুজে। শহরের ভেতরে পাইকারি হাট। ছটার মধ্যে কাজ শেষ। যে দিন যে পাইকারের হয়ে খাটতাম, সেই খাওয়াত ব্রেক ফাস্ট।

ব্রেক ফাস্ট সেরেই সটান চলে যেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানটিনে খালাসীর কাজের উপার্জনের রেস্ত ব্যয় করে সারতাম লানচ। সন্ধ্যায় আবার লরির সঙ্গে ফিরে যেতাম পারভানদ্রে। এইভাবেই কাটল কয়েক মাস। যতদিন দক্ষিণ ফ্রানস ছিল স্বাধীন। কিন্তু চল্লিশ সালের শেষাশেষি গোটা ফ্রানসই যখন জরমনরা দখল করে নিল, তখন পালানোর কোন জায়গা না পেয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম বেলজিয়ামে। নামুরে আমাদের অবশিষ্ট বাড়িটাও জরমন বোমা শেষ করে দিয়েছে। তাই গাঁয়ের বাড়িতে উঠলাম। ভরতি হলাম স্কুলে।

একটা কথা বলি, ফ্রানসে যে কেউ ভরতির পরীক্ষায় পাস দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারে। বেলজিয়ামে কিন্তু তা নয়।

স্কুল থেকে পাসের ছাড়পত্র চাই। পুরনো হিসেব মত স্কুলের পড়া শেষ হতে আমার দেড় বছর বাকি ছিল। বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি আমার স্কুলের পড়া শেষ হল। ভরতি হলাম লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার বিষয় কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং।

স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন ভাই-বোন ও কয়েক বন্ধু মিলে শুরু করলাম ব্যবসা। জাত-ব্যবসা। আমাদের দলে ছিল একজন স্বদেশ পলাতক জরমন ইহুদী, একজন বেলজি কম্যুনিস্ট, একজন বেলজি পাইলটের ছেলে। বাবা তখন ব্রাসেলসে।

যুদ্ধ আরম্ভ হলে সর্বত্র যা হয় আমাদের দেশেও তাই শুরু হল—কালোবাজারি। আমরা ঠিক করলাম সাধ্যমত এই কালোবাজারির মোকাবেলা করব। যখন যে শহরে শুনতাম শাক-সব্জীর দাম চড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লরি মাল নিয়ে গিয়ে জলের দরে সেখান বেচতাম, ফলে দাম পড়তে বাধ্য হত। সেই সঙ্গে মুক্তি-যোদ্ধাদের লুকিয়ে সাহায্য দিতাম। জরমন-বিরোধী কাগজ বার করতাম।

এমন সময় জরমনরা ফতোয়া জারি করল সব কারখানা শ্রমিক জরমন বাহিনীতে যোগ দেবে আর স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলে কারখানায় খাটবে। উদ্দেশ্য, আমাদের ঐক্যবোধ নষ্ট করা। আমরাও দিলাম পাল্টা জবাব—স্কুল-কলেজে গেলাম না। কলে-কারখানাতেও না। লুকিয়ে অধ্যাপকদের কাছ থেকে নোট চেয়ে আনতাম, পড়া বুঝে নিতাম। গোপনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গিয়ে পরীক্ষা দিতাম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমাদের ওই সব পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকার করে নেয়।

এদিকে যুদ্ধ চলাকালেই আমাদের ব্যবসা রীতিমত জাঁকিয়ে উঠল। দু-হাতে টাকা। লাখ লাখ টাকা। অঢেল, অপর্যাপ্ত। সেই সময়ই আলাপ হল এক বন্ধুর বোনের সঙ্গে। ওকে ভালবাসতে গিয়েই টের পেলাম চারদিকে ভালবাসার বড় অভাব। মাথায় তখন ভাবনার পোকা কিলবিল করছে—জীবনের উদ্দেশ্য কি?

কোথাও কোন সদুত্তর না পেয়ে ঢুকলাম গিয়ে জেসুইট সমাজে। আর তখনই ঠিক করলাম চাকরি নয় ব্যবসা নয়, করলে দুঃস্থ মানুষেরই সেবা করব। কোথায়? আলজিরিয়া বা লিবিয়ায়। ভারতের কথা একবারও তখন মাথায় আসেনি।

যুদ্ধ শেষ। কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। জেসুইট সমাজে তখন শিক্ষানবিশ। এমন সময় হাতে এল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ। তারপর পেলাম কবিরের কবিতাগুচ্ছ ও ডাকঘর। ঠিক করলাম ভারত সম্বন্ধে পড়াশোনা শুরু করব। ভরতি হলাম নামুর কলেজে। বিষয় সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় শিল্প।

ডিগরি পেলাম। তখন জেসুইট সমাজ বললেন কলকাতায় সেনট জেভিয়ারস কলেজে ভবিষ্যতে কেমিস্ট্রির একজন অধ্যাপক লাগবে; যদি যেতে চাও, তা হলে নিজেকে তৈরী কর। তক্ষুণিই মনস্থির। ভরতি হলাম লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে বি এস-সি পাস করলাম সাতচল্লিশে। উনপঞ্চাশে কেমিস্ট্রিতে পাস করলাম এম এস-সি। চার বছর বাদে একই সঙ্গে বায়ো-কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট ও ফিলজফিতে এম এ ডিগরি নিয়ে রওনা দিলাম কলকাতার উদ্দেশে।

এখানে থাকতে থাকতে এমন হল জানেন, আটান্ন সালে খবর এল দেশ থেকে বাবা মারা গেছেন, গেলাম না। বছর পাঁচেক আগে মায়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নামুরে গিয়েছিলাম। সে এক কিতকিচ্ছিরি অবস্থা। কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না, কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারি না নিজেকে। মায় ওখানকার খবর কাগজ পড়ে কেমন পানসে পানসে লাগত। মনে হত বিদেশের খবর পড়ছি। গত বিশটা বছর আমার অতীতের ত্রিশ বছরের পাকা বেলজি-বনেদটা একেবারে শিথিল করে ছেড়ে দিয়েছে। থেকে থেকে খালি মনে পড়ত কলকাতার কথা, কলেজের কথা। ছেলেগুলো কি করছে। বিভিন্ন গাঁয়ে যে সব কাজ শুরু করে গিয়েছিলাম, তার কথা।

শুধু নিজের নয়, গত বিশ বছরে এদেশেরও প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়েছে। ধরুন ছাত্রদের কথা। আগে দেখেছি এখানকার ছাত্ররা রীতিমত সিরিয়াস, আর এখন অধিকাংশই বড় সিনিক। ভাল ছাত্র নেই, এ কথা বলছি না, বরং আগের তুলনায় এখন অনেক ভাল ছাত্র পাচ্ছি। কিন্তু অধিকাংশেরই ওই রোগ। কোন কিছু আঁকড়ে ধরবে না, বিশ্বাস করবে না। এতে কি কাজ হয়, না দেশ এগুতে পারে!

আমার মনে হয়, গলদটা মূলেই। আপনারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছেড়ে এক লাফে প্রবেশ করছেন পারমাণবিক সমাজ-ব্যবস্থায়। লোকের মন তৈরী নয়। তৈরী করা হয়নি। তাই রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিশ্বাস, সন্দেহ। ভাল কাজেরও খুঁত খুঁজে বার করতে লোকে ব্যস্ত। আর গোটা সমাজ যা করবে, ছাত্ররা তো তার প্রভাব এড়াতে পারে না।

আলোচনায় নির্মিয়ক ছেদ পড়ল। বন্ধ দরজায় টোকা পড়ছে। ফাদার গলাটা ঈষৎ বাড়িয়ে বললেন : কাম ইন। একটি রোগা পাতলা টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালী ছাত্র এসে দাঁড়ালেন ফাদারের টেবিলের সামনে। এ কি নিমাই, তুমি বিছানা ছেড়ে কেন এসেছে?

: ফাদার আমায় ট্যুইশনিতে যেতে হবে।

: কোন কথা শুনব না নিমাই। যাও হোস্টেলের ঘরে গিয়ে শোও। বন্ধুদের কাউকে দিয়ে ক্যানটিন থেকে খাবার আনিয়ে নাও। বিছানা ছাড়া চলবে না। সুস্থ হয়ে ওঠ, তারপর যা খুশী তাই করো।

এর পর নিমাই আর কোন কথা না বলেই চলে গেলেন। শুরু হল মাঝ-পথে-ছেদপড়া-আলোচনা। কিন্তু রেশ বজায় রাখা মুশকিল। মিনিটে মিনিটে ছাত্ররা আসছেন। কেউ ভরতি করবে তার ভাইকে। কারুর প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সমস্যা। এরই মধ্যে একজন কর্মচারী এসে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত একটা সমস্যার কথা জানিয়ে গেলেন। একটু পরেই এলেন এক পানজাবী অধ্যাপক। তাঁর সমস্যা, একটি অনারস ফেল করা ছাত্র নিষেধ না মেনে নিত্যি ক্লাসে আসছে, ডিসটারব করছে।

ও'রা কথা বলছিলেন, আর আমি গোটা ঘরটাকে এলোমেলোভাবে দেখছিলাম। একটা টাইপরাইটার এক কোণে। ও-দিকে টেবিলের ধারে কাঠের পারটিশনের মাথায় টাঙানো চাষীদের টুপি। ঘরে জামা কাপড় বলতে যা সবই ফাদারের গায়ে—একটি পাজামা ও রিফু করা খদ্দরের পানজাবি। বই-এর স্তূপের আড়ালে দক্ষিণের দেয়ালে দুটি ছবি : সেনট জেভিয়ার ও মহাত্মা গান্ধীর। ছবি থেকে মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ল ফাদারের চোখ হাত-ঘড়িতে। বুঝলাম ক্লাসের সময় হয়ে এসেছে। উঠে পড়লাম। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন ফাদার। আর তখনই শেষ প্রশ্নটি করলাম ফাদারকে—এটা তো আপনার স্টাডি। খাওয়া, শোওয়া কোন্ ঘরে?

: কেন, এই ঘরে। ঈষৎ কৌতুকের ছিটে ফাদারের পরিমিত হাসিতে।

: কোথায়? এই চিলতে মেঝটুকু ছাড়া তো কোন ফাঁকা জায়গাই নেই এই ঘরে। বিছানাও তো দেখছি না।

: আমি মাটিতেই শুই। আমার বেডিংটা দেখবেন? আসুন।

দরজা থেকে ফিরে আবার ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। বই-বোঝাই একটি আলমারি ও দেয়ালের ফাঁকে আমাকে তাকাতে বললেন ফাদার। উঁকি দিলাম, কানে এল ফাদারের সহাস্য উক্তি—ওই আমার বেডিং। তাকিয়ে দেখি এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো দুটি মাদুর।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

আবদুল আলিম মারা গেলেন। তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর। সময় ভোর ছ'টা পঁয়ত্রিশ মিনিট। আলিমের হয়েছিল যকৃতে সিরোসিস। খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন। সারারাত মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, থামানো যায়নি। কাফন ঢাকা দেহটি যখন গোরে নামান হচ্ছে, তখনও মুখের দিকটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল।

আলিমের বাড়ি মুর্শিদাবাদ। দেখতে ছিলেন ছোট-খাটো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ের রং, চেহারা অতি সাধারণ। অসাধারণ ছিল তার গানের গলাটি। জরাট, উদাত্ত। বিষণ্ণতার রেশ থাকত, স্বর কোনো খাদেই পড়ে যেত না, একেবারে বাঁশীর মত সুরেলা। এগারো বছর বয়সে কলকাতায় প্রথম গানের রেকর্ডিং করেন। ১৯৪৮ সালে চলে আসেন ঢাকায়।

আব্বাসউদ্দিন তখনো বেঁচে আছেন। অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি আলিমকে। আলিমের ছিল চুপচাপ স্বভাব, প্রচারের ধার বেশী ধারতেন না। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে আলিমের জনপ্রিয়তা সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। আলিম বললে বোঝাত লোক-সংগীতের রাজাকে। আমৃত্যু ঐ ছিল তাঁর মর্যাদা। আলিমের মৃত্যু সংবাদ যিনি প্রথম বেতারে প্রচার করেন, তার গলা শোকের বাষ্পে ভারী হয়ে যায়। আলিম মারা গেছেন, এই কথা শুনে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর জরুরী কাজ মুলতবী রেখে ছুটে যান হাসপাতালে। ঠাকুর সাহেব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হয়ে জানাজায় যোগ দেন তোফায়েল আহমদ। জানাজা পড়ান হয় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। বেতারে খবরটা পেয়ে ঢাকার আশপাশের বৃহৎ অঞ্চল থেকে আলিমের ভক্তরা ছুটে এসেছিল। ঢাকা বেতার সেদিন স্বাভাবিক কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে আলিমের গানের রেকর্ড বাজিয়েছে। কোন শিল্পীর জন্য এতখানি সম্মান এর আগে ঢাকা বেতার দেখায়নি।

সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক ঘটনাটি ঘটে আলিমের কাফন ঢাকা দেহ গোরে নামানোর সময়। মুসলমান ধর্মে আছে, কবর দেওয়ার পর মওতাকে নওক্কের ও মানেকের নামে দুই ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করে, হে মৃত ব্যক্তি, বলো, কে তোমার সৃষ্টিকর্তা। আলিমকে যে মুহূর্তে গোর দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভক্তদের কারো ট্রানজিস্টার থেকে ভেসে এলো আলিমের সেই বিখ্যাত গানটি: 'ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে।' গোরে নামিয়ে আলিমের নরদেহ চিরদিনের মত বিসর্জন দেওয়ার সময় বেজে ওঠা আলিমের ঐ গান যেন একদিকে জীবন

অন্যদিকে মৃত্যুর কথাটা উচ্চকিতভাবে ঘোষণা করল। আলিম ভক্তদের অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে ঐ মুহূর্তে।

আশ্চর্য, আলিমের অধিকাংশ গানই মৃত্যু-সম্পর্কীয়। খুব যে সেগুলি অধ্যাত্ম-বিষয়ক, তা নয়। সহজ, সরল অনুভূতি দিয়ে মৃত্যুর বর্ণনা। আলিম ৪৩ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ৭টি ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েটি এইবার স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে। ঢাকার মধ্যে নিজস্ব একখানা ছোট বাড়ি। তবে লোক-সংগীতের রাজা আলিমের অসহায় পরিবারটি গণ-ভবন, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং আলিমের অগণিত ভক্ত-সুহৃদের সহানুভূতি পাবে, এটা নিশ্চিত।

আলিম পি জি হাসপাতালের একটি শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৫ সেপ্টেম্বর, ঠিক তার আগের দিন হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে পি জি-তে এসে ঠাঁই নিলেন তরুণ কবি আবুল হাসান। আবুল হাসান, আগে জানিয়েছি, হৃদরোগে আক্রান্ত। পি জি-তে আসার পর আবুল হাসানের অবস্থা কতকটা ভাল। এ ছাড়া মনের দিক দিয়ে হাসান বেশ শক্ত। হাসানের জন্য অনেকের, বিশেষত শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্বেগের সীমা নেই। ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিকরা সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে চিকিৎসার জন্য হাসানকে বিদেশে পাঠান হয়।

ঈদ সংখ্যার লেখা তৈরিতে লেখকদের ব্যস্ততা একটু বেড়েছে। ঈদের বাকী আছে এক মাসের কিছু বেশী। কলকাতায় যে রকম শারদীয় সংখ্যা বার করার ধুম ঈদ সংখ্যার ব্যাপারটা মোটেও ততখানি নয়! ঈদের সময় ঢাকায় বারোটা বাংলা দৈনিক নমো নমো করে দুই কি তিন পৃষ্ঠার ঈদ সংখ্যা সাহিত্য-পাতা বার করবে, পরিধি বড়জোর এইমাত্র। এছাড়া আছে তিনটে কি চারটে সাময়িকী (সাপ্তাহিক বা মাসিক) যেগুলি বর্ধিত কলেবরে ঈদের বিশেষ সংখ্যা হয়ে বেরুবে। অথচ সংখ্যায় সাহিত্য পত্রিকা যে একেবারে কম তা বলা যায় না। আসলে উদ্যোগ ও সংগঠন প্রচেষ্টা কম। বড় অন্তরায়, কাগজের নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য এবং ছাপাসহ অন্যান্য কিছুর ব্যয় বৃদ্ধি। বাংলাদেশের নিয়মিত অনিয়মিত সাময়িকপত্রের একটা তালিকা দিচ্ছি:

(১) মাসিক ছোট গল্প, সম্পাদকের নাম কামাল বিন মাহতাব। পত্রিকাটি নানা অসুবিধের মধ্যেও এইবার ৮ম বর্ষে পা দিল। কামাল নিজেও গল্প লেখেন, হেরাল নামে প্রচারণী সংস্থার সত্ত্বাধিকারী, চেষ্ট

করছেন গল্প আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি দাঁড় করাতে।

(২) মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী, সম্পাদক দুজন, ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহিম ও তরুণ সাংবাদিক মুহম্মদ জাহাংগীর। ভারতের পরলোকগত বিশ্ব-নন্দিত বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোস এই পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ক'দিন আগে সত্যেন বোস সংখ্যা হিসাবে বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি মূল্যবান সংখ্যা বেরিয়েছে। পত্রিকাটির ক্ষীণ দেহ, কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনা নিয়মিত।

(৩) কণ্ঠস্বর, সম্পাদকের নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। সায়ীদ সরকারী কলেজের অধ্যাপক, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। শক্তিশালী কবি। কণ্ঠস্বর প্রকাশনার ৮ বছর চলছে। বলতে গেলে সায়ীদ প্রায় একার চেষ্টায় পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাটি মাসিক।

(৪) গণ-সাহিত্য, সম্পাদকের নাম আবুল হাসনাত। মাহমুদ আল জামান এই নামে কবিতা লেখেন। বয়সে তরুণ হাসনাত পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রিকাটি প্রায় নিয়মিত প্রতি মাসে বেরোয়।

(৫) জনান্তিক, সম্পাদকের নাম রইসউদ্দিন চুঁইয়া। ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

(৬) কালস্রোত আর একটি মাসিক পত্রিকা, জনান্তিকের মতই পরিচ্ছন্ন ও সুশোভন, সম্পাদকের নাম আহমেদ আবদুল আওয়াল।

(৭) থিয়েটার পত্রিকাটি নাটক বিষয়ক ত্রৈমাসিক। সম্পাদকের নাম রামেন্দু মজুমদার। রামেন্দু এবং তাঁর স্ত্রী ফেরদৌস আরা দুজনই এখানকার মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী। নাট্য-শিল্পী মোহাম্মাদ জাকারিয়া, আবদুল্লাহ আল মামুন ও রামেন্দু-দের নাট্য-গোষ্ঠী 'থিয়েটারের' মুখপাত্র বলা চলে এই পত্রিকাটি। সামগ্রিকভাবে এখনকার নাট্য-চর্চার উজ্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে ত্রৈমাসিক থিয়েটার।

(৮) সংস্কৃতি, সম্পাদকের নাম বদরুদ্দীন উমর, মাসিক পত্র। উমর বাংলাদেশের গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। আইয়ুব আমলে স্পষ্ট ও সত্য কথা লেখার 'অপরাধে' চাকরী যায়। আর কোথাও চাকরীতে ঢোকেননি। সংস্কৃতি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মাসিক। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ইস্পাত'ও ঠিক ঐ ধরনের পত্রিকা। ওয়ালীউল বারী চৌধুরী ইস্পাতের সম্পাদক।

আমিনুল ইসলাম বেদু ও সিকদার আমিনুল হক, এই দুজন নিষ্ঠাবান সাহিত্য-কর্মী প্রায় নিয়মিত বার করেন 'সাম্প্রতিক' নামে একটি মাসিক। এছাড়া অনিয়মিত বেরোয় এমন আরো ক'টি পত্র-পত্রিকার নাম তুলে দিচ্ছি : স্বরলিপি (খুলনা), কথা (খুলনা), শিল্পকলা (ঢাকা), বিপ্রতীপ (ঢাকা), সময় (ঢাকা) প্রভৃতি। চট্টগ্রাম থেকে বেরোয় উচ্চমানের একটি শিশু মাসিক। এখলাস-উদ্দিন আহমদ, ঐ পত্রিকা 'টাপুর টুপুরে'র সম্পাদক।

এই সবকটি পত্রিকার সোল এজেন্ট যে, তার নাম কাজী ফারুক। ফারুক বয়সে তরুণ, পঁচিশ হয়ত পেরোয়নি। শুধু ব্যবসার জন্যে ফারুকের এই এজেন্সি নেওয়া নয়, তার উদ্দেশ্য সব রকমের পত্রিকা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সাহিত্যের জন্যে উৎসাহ অনুরাগ, সেই সংগে নতুন পাঠক ও ক্রেতা তৈরি হোক, এই হলো কাজী ফারুকের চেষ্টা। তোপখানা রোডের খোলা আকাশের নীচে পশ্চিম-মুখো একখানা ছোটো লাইব্রেরী আছে ফারুকের, তরুণদের সাহিত্য আড্ডা বসে এখানে। ফারুকের এই লাইব্রেরি, বর্ণবীথিতে ঘণ্টা পাঁচেক কাটাতে পারলে ওখানেই ঢাকার অধিকাংশ তরুণ ও কিছু সংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের দেখা পাওয়া যাবে নিশ্চিত।

ঢাকায় ভীষণ ভ্যাপসা গরম পড়েছে। ভাদ্রের তাল পাকা গরম যাকে বলে। কচিৎ কখনো হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিও হয়ে যায়। নদীর পানি কমতির দিকে। মোটা-মুটি বলা চলে, বন্যা সরে গেছে। ঢাকার দু'একটা জরুরী শিবির ছাড়া সব ক'টা ত্রাণ শিবির বন্ধ। ৪ সেপ্টেম্বরের হিসেব ছিল, ঢাকার জরুরী দুটি ত্রাণ শিবিরে এক হাজার বন্যার্ত এখনো আছে, বাদবাকী সবাই যার যার গ্রামে ফিরে গেছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতা চলছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই কম। সদ্য স্বাধীন দেশ, দরিদ্র, তদুপরি একটা প্রলয়ংকরী বন্যায় ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, এত অর্থ ও সম্ভার কোথায় পাবে? ত্রাণমন্ত্রী আবদুল মোমেন কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দেশী-বিদেশী মুদ্রায় অন্তত ৩৫০ কোটি টাকা দরকার।

এবারের বন্যা ফসল ও সম্পদ মিলিয়ে ৫০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে, সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অশেষ দুর্ভোগ ও ভোগান্তির মধ্যে। বন্যার পানি সরে যাওয়া বিধ্বস্ত মাঠ ও ক্ষেত-জমির দিকে তাকালে আগামী পাঁচান্তরে দুর্ভিক্ষের হাহাকার যেন কান পেতে শোনা যায়। একমাত্র ভরসা, আমন ফসলের জরুরী কর্ম-সূচী। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ, আগামী জানুয়ারীর মধ্যে সব রকম সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়ে আমন ও রবির একটা ফসল তুলতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল নিয়ে যাবেন, এই রকম খবর ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। কিন্তু তিনি আর যাচ্ছেন না, সম্ভবত বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জরুরীতর প্রয়োজনেই। ঠিক হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন। ঐ দলে যাচ্ছেন একজন অত্যন্ত পটু ও বর্ষীয়ান পার্লামেন্টারিয়ান আসাদুজ্জামান খান। রাষ্ট্রপুঞ্জের এইবারের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করবে, এটা একরূপ নিশ্চিত। বাংলা-দেশের সবাই সাগ্রহে ঐ দিনটির জন্য অপেক্ষা করছে।

রাহাত খান

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

চিত্র প্রদর্শনী

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী মৈনাকরঞ্জন রায়, ইরা রায়, তপন মিত্র ও বিপ্লব চৌধুরীর একটি যৌথ গ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে এই চারজন শিল্পীর মোট ২২টি গ্রাফিক নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, দুজন শিল্পী পরীক্ষামূলকভাবে নতুন ক্ষেত্র অবলম্বনে গ্রাফিক-শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সকলেই জানেন যে, দস্তা বা তামার পাতই গ্রাফিক শিল্পকলার প্রধান উপাদান—অর্থাৎ এই পাতের ওপরেই খোদাই করে তারই পরে প্রিন্ট নেওয়া হয়। বর্তমানকালে ছবির রঙ-তুলি-ক্যানভাসের মত দস্তা ও তামাও আজ দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। ক্যানভাসের বদলে ম্যাসোনাইট বোর্ড ব্যবহার করে ইতিপূর্বে বহু শিল্পীই উল্লেখ্য শিল্পসৃষ্টি করেছেন। এমন কি গ্রাফিক ক্ষেত্রেও কয়েকজন দস্তা বা তামার পরিবর্তে মোটা বোর্ড ব্যবহার করেও সুফল লাভ করেছেন। মৈনাক রায় ও বিপ্লব চৌধুরী উভয়েই দস্তা বা তামার পাত ব্যবহার না করে রচনা ক্ষেত্র হিসাবে প্লাইউড ব্যবহার করেছেন। তারই ওপর ফ্যাভিকলের মোটা প্রলেপ দিয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়ে গ্রাফিক প্রথায় কাজ করেছেন, অর্থাৎ খোদাই ও ইনটালিও রীতিতে কাজ করে গেছেন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রঙীন প্রিণ্ট ও কারুকার্যের দিক
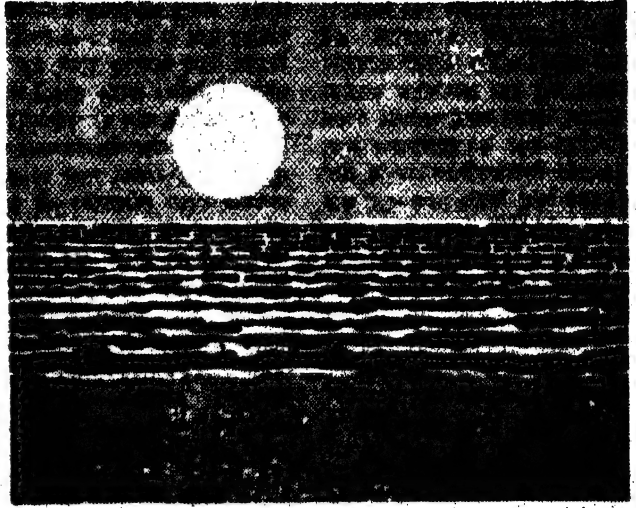
কম্পোজিশন-বি —বিপ্লব চৌধুরী

থেকে বিচার করলে বোঝাই যায় না যে, এগুলি অন্য জাতীয় কোনও ক্ষেত্র থেকে নেওয়া। গ্রাফিকশিল্পে এই বিকল্প উপাদান ব্যবহার অনেকের চোখে পড়ে—হয়তো বা অপর কেউ এটির আরও উন্নতি-সাধন করবেন। মৈনাক রায়ের রচনায় রঙ ব্যবহার ও কারুকার্য লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে ফ্লাওয়ার দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। গভীর নীলরঙের পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম রেখাভিত্তিক কারুকার্য, বিশেষ করে লাল রঙের বিন্যাস কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। কারুকার্য ও রঙ মিশ্রণের দিক থেকে কম্পোজিশন-৩ প্রিণ্টও উল্লেখ্য। ইরা রায়ের লিথোগ্রাফ নিদর্শনগুলি বলিষ্ঠ এবং আকার-প্রধান। বিশেষ একটি মুখ-মণ্ডলকে কেন্দ্র করে শিল্পী সবুজ ও হলুদ রঙের মধ্য দিয়ে লিথো-গ্রাফ-১ প্রিন্টে আকারভিত্তিক রূপ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ২নং প্রিণ্টও উল্লেখ্য। বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও সূক্ষ্ম খোদাই কাজের জন্য এচিং অনেকের চোখে পড়ে। শিল্পী ড্রয়িং-এ সিদ্ধ-হস্ত, বিশেষ করে নরনারীকে কেন্দ্র করে কালিকলমের ড্রয়িং'এ তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তপন মিত্রর নিদর্শনগুলি অনেকের চোখে পড়ে। কারণ শিল্পী জ্যামিতিক নানা কেন্দ্র অবলম্বনে রচিত আকারের সঙ্গে বিমূর্ত রেখাজাল তথা কারুকার্যের সংমিশ্রণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৬নং নিদর্শনের নাম করা যায়। রচনারীতি ও কারুকার্যের দিক থেকে বিন্দু-প্রধান হালকা হলুদ রঙের ১৪নং নিদর্শনও উল্লেখ্য। বিপ্লব চৌধুরীর রঙীন প্রিন্টগুলির মধ্যে ইণ্টালিও প্রথায় রচিত দি ট্রি অনেকের চোখে পড়ে। তবে কম্পোজিশন বি-তে শিল্পী লিনোকাট রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মিশ্র প্রথায় রচিত হলেও সমুদ্রের ছবিটি দেখে অনেকেই খুশী হবেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছবি অাঁকার স্পৃহা জাগাবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাঁদের মধ্যে ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের নানা বিভাগের কর্ম-

সেরিগ্রাফ ও এচিং —তপন মিত্র
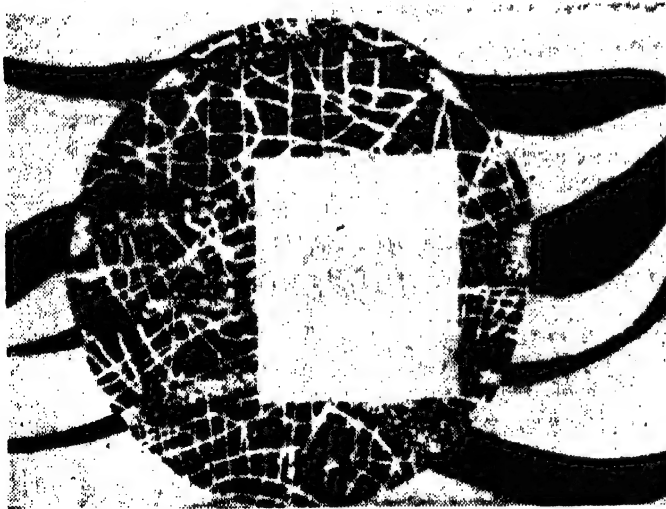
চারিবন্দের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ গত ১০ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে করে আসছেন। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এই সংস্থার একাদশ বার্ষিক 'পরিচয়' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত শাখার কর্মচারীদের ২৫৩ জন ছেলেমেয়ের আঁকা প্রায় ৪৫০টি নির্বাচিত শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। ছোট্ট শিশু বিভাগ থেকে শুরু করে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের আঁকা নিদর্শনগুলি দেখে অনেকেই খুশী হন। বলা বাহুল্য, ছোট্ট শিশুরা আপন আপন কল্পনা অনুযায়ী নানা আজগুবী ছবি আঁকে। পেন্সিল, প্যাস্টেল ও নানা রঙ মাধ্যমে আঁকা কয়েকটি ছবি অনেকেই উপভোগ করেন। বিশেষ করে সমকালীন যুগ যে শিশুদের মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, দু-একটি ক্ষেত্রে তারও প্রমাণ মেলে—যেমন সুনীত মালহোত্রার (পুনা—বয়স ৬) আঁকা দি ওয়ার। একটি ছবি অনেকেরই চোখে পড়ে—স্বাগতা সিংহের (কলকাতা, বয়স ৫) রঙীন ছবি মাই ফার্স্ট প্রাইজ। অন্যান্য ছবির মধ্যে ফরিদা মতিওয়ালার (বোম্বাই, বয়স ৫) রেখাভিত্তিক ট্রান্সপোর্ট ও সমীর জুনারকারের (বোম্বাই, বয়স ৫) প্যাস্টেলে আঁকা দি বোটম্যান-এর নাম করা যায়। সাত থেকে নয় বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের ছবিতে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সন্ধান মেলে। অর্থাৎ এই বিভাগের ছেলেমেয়েরা পরিচিত দৃশ্য বা বস্তুর ওপর বেশী ঝোঁক দিয়েছে, তবে অনেকের কাজই মূল কোন ছবির প্রতিলিপি। এখানে প্রথমেই মালিনী গুপ্তর (বোম্বাই, বয়স ৭) প্যাস্টেলে আঁকা গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া অনেকের নজরে পড়ে। সুদীপা দত্ত (কলকাতা, বয়স ৮) এ ফ্রুট সেলার-এ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মৌ দাশগুপ্তর (কলকাতা, বয়স ৭) প্যাস্টেলে আঁকা ম্যারেজ অব টাইগারস-ও উল্লেখ্য। দশ থেকে বার বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের ছবি অপেক্ষাকৃত ভাল; রঙ ব্যবহার রীতিতেও নিয়মিত অনুশীলনের পরিচয় মেলে। প্রথমেই চোখে পড়ে শুভ্রা গাঙ্গুলীর (কলকাতা, বয়স ১২) দি ভিলেজ কর্নার। মাত্র কালো রঙের স্তরভেদ মাধ্যমে ছোট্ট শিল্পী গ্রামের একটি সুন্দর দৃশ্য এঁকেছে। অপরাপর ছবির মধ্যে শিল্পী রায়ের (কলকাতা, বয়স ১১) গরুর গাড়ি (নট ইন এ হারি), পারমিতা চক্রবর্তীর (কলকাতা, বয়স ১০) অরণ্যপথ (দি উডস) ও ডন বসকোর (পুনা, বয়স ১২) এ সাইকেডেলিক পেণ্টিং-এর নাম করা চলে। সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এস সুন্দরের (মাদ্রাজ, বয়স ১২) মড সেণ্টার ও জলরঙ ছবির উল্লেখ্য নিদর্শন হিসাবে কল্লোল ভট্টাচার্যের (কলকাতা, বয়স ১০) টিম স্পিরিট-ও অনেকের ভাল লাগে। বলা বাহুল্য, ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের আঁকা আশানুরূপ বিশেষ কোনও ছবি আমার চোখে পড়েনি—বিশেষ করে যদি তুলনামূলকভাবে বিচার করা যায়। কারণ, এই বিভাগে এই বয়ঃসীমার ছেলে-মেয়েদের আরও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ছবি প্রশংসনীয়। যেমন মধুমিতা চক্রবর্তীর (কলকাতা, বয়স ১৪) আর্লি মর্নিং। পল্লীগ্রামে সূর্যোদয়কে কেন্দ্র করে আঁকা ছবিটিতে শিল্পীর সুকৌশল লাল রঙ ব্যবহার-রীতি প্রশংসা দাবি করে। উদয়মূর্তিও (পুনা, বয়স ১৩) রেনি ডে-তে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বর্ষাকালে একটি ছাতাকে আশ্রয় করে তিনজন লোক চলছে—বিশেষ করে জলরঙে আঁকা ছবিটিতে শিল্পী মাত্র তুলির বলিষ্ঠ টানের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি-ধারার রূপ প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে এন গিরিজার (মাদ্রাজ, বয়স ১৩) ম্যাডরাস এন্টারটেনার্স, ফাল্গুনী মেহতার (বোম্বাই, বয়স ১৩) ক্র্যাকারস ও শশীপ্রভা পুবানিকের (বোম্বাই, বয়স ১৫) লর্ড গণেশ উল্লেখ্য।

চিত্রপ্রিয়

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে দেশ পত্রিকায় (১২ অক্টোবর ১৯৭৪) সনাতন পাঠক সাহিত্য সংবাদে যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবার আছে।

প্রথমত, একটি তথ্যগত ভুলের উল্লেখ করি—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ (সাধনার সম্পাদক), তাঁর পিতা। সুতরাং তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এ কথা সনাতন পাঠক লিখেছেন। এ সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। ভারতবর্ষে কোন্ কমিউনিস্ট নেতা রাজনীতিতে সফল হয়েছেন? এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়তে লেগেছিলেন উঠে পড়ে তাঁরা বিপ্লব ঘটানোই তাঁদের রাজনীতির প্রধানতম কর্তব্য বলে জানতেন। কেউই কি বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা দেখে যেতে পেরেছেন? না পেরে কেউ কেউ নির্বাচন জেতার সফলতাকেই সফলতা বলে জেনেছেন কেউ কেউ বোমা পটকার হঠকারী রাজনীতিতে উৎসর্গ দিয়েছেন, যে কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য গড়ে বামপন্থী রাজনীতির সাফল্য চেয়েছেন—কিন্তু যে বিপ্লবের জন্য এত মাথা-ঠোকাঠুকি সে দূর অস্ত্।

সৌম্যেন্দ্রনাথও নির্বাচন লড়েছিলেন—কিন্তু যে কোন দলের সঙ্গে 'বামপন্থী সমঝোতা' করে নয়। সভায় সভায় বলেছেন—দেশের বাইরে যে গণ-আন্দোলন চলছে তাকে অ্যাসেমব্লীর ভিতরও পৌঁছে দিতে চাই—আমার রাজনৈতিক পথ পছন্দ হলেই আমায় ভোট দেবেন—নইলে নয়। আর যাই হোক, সৌম্যেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী সুবিধাবাদী ছিল না। আগের দিনের সাহিত্যিকেরা একে হয়তো 'আদর্শবাদী' দৃষ্টিভঙ্গী বলতেন, একালের সাহিত্যিকেরা কেউ কেউ নগদমূল্য সচেতন, তাঁরা একে ব্যর্থতা বলছেন।

আর একটি কথা, সৌম্যেন্দ্রনাথ চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। সে সম্বন্ধে সনাতনবাবুর মত বন্ধুদের জানাতে চাই যে, তাঁর চিন্তার সত্যতা তাঁর সাফল্যের পরিচায়ক। প্রথমত, তিনি ১৯৩৪ সাল থেকে বলছেন কমিউনিস্ট আন্দোলন কংগ্রেসের বাইরে থেকে গড়তে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং রায়পন্থীরা সে কথা স্বীকার করেননি। তাঁরা কেউ কেউ কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা বেঁধে দেশ বিভাগ সমর্থন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস তাঁদের ঠাঁই দেয়নি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিপূজা যে কমিউনিজমের আদর্শের পরিপন্থী সে কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ স্টালিন প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁর সে বিচার ভুল নয়। তৃতীয়ত, কোন দেশের গণ-আন্দোলন সেই দেশের বাস্তব অবস্থার নিরপেক্ষ গড়ে উঠবে অন্য দেশের অঙ্গুলি নির্দেশে নয়। সোভিয়েট-ভারত চুক্তি হলে ইন্দিরা গান্ধী প্রগতিবাদী, চুক্তি না হলেই প্রতিক্রিয়াশীল—সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিচার এতটা কর্তাভজা ছিল না।

কর্তাভজা না হওয়াই বোধ হয় তাঁর ব্যর্থতার কারণ। আশ্চর্য এই যে, রাজনৈতিক চিন্তার স্বচ্ছতার বিচার না করে তাঁর ব্যর্থতার স্লোগান অনেকেই তুলছেন।

সৌমেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট

॥ ২ ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনীতি সাহিত্য সংগীত ও সংস্কৃতি বিষয়ে যা লিখেছেন তা যথার্থ; কেবল আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম বলেই এ চিঠি লিখছি। একথা আরও মনে হয়েছে এ কারণেই যে এই সংখ্যাতেই আপনি বিভূতি চৌধুরী'র কবি পরিচয় প্রকাশ করে বাধিত করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথও কবি ছিলেন। ১৯৪৪ সালে লক্ষ্ণৌ ও ফতেগড় জেলে থাকাকালীন হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের 'বিহারী সত্‌সই' এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং ১৯৪৫ সালে দমদম জেলে থাকার সময় তিনি এর অনুবাদ করেন। একশটি দোঁহার অনুবাদ নিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথের 'বিহারী সত্‌সই' তাঁর কবিমনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা—৩৪

একটি বই ও একটি প্রকাশন সংস্থা

আপনার পত্রিকায় ২৫শে আশ্বিন

তারিখে প্রকাশিত 'একটি বই ও একটি প্রকাশন সংস্থা' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণই নয়, এই কর্মসূচী সম্পর্কে বিদগ্ধ মানুষদের অজ্ঞতা দূরীকরণও যে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করে এ কথা মনে হয়েছে।

এই রাজ্যে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ক্রমশ যে জনমত সংগঠিত হচ্ছে, তার মূলে আমাদের সমিতির ভূমিকা আমরা সগর্বে উল্লেখ করতে পারি। এই রাজ্যকে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য আমরা একদিকে যেমন বয়স্ক ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র গঠন করছি, অন্যদিকে তেমনি জেলায় জেলায় জনমত প্রচার অভিযান সংগঠিত করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবার চেষ্টা করছি সমস্যাটির গুরুত্ব সম্পর্কে। বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলায় আমরা ১০০০টি শিশু ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি। সাম্প্রতিক চরম খাদ্যাভাবের দরুন কোনো কোনো অঞ্চলে আমাদের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্র পরিচালনার পরিবর্তে খুলতে হচ্ছে লঙ্গরখানা। ইতিমধ্যে কুচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জে একটি লঙ্গরখানা চালু হয়েছে। সমিতির কর্মীরা এজন্য দেহের রক্ত বিক্রি করে ও গণসংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সদ্য সাক্ষরদের জন্য এতাবৎ আমরা বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এবং নেপালী ভাষায় চার্ট ও প্রাইমার প্রকাশ করেছি। তেলুগু ভাষার চার্ট এবং প্রাইমার রচনার প্রাথমিক কাজও শেষ হয়েছে। বাংলা ভাষার চার্ট এবং প্রাইমার ছাড়াও পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নেপালী ভাষাভাষীদের জন্য দার্জিলিং এবং কার্শিয়াংএ আমরা ৩০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি। ভারতে আমাদের সমিতিই প্রথম নেপালী ভাষায় সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। উপরোক্ত সব কটি ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চলছে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চলছে বাংলা এবং হিন্দী ভাষায়। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এবং আরো অনেক সহযোগী কেন্দ্রে সদ্যসাক্ষরদের জন্য প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ কপি বই আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার তাঁদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জন্য নামমাত্র মূল্যে আমাদের বই কিনে থাকেন। এত কম দামে (কোনটি ১৫ পয়সা কোনটি ২৫ বা ৪০ পয়সা) আর কোথাও এ ধরনের বই তাঁরা পান না। সচরাচর এ সব বইয়ের দাম ৭৫ পয়সা থেকে ২ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সব বই প্রকাশের এবং বয়স্ক ও শিশুকেন্দ্র চালাবার খরচ জোগাবার জন্যই আমরা সুলভে মনীষীদের রচনাবলী ও বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করে থাকি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অনুদান আমাদের কাজের আংশিক খরচ জুগিয়েছিল মাত্র। বর্তমান বছরে পরিচালিত ১০০০টি বয়স্ক ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চলছে কোনরকম সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে, সম্পূর্ণত প্রকাশনার আয় এবং শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় 'মুখে ভাত' দেবার অনেক আগেই পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল কর্মীদের দেহের রক্তের বিনিময়ে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, প্রয়োজনের সময় তাঁরা স্থান দিয়েছিলেন বলে। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিমূর্তি আজও খণ্ডিত মস্তক থাকতো (যেমন আছে সংস্কৃত কলেজে) দেশের প্রবীণ প্রাজ্ঞদের ভরসায় পড়ে থাকলে।

স্বপ্না দেব
সহসাধারণ সম্পাদিকা
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

গালিবের কবিতা

গত ১২ অক্টোবর সংখ্যায় গালিবের কবিতার উদ্ধৃতি সম্বন্ধে কোচবিহারের পত্রলেখিকার চিঠির উত্তরে জানাচ্ছি যে 'জীনৎ' কথাটি ছাপার ভুল, ওটা 'জীস্ত'-ই হবে। কিন্তু 'দর্দে বে-দওয়া' এবং 'দর্দে না-দওয়া' দুই-ই অর্থের দিক দিয়ে সঙ্গত এবং আমরা উর্দু পণ্ডিতদের মুখে 'বে-দওয়া' এবং 'না-দওয়া' দু-রকমই শুনেছি। আমার কাছে গালিবের দু'খানা উর্দু 'দিওয়ান' (কবিতা সঙ্কলন) আছে, তাতে অবশ্য 'বে-দওয়া'-ই আছে। শ্রীসত্য গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অনুবাদের সময় হয়তো সেটাই... তাই তিনি কি পাঠ গ্রহণ করেছেন জানি না। আমার মনে হয়, দু রকম পাঠই ঠিক। অর্থাৎ পাঠ ভেদ মাত্র, 'না-দওয়া' ভুল নয়।

বীথিকা গঙ্গোপাধ্যায়
চুঁচুড়া

মানুষ শরৎচন্দ্র

"দেশ" পত্রিকায় ৩১শে আগষ্ট ও ৭ই সেপ্টেম্বর এই দুই সংখ্যায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "মানুষ শরৎচন্দ্র" নামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লেখার একটি উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে দৃঢ় সংশয় আছে। তিনি লিখেছেন—"পথের দাবী" পুস্তক লেখার জন্য "শরৎবাবুকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ইলিসিয়াম রোতে ডেকে এনেছিল; ধমকেছিল, ভয় দেখিয়েছিল।" একথা নাকি শরৎবাবু নিজে বলিছিলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়কে। কারোর নিজের অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষভাবে জানা ঘটনার প্রতিবাদ করা খুবই কঠিন। কিন্তু পথের দাবী লেখার কিছু পরে শরৎবাবুর ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমাদের উভয়েরই হয়েছিল। আলাপ প্রায় পথের দাবী ও রাজনীতি ঘেঁষা সাহিত্য নিয়েই হতো। 'পথের দাবী' বই নিয়ে বহু কথা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারী লিপির উল্লেখও তিনি করেছেন। ঐ চিঠি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। কিন্তু টেগার্ট সাহেব তাঁকে ডেকে নিয়েছিল বা ধমকেছিল—সে কথা কখনও বলেন নি।

'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় বের হয়েছিল; ঐ কাগজের পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে আমাদের কিছু রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। "পথের দাবী" লিখতে আরম্ভ করার পূর্বে ও লেখার সময় উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে শরৎবাবুর প্রায়ই পুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হ.তা। তাঁর এবং ডাঃ অমিয় বসুর মুখ থেকে তিনি অনেক কাহিনী শোনেন; এর উল্লেখ "বিপ্লবের পদচিহ্ন" বইতেও আছে। জেল থেকে মুক্তির পর উমাপ্রসাদবাবু ও শরৎবাবুর সঙ্গে অনেক কথা আমাদের হয়েছে। কিন্তু শরৎবাবু কখনও টেগার্ট তাঁকে ডেকে ধমকিয়েছে—তা তিনি বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি তখন উমাপ্রসাদবাবুর কাছে। তিনি তা আমাদের দেখান। উমাপ্রসাদবাবুও আমাদের কাছে শরৎবাবুকে টেগার্টের ধমকানির কথা বলেন নি। আর একজন তৎকালীন কনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ—বর্তমানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত,—তিনিও ঐ সময় শরৎবাবুর কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁরও মনে পড়ে না টেগার্টের কাছে ধমক খেয়েছেন ব'লে শরৎবাবু তাকে কখনও বলেছেন। জীতেনবাবুর ঐ উক্তি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের এই সব কারণ।

জিতেনবাবু আরো লিখেছেন—শরৎবাবু "সংস্কারে পরিপূর্ণ ছিলেন। মৃত সমাজব্যবস্থাকে তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতেন।" জানি না কি করে জিতেনবাবু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন। শরৎচন্দ্রের "পল্লী সমাজ", "পণ্ডিত মশায়", "দত্তা" প্রভৃতি বহু পুস্তকে বার বার তিনি প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে ঘা দিয়েছেন। লেখক আরো বহু মন্তব্য এবং ঘটনার উল্লেখ করেছেন—যা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও রুচিসম্মত বলে মনে হয় না। আমরা উভয়ই এখন ৮০র উর্ধ্বে; তাই বর্তমান রুচি ও সংগতিবোধের সঙ্গে খুব সংযোগ নেই। তাই ঐ নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না।

অরুণচন্দ্র গুহ
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
নয়াদিল্লি—১

প্যারিসের শিল্পী

'দেশ' সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৭৪ (পৃঃ ৭১৭) বোম্বাই থেকে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রটি দ্রষ্টব্য। 'Louvre' শব্দটির উচ্চারণ তিনি 'লুভ্র' লিখেছেন। বানানটি 'Louvre' এবং 'Louver' দু'টিই প্রচলিত। অভিধানে, বিশেষ ক'রে সংসদ অভিধানেও উচ্চারণটি 'লুভ্রের' পাওয়া যায়। সংসদ ইংরেজী-বাংলাতে পাই লু-ভ্যা(র), কারণ ফরাসী ভাষায় শেষের 'r'টি প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। সব থেকে মজার ব্যাপার 'দেশ' আগস্ট ১০, ১৯৭৪ (পৃঃ ৮৯) থেকে সম্পাদকীয়তে দ্বিতীয় কলামে লেখা হয়েছে 'লুভ্রের', 'লুভ্র' নয়। বর্তমানে আমার একজন ফরাসী বন্ধু আছে। তাঁর কাছে শোনা গেল তাঁরা উচ্চারণে শব্দটি 'লোভ্রো' বা 'লুভ্রো'-র মতই বলেন, কারণ শেষের 'r' উচ্চারিত হয় না। তা ছাড়া মাসিক্যুলারও এ ভাষার বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়।

আনিসুর রহমান
ঢাকা

সাহিত্য সংবাদ

পাঠ্যবই

পৃথিবীতে অপাঠ্য বই প্রচুর আছে বটে কিন্তু যে-গুলি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য বই, অর্থাৎ স্কুল কলেজের টেক্সট বুক, সেগুলি যদি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য হয়, তা হলে দুঃখ আরও বাড়ে। ছাত্রজীবন পার হয়ে আসার পর আর ছাত্রজীবনের দুঃখের কথা তেমন মনে থাকে না। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার যখন শিশুদের স্কুলে যেতে দেখি, কচিৎ তাদের পড়ার বইতে চোখ বোলাতে হয়, তখন আঁতকে উঠি—এখনো সেই দুর্দশা? ছোটদের বইগুলি এখনও কি বিশ্রী ছাপা, অনেক রকম ভাষার ভুল, এমনকি বানান ভুল পর্যন্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় কিংবা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বই আমাদের ট্র্যাডিশানের অন্তর্গত হয়ে গেছে। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এই সব বইয়ের কোনো ত্রুটি আছে কিনা বুঝতে পারি না। কিন্তু আজকাল শিক্ষায় নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নাকি যুক্ত হয়েছে, সুতরাং স্কুল পাঠ্য বইকেও আধুনিক হতে হবে। সেই জন্য নানান নতুন লেখক-লেখিকা বই লিখছেন, বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন বই। যদিও আমার মনে হয়, সারা দেশের শিশুদের একই বই পড়ানো উচিত, তাতে মানসিকতার একটা সাযুজ্য তৈরি হয়—বর্ণ পরিচয় বা হাসিখুশী যারা পড়েছে তারা যেমন এখনো বৃদ্ধ বয়েসেও কখনো কখনো সেই সব বইয়ের দু'এক লাইন স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আনন্দ পান, এখন আর সে রকমটি হবার উপায় নেই। এখন যাঁরা পাঠ্য বই লেখেন, তাঁদের নামও শুনিনি অর্থাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের কোনো পরিচয় পাই না। আমাদের মতে, শিশু পাঠ্য বই রচনার ভার প্রকৃত প্রতিভাবানদের হাতেই থাকা উচিত, সারা দেশ যাঁদের অন্য পরিচয়েও জানবে। শুধু একটি পাঠ্য বই রচনা করেই যাঁদের প্রতিভা নিঃশেষিত, তাঁদের দ্বারা বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না।

পাঠ্য বইয়ের ভুলের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু ভুলের চেয়েও খারাপ, নির্ভুল বাজে লেখা। যাতে ছেলেদের কল্পনা শক্তি জাগে না কিংবা পড়তে মজা পায় না, সে রকম বাক্য বা পদ্য শিখিয়ে লাভ কি? আর কাব্যপ্রতিভাহীনদের রচিত ছড়া একটা ভয়াবহ ব্যাপার—এবং
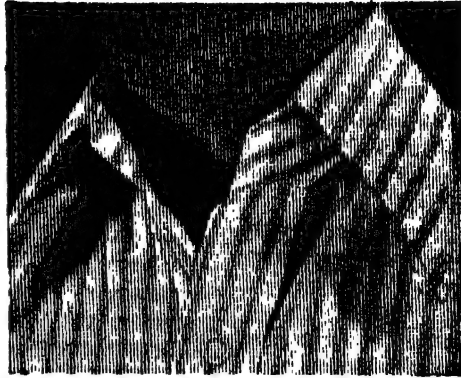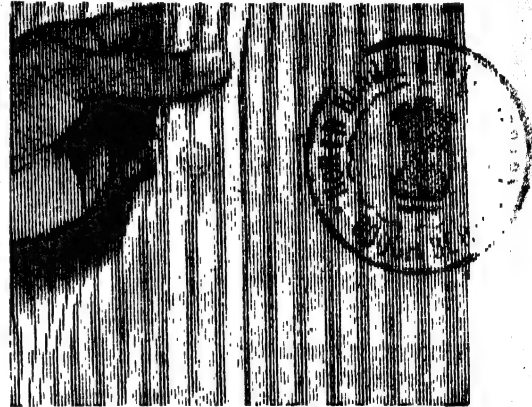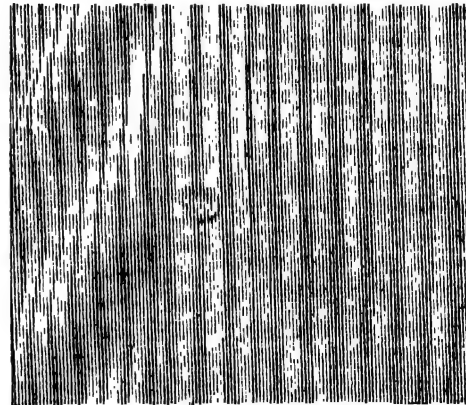
শিশুদের মাথায় সেটা জোর করে ঢোকাতে দেওয়া একটা অপরাধ।

পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের নিন্দুক আক্রমণ করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার দুঃখ বোধ থেকেই এই কথা লিখছি। আর একটু ক্ষমতার সঙ্গে বইগুলি যদি রচিত হয় এবং এর মান ঠিক রাখার ব্যাপারে কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষ যদি দৃষ্টি রাখেন, তাহলেই সুখী হবো। শুনেছি, পাঠ্যবই রচনা ও ছাপা একটা বেশ বড় রকমের ব্যবসা—এবং বোর্ড থেকে এই সব বই পাশ করানো এবং বিভিন্ন স্কুলে সেই সব বই 'ধরানো' নিয়ে প্রচুর হুলুস্থুল কাণ্ড চলে। আমাদের মতন দু' এক জনের প্রতিবাদে তার কিছুই বদলাবে না। তবু, আমরা এখন অনেকগুলি মূল্যবোধ হারিয়ে ফেললেও, শিশুদের প্রতি স্নেহের ব্যাপারটা বোধহয় তেমন হারাই নি। সেই ব্যাপারে যত কম অবহেলা করা যায়, ততই মঙ্গল।

এ তো গেল বাংলা পাঠ্য বই সম্পর্কে। স্কুলের ইতিহাস বই রচনা নিয়ে যে কত রকম কেলেংকারি চলছে, সে তো অনেকেরই জানা। আমাদের জাতীয় ইতিহাস এখন যেন ফুটবলের মা। যাই হোক, সে ব্যাপারে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

শিশুপাঠ্য বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে একটি বইয়ের নাম করা অবশ্যই উচিত। বইটির নাম আনন্দ পাঠ, যেটি রচনা করেছেন গণেশ বাগচী ও মহাশ্বেতা দেবী। বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য এটি ভাগ ভাগ করে প্রকাশিত হয়েছে। গণেশ বাগচী মহাশয়ের কোনো পরিচয় আমার জানা নেই কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর নাম সকলেরই জানা। সিরিয়াস গল্প উপন্যাস রচনার পরেও সময় করে তিনি যে এই গ্রন্থগুলি রচনার জন্য অন্তত অর্ধেক পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আনন্দ পাঠের প্রধান গুণ এর সুরুচি। ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়াও এতে আছে সাহিত্য গুণ। আগাগোড়া আমারও পড়তে ইচ্ছে হলো।

এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়, আর একটি বইয়ের, সংযুক্তা মিত্রের 'ভাষা পরিচয়।' বইটি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, বয়স্ক বিদেশীদের জন্য। আজকাল অনেক বিদেশীই বাংলা ভাষা শিখতে চান কিন্তু ভালো বইয়ের অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। বয়স্কলোক কোনো একটা ভাষা গোড়া থেকে শিখতে চাইলেও তাঁকে শিশুপাঠ্য বই দেওয়া যায় না। তার মানসিক গঠনের উপযোগী বাক্য বিন্যাস দরকার। এতদিন পরে সংযুক্তা মিত্র সেই কাজটি করেছেন অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে।

অক্ষর

তীব্র কাগজ সংকটের প্রতিবাদে একটি পত্রিকা বেরিয়েছে অভিনব ভাবে। অত্যন্ত রংচঙে মলাটের ছবি সমন্বিত এই পত্রিকাটি প্রথম হাতে নিয়ে চমকে উঠেছিলাম। ছোট কবিতার কাগজের এই ঐশ্বর্য এলো কোথা থেকে! একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

কাগজের অসম্ভব দামের জন্য এরা কাগজ কেনেনই নি। কাগজ না কিনে পত্রিকা। অর্থাৎ পুরোনো 'দেশ' বা 'অমৃত' বা 'বেতার জগৎ' পত্রিকার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে তার ওপরেই এঁরা বড় বড় টাইপে লাল কালিতে ছাপিয়েছেন নিজেদের কবিতা। পড়তে কোনোই অসুবিধে হয় না। আর মলাট? বিভিন্ন ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠা, সোভিয়েট দেশ বা স্প্যান কাগজের ছবিওয়ালা পৃষ্ঠা, তার ওপর আবার লাল কালিতে ছাপা। ফলে, প্রতিটি কপিই আলাদা।

ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ায়, কালোবাজারি করে। কবিরা তাদের নিজস্ব প্রতিবাদ ঠিকই জানিয়ে যায়।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

"দেশ" পত্রিকার ৩১ আগস্ট সংখ্যায় 'সাহিত্য ও নারী' শীর্ষক আলোচনা পড়ে আশ্চর্য হলাম। আশ্চর্য হয়েছি এই দেখে যে, লীলা মজুমদার ও রাবেয়া খাতুনের মত প্রখ্যাত লেখিকারাও সমস্যাটির মূলে পৌঁছতে পারেননি। আর আপনি যে পারেননি তা আপনার স্বধর্মে 'পুরুষধর্ম' প্রোথিত। সন্তান পালন, পোশাক-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি 'নারীত্ব'র মাধ্যমে আপনারা বুঝতে চেয়েছেন মেয়েদের মধ্যে সত্যিকারের লেখিকার সংখ্যা কম কেন। বোধ হয় আপনার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। মেয়েদের কিভাবে দেখছেন, কোন কোন কাজের মধ্যে তাদের বিকশিত হতে দেখেন, এর থেকেই স্পষ্ট হয় ইতিহাসে মেয়েদের কিভাবে দেখতে চাওয়া হয়েছে। তাই সমস্যাটি সমাজতাত্ত্বিক অনেকাংশে অস্তিত্বধর্মী; সমস্যাটি পুরুষের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বিচার সম্পর্কীয় আদর্শ সামাজিক পটভূমিকায় মেয়েদের মুক্তি সম্পর্কীয়। আপনারাও আশা করি স্বীকার করবেন যে, যে-কোন শিল্পসৃষ্টির মূলে প্রেরণা গভীর সামাজিক চেতনায়, ব্যক্তিমানসের রহস্য-সন্ধানে, পৃথিবী ও মানুষের মানবীয় ইতিহাসের উদার পর্যবেক্ষণে—এক কথায় সৃষ্টিশীল চেতনার অখণ্ড প্রকাশে। এই প্রকাশের সুযোগ মেয়েরা পাচ্ছে কি? পর্দানশীনতা উঠে গেলেও? বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে চললেও? ছোটবেলা থেকেই এক নির্দিষ্ট গণ্ডীতে তাদের পরিচালনা করা হয় না কি? সন্তান পালনে দক্ষতা এক জিনিস, আর শিশুসাহিত্য রচনা আর এক—দুইয়ের মধ্যে আছে সৃষ্টিশীল চেতনার নিষিদ্ধ পর্দা।

রাকা চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

॥ ২ ॥

গত ৩১ আগস্ট তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসনাতন পাঠকের সাহিত্যে মেয়েদের অবদান সম্বন্ধীয় মন্তব্য পড়লাম। পরিমাণগতভাবে এবং কিছুটা গুণগতভাবেও সাহিত্যে মেয়েদের অবদান যে পুরুষদের চেয়ে কম, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। একটা গোড়ার কথা আলোচনা করে নেওয়া ভালো। আমার মনে হয়—ভেতরের যে তাগিদ না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সে তাগিদ অনেক মেয়ের মধ্যেই অনুপস্থিত। এর কারণ মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি বা অনুভূতির দৈন্য নয়—কারণ হলো যে, মেয়েরা নিজেদের জীবনের মধ্যে এমন জড়িয়ে পড়েন যে, সেই জীবনকে ছাড়িয়ে তাদের দৃষ্টি ওপরে পৌঁছয় না, যদিও জীবনকে অনুভব করেও জীবন-নিরপেক্ষ দৃষ্টি না পেলে সৎ-সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।

বর্তমানে যে সাহিত্যে বাজার ছেয়ে গেছে, এ-দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র, তার দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমটা হচ্ছে ভায়োলেন্স, দ্বিতীয়টা সেক্স। বর্তমান যুগের স্টাইলের ভায়োলেন্সে কজন মেয়ে সাহিত্যের উপাদান খুঁজবেন জানি না—তা সে ভায়োলেন্স আমাদের জীবনে যত বাস্তবই হোক না কেন। আর সেক্স সম্বন্ধে খোলাখুলি লিখতে বা তাকে সাহিত্যের উপজীব্য করতে অনেক মেয়েই সংকোচ বোধ করবেন, অন্তত এ-দেশে। আর যে-সব লেখায় ঐ দুটি বস্তু অনুপস্থিত, সে-সব লেখার বাজার এখন কতটুকু? আর কে না জানে যে লেখার 'বাজার' নেই, সে লেখা আত্মপ্রকাশ করবার কোন সুযোগই পায় না বর্তমান যুগে?

তবে সনাতন পাঠকের একটা কথা মানি, লেখার আনন্দেই লিখে যাওয়া এক ধরনের পাগলামি, আর এই পাগলামি না থাকলে সৎ-সাহিত্য সৃষ্টি হতো না। মেয়েরা মূলত প্র্যাকটিক্যাল—তাই অহেতুক পাগলামি ওদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবে আগেই বলেছি, সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে।

মীরা বালসুব্রামিয়ন, কলকাতা-২৯

বিবেকানন্দ : নতুন আবিষ্কার

Swami Vivekananda in America—New Discoveries by Marie Louise Burke. Price : Rs. 18|-

Swami Vivekananda—His Second visit to the West By the same. Price : Rs. 32|-

Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 700-014

শ্রীমতী ম্যারি লুই বার্ক রচিত উল্লিখিত গ্রন্থ দুটি হাতে পেয়ে মনে হল, এ যেন এক মহাদেশের পুনরাবিষ্কার। প্রথমটিতে ৭১২ পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয়টিতে ৮৪২ পৃষ্ঠা—মোট দেড় হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য বিশ্ব পরিক্রমার এক বিস্ময়কর লিপিচিত্র এই গ্রন্থের মূল উপাদান। শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর বাণী-মুগ্ধ নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর বেদান্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী বার্ক বিবেকানন্দের এক অভিনব ঐতিহাসিক জীবন্ত-স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করে এই মহৎ গ্রন্থ দুটি রচনা ও সংকলন করেছেন শুধু পরিশ্রমই তার একমাত্র হাতিয়ার নয়। এ বিশাল কর্মের জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠারতি, অহৈতুকীভক্তি, শরণাগতি। এর তুলনাস্থল একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা। এই গ্রন্থে বার্কের সমস্ত পরিশ্রম ছাপিয়ে উঠেছে স্বামীজীর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। যে মহৎ সৃষ্টিকর্মের মূলে থাকে অজন্তা-ইলোরার রসসৃষ্টি, মীনাক্ষী মন্দিরের ভাবরূপ এবং তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন, বার্কের এই গ্রন্থের পশ্চাদ্‌পটেও তেমনি রয়েছে একটি বিশাল শিল্পসৃষ্টির বিস্ময়রসাবিষ্ট আকাঙ্ক্ষা। মার্কিন মহিলা বার্ক কিছু শ্রদ্ধা, কিছু তথ্যপ্রিয়তা, কিছুটা বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মন নিয়ে ১৯৫০ সালের দিকে নিউ ইয়র্ক ব্রুকলিন ও বোস্টন গ্রন্থাগারগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাটতে থাকেন অসীম ধৈর্যে অদ্ভুত নিষ্ঠায়। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বিবেকানন্দের আমেরিকা প্রবাসের সংবাদ ও তথ্য সাময়িক পত্র থেকে সংগ্রহাভিলাষে প্রস্তুত হয়ে দেখলেন, কাজটা আদৌ সহজ নয়। একটি সংবাদপত্রের ফাইল শেষ হতে না হতেই আরও নতুন তথ্য হাতে আসতে লাগল—প্রায় বন্যাবেগে। সুতরাং এ-কাজ কত দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিবেকানন্দের জীবনকথা তাঁর পাশ্চাত্ত ও ভারতীয় ভক্তরা লিখে গেছেন, এখনও লিখে চলেছেন। তাঁর আমেরিকা-বিজয় বোধ হয় পরাধীন ভারতের প্রথম বিশ্ববিজয়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীমতী বার্ক অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত যাবতীয় মার্কিন পত্র-পত্রিকা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে তার থেকে সুদীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং স্বামীজীর অনেক অজ্ঞাতপূর্ব বক্তৃতা ও আলোচনার পূর্ণ বয়ান পুনরাবিষ্কার করে বিবেকানন্দের একটি বিদ্যুন্ময় প্রতীকমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইতিহাসের নানা তথ্য-পঞ্জির মিলিয়ে লেখিকা আমেরিকার পত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন—মার্কিন দেশের শিক্ষিত আদর্শবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অসাধারণ উদারতা, কোনও কোনও ধর্ম-যাজকের ধর্মীয় সংকীর্ণতা, রমণীদের করুণা-স্নেহ-ভালোবাসা এবং একনিষ্ঠ শরণাগত ভক্তদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি নিয়ে বিবেকানন্দের প্রথম মার্কিন পরিক্রমা শেষ হল। সময়ের পরিমাণ—১৮৯৩ সালের আগস্ট থেকে ১৮৯৫ সালের এপ্রিল—বছর দুয়ের ঘটনা। ঘটনার বিবরণ তো স্বামীজীর জীবনগ্রন্থে আছে। ঘটনা বর্ণনার জন্য লেখিকা কলম ধরেননি। তাঁর রীতি-প্রকরণ বা methodology হচ্ছে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসসম্মত ও তথ্য-নিষ্ঠ। বিবেকানন্দের নব মতপ্রচার আমেরিকায় কীভাবে গৃহীত হয়েছিল পরাধীন ভারতের এই তাম্রমূর্তি ব্যক্তির রাজসিক হাবভাব ধনাধিপতি আমেরিকার চোখে কেমন লেগেছিল, পাদ্রী সম্প্রদায় তাঁকে নাস্তানাবুদ করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ঔদার্যের কাছে কীভাবে ম্লান হয়ে পড়ছিলেন, কেউ কেউ তাঁর মতামত পুরো না মানলেও তাঁর চুম্বকধর্মী ব্যক্তিত্বের কাছে কীভাবে বিকিয়ে গিয়েছিলেন, সে-সমস্ত অনাবিষ্কৃত তথ্য লুই বার্ক বহু পত্রিকার বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনেছেন। বস্তুত তাঁর 'নিউ ডিসকভারি' নতুন নতুন তথ্যে পাঠককে এমন চমকিত করে যে, সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে। এত তথ্য এত কাহিনী, এত বিচিত্র ব্যাপার যে একদা স্বামীজীকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সাময়িকপত্রে প্রবল ঝড় তুলেছিল এত স্তুতিবাদ তাঁর শিরে বর্ষিত হয়েছিল এবং এত তীব্র কটু নিন্দার গরল তাঁকে নীলকণ্ঠের মতো অম্লানবদনে পান করতে হয়েছিল শ্রীমতী বার্কের এই গ্রন্থ প্রকাশিত না হলে যে সমস্ত কথা অন্ধকারে অজ্ঞাত রয়ে যেত। ভবিষ্যতে হয়তো, কোনও নবীন গবেষক সেই সংবাদপত্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিবেকানন্দ সম্পর্কে একখানি অতি-বৃহৎ পি-এইচ-ডি থিসিস লিখে ফেলতেন।

লুই বার্কের এই সংকলন থেকে কত যে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। বিবেকানন্দ অল্পকালের মধ্যে আমেরিকায় বিশেষ মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুললেও, সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই তাঁর নামটি যথাযথ উচ্চারণ করতে পারতেন না। 'Kanandah', 'Swami Vive Kananda'—কাগজপত্রে এইভাবেই তিনি উল্লিখিত হতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁকে 'Brahmin high priest' বলা হয়েছে, কখনও বলা হয়েছে—'The Buddhist Monk'। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হতে দেওয়ার জন্য কলকাতার ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন এখানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকার জিজ্ঞাসু নর-নারী তাঁর বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক, জ্ঞানের গভীরতা, চিত্তের সাত্ত্বিকতা এবং সামগ্রিক রাজসিকতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন—সেকথা নানা সংবাদপত্র ও স্মৃতি-কথা থেকে সংগ্রহ করে শ্রীমতী বার্ক এই গ্রন্থে একটি বিচিত্র অজ্ঞাত জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সিস্টার দেবমাতা তাঁর বক্তৃতা স্মরণ করে বলেছেন :

"He began to speak; and memory, time, place, people, all melted away. Nothing was left but a Voice through the void".

এ যেন অরণ্যের অন্তরাল থেকে উদ্‌গীত দৈববাণী, যা এক মুহূর্তে মানুষের স্থান-কালবোধ লুপ্ত করে অসীম চেতনালোকে নিয়ে যায়। মার্কিন মহিলা-কবি ও সাংবাদিক এলা হুইলার উইলকন (Ella Wheeler Wilcon) বিস্ময়মুগ্ধ চক্ষে ও ভক্তিনত হৃদয়ে স্বামীজীর মধ্যে মহত্তম সত্তাকে এইভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন :

"I believe him to be the re-incarnation of some great Spirit—perhaps Buddha—perhaps Christ."

তবে বার্ক শুধু স্বামীজীর গুণমুগ্ধ অনুরাগী ব্যক্তিদেরই কথা লিপিবদ্ধ করেননি। বিবেকানন্দের শাণিত যুক্তির আঘাতে অনেক ধর্মধ্বজী ধরাশায়ী হয়েছিলেন এবং পরাভূত হয়ে তাঁরা বিবেকানন্দকে লোকচক্ষে হেয় করতেও চেয়েছিলেন। কেউ কেউ তাঁর অকলংক চরিত্রে

কালিমালেপনের বাতুলোপম চেষ্টা করেছিলেন। বিবেকানন্দ এ-সমস্ত পথের কাঁটাকে গ্রাহ্যও করতেন না। তবু বিদেশে প্রবাসজীবন-যাপন করবার সময়ে তিনি মাঝে মাঝে দুঃখে বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়তেন। 'প্রেসবাইটেরিয়ান' খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, ভারত ও আমেরিকার থিয়জফিস্ট, পণ্ডিতা রমাবাইয়ের খ্রীষ্টান সংঘ এবং বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ তাঁকে অকারণে আক্রমণ করলে তিনি ব্যথা পাবেন না, তিনি এমন দেবতা ছিলেন না। সবচেয়ে দুঃখের কথা, যখন তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করছেন, ভারতবর্ষের, বিশেষত কলকাতার হিন্দুসমাজ সভা করে, কাগজে প্রচার করে, প্রবন্ধ লিখে আমেরিকাবাসীকে জানান, তিনি হিন্দু সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি, জুয়াচোর নন, তখন অলস ও জড়বুদ্ধি ভারতবর্ষ এবং কলকাতার নব্য-বঙ্গীয়গণ এ বিষয়ে আশ্চর্যজনক নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। Boston Daily Advertiser (১৬ মে, ১৮৯৪)-এ "A Prophet from India" নিবন্ধে স্বামীজীকে অতিশয় কুৎসিত ভাষায় গালি বর্ষণ চলতে থাকলেও ভারতবর্ষ থেকে তার বিশেষ কোন প্রতিবাদ এলো না। অবশ্য আনন্দের কথা, স্বামীজীর কয়েকজন আমেরিকান ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী এই সমস্ত ঘৃণ্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

লুই বার্কের দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমটির পরিপূরক। স্বামীজীর দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ অর্থাৎ ১৮৯৯-১৯০০ সালের মধ্যে তার প্রথম ইংলণ্ড ভ্রমণ এবং দ্বিতীয়বার আমেরিকা পরিক্রমার নানা তথ্য ও বক্তৃতার চুম্বক এই বিশাল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লস এঞ্জেলস, পাসাদেনা, উত্তর কালিফর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক ও প্যারিস—এই সমস্ত অঞ্চলে বিবেকানন্দের প্রতিটি বক্তৃতা, আলোচনা ও সংবাদ শ্রীমতী বার্ক নিপুণতার সঙ্গে বিন্যস্ত করেছেন। এই দ্বিতীয়বার ভ্রমণে স্বামীজী প্রথম বারের মতো উন্মত্ত ঝড়ের হাওয়া সৃষ্টি করেননি, বাইরের দিক থেকে এই ভ্রমণ উত্তেজক ও নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ নয়। কিন্তু আর-এক দিক থেকে ওই দ্বিতীয় গ্রন্থটি অতিশয় মূল্যবান। এতে সংকলিত তথ্য সংবাদ ও স্মৃতিচিত্র থেকে স্বামীজীর অন্তর্জীবনের পরিচয় অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবার তিনি আমেরিকায় আর কুলপরিচয়হীন আগন্তুক নন। এবার তিনি সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথম গ্রন্থে দেখা গেছে, তাঁকে কীভাবে আমেরিকার বিরোধিতা ও ভারতবর্ষের অসাড় জড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থেও সেই সংঘর্ষের বর্ণনা ও তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার মর্মবিদারী চিত্র আছে। এবার বিরোধ ও সংঘর্ষ বাইরের দিক থেকে এলো না, এলো তাঁরই অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছ থেকে। এবারেও তিনি শুধু বক্তৃতা, আলোচনা ও যোগশিক্ষা দানে ব্যস্ত রইলেন না, আমেরিকায় বেদান্তকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হলেন। আগের বারের মতোই মার্কিন ভক্ত ও অনুরাগীর দল তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু কিছু বেসুরো সুর কেন বিবেকানন্দের কানে বাজল। সেই বিচিত্র ব্যাপার এই দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীমতী বার্ক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমতী বার্ক বলেছেন:
"Immeasurable greatness that was Swami Vivekananda."
সেই বিশাল মহত্ত্ব তিনি স্বামীজীর দ্বিতীয় বার ভ্রমণ ও বক্তৃতাদি থেকে লক্ষ্য করেছেন। শিষ্যদের প্রতি তাঁর মমতার জন্য স্বামীজীর মানসিক প্রশান্তি বার বার বিঘ্নিত হয়েছে। সর্বনাশা স্নেহ-ভালোবাসা এই জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীকে ভাবসমাধি থেকে পৃথিবীতে টেনে এনেছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে ভারত থেকে স্বামীজীর দ্বিতীয় বার আমেরিকা যাত্রা (ইংলেণ্ড হয়ে), আমেরিকার রিজলে ম্যানোর, দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া, উত্তর কালিফোর্নিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে সফর, বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন, বেদান্তক বিশ্বমানবের সাধ্য-সাধনতত্ত্বরূপে প্রচার, তার সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য, দর্শন, ইতিহাস, বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য এবং গীতার তত্ত্বাদর্শ ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বহু তথ্য ও আলোচনা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার ভ্রমণে বিবেকানন্দ শিষ্যদের কাছে একটি কথা বার বার তুলে ধরেন, তা হল—বীর্য পৌরুষ মনুষ্যত্ব। গীতা ব্যাখ্যাকালে তিনি মার্কিন ভক্তদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল আধ্যাত্মিক আত্মবিশ্বাস—'Spiritual self-reliance'; তখন তাঁর মনে হয়েছিল, ভীরুতার চেয়ে ঘৃণ্যতর পাপ আর নেই। ক্লৈব্য দমনই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য। তাঁর প্রিয় ভক্ত ও গীতাপাঠের শিষ্য রোডহামেল (Rhodehamel) এই তথ্য সরবরাহ করেছেন:

"One great theme was carried through all the Swami's teaching, and that was the necessity for spiritual self-reliance. 'Religion is for the strong', he shouted again and again. So in conclusion he took up the Gita, dwelling on the error of Arjuna in confounding his spiritual welfare with the disinclination to tread the stern path of duty as it was laid out for him by the energies of his nature (which had yet been neutralized by spiritual culture."

কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের মহারাজগণ এই বিশাল গ্রন্থ অতিশয় সুলভ মূল্যে প্রকাশ করাতে বিদ্যার্থী পাঠক গ্রন্থ দুটি সংগ্রহ করতে আর্থিক অসুবিধা বোধ করবেন না বলেই মনে হয়। আমরা শুনেছি, এই মহৎ গ্রন্থের তৃতীয় পর্যায়েও শ্রীমতী লুই বার্ক হাত দিয়েছেন, তাতে য়ুরোপের সমাজে ও সাময়িকপত্রে স্বামীজী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হবে। তার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। সর্বশেষে বলি, প্রেম-ভক্তির দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করা যায় লুই বার্কের এই বিশাল গ্রন্থ দুটি তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। পরিশ্রম হল অন্ধ ও জড়ধর্মী; প্রেমই পরিশ্রমকে জীবিত করে তোলে। স্বামীজীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমভক্তিই শ্রীমতী বার্ককে এই দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধি দান করেছে। অবশ্য অন্ধভক্তি তাঁকে একচক্ষু হরিণের মতো একপাক্ষিক দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এনে দেয়নি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা

কুহক (প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা)। সম্পাদক : জাদুকর এস কে বসু। ৭২ কাশীপুর রোড, কলকাতা ৩৬। প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা।

এই মুহূর্তে জাদুবিদ্যা-সংক্রান্ত কোনো নিয়মিত কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে বলে জানি না। সেদিক থেকে 'কুহক' পত্রিকার প্রকাশ সময়োপযোগী। প্রথম সংখ্যায় জাদুবিজ্ঞানী অশোক রায় ও বিদেশী জাদুকর শানিং পোলক সম্পর্কে লিখেছেন যথাক্রমে সম্পাদক শ্রীবসু এবং জাদুকর শুভেন (সুচারু ভট্টাচার্য)। এই লেখা দুটিই এ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। তিনটি নতুন খেলা শেখানো হয়েছে এ-সংখ্যায়। খেলা তিনটির আবেদন নিশ্চিত সংশয়াতীত। কিন্তু পুরোপুরি জাদুকরদের জন্যই যে-পত্রিকা অভিপ্রেত তাতে আরও উঁচু মানের খেলা নিয়ে আলোচনা করতে অসুবিধে কোথায়? কাগজটি যতটা পরিচ্ছন্ন ততটাই যদি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তাহলেই টিঁকে থাকবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৯ অক্টোবরের সংখ্যায় নবনীতা দেব সেনের 'প্রাপ্তি' কবিতার তৃতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একটি মারাত্মক মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে গেছে। 'রয়েছেন আড়ালে আড়ালে কোথাও—' পঙ্‌ক্তিটি এরকম ছাপা হয়েছে। আসলে ওটি হবে:

"দর্পহারী রয়েছেন আড়ালে কোথাও"

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন অধিনায়ক

এই ভারতেই প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্লাইভ লয়েড। আবার ভারত সফরে এসেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ দলের নতুন অধিনায়ক হয়ে। মাঝের আট বছরে অনেক কীর্তি। বলা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রভূত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কষিত-কাঞ্চন ক্রিকেটার ক্লাইভ হুবার্ট লয়েড।

বয়স মাত্র ৩০ বছর। জন্ম ১৯৪৪ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে। গুয়ানার বাঁ-হাতি চশমা পরা এই মারমুখী ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে ৩৬টি টেস্টে ৩৮·৬৭ রানের অ্যাভারেজে ২২৮২ রান করেছেন। সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচটি। টেস্টে সর্বোচ্চ রান ১৭৮, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ব্যাটের বিক্রমের সঙ্গে তুলনা করা না গেলেও বলেও হাত আছে। আগে ডান হাতে দিতেন লেগ-ব্রেক ও গুগলী বল। এখন মিডিয়াম পেসার। ব্যাটিং ও বোলিংয়ের উপরে যে কৃতিত্বে লয়েড এখন পৃথিবীর এক নম্বর, আধুনিক ক্রিকেটে সেটা মস্ত বড় গুণ হিসাবে স্বীকৃত। আমি ফিল্ডিংয়ের কথা বলছি। ক্লাইভ লয়েড বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার। সব জায়গাতেই ফিল্ড করতে পারেন। কভারে অতুলনীয়। প্রকৃত অর্থেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন অধিনায়ক সর্ববিদ্যাবিশারদ চৌকস ক্রিকেটার। তবে অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা কম।

ল্যান্স গিবসের অবর্তমানে নিজ রাজ্য গুয়ানার দু'চারটি খেলায় অবশ্য যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইংলণ্ডের ল্যাংকাশায়ার কাউন্টি দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবেও দু-একটি খেলায় অধিনায়কত্ব না করেছেন, এমন নয়। কিন্তু টেস্ট খেলার অধিনায়ক হিসাবে একেবারেই আনকোরা। সুতরাং অতীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের রাজ সিংহাসনে বসে যাঁরা কিংবদন্তীর নায়ক হয়েছেন, সেই ওরেল-আলেকজাণ্ডার-সোবার্স-কানহাইয়ের যোগ্য উত্তর-সূরি হিসাবে লয়েড নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা সেটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অবশ্য ওঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা। না হলে দুঃসময়ের কাণ্ডারী রোহন কানহাইকে বাতিল করে তাঁরা লয়েডকে অধিনায়ক করতেন না।

ক্রিকেটের কূটিল আবর্তে আবার এই ক্রি-কণ্ট্রোল বোর্ডের দ্বারাই লয়েড উপেক্ষিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩-এ অস্ট্রেলিয়া দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় প্রথম দুটি টেস্টে লয়েডের ডাকই পড়েনি। কিন্তু পরের তিনটি টেস্টে প্রমাণ করে দিয়েছেন, লয়েড অপরিহার্য এবং প্রাণবন্ত ক্রিকেটের প্রাণ-পুরুষ, যিনি সমগ্র দলকে উজ্জীবিত করতে পারেন, চিত্তাকর্ষক ব্যাটিংয়ে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারেন সহ খেলোয়াড়দের মধ্যে।

নিজ দেশের অধিনায়ক গ্যারি সোবার্স বলেছিলেন, "লয়েড থাকা মানেই দলের রানের সঙ্গে শতরান যোগ হওয়া। সে যদি সেঞ্চুরি না-ও করে—৪০ কিংবা ৫০ রান করে, তবে আর ৪০ বা ৫০ রান বাঁচিয়ে দিতে পারে তার অসাধারণ ফিল্ডিংয়ে। তারই মধ্যে বিপক্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানও রান আউট হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য প্রথমে তাকে না

ক্লাইভ লয়েড

ডেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভীষণ ভুল করেছিলেন।"

বিপক্ষ অধিনায়ক মাইক ডেনেস বলেছিলেন, "লয়েডকে নিয়েই আমাদের মাথাব্যথা। লয়েড একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা লয়েডকে ক্রিজ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরবে, যদি না পারি ঘুরবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে। আমরা এখন সবাই মিলে পরিকল্পনা ও পরামর্শ করছি কীভাবে লয়েডকে আউট করা যাবে। ওর খেলার ফিলম আমাদের তোলা আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতিও জানা আছে। সুতরাং কোথায় ওর দুর্বলতা তা ঠাহর করা খুব কষ্টকর হবে না।"

কিন্তু ডেনেস বা ইংলণ্ডের অপর খেলোয়াড়রা কি ঠিকভাবে লয়েডের দুর্বলতা বুঝে আঘাত হানতে পেরেছেন? সব ক্রিকেটারেরই কোথাও না কোথাও দুর্বলতা থাকে। সব ক্রিকেটারেরই জীবন পদ্ম পাতায় জলের মতন। এই আছে, এই নেই। লয়েড তো ছার। বিশ্ব ক্রিকেটের প্রধান পুরুষ ব্র্যাডম্যানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। যাদের খেলায় ভুলচুক কম, শিল্পনৈপুণ্য ও বিক্রম বেশী, যারা প্রতিভার সহজাত ঐশ্বর্যে শৌর্যময় তারা আসল ক্রিকেটার। লয়েড এই শেষোক্ত সমাজের সদস্য, তবে কৌলীন্যের মর্যাদা কিছু কম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্যালিপসো সুরের আগুনে তপ্ত ওর ক্রিকেট জীবন। তাই ১৯৭৩-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইংলণ্ড সফরে মাইক ডেনেসের দল ওর রানের বান রোধ করতে পারেনি। প্রথম টেস্টের ১৩২ রানের একটি অনবদ্য সেঞ্চুরি এবং তিনটি টেস্টেই মুখ্য-ভূমিকা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আকাশে নতুন নক্ষত্রটির আবির্ভাব ১৯৬৬ সালে। শেল শীল্ডে গুয়ানার পক্ষে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েই বারবাডোজের পক্ষে সেঞ্চুরি, যে বারবাডোজ দলে ছিল চার্লি গ্রিফিথের মত বোলার, সোবার্সের মত চৌকস খেলোয়াড়। জামাইকার বিরুদ্ধে পরের খেলায় ১৯৬ রানের মধ্যে ব্যাট-বলের ফুলঝুরি। লয়েডের বয়স তখন ২২ বছর। তবু ওই বছর ইংলণ্ড সফরকারী দলে নতুন নক্ষত্রটির স্থান হয়নি। শীত মরশুমে ভারতে খেলতে এসে বোম্বাইতে জীবনের প্রথম টেস্টে ৮২ এবং নট আউট ৭৮ রানের দুটি অপূর্ব ইনিংস। চন্দ্রশেখর, বেঙ্কটরাঘবন, দুরানি, নাদকার্নী কারো বলই লয়েডকে বেগ দিতে পারেনি! স্বল্পকালীন সফরে সবচেয়ে বেশী রান (৭৬০) ছিল ওরই নামের পাশে। তারপর নিজের দেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরি সমেত যেমন ৫০ রানের অ্যাভারেজ বজায় রেখেছিলেন, তেমন ১৯৬৮-৬৯'এ অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে প্রথম টেস্টেই করেছিলেন ১২৯ রানের একটি সেঞ্চুরি, মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টায়। তারপর অবশ্য কয়েকটি টেস্টে লয়েডের ব্যাটে ভাল রান আসেনি। সম্ভবত অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের পরিণতি। ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট আকাশে উদিত হয় আর কয়েকটি নতুন নক্ষত্র—চার্লি ডেভিস, লরেন্স রো, আলভিন কালিচরণ। নির্বাচকরা সাময়িকভাবে লয়েডকে আর অপরিহার্য বলে মনে করেন নি। ১৯৭১-৭২'এ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার দলভুক্তি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্ব একাদশের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য তার ডাক পড়ে। সেখানে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় একটি ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে লয়েড জীবনের প্রচণ্ডতম আঘাত পান। তার শিরদাঁড়ার দুটি জায়গার গ্রন্থি আলগা হয়ে যায়। স্ট্রেচারে করে তাকে মাঠ থেকে

বের করা হয়। সাময়িকভাবে শিরদাঁড়া অসাড় হয়ে যায়।

কিন্তু কী অদ্ভুত উপাদানে গড়া গ্যয়ানার ওই কালো দৈত্য। দুই বছরের মধ্যে ওই আঘাত কাটিয়ে উঠে তিনি মাঠে নামেন দুর্জয়তার দীপ্তিতে ক্রিকেট জগৎ আলোকিত করে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আঞ্চলিক খেলায় দুই ইনিংসে দুটি অনবদ্য সেঞ্চুরি। টেস্টেও মোটামুটি ভাল রান। লয়েড জানতেন টেস্ট ক্রিকেটে জায়গা পেতে হলে রো, ডেভস, কালীচরণ ফ্রেডরিক্সের দিক থেকে তার দিকে দর্শকদের দৃষ্টি ফেরাতে হলে—তাকে স্বমূর্তি ধারণ করতেই হবে। তাই ১৯৭৩ এ অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজে প্রথম দুটি টেস্টে উপেক্ষিত হয়েও গ্যয়ানায় চতুর্থ টেস্টে দলের ৩৬৬ রানের মধ্যে করলেন ১৭৮, অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ব্যাটের খড়্গে খান খান করে দিয়ে। সে এক সাড়া জাগানো ইনিংস—ক্রিকেটের বহুশ্রুত স্মরণীয় ইনিংসগুলির অন্যতম।

[illegible] আরও পরিমার্জিত, [illegible] দি [illegible] তার দুর্নাম আছে। ১৯৭১-এ ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় তিনবার রান আউট হয়েছেন। প্রথম টেস্টে দুইবার, তৃতীয় টেস্টে একবার। টেস্টে আরও রান আউটের নজির আছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে খেলায় তিনবার রান আউট হবার মূলে ওর নিজের দোষ কতটা ছিল, কতটা ছিল সহ ব্যাটসম্যানের ত্রুটি, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। দুবার সঙ্গী ব্যাটসম্যান ছিলেন রোহন কানহাই, একবার অধিনায়ক সোবার্স। কনিষ্ঠই পার্শ্বে হিসাবে সব দোষটা অবশ্য লয়েডের উপরই বর্তেছিল। অধিনায়কের মুকুট মাথায় চাপার পর ওই ধরনের রান আউট হওয়া সম্পর্কে লয়েড নিশ্চয়ই সচেতন থাকবেন।

রান আউট হওয়া এবং রান আউট করার ব্যাপারে লয়েডের ভূমিকায় আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য। নিক্ষিপ্ত বলে উইকেট ভেঙে দিয়ে তিনি যে কত ক্রিকেটারের জীবন নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। অদ্ভুত হাতের টিপ, লম্বা দুখানি হাতের অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা অথচ মাঠের মধ্যে চলাফেরার সময় মনে হয় খেলা সম্পর্কে যেন একেবারেই নির্লিপ্ত। অন্য ফিল্ডারদের মত [illegible] চোখে পড়ে না।

গ্যারি সোবার্স লিখেছেন, লয়েড ফিল্ডিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কলিন ব্লাণ্ডের মত সুদক্ষ। কলিন কিন্তু প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে ফিল্ডিং ও থ্রোয়িং প্র্যাকটিস করে। দূর থেকে একটি স্টাম্পে বল নিক্ষেপ করে হাতের টিপ বাড়ায়। লয়েডের পৃথক প্র্যাকটিসের বালাই নেই। তবু তার নিক্ষিপ্ত বলের অভ্রান্ত নিশানা। প্রকৃতি ও প্রতিভার ঐশ্বর্যে লয়েড একজন কমপ্লিট ক্রিকেটার। আচরণে সরল, ব্যবহারে ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তরুণ ক্রিকেটারদের প্রাণের প্রতীক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন অধিনায়ক।

মুকুল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতের মাটিতে পা ফেলার আগেই টেস্টের আমেজ লাগে আমেদাবাদে ইরানী ট্রফির খেলায়। খেলার মাঝেই চলে ক্রিকেটারদের নিয়ে 'বীরপূজা'র অনুষ্ঠান। সম্ভাবিত টেস্ট খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যে লৌকিক দেবতা হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালোরের ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টের সিজন টিকিট একদিনেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন টিকিটের জন্য কালোবাজারে ছুটছে। ভাবছি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতার কি হাল হবে। টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা যেভাবে গরম হয়ে ওঠে তার তুলনা নেই। টেস্ট ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তত বলা যেত পারে—এমন শহরটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

শুধু কি টেস্ট ক্রিকেট, কলকাতায় ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিসের আসর বসবে ফেবরুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে (৬ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত)। ১০০, ১৫০, ২৫০, ৫০০, ৭৫০ এবং ১০০০ টাকা সিজন টিকিটের দাম হবে জেনেও এখন থেকে আরম্ভ হয়েছে টিকিটের চাহিদা। চাহিদা না হবারও অবশ্য কারণ নেই। সোয়া কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী ইডেনের নতুন ইনডোর স্টেডিয়ামে দর্শক আসন হবে হাজার বারো। সিজন টিকিট বিক্রি করা হবে দশ হাজার। চাহিদা অন্তত লক্ষ লোকের। সুতরাং আগে থেকে চেষ্টা না করলে টিকিট মিলবেই বা কিভাবে? বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ দেখার সুযোগ ক্রীড়ামোদিদের ভাগ্যে তো বেশী মেলে না। বিশেষ করে আমাদের দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের পক্ষে! ঘরের পাশে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট, টেবল টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। কোন্ ছাত্র যুবক এ দুটি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ ছেড়ে দিতে চাইবে? কিন্তু বঞ্চিতদের সংখ্যাই তো হবে বিপুল। ক'জন আর খেলা দেখার সুযোগ পাবে। ঠাঁই নাই। চাহিদার তুলনায় ক্রীড়াঙ্গন সত্যিই ছোট তরী। সুখের কথা, ইণ্ডোর স্টেডিয়ামের পাশেই ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে খেলার ছবি দেখাবার কথা ভাবছেন রাজ্য সরকার। এ ব্যবস্থা হলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র যুবক দুধের পিপাসা অন্তত ঘোলে মেটাতে পারবে।

ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় ট্রফি

যদিও আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স, ডুরাণ্ড জয় সর্বভারতীয় ফুটবলে ট্রিপল ক্রাউন লাভের অলিখিত সংজ্ঞা, তবু কলকাতার লীগ শীল্ড জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডি সি এম ট্রফি লাভ ট্রিপল ক্রাউনের প্রায় সমগোরব। নিঃসন্দেহে তিনটি বড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান। স্থানীয় লীগ বাদ দিলে দুটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা।

ভারতের নামী দলগুলি ও বিদেশের দুটি দল নিয়ে আয়োজিত এবারের ডি সি এম ট্রফি জিতে ইস্টবেঙ্গল ৮ বারের মধ্যে ৬ বার ট্রফিটি ঘরে তুলেছে। ফাইনালে তারা জলন্ধরের শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসকে হারিয়েছে ১—০ গোলে। তার আগে সেমি-ফাইনালে ২—০ গোলে পরাজিত করে ব্যাংককের পোর্ট অথরিটি দলকে। গ্রুপ লীগে দক্ষিণ কোরিয়ার চো হুয়েং ব্যাংককে ৩—২ গোলে, পাঞ্জাব পুলিসকে ১—০ গোলে এবং নীমাচের সেন্ট্রাল রিজার্ভ

ডি সি এম ট্রফির সংগে বিজয়ী ইস্টবেংগল (বাঁদিক থেকে) কাজল ঢালি, সুভাষ ভৌমিক, অশোক ব্যানার্জী অধিনায়ক সমরেশ চৌধুরী ও সলিল দাস

পুলিসকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেংগল সেমি-ফাইনালে ওঠে। সুতরাং লীগ ও নক আউট প্রথায় পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থাকার কৃতিত্বসহ তাদের ট্রফি লাভ। এবং বলা বাহুল্য প্রতি খেলাতেই প্রাধান্যের পরিচয়।

কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ডি সি এমে এবার অদ্ভুত ফল দেখিয়েছে। রাজস্থানের আর্মড কনস্টেবলারির দল গোয়ার ডেমপো স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছিল ৭—০ গোলে। সেই আর্মড কনস্টেবলারিকে মহমেডান হারায় ৭—১ গোলে এবং ডেমপোকে ৩—১ গোলে। সেমি-ফাইনালে কিন্তু পাঞ্জাব পুলিসের কাছে মহমেডান ১—৪ গোলে হেরে যায়।

দক্ষিণের দলীপ ট্রফি জয়

পশ্চিমাঞ্চলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে দক্ষিণাঞ্চল এবার দলীপ ট্রফি জিতেছে। একবার যুগ্ম-জয়ের হিসাবসহ এবার নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফি পেল ৬ বার।

গতবারের বিজয়ী উত্তরাঞ্চলকে প্রথম খেলায় ১ উইকেটে হারিয়ে দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে ওঠে। পশ্চিমাঞ্চল ফাইনালে ওঠে পূর্বাঞ্চলকে প্রথম ইনিংসের ফলে এবং মধ্যাঞ্চলকে ৬৪ রানে পরাজিত করে।

অসময়ের বৃষ্টির ফলে দলীপ ট্রফির খেলা এবার ভাল জমেনি। কোন খেলায় বড় ইনিংস গড়ে ওঠেনি। সবচেয়ে ব্যর্থতা দেখিয়েছে পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা, যেমন প্রায় প্রতি বছর দেখিয়ে থাকে। পুনায় বৃষ্টি-বিধ্বস্ত পীচে পান্ডুরঙ্গ সালগাওকার (৩৯ রানে ৬ উইকেট) এবং কারশন ঘাউড়ির (২০ রানে ৪ উইকেট) পেশ বলে মাত্র ৮৩ রানে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও তারা ১২৭ রানের বেশী করতে পারে না। রাকেশ শুক্লার ২৫ এবং পলাশ নন্দীর ৩৩, দুই ইনিংসের ব্যক্তিগত বড় রান। পশ্চিমাঞ্চল ৪ উইকেটে ২০০ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেও সরাসরি জয়ের সম্ভাবনায় ছিল। সরাসরিই হয়তো জিতত, যদি শেষ দিন সময় চক্রবর্তীর কাচে অশোক মাঁকড় ক্যাচ না দিত। তখনো পূর্বাঞ্চলের এক রান ঘাটতি ছিল। যাইহোক, সময়াভাবে সরাসরি না হারলেও পূর্বাঞ্চল দলীপ ট্রফির খেলায় এবার সামগ্রিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল আবার ফাইনালে ব্যর্থতা দেখিয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে। এক সময় যাদের তারকাখচিত দল বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে তাদের ১০৯ রানে শেষ হওয়া অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয় ইনিংসেও পশ্চিমাঞ্চলের দুশো রান পুরো হয় নি। দক্ষিণাঞ্চলও যে বড় ইনিংস করেছে, তা নয়। তবে দক্ষিণের জয়ের মূলে প্রধান চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন এবং অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবনের বোলিং আর আবিদ আলী ও সৈয়দ কিরমানির ব্যাটিং। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৬ রানে বেঙ্কটরাঘবনের ৬টি উইকেট লাভ উল্লেখ করার মত। পশ্চিমাঞ্চলের ১০২ রানের উত্তরে ১০৭ রানে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি উইকেট পড়ে যাবার পর সপ্তম উইকেটে আবিদ আলী ও কিরমানির ১১৩ রান যোগের ফলে দক্ষিণাঞ্চল জয়ের পথে এগিয়ে যায়। আবিদের ৮২ রান এবং এবং ১৪৩ মিনিট উইকেটে টিকে থেকে কিরমানির ৩৩ রান প্রশংসার দাবী রাখে। ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের পরে ভারতের দুই নম্বর উইকেটকিপার সৈয়দ কিরমানি ব্যাটিংয়ে দিন দিন দক্ষতা দেখাচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দল গড়ার শেষ ট্রায়াল হিসাবে গণ্য ইরানী ট্রফির খেলায় সেঞ্চুরি করতে পারেনি মাত্র এক রানের জন্য।

একলব্য

'সেই চোখ' (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে উত্তমকুমার এবং আরো কয়েকজন — ফটো—দেশ

মতামতের মন্তাজ

বাংলা ছবি দেখানোর জন্য যে অরডিন্যান্স-এর প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে অনেকেই হয়ত খুশি হবেন—বিশেষত যাঁরা বাংলা ছবি ভালবাসেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি মন্দ নয়। বাংলা ছবির মার্কেটিং সমস্যাই এখন সব চাইতে বড়। তাই এক্ষেত্রে কী করা যায় সেই ভাবনারই সূত্রে অরডিন্যান্সের কথা হয়ত উঠেছে। বাধ্যতামূলক বাংলা ছবি প্রদর্শনীর মূলে যে সদিচ্ছা প্রকট সেটা কেউই অস্বীকার করবেন না। বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্দশা মোচনের জন্য রাজ্য সরকার যে এখন অতিমাত্রায় সক্রিয় সেটা সন্দেহাতীত। বিশেষত পশ্চিম বাংলার তরুণ তথ্যমন্ত্রী বাংলা ছবির সমস্যা সমাধানের কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছেন।

* * *

এতদিন চিত্রপ্রযোজনার সমস্যাগুলি বিশেষ ভাবে ভাবা হয়েছে। প্রযোজনার হার বাড়াবার জন্য কিছু পন্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার একটি বন্ধ স্টুডিও আবার চালু করেছেন। ছবির টেকনিক্যাল মান যাতে উন্নত হয় সে জন্য স্টুডিওগুলিকে আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এইবার বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বাংলা চিত্র প্রদর্শনের অব্যবস্থার উপর। এই কারণেই অরডিন্যান্সের প্রস্তাব।

* * *

কিন্তু অরডিন্যানস জারি হলে আবার কিছু কিছু নতুন সমস্যাও দেখা দেবে। এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হুকুমনামার ফলে নতুন নতুন হলে বাংলা ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হতে পারে। অর্থাৎ যে হলগুলি এতকাল হিন্দী ছবির কুক্ষিগত ছিল সেখানে না হয় বাংলা ছবি মুক্তি পাবে। কিন্তু অপ্রচলিত চেনগুলি চিত্রপ্রযোজকদের কী পছন্দ হবে? কিংবা দর্শকদের? বেচাকেনার ক্ষেত্রেও একটা অভ্যাসের ব্যাপার আছে। বই বেচাকেনার ব্যবসা যেমন এক অঞ্চলে জমে ভাল, অন্যত্র নয়, তেমনি বিভিন্ন সিনেমারও একটি নিজস্ব অঞ্চল আছে। অতএব সারা রাজ্যে সব সিনেমা হলেই বাংলা ছবির দর্শক বেশি জুটবে এমন আশা খুব যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া সারা বছরে এমন অধিক সংখ্যক বাংলা ছবি হয় না যাতে এই রাজ্যের বা কলকাতা শহরের সব হলের দরকার হতে পারে। আরও একটি কথা আছে। বাংলা ছবির জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট চেন আছে। ওই চেনগুলিতে বাংলা ছাড়া আর কোন ছবিই দেখানো হয় না। প্রস্তাবিত অরডিন্যানসের সুযোগে ওই সব বাংলা রিলিজ চেন-এ একবার যদি হিন্দী ছবি ঢুকে পড়ে তাহলে সমূহ বিপদ। সেক্ষেত্রে বাংলা রিলিজ চেন বলে আর কিছু থাকবে না। এই সব রিলিজ চেন যদি বাংলা ছবির জন্যই নির্দিষ্ট থাকে তবে অবশ্য ভাবনার কারণ নেই।

* * *

বিষয়টা তলিয়ে দেখতে হবে। বাংলা ছবির সুবিধা করতে গিয়ে বাংলা-হিন্দীর সরাসরি প্রতিযোগিতা যেন আরও প্রকট বা তীব্র না হয়ে ওঠে। বাংলা রিলিজ চেন-এ কোন প্রতিযোগিতা নেই, কারণ ওখানে

শুধুই বাংলা ছবি চলে। কিন্তু একবার 'রিলিজ-চেন' তৈরি হলে সেটা বাংলা ছবির পক্ষেই কতিকর ব্যাপার হবে। ক্রমে যে বাংলা ছবির প্রয়োজনায় হার বাড়বে, অথচ বাড়বে। এই আশা অন্ততঃ অমূলক নয়। আগামী বছর হয়তো মুক্তির জন্য আরও অধিক সংখ্যক ছবি জমা হবে। সেই ছবি-গুলি যাতে বন্দিদশায় না পড়ে তার জন্য ব্যবস্থা করতেই হবে। সে জন্য বাংলা ছবির আরও একাধিক রিলিজ-চেন-ই যথেষ্ট। এবং বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে—কী শহরে কী মফস্বলে—আরও কয়েকটি বাংলা রিলিজ-চেন সৃষ্টি করা যায় কি-না সে বিষয়ে সরকারকে তৎপর হতে হবে। বাংলা রিলিজ-চেন-এর সংখ্যা বাড়লে চিত্র প্রদর্শন ক্ষেত্রের অনিয়ম বা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার প্রবণতাও কমবে। এখন হল যেহেতু কম তাই অন্যায় আবদার বা দাবির সুযোগও বেশি। হলের সংখ্যা বাড়লে বাংলা চিত্র-প্রদর্শনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতে পারে। কলকাতা শহরে আরও তিনটি বাংলা রিলিজ-চেন তৈরি হতে পারে, যেখানে শুধুই বাংলা ছবি মুক্তি পাবে। এই চেন তৈরির জন্য আইনের দরকার নাও হতে পারে। মনে হয় সরকারের অনুরোধে কাজ হবে। যদি না হয় তবে সুস্থ জনমত গড়া যেতে পারে। উত্তেজনা ও অশান্তির পথ এড়িয়ে গিয়েও কাজ সম্পন্ন করা যায়। চিত্র প্রদর্শকদেরও মনে রাখতে হবে, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সর্বাগ্রে। কলকাতায় বা পশ্চিম বাংলায় সিনেমা হল তৈরি করে শুধু বোমবাই চলচ্চিত্র শিল্পের সেবা করা চলবে না। যখনই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিপদ তখনই তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রস্তুতি যদি না থাকে তবে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

"যে যেখানে দাঁড়িয়ে"/দীপঙ্কর দে, কাবেরী বসু

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

(চিত্রলিপি ফিল্মস)

অ্যাডালট থিম নিয়ে খুব বেশি বাংলা ছবি হয় না। তাই 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবিটি মন দিয়ে বসে দেখার মতো। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'র মন্থরতা বেশি, চরিত্ররা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে বলে নয়। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের চরিত্ররা নিজস্ব গণ্ডি হয়তো অতিক্রম করতে পারেনি, কিন্তু আগে কিংবা পরে অনুপম ও অঞ্জলির মনে যে বাসনার তাড়না সেইখানেই গল্পের গতি। পরিচালক অগ্রগামী গোষ্ঠী ছবিতে অনুপম-অঞ্জলির মনের খবরই শুধু দিতে চেয়েছেন। সেটা অনেকটা বর্ণনামূলক। ছবিতে বাইরের ঘটনা, যাকে বলে নাটকীয় অ্যাকশন, বিশেষ নেই। নাট্যক্রিয়া বলতে যা আছে সেটা মনস্তাত্ত্বিক। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে অভিনেতা অভিনেত্রীর একটি বড় ভূমিকা থাকে। তাঁরাই অভিনয়ের ভিতর দিয়ে নাট্যক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। ছবির অনুপম—দীপঙ্কর দে—অধ্যাপক হিসাবে শান্ত ও মার্জিত ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছর পর অঞ্জলির সঙ্গে মিলিত হবার পর অনুপমের অন্তরে যে উত্তাল বাসনা বা অস্থিরতা জাগা স্বাভাবিক তার হদিস কিন্তু শিল্পীর অভিব্যক্তিতে পাওয়া গেল না। অনুপমকে দেখার পর, বেশ বোঝা গেছে, অঞ্জলি অশান্ত, কিছুটা ক্লান্তও বুঝি। সেটা কাবেরী বসুর অভিনয়ে প্রতিফলিত। তবে অঞ্জলি কিছুটা উজ্জ্বল হতে পারত। বরঞ্চ নির্জনে পরস্পরকে নিবিড়-ভাবে পাবার পর অঞ্জলির মনে যে সংকট বা অপরাধবোধ জেগেছে তার আভাস কাবেরীর অভিব্যক্তিতে চমৎকার। পরস্পরের মিলনের দৃশ্যটি আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখাতে পারলে অঞ্জলির প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত। হয়তো সেনসর-শাসন এখানে বাদ সেধেছে।

নাট্যক্রিয়া যদি ছবিতে কিছু থাকে সেটা শেষ অঙ্কে—যখন অঞ্জলি নিজের দাম্পত্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে অনুপমকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। সম্ভবত অঞ্জলির স্বামী রণেন স্ত্রীর মনের এই বিক্ষোভের সাক্ষী। এই ভূমিকায় এন বিশ্বনাথনের অভিনয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অনুপম-অঞ্জলির কাহিনীর সমান্তরালভাবে রয়েছে যথাক্রমে ওদের ছেলে ও মেয়ে বাপ্পা-ঝুমঝুমের প্রেমের গল্প। মূল গল্পে প্রেম-সম্বন্ধের যে অস্পষ্টতা রয়েছে, অস্পষ্ট না হলেও সেটা অনুজ্জ্বল সেটাকে পরিচালক একটু বেশি প্রকট করেছেন, বিশেষত বাপ্পা ও ঝুমঝুমের ক্ষেত্রে। ওরা সকলের অলক্ষে একে অপরের কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছে, একে অপরকে ভালবাসা নিবেদন করেছে, অনুপম-অঞ্জলি যা পারেনি। এর পর ছবির শেষান্তে বাপ্পা-ঝুমঝুমেরও যে যেখানে ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। পরের জেনারেশন তাদের

ইচ্ছাকে মূল্য দিতে জানে। এই উপন্যাসিকা গল্পের বক্তব্যবিহীন, তাই অবিশ্বাস্য। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বটিও বহু রচনায় মুখে বলে হয়েছে। এটা ছোটদের গল্প আড়াই বেশি উপভোগ্য। সর্বক্ষণ প্রাণোচ্ছল। এই চরিত্রকে সজীব করে তুলেছেন। কেবল নির্জীব মনে হয় বাপ্পা-রূপী ঝান্টু সেনকে। ওদের ঘনিষ্ঠতার কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছে। বাপ্পার মা। অঞ্জলিদের প্রতি অনুপমের আকর্ষণ দিয়েও তার কিছুটা অসংগতি। এই চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় স্বাভাবিক।

ছবিটিকে অবশ্য অগ্রগামী চিত্র শ্রেণীরই করতে চেয়েছেন। শিল্পমর্যাদায় যাতে এই ছবি আর দশটা চিত্রের উপরে থাকে সে-ব্যাপারেও পরিচালকের সযত্ন চেষ্টা দেখা গেছে। অনুপম-অঞ্জলির পূর্ব-জীবনের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক সুকল্পিত। ওদের জানালায় দাঁড় করিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার—মনের কথা জানিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও সুন্দর। সংগীত রবীন্দ্র-সংগীতের (সাগর সেনের কণ্ঠে "না বুঝে কারে তুমি") ব্যবহার শিল্পসম্মত। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ জায়গায় জায়গায় আবহ-সংগীতের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত এই ছবির পটভূমি নির্বাচন এবং ছবিতে চিরকাল মেজাজ আনার জন্য পটভূমিকে ব্যবহার করার ব্যাপারেও পরিচালক কল্পনাশক্তি ও রুচি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। শেষোক্ত কাজে বিশু চক্রবর্তীর ক্যামেরার ভূমিকাও খুব বড়। সব বিভাগের কাজই ভাল, তাও আলাদাভাবে দেখতে বা শুনতে ভাল লাগে। সব মিলিয়ে আরও বড় কিছু হয়ত পাওয়া যেত।

সুজাতা

মা চণ্ডী চিত্রম্

কিন্তু যে হরিজন-নায়িকাও যেহেতু গ্ল্যামার-স্টার তাই সম্ভ্রান্ত নায়ক তাঁকে জীবনসঙ্গিনী করে নিলেও সেটা খুব বড় রকমের আত্মত্যাগ কিংবা একটা মহৎ কাজ মনে হয় না। সিনেমার লাইসেন্স অবশ্য মেনে নিতেই হবে। এবং "সুজাতা"-য় অপর্ণা সেনকে আগাগোড়া অচ্ছুৎকন্যা ভেবে নিতে পারলে ছবি দেখার নাট্যসুখ-টুকু পুরোপুরিই পাওয়া যাবে। সুবোধ ঘোষের গল্পের যেটা মানবিক আবেদনের দিক তার প্রতি পরিচালক চিত্রনাট্যকার পিনাকী মুখোপাধ্যায় অতি বিশ্বস্ত। বরঞ্চ সেন্টিমেন্টকে আরও একটু বেশি চড়িয়ে নেবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। ছবির শেষে, যখন সুজাতার সব সাধ পূর্ণ, দর্শকের চোখ অশ্রুসিক্ত হতে পারে।

"সুজাতা"/সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য আরও সংক্ষিপ্ত ও ঘনবদ্ধ করা যেত। পরিচালক গল্প বলার সময় ফ্ল্যাশব্যাকে কুলীনের ঘরে আশ্রিতা সুজাতার শৈশবের ঘটনা দেখিয়েছেন। সুতরাং গোড়ায় তিনি সুজাতার শৈশবের গল্প সরাসরি এতটা সময় নিয়ে বর্ণনা না করলেও পারতেন। ওই অংশে আবার রমার জন্মদিনে পুতুলনাচের দৃশ্য এবং আরও কিছু বাড়তি ঘটনাও আছে। ছবি দেখে মনে হয়, প্রথম দিকে বেশ কিছুটা সময় অকারণে নষ্ট হল।

সুজাতা ও রমা বড় হবার পর কিন্তু দর্শকের আর কোন ক্ষোভ থাকবে না। সুজাতা শান্ত, ঘরের কাজে সদা ব্যস্ত। সুজাতার স্বভাবের নানা রকম গুণ না থাকলে (সুন্দর গান গাওয়া সমেত) এই চরিত্রের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি থাকবে কেন? এই সহজ চরিত্র বিশ্লেষণে অপর্ণা সেন কোন ত্রুটি রাখেননি। উল্টো স্বভাবের রমা সর্বক্ষণ হাসি-খুশি, প্রাণোচ্ছল। মামুলি নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের চরিত্রকে হিংসুটে ও ঝগড়াটে করা হয়। রমা তা নয়। চরিত্রটিতে সুন্দরভাবে প্রাণ-সঞ্চার করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। দুজনের মধ্যে তাঁকেই হয়ত দর্শকের বেশি ভাল লাগবে। উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ বংশজাত অধীর সম্ভবত সুজাতাকে প্রথম দেখার পরই ভালবেসেছে। এই চরিত্রে দীপঙ্করের উপর নাট্য সৃষ্টির তেমন কোন গুরুদায়িত্ব ছিল না। শিল্পী অভিনীত ভূমিকাকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

সুজাতা ছাড়া আর যাঁদের নিয়ে ছবির নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যক্রিয়া গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন রমার বাবা-মা'র চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং অধীরের দিদিমার ভূমিকায় ছায়া দেবী। চিত্রনাট্যের প্রথম থেকেই অনিল চট্টোপাধ্যায় অতি চমৎকার অভিনয় করে গেছেন। তাঁকে বেশি ভাল লাগে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর—বেশি বয়সে। ওই সময়ে সুব্রতার অভিনয়ও মনোজ্ঞ এবং সংযত। আগের দিকে, রমা-সুজাতা যখন শিশু, তাঁর অভিনয়ে রোমান্টিক নায়িকা-সুলভ হাব-ভাব একটু বেশি, যেটা বিসদৃশ। ছায়া দেবী বরাবর যেমন করেন তেমন অভিনয়ই করেছেন।

সুজাতা-গল্পের মূলে রস সঞ্চারের জন্যই পরিচালক একাধিক গানের কথা ভেবেছেন। "ফুল বলে ধন্য আমি" (সুজাতার মুখে) এ ছবিতে থাকাই স্বাভাবিক। তবে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের "জল দাও" গানের দৃশ্যটি সংযোজন করে পরিচালক গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তখন গঙ্গার তীরে সুজাতাকে চণ্ডালিকার কাহিনী বলছে অধীর। প্রসঙ্গত বলা যায়, গঙ্গাতীরে এবং অন্যান্য আউট-ডোর দৃশ্যে কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ফটোগ্রাফির

"পাগলাবাবু" (পরিচালনা : বিশ্বজিৎ) ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ
ফটো-দেশ

কৃতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুজাতাকে চণ্ডালিকা-কাহিনী বলার সূত্রেই চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের দৃশ্য—রমার কণ্ঠে অভিনীত। অন্য প্রসঙ্গে ও অন্য দৃশ্যে নাচ গানও আছে। গানের সুরের জন্য নচিকেতা ঘোষ আবার বাহবা পাবেন। তবে নাটকীয় দৃশ্যে সংলাপ বলার সময় অতিরিক্ত বাজনা ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। গঙ্গায় ভাসমান নৌকো থেকে গাওয়া গানটি দর্শককে স্তব্ধ করে। গানটি দরদভরা গলায় গেয়েছেন মান্না দে। ছবির বক্তব্য ও রসের সঙ্গে সংগতি রেখেই গানটি প্রযুক্ত। পিনাকীবাবু আগাগোড়াই মূল গল্পের আবেগ প্রতিষ্ঠার প্রতি যত্নবান। এই কারণেই সুজাতা নাট্যামোদী দর্শকের মন জয় করবে।

বোম্বাই বিচিত্রা

ব্যাঙের ছাতার মতো এখন চারদিকে ফিল্ম-টেলিভিশন ইনস্টিটিউট গজিয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই বোম্বাই শহরে চারটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট চালু, আরও একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হবার কথা নভেম্বরের মাঝামাঝি। অনুপ্রেরণা এসেছে কোথা থেকে না বললেও চলে. অবশ্যই পুনা ফিল্ম অ্যানড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রেরণার উৎস। পুণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক আর প্রাক্তন ছাত্ররা সোৎসাহে এই কাজে হাত লাগিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আছেন বেকার কিছু চিত্রনির্মাতা। রোজগারের একটা সহজ উপায় আর কী! সরল, উচ্চাভিলাষী চলচ্চিত্র কলাবিদ্যার্থীদের তো অভাব হয় না।

এখন, তথাকথিত এই ইনস্টিটিউটগুলি কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে? ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকরা কি ছাত্রদের কলাকৌশল-বিদ্যা বিতরণ করেন? বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আছে কি? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারব না, তবে এইটুকু অনায়াসেই বলা যায়, পুনা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এই চলচ্চিত্র-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও মতেই তুলনীয় নয়।

বোম্বাইয়ের একটি ইনস্টিটিউট একটি স্টুডিওর সঙ্গে সংলগ্ন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এক প্রবীণ চিত্র-প্রযোজক। উক্ত প্রযোজকের ভাইপো হলেন অধ্যক্ষ। ভদ্রলোকের ছোট-খাট ভূমিকায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে, এই পর্যন্ত। প্রচুর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শিক্ষালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। যথাকালে বড় বড় সংবাদপত্রে এবং সিনেমা-পত্রিকায় বিরাট আকারে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। অভিনয় এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীরা শ-য়ে শ-য়ে ভর্তির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে থাকলে বিস্মিত হব না। এখানকার যে-কোনও পাঠক্রমই শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশ ব্যয়সাধ্য। তাতে কী আসে-যায়? ছাত্ররা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারবেন তো!

ভর্তির আগে শিক্ষার্থীদের একটি সিলেকশন বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয়েছিল। সেই বোর্ডে ছিলেন কয়েকজন নামকরা প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা হয় তাজমহল হোটেলে। শোনা যায়, ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আগে-ভাগে বোর্ডের সদস্যদের অনুরোধ করে রাখেন যে, যাঁরা ভর্তি হতে চাইছেন তাঁদের কাউকেই যেন নিরাশ করা না হয়। সিলেকশন বোর্ডের একজন সদস্য অন্তত এ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। তাঁর ধারণা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যকার যোগ্যতা ছিল বড়জোর শতকরা পাঁচ জনের। বলা বাহুল্য, সকলকেই ভর্তি করা হয়েছে।

বোম্বাইয়ের অনুরূপ আর-একটি ইনস্টিটিউটের খবর দেওয়া যাক। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই ইনস্টিটিউটের অ্যাডভাইসারি কমিটি গঠিত। কিছুদিন আগে দুটি ছাত্রীর অভিভাবক উক্ত কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আনার ভয় দেখান। অভিভাবকের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে 'ফী' [illegible]য়ের মধ্যে প্রতারণা রয়েছে। বড় বড় নাম উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেইসব নাম দেখেই সকলে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইনস্টিটিউটটি এখনও চলছে।

পুনা ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতি নিঃসন্দেহে চমৎকার। এটি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সিনেমার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারেন, কলাকৌশলগত কাজও পারেন শিখতে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যটাই স্পষ্ট। শিক্ষার্থীদের কল্যাণের প্রতি সেখানে নজর দেওয়া হয়, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

* * *

সেদিন এক বন্ধু বলছিলেন, বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে এখন বাঙালী পরিচালকদেরই জয়জয়কার। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কয়েকটি সফল হিন্দী ছবির নাম করলেন—যেমন, চোর মচায়া শোর (পরিচালক : অশোক রায়), রজনীগন্ধা (পরিচালক : বাসু চট্টোপাধ্যায়), কোরা কাগজ (পরিচালক : অনিল গঙ্গোপাধ্যায়), দোস্ত (পরিচালক : দুলাল গুহ)। তিনি আরও বললেন, বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত অংকুর (যেটি বোম্বাইয়েও আবার হিট্ করেছে) চিত্রটির পরিচালকও বাঙালী।

বাঙালীর প্রশংসা শুনতে বাঙালীদের স্বভাবতই খুব ভাল লাগে। বন্ধুর কথায় তাই আমরা পুলকিত হয়ে উঠলাম। তবু এক জায়গায় তাঁর ভুলটি শুধরে দিতে হল বললাম, অংকুর ছবিটির পরিচালকের নাম বেনেগল; ইংরাজীতে ওই শব্দটা লিখে তার থেকে দ্বিতীয় 'ই' অক্ষরটা বাদ দিলেই সেটা অবশ্য দাঁড়ায় 'বেঙ্গল', কিন্তু ভদ্রলোক বাঙালী নন।

সুরঞ্জন

পুজোর গান (৩)

রামকৃষ্ণায়ণ

রামকৃষ্ণায়ণ লং-প্লে রেকরডে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গীতিনাট্যের নায়ক মনে হতে পারে। এটা রচনার দোষ। ঠাকুরের জীবন-কাহিনী নিয়ে সংগীতপ্রধান নাটক হলে ক্ষতি ছিল না। রামকৃষ্ণায়ণ তা হয়নি। রামকৃষ্ণদেব-গীত গানগুলি শোনানোই এই রেকরডের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনা বা প্রযোজনার পিছনে যে সদিচ্ছা বা সৎ-প্রেরণা আছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তবে কীভাবে সৎ উদ্দেশ্যের রূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে প্রযোজকদের হয়ত খুবই ভাবতে হয়েছে। ঠাকুরের সংলাপের সূত্রেই গানগুলি পরিবেশিত। অন্যান্য চরিত্রও রাখা হয়েছে। যেমন নরেন, গিরিশ, ভৈরবীব্রাহ্মণী, যোগেশ্বরী, বৈষ্ণব চরণ, মনোহর সাঁই, পাগলিনী, বিনোদিনী প্রভৃতি। এঁদের মুখের গানও বাদ যায়নি। পঞ্চাশ মিনিটের রেকরডে এত গানের সংকুলান প্রায় অসম্ভব। অতএব সব গান পুরোপুরি শোনানো হয়নি। রামকৃষ্ণায়ণ-এ এত চরিত্র থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেটা জীবন-নাট্যের রূপ নেয়নি। একটিমাত্র সংলাপ, তারপরই গান। তার চেয়ে ঠাকুর-গীত শুধু গানের রেকরড হয়ত ছিল ভাল।

এর উপর শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঠাকুরের সংলাপ। সেই 'নরেন', আর 'র'-র জায়গায় 'ন্যা'। ঠাকুর এইরকমভাবেই উচ্চারণ করতেন সেটা তিনি কী করে আবিষ্কার করলেন জানা নেই। যে-অঞ্চলে ঠাকুরের আবির্ভাব সেই অঞ্চলের উচ্চারণ-অভ্যাসের কথা ভেবে কি? কথামৃত-গ্রন্থে (যেটা প্রামাণ্য বলেই ধরতে হবে) ঠাকুরের মুখে 'নরেন' উচ্চারণ নেই। ঠাকুর কীভাবে কথা বলতেন সেটা অভিনেতা হয়ত কল্পনা করেই নিয়েছেন। কতগুলি ব্যাপারে অন্তত তিনি তাঁর কল্পনাশক্তি নিবৃত্ত করতে পারতেন। অভিনেতার মুখে বার বার 'ন্যরেন', শোনা বড় কষ্টদায়ক। ঠাকুরের ভূমিকা অভিনয়ে এই ম্যানারিজম-ই বা কেন?

তা ছাড়া ঠাকুরকে অপ্রত্যেক দৈর্ঘে রাখা কেন? গানও রেজির তাল ব্যাটালগ। গানের সুর-রচনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় এককোণীয়-যেনত্ব করেছেন। সেটা নিশ্চয়ই ভাল। তবে ভক্তিগীতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুরেরও একটি গভীর প্রভাব থাকে। তবু রবীনবাবুর সুররচনায় কৃতিত্ব আছে। সংগীতানুরাগীগণ অবশ্য এই গানগুলি শুনে আনন্দিত হবেন। বিভিন্ন চরিত্রে সব বিশিষ্ট শিল্পীরাই সুন্দর গেয়েছেন। ঠাকুরের মুখের গানগুলি অসামান্য দক্ষতা ও অনুভূতির সঙ্গে গেয়েছেন মান্না দে। তা ছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (গিরিশ), মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নরেন), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (বৈষ্ণব চরণ), রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (মনোহর সাঁই), প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী (বৈরাগী), শিপ্রা বসু (পাগলিনী), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (বিনোদিনী) এবং গৌতম মুখোপাধ্যায় (বালক গদাধর) ও দিলীপ ভট্টাচার্যের (অধিকারী) গাওয়া গান শুনতেও ভাল লাগে। রেকরডটি শোনার পর অবশ্য ঠাকুরের গানই মনে অনুরণিত হতে থাকে। রেকরডটির সার্থকতা এইখানেই, রামকৃষ্ণায়ণ-রচনা (অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-কৃত) নয়।

অন্য রেকর্ড

এইচ-এম-ভি পুজো রেকর্ডে, বলা বাহুল্য, আধুনিক গানের সংখ্যাই বেশি। মান্না দে'র চারটি গান সুরের বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য, গাওয়ার গুণে উপভোগ্য। একটি ই-পি রেকর্ডে আশা ভোঁসলে ও রাহুল দেববর্মণের গানের গাঁটছড়া। আশার দুটি গান শুনতে ইচ্ছা করে। রাহুলের গানের সুরও ভাল। কিশোরকুমারের সুরে লতা মঙ্গেশকরের গান জনপ্রিয় হবার মতো। কিশোরকুমারের গানের সুর দিয়েছেন লতা। এই সুরারোপ-বিনিময় কিশোরের পক্ষে খুব লাভজনক হয়নি। পুত্র অমিতকুমারের গানের সুর-রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন কিশোর। অমিতের গানের কৈশোর-দশা এখনও কাটেনি, পরে হয়ত তাঁর গান আরও পরিণত হবে। এবারের পুজোর গানে যদি মন না ভরে, তাই সম্ভবত অতীতের কিছু হিট গানের সংকলন বের করা হয়েছে। লং-প্লে রেকর্ডটির নাম পুজো-কুসুম। শিল্পীরা হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে।

মুজনের জন্যে কবিতার অনুপম আবৃত্তির একটি রেকর্ড সুধীজনের ভাল লাগবে। প্রতিটি কবিতার আবৃত্তির আগে একটুখানি গৌরচন্দ্রিকা আছে। তাও সন্তোষকুমার ঘোষের কণ্ঠে গৌরী ঘোষের। এই প্রস্তাবনাও কবিতার মতো। কবিতা আবৃত্তি করেছেন শম্ভু মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ ও কাজী সব্যসাচী।

শচীন দেববর্মণের ছয়খানি লোক-সংগীতের সুপার-সেভেন রেকর্ড আদৃত হবে। পূর্ণদাস বাউলের গানের একটি লং-প্লে রেকর্ড বের করা হয়েছে। শিল্পী তাঁর নিজস্ব ঢঙে গানগুলি গেয়েছেন। রসিক ও ভক্ত শ্রোতার কাছে ওই গানগুলির আবেদন গভীর।

হিন্দুস্থানের লং-প্লে রেকর্ডে এই প্রথম অমর পাল বারোটি গান করলেন। গানগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। আগমনী বাউল, প্রভাতী, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি সব রকমের গানই আছে। এবং গানগুলিতে অনুভূতির স্পর্শ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গ্রামীণ মেজাজ। এই রেকর্ডের কদর তো হবেই, খাঁটি লোকসংগীতের প্রসারের দিক থেকেও এই রেকর্ডের মূল্য অনেক।

চাঁপাডাঙার মেলা

(নান্দনিক)

রেখটীয় পদ্ধতিতে গালাগানের মধ্য দিয়ে নাট্যগত বিষয়বস্তুকে দর্শকের কাছে পরিস্ফুট করে তোলাই বুঝি ইদানীং প্রায় সব কটি গ্রুপ থিয়েটারের প্রকরণগত লক্ষ্য। নান্দনিক-এর "চাঁপাডাঙার মেলা"ও এমনি একটি প্রযোজনা। সেই সূত্রেই মঞ্চে এসেছে জুড়ি। প্রতিটি দৃশ্যের পূর্বাহ্ণে তার মুখ দিয়ে বলিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য ঘটনা সংক্ষেপ। প্রতিটি দৃশ্যান্তরের সময়ে সেই সাথে আবার আগামী দৃশ্যের বিজ্ঞপ্তিসহ লেখা পোস্টার প্রদর্শনীর কোনই প্রয়োজন বোধ হয় ছিল না। প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ না থাকলেও চমৎকারিত্ব আছে। তবে কাহিনীর গতির দিক থেকে তার উপস্থাপনা কিছুটা মন্থর। অভিনয়ে আপাত কুশলতার ছাপ রাখতে পারলেও মুখ্য চরিত্র মদনের ভূমিকায় পার্থ ভট্টাচার্য সর্বত্র যেন ফোটাতে পারেননি নিজেকে। বিশেষত ঝুমুর গানের আসরে বা প্রবল আনন্দঘন মুহূর্তগুলোতে এই ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়েই দেখা দিয়েছে। সে যে আসলে বোকা ও বুদ্ধিহীন এ কথাটাই শিল্পী বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন মাঝে-মধ্যে। পাশাপাশি নায়িকা রাধাবালার ভূমিকায় বেলা রায়ের অভিনয় সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সংলাপ, হাবভাব চলনে-বলনে দর্শকদের অভিভূত করে তুলতে পেরেছেন তিনি। বিশেষ করে যাত্রাদলের সজ্জায় (ঝুমুর রীতি অনুসারে) মদন ও রাধা-বালার মিলনদৃশ্যে তাঁর নিখুঁত অভিব্যক্তি যথার্থ অর্থেই একটি সুনিপুণ শৈল্পিক প্রকাশের নিদর্শন। তবে এই অংশে আলোক কাজের দুর্বলতা লক্ষণীয় বিষয়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ফটিক চরিত্রে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অনবদ্য। নাটকের দাবি অনুযায়ী মঞ্চে এসেছিল আরো কিছু চরিত্র। এদের মধ্যে জুড়ি (অমর ভট্টাচার্য), বিহারী (দীপ দে), জুয়াড়ী (সমীর লাহিড়ী), ফেরিওয়ালা (নিখিল দাস), ঘটক (অজয় দত্ত), সন্তোষ (আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়), রসিক (নির্মল ঘোষ) প্রমুখ সকলের অভিনয়ই নাটকের দাবি অনুযায়ী যথাযথ। সংগীত পরিচালনা মোটামুটি স্বচ্ছন্দ এবং নাট্যনির্দেশনা এক কথায় প্রশংসার যোগ্য।

—নাট্য সমালোচক

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যদেবের নাম শুনেছ?
নাবিকমাত্রেই শুনেছে। জলদস্যুরা তাঁর নাম শুনলে কাঁপত।
অরণ্যদেব নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জলদস্যুদের উচ্ছেদ করবেন।

7NC
অরণ্যদেবের নাম শুনেছি কিনা? ছোটবেলা থেকেই শুনছি। না, কখনও তাঁকে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, আমার বাপ-ঠাকুর্দা তাঁকে দেখেছেন।

ক্যাপটেন এস্ট্রিভ নানাজনকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে...
অরণ্যদেবের নাম শুনেছ?
এখানে ও-নাম কেনা শুনেছে? অরণ্যদেবের মৃত্যু নেই।
SEA CLOUD
৬/10

অরণ্যে তিনিই শান্তি রক্ষা করেন।
তিনি আছেন, তাই বাইরে থেকে কোনও শত্রু অরণ্যে ঢুকতে সাহস পায় না!
হুম!

আমার জাহাজ এখানে রইল! তোমরা বরং রঙ লাগাও!
আমি দিন কয়েকের মধ্যে ফিরব!
কোথায় যাচ্ছেন?

রত্ন-গুহার সন্ধানে! সেখানে রাশি-রাশি হীরে-মুক্তো রয়েছে। ওগুলো নিয়ে আমি ফিরব।
বলেন কী!
সত্যি কথা!

ক্যাপটেন, প্রচুর রসদ জোগাড় করেছি।
সবই কাজে লেগে যাবে।
এবারে রত্ন-গুহার সন্ধান পাওয়া চাই।

ওই সেই চূড়া! এখানেই নামব।
বাপরে!
আশ্চর্য!
!!!
১১

অরণ্যদেব
লী ফক

ওটা কী? কারও মূর্তি?
ধুৎ! ওটা একটা পাহাড়!
??!!

কিন্তু দেখতে একেবারে মানুষের মাথার মতো!
অবিকল মানুষ!

ওরা এসেছে রত্ন-গুহার খোঁজে ...
রত্ন-গুহা এই এলাকাতেই তো এরিক?
তাতে কোনও ভুল নেই।

ওই গাছগুলোর নীচে তাবু খাটাও ....
তারপর বন্দুক-টন্দুক বার করো
কিন্তু রত্ন-গুহাটা কোন দিকে?

হীরে-মুক্তোর সেই গুহাটা কোন্ দিকে?
তা ঠিক জানিনা। লিজা, তৈরী হয়ে নাও।
জানো না? তার মানে?

আমরা এত পয়সা খর্চা করলুম ... এত দূরে এলুম .....
আর এখন বলছ জানো না?
সত্যি জানি না!

শুধু এই পর্যন্ত পথের কথাই গ্রেভসের মনে ছিল। কিন্তু গুহাটা ঠিক কোথায়, তা কেউ জানে না।
লিজা?
লিজাকে সেটা জানতে হবে।

কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?
দারুণ!
?!
এ সবের অর্থ কী?

গুজরাটের চোরাকারবারীরা এখন সংস্থার নামে দু হাতে টাকা বিলোচ্ছেন বলে প্রকাশ। হাসপাতাল, ইস্কুল নির্মাণ ইত্যাদিতে তাদের এখন প্রচুর দানধ্যান।

পুলিস থেকে এখন তাঁদের ধরনা আর নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

• • •

আজকের ডিমের মতই টাটকা খবরে, পশ্চিমবঙ্গ 'বিভিন্ন রাজ্যের থেকে প্রত্যহ চার লাখ করে ডিম আমদানি করে থাকে জানলাম। তা হলে, আমাদের ঐ ডিমের পঞ্চবার্ষিকী অশ্বেদোগের পরিকল্পনা সার্থক—লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে গেছি।

• • •

শ্রীকামরাজ শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে দুই কংগ্রেসের জোট বাঁধার কথা বলেছেন।

তা হলেই বঙ্কিম দৃষ্টিতে দেখলে এই ঘোর রজনী কাটিয়ে ইন্দিরা একেবারে দেবী চৌধুরানী।

• • •

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সান্যাল : বৈদ্যদের গোষ্ঠীপ্রীতি সুবিদিত। এক আপিসের বড়বাবু ছিলেন বদ্যি। সে-আপিসের সকলেই তাই। হঠাৎ এক চাকরির খালি হওয়ায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কিন্তু আবেদনকারীদের ভেতর বৈদ্য একজনকেও

পাওয়া গেল না। তারপর বাধ্য হয়ে তাদের ভেতর থেকেই বাছাই করে বৈদ্যনাথ নামের একজনকে কাজটা দেওয়া হল তখন।'

কোনোরকমে পিতৃরক্ষা!

• • •

মহা মহা জ্যোতিষীরা গুণে-গেঁথে বের করেছেন দশ হাজার বছরে একবার করে যে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে যার ফলে মহাপ্রলয় ঘটে যায় সেটা আর দশ বছর পরেই ঘটতে যাচ্ছে আবার—সেই সময়ে আর সব গ্রহরা বৃহস্পতির বিরুদ্ধে খাড়া হবে বলে জানা গেল।

নিছক পারিবারিক বার্হস্পত্য কলহ!

• • •

শিল্পবস্তুর সম্পর্কে এক কণা সিওর না হয়েও শিল্পদ্রব্যের এক কনাসিওর হওয়া যায়, তা জানেন?

• • •

শ্রীধন রায় : 'লেখকরা বিস্তর/কেউ লেখে অল্পই/কেউ কিছু বিস্তর॥'

অল্পের মধ্যেই কেউ বা সবিস্তর।

• • • •

'তোমার পকেট কাটলো বলে/চোরের পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো ডাকাত/দেশের পকেট ফাঁক করো॥'

শ্রী জে মুখার্জি : 'গত বছর দিল্লি যাবার সময় ভোরবেলায় ভয়ানক চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম এক বাঙালী যুবক তার নিজস্ব হিন্দীতে এক অবাঙালীর সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। দোষের মধ্যে লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটিকে মহিলা মনে করে ঐ অবাঙালীটি 'মাইজী' বলে ডেকেছিল।......'

এক চুলের এদিক ওদিক মাত্র।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকার Other সব ব্যাপারে লোকসান খেলেও আমাদের ব্যবসায়ে নামতে চলেছেন—বিশ্বাস করুন বা না করুন!

• • •

শ্রীপ্রণব মাইতি : 'পাস করেছেন/পাস খেয়েছেন/তিন 'শ পাতি জর্দা।/বাস ছুটছে/বাস উঠছে/নদীয়া থেকে খড়দা॥'

• • •

শ্রীপ্রশান্ত : 'মেয়েদের ভেবো না কো/কাঁচ গড়া টয়/ওদেরই জন্যে ধুলো/হয় কত টয়॥'

• • •

শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় : 'আল পাতো/খাও/খাও পেট ভরে হাওয়া/গরিবি হটাবে/ভাই/ছাড়ো খাওয়াদাওয়া॥'

• • •

সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগণেশ বলেছিলেন যারা বিদেশী চোরাচালানে বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করতে রপ্ত সেই

চোরাচালানদারদের সবাইকেই আমরা জানি, আর সময়মত পাকড়াবো, এই সেদিন এই কথা বলার পর তিনি নিজেই আজ ওলটালেন!

কার্তিকদের গায়ে শুঁড় বোলাতে যাওয়া!

• • •

কাজী মুরশিদুল আরেফিন : 'সেদিন কলকাতায় শিক্ষিত বেকার যুবকের এক পান-বিড়ির দোকানে সাইনবোর্ডে এই ছড়াটা দেখলাম : এই-যে আসুন আসুন একটু বসে বিড়ি কষে/খকখাকিয়ে কাশুন।'

আরে, ফিন্ খান—ফিন্ আরো কাশুন!

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

বাঙলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে

পবিত্রকুমার মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত ও অধীপ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
		৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১১১·২০ টাকা	৬৬·০০ টাকা	৩৮·০০ টাকা

স্মরণীয় মুহূর্তে
বিনী জানে আপনি
কি চান
তাই আপনার জন্তে টেরীন মিশ্রণে বিনীর আকর্ষণীয় অর্ঘ্য-সম্ভার— জীবনে বিশেষ করে মনে রাখার মত মধুর ক্ষণে· আপনার ইচ্ছা পূরণে।
বিনী
TERENE ®
আমরা অনেক অনেক বদলেছি–
আপনার মতই

নূতন মুদ্রণ

॥ দাম ন টাকা ॥

বনফুলের নূতন উপন্যাস

আশাবরী ৭৲

জরাসন্ধের নূতন বই

চলতি মেঘের ছায়া ৮৲

নিঃসঙ্গ পথিক

প্রথম খণ্ড—১৮৲ দ্বিতীয় খণ্ড—১২॥

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।

সহৃদয় পুস্তকবিক্রেতা ও এজেন্ট বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমাদের কোন ক্যানভাসার বা এজেন্টকে কোথাও অর্ডার সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয় না, প্রয়োজন হইলে আমাদের ডিরেক্টরগণই গিয়া থাকেন। দয়া করিয়া অর্ডার ও অগ্রিম টাকা ডাকে সরাসরি আমাদের আপিসে পাঠাইবেন।

ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতিষাচার্য ভৃগু জাতকের

১৯৭৫ কেমন যাবে

তৎসহ ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

এই বইটি প্রথম বেরোবার পরই অনেক নকল বেরিয়েছিল। তার দ্বারাই ভৃগুজাতকের বইয়ের মূল্য প্রমাণিত। গত দু বছরই এঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে—পাঠকরা মিলিয়ে দেখে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। প্রতিদিনই সফল হচ্ছে এইসব ভবিষ্যদ্বাণী।

আগামী বৎসর বিশ্বের দুর্বৎসর—কতটা খারাপ এই বইতে দেখতে পাবেন।

॥ চার টাকা ॥

কাগজের দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও সাধারণের ক্রয়যোগ্য রাখার জন্য নামমাত্র মূল্য।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড—২০৲ দ্বিতীয় খণ্ড—২০৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

১ম—১৮৲ ২য়—২০৲

পর্বতারোহণ বিশেষজ্ঞ প্রাণেশ চক্রবর্তীর

রক্‌ ক্লাইম্বিং ৪৲

শৈল-আরোহণ শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ। অসংখ্য চিত্র সম্বলিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ

ভাগবতীতনু রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। ১২·৫০

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

(সি ১২৭২৮)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়— ... ১৬৯
ব্যঙ্গচিত্র— ... ১৭০
বৈদেশিকী—দেবরাজ ... ১৭১
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত ... ১৭৩
রূপদর্শীর শোভার চিন্তা— ... ১৭৫
দেখো ফুল কিনছে ফুলকুমারী (কবিতা)
—সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৭৬
পুনর্মুখার (কবিতা)—রজত মিত্র ... ১৭৬
মেহেদি পাতার জন্য (কবিতা)—কবিরুল ইসলাম ... ১৭৬
সমকালীন কবির প্রতি কীর্তিনিন্দা (কবিতা)
—জিয়া হায়দার ... ১৭৬
ছিল রুমাল হয়ে গেল একটা বেড়াল—রঞ্জন ... ১৭৭
তুমি কি বেসেছ ভালো—চিত্ররথ দত্ত ... ১৭৯
জাপানের এ বি সি ডি—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ... ১৮৫
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ১৮৯
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর ... ১৯৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী	...	১৯৭
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	১৯৯
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু	...	২০১
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	২০৭
গজল সম্রাজ্ঞী—জ্যোতির্ময় বসু রায়	...	২০৯
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত	...	২১১
ঢাকার চিঠি—দাউদ হায়দার	...	২১৫
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত	...	২১৭
আলোচনা—	...	২১৯
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	২২৫
পুস্তক পরিচয়—	...	২২৭
ভারতের এক নম্বর ব্রিজ খেলোয়াড়—মুকুল	...	২২৯
খেলার মাঠে—একলব্য	...	২৩১
রঙ্গজগৎ—	...	২৩৩
অরণ্যদেব—	...	২৩৯
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী	...	২৪০

প্রচ্ছদ : বিপুল সেনগুপ্ত

ম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ৩০ কার্তিক ১৩৮১

মানুষের আদি জন্মভূমি

নৃতত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানানুশীলনের : একটি বিষয়, যার সঙ্গে সাধারণ ষের প্রাত্যহিক চিন্তা ও আগ্রহের াগ্রত কোন সম্বন্ধ নেই। তবু এই রেই জগতে মাঝে-মাঝে এমন প্রদ ঘটনার আত্মপ্রকাশ দেখা যার সাড়া সাধারণ মানুষেরও বশেষ কৌতূহলের চাঞ্চল্য জাগিয়ে । সম্প্রতি ইথিওপিয়াতে ফরাসী কন নৃতাত্ত্বিকদের যৌথ অনু-নর কৃতিত্বে প্রাচীন মানুষের শেষের অর্থাৎ অস্থি-কঙ্কাল-টির যে শিলীভূত নিদর্শন কৃত হয়েছে, তার বয়স চল্লিশ লক্ষ বলে দাবী করা হয়েছে। সন্দেহ খুবই চমকপ্রদ আবিষ্কার। শুধু র ছাত্রটি নয়, এই বিংশ শতাব্দীর ন জনপদের সাধারণ মানুষটিরও াতে এই বিস্ময় সঞ্চারিত হতে যে, তারই একজন 'অত্যন্ত অতি-প্রপিতামহ' আজ থেকে চল্লিশ ৎসর আগে এই পৃথিবীর আলো-মধ্যে পথ হেঁটে জীবনের সম্বল করেছিল। কিন্তু যাঁরা নৃতত্ত্বের জ্ঞ, তাঁরা নিশ্চয় এত সহজে কল্পনাগ্রস্ত হতে চাইবেন না। এই ইথিওপীয় মানবের প্রাচীনতার নিঃসংশয়ে মেনে নেবার আগে যোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেতে ন। জাভা-মানব, পিকিং-মানব ও ডারটাল মানবের প্রাচীনতা আবিষ্কারকের অভিমত ও ত যেমন বহু জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত বশেষে প্রমাণসিদ্ধ বলে স্বীকৃত মর্যাদা লাভ করেছিল, এক্ষেত্রেও প্রাচীনতার হিসাবটাকে বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সম্মুখীন বে। কেনিয়াতে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী কির আবিষ্কৃত মানবিক দেহাস্থির ভূত নিদর্শনটি পঁচিশ লক্ষ বছর এক মানুষের অবয়বের স্মৃতিচিহ্ন প্রায় সকল নৃতাত্ত্বিকের স্বীকৃতি ছ। তাই প্রশ্নটা এখন এই দাঁড়চ্ছে ক বেশী প্রাচীন? ইথিওপীয় না কেনিয়া-মানব? প্রশ্নটি নৃতাত্ত্বিক মহলে বহু বিতর্কের মুখরতা সঞ্চারিত করবে বলে মনে হয়। ইথিওপীয় মানবের অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কর্তা নৃতাত্ত্বিকেরা আরও একটি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের মতে আফ্রিকাই প্রথম মানবের আবির্ভাব-ভূমি। এই সিদ্ধান্তকেও নৃতত্ত্বের সর্ববাদিসম্মত সমর্থন পেতে হলে আরও বহু কঠিন প্রশ্ন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তা ছাড়া একথা কেউ বলতে পারেন না যে, নৃতত্ত্বের কোন অনুসন্ধানী গবেষক এই পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশের কোন স্থানে আরও প্রাচীন মানবিক অস্তিত্বের কোন অস্থি-নিদর্শন আর কখনও আবিষ্কার করতে পারবেন না। সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ করতে পারে যে, নৃতত্ত্বের আপন-ঘরে ধারণা অনুমান ও সিদ্ধান্তের খুব বেশী স্থিরতা নেই। আজকের ধারণা কাল বদলে যায়। নৃতত্ত্ব অনেকদিন ধরে শিখিয়ে এসেছে যে, ভূতাত্ত্বিক প্লিস্টোসিন অধ্যায়ের শুরুতেই মানবিক অবয়বের রূপ ও প্রকার সুপরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ পূর্ণদেহ মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে দশ লক্ষ বৎসর আগের কোন শুভ মুহূর্তে। আজ শুনতে হচ্ছে, কেনিয়া-মানবের বয়স পঁচিশ লক্ষ বছর, ইথিওপীয় মানবের বয়স চল্লিশ লক্ষ বছর। নূতন আবিষ্কারের প্রণোদিত সিদ্ধান্ত সহজে বিশ্বাস না করবার আর-একটি কারণ সৃষ্টি করে রেখেছে, নৃতত্ত্বেরই ঘরের একটি নিদারুণ জালিয়াতীর ঘটনা। পিল্টডাউন-মানব, ইংলণ্ডের সাসেক্সের একটি গহ্বরের ভিতরে আবিষ্কৃত যে নর-করোটি অতি-প্রাচীন মানুষের একটি বিশিষ্ট দৈহিক প্রকারের পরিচায়ক নমুনা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, এবং যাকে অবলম্বন করে নৃতত্ত্বের শিক্ষা দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়েছিল, একদিন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সেই নর-করোটি কোন প্রাচীন নরের করোটিই নয়। এক দক্ষ জালিয়াত ব্যক্তি গোরিলার খুলির সঙ্গে আধুনিক মানুষের চোয়ালের হাড় জুড়ে দিয়ে বিচিত্র এক ধোঁকা নির্মাণ করে রেখেছিল। আধুনিক নৃবিজ্ঞানী তাই খুব সাবধান হয়েছেন, আবিষ্কৃত কোন মানবিক অস্থি-ফসিল সম্পর্কে প্রাচীনতার হিসাব খুবই সাবধানে বৈজ্ঞানিক বিচারের দ্বারা নিষ্পন্ন করা হয়।

প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন করা চলে। এবং প্রশ্নটিকে নিতান্ত একটি চটুল কৌতূহলের ব্যাপার বলে না মনে করে একটি সঙ্গত কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে করাও চলে। আমাদের এই ভারত-ভূমিতে সুদূরাতীত কালের কোন শুভ মুহূর্তে মানবিক প্রকারের পরিণত রূপ নিয়ে প্রথম মানুষটি আবির্ভূত হয়েছিল, এমন অনুমান কি অসঙ্গত? অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়, যদিও এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস পরিপুষ্ট করবার মতো কোন প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলার কবি বলেছেন—ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র। বলা বাহুল্য, কবি-কল্পিত এই ধারণা নৃতাত্ত্বিকেরা অনুমোদন করতে পারবেন না, যদি না কোন অনুসন্ধানের কৃতিত্বে অথবা আকস্মিক আবিষ্কারে আদি-মানবের অস্থি - কঙ্কাল - করোটির বস্তুময় কোন স্মৃতি-চিহ্ন কিংবা অবশেষের চিহ্ন ভারতের কোন স্থানে ধরা পড়ে যায়। ভারতেও প্রাচীন নর-করোটির কিছু নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের বয়সের প্রাচীনতার হিসাব একজন জাভা-মানবেরও বয়সের কাছাকাছি নয়। পঁচিশ লক্ষ বৎসরের বয়স বলে কথিত কেনিয়া-মানবের প্রাচীনতার গৌরব মৃদু করে দিতে পারে, এমন আবিষ্কার ভারতের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কৃতিত্বে কোন-দিনও সম্ভব হবে না বলে ধারণা করবারও কোন যুক্তি নেই। ভারতে প্রাচীন নর-করোটির সাম্প্রতিক একটি আবিষ্কার যদিও বিশ্ব-নৃতত্ত্বের ঘরে বড়-রকমের কোন কৌতূহলের সাড়া জাগিয়ে তোলেনি, কিন্তু এই আবিষ্কার একটি সংকেত, যাতে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, ভারতে আরও প্রাচীন মানবিক অস্তিত্বের প্রমাণ-চিহ্ন আবিষ্কৃত হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। মধ্যপ্রদেশের ভূপালের নিকটে ভীমবেটকা নামে একটি স্থানে এই নর-করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের শিবালিক গিরিমালার উপত্যকা আদিম স্তন্যপায়ী জীব-জীবনের শিলী-ভূত অস্থি-চিহ্নের একটি বিরাট আশ্রয়। শিবালিকে প্রাপ্ত বানরাকার দ্বিপদ প্রাণীর যে অস্থি-নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, কোন কোন নৃতাত্ত্বিকের অভিমতে, তার মধ্যে মানবিক রূপে বিবর্তিত হবার একটি অগ্রসর দশার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে অনুমান করবার এই যুক্তিও থাকে যে, পূর্ণকায় আদি-মানুষটির প্রথম আবির্ভাবের ঘটনা এই ভারতেরই আলোছায়ার মধ্যে উদ্বোধিত হয়েছিল। আপাতত এই অনুমান ও কল্পনা সম্বল করে ভারতীয় কৌতূহলের পক্ষে এই অপেক্ষা স্বীকার করে নিতে হবে যে, দেখা যাক, প্রাচীনতম মানুষটির কোন স্মৃতিচিহ্ন ভারতের কোন স্থানে কোনদিন আবিষ্কৃত হয় কি না।

অলৌকিকের প্রতীক্ষায়

বৈদেশিকী

দেবরাজ

মুক্তির সন্ধানে

পশ্চিম এশিয়ার যে মুলুকটার নাম প্যালেস্টাইন সেটা পয়লা বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল তুর্কীদের তাঁবে। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য খান খান হয়ে যাবার পর লীগ অব্ নেশন্স অর্থাৎ জাতিসঙ্ঘ মুলুকটার জিম্মাদার করে দেয় ইংরেজদের। ও এলাকায় তখন যারা বাস করতো তারা সবাই প্রায় ছিল জাতে আরব—ইহুদীদের পাত্তা ছিল না সেখানে। ওরা ও অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করে দেশবিদেশ থেকে ১৯১৯ সনের পর জাতিসঙ্ঘের নির্দেশ অনুযায়ী একটা ইহুদীদের জাতীয় আবাস গড়ে তোলবার জন্যে। ব্যাপারটাতে আরবদের সায় ছিল না। তারা চেয়েছিল একটা স্বাধীন প্যালেস্টাইন গড়ে তুলতে যেটা হবে পুরোপুরি আরব রাষ্ট্র। দাবিটা যে অন্যায্য নয় এ কথা এক সময় ইংরেজরাও স্বীকার করেছিল—বাইরে থেকে ইহুদীদের আসা বন্ধ করে দিতেও চেয়েছিল। পারেনি। দুনিয়ার ইহুদীদের প্রবল আপত্তিতে। তাদের যেমন পয়সার জোর তেমনই তাদের দুনিয়াজোড়া প্রতিপত্তি। তার ওপর ইহুদীদের ওপর হিটলারের অকথ্য অত্যাচারে তাদের ওপর দরদ তামাম দুনিয়াতেই বেড়ে গিয়েছিল।

তাদের স্বপ্ন সার্থক হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সনে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মঞ্জুরির ছাপ নিয়ে প্যালেস্টাইন এলাকায় দেখা দিল ইহুদীদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র ইস্রায়েল। দুনিয়াতে কোথাও প্যালেস্টাইন বলতে আলাদা কিছু আর রইলো না। তার নামটাও মুছে গেল দুনিয়ার মানচিত্র থেকে। এলাকাটা ভাগ করে নিলে ইস্রায়েল, জর্ডন আর মিশর। প্যালেস্টাইনের বাসিন্দারা রাতারাতি হয়ে গেল নিজ বাসভূমে পরবাসী। অনেকে আবার উদ্বাস্তু হয়ে আস্তানা খুঁজে বেড়াতে লাগলো এ রাজ্যে ও রাজ্যে। যাদের ঘরবাড়ি পড়েছিল ইস্রায়েলি এলাকায় তাদের অনেকেই দেশত্যাগী হয়েছিল কেউ বা ভয়ে কেউ বা তাড়া খেয়ে। প্রায় পনেরো লাখ লোক হয়ে পড়েছিল উদ্বাস্তু ঘরছাড়া ইহুদীদের ঘর বাঁধবার ঠাঁই করে দিয়ে। এদের দেখাশোনার ভার নিয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটা ত্রাণসংস্থা গড়ে। কিছু লোকের যাতে সুরাহা অবশ্য হয়েছে কিন্তু এখনও লাখ লাখ লোক দিন কাটাচ্ছে আশ্রয় শিবিরে। পাকাপাকি ঘর বাঁধতে তারা এখনও পারেনি। বিনা দোষে তাদের জীবন কাটাতে হচ্ছে ছন্নছাড়া হয়ে। পরের হাত-তোলা খেয়ে। এত কষ্টের পরও কিন্তু

তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়নি। আবার তারা সব ফিরে পাবে এই আশায় তারা বুক বেঁধেছে।

এমনটা কিন্তু হবার কথা ছিল না। প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দারা ভেসে যাবে আর উড়ে এসে জুড়ে বসবে তাদের এলাকায় সাত দেশ থেকে ইহুদীদের দল এমন কথা লীগ অব নেশনসের পরিকল্পনাতে ছিল না, ইউনাইটেড নেশনসের পরিকল্পনাতেও নয়। মুলুকটা যখন ইংরেজদের তাঁবে ছিল তখন তারাও চায়নি ভবঘুরে হয়ে যাক প্যালেস্টাইনের বাসিন্দারা, তাদের ঘর দখল করুক ইহুদীরা। ঠিক ছিল ইহুদীদের একটা আলাদা রাষ্ট্র হবে বটে কিন্তু পাশাপাশি আলাদা স্বাধীন প্যালেস্টাইনও থাকবে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো ঠিক এর উলটো। নিজেদের বসত তৈরি করে ফেললে ইহুদীরা আর নিজেদের ভিটে থেকে উৎখাত হলো প্যালেস্টাইনের বাসিন্দারা। ইহুদিদের খুঁটির জোর আছে, টাকার জোরও, আধুনিক লড়াইয়ের কায়দাও তাদের রপ্ত, সাজসরঞ্জাম কেনার পয়সাও আছে তাদের। বেচারা প্যালেস্টাইনের বাসিন্দাদের জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার ছাড়া আর কী আছে? আরব দুনিয়া তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু তাদেরই বা কী এমন সাধ্য? ইহুদীদের সঙ্গে তারা ছলে বলে কৌশলে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারেনি। লড়াইও তারা করেছে কিন্তু কাবু করতে পারেনি ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েলকে। ছিনিয়ে নিতে পারেনি তার কাছ থেকে প্যালেস্টাইন মুলুক।

প্যালেস্টাইনের সবটাই প্রায় এখন ইস্রায়েলের দখলে। গাজা এলাকাটা কব্জা

করেছিল মিশর আর জর্ডনের পশ্চিম পারটা জর্ডন। তাতেও ভাগ বসিয়েছে শেষ দুটো লড়াইয়ের পরে ইস্রায়েল। এসব জবরদখল এলাকার কতটা তাকে ছাড়তে হবে তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার কথা জেনিভার বৈঠকে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের বাসিন্দারা তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা আর সামর্থ্য অনুযায়ী। তারা গড়ে তুলেছে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন অর্থাৎ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা। সোজাসুজি লড়াইয়ে তাদের মতলব তারা হাসিল করতে পারবে না এ তারা জানে। তাই তারা বেছে নিয়েছে গেরিলা যুদ্ধের পথ। ইস্রায়েলের এলাকায় তারা হানা দিচ্ছে যখন সুবিধে পাচ্ছে। এদের ঘাটি ছড়িয়ে আছে আরব দেশগুলোতে। ১৫০ জন সদস্য নিয়ে তৈরি প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল অর্থাৎ প্যালেস্টাইন জাতীয় পরিষদ ও সংস্থার সর্বেসর্বা। কাজ চালাবার জন্যে পরিষদ নির্বাচন করে একটা ছোট কার্যনির্বাহক সমিতি। প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হচ্ছেন ইয়াসের আরাফাত।

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার অনেক শরিক। তবু এক নম্বর হচ্ছে ফাতা। আরাফাত এরই নেতা। ফাতার পত্তন হয়েছিল গাজা অঞ্চলে। আল আসিফা বলে জঙ্গী বাহিনী এরা গড়ে তুলেছে ১৯৫৯ সনে। প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে এই ফাতা। তাদের দু নম্বর সংগঠন হচ্ছে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন অর্থাৎ প্যালেস্টাইন মুক্তির জন্যে গণগোষ্ঠি। এর নেতা হচ্ছেন জর্জ হাবাশ। মার্ক্সবাদে তাঁর গভীর প্রত্যয়। তিনি শুধু ইস্রায়েলকে উৎখাত করতে চান না, তাঁর ইচ্ছে তামাম রাজারাজড়াকে আরব দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক প্যালেস্টাইন আরব রাষ্ট্রের পত্তন করা এ দুটো ছাড়া আরও কয়েকটা বামপন্থী ঘেঁষা সংগঠনও আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উগ্রপন্থীও। প্যালেস্টাইন সমস্যার দিকে দুনিয়ার নজর ফেরাবার জন্যে তার বিমান ছিনতাই করেছে, লোক গুম করেছে বিমান বন্দরে হানা দিয়েছে, নানা দূতাবাসে অবরোধ ঘটিয়েছে। খেলার মাঠকেও রেহাই দেয়নি। তবে প্যালেস্টাইনের বাসিন্দাদের মূল সংগঠন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নয়। প্যালেস্টাইন সমস্যা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আলোচনায় মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার পেয়েছেন ইয়াসের আরাফাত।

অনেক কাল ধরে মনকষাকষি চলেছিল আরাফাতের সঙ্গে জর্ডনের রাজা হুসেনের। ১৯৫০ সনে তাঁর ঠাকুর্দা রাজা আবদুল্লা জর্ডনের পশ্চিম পারের যে এলাকা দখল করেন সেটা প্যালেস্টাইনের মধ্যেই পড়ে। সেই সুবাদে রাজা হুসেনের দাবি তিনিই প্যালেস্টাইনের একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁর ইচ্ছে আলাদা একটা প্যালেস্টাইন তৈরি হলে তাকে নিয়ে জর্ডনের সঙ্গে মিলিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র বানিয়ে তিনি মজাসে রাজত্ব করবেন। মুক্তিযোদ্ধারা তা চান না। তাঁরা চান আলাদা স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়তে। সে দাবি আরব দেশগুলোও মেনে নিয়েছে। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি রাবাতে একুশটা আরব দেশকে নিয়ে যে শীর্ষ বৈঠক বসেছিল তাতে ঠিক হয়েছে প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আরাফাতই সে আন্দোলনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি— ও সমস্যার মোকাবিলা যাঁরাই করতে চাইবেন তাঁদের কথা কইতে হবে তাঁর সঙ্গেই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও তিনিই হবেন প্যালেস্টাইনের অভাগা বাসিন্দাদের মুখপাত্র। মিশর, মরোক্কো, সিরিয়া, সৌদি আরব, আলজেরিয়া কারুরই এতে আপত্তি নেই। উপায় না দেখে পথে এসেছে জর্ডনও।

সি পি আই এবার বিরোধী দল

রাজ্য বিধানসভায় সি পি আই এবার বিরোধী দল। বিধানসভার গতবারের অধিবেশনেও সি পি আই সদস্যরা কার্যত বিরোধী দলের ভূমিকাই নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দল নন। তাই, বিরোধী দলের যেসব অধিকার থাকে সি পি আই-এর তা ছিল না। এবার সি পি আই আনুষ্ঠানিকভাবেই বিরোধী দল। বিশ্বনাথ মুখার্জী আনুষ্ঠানিকভাবেই বিরোধী নেতা।

তাঁরা যে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দল এটা সি পি আই বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রথম দিনই একটা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, একটা মুলতুবী প্রস্তাব এনেছিলেন এবং একটা অধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবও এনেছিলেন। মুলতুবী প্রস্তাবটা সরকার পক্ষ মানতে রাজী হলেন না বলে সি পি আই একবার ওয়াক আউটও করলেন।

দু দিন বসেই বিধানসভা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ আছে। আবার যখন বিধানসভা বসবে তখন সি পি আই নেতৃত্ব আবার দেখাবার চেষ্টা করবেন যে, তাঁরা সত্যিকারের বিরোধী দল। সি পি আই এই সুযোগটা পুরোপুরি ব্যবহারে কোনও কসুর করবে না।

তারপর তো আছে বিশ্বনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বের প্রশ্ন। বিশ্বনাথবাবু সি পি আই-এর ভেতরে সেই গোষ্ঠীর লোক যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব রেখে চলাটা মোটেই পছন্দ করেন না। এই ব্যাপারে তাঁরা দলের জাতীয় নেতৃত্বের কৌশলের বিরোধী। বিশ্বনাথবাবুরা বামপন্থীই থাকতে চান। বামপন্থা যদি দলের ক্রিয়াকলাপে পুরোপুরি প্রতিফলিত না হয় তা হলে তাতে দলের ক্ষতি হবে বলেই বিশ্বনাথবাবুরা মনে করেন।

তাই, বিধানসভায় বিশ্বনাথবাবুদের ক্রিয়াকলাপে এই জিনিস ভালভাবে ফুটে উঠবেই। বিশ্বনাথবাবুরা বিধানসভার অধিবেশনে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেনই যে, তাঁরা সত্যিকারের বামপন্থী। বিশ্বনাথবাবুর নেতৃত্বে, গীতা মুখার্জীর সাহচর্যে এবং সোমনাথ লাহিড়ির পরামর্শে রাজ্য বিধানসভার এবারের অধিবেশনে সি পি আই বেশ কিছুটা জঙ্গী মনোভাব দেখাবেই।

*

কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি আই-এর পক্ষে রাজ্য বিধানসভায় নিভেজাল বিরোধী দলের ভূমিকা নেওয়া সম্ভব নয়।

এর প্রধান কারণ, রাজ্য রাজনীতির পটভূমি। সি পি আই আনুষ্ঠানিকভাবে এখন কোনও পক্ষের সঙ্গে না থাকলেও তাঁদের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে। তাঁরা একই সঙ্গে নির্বাচন লড়েছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে জিতেছিলেন। এবং সি পি আই দলগতভাবে রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসের চেয়ে সি পি আই (এম)-কে এখনও বড় শত্রু মনে করেন। এই অবস্থায় সি পি আই-এর পক্ষে পুরোপুরি বিরোধী দল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়—যে বিরোধী দল হতে পারে সি পি আই (এম) বিধানসভায় যোগ দিলে সেই বিরোধী দল এখনও সি পি আই কিছুতেই হতে পারেন না।

জাতীয় রাজনীতিতেও এখনও সি পি আই-ই একমাত্র কংগ্রেসের সহযোগী। জয়প্রকাশের আন্দোলন চলছে। তাঁর একমাত্র অ-কংগ্রেসী দল যেটা কংগ্রেসের সহযোগী আছে তা হল সি পি আই। সি পি আই-এর জাতীয় রাজনীতির ছাপ পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই-এর উপর মোটেই পড়বে না, তা হতে পারে না।

তৃতীয়ত, এখনও পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে যে, আগামী নির্বাচনে (তা ১৯৭৬-এই

হোক, আর ১৯৭৬-এই হোক) সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকবে। ফ্রন্ট হয়তো হবে না। তবে আসনের রফা নাকি হবেই। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া, যিনি সি পি আই নেতৃত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তিনি নাকি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন যে, আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা আসনের দশটি সি পি আইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিশ্বনাথবাবুরা এখন যতই বামপন্থী সাজুন, যদি নির্বাচনের মুখে গিয়ে বোঝেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতা না করলে বিধানসভায় আসাই যাবে না তা হলে সে সমঝোতায় তাঁদেরও আপত্তি হবে না।

এই সব কারণে সি পি আই আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দল হলেও নির্ভেজাল বিরোধী পারটি হওয়া তাঁদের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়।

*

সিদ্ধার্থবাবু অবশ্য সি পি আই পুরোপুরি বিরোধী দল হওয়ায় অত্যন্ত খুশী। তাঁর সন্তুষ্টির প্রধান কারণ তাঁর এই আশা যে, অতঃপর কংগ্রেস এম এল এ-রা সভার ভেতরে সি পি আইকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। ফলে, সভার ভেতরে আর নিজেরা তেমন ঝগড়াঝাটি করবেন না এবং সরকারের বিরুদ্ধেও তেমন আক্রমণ চালাবেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই আশা কিছুটা সফল হলেও হতে পারে। তবে, খুব বেশী হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথম কারণ, কংগ্রেসীদের ঝগড়াটা এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে, অন্য কিছু দৃষ্টি ঘোরাতেই পারে না। বহু কংগ্রেসী নিজের দলের প্রতিপক্ষের চেয়ে সি পি আই-এর লোকজনকে বড় বন্ধু মনে করেন। ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিতে এই জিনিস পরিষ্কার। বহু প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের এক গোষ্ঠী সি পি আই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসেরই আর এক পক্ষকে জব্দ করার চেষ্টা করছে। বিধানসভায় এখনই এই জিনিস হবে না। তবে, ধীরে ধীরে যে বিধানসভায়ও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, নেতিবাচক রাজনীতি কোনও দলকে বেশী দিন ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে না বা তার মঙ্গলও করতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী যেটা ভাবছেন সেটা নেতিবাচক রাজনীতির ভাবনা। অর্থাৎ, সি পি আই-এর বিরুদ্ধে গিয়ে কংগ্রেসীরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এই ধরনের ঐক্য বেশী দিন টিঁকতে পারে না। তা হলে সি পি আই (এম) আবার জাগছে দেখে অনেক আগেই কংগ্রেসীরা ঐক্যবদ্ধ হতেন।

৩-১১-৭৫

নবারুণ গুপ্ত

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

ডাক আর জমবে না

ডাক ও তার বিভাগ কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য যে-সব প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই বিষয়ে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ডাক ও তার বিভাগের কর্তৃপক্ষ যে-সব বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন, অন্যান্য রাজ্যও এই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

"ডাক এত জমে যায় কেন," ডাক ও তার বিভাগের মুখপাত্র বললেন, "পাবলিক তা জানে না। অথচ সবাই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে। অদ্ভুত দেশ আমাদের মশাই। বলুন তো কেন জমে যায়?"

"এ আর শক্ত কথা কী? ঠিকমত ডেলিভারি হয় না বলে?"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঠিকমত ডেলিভারি হয় না কেন?"

"আপনিই বলুন না।"

"অসল কারণ আপনি।"

"আমি!"

"আহা, শুধু কি আপনি একা? আপনি, আমি, পাবলিক, আমরা সবাই।"

"সে কী মশাই, এতো উল্টো চাপ। আমরা কী চিঠি বিলি করি, না পোস্টাফিসে নিয়মমাফিক কাজ করি?"

"না তা করব কেন? আমরা খেয়াল খুশি মত আবোল তাবোল যাতা লিখে ডাকের বাক্স বোঝাই করে দিয়ে আসি। কোয়ালিটির কথা একবারও ভেবে দেখি না। এখন 'তারা শালারা সেই ভেজপাতার স্তূপ বয়ে মর! রাবিশ! পাবলিকের এই শেলফিশ ব্যবহারের জন্যই তো চিঠির পাহাড় জমে যাচ্ছে মশাই।"

"একে আপনি শেলফিশ ব্যবহার বলছেন!"

"একশোবার বলব। পাবলিক শুধু সেলফিশই নয়, অলসও। হ্যাঁ তাও বলছি। অরিজিন্যাল কিছু লিখছেন আর না রচনাশৈলীর একটা নতুনত্ব কিছু আছে, নতুন সমাস, নতুন ... কথা ছিল। কিন্তু আজকাল সব কী চিঠিই লেখা হচ্ছে! ... ম্যান পড়া সংখ্যার গল্প উপন্যাস। যেমন ভাব, তেমন ভাষা, তেমনি আবার হস্তাক্ষর। বানানের কথা ছেড়েই দিলাম। ছ্যা ছ্যা! আমাদের সর্টাররা আজকাল এমন কি লাভ-লেটারগুলোও খুলে দেখতে চায় না। ... ক্রাইসিস কতদূর গড়িয়েছে বুঝে দেখুন। পাঁজা করে 'অমনোনীত'-ঝুড়িতে ফেলে রেখে দেয়। তাই চিঠি জমে পাহাড় হয়ে উঠছে। এইসব রাবিশ ডেলিভারি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তাই।"

"অমনোনীত-ঝুড়িতে ফেলে দেয়! না পড়েই! বলেন কী!"

"একেবারে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি মশাই। নিখিল ভারত মেল সর্টারস ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটা সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রেমপত্রের মান শোচনীয়ভাবে ক্রমশ যে নেমে যাচ্ছে, এই বিষয়ে ঐ সমীক্ষার প্রতিবেদনে পাঁচ ছয় বছর আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল। ওঁরা প্রেস কনফারেন্সও ডেকেছিলেন জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কেউই কর্ণপাত করেন নি। রিপোর্টাররা পর্যন্ত আসেননি। এখন ডাক বিভাগকে দোষ দিয়ে হবে কী? চিঠি লেখার সময় মনে থাকে না!"

সর্টারস ফেডারেশনের মুখপাত্রও একথা সমর্থন করলেন। বললেন, "আমরা স্যার আমাদের সমীক্ষার ফাইনডিংস, পরিসংখ্যান এমন কি চিঠির নমুনা পর্যন্ত লোকসভার সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমরা আমাদের জাতীয় কনভেনশনে সর্বসম্মতি গৃহীত প্রস্তাবের নকলও পাঠিয়েছিলাম। তাতেও কারোর টনক নড়াতে পারিনি।"

মেল সর্টারদের জাতীয় কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয় অংশ পাঠক-পাঠিকার জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"বিগত দশ বৎসর যাবৎ ভারতের তপশীলভুক্ত ও তপশীল বহির্ভূত যাবতীয় ভাষায় লিখিত বৈধ ও অবৈধ সকল প্রকার প্রেমপত্র পড়িয়া মেল সর্টারগণ গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। গভীর পরিতাপের সহিত তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন যে, বর্তমান ভারতে প্রেম-পত্রের মান ক্রমাগত নামিয়া যাইতেছে। অবস্থা বর্তমানে এতই শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে যে প্রায় একখানা চিঠিও পড়িবার মত পাওয়া যাইতেছে না। শুধু শুধু সর্টারগণের হয়রানিই সার হইতেছে এবং সর্টারগণ প্রতারিত বোধ করিতেছেন। এই বিষয়ে বারংবার উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও ফল পাওয়া যায় নাই। সর্টারগণও মানুষ। তাহাদের কৌতূহলও মানুষেরই স্বাভাবিক কৌতূহল। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় এইভাবে নষ্ট হইয়া গেলে তাহাদের কর্মে যোগ (ইনসেনটিভ) স্বভাবতই কমিয়া যাইবে এবং তাহাদের দক্ষতা (এফিশিয়েনসি) ক্রমান্বয়ে কমিয়া গিয়া ডাক সর্টিং-এ সমস্যা সৃষ্টি হইবে। অতএব আমাদের দাবী, পাঁচ শতাংশ এমন চিঠি ডাকে ফেলা হউক যাহা পাঠ করা মাত্র সর্টারগণ হারানো ইনসেনটিভ ফিরিয়া পাইবেন।"

"কী স্যার, কিছু অন্যায় দাবী করেছি?"

"ফাইভ পারসেন্ট অবরগে চিঠির দাবী, এমন কিছু অন্যায় বলে আমার তো মনে হচ্ছে না।"

"তাহলে বুঝুন," ডাক ও তার বিভাগের মুখপাত্র বললেন, "সমস্যার মূলটি কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে।"

"তা এই সমস্যার সমাধানকল্পে আপনারা কী স্টেপ নিয়েছেন?"

"যা ভাবা হয়েছে তা এই। লাভ-লেটারের কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি দুইই বাড়াবার জন্য জাতীয় স্পেশাল একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে। এই প্রোগ্রামের তিনটে দিক আছে। যথা: (এক) মাস স্কেলে প্রোপাগ্যানডা। এ বিষয়ে আমরা টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করব। প্রেমপত্রের বেস্ট মডেল বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার করব। (দুই) জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা আহ্বান করব। অরিজিনাল প্রেমপত্র রচনার এই প্রতি-যোগিতা নিশ্চয়ই উৎসাহের সঞ্চার করবে। এবং (তিন) ডাক বিভাগ থেকে এক বিশেষ ডিজাইনের অন্তর্দেশীয় পত্র ছাড়া হবে যাতে তরুণ ও তরুণীদের মনে এক বিশেষ ধরনের ভাব সঞ্চার হয়।"

"প্রকল্পটা ভালই। ভাল ফল দেবে বলেই মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে কি মশাই! আমরা এর মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে যে-কটা মেঘদূত বাজারে ছেড়েছি ... এইট্টি পারসেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে।"

"মেঘদূত! কালিদাসের?"

"না মশাই। এ মেঘদূত পড়ার বই নয়। আমাদের ডাক বিভাগের সেই বিশেষ ধরনের অন্তর্দেশীয় পত্র। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মনে মেঘদূতের ডিজাইন দেখে এমনই অনুকূল ভাবের সঞ্চার হয়েছে যে তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্বোধনী পত্রটি লিখতে রাজি হয়ে গেছেন। এ কলকাতার ক্রেডিট, বুঝলেন স্যার।"

দেখো, ফুল কিনছে ফুলকুমারী

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুলবারান্দার নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছি বহুক্ষণ
ছেঁড়া কাঁথায় ভিখিরী কুকুর পাগল ঠেলাঠেসি
জুতো ভিজে যায় নোংরা জলে
গোড়ালি ছেয়ে আমার নিয়েছেন শনি আমার শরীরে. শুধু বুকে
বিঁধে আছে অলৌকিক আবির রাঙানো এক স্বপ্ন
বিশাল গাড়ের মঠ পকেটে হাসছে অট্টহাসি, চুপচাপ
দাঁড়িয়ে রয়েছি ফুলবারান্দার নীচে
পেটে-খিদে-মুখে-লাজ সভ্যতার ঐ মুখে লাথি মেরে;
কচ্ছপের মাংস রাঁধে
কাঙাল যুবতী স্তন খোলা
তাকে দেখে উবু চুলকোয় জুতোপালিশওয়ালা
সাট্টার হিসেব লেখে বেশ্যার দালাল
আমি ত্রিভুবনমুরারী দাঁড়িয়ে রয়েছি দিবাস্বপ্নে মশগুল
বৃষ্টি হচ্ছে ঝমাঝম, দেখো কার জন্য ওইদিকে
দেখা যাচ্ছে আবছায়া
ফুলকুমারী কিনছে ফুল তার ভ্রূক্ষেপবিহীন চোখে ঝরে যায়
ময়লামাখা পৃথিবী নোংরা জানে যার
ঝলমলে মুখ জুড়ে ঝলসায় দেবদূতী হাসি।

পুনরুত্থান

রজত মিশ্র

ভালোবাসা ভুলে গেছি বলে আমাকে দুরন্ত পাপ দাও
একবার নষ্ট হয়ে যাই যেন পাপে
একবার ব্যবধান কেড়ে যেন পৌঁছে যাই
তোমার ঘৃণার কাছে।

অন্তত একবার যেন বেঁচে যাই॥

সমকালীন কবির প্রতি কীর্তনিয়া

জিয়া হায়দার

কাহ্নগীত কেমনে বলো কীর্তনিয়া গায়
বলো হে কবি, মান্যবর বিজ্ঞজন তুমি।

মথুরাপুরী অন্ধকার, কেননা কালীদহ
ক্ষুদ্র বড়ো বিষকুটিল কালসর্পে ভরা.
যোজন দূরে কংসরাজ সিংহাসনে বসে
হিংস্র ঠোঁটে হাসে এবং বাজায় করতালি;

বশংবদ নীচ আত্মা ওরা কয়েকজন
মথুরা নামে নগরটির প্রতাপশালী প্রজা
স্তোকবাক্যে চরিত্রটি দিয়ে বিসর্জন
লেডের স্বাদে কংসরাজে মেনেছে ঈশ্বর:
এবং তারা, মথুরাবাসী দাওয়ায় বসে সুখে
হুঁকোয় দিয়ে বিলাসী টান ভাগ্যটারে দোষে—
যোজন দূরে সপরিষদ-প্রীত কংসরাজ
হিংস্র ঠোঁটে হাসে এবং বাজায় করতালি,
নিজেই যেন কালসর্পজাতের সম্রাট।

কালীদহের জলে যে আর ঢেউ ওঠে না, কবি,
কালসর্প ভীড় করেছে পদ্মছাওয়া ঘাটে—
কাহ্ন নিজে হারালো দিশা, বাঁশিতে তার বিষ
ছড়ালো কোন গুপ্তচর কংসরাজদূত—
কাহ্ন হায় হারালো তার বংশী অবশেষে।

প্রেমাবতার কাহ্ন হায় ভুলেছে প্রেমগীতি;
কদম্বেরই পত্রপুটে ভ্রমরাদংশন
আনে না আর প্রেমের জ্বালা ফুলের পল্লবে,
এবং রাধা উন্মাদিনী বধিরা নিশ্চল।

নিঃসহায় এ-দরিদ্র কীর্তনিয়া, বলো,
কেমনে গায় কাহ্নগীত মথুরাপুরী দ্যাখো
অন্ধকারে নিমজ্জিত, এবং কালীদহে
বিষকুটিল লক্ষ কালনাগের সমারোহ॥

মেহেদি পাতার জন্যে

কবিরুল ইসলাম

একটি সন্ধ্যা তুমি নষ্ট করেছিলে
মেহেদি পাতার জন্যে:
এ তোমার ভ্রম। সেই ভ্রমের ভিতরে
কোনো ঘরবাড়ি ছিলো না।

যদি তো তোমারই তার কোনো
বিকল্প হয় না যেহেতু
এ নয় ভদ্রলোকের চুক্তি
যোগসাজসের খেলা—
কিংবা খেলাও নয় কেননা খেলারও
আছে নিয়মশৃঙ্খলা।

এ তোমার ভ্রান্তিবিলাস
প্রত্যেক ঝোপে কি বাঘ থাকে?
এ তোমার নির্জলা ভ্রম
সেই ভ্রমের ভিতরে ঘরবাড়ি দূরের কথা
কোনো প্রতিবিম্বও ছিল না।

তুমি তো একাই একশো হয়ে আছো॥

ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল

বৃহন্ন

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক তথা জাতীয় পরিস্থিতি যৎপরোনাস্তি বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। বিভ্রান্তি শুধু আমার নয়, এ ধাঁধা তোমার আমার। অনেকে অপাঠ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী খুলেছেন ব্যাখ্যা বা সমাধানের সন্ধানে, মহাভারত বাইবেল থেকে মার্কস আর মাও ত্সে তুঙ্ পর্যন্ত। আমার দৌড় দেখা গেল শুধু সুকুমার রায়ের মসজিদ পর্যন্ত। আমি আবার খুলে বললাম "হ য ব র ল"। বিশ্বব্যাপ্ত বিভ্রান্তির এমন প্রাঞ্জল বর্ণনা আমার অজানা।

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে নায়ক-নায়িকা মুম্বইয়ের মতোই সংখ্যাতীত। নামকরণে সম্ভাব্য বিপত্তি আছে। তার চেয়ে ভালো সুকুমার রায়। "চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন হল তো?" আজকের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভার এহেন সঠিক বর্ণন বিরল। কেন্দ্র সম্বন্ধেও মন্তব্যটি অবান্তর না হতে পারে। "ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল"। অমুকের কলম আর তমুকের সোচ্চার চিন্তা থেকে জ্ঞান আহরণ করি বিস্তর সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্বন্ধে কিন্তু সম্যক উপলব্ধি পাই ১৯২৩ সালে লিখিত সুকুমার রায়ের পরিচ্ছন্ন প্রলাপে। দলাদলি না থাকলে রাজনীতির, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাজনীতির, অর্থই হয় না। অর্ধশতাব্দী পূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ভাষ্যকার অসুস্থ সুকুমার রায় লিখে গেছেন ঃ

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দীভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

নেখাদ ননসেনস বই কি? কিন্তু বর্তমান বর্ধমান নৈরাজ্যের এমন বিশদ বিবরণ তো চোখে পড়ে না। নাম করব না। কিন্তু হলদে-সবুজদের কে চিনতে পারবে না, যদিও লালবাজার আজ ওকে লাল বলে আর কাল বলে কালো। পার্থক্য অবুঝৎ। চিৎপটাং [illegible] সবাই কিন্তু এই ধর্মতলাতায় থেকে বৃহত্তর আওয়াজ যেন আসছে দুস্তর গর্জন আর জালিম প্রান্তর থেকে কাঁদও বিহার ও উত্তর প্রদেশে তার প্রতিধ্বনি শ্রবণাতীত নয়। "গন্ধ গোকুল হিজিবিজি" পঙক্তিটিতে যে ব্যাখ্যা নিয়ে আছে তা দেখিয়ে দেবার দায় আমার নয়। "ভেরি বিজি" ব্যক্তিটির সন্ধান কলকাতায় অধিকরণে না মিললেও নয়াদিল্লিতে নিশ্চয়ই মিলবে। নন্দীভৃঙ্গী আর কানা মামা তো বিচরিছে সর্বত্র—প্রায় চীনেবাদাম ও সর্দিকাশিরই মতো। ব্লটিং পেপারের নতুন নাম আয়কর ভবন, কখনো শুনি চাবন। এই তো আবার শুরু হলো কথার পাগলামি। কিন্তু ব্যাপ্ত বিভ্রমের শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদন "ধর্মতলা কর্মখালি।" এখন নাম নাকি লেনিন সরণী। সেথা যাক কেরানী।

*

এ-হেন বিশৃঙ্খলা কদাচ দেখেছি। সমাজের সমস্ত স্তরে একটা লক্ষ্যহীন অরাজকতার মৃদু বন্যা আমাকে আজ আতঙ্কিত করে। গত অর্ধশতাব্দীতে যা কিছু স্থির বলে জেনেছিলাম তার সবটাই যেন আসন্ন অপমৃত্যুর সম্মুখীন। কর্তৃত্ব অন্ধ, বধির বা উদাসীন হলে উপেক্ষিত হবেই, উৎক্ষিপ্তও বা প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে; কিন্তু তাই বলে দায়িত্ববোধ কেন বিদায় নেবে ব্যক্তি আর সামাজিক সমষ্টিগত সচেতনতা থেকে? সরকারী অক্ষমতা আর অপরাধের পরিমাপ করতে দূরবীনের দরকার নেই নিশ্চয়ই; দুইই সর্বদা ও সর্বত্র প্রত্যক্ষ। কিন্তু একটা পুলিসপুষ্ট সরকার নিয়েই তো গোটা সমাজ নয়। তার একটা নিজস্ব সত্তা থাকে। যা সরকার-স্বাধীন। এমন সমাজেই কতার ইচ্ছায় অকর্ম হয় না। এই সত্তাটির সন্ধানই প্রতিদিন দুরূহ থেকে দুরূহতর হয়ে উঠছে। ডায়োজিনিস নাকি আলো নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন একজন সৎ লোকের সন্ধানে। খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা জানিনে। আমার চোখে তো আজ সারা সমাজটাই নিরুদ্দেশ। আছে শুধু নড়বড়ে এক সরকার যার মোল্লার জোর মসজিদেও ক্ষীণ।

সামান্য সাতাশ বছর আগেও সরকারে আমাদের স্বর ছিল নিস্তব্ধ। আজ আমরা আরো অগ্রন্থের আমাদের নিজেদেরই তথাকথিত নেতাদের কাছে। কারণ একমাত্র এই নয় যে, রুমাল সহসা মার্জারে বা নরখাদক ব্যাঘ্রে পরিণত হয়েছে। কারণ সমাজের সর্বস্তরে গুরুতর অস্বাস্থ্য। পুরো কাঠামোটাই যেন ভগ্নপ্রায়। ছেলে বাবার কথা শুনবে না। প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্যে কলা দেখাবে মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীদের কেউ কেউ গান্ধির না হটিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হটাতে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রীর পহেলা দুশমন নাকি সি আই এ। আই এফ এ বা আই ও এ নয় কেন?

*

রুমাল বেড়াল হয় এমন সমাজেই যেখানে বেড়াল নেই, আছে শুধু শেয়াল। এই শৃগালজাতীয় জন্তু শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকশ্রেণীতে নেই, অর্থাৎ আমলাতন্ত্র (মন্ত্রিমণ্ডল তো বিবেচনার অযোগ্য), আছে সমাজের সবস্তরে। আমাদের চলছে যা জনৈক গ্রীক দার্শনিক অভিহিত করেছেন অনালোচিত অস্তিত্ব বলে। এমন মূল্য অস্তিত্ব নাকি ত্রিভুবনে নেই।

অথচ আলোচনার তো অন্ত নেই। কাগজ খুললেই সরকারের সমালোচনা। সরকারের অপ্রশংসা করবার মতো যথেষ্ট খুঢ় ভাষা বাঙলায় নেই, হিন্দীতে তো থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সরকারকে তিরস্কার করলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হবে এমন সম্ভাবনা আদৌ প্রবল নয়। তার চেয়ে বেশী চাই আত্মসমালোচনা। এই বস্তুটি আজ তেল নুন লকড়ির চাইতেও বেশী দুর্লভ হয়ে উঠেছে, অংশত আমরা তেল নুন লকড়ি পাচ্ছি না এইজন্য যে, ঘাটতি ঘটেছে আত্মসমালোচনায়। রুমাল বেড়াল হোক। তাকে ঢিল ছোড়ো, মারো। জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ তাঁর প্রতিবেদনে অন্তর্নিহিত ক্লীবতা। সরকার সুন্দর বা সুন্দরী নামে ব্যাঘ্র বা ব্যাঘ্রিনী কিনা তাই নিয়েও আমার শিরঃপীড়া স্থিতমত। আমাকে ভীত করে সামাজিক সুপ্তি। সহস্র অভাবের মধ্যেও সামাজিক তৃপ্তি। মহাধিকরণে নিদ্রা অব্যাহত। শহীদ মিনারে নেই জাগৃতি। এই দ্বিবিধ মোহ থেকে আমাদের মুক্তি হবে কবে? কবে?

তুমি কি বেসেছ ভালো / চিত্ররথ দত্ত

পার্ক স্ট্রীটের জলুসভরা অতি সুবিন্যস্ত রেস্তোরাঁগুলোতে আড্ডা ছিল ওদের। সুন্দর উজ্জ্বল-রঙ জামা, নিখুঁত ছাঁটের প্যাণ্ট আর পকেটে পকেটে শৌখিন সিগারেট। নরম ফিকে আলোয় কার্পেট বিছানো মেঝেতে আধুনিক পপ-সংগীতের তালে পায়ে পায়ে তাল রাখতে রাখতে কফিতে চুমুক, এইভাবে কলেজের প্রথম বছরগুলোয় এক একটা দিন এক ধরনের উদ্দেশ্যহীন উল্লাসের তৃপ্তিতে দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হলো, হঠাৎ কোনো অদৃশ্য প্রভাবে রঙ বদলাতে আরম্ভ করল একটু একটু করে। চার দেওয়ালের সেই শীতল ও সাজানো গণ্ডির জগৎ থেকে বাইরে শক্ত মাটির ঝাঁঝাঁ বাস্তবে ফিরতে আরম্ভ করল সবাই। প্রায় অজান্তে, কেমন একটা নিরুদ্দ ভয়াবহ প্রশান্তি নিয়ে। কেউ কাউকে সঠিক কোনো প্রশ্ন করল না, জানতে চাইল না ঠিক কোথায় এর উৎস, শুধু সকলে সকলের চোখে নিজের ছায়া দেখল। এই পালা বদল যেন পূর্ব আকাশে সূর্যের মতোই সত্য এবং অবধারিত। স্বচ্ছন্দ গতির জীবন থেকে নির্জীব মানুষের শ্বাসবন্ধ হওয়া ভাঙাচোরা পথে সরে এল ওরা। চোখের চাওয়ায় ফুটে উঠল প্রতিহিংসার একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্রমশ অদৃশ্য যোগসূত্র রেখে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।—মুক্তি চাই, মুক্তি। ইতিহাস সাক্ষী, রক্তের শোষণকে রক্ত দিয়েই রুখতে হয়; বিনা রক্তপাতে বিপ্লব মূর্খের প্রলাপোক্তি, সোনার পাথরবাটি। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখনই, সত্তরের দশক হোক মুক্তির দশক।—হাতের আড়ালে আশ্রয় পেল ধারালো ছুরি।

টুবলু মেরিন কলেজের ছাত্রাবাস থেকে মাঝে মাঝে আসত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। দেখত, কোথায় যেন পটপরিবর্তন হয়েছে, যেখানে কিছুতেই মিলতে পারছে না আগের মতো করে। এই বিচ্ছিন্ন দূরত্বে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের দেখতে দেখতে একদিন মনে হলো, ওর ঐ হস্টেলের জীবন যেন পাথরের তলায় চাপা পড়ে থাকা বিবর্ণ ঘাস; এক ধরনের সুরক্ষিত, কিন্তু বড় বেশি রক্তশূন্য ও অভিজ্ঞতা বিহীন। পৃথিবীর কোনো খবর, কোনো ইশারা সেখানে পৌঁছতে পারে না।

বাবা ছিলেন বিদেশী কোম্পানির অতি সুউচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বিরল, ভারতীয়দের একজন। নিতান্ত অল্প বয়সেই সাফল্যের প্রান্ত শিখরে উঠে হঠাৎ মারা গেলেন ক্যানসারে। ছোট ছোট দুটি মাত্র ছেলেকে অতি ধীরে, যত্নে মানুষ করে তোলায় মন দিলেন মা। মামারা মস্ত লোক, কেউ সফল ব্যারিস্টার, কেউ কৃতবিদ্য ডাক্তার অথবা বিরাট চাকুরে, এঁগিয়ে এসেছিলেন একটুও দেরি না করে। কিন্তু বোন স্বনির্ভরশীলা, ভাইদের ওপর কোনো বোঝাই অর্পণ করলেন না। সামান্য কিছু ব্যাঙ্কের সঞ্চয় আর জীবনবীমা ও কোম্পানির কৃতজ্ঞতার পুরস্কার মিলিয়ে, কিছুটা হিসেব করে হলেও মোটামুটি ভালোভাবেই ছেলেদের মানুষ করতে লাগলেন। তারপর অনেক দিন, প্রায় একটা যুগ পেরিয়ে এসে বড় ছেলে অঞ্জন যখন বিদেশ থেকে বিশেষ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে বাবার কোম্পানিতে যোগ দিল আর টুবলু পড়তে গেল কলেজে, মেরিন ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্যে, তখন মা, বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বহুকাল পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

কিন্তু জীবনটা তুরল কোনো পদার্থ নয় যে, যে কোনো পাত্রেই তাকে সহজ হিসেবে ঢেলে নেওয়া যাবে। ক্রমশ নিজেকে নিয়ে নিশ্চিন্ত এক যুগ-বিচ্ছিন্ন হীনমন্যতার গ্লানিতে অনবরত পীড়িত হতে লাগল টুবলু। আস্তে আস্তে প্রস্তুত করল নিজেকে, তারপর একদিন শেষবারের মতো

...কলেজের হস্টেল থেকে বেরিয়ে এসে ...দের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল।

...হাত ধরে বিল্লি বলল, "আমার ভয় করছে, কিছু যদি হয়?"

টুবলু হাসল, "কিছু তো হবেই হবে অবিচার, অত্যাচার থেকে। জীবনের মূল্যবোধ খ‍ুঁজছে, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বস্তু, অন্যায়, সোনা, কিছু না হয়ে আর কতদিন চলবে।—সবাই গা বাঁচাচ্ছে, আরামের নিরাপদ আশ্রয় পালটাবার সময় এসে যাইর অপেক্ষা করছে দেখতে পাচ্ছ না?—তুমি ভয় পেও না, বিপ্লবে ভয়ের স্থান নেই, দ্বিধা নেই—নির্মম হতে হবে, নিরপেক্ষ হতে হবে; কেউ ভাই নয়, বন্ধু নয়, বাবা নয়, মা নয়, সবাই শোষক অথবা শোষিত মানুষ। —দেয়ার ইজ নো আদর, অলটারনেটিভ বাট টু ফাইট দ ডেডলিয়েস্ট দোজ সোসাল ভাইরাসেস। ওরা খুব শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত; আপাত সৎ ও পরিচ্ছন্ন মানবিক আবেদনের প্রলেপে ঢাকা বলে চিনতে অসুবিধে হয়।"

খুব দ্রুত ওলটপালট হতে লাগল ঘটনার গতি। কোথাও আর কোনো আড়াল নেই; সাবধানী মন্থর কৌশলগুলো উপযোগিতা হারাচ্ছে বলে চার পাশ থেকে তাদের খসিয়ে দিতে হচ্ছে ভাবনা না করে। এখন আক্রমণের লক্ষ্য পরস্পর দুই পক্ষ একেবারে সম্মুখ সমরে। বছর না ঘুরতেই টুবলু দখল বন্ধুদের কেউ মৃত, কেউ নিখোঁজ কেউ জেলের অন্ধকারে। একদিন গভীর রাতে এ-বাড়িও ঘেরাও করল পুলিস, নির্বিকারহীনভাবে শিস দিতে দিতে জাল আঁটা কালো গাড়িতে উঠে চলে গেল টুবলু। মা নিঃশব্দে কাঁদলেন। ইংরিজি অনার্স ক্লাসের ফাঁকে য়ুনিভার্সিটি ক্যানটিনে একা বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অলক্ষে বিল্লির চোখ জ্বলে উঠল। ছেড়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পীড়িত একান্ত সরল স্নেহময় বাবা-মা বিষণ্ণ ও চিন্তিত হলেন, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না স্রোতের গুরুত্ব। ঠিক যেমন, কিছু না বুঝেই টুবলুর গ্রেপ্তারের সময় মন খারাপ করে কেঁদেছিলেন বিল্লির মা, আর বাবা বিচলিত হয়েও সাবাস জানিয়ে বলেছিলেন, "এই বয়সে ছেলেমেয়েরা তো অমন একটু আধটু ছাত্র-আন্দোলন করবেই, এই তো আদর্শবান হওয়ার সময়, তেমনি ভাবলেন দু দিন বাদে টুবলু ফিরে এলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, মন বসবে পড়াশুনোয়। শুধু বড় বোন রূপা বুঝল, অথবা অনেক উপলব্ধি করল বিল্লির কাছাকাছি থেকে, চোখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে সমর্থ ও সহযোগ কেন্দ্রীভূত করল জীবনের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো ছোট বোনের অস্থির এই নিঃসঙ্গতার জট ছাড়াবার জন্যে।

কিন্তু যে তীব্রতম মন্ত্রে একবার আগুন ধরে তাকে সহজে আর রোধ করা যায় না। বিল্লির সাজগোজের সুবিন্যস্ত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে চেহারায় ফুটে উঠল এক ধরনের অযত্ন-লাঞ্ছিত মালিন্য; গালের দু পাশ দিয়ে ঝুলে পড়া টানা কাঁধ অবধি চুল রুক্ষতার আভাস, কিন্তু চোখে চারপাশের তুচ্ছতা ছাড়ানো এক সুদূরপ্রসারী তীক্ষ্ণতা। মনে হতো একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় একটু একটু করে পুঞ্জীভূত হচ্ছে সেখানে। রাস্তা চলার সময় পদক্ষেপ দ্রুত ও মনোযোগী। বিক্ষিপ্তভাবে কলকাতার পথে-ঘাটে চকিতে কখনো হয়তো নিঃসঙ্গ ও অন্যমনস্ক বিল্লিকে দেখা যায়।

দেখতে দেখতে সব কিছু ছাপিয়ে কলকাতায় পুজোর উৎসব আছড়ে পড়ল। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম বিল্লির অসহ্য মনে হলো এই স্থূলতা। উৎসবের চটুল

গাঢ় রঙে এই সর্বস্বত্বী সমাজটাকে আড়াল করার কী সর্বস্ব হ্রস্ব কর চেষ্টা। অনেকটা নষ্ট-যৌবন কামাসক্ত নারীর রূপচর্চার মতো। বিশৃঙ্খল ভিড়ে বন্ধ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলো-কমলালো সজ্জিত দামামামন্ত্র এক মিছিল দেখতে দেখতে হতাশায় নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে বিল্লি ক্রমশ পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে গেল; ভাবল এতো দবীর(!) বিসর্জন নয়, এই জাতটার বিসর্জন। রাস্তা বন্ধ করে উল্লাস, অসভ্যতা, চোখ রাঙানো—কী ভয়ঙ্কর এই সংস্কৃতি। পুঁজিপতি ধনতান্ত্রিক সমাজ যুগ যুগ ধরে সুপরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের শিরায় ইনজেক্ট করেছে এই সব-ভোলানো কড়া আফিং। —বড় বড় লোক সব চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তা আড়াল করে ঘুরে ঘুরে দেখছে। —এত কী দেখার আছে ওটায়, কী দেখার আছে! এই শহরের মানুষগুলোর দেখা যেন আর শেষ হয় না। রাস্তা দিয়ে একা মেয়ে গেলে দেখে, নব-দম্পতি ঘনিষ্ঠ হলে দেখে, কেউ ভালো জামা পরলে দেখে, ভালো গাড়ি যেতে দেখলে দেখে, সেই গাড়ির চাকায় কাউকে পিষ্ট হতে দেখলেও দেখে, কেউ বিকলাঙ্গ হলে দেখে, কেউ না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরলেও দেখে। শুধু দেখে আর দেখে, এদের দেখা যেন আর শেষ হয় না!

ছ' মাস বাদে পুলিসের ওপর মহলে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে এল টুবলু। চার পাশে তাকিয়ে দেখল বড্ড একা, মতামতের দ্বন্দ্বে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দল। ছোট হচ্ছে, কিন্তু নিজেদের আরো বেশি শক্তিশালী মনে করছে সবাই। অবাঞ্ছিত এলিমেন্ট সরিয়ে দিয়ে আরো বেশি শোধিত ও সমর্পিত-প্রাণ সঠিক পথের অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছে বলে নিজেদের মনে করছে প্রত্যেকে। বিল্লির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে, ওর মনের আশ্রয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে কয়েক দিনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠল টুবলু। তারপর একদিন দুজনে বিয়ে করে নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল কোথায় কোন বস্তির খোলা ঘরে। আর তারপরেই অজ্ঞাত জগৎ বা আন্ডারগ্রাউন্ডে গা ঢাকা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে গেল। যদিও জানত মুচলেকার বিনিময়ে মুক্তি নিয়ে আবার এতে সক্রিয় হওয়ার পরিণতি মৃত্যু; দেখতে পেলেই সরাসরি বা ধরে নিয়ে গিয়ে অন্তরালে গুলি।

রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ হয়তো মুখোমুখি হতো আত্মসুখে সুখী পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। তারা ভীত চোখে অন্যমনস্কের ভান করে সরে যেতে চাইত। আর যারা ছিল সমপথের যাত্রী, আজ বিরুদ্ধশক্তির ভয়াবহ ক্ষমতার মুখোমুখি হয়ে সরে এসেছে নিরাপদ দূরত্বে, আন্তরিক আশঙ্কায় বলত, 'এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কে কোথায় দেখতে পেয়ে যাবে।'

টুবলু হাসত। একটু দাঁড়িয়ে হাত বাড়াত, 'একটা সিগারেট খাওয়া তো।' দু-একটা টান দিতে দিতে চুলের গোছা কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা যেন অসংলগ্নভাবে বলত, 'নাথিং গোজ ইন ভেন, দিন আসবেই অ্যান্ড আই'ল শো য়ু'...তারপর নিঃশব্দে হারিয়ে যেতে ভিড়ের মধ্যে।

দিন বয়েই যেতে লাগল একই রকম অলস গতিতে। চার পাশে শুধু মানুষের গড্ডলিকাপ্রবাহ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। দেওয়ালে দেওয়ালে জনগণের প্রতি মুক্তির আহ্বান, বিপ্লবের ডাক আর স্টেনসিল করা নেতাদের ছবি রোদ-বৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। প্রত্যহের খবর শুধু গুপ্ত-হত্যা সংঘর্ষে মৃত্যু আর বিচারহীন আটক।—দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে নিখোঁজের তালিকা। সবাই যেন শুধু ব্যক্তি-গত আক্রোশের বলি; নীতিটাকে সুবিধেজনক আড়াল হিসেবে ব্যব-হার করে আপন আপন স্বার্থ মেটাতে নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে সবাই। এদিকে জেল-খানাগুলো ভরে উঠছে ছেলেমেয়েদের ভিড়ে।—মোটামুটি হিসের পাওয়া যাচ্ছে বিশ হাজার। এর মধ্যে কে কোথায় আছে বা আদৌ আছে কিনা কে খুঁজে দেখে? এরা কি অন্ধকারেই চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে? কেউ ভাববে না এদের কথা, কেউ এগিয়ে আসবে না? সমাজটা এত স্থবির, এত পচনশীল! অস্থির টুবলু ঘুরে বেড়াতে লাগল পথে পথে, কখনো একা, কখনো পাশে বিল্লি।

টুবলুর এই আপাত বিচ্ছিন্ন উদাসীন ভঙ্গিটাকে কাছ থেকে অনেক দেখতে আরম্ভ করল অন্যভাবে। ভাবল টুবলুর মধ্যেও এক ধরনের ক্লান্তি এসেছে, আর যেন এই উত্তেজনা ভালো লাগছে না; বোধ হয় এবার সরে যাবে টুবলু। এমন কথাও কেউ কেউ বলল, মূলত বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেছে বলে রক্তে কোথাও তার একটা প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। বিশুদ্ধ মার্কসীয় ভাবধারায় প্রকৃত বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ

[illegible] হয়তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। [illegible] কেউ কেউ অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে [illegible] যে, টুবলু মার্কস ও এঙ্গেলস [illegible]ভাবে পড়ে ফেলেছে, সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্ব "সন্দর্ভ" মাও-এর বাণীও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে ও বুঝেছে, যার [illegible] স্বরূপ টুবলুর ভূমিকা বস্তুযানে একেবারেই থিওরিটিশিয়ানের, ওর পক্ষে আর কোনো অ্যাকশন সম্ভব নয়। তা না হলে টুবলুই সব চেয়ে ভালো নেতৃত্ব দিতে পারত। কারণ, মৃত্যু ও কষ্টকে টুবলু কখনো ভয় করে নি। দুঃখ ও মৃত্যুকে যারা ভয় পায় তাদের পক্ষে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব নয়—'বিপ্লব ডিনার পার্টি নয়, লাইদার হার্ডশিপ নয় ডেথ।' তা হলে পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর কবল থেকে সর্বহারার মুক্তি হবে না কোনো দিন। দুঃখ, কষ্ট, ভয় তাদের জন্যে যারা ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়।

দলের কোনো কম চাঞ্চল্য নেই। সঙ্গীরা সব আন্ডারগ্রাউন্ডে চুপচাপ। খবর আসছে জেলের ভেতর থেকে ছেলেরা বেরিয়ে আসার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে অস্থির হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু। বিনা বিচারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মরার আগে একবার শেষ লড়াই করে দেখতে চায় সবাই।

এরই মাঝে এখানে-ওখানে ছোট বড় কতকগুলো সংঘর্ষ ঘটে গেল বিভিন্ন জেলে। কেউ মরল গুলিতে, কেউ পালাল, আবার কেউ আহত অবস্থায় বন্দী হলো আরো কড়াভাবে। কাগজে লেখালেখি চলল কিছুদিন, বিবৃতি, পালটা বিবৃতি, তদন্ত, তারপর যথারীতি সব চুপচাপ। টুবলু মনে মনে বলল, এভাবে, এভাবেই হবে।—মুক্তির পথ অতি দুর্গম কিন্তু একেবারে অনতিক্রম্য নয়।

অনেক পথ ঘুরে, হঠাৎ একদিন ছোট্ট একটা খবর পৌঁছল। আগামী অমুক তারিখ সুপরিকল্পিতভাবে গোলমাল বাধানো হবে ওখানে, উত্তেজিত করা হবে, প্রত্যেক কথা হবে উচ্ছৃঙ্খল হবার জন্যে, তারপর যারা এখনো অবিচল আছে আদর্শে, প্রলোভন ও ভীতির কাছে নিজেকে বলি না দিয়ে বুক চিতিয়ে আছে, তাদের সরিয়ে ফেলা হবে খুব সহজ হিসেবে। সেই সব ছেলেমেয়েদের [illegible]নেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের পরিবর্তিত বা [illegible]ই করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাঁচার [illegible] উপায়, জেল ভেঙে পালাবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করা। সর্বশেষ লিখেছে "আমরা আশা করব, দলগত আদর্শ ও সংহতির কথা মনে রেখে তোমরা ঐ দিন ঐ সময়ে আমাদের সাহায্যে উপস্থিত থাকবে"!

অন্ধকার [illegible], গোল হয়ে বসে সকলের কান্নায় মুখের ওপর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নয়ন [illegible] খুলল টুবলু। তারপর বিদ্রির কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমরা তাহলে যাচ্ছি।"

"এই চোদ্দজনই?" দ্বিধান্বিত প্রশ্ন করল একজন।

টুবলুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, "আমরা সাহায্যের জন্যে চেষ্টা করব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কাউকে না পাওয়া গেলে চোদ্দজনই। অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হও।"

দলের সমস্ত বিচ্ছিন্ন অংশের প্রতি আবেদন পাঠাল ওরা, কিন্তু লাভ হ'লো না। কেউ নীতির প্রশ্ন তুলল, এই জাতীয় অ্যাকশনের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা খুঁজল কেউ, আর কেউ মানতে পারল না সময় নির্বাচনের যথোপযুক্ততাকে। জানালো, আর একটু পরে ভালো করে পরিস্থিতি যাচাই ক'রে তারপরেই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সবকিছু নস্যাৎ করল টুবলু। ওর মধ্যে মুক্তির চাপা উত্তেজনা যেন দামামা বাজাচ্ছিল!—আর দেরি নয়। এই বছরটাকে আর শেষ হতে দেওয়া যায় না। এমনিতেই বড় দেরি হয়ে গেছে, বিদায়ের আগে বছরটাকে শেষ সম্মান দিতে হবে। কিছুই দিতে পারিনি, কিন্তু বোঝাতে হবে, জানাতে হবে সব কিছু থেমে যায়নি, জীবন এখনো শেষ হয়নি। ওদের মুক্তির পথ আগে হোক তারপর তত্ত্ব ও নীতির সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে আর একবার নাড়াচাড়া করা যাবে।

নতুন বছরের প্রাক্কালে, নিউ ইয়ার্স ঈভের সারারাত্রিব্যাপী বিলাসবহুল উল্লাসের জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছে সবাই; চালাচালি হচ্ছে প্রীতি ও শুভেচ্ছাপূর্ণ কাগজখন্ড, আদানপ্রদান কেক-মুরগি-মদের ভেট, ছবি-ঘরের সামনে উন্দাম হচ্ছে ভিড়, ঠিক তখন দুপুর বেলা ভিজিটিং আওয়ার্সের কিছুক্ষণ আগে চোদ্দজন এসে জেল চত্বরের বিশাল মূল প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড়াল। প্রায় অলক্ষে কারো কৌতূহল না জাগিয়ে সকলের সঙ্গে মিশে।

রাস্তার ধারে এই ফটকটার বিধিনিষেধ নেই বললেই চলে। নিয়ম মাফিক দুজন রাইফেলধারী কর্তব্যরত অবস্থায় অলস অবসর যাপন করছে। কড়াকড়ি তেমন না থাকলেও এটা বন্ধই এবং প্রায় কল্পলোকের কোনো মহাশক্তির দৈত্যকে আটক রাখার উপযুক্ত। কিন্তু তার একটি অংশ একজন প্রমাণ সাইজের মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াতের উপযোগী করে কাটা এবং উক্ত গরাদের পাল্লাটি সর্বদাই হাট হয়ে আছে। এই দানবিক লোহ ফটকের দু-পাশ থেকে লাল ইঁটের নিরেট প্রাচীর ভেতরমুখী অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকে একটি কেন্দ্রে মিলিত হয়েছে। সেখানে, প্রথমটির অনুরূপ সুদৃঢ় কিন্তু আকারে কিছু ছোট অপর আর একটি গরাদ-যুক্ত গেট, অতি শক্ত করে আঁটা, সব মিলিয়ে, প্রথম ফটক [illegible] না দিলেই মস্ত বড় অর্ধবৃত্তাকার [illegible] জায়গায় পড়তে হয়। এই [illegible] প্রাকারের তোরণদ্বয়ের [illegible] বলে আলোবাতাসের চলাচল প্রয়োজনের তুলনায় কম, সেখানে কিছুটা [illegible]কারী ঠান্ডা অনুভূতি ও কিছুটা পুরোনো গন্ধ জড়াজড়ি করে আছে। একটু ওপাশে, অনতিদূরে দর্শনপ্রার্থীদের যাওয়া আসার জন্যে দৃষ্টি চলাচল করতে পারে না এমন একটি স্বাভাবিক মাপের নিরেট দরজা। বিষণ্ণ প্রতীক্ষায় হতাশাচ্ছন্ন কিছু পুরুষ ও মহিলা—হাতে সযত্নে ধরা ফল, মিষ্টি, শীতল পানীয়। আরো এক ধাপ এগিয়ে, বাইরে থেকে ভেতরে তাঁদের সঙ্গে মিশে পরস্পরের থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াল সবাই। উদাসীনতার আড়ালে সতর্ক চোখ নজর রাখছে পারিপার্শ্বিকের ওপরে, কিন্তু মন কেন্দ্রীভূত ঐ আবদ্ধ ছোট্ট দরজাটায়। প্রবেশ ও নির্গমনের জন্যে ওটাই মুক্ত করা হবে এবং সেই মুহূর্তে প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ পথে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করবে বন্দীরা। অবশ্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি শুরু হবে আরো আগে, একেবারে ভেতর থেকে, তারপর সময়ের অঙ্কের সঙ্গে তাল রেখে খুব দ্রুত এই পর্যায়ে টেনে আনতে হবে ব্যাপারটাকে। আর ঠিক তখনই দরকার হবে আড়াল বা কভারেজ, যার মধ্যে দিয়ে বাধাহীন বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারবে সবাই। অর্থাৎ বাধাদানকারী সেপাইদের প্রচন্ড আঘাতে ছুটিয়ে দিয়ে ওদের মুক্তির পথ আগে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

বুকের মধ্যে পাথরের নিস্তব্ধতা, কিন্তু শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত অনবরত শুধু যেন দুটো হাত ও পায়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। টাইম বোমার কাঁটার মতো টিকটিক করে ঘড়িগুলো অসহ্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে খুব দ্রুত এগোচ্ছে একটা বিস্ফোরণের দিকে। কৌশলে কাছাকাছি দু-একজনকে আভাস দিয়ে সরে যেতে বলল ওরা। আশ্চর্য, একটুও সচকিত না হয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত সহযোগীর মতো সন্তানদের মুক্তি-কামী কিছু পিতামাতা বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ ওপাশ থেকে একটা গোলমাল দ্রুত কাছে এগিয়ে এল। চকিতে সজাগ হয়ে স্নায়ুতন্ত্র টান রেখে শিকারী বন-বেড়ালের মতো দরজার আশেপাশে ঝুঁকে দাঁড়াল চোদ্দজন। অস্থির কয়েকটি দীর্ঘতম মুহূর্ত।—খুলছে না কেন দরজাটা! কিন্তু এটা নয়, সোজা অঙ্কের হিসেব গরমিল ঘটিয়ে ওপাশে, প্রায় পেছনে ফেলে রাখা মূল গরাদের ফটকটাই হঠাৎ খুলে গেছে। একজন অসুস্থ বন্দীকে বাইরে আনা হচ্ছিল। সেখানে ছাপিয়ে উঠল ধস্তাধস্তি, এলোমেলো ভয়ংকর চাঞ্চল্য।—টুবলু পেছনে

-রে চিৎকার করল, "অ্যাম্বুলেন্স!"

পড়িমরি করে ছুটল সবাই। অকস্মাৎ এ মুহূর্তে, যা ছিল বোঝাবুঝির এক্তিয়ারে, তা হাতছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও বড় ভাইটাল, অনস্বীকার্য মূল্যবান।—দু-চারজন ক্ষীণতনু সদ্য তরুণ যুবক, কর্মীর জোড়া-কাটা পোশাক, বিধ্বস্ত প্রথম ধাক্কায় গেটের সীমানা পেরিয়ে এল। কিন্তু তার আগেই এপাশে দাঁড়ানো সেপাইদের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেছে। ভেতরেও বেজে উঠেছে পাগলা-ঘণ্টি। অদূরে গেটের ওপারে প্রধান লবির মুখে হাতাহাতি হচ্ছে। এপাশে একটি মেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের ক'রে বোমা ছুঁড়ে দিল রক্ষীদের ওপর, কিন্তু ফাটল না সেটা। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল অনেকগুলো ছুরি। ততক্ষণে চারপাশ থেকে ছেয়ে ফেলছে অসংখ্য সেপাই—বেওনেট শোভিত রাইফেল আক্রমণের নিখুঁত ভঙ্গিতে সামনের দিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে ধরা। সমবেত বুটের আঘাতে ভেতরের বিশাল তৃণহীন চত্বর ধুলোয় আচ্ছন্ন। কর্কশ একটা স্বর অনেক উঁচুতে জেগে উঠল, "ফায়ার!" কিছু আর্তনাদ মিশে গেল রাইফেলের কট্‌কট্‌ আওয়াজের সঙ্গে। হাতের কাছে যে যা পেল টেনে নিল; বেঁধে গেল গেরিলা কায়দায় প্রবল হাতাহাতি সংঘর্ষ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কাউকেই প্রায় চেনা যাচ্ছে না—অনেকটা বহু-চরিত্র বিশিষ্ট নড়ে যাওয়া কোনো চলচ্চিত্রের অংশের মতো। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে প্রধান ফটকটা বন্ধ হয়ে গেছে। টুবলুদের সঙ্গে ভেতরের ছেলেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলার জন্যে মুক্ত অংশের গরাদের গেটটাও বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা চলছে। টুবলু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চাবির অধিকারী জাঁদরেল লোক-টির ওপর। হঠাৎ পাশে প্রবল আর্তনাদে ফিরে তাকিয়ে দেখল বিজনের বুকে সরাসরি একটা বেওনেট আমূল ঢুকে গেছে। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিসেবে ছিটকে বেরিয়ে এল দুজন মেয়ে, হিমানী আর বিল্লি, বুকের ভেতর থেকে নিমেষে পিস্তল বের ক'রে গুলি চালাল। কিন্তু সেটুকু অন্য-মনস্কতার সুযোগে আহত অবস্থাতেই এক ঝটকায় টুবলুর বাঁধন ছাড়িয়ে সরে গেল লোকটি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি এসে লাগল টুবলুর ঊরুতে। দেখতে দেখতে এই ফটকটাও বন্ধ ক'রে ফেলতে সক্ষম হ'লো রক্ষীরা। টুবলু-দের দল ছাড়া মুষ্টিমেয় আর যে কটি ছেলে গেটের এপারে আসতে পেরেছিল এবং তাদের মধ্য এখনো যারা পুরোপুরি মাটিতে শুয়ে পড়েনি, তাদের অবস্থা হ'লো ফাঁদে পড়া হিংস্র জন্তুর মতো। পড়ে গিয়ে টুবলু চিৎকার করে বলল, "বিল্লি সাবধান!" কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশ থেকে বিল্লিকে ঝকঝকে ধারালো বেওনেটে গেঁথে দিল এইজন্য। মুখোমুখি থেকে পড়ল বিল্লি, হাত থেকে ছিটকে গেল পিস্তলটা; [illegible] ওঠা [illegible] মনে কোথায় মাথা-খাশি হয়ে গিয়েছে। ভারি হয়ে উঠল শাড়ির বাঁধন। টুবলু দু-হাতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়াল। মাটিতে বন্ধুদের ক্ষতগুলো দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দেওয়ালের পাশে মৃত্যু-ভয়ে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত দর্শনপ্রার্থীরা। এদের মধ্যে থেকেই আহত দু-একজন কোনো অলৌকিক উপায়ে বিশাল উঁচু গেটের ওপরে প্রাচীরের ফোকর দিয়ে ওপাশে খোলা আকাশের নিচে টপকে গেল।

ওদিকে দু-তিনটে জোয়ান সেপাই হিমানীকে পিছমোড়া করে বিশ্রী ভাবে ধরে শূন্যে তুলে নিয়েছে। টুবলু তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকাল. ছুরিটা? ছুরিটা কোথায়? কিন্তু কুড়িয়ে নেবার আগেই আর একটা গুলি কাঁধে এসে লেগে ঘুরিয়ে ফেলে দিল। টুবলু কোনো রকমে বলল "বিল্লি পালাও, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।" আধখানা উঠতে না উঠতে ভারি বুটের একটা লাথি সরাসরি পড়ল মুখের ওপর।—আবার আর একটা। অনেকে ঘিরে ধরেছে। কে যেন চিৎকার ক'রে বলল, "বিপ্লব? বিপ্লব মারাতে এসেছিস? —মার শালা শুয়োরের বাচ্চাকে।" আত্মরক্ষার জন্যে হাতটা তোলার চেষ্টা করল টুবলু, কিন্তু একজন বেওনেট দিয়ে হাতের পাতাটা গেঁথে দিল মাটির সঙ্গে। তারপর চুলের মুঠি ধরে সবাই মিলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল একদিক থেকে আর একদিকে। কপালের পাশ আর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মুখটাকে চটচটে ও নোনতা করে তুলেছে। ঠোঁটটা একবার চাটবার চেষ্টা করল টুবলু। বিল্লি মাটি ছেড়ে অসুন্দর এক ভঙ্গিতে কচ্ছপের মতো মন্থরতায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে আর্ত আওয়াজ তুলে বলল, "দাঁড়াও, একে মেরো না, মেরো না, ও কোনো দোষ করেনি—ওকে আমার অনেক কথা বলার আছে, থামো।" সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে টুবলু চোখের কোণায় দেখল, একটি লোকের হাতে [illegible] [illegible] [illegible] ছিনিয়ে নেয়ে এসে [illegible] বিল্লির মাথাটা ফাটিয়ে দিল। [illegible] একার কাছে টুবলু চিৎকার করতে [illegible], "খবরদার। আমি এর বদলা নেব।" [illegible] সঙ্গে ধাঁকানি দিয়ে উঁচু করে [illegible] ফেলল ওকে সবাই, তারপর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল ওর পেটে। অবশেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে ফেলে রেখে সরে গেল। টুবলু বুঝতে পারল ভেতর থেকে একটা তরল উষ্ণ স্রোত গলার নালি বেয়ে উঠে এসে মুখের দুপাশ দিয়ে উপচে পড়ছে। —কিন্তু কোনো ব্যথা নেই কেন! সব. শান্ত, কোথাও কোনো আওয়াজ নেই—গুলির শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। বিশাল গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের রঙ ঝাপসা। দিন কি শেষ হয়ে এল? খুব হালকা লাগছে শরীরটা! —তবে কি গুলি লাগেনি? কেউ পেটে মারেনি বন্দুক দিয়ে? শুধুই কল্পনা, অথবা এ সবই স্বপ্ন। কিন্তু ঐ যে ওখানে বিল্লি শুয়ে আছে। বিল্লি, সোনা, তোমাকে ওরা ব্যথা দিয়েছে? ভয় পেও না. আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমাকে কিছু করতে পারবে না। দাঁড়াও. আমি আসছি। ওঠো। —কষ্ট হচ্ছে উঠতে? আমি যাচ্ছি. তোমাকে উঠতে হবে না। আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাব। অনেক দূরে, যেখানে ওরা কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। ঐ যে. সেই বনের মধ্যে, ঝিলের ধারে, গাছের ছায়ায়—তোমার মনে আছে? —তোমাকে আমি নিয়ে যাব সেখানে—আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শুয়ো। —ভয় নেই, এই তো আমি এসে গেছি।.........মাগো, মা......কিছু ভেবো না ...এই তো বেশ ভালো হ'লো মা, টুবলুকে নিয়ে তোমার আর কোনো চিন্তা রইল না... মা.........বিল্লি.........।

দিন তখনো শেষ হয়নি, বাইরে উজ্জ্বল আকাশ, কিন্তু একটি উল্লাসমুখর রাত্রিকে পথ ক'রে দেবার জন্যে তখন ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়ছিল বছরের শেষ সূর্য।

জাপানের এদিক সেদিক

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

টোকিও ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার.পোর্ট থেকে শহর টোকিওতে চলে এলাম একখানা কালো, ঠাণ্ডা লিমুজিনে বসে। রাত সাড়ে দশটার টোকিও। সওয়া কোটি লোকের শহর। জাপানের রাজধানী।

সারাটা পাড়ায় শুধু নাইট ক্লাব আর হোটেল। কলকাতার চৌরংগীর মত টোকিওর চৌরঙ্গীর নাম গিঞ্জা। ভিড়ভাট্টার দিক থেকে তারপরেই এই নাইট ক্লাব আর হোটেল পাড়া। জায়গাটির নাম—আকাসাকা। নানা রঙের দেওয়াল। এসকালেটর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার দোকান। সবত্র ইলেকট্রিকের খেলা। হাত দিয়ে দরজা খুলতে হয় না। কাছে এগোলেই কাচের দরজা আপনা-আপনি খুলে যায়।

সকালে ব্যাংকক। দুপুরে বৃষ্টিভেজা হংকং। সন্ধ্যায় তাইপে। রাতের আলোর ভেতর টোকিও এয়ারপোর্ট। গতকালের দমদমের রাস্তা যেন গত জন্মের জিনিস।

হোটেলের ঘরে ঢুকে শিয়রে পেলাম টেলিভিশন। শুয়ে শুয়ে আন্দাজে নব ঘুরিয়ে একবার পেলাম শুয়োরের মাংসের বিজ্ঞাপন। আর একবার—সামুরাই থিয়েটারের মাথা-ন্যাড়া ধীরোদাও জাপানী নায়কের ছবি।

দিল্লি, ব্যাংকক, হংকং, টোকিও—পৃথিবীর সর্বত্র হোটেলের চরিত্র প্রায় একই রকম। ভারি কার্পেট। সিঁড়ির মুখে অয়েল পেণ্টিং। প্রতি ফ্লোরে আগুন লাগলে বেরোবার এমারজেন্সি একজিট ডোর। ক'দিনের ভেতর বুঝলাম—শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে জাপানীরা খুবই চিন্তিত।

হোটেলের ভেতরেই মশা মারার স্কোয়াড ঘুরে বেড়াচ্ছে। এয়ারকণ্ডিসনড করিডর কিংবা লিফ্ট থেকে বো বো আওয়াজ তুলে ওরা পোর্টেবল মোটর আর হোস পাইপ নিয়ে প্রায়ই উদয় হয় আচমকা। স্বস্তি পেলাম। টোকিওতেও তা হলে মশা আছে।

কাচের গ্লাস কাগজে মোড়া। তাতে লেখা—গ্লাসটি বীজাণুমুক্ত। এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ট্যাক্সিচালকের হাতেও সাদা গ্লাভস্। মাটির নিচে পর পর তিনটি সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন চলে। মাটির ওপরে একটি ট্রেন। আকাশে মনোরেল। মোট পাঁচটি ট্রেন। তিনটি উড়াল রাস্তা দিয়ে গাড়ির স্রোত। তা ছাড়া, মাটির ওপরে গাড়ি চলাচলের আরেকটি পথ। অর্থাৎ মোট নয়টি পথে যানবাহন। তার ভেতর আনুষ্ঠানিক কিমোনো পরে জাপানী মহিলা চলেছেন। তার ভেতরেও পায়ে সাদা মোজা। মোজার ওপরে দুই স্ট্রাপের স্যাণ্ডেল। আদৌ পা ফসকে স্যাণ্ডেল সরে যায় না। মোজা পা-কে বীজাণুমুক্ত রাখে। খাবার টেবিলেই মুখের কাছে বাঁ হাতের তালুর ছোট্ট আড়ালে জাপানীরা ডান হাতের খড়কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে। কারো বাড়িতে গেলে ঘরে ঢোকার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতো খুলতে হয়। বেরোবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতো পরার জন্যে এক হাত লম্বা শু-হর্ন। গরম পড়লে গৃহলক্ষ্মী অতিথিদের জন্যে ফ্রিজের ভেতর থেকে অডিকোলন মাখানো শীতল তোয়ালে বের করে আনেন। তাই দিয়ে অতিথিরা মুখ মুছে বেতের ট্রে-তে রেখে দেন। গম্ভীর আলোচনার ভেতর তোয়ালে দিয়ে মুখমার্জনার কাজটি সারতে হয়। শীত পড়লে এই তোয়ালেই গরম জলের ভেতর ডুবিয়ে নিংড়ে এনে অতিথিকে দেওয়া হয়। সবদা ফ্রেশ থাকার অব্যর্থ উপায়। মুখেও ময়লা জমল না।

ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর অবধি প্রায় ভাদ্র মাসের বাংলাদেশের আবহাওয়া। অবশ্য সবত্র নয়।

চারটি বড় বড় দ্বীপ নিয়ে জাপান। এ-মাথা থেকে ও-মাথা প্রায় ১৯০০ কিলো-মিটার। সারা গায়ে সমুদ্র আর পাহাড়। তার ভেতর আসো পাহাড়ে একটি জাগ্রত আগ্নেয়-গিরি দেখলাম। জায়গাটি কিউসিউ দ্বীপে। রোপওয়ে দিয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলাম।

নিক্কো ঘুরে দেখে ফেরার পথে

আগ্নেয়গিরি তখন ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে ছাই ছড়াচ্ছিল।

বড় বড় শহরে যেখানে যেটুকু জায়গা এখনো খালি পড়ে আছে—সেখানেই ধান লাগানো হয়েছে। হণ্ডা মোটর কারখানার গায়েই ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের পাশেই আধা ভগ্ন মোটর গাড়ির ভাগাড়। আলো পড়ে চকচক করছিল। আমাদের দেশে এসব গাড়ি তাপ্পি মেরে অনেকেই চালায়। ও দেশে একটা ১৪ ঘোড়ার ইনজিন মোটে ৮০ ডলার। বেবি ফ্রিজ ১১৫০ টাকা। এক জোড়া ভাল জুতো অবশ্য ১৬০০ টাকা। জুতোর চতুর্দিকে ফুল সাজানো। একটি ঝকঝকে টয়োটা গাড়ি ১৭৫০০ টাকা। ছোট হণ্ডা গাড়ি ৭৫০০ টাকা। ন্যাশনাল প্যানাসোনিক টেপ রেকর্ডার ২৯৬ টাকা। কিন্তু এক রাত শুতে ভাল হোটেল নেয় ২৫ ডলার।

জাপানে স্ট্যাটাস সিম্বল এখন তিনটি—'সি': Car, Cooler এবং Colour T. V.

চাষী বাড়িতেও একটি টয়োটা। কুলার বসানো দুটি ঘর। বৈঠকখানায় একটি কালার টি ভি। মেয়েরা স্কার্ট পরে। পুরুষেরা ট্রাউজার। বাড়ি থাকলে ট্রাউজারের ওপর ফতুয়া। ঘর পরিষ্কার হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে। জমি চষছে পাওয়ার টিলার। ভাত হচ্ছে রাইস-কুকারে। দাড়ি কামানো চলছে ইলেকট্রিক শেভারে। ধান তোলা হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্টারে। কফির ক্ষেতে বারিবিন্দু ছড়াচ্ছে একঘোড়ার অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার। দশতলা ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোরে খদ্দের উঠছে এসকালেটারে। পাতাল রেলের প্রতিটি কামরা এয়ার-কণ্ডিশনড। স্যাটেলাইটে খবর চালাচালি হয়। ইয়োমিউরি সিমবুন কাগজে ৫৬০০ লোক কাজ করেন। অফিসটিকে দেখলে ইস্পাত কারখানা মনে হবে। সম্পাদক আলাপেছে জেব, চা পরিবেশন করলেন। আলোচ্য বিষয় : চু এন লাইয়ের স্বাস্থ্য।

জাপানীরা সারাদিনই কিছু না কিছু পড়েন। ম্যাগাজিন, ছবিতে বীরত্বব্যঞ্জক যৌন কাহিনী, খবরের কাগজ, উপন্যাস। মাঝারি নভেলের বিক্রি এক লক্ষ কপি। খবরের কাগজের বিক্রি কোটির উপর। তবে জাপানী ভাষায়। ইংরেজি কাগজের সবচেয়ে বেশি সারকুলেশন—তিন লক্ষ। জাপান টাইমস। চল্লিশোর্ধ জাপানী ইংরাজি বিশেষ জানেন না। যুদ্ধোত্তর জাপানীকে স্কুলে অবশ্য-পাঠ্য ইংরাজি পড়তে হয়েছে।

টোকিওতে সব সময় রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। এই ভাঙছে। এই বানাচ্ছে। ১৯২১ সনের টাইফুন সমুদ্র থেকে উঠে এসে টোকিওর বারো আনা ভেঙে দিয়ে যায়। তারপর যুদ্ধের ডামাডোল। তাই টোকিও প্রায় নতুন। ২৫ লক্ষ মোটর গাড়ি। পাতালে ১৫০ কিলোমিটার ট্রেন লাইন।

পাতাল রেলে লম্বা পাড়ির পথ মাত্র ৪০ ইয়েন।

পেট্রোলের দামের ধাক্কাটা ওরা কিভাবে যেন সামলেছে। ভারতীয় টাকায় এক লিটার দু টাকা পঁচিশ পয়সা। ম্যানিলায় মোটে দেড় টাকা। আরবদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে দরটা কমিয়ে রেখেছে। চালের কিলো কিন্তু প্রায় দশ টাকা। শুয়োরের মাংসের কিলো চার টাকা। গরুর মাংসের কেজি আঠারো টাকা। একখানা সিনেমার টিকিট ১৬ টাকা। জুতো পালিশ করে কোরিয়ানরা। পাড়ায় কোরিয়ান ভাড়াটে এলে কিংবা স্কুলে কোরিয়ান ছেলে ভর্তি হলে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর শুরু হয়ে যায়। প্রায় ৭ লক্ষ কোরিয়ান থাকে জাপানে। এই কোরিয়রা জাপানীদের ভায়া চীন—বৌদ্ধধর্ম সাপ্লাই দিয়েছিল। আসো পর্বতের ওখানটায় একটি পর্বত শ্রেণীর মাথা দেখিয়ে একজন জাপানী পরমাণু বিজ্ঞানী বললেন, বুদ্ধ শুয়ে আছেন। সত্যি তাই। দেখলে মনে হবে আকাশজুড়ে বুদ্ধদেব ঘুম দিচ্ছেন।

ভোট হয় রবিবার। ভোট দেয় মেয়েরা। পুরুষরা সেদিন গলফ্ খেলতে যায়। সব চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে যেবার—সেবারে পড়েছিল ৩৭ পারসেন্ট মাত্র। সেই মেয়েদের অবস্থাই কিন্তু সবচেয়ে কাহিল।

তারা প্রায় পণ্য।

হোটেল, রেস্তোরা, লিফ্ট, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর এবং অফিসে তারা একই কাজে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পায়। উপরন্তু চাই মাপসই ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস। ওরা সব সময় ভদ্রতায় অবনত। তটস্থ। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে এবং বারবনিতাদের লাইনে নবাগম বন্ধ করতে টোকিওর এক মহিলা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে লড়াই করে আসছেন বলে এবারে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

তবু মেয়েরা টুরিস্ট গাইড। সেটা না হয় অগ্রগতির সাইন। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য নাইট ক্লাবে তারা যে কতভাবে পণ্য বিক্রির সহায়কের ভূমিকা নিচ্ছে তার ঠিক নেই।

৬০০০ ইয়েনে বেপু শহরের সিগনল হোটেলে নাইট ক্লাবে ঢুকেছিলাম। এক মাইলের ভেতর প্রশান্ত মহাসাগর। ৬০০০ ইয়েনের সঙ্গে এক বোতল আসাহি বিয়ার এবং একজন জাপানী তরুণী সঙ্গিনীর বাক পরিহাস ফ্রি।

স্টেজে নগ্ন নৃত্য। স্টেজের বাইরেই বাজনার তালে তালে দর্শকদের নৃত্য। একটি বড় কাগজের তরুণী রিপোর্টারের আহবানে তার কোমর জড়িয়ে নাচতে হল কিঞ্চিৎ। তিন হাতের ভেতর মঞ্চে বসন উন্মোচন চলছিল। লাল আলোতে জিংক অক্সাইড মাখানো নারীদেহ ঝলসাচ্ছিল। আমার আলিঙ্গনে জাপানী ভ্যারাইটির তরুণী। পরিবেশ এবং অধিক বিয়ারের গুণে আমি তাকে বললাম—তুমি এখন আকাশের তারা হয়ে কি করে আমার কাছে ধরা দিলে? মেয়েটি জবাবে বলল, ইণ্ডিয়ায় কি ক্যালকুলেটর মেশিন তৈরি হয়? আমি বুঝলাম, এতক্ষণ আমি একটি জ্যান্ত ক্যালকুলেটর জড়িয়ে নাচের চেষ্টা করছিলাম। বাজনা থামতেই টয়লেটে ছুটলাম। বমি হতে পারে ভাবছিলাম। তার বদলে প্রকৃতিকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশেই তখন সপ্তা তাড়িত একজন সুবেশ জাপানী প্রকৃতিকে মুক্তি দিচ্ছিল। অসতর্কতায় তার উরুদেশ, পকেট এবং জাঙ্গিয়ার কাছ থেকে ১০ হাজার ইয়েনের ২০।৩০ খানা নোট ভো-কাটা ঘুড়ির মত দুলে দুলে মেঝেতে পড়ল। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখনো মঞ্চের বাজনায় তালে তালে দুলে দুলে প্রকৃতি-মুক্ত হচ্ছিল। সে বেরিয়ে গেলে আমি ফাঁকা বেসিনে বমি করে বাজনার ভেতরে ফিরে এলাম। তখন মঞ্চে বসন উন্মোচন সম্পূর্ণ। দুজন মাঝবয়সী ওয়ার্কিং গার্ল সঙ্গী পায়নি বলে হাত ধরাধরি করে নিজেরা নাচছিল। আমি তাদের ভেতরে গিয়ে পড়লাম। ওরা আমাকে ভাগাভাগি করে নিয়ে আলাদা আলাদা করে নাচল। বুঝলাম উদ্বৃত্ত অর্থ নাইট ক্লাবে ঢালতে এসেছে দুজনে। ওরা আমার ভারতীয় নাকে দুটি সপ্রশংস চুমু দিল। আমি ওদের দুই গণ্ডে দু'টি করে দিলাম। এই আমার জাপানকে একমাত্র উপহার। আর ছিল কিছু চারমিনারের খালি প্যাকেট। সে সব গেছে ওয়েস্ট পেপারের ঝুড়িতে।

জাপানী মেয়েরা পরিশ্রমী। ভোটার। গৃহিণী। কিন্তু সচিব ও সখী নয় বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের বই তর্জমা করছেন জাপানী লেখক আজুমাসান। ভারত প্রেমিক। ভাত ও কই মাছের ঝোলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বোলপুরে থাকার সময়। তিনিও বললেন, ছোটবেলায় মাকে দেখেছি লটবহর পিঠে করে আগে আগে যেতেন। বাবা পিছনে। হাতে ছড়ি। মুখে পাইপ।

এত বড় একটা যান্ত্রিক দেশ—সেখানে দেখলাম ফুটফুটে মেয়েরা মুখে রুমাল বেঁধে বাগান পরিষ্কার করছে, কারপেট ঝাড়ছে। ওদের শ্রমের কি কোন মূল্য নেই! ওরা কি শুধুই বিনোদিনী? নয়ত ফ্রকপরা ঝি? কিংবা অর্ধেক বেতনের কেরানী? কিংবা সঙ্গিনী মাত্র?

তাহলে কি জাপানীরা অসভ্য?

তা বলা যায় না।

তাহলে কি জাপানীরা বুনো?

তা বলা যায় না।

তাহলে কি জাপানীরা অনুন্নত?

তা বলি কি করে!

তাহলে ওরা কি?

ওরা স্রেফ নির্ভেজাল জাপানী। চারিদিকে সমুদ্র। দেশের ভেতর পাহাড়, ধানক্ষেত এবং কারখানা।

এই হল গিয়ে জাপান।

'কাপড় যাতে কখনও কুঁচকে খাটো না হয়' তার জন্যে আরেকটি উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া।

যে কাপড়ের গায়ে অরবিসেট ছাপ দেখবেন সেকাপড় কোনদিন কুঁচকে খাটো হবে না। অরবিন্দ মিলস-এর কটন আর পলিয়েস্টার কটন কাপড়ের সুপ্রসিদ্ধ উৎকৃষ্টতার এটি হল আরেকটি গ্যারান্টি।

অরবিসেট প্রক্রিয়ায় এমন সব বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য কৌশল প্রয়োগ করা হয় যাতে কাপড় কুঁচকে যাবার কোন ভয়ই থাকে না। এই প্রক্রিয়া দুনিয়ার যে-কোন জায়গার আধুনিক সেরা প্রক্রিয়ার সমকক্ষ।

আপনি যখন বেছে বেছে পছন্দ ক'রে ভাল কাপড় কিনে ঠিক মাপের সেলাই করাতে চান তখন আপনি স্বাভাবিক কারণেই তোল আনা যাচিয়ে নিতে চান যে, সেকাপড় পরে 'কুঁচকে খাটো হবে না।

এইটাই হল অরবিন্দের অরবিসেটের বিশেষত্ব।

আপনি যাতে নিশ্চিত হতে পারেন তার জন্যে প্রতিটি মিটারে লাগানো আছে অরবিসেটের ছাপ। নিশ্চয় দেখে নেবেন।

অরবিসেট—অরবিন্দ কাপড় কখনও কুঁচকে খাটো হবে না তার গ্যারান্টি।

Interpub/AM/25/74 ben

যাও পাখি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ আটাশ ॥

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—ও মা! সে তো গাঁয়ের গ্যাংলা মেয়ে শুনেছি! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে!

কেমন নিরাসক্ত গলায় সোমেন বলে—ওইটুকু আবার কি। তোমার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—সে তখন জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি। কিন্তু আমাদের আমলে যা হত তা কি আজকাল হয়? তার ওপর বড়লোকের মেয়ে, আদুরে, এত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবে কেন শৈলী!

—সে তোমার শৈলীই জানে!

এই বলে সোমেন আবার সিগারেটের জন্য হাত বাড়ায়।

ননীবালা বলেন—এক্ষুণি তো খেলি! বুকটা শেষ করবি নাকি! ওসব বেশী খেলে কী যেন সব রোগ বালাই হয়, লোকে বলে।

—কিছু হবে না। এই বলে অস্থির হাতে আবার দেশলাই জ্বালে সোমেন।

আর তখনই ননীবালা ছেলের মধ্যে একটু গোলমালের গন্ধ পান। কী যেন হিসেবে মিলছে না।

সময়ের একটু ফাঁক রাখেন ননীবালা, তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে, শৈলীর মেয়ে দেখতে শুনতে কেমন?

—কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি, শৈলী দেখতে বেশ ছিল, একটু হাবা মতন ছিল অবিশ্যি। মেয়েটা কেমন?

—কালো।

—চোখমুখ?

—ভালই। আলগা চটক আছে।

—তোর সঙ্গে কথাটথা বলল না?

—বলবে না কেন? এ কি তোমাদের আমলের মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক নাকি?

ননীবালা বললেন—তা নয়। বলছিলাম, বড়লোকের মেয়ে বলে দেমাক নেই তো!

—থাকলেই বা, কে পরোয়া করে!

এটা উত্তর নয়। রাগ। ননীবালা বুঝলেন। একটু ছায়া মনের মধ্যে খেলা করে গেল। বুড়ো বয়সে সব মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তিনি কতবার শৈলীর পুতুলের সঙ্গে নিজের পুতুলের বিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি বুড়োবয়সে পুতুল খেলার ইচ্ছে হয়? ভাবতেই একটু শ্বাস বেরিয়ে যায় বুক থেকে। তাই কি হয়! শৈলীরা কত বড়লোক। জজের বাড়িতে জন্মেছে, বিয়েও হয়েছে আর এক মস্ত বড় ঘরে। সুখ ছাড়া আর কিছু কি ওরা জানে! ননীবালার ঘরে কী আছে! ঐ তো ছেলে, চেহারাটি কেমন রোগার মধ্যে তিরতিরে সুন্দর! বলতে নেই। থুঃ, থুঃ! অমন সুন্দর ছেলেটা তার, সারাদিন ছন্নছাড়ার মতো ঘোরে। কোন বাড়িতে বুঝি একটু পড়ায়। ব্যাস। এ ছাড়া কোন কাজ নেই। এই ছেলে কবে দাঁড়াবে, কবে তার বিয়ের কথা ভাববেন তা বুঝতে পারেন না তিনি। বড় রাগী আর অভিমানী ছেলে। শৈলীর মেয়ে ওকে আবার তেমন কিছু বলেনি তো!

ননীবালা হঠাৎ একটু আদুরে গলায় বলেন—ওরে ছেলে, আমাকে একবার শৈলীর বাড়ি নিয়ে যাবি? সে যে খুব দেখতে চেয়েছিল আমাকে!

—বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর যেও। এখন ঐ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে লাভ কি? কথাবার্তা বলতে পারবে না, সবাই ব্যস্ত।

—বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে?

সোমেন একটু ঝাঁঝ দিয়ে ওঠে—অত জানি না।

রাগ দেখে ননীবালা দমেন না, সুর খুব নরম করে বলেন—ধমকাস না বাবা। মরে যদি তোর ঘরে জন্মাই ফের, তবে তো শাসনের চোটে দম বের করে দিবি। মা হয়ে বকা খাচ্ছি, মেয়ে হয়ে তো খাবোই।

সোমেন হাসে হঠাৎ। বলে—মরতে বলেছে কে?

—বলতে হয় না, হঠাৎ কার কখন মেয়াদ শেষ হয়। [illegible] শৈলী [illegible]য়ের কথা কী বলল?

—বলছে আবার কী। বাবাকে যাবে তুলে দিচ্ছে। সেদিন [illegible] ছিল। গিয়েছিলাম। দেখি, বা[illegible] কিছু লোকজন। সবাই ব্যস্ত। শৈলীমাসির ঘরেও কয়েকজন বসে আছে। আমাকে দেখে খুব খাতির করে বসাল, অনেক [illegible] খাওয়াল। বলল—বাবলু, ঋ[illegible] বিয়ে [illegible] ফাল্গুনে, নয়তো বৈশাখে। তোমাকে বলা রইল কিন্তু।

—আর কিছু বলল না?

—হুঁ। ছেলে বিলেতে [illegible] মেম বিয়ে করেছে, আর আসবে না, [illegible] খুব দুঃখ করল। বলল—ছেলে তো আপন হল না, এখন দেখি জামাই যদি আপন হয়। ছেলে লিখেছে, 'ভারতবর্ষ' [illegible] ওখানে মানুষ থাকতে পারে [illegible] লণ্ডনে যাট হাজার পাউণ্ডে বাড়ি [illegible] 'গাড়িটাড়ি'ও তো কিনেছেই।

—ও আবার কেমন [illegible] ননীবালা দুঃখ পেয়ে বলেন।

মিটমিটে হেসে সো[illegible] বলে—আমি যেমন!

—তোর সঙ্গে কি[illegible]? ননীবালা অবাক হয়ে ব[illegible] আমার কোলপোঁছা ছেলে। [illegible] পড়লে কেমন মা-মা করিস!

—সে সবাই কর[illegible] সুযোগ পেলে কেটেও পড়ে। [illegible] তো বাসা ছাড়ার প্ল্যান করছি, [illegible] জানোই। একই ব্যাপার।

ননীবালা অবাক [illegible] কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে [illegible]! তুই আবার যাবি!

—যাবোই তো। সো[illegible]ন হাসি-মুখে বলে—শুধু যে বাসা ছাড়বো তা নয়, দেশও ছাড়তে পারি।

—তার মানে?

—আমার এক বন্ধু জার্মানীতে চাকরি করে। সে লিখেছে, আমাকে ওখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

—গিয়ে কি করবি?

সোমেন আদপেশে। হেসে বলে—চাকরি করব আর তোমাকে টাকা পাঠাবো।

—অমন টাকায় আমার দরকার নেই। ননীবালা বলেন—আগে শুনেছি লোকে পড়াশুনো করতে বিলেত টিলেত যায়। আজকাল দেখি সবাই যায় চাকরি করতে।

সোমেন চিত হয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে—তো এদেশে চাকরি না পেলে কী করবে?

ননীবালা বেশী কথা বলেন না। কেবল

গলায় একটা ক্ষীণ নিরুদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে বল্লেন—বেশ, যাবি তো যা না! বিদেশে গেলে ছেড়ে তো দিতেই হবে। যতদিন এদিকে আছিস ততদিন বাইরে কোথাও না থাকলেই হয়।

সোমেন উত্তর দিল না। সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবে।

ছেলেটাকে ভয় পান ননীবালা। দুই ছেলের মধ্যে, বলতে নেই, এই ছেলেটার প্রতিই ননীবালার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী। কোলের ছেলে, একটু বেশী বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খেয়েছে, সংসারে আছে একটু কম জোরে। দেওয়া-থোওয়া করতে পারে না তো। সংসারে দেওয়া-থোওয়া করতে না পারলে আদর হয় না। সেই জন্যই অসহায় ছেলেটার দিকে তাঁর টান বেশী। কিন্তু এ ছেলেটাই তাঁকে একদম পাত্তা দেয় না। ডাকখোঁজ করে বটে, কিন্তু দড়ি-আলগা ভাব। জাহাজ যেন জেটিতে ঠিকমতো বাঁধা নেই। জলের ঢেউয়ে নড়ে চড়ে দোল খায়। বুঝিবা যে কোনো সময়ে ভেসে চলে যাবে। ওর মনটা কি একটু শক্ত? মায়াদয়া একটু কি কম! চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ননীবালা ভাবেন। সংসারে কেউ তো কারো নয়। বুড়ো বয়সে এইসব টের পাওয়া যায়।

আজকাল চলে-যাওয়ার একটা বাতাস এসেছে দুনিয়ায়। হুট হাট শুনতে পান, তরতাজা ছেলেরা সব বিলেত বিদেশে চলে যাচ্ছে। ছেলেধরা যেমন খেলনা বা লজেঞ্চুস দেখিয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, এও তেমনি। গুণী ছেলেদের টেনে নেয় সাহেবরা। বড় জামাই অজিতের বন্ধু লক্ষণকেও টেনে নিয়েছে ঐ রকম। সে আর আসবে না। জমিটা তাই সস্তায় পাওয়া গেল। কিন্তু জমির কথা আর ভাবেন না ননীবালা। মাথার মধ্যে শৈলী, শৈলীর মেয়ে, বিলেত বিদেশ, সোমেন, সব জট পাকিয়ে যায়। আর মনে হয়, পৃথিবীটা মস্ত বড়, কূলহারা অথৈ, ছেলেবেলায় মনে হত যতদূর দেখা যাচ্ছে ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীটা সাত্যকারের। তার পরের পৃথিবীটা ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর রাজত্ব। বুড়ো বয়সে সেটাই আবার মনে হয়। চেনাজানার বাইরে পৃথিবীটা জীনপরী দৈত্য-দানোর হাতে। ঘরের ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।

ননীবালা শ্বাস ছাড়েন, থাক সবাই নিজেদের মনে সুখে থাক। যেখানে খুশী থাক।

—বাত্তি নেবাবো মা? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ। বলে ননীবালা শুয়ে পড়েন। শরীরটা আজ বড্ড খারাপ। রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। সকালে একবার ডাক্তারের কাছে যাবেন কাল।
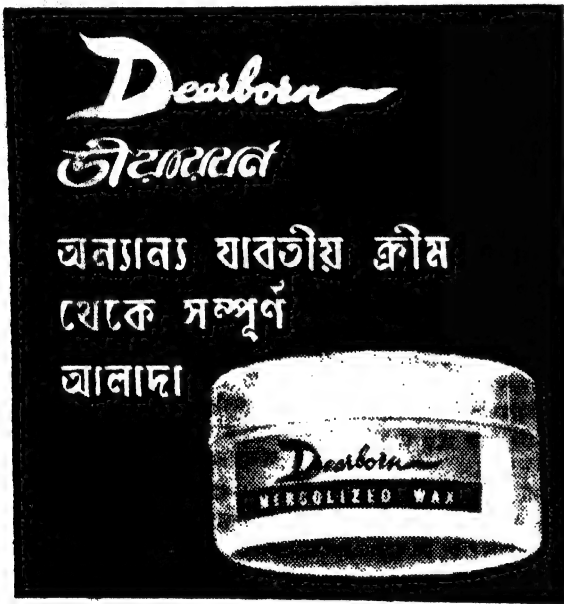
কলকাতার শৌখীন শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম টের পোওয়া যায়। খবরের কাগজে মহামারীর কথা লেখে। খুব ধুলো ওড় চারদিকে। এ শহরে কেন যে তেমন শীত পড়ে না ননীবালা বোঝেন না। মানুষ বেশী বলে সকলের গায়ের ভাপে শীত কমে যায় না কি! কিংবা সেই যে অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছিল, তাইতেই শীত পালিয়ে গেছে। কথাটা একদিন সোমেনকে বলেছিলেন, সোমেন ধমকেছিল। ছেলেটা বড্ড বকে তাঁকে। শীতের জন্য একরকম দুঃখ হয়। শ্বশুর-বাড়িতে সেই কোন ভোরে উঠে কাঠের জ্বালে রোগা ছেলের জন্য কালোজিরে চালের ভাত বসাতেন। চারধারে পৃথিবীটা কি হিম কি কনকনে ঠাণ্ডা! নাকে চোখে জল আসত, হাড়ের ভিতরে ব্যথিয়ে উঠত শীত। বাগানে কপির পরতে, পালংয়ের পাতায় কুয়াশা জমে থাকত। জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামত টিনের চাল থেকে। বাচ্চাদের গায়ে গরম জামাটামা জুটত না, খাটো খাটো মোটা সুতীর চাদর জড়িয়ে ঘাড়ের পিছনে গিঁট বেঁধে দেওয়া হত, দেখতে হত ছোটো ছোটো পা-ওলা পাশ বালিশের মতো, সারা উঠান দৌড়ে বেড়াত। রোদ যতক্ষণ না উঠত ততক্ষণ সিঁটিয়ে থাকত হাত পা, অঙুল অবশ হয়ে বেঁকে যেতে চাইত। গরম গরম হবে, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে শীত এই জেনে এসেছেন এতকাল। কিন্তু কলকাতার ধারা আলাদা। এখানে সারা বছরই কেমন একরকমের ভ্যাপসা গরমী ভাব।

নুষের গায়ের তাপ, কিংবা অ্যাটম্ বোমা
হু একটা কারণ আছেই। ছেলেরা বোঝে
। বহুকাল হয়ে গেল এ শহরে, তবু
ক আপন করতে পারলেন না জায়গাটাকে।
য়া জন্মাল না। কেবলই মনে হয়, আমার
শ আছে দূরে, এখানে প্রবাসে আছি।
থচ তা তো নয়। কলকাতাতেই সবচেয়ে
দামী সময়টা কাটল জীবনের, ভগবান
লে এখানেই বাড়িঘর হবে, এখানেই
গা পেয়ে যাবেন। তবু কেন যে এটাকে
জের জায়গা বলে ভাবতে পারেন না।

একদিন সকালে বড় জামাই এসে
জির। বলল—মা, আমাদের বাড়িতে
নুন।

বুকটা কেঁপে ওঠে, হাত-পা ঝিম ঝিম
র। কষ্টে ননীবালা বললেন—কেন বাবা,
। হয়েছে?

অজিত মুখটা গম্ভীর রেখেই বলে—
নুন নিজেই দেখবেন।

গলা আটকে আসে ননীবালার। শীলুর
ট লেগেছিল পেটে, কোনো অঘটন
নি তো! কষ্টে জিজ্ঞেস করেন—শীলুর
ছু হয়েছে?

জামাই লজ্জা পায়। চোখ নামিয়ে
স—আপনার একবার যাওয়া দরকার।
পনার মেয়ে আপনার জন্য অস্থির।

বীণা নন্দাইকে চা করে খাওয়ায়,
বার দেয়, দু একটা ঠাট্টার কথাও বলে।
দের কারো দুশ্চিন্তা নেই। কেবল ননী-
দারই হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে
সে। কতকাল ধরে সন্তানের জন্য
পেক্ষা করেছে ওরা। প্রায় বুড়ো বয়সেই
ত চলেছে সন্তান, যদি কিছু ঘটে তো
য়টা জামাইটা লজ্জা নেবে। সংসারের সুখ
ব যাবে।

ননীবালা কথা বাড়ান না। সোমেনের
টা কীটব্যাগে কাপড়চোপড় গোছাতে
কেন। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। কাউকে
ল যাওয়া হল না। জামাই তাড়া দিচ্ছে,
দোর কিছু সিজিল-মিছিল করে যাবেন
র উপায় নেই। ননীবালা বাড়ির বার
লই বীণা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাটকে
খে। কী এক শত্রুতা তৈরী হয়েছে
টার সঙ্গে! তার ওপর চেক ভাঙিয়ে
পা তুলতে যে কোনোদিন গোবিন্দপুরে
কে শনিঠাকুরটি অসবেন। আর এক শত্রু।
ন্তু শত্রু হোক আর যাই হোক, তার
টা মর্যাদা আছে। ননীবালা মানুষটাকে
ই মুখ কখুন, এ সংসারের আর কেউ
কে অমর্যাদা করলে ননীবালার বড়
গে। ননীবালা থাকবেন না, তখন যদি
সে তো ছেলের বউ হয়তো বসতেও
বে না, আদর আপ্যায়ন করবে না,
ড়ানোর ওপর বিদায় দেবে। সে লোকও
অভিমানী, একটু অনাদর দেখলে
জেকে সে জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়।

আর সোমেনের চিন্তা তো আছেই।
বাপের মতই স্বভাব, একটুতে রেগে যায়।
মুখ ফুটে কারো কাছে এক গ্লাস জল
পর্যন্ত চায় না। ননীবালার কাছেই যত
আবদার। বয়স্ক খোকা একটি।

এইসব দুশ্চিন্তা করেন ননীবালা, আর
ব্যাগ গুছিয়ে নেন। সংসারে শত দড়িদড়া
দিয়ে বাঁধা জীবন। কত মায়া, কত চিন্তা,
কত নিজেকে দরকারী মানুষ বলে ভাবা!
তবু তো সব ছেড়ে একদিন রওনা হতে
হয়! কিছু আটকে থাকে না। এসব বুড়ো
বয়সের চিন্তা। আঁচলটায় চোখ মুছে নেন
তিনি।

এই যে শীলু আর জামাই ছেলে-
ছেলে করে পাগল, তার তো কোনো মানে
নেই। হচ্ছে না, সে একরকম। কিন্তু হলেই
কি সুখ নাকি? মুখখানা দেখলেই মায়া
বসে গেল তো গেলই। আর একটা
জীবন ছাড়ান কাটান নেই। মুখ
দেখে সুখ যেমন, আবার জীবন-
ভর দুঃখও কম নাকি। পেটের শত্রুর
চেয়ে শত্রু নেই, লোকে বলে—সে মিছে কথা
নয়। বাপ-মা যত ভালবাসে ছেলেমেয়েকে
ছেলেমেয়ে কোনোকালে উল্টে ভালবাসে না
তত। নিজেকে দিয়েই জানেন। রণেন,
শীলু হওয়ার পর জগৎ সংসার যেন ওদের
মধ্যেই বাসা বাঁধল, ভালবাসা নিওড়ে নিল।
আবার এখন রণেনকে দেখেন, ছেলেপুলে
নিয়ে কত চিন্তা, কত ভালবাসা!

ননীবালা বীণাকে ডেকে বললেন—
যাই।

—আসুন। বলে বীণা প্রণাম করল।

বড় ভাল লাগল ননীবালার। পিঠে হাত
রেখে গভীর মনে আশীর্বাদ করলেন। এরা
ভালবাসা নিতে জানে না, জানলে, ননীবালা
যে কত ভালবাসতে পারেন তা দেখতে
পেত।

ক্রমশ

বঙ্গ
বজ্ঞান

ত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল অমূল্য সম্পদঃ ন্তু কতদিন থাকবে ?

স্বাধীনতার পূর্বেকার সাজত্যায়ামি থাক। ধীনতা পাওয়ার পর গত সাতাশ বছর যে ঝড় বয়ে গেছে—এবং এখনও বইছে, ও যেন তুলনা নেই। এ ঝড় দায়িত্বহীন উপেক্ষার। উপেক্ষা বনসম্পদকে লালন ং পালন করার দায়িত্বে। উপেক্ষা দায়িত্ব- ন অথচ স্বার্থ দেবয়ী কিছু মানুষের ব মানসিকতা বনজীবীদের চেয়েও কর। নিজেদের অর্থলোলুপতার দরুন বিপর্যয়কর অনিষ্টই ঘটুক না কেন, সে কখনও তারা ভাবে না। ভাবতে চায়ও আর এই সঙ্গে রয়েছে অজ্ঞ কিছু কিছু নীয় অধিবাসী। বন্য শ্বাপদের হাত ক আত্মরক্ষা অথবা শিকারের আশায় ন কোন জায়গায় তারা আগুন ধরিয়ে । পলকে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তৃত বন্যাঞ্চলে। তখন হাজার হাজার ৎ সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ অথবা নানা তর পশু মারা পড়ে। বড় বড় গাছপালা ক কত রকমের লতা-গুল্ম প্রভৃতি যে ল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, সে হিসেব কেউই ন না।

আর ওদিকে দুর্গম বনাঞ্চলের মধ্যে মাঝেই শোনা যায় খটাখট্— রাঘাতের শব্দ। বেপরোয়া গাছ-চোর। র নিয়ম কানুনের তারা কোন ধার ধারে বেআইনীভাবে এক এক জায়গায় তারা া করে। বড় বড় গাছ—শাল, পাইন— র হাজার গাছ। নিজেদের খেয়ালখুশি কেটে এ-সব গাছ চোরা পথে তারা র করে কখনও দার্জিলিং, কখনও পাইগুড়ি, অথবা সিকিমের পথে অনাত্র। র কয়েক লক্ষ টাকার মত জাতীয় সম্পদ চাবে আমরা হারাচ্ছি।

কারোর কারোর অভিযোগ : এই সব -চোরদের সঙ্গে বনসংরক্ষণ বিভাগের ন কোন কর্মীর যোগসাজস থাকে। বন- দের বক্তব্য, দুর্ধর্ষ ওই সব গাছ-চোর বেশি তৎপর এবং বেপরোয়া—সীমিত ক রক্ষী এবং প্রতিরোধ করার মত সরঞ্জামের অভাবে তাদের সঙ্গে লড়াই একরকম অসম্ভব ব্যাপার।

'এ সবের দরুন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে পরিমাণ অমূল্য সম্পদ রয়েছে তার মূল্য বড় কম নয়।' সম্প্রতি আমার কাছে এই মন্তব্য করেছেন বাকসার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রীঅমলভূষণ চৌধুরী।

চোরা শিকারীদের হাতে এ ধরনের চিতল হরিণ কত যে মারা পড়েছে কে জানে ? ফলে উত্তরবঙ্গের বন্যাঞ্চলের এই অমূল্য সম্পদ এখন অবলুপ্তির পথে

শ্রীচৌধুরী বললেন, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির প্রায় ৮০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলের ওপর শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী এবং আমি সম্প্রতি সমীক্ষা চালিয়েছিলাম। এই সমীক্ষা পরীক্ষা করার পর আমাদের মনে হয়েছে, উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের এই সীমিত পরিবেশে যত বিচিত্র গাছপালা এবং বিচিত্র প্রজাতির পশুপাখি চোখে পড়ে, পৃথিবীর অন্যত্র তেমন উদাহরণ বিরল বললে হয়ত বেশি বলা হবে না।

অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে অঞ্চলে যত বেশি রকমারি উদ্ভিদের সমাবেশ, সেখানে পশুপাখি, কীটপতঙ্গের মধ্যেও যেন হাজারো বৈচিত্র্য।

শ্রীচৌধুরী এবং শ্রীচক্রবর্তী দেখেছেন, ভেজামাটির মিশ্র-বনাঞ্চল (Wet Mixed Forest), যেমন, রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, ভুতরী, চিলাপাতা, মোরাঘাট, দুমচী, খয়েরবাড়ি, লাটঘুড়ি, আপালচাঁদ, বাগ- ডোগরা প্রভৃতি জায়গায় বৃক্ষ এবং লতা- গুল্মের সমাবেশ সবচাইতে বেশি। এখানে অনেক বেশি গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species) চোখে পড়বে।

অবশ্য উত্তরবঙ্গের সারা বনাঞ্চলের হিসেব ধরলে বলতে হয় : সেখানে বাস করছে প্রায় ৩০০ রকমের উদ্ভিদ প্রজাতি। এদের মধ্যে আছে ৫৪০ রকমের বৃক্ষ। ৭৪৮ রকমের গুল্ম। লতা ও লতানো গাছের সংখ্যা ২১৬। এদের মধ্যে ১১১ রকমের লতা দৈত্যাকার গাছগুলিকে বেষ্টন করে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। ঝোপ জাতীয় গাছের প্রজাতির সংখ্যা ৬২৮। আর শুধু ফার্নই আছে ২৫০ রকমের। এ ছাড়া আছে মস, লাইকেন, শৈবাল এবং ছত্রাক জাতীয় নিম্নশ্রেণীর বহু প্রজাতি। আছে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ রকমের রডডেনড্রন, মিকালোপাসাস, রিউম, রকমারি অর্কিড।

লাম্মাসং (৩১৫ মিটার), মহানন্দা (৯৭০ মিটার) এবং লাটপঞ্চার (১০০০-১২০০ মিটার) অঞ্চলে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। আর এসব জায়গাতেই অজস্র রকমের পশুপাখি, কীট, পতঙ্গের সমাহার। বলা বাহুল্য, এ সব প্রাণীর কোন কোনটির অর্থনৈতিক মূল্য যেমন অনস্বীকার্য, এদের কেউ কেউ আবার পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের ব্যাপারে বড় রকমের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে : উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের ১২০০ বর্গমাইল বনাঞ্চলে বাস করে প্রায় ৬০০ পাখির প্রজাতি। প্রায় ৯০ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১২৫ রকমের মাছ, ৭৪ রকমের সাপ, নানা রকমের গোসাপ, প্রজাপতি, মথ এবং পোকামাকড়।

বাঘ

এক সময়ে বকস্যার বনাঞ্চল ছিল সারা উত্তরবঙ্গের শিকারীদের স্বর্গভূমি। ১৯৪৪ থেকে ১৯৭৪ এই তিরিশ বছরে শুধু তাদের হাতেই এ অঞ্চলে মারা পড়ে প্রায় ৯০ টি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

তবে তারও আগে এ অঞ্চলের নিধন

উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে এমন দৃশ্য বিরল নয়। একটি উড়ুক্কু সাপ টেলিফোনের তারে জড়িয়ে বিশ্রাম করছে। এর জন্যে প্রায় ১০ মিটার দূরের একটি গাছের ডাল থেকে সাপটিকে লাফ দিতে হয়েছিল। এবং এই একটিই শুধু নয়। উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েক শ্রেণীর সাপ গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে চলাফেরা করে

বনের আরও কিছু হিসেব মিলবে কোন কোন ডি আই পি-র রোজনামচায়।

যেমন, ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার তদানীন্তন গবর্নর মিঃ অ্যান্ডারসনের শিকার-তাঁবু বসান হয়েছিল রায়ডাক বনের টিয়ামারী জঙ্গলে। ওই সময় মারা পড়ে ১১টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ১টি চিতা বাঘ, সম্বর হরিণ ৭টি, হগ্ ডিয়ার ২, বার্কিং ডিয়ার ৭, পাইথন ২, সজারু ১, শুয়োর ১২ এবং অন্যান্য পাখি ৩৭টি। ওই একই সময়ে অন্যান্যদের হাতে আরও তিনটি রয়েল বেঙ্গল নিহত হয়েছিল। পরে ১৯৩৪-৩৫ সালে ৮টি, ১৯৩৯ সালে ১টি, এবং ১৯৪২ সালে আরও ১টি বাঘ হত্যা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, একই বনের সীমিত পরিসরে মাত্র সাত আট বছরে মারা হয়েছিল ৩০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং ১টি চিতা। অথচ পশু-বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি বাঘের নাকি নিজস্ব এলাকা ১০ থেকে ২০ বর্গমাইল। বকসার বন হয়ত এ ধরনের হিসেবের ব্যতিক্রম, নইলে এত বেশি সংখ্যক বাঘ নিশ্চয় সেখানে পাওয়া যেত না।

আর একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৯৩৩-১৯৪৪ এই এগার বছরে বকসার বনের দুটি বিশেষ অঞ্চলে মারা পড়েছিল মোট ৫০টি রয়েল বেঙ্গল, এই সঙ্গে কত হরিণ, শুয়োর, পাখি, সাপ, সজারু—তার সঠিক হিসেব যোগান শক্ত। ওই দুই অঞ্চলে ওই সময়ের পর জীবিত রয়েল বেঙ্গলের সংখ্যা ছিল প্রায় ২২৫টি। ১৯৭২ সালের পরিসংখ্যানে এই হিসেব এসে দাঁড়িয়েছে কুড়ি বাইশটির মত।

বাকসার হাতি

হ্যাঁ, উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের হাতির সংখ্যা বাড়ছে।

অমলবাবুর বক্তব্য : ১৯৬৭-৬৮ সালে শুধু বকসার অঞ্চলেই যে ধরনের হাতির দল চোখে পড়ত এখনকার তুলনায় তার আয়তন ছিল কম। এক একটি দলে বড় জোর ৩০ থেকে ৩৫টি হাতি থাকত। এখন যে সব হাতির দল বন থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেত খামারের ক্ষতি করছে সেই সব দলে হাতির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬০ থেকে ১০০টির মত।

প্রঃ হঠাৎ উত্তরবঙ্গেই বা হাতির সংখ্যা এমন বেড়ে গেল কেন? এবং বন ছেড়ে দলে দলে তারা সমতল ভূমিতে নেমে এসে এমনভাবে ফসলেরই বা ক্ষতি করছে কেন?

শ্রীচৌধুরী : বহু বছর ধরে 'হাতি খেদাতে' হাতি ধরা হচ্ছে না। 'মেলা শিকারে' ছোট এবং মাদী হাতিই ধরা সম্ভব হয়। ফলে পুরুষ এবং গুণ্ডা হাতি থেকেই যাচ্ছে। সম্ভবত এর জন্যেই দলগুলিতে হাতির সংখ্যা বাড়ছে।—আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : পাহাড়ের পাদদেশে চা-বাগান এলাকায় শত শত বর্গ মাইল এলাকা পরিষ্কার করে বসতি বসান হয়েছে। সংরক্ষিত জঙ্গলে প্রাকৃতিক বন কেটে কৃত্রিম বন তৈরি করা হয়েছে। ফলে বহু জায়গায় হাতিদের নিজস্ব চলাফেরার পথ এখন লুপ্ত। স্থানীয় অধিবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে হাতির খাবার বেতবনের ক্ষতি করেছে। সংরক্ষিত বনগুলিতে এখন তাদের খাবারের অভাব। ফলে, এক, নিজস্ব পথ লুপ্ত হওয়ায় ওরা এখন এলোপাথাড়ি যে কোন পথ দিয়ে চলাফেরা করে এবং এইভাবে চলতে গিয়ে বসতি অঞ্চলে এসে পড়ে। দুই, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এরা তেমন খাবার পায় না। অথচ মাসে প্রত্যেকটি হাতির জন্যে দরকার গড়ে প্রায় দুই টনের মত ঘাস পাতা। তাহলে অবস্থাটা ভাবুন। গত জুলাই মাসে শুধু উত্তর বঙ্গের বনাঞ্চলেই ছিল প্রায় ৩০০টি হাতি। সেখানকার বনাঞ্চলে এত হাতির খোরাক কোথায়? তাই বাধ্য হয়ে ওরা হানা দিয়েছিল সমতল ভূমির বসতি এলাকায়। এতে প্রচুর ফসলের ক্ষতি হয়।

সাপ

উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় ৭৪ প্রজাতির সাপ। এদের মধ্যে পাইথন এবং কিং কোবরা (শঙ্খচূড়) বকসার বনের এক অমূল্য সম্পদ। এই ৭৪টি প্রজাতির সাপের মধ্যে ১৩টি মোটামুটি বিষাক্ত। শতকরা ৭৪ ভাগ বাস করে ৭০০ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতায়। ২০ ভাগ সমতল-ভূমিতে। এবং বাকি ৬ ভাগ উঁচু পাহাড় এলাকায়।

তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে রায়ডাকের ভেজা জঙ্গলে শঙ্খচূড়ের ঝাঁক দেখা যেত। দেখা যেত সাড়ে চার মিটার লম্বা কোবরার দল। এখন এদের সংখ্যা কমে আসছে।

এ সব সাপের খাবার ভিন্নজাতীয় সাপ। আবার কোন কোন সাপ শামুক খায়, অথবা শামুকের ডিম। এক ধরনের ডিম-খেকো সাপ এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলে। এদের নাম ক্লাইছোপোলিয়া ওরনেটা। রঙ সোনালী এবং কালোর মিশ্রণ। 'ব্রোনজ' সাপও এ অঞ্চলের আর একটি বৈচিত্র্য। এরাও গাছে গাছে উড়ে চলে। ডুয়ার্স অঞ্চলের 'গ্রিন্কো স্নেক' বদরাগী সাপ। চটলে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। এ ছাড়াও এখানে বিচরণ করছে পাঁচ রকম প্রজাতির অন্ধ সাপ, দোর্দণ্ড প্রতাপ পাইথন প্রভৃতি।

উত্তর বঙ্গের বনাঞ্চলের আরও একটি সম্পদ 'রক্বী' (Rock Bee) বা পাথুরে মৌমাছি। এরা টাটারি, বহেরা, টিমুর, ওদাল, শালি, গিন্দারিই প্রভৃতি গাছের কোটরে বাসা বাঁধে এপ্রিল-মে মাসের দিকে। সেই সব কোটরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঈগল-পাখি মধু খাচ্ছে এমন দৃশ্যও কখনও কখনও দেখা যায়। আশ্চর্য এই, এই সব মৌমাছি কিন্তু এ সব অঞ্চলে চাক বাঁধে কম। বাঁধলেও উঁচু গাছের মাথায়। ফলে মধু আহরণ করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর যারা বাঁধে না—তাদের সংখ্যাই বেশি—তারা মধু আহরণ এবং চাক বাঁধতে চলে যায় সুন্দর বনে। কেন যায়, কী করলে এ অঞ্চলেও 'মধু' সংগ্রহ করা সম্ভব—এ সব নিয়ে অনুসন্ধানের সুব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি।

হ্যাঁ, সমভূমি, বক্সদুর উপত্যকা অথবা পাহাড়ের থাকে থাকে বিভিন্ন উচ্চতায়—উত্তরবঙ্গের সারা বনাঞ্চলে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে প্রায় ৯০ রকম প্রজাতির স্তন্যপায়ী

প্রাণী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেড়াল, লেপার্ড, চিতল, বার্কিং, হগ, সম্বর প্রভৃতি হরিণ। এক সময় বুনো মোষের প্রাচুর্য ছিল, এখন কমে এসেছে। কাঠবেড়াল, পান্ডা জলদা পাড়া এবং গরুমারা অঞ্চলের অনবদ্য আকর্ষণ। এক সময়ে এখানে গন্ডারও পাওয়া যেত। এ-অঞ্চলে এ প্রাণীটি এখন বিলুপ্ত। এই সঙ্গে আরও নানা রকমের প্রাণীও।

অভিযোগ, বহু শিকারী বেআইনীভাবে এখনও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের বহু পশু-পাখি শিকার করে চলেছে। শিকার করছে তাদের চামড়া এবং পালকের লোভে। এ সব সামগ্রী তারা চড়া দামে বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর রোজগার করছে।

আর এর ফলে সারা বনাঞ্চলে এখন বাজ, ধনেশ, রাজ ধনেশ, প্রভৃতি শিকারী পাখি প্রায় অবলুপ্ত। বহু পাখি জালবন্দী করে ধরে নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সংখ্যাও এখন কমে এসেছে।

১৯১৮ সালে সি এম ইংলিশ, এইচ ডি ওডোনিল এবং ই ও সেবিয়ারের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ওই সময় শুধু জলপাইগুড়ির সমতলভূমিতেই বাস করত প্রায় ৪০০ প্রজাতির পাখি। এদের মধ্যে ফিঙে, বুলবুল, পতঙ্গভুক, হাঁস, খঞ্জন, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, পেঁচা, ঈগল এবং পায়রাই প্রধান। আর এই সঙ্গে সেখানকার নদী নালায় রয়েছে পর্যাপ্ত মাছ, নানা প্রজাতির এবং বিচিত্র স্বাদের।

'এক কথায় উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল এখনও এক অমূল্য সম্পদ,' এ মন্তব্য জনৈক প্রকৃতি বিজ্ঞানীর।

'উত্তরবঙ্গের কোন কোন বনসম্পদ দিয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অথবা কোচবিহারে বড় বড় কাগজের কলও চালান যায়।' বলেছেন আর একজন বিশেষজ্ঞ।

করা যায়। হয়ত অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু তার জন্য দরকার উপযুক্ত বনব্যবস্থাপনার। যা করা দরকার তা হল : এক, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখানকার সারা বনাঞ্চলের কাষ্ঠ সম্পদ এবং প্রাণী সম্পদের ওপর অনুসন্ধান। দুই, কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত বন তৈরি করার আগে যে বন আছে—অর্থাৎ প্রাকৃতিক বন—তার স্বরূপটি ভালভাবে আগে থেকে দেখে নেওয়া দরকার। সেটা না করলে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তিন, বনসম্পদ রক্ষা করার জন্যে আরও কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন। চার, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণের দায়িত্ব শুধু যে সরকারের নয়, জনসাধারণেরও—স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই বোধটি জাগিয়ে তোলা দরকার। পাঁচ, দরকার বনসম্পদের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার জন্যে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা। এই গবেষণার কাজে মিলিতভাবে সাহায্য করবেন প্রাণী বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, আবহাওয়া এবং জলবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক প্রভৃতি। কারণ অনেকেই হয়ত জানেন কোন স্থানের জল, আবহাওয়া, মাটির উপাদান, বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা—এ সবের ওপর যথাযথ জ্ঞান না থাকলে বনসম্পদ সংরক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। এবং বিজ্ঞানী-দের এ কাজ করতে হবে কলকাতা বা বড় বড় শহরের গবেষণাগারে বসে নয়—উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের মধ্যে বসেই। দেশে বিজ্ঞানীর যখন অভাব নেই, বরং বেকার বিজ্ঞানীর সংখ্যা যখন বাড়ছে—তখন এমন একটি পরিকল্পনা নিতে বাধা কোথায়?
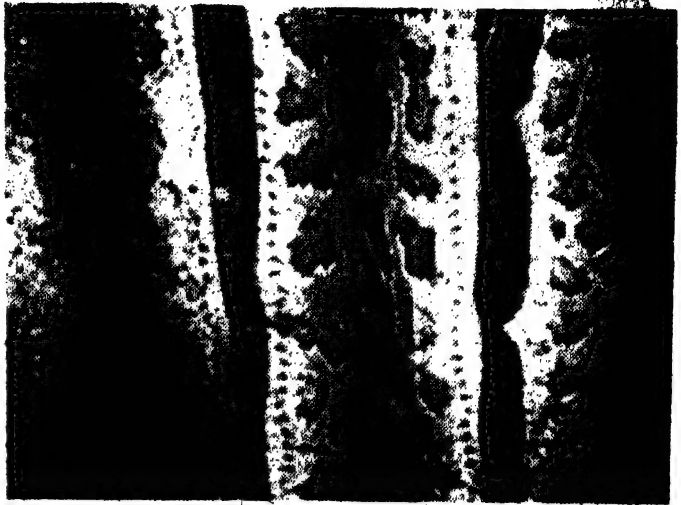
উত্তরবঙ্গের আর এক দুর্লভ সম্পদ পাইথনের চামড়া। ছবিতে তিনটি পাইথনের চামড়া লক্ষ করুন। এর এক একটি চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রায় বাইশ ফুট লম্বা পাইথনের গা থেকে। শিকারীদের অত্যাচারে এ রকমের পাইথন এখন আর তেমন চোখে পড়ে না।

বলতে বাধা নেই, উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান সম্ভব হলে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শুধু কাগজ বা কাঠের কল নয়—আরও নানারকম শিল্প সামগ্রী গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব হবে না। এবং তা যে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক দিকটি সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে, বলাই বাহুল্য।

সত্যেন বোস বিজ্ঞান সংগ্রহশালা

সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন ভবনের নবনির্মিত দ্বিতলে সত্যেন বোস বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে কলমে কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, কিশোর-কিশোরীরা তাদের অনিসন্ধিৎসু মনের নানান প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই পরীক্ষা করে যাতে যাচাই করতে পারে, সে ব্যাপারে এ ধরনের হাতে কলমে কেন্দ্রের ভূমিকা আজ অপরিসীম।

পরিষদের কর্মসচিব ডঃ জয়ন্ত বসুর প্রতিবেদন : এক, বিজ্ঞানের যে জ্ঞানটুকু থাকলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ নিজেরাই তা প্রয়োগ করে নিজেদের জীবন-যাত্রার মান উন্নততর করতে পারেন, হাতে কলমে কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সে ব্যাপারেই সাহায্য করা। দুই, বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এই বিভাগ তার পরিপূরক হিসেবে যাতে কাজ করতে পারে—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করছি।

অনুষ্ঠানে স্বর্গত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বহুমুখী মানসিকতার কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্প্রতি যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গঠন করেছেন, তাতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জানান।

সমরজিৎ কর

ঘরে বাইরে

মৃদুলা সারাভাই

কুমারী মৃদুলা সারাভাই-এর ব্যক্তিত্ব চিরকালই ছিল বিতর্কমূলক। তার অস্মিতা ঘিরে মতবিরোধের অন্ত ছিল না। কিন্তু সে অস্মিতার একটি অপূর্ব সুন্দর দিক ছিল। সেটি ছিল তার করুণা এবং সমবেদনা। সেই সমবেদনার সামান্য ঝলক মাত্র দেখেছিলাম আমি। জেনানা কামরায় ঠাসাঠাসি যাত্রীর দল। বিছানা, বাক্স সবের উপর বসেছে দলে দলে মেয়ে। ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি থামলো। এক বৃদ্ধা অতি কষ্টে এগিয়ে এসে দরজার হাতল হাতড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করাতে গাড়ির যাত্রীরা প্রায় তাকে হিঁচড়িয়ে হটাবার চেষ্টা করছে। এদিকে গাড়ি তখন ছাড় ছাড়। বৃদ্ধা প্রায় পড়ে যান আর কি। হঠাৎ কামরার অন্যদিক থেকে এগিয়ে এলেন একটি মহিলা। বলিষ্ঠ গঠন। পরিধানে সাদা সালোয়ার কুর্তা। ছোট করে ছাটা চুল। পায়ে কাবলী, প্রায় পাঠানদের মত মজবুত আর শক্ত। শরীর-বাঁধন দৃঢ়, মুখে দৃঢ়তার ছাপ। প্রায় চলমান গাড়ির দরজা খুলে দু-হাতে জড়িয়ে বৃদ্ধাকে তুলে নিলেন। কামরার কেউ একটি কথা বলতেও সাহস করেনি, এমনই ছিল তার গতিভঙ্গী। বৃদ্ধা কেঁদে ওঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। সস্নেহে তাকে পাশে বসিয়ে মহিলা যেমন সারা রাস্তা একখানা বই পড়ছিলেন তেমনই পড়ে যেতে লাগলেন। দারুণ কৌতূহল হলো জানবার। কে এই বৈশিষ্ট্যময়ী মহিলা? দু'চার কথার পর জানতে পারলাম তিনি মৃদুলা সারাভাই।

মৃদুলা সারাভাই-এর রাজনীতি ক্ষেত্র এমনকি সমাজসেবার অধ্যায়ের থেকে অনেক দূরে বাস করেও মাঝে মধ্যে দেখা হতো। সেদিনের সেই ঘটনা থেকে আমার মনে ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। ধনী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু আচারে ব্যবহারে কোথাও তার এতটুকু নিদর্শন ছিল না বলেই বোধহয় মৃদুলা সারাভাই ছোট-বড় সবাইকে ভালবাসতে পারতেন। আমেদাবাদের বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবার সারাভাইদের। পরিবারে প্রায় সবাই কৃতী। পিতা আম্বালাল সারাভাই মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ প্রিয় পাত্র, ভাই বিক্রম সারাভাই-এর নাম বিশ্ববিখ্যাত। মা সরলা দেবীকেও কলকাতায় দেখেছিলাম কতকাল আগে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেনের একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে এসেছিলেন। কলকাতার কর্মীদের কর্ত্রীরা নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই দমদম বিমানঘাটি থেকে সরলা দেবীকে এনে গুরুসদয় রোডস্থ বিড়লা ভবনে পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিল আমার উপর। তখন দমদমের পথ ছিল অনেকটা। গাড়িতে সরলা দেবী বাঙ্গালী মেয়েদের বিষয় কতশত প্রশ্ন করলেন। পরে-ছিলেন মোটা খদ্দরের শাড়ি জামা, মুখে মিষ্টি হাসি। তার সংগে আজকের সন্তান বিয়োগে বিষন্নপ্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধার কত তফাৎ। এই নিয়তি।

মৃদুলা সারাভাই ১৯১১ সালে ৬ই মে

মৃদুলা সারাভাই

জন্ম গ্রহণ করেন। জনজীবনের সংগে তাঁর প্রথম পরিচয় গ্রামের মেয়েদের জন্য কল্যাণ-কর্মের মাধ্যমে। সেই সমাজসেবাব্রতের জন্য তিনি প্রথম কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাস্টের সংগঠন সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে এ ট্রাস্ট-এর পত্তন হয়। দেশ বিভাগের পর যখন নারী সমাজ সর্বত্র চরম অত্যাচারের বলি হয়, তখন তাঁর ভূমিকা হয় ত্রাণকার্যে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সীমা-রেখার দুই পারে বার বার পাড়ি দিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন সকলকে। সে দারুণ দুর্যোগে হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তিও জুগিয়েছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। মৃদুলার বিচিত্র কর্মময় জীবনের একটি অধ্যায় ছিল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ-দান। ১৯২০ সালে অতি অল্প বয়সের মেয়ে মাত্র ছিলেন তিনি। তখন অসহযোগের সৈনিক হয়েছিলেন। পরে অবশ্য গান্ধীজীর সংগে সবরমতীতে বাস আরম্ভ করেন। আই এন এর তদন্ত অনুসন্ধানে তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ তাঁকে জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চে এনেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন মৃদুলাকে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করেছিলেন।

শেখ আবদুল্লার সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ সাধারণের চোখে তাঁর প্রধান ভূমিকা হিসাবে এসেছে। শেখ সাহেবের জন্য বহু বছর ধরে তিনি যুদ্ধ চালিয়েছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় শেখ সাহেবের সংগে জাতীয় নেতা-দের পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন হয়।

মহিলাদের মধ্যে তাঁর কর্মপ্রেরণার আগ্রহও প্রচুর ছিল। গুজরাত কংগ্রেস সেবাদলের অধিনায়িকা ছিলেন অনেক দিন। হরিপুরা কংগ্রেসের মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ভার তাঁর উপর ছিল। ১৯৪৫ সালে বোম্বাই-এর অ্যাসেমব্লির সভাপদের জন্য প্রস্তাব হওয়াতে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে সে পদ নিতে বারণ করেন। শান্তি সৈনিক হিসাবে কাজ করাই গান্ধীজী তাঁর উপযুক্ত [illegible]।

তাঁর [illegible] বিরোধ থাকা সত্ত্বেও [illegible] মহিলা [illegible] কোন-দিন [illegible] গান্ধী [illegible] মহিলা ছিলেন। [illegible] ছিলেন [illegible] মৃদুলার [illegible]।

*

অলস মস্তিষ্কের আমেজ লাগাতে চান তো যথেষ্ট কাজ করুন। কাজের অবসরটুকুর আনন্দ তখন হবে পরিপূর্ণ। একথা বলে-ছিলেন লেখক জেরোম কে জেরোম।

অপুষ্টির কুফল

তথ্যটি নূতন নয়। বিশেষজ্ঞরা অনেক-দিন ধরেই বিশেষ কথাটি বলছেন। সাবধান করছেন, সতর্ক করছেন সবাইকে। পুষ্টি-হীনতার একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে মস্তিষ্কের উপর তার ক্রিয়া। সম্প্রতি প্রফেসর রামলিঙ্গস্বামী সে কথাই শারীরবৃত্তবিদদের কনফারেন্স-এ আবার স্মরণ করিয়েছেন। শৈশবের অপুষ্টি মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দিতে পারে। ম্যারাসমাস্ রোগাক্রান্ত শিশুর মৃত্যুর পর দেখা গেছে তার cerebrum এবং cerebellum অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কে এবং লঘুমস্তিষ্কে সাধারণ শিশুর মস্তিষ্কের চেয়ে কম কোষ থাকে। কেন এমন হয়?

প্রকল্পটির স্বপক্ষে অনেকেই এক কথা

চিত্র প্রদর্শনী

সমকালীন চিত্রকলা ক্ষেত্রে একটি বিশ্বজনীন সাদৃশ্য দেখা গেলেও বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের কাজে এক একটি বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। সে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা তথা পরিকল্পনা অথবা রঙ ব্যবহাররীতি বা প্রকাশ করার ভঙ্গীমায়। অস্ট্রেলিয়ান আর্ট কাউন্সিল ও ললিতকলা আকাদেমির সহযোগিতায় ও কলকাতার অস্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশনের উদ্যোগে আকাদেমি গ্যালারীতে আয়োজিত খ্যাতনামা অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী অ্যালান লিচ-জোন্সের প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা দশটি ছবি ছাড়া ২৫টি স্ক্রীনপ্রিণ্ট নিদর্শন দেখা যায়। অ্যালান লিচ-জোন্স অস্ট্রেলিয়ার একজন প্রথিতযশা শিল্পী—শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রাফিক প্রদর্শনীতে তিনি যোগদান করেছেন এবং পৃথিবীর অনেক আর্ট গ্যালারীতে তাঁর শিল্প-নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে দিল্লীতে ও কলকাতায় এটিই তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। লিচ-জোন্সের পেণ্টিং ও গ্রাফিক-প্রিণ্ট নিদর্শনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য লক্ষিত হলেও মূলত দুই ধারার মধ্যেই একটি যোগসূত্র ধরা পড়ে। কাল ও নিরবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা অবলম্বনে রচিত ছবিগুলির মধ্যে রচনাক্ষেত্রের বিরাট শূন্য স্থান ও তারই একপাশে রচিত রেখাভিত্তিক আঁকাবাঁকা আকারপ্রধান ছবিগুলি নিছক প্রতীকমূলক। প্রত্যেকটি মোটা রেখাভিত্তিক রচনাই শিল্পী নানা রঙের রেখায় ভরে ফেলে সেগুলিতে একটি বিশেষ রূপ দান করেছেন। অর্থ খোঁজা নিরর্থক, কারণ সীমা ও অসীমের মধ্যে শিল্পী যেন একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

আকাদেমি গ্যালারীতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়ং আর্টিস্টস ফেডারেশনের পঞ্চম যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ৬৫ জন শিল্পী সভ্যের মোট ৪৬টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা ও সেই সঙ্গে যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে গত কয়েক বছরের মধ্যেই এই শিল্পী সংস্থাটি সুনাম অর্জন করেছে। এই সংস্থার সভ্যবৃন্দ সকলেই তরুণ এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পকলা ক্ষেত্রে আজ পরিচিতও

কম্পোজিশন —মৃণ্ময় মুখার্জী

লাভ করেছেন। বিভিন্ন রীতিতে কাজ করলেও এই তরুণ শিল্পীদের কাজে পরীক্ষাস্পৃহা ও প্রগতিবাদের পরিচয় মেলে। অবশ্য অনেকের কাজই পরীক্ষামূলক এবং তা স্বাভাবিকও বটে। একদিকে যেমন দু-একজনের শিল্পকর্মে প্রতিভার সন্ধান মেলে, অপর দিকে তেমনি দু-একটি দুর্বল ছবিও দেখা যায়। তবে ভাস্কর্য বিভাগে অল্প নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ কোনটিই চোখে পড়েনি। প্রথমেই অসিত মণ্ডলের ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর্থ কলার ও গাম ব্যবহার করে শুধু যে তিনি তেলরঙের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন তা নয়, উপরন্তু তিনি একটি সুন্দর জলরঙ জাতীয় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করেছেন। প্রতীকমূলক টরফিশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কাজল দাসগুপ্ত রেন, রেন, রেন-এ অ্যাকশন পেণ্টিং শ্রেণীর—লাল, কালো ও সাদা রঙের আঁকাবাঁকা রেখাজালের মধ্য দিয়ে তিনি ঝরঝর বৃষ্টির রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিতোষ দাসের লাইফ আলংকারিক দিক থেকে উল্লেখ্য হলেও অন্যান্য দিক থেকে কিছু দুর্বল। গভীর রঙ ও অলংকরণ অবলম্বনে সমীর ঘোষ রসসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—এ ভিলেজ ঈষৎ আড়ষ্ট না হলে অনেকের চোখে পড়ত। তবে ফ্লাওয়ার রুমের জন্য তিনি প্রশংসা দাবী করেন—প্রতীকপ্রধান ছবিটির আলোকবিন্যাস দ্রষ্টব্য। বিপুল গুহর ট্র্যানস্পেরেন্স-এ অনেকের ভাল লাগে। মৃন্ময় মুখার্জীর অলংকারপ্রধান ছবি, বিশেষত কম্পোজিশন-এ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ছবিখানির স্বচ্ছতা ও স্ফটিক জাতীয় কারুকার্য লক্ষণীয়। অসিত পালের প্রতীক ও মোটিফপ্রধান ছবিগুলির মধ্যে রেডিঅ্যাণ্ট কনস্যাসনেস, কম্পোজিশন হিসাবে উল্লেখ্য। পৃথ্বীশ শিকদারের সাররিয়্যালিস্টিক রচনাবলী কোলাজ জাতীয়। পরিকল্পনা ও রচনার দিক থেকে ফসিল-এর নাম করা যায়। বরুণ সিমলাই-এর রেখাভিত্তিক কম্পোজিশনগুলির মধ্যে কম্পোজিশন-এ অনেকের ভাল লাগে। ভাস্কর্য বিভাগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা সমকালীন গঠনরীতির কোনও সন্ধান মেলেনি। তা সত্ত্বেও সাবলীল আকার-সৃষ্টির জন্য কম্পোজিশন (স্যাণ্ডস্টোন) অনেকের ভাল লাগে। সত্যেন মজুমদারের টর্সো (পাথর) ঈষৎ আড়ষ্ট মনে হয়, তবে ছোট্ট হেড-এ (পাথর) তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আকার গঠনের দিক থেকে অনিল সেনের অ্যাট রেস্টও অনেকের চোখে পড়ে যায়। প্রদর্শনীর অন্যান্য নিদর্শনাদির মধ্যে নন্দিতা গুহর লাইফ ও মুকুল প্রসাদের এ পোর্ট্রেট ও তপন বিশ্বাসের কম্পোজিশন উল্লেখযোগ্য।

*

শিল্পী অরুণকুমার মৈত্রও আকাদেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২৮টি ছবি দেখা যায়। শিল্পী রামায়ণ ও মহাভারতের নানা উপাখ্যান অবলম্বনে ছবি এঁকেছেন, সেই সঙ্গে প্রদর্শনীতে কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যেরও সন্ধান মেলে। শিল্পী রঙ ব্যবহারে পটু, প্রধানত ইমপ্রেশানিস্টিক ও সেই সঙ্গে কয়েক ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশানিস্টিক

রীতিতে কাজ করেছেন—এবং প্রাথমিক অঙ্কন প্রথাতেও তাঁর দখল আছে। তাছাড়া সুনির্বাচিত নানা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি ছবি দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গভীর ও অতিরিক্ত রঙ ব্যবহারের চাপে বিষয়বস্তুগুলি ঠিক ফুটে ওঠেনি। আসল কথা, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠভূমি তথা রচনাক্ষেত্রের শূন্য স্থানের অভাবে ছবিগুলি যেন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। ছবির মূল মূর্তিগুলি ঈষৎ ছোট আকারে আঁকলে অথবা ছবির আকার বড় করলে শিল্পী যে অধিকতর সুফল লাভ করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর একটি কথা, শিল্পীর রচনায় বৈচিত্র্যের অভাব। বিভিন্ন উপাখ্যানের নায়িকার তিনি যথাযথ পরিচয় দিতে পারেননি, অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই সব নারী তথা নায়িকার একই মুখ তিনি এঁকে গেছেন। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ভাল লাগে—যেমন দময়ন্তী ও হংস, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। নিসর্গ দৃশ্যগুলি দুর্বল—বিশেষ করে ডটার অব হিমালয় ও সানরাইজ ফ্রম টাইগার হিল।

চিত্রপ্রিয়

॥ উনপঞ্চাশ ॥

অজয় সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে এক মুহূর্ত থমকিয়ে দাঁড়ায়, তখনো তার দৃষ্টি উঁচু রকের ওপর খোলা দরজার কাননের ছায়ামূর্তির প্রতি। অনিবার্য, অজয় জানে, কাননের এই দরজায় দাঁড়ানো, কারণ দরজা বন্ধ করা কাননেরই কাজ। অন্য দিন এই অন্ধকারের সুযোগ কানন কখনোই বৃথা যেতে দেয় না, নিজের শরীরে অজয়ের স্পর্শ এবং অশেষ আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত অথচ তাৎক্ষণিক তৃপ্তির একটি দংশন ঠোঁটে নিয়ে রেখে দেয়। আজ আসে না কানন, আসে নি, ও থমকে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়িতে, রান্নাঘরের দরজায় অজয় আর প্রমীলার কথোপকথন শুনেছিল। সিঁড়ির আলোয় থমকে দাঁড়ানো ছায়া অজয় দেখেছিল। লজ্জা? সেইজন্য অন্ধকার দালানে তার গায়ের স্পর্শ দিলে, বাইরের ঘরে আসে নি? সংকোচ? দরজায় ছায়াকে অথবা মায়া মনে হয় না। অথবা মায়া যদি কোনো রমণী, তবে সে এমন দেয় এক বাধা ভরা আনন্দের অনুভূতি, যে-বৈভব কোনো প্রত্যাশা জাগায় না, অথচ নিরাশার প্লানিতে ভরে দেয় না মন। দরজায় ওই ছায়া অতি প্রত্যক্ষ একটি শরীর, অতি তীব্র জীবন্ত একটি কণ্ঠ।

অজয় প্যাডেলে চাপ দিয়ে আসনের ওপর বসে অন্ধকারে এগিয়ে যায়। পিছনে নিচু স্বরে হয় তো কিছু ধ্বনিত হয়, এত অস্ফুট, কানে এলেও সম্যক কিছু বোঝা যায় না। 'সুখবর...এই অঘ্রাণে তার বিয়ে লাগছে।' অজয় এখন প্রমীলার মুখ মনে করতে পারে না, কিন্তু এখনো তরল হাসির স্বর কানে ভাসে, 'কোথায় মোহনলাল স্ট্রিট না কী আছে, সেইখানে।'...প্রমীলার মুখ তখনো তার চোখে পড়ে নি, এখনো মনে পড়ে না, কারণ তাঁর ঠাকুরঝির মুখ সকল কিছুকে আড়াল করে রাখে, এবং 'ঠাকুরঝির মুখে সুখবরটা শুনেছেন নাকি?' এই প্রশ্নের জবাব তার ভিতর থেকে ভেসে আসে, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

অন্ধকার কোনো বাধা না, অজয়ের চোখে সবই স্পষ্ট, দুধারের জল-কলে পুরী-পুরুষের ভিড়, জটলা, তর্কাতর্কি, স্নান, সাবানের গন্ধ, বালতি কলসীর ঝংকার, তথাপি আনমনেই তার হাত মাঝে মাঝে বেল বাজায়, পথে মানুষ চলে। পশ্চিমের দিগন্ত [illegible] সাদা মেঘের আলো এখন [illegible] [illegible] কালো, সাঁঝরা [illegible] পৃথিবীর দিকে [illegible] [illegible] ঝিকমিক করে এবং [illegible] ছায়ামূর্তি [illegible] এখন বাতাসে [illegible] জোনাকিরা [illegible], স্পষ্টত মুখে, চকিত [illegible] [illegible] ও হারায়। সাইকেলের গতি [illegible] [illegible] দু পাশে সংসারের নানা শব্দ ও স্বর।

শুনেছে অজয়, সুখবর, প্রকৃতই কাননের মুখে, এইরূপ মনে হয়, যেন অতি অভ্রান্ত। যদিচ, না-দেখা প্রমীলার মুখের কথা বিয়ের ছোবলের মতো ছেলেছে বুকে তথাপি মনে হয়, সুখবর শোনা হয়েছে তার কাননের মুখে। কারণ কানন যে পরিণামের বিষয় কিছুই জানে না। বিবাহের প্রস্তাব? অসম্ভব। অতি ভয়ের। শিউলির মতো গৃহত্যাগ? মৃত্যুর অধিক, অসম্ভব কাননের শুধু ভয় করে। কানন কিছুই জানে না। কানন কী করবে? অজয় কেন কাননের ওপর রাগ করে?

রাগ? আলোর ঝলকে অজয়ের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ঝটিতি ব্রেক কষে, মাটিতে পা চেপে দাঁড়ায়। আলো তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে ডুবে যায়, এবং অজয় অন্ধের মতো, কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার চোখের সামনে একটু দূরে একটি অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে, এবং ধীরে আবছা হয়ে যায়। সিগারেটের অগ্নিশিখা অজয় আস্তে আস্তে আবার সবই দেখতে পায়। রাস্তার এক পাশে একটি মিলিটারি জীপ, সিগারেটের অগ্নিশিখা জীপের ভিতরে হয় তো কোনো সৈনিক এবং হয় তো তার কোলের কাছে আরো কেউ—কোনো [illegible]

গণিকা নিশ্চয়ই না, সম্ভবত কোনো বাঙ্গালী উওমেনস অকজিলিয়ারি কোর-এর কর্মী, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কোনো বাধা নেই, অথবা মিল ফ্যাক্টরির কোনো শ্বেতাঙ্গিনী কন্যা। তারা কেউ গণিকা না, তাদের সঙ্গে মেলামেশায় কোনো সামরিক বাধা নেই—আউট অব্ বাউণ্ড নয়... তথাপি, জীপের ভিতর থেকে টর্চের তীব্র আলো অজয়ের চোখ ঝলকিয়ে দেয় কেন? সৈনিকের পক্ষে এক্ষেত্রে সামরিক পুলিসের কোনো ভয় নেই। অজয়ের কৌতূহল এক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হয় না, বুঝতে পারে এখন সে নয়া রাস্তার মোড়ে। ডান দিকে দূরে চোখে পড়ে না, কিন্তু বিশাল ও ভারি লৌহস্তম্ভের পতন, ট্রাকের গর্জন ভেসে আসে। পুরনো চটকলের বুকে হেভি মোটর ভেহিকল্-এর সামরিক কারখানা। কাজ চলে ওখানে দিনের আলোয়, রাত্রের অন্ধকারে নিতান্ত আলোর সংকেত রেখায়।

কিন্তু রাগ? 'আমি কী করবো? আমার ওপর কেন রাগ করছেন?' অজয় নয়া রাস্তার অন্ধকার নিরালায় এগিয়ে চলে এবং ভাবে এই তো সেই সুখবর, কাননের কিছু করার নেই। কিন্তু কী সেই অজ্ঞাত কারণ, প্রমীলা সহসা ডেকে কাননের বিবাহের সংবাদ দেন? যেন মনে হয়, সকলই পূর্ব পরিকল্পিত। কাননের অসহায় ভীরুতা প্রমীলার সংবাদ এবং আজ-ই যদিচ অজয় জানে পূর্ব পরিকল্পিত কিছুই না। তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র, প্রশ্নের অতীত তথাপি কাননের অসহায় নিস্তেজ ভীরু অভিব্যক্তির পরেই প্রমীলার খুশি চলকানো সংবাদের মধ্যে যেন কোথায় একটা যোগসূত্র অনুমিত হয় আর অপমানের জ্বালা বিষের মতো ক্রিয়া করে। অসহায় এবং যন্ত্রণায় বিদ্ধ কতগুলো জিজ্ঞাসা তার চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে : প্রমীলা তাকে কী চোখে দেখেন? তাঁর যুবতী ননদের সঙ্গে অজয়ের অসময়ে নিভৃত সাক্ষাৎ কথাবার্তা তাঁর অজ্ঞাত নেই। তিনি বুদ্ধিমতী এবং ব্যক্তিত্বশালিনী, কাননের আচরণকে কি তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না? পারেন নিশ্চিত কিন্তু কী তাঁর ধারণা এবং অভিমত? তিনি অজয় বা কাননকে প্রত্যক্ষ কোনো প্রশ্রয় দেন না, তবু স্পষ্ট তাঁর নির্বিকারত্ব। দু জনের দেখা সাক্ষাতের নানান লুকোচুরির খেলা তাঁর কাছে যেন কোনো দ্রষ্টব্য বিষয় না। কোনো অপরিণামদর্শী দুর্দৈবের দুশ্চিন্তার কোনো লক্ষণ তাঁর অভিব্যক্তিতে অনুপস্থিত কেন? প্রমীলা এতো নির্ভয় নিশ্চিন্ত কেন তাঁর একুশ বছরের ননদিনী বিষয়? তাঁর সঙ্গে কি কাননের কোনো বোঝাপড়া আছে, অথবা কাননের গতির সীমা তিনি জানেন? মহীতোষের না [illegible]

বিষয়েও অজয়ের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না, পুরুষদের দৃষ্টি এক্ষেত্রে অনেকটা অচেতন, লক্ষের অবকাশ কম। কিন্তু প্রমীলা কেবল রমণী নন, তাঁর সংসারের সীমায় প্রতিদিন যা ঘটে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত বা বিমুখ থাকা তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব? যা প্রশ্নের অতীত, তাঁর মতো মহিলার পক্ষে সংসারের সীমায় কোনো দায়িত্ব থেকেই তিনি মুক্ত থাকতে পারেন না। তবে? এবং তারপরেও রান্নাঘরের দরজায় ডেকে ননদিনীর আসন্ন বিবাহের সুখবর দেন? কী রহস্য নিহিত এই সব আচরণের মধ্যে?

এবং কী রহস্য কাননের এই স্পষ্ট পশ্চাদপসরণের? যথার্থই পশ্চাদপসরণ, স্পষ্টত কোনো দায় গ্রহণের অস্বীকৃতি।

কী ভেবেছিল কানন? কী চেয়েছিল? জিজ্ঞাসা অজয়ের বিস্ময়াবিষ্ট মনে প্রথম থেকেই ছিল। কাননের মতো মেয়েরা চিরদিনই তার কাছে অনেক দূরের। জন্মসূত্রেই এরকম কোনো কিছুর কল্পনার অবকাশও তার ছিল না। জীবনের চিন্তা-ধারাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু জীবন সর্পিল, অজ্ঞাত বাঁকের মুখে কানন একটা বিস্ময়ের ঝংকার। তথাপি কাননের দৃষ্টির সংকেত হাসির ডাক, কোনো কিছুকেই সে একান্ত নিঃশংশয়ে গ্রহণ করে নি। করে নি, তবু আশা প্রোথিত হয়েছিল হৃদয়ের মূলে। অধিকার বোধ কদাপি না, প্রাণে এক আনন্দ ও বিশ্বাসের গাঢ়তা দাগ ফেলেছিল কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন মন প্রতিটি মুহূর্তে পরিণামের জিজ্ঞাসায় আবিষ্ট ছিল।

ছিল, এখন আর তেমন নেই, সম্ভবত পরিণামের ফলশ্রুতি এখন আর জানতে বাকী নেই, এবং এই মুহূর্তের অসহ্য কষ্ট, তীব্র যন্ত্রণা, অপমানবোধের কষাঘাত এই-রূপে হানে। দু হাত উঠে আসে তার বুকে, সবটে দুই পা মাটিতে শক্ত হয়ে চেপে বসে, মনের কষ্ট সমস্ত শরীরে ঝাপটা মারে, নিশ্চল হয়ে পড়ে সে এবং ঘ্রাণে তার কাননের গন্ধ। অনুভূতি জুড়ে স্পর্শ তার কাননের উত্তপ্ত যৌবন, কাননের দান। কেন? কী রহস্য এই খেলার? এই কি কাননের অভ্যস্ত জীবন, এবং আর কে তার খেলার সঙ্গী? কলকাতার বাড়ি আর নিজের এই পঁচিশ বছরের সমস্ত জীবনটা সহসা একটা উদ্যত চাবুকের মতো চোখের সামনে জেগে ওঠে এবং তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে একটা হীনমন্যতাবোধকে সে দমিয়ে রাখতে পারে না।

'ওহ্, নো ডার্লিং!' প্রতিবাদ অথচ একটি আত্যন্তিক সুখের কুহর রমণীর স্বরে ভেসে আসে এবং তারপরেই খিলখিল হাসি।

অজয়ের সংবিত ফেরে, সে বুক থেকে দু হাত নামিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে রাখে। ডান দিকে রাস্তার ধারের ঘাস-ছাওয়া ঝোপের কাছে জ্বলন্ত সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ জেগে ওঠে। অদ্ভুত, আশ্চর্য কিছু না, নয়া রাস্তা এখন গোরা সৈনিকদের প্রেমের বাগিচা। আশেপাশে সামরিক অফিসগুলোতে এখন অনেক মেয়ে কর্মী, 'ওয়াকাই' তারা এক কথায়, তারা গণিকা না, অতএব বান্ধবীর অপ্রতুলতা ততোধিক নেই। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়ের আশা এখন ক্রমেই উজ্জ্বলতর, ইতিমধ্যেই শতাধিক ইতালীয় বন্দী হেস্তি মোটর ভেহিকল কারখানায় কাজে লিপ্ত, যারা ভারতীয় কোনো ভাষা বা ইংরাজিও জানে না। মিত্রপক্ষের সৈনিকরা আপাতত অনেকটা নিশ্চিন্ত, পরবাসের জীবনকে ভোগে মগ্ন রাখতে চায়।

অজয় প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগিয়ে যায় এবং কিছুটা অগ্রসর হয়ে সুড়ং-এর মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করে। চেনা রাস্তা, অতএব অন্ধকারেও কোনো অসুবিধা হয় না, যদিচ সাবধানে চলতে হয় এবং ঘণ্টি বাজায় টিং টিং শব্দে। একদিকে দেওয়াল, অন্যদিকে পোড়ো জমির আশে-পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বস্তিঘর, যেখানে দু'একটি আলোর বিন্দু দৃষ্ট হয়, শোনা যায় মানুষের বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা। আরো কিছু অগ্রসর হবার পরেই সম্পন্ন লোকালয়, বাড়িঘর, সামনে আড়াল করা আলোয়, চায়ের দোকানে পাড়ার লোকজনদের চোখে পড়ে। অজয় একটা সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে আসে, যন্ত্রণার কিছুমাত্র অবসান হয় না, বরং অনুভব করে আগুনে আক্রান্ত মানুষ যতো বেগে ছোটে আগুন অধিকতর রুদ্র হয়, দাহ বাড়ে। একাকী থাকতে ইচ্ছা কর না, অথচ কারো সঙ্গলাভের ইচ্ছা হয় না, কোনো গন্তব্য স্থির করতে পারে না, যদিচ অন্ধকার পথে পথে সাইকেল চালিয়ে এভাবে ঘোরা নিরর্থক এবং ওয়ার্ডে আপাতত হাজিরা দেওয়া আবশ্যিক কর্তব্য। দুপুর থেকে সে ওয়ার্ড অফিসের বাইরে। এই প্রথম অজয় অনুভব করে তার কোনো বন্ধু নেই—এমন বন্ধু যার কাছে নিজের স্বরূপ অনায়াসে প্রকাশ করা যায়। মোহনের প্রশ্নই আসে না, পার্টির কোনো বন্ধুই সে রকম কোনো বন্ধু না, যাকে এই গোপন যন্ত্রণার কথা বলা যায়। এখানে নেই, এমন কি, কলকাতা-বাগবাজারের পাড়াতেও, তার আজন্ম পরিচিতদের মধ্যেও প্রাণ খুলে দেখাবার কেউ নেই।...অথচ সময় যায়, ক্রমে আসন্ন আবার সেই সাক্ষাৎ, কাননের সঙ্গে, যা কেবল আজ রাত্রে না, আগামীকাল এবং তারপরেও, অগ্রহায়ণের সেই রাত্রিটির আগে পর্যন্ত অনেকবার ঘটবে সেই সাক্ষাৎ। কী করণীয় অজয়ের। আজ এবং তারপরেও এই প্রাক দুর্গাপূজাকাল থেকে অগ্রহায়ণের সেই দিনটি পর্যন্ত? ঘ্রাণে তার কাননের গন্ধ, অনুভূতি জুড়ে কাননের শরীরের উত্তপ্ত স্পর্শ।

বড় রাস্তায় তার গতিরোধ হয়, সুদীর্ঘ কনভয় রাস্তার ওপর মন্থরগতি, মাঝে মাঝে আলো জ্বলে, দূরে অগ্রগামী পথপ্রদর্শক মোটরসাইকেল আরোহীর কাছ থেকে কনভয় অতিক্রমের নিরন্তর সঙ্কেত শব্দ ভেসে আসে অনেকটা সাইরেনের মত। পথের দু পাশে সাইকেল রিকশা, গরু আর ঘোড়ার গাড়িগুলো দাঁড়ানো, তাদের চলাচল আপাতত নিষেধ। অজয় সাইকেল থেকে নামে, একবার উত্তর দিকে ফিরে তাকায়, বকুলতলা ক্লাবের কথা একবার মনে আসে, কিন্তু যেতে ইচ্ছা হয় না। শরতের কথা মনে পড়ে, এ আর পি ওয়ার্ডেন পূর্ববঙ্গের ছেলে, নিরীহ বিষন্ন এক যুবক, স্বল্পবাক মেলামেশায় অক্ষম, আই এ পাশ, ওয়ার্ডেন হিসাবে একেবারে বেমানান। রোগা, শুকনো মুখ, চোপসানো গাল, কোটরাগত চোখ, হাসলে ছোট বালকের মতো দেখায়। শরত কবিতা বলে, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়ে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কথা বলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, মনে হয় তার চোখ ছলছল করে। মাঝে মাঝে কলকাতা যায় ধুতি পাঞ্জাবি পরে, যাবার আগে তার চোখে মুখে যেন একটা আবেগ ও উত্তেজনার ঝলক লাগে এবং যখন ফিরে আসে তাকে অধিকতর বিষন্ন আর রুগ্ন দেখায়। সে অতি অলস, আলস্যের জন্য সকলে বিদ্রূপ করে, সে হাসে, কখনো রাগ করে না।

এই মুহূর্তে অজয়ের সহসা বিশেষ করে শরতের কথা মনে পড়ে যায় এবং শরতের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করে, যদিচ সে তার আপন জগতের মধ্যে এমন লুপ্ত হয়ে থাকে যেন একটা আড়াল তাকে ঘিরে থাকে, যা ভেদ করা, সব সময়ে তাকে স্পর্শ করা যায় না এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কখনো তার কোনো উৎসাহ লক্ষিত হয় না, মতামত বিনিময়ে বিমুখ। অন্যেরা যদি বা অজয়ের সঙ্গে তর্ক করে, শরত নির্বিকার থাকে, তথাপি এই মুহূর্তে তার শরতের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করে। সে কংক্রীট শেলটার দেওয়ালের আড়াল দিয়ে ওয়ার্ডের বারান্দায় ওঠে।

ওয়ার্ডের ঘরে আলো জ্বলে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। টেবিলের সামনে তারক কুণ্ডু একলা, আর কেউ নেই, কিন্তু অজয়কে দেখে, তারক কুণ্ডু ওয়ার্ডেন যেন হঠাৎ সচকিত চমকে ভ্রূকুটি চোখে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ অপ্রস্তুতভাবে হাসে। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ফাইল, টেলিফোন, দেওয়ালে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, অগ্নিনির্বাপক নানা সরঞ্জাম ঘরের এখানে-ওখানে। অজয় যুগপৎ হতাশ ও বিরক্ত হয়। তারক কুণ্ডু কখনো এই সন্ধ্যা রাত্রে ওয়ার্ডে থাকবার লোক না। সদলবলে মদ্যপান সহযোগে ওস্তাগার গলি অথবা নদীর ওপারে চন্দননগরের গণিকালয়ে অবস্থানের সময় এখন। পিছনের দরজা ভেজানো, যার বাইরে বারান্দা, এবং পাশে আর একটি ঘর। নানান বস্তু ও গুটিকয়েক ক্যাম্পখাট গুটানো আছে, যা কেউ কেউ রাত্রে ব্যবহার করে, এবং একটি খাটিয়া। পাঁচিলঘেরা উঠোনের এক পাশে রান্নাঘর, আর এক দিকে খাটা পায়খানা এবং কুয়োর চারপাশে বাঁধানো স্নানের জায়গা।

'শরতবাবু, কোথায়?' অজয় ঘরের এক পাশে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করে।

ইতিমধ্যে তারক উঠে দাঁড়ায়, যার কোনো হেতু নেই, কারণ সহকর্মী অজয়কে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবার কোনো প্রশ্ন নেই। বেঁটে গোলগাল কালো তারক ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসে এবং তার অকাল টাক আলোয় চকচক করে। বলে, 'শরতবাবু তো আজ কলকাতায় গেছে। আপনাকে আচ্ছালাল খুব খুঁজছিল। সেই দুপুর থেকে আপনি সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'

অজয় স্বভাবতই বিব্রত বোধ করে; কারণ, আচ্ছালাল একজন মেসেঞ্জার, সাইকেলটা তার প্রয়োজনেই বেশি লাগে এবং অপরের পক্ষে সাইকেল নিয়ে যাওয়া নিয়মবহির্ভূত কাজ। সে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো মেসেজ ছিল বুঝি?'

তারক বলে, 'হ্যাঁ, খুব জরুরি।' এই কথা বলার সঙ্গেই তার ছোট দুই চোখের দৃষ্টি চকিতে একবার পিছনের দরজা লক্ষ করে এবং আবার বলে, 'আচ্ছালাল আপনাকে খুঁজতে এখন বোধ হয় বকুল-তলায় গেছে। আপনি বরং সাইকেলটা নিয়ে সেখানেই যান, ওকে দিয়ে দেবেন।'

তারকের যশোর জেলার উচ্চারিত ভাষায় অজয় তেমন মনোযোগ দেয় না, সে শার্টের বুকের বোতাম খুলতে খুলতে পিছনের দরজার দিকে পা বাড়ায় এবং বলে, 'আচ্ছালাল বকুলতলায় আমাকে না পেয়ে এখানেই চলে আসবে।'

'শুনুন অজয়বাবু', তারক প্রায় আর্ত-স্বরে ডেকে ওঠে, তার কালো মুখে হাসি নেই, একটা ত্রস্ত অপরাধের ছায়ায় অধিকতর কালো হয়ে ওঠে। সে অজয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

অজয় অবাক ভ্রূকুটি চোখে তারকের দিকে তাকায় এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আপনি বকুলতলাতেই যান।' তারক অতি বিচলিত স্বরে বলে।

অজয়ের বিস্ময় বর্ধিত হয় এবং সে কিছু বলবার আগেই পিছনের দরজা খুলে যায়, আর আচ্ছালাল অজয়কে লক্ষ না করেই বলে ওঠে, 'এই তারোক সশালা জল্দি আয়।'

অজয় বিভ্রান্ত বোধ করে, আচ্ছালালকে দেখে এবং তার কথা শোনে। আচ্ছালাল নিমেষে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এবং পিছন ফিরে অদৃশ্য হয়। অজয় তারকের দিকে তাকায়। তারক হাসবার চেষ্টা করে। অজয় পিছনের দরজা খুলে পা বাড়াবার চেষ্টা করতেই তারক তাকে হাত ধরে টানে, বলে, 'অজয়বাবু, শুনুন।'

অজয়ের মুখোমুখি বারান্দায় আচ্ছালাল, সেও শক্ত মুখে বলে, 'ঝঞ্ঝাট মত্ করেন অজয়দা, বাইরে যান।'

অজয়ের বিভ্রান্তি ঝটিতি সিদ্ধান্তে দৃঢ় হয়। সে তারকের হাত সরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই আচ্ছালাল তার বুকের জামা মুঠি পাকিয়ে ধরে, তার পরিণাম, এ মুহূর্তের অজয়ের দ্বারাই সম্ভব। আচ্ছালালের মুখের ওপর সজোরে তার কঠিন মুষ্টির আঘাত লাগে, পরিণামে আচ্ছালাল বারান্দায় নিচে ছিটকে পড়ে। অজয় দ্রুত পাশের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে দিয়ে ঢোকে এবং প্রস্তরবৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। অবিশ্বাস্য দৃশ্য তার সম্মুখে, ওয়াডেন বিজয় চক্রবর্তী সম্পূর্ণ নগ্ন এবং দুটি মেয়ের একই অবস্থা। একজন শায়িতা খাটিয়ার ওপরে, আর একজন এই মুহূর্তে নিজের দুই উরুর মাঝখানে দুই হাত দিয়ে আবৃত করে ঘরের এক কোণে চকিত ভীরু পায়ে ছুটে যায়।

অজয়কে দেখা মাত্র বিজয় মেঝের ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নীল রঙ কুর্তা তুলে নেয় এবং তার পায়ের ধাক্কায়, একটি চটের ব্যাগ উল্টে ছড়িয়ে পড়ে চালের দানা এবং খাটিয়ার ওপর কালো স্বাস্থ্যহীন রমণী খাটিয়া থেকে নেমে মেঝের শুয়ে পড়ে নিজেকে আড়াল করে। অজয় তখনো যেন বিশ্বাস করতে পারে না তার চোখের সামনে এই চিত্র ও চরিত্র। ঘটনাসমূহ প্রকৃত এবং বাস্তব। ক্রমশ

গানের আসর

সংস্কৃত ও সঙ্গীত সাহিত্য

কিছুদিন আগে সংস্কৃত ভাষার চর্চা নিয়ে একটা বড় রকমের আন্দোলন হয়ে গেল। সংস্কৃত ভাষায় যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবন্ধ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের অমনোযোগিতা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই এবং এইটাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় যখন সংস্কৃত ভাষার সমস্ত দিকে আমাদের জাগ্রতভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু কেবল মিটিঙ এবং বক্তৃতা দিয়ে কোনও ফল হবে না—যদি না আমরা কার্য্যত সংস্কৃত গ্রন্থাদির আলোচনায় তৎপর হই। এ বিষয়ে আমাদের আত্মসমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টায় এই লেখককে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান করতে হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বিশেষ কিছু সাহায্য এ যাবৎ বাংলা থেকে প্রকাশিত পুস্তকাদি থেকে পাননি এবং বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য বিভাগের আলোচনা এতই কম যে তাকে অকিঞ্চিৎকর বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলায় কিছু টেকসট বই-এর মত আলোচনা আছে এবং অতি স্বল্প একাডেমিক আলোচনা আছে যা পূর্ণাঙ্গ তো নয়ই এমনকি সুবোধ্যও নয়। এর মধ্যে দাক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী রচিত "চার্বাক দর্শন"-এর মত দু-একটি গ্রন্থ ব্যতিক্রম। বর্তমানে শ্রীযুক্ত পরিতোষ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত বেদ গ্রন্থমালাও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। এর আগে অবশ্য বসুমতী সাহিত্য মন্দির বা অন্যান্য দু-একটি প্রতিষ্ঠান থেকে কতিপয় পুরাণাদি গ্রন্থ বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলি নিতান্ত সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্যই। বলা বাহুল্য আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে চলেছেন।

কিছুকাল হল বৈদিক সঙ্গীতের আলোচনায় ব্যাপৃত আছি। এ সম্বন্ধে অনেককেই বলতে শুনেছিলুম—"বৃথাই পরিশ্রম করবেন মশাই ওসব কিছুই পাওয়া যায় না।" কিন্তু অনুসন্ধান করে, চেষ্টা করে দেখেছি অনেক কিছুই পাওয়া যায়, এমনকি সামগানের কোন ধারা আমাদের দেশে চলে এসেছে তাও বেশ বোঝা যায়—শুধু তাই নয় স্বরলিপি করে গাইবার প্রণালীও নিরূপণ করা যায়। এতে একটা চমকপ্রদ বস্তু আমার উপলব্ধিতে এসেছে সেটা হচ্ছে এই যে, লৌকিক সঙ্গীত ক্রম বিকাশের দিক থেকে বৈদিক সঙ্গীতের মুখাপেক্ষী ছিল না বরঞ্চ বৈদিক সঙ্গীতই লৌকিক সঙ্গীতের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছে। এ রকম সন্দেহ যদি মনে উদয় হয় যে প্রাক্-সংস্কৃত এক বা একাধিক ভাষা একদা গন্ধর্ব বসু রুদ্র প্রভৃতি দেব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলির কতিপয় বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তবে সেটাকেও অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভবত অনুদাত্ত, স্বরিতের কসি, দাঁড়ি চিহ্নে বা সামবেদের সংখ্যাচিহ্নে সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যকেই বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন অতীতে এগুলি যেভাবে গাওয়া হত তা থেকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে তার জন্যই এই চিহ্নসমূহের প্রবর্তন।

যাই হোক, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় পূর্ণাঙ্গ টীকাসমন্বিত বাংলায় অনুদিত সামবেদ নেই; নেই ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ বা অথর্ব বেদ। যেগুলি কিছু কিছু আছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তা অচল। শতপথ ব্রাহ্মণের মত বই-এর কোনও বঙ্গানুবাদ নেই, নেই জৈমিনী ব্রাহ্মণের অনুবাদ সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ্য, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও বাংলা সংস্করণের প্রচেষ্টাও বোধ হয় অত্যন্ত কঠিন পরিকল্পনা। উপনিষৎ গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং আলোচনা আছে, কিন্তু সেই শঙ্কর বা সায়ণেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যেন এ যুগে আমাদের স্বকীয় কোনও দৃষ্টিকোণ নেই, আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে বাস্তবচিন্তানিষ্ঠ কোনও বক্তব্য যেন আমাদের স্থাপন করবার কোনও অধিকার নেই। প্রাতিশাখ্য সম্বন্ধে দু একটি বাংলা গ্রন্থ আছে কিন্তু শিক্ষা গ্রন্থগুলির ভাষ্য সমেত অনুবাদ নেই। অথচ বৈদিক সঙ্গীতের প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা এই শিক্ষাগুলিতেই আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র বাংলায় কেউ তর্জমা করেছিলেন কি? আমার জানা নেই। অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এ বিষয়ে বেশ কিছু সফল আলোচনা করেছিলেন, তবে তা সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে অধিকার করে নয় বলে জানি। অথচ সমস্ত আর্য-সৌন্দর্যতত্ত্ব এই গ্রন্থেই বিধৃত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদ কালে সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আলোচনার পূর্ণতা ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে কি কেউ মন্তব্য করেন? তেমন কিছু তো দেখা যায় না। কেবল আক্ষরিক অনুবাদ, দু চারটে শব্দের অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা ব্যতীত পাঠকের চিন্তা জাগিয়ে তোলবার মত ইঙ্গিত কোনও অনুবাদ গ্রন্থেই দেখা যায় না। অলঙ্কার সাহিত্যের ধ্বনিবাদ যে বৃহদ্দেশী নামক সঙ্গীত গ্রন্থেই প্রথম অঙ্কুরিত হয় তার কোনও উল্লেখ আজকালকার সংস্কৃতি সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় কি? সাহিত্যে যে অলঙ্কার শাস্ত্রগুলি পঠিত হয় তার অধিকাংশই অপূর্ণ। বহু আলঙ্কারিক তথ্য সেগুলিতে স্থান পায়নি এটি যাঁরা সঙ্গীতের দিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে আজকাল যে সব অলঙ্কার সম্বন্ধীয় বই বেরুচ্ছে সেগুলিতে আলোচনা নেই।

অতি সম্প্রতি দু একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হয়ে বেরুচ্ছে কিন্তু পূর্বেই বলেছি এসব গ্রন্থের সম্পাদকগণ কোনও স্বকীয় চিন্তার পরিচয় দেন না তা সেই চিরাচরিত সংস্কৃত টীকার পদ্ধতিতেই অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করে চলেছেন।

বাংলায় সম্ভব না হলে এই কলকাতা থেকে ইংরেজিতেও তো সংস্কৃত গ্রন্থাদির সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব। সে বিষয়ে অনেক বেশী তৎপর হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য অনেকেই অনেক কিছু কাজ করতে পারেন না। বলতে গেলে আরও অনেক কথাই বলবার আছে, আমি সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতেই দু চার কথা বললুম। আসল কথা হচ্ছে কাজ, কাজ করলেই কাজের সুযোগ বেড়ে যাবে, পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। প্রথম [illegible]-

ওয়ার্ক আমাদেরই করতে হবে খেটে খুটে। তবে দোহাই সংস্কৃতসেবীদের, সেই ঊনবিংশ শতকের জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, রুশীয় পণ্ডিতদের উক্তিই উদ্ধৃত করে কাজ সমাপন করবেন না, নিজেরা যে কিছু ভাবেন এবং স্বকীয় বক্তব্য স্থাপন করতে পারেন—তার পরিচয় কিছুটা অন্তত রাখবেন।

গীতবাণী

ষোলটি ভক্তিগীতির সংকলন শ্রীসুনীল দত্ত-রচিত গীতবাণী। গান অনেকেই লিখছেন এবং সুর দিচ্ছেন; কিন্তু সুনীল দত্ত একজন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ইনটেলেকচুয়েল সমাজ যা চাইছেন সেই সাহিত্যে উত্তীর্ণ সঙ্গীত এবং এস্থেটিক মহিমায় সমৃদ্ধ সুর প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গানগুলিতে। খ্রীষ্টীয় সমাজে তিনি সুবিদিত কিন্তু বাংলার তাবৎ কম্পোজারদের মধ্যেই তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এ কথা বলতে দ্বিধা বোধ করি না। গানগুলির স্বরলিপি করেছেন শ্রীমতী গীতা রড্রিগস্।

শার্ঙ্গদেব

গজল-সম্রাজ্ঞী

বেগম আখতারের প্রথম প্রেম সংগীত। শেষ পর্যন্ত এই ভালবাসা অটুট ছিল। সংগীত তাঁকে দিয়েছে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা। বিনিময়ে তিনি দিয়েছেন তাঁর হৃদয়। তাঁর শরীর যে ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল, সেটা ইদানীং বোঝা যেত; সতেজ কণ্ঠেও পাওয়া যেত ক্লান্তির ছাপ। তবু গান গাওয়া তিনি ছাড়েননি, আসরও ছাড়েনি গায়িকাকে। ৬৪ বছর বয়সেও যে বেগমসাহেবা শ্রোতাদের পারতেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে! তাছাড়া ঠুমরি-গজল-গীত-দাদরা-কাওয়ালির আসর তাঁকে ছাড়া ভাবাও কি যেত? কতকটা অসুস্থ শরীরে গত ২৬ অকটোবর সন্ধ্যায় আমেদাবাদে কাওয়ালির এক আসরে তাঁকে গাইতে হয়েছে। বেগম গেয়েছেন দরাজ মনে, আবেগ-আপ্লুত গলায়, হৃদয়ের অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে। ওই রাত্রেই হৃদ্‌রোগের আক্রমণ। চার দিন পর ৩০ অকটোবর রাত্রে সব শেষ। গান গেয়েই গায়িকা চোখ বুজলেন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীত-জগতের একটা দিক একেবারে খালি করে গেলেন।

* * * *

"গজল-সম্রাজ্ঞী" বেগম আখতারের শৈশব কেটেছে ফৈজাবাদ শহরে। পুতুল-খেলার বয়স পার হতে-না-হতেই তিনি গানের প্রেমে পড়েছিলেন। বালিকা-বয়সে পেলেন গুরু, ওস্তাদ আতা মহম্মদ খাঁ; পাতিয়ালা ঘরানার খেয়ালিয়া। দীর্ঘকাল তাঁর কাছে খেয়ালে তালিম নিয়েছেন, খাঁ সাহেবের নির্দেশে ওই বয়সেই দিনে আট ঘণ্টা রেয়াজ করেছেন। (বেগম আখতারের অপর গুরু কিরানা ঘরানার ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ-ও ছিলেন সমান কড়া)। খেয়াল শিখতে ছাত্রীর বুক কেঁপে উঠত মাঝে মাঝে। তবু নিয়মিত শিখেছেন। খেয়াল-অনুশীলনের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গোপনে তিনি যে ঠুমরি, দাদরা আর গজল চর্চা করছেন, সে-কথা কি আতা মহম্মদ খাঁ জানতেন? হয়তো আভাসে জানতেন, কিন্তু হিন্দুস্থানী কাব্যসংগীতে ছাত্রীর অনুরাগ আর অধিকার কতখানি, তার আন্দাজ তিনি পেয়েছেন অনেক পরে। ১৯৩৪ সনে কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটারে আয়োজিত এক আসরে ছাত্রীর কণ্ঠে একটি গজল শুনে তিনি চমকে গিয়েছেন। আসরে বেগম আখতারের সেই প্রথম অনুষ্ঠান। সুরেলা গলার কাজ, উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ মোচড়, ভাব মাধুর্যের দরদী প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি ছাত্রীর সাংগীতিক প্রতিভার ক্ষেত্রটি চিনে নিতে পেরেছেন। তিনি আর ছাত্রীর পথরোধ করে দাঁড়াননি।

১৯৩৪ থেকে '৫০—এই ষোল বছরে বেগম আখতারের জীবনে সাফল্য আর স্বীকৃতি এসেছে নানাভাবে। আবার এই সময়ে নানাভাবে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে

বেগম আখতার

হয়েছে। আলফ্রেড থিয়েটারের সেই অনুষ্ঠানের পর প্রথমে গ্রামোফোন কোমপানি, পরে মেগাফোন কোমপানি বেগম আখতারের লঘু রাগপ্রধান গান রেকরড করলেন। মেগাফোনের একের পর এক ডিস্কে তাঁর নাম বিশেষভাবে ছড়াল। রেকরডের দোকানে আখতারী বাঈয়ের (তখন ওই নামেই লোকে তাঁকে চিনত) গজল-দাদরার দারুণ চাহিদা। মেগাফোন কোমপানির জে এন ঘোষ তাঁকে দিয়ে উর্দু গজল গাইয়ে তৃপ্ত থাকেননি, বেগমসাহেবার গলায় বাংলা গানেরও রেকরড করিয়েছেন। বাংলা উচ্চারণে ত্রুটি? তা থাক্‌, সে-ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে সুরের সম্পদ, গায়কীর মজা। তাঁর বেশ কয়েকটি বাংলা গানের জনপ্রিয়তার মূলে ওইখানে। ইতিমধ্যে অল ইনডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে বেগম আখতার লঘু রাগ-প্রধান সংগীত পরিবেষণেরও সুযোগ পেলেন। বেতারে সেই তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। নতুন পরিবেশে অনভ্যস্ত, বেগম আখতার গেয়েছিলেন ভয়ে-ভয়ে; তাঁর নিজের ধারণা, কাঁপা-কাঁপা গলায়। বেতার সংস্থার কর্তা-ব্যক্তিরা, যাঁরা ছিলেন কাছাকাছি, কিন্তু গান শুনে "শাবাশ" ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। গায়িকার অসামান্য জনপ্রিয়তা তাঁকে কিছু কালের জন্য টেনে আনল ছায়াছবির জগতে, নাট-মঞ্চেও। কলকাতার কোরিনথিয়ান থিয়েটারের বেশ কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। অভিনয় কিন্তু তাঁর প্রাণের জিনিস ছিল না। হিন্দী সিনেমায় যেমন, তেমনই রঙ্গমঞ্চেও প্রধানত তাঁর কদর ছিল গানের জন্য। (প্রসঙ্গত, অনেক দিন পরে সত্যজিৎ রায়ের **জলসাঘর** চিত্রেও তিনি ছিলেন গায়িকার ভূমিকায়।) মঞ্চে দর্শকদের সামনে গান গেয়ে 'এনকোর' শোনা অথবা হাত-তালি পাওয়ার মোহ যে তাঁর ছিল না, এমন নয়। তবু রঙ্গমঞ্চের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মুখে রঙ মাখা আর তাঁর সইছিল না, রঙ যদি লাগাতে হয় তিনি নিজেই তা ভরিয়ে দেবেন তাঁর গানে—এই তখন তাঁর চিন্তা। ইচ্ছার জোর থাকলে কোনও প্রতি-বন্ধক সমস্যা হয়ে থাকতে পারে না। বেগম আখতারও একদিন নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজে নিয়েছেন, নাটমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়েছেন চুকিয়ে।

থিয়েটার ছেড়ে গেলেন হায়দরাবাদ, সেখানে অসংখ্য শ্রোতা ছিলেন তাঁর,

অংশেভার। এত বড় আসরে এর আগে তিনি কখনও গান করেননি। মাইকের ব্যবস্থা তো তখন হত না, গজল-দাদরায় সূক্ষ্ম গলার কাজের আন্দাজ বড় আসরে দেওয়া খুবই কঠিন; তবু হায়দরাবাদের শ্রোতাদের মন তিনি জয় করে নিতে পেরেছিলেন। এমনই ছিল তাঁর কণ্ঠের মাদকতা! খবর শুনে রামপুরের নবাব আলি খাঁ তাঁকে "সেলাম" জানালেন। বেগম কি নবাবের সভা-গায়িকা হবেন, মাসিক দু-হাজার টাকা বেতনে? বেগম আখতার সম্মত হলেন। রামপুরে তিনি পেয়েছেন তাঁর জীবনসঙ্গীকে, সেই দিক থেকে রামপুরের অধ্যায়টি তাঁর কাছে মূল্যবান। কিন্তু শিল্পীর মন ভরেনি না। (গত বছরের 'দেশ-বিনোদন' সংখ্যায় "বেগমের স্মৃতিচারণ" রচনায় এ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে।)

বার বার যে-শহর তাঁকে সাদরে টেনে নিয়েছে, সেই কলকাতা শিল্পীর ইচ্ছা পূর্ণ করল। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ-প্রবর্তিত নিখিল-বঙ্গ সংগীত সম্মেলনে তিনি গান গাইবার সুযোগ পেলেন। সংগীত শিল্পী হিসাবে তাঁর সগৌরব প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের আসরে। জীবনের অবশিষ্ট দুই দশক সারা ভারতের ছোট-বড় নানা সংগীত-সম্মেলন আর আসরে গাইবার জন্য কেবলই তাঁর ডাক এসেছে। অক্লান্ত ভাবে শিল্পী বসেছেন তাঁর হারমোনিয়াম নিয়ে। গেয়েছেন তাঁর, এবং শ্রোতাদেরও প্রিয় গানগুলি। সেই "সাঁইয়া গয়ে পর দেশ", "জেরা ধীরেসে বোলু", "কোয়েলিয়া মৎ করো পুকার", "ও বেদরদী সপনে মে' আ জা", "হম পরদেশী", "বো হি হমনে তুমনে", "তেরে বিনা বালম্" ইত্যাদি। রসিক শ্রোতারা তাঁর কণ্ঠে একই গান কতবারই তো শুনেছেন, তবু শিল্পীকে কখনও তাঁদের একঘেয়ে মনে হয়নি, প্রতিবারই তাঁকে পেয়েছেন যেন নতুন করে। তার কারণ কী? কারণ, শিল্পী নিজেও যে নিজের কণ্ঠকে—প্রকৃতির মতো—নতুন সাজে সাজিয়ে নিয়েছেন।

খেয়ালের তালিমে সমৃদ্ধ তাঁর কণ্ঠে গীত লঘু রাগপ্রধান গানেও ছিল বিশেষ একটি ব্যাপ্তি। প্রথম দিকে বেগম আখতারের গানে চটুলতার প্রকাশ ছিল স্পষ্ট। সেই সঙ্গে থাকত বোল-বানানার মজা, কাব্যিক আমেজ। কোনও একটি শব্দ দুমড়ে দেবার সময় শিল্পী বিশেষ মেজাজে তাঁর কণ্ঠস্বর যখন ঈষৎ ভেঙে দিতেন, তখন আশ্চর্য এক রসের সৃষ্টি হত। শ্রোতারা সমস্বরে 'আ-হা-হা' বলে উঠতেন। পরবর্তী কালে বেগম আখতারের গলা একটু বেশী ভারী হয়ে ওঠে, এমনিতেই তা ভাঙা-ভাঙা মনে হত। শিল্পী তখন চটুলতা বর্জন করেছেন। অন্য গুণগুলি রেখে চটুলতার জায়গায় স্থান দিয়েছেন দরদকে। অর্থাৎ ঝুঁকেছেন গভীরতার দিকে অনুভবের দিকে। শিল্পীর বয়স যখন পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ, তখন থেকেই দেখা যেত, তিনি বেছে নিচ্ছেন বিশেষ করে রাগ-নির্ভর গানগুলি। খেয়ালের তালিম তখন খুবই কাজ দিত।

বেগম আখতারের ঠুমরি গানে পানজাবী আর পূর্বী ঢঙের সুষম সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যেত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। যে-সব রাগে সাধারণত ঠুমরি-দাদরা গাওয়া হয়ে থাকে, তার বাইরে নানা রাগরাগিণীর সুরেও তিনি ওই অঙ্গের গান পরিবেশন করেছেন। শিবরঞ্জনী, ভীমপলশ্রী, মল্লার, চন্দ্রকোষ, এমন কী দরবারী ধরেও তাঁকে ঠুমরি গাইতে শুনেছি। তবে এমনিতে তাঁর প্রিয় রাগ ছিল : দেশ, খাম্বাজ, পিলু, পাহাড়ী, কাফী, সারং এবং অবশ্যই ভৈরোঁ—যে-রাগে গুরুজীর কছে তাঁর তালিম শুরু হয়। বেগম আখতারের শেষ বাংলা গানের রেকরডে (এবার পুজোয় প্রকাশিত) যে-গানটি ("ফিরে যা ফিরে যা") বার বার শুনতে ইচ্ছা করে, সেটি ভৈরোঁ-রাগাশ্রিত। ঘুরে ফিরে এসেছেন ওই রাগে—যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার জন্য।

• • •

মনে পড়ছে কলকাতায় তাঁর শেষ অনুষ্ঠানের কথা। ২৯ সেপটেমবর রাত্রে আলাউদ্দিন খাঁ সারকল-আয়োজিত একক-আসরের শিল্পী তিনি। বেগম আখতারকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ইদানীং তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন, "থক্ গয়ী হু" (পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি)। বেগম প্রথমেই আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেবের স্ত্রীকে হাটু ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, তার পর খুঁজে খুঁজে পরিচিত শিল্পী আর ব্যক্তিদের একে একে নমস্কার জানাতে থাকলেন। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির সঙ্গে জড়িত কলকাতা শহরের শ্রোতাদের কাছে তাঁর যে এটি শেষ অনুষ্ঠান, বিদায়ী আসর, সে-কথা কেউ আমরা ভাবিনি। শিল্পী নিজেও সজ্ঞানে না। কিন্তু নির্জ্ঞানে তিনি কি কিছু বুঝতে পারছিলেন? কে জানে। শ্রোতাদের আশা মিটিয়ে দিয়ে গাইলেন বাইশখানি গান। প্রথমে একটি খেয়াল—তার পর ঠুমরি, দাদরা, গজল, কাজরী। মনে হল, একেবারে অন্য মেজাজে। স্পষ্টতই ক্লান্ত কণ্ঠে এমন গম্ভীরতা কেমন করে প্রকাশ পায়, ভাবতে অবাক লাগছিল। "বেদরদী সপনে মে' আ জা", "কোয়েলিয়া মৎ করো পুকার", গান দুটি শোনাল খুবই বিষন্ন। যখন গাইলেন, "জেরা ধীরে-সে বোলু", তখন তাঁর গলা আরও ধরা-ধরা। প্রতিটি স্বর যেন আহত। আশ্চর্য করুণ, আশ্চর্য মধুর।

বেগম আখতার বলেছিলেন, 'খোদার মেহেরবানি থাকলে জিনদিগী-ভোর গান গেয়ে যাব।' সে-কথা তিনি রেখেছেন। শুধু আমরা যা হারালাম, তা আর ফিরে পাব না। আমাদের সম্বল রইল কিছু রেকরড আর স্মৃতি।

জ্যোতির্ময় বসুরায়

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

"অশোক, কনগ্রাচুলেশনস্। তোমরা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছো। এটা আনন্দের কথা। আরও আনন্দের কথা তোমাদের প্রধান মন্ত্রী মিসেস্ গান্ধী বলেছেন এই প্রযুক্তিবিদ্যা তোমাদের দেশের কাজে লাগাতে চাও। আমরা খুশী।" এই বলে, নিউইয়র্কে ভারতের রাষ্ট্রদূত অশোক রায় জানালেন, আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী মহলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অশোকবাবু বললেন যে আমাদের পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর পর আমেরিকার কোন কোন মহল ভারতের নিন্দা করলেও সাধারণভাবে সেখানকার জনগণ তাঁকে টেলিফোনে, আবার কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দূতাবাসে এসে ওই অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছেন। পাকিস্তান-সহ কয়েকটি রাষ্ট্র ভারত বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠলেও আমেরিকায় সুবিধা করতে পারেনি।

অশোক রায় তৃতীয় বাঙালী যিনি স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় আই-এফ-এস পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেন। ১৯৫০ সালে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে যোগদান। সেই থেকে একটানা ২৪ বছর তিনি নানা ঘটনার সাক্ষী। আমাদের আলোচনার সূচনাতেই অশোকবাবু বললেন, দেখুন—অফিসিয়ল সিক্রেটস বলে একটা কথা আছে। তাই এমন কিছু প্রশ্ন করবেন না যাতে সাউথ ব্লকে ভুল বোঝাবুঝি হয়।

অশোকবাবুর বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তৎকালীন পূর্ববাংলায় নানা জেলায় তাঁকে কাজ করতে হয়। ঢাকা জেলার গৌমরাই থানায় বাড়ি হলেও অশোকবাবু ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ছেলেবেলা থেকেই অশোক ডানপিটে। ছাত্রজীবনে বন্ধুরা তাঁকে হিংসা করত। ৪২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ। একটানা ৬ বছর। সেখান থেকে ইতিহাসে এম-এ পাশ। পরে কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজের লেকচারার পদে যোগ দেন। ওই বছরই তিনি আই-এফ-এস পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকেন। ৪৯ সালে পরীক্ষা দেন। ফল বেরুলে দেখা যায় তালিকায় তাঁর নামই প্রথমে। প্যারিস, লন্ডন এবং দিল্লিতে ট্রেনিং. এর পর অশোকবাবু ৫৩ সালে ১৮ এপরিল করাচিতে ভারতীয় হাই কমিশনে তৃতীয় সচিব পদে যোগ দিতে গেলেন। করাচি গিয়েই সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। "ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবছি প্রথম বাইরের পোস্টিং-এ কী হয়"—অশোক রায় বললেন। অফিসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাই কমিশনার বললেন, "আজ সকালে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। এবং বগুরার মহম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। নাজিমুদ্দিন সমর্থকরা তাই উত্তেজিত। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" তখন করাচিতে আমাদের হাই কমিশনার ছিলেন মোহন সিং মেহেতা। তিনি প্রতিদিন সকালে হাই কমিশনের অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হতেন। অশোকবাবু ছিলেন পলিটিক্যাল সেকশনে। তাই কাজের দায়িত্ব ছিল বেশি। অবশ্য করাচি যাওয়ার আগে ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন

অশোক রায়

অডিটর জেনারেলের কন্যা গায়ত্রী দাশগুপ্তের সঙ্গে অশোকবাবুর বিয়ে হয়। স্ত্রী গায়ত্রী রায়ও সেই থেকে সর্বত্র অশোকবাবুর সঙ্গে থেকেছেন এবং একজন খাঁটি ডিপ্লোম্যাটের স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

বগুরার মহম্মদ আলীর আমলে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু গেলেন করাচিতে। আলী এলেন দিল্লিতে। একাধিক চুক্তি হল। অবশ্য পরবর্তীকালে ওই চুক্তিগুলি কাগজে-কলমেই রয়ে গেল। পাকিস্তান কোনদিনই চুক্তি মেনে চলেনি। '৫৫ সালে অশোকবাবু বদলি হলেন পশ্চিম বার্লিনে ভারতের মিলিটারি মিশনে। তখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন নামবিয়ার। '৫৬ সালে পণ্ডিতজীর নির্দেশে বার্লিনে ভারতের মিলিটারি মিশন বন্ধ হয়ে গেল। জুন মাসে খোলা হল কনসাল জেনারেল অফিস। তখন ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক বিশেষ উত্তেজনা। রাশিয়া '৫৭ সালে আবিষ্কার করল উভয় বার্লিনের বিখ্যাত টানেল। বলা হল এটা সি-আই-এর কাজ। আমরা দেখতে গেলাম। দেখলাম। সত্যই এক টানেল তৈরি করা হয়েছে।

অশোকবাবু নানা প্রশ্নের জবাবের সময় বললেন, "যেখানে গিয়েছি, সেখানেই কোন না কোন উত্তেজনার মধ্যে পড়েছি।" '৫৭ সালে প্রথম সচিব হিসাবে পদোন্নতি হল। এবার কলম্বোতে। বন্দেরনায়ক তখন প্রধানমন্ত্রী। তামিল এবং সিংহলীদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা হল। '৫৮ সালে এই দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ত্রাণ সাহায্যের কাজ ভারতীয় হাই কমিশন থেকে শুরু করা হল। এই কাজের দায়িত্ব ছিলো অশোকবাবুর উপর। কলম্বোতে বেশি দিন থাকতে হয়নি। আবার ডাক পড়ল সাউথ ব্লকে। আনডার সেক্রেটারী পদে যোগ দেন। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার। সুকর্ণ তখন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট। সেখানে শুরু হল বিদ্রোহ। সুকর্ণ-নেহেরুর মধ্যে এই সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্র বিনিময় হয়। অশোকবাবু বললেন, "এই সব চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশের সময় এখনও আসেনি।" কয়েকমাস পরে অশোকবাবুকে ডেপুটি সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় পারসোনাল। অশোকবাবু একটু হেসে বললেন, "এই সময় দেখলাম ধরাধরি কাকে বলে।" বাইরে যাওয়ার জন্য সারাদিন চলতো তার ঘরে তদ্বির।

৬১ সালে মে মাসে অশোকবাবু আবার দিল্লি ছাড়লেন। এবার ওয়াশিংটনে ভারতের দূতাবাসে। এম সি চাগলা তখন ভারতের রাষ্ট্রদূত। কেনেডি ক্ষমতায় এসেছেন। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক ভাল। ৬২ সালে চীনা আক্রমণ হোল। কেনেডি আমাদের অঢেল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। শ্রীমতী কেনেডি এলেন দিল্লিতে। '৬২ সালে নেহেরু গেলেন ওয়াশিংটনে। হ্যাঁ অশোকবাবুর ওয়াশিংটন যাত্রা কিন্তু বিমানে হয়নি। তখন নিয়ম ছিল জাহাজে যেতে হবে। অশোকবাবুর ভাষায়, "বম্বে থেকে জাহাজে উঠলাম। সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করে ১৫ দিনের মাথায় লনডনে। সেখান থেকে আরও পাঁচদিন পরে ওয়াশিংটনে। সত্যই এটা একটা থ্রিলিং ব্যাপার।" '৬১ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ওয়াশিংটনে গেলেন। ভারতীয় দূতাবাসের চেষ্টায় কেনেডির সঙ্গে তার ১০ মিনিটের এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হল। "আমার উপর দায়িত্ব ছিল ডাঃ রায়ের দেখাশুনার। হোয়াইট হাউস ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত সব প্রোটোকল ভেঙে দিল। কেনেডি ১০ মিনিটের জায়গায় ৫৫ মিনিট বিধানবাবুর

সঙ্গে কথা বলেন। ডাঃ রায় এই সময় কেনেডির স্বাস্থ্য সম্পর্কেও নানা উপদেশ দেন। যতদূর মনে আছে কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেনেডি বিধানবাবুকে ৩০০ কোটি টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশেষ এক কারণে তা ভেস্তে যায়।" কারণ জানতে চাইলে অশোকবাবু বলেন, "দেখুন ঘটনা আমি জানি। কিন্তু আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়।" '৬১ সালে গোয়া মুক্ত করা হল। পশ্চিমী দুনিয়া আবার আমাদের কঠোর সমালোচনা শুরু করল। ওয়াশিংটনে আমরা স্থির করলাম প্রেস কনফারেন্স ফেস করব। খোলাখুলি বলব আমাদের নীতি। সাংবাদিকদের ডেকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম। ইংরেজদের আমরা বিতাড়িত করেছি। গোয়া ভারতের অঙ্গ রাজ্য। বিদেশী শক্তি পরতুগীজ সরকার স্বেচ্ছায় গোয়া ছেড়ে যাচ্ছে না। আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। এবং সেখানকার জনগণকে মুক্ত করার দায়িত্ব ভারত সরকারের। এতে কাজ হল। ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হল। সেদিন ওয়াশিংটনে বড় বড় সংবাদপত্র ভারতের বক্তব্যের সমর্থনে সম্পাদকীয় লিখেছিল।"

অশোকবাবু বললেন, "চার বছর ওয়াশিংটনে থাকার সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহু উত্থান পতন দেখেছি। কেনেডিকে হত্যা করা হল, জনসন ক্ষমতায় এলেন। '৬৪ সালে মে মাসে পণ্ডিতজীও মারা গেলেন। নেহেরু-কেনেডির সম্পর্ক ভারত-আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন রচনা করেছিল। জনসনের আমলে তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে। '৬৪ সালে অকটোবরের মাঝে ছুটিতে এলাম তখন আমার বদলির আদেশ হল সাউথ রোডেশিয়ায়। নভেম্বর মাসে একদিন দিল্লি থেকে বার্তা এলো। আমার ছুটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দিল্লিতে বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করি। দিল্লি গেলাম। আমায় বলা হল তোমার দক্ষিণ রোডেশিয়ার পোসটিং বাতিল হল। পদোন্নতি হল। তোমাকে ইস্ট পাকিস্তানে ডেপুটি হাই কমিশনার পদে যোগ দিতে হবে। ওই বছর জানুয়ারি মাসে আয়ুব-মোনায়েম সবুর সমর্থনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। ৪০/৫০ লক্ষ লোক এদেশে চলে এসেছে। মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার চলছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব দাঙ্গার বিরোধিতা করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দু দিন ভাবার সময় নিলাম। দু দিন পর জানালাম ঢাকায় যাব।" ৬৪ থেকে ৬৭ সালের শেষ অবধি ঢাকায় তাঁর নানা অভিজ্ঞতা।

অশোকবাবু বলে গেলেন, "আমি যাওয়ার কিছুদিন পর মহগ্রামে চলল গুলি। পাক জঙ্গী শাসক তখন ঢাকায় আমার উপর কড়া নজর রাখছে। একদিন মুসলীম লীগের কিছু যুবক এসে সেগুন বাগিচায় আমার অফিসের কিছু ভাঙচুর করল। একদিকে ভারত বিরোধী অপপ্রচার অপর দিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার সমানে চলছে।' একটু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওইসময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী রকম ছিল? একটু হেসে বললেন, "চমৎকার। তবে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম না —পাছে ওদের উপর জঙ্গী নায়কদের অত্যাচার বেড়ে যায়।"

যা' হোক '৬৫ সালে আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে দিল্লি থেকে জরুরী তলব পেয়ে ২ সেপটেম্বর দিল্লি যাই। ৫ সেপটেম্বর রাতে কলকাতার পথে রওনা দেওয়ার আগে সাউথ ব্লকেই খবর পাই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। দুপুর তিনটা নাগাদ দিল্লিতে খবর এলো। পাকিস্তান ভারতের পানজাবের বিভিন্ন স্থানে বিমান থেকে বোমা ফেলেছে। কলকাতায় পৌঁছে জানা গেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন

হয়েছে। পরদিন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে দেখা করি। সারাদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ তৎকালীন পাকিস্তান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি (বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিব) রথীন সেনগুপ্তের ঘর থেকে ঢাকার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সাড়া পাইনি। ১০/১১ সেপ্টেম্বর এইভাবে কাটে। তারপর কলকাতার একটি বিদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে জানতে পারি ঢাকার ভারতীয় নাগরিকদের গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাঙ্গুলী তখন দশ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কোনো খোঁজ পাচ্ছি না।" অশোকবাবুর মনোবেদনা তখন বুঝতে পারিনি। অশোকবাবু জানালেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী হোম সেক্রেটারি অশোকবাবুর স্ত্রীর নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই সময় অশোকবাবুর একটি কন্যা সন্তান হয়। অশোকবাবু দুই সন্তানের জনক। ছেলে অর্জুন এখন দিল্লিতে পড়াশুনো করে। মেয়ে তিলোত্তমা থাকে নিউইয়র্কে। যা হোক যুদ্ধ থেমে গেলেও অশোকবাবু কলকাতায় প্রায় ৫০ দিন আটকে ছিলেন। পরে বেগুন হয়ে ঢাকায় যান। ঢাকায় তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অশোকবাবু জানালেন, "৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি করলেন। আবার গোলমাল শুরু হল। ঢাকা রেল ইয়ার্ডে চলল গুলি। রক্ত দিলেন অনেক যুবক। এবার থেকে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামলেন। শুরু হল আয়ুব বিরোধী আন্দোলন।" '৬৭-তে অশোকবাবু ফিরে এলেন দিল্লীতে। এবার তিনি হলেন ডিরেক্টর এক্সটার্নাল পাবলিসিটি। এই পদে একসময় পি এন হাকসার ছিলেন। '৬৯-এ কিছু সময়ের জন্য তাকে যেতে হয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে। '৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আবার সাউথ ব্লকে। পদোন্নতি হল। জয়েন্ট সেক্রেটারি পাকিস্তান।

এই সময়ের অভিজ্ঞতা হল—ফরাক্কা নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠক। দলের নেতৃত্ব করলেন অশোকবাবু। দু'বার গেলেন ইসলামাবাদে। '৭০ সালে পাকিস্তানের নির্বাচনের আগে ঢাকা অফিস ইনস্পেকশন করতে আবার ঢাকায়। নির্বাচনের আগে হল ঐতিহাসিক প্রলয়ঙ্করী বন্যা। লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রাণের জন্য সামগ্রী এবং এক কোটি টাকা সাহায্য করতে চাইলেন। ইয়াহিয়া বললেন, ভারতের সাহায্য নেব না। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে গর্জে উঠলেন। সারা পূর্ব পাকিস্তান বলল, আমরা ভারতের সাহায্য নেব। ইয়াহিয়া হেরে গেল। "তাকে কড়ে আঙুলের সাহায্য পাঠানো হয়। তারপর আমাদের বিমান হাইজ্যাক করা হল। এসবই আমাকে কর্মব্যস্ত রেখেছে।"

তারপর ২৫ মার্চ পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ শুরু হল পূর্ব পাকিস্তানে। লক্ষ লক্ষ লোক এপারে আসতে আরম্ভ করেছে। মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা হল। পররাষ্ট্র বিভাগের অন্যতম সচিব এস কে ব্যানার্জি একদিন আমায় ডেকে বললেন, "তুমি কলকাতা যাও। মুজিবনগরের নেতাদের সাহায্য করার সব দায়িত্ব তোমার। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। খুব কঠিন কাজ। সাতদিন মুজিবনগর ঘুরে গিয়ে পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউলকে রিপোর্ট দিলাম। বললাম, তাজউদ্দিন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং সাহায্য ইত্যাদির জন্য আর দেরী না করে কলকাতায় অফিস খোলা দরকার। ওই সময় লিবারেশন সরকারের পাঁচ প্রধান সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, খোন্দকার মোসতাক, কামরুজ্জমান এবং মনশুর আলীর সঙ্গে দীর্ঘ কথা হল। ওরা চাইলেন মুক্তি যুদ্ধের সাহায্য। ওদের স্মরণ করিয়ে দিলাম প্রধানমন্ত্রী সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" তারপর ৯ মাস কলকাতায় এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আড়াই মাস ঢাকায় অশোকবাবু বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ছিলেন। ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় হোটেল ইনটার কন্টিনেন্টালে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ডি পি ধর ঘোষণা করলেন, অশোক উইল বি দি ফারস্ট ইনডিয়ান হাই কমিশনার ইন বাংলাদেশ। তখন আমিও ঢাকার ওই হোটেলে থাকি। বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় সাহায্য অশোকবাবু ঢাকায় বসেই দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে করে দেন। কিন্তু জানুয়ারি মাসে ডি পি ধর আবার জানালেন অশোক বাংলাদেশের ব্যাপারে ইমোশনালী ইনভলবড। সুতরাং অশোক হাই কমিশনার হচ্ছে না। —এইসব কথা প্রসঙ্গে অশোকবাবু বললেন, "বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সব কিছু এখনও গোপন রাখা দরকার।" এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করতে অশোকবাবু অসম্মত হন।

'৭২ সালে জুলাই থেকে অশোকবাবু রয়েছেন নিউইয়র্কে। চাকরী জীবনের প্রথম ২২ বছর অশোকবাবু পলিটিক্যাল সেকশনে বেশি কাজ করেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি রাজ্যের জন্য ভারতের এই কনসাল জেনারেল অফিসে বেশির ভাগই বাণিজ্যিক কাজ। আমেরিকানরা অশোকবাবুকে টি-কাউন্সিল অব ইউ এস-এর প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেছেন।

নিউইয়র্কে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানালেন, "নিক্সন প্রশাসন যাই বলুন, আমেরিকার সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী ভারতের বন্ধুত্ব লাভ করতে চান।" একথা তাকে অনেকেই বলেছেন, যে, ভারত বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ, ভারতকে অবজ্ঞা করার অর্থ হবে গণতন্ত্রকে হেয় করা। অশোকবাবু বললেন, "ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সরকারী-বেসরকারী ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্কে যান ব্যবসার লেনদেন করতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা এখানকার কোন ব্যবসায়ী এ পর্যন্ত যাননি। তিনি বলেন, "আমাদের সেলস প্রমোশন একটু ভাল করতে পারলে বিদেশী মুদ্রার জন্য হাহাকার করতে হোত না। আমাদের দারজিলিং-এর 'চা' খুব জনপ্রিয়। ওরা আরও ভাল জাতের চা চান। আমেরিকানরা আগে গরম 'চা' খেতেন না। এখন গরম 'চা'-এর প্রচুর চাহিদা। চাহিদা আছে সুতী বস্ত্রের, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের, ব্যাং, চিংড়ি মাছের।

অশোকবাবু বললেন, "ভারতে তৈরী বিয়ার রাম এবং জিনের ওদেশে খুবই চাহিদা।" কিন্তু কোথায় কোন গলদের জন্য আমরা বাজারটা ধরে রাখতে পারছি না। অশোকবাবু বলেন, আমেরিকান ব্যবসায়ীরা ব্যবসাক্ষেত্রে উচ্চমানের জিনিস চান, দামের স্থিতিশীলতা, এবং সময়মত ডেলিভারি চান।

অশোকবাবু এবার ছুটিতে কলকাতায় এলেও তিনি সারাদিনই টি বোর্ড অফিসে কাটিয়েছেন। স্পষ্ট করে বলেছেন, কেনিয়া এবং আফরিকা থেকে উচ্চমানের 'চা' পাঠানো হচ্ছে। প্রতিযোগিতা প্রচুর। আমরাও যেন ভাল জাতের 'চা' পাঠাই। অশোকবাবু আর একটি প্রশ্নোত্তরে বলেন, "তার এলাকায় অর্থাৎ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব ১৭টি রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ ভারতীয়। এছাড়া আছে নিউইয়র্ক শহরে প্রায় ৩৫ হাজার ভারতীয়। এদের মধ্যে শতকরা ৫-৭ ভাগ বাঙালী। সেখানকার বাঙালীরা কেউ কারুর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না। সম্ভবত এটা এক ধরনের কমপ্লেক্স।

অশোকবাবু কলকাতায় মাত্র কয়েকদিন অবস্থানকালে তার স্কুল ও কলেজ জীবনের সহপাঠীদের খোঁজ খবর নেন। তার স্কুল জীবনের সহপাঠী কলকাতা করপোরেশনের কমিশনার শিবু সমাদ্দার এবং কলেজের সহপাঠী আমাদের সহকর্মী তরুণ ঘোষের কথা বললেন। আমাদের অফিস থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অশোকবাবু জানালেন, '৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি নিউইয়র্কে আছেন। তারপর কোথায় যাবেন জানেন না। তবে কলকাতায় অবশ্যই আসবেন।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

থ্যাকারসীর
তৈরী মেন্ডেড় ফ্যাব্রিক্স-
প্রিণ্ট
TF
কারসী গ্রুপ
মিলস

ঢাকার চিঠি

ফররুখ আহমদ : সাত সাগরের মাঝি

এ ঘুম তোমার মাঝি মাল্লার
ধৈর্য নেইকো আর
সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে
তোলে বিষ ফেন ভার
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে
আকাশের পথ ধরে
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা—
বেনার্দি তোমার পূর্ণ জাহাজে কে
মারজানে মর্মরে?
ঘুম ঘোরে তুমি শুনছো কেবল
দুঃস্বপনের গাথা
........................তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?
—ফররুখ আহমদ
(১৯১৮—১৯৭৪)

কলকাতার কোন দৈনিকেই খবরটা কেন জানি বের হয়নি। স্বভাবতই এখানকার বহু সাহিত্যানুরাগী বাংলাদেশের বহুল বিতর্কিত কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি। জানতে পারেননি আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়, কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তার মৃত্যুর খবর।

শামসুর রাহমানের কথায় ফিরে আসা যেতে পারে। না, তিনি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যাননি। রেখে গেছেন বিপুল কাব্য-সম্ভার: যা আমাদের পথ দেখাবে। তাঁর সাহিত্যের আলোয় নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে বলে শামসুর রাহমান যে আশা প্রকাশ করেছেন, আমি একমত। কেননা, ফররুখ আহমদ সেই কবি, যাকে আমি বাংলাদেশের কাব্য জগতে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রস্তুত।

যদিও আমার এই রচনা তাঁর কাব্য, জীবন ও নীতিবোধের উপর নির্ভর করে। আর সেই জন্য এখানে অতীতের অনেক স্মৃতি এসে ভিড় করবে। তার আচার ব্যবহার এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের যে পরিচয় পেয়েছি, কোন সন্দেহ নেই, আমি তাতে সুখী। অর্থাৎ বলতে চাই, পাকিস্তান ভেঙে গেলে নতুন বাংলাদেশে অনেকেই সুবিধামত নিজেদের নীতি বদলিয়েছেন; পাকিস্তানকে দোষারোপ করেছেন, বাংলাদেশের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়েছেন। ফররুখ আহমদ তা করেননি। নিজের বিশ্বাসে অটল; হয় মরণ, না হয় জীবনধারণ; স্থির প্রতিজ্ঞায় মহীয়ান। পাকিস্তানকে ভুললেও ইসলামের নীতিটাকে বিসর্জন দেননি। কিন্তু অনেকেই দিয়েছেন।

ফররুখ আহমদ মধুসূদনপ্রেমী, তাঁর সার্থক উত্তরসূরী এবং ঠিক তাঁরই মত, বলা চলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অশেষ দুর্গতির মধ্যে, বিনা চিকিৎসায় গত ১৯শে অক্টোবর ঢাকায় মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছাপ্পান্ন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, পুনর্বার ঘোষণার প্রয়োজন বাহুল্য মনে হবে।

মনে পড়ে কেবল 'সোনার তরী' নয়, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ বাদ হয়ে গেলেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় স্কুল কমিটি ঠিক করলেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য যে কোন কবির কবিতা চলতে পারে: কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু নয়। সেটা ছিল পাকিস্তান-সময়।

কেউ বেছে নিল নজরুল ইসলাম, জসিমউদ্দিন, আহসান হাবীব। আমি অন্য-মুখী, ফররুখ আহমদ। ফররুখ আহমদের কবিতা আমার ভাল লাগে তাই।

আমার পাড়ায় থাকেন কিংবা আমি তাঁর পাড়ায়, এই প্রশ্নয়ও হতে পারে। আবৃত্তি একদিন শেষ হয়ে যায়। আমি উৎসাহে খবরটি তাঁকে জানাতে চাই। দেখা হয় মেজ ছেলের সাথে। ফররুখ আহমদ বাড়ি ছিলেন। খুশি হলেন কিনা বুঝতে পারিনি। তবে যথারীতি চা দিয়েছেন। ছড়া লিখে ছোটদের কাগজে হাত পাকাচ্ছি, কিন্তু কি ধরনের ছড়া, না শুনে ছাড়লেন না। আমাকে উৎসাহ দিতে বিমুখ হননি। আমার দুই অগ্রজের সংগে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়: বোধ করি সেই জন্য আমাকে নিজের ছড়া শোনাতে কুণ্ঠিত হননি।

পরবর্তীকালে দেখেছি, বিদেশী স্বদেশী কবির কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। ইকবালের মূল কবিতার সংগে বাংলা তরজমা না শুনলে এই অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন কবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমালাগুলো অনুভব করা দুষ্কর।

চা খাচ্ছেন পলকে পলকে, গল্প করছেন দশ-দিগন্ত সপ্ত-সিন্ধু নিয়ে। দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি বাতাসকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, আর সেই কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করছে। কাব্যালোকে তার ভ্রমণ আরব, ইরান, তুরান থেকে শুরু করে শ্যাম বঙ্গদেশের যশোহরের আলাকোহোলিক নিসর্গ। কাব্যালোচনা করছেন সমসাময়িক কবি থেকে শুরু করে সন্তানতুল্য আরেকজন বালকের সাথে। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে নারাজ। নিজের বিশ্বাসে হেঁটে চলে আলো-আঁধারে, কাউকে ডেকে নিতে দ্বিধায় মাটির দিকে মুখ রাখেন। কেউ এলে হয়তো সুখী হবেন, অথচ না এলে দুঃখ পাবেন না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈনাদের অত্যাচারকে তিনি গ্রহণ করেছেন. পাকিস্তানীদের স্বপক্ষে রেডিওতে কথিকা, গান প্রচার করেছেন, সামরিক ক্রিয়াকলাপকে বাহবা দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবী হত্যায় সায় তো দেননি, বরং মর্মাহত হয়েছেন।

তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সাথে কেউ একাত্ম ঘোষণা করেননি বলে কাউকে দোষারোপ তো দূরের কথা, চোখটা ঘুরিয়ে দেখেননি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে অনেকে রাতারাতি বাংলাদেশের আজীবন ধারক-বাহক বলে চিৎকার করেছেন, বলেছেন, বাংলাদেশের জন্যে তিনি কি-না করেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সেই সব সুযোগসন্ধানী বুদ্ধিজীবীর দল পাকিস্তানের প্রশংসায় একদা নিজেদের মেলে ধরেছেন বিশাল জনসমুদ্রে, যেন নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলে কোন একটি ইসলামাবাদী-রাওয়ালপিণ্ডি তকমা সুনিশ্চিত।

দেখতে পাই পাকিস্তানী আমলে অনেক বুদ্ধিজীবী বলে কথিত একজন ভদ্রলোককে। তিনি পাক আমলে মেয়ের নাম রাখেন আরবীতে মুসলিম নামানুসারে। আর বাংলাদেশের আবির্ভাবের সংগে সংগে চলতি ভাষায় পুরো বাংলায় হিন্দুয়ানীতে। এইসব ঘটনাগুলো তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, বাংলাদেশের প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র রাতারাতি কত দ্রুত বদলে যেতে পারে, তার নমুনা। ফররুখ আহমদ তা করেননি। নিজেকে আগের আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখেই চাকরী হারিয়েছেন, দুঃখকষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। স্বাধীনতার দুই বৎসর পরে ঢাকার একটি দৈনিক কাগজ ফররুখ আহমদের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে উপ-সম্পাদকীয় লিখলে সরকার তাকে চাকরীতে পুনর্বহাল করলেও একজন কবি হিসেবে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেননি।

আগেই বলেছি, ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক মতাদর্শে আমাদের আদৌ কোন বিশ্বাস ছিলো না; তবু একবাক্যে বাংলাদেশের সব ধরনের বুদ্ধিজীবী স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর সাহিত্যকে কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যাবে না। যদিও তাঁর কাব্যে প্রচুর ভিনদেশী শব্দের উৎপাত আমাদের নতুন পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল, তথাপি এক ধরনের উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর দল অন্য চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন তাঁকে। কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম যতখানি সার্থক, ফররুখ আহমদ কোন অংশে কম নয়।

[illegible]

প্রাণ উচ্চারিত হচ্ছে সাহিত্য মহলে। কেউ কেউ গবেষণা করে বিরাট ভল্যুম-এর গ্রন্থ প্রকাশ করছেন।

ফররুখ আহমদের সনেট এক সময় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। সনেটগুলো প্রকাশিত হয়ে দেখ, পরিচয়, চতুরঙ্গে। তাঁর 'ডাহুক' সনেটটি এখনো অনেকের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর 'লাশ' নামক কবিতার সমাজ সংসার চিত্রের যে বাস্তবতা লক্ষ্য করে গেছে, বাংলা কবিতার জগতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া মুশকিল—

আমি দেখি পথের দুধারে
        ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে
        দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে
        জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা,
পাঁশবতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস,
        নারী হলো লুণ্ঠিতা গণিকা।

কবিতার এই চরণটুকুতে সহজেই ধরা পড়ে যায় ১৯৪৩ সালের দুর্দশা; যা এখন আমাদের চোখের সামনে খেলছে।

ফররুখ আহমদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর কবিসত্তা ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে, সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। মহৎ এবং সৃজনশীল কবি। তাই ইসলামী রেনেসাঁসের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হলেও তিনি বিশ্বজনীন মানবতার বাণীকেই করেছিলেন তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য।

মুসলিম পুরাণ ঠিক পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়, আশ্রয় খুঁজেছেন আরব্য উপন্যাসে। দুঃসাহসিক সিন্দাবাদকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কবিতা লিখেছেন ইসলামের নতুন জাগরণের জন্যে।

পাল তুলে দাও ঝাণ্ডা ওড়াও সিন্দাবাদ—
... ...
ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা
        আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার
        ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের
        মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও
        হে মাঝি সিন্দাবাদ।

তাঁর কবিতায় যে শব্দ-ব্যবহার লক্ষ করি, তা শুধু পুরোনো ঐতিহ্যে লালিত নয়, নতুনতর দিগন্তে পতাকায় পাখা মেলবার অপূর্ব সমন্বয় আমাদের বিহ্বল করে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'কে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' সুধীন দত্তের 'দশমী'র সঙ্গে প্রতীকী গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করে ঘোষণা করেছেন, সাত সাগরের মাঝি বাংলা কাব্যেতিহাসে একদার একটা ধারায় উচ্চতম মিনার।

আর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যের শক্তিমান শিল্পী ফররুখ আহমদ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে অনেকেরই আকর্ষণ করলেও প্রকৃত পক্ষে কাউকে সহযাত্রী বা অনুসারী হিসেবে পাননি। তবে সুনীল মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন, বাংলা কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের উৎকর্ষ-বিধানে তাঁর প্রযত্নের অন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা কাব্যের বিকাশ ধারাকে যেমন সার্থকভাবে অনুকরণ করেছেন, তেমনি ইউরোপীয়, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের বিকাশ ধারার সাথেও যোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।'

আবদুল মান্নান সৈয়দ কিংবা সুনীল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য যেমন ঠিক, তেমনি আবার একথাও বলা চলে, উচ্চতম মিনারেই অনেকের পদচারণা শুনতে পাওয়া গেছে এবং তাঁর সমসাময়িক কবিরাই সহযাত্রী কিংবা অনুসারী। নতুন কবির দল অনায়াসে বুঝতে পেরেছিল, ফররুখ আহমদের পথে তাদের যাত্রা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা, শব্দের প্রতি যে মনোযোগ এবং প্রতিভা থাকা দরকার, তা কারুর নেই।

কিছুটা অতীতের ঘটনায় আবার ফিরে আসা যেতে পারে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর কবিসত্তায় যে বিদ্রোহের জন্ম, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে তিনি আইয়ুবী স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত করেছেন বিদ্রূপাত্মক কবিতাধ্বনি। এরপর থেকে (কবে থেকে ঠিক সে সময়টা আমার মনে পড়ছে না) ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আইয়ুব সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রকাশনা বন্ধ ছিল। তাই বলে কাব্যচর্চা বন্ধ হয়নি। লিখেছেন ছদ্মনামে। লিখেছেন অজস্র সনেট, কবিতা, ছড়া।

এইসব ঘটনা একজন কবির কাছে কতখানি মারাত্মক, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ফররুখ আহমদের কবিজীবন ছাত্র অবস্থায়, কলকাতায়। ছাত্র থাকাকালেই তাঁর সুনাম ও গৌরবের মহিমা এতদূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, অনেকের হৃদরোগের কারণ বলে তখন প্রমাণিত হয়েছিল। কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাময়িকীগুলোতে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাজ্য প্রসারিত ছিল সমস্ত পৃথিবীর ভৌগোলিক রাজ্যে।

আমার ধারণায়, বাংলা কাব্য জগতে তাঁর কবিতা ও সনেটগুচ্ছ বিস্ময় হয়ে রইবে। ফররুখ আহমদের মতো বিপুল পরিমাণ সনেট এবং উল্লেখযোগ্য সনেট কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

*

নজরুল ইসলামের সঙ্গে অনেকেই ফররুখ আহমদের মিল খুঁজতে উদ্যোগী কখনো সখনো পেয়ে যান। সত্যি। কিন্তু পুরোপুরি নয়। [illegible] কথা, আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার, আরব ইরান ব কবিতায় প্রধান বলে গ্রহণ করলেও দুইজন দুই পথের যাত্রী।

আগেই বলেছি ফররুখ আহমদ মধুসূদনপ্রেমী, অকৃত্রিম ভক্ত। তবে অনেক সময় মাইকেলের কবিতা ঠোঁটের উপর খেলা করলেও প্রসঙ্গান্তরে ফিরে আসেন বৈদেশিক রোমান্টিক কবিকুলের ধ্রুপদী কবিতার ভুবনে।

তাঁর নিজস্ব কবিতায় মাইকেলের শব্দ ব্যবহারে পিছু-পা হননি। সেখানে আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পেছনে রেখেছেন নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার। আর সেই সঙ্গে দেশজ ঐতিহ্য উদ্ভিদ শিল্পের ঘ্রাণ বড়বেশী প্রকট ছিলো বলেই বাংলার কাব্য জগতে আজ অলৌকিক আসনে আসীন হয়েছেন।

ফররুখ আহমদের অনুবাদ কর্ম এক-সময় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। ইকবালের কবিতার পরিচয় মূলত তিনিই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে করে তোলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত কবিতার জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। ইকবালের কবিতা ছাড়াও জামী, রুমী, হাফিজ এবং গালিবের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ আমরা সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করেছি। শিশু সাহিত্যে, বিশেষত ছড়ার রাজত্বে বাংলাদেশের কোন ছড়াকার এসে এখনো তাঁর আসনটি দখল করতে পারেন নি।

অর্থাৎ ফররুখ আহমদ সর্বত্র গম্ভীর ভাবে হেঁটে গেছেন, 'নীল আকাশের তারার বনের স্বপ্নমুখর মনে/আখরোট বনে/বাদাম খুবানি বনে'।

ফররুখ আহমদের প্রকাশিত [illegible] সংখ্যা প্রায় পনেরটি। এর মধ্যে কাব্যনাট্য, ছড়াও উল্লেখ্য।

মৃত্যুকালে বাইশখানা অপ্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ রেখে গেছেন। যা আমাদের 'নতুন পানিতে সিন্দাবাদের মতো সফর করাবেন।'

*

ফররুখ আহমদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে কল্পনাতীত। তাঁর মৃত্যুর পরে গোরস্থানে কবর দেবার মতো কাফনের কাপড় কেনবার মত অর্থ গৃহে কিংবা ব্যাংকে: না, কোথাও ছিলো না। আর ঢাকার শহরে জমি তো বহু দূরের কথা।

ফররুখ আহমদের দাফন সম্পন্ন করলেন একজন অগ্রজতুল্য বন্ধু কবি বেনজীর আহমদ। নিজের জায়গা থেকে মাত্র সাড়ে তিন হাত জায়গা দিয়ে।

দাউদ হায়দার

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি

প্রতি বছর 'ব্যস্ত' ঋতুতে (busy season) রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া নতুন করে ঋণ সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা করে থাকে। এ বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষণা করেছে তার অভিনবত্ব আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সর্বপ্রথম একাধিক ব্যাঙ্ক রেট প্রথা চালু করেছে। এখন থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পুনর্বাট্টা হার (rediscount rate) ৯ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত হবে। নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অর্থ জমা রাখার বিধিবদ্ধ ন্যূনতম পরিমাণ (minimum statutory balances) পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে চার শতাংশ করা হয়েছে; এই ১ শতাংশ কমে যাবার মধ্যে ০·৫ শতাংশ কমবে এ বছর ১৪ ডিসেম্বর থেকে এবং অবশিষ্ট ০·৫ শতাংশ কমবে ২৮ ডিসেম্বর থেকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যে অর্থ জমা রাখে তার বিধিবদ্ধ ন্যূনতম পরিমাণ ১ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অতিরিক্ত ১২০ কোটি টাকা থাকবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতিতে ঋণ প্রদান করার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলি এজন্য আরও বেশি করে ঋণ পাবে আশা করা যায়। রপ্তানিভিত্তিক শিল্প ও ভোগ সামগ্রী শিল্পের জরুরী চাহিদা মেটাবার কাজেও এই টাকা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে যে কঠোরতা এখন বর্তমান আছে, তা যথারীতি থাকবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নীতি ঘোষণায় এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রশমনের কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শ্রীজগন্নাথন জানিয়েছেন যে, নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল একদিকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিহত করা এবং অপর দিকে বিনিয়োগ বজায় রাখা, উৎপাদন বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন ঘোষিত নীতিতে বলা হয়েছে যে, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্ব দিতে হবে কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর দিকে এবং খাদ্যশস্যের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা ঠিকভাবে কার্যকর করার মতো

ভারতের অর্থনীতি

প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার দিকে। কৃষির উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সব সরঞ্জাম ও উপকরণের প্রয়োজন সেগুলির উৎপাদন যাতে বাড়ে অথবা যাতে সেগুলির সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের দিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নির্বাচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গত কয়েক বছর যাবৎ যে উদার নীতি অনুসরণ করে এসেছে তার কোন পরিবর্তন হবে না। বেসরকারী ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সার উৎপাদন, কীটনাশক জিনিস উৎপাদন, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মূল ধাতব ও খনিজ জিনিস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, এ সব ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার সময়ে কার্যকর মূলধনের (working Capital) যা প্রয়োজন তা-ই বিবেচিত হবে। খাদ্যসামগ্রী, তুলা, তৈল বীজ, ও তেল, চিনি এবং সব রকমের কাপড় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তা বজায় রাখা হবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে এবং এর ফলে যে একাধিক ব্যাঙ্করেটের সৃষ্টি হবে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে বলা শক্ত। তত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেবার অর্থ হল, ঋণ গ্রহণের খরচ (cost of borrowing) আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাতে ঋণগ্রহীতাদের ঋণ গ্রহণের আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, ব্যাঙ্ক থেকে বেশি সুদে টাকা ধার করলে (ব্যাঙ্ক রেট বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও টাকা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার আরও বেড়ে যাবে) শিল্পসংস্থাগুলির উৎপাদন-ব্যয় প্রচণ্ড বেড়ে যাবে। তার ফলে এখন থেকে শিল্পসংস্থাগুলির উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা তা হলে কি কমবে? বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমাবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতি আরও কঠোর করা দরকার, এটা

যেমন ঠিক, তেমনি [illegible] উৎপাদন বিশেষ করে কৃষিজাত জিনিস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় টাকা [illegible] যাতে অত্যধিক বেড়ে না যায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবুও বলা যায়, এখন সব দিক দিয়েই যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল মজুতদারদের আরও বেশি ঋণ নেওয়ায় উৎসাহ না দেওয়া। যদি ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি অনুৎপাদনমূলক ব্যবসায় ও মজুতদারী প্রতিরোধ করার জন্য আর্থিক চাপের সৃষ্টি করে তবেই তা সঠিক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একাধিক সুদের হারের প্রভাব বা ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব কী হবে তা বলা এখনই সম্ভব নয়। তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে কিছু দিন পর। ব্যবসায়ী মহল কিছুদিন যাবৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ দানের নীতির কড়াকড়ি শিথিল করবার জন্য সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আর্জি পেশ করছিলেন. তাঁদের বক্তব্য ছিল, ঋণদান নীতির বাড়াবাড়ির জন্য দেশে মন্দার সৃষ্টি হতে চলেছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর ডক্টর হাজারি বলেছেন, উৎপাদনের যদি ব্যাঘাত ঘটে থাকে তবে তা টাকার অভাবে ঘটেনি, অন্যান্য কারণে এই ব্যাঘাত ঘটেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ টাকার যোগান যে হারে বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। শুধু টাকার যোগান বেড়ে যাওয়াই বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ নয়, যদিও এটাই অন্যতম প্রধান কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বাড়িয়ে ঋণদান নীতির কঠোরতা বাড়িয়েছে বটে, অপরদিকে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ব্যাঙ্ক-রেট অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির net minimum liquidity ratio ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৯ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মোট যে টাকা ঋণ দিতে পারে তার পরিমাণ কিছু বাড়ানো হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির দুইটি বিশেষ অঙ্গ হল, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা (regulatory role) এবং অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করার ভূমিকা (promotional role)। এই দুই উদ্দেশ্যের সার্থক সমন্বয়ের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির সাফল্য নির্ভর করে। বর্তমান সময়ে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাই সব চেয়ে জরুরী। সেজন্য বর্তমান ঋণ নীতি উন্নয়নমূলক হওয়ার অনুপাতে বেশি মাত্রা নিয়ন্ত্রণমূলক হয়েছে।

সুব্রত গুপ্ত

আলোচনা

কবিপত্নী মৃণালিনী

দেশ, ১৭ই আগস্ট, ১৯৭৪, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "তাঁর (মৃণালিনী দেবীর) সঠিক জন্ম তারিখের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।" তবে সম্প্রতি মৃণালিনী দেবীর ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পুত্র বিশ্বভারতীর জন-সংযোগ বিভাগের কর্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (বীরেন্দ্রনাথ?) জানিয়েছেন মৃণালিনী দেবী ১২৮০ সনের ১৮ই ফাল্গুন (১লা মার্চ, ১৮৭৪) জন্ম গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ যে ২৪শে অগ্রহায়ণ, ...১২৯০, (ইং ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) হয়, তাতে রবীন্দ্র গবেষকদের মতভেদ নাই কারণ এ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে স্বয়ং কবির লিখিত পত্র রবীন্দ্র-সদনেই সংরক্ষিত আছে। প্রবন্ধ লেখক "এক বছরের ছোট" হেমলতা দেবী ঠাকুর)কে একস্থানে "বালিকা বধূ" এবং মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন কনে দেখতে "রবীন্দ্রনাথ যশোর যান নাই।" অথচ ঐ প্রবন্ধেই অবনীন্দ্রনাথের জবানীতে আছে "পিসিমারা, জিজ্ঞাসা করেছেন, কীরে, কনে দেখেছিস্, পছন্দ হয়েছে?"

দেশ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, '৭৪ (পৃঃ ৫৪৭-৫৪৮) আত্রেয়ী ভট্টাচার্য লিখছেন বিয়ের সময় "রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৩ বছর পার হয়ে গিয়েছে।"

দেশ, ২১শে সেপ্টেম্বর, '৭৪ (পৃঃ ৬২৭-৬২৮) অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেমলতা ঠাকুরের জবানীতে বলছেন, "কাকিমা (মৃণালিনী দেবী) প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন, মাত্র এক বৎসরের বড়।" হেমলতা দেবী তাঁর মতে জানুয়ারী, ১৮৭৪-এ জন্ম গ্রহণ করেন। কাজেই বয়সে হেমলতা দেবীই (তাঁর মতে) কয়েক মাসের বড়।

অমৃত,... ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ (পৃঃ ৩১), এক পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীভ্রাম্যমাণের মতে "রবীন্দ্রনাথ ২৩।২৪ বৎসর বয়সে বিয়ে করেন। মৃণালিনী দেবীর তখন ১৩।১৪ বছর বয়স।" অমিতাভ চৌধুরী "রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা" গ্রন্থেও লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ২৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে কাদম্বরী দেবীর বয়স সম্বন্ধে উক্ত পত্রে শ্রীচৌধুরীকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে হিরন্ময়বাবু যথার্থই বলেছেন যে বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর সাত মাস। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১ থেকে হিসেব করলে এবং গড়ে ৩০ দিনে মাস ধরলে রবীন্দ্রনাথের বয়স দাঁড়ায় ২২ বৎসর ৭ মাস ২ দিন। আর এই সোজা হিসাবে কোন গরমিল থাকার কথা নয়। আমাদের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের বিবাহকালে বয়স সম্বন্ধে আত্রেয়ী দেবী এবং অমিতাভ চৌধুরী '২৩' এবং শ্রীভ্রাম্যমাণ '২৩।২৪' বলছেন কেন?

মৃণালিনী দেবীর জন্ম যদি ১লা মার্চ, ১৮৭৪ই ধরে নেয়া হয় তবে বিবাহ সময়ে তাঁর বয়স ৯ বৎসর ৯ মাস ৮ দিন (গড়ে ৩০ দিনে মাস ধরে) হওয়া উচিত। শ্রীভ্রাম্যমাণ মৃণালিনী দেবীর বয়স ১৩/১৪ বৎসর কোথায় পেলেন? স্পষ্টই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে বিবাহের সময় হেমলতা দেবী কুমারী এবং দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রথমা পত্নী সুশীলা দেবীর মৃত্যুর পর" "রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সাত বৎসরেরও পরে" হেমলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর (দ্বিপেন্দ্রনাথ) বিবাহ হয়। পূর্ণানন্দবাবু হেমলতা দেবীকে তাহলে "বালিকা বধূ" বললেন কেন? উপরোক্ত তথ্য ও যুক্তি অনুসারে তাহলে সিদ্ধান্ত এই, কি পূর্ণানন্দ বাবু, কি আত্রেয়ী দেবী, কি অমিতাভ চৌধুরী, কি শ্রীভ্রাম্যমাণ কেউই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নন।

এই সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র "আজকাল" সম্পাদক (পরে শতাব্দীর সম্পাদক) মুরারি দে, ১ ক্লাইভ রোড, কলকাতা থেকে ১৫-৮-১৯৪৬ তারিখে আমাকে একটি পত্র দেন, অবশ্য এর পরেও তিনি লিখেছেন, হেমলতা ঠাকুর, প্রতিমা ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতির কাছ থেকে "আজকালের" জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি বিষয়ক ধরনের রচনা সংগ্রহ করে দিতে। ঐ খামে তিনি সকলকে এবং হেমলতা ঠাকুরকেও একটি পত্র দেন। হেমলতা ঠাকুর তখন শ্যামলিকভবনের পাশে 'দেহলি' অথবা পাশেই

থাকতেন। রবীন্দ্র বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলেন তার সারমর্ম হ'ল, কবি ঢোল-ডগর বাজিয়ে বর সেজে বাইরে বিয়ে করতে যান নাই।—বিয়ে জোড়াসাঁকোতে হল—কনেকে জোড়াসাঁকো আনা হল—কনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ের দেশ যশোরের এবং সম্পর্ক কেমন বোন হত। রবীন্দ্রনাথের মা, মাতামহী, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীও ছিলেন ঐদিকের কনে। তিনি বলেন, কনে দেখতে রবীন্দ্রনাথ সহ তাঁরা যশোর গিয়ে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সম্ভবত ২২ এবং কাকিমা ভবতারিণীর (মৃণালিনী) বয়স সম্ভবত বছর দশেক হবে মত—মাঝারি-পাতলা গড়নের ছিলেন। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত "রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ ১৯৭৩ ইত্তেফাক'-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তিনি একথাও বলেন "কাকিমা তাঁর থেকে বয়সে বড়" ছিলেন। বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়সের সমস্যার সমাধান হ'ল।

হেমলতা দেবী এবং মৃণালিনী দেবীর বয়স সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে তাঁদের জন্ম তারিখের গবেষণা-সম্মত প্রমাণ আবশ্যক। রবীন্দ্র গবেষকদের পক্ষ থেকে এক্ষণে একান্ত অনুরোধ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় (বীরেন্দ্রনাথ?) এবং অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্বন্ধীয় সঠিক প্রামাণিক তথ্য পেশ করবেন। অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন, সে যুগের মহিলারা তাঁদের জন্ম সন তারিখ সম্বন্ধে অন্যের কথার উপরই বেশী নির্ভরশীলা থাকতেন—এ নিয়ে খুব মাথা ঘামাতেন না। কবির কনে দেখতে যশোর গমন সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবীর উক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বাচনিক থেকে স্মৃতি উদ্ধারের সময় "বিয়ে করতে" যশোর যান নাই-এর সঙ্গে সম্ভবত "কনে দেখার" তালগোল পাকিয়ে গেছে। নইলে পিসিমারা কনে "পছন্দ" হয়েছিল কিনা একথা বলবেন কেন? মৈত্রেয়ী দেবী যদি এ সম্বন্ধে উচ্চ-বাচ্য না করেন তবে ধরে নেয়া যাবে আমাদের ধারণা অমূলক নয়। পত্নী স্মৃতি সম্বন্ধে 'স্মরণ' ছাড়াও শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রায়' উল্লেখিত মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়। এছাড়াও ১৮৮৩-তে বিবাহের পর রচিত এবং মৃণালিনী দেবীর জীবৎকাল পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্য, গান, রচনাবলী অতি সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে, বিশেষ করে গাজীপুর ও শিলাইদহের নিভৃত অবস্থানে, কবি-পত্নীকে পাওয়া যায় না কি? পত্নী যখন মারা যান কবি তখন পঞ্চাশোর্দ্ধে, ভুললে চলবে না কবিমানস তখন রিটেলেকটিভ, এছাড়া তাঁর ঋষিত্ব, সংসারের ভার, বিশ্ব-

শোক ভোলবার জন্য এসবেরই ত প্রয়োজন ছিল! সে-সব কথা বিভিন্ন সময়ে, এমনকি মৈত্রেয়ী দেবীকেও কবি বলেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পত্নীকে লিখিত পত্র, ঠাঁর 'মুগির ডাল, কুলির অম্বল' দুটি রবন্দুর দেশের কথা নিয়ে তামাশা ঠাট্টা, অন্যদিকে কবি সম্বন্ধে পত্নীর ঐতিহ্যবাহী ঠাকুর পরিবারে সংক্রান্ত সগর্ব শ্রদ্ধা মিশ্রিত সহযোগিতা, কোন'ট রবীন্দ্র গবেষকের দৃষ্টি এড়াবার মত? ১৯৭৩ এবং পরে '৭৩ এ সৈয়দ মুজতবা আলী রথীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেটে পরলোকচর্চা সম্বন্ধে (শ্রীচৌধুরীর রচনা প্রকাশেরও বহু পূর্বে) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রথীন্দ্রনাথের বিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হ'ল তা স্ত্রীর প্ল্যানচেট নির্দেশ মতে। আমরা দেখেছি কি অধীর আগ্রহে তিনি এই চর্চায় মেতে থাকতেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃণালিনী সম্বন্ধে তিনি আমাকে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেন এবং উৎসাহ দেন এই শূন্য দিগন্তে পদচারণার জন্য। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহও করে আসছি, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সদনেও যাওয়া প্রয়োজন। ভাবতে অবাক লাগে কি অপূর্ব সংযম এবং ধৈর্যের সঙ্গে শোক-দুঃখ পূর্ণ ক্ষুরধার সংসার নদীর তীরে বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য—একক মাঝি সোনার তরী বেয়ে চলেছেন। দেশ-এর এই আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন এ নিয়ে যদি একটি গ্রন্থ লিখিত হয় তবেই কবি পত্নী সম্বন্ধে সকল ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হ'তে পারে। এ বিষয়ে সহযোগিতা কাম্য।

আশরাফ সিদ্দিকী

ঢাকা-৫

বিদেশী বই

২রা কার্তিক ১৩৮১, প্রকাশিত দেশের 'বিদেশী বই' বিভাগে প্রিয়শর্মা কৃত সলঝেনিৎসিনের গুলাগ আর্কিপেলাগো বই-এর পর্যালোচনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

বিভিন্ন সূত্রে সলঝেনিৎসিনের এই ঢাক্কাজাগান বই ইতিমধ্যে অনেকের হাতে এসে গেছে। কাজেই আগ্রহশীল পাঠকগণ 'দেশে' শ্রীপ্রিয় শর্মা-র আলোচ্য পর্যালোচনা প্রকাশের আগেই গুলাগ আর্কিপেলাগো পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং সলঝেনিৎসিনের বই-এর বিষয়বস্তু ও বক্তব্য কি তা জেনে বলা যায় প্রিয়শর্মা গুলাগ আর্কিপেলাগোর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি—ওঁর উদ্ধৃতি অনুসারে বইটি সাসিসজাত লেখকদের মধ্যে একজনের 'সৃষ্টি' হওয়া সত্ত্বেও। সুস্থ সমালোচনা প্রিয়শর্মার নিবন্ধে পদে পদে বিঘ্নিত। মনে হয় বইটির আলোচনা করতে বসে স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদের কবলগ্রস্ত হয়ে তিনি অজান্তে সমালোচকের নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে গেছেন।

আপেক্ষিক বিচারে সলঝেনিৎসিনের গুলাগ আর্কিপেলাগো কমিউনিস্ট দুনিয়ার নিসন্দেন-নিশানা বলে মনে হয় না। সে রকম ইঙ্গিত বা প্রস্তাবনাও বই-এর কোথাও নেই। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ হাজির করে লেখক যে কি বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, বিশেষ ধরনের ক্ষোভের আড়ালে প্রচ্ছন্ন। সে ক্ষোভ নানা ব্যক্তিগত কারণেই হ'তে পারে। কিন্তু সমালোচক প্রিয় শর্মার বিচারে তা কি ভাবে এবং কেন ঐতিহাসিক মূল্য পেল বোঝা যায় না। রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর সরকারের অত্যাচার পালিত শাসন ব্যবস্থার জনক লেনিন ও স্টালিন ইতিহাসের আর এক জোড়া তৈমুর লঙ্ কিংবা নাদির শা না হলেও আসলে সে ভীরু, কাপুরুষ, নিষ্ঠুর সলঝেনিৎসিনের লেখার আড়ালে প্রিয় শর্মার এই সিদ্ধান্ত তারই মনগড়া; লেখকের সংযোজিত তথ্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে এবম্প্রকার সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ সলঝেনিৎসিনের দুর্বল-যুক্তি ও বক্তব্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বা মতামতের পক্ষে অপর্যাপ্ত। অবাস্তব পরিসংখ্যান, অযৌক্তিক ব্যাখ্যা, স্থূল প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা বইটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সারবস্তু এতে খুব কমই আছে। এমন কি অত্যাচার উৎপীড়নের প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগীদের উক্তি এবং জবানবন্দীর মধ্যেও বিস্তর অসঙ্গতি, অতিশয্য দোষ নজরে পড়ে। স্থানে স্থানে পরস্পরবিরোধী বর্ণনা এবং কষ্টকল্পিত পরিস্থিতিরও অবতারণা করা হয়েছে। এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে গুলাগ আর্কিপেলাগো না হয়েছে ইতিহাস, না সাহিত্য। সেদিক থেকে বিচার করলে বইটি প্রিয় শর্মার ভাষায় নিশ্চয় "অসাধারণ"। কিন্তু আমার মনে হয় পুস্তক রচয়িতা বই-এর এই দুর্বল দিকগুলি সম্বন্ধে নিজেও সজাগ ছিলেন বলে কোন প্রকার চূড়ান্ত মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন। কারণ, প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ বলে কোন কিছু ঘটনা কল্পনা করা এবং কার্যক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তা প্রমাণ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল যে ব্যবধান সে জ্ঞান বুদ্ধিমান সলঝেনিৎসিনের এক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী। অথচ আমাদের প্রিয় শর্মা মহাশয় কেমন সহজেই না গুলাগ আর্কি-

পেলাগেয়াকে সলঝেনিট্‌সিন ও তাঁর বন্ধুদের অভিজ্ঞতার "দলিল" বলে চালিয়ে দিলেন। অভিজ্ঞতার "সাধারণ বিবরণ" এবং "অভিজ্ঞতার দলিল" তাৎপর্যের গভীরতায়, ব্যাপকতায় যে সমার্থক নয় এ কথা প্রিয় শর্মার অজানা নয়।

বিনয়কুমার ভট্টাচার্য
কলিকাতা—৩৫

জাদুঘর থেকে চুরি

না, সেটি আর এবার হল না। সময়োপযোগী সম্পাদকীয় 'জাদুঘর থেকে চুরি'-তে (দেশ ৪১ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা) আপনারা যে শেষ কথাটি লিখেছেন—"সুতরাং কলকাতার জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া মূর্তিগুলো যে উদ্ধার হবেই, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।"—সেটি দুর্ভাগ্যের মুখে ছাই দিয়ে অমূলক বলে প্রমাণিত হল। অসংখ্য ধন্যবাদ কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা দফতরকে। এক আশ্চর্য তৎপরতায় এবার এরা দিন তেরর মধ্যে সমস্ত জাল গুটিয়ে এনে চমৎকৃত করেছেন দেশবাসীকে। শুনেছি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ডিরেকটর গোয়েন্দা দফতরের প্রধান শ্রীবিভূতি চক্রবর্তী ও এই সন্ধানে তাঁর সহযোগীদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—'সমগ্র জাতি আজ আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।' পুরাতত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসাবে এই জাতীয় সম্পদের প্রত্যাবর্তনে আমরা খুশী হয়েছি। জানা গেছে, এক বিদেশী (কানাডার নাগরিক ফ্রাঙ্ক সিকিউলাস) প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খাটিয়ে এ যাত্রায় মূর্তিগুলো পাচার করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের পথে। সে যাক্‌গে, আপনারা লিখেছেন সবসমেত পনেরটি মূর্তি খোয়া গিয়েছিল। আসল তথ্য ষোলটি। যতদূর জানি, এর দুটি সারনাথ থেকে পাওয়া, দুটো যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংকিস্সা ও সোয়াট উপত্যকা থেকে, অন্য ক'টি মথুরা থেকে সংগৃহীত। অধিকাংশই হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি যেমন, বরাহ-অবতার, গণেশ, শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন ধারণ, একমুখ লিঙ্গ, মহিশমর্দিনী (দুটি), সরস্বতী, শিবমস্তক, নাগদম্পতী, গরুড়, নারীমস্তক। বৌদ্ধ দেবদেবী বলতে পদ্মপাণি, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়, পাঞ্চিক ও হারীতী এবং দুটি বুদ্ধমস্তক। বেলেপাথরেরর এই মূর্তিগুলো ছোট ছোটো। সবচেয়ে ছোট্টটি চার ইঞ্চি, বড়টি পনের ইঞ্চি।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এবার যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব ছিলেন হারানিধি ফিরে পাবার জন্য। বেতার, সংবাদপত্র, কাস্টমস্‌, আরকিওলজিকাল সারভের দফতর, দেশ বিদেশের মিউজিয়াম, এমনকি আন্তর্জাতিক পুলিস সংস্থা ইন্টারপোল সর্বত্র খবর করেছিলেন।

চিঠি লিখলাম এ কারণে, যে গুরুত্বপূর্ণ এই মূর্তিসংগ্রহটি পুনরুদ্ধার করাও যে হয়েছে, 'দেশ'-এর উদ্‌গ্রীব পাঠক সে কথা জেনে স্বস্তি বোধ করবেন।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী
কলকাতা—৫৩

ঢাকার চিঠি

গত ২৮শে সেপটেমবর দেশ-এ প্রকাশিত ঢাকা থেকে জনাব রাহাত খান প্রেরিত 'ঢাকার চিঠি' শিরোনাম যুক্ত প্রতিবেদনের এক স্থানে 'ডে'পুতে বেহাগ' থিয়েটার-এর প্রযোজনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যগত দিক দিয়ে এটা ভুল। আসলে 'ডেপুতে বেহাগ' নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে নিবেদিত নাটক।

'ডেপুতে বেহাগ' নাগরিক এর নিয়মিত নাটক ছিল।

এস, এস, আখতারুজ্জামান
[illegible] ঢাকা—১

গানের আসর

২রা নভেম্বর ১৯৭৪ সালে 'দেশ পত্রিকার' শার্ঙ্গদেব রচিত 'গানের আসর'-এ আগমনী সম্বন্ধে তাঁর সুচারু তথ্যপূর্ণ রচনা পড়ে যতদূর আনন্দ পেলাম—ঠিক ততোদূর দুঃখ পেলাম তাঁর মারাত্মক ভুল লক্ষ্য করে।

শার্ঙ্গদেব হঠাৎ কি করে, বহুল প্রচারিত ধীরেন দাস গীত—'আজ আগমনীর আবাহনে' ও 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে' গান দুখানিকে কাজী নজরুল ইস্লাম সাহেবের রচনাভুক্ত করে দিলেন? এই দুখানি গান আমারই রচনা ও সুরারোপিত। গ্রামোফোন কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারতেন।

হীরেন বসু
(গীতিকার ও সুরকার)
কলকাতা-১৯

সাহিত্য সংবাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি

শারদীয় 'এক্ষণ' পত্রিকা প্রতি বছরই নতুন কিছু উপহার দেয়। গত বছর এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি অদ্ভুত ধরনের গদ্য রচনা, যে রকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গদ্য আমি বহুদিন পড়িনি।

এবারে এই পত্রিকার ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি। এই ডায়েরির অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমরা অবহিত ছিলাম না, তাঁর মৃত্যুর এতদিন পর এর আবির্ভাব এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রিয় লেখকদের অন্তরঙ্গ জীবনী জানতে কার না আগ্রহ হয়।

মোটমাট বারোখানা খাতা পাওয়া গেছে। তার থেকে মাত্র চারখানি খাতা ছাপা হয়েছে এক্ষণ পত্রিকায়। সম্পাদনা করেছেন যুগান্তর চক্রবর্তী। মাঝে মাঝে অনেক পৃষ্ঠা ফাঁকা। এবং অনেক পৃষ্ঠাতেই মাত্র দু'চার লাইন লেখা। কিন্তু তা ছাড়াও যা পাওয়া গেছে, তার মূল্য অসামান্য।

ডায়েরিগুলি, যা ছাপা হয়েছে, মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে লেখা। কিন্তু কোনো লেখাতেই মৃত্যুর কোনো ছাপ নেই। দারিদ্র্য ও অসুস্থতায় যখন তিনি প্রায় নিমজ্জমান, সেই সময় অতুল গুপ্ত এবং আরো কিছু কিছু বাঙালী সাহিত্যিক এবং কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত চেষ্টায় ব্যবস্থা হয় তাঁর চিকিৎসার। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় ইসলামিয়া হাসপাতালে। তিনি বেশ প্রসন্ন মনেই নিয়েছেন ব্যাপারটাকে। তাঁকে সেরে উঠতে হবে, শরীরটাকে শক্ত করে নিয়ে আবার লিখতে হবে—এইটাই বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। কোনো রকম নৈরাশ্যের স্থান নেই এই লেখকের জীবনে। এখন, তাঁর সমস্যাটা দু রকম। অত্যধিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। শরীর সারাতে গেলে চিকিৎসার সময়ে অন্তত মদ্যপান ছাড়তে হয়। আবার মদ্যপান ছাড়লে তাঁর লিখতে ইচ্ছে করে না, রাত্রে ঘুম আসে না। এই ব্যাপার নিয়ে তিনি প্রায় সব সময়েই নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মেতে আছেন। ডাক্তার, শুভার্থী, বন্ধু ও সাহায্যকারীরা তাঁর মদ্যপান ছাড়াতে বদ্ধপরিকর আর এই লেখক, হাসপাতালের ক্যাবিনে শুয়েও পুরোনো নেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুত নানা কৌশলে তাঁর মদ জোগাড় করার বর্ণনাগুলি আদ্যোপান্ত মজার। আমাদের দেশে এই সব কথা বাইরে প্রকাশ করার রীতি নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরির একাধিক জায়গায় লিখছেন, ওরা কেউ বুঝবে না, আমি কেন মদ খাই।

দিনলিপিতে মাঝে মাঝে উল্লেখ আছে কোনো এক মায়ের, সম্ভবত কালীর, কোনো ধার্মিক বা আধিদৈবিক শক্তির। ডায়ালেকটিকস বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের এই ধরনের ঘটনায় অনেকের খটকা লাগতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, অনেক লেখকের জীবনেই একটা রহস্যময় দিক থাকে, এটাও সেই রকমই একটা কিছু। অনেক মহাপুরুষের জীবনেও এমন অনেক ছোটখাটো দুর্বলতা হঠাৎ চোখে পড়ে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু সেই জন্যই তাঁর মহত্ত্বকে খর্ব করার চেষ্টা ছিঁচকেমির নামান্তর।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো চিন্তাও করেন নি যে, এই ডায়েরি কখনো ছাপা হবে। কোথাও কোনো সচেতন বাণী নেই, জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে ভাবগম্ভীর বক্তব্য নেই, এমনকি নিজের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কেও উল্লেখ খুব কম। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁকে টাকার হিসেব করতে, অনটন যাঁর নিত্যসঙ্গী, তাঁর পক্ষে এটা আশ্চর্যের কিছু না। এবং অনেক পাতায় খাদ্যদ্রব্যের তালিকা। একদিন একটু বেশী কিছু খেলে কি গভীর তৃপ্তি! এ রকম কথাও তিনি লিখেছেন, 'আজ দুপুরে খাওয়ার সময় (১১২) এক বাটি ডাল খেলাম। কতকাল ডাল খাইনি। বাড়িতে কয়েক চামচ ডালের জল খেতাম!

প্রায়ই অনেকে আসে, তারাশঙ্কর, সুভাষ ও গীতা মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, অন্যান্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধ, স্ত্রী, পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন—তবু, দু'একদিন কেউ অনুপস্থিত থাকলেই তাঁর বিস্তৃত প্রশ্ন, কেউ আসছে না কেন? আমার বন্ধুরা কি আমাকে ভুলে গেল? পার্টির লোকরা কি আমাকে ত্যাগ করল? তারপরই আবার ফুটে ওঠে তাঁর অনবদমিত একরোখা মনোভাব। 'কাল আত্মীয়বন্ধুরা কেউ এল না কেন, ভাবছি।...

যাক গে। বেশ আছি।...

একলা একলা হলেও খারাপ লাগে না। আমি তো চিরদিন একা।'

ইসলামিয়া হাসপাতাল থেকে খানিকটা সুস্থ হয়েই জোর করে বাড়ি চলে এলেন। একা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পৌঁছাবার একটু বাদেই জানতে পারলেন, স্কুলে খেলতে গিয়ে তাঁর মেয়ের পা ভেঙে গেছে। 'গেলাম কাশীপুর হাসপাতালে। টিটুর পা প্লাস্টার করা।...আমায় দেখে কেঁদে ফেলল। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমায় দেখে বুকে বল পেয়েছে। চিরদিন আসল দায় আমিই তো করি।'

এর পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ভর্তি হয়েছিলেন লুম্বিনী পার্কে। সেখান থেকেও কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে আবার নানান লেখা, অর্থ চিন্তা, সংসার চালাবার চিন্তা। মৃত্যুর মাত্র মাস কয়েক আগে লিখছেন, 'ক'দিন থেকে শরীর খুব খারাপ... কী যে দুর্বল বলা যায় না—বিছানা থেকে উঠবারও যেন শক্তি নেই—এদিকে ঘরে পয়সা নেই—জোর করে তো বেরুলাম, ফিরবো কিনা না জেনে Writers B জা রায়ের ১৫০ টাকার চেক নিয়ে ভাগ্যিসে বাড়ি ফিরলাম ৩টায়। চেক্টা পেলাম তাই রক্ষা।'

কিন্তু আমরা জানি শেষ রক্ষা হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান মাত্র ৪৮ বৎসর বয়েসে।

সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, তিনি ডায়েরি থেকে সামান্য কিছু অংশ নিতান্ত ব্যক্তিগত বলেই বাদ দিয়েছেন। বাদ দেওয়ার কথা শুনলেই বেশী কৌতূহল জাগে কিংবা আফসোস হয়। অত্যন্ত পরিশ্রম করে সম্পাদনা করার জন্য যুগান্তর চক্রবর্তী নিশ্চিত আমাদের ধন্যবাদার্হ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তিনি লেখকের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত বলেই হয়তো তাঁর পক্ষে নির্লিপ্ত হওয়া শক্ত। ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন, লেখকের মদ্যপান বা ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কোন 'পক্ষ' কি ভাববে, তা অনেকটা কৈফিয়তের মতন শোনায়—এর কোনো দরকার ছিল না।

সনাতন পাঠক

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন

দেশব্যাপী যে রবীন্দ্র চর্চা ব্যক্তিগত প্রয়াসে চলছে সাহিত্য, শিল্পে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সাংবাদিকতায় তাকেই একমঞ্চে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী এক রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেছেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। উদ্বোধন করবেন শ্রীউমাশংকর যোশী।

রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্পর্কিত আরও চারটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবিমল রায় ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি আসবেন সম্মেলনে। সম্মেলনের সদস্য দক্ষিণা ১০.০০, প্রতিষ্ঠানগত সদস্য দক্ষিণা ২৫.০০।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ জানিয়েছেন যে, ৭৩ শরৎচন্দ্র বসু রোডে সম্মেলন অফিস প্রতিদিন সন্ধ্যায় খোলা থাকবে। যাঁরা সদস্য হতে ইচ্ছুক এবং সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে চান তাঁদের এ সময়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

আমার সহধর্মিণী উচ্চ শিক্ষিতা। তাঁর বাংলা ভাষায়, বিশেষ রবীন্দ্র সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তিনি একজন ভালো পাঠিকা। গল্পের আসরে সাহিত্য নিয়ে বেশ জমকালো সমালোচনাও করতে পারেন। কিন্তু কই আমাদের দীর্ঘ ২৯ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁকে দিয়ে তো এক লাইনও লেখাতে পারলাম না। তাঁর কথা, 'লিখে কি হবে?'

ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল কলেজের রচনা তাদের মাকে দিয়ে লেখাতে চাইলে উনি বলেন, 'আমায় বিরক্ত করিস না, বাবার কাছে যা।' আমার এই লেখাটা গিন্নিকে দেখাতে তিনি ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন—'বুড়ো তো হয়েছ, এখনো পাগলামি ছাড়লে না, আর আমাকেও সারা জীবন জ্বালালে। দেখগে আমার বোনেদের স্বামীদের, তারা সবাই কেমন দিনরাত টাকার ফিকিরে ঘুরছে—বোনেদের কত গয়না, কত দামী দামী শাড়ি, ঘরভর্তি আসবাবপত্র—...আর তুমি ম্যাজিস্ট্রেট! আহা মরি এই সব ছাই আজেবাজে জিনিস নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে। বাব্বা! কি কপালই করে এসেছিলাম যে, তোমার মত এক অপদার্থের সঙ্গে জীবন কাটাতে হলো......।'

দেখছেন তো মেয়েরা কেন লিখতে পারে না তার আসল কারণটা কোথায় নিহিত তারা 'পাগল' হওয়া দূরের কথা, জীবনে কোন উচ্চ আদর্শের ধারও ধারে না। যারা লেখে সে মেয়েরা ব্যতিক্রম—এ কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার স্ত্রীকে নারীজাতির প্রতীক ধরে নিয়ে আমি হাড়ে হাড়ে এই বুঝেছি যে, মেয়েরা যত লেখাপড়াই করুক না কেন, তারা সবাই সেই 'সোনার হরিণে'র পেছনেই তাদের মানুষদের দৌড় করাতে চায় আর মানুষ তা না পারলেই ওই মানুষের হয় আমার মত এই গরীবের অবস্থা। আর সময় সময় স্ত্রীর ঐসব কথা শুনে মনে হয়, কে জানে হয়তো কবি ইয়েটস ঠিকই বলেছেন—

"Ladies .... may sigh over a life without meaning, which is yet all they can know of life."

শুভেন্দুমোহন মুখোপাধ্যায়
বাদলপুর

॥ ২ ॥

দিন মাস বছরের চাকায় সমাজ এগোচ্ছে দ্রুত তালে। এখন আর সমাজের দোহাই দিয়ে সাহিত্য জগৎ থেকে মহিলারা সরে থাকতে পারবেন না। মেয়েদের মধ্যে সাহিত্য-বোধ যে পরিমাণে এসেছে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বা ক্ষমতা সে রকম লক্ষণীয় নয়। কেন নয় সেটা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, মেয়েরা বেসিক্যালি ঘরমুখী, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের ঔৎসুক্য, আকর্ষণ এবং যোগাযোগ যতই থাক, একটি মেয়ে ঘর সম্পর্কে যতটা চিন্তা করতে পারে বাইরের জগত সম্পর্কে ততটা দ্রুত পারে না।

দ্বিতীয়ত, সংসার নামক ব্যাপারটায় তাদের প্রায় সর্বক্ষণ জড়িত থাকতে হয় বলে সময়ও কম পান তাঁরা। (তার মানেই এই নয় যে সংসারের ঝামেলা যাঁদের কম তাঁরা সকলেই সাহিত্য নিয়ে মাথা

ঘামাচ্ছেন)।" তৃতীয়ত, পুরুষেরা যেমন নিজের চেষ্টায় পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ গোষ্ঠী বা দল গড়ে তোলেন, সাহিত্য জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, মেয়েরা তেমন পারেন না। এর কারণ বেশ কিছুটা অর্থনৈতিক এবং কিছুটা সুযোগ সুবিধার অভাব। মেয়েরা হয়তো লেখা সংগ্রহ করতে পারেন, নিজেরা লিখতে পারেন কিন্তু ছাপানো এবং পত্রিকার প্রচারের ব্যাপারে তাঁরা একটু পিছু হটে যান। চতুর্থত, মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী, সেই কারণে তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, আলোচনাচক্রে কিংবা বিখ্যাত সেই আড্ডাগুলোতে অংশ নিতে বা যোগদান করতে সক্ষম হন। 'শনিবারের চিঠির' আড্ডা বা কল্লোলের কালের আড্ডার মত মজলিশ এখন আর তেমন হয় না। যাও বা দু'একটি হয় তাতে মেয়েদের উপস্থিতি প্রায় থাকেই না।

ইরা গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-১১

॥ ৩ ॥

পঞ্চাশ বছর আগে যে সব লেখা মেয়েদের নামে চলে যেত এখন তা চলবে না। লেখার মান এখন পুরুষ এবং মেয়ের আলাদা নেই। ভালো লেখা না হলে শুধু মেয়েদের নাম দেখে লেখা ছাপাবার দিন চলে গেছে। পুরুষদের লেখার সাথে পাল্লা দিয়েই লিখতে হবে কিন্তু তারা যে সময় ও স্বচ্ছন্দ্যটুকু পাচ্ছে মেয়েরা তো সেটা পাচ্ছে না।

লীনা রায়
কলকাতা-৫৮

॥ ৪ ॥

'কবিতা পড়ুন' আন্দোলন একাদন কবিতা অনুরাগীর সংখ্যা বাড়িয়েছে, 'মহিলারা আরও বেশী করে লিখুন' এই আন্দোলন কি হতে পারে না?

বৈজয়ন্তী দত্ত
কলকাতা-১৯

নতুন লেখক সম্পর্কে

'দেশ' ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার সাহিত্য সংবাদে আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, যে কোন লেখা অমনোনীত বিবেচিত হলে অনেকে ধরে নেন যে, নিশ্চয়ই ঐ কাগজে নানান চক্রান্ত রয়েছে এবং সেইজন্যেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়নি।

সত্যিই যদি কেউ এরকম ধারণা সব সময়েই পোষণ করতে থাকেন—তাহলে তো শুধুই দুর্ভাগ্যজনক। তবে যাঁরা নতুন লেখক, অখ্যাত বা স্বল্প পরিচিত, তাঁদের লেখা যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা হয় মূলত সেই সব পত্র পত্রিকার সম্পাদকের ভালো লাগা সাপেক্ষে। এখন এই ভালো লাগা—যার ওপর নবীন লেখকের কোনো লেখা প্রকাশিত হবে কিনা এই ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভরশীল — নিতান্তই আপেক্ষিক। একই লেখা এক পত্রিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর অন্য সম্পাদকের মনোনয়ন লাভ করেছে এবং প্রকাশিতও হয়েছে এরকম প্রচুর নজির আছে। আর একটা প্রশ্ন, আমাদের দেশে রাজনীতি, খেলাধুলো প্রভৃতির মতো সাহিত্যক্ষেত্রেরও কোথাও কি কোনোই গোষ্ঠীগত ব্যাপার নেই, নেই তিল পরিমাণও চক্রান্ত? কেন বিশেষ এক ধরনের উদ্দেশ্যমূলক লেখা না লিখতে পারলে কোনো কোনো কাগজে প্রবেশের ছাড়পত্রই পাওয়া যায় না, কেনই বা কখনো সখনো জোটবদ্ধ হয়ে একজনকে সম্ভাবনাময় ঘোষণা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়? একটা সংকলনগ্রন্থ হাতে নিয়ে অপরিহার্য কারো নাম না দেখে যেমন চমকে উঠি, সে রকম অনেকের অদ্ভুত উপস্থিতিও আমাদের কম বিস্মিত করে না।

আপনি এই সূত্রে আরও লিখেছেন যে, কারো লেখা অমনোনীত হলে তার মনে কি এই সন্দেহ একবারও উঁকি দেয় না যে হয়ত লেখাটি সত্যিই ভালো হয়নি। বাস্তবিক, যে-কোনো সৎ এবং পরিশ্রমী লেখকের পক্ষে আত্মতুষ্ট হবার অবকাশ নেই। নিজের সব রচনা সম্পর্কেই তাঁর একটা অতৃপ্তিজনিত খুঁতখুঁতুনি থেকেই যায়। প্রসঙ্গত আপনি স্বীকার করেছেন নামী লেখকের অনেক বাজে লেখাও প্রকাশিত হয় এবং যেহেতু তারা সরাসরি পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ, সে জন্যে এঁরা বাজে লিখলে পাঠকই এঁদের প্রত্যাখ্যান করবেন। কিন্তু এ বাবদে দায়িত্ব শুধু পাঠকের একার নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক নামী লেখক নিজেই জানেন না ঠিক কোন সময়ে থামতে হবে। ফলে তাঁরা তাদের জীবদ্দশাতেই নিজেদের সুনামহানির ব্যবস্থা পাকা করে রেখে যান।

দেবাশিস বসু ও প্রশান্ত রায়,
কলিকাতা-৩২

অর্থনীতি : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে। সুরদাস। দীপিকা। ৩০।১-এ, কলেজ রো, কলি-৯। মূল্য ৮ টাকা।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার অভাব নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পাবলিক সেকটর একচেটে পুঁজির অপর পাল্লায় অবস্থান করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। ধনের সুষম বণ্টন সম্ভব করে তোলে। দেশের শিল্পনীতিতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর সেই কারণে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে : (১) ক্ষুদ্র শিল্প কুটির শিল্প (২) বৃহৎ শিল্প (৩) বৃহৎ শিল্পের এলাকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। তিনটি স্তরের কোথাও মাথা ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা নেই। সাধারণ মানুষের স্বল্প সঞ্চয়, রাষ্ট্রীয় সাহায্য পুষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের পথ প্রস্তুত করবে। বৃহৎ পুঁজি গড়ে তুলবে বৃহৎ উদ্যোগ। এর পরই আসছে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তৈরি বিভিন্ন সংস্থা, সে সংস্থায় যে শুধু শিল্পোদ্যোগ থাকবে তা না, পরিবহণ সংস্থা হোটেল ইত্যাদিও থাকতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে সুরদাস রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুন্দর তথ্য চিত্র পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তিনি বিষয়বস্তুকে এইভাবে সাজিয়েছেন : রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য কি ছিল এবং আমরা কোথায় আছি। ব্যর্থতা, অনুন্নত পরিচালন ব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি : পরিচালকমণ্ডলী এবং শ্রমিক-কর্মী সম্পর্কের টানাপোড়েন বিপর্যস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্পর্কে জনসাধারণের নিস্পৃহ ভাবের কারণ কি, কেন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশার প্রতিফলন সম্ভব হল না। সাফল্যের মূল্যায়নের মাপকাঠি কি হওয়া উচিত, গতানুগতিক লাভ লোকসানের মাপকাঠি, না সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য-পালনের দৃষ্টিকোণ অথবা অর্থনৈতিক প্রগতিসাধনের পরিপ্রেক্ষিত।

৮৮ পাতার ক্ষুদ্র পরিসরে সহজ ও সর্বজনবোধ্য করে সুরদাস কোটি কোটি টাকার ব্যর্থতার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিছু কিছু উদ্ধৃতিতে একই কথা বারে বারে বলা হয়েছে। ভূমিকাতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উদ্দেশ্য কি তা যখন বলাই হয়েছে তখন অন্যান্য জায়গার উদ্ধৃতির পরিসরকে বিভাগীয় আলোচনায় ব্যবহার করা যেত। ছাপা সম্পর্কে আর একটু সচেতন হলে ভাল হত না কি?

অর্থনৈতিক রচনা-বিচিন্তা। সম্পাদনা, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও প্রবন্ধনাথ রায়। দি নিউ বুক স্টল, ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

অর্থনীতি যে নীতির সঙ্গে পণ্ডিত থেকে শুরু করে হাটের মানুষের জীবনও জড়িয়ে আছে তা সহজ করে তুলে ধরার প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করবেন না। বিদেশে এই ধরনের জনপ্রিয় প্রকাশনের অভাব নেই। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের প্রকাশকরা এই ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় বর্তমান অর্থনৈতিক তাণ্ডবের বহু আলোচিত, জনপ্রিয় কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠকদের সামনে আসতে পেরেছেন।

প্রথমে ছোট ছোট কিছু ঘটনা বা গল্পের টোপে গেঁথে অর্থনীতির অনেক রুই কাতলা পণ্ডিতেরা অগাধ জল থেকে সহজে তুলে এনেছেন। যেমন কালো টাকা সম্পর্কে কার না কিছু জানতে ইচ্ছে করে। টাকার দাম সম্পর্কে সকলেরই জাগ্রত কৌতূহল। বর্ধিত জনসংখ্যার শীতল পরিণতি সম্পর্কে একটা আশংকার ভাব জাগিয়ে তোলার মধ্যে একটা বাস্তব যুক্তি আছে। ম্যালথাসই সেই যুক্তির জন্মদাতা। সাদা বাজারের পাশাপাশি কবে থেকে কালো বাজারের প্রচলন হল সকলেরই জানতে ইচ্ছে করবে, জানতে ইচ্ছে করবে মুক্তির রাস্তা। মোটর গাড়ির চেয়ে সস্তার বাইসাইকেলের প্রয়োজন কেন বেশি, কেন টেলিভিশনের কথা না ভেবে আপাতত সস্তার ট্রানজিস্টারের কথা ভাবব সে আলোচনাতেও আমাদের উৎসাহের অভাব নেই।

অর্থনীতির সবকটি মুক্ত বিভাগ যেমন জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, মুদ্রা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ নিবন্ধের লেখক শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। লেখক সূচীতে অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী ভবতোষ দত্ত, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, সন্তোষ ভট্টাচার্য, ধীরেশ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার সেনগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মীরা রায়, সম্পৎ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধনাথ রায়। বাংলাদেশ সম্পর্কেও একটি ক্ষুদ্র বিভাগ সংযুক্ত হয়েছে। ছাপা বাঁধাই সুন্দর। গতানুগতিক পাঠ্যসূচীতে বইটি কিছু ভিন্ন স্বাদের।

জীবনী

বিপ্লব-তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ। ললিতকুমার সান্যাল। প্রকাশক—মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি। অনুশীলন ভবন, ৩২।৮ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০। মূল্য দশ টাকা।

যাঁদের জন্মগ্রহণে কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হন তাঁদের কথা আমরা জানি, আবার সঠিক জানিও না। তাঁদের দুশ্চর সাধনার কত কঠিন মুহূর্ত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে তার কতটুকুই বা আমরা খোঁজ রাখি। বিপ্লবী-সাধক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ এমনই এক মহান পুরুষ, যাঁর সমগ্র পরিচয় শুধুমাত্র একটি জীবনী-গ্রন্থেই পাওয়া যাবে না। তাঁর বিপ্লবী-জীবনের বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা এককালে কিংবদন্তীর মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের আতংক এবং ভারতের বিপ্লবীদের গুরু ও পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ বাংলার বিপ্লব-সাধনায় ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যোগসাধন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গীতোক্ত সাধনার প্রতিমূর্তি, আধ্যাত্মিক সাধক, বাইরে অক্লান্ত কর্মবীর। ত্রৈলোক্যনাথের, বাক্তিগত তপস্যার শেষে যে উষার উদয় তা কোন রাজকীয় প্রতিষ্ঠা নয়। মহারাজ অগণিত দেশবাসী এবং বহু দেশনেতার অন্তরে যে রাজ-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার কাছে যে-কোন উচ্চ সরকারী পদ ছিল অতি তুচ্ছ। শেষ জীবনে—মহাপ্রয়াণের অব্যবহিতকাল পূর্বে—ভারতের মাটিতে দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে পেরে ধন্য।

শ্রীসান্যালের লেখা এই জীবনীগ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের বহু ঘটনাই লিপিবদ্ধ। লেখক মহারাজের বৈপ্লবিক কর্মজীবনের কথা যেমনি বলেছেন তেমনি মানুষ ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয়ও প্রকাশ করেছেন। এক একবার কিভাবে তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়েছেন কিংবা কেমনভাবে সহকর্মীদের নিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করেছেন—মহাবিপ্লবীর ঘটনা-বহুল জীবনের এই সব কথা পড়ার কালে রোমাঞ্চিত হতে হয়। রোমাঞ্চের চেয়েও যা বড় সেই মহৎ প্রেরণাই এই জীবনীগ্রন্থ-পাঠকদের আকৃষ্ট করে রাখে। [illegible]

একে একে সব চলে গেলেন, মহারাজও নেই। মহারাজের তিরোভাবের সঙ্গে যেন এক বিশেষ যুগের অবসান হল। সেই যুগের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও চরিত্রবলের এক মূর্ত প্রতীক ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর এই ভাবমূর্তি বইটিতে পরিস্ফুট। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সেই যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ও যেন আমরা পেয়ে যাই বইটিতে। শুধু অনুশীলন সমিতির কর্মযজ্ঞই নয়, সারা দেশে তখন যে বিপ্লব ও আত্মদানের জোয়ার এসেছিল এই বইয়ে তারই এক বেগবান চিত্র পাওয়া যায়। স্বচ্ছন্দ ভাষায় লেখা এই জীবনী রচনার খুবই প্রয়োজন ছিল আজ। দেশকে ভালবেসে এবং ভগবানকে চেয়ে একটি জীবন কিভাবে কর্মময় মহাজীবনে রূপান্তরিত হতে পারে সে কথাই আজ হয়তো বিশেষভাবে অনুভব করা দরকার। এই পুস্তক সেই অনুভবের দরজা খুলে দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'রহস্যময় রূপকুণ্ড' যাঁরা পড়েছেন, বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সাম্প্রতিক বই **হিমালয়ের ফুল** (শঙ্খ প্রকাশন, কলকাতা ৯, তের টাকা) হাতে নিয়ে তাঁদের মনে হতে পারে যে, এ-ও নিশ্চয় তেমনই এক ভ্রমণ-কাহিনী। নামকরণ বুঝিবা ব্যঞ্জনাময়। হয়তো ফুল মানে কোনো রূপরাজি। নারী কিংবা প্রকৃতির। নারী হওয়াই বেশি স্বাভাবিক, কেননা বাংলা ভ্রমণ-কাহিনীর অধিকাংশই জলো উপন্যাসের ছদ্ম আধার।

কিন্তু না। একেবারেই তা নয়। হিমালয়ের ফুল বলতে হিমালয়ের ফুলই বুঝিয়েছেন বীরেন্দ্রবাবু। পর্বতারোহী পর্যটক হিসেবে তিনি বার বার ছুটে গিয়েছেন দুর্গম তুষারসরণিতে। সেই সারণি পথে তাঁর চোখে পড়েছে যে ঝরণা ঝাঁপিয়ে নেমে উপত্যকা বেয়ে নিশ্চল সবুজ বনানী। কিংবা দেখেছেন উন্নত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ কীভাবে প্রভাতী মেঘকে অবহেলা করে রক্তিম বর্ণচ্ছটায়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী না হয়েও তাঁর রূপপিপাসু মন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এই বিচিত্র পুষ্প প্রজাতি সম্পর্কে। গভীর অনুসন্ধিৎসা, বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং বহুদিনের অধ্যবসায় সহযোগে তিনি একখানি পুরো গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন হিমালয়ের কোলে ফুটে-থাকা বহু জানা-অজানা ফুলের বিষয়ে। সাধারণ পাঠকের জ্ঞান নিশ্চয়ই বাড়বে, কিন্তু বইটির মুখ্য রস বশ্যই আকৃষ্ট করবে সম্ভবত উদ্যানবিলাসী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের। অন্তত দু-জন প্রবীণ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর প্রশংসাসূচক অভিনন্দন যে তিনি ইতিমধ্যেই আদায় করতে পেরেছেন, তার লিখিত প্রমাণ বইয়ের মধ্যেই সংযোজিত।

*

"পাঠক, কুড়িটি গল্প নিয়ে এই সংকলন আপনার কাছে উপস্থিত। গল্পগুলি পড়বার সময়, জানি, এতদিনকার গল্প-পাঠের সংস্কার আপনার মধ্যে কাজ করতে থাকবে।......তবু আবেদন, ধৈর্য ধরে গল্প-গুলোর কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করুন। এই রীতি বদলকে আপনার সংস্কারের ওপর আঘাত বলে যেন মনে করবেন না। এই বদলটা অনিবার্য প্রয়োজন কিনা ভেবে দেখবেন।" এই সরল আবেদন রেখেছেন অতীন্দ্রিয় পাঠক তাঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ **অন্তর্মুখ/পরিক্রমা-র** (অবাস্ত, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) মুখবন্ধে। অর্থাৎ গল্পগুলি পড়ার আগেই পাঠকের মন যাতে তৈরী হয়ে থাকে নতুন রীতির এই রচনা সম্পর্কে তারই প্রস্তুতি এবং নির্দেশ। কথাটা মিথ্যে নয়। দীর্ঘ ছ' বছর কালের মধ্যে এই কুড়িটি গল্পই বেশ ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সাজিয়ে অন্যরকম রচনা। তবু অনভ্যস্ত জিভে এর স্বাদ খুব গাঢ় লাগে না। হয়তো সংস্কারের দোষ, হয়তো প্রস্তুতির অভাব। কিন্তু পুরো দায়িত্বই কি পাঠকের? একেবারে শেষ দুটি রচনায় ('গণ্ডীর ভেতর' এবং 'ক্যালেণ্ডার আর জানালার গল্প') লেখকের বক্তব্য কিছুটা স্পর্শ করা যায়। সেদিক পূর্ববর্তী আঠারোটি লেখার অভিঘাতে নাকি গল্পগুলিই কিঞ্চিৎ বক্তব্য-প্রধান হলো? শুধু রীতি-বদল কোনো গল্পকেই গল্প করে তোলে না। কিন্তু নতুন রীতির সৎ গল্প পাঠককে শুধু চমকে দেয় না, গ্রাস করে, অভিভূত করে। অবধারিতের মতো সাহিত্যে তার জায়গা করে নেয়। এর দৃষ্টান্ত বিদেশে খোঁজার প্রয়োজন কী। এদেশেও রয়েছে। সংখ্যায় অল্প হলেও।

পত্রিকা

শারদীয় দক্ষিণী বার্তা। সম্পাদক : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। ৩৬বি, কে পি রায় লেন, কলকাতা ৩৩। দাম : পাঁচ টাকা।

আলোচ্য পত্রিকার সম্পাদক রাজনীতির জগতের লোক। প্রখর সমাজ-সচেতন। সেই চেতনার আলোক পত্রিকার পরিকল্পনায় বিচ্ছুরিত। বিশিষ্ট লেখকদের গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদির বাইরে সাধারণ মানুষদের সম্পাদক টেনে এনেছেন সূচীপত্রে যাঁদের মধ্যে আছেন বেকার যুবক, নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ, ফুটপাথের হকার-দোকানদার প্রভৃতি। সাক্ষাৎকারের এই পর্যায়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র, সংগীত, খেলাধুলার জগতের, এমন কি আরক্ষা বিভাগের দুই প্রধানকেও উপস্থিত করেছেন সম্পাদক। স্বল্পতেই পত্রিকাটি বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, নানাভাবেই বৈচিত্র্যময়। এমন একটি সুসম্পাদিত পত্রিকা তার নিজের গুণেই সকলের প্রশংসা আদায় করে নিতে পারে।

ভারতের এক নম্বর ব্রিজ খেলোয়াড়

কথা হচ্ছিল আমাদের অফিসেই, ক্রীড়া সাংবাদিক রাজন বালা এবং আমার সঙ্গে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ষোড়শ জাতীয় ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপের সংবাদ পরিবেশনা সম্পর্কে। সংবাদপত্রে স্থানের অভাব। ওই সময় নানা খেলার মেলা। তাসের আসরেও জমা হবে সারা ভারতের শতাধিক দল। কিভাবে জাতীয় ব্রিজের সংবাদ অল্প কথায় আকর্ষণীয় করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তরুণ সাংবাদিক অলক দাশগুপ্ত বলল, বিশেষ বিশেষ খেলার বিবরণ দেওয়াও তো সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলার বিশেষত্ব ফুটিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেশী আকর্ষণীয় হবে। যেমন বাংলার রবি রায়ের সঙ্গে বোম্বাইয়ের টিম্বরিওয়ালার খেলার বিবরণ।

আগন্তুক সবিনয়ে বললেন, 'আমিই রবি রায়।' তরুণ সাংবাদিকের চোখে হঠাৎ যেন নতুন দর্শনের আনন্দ। রবি রায়ের নামই শুনেছিল, চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটেনি কোনদিন।

তরুণ সাংবাদিক কেন, ডাকসাইটে তাস খেলোয়াড় রবিবাবু অনেকের কাছেই অপরিচিত। কারণ আমাদের দেশে ব্রিজ খেলার তেমন প্রচার নেই। কাগজে ব্রিজ খেলোয়াড়দের ছবিও প্রকাশিত হয়নি অন্যান্য ক্রীড়াবিদদের মত। তবে পরিচিত মহলে এবং তাসের আসরে রবি রায়ের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তাসের যাদুকর নামে অভিহিত।

পি সি সরকারের যাদু বা ইন্দ্রজাল নয়—নিজের হাত বাদে তিন হাতের অজানা ৩৯ খানা তাসের হদিস ঠিক করে বিড করা এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে অতি দ্রুত খেলে কন্ট্রাক্ট পূর্ণ করার মধ্যে যেন যাদুকরের দক্ষতা।

সব খেলাতেই শিল্পের ছোঁয়াচ আছে, সৌন্দর্য আছে। শিল্প ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ আছে তাস খেলাতেও। তবে নিশ্চয়ই অকশান ব্রিজে তেমন নয়, যেমন আছে কন্ট্রাক্ট ব্রিজে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অকশানের সঙ্গে কন্ট্রাক্টের পার্থক্য পুকুরের সঙ্গে অকুল সমুদ্রের পার্থক্যের মত। কন্ট্রাক্টে কার্ড-প্যাকের প্রশ্ন নেই। ছল-চাতুরী বা ইঙ্গিত ইশারার সুযোগ নেই। বিড-এর অর্থ জানার অধিকার আছে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের। অথচ অত্যন্ত জটিল এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও হিসাবের খেলা। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাসের সঠিক হদিস করে বিড করা এবং নির্ভুলভাবে খেলে কন্ট্রাক্ট পূরণ করতে না দেবার মধ্যেই কন্ট্রাক্ট ব্রিজের সৌন্দর্য। রবি রায়ের পার্টনার হিসাবে কিংবা প্রতিপক্ষ হিসাবে যাঁরা খেলে থাকেন তাঁরা তো স্বীকার করেনই, যাঁরা পাশে বসে খেলা দেখেন তাঁরাও স্বীকার করেন নিঃসন্দেহে রবি রায় এখন ভারতের এক নম্বর ব্রিজ খেলোয়াড়।

কেউ কেউ পরিহাস করে বলেন, তোমার হাতের উল্টোপিঠে কি অদৃশ্য এক্স-রে যন্ত্র ফিট করা আছে? না হলে ওভাবে তাসের হিসাব কর কি করে?

ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি সঙ্গীর সঙ্গে তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে রুইয়া ট্রফি পেয়েছেন (৬৬, ৬৭ ও ৭৩ সালে)। আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে

রবি রায়

দু'বার পেয়েছেন গুরু দত্ত ট্রফি (৭১ ও ৭৪ সালে), দু'বার হোলকার ট্রফি (৭১ ও ৭৩ সালে)। একবার পেয়েছেন সিংহানিয়া ট্রফি (১৯৭২ সালে)। বাংলার কেউ তো নয়ই—আজ পর্যন্ত ভারতের কোন খেলোয়াড় জাতীয় স্তরের চারটি ট্রফি লাভ করতে পারেননি। হোলকার ছাড়া তিনটি ট্রফি পেয়েছেন বোম্বাইয়ের টিম্বরিওয়ালা ও বাংলার নলিনী সেন। সিংহানিয়া বাদে বাকি তিনটি জয়ী হয়েছেন বাংলার শান্তি সেন। রবিবাবুর নিজের বিচারে যিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিজ খেলোয়াড়। অবশ্য বোম্বাইয়ের শ্রীরাম শেঠিকেও রবিবাবু শান্তি সেনের সঙ্গে ব্র্যাকেটে শীর্ষস্থান দিয়েছেন।

রবি রায়ের নিজের মত যাই হোক, পরিসংখ্যান এবং ব্রিজ রেজিস্ট্রার কিন্তু বলছে সাম্প্রতিক খেলার বিচারে রবি রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৭৩ সালে জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান সহ টানা ৬টি রেজিস্টার্ড ব্রিজ টুর্নামেণ্টে বিজয়ী হয়েছেন। আজ পর্যন্ত কেউ এ সম্মান পায়নি। ৬টি প্রতিযোগিতাতেই পার্টনার ছিলেন শান্তি সেন।

ব্রিজ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার অনুমোদিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যের ভিত্তিতে ক্রমপর্যায় রচনার ব্যবস্থা আছে, সম্মানের শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন জুনিয়র মাস্টার, মাস্টার, সিনিয়র মাস্টার, লাইফ মাস্টার ও গ্র্যাণ্ড মাস্টার। পয়েণ্ট দেওয়া হয় যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যানুপাতে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী। রবি রায়ই এখন 'গ্রাণ্ড মাস্টার' তালিকার শীর্ষে আছেন, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে।

এতবড় খেলোয়াড়কেও কিন্তু ১৯৭২-এ নিয়মিত খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি বিশ্ব ব্রিজের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায়। পূর্বাঞ্চলের আসর বসেছিল সিঙ্গাপুরে। ওখানে ভারত জিততে পারলে মিয়ামি বীচে গিয়ে বারমুডা বৌল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ পেত। জয়ের সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বেশির ভাগ খেলায় বাংলার রবি রায়, মিলন রায়, শান্তি সেন প্রমুখকে সিঙ্গাপুরের হায়াৎ হোটেলে বসিয়ে রেখে অপর খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ দেওয়ায় ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে ফিরে আসে। বাংলার নামী খেলোয়াড়দের বসিয়ে রাখার কারণ ব্রিজ ছাড়া অন্য কিছু। যোগ্যতা অনুযায়ী রবি রায় ছিলেন ভারত দলের প্রতি খেলায় অপরিহার্য।

তাস-দাবা পাশা তিন কর্মনাশা বলে যে কথাটি আছে, রবিবাবুর জীবনের সঙ্গে তার কণামাত্র মিল নেই। রাইটার্স বিল্ডিংসে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টের হেড অ্যাসিসট্যাণ্ট। তাস খেলেন চাকরীর শর্ত পুরোপুরি পূরণ করে। কম্পিটিশনে খেলা ছাড়া আলুনি খেলা খেলেন না। ব্রিজের বইপত্র পড়াও সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছেন। বেলগাছিয়ায় গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেটে ওর এম আই জি ফ্ল্যাটে ক্লাব, ডায়মণ্ড, হার্টস, স্পেড, নো-ট্রাম্প-এর আওয়াজও শোনা যায় কচিৎ-কদাচিত। ঘরের আলমারী ঠাসা কিন্তু ব্রিজের নানা পুরস্কারে। ৪৩ বছর জীবনে ২৫ বছর ধরে ব্রিজ খেলছেন। জিতেছেন কম করে শতাধিক টুর্নামেণ্ট। এখন যেন ব্রিজ সম্পর্কে বেশ আত্মস্থ। সেদিন রীতিমত বিস্ময় বোধ করলাম যখন ওঁর স্ত্রী বললেন, আমি তাসের 'ত' বুঝি না এবং আমাকে বোঝাবার জন্য ওর ফ্ল্যাটে এক সেট তাস খুঁজে পাওয়া গেল না, সংগ্রহ করতে হল অন্য ফ্ল্যাট থেকে।

মুকুল

খেলার মাঠে

পর্দার উপর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল

গত জুলাই মাসের ৭ তারিখে মিউনিখ অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ঘাসের উপর যারা বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলাটি দেখার সুযোগ পেয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা ভাগ্যবান। টেলিভিশনের পর্দার উপরে পৃথিবীর যে কুড়ি কোটি ফুটবলপ্রেমী ওই খেলা দেখেছে তাদের ভাগ্যের ওপরও অনেকের হিংসা আছে। কিন্তু ছায়াছবির পর্দায় কলকাতায় যে ক্রীড়ামোদীরা ওই খেলা দেখেছে তারাও কি কম ভাগ্যবান ? কেননা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল ম্যাচ হিসাবে প্রশংসিত পশ্চিম জার্মানী ও হল্যাণ্ডের ওই ফাইনাল খেলা দেখা তো ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে জীবনের চরম দর্শনেরই মত।

পশ্চিম জার্মান কনসুলেটের ব্যবস্থাপনায় ছবিটি অল্প কয়েকদিনের জন্য এসেছিল কলকাতায়। দেখার সুযোগ পেয়েছে মাত্র কয়েক হাজার দর্শক। একদিন প্রেস ক্লাবে, একদিন ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবে, একদিন কাস্টমস হাউসে এবং তিনদিন ম্যাক্সমুলার ভবনে ছবিটি দেখানো হয়। কোন সিনেমা হাউসে দেখানার ব্যবস্থা হয়নি। হলে এ রাজ্যের ফুটবল খেলোয়াড় এবং দর্শকরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রোমহর্ষক ফুটবলের আভাস পেত, যার মধ্যে রয়েছে চরম উত্তেজনা, আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে ওঠা-পড়ার ছন্দসুখ এবং শিল্পশৈলীর সঙ্গে অচিন্তনীয় উৎকর্ষ।

পুরো ফাইনাল খেলার দু'ঘণ্টার ছবি। সত্যিই যেন ছবি। যেন খেলা নয়। গোলাকার একটি বস্তু নিয়ে সংগ্রামের শ্বাসরুদ্ধকারী এক নাটক, যে নাটকের নট ২২ জন নিখুঁত ফুটবল শিল্পী, নিয়ন্তা একজন রেফারি।

হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর খেলা সম্পর্কে আমরা অনেক রিপোর্ট পেয়েছি। বলা হয়েছে নৈপুণ্য, দক্ষতা, কল্পনাশক্তি এবং বিন্যাসের মাধ্যমে আগামী শতাব্দীর ফুটবলের ছক এবং ভঙ্গি এরা তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু সেটা যে কত উঁচু তারই পরিচয় পেলাম পর্দার উপরে।

ফুটবল যে একজনের খেলা নয়, ১১ জনের খেলা সেটা আমরাও জানি, আমাদের খেলোয়াড়রাও জানে। কিন্তু দিবাদৃষ্টি খোলার মত সত্যিই জানলাম এই ছবি দেখে। নিঃসন্দেহে কারো কারো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠছে, ২২ জনর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়ক ফ্রানৎস বেকেন বাউয়ারের। তবু কেউ যেন কারো চেয়ে কম নয়। মেশিনের মত খেলা। নিখুঁৎ পাসিং, নিখুঁৎ রিসিভিং, অবিশ্বাস্য ডজিং ও ট্যাকলিং। সারা খেলায় একজনকেও একটি বারের জন্যও ভুল পাস বা ভুল রিসিভ করতে দেখিনি। দেখিনি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে একটিও বল মারতে। বলের উপর যেন প্রাপক এবং গন্তব্যস্থানের ঠিকানা লিখে সবাই বল মেরেছে। খেলোয়াড়দের মতই ফুটে উঠেছে রেফারি জন টেলরের পরিচালন দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্ব।

ছবিটির বিশেষত্ব ফাউল, পেনাল্টি কিক, একচুলের জন্য গোল মিস এবং চরম উত্তেজনার মুহূর্তগুলি দ্বিতীয়বার দেখানো হয়েছে স্লো মোশানে। যেমন প্রথম মিনিটেই হল্যাণ্ডের অধিনায়ক যোহান ক্রুইসকে জার্মানীর ব্যাক বার্টি ভগটস-এর ফাউল করার দৃশ্য এবং পেনাল্টি কিক থেকে নীসকেনসের গোল করার কারুকার্য। ঠিক একইভাবে দেখানো হয়েছে হল্যাণ্ডের ব্যাক সুরবিয়ার পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফাউল করেছে জার্মানীর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন লেফট আউট হোয়েলজেনবিনকে এবং সে কিক থেকে গোল শোধ করছে ব্যাক ব্রাইস্টনার। গার্ড ম্যালারের জয়সূচক গোলটির ছবি এবং অবধারিত গোল বাঁচানোর কয়েকটি ছবিও একইভাবে দ্বিতীয়বার স্লো-মোশানে পর্দার উপর ফুটে উঠেছে। স্লো-মোশনের পর দেখানো হয়েছে সাময়িকভাবে শিল্পী খেলোয়াড়দের নিশ্চল দৃশ্য—যে যেখানে যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল—অপূর্ব সে দৃশ্য। মাঝে মাঝে দর্শকদের অভিব্যক্তি এবং দুই দলের কোচ ও ট্রেনারদের মুখের নানা ছবিও পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে। ছবির সঙ্গে ধারা বিবরণী থাকায় মিউনিখ স্টেডিয়ামে বসে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল ম্যাচ দেখার আমেজই যেন উপভোগ করেছি।

কুড়ি কোটি টাকার লড়াই

মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্ব খেতাবী লড়াইয়ে জর্জ ফোরম্যানকে অষ্টম রাউণ্ডে নকআউট করে মহম্মদ আলী হেভিওয়েটে শুধু আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরবই অর্জন করেনি, তিনটি কীর্তির অধিকারী হয়েছে। প্রথম কীর্তি, জীবনের চল্লিশটি লড়াইয়ে অপরাজিত ফোরম্যানকে পরাজিত করা। দ্বিতীয় কীর্তি, বিশ্ব খেতাব হারানোর পর সেই খেতাব পুনরুদ্ধারের দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি। তৃতীয় কীর্তি অর্থলাভের। ফাইট অফ দি সেঞ্চুরি নামে অভিহিত শোরগোল তোলা এই ঘুষোঘুষির সংগ্রামে সংগৃহীত হয়েছে, আমাদের টাকার হিসাবে কুড়ি কোটি টাকা। মহম্মদ আলী ও ফোরম্যান প্রত্যেকে পেয়েছে চার কোটি করে টাকা। কাউকেই এই টাকা থেকে আয়কর দিতে হবে না। সেটা মিটিয়ে দেবে জাইরের কিনশাসা শহরে আয়োজিত শতাব্দীর সব চেয়ে সাড়া-জাগানো এই সংগ্রামের উদ্যোক্তারা। বলা বাহুল্য, খেলাধুলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে এত বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়নি, কোন খেলোয়াড়ও এত অর্থ রোজগার করতে পারেনি, ফোরম্যান বা মহম্মদ আলী একটি লড়াই থেকে যা সংগ্রহ করল।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশ্ব খেতাব হারিয়ে সেই খেতাব পুনরুদ্ধারের একটিমাত্র নজির আছে। নজির সৃষ্টি করেছিল ফ্লয়েড প্যাটার্সন। সুইডেনের ইঙ্গেমার জোহানসনের কাছে হেরে গিয়ে সেই জোহানসনকেই হারিয়ে আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করল মহম্মদ আলী।

দশ বছর আগে আমেরিকার এই কৃষ্ণকায় মুষ্টিযোদ্ধা সোনি লিস্টনকে হারিয়ে যখন প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তখন মুষ্টিযুদ্ধ জগতে কেসিয়াস ক্লে নামে পরিচিত ছিল। পরে ক্লে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মহম্মদ আলী নাম গ্রহণ করে এবং বিশ্বযুদ্ধের এক বর্ণাঢ্য চরিত্রে পরিণত হয়।

ফুটবলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তি

সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেণ্ট স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড পাওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে এ রাজ্যের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েছে। কলকাতা ও যাদবপুরের। এবার পেল এ রাজ্যের আর এক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমানের ছাত্রদের এই কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য। কলকাতা সর্বাধিক পাঁচবার আশুতোষ শীল্ড পেয়েছে। যাদবপুর পেয়েছে একবার। কলকাতার প্রাপ্তি ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের মধ্যে সর্বাধিক। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অক্টোবরের প্রথম দুই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা আঞ্চলিক নক-আউটে বর্ধমানের কাছে হেরে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুষ্কালের হিসাবে কলকাতা এ রাজ্যের অন্য ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃসম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র দেড় দশক। বর্ধমানের ফুটবল ছাত্ররা এ পর্যন্ত আটবার চেষ্টা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাঞ্চলক চ্যাম্পিয়নও হতে পারে নি। এবার নয়বারের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম পূর্বাঞ্চল শ্রেষ্ঠ হয়ে আন্তঃ আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় প্রথমবার যোগ দিয়েই বিজয়ী হল। রানার্স হয়েছে গতবারের বিজয়ী কালিকটের ছাত্রদল।

স্যার আশুতোষ শীল্ড বিজয়ী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দল

অবস্থানের দিক থেকে বর্ধমানের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ফুটবল পরিবেশ থেকে দূরে। এ রাজ্যে তথা সারা ভারতের ফুটবল ধমনী কলকাতার ময়দান। এই পরিপ্রেক্ষিতে মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান ছাত্র দল আশুতোষ মুখার্জি ট্রফি জয়ে নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ছোঁয়াচ আছে।

প্রতি বৎসর পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে যোগদানকারী প্রতিটি টিমেরই উচ্চাশা থাকে কলকাতাকে হারানোর। আঞ্চলিক নক-আউট প্রতিযোগিতায় বিশ্বভারতীকে ২—০ গোলে হারিয়ে বর্ধমান মুখোমুখি হয় কলকাতার। ইতিপূর্বে বর্ধমান এক বছর আগে কলকাতার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে অতিরিক্ত সময়ে হেরেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টিমে প্রথম ডিভিশনের ফুটবল তারকার অভাব ছিল না। কিন্তু বর্ধমানের ছাত্ররা কলকাতাকে তছনছ করে রীতিমত বেগ দান উইং আ্যাটাকের মাধ্যমে। কলকাতার বিশেষ প্লেয়ারদের গা-ঘেঁষা ছক-বন্দী খেলায় বর্ধমান টিম কৌশলগত দিক থেকে লাভবান হয় বেশি। সারা ম্যাচ কলকাতার ছাত্ররা এই খেলার রকমসকম আত্মস্থ করতে গিয়ে এমন গুলিয়ে ফেলে যে, গোলের সংখ্যা মোট চারটিতে পৌঁছয়। এর মধ্যে একটি শোধ করে তারা পেনাল্টি থেকে।

কলকাতাকে এক-গণ্ডা গোলে হারানোর পারদর্শিতা বর্ধমান দলে টনিকের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তদুপরি রবীন্দ্রভারতী ও রাঁচি ছাত্রদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তি গৌহাটির চেয়েও বেশি দেখা গেছে। রবীন্দ্রভারতী গৌহাটির মতই বর্ধমানের সঙ্গে তুলনায় টানিশ বিশ ফুটবল খেলে হেরে যায় নাম মাত্র গোলে। ওদের চেয়েও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদান যোগায় রাঁচি। রাঁচির মাঠটি বর্ধমান দলকে রীতিমত ভাবিয়েছে। প্রায় তুল্যমূল্য খেলায় রাঁচি হারে ১—২ গোলে। এদিকে উৎকলের ছাত্ররা গরহাজির থাকায় বর্ধমান ছয় পয়েন্ট পেয়ে পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ান হয়।

সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসাইটে দল হিসেবে কালিকটের কদর কম নয়। তারা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। কেরলের এই বিশ্ববিদ্যালয় দলে রাজ্য দলের কয়েকজন প্লেয়ারও শক্তি যুগিয়েছে। ওদের অধিনায়ক প্লেয়ার দেবানন্দের দিকে কলকাতা ময়দানের বড় দুই ক্লাবের একটির নাকি নজর পড়েছে। কালিকটের বিশেষত্ব তারা আধুনিক ফুটবলের আদব-কায়দায় বেশ রপ্ত, সেই মূলধনেই তারা খেলা শুরু করেছিল মাঠের গতিতে সব রকম কলাকৌশল বিস্তার করে। প্রথম ধাক্কা সামলাতে বর্ধমানের দিনের ভিত দস্তুরমত দুলে উঠেছিল। ওদের আগ্রাসী ঝোঁককে ভোঁতা করতে বর্ধমানও গতিসম্পন্ন আক্রমণের দুই পক্ষ বিস্তারী খেলায় কালিকট গোলরক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাল্টা জবাবের চাপটা অসহ্য হওয়ায় কালিকট কিছুটা খেই হারিয়ে ম্যাচ হারে ০—৩ গোলে। অতঃপর গুরুনানক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গা-জোয়ারি ফুটবল দিয়ে বর্ধমানকে বিভ্রমে ফেলতে চেয়েছে, প্রত্যুত্তরে বর্ধমানের খেলার ধরনে চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার মনোবৃত্তি ফুটে উঠতেই গুরুনানকের কাছে বর্ধমান 'এ বড় কঠিন' ঠাঁই হয়ে দাঁড়ায়। গুরুনানকের টিমে এই আশাভঙ্গের চিড় ধরে বর্ধমান আক্রমণের ফাটল তৈরি করে ওদের হারায় দু-গোলে।

লীগ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বোম্বাই দল কালিকটের কাছে ১—৮ গোলে ম্যাচ খুইয়ে প্রতিযোগিতায় ক্ষান্তি দেয়। বঙ্গ-শার্দুলের নামাঙ্কিত স্মৃতি ফলকটি বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ওয়াক-ওভার পাওয়ায় বর্ধমান ছাত্রদল হাতে পায়।

শীল্ড হাতে বর্ধমানের ছাত্রদল হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে কেউ ওদের স্বাগত জানানোর জন্যে অপেক্ষা করেনি। খোদ বর্ধমান শহরে পুজোর ছুটিতে কমবয়সী সকলেরই মুখে এক কথা—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এমন কাণ্ড করল কিভাবে? ব্যাপারটা আপাত বিস্ময়ের হলেও বাস্তবে এই ট্রফি জয়ের পিছনে একটা টিম-ওয়ার্ক কাজ করেছে। এর হোতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলটাইম এন আই এস কোচ রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে রথীনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে প্রশিক্ষণকালে ওই নাম-না-জানা প্রতিভাগুলোকে টেনে বার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হাজার চারেক টাকা খরচ করা হয়েছে, এই পরিশ্রমের বিশেষ ফসল স্ট্রাইকার অমর্ত্য ঘোষ ও প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (অধিনায়ক) এবং রক্ষণভাগের অন্যতম খুঁটি শেখর সরকার। সারা টুর্নামেন্টে ওরা দর্শকদের কাছে বাহবা পেয়েছে তাদের স্বকীয়তায়। কলকাতার প্রথম ডিভিসনের ছাপমারা প্লেয়ার ওদের ছিল না। সেদিক থেকে বর্ধমানের স্থানীয় প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান অসীম মেমোরিয়াল ক্লাবের ছজন প্লেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় দলে থাকায় দলগত সমন্বয়তা ভালভাবে গড়ে ওঠে। কোচ রথীনবাবুর বিশ্বাস মফঃস্বল বাংলায়ও ফুটবল ছাত্রের অভাব নেই। তাদেরকে হাত ধরে উন্নতির রাস্তা দেখাতে পারলে এ রকম অঘটন তারা ঘটাতে পারে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যাদের জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাদের নাম: কানাই কুণ্ডু ও আশিস রায় গণেশ অধিকারী, দেবাশিস চ্যাটার্জি, নেপাল দাস, হিমাদ্রি চক্রবর্তী, শেখর সরকার, রবিশংকর মল্লিক, সদানন্দ নায়ক, তপন সিংহরায়, অশোক বারুই, আনন্দ মুখার্জি, প্রবীর ব্যানার্জি, অমর্ত্য ঘোষ, অনুপ নন্দী, সমীর বারুই।

একলব্য

রঙ্গ জগৎ

সব শূন্য আসন পূর্ণ হয় না। আর একজন অহীন্দ্র চৌধুরী আসবেন না। আর একজন শিশির ভাদুড়িকে যেমন আমরা পাব না। মৃত্যুর অনেক আগেই অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় থেকে অবসর নিয়েছিলেন। অবসর জীবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেও কিন্তু তিনি শূন্যতার সৃষ্টি করে গেলেন। কারণ অভিনয়োত্তর জীবনেও তাঁকে আমরা বাংলা নাট্যমঞ্চের নানাবিধ প্রগতি-পরিকল্পনা ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দেখেছি। মঞ্চই ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। বস্তুত মঞ্চের অভিনেতা হিসাবেই অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ঐতিহাসিক নাটকের দুরূহ চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও আলোচনার বস্তু। চলচ্চিত্রেও তাঁর

মতামতের মন্তাজ

অসামান্য অভিনয়ের কিছু নিদর্শন আছে। বাংলা সিনেমার আধুনিক যুগের ছবিতে তাঁকে আমরা দেখিনি। নতুন যুগের পরিচালকদের ছবিতে তিনি অনুপস্থিত। কিন্তু একালের চলচ্চিত্রকারদের মুখেও অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়-বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায়।

* * *

অহীন্দ্র চৌধুরীর যাঁরা উত্তরসূরী তাঁদের আজ আত্মসমালোচনার দিন। যিনি

একই যুগের দুই প্রতিভাধর নট অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ১৯৫৬ সনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছবিটি তোলা

তারিখে "সাজাহান" নাটকের নাম-ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু শেষবারের মত মঞ্চাবতরণ করেন। যখন তাঁর বয়স সতেরো তখন এক অবৈতনিক অভিনয়ের আসরে তাঁর প্রথম খ্যাতিলাভ ঘটে ঐ ভূমিকাতেই। মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। এই দীর্ঘকাল জুড়ে অহীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ। মুগ্ধ নাট্যামোদীরা তাঁকে নটসূর্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই। সরকারী সম্মান এসেছিল অনেক পরে—১৯৬৪ সালে, যখন তিনি পদ্মশ্রী-র তকমা পান। তখন তিনি তার অভিনেতা নন রাজ্য সরকারের সংগীত-নাটক-আকাদেমির নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ। রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নেবার পর দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই শিক্ষকতার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন তিনি। এই আকাদেমিই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত অধ্যক্ষ অহীন্দ্রবাবুরই কার্যকালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম তাঁরই রচনা।

এই কর্মবহুল জীবনের পূর্ণচ্ছেদ

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে অহীন্দ্র চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ঘটল উনআশি বছর বয়সে। অকালমৃত্যু অবশ্যই নয়। তবুও ঘটনাটি শোকাবহ এই কারণে যে নটসূর্যের শূন্য স্থান কোনদিনই আর পূর্ণ হবে না।

অহীন্দ্রবাবুকে প্রথম দেখি সিনেমার পর্দায়, তারপর মঞ্চে। ব্যাপারটি অবশ্যই উলট-পুরাণের মত শুনতে, কারণ মঞ্চেই তাঁর নাট্য-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ ও পূর্ণ পরিণতি। তা সত্ত্বেও বাঙালী প্রযোজকরা যখন প্রথম নির্বাক ছবি তৈরির কাজে হাত দেন সেই সময়ে—অর্থাৎ ১৯২১ সালে—অহীন্দ্রবাবু কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় ফটোপ্লে সিন্ডিকেট অফ ইণ্ডিয়ার পত্তন করেন। এই প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম ও শেষ ছবি "সোল অফ এ স্লেভ"। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়াও অহীন্দ্রবাবুই ছিলেন তার কাহিনীকার, সম্পাদক ও পরিচালক। যদিও কর্মীগোষ্ঠীর প্রবীণতম সদস্য হিসেবে হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম পরিচালক রূপে ঘোষিত হয়। এখনও মনে আছে কী চমক লেগেছিল এই নবাগত অভিনেতাকে দেখে, যার নাম আগে কখনও শুনিনি।

সেই চমকই নতুন করে অনুভব করে-ছিলুম আর্ট থিয়েটারের আসরে "কর্ণার্জুন" নাটকে তাঁর অর্জুনের অভিনয় দেখে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সেই তাঁর প্রথম অবতরণ—সময় ১৯২৩।

অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জুন"-এ কর্ণই প্রধান চরিত্র। নাটকের কর্মকান্ড এই চরিত্রটিকেই ঘিরে। সংলাপের অনুপাত হিসাবে বারো আনা কর্ণের মুখে, বাকি চার আনা বা তারও কিছু কম অর্জুনের ভাগে। তা সত্ত্বেও এই [illegible] গৌণ চরিত্রে আর পাঁচজনকে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এই নবীন অভিনেতাটির বাধল না। যেটা সবচেয়ে চমক লাগাল তা এই নবাগতের ভাবাভিব্যক্তির ক্ষমতা। অভিনয়ে সংলাপই যে সবটা নয় অহীন্দ্র চৌধুরী তা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন সকলকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম ভূমিকাভিনয়ে।

কোন একটি বিশেষ ভূমিকায় একজন নতুন শিল্পী হঠাৎ সকলকে চমক লাগিয়ে দিলেন—এরকম ঘটনা রঙ্গজগতে বিরল নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব শিল্পীর নাম পরে আর শোনা যায় না। কারণ এঁদের নাট্যকুশলতার পরিধি অত্যন্ত সীমিত, অল্পেই এঁরা ফুরিয়ে যান। অহীন্দ্র চৌধুরী এই জাতের শিল্পী নন তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিলেন আর্ট থিয়েটারের পরবর্তী নাটকগুলিতে। স্মৃতিপটে আজও প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে "চিরকুমার সভা"-য় চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর আশ্চর্য অভিনয়। একজন নবীন যুবকের পক্ষে আত্মভোলা এই প্রায়-বৃদ্ধের ভূমিকায় এমন নিপুণ অভিনয় অকল্পিত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই আশ্চর্য প্রতিভার আর এক বিচিত্র স্ফুরণ দেখেছিলুম রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি নাটকে—"গৃহপ্রবেশ"-এ। মৃত্যুপথ-যাত্রী এক পুরুষ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে যে রোমান্সের জাল বোনে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার আবেগে যে স্বপ্ন দেখে, সারা নাটকটি তারই সুরভিতে ভরপুর। একজন অভিনেতার পক্ষে শয্যাশায়ী অবস্থায়

কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনের মাধ্যমে একটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলা যে কতখানি কঠিন তা অভিনয় সম্বন্ধে যাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই বুঝবেন।

অহীন্দ্রবাবু তাঁর সুবিস্তৃত নট জীবনে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মঞ্চে ও চিত্রে। তার সবগুলিই যে অভিনয়শিল্পের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ তা বলি না। তবে মনে করে রাখবার মত চরিত্র সৃষ্টিও তার মধ্যে এত আছে যার তুলনা সহজে মেলে না।

মঞ্চে তাঁর অভিনীত চরিত্রের সংখ্যা দুই শতাধিক। এগুলির মধ্যে তাঁর চন্দ্রবাবু, সাজাহান, ঔরংজেব, ডাঃ ভোস, ভোলা মাস্টার, সব্যসাচী, মাইকেল, কৈলাস খুড়ো বা গোলাম হোসেন সহজে ভোলা যাবে না।

ছবিতেও শতাধিক চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি এক্ষেত্রেও নিতান্ত কম নয়।

সব ছাপিয়ে অহীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে যে-কথা বলা চলে সেটা তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা—শুধু অভিনয়ের ব্যাপারে নয়, নাট্যশিল্পের সকল বিভাগেই। তাই কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে, নিজস্ব লাইব্রেরিটি নাট্যোৎসাহীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এবং থিয়েটার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায়।

এই বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীর তিরোধান তাই সমগ্র নাট্যশিল্পের একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

অনুজেন্দ্র ভঞ্জ

সাজাহান নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

একটি যুগের অবসান : ... ও অহী...
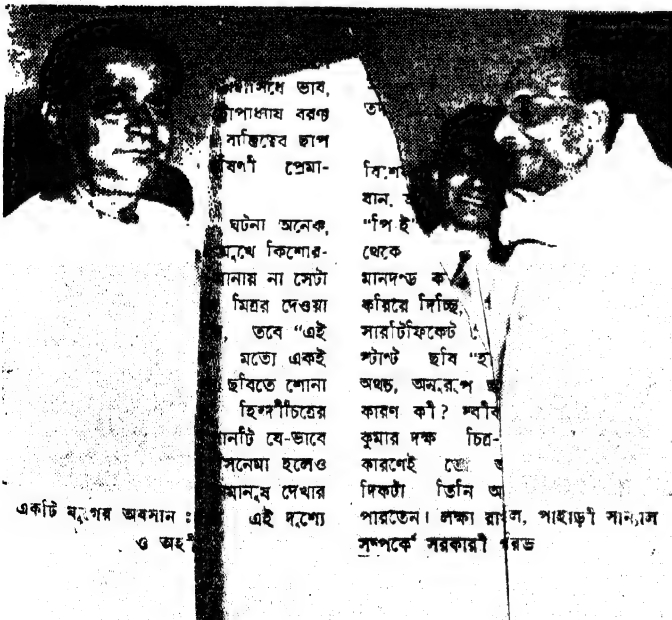
সংক্ষিপ্ত জীবনী

অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৫ সালের ৬ আগস্ট, কলকাতায়। প্রথম মঞ্চাভিনয় একটি অপেশাদার দলের হয়ে সাজাহান নাটকে সাজাহানের চরিত্রে। পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি ওই ভূমিকায় তাঁর কালে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রাখেন। তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়ও ওই সাজাহানের চরিত্রে ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অভিনেতৃ সংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অহীন্দ্রবাবুর প্রথম অভিনয় আর্ট থিয়েটারে কর্ণার্জুন নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়। আর্ট থিয়েটার ছাড়াও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী, স্টার, রঙমহল ইত্যাদি মঞ্চে অজস্র নাটকে অভিনয় করে নিজেকে নটসূর্য রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দুশোরও বেশি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন যার মধ্যে অযোধ্যার বেগম,
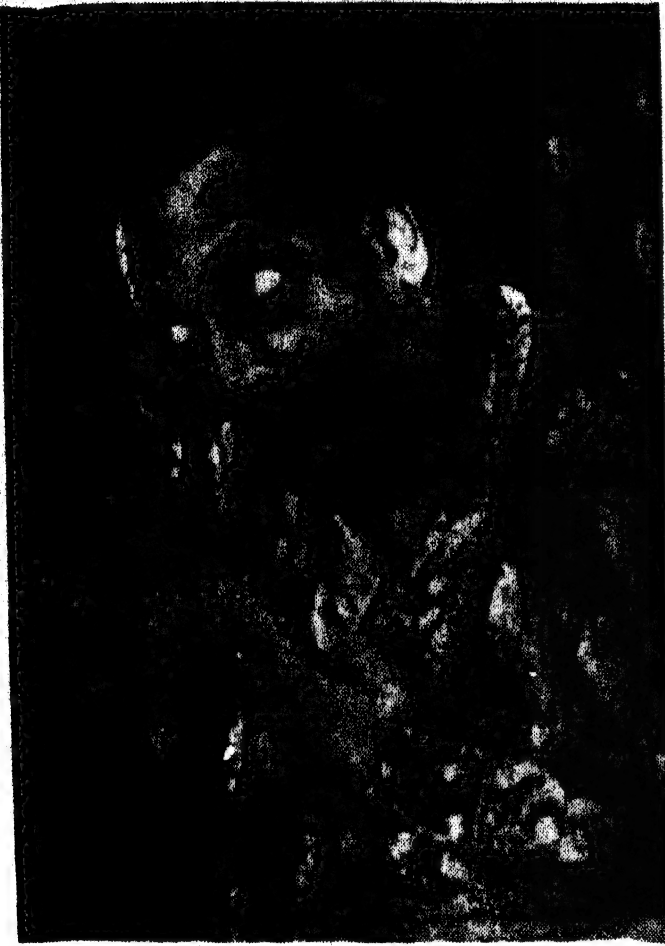
সোনার সংসার ছবিতে স্যার শঙ্করনাথের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

ইরাণের রানী, বিষবৃক্ষ, শাস্তি কি শান্তি, চিরকুমার সভা, গৃহপ্রবেশ, আত্মদর্শন, মিশরকুমারী, প্রতাপাদিত্য, দেশের ডাক, চন্দ্রনাথ, মা, ব্রতচারিণী, খনা, নরদেবতা, কেদার রায়, গোরা, পথের দাবি, সংগ্রাম ও শান্তি, ভোলা মাস্টার, মাইকেল, কঙ্কাবতীর ঘাট, কাশীনাথ, পি-ডাবলিউ-ডি, রিজিয়া, বাংলার প্রতাপ, সন্তান প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছায়াছবিতেও অহীন্দ্র চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ছবিতে তাঁর প্রথম অভিনয় নির্বাক যুগে সেল অব স্লেভ চিত্রে। শতাধিক চিত্রে তিনি অভি… করেছেন। সোনার সংসার চিত্র… শঙ্করনাথের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়… আলোচনার বস্তু। তাঁকে শেষ দেখা… প্রবল সন্ধ্যা চিত্রে।

১৯৫৪ সালে তিনি… সরকারের সংগীত-নৃত্য-নাট্য… আচার্য পদে নিযুক্ত হন। তিনি ওই পদে যুক্ত ছিলেন… প্রসঙ্গে তিনি একটি… গ্রন্থ রচনা করেন: নিজে… দেশ পত্রিকায় রচনাটি… প্রকাশিত হয়।

৪ঠা নভেম্বর ভোরে… শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে… এবং এক কন্যা বর্তমান… জীবিত আছেন।

অমানুষ

(শক্তি ফিল্মস)

ধর্মেন্দ্র কিংবা শত্রুঘ্ন সিনহার মতো না হলেও রঙিন বাংলা ছবি অমানুষ-এ উত্তমকুমার যতটুকু মারপিট করেছেন তাতেই "গুরু"-শিষ্য ফ্যানরা খুশি। অমানুষ-কে বাংলায় "হিন্দী ছবি" বলা যেতে পারে। অর্থাৎ হিন্দীচিত্রসুলভ উত্তেজনা এবং অন্যান্য উপভোগ্য বিষয়ও অমানুষ-এ আছে। তবে কি অমানুষ-ই বাংলা ছবির বাঁচার পথ? এই বিপাকেও বাংলা চলচ্চিত্র স্বধর্মকে আঁকড়ে ধরলেই বাঁচবে, পরধর্ম ভয়াবহ হতে পারে। তবে শক্তি সামন্তর অমানুষ থেকেও কিছু নেবার আছে। সে হল গতি, যা প্রায় বাংলা ছবিতেই থাকে না। অমানুষ-এর টেকনিক্যাল কাজের পারিপাট্যের দিকটাও দেখে নেওয়া দরকার। তার উপর শক্তিবাবু গল্পের পটভূমিকে দৃশ্যত এমন সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে অলোক দাশগুপ্তর চমৎকার ফটোগ্রাফিরও উল্লেখ করতে হয়। কয়েকটি কমপোজিশন খুবই সুন্দর, তার মধ্যে একটি হল যেখানে চলন্ত জাহাজের গলুইয়ে উত্তমকুমার দাঁড়িয়ে।

সুন্দরবনের কাছাকাছি ওই সুন্দর জায়গা ক্যামেরার কাজের গুণে আরও সুন্দর। সেখানে যা-কিছু ঘটল তার যুক্তি খুঁজতে গেলে অবশ্য দর্শককে হয়রান হতে হবে। শক্তিপদ রাজগুরুর এই গল্পের সূত্রে পরিচালক দর্শকদের কতখানি মজিয়ে রাখলেন সেটাই বড় কথা।

ছবিতে মারপিট যখন রয়েছে তখন বুঝতেই হবে যে শয়তান লোকও আছে। শয়তান-শিরোমণি হলেন উৎপল দত্ত, তাঁর জন্য বড় ঘরের শিক্ষিত ছেলে উত্তমকুমার অমানুষ—মদ্যপ ও গুন্ডা। অবশ্য সিনেমার …অন্তরে প্রকৃত মানুষ। উত্তমকুমার …দুঃখে—ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় …অন্যায় দমনের জন্য। শম্ভু … কিংবা মনোমোহনের দলের … মারপিটের দৃশ্যগুলি …

…গুলো দেখে প্রেমিকা শর্মিলা … কিন্তু তাঁকে যেহেতু অন্য… …য়েছে তাই আসল মানুষ… …ত পারেন না। এতদিন ওঁর … না। অথচ তাঁর দাদা অন্তী… … উত্তমকুমারকে অমানুষ … গ্রামে নতুন আসার পরই …নল চট্টোপাধ্যায় কিন্তু …রকার মানুষকে খুঁজে …ম তাঁরই চেষ্টায় অমানুষ … প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত। … সকলেরই নাটকোচিত। … উৎপল দত্তের চেহারাটাই

"অমানুষ"/উত্তমকুমার

অনেক পরিমাণে সাহায্য করেছে। কথা বলার একটি বিশেষ ঢঙ-ও তিনি বেছে নিয়েছেন। তাতে কাজ হাসিল হয়েছে ভাল। অমানুষরূপী উত্তমকুমার এহেন অবাস্তব বিষয়েও অভিনয়ের অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে দারোগাবাবুর বিদায় নেবার সময়। কিন্তু অমানুষ হবার পর উত্তমকুমারের কুলী-মজুরের মতো আচরণ কেন? হতে পারে অবস্থা বিপাকে তাঁকে ছোট কাজ করতে হচ্ছে, তাই বলে বংশগত স্বভাব ও মর্যাদাবোধ একেবারেই কি চলে যাবে? শর্মিলা ঠাকুরের সাদাসিধে ভাব, অভিনয়ও তাই। অনিল চট্টোপাধ্যায় বরঞ্চ তাঁর চরিত্রে মানবিক বোধ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। অমানুষ-হিতৈষিণী প্রেমা-নারায়ণকেও ভাল লাগে।

ছবিতে চরিত্র অনেক, ঘটনা অনেক, গান অনেক। উত্তমকুমারের মুখে কিশোর-কুমারের গান যে একেবারেই মানায় না সেটা আবার প্রমাণিত হল। শ্যামল মিত্র দেওয়া অন্য গানগুলির সুর মন্দ নয়, তবে "এই বিপিন বাবুর কারণ সুধার" মতো একই সুরে গান হালে একটি বাংলা ছবিতে শোনা যায়নি কি? তবে উত্তমবাবু হিন্দীচিত্রের নায়কের মতো হেলেদুলে গানটি যে-ভাবে পিকচারাইজ করেছেন তাতে সিনেমা হলেও ফাল্গুনা হেলে-দুলে ওঠেন। অমানুষ দেখার তাৎক্ষণিক সুখ ও উত্তেজনা এই দৃশ্যে এবং অন্যত্র।

বোম্বাই বিচিত্রা

কথায় বলে, বার বার তিন বার। মনোজ-কুমারের ক্ষেত্রে "হ্যাটট্রিক" আগেই হয়ে গিয়েছিল, এবার নিয়ে ঘটনাটা চতুর্থবার ঘটল, পর পর।

তাঁর রোটি কাপড়া অওর মোকান ছবিটি 'পি-ই' অর্থাৎ 'প্রিডমিনেন্টলি এডুকেশনাল' (একান্তভাবে শিক্ষামূলক), এই সার্টিফিকেট পেয়েছে। মনোজকুমার এ-পর্যন্ত চারখানি ছবি প্রযোজনা করেছেন—উপকার, পূরব অওর পশ্চিম, শোর এবং রোটি কাপড়া অওর মোকান। চারখানি ছবিকেই সেনসর বোর্ড উক্ত সার্টি-ফিকেট দিলেন। "পি-ই" সার্টিফিকেটের প্রধান সুবিধা, ওই অভিজ্ঞান-পত্র ছবিকে আবগারি শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেয়। মনোজকুমার অতি দীর্ঘ ছবি করেন; একসাইজ ডিউটি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ফলে প্রতিবারই তিনি এ-বাবদে প্রায় দশ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে ফেলছেন। শুধু তা-ই নয়, মনোজকুমারই একমাত্র প্রযোজক যিনি উত্তর ভারতের পরিবেষকদের ভরসা দিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁর ছবি প্রমোদকর থেকেও অব্যাহতি পাবে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে মনোজকুমারের ছবিগুলি যথাকালে সত্যিই প্রমোদকর-মুক্ত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে দেখা যায়, প্রযোজক হিসাবে তিনি এবং তাঁর ছবির পরিবেষকরা লাভবান হন, সেই সঙ্গে সরকারের তহবিলও হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রমোদকর-মুক্তির ব্যাপার নিয়ে ইতি-পূর্বে কথা উঠেছিল। দিল্লির একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় সমালোচক প্রশ্নটি তুলেছিলেন; বলেছিলেন, এ-বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার।

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। বিশেষ বিশেষ প্রযোজক যে-সুযোগ সুবিধা পেয়ে যান, অন্যদের বেলায় তো তা সম্ভব হয় না! "পি-ই" সার্টিফিকেট অথবা প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারের মানদণ্ড কী? প্রসঙ্গত আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, জয় বাংলা ছবিটি "পি-ই" সার্টিফিকেট পেয়েছিল। জয় মুখার্জির স্টান্ট ছবি "হামসায়া"-ও। ভাবা যায়? অথচ, অনুরূপ ছবির ভাগ্যে তা জোটেনি। কারণ কী? স্বীকার করে নিচ্ছি, মনোজ-কুমার দক্ষ চিত্র-নির্মাতা। কিন্তু সেই কারণেই তো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার দিকটা তিনি অনায়াসে এড়িয়ে চলতে পারতেন। লক্ষ্য রাখতে পারতেন যাতে তাঁর সম্পর্কে সরকারী পক্ষপাতের অভিযোগ না ওঠে। এটা তিনি পারতেন। মনোজকুমারের প্রথম তিনটি ছবির প্রত্যেকটি অসাধারণ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল। যে-সব অঞ্চলে ছবি-দুটি প্রমোদকরমুক্ত হতে পারেনি, সেই সব জায়গাতেও টিকিট-ঘর টিকিটের জন্য ভিড় করে। সেই কথা মনে রেখেই উক্ত মন্তব্য করেছি।

* * *

"গুপ্ত জ্ঞান"-এর নির্মাতা বি কে আদর্শ এবং তাঁর অভিনেত্রী-স্ত্রী জয়মালার একটি খামার আছে, বোম্বাই থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল দূরে। তার নাম "জয়মালা ফার্ম"। ওই খামার-বাড়ির কাছে সেদিন এক কাণ্ড ঘটল।

আদর্শ ওঁদের খামার-গৃহে "গুপ্ত জ্ঞান" ছবির রজত-জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। অতিথিদের মধ্যে সমালোচক এবং সাংবাদিকরাও ছিলেন। উৎসব বেশ ভালই চলল, পান-ভোজনের আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না। রাত যখন বারোটা, অতিথিদের তখন শহরে ফেরবার পালা। সারি সারি ট্যাক্সি ছিল প্রস্তুত। অতিথিরা যেই গাড়িতে উঠলেন, গণ্ডগোলটা শুরু হল তখনই। গাড়িগুলো কয়েক গজ অগ্রসর হওয়ার পরেই দেখা গেল, "রাস্তা বন্ধ।" কী ব্যাপার? গ্রামবাসীদের এক বিরাট দল সব ট্যাক্সি "ঘেরাও" করে ফেলেছে; কেউ যাতে গাড়ি থেকে নামতে না পারেন, সে-দিকে ওদের কড়া নজর। ইতি-মধ্যে নামল বৃষ্টি—অসময়ের বৃষ্টি। কাঁচা রাস্তা দেখতে দেখতে জলকাদায় ভরে গেল। যাই হোক, ওই বৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত আদর্শকে করল বিপন্মুক্ত। বর্ষণের ফলে ঘেরাওয়ের দলে কিছুটা বিশৃংখলা দেখা দিল, সেই সুযোগে আদর্শ মোটর থেকে নেমে ছুটলেন থানার দিকে। যথাকালে পুলিস এসেছে। অবশেষে ভোর চারটের সময় 'ঘেরাও' তুলে নেওয়া হল।

কিন্তু গ্রামবাসীরা গাড়ি "ঘেরাও" করতে গেল কেন? জানা গেল, ওরা "জয়মালা ফার্ম"-এর কর্মী; দাবি আদায়ের জন্যই ঘেরাও। খামারের পক্ষ থেকে বলা হয়, অবস্থার উন্নতি হলে পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ ওই পার্টির ব্যবস্থা। গ্রামবাসীরা দেখল, গাড়ি-ভর্তি রকমারি খাদ্য আসছে, খামার-বাড়ির চেহারা আলো-ঝলমল। তারা তখনই বুঝল, তাদের বোকা বানানো হয়েছে। এবং তখনই স্থির করেছে, খামারওয়ালাদের জব্দ করতে হবে।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, পুনা-বম্বে ন্যাশনাল হাইওয়ের দু-পাশে নানা জায়গায় সম্প্রতি বোম্বাই ফিল্মওয়ালাদের বেশ কিছু খামার গড়ে উঠেছে। খামারের মালিকদের মধ্যে রয়েছেন এইচ এস রাওয়েল, জে ওমপ্রকাশ, শক্তি সামন্ত, রাজ কাপুর, মোহন সেগাল, অশোককুমার। হঠাৎ চাষবাসের প্রতি

'আলো আঁধারে' (পরিচালনা : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য ও কুমারী বিপাশা ঘোষ

এঁদের আগ্রহের কারণ? এই জিনিসটা আয়কর থেকে মোটামুটি মুক্ত—এই জন্য কি?

সুরঞ্জন

পল্লী সমাজ

শিল্পী পরিষদ

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' পাদপ্রদীপের আলোয় 'রমা' নামে পরিচিত। গণ্ডগ্রাম শীতলাতলার পাঠশালায় দুই কিশোর কিশোরীর অন্তরঙ্গতা পরবর্তীকালে কোন দ্বন্দ্বে পরিণত, মঞ্চসফল এ-নাট্যের দর্শকরা কোনদিনই সে-কথা ভোলেন নি। শিশির যুগের সেই বিখ্যাত নাটাকে শিল্পী পরিষদ মঞ্চে আনলেন মূল উপন্যাসের নামে। সম্ভবত শংকা ছিল, রমা নামে অভিনীত হলে দর্শক তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পাবেন। অযোগ্যতা যে সবচেয়ে সরস ফলটিরও বোঁটা মচড়ে খায় এ গোষ্ঠীর দুর্বল অভিনয় সে সত্য উপস্থিত করেছে। মূল চরিত্র রমেশ অসতর্ক শিল্পীর হাতে আঁকা কণ্টকিল্পিত চিত্রের মতনই অসংকল্প, ভীরু ও ক্লান্ত। কল্পনা মুখারজির 'রমা' যদি জোরদার হতো, হয়তো রমেশ-এর ব্যর্থতা ঢাকা পড়ত অনেকটাই। কিন্তু শ্রীমতী মুখারজি এ-চরিত্রে কোথাও সেই মাত্রা আনতে পারলেন না। যে-নাট্যের প্রধান দুটি চরিত্রেরই মাটির ওপর পা থাকে না তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে কি প্রশ্ন উঠবে না? নির্দেশক রমেশ পাঠক নাট্যমুহূর্ত রচনাতে সর্বত্র সতর্ক ও সচেতন থাকলে যুক্তিবর্জিত কান্ডকারখানাগুলো অনায়াসে ঘটতে পারত না। নাট্যের কোথাও কোথাও অভিনয়ের ঘোড়া সংযমের শাসনকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। আলো, আবহ আর দৃশ্যসজ্জাই কি অনুগত ছিল নাট্যের প্রতি? দলগত অভিনয়ের অসাম্যতার কথা এরপরে বোধ হয় না বলাই ভালো। ব্যক্তিগতভাবে অসামান্য মনে হবে গৌর চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মদাস' আর কমলা গুপ্তার 'জ্যাঠাইমা'। নির্দেশক নিজের 'বেণীর রূপ ধরে মঞ্চে এসেছিলেন। জহর ঘোষ, সুনীল চক্রবর্তী, দিলীপ সেনগুপ্ত, নিশীথ দাসের অভিনয় মোটামুটি। নাটকটি মঞ্চস্থ হলো মিনারভায়।

প্র-ব-জ

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নাট্যাভিনয়

অভিনয় যারা করল, তাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। কিন্তু যে দাপটে তারা অভিনয় করল সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। ৩নং ব্লক মহেলা সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে" দেখে মনেই হচ্ছিল না ওই সব অপ্রাপ্তবয়স্ক শিল্পীদের এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। নাট্যনির্দেশক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য সাধুবাদ পাবেন। নাটকের গতিবেগের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। শিল্পীদের পূর্ণভাবে তৈরি করে নিতে পেরেছেন তিনি। প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাপারে দু-একটি ছোটখাট ত্রুটি ছিল, কিন্তু শিল্পীরা যেহেতু বয়সে ছোট, তাই তাদের ওই ভুলগুলিও মিষ্টি লাগছিল। অভিনয় প্রায় সকলেই ভাল করেছে। যাকে বলে নিখুঁত টিম ওয়ার্ক। কোনরকম তুলনামূলক বিচার না করেও তিনজন শিল্পীর নাম উল্লেখ করতেই হয় শেষ পর্যন্ত। তারা হল শুভ্রা চক্রবর্তী (বিন্দু) চন্দ্রা সেনগুপ্তা ও দীপান্বিতা বিশ্বাস (অন্নপূর্ণা)। শুভ্রার অভিনয় তো প্রায় অসাধারণের পর্যায়ে। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হল : অঞ্জনা ভট্টাচার্য গায়ত্রী নন্দী, নন্দা সেনগুপ্তা, কৃষ্ণা বিশ্বাস, জগদ্ধাত্রী নন্দী, সুভদ্রা পাল, শুক্লা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঈশানী নন্দী, মল্লিকা দাস ও মমতা ঘোষ।

অরণ্যদেব লী ফক

গুপ্তধনের সন্ধানে আমরা আমাদের যথা-সর্বস্ব বিক্রি করে এখানে এসেছি, তাই না?
বিলকুল!
এখন বিনা তুমি বলছ যে, দ্বীপের হদিশ তোমার জানা নেই!

লিজাই সেই পথ খুঁজে বার করবে।
কী যা-তা বলছ তুমি? লিজা কী করতে পারে?

রত্ন-গুহার সন্ধানীরা.....
ক্যাপটেন, লিজা কী করে পথ খুঁজে বার করবে?
তাও আবার ওই পোশাকে?
তোমরা অত অধৈর্য হচ্ছ কেন?

অরণ্যদেব যে কোথায় থাকে, তা কারও জানা নেই।
তবে শুনেছি, 'সে-ই সবাইকে খুঁজে বার করে।'
/24

লিজাকেও সে-ই খুঁজে বার করবে।
'এই জঙ্গলে গয়নাগাঁটি-পরা মেয়েও নিরাপদ।'
–এই রকমের একটা কথা শুনেছি।

তুমি এ-সব বিশ্বাস করো?
না-বিশ্বাস করে উপায় কী? গুপ্ত-গুহার খোঁজ একমাত্র এইভাবেই মিলতে পারে।
লিজা, তোমার ভয় করছে না?

ভয় নিশ্চয় করছে। কিন্তু ঐশ্বর্যের খোঁজ পাবার জন্যে ঝুঁকি তো নিতেই হবে।
তাহলে এগোও। বেতার-যন্ত্রটা সঙ্গে নিতে ভুলো না।

??!!

ছাতা হাতে/ছাতা মাথে/ছাতা হয় হারাতে/হারাবার পরে/পরের ছাতাটি হাতাতে॥'

ছাতার তিন অবস্থা এবং চতুর্দশা—শেষ দশাটি অবশ্যই চতুরের হাতে—

*　*　*

কিসিংগার সাহেব জানিয়েছেন ইজরেলীরা সিনাই এলাকার থেকে তাদের আরো বেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারচুয়ালি? বটে?

*　*　*

ব্যাপক গুদাম তল্লাশির পর সব কিছুরই দাম সর্বত্র হু হু করে পড়ে যাচ্ছে নাকি, তার ভেতরে চিনির দাম সস্তা হওয়া একটা একটু মিঠে খবর।

*　*　*

কৃত্রিম জীন ব্যবহার করে বহুমূত্রের মত বংশগত ব্যাধিগুলিও সারানো যাবে,

দিল্লিতে এসে এই তথ্য জানিয়েছেন ডঃ খোরানা।

ডঃ খোরানা জীন্দাবাদ!

*　*　*

গত যুদ্ধে যে মশাদের বংশ মার্কিনী-দের দৌলতে ধ্বংস হয়ে গেছল সেই মশায়রা আবার ফিরে দেখা দিচ্ছেন নাকি।

এবার ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের পালা।

*　*　*

শ্রীমতী সবিতা নন্দী: 'গ্রাম্য বধূ আমার এক বান্ধবী কলকাতায় বেড়াতে এলে নানান কথার ফাঁকে তাকে শুধালাম, হ্যাঁ রে, তোর বরের নাম কি রে? সলজ্জ

অল্প বিস্তর

সে জানাল, একটা কিছু নাম মনে করে নে, আমি বলতে পারব না। তোদের শহুরে বউদের মত আমরা বর্বর নয় যে, শুধু বর বর করব আর বরের নাম ধরব। শেষে বহুত পীড়াপীড়িতে বললে, পনের পয়সার তিনটে বরং ধর।......ধরতে পারলেন?'

অবশ্যই। নিরোধ কণ্ডম ধর।

*　*　*

সদাশয় সরকার বাহাদুর আমাদের রাজ্যে সাপ আর কুমীর পোষার এক পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে প্রকাশ।

রাস্তাঘাটে চার ধারে খাল কাটার কাজ হয়েই রয়েছে, এবার কেঁচোর খোঁজে গর্ত খুঁজতে শুরু করলেই হয়।

*　*　*

মদ খাবার বাজি ধরে কয়েক মিনিটের ভেতর পুরো এক বোতল ফাঁক করতে গিয়ে জম্মুর একটি যুবক যমালয়ে গিয়ে জমেছে বলে খবর।

বেঁচে গেল বেচারা। এর পর আর তার লিভার অ্যাবসেস হয়ে মারা পড়ার ভয় রইল না। পক্ষাঘাত হলে বাত যেমন সেরে যায়।

*　*　*

শ্রীমান পন্টু চক্রবর্তী: 'বলুন দেখি কোন দেশকে সকলেই বেশ এড়িয়ে চলতে চায়? বলতে পারেন নামটি তার?'

উপদেশ।

*　*　*

বিপুল বিদেশী মুদ্রার এক ফাঁকিদারের নাম শ্রীচোরারিয়া, বাস রাজস্থানের চোরু গ্রামে—বিশ্বাস করুন বা না করুন!

*　*　*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বণিক: বন্ধুর বিয়ের বউভাতে অল্প দামের ভালো উপহার কি দেওয়া যায় খুঁজতে গেলে সেলসম্যান ভদ্রলোক একটি সুদৃশ্য আত্মবাতিদান দিলেন—আজকের দিনে উপহার হিসেবে এর দাম অনেক, জানালেন তিনি, অতবার লোডশেডিং হবে নবদম্পতি স্মরণ করবে আপনাকে।

এ-হেন কালে চিরস্মরণীয়।

*　*　*

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের গা ঘেঁষে সীমান্ত এলাকায় ঘোরঘুরি গেলেই নাকি গব করে গিলিত হয়ে বেমালুম গাব হয়ে যায়—একটি খবর।

গরুদের বেলায় গব্য হওয়াটাই ঠিক।

*　*　*

শ্রীশঙ্কর মজুমদার: 'শাকের মধ্যে শাক/পালং আর পুঁই/মাছের মধ্যে মাছ/ইলিশ আর রুই/ফুলের মধ্যে ফুল/গোলাপ আর যুঁই/মানুষের মধ্যে মানুষ/তুই আর মুই।/আর কাজের মধ্যে কাজ/খাই আর শুই।'

*　*　*

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীরা সবাই নাকি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের
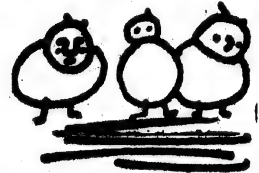
সংবাদে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন, দমদমে এ.স এই কথা বলে অভিযোগ করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোয়েল। বাড়িয়ে বলেছেন কি না কে জানে, তবে বোঝা যায় যে, মোটের ওপর ওখানকার সবাই বেশ সোয়েলড্ আপ্।

*　*　*

আনন্দবাজারের আনন্দসংবাদ, ওড়িশার তেলকই গ্রামের লোহার খনিতে টন পিছু ষোল গ্রাম করে সোনা আছে জানা গেল।

ওড়িশাবাসীদের কইতেল খাওয়ার সুবর্ণসুযোগ।

—শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
পবিত্রকুমার মুখার্জী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
অধীপ সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাষিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা		৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
সডাক	ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা

NAVY CUT
MEDIUM
WILLS
NAVY CUT
MADE IN INDIA

কি চমৎকার।
রাঙিয়ে দিয়ে আরো মনোহারী।
থেকে যেন ফুটে বার হচ্ছে।

সর্বপ্রথম
কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi home 6A/73 BEN

মিউজিক সিস্টেম
মেইন্‌স-
ব্যাটারী
সিস্টেম জি এফ ৫৩৩
ফিলিপ্‌স জি এফ ৫৩৩ এমন সব কাজ করবে
যা অন্য রেকর্ড প্লেয়ারের পক্ষে সম্ভব নয়।
এটি আপনাকে যোগাবে অসাধারণ মোনো-সাউণ্ড এবং সত্যিকারের স্টিরিও সাউণ্ডও: এতে আছে স্টিরিও কার্টরিজ আর আউটপুট। শুধু আপনার রেডিওর সঙ্গে সংযুক্ত করুন—আর দেখুন কি হয়! —পেয়ে গেলেন স্টিরিও!
স্টিরিওতে বদলে নেওয়া যায়!
ডাইরেক্ট টেপ-রেকর্ডিং এবং প্লে-ব্যাকের জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে। মোনো আর স্টিরিও দুই ভাবেই।
চলবে মেইন্‌সে আর ব্যাটারীতে। আর মেইন্‌স থেকে ব্যাটারীতে আপনা থেকেই চলে আসবে—যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।
একই স্পীডের জন্য আপনি সবসময় এর ওপর নির্ভর করতে পারবেন—এর বিশেষ ইলেকট্রনিক স্পীড 'গভর্নর' তা সুনিশ্চিত রাখে।
রেকর্ড শেষ হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই সুইচ অফ হ'য়ে যাবে। আর হাঁ, এর আছে ভল্যুম আর টোন কন্ট্রোলস্ এবং ৩-স্পীড সিলেক্টর।
ঘরে বা বাইরে সব জায়গায়ই বাজান যাবে। (মজা আর বিনোদনের জন্য কত জায়গায় এটি ইচ্ছেমত নিয়ে যাওয়া সম্ভব ভেবে দেখুন তো!)
দেখলেই মন কেড়ে নেবে! চমৎকার ভাবে তৈরী করা হয়েছে—কাঠ, পলিস্টাইরিন আর ডেকোরেটিভ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে।
ফিলিপ্‌স মেইন্‌স ব্যাটারী সিস্টেম জি এফ ৫৩৩—এত সব যোগাচ্ছে এমন এক দামে যা একমাত্র ফিলিপ্‌স প্রযুক্তিবিদ্যারই সম্ভব।
আজই আপনার ফিলিপ্‌স বিক্রেতার কাছে চলে যান।
ফিলিপ্‌স
OBM-3444 BN
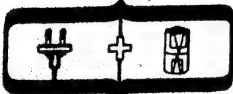
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এ কেমন উৎসব ?—		৩২৯
ব্যঙ্গচিত্র—		৩৩০
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত	...	৩৩১
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	৩৩২
রূপদর্শীর সোজার চিন্তা—	...	৩৩৩
বাঘা সারে ! (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৩৩৪
কি বর্ণের ঘুম (কবিতা)—রাণা চট্টোপাধ্যায়	...	৩৩৫
কিশোরীর ফুল (কবিতা)—দেবারতি মিত্র	...	৩৩৫
এমনি করে হারাই (কবিতা)—দেবতোষ বসু	...	৩৩৫
নিম্নচাপ (কবিতা)—শান্তিকুমার দাস	...	৩৩৫
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত	...	৩৩৬
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৩৩৭
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায়	...	৩৩৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রধানমন্ত্রীর জীবন ও সময়	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৩
মুজদেব বসু	আশরাফ্ সিদ্দিকী	৩৫৩
ঘরে বাইরে	শ্রীমতী	৩৬১
যুগ যুগ জীয়ে	সমরেশ বসু	৩৬৩
বিশ্ববিজ্ঞান	সমরজিৎ কর	৩৬৭
চিত্রপ্রদর্শনী	চিত্রপ্রিয়	৩৭১
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	তাপস গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭৩
আলোচনা		৩৭৭
গানের আসর	শার্ঙ্গদেব	৩৮১
পুস্তক পরিচয়		৩৮২
বার্নার্ড জুলিয়ন সোবার্সের ছায়া	মুকুল	৩৮৪
খেলার মাঠে	একলব্য	৩৮৫
রঙ্গজগৎ		৩৮৭
অরণ্যদেব		৩৯৩
অল্পবিস্তর	শিবরাম চক্রবর্তী	৩৯৪

প্রচ্ছদ : দিলীপ দাশ

সম্পাদকীয়

শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮১
৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫

এ কেমন উৎসব ?

গ্রীক-কল্পনার নয়জন মিউজ দেবী, যাঁরা বিবিধ বিদ্যা ও কাব্যকলার পরিপালিকা, যাঁরা সাংস্কৃতিক শীল ও সদাচারের প্রেরণাময়ী নায়িকা, তাঁদের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেও ভ্রূকুটি করেন না, ব্যথিত হলেও মুখবিকৃতি করেন না। তাঁরা কোন অবস্থাতেই তাঁদের স্মিতপ্রসন্ন রূপ ও ব্যক্তিত্বের সৌষ্ঠব বর্জন করেন না। তাঁরা ভাবোল্লাসে চঞ্চল হয়ে যখন নৃত্য করেন, তখনও তাঁরা খুব সতর্ক থাকেন, যেন ধূলি উত্থিত না হয়। বুঝতে অসুবিধে নেই, নয় মিউজ দেবীর এই চারিত্রিক তত্ত্বের মধ্যে বস্তুত সাংস্কৃতিক রীতি ও আচরণের একটি তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। এবং উৎসব নামে অভিহিত যে অনুষ্ঠান জাতির সাংস্কৃতিক অভিরুচি ও আকাঙ্ক্ষার একটি রূপান্বিত বহিঃপ্রকাশ, তারও একটি আদর্শিক প্রকৃতির পরিচয় এই তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা চলে, উৎসবকেও স্মিতপ্রসন্ন রূপ নিয়ে বিশেষ একটি রম্যতায় নন্দিত হতে হবে, নইলে কোন উৎসবই যথার্থ উৎসব বলে বিবেচিত হতে পারে না। উৎসবের নাম নিয়ে (হলোই বা ধর্মীয় উৎসব) স্থূলতা ও রূঢ়তার একটা প্রমত্ত দৃশ্য যদি সৃষ্টি করা হয়, তবে সেটা হবে সাংস্কৃতিক সত্যেরই অপঘাতক একটা ব্যভিচার।

এই অভিযোগ আজ দেশবাসীর অনেকের উদ্বিগ্ন মনের ভাবনাতে প্রবল হয়ে উঠেছে। পূজা ও উৎসবের সমারোহময় যে মাসটা কলকাতা ও কলকাতার বাইরের অজস্র গ্রাম ও শহরের হর্ষ এবং আমোদ উতলা করে দিয়ে গেল, তার সবটাই নিছক স্থূলতা ও রূঢ়তার প্রমত্ত একটা রূপ বলে কেউ অভিযোগ করবে না। কারণ, এরকম ঢালাও অভিযোগ বস্তুত একটি কঠোর অতিশয়োক্তি। বৈচিত্র্য, শ্রী, সৌষ্ঠব ও রম্যতার অনেক প্রকাশ অনেক উৎসবের আনুষ্ঠানিক অভিনবতার আকারে ও প্রকারে দৃশ্যায়িত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু অনেক উৎসব (সম্ভবত এরাই সংখ্যাধিক) যেমন তাদের নিদারুণ অভিনবতায় তেমনই তাদের নেপথ্য কদর্যতার ক্রিয়াকলাপে বস্তুত জনজীবনের উপর উৎপীড়নের এক মহাসমারোহের ব্যাপার হয়ে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের একটি করুণ বিপন্নতার সত্য সঙ্কেতিত করেছে। পূজা ও উৎসবের নাম ক'রে চাঁদা সংগ্রহের কাজটা যে-প্রথায় নিষ্পন্ন হয়েছে, সেটা অতীতের কোন অত্যাচারী বাদশাহের জিজিয়ার তুলনায় কম বর্বরতার প্রথা নয়। এক্ষেত্রে সরকার জনসাধারণকে চাঁদা-দস্যুতার আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি, যদিও জোর-জুলুমের বিরুদ্ধে শাসনিক নিষেধ ধ্বনিত করে রেখেছিলেন। পথ-অবরোধ করে পূজা-মণ্ডপের নির্মাণ, এই অনাচারের বিরুদ্ধেও পুলিসের যথোচিত ব্যস্ততার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। নাগরিক জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ানক অপঘাতক যে মাইক, তার চণ্ড কোলাহল স্তব্ধ অথবা সংযত করবার জন্যও পুলিস কোন সার্থক ও প্রত্যক্ষ প্রতিকারমূলক কর্তব্য পালন করেনি।

উৎসবের করুণ দুর্ভাগ্যের অন্য দিকের বাস্তব সত্য এই যে, অযোগ্য ও অনধিকারীর স্থূল অভিরুচির কাছে উৎসবের আত্মসমর্পণ। সাংস্কৃতিক আদর্শের কোন কিছুই যাদের জানা নেই, ধর্মনীতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে যাদের কোন শিক্ষাই নেই, যাদের অর্বাচীন চিন্তায় হুল্লোড়ই সবার উপর সত্য, বেশীর ভাগ তাদেরই উদ্যোগের রূঢ় গ্রাসের মধ্যে উৎসবের ভাগ্য নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের কোন কোন রিপোর্টে বিবৃত হয়েছে যে, যথেচ্ছ অর্থ সংগ্রহ করবার এবং যথেচ্ছ আমোদ করবার মস্তানীপনার সঙ্ঘবদ্ধ ও উদ্ধত ইচ্ছাটাই অনেক পল্লীর পূজা-উৎসবের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের প্রধান হেতু। এর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠার কোন প্ররণাই নেই।

ইতিহাসের শিক্ষা কিন্তু এই কথাই বলে : সাধু সাবধান। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বিকার এই পদ্ধতিতেই অনেক জাতির প্রতিভা ও সামাজিক উৎকর্ষের অধঃপতন ঘটিয়েছে। মিনার্ভা দেবীর মন্দিরের যে প্রাঙ্গণে গুণী জ্ঞানী শিল্পী ও কবিদের সম্মেলন একদিন যথার্থ সাংস্কৃতিক আনন্দের উৎসব হয়ে উঠতো, একটি শতাব্দী পার না হতেই দেখা গেল, সেই প্রাঙ্গণে মদ্যপানপ্রমত্ত অবাধ প্রগল্ভতাচারের স্ফূর্তি নিয়ে কদর্য এক উৎসব উল্লসিত হয়েছে। কারণ শিক্ষিত ও গুণিজনের, এবং সাধুজনেরও সেই অত্যন্ত উৎসবটির মধ্যে 'গোলা' লোকের ইচ্ছা ও অভিরুচির প্রবেশ প্রবল হয়ে উৎসবের প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সার্থকতার দফা-রফা ক'রে দিয়েছিল।

এমন মন্তব্য করবার অবশ্য প্রয়োজন হয় না যে, জাতির সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের চরম হানি ঘটাবার মতো অপরুচির প্রবলতা আমাদের পূজা - উৎসবের প্রেরণাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু লক্ষণ যেটুকু প্রকট হয়েছে, সেটুকুই যথেষ্ট আশঙ্কার সঙ্কেত। যথাসময়ে সংশোধিত ও পরিমার্জিত না হলে আমাদের জাতীয় উৎসবগুলির, বিশেষ করে পূজা-উৎসবগুলির আনুষ্ঠানিক অবনমন আরও শোচনীয় হবে।

উৎসবের আলো-ঝলমল শোভা ও বৈচিত্র্যের বিপুলতা আরও বাড়ুক, ক্ষতি নেই, যদিও নিরন্নতায় ক্লিষ্ট বৃহত্তর জনজীবনের দুঃখটা মুখ লুকিয়ে করুণ বিদ্রূপের হাসি হাসবে। কিন্তু উৎসবের নেপথ্যে যেন জোর-জুলুম-উৎপাতের অবাধ ইচ্ছার খাতাটা গরীব-অগরীব সকলের নাগরিক অধিকার ও সম্ভ্রমের যথেচ্ছ অবমাননা করে যথেচ্ছ চাঁদা সংগ্রহ করবার সুযোগ না পায়। মনে হয়, এর জন্য সরকারের পক্ষে বিশেষ আইন প্রচলিত করবার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়েছে। পূজা-উৎসবের অনুষ্ঠান করবার জন্য সরকারের সম্মতি প্রদানের রীতির মধ্যে কঠোর শর্ত বিহিত করা উচিত। সাংস্কৃতিক যোগ্যতার বিচার না করে কোন উদ্যোক্তাকে পূজা-উৎসবের অনুমতি প্রদান করা উচিত নয়।

সমাজ-বিজ্ঞানের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জাতির উৎসবগুলি বস্তুত জাতির প্রাণে এক-একটি বসন্ত-ঋতুর সমাগম। উৎসবের রম্যতার স্পর্শে জাতির প্রতিভা পুষ্পিত হয়, নূতন বাতাসের সঞ্চার জাতির প্রাণের ক্লান্তি দূরীভূত করে। দেশবাসী কে না চাইবেন, আমাদের উৎসবগুলিও যথার্থ আনন্দের জাগরণী হয়ে সব দীনতা ও মলিনতা ধুইয়ে দিক ?

সি পি আই
ছায়া ও কায়া

পূর্ব ভারতের প্রকৃত আন্দোলন চাই

আমাদের একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা আছে। এই ভুল ধারণাটা হল যে, কেন্দ্রে যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ দফতরে একজন বাঙালী মন্ত্রী থাকেন, তাহলে তাঁর ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে লাভবান হতে পারে। এই ধারণাটা কত ভুল আগে বহুবার তা প্রমাণিত হয়েছে। শচীন চৌধুরী কিছুদিন কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ তার জন্য একটুকু বাড়তি উপকার পায় নি। এবার এই ভুল ধারণাটা আবার ভেঙেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দেবীবাবুর আমলেও পশ্চিমবঙ্গ এতটুকু উপকার পায় নি। বরং, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর কেন্দ্রের যে সব অবিচার চলছিল, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি যেভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছিল গুজরাটি মানুভাই শার আমলে, বাঙালী দেবীবাবুর আমলেও সেই অবিচার ও সেই লুণ্ঠন সেইভাবেই চলছে। বরং কিছুটা বেড়েছেও।

এবং, দেবীবাবু শুধু যে কিছুই করতে পারেন নি বা করেন নি তা নয়, উল্টে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র হিসাবে এই অবিচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ উঠলেই তা অস্বীকার করে যাচ্ছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের সাফাই গাইছেন। দেবীবাবু বাণিজ্য মন্ত্রী হওয়ায় কেন্দ্রের বরং একটা বিশেষ সুবিধা হয়ে গিয়েছে—সাফাই গাওয়ার জন্য তাঁরা একজন বাঙালী ও পূর্ব ভারতীয় পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারত কীভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে, স্বাধীনতার পর থেকেই অর্থনৈতিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের উপর কী কী অবিচার হয়েছে ও হচ্ছে প্রথম তা সুসংগঠিতভাবে তুলে ধরেন আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের রণজিৎ রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কী রাজসিক ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই তুলনায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য কী সামান্য মুষ্ঠিভিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে রণজিৎবাবু সরকারী তথ্য থেকেই তা দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বৈষম্যমূলক আচরণের কোনও সদুত্তর এখনও দিতে পারেন নি।

কয়লা ও ইস্পাতের দর সারা ভারতে এক করে দিয়ে কেন্দ্র কীভাবে পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করেছে রণজিৎবাবু তাও দেখিয়েছেন। এবং, সেই সঙ্গেই দাবি তুলেছেন তাহলে তুলো, তৈলবীজ ও অন্যান্য কাঁচামালের দরও সারা ভারতে এক করা হোক। এই দাবি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাও পরে সংসদে এবং সংসদের বাইরে তুলেছেন। এই দাবি দেবীবাবুর কাছেও রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছু তো করেনই নি, উল্টে কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক ও ঔপনিবেশিক শোষণের মনোবৃত্তির সাফাই গেয়েছেন।

*

সম্প্রতি দেবীবাবুর দফতর এবং কেন্দ্রীয় কর্তারা পাটচাষীদের মারার জন্য কী সর্বনাশা অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন রণজিৎবাবু তাও দেখিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার, বিহারের এবং ওড়িশার লক্ষ লক্ষ পাটচাষীর সর্বনাশ করার জন্য মিল মালিকরা, প্রগতিশীল দেবীবাবুর দফতর এবং সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান পরিচালক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কী মারাত্মক সব ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতের তুলা চাষীদের যত বেশি সম্ভব পাইয়ে দেওয়ার জন এই কর্তারাই কতটা উদ্গ্রীব—রণজিৎবাবু তাও দেখিয়েছেন।

পাট এবার কম চাষ হয়েছে। এখন পাটের চেয়ে অন্যান্য চাষে বেশি পাওয়া যায় বলে সমগ্র পূর্ব ভারতেই পাট চাষ কমে গিয়েছে। অথচ, বিশ্বের পাটের বাজার বেশ তেজি। বিশেষ করে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার পর। ফলে, এবার কাঁচা পাটের দর বেশ ভাল পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পূর্ব ভারতের লক্ষ লক্ষ চাষীর চোখে আশা দেখা দিল। ঠিক এই সময় দেবীবাবুর দফতর ও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া মিল মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সর্বনাশ করতে এগিয়ে এল। সরকার স্থির করলেন : (১) বাজার থেকে কাঁচা পাট কেনার জন্য কাউকেই (জুট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বা মিলদের) বেশি টাকা আগাম দেওয়া হবে না। তারা যাতে বেশি পাট কিনতে না পারে। (২) মিলগুলির উপর নির্দেশ গেল, কেউ তিন মাসের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাঁচা পাট কিনে মজুত করতে পারবে না।

এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হল ঠিক পাট ওঠার মুখে। ফলে, কাঁচা পাটের ভাল দর পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যে মিলিয়ে গেল। কাল্লা টাকার মালিকরা (যারা অনেকে ঘুরিয়ে চটকলওয়ালা,) বেনামে সস্তায় কাঁচা পাট কিনে রাখার সুবর্ণ সুযোগ পেল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী বঞ্চিত হল। পাটকলগুলিও বেশ কম দামেই পাট কিনতে পারল।

আগামী সংখ্যা থেকে 'খাও পাখি' উপন্যাস পুনরায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

রণজিৎবাবু তাঁর সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কতগুলি সরকারী তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রকাশিত তথ্য। ভারতের অন্যান্য চাষীর তুলনায় পাটচাষী কীভাবে বঞ্চিত এই তথ্যে তা পরিস্কার। বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের দর গত চৌদ্দ বছরে যেভাবে বেড়েছে পাটের দর তার তুলনায় কিছুই বাড়ে নি। হিসাবটা এইরকম :

	১৯৭৩ ফেব্রুয়ারি	১৯৭৪ ৩১ আগস্ট
	(১৯৬০-৬১=১০০)	
সকল কৃষিজাত দ্রব্য	১৯৯	৩৭৯
কাঁচা পাট	১৩৪	১৬১
খাদ্যশস্য	২৫১	৩৯৯
তুলা	২০৬	৪০৮
পাটজাত দ্রব্য	২১২	২৮৭

এই তথ্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেছে এবং এই তথ্য থেকেই পরিস্কার, পূর্ব ভারতের পাট চাষীকে যখন মারা হচ্ছে তখন পশ্চিম ভারতের তুলা চাষীকে কীভাবে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার, পাট চাষীর চেয়ে যে পাটকল মালিকরা খাতাপত্রেই বেশি পাচ্ছে তাও এই সংখ্যা তথ্যেই পরিস্কার। কাঁচা পাটের দর তের-চৌদ্দ বছরে বেড়েছে মাত্র শতকরা ৬১ ভাগ আর পাটজাত দ্রব্যের দর বেড়েছে শতকরা ১৮৭ ভাগ। তুলার দর বেড়েছে শতকরা ৩০৮ ভাগ।

এর পরও দেবীবাবুর দফতর ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মিল মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাটচাষীকে আরও মারার চেষ্টা করছে।

*

আসল কথা হল, কেন্দ্র এই নীতি চালাবেই। দেবীবাবু, সিদ্ধার্থ রায়, নন্দিনী সৎপথী, আবদুল গফুরের মত লোক পাওয়ায় কেন্দ্রের আরও সুবিধা হয়ে গিয়েছে। এরা পুরোপুরি দিল্লির উপর ভরসা করে ক্ষমতায় রয়েছেন। জানেন যে, এই শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের গদীই যাবে। তাই, তাঁরা এগুলি মোটামুটি চুপচাপই মেনে যাচ্ছেন।

এই অবস্থার প্রতিকার হতে পারে যদি পূর্ব ভারতে সত্যিকারের কোনও শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন হয়। সে আন্দোলনে সমগ্র পূর্ব ভারতকে চাই। যেটা ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ রাজনীতি নয়। অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জোরদার স্বাস্থ্যবান রাজনীতি। এই রাজনীতির লক্ষ্য হবে না পাঞ্জাবী বা গুজরাটি বা মাদ্রাজী পেটাও। এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা।

১৮-১১-৭৪

নবারুণ গুপ্ত

[illegible]

[illegible] মস্কো আর পিকিং। [illegible] মিল দুই কম্যুনিস্ট [illegible] নেই। চোদ্দ বছর হলো তাদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে। তকরার লড়াই তাদের মধ্যে সমানে চলেছে। বছর পাঁচেক আগে আইবেরিয়া সীমান্তে আমুর আর উসুরি নদীর মাঝে এক ছোট্ট দ্বীপও হয়ে গেছে। তখনই রটেছিল পারমাণবিক অস্ত্র ছেড়ে চীনকে ঠাণ্ডা করে দেবে রুশীরা যদি না চীনারা নাকে খত দেয়। তা অবশ্য হয়নি। চীন নাকে খত দেয়ও নি রুশিয়াও চীনের ওপর হামলা করে নি। তবে চীনদের বিশ্বাস তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে রুশীরা তাকিয়ে তৈরি হচ্ছে। কম্যুনিস্ট জোটগুলো দু ভাগ হয়েছে। তাদের কেউ রুশপন্থী, কেউ বা চীনপন্থী। ওদিকে অকম্যুনিস্ট দেশগুলোতে কম্যুনিস্টরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেছে। তাদের এক শরিক রুশিয়ার ভক্ত, এক শরিক চীনের।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে লোকে ধরে নিয়েছে রুশ-চীন মনান্তর কোনও দিনই ঘুচবে না—আপাতত তো নয়ই। চীনারা বলছে রুশীরা শোধনবাদী। আর গড়ে তুলেছে এক আজব চিজ যা হচ্ছে সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদ। ওদিকে রুশীরা ধুয়ো তুলেছে চীন সাচ্চা কম্যুনিস্ট মোটেই নয়, মেকি নিয়েই তার কারবার। আসলে সে উগ্র জঙ্গীবাদী দেশ। ছলে বলে কৌশলে নিজের এলাকা বাড়িয়ে নেওয়াই তার মতলব। অন্য কোন ছার খোদ রুশিয়ার জমির ওপরই তার লোভ। দু পক্ষই অবশ্য সরকার আর দেশের মানুষকে আলাদা করে দেখছে। দু পক্ষই বলছে যত নষ্টের মূলে দেশের সরকার তারা যা করছে তাতে লোকের সায় নেই। চীনের সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক চিড় খেয়েছে ক্রুশ্চেভের আমলেই। তার ওপর চীনের কম্যুনিস্ট দলের পাণ্ডাদের বেজায় রাগ। ব্রেজনেভ-কোসিগিনের ওপরও রাগ কিছু কম নয়। পিকিংয়ের ধারণা, তাঁরা গদিতে যতদিন কায়েম থাকবেন ততদিন আপসের কোনও সম্ভাবনা নেই। মস্কোর ধারণাও ওরই উলটো পিঠ। তার কথা হচ্ছে গোল বাধিয়েছেন মাও সে তুং-চু এন লাই জোট—ও'রা থাকতে রুশ-চীন ভুল-বোঝাবুঝির অন্ত হবে না।

দু দেশের মধ্যে এত চটাচটি থাকলেও কূটনৈতিক গাটছড়া কিন্তু কেউই ছিঁড়ে ফেলেনি। পিকিংয়ে আছেন রুশী কূটনীতিকের দল, মস্কোয় চীন কূটনীতিকদের গোষ্ঠী। যে যার সরকারের বক্তব্য ফলাও করে প্রচার করছে দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয় থেকে।

বৈদেশিকী

দেবরাজ

নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণে যাওয়া-আসাও আছে। অবশ্য নিজের এলাকায় অপরকে সুবিধে পেলেই দু কথা তাঁরা শুনিয়ে দেনও। অপর পক্ষ অবশ্য চুপচাপ সে অপমান বরদাস্ত করেন না—রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে আসেন অভ্যর্থনার আসর কিংবা ভোজসভা থেকে। এবারও চীনা রাষ্ট্রদূত অভিমান করে বেরিয়ে এসেছেন মস্কোর অভ্যর্থনা সভা থেকে ৭ নভেম্বর। পালে-পার্বণে এক দেশের তরফ থেকে আর এক দেশের সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী পাঠানোও হয়। লোকে ধরে নেয় এ সব নিছক ভণ্ডামি, এর কোনও মানে নেই। এ সব বাণীর ওপর বেশী গুরুত্ব দিলে আখেরে ঠকে হয়। অন্য কোনও সময় না হোক জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক দেশের সরকার আর এক দেশের সরকারকে বাণী পাঠাবেনই। চীনের জাতীয় দিবস পয়লা অক্টোবর। ও দিন রুশীরা চীনাদের শুভ কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে দু কথা বলবেই। আবার পালটা জবাব দেয় চীনারা রুশ বিপ্লবের স্মরণ দিনে ৭ নভেম্বর। এবারেও ও নিয়ম না পিকিং না মস্কো কেউই ভাঙেনি।

কিন্তু শোরগোল উঠেছে চীনের রুশিয়াকে পাঠানো নভেম্বরের শুভেচ্ছা নিয়ে। তাতে চীন বলেছে রুশিয়ার সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করতে সে রাজী, তার সঙ্গে সীমানা নিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতেও। ঠিক এ ধরনের মোলায়েম ভাষায় আপসের কথা চীন আগে কখনও তোলে নি। দুনিয়া জুড়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে, তা হলে চীনের চাল কি পালটাচ্ছে? কালতুত্তো বড় ভাই রুশিয়ার সঙ্গে সে কি মিটমাট করার তালে আছে? চীনারা বলেছে ১৯৬৯ সনে পিকিং বিমান বন্দরে চু এন লাইয়ের সঙ্গে কোসিগিনের যে ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল সেটাকে মেনে নিলে কেমন হয়? তাদের কথা হচ্ছে সীমান্ত থেকে দু পক্ষই যার যার ফৌজ সরিয়ে নিক, সেখানে অবস্থাটা যা আছে তাই থাকুক, তারপর ঝগড়ার নিষ্পত্তি হোক কথাবার্তা বলে বৈঠকে বসে. একটা চুক্তিও হোক এই বলে যে, কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, কোনও কারণেই জোর খাটিয়ে কোনও সমস্যার ফয়সালা করবে না, সামরিক সংঘর্ষ যাতে না বাধে সেদিকে নজর রাখবে, যে সব এলাকার মালিকানা নিয়ে মতান্তর আছে সে সব এলাকায় সৈন্যসামন্ত মুখোমুখি থাকবে না যাতে উত্তেজনা না বেড়ে কমে যায়।

এ সব বেশ ভালো ভালো কথা। দু পক্ষ যদি এই সব মেনে চলে তা হলে কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় [illegible] মিটে যায়। কিন্তু সত্যি কি চীনারা মিটমাট চায়? তাদের যে সুমতি হয়েছে এ কথা মেনে নিতে রুশীরা রাজী নয়। তারা খোলাখুলি চীনের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়নি, তবে আড়ালে বলছে ওটা একটা কূটনৈতিক প্যাঁচ। রুশিয়াকে বেকায়দায় ফেলাই তার মতলব, খানিকটা আমেরিকাকে ধাঁধায় ফেলাও। রুশীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে চীন সত্যিই যদি রুশিয়ার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতাতে চাইতো তা হলে সে যে রুশ হেলিকপটারটা তার চালক আর আরোহী সমেত ধরে রেখেছে সেটা ছেড়ে দিয়ে তবে আপসের কথা পাড়তো। ও হেলিকপটারটা মার্চ মাসে কলকব্জা বিগড়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে নেমেছিল সিংকিয়াং এলাকায়। চীনেরা চালক আর আরোহী সমেত তাকে আটক করে রেখেছে এই বলে যে ওটা গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল। আপসের ইচ্ছে থাকলে একটা মামুলি শুভেচ্ছা বাণী না পাঠিয়ে চীন ওই হেলিকপটারটাই ফেরত পাঠাতো রুশিয়ায় আর সেটাই হতো তাদের সুবুদ্ধির অকাট্য প্রমাণ এই আভাসই দেওয়া হয়েছে রুশীদের জবানিতে।

চীনেরা ওই চিঠি পাঠিয়েছিল ভ্ল্যাডিভস্টকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে রুশ কম্যুনিস্ট দলের সচিব ব্রেজনেভের মোলাকাতের ঠিক আগেই এটা লক্ষ করে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন ওটা আমেরিকাকে ভড়কে দেবার ফন্দি। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিলে গেলে আমেরিকার আর রুশিয়ার সঙ্গে দোস্তি করে কী লাভ এই ভেবে ফোর্ড ব্রেজনেভের সঙ্গে কথাবার্তায় বেশী দূর নাও এগুতে পারেন এই আশায় হয়তো চীন ঢিলটি ছুঁড়েছে সময় [illegible]। এ সবই অবশ্য আন্দাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক কেন যে পিকিং বাণীটা পাঠিয়েছে তা সত্যিই একটা চীনে হেঁয়ালি। তার জবাব চীনই জানে। তবে চট করে কিছু একটা রুশিয়া করে বসবে এতটা কূটনীতিতে কাঁচা ক্রেমলিন নয়। চীন কেবল তো অনাক্রমণ চুক্তির কথা তোলে নি, তুলেছে সীমান্ত-সমস্যার কথাও। ওইটাই তো মিটমাটের প্রচণ্ড বাধা। চীনের সঙ্গে তার সীমান্ত নিয়ে কোনও ঝগড়া আছে এ কথা রুশিয়া মানে না। চীনের দাবি হচ্ছে তার অনেক এলাকা জারের আমলে রুশীরা জবরদখল করেছে, সে সব কম্যুনিস্ট আমলে রুশিয়ার ফেরত দেওয়া উচিত। ও দাবি মস্কো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এক ইঞ্চি জমিও চীনকে ছেড়ে দিতে রুশিয়া নারাজ। তার মতে, সীমান্ত এখন যা আছে তাই চূড়ান্ত, তার একটুও নড়চড় হবে না। এ শর্ত মেনে কী আর চীন আপস করতে বৈঠক বসাবে?

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রি

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার কাছে পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর ছাত্র ও যুবারা কৃতজ্ঞ থাকবেন কারণ রায় মন্ত্রিসভা তাঁদের সামনে মুক্তি ও রোজগারের নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পটি সব থেকে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা হল ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রি।

যে যে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যা নিকেতনে ইন্ডাস্ট্রির ভিত্তিতে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে সেই সেই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়নের মাতব্বরগণ প্রচুর টাকা কামাই করছেন।

প্রধানত দুটো উপায়ে এই সব ইউনিয়ন ইনডাস্ট্রি ফেঁপে উঠছে। (এক) পরীক্ষার হলগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন ইনডাস্ট্রির কাছে ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। এবং ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রির পরিচালকবর্গ পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে গায়ের জোরে "শান্তি কর" আদায় করছে। এবং (দুই) এক শ্রেণীর কলেজ কর্তৃপক্ষ "হাঙ্গামা এড়াবার জন্য" কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রির পরিচালকবর্গের সঙ্গে একটা রফা করেছেন। রফার শর্ত এই যে, কলেজের অনার্স সীটগুলোর অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রির পরিচালকবর্গের সুপারিশ অনুযায়ী ভর্তি করা হবে। বাকি ৭০ ভাগ ভর্তি করবেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এ ছাড়া যে-কলেজ, যে-ছাত্র ইউনিয়নের সাম্রাজ্যের অধীন, সেই কলেজে ভর্তি হতে গেলে ছাত্র মাত্রকেই "অ্যাডমিশন ফি" বাবদ ২ টাকা থেকে ১০ টাকা ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রিকে দিতে হবে।

কলকাতার প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে এই সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং সংবাদ (স্টেটস্‌ম্যান) পরিবেশিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র ইউনিয়ন বা শিক্ষা দফতরের কাছ থেকে কোনও বিবৃতি, প্রতিবাদ বা অন্য কোনও রকম মন্তব্য এখনও পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। জনসাধারণের মধ্যেও কোনও রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। তবে কি ধরে নিতে হবে যে দেশসুদ্ধ সবাই আমরা জ্ঞানপাপী হয়ে আছি? না কি এর ভয়াবহ পরিণাম বোঝবার মত বোধশক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি?

আমার যা খবর তাতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই দলের ছাত্ররাই এই লুঠের কারবারে নেমে পড়েছেন। কংগ্রেস বলতে ছাত্র পরিষদ ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটি—কেউই এই ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রির বাইরে নেই। আরও লজ্জা ও পরিতাপের কথা, অনেক অভিভাবকও জেনেশুনে নিজেদের ছেলেমেয়েকে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রিকে মোটা টাকা দিয়ে অনার্স-এ ভর্তি করাচ্ছেন।

অবস্থা আজ কতটা শোচনীয় হয়ে উঠেছে তা দেখুন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রতিবেদক জানাচ্ছেন (৯ নভেম্বর ১৯৭৪): সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে "অ্যাডমিশন ফি", "পরীক্ষার হলে শান্তি কর" ইত্যাদি বাবদ বছরে ৩।৪ লক্ষ টাকা নিরীহ ছাত্রদের কাছ থেকে জবরদস্তি আদায় করা হচ্ছে।

পরীক্ষার হলে উৎপীড়নের কাহিনী তবু জানা যায়। কিন্তু "অনার্স ক্লাসে" ভর্তির ব্যাপারে টাকা লেনদেনের ব্যাপারটা এখনও যে গোপন আছে তার কারণ এই দুর্নীতি দুতরফা। এবং ছাত্র ইউনিয়নের নামে এই দুর্নীতি চলেছে, এই কথা জানার পর দুঃখ ক্ষোভ এবং হতাশায় মন ভরে ওঠে।

কীভাবে এই দুর্নীতি চলে তা বলি। নিজ নিজ এলাকায় পরীক্ষার হলে ছাত্র ইউনিয়নের পেশাদার মস্তানেরা ঢুকে পড়ে "শান্তি কর" আদায় করে। এক-এক এলাকায় করের হার এক-এক রকম। যে-সব ছেলে "শান্তি কর" দিয়ে দেয়—আজকাল অধিকাংশ ছাত্রই এই "শান্তি কর" দিতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে যে এই জুলুমবাজ নতুন বর্গীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই—তাদের টোকাটুকির খুব সুবিধে হয়ে যায়। এককালে প্রবাদ ছিল, কলকাতায় টাকা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। এখন, টাকা দিলে পরীক্ষার হলে সব প্রশ্নের উত্তর লেখা আস্ত খাতাও সরবরাহ করা হয়। এমন কি, এও দেখা গিয়েছে, উত্তর পত্র জমা পড়ে পরীক্ষকদের বাড়ি চলে যাবার পরও ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রি যথাযোগ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেই খাতা বদলে দিয়ে এসেছে।

এবার ভর্তি। সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্র ইউনিয়নকে "অ্যাডমিশন ফি" না দিলে কোনও ছাত্রের পক্ষে অ্যাডমিশন ফরম পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ নামক মেরুদণ্ডবিহীন এক অস্তিত্বের সাধ্য নেই যে স্বাধীনভাবে সে কাউকে ফরম বিলি করে।

অনার্স ক্লাসে কে ভর্তি হবে তা তার পাশ নম্বরের উপর নির্ভর করে না। ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রি যাকে ভর্তি করতে নির্দেশ দেবে, সে-ই শুধু ভর্তি হতে পারবে। অবশ্যই বিনামূল্যে নয়। যে ছাত্রের নম্বর যত কম, ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে সেই তত লোভনীয় খদ্দের। কারণ, তার কাছ থেকেই তত বেশি টাকা পাওয়া যায়।

মোটামুটি এই হচ্ছে আজকের পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রি শাসিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটা রেখাচিত্র। এবং যে পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার আজ শ্রীমান সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এবং যার ছাত্র ও যুবাপ্রীতি আজ সর্বজনবিদিত।

এখন বলুন, ছাত্র বন্ধুগণ! এই শিক্ষা আপনাকে কী দেবে? বলুন, অভিভাবকবর্গ! নিষ্ক্রিয় এবং নীরব থেকে অথবা এই ব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার করে, আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য আপনি কোন্ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু না বলাই ভাল। কারণ বলাটাই পণ্ডশ্রম। শুধুমাত্র পদ আঁকড়ে থাকাটাই যাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র, এবং যে-কোনও মূল্যে, তাঁদের কানে বেসুরো কথা বাজবে না জানি।

তবে এই ছাত্ররাই তো একদিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। এবং এই বিদ্যার মূলধনের জোরে শিক্ষক হবে, অধ্যাপক হবে, অধ্যক্ষ হবে, উপাচার্য হবে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আরও কত কী হবে? হয়ত কেউ মুখ্যমন্ত্রীও হবে।

মনে কর রে মন! সে দিন উজ্জ্বল!

ব্যথা সারে !

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কবে সে কৈশোর-কাল একদিন পড়ন্ত বেলায়
মত্ত হয়ে ছিলাম খেলায়
বাড়ির উঠানে.
অকস্মাৎ ভেসে এল কানে
গ্রাম্য পথে কে বিচিত্র ফিরিওলা কী অদ্ভুত দীর্ঘ হাঁক পাড়ে ঃ
ব্যথা সারে ! ব্যথা সারে ! ব্যথা সারে !

কে এ লোক ? হেন কথা বলে কী সাহসে
এই পাড়াগাঁয়ে ?
কৌতূহলবশে
ছুটে গিয়ে দেখি এক জীর্ণ বৃদ্ধ চলেছে মন্থরে ধূলো-পায়ে
কাঁধে লাঠি প্রান্তে বাঁধা কাপড়ের সামান্য পুঁটুলি,
মুখে সেই অসম্ভব বুলি
মাঠে ঘাটে দ্বার হতে দ্বারে :
ব্যথা সারে ! ব্যথা সারে !

কাছে যেতে ফিরিওলা উৎসুক-উন্মুখ
শুধাল মধুর স্বরে ঃ বাড়িতে আছে কি কোনো অসুখবিসুখ
জ্বর-জ্বালা ব্যথা-কষ্ট সরবে-নীরবে ?
নিয়ে চলো তবে
অল্প-স্বল্প পেলে কিছু দাম
দিয়ে দেব আরোগ্য-আরাম।
বলিলাম, না তো নেই কারো কোনো অসুখবিসুখ।
নেই ? ফিরে গেল ফিরিওলা বিমর্ষ-বিমুখ—
কোথা গেল ? কে সে লোক ? ভালো ক'রে দেখিনি তো মুখ।

তারপর
অর্ধশতাব্দীরও বেশি কেটে গেছে নিষ্ফল বছর,
ব্যথার সমুদ্র দিয়ে বয়ে গেছে কত শত প্রহর-লহর
তপ্ত অশ্রুধারে।
সহসা সেদিন শুনি মধ্যরাতে শহরের দগ্ধ অন্ধকারে
সেই সে পুরনো সুরে ফিরিওলা দীর্ঘ হাঁক পাড়ে ঃ
ব্যথা সারে ! ব্যথা সারে ! ব্যথা সারে !
উন্মাদের মতো ছুটে বাইরে এলাম আত্মভোলা
খুঁজি তারে হেথা-হোথা কোথা ফিরিওলা
কাঁধে লাঠি ডগায় বোঁচকা বাঁধা চলন মন্থর
ডাকি তারে ঃ কোথা তুমি স্বাদু জাদুকর ?
কোথা নাই, কেহ নাই শুধু সেই অনিরুদ্ধ স্বর
ধ্বনিছে আকাশে,

সর্ব বিশ্ব ভ'রে আছে শান্ত উপশমের আশ্বাসে
স্তব্ধ স্পন্দহারা
মনে হল সব ব্যথা সারে বুঝি এক ব্যথা ছাড়া।

রাত্রে-দিনে উদয়ে-বিলয়ে
সামান্য দামের বিনিময়ে
দ্বারে দ্বারে কী ওষুধ করো তুমি ফিরি?
জানো না কি সেই ব্যথা সারে না তো তুমি যদি না হও শরীরী
অমৃতের মিত আয়তনে,
যদি নাহি ধরা দাও উদ্বেলিত বাহুর বন্ধনে
অকারণে!
সে ব্যথা সারার নয়—দুঃসহের চেয়েও দুঃসহ
সে ব্যথার নাম জানো? নাম তার ঈশ্বর-বিরহ॥

কি বর্ণের ঘুম

রাণা চট্টোপাধ্যায়

কি বর্ণের ঘুম তুমি ভালোবাসো?
নদীর স্বচ্ছতা চোখের ভেতর ঘুম এনে দেয়—
ভালবাসা-রঙিন ঘুম, বহু বর্ণের ঘুম
যেন আজকাল ঘুমহীনতা রক্তের ভেতর এনে দেয় সন্ন্যাস-

কি সুর তুলেছো আনন্দলোকে নারী?
কালো রঙের উত্তরীয় মাটি ভেদ করে উড়ছে হাওয়ায়
কি বর্ণের ঘুম উঠে আসে ধীবরের জালে?

এইতো অবসর, হাওয়ায় মিশে যায় শ্বাস
কি বর্ণের ঘুম প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে
হাতে হাত হেঁটে যাওয়া লালরঙের ধুলোয়?

এমনি করে হারাই

দেবতোষ বসু

ভিতর দিকে যাচ্ছে বেঁকে শব্দ, যেন তীর
কী কৌশলে ফেরাবো মন সেই প্রতিবন্ধীর?
দিয়েছি তাকে সংগৃহীত ধাতুর সব শ্রী
ওষ্ঠে নিপুণ ব্যঙ্গ এবং নয়নে বহ্নি;
তপ্ত বলে তাকে আমি জলেও রেখেছি
নিজের হাওয়ায় তাড়িয়েছি তার আস্ফোটে মাছি।
এবং আমি যতই তার আনুভূমিক পা
ধরতে যাই ভালোবাসায়, এক অবৈধতা
আছড়ে পড়ে বধির ক্রোধে, ভিতরে নিরাকার
শান্ত জ্বলে দু চোখ, আমি দেখিনি যাকে, তার;
এমনি করে হারাই আমি যা পাই, যা না পাই
অখণ্ড এক যুদ্ধে ভেঙে দু ভাগ হয়ে যাই।

কিশোরীর স্কুল

দেবারতি মিত্র

এত স্বল্পবাসা কিশোরীরা রাস্তায় এসেছে,
তা কি করে সম্ভব?
সামনের দিকে ঘুম-ফ্রকের বোতাম খোলা
দেখা যাচ্ছে সবে ফোটা ফুল
হাওয়ায় ভাসছে খুব ফুরফুরে ঠাণ্ডা
আতপ্তকাঞ্চনরঙা ছোট্ট হালকা স্তন
ফুটকি ফুটকি কত সংখ্যাহীন আবছা হলুদ কুঁচি মুদু

অতসী গাছের চেয়ে কিছু বড়
একটি লাজুক গাছ হাতছানি দিয়ে ডাকে—
গোছা গোছা পাতাসুদ্ধ শাখাগুলি পাগলী কিশোরী
নতুন উজ্জ্বল স্তন উড়ুউড়ু ফিকে টিউ ফুল।
ক'টি স্তন ক'টি বা কিশোরী
এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়......
গোনার আগেই
খেয়ালী ন' নম্বর দক্ষিণ-পুব দিকে
নিয়ে চলে গেল।

নিম্নচাপ

শান্তিকুমার দাস

বৃষ্টি-ঝড়ের অমোঘ দাপটে
বাতিগুলো নিভে গেছে,
তবু যেন এক গোপন আলোক
চোখে চোখে আছে বেঁচে!

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে
নেশা করা দুটি প্রাণী;
হঠাৎ বৃষ্টি থামলে আবার
ওদেরই মানুষ মানি!

ভারতের অর্থনীতি

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সরকার একথা স্বীকার করেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী টি এ পাই বলেছেন, যে এখন ৭·৫ শতাংশ হারে শিল্পোৎপাদন বাড়াতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বিতরণ, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা প্রদান, প্রভৃতি ঢেলে সাজাতে হবে। শ্রীপাই-এর মতে বিক্রেতার বাজার যে চিরকাল চড়া থাকবে তা নয়, ক্রেতাদের স্বার্থের দিকেও বিক্রেতাদের দৃষ্টি দিতে হবে। শ্রীপাই শিল্পগুলিকে লাইসেন্সভিত্তিক উৎপাদনী শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উৎপাদন বাড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে যদি এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ লাইসেন্সভিত্তিক ক্ষমতার চেয়ে বেশিও হয়, তাহলেও সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। অপরদিকে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উৎপাদন যদি লাইসেন্সভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়, তবে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হবে। শ্রীপাই আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, শিল্পনীতি উন্নয়নমুখী করাই সরকারের লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণমূলক করা নয়। বর্তমান অবস্থায় এবং আরও আসছে কয়েক বছর সরকারকে শিল্পক্ষেত্রে 'নির্বাচন-মূলক' নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং বিনিয়োগের ধারা সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

যদি শিল্পক্ষেত্রে মন্দা না হয়ে থাকে তবে শিল্পোৎপাদন ক্রমশঃই হ্রাসমান হচ্ছে কেন? সরকারের পক্ষে যুক্তি হল, একাংশ অসাধু শিল্পপতি জিনিসপত্রের দাম বর্তমানে কিছু পরিমাণে নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে কৃত্রিম অভাবের অবস্থা বজায় রাখতে চান। দেশে উৎপাদন-ধারা ব্যাহত হচ্ছে এই যুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ীগণ মনে করেন যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা অবশ্যম্ভাবী এবং এই অবস্থার মোকাবিলা করতে হলে এখনই রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণসংক্রান্ত নীতি আরও উদার করা দরকার। কেননা ব্যাংকের ঋণ-সংকোচন নীতিই এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নর ডক্টর হাজারী বলেছেন, ঋণের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে বলে কোন তথ্য তাঁর জানা নেই। রিজার্ভ ব্যাংকের মতে কোন কোন কারখানায় উৎপাদন কমে যাবার অন্যান্য কারণ থাকতে পারে; তবে ব্যাংকের ঋণ-সংকোচন নীতি এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ বলে রিজার্ভ ব্যাংক মনে করে না। সরকারী শিল্পসংস্থাগুলিতেও যে উৎপাদন কমে যাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং সরকারী উদ্যোগগুলিরও অর্ডার-পত্র যে কমে যাচ্ছে ডক্টর হাজারী তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো, এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার প্রয়োজন এখন খুবই বেশি; তা না হলে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। কৃষি, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মূল ধাতব জিনিস, খনিজ সামগ্রী, এবং জনগণের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস উৎপাদনের জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রেও ব্যাংক-ঋণের অভাব হচ্ছে না বলে ডক্টর হাজারী জানিয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি খুব কঠোর হলেও সাধারণভাবে উৎপাদন বাড়াবার প্রয়াসে ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পেতে যাতে অসুবিধা না হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশনামা সেভাবেই জারি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করে রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বলেছেন যে এই রাজ্য কৃষিগত পুনঃ ঋণ সরবরাহ সংস্থা (Agricultural Rifinance Corporation) প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদির পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে এই সংস্থা স্থাপিত হবার পর থেকে এ-পর্যন্ত ২৬টি জলসেচ প্রকল্পের জন্য ৩·৭০ কোটি টাকার পুনঃ ঋণ সরবরাহের সুবিধা অনুমোদিত হয়েছিল; তার মধ্যে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাত্র ৪৪ লাখ টাকার সুবিধা গ্রহণ করেছে; অপর দিকে এই সময়ের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ২৯০টি প্রকল্পের জন্য ৬৮·৩২ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে; এবং তার মধ্যে ৩৪·৭৬ কোটি টাকার সুবিধা গৃহীত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণদান নীতি অনুযায়ী যতটুকু ঋণ পাওয়া যায় তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করতে পারাও উৎপাদন হ্রাসের একটি কারণ হতে পারে।

দেশের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ-কল্পে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো খুবই জরুরী। যেসব শিল্প নিত্যব্যবহার্য ভোগ-সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী উৎপাদন করার জন্য দরকারী মূলধন-সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণদানের সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীপাই আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্র নীতি কঠোর করা হয়েছে সন্দেহ নেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সুদের হারও খুবই বেশি। দেশে চোরা-কারবারী ও ফাটকা-কারবারীদে ব্যবসায় প্রতিরোধ করাই এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির উদ্দেশ্য বলে ব্যাংকিং-মহল থেকে জানানো হয়েছে। আমাদের দেশে জিনিস পত্রের দাম এ-বছর সর্বকালীন সর্বোচ্চ রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল; এক্ষেত্রে যা কোন কোন শিল্পজাত সামগ্রীর দাম কমে আসে তবে সাধারণ লোকের কাছে সেটা শু সংবাদ বলেই গণ্য করা হবে। কিন্তু সমস হল দাম কমে আসার পর লাভের সম্ভাবন কমে যাওয়ায় শিল্পপতিগণ যদি উৎপাদ কমিয়ে দেন। সুতী কাপড়-চোপড়ের দা এখন কিছু কমেছে; সাধারণ ক্রেতারা এ কিছু উপকৃত হয়েছেন। কারণ একমা আগেও কাপড়-চোপড়ের দাম এত বে ছিল যে সাধারণ মানুষের নাগালের বাই তা চলে গিয়েছিল। মূল্য-বৃদ্ধির বিপ ক্রেতাদের তরফ থেকে নীরব প্রতিরোধ কিছুটা পরিলক্ষিত হয়নি তা-ও নয়। কার ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় অনেক ক্রেতা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় কিনতে পারেননি। যদি সব জিনিসে দামই কিছু কিছু কমতে থাকে, তবে ত হবে প্রধানত চাহিদার সীমাবদ্ধতা (demand constraint) দরুণ। বিদ্যুৎ সর বরাহের ঘাটতির দরুণ উৎপাদন ক. হাবা দৃষ্টান্ত ছয়মাস আগেও খুবই ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহে এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তেল-সংকট অবশ্য এখনও খুব বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচামাল সর বরাহে ঘাটতিও শিল্পোৎপাদন কম হবা কারণ। লাইসেন্স পদ্ধতিরও প্রয়োজনী সংস্কার করা দরকার। শিল্পোৎপাদন হ্রা পাবার কারণ হিসেবে ব্যাংকের ঋণ-সংকোচ নীতিকেই একমাত্র দায়ী করা উচিত হ কিনা সেটা বিতর্কের বস্তু। পৃথিবী কোন কোন দেশে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা পরি লক্ষিত হয়েছে; কিন্তু ভারতে প্রকৃতই হয়েছে কি?

সুব্রত গুপ্ত

সাহিত্য সংবাদ

কাল্পনিক সংলাপ

প্রশ্ন : আচ্ছা, মঁসিয়ে মালরো, আপনি এই যে নেহরু পুরস্কার নিতে এসেছেন, আপনার কি রকম লাগছে ?

মালরো : আবার ভারতে এসে ভালোই লাগছে।

প্রশ্ন : না, আমি সে কথা জিজ্ঞেস করি নি। আমি জানতে চাইছি, নেহরু পুরস্কার পেতে আপনার কেমন লাগছে ?

মালরো : পুরস্কার পেতে যদি আমার খারাপ লাগতো, তাহলে এসেছি কেন ? টাকা জিনিসটার কোন চরিত্র নেই, যেখান থেকেই আসুক। না, আমি ভুল বললাম, টাকারও চরিত্র আছে। একজন খুনী বা বাটপারের কাছ থেকে কি এমনি এমনি টাকা নেওয়া যায় ? তবে, সাহিত্যের জন্য যদি কেউ পুরস্কার দেয়—

প্রশ্ন : আমি বোধ হয় আমার কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি ঠিক পুরস্কারের কথাটাও জিজ্ঞেস করি নি। আমি বলতে চাইছি, নেহরুর নামে যে পুরস্কার, সেই পুরস্কার নিতে আপনার কেমন লাগছে ?

মালরো : যুবক, তুমি সত্যিই আমাকে বোঝাতে পারছো না। স্পষ্ট করে বলো, তোমার প্রশ্নটা ঠিক কি ?

প্রশ্ন : জওহরলাল নেহরু আপনার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে বছর পনের আগে যখন তিনি জীবিত, এবং আপনি ছিলেন ফরাসী দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী, সেই সময় তিনি আপনাকে একবার এ দেশে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। আজ সেই বন্ধুর স্মৃতিতে যে পুরস্কার সেটা নিতে আপনার মনের অবস্থাটা—

মালরো : মনে হচ্ছে, তুমি একজন ভাবপ্রবণ—

প্রশ্ন : বার্ধক্যে বুঝি ভাবালুতা থাকে না ?

মালরো : আমি বৃদ্ধ নই ! বার্ধক্যকে আমি ঘৃণা করি।

প্রশ্ন : আপনার "বিপরীত স্মৃতি" নামক গ্রন্থে আপনি বলেছেন যে আপনি শৈশবকেও ঘৃণা করেন।

মালরো : আমি মানসিকতার চির যৌবনে বিশ্বাসী

প্রশ্ন : শুধু মানসিক নয়, শারীরিকও। "বাংলাদেশ-যুদ্ধের" সময় আপনি স্বয়ং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বাংলা দলের পক্ষে অস্ত্র ধরার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন।

মালরো : (সামান্য অর্থবোধক হাসি)

প্রশ্ন : আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল, বন্ধুর স্মৃতিতে যে পুরস্কার—

মালরো : এক হিসেবে তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাবার জন্যই আমি এসেছি। তবে মৃত্যু মৃত্যুই, তার বেশী কিছু নয়, কমও নয়। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি।

প্রশ্ন : আপনি অ্যাপোলিনেয়ারের মৃত্যুর সময়েও বোধ হয়—

মালরো : ও, গীয়ম ! গীয়ম ! সে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তবে, তার মৃত্যুর সময় আমার বয়েস ছিল খুবই কম। কিন্তু হঠাৎ গীয়মের কথা কেন ?

প্রশ্ন : আপনার প্রথম যৌবনের উল্লেখযোগ্য মৃত্যু থেকেই শুরু করছিলাম।

মালরো : মৃত্যু একটা মোটেই বেশীক্ষণ আলোচনার বিষয় নয়। অন্য কোন মনোরম প্রসঙ্গ—

প্রশ্ন : যেমন ধরুন স্বাধীনতা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা—

মালরো : আমি দেখে যাবো। আমি ঠিক বেঁচে থাকবো। জানো বোধ হয়, আমি অন্তত একশো পঁচিশ বছর বাঁচবো, কিংবা তিনশোও হতে পারে—

প্রশ্ন : ম্যাথুসেলার মতন ?

মালরো : না, আমার মতন।

প্রশ্ন : এতদিন আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে ? শরীর যদি অশক্ত হয়

মালরো : আবার শরীর ?

প্রশ্ন : কিংবা ধরুন, যৌন ক্ষমতা। ততদিন যদি যৌন ক্ষমতা না থাকে, তবুও কি মানুষ বাঁচতে চায় ? বৈজ্ঞানিকরা তো বলেন—...আচ্ছা, আমি যদি প্রশ্ন করি, আপনার এখনই যৌন ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে কিনা—তাহলে কি আপনি উত্তর গোপন করবেন ?

মালরো : সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা আমি পছন্দ নাও করতে পারি—

প্রশ্ন : তা ঠিক। আচ্ছা আবার সেই পুরস্কারের প্রসঙ্গে।

মালরো : এ প্রসঙ্গও শেষ হয়ে গেছে। এবং, তুমি আমাকে সাহিত্য বিষয়ক কোন প্রশ্নও করো না

প্রশ্ন : না, করবো না। আপনাকে এই পুরস্কার অবশ্য সাহিত্যিক হিসেবেও দেওয়া হচ্ছে না। এটা এক ধরনের শান্তি পুরস্কার—আপনার আগে যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন—

মালরো : জানি, শুনেছি। কেন, ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

প্রশ্ন : আমি আপনার রচনার একজন মুগ্ধ পাঠক তো বটেই, তবে মনুষ্য জাতির স্বাধীনতার সমর্থনে আপনার যে ভূমিকা, সেটাও আমি খুব শ্রদ্ধা করি। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে এবার যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছেন

মালরো : তুমি আমার আরও প্রশংসা করো। আমি প্রশংসা শুনলে খুশী হই।

প্রশ্ন : (হা-হা)

মালরো : ভারতীয়রা অনেক রকম বিনয় সূচক বাক্য জানে। তুমি আমাকে সে রকম কিছু শোনাও

প্রশ্ন : এটা ভারতীয়দের প্রশংসা না নিন্দা

মালরো : বুঝতে দেরী হলো তোমার ? নিন্দা

প্রশ্ন : কেন ?

মালরো : শক্তিশালী ব্যক্তির বিনয় খুব সদ্গুণ। দুর্বলের নয়।

প্রশ্ন : এটা যেন বাণীর মতন শোনাচ্ছে। আপনাকে মানায় না

মালরো : (মৃদু হাস্য) তুমি আমাকে একটু রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে আমাকে দিয়ে আরও অনেক কথা বলাতে চাইছো। এই কায়দাটা আমি জানি। আমি তোমাকে আর একটা বাণী দিচ্ছি, শুনে নাও

প্রশ্ন : বলুন—

মালরো : নিজে না বুঝে, নিঃসংশয় না হয়ে কোন কিছুই মেনে নেবে না। এই ভাবেই মানুষ স্বাধীন হবে।

প্রশ্ন : ধন্যবাদ। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ভ্রমণের পর আপনার কলকাতায় আসার কথা ছিল। আমি বিমান বন্দরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি কলকাতায় না গিয়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন। এবারও বোধ হয় কলকাতায় আসছেন না ?

মালরো : না, সময় পাবো না

প্রশ্ন : পরে কখনো একবার কলকাতায় আসবেন। আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, আর আপনাকে আটকে রাখবো না। নমস্কার।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

৪ঠা আশ্বিন সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকার 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে 'জেলা সাহিত্য' সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, তা অনেকাংশেই কোমরবন্ধের নীচে আঘাত করার সামিল। জেলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে 'পেডিগ্রী' খুঁজে খুঁজে সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এরকম কথা আপনার লেখাতেই প্রথম শুনলাম। 'এই ব্যাপারটা ভালো না', আপনি লিখছেন, 'এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যের কোনো উপকার করে না।' এরকম আপ্তবাক্য উচ্চারণ করে আপনি নিঃসন্দেহে হৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু যে কোন জেলাবাসী লেখকই, সামান্য স্কুল শিক্ষক বা বি ডি ও বা জেলাধীশ, সেই জেলার সাহিত্যসেবী হিসেবে গণ্য কেন হবেন না, তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আপনি দেননি। বাঙলা ভাষায় লিখলেই তাকে বাঙলা সাহিত্যের অমর লেখক হতে হবে, এমন বাঁধাধরা নিয়ম কি করা যায়? আর, তা হতে চাইলেই কি হওয়া যায়? সকলেই কি আর দেশ-আনন্দবাজার-আকাশবাণীর মত প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য পেতে পারেন?

আমি লেখক নই, পাঠক হিসেবেও সুস্থ এবং পরিণত মানসিকতার পরিচয় কতখানি (যা আদৌ দিতে পেরেছি (কিনা), তা জানি না। তবে আপনি যে রহস্যের কথা বলেছেন, সেই রহস্যের মতো আমি আর অনেকের মতো, বিভিন্ন ছোটখাট পত্র-পত্রিকা কিনে পড়ি। আমার মতামতের দাম না থাকলেও বলব, যে কোন 'বড়' পত্রিকারই এক-একটি বিশেষ এবং বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠী আছে। সেই গোষ্ঠীব্যূহ ভেদ করা কত কঠিন, তা আপনার বর্তমান অবস্থায় উপলব্ধি করা কঠিন, তা জানি। কিন্তু সত্যি করে বলুন ত, বাংলা ভাষায় লিখে যাঁরা এখন খ্যাতি এবং অর্থ লাভ করেছেন, যাঁদের বয়স পঁয়তাল্লিশের ঊর্ধ্বে নয়, তাঁরা কি সত্যিই গোটা বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত?

নটবর দে
কলকাতা-১

॥ ২ ॥

বর্তমান ৩১ আগস্ট, '৭৪ সংখ্যায় 'সাহিত্য ও নারী' প্রসঙ্গে সনাতন পাঠক যে আলোচনা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

যে সমস্ত কারণ দেখানো হয়ে থাকে, তা যে অত্যন্ত দুর্বল, সনাতন পাঠকের মত আমি নিজেও তা স্বীকার করি। মেয়েরা এখন যথেষ্ট প্রগতিশীলা হয়েছেন। জীবন ও শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষ স্থান করে নিচ্ছেন। তাহলে সাহিত্যে তাঁদের এই অনীহার কারণ কি? সংস্কার-মুক্ত সাহিত্য-সৃষ্টি করতে গেলে দুঃসাহসিকা হবার খুব বেশী প্রয়োজন আছে কি? তাও যদি থাকেই, তবুও পশ্চাৎপদ হওয়া যেন আজকাল ঠিক মানাচ্ছে না। তাঁরা উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকাশ্য গোধূলিবেলায় প্রহসন সৃষ্টি করে সব কিছু থামিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন, নির্ভয়ে এবং নিঃশঙ্কায় সংবাদপত্রের 'উত্তেজনা' হতে পারেন, দুঃসাহসিকা হতে আরও বাধাটা কোথায়?

বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন লেখিকা সংযোজন হচ্ছে না। এখনও আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবীর মত প্রবীণা শিল্পীরাই সপ্রতিভ উজ্জ্বলে ঝলমল। কেন? বাংলাদেশে আর কি নতুন করে লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু কিংবা কবিতা সিংহ জন্মাচ্ছেন না? নাকি মেয়ে-দের ধীশক্তি পুরুষদের তুলনায় সাধারণ-ভাবে কম? একথা ঠিক, জোর করে শিল্প-সৃষ্টি হয় না। তার জন্য ব্যাকুলতা চাই, প্রতিভা চাই, পর্যাপ্ত অনুশীলন দরকার। সহসা পরিবর্তন এলেও অনেকের জীবনের মোড় ফিরে যায়। আইনজীবী লেখক হয়ে ওঠেন, বিজ্ঞানের ছাত্র হন কবি। সেই ভয়ংকর পরিবর্তন মেয়েদের জীবনে কবে আসবে? কবে তারা সংসারে থেকেও নির্বাসিত সত্তার সহজ স্ফূর্তিতায় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে এগিয়ে আসবেন?

শিপ্রা মুখোপাধ্যা
অণ্ডা
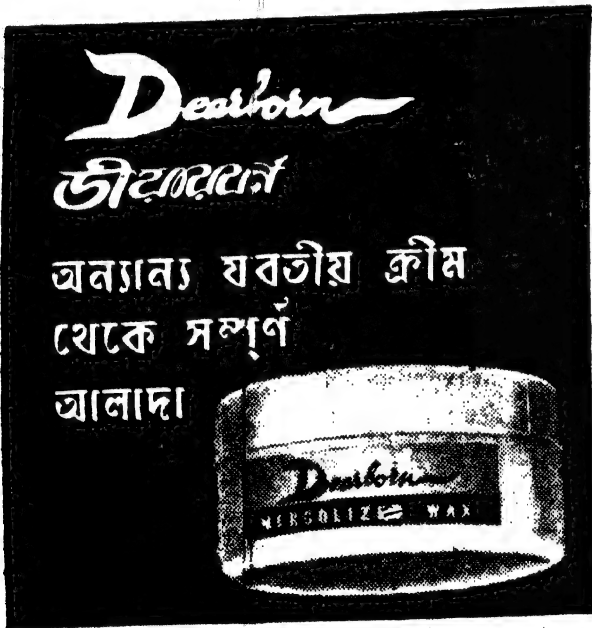
॥ এক ॥

বউ, কলকাতার যদুবাবুর অথবা বোম্বাইয়ের থার বাজার কল্পনা করো। কেউ বঁটি দিয়ে রুই মাছের ভাগা কাটছে, রুপোলী ইলিশ মাছ হাতে করে চিৎকার করছে অন্য কেউ। ধীর পায়ে, থলে হাতে সন্ধানী চোখ তাজা মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটি ছোট্ট সংসারের পেছন পেছন হাঁটছিলুম। সাহেব, মেমসাহেব, ছোট্ট মেয়েটি।

—"মুখ চাই, মুখ? আপনার পোত্রেত মাদাম মঁসিয়? আপনার ফুটফুটে খুকুর মিষ্টি পোত্রেত করে দেব! সাদা-কালোয় কিংবা রঙীন।' রঙীন ছবিতে ওকে দারুণ মানাবে! না-না, পছন্দ না হলে নেবেন না!"

ছোট্ট সংসারটি ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সাহেব-মেমসাহেব-খুকু। ওদের পেছন-পেছন হাঁটছিলুম। শিল্পী এবার আমায় ধরল,

—"মুখ চাই, মুখ? আপনার পোত্রেত্?"

ছিপছিপে চেহারার মানুষটি। অবিন্যস্ত চুল, দাড়ি, গোঁফ নিয়ে লম্বাটে ধরনের মুখ। লাল রংয়ের গলাবন্ধ সোয়েটার পরে যেন যীশুখৃষ্ট। বাঁ হাতের ড্রয়িং বোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা সাদা কাগজ। ডান হাতে ছোট্ট বাক্স। ওতে নিশ্চয়ই পেন্সিল, ক্রেয়ন অথবা রঙীন প্যাস্টেল রাখা আছে। সাদা-কালো পোর্ট্রেটের কত দাম পড়বে জানতে চাইলুম যীশুখৃষ্টের কাছে। বাস! সংগে সংগে এক কোণে রাখা ভাঁজ-করা চেয়ারটা ফট করে খুলে ফেলল। বলল,

—"বসুন, বসুন!"

হাসি-হাসি মুখে বললুম,

—"না ভাই! কত দাম পড়বে আগে বলুন?"

—"হুট করে কি দাম বলা যায়? পঞ্চাশ থেকে একশো' ফ্রাঁর মধ্যেই করে দেব। বসুন তো মশায়!"

চোখ কপালে তুলে বললুম,

—"পঞ্চাশ থেকে এ-ক-শো' ফ্রাঁ!!"

নিজে ছোট্ট টুলটির ওপরে বসে ড্রয়িং বোর্ড বাগিয়ে ধরল যীশুখৃষ্ট। বলল,—"আগে ছবিটা তো' হোক, তারপর আপনার পছন্দ মতন একটা রফা করা যাবে।"

চারপাশে যদুবাবুর বাজারের মতো গোলমাল। হয়তো তার চেয়ে একটু কম। 'গুঞ্জন' বলা যেতে পারে। বোর্ড বাগিয়ে বসে খদ্দেরদের ছবি আঁকছে শিল্পীরা। যাদের হাতে এখন খদ্দের নেই, তারা সন্ধানী চোখ আর হাতে বোর্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারের মধ্যে। বউ, জানো তো', প্যারিসের এমন বাজার আর সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এক নজরে মনে হয় শ' তিনেক শিল্পীর ভীড় এখানে। পিগাল ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছি। বিশাল গীর্জাটিকে ডানদিকে রেখে। পাথর বাঁধানো ছোট্ট গলি ঘুরে ঘুরে গীর্জার পেছনে এই মোঁমাত্র। বহু যুগ আগে ছিল শিল্পীদের পীঠস্থান। আধপেটা খেয়ে-না-খেয়ে, উপোস দিয়ে দিয়ে যে সব শিল্পীদের পেটে কড়া পড়ে যেতো, অথচ ছবি ছাড়া কিছু মাথায় আসতো না, সেই সব শিল্পীদের আখড়া। সুস্থ শহরবাসীরা পাগলদের কাণ্ড দেখতে আসতো। কলকাতার ফুটপাথে কোনো খুদে শিল্পীকে কল্পনা কর, যার ডান হাতটা নেই। বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙীন খড়ি ঘষে ঘষে ফুটপাথ অথবা কালো পিচের রাস্তায় ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকতো—দাঁড়িয়ে দেখতুম আমরা। পথ চলতি মানুষজন দু'দণ্ড থেমে মজা দেখে যেতো। আমরা ছোটরাও আলু-কাবলী খেতে খেতে গিয়ে দাঁড়াতুম ইস্কুলের টিফিনের সময়। কি দারুণ গণেশের মুখটা বানিয়েছে; লক্ষ্মীর প্যাঁচার চোখ দুটো দ্যাখ, ঠিক একেবারে প্যাঁচার মতোন! ভীড়ের মধ্যে উদার কেউ হয়তো আনা-দুআনা ছুঁড়ে দিতেন গণেশ বা

লক্ষ্মীর গায়ে। পয়লা শব্দের জন্যে আমরা ঘুরে দেখলে বলতেন,

—"নুলো, কানা লোক ভিক্ষে করার থেকে এ অনেক ভালো, না কি বল?"

যীশুখৃষ্টের কটা চোখের দিকে তাকিয়ে চেয়ারটি ভাঁজ করে পাশে রাখলুম। অল্প হেসে বললুম,

—"আপনাদের বাজারটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপরে আসবোখন—"

হঠাৎ বোধ হয় অভিমান বা শিল্পীর দম্ভে ঘা লাগল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বেশ রুক্ষ গলায় বলল যিশু,

—"আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে!" বলেই উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নতুন খদ্দের খুঁজতে লাগল যেন। আমি জানি, ও রাগ করেছে। আর কথা না বাড়িয়ে ওকে পেছনে রেখে দু' পা হাঁটতেই শুনলুম,

—"ইণ্ডিয়ান!"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি 'হের হিটলার'-এর ভঙ্গিতে ডান হাত তুলেছে যীশুখৃষ্ট বেশ উঁচু গলায় বলছে,

"অন্য কোথাও বসে পড়লে কিন্তু রাগ করবো"

হেসে আমিও হাত তুললুম,

"কথা দিচ্ছি, পোর্ট্রেট করাতে কোথাও বসব না!"

শীত যাব-যাব। বসন্ত আসে এখনো। গত তিনদিন বৃষ্টি হয়নি আকাশ থমথমে। বর্ষা ফুরোলেই মোঁমার্ -এর মেলা শুরু হয়। রোজগেরে শিল্পী দের মরশুম। পাহাড় বা এই বিশা টিলার ওপরে এতখানি সমতল চত্বরে প্রায় সবটাই শিল্পীদের দখলে। চারপা ঘিরে নানান আকারের বাড়ি। সব বাড়ি একতলাতেই দোকান-পাট, রেস্তোরা আলুভাজা বা মদের দোকান। রেস্তোরা থেকে কয়েক জোড়া টেবিল-চেয়ার ছিটকে এসে খোলা চত্বরে বসে পড়েছে বিয়ার বা ওয়াইনের বোতল ঘিরে বিদেশী বৃন্দ। ওপরে সোজা আকাশ। গো চত্বরটি কলকাতার ছোটখাটো ঘাস-বিহী পার্কের মতো।

খজানাসা ফরাসী শিল্পীদের ভীড়ে মধ্যে হঠাৎ দেখি এক থ্যাবড়া নাক। কোনো সেলুনের নরসুন্দরের মতো হাতে ধরা কাঁচি কচ-কচ করছে। জাপা শিল্পীটির বগলে শুধু একটি থ ঝুলছে। তার গায়ে ফরাসী ও ইংরেজীতে লেখা—"দু মিনিটে ম শুধু পাঁচ ফ্রাঁ।"

এমনি কাঁচি হাতে আরো জনা চ পাঁচেককে ঘুরতে দেখলুম।

শুধু এক জোড়া কাঁচি হাতে শিং জাগাতে পারো, বউ? কলম, পেন্ ক্রেয়ন, রং, তুলি, বোর্ড—কিছু নে

শুধু কাঁচি। দর্জি বা নরসুন্দর, এ'রাও অবশ্যই এক জাতের শিল্পী। চুল-দাড়ি-গোঁফ কেটে ছেঁটে, আমার জামা বা তোমার ব্লাউজের নকশা কত সুন্দর, কত মাপসই হতে পারে—তার অনেকখানিই ও'দের হাতে। কিন্তু দু মিনিটে তোমার মুখের নকশা বানিয়ে দিচ্ছে, শুধু একটি কাঁচি সম্বল, এমন শিল্পী আমি অন্তত দেখিনি কোথাও।

আসলে ব্যাপারটা তখনো পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারছি না। ওদের কাছে-পিঠে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। একটু বাদেই দেখি চারজন মধ্যবয়সী সাহেব বেশ মেজাজে হেঁটে আসছেন এদিকে। লম্বা-চওড়া লোকটির মৌতাত একটু বেশীই হয়েছে মনে হল। অসামাল পা ফেলে ফেলে হাঁটা। জাপানী শিল্পী অল্প এগিয়ে গেল কাঁচি কচকচ করতে করতে। ভাঙা ফরাসীতে বললে,—"দু মিনিট দিন আমাকে, মুখ করে দিই!"

চারজনের কেউই দাঁড়িয়ে পড়ল না। চোখের কোলে শিল্পীকে দেখে নিল। হাঁটতে হাঁটতে সেয়ানা গোছের সঙ্গীটি মুখ খুলল। মাথা দুলিয়ে বলল,—"আমাদের মহা-মূল্যবান জীবনের দুটো মিনিট, ইজ ইকোয়াল টু একটি মুখের নকশা—অ্যাঁ?"

জড়ানো গলায় থেমে থেমে কথাগুলি বলেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকি তিনজনও পাশাপাশি দাঁড়াল। গায়ে গা লাগিয়ে। আগের লোকটি তার কথা শেষ করলে,

—"কিন্তু, বলি কার মুখ আমায় দেবে বাছা?"

শিল্পী খদ্দেরের 'মুড' বুঝে ফেলেছে। এক গাল হেসে ফেলল। থলে থেকে এক খণ্ড চৌকো মতোন কাগজ বের করতে করতে কথা বলতে লাগল। কলকাতার ছোটখাটো হিন্দু হোটেলগুলো থেকে খেয়ে-দেয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালে পেছন থেকে দ্রুত গলায় যেমন শোনা যায়—"মাছেরঝোলভাতবেগুনভাজা ডালএকআনা লেবুকলাপাতা আছে!" ঠিক সেই রকম গড়গড় করে বলে গেল,

—"যার মুখ বলবেন! আপনার বা আপনার বন্ধুদের, দ্য গল, নিক্সন, চার্চিল, বব হোপ বা যে কোনো বিখ্যাত লোকের—"

না, একখণ্ড নয়, পকেট ডায়েরী সাইজের দু'খণ্ড সাদা কাগজ গায়ে গায়ে লেপ্টে লাগানো। বাঁ হাতে সেই কাগজটি নিজের চোখের সামনে উঁচু করে ধরল শিল্পী। ডান হাতে কাঁচি তো আছেই। তৃতীয় সঙ্গীটি বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে টাল সামলে বললে,

—"ঠিক আছে ভায়া! আমার অমন দীর্ঘ জীবন থেকে শুধু দুটো মিনিট তোমার নামে উৎসর্গ করলেই যদি একটি

আঁকো! হিরোশিমার মুখ আঁকো!"

মুখ আমাকে দাও তবে নাও—" বলে ডান হাতের কব্জি উলটে ঘড়িতে চোখ রাখল, "এই মুহূর্ত থেকে আমার দুটো মিনিট—তোমার। টিক-টিক-টিক-টিক—"

শিল্পীর দাঁত তখনো হাসির ভঙ্গিতে চকচক করছে। আরো একটু মুখব্যাদান করে বললে,

—"শুধু দুমিনিট আর আমার পারিশ্রমিক পাঁচ ফ্রাঁ।" থলের লেখাটি তুলে দেখাল ওদের, "কার মুখ চাই বলুন?"

এতক্ষণে লম্বা-চওড়া লোকটি জড়ানো গলায় বললে,

—"তুমি তো জাপানী শিল্পী?"

—"হ্যাঁ, ম'সিয়!"

—"তবে আঁকো! হিরোশিমার মুখ আঁকো,"—বলেই ভদ্রলোক খ্যালখ্যাল করে হাসতে লাগলেন আর মুখ দিয়ে দু'বার শব্দ করলেন—"বুম্-বুম্"!

শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। ওর মুখের হাসিটি মিলিয়ে যাব-যাব করছে। চোখ সামান্য গোল হয়েছে। ঠোঁট দুটিও একত্রে একটি বৃত্তের মতো প্রায়। অর্থাৎ এতক্ষণে উনি ঠাওর করেছেন যে এ'রা মোটামুটি কঠিন খদ্দের।

চতুর্থ ভদ্রলোক একটু তফাতে একলা দাঁড়িয়ে বোধহয় ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বের করে বললেন,

"বেড়ে বলেছিস, হিরোশিমার মুখ! ক্যাপেশ কবিতার বিষয়! আহা—হিরোশিমার মুখ—" বলেই অমনি বুকের ওপর থুতনি ফেলে টলতে লাগলেন।

চারটি ফরাসী ভদ্রলোক এবং এক জাপানী শিল্পীর মধ্যে যে এইসব কথাবার্তা চলছে, সেদিকে মোঁমার্ত্র-এর আর কারো বিশেষ খেয়াল নেই একমাত্র আমি ছাড়া। কারণ একটানা গুঞ্জন গোটা চত্বরের পো ধরে রেখেছে।

শিল্পী একটু সামনে নিয়ে বলল,

—"দেখুন মশায়, হিরোশিমা তো ঠিক কেনো মানুষ নয়। মানে, তার মুখ আঁকতে পারা যায় বলে তো—"

তৃতীয় জন বেশ শিল্পীর প্রতি যথেষ্ট করুণা দেখিয়ে বললে,

—"আচ্ছা বাছা, থাক! হিরোশিমার যদি তোমার খুব অসুবিধে হয় তো যেতে দাও! কোনো বিখ্যাত লোকের মুখ আঁকতে পারবে তো?"

খানিকটা থই পেয়ে তুবড়ির মতো বলে উঠল শিল্পী,

—"দ্যগলনিক্সনমাওনাসেরববহোপচিচ-কক—কার মুখ চাই শুধু একবার মুখ ফুটে বলুন?"

—"দক্ষিণ ফ্রান্সের বিখ্যাত উকিল ম'সিয় ভিংসের মুখ আঁকো!"

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন,

—"না-না! আমার চাই না—"

বাকি তিনজন একসঙ্গে থামিয়ে দিলেন ওঁকে,

—"চো-ও-ও-প!" তারপর শিল্পীকে আবার,

"কই, বিখ্যাত উকিলের মুখ কই?"

আমি আর থাকতে পারলুম না, হাসির দমককে খানিকটা কাশির মতো করে বের করে দিলুম। শিল্পীর মুখের চেহারা তুমি কল্পনা করতে পারবে না বউ! কতিপয় সুন্দরীদের সঙ্গে গদগদভাবে কথা বলতে বলতে কোনো ফিটফাট যুবককে যদি থামিয়ে দাও এবং কানে কানে বলো যে, 'মশাই আপনার প্যান্টের বোতাম সব খোলা' তাহলে তার মুখের চেহারা বোধহয় অনেকটা এইরকম হবে। খানিকটা সেই "ছেড়ে দে মা" গোছের বিভ্রান্ত ভাব। যার নাম কখনো শোনেনি, জীবনে যাকে কোনো অবস্থাতেই সে দেখেনি কোথাও তার মুখ কি করে আঁকবে?

"—মাফ করুন, ওঁকে আমি চিনি না—শুধু মুখ আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য কাউকে বলুন—"

বলে শিল্পী ঘুরতে যাবে, মোটা মতোন ভদ্রলোক ঝপ করে তার হাত ধরলে। বললে,

—"তা তো চলবে না ভাই! যে কোনো বিখ্যাত লোকের মুখ তুমি আমাদের দেবে বলেছো—"

সামান্য রাগ-রাগ গলায় শিল্পী বললে

—"কি মুশকিল। বলি, তাঁকে না দেখে তাঁর মুখ আমি বানাব কি করে?"

—"না দেখে মানে!" মোটা ভদ্রলোকের চোখ ডিমের মতো গোল।

অন্যজন বললে,

"তুমি তো অন্ধ শিল্পী নও ভাই! জলজ্যান্তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর তাঁকে কিনা তুমি দেখতে পাচ্ছো না! অ্যাঁ!!"

বলে লম্বা লোকটির কাঁধে হাত রাখলে। উনি তখন বিখ্যাত লজ্জায় মৃদু-মন্দ হাসছেন।

শব্দ হয়ে গেল 'ম্যাজিক'! এ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ মাথায় আসছে না বউ। বাঁহাতে সেই কাগজের স্যান্ডউইচ সামান্য উঁচু করে ধরা, ডান হাতের কাঁচি কাজ শুরু করল কুচ-কুচ-কুচ। দক্ষিণ ফ্রান্সের বিখ্যাত উকিল মঁসিয় ভিংস চোখ পিট্-পিট্ করে তাকাচ্ছেন শিল্পীর দিকে। বিশাল শরীর অল্প-অল্প দুলছে। শিল্পীর চোখ শুধু দুটি জায়গার মধ্যে নড়া-চড়া করছে। ভিংসের মুণ্ড আর কাগজের স্যান্ডউইচ, উকিলের মুণ্ড। এতক্ষণে চারপাশে গোলমতোন ছোটখাট ভীড় জমেছে। প্রায় সকলেরই চোখ ওই দুটি বস্তুর ওপর ঘোরাফেরা করছে। মাঝে-মধ্যে শিল্পীর মুখটিও দেখে নিচ্ছি আমরা। ওর মুখে খই ফুটছে এখন। রোদ্দুরের কথা, বৃষ্টির কথা। শীত এবং বসন্তের কথা। এবার মরশুমে ভীড় কেমন হবে, তাই নিয়েও কথা চলছে। উকিল সাহেবের বাকি তিন বন্ধুও কথা বলছে। এখন ওদের ভিংসের মক্কেল বলে মনে হচ্ছে আমার। দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনো মোকদ্দমায় জিতে-টিতে হয়তো ফুর্তি করতে এসেছে প্যারিসে। মাঝে এ। ভীড়ের মধ্যে থেকে ফোড়ন কাটছে দু'একজন। মুখের ওপর দিক অর্থাৎ চুলের এবং টাকের দিক থেকে আরম্ভ করে কপাল, উন্নত নাক বেয়ে তর তর করে নেমে আসছে কাঁচি। কথার ফাঁকে হঠাৎ হয়তো শিল্পী বলে উঠছে,—"মঁসিয় ভিংস, একটু বাঁদিকে ঘুরুন—আর একটু, ঠিক আছে!" অথবা "আপনি যদি বারান্দার ওই সুন্দরীর দিকে অতখানি মুখ ঘুরিয়ে ফেলেন তাহলে তো মুশকিল—" আমরা সবাই হেসে সুন্দরীকে দেখে নিলুম। মোটা-সোটা অন্তত ষাট বছর বয়েসের এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে বারান্দায়। হাসির লহরা উঠল। উকিলবাবুও থ্যালথ্যাল করে হেসে নিলেন খানিক। শিল্পী বললে—"হাসির সেকেণ্ডগুলো কিন্তু দু'মিনিট থেকে বাদ যাবে!"

ঠোঁট থুতনি ছাড়িয়ে গলা বেয়ে নেমে এল কাঁচি। কাগজ শেষ। 'প্রোফাইল' ছবি কাটা হয়ে গেল। ঠিক দু'মিনিট না হলেও বড়জোর চার। কাঁচিটি পকেটে রেখে ম্যাজিক দেখানোর ধরনে দু'বার কাগজটিতে ফুঁ দিল শিল্পী। দিয়ে আলতো হাতে কলার খোসা ছাড়ানোর মত দু'দিক থেকে সাদা কাগজ দুটি তুলে ফেলে দিল। ভেতরকার তৃতীয় কাগজটির রং কালো। কালো কাগজের ওপরে মুখের নকশা। একটু উঁচুতে তুলে চার বন্ধুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শিল্পী। 'কাট-আউট প্রোফাইলে' উকিলের কপাল, নাক, ঠোঁট অথবা থুতনি স্পষ্ট চেনা যায়। 'সিল্যুয়েটে' মঁসিয় ভিংসের মুখ।

—"হয়ে গেল?"

হাত বাড়িয়ে ছবিটি নিলেন উকিলবাবু।

চাপা গলায় দু'একটি ভালোমন্দ মতামত শোনা গেল। মঁসিয় ভিংস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বেশ উঁচু গলায় বিশুদ্ধ ফরাসীতে যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন,

—"আমাকে কি বলে গিয়ে এই রকম দেখতে?"

দু'দণ্ড সব চুপ।

বিদেশী সুন্দরীদের ছোট একটি দল পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলা বাড়িয়ে উৎসুক চোখে মঁসিয়ে ভিংসের মুখ এবং কালো প্রোফাইল লক্ষ্য করল। ওদেরই একজন তেমনি বিশুদ্ধ ফরাসীতে জবাব ছুঁড়ে দিল,—"হ্যাঁ মঁসিয়! ঘোর অমাবস্যার রাত্তিরে!"

চারদিকে গুঞ্জন ছাপিয়ে হেসে উঠলুম সবাই।

দু' মিনিটে মুখ, শুধু পাঁচ ফ্রাঁ বলতে বলতে ওরই মধ্যে আর একটি খদ্দের ধরে ফেলেছেন জাপানী শিল্পী। দক্ষিণ ফ্রান্সের উকিলবাবু [illegible] মুখ হাতে করে [illegible]। সুন্দরীদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলুম আমরা [illegible] দোকানের দিকে। [illegible] খিদে পাচ্ছে। [illegible] আর একটি [illegible] ছাড়া সারাদিনে [illegible] পড়েনি কিছুই। (ক্রমশ)

লক্ষ্মণ মিস্ত্রীর জীবন ও সময়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এই সময়টা—এই বর্ষার মুখে মুখে নোনা খালের জলে গাঙ থেকে মোচা, হরিণে, চামানে চিংড়ির খুদে খুদে ছানা ভেসে আসে। মাটি ফাটানো রোদের গায়ে ঠিক এই এখনই বৃষ্টি এসে তাতানো ভাপ কেড়ে নেয়। এখন মোচা চিংড়ির ঝাঁক ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পুকুরে ফেলতে পারলে শীত নামার মুখে মুখে পাঁচ ছ'মাসের ভেতর সেসব চিংড়ি এক-একটা দেড় দু'শো গ্রামে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন ধরে সুখ। খেয়ে সুখ। বাজারে নীলামের কাঁটায় গিয়ে ওজন করে বেচে দিয়েও সুখ। কেজি বিশ বাইশ টাকা। বাজারে পড়তে পায় না। বিদেশে চালান যায়। সেই টাকায় জালের কাঠি হবে। গইলের ছাদে টালি উঠবে।

দু'ধারে কচুরিপানার দু'টো লাইন সযত্নে করে ঠেসে বসিয়ে দিয়ে ঠিক মাঝখানটায় আটল সাজিয়ে লক্ষ্মণ মিস্ত্রি ওপরে উঠে এল। ইরিগেশনের খাল। একদা নৌকো চলত। এখন অবহেলায় বুক বুজে এসেছে। তারই গায়ে গায়ে আলে আলে ভাগ করা ধান চাষের মাঠ। যে কোন ট্রেনের জানলায় বসে যে ছবি দেখা যায় ঠিক তাই আর কি।

লক্ষ্মণ সেখান থেকেই ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল, উঠে যা বললাম। উঠে যা। বলতে বলতে লক্ষ্মণ আলের দিকে তেড়ে গেল।

কি হবে? বলে শরৎ মিস্ত্রী উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল অনন্ত সর্দার। শরৎ লক্ষ্মণ মিস্ত্রীর বাপ। অনন্ত লক্ষ্মণের দু' নম্বর শ্বশুর। দু'জনই মাথা নিচু করে জয়া ধানের কাঁচ বীজ রুয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। খানিক আগেও লক্ষ্মণ মাথা হেঁট করে ওদেরই সঙ্গে রুচ্ছিল। গোবর-সার মেশানো পাঁক মাটিতে কারকিত করে কেমিকাল সার মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'বিঘে চার কাঠা জায়গা। ভাগের জায়গা। অর্ধেক দিয়েও লক্ষ্মণের গোলায় ভালই ওঠে। লক্ষ্মণ চাষটা জানে। ফলায় ভাল। এ তো দিশী ধানের চাষ নয়। যেমন তেমন রুয়ে দিয়ে যাত্রা গান সেরে সেই ধান কাটতে ফিরে এলাম! এ হল যত্নের জিনিস। অষ্টপ্রহর কড়া নজর রাখতে হবে।

অনন্ত লক্ষ্মণের নতুন শ্বশুর। জামাইকে ওভাবে মারমুখো হয়ে ছুটে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেল। মারবে না তো। ভয়ে ভয়ে আলে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ একবিঘত অন্তর তিন কলি করে ধান চারা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে মাটিতে বসাচ্ছিল। আর পিছু হটছিল। মাথা নিচু করে জমিতে নজর রাখতে হয়। লাইন বেঁকে না যায়। তাহলে মাসখানেক পরে নিড়েনে গোলমাল হয়ে যাবে। তখন এই তিন কলি চারা রোদ্দুরে, জলের রসে ইউরিয়া খেয়ে খেয়ে আশি কলি পর্যন্ত হবে। আরও পরে শিষ পিছু গোনা-গুনতি একশো দশটা ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়বে। পৌষ ধানের হারাহারি বিঘেয় তিন গুণ ধান দেবে তখন।

শরৎ তার নতুন বেয়াইকে আবছা হেসে অভয় দিল, পাগল!

অনন্তর নাকের বাঁ পাশে সাদা শ্বেতীর দাগটায় রোদ পড়ে চিক চিক করে উঠল। এতক্ষণ মাথা নিচু করে রোয়ার দরুণ মুখে রক্ত এসে থানা দিয়েছে। বয়সের শুকনো মুখও ভারি থমথমে। লক্ষ্মণ এসে চেঁচিয়ে বাপকে জমি থেকে তুলে দিল, ওঠ বলছি বাবু। ওঠ। এমন ফাঁকি দিয়ে রোয় কেউ?

রোয়া মাটি তৈরি, নিড়েন নিয়ে ছেলের মন অস্থিরতার বাড়াবাড়ি দেখে শরৎ মিস্ত্রি মনে মনে বেশ গর্বসুখ পায়। আলের পর কালো পাথরখানা দাঁড়ানো। দুই বুকে দুধাবড়া মাংস দিয়ে ভগবান লক্ষ্মণের গায়ে পাকা হাতে ঘুটে দিয়েছে। টানটান ক্রমেটে কাঠামোর ধারা তার দু'ধারে খানা হাত লাগানো। এই হাতে তার ছেলে দিনে দশ কাঠা একাই রুইতে পারে। এক কাহন অবধি ধান ঝাড়ায় একদিনে। কেউ ঘাঁটায় না তার ছেলেকে। ভয়ঙ্কর হাত চলে। দমাদম। ভয় পায় লোকেই। সাদা চোখের ভেতর কালো মণিজোড়া এদিক ওদিক ঘুরছে অনবরত। এ ছেলের দৃষ্টি থেকে কোন জিনিস ডাবার উপায় নেই। পাশের জমিতে তার জ্ঞাতি ভাই পঞ্চানন মিস্ত্রী হাত আলাদা দিচ্ছিল। বর্ষায় সব জায়গায় জল ধরে থাকবে। সে ভাইপোকে ধমকালো। ও কি হচ্ছে লক্ষ্মণ। কোন হায়া নেই তোর। নতুন শ্বশুরটো পর্যন্ত ডরায় তোকে যা বলছি। যা মাছ ধরগে যা—

শরৎ সে তাকে খুব হিংসে পাড়—

পড়শীর। তাদের বাপবেটাকে কোন কিছুই কাবু করতে পারে না। জবরনারি। প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক ভাসা হলেও তাদের কোন ভয় নেই। লক্ষ্মণটা এখন যেন তার প্রায় ডাঙরডেঙর ছোট ভাইটি। পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বিপদে আপদে। ইট কাটা, ধান ঝাড়া, ডাঙা জমিতে বাগান করায় শরৎ মিস্ত্রীর জোগাড়ে বল সঙ্গী সাথী বল— সে ওই লক্ষ্মণ মিস্ত্রী মা-মরা একটা ছেলে তার। ওই ছেলে নিয়ে সে পৃথক হয়েছিল। এখন তার বলভরসা এই লক্ষ্মণ। তা বয়স এখন বিশ বিশ তো হবে।

এদেশে বিয়ে হয় আগে। লোকে বিয়েও করে অনেক। মান্য মিস্ত্রর তিন ব্যাটা—কোনো, গণেশ আর ফোনো—মোট এগারোখানা বিয়ে করেছে। একটা বউও নেই তিন ভাইয়ের। অথচ বয়স কি এমন ভাই তিনটের। তিরিশও ছোঁয় নি। তিন ভাইয়ের এগারোখানা বউয়ের কোনোটা ছেড়ে গেছে। কোনোটা পালিয়েছে। কোনোটা পটল তুলেছে। দুটি কেউ আবার অন্যত্র বিয়ে বসেছে। এদেশে এরকমই।

গরু দুধ দেয় এখানে এক সের তিনপো। তিরিশ পেরোতেই চুল দাড়ি পাকে। আর পারলে দু'তিনটে বিয়ে করে নেয় লোকে। মাটি বা ধান কেটে ফিরে এসে ঠিক ভরদুপুরে বউ পেটানো হয়। বেদম। তাতে বউ ভাগে নয়ত খুন হয়। কিংবা জ্বাল করে তো মেয়ে মাথার ওপর মস্ত বড় একটা খোঁপা করে সন্ধ্যে সান্ধ্য ধানের পোকা মারার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়। এই হল গিয়ে এ-তল্লাটের রীতি। বেগমপুর, খেয়াদা, পারমপুর, খাড়াপাতাল—আশপাশের দু'দশখানা গাঁয়ে এইটেই চল।

শরৎ নিজেই বিয়ে করেছে দু'খানা। তার ছেলে লক্ষ্মণেরও এই বয়সের ভেতর দু'খানা হয়ে গেছে। [illegible] নতুন বেয়াইকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরালো। ধরিয়ে বলল, জামাইকে ভয় পাসনে। লক্ষ্মণ আমাদের ওরকমই!

বেচারা বেয়াই তার। [illegible] তিনকুলে কেউ ছিল না। অন্যত্র খাটতো। লক্ষ্মণই বাপকে বলল, শ্বশুরটারে নিয়ে আয়। পেটে ভাতায় থাকবে'খন। তবে ফাঁকি দিলি একদম তেড়ে দেব।

এদেশে ফাগুনের গোড়া থেকে টানা তিনটি মাস এলোপাথাড়ি দখিনে বাতাস বয়। হাওয়ার কি দাপট। তখন মেঘ দাঁড়াতে পায় না আকাশে। [illegible] ছুটে বেড়াতে হয়। কলকাতা [illegible] মুখে ইলেকট্রিক ট্রেন তার বাঁশীর শব্দটাই এই বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ঘন ঘন ট্রেন। ঘন ঘন যাতায়াত। সবাই যাচ্ছে। তাড়া যাচ্ছে। যাত্রার দল আসছে। বরযাত্রী আসছে। এস ইউ সি-র জন্মদিনের মিছিল শহীদ মিনার থেকে ফিরছে। সবই এই ট্রেনে।

শরৎ অনন্তকে হেসে বলল, ছেলেটা আমার বড় মরাটে চটা! এই গরম। এই ঠাণ্ডা।

শরতের মুখে এখনকার হাসি একেবারে বাউল দরবেশের। মানুষটা লম্বা আছে। কাঁচাপাকা চুলদাড়ি। গোটা দুই দাঁত না থাকায় হাসলে জিব দেখা যায় খানিক। তাই বাইরের লোক দেখলেই বলবে ষাট পঁয়ষট্টি। আসলে শরতের এখন তেতাল্লিশ। কিন্তু সব সময় ফোকলা মুখে সেই তিনকেলে হাসি। তাতেই লোকে আরও ভুল করে। এখানে যে সব আগে আগে। জন্ম। বিয়ে। দক্ষিণে বাতাস। চুলদাড়িতে পাক। জ্যাঠো রোয়া। বউ পেটানো। এমন কি পটল তোলা।

লক্ষ্মণ রাগে রাগে ক্ষেতে নামল। ঘাসকুটি কিছু নেই। ক্ষীরের মত গদ মাটিতে পা বসে গেল। বাপ আর শ্বশুরের রোয়া তার পছন্দ হয়নি। আড়ে বিঘেয় হাত দশ পনর জায়গার রোয়া রাগে গজগজ করতে করতে লক্ষ্মণ তুলে ফেলল। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের দু'খানা আঙুলে তিনকলি করে ধানচারা ধরে সমান ফাঁকে ফাঁকে রুইতে লাগল। তখন বাঁ হাতখানা তার বাঁ উরুর ওপর। তাতে গোছ করে ধান-চারা ধরা আছে।

শরৎ আর অনন্ত—খানিক দূরে আলে বসে হাসতে হাসতে দেখছিল। শরৎ মনে মনে বলল, ব্যাটা আমার ঠিক তার ঠাকুর্দার মত হবে। ঈশ্বর মোহন মিস্ত্রীর মত। তাড়ির সঙ্গে সমুদ্রর কাঁকড়া কোনদিন ভেজে খাওয়ার তর সইত না লোকটার। শরৎ খোকা বয়সে দেখেছে—তার বাপ মোহন মিস্ত্রী দিনমানে কাঠকুটি দিয়ে আগুন জেবলে তাড়ির ঝাঁপ নিয়ে বসত। আর জ্যান্ত কাঁকড়া দাড়া সুদ্ধ সেই আগুনে আধপোড়া করে প্রায় কাঁচাই চিবিয়ে খেয়ে নিত। খোলা সুদ্ধ। ঠিক তার বাপের চেহারা পেয়েছে ছেলেটা। সেই রোখ। সেই এক রকমের রাগ।

লক্ষ্মণ রুইতে রুইতেই উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, এই বাবা। আবার গল্প মারছিস?

এই তো মোটে বসলাম রে। বিড়িটা খাই—

নুড়ো জেবলে দেব মুখে। এই শ্বশুর। ওঠ—

অনন্ত সরদার ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

শরৎ বসে-বসেই এক হাতের টানে [illegible] টেনে বসিয়ে দিল। তুমিও যেমন! সব কথা শুনতে আছে নাকি ওর! তাহলে আমাদের চলে!

লক্ষ্মণ হালের মাঝখানে দাঁড় ধরায় মোটা কঞ্চি নিয়ে তেড়ে উঠল। ওঠ্ বলছি। বাড়ি যা বাবা। জ্বালোয় জ্বালোয় যা। বাগানে জল দিবিনে? দশ পণ লঙ্কাচারা এমনি এমনি বসালাম। ঝিঙের মাদায় ছায়া করবে কে?

যাচ্ছি রে! যাচ্ছি। খুব দুর্বল গলায় বলে উঠে দাঁড়াল শরৎ। অনন্তকে বলল, চল বেয়াই।

আলের ওপর দিয়ে দু'খানা আধপাকা মানুষ মিস্ত্রীপাড়ার পথ ধরল। এখান থেকে পাড়াটা দেখা যায়। কেষ্ট মিস্ত্রীর খামার। জ্ঞানো মিস্ত্রীর ঠাকুর ঘর। মণি মিস্ত্রীর জল ছেঁচা মেশিনের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অনন্ত মেয়ে দিয়েছে মাস ছ'য়েক। খেয়াদার ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জামাইবাড়ি এসে পাকাপাকি উঠেছে। চাষবাস দেখবে। খাটাখাটি করবে। পর তো নয়। নিজের জামাই। বড় উঠোন। ঘরের পেছনে বাপ'কলে পুকুর। গোয়ালঘর। গোলা। নারকেল, সুপুরি, তাল, খেজুর গাছ। এক কোণে ওল, বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়সের ক্ষেত। জামাইয়ের আগের পক্ষের একটা কচি খুকী আছে। মেয়েটা এই ক'মাসেই তার বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। মাঠ থেকে ফড়িং ধরে এনে দেখাতে হয়। আকাশে মেঘ উঠলে কোলে নিয়ে দেখাতে হয়। তার মেয়েকে অবশ্য সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয় না। জামাই তার পয়লা বউকে বিদায় দিয়ে তার মেয়েকে ঘরে এনেছে।

দু'জন আধপাকা মানুষ উঠোনে বসে বোকনো ভরে যখন ভাত খাচ্ছে—তখন কলকাতার ডাকগাড়ি বাঁশি দিয়ে পরের স্টেশন পিয়ালির দিকে পাড়ি দিয়েছে। লক্ষ্মণের খুকীটি পাতিহাঁসের পায়ে দড়ি বেঁধে পুকুরঘাটে যাচ্ছিল। এমন সময় লক্ষ্মণ উঠোনে পা দিল। হাতে আটল ভর্তি চিংড়ি। পা এদিক ওদিক পড়ছে। তার মানে তিতখুটে তেলো তাড়ির বহরটা আজ কিছু বেশি হয়ে গেছে। ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়েই মাছ কাঁটা ছেড়ে দিয়ে জলে দাপাতে লাগল। গহিন পুকুরের মাঝখানটায় ডুব দিয়ে দিয়ে মাটি তুলে খুকীকে দেখাতে লাগল। এই দ্যাখ। কেমন কালো মাটি। তারপর নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ নিয়ে চেঁচাতে লাগল। কী গোন্ধ! উঃ! আর থক থক শব্দ করে ঘোলায় সে মাটি পাড়েরই ছুঁড়ে দিতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাপের কাণ্ড দেখে খুকী হাসতে লাগল।

লাল চোখে ভিজে গায় এসে ছেলে খেতে বসলে শরৎ বিড়ি ধরালো। তামাক কিনে হাতে পাকানো বিড়ি।

খেতে খেতে লক্ষ্মণ আবার বাপকে

দাবড়ালো। বলে আছিস কেন বাবা। হাত ভাতটা হাতে নিয়ে এখায় বসে খা না। বসে থাকিস নে বাবা—

শরৎ কোন জবাব দিল না। বড় বড় টানে বিড়ির আগুনে লাল করে তুলল। অনন্ত বেয়াই খাবার পর ঘুমোচ্ছে। তার মেয়ে ছেলেকে ভাত বেড়ে দিয়ে এইমাত্র রান্নাঘরে খেতে বসল। পাশে তার সতীনের খুকীটি আবার খেতে বসেছে।

উঠোনে পায়রা উড়ে এসে বসল। গোয়ালের গা দিয়ে সাদা বেড়াল গুটি গুটি এসে লক্ষ্মণের পাতের পাশে দাঁড়াল। কালো কুচকুচে কুকুরটাও খানিক দূরে দাঁড়িয়ে। শরৎ দেখল, এ সবের মাঝখানে তার মা-মরা ছেলেটা খাঁটি গেরস্থের মত বগলে বাঁ হাত গুঁজে আসন-পিঁড়ি হয়ে খেয়ে চলেছে। একবার মনে মনে হাসল। আরেকবার খোলাখুলি হাসল।

লক্ষ্মণ খেতে খেতেই বাপের মুখের ফোকলা হাসিটুকু দেখলো। তার শউরো এখন ঘুমোচ্ছে। ঠিক এই বেলা। ঠিক এই বেলা। মুখখানা নরম করে লক্ষ্মণ বাপকে বলল, বাবু চল বেগমপুর যাই। যাবি? অনেকদিন যাইনে—

বাগানে জল দেবেনে কে?

শউরোকে বলে যাব। জল দেবে। ঝিঙে চারার মাদায় ছায়া করে দেবে। সন্ধে হ'লে জাল বুনিতে বসবে। মেয়ে বাপে ভালই থাকবে।

শরৎ একবার কি ভাবল। তারপর বলল, চল তাহলি বেলাবেলি—

খানিক পরে দেখা গেল শরৎ মিস্ত্রী তার মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে মিস্ত্রীপাড়া থেকে বেরিয়ে দ্বারিকপোতার মাঠে নামল। কাঠফাটা রোদ্দুর। দুটো লোক গমগম করে হাঁটছে। শরতের মাথায় গামছা বিড়ে করে পাকানো। লক্ষ্মণের হাতে তিন ফুটো এক ছাতা। খোলায় মাঠের ভেতর ছাতার একরত্তি ছায়াটুকু দাবড়ে দাবড়ে লক্ষ্মণ মিস্ত্রী তার বাপকে নিয়ে পিচ-রাস্তায় এসে উঠল।

ঠিক এই সময় শরৎ মিস্ত্রী তার সেয়ানা ছেলেকে হাঁটতে হাঁটতেই একটা প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা লক্ষ্মণের খুব কঠিন লাগল।

খুকীর মাকে বিদেয় দিয়ে কি ভাল করলি?

খুকীর মা মানে লক্ষ্মণের পয়লা বউ। লক্ষ্মণ বলল, বাবু। বেগমপুরে হাফ দেখতি যাচ্ছি—তারেও তো বিদেয় দিইছিলি তুই। আমি তখন ছোট। এখন হলি পারতিস?

তার তো কাল রোগ ছিল।

হো হো করে হেসে উঠল লক্ষ্মণ। কাশরোগ না লোকের কথায় বাবা!

শরৎ দুপুরের ফাঁকা পিচ-রাস্তায় মেগেমেগে উঠল। হাতে কিছু থাকলে তাই নিয়ে লক্ষ্মণকে তাড়াই করে বসত। আমারই কালরোগ ধরে যাচ্ছিল। তুই তার বুঝবি কি?

বাপ ব্যাটায় হাঁটতে হাঁটতেই কথা হচ্ছিল। আরও আধ ঘণ্টাখানেক হাঁটলে তবে বেগমপুর। তারপর সেই অঞ্চল প্রধানের ফলফলারির বাগান-ঘেরা বাড়ির বাইরে গিয়ে উঁচু মাটির বাঁধের গা ঘেঁষে লক্ষ্মণ মিস্ত্রী তার বাপকে নিয়ে বনঝাউের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসবে। যদি দেখা যায় নতুন মাকে। নতুন মা এই সময়টা ধান সেদ্ধ করতে বসে। একা একা পুকুরে নামে। গইলে ঢোকে। অত বড় বাড়ির উঠোন পারাপার করে। নির্জন দুপুরে এই সময়টায় নতুন মাকে আশ ভরে দেখা যায়। সেয়ানা হয়ে উঠে তক এই এক তার খেলা। বাপকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাপের বিদেয় দেওয়া বউ মাঝে মাঝে দেখে আসে লক্ষ্মণ। সেই কোন্ ছোটবেলায় বাপের বিয়েতে এক সঙ্গে খ্যাট খেয়েছিল। আমের চাটনি খেয়েছিল মনে আছে তার। হ্যাজাকের আলো। কিছুকাল কোলেও চড়েছিল এই নতুন মায়ের। তারপর একদিন চলে গেল। সব মনে নেই লক্ষ্মণের। আবছা আবছা চোখে ভাসে।

কালরোগই যদি থাকবে তবে আবার নতুন মার নতুন সংসার কি করে হয়েছে বাপ। তুই বল বাবা। বুক ঠুকে বল।

শরৎ এর কোন জবাবই দিতে পারে না। লক্ষ্মণের মা ভেদবমিতে ফৌত হলে পর এই মেয়েকে বে করেছিল শরৎ মিস্ত্রী। নগদ লব্বই টাকা গুণে দিয়ে। পায়ের গোছ কি। হাতের গোছ কি। এই ড্যাম্ ড্যাম্। ঢেঁকিতে পাড় দিতি বসলি মাথা ঘুরে যেত। চোখ ফেরানো যায় না। খড় কুচাতে বসে নিজের হাতে কোপ দিয়ে বসেছিল শরৎ। লক্ষ্মণ তখন খোকাটি। সে অবধি ন্যাওটা হয়ে পড়ল। কিন্তু শরতের শরীর যে বয় না। শুধু ভাঙে। শুধু ভাঙে। সেজঠাকুদা—মাতব্বররা সবাই বলল, তোর বউয়ের কাশরোগ।

তবু শরৎ ছাড়তে চায়নি। কিন্তু রাত হলেই তার সন্দেহ চেপে বসত। তবে কি। তবে কি? ছ'মাসের মাথায় কাটান ছাটান

হয়ে গেল। সে অনেকদিন আগের কথা। লক্ষ্মণ থাকত তার নতুন মায়ের কাছে।

সব কথা তো তখন লক্ষ্মণকে বলা যেত না। না, বলা যায় নিজের ব্যাটাকে? ঝিঁঝিঁ-তলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শরৎ মিস্ত্রী তার হাতে পাকানো বিড়ি ধরালো। লক্ষ্মণকেও দিল একটা। কলকাতায় গস্ত করতে ব্যাপারীদের লরি যাচ্ছে। বেগমপুরের পথ দিয়েই যাবে। একফাঁকে বিড়ি ধরিয়ে বাপ-ব্যাটায় হাত তুললো। যদি নিয়ে যায়। তাহলে এতটা পথ আর হাঁটতে হয় না। লরির ছাদে ব্যাপারী-দের একজন হাত নেড়ে জানালো, জায়গা নেই। জায়গা নেই।

লক্ষ্মণ তখন খোকাটি। চাবীকাড়ি মেয়ে-মাগী বসিয়ে খাওয়াবে কে? এ তো ভদ্দরলোকের বাড়ি নয়। গেরস্থ বাড়ি। বউ বিয়োবে না। ঘরে থাকলে শরীর ভাঙে। মাতব্বররা বলে কালরোগ।

পোয়াতি উঠতেই শরৎ তার নতুন বউ জানালো। যেতে চায় কি! লক্ষ্মণটাকে কোলে নিয়ে কি কান্নাকাটি। কাঁকালে উঠে ছেলেটাও কাঁদে। শেষে বাপ হয়ে ছেলেকে ছিঁড়ে নিতে হল। শরৎ ভেবেছিল—বয়স-কালের মেয়েমানুষ—তখনকার ইউনিয়ন বোরডের কোন না কোন পিসিডেন্টের জল-পাত্তর হয়েই এই গাঁয়েঘাটে থেকে যাবে। পুরুষমানুষ সে। তাই মন শক্ত রাখতে হয়। নয় কি সেদিন কষ্ট কি তারও হয়নি? কিন্তু কামিজিরেত, লক্ষাবাগানের মুখ চেয়ে সেদিনও তার বুক বাঁধতে হয়েছিল। গেরস্থ বাড়ি নিষ্কলা কমাতে জিনিস জেনেশুনে পুষবে কে? শেষমেষ পোয়াতির একটা মায়াও তো পড়ে যেতে পারত। তখন?

তখন নতুন নতুন কন্ট্রোলের কাল। আটা দিয়ে গাঁয়েঘাটে পিসিডেন্টরা রাস্তা বানাচ্ছে। খাল কাটাচ্ছে। আটার সের ছ' আনা। হেমন্ত কয়ালের তখন কন্ট্রোলের দোকান। ছ-সাতজন লোক খাটে। তখনো সে অঞ্চলপ্রধান হয়নি। তার ঘাটে গিয়ে মেয়ে-মানুষটা ভিড়ে গেল। গেরস্তয় গোড়ায় ছিল জলপাত্তর। তারপর একদিন বউ হয়ে গেল। হেমন্ত হল অঞ্চলপ্রধান। এই তো সব চোখের ওপর ভাসে। এই সেদিনের কথা। হেমন্তর ঘরে গিয়ে বছর বিয়োনি হল তার বউ। হেমন্তর পুকুর হল। জায়গা হল। আমবাগান। নারকেল বাগান। ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে।

লক্ষ্মণটা অনেকদিন আগে একদিন নতুনপুকুরের মেলা ঘুরে এসে বলেছিল, এই বাবা! নতুন মাকে আমি সামনে গিয়ে চেনা দিলাম। নাম বলিনি। কিন্তু চিনতে পারলে না।

শরৎ হোসেনের মটকা ছাইতে ছাইতে উঠোনে দাঁড়ানো ডাগর ছেলেটাকে বলেছিল, নাম বললিনে কেন?

লজ্জা করল।

বললে ঠিক চিনত। তারপর বলল, তার আর দোষ কি! অনেক সেয়ানা হয়েছিস তো। সাজ চেহারা অনেক পালটে গেছে। সেই খোকাটি তো আর নোস্। তাই চিনতে পারে নি। মনে মনে বলেছিল, কালরোগ না কচু! তাহলি বছর বিয়োনি হয় কখনো! বোঝার ভুল। হিসেবের ভুল। এই করেই তো আমরা মরি। এরকম ভুল আরেকবার করেছিল শরৎ। তার একটা দুধেল গাই পাল খায় না বলে গোহাটায় গিয়ে জলের দামে বেচে দিয়ে এসেছিল। ওমা! আশ্চর্য কান্ড। সাতবেড়ের গোকুল বাঁদা সেই বাঁজা গাই কিনে পরের পূর্ণিমের গাভিন করে আনল। সবই ভাগ্য। কখন যে কি ফসকায়! কে বলতে পারে!

দুটো লোক তখনো হাঁটছে। একজন আধপাকা। একজন তরতাজা। এই এক খেলা বাপবেটার। সেই নতুনপুকুরের মেলার দিন থেকে। তা ক'বছর হয়ে গেল। কখনো লক্ষ্মণ কথাটা পাড়ে—কিরে বাবু—বেগম-পুরে যাবি? চল্ ঘুরে আসি। কখনো শরৎ পাড়ে—কিরে যাবি নাকি। তোর নতুন মা আজ দুপুরের দিকে পুকুরে নামবে। পাট ভিজোনো আছে না!

এইরকম আর কি!

মুশকিল খুব সাধারণ। বাপব্যাটায় গিয়ে বনঝালের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে। সেদিকটায় লোক চলাচল নেই। ঢোলকলমি, তিওল, ভ্যারেন্ডার জঙ্গলমত। সেখান থেকে সব দেখা যায়। কিছুদিন অন্তর। দেখতে দেখতে লক্ষ্মণ বলে, ওই তো নতুন মা—

শরৎ কিছু বলে না। পায়ে মশা বসেছিল। যাতে শব্দ না হয়—এমনভাবে চাপড় মারে। মশাটা মরেছে। রক্ত নিরাকার। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে ফেলে।

সেদিনও অন্য ধারা হল না। লক্ষ্মণের নতুন মা জানেও না—তার এককালের সতীনপো এখন ডাগরটি। দুদুখানা বে করে বসে আছে। বাপকে নিয়ে তাকে দেখে যায় মাঝে মাঝে। বিকেলে ফেরার পথে পিচ-রাস্তায় বাপের সঙ্গে কোন কথা হচ্ছিল না। পরিষ্কার দেখাতে পাচ্ছিল—তার কতদিনকার নতুন মা ভেজানো পাট সরিয়ে সরিয়ে পা ধুচ্ছিল। হাতে পয়সা হতে হেমন্ত কয়াল এখন দুপুরে আগল এঁটে ঘুমোয়। বিকেলে একবাটি চা খায় মুড়ি দিয়ে। নতুন মাকেই সারা সংসারটা আগলাতে হয়। বনঝালের জঙ্গলে বাপের পাশে উবু হয়ে বসে একবার খুব আস্তে ডেকেছিল—নতুন মাগো। নতুন মা—

পাশে বসা বাপটা তার গলা চেপে ধরে বলেছিল, চুপ কর। আচমকা দেখে ভয় পাবে।

চেনা দেব? এই বাবা—

না। ভয় পেয়ে চোর ডাকাত ভাববে। চেঁচিয়ে উঠবে—

বাপের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণের মনে হচ্ছিল—একটা বুড়ো সাদা শেয়াল বসে আছে ঘাপটি মেরে। এখনি ডান্ডা পেটা করা দরকার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে খুব মায়া হয় তার। ভেবেছিল, পথে তালশাঁস পেলে চারগন্ডা পয়সার কিনে খাওয়াবে বাপটাকে।

ফেরার পথে ওরা তালশাঁস পেল না। পেল মেঘলা আকাশ। জলভর্তি লম্বা খাল। বাস ছুটে যাওয়া পিচরাস্তা।

খুকীর মাটাকে যে বিদেয় করলি—

কথা শেষ করার সুযোগ পেল না শরৎ। লক্ষ্মণ খেঁকিয়ে উঠল। চুপ করবি তুই!

শরৎ পুরো ব্যাপারটার জন্যে নিজেকেই দায়ী করে মনে মনে। ব্যাটার বউটা তার খুবই ভাল ছিল। রুটি সেঁকার তাওয়া নেই। কলাই থালায় কাঠের আঁচে একখানা করে রুটি সেঁকে দিত। শউরোর রুটি ক'খানা যাতে কোথাও না পোড়ে সেদিকে নজর ছিল। বিকেল হলেই নিজের থেকে ওল বাগানে জল দিত। কিছু বলতে হত না।

অথচ আমিই সর্বনাশটা করলাম। শরৎ লক্ষ্মণকে আবার একটা বিড়ি দিল। মেশিন দিল। মেশিনের চকমকি পাথরগুলো এদানী বড় খারাপ হয়ে যায়। কিছুতেই ফুলকি দিয়ে আগুন ওঠে না। আহা, ছেলেটা তার বড় শুকনো মুখে হাটছে!

গত বছর খোয়োকালে ইঁটখোলায় বাপ-বেটায় লেগেছিল। হাজার ইঁট কাটলে চোদ্দ টাকা। ফুরোনের কাজ। সেই সন্ধ্যেতারা আকাশের কিনারে ঢলে পড়লে— বেশ রাত থাকতে দুজনে ম্যারিকপোতার মাঠ ভেঙে ইঁটখোলায় এসে উঠত। হাতে হ্যারিকেন। সাদা বালি আর জাব করা মাটির তাল ফমায় ঠুকে ইঁট বানাতো সকাল সাতটা আটটা অবধি।

একদিন বাড়ি ফিরে কানাকানি শোনে—ব্যাটার বউ তার কুল ভেঙেছে। ভাগিয়েছে ভুবন মিস্ত্রীর ছোট ব্যাটা বলাই। হায়ার সেকেন্ডারি না কি জিনিস দেবে। লম্বা সম্বা তাগড়া ছেলে। সাইকেল চালায়। পার্টি ফ্রিকসনে পাইপগান চালায়। এগেনস্টু পারটির সঙ্গে গোলাগুলি নিয়ে টক্কর দিয়ে থাকে। সেই ছেলের এই কান্ড। শেষ রাত্তিরে। ফাঁকা ঘরে। দেখেছে কে? না, জ্ঞাতিভাই পঞ্চানন মিস্ত্রীর বউ। একথা কি চাপা থাকে।

এদেশের রীতি ধরে লক্ষ্মণ তার বউটাকে পেটালো। খুকীটা সাধা দিন কাঁদলো। বিকেলে ফলিডল খেল বউ। সন্ধ্যে বেলা সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে লক্ষ্মণ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হাজির। ডাক্তার পাম্প করে বাঁচিয়ে দিল।

এরপর বেশ কিছুকাল ভাল ছিল। ফিরে আবার। কে যেন লক্ষ্মণের ঘরের পেছনে খেজুরতলা থেকে দুজনকে বেরোতে দেখেছে একসঙ্গে। লক্ষ্মণ প্রায় তার বাপের কায়দায় এবার বউ ভাগালো। আহা! কাঁচ বউটা। এখন নাকি ফার্স্ট ট্রেনে যাদবপুর-ঢাকুরে কোন্ কাজের বাড়ি খাটতে যায়। সেখানে ঝিগিরি করে।

সাড়ে চারটের ট্রেনে। গায়ে জামা নেই, পরনের শাড়িখানা ধুড়ধুড়ি অবস্থা। হাতে কিলো-খানেক আটা। আহা! দেখলে চোখে জল পড়ে।

নতুন পুকুরের মাঠ পেরিয়ে লক্ষ্মণ আর একটাও কথা বলল না। বিকেল ঘন কালো হয়ে আসছিল। সঙ্গে দখিনা বাতাস। এলোপাথাড়ি। ছাতা ভাঁজ করে কাঁধে ফেলেছে। শরৎ তবু তার ভাগ্য ভাল বলে নিজেকে নিজেই বোঝালো। ব্যাটা তো সাধু সন্ন্যেসী হয়ে যায়নি। ফের বে বসেছে। তিন বিঘেয় সবজির বাগান দিয়েছে। চাষে ষোল-আনা মতি। গরুর যত্ন নেয়। কিসে সংসারে সাশ্রয় করে দুটো পয়সা হয়—সেদিকে কড়া নজর। মাছ চিংড়ি ধরে এনে বাড়ির পুকুরে ফেলে। উঠোনে ওল বসিয়েছে। মান বসিয়েছে তিরিশখানা। ক্ষার দিয়ে—কলার বাসনা দিয়ে পরনের কাপড় চোপড় কেচে পরিষ্কার রাখে। তাড়িটা খায়। কিন্তু গাঁজা তো খায় না। ওই এক পাজি নেশা। বুক লাল হয়ে দেহ শুকিয়ে যাবে।

বাপকে বলে কি করে সব কথা। লক্ষ্মণ সেসব কথা আর কোনদিন মুখে আনবে!

চোত সংক্রান্তির ক'দিন আগে তার খুড়ো পঞ্চানন মিস্ত্রী খবরটা আনে। তার চেয়ে কিছু বড় তার খুড়ো। একসঙ্গে খেলেছে। জিরেন কাটের রস একসঙ্গে খায়। খুড়োই খবরটা ভাঙ্গলো সন্ধ্যে বেলা। বাপ তখন কেরোসিনের লাইন দিতে গেছে কন্ট্রোলে। পঞ্চা খুড়ো গিয়েছিল যাদবপুরে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড় দিতে।

সন্ধ্যে বেলা আরেক জ্ঞাতি খুড়ো কিশোরী মিস্ত্রী—মান্য মিস্ত্রীর তিন ব্যাটা—গণেশ, কোনো, ফোকো—সবাই বসে। পৃথিবীতে এই সময় হলুদ বর্ণের চাঁদ ওঠে। রাখালরা গরু নিয়ে ফিরছিল। বাদুড়গুলো আকাশ দেখতে বেরিয়েছে সবে। পঞ্চা খুড়ো তখন খবরটা ভাঙ্গলো। ও লক্ষ্মণ! তোর সেই বউয়ের ভাগ্য ফিরে গেছে। হাঃ! হাঃ!

লক্ষ্মণ চুপ করেই ছিল।

হাত ভর্তি চুড়ি। গা ভর্তি গয়না। রান্না-ঘরের ছাদঢালাই হচ্ছে। আমার মাথায় কড়াই ভর্তি মশলা। ও মা! বাড়ির গিন্নি তোর সেই বউ। তারপর পাড়ায় খোঁজ নিয়ে জানলাম সব। তোর বউ ও-বাড়ি ঝি খাটতে গিছলো। এখন তিনি বউ-মরা কর্তার গিন্নি! কি ভাগ্যি! রানীর হালে আছে। শুনলাম টেবিলে বসে বাবুর সঙ্গে ভাত খায়—চা খায় দিনি দোবারা—ঘড়ি ধরে। বেটাইম কিছু হবার উপায় নেই। হু। এ হল গিয়ে ভদ্দরলোকের কারবার! সোজা কথা! গর্বে পঞ্চাননের বুক ফুলে উঠেছিল।

সবাই বলল, এরি বলে ভাগ্যি! ও মেয়ের রানী হবারই কথা। দিদি তুই তেইড়ে! এখন দ্যাখগে। ভদ্দরলোকের বউ বনে আছে। পায়ে স্যাণ্ডেল। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে।

পঞ্চা খুড়ো বলল, সারা সেমিজ পরে। এই অ্যাত্তখানি সিঁদুরের টিপ—

এসব কথা কি বাপকে বলা যায়। বাবু, তোমার যেমন ফসকানি ভাগ্য! আমারও তেমনি ফসকানি কপাল। বাপ ব্যাটায় আমরা আছি ভাল! আজ পুকুর ধারে নতুন মায়ের শাড়ির লাল পাড় কেমন ডগডগ করছিল। একদিন ঠিক চেনা দিয়ে দেব মা তোমায়। আমি তোমার সেই কাঁকালের লক্ষ্মণ। তোমার ওই ভর ভরাট সংসারের সব ছেলেমেয়ের আগে আমি হয়েছি মা। মাগো, ঠিক তোমায় চেনা দিয়ে দেব। তুমি চমকে যাবে মা—

পঞ্চাখুড়োকে নিয়ে পরদিন যাদবপুরে গিয়েছিল লক্ষ্মণ। বাড়ির সামনে পেছনে খালি ঘোরাফেরা করার পর একবার যেন মনে হল, খুকির মা জানলা দিয়ে তাদের দেখল। তারপর কোথায় কি! সব ভোঁ ভাঁ। আধ-পাকা একজন মানুষ ছাতা হাতে অফিস বেরোল। ঠিক ভদ্দরলোকের মত দেখতে। খুড়ো যা বলেছে একেবারে তাই। হাতে ঘড়ি। বুকে কলম। হাতে টিফিনের কৌটা। চোখে চশমা। পায়ে বুট। তারপরেই বউ বেরোলো। ঝুলবারন্দায়। সবটা নয়। দু'খানা হাত পুব আকাশে তুলে ধরল শুধু। গয়নায় চুড়িতে হাত বোঝাই। দেহখানা দেখালো না। পুবের আলো পড়ে সে-হাত ঝক মক করে উঠল। এসব কথা বাপকে বলা হয়নি লক্ষ্মণের। আলো ঠিকরে পড়ে হাত দিয়ে ছটা দিচ্ছিল।

সন্ধ্যের ফিরে দেখলো, অনন্ত লোকটা বড় ভাল। কোটকেনার মাঠে—ওই সেই দূরে—বাঁকে করে জল দিচ্ছে। দেহখানা দেখা যায় ছোট। বেশ দূরে তো। তারপর সন্ধ্যের মুখ। অনেকদিন পরে পৃথিবীতে আবার হলুদ বর্ণ চাঁদ উঠছিল। তার ভেতর দিয়ে একখানা ট্রেন ম্যাটমেটে আলো জেলে শহরে যাচ্ছিল। শরতের বিবেকবুদ্ধি বোধহয় কামড় দিল। নিজে থেকেই বলল, যাই, জল দিইগে।

একা একাই বাপ বাগানের দিকে রওনা দিল। হাজার হোক নতুন বেয়াই তো। দুটো গল্পগাছাও করা যায় এক সঙ্গে হলে।

লক্ষ্মণের চোখের সামনে তিন বিঘের বাগানখানা ভেসে উঠল। আর তিনটে মাস পরে—

আর মোটে তিনটে মাস পরে। যদি ঝড়বৃষ্টিতে জলবসা না হয় ক্ষেত তাহলে—

তাহলে একদিন অন্তর একদিন ঝিঙে

(সি ১৪২৪)

উঠবে অনন্ত দুমেল। আবার কাজ করেও মিটিল কিসে। তেভুল সেই পরিবারটি সুখতোর তো কথাই নেই। ছেলে মেয়ে কাজে হবে। দিনে কাজে পাহারা চাই। আবার রাতে খোরাই দিয়ে, যেখানে পাঠাতে হবে। সেখান থেকে আবার বাবেটির পাহারাদার থাকে—

পাহারা আর কে তখন?

খালি দাওয়ায় তার একহারা শরীরটা দাঁড়ালো। গায়ে জামা দিয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ। পায়ে আলতা। ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। লক্ষ্মণের খুব ভাল লাগল।

খুকী কোথায়?

সে তো সেই বিকেলে বাবুর সঙ্গে বাগানে গেল।

শুনে লক্ষ্মণের খুব ভাল লাগল। তার শরীরটা জোক ভাল। মেয়ের সতীন-ঝিকে আগলেছে বসে আছে। লক্ষ্মণের মনটা কিসে একেবারে ভরে গেল। ঠিক এইভাবে নতুন খালির জলে কি-রাতে শুকনো পুকুর ভরাট হয়। একটু একটু করে জল বাড়ে। তখন কোন তল পাওয়া যায় না।

ঘুমোবি?

লক্ষ্মণের কথায় বউ চুপ করে থাকল। এ দোলনা তার আমলের নয়। তার সতীনের আমলকার। দড়ির দোলনা। গেরস্থ বাড়ি মাত্রেই থাকে। খোকাখুকু হলে চৌচালার বারান্দায় টাঙিয়ে দেয়। তাতে মানুষের ছানা আরামে দোল খায়। বড় হলে খোকাখুকু অকালে নিয়ে বাবা মাও দেয়েলে। ফাঁকা দোলনা দেখাদেখি।

লক্ষ্মণের বউ ছুটে ঘরের ভেতর চলে গেল। সাদা তোলা ওদের সঙ্গে চিংড়ি দিয়ে তরকারি বসিয়েছে। কেমন যেন ধরা ধরা গন্ধ বেরোচ্ছে। পড়ে গেল না তো!

লক্ষ্মণও ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

কদিনে লক্ষ্মণের কুমড়ো চারার ডগা-গুলো লগবগ করে বেড়ে গেল। কিছু লতায় ফুল এসেছে। লক্ষ্মণ পয়লা ফুলটার মুখ সুতো বেঁধে দিয়ে চৌকিদার করে এল এক-দিন। তাহলে ভাল সাইজের কিছু হবে।

কেন যে কাবে বলে গণেশ যে-পাড়ায় ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছিল। জানাশুনা জায়গার লোকে তো আর ও-বাড়িতে মেয়ে দেবে না। তাই যায় আসে। আবার দুপাক ঘুরে সুন্দরীতে হলুদবর্ণের পুরো গোলগাল চাঁদ উঠেছিল কদিন ধরেই।

ভোর ভোর ধানক্ষেতে গিয়ে শরতের বুকখানা দুলে উঠল। কি গোছ। সকাল-বেলাই মেঘবর্ণ। আরো তো সারাবেলা পড়ে আছে। বেলায় বেলায় রঙ পাল্টাবে। না জানি বিকেলের ঘোরে আরও কত গাঢ় সবুজবর্ণ ধরে। তিনকাঠি ধানচারা এখন কোথাও কোথাও ঝাড়ে বংশে পঞ্চাশ কাঠি। আড়াল উঁচু হয়ে বসে গুনে দেখল শরৎ। তাড়াতাড়ি করে বাড়াতে পারলে তো ধান ধরলে

মাটি নুয়ে পড়বে। এ-বয়সটা পৃথিবীটা হাঁ-করে থেকেই তাকাচ্ছে চারদিকে। একটা তেকড় দেখল পাতার ওপর দিয়ে আলবাঁধের পাশে সেটা টিপে মারতে গিয়ে নজরে পড়ল। এ কি কাণ্ড! হা ভগবান! আলো খোলাই হয়ে গেছে। সব সার খেয়ে নিচ্ছে ঘাস। এখন ধানচারাদের বাড়ন্ত সময়। ঝাড়বার মুখে এখনই বাধা? গোমে গোড়া কেটে ফিরল শরৎ। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কোথায় গেলি হারামজাদা! কোথায়—

খুকী ঘুমোচ্ছিল। লক্ষ্মণ আর তার বউ সারারাত গল্প করেছে। জানলার নিচে ঘেঁটুফুলের বড় বড় পাতায় রাতভোর জ্যোৎস্না হেসেছে। ভোর ভোর অনন্ত যখন বাগান চৌকি দিয়ে ফিরেছে—তখনো ওরা দুজন ঘুমোয়নি। সকালবেলা ফাঁকা উঠোন পেয়ে দুজনে গলাগলি করে দড়ির দোলনায় দুলেছিল। ভোরের বাতাস ছেঁচতলার বড় বড় ঘাস কাঁপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় শরৎ একেবারে দোলনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। হারামজাদে! মাঠের ধান ঘাসে টাইটুম্বুর। গুষ্টির তুষ্টি করে দোলনায় দোলা—

ব্যাটার বউ একগলা ঘোমটা দিয়ে এক লাফে ঘরে। বাপের রাগ লক্ষ্মণ জানে। সেও লাফিয়ে উঠেছে। হাতের কাছে যা পাবে তাই এখন ছুঁড়ে মারতে পারে শরৎ।

শরৎ তা কিছুই করল না। চাপা গলায় বলল, নিড়েনের অভাবে অত সুন্দর ধান পরাণে মরে যাবে—

তুই ভাবিসনে বাবা। আমি ঠিক নিড়োবো—

প্রায় দশ কাঠা আন্দাজ নিড়িয়ে লক্ষ্মণ যখন ঘরে ফিরল—তখন মাথার ওপরে সূর্যের চড়ানির সবে শুরু। তেউড়ে কলাইয়ের ডাল। তেঁতুলের টক। চ্যাং মাছের ঝাল। খান সেদ্ধ। খেয়ে উঠে একটা ঘুম দিল লক্ষ্মণ। চৌচালার বড় দাওয়ার। তার নিচেই গর্ত করে হাঁস মুরগির ঘর। তাতে সাপ খটাস বা বেড়ালের ঢোকার কোন পথ নেই।

লক্ষ্মণ দেখছিল, নিড়েনের অভাবে ধান-ক্ষেত ঘাসে ছেয়ে গেছে। পা ফেলা যায় না। তার বড় অনুতাপ হল। এ আমি কি করলাম। এত সুন্দর ধান। নিজের হাতে গলা টিপে মারলাম। বিয়েন কাঠি তো বেরোবে না আর। চারা যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে পরিষ্কার বুঝলো—ধানচারাগুলো ওটাকো হয়ে উঠে কিন্ কিন্ করছে—বাড়বে বলে—আরও বাড়তে চাইছে বলে। চৌদিকে ঘাসে দম আটকে ফেলেছে। বাড়তে পারছে না। তার ঠিক পিঠের নিচেই ফাঁপা মাটির দাওয়ার ভেতরে হাঁসের ঘরে সাপ ঢুকেছে। ডিমের লোভে। হাঁসগুলো বের করা দরকার। ভয়ে দাপাদাপি করছে। সাপটা ফণা তুললো। বুড়ো সাপ বেশিক্ষণ ফণা

তুলে খাড়া রাখতে পারে না। মাথা দোলে। মাথা ঘোরে। আহা হা কি রূপ! কি রূপ! চোখ ভরে দেখে লক্ষ্মণ। বুড়ো সাদা মাথাটার নিচে সুন্দর গলা। তাতে জ্বলছে কালচে বুটি। এমন জিনিসের হাতে মরেও সুখ। ধেড়ে হাঁসটা তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে অন্ধকার বাসায় চুপ করে দাঁড়ানো। ছোবল পড়লে আর সরে দাঁড়াবার জায়গাও নেই। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় ডিম-গুলো—অন্ধকারে সেগুলো ফিক ফিক করছে। ধেড়েটা সব বুঝতে পেরেছে এক লহমায়। আহা এমন জিনিসের হাতে পড়ে মরেও সুখ।

পণ্ডা খুড়ো, কিশোরী খুড়ো—গণেশ, ফোকো, কোনো—তিনভাই—আরও সবাই একসঙ্গে মিছিল করে চলেছে। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। দুটো মেঠাইয়ের দোকান পড়ল। রাজপুরের শ্মশান। এখানে কত মড়া যে পোড়াতে এসে ঘাটের সঙ্গীদের সঙ্গে বসে লক্ষ্মণ কয়েকবার লেডিকেনি আর আলুর দম খেয়েছে। বুড়ো মানুষ মরলে বড় মজা হয়। ক'বার শুধু হরি হরি বল। হরি হরি। তারপরেই লেডি-লেডিকিনি। শুধু আধপোড়া নাইকুণ্ডলিটা মাটি মাখিয়ে ভাল বানাও। তারপর আদি-গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেই কাজ শেষ। লেডি-কিনি। তারপর আলুর দম। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। সব কথা তাই মনেও থাকে না।

সবে গাঁয়ের রাস্তা ছেড়ে গড়িয়া এল। দাদারা মেঠাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। এখনো টালিগঞ্জ। তারপর ময়দান। সেখানে জোর বক্তৃতা হবে। জমি দেওয়া হবে শেষ মেষ। বুড়ো বঙ্কিম মিস্ত্রী আলাং তালাং বকছিল। কোম্পানি বাঁধের গায়ে লাইন ধরে এক বিঘে দু বিঘে করে জমি সবার নামে বিলি হচ্ছে। আকাশের নিচে বাঁশের খুঁটো পুঁতে সীমানা চৌহদ্দি। বর্ষা পড়লেই গেন্তু নয়ত দামোদর ধান রুয়ে দিতে হবে। খুব সারি জায়গা। কলকারী। রুয়ে দিলেই ধান।

ও বলাই! তোর পাইপগানের নল ফেটে গেল কখন? মুখ ঘুরিয়ে নে। মুখ ঘুরিয়ে নে। নয়ত বেদম জখম হবি। এসব পার্টি ফ্রিকশনের ব্যাপার। এগেনেস্ট পার্টি হরপুরের মাঠ দিয়ে বেড় দিচ্ছে। জমি দখলের লড়াই। দখলে রাখার লড়াই। ওরা হাজার দুয়েক লোক। সারা গাঁ বেড় দিয়েছে। এবার আগুন দেবে। সব্বাইকে দেশছাড়া করবে। এদিকে শুধু বলাই। ভুবন মিস্ত্রীর ব্যাটা। তার পয়লা বউয়ের কুল জ্বেলেছিল। আহা। বড় সোন্দর পাইপগান চালায়। কি টিপ। লক্ষ্মণের বাঁ ধারে পণ্ডা খুড়ো, কিশোরী খুড়ো। গণেশ। তার বাপ মানা মিস্ত্রী। সাত আটজনে দু হাজার লোকের মহড়া। পুলিশ। দমাদ্দম। হাঃ! হাঃ! তার বুড়ো বাপটা—শরৎ মিস্ত্রি সবার অগ্রে।

হাতে একখানা রাম দা। কি প্রবল ঘোরাচ্ছে। এই কাপড় সরে যা। গর্দান লাগবে। বক্সাইয়ের পাইপগানের নল ফেটে চৌচির। পম্পা খড়ো কাঠি এগিয়ে দিচ্ছিল। এক একখানা কাঠি র‍্যাকের দরে তিন টাকা। কি আওয়াজ রে বাবা। উঃ। শালারা পালাচ্ছে এবার। ধর। ধর। ডেইডে ধর। হাজার দুই লোক বনবাদাড় ভেঙে পালাচ্ছে। হু হু বাবা। এ হল গিয়ে মিস্ত্রী পাড়া। গর্দিরে একেবারে পরিষ্কার টিপ। বু তিনটে লোক পড়ল। একটাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে। দুটো পড়ে আছে। গর্দিন করে দিলি হয়। তাহলিই সব সাবাড়। বিকেলে ময়দানে কুতে আছে। আবার পুলিসও আসতি পারে। এখনই লাশ সরানো দরকার। ও বজরা। তুই কখন এলি? তুই তো ওয়াগন ভাঙিস। তুই এর মধ্যি কেন? খুব মজা লাগে, তাই না? মানুষজন কেমন ভয়ে তরাসে পালায়। বিড়েলের মত। তুই এদিকটায় পাহারায় থাকিস।

ছুটে এগোতে গিয়ে লক্ষ্মণ দেখল—কোমপানি বাঁধের গায়ে আমতলায় নতুন মা দাঁড়িয়ে। মুখে হাসি। কপালে সিঁদুরের টিপ। ডগডগে লাল পেড়ে শাড়ি।

লক্ষ্মণ চেনা দিল। তুই কখন এলি নতুন মা? সব দেখলি?

সব।

সব?

সব। আয় এখানে একটু জিরিয়ে নে। তারপর খেয়ে নে। পান্তা এনিছি। বাপকে ডাক?

না দরকার নেই।

দেখুক। একবারটি। কে এল!

না। তুই খেয়ে নে। আমি দাঁড়াই। আর গুলিগোলায় যাসনে বাপ—

লক্ষ্মণ বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ডাবা হাঁড়িটা টেনে নিয়ে দু' গরাস পান্তা মুখে দিয়েও অবাক হল। সত্যি সত্যি নতুন মা লালপেড়ে শাড়ি পড়ে দাঁড়ানো। মোলাম পায়ের পাতা ঘাসে ঢাকা মাঠে। আমতলার ঠান্ডা ছায়া বাতাসে বাতাসে জায়গা বদলাচ্ছে—আবার ফিরেও আসছল।

আমি চেনা না দিতিই চিনলি মা?

নতুন মা হাসলো। ওমা! চিনবোনি কেন?

আমি তো এখন স্যায়না হয়েছি মা—

তাতে কি?

আমায় তো তুই পেটে ধরিসনি মা—

কে বললে? তুই তো আমার পয়লা ছেলে। নতুন সংসারে পরে আরও অনেক পেটে ধরলাম। এখন তো তোর অনেক ভাইবোন। কিন্তু তোকে কাকালে নিয়ে যা সুখ।

সত্যি মা? পান্তার গরাস গলায় আটকে বিষম খেল লক্ষ্মণ। নতুন মা বা হাতে তার মাথায় থাবড়া দিয়ে জল হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। ভাত মুখে এক কথা বলে না বাপ। জরি হয়ে যাবে। আমি যাই [illegible] হেঁশেলে জ্যাঠার এখন একবাটি চা [illegible] তারপর গদিতে গিয়ে বসবে।

আরেকটু থাকো মা নতুন মা। আর দু' গরাস খেয়ে নি—

ধীরে সুস্থে খেয়ে খেয়ে লক্ষ্মণ ফন্দি এঁটে নতুন মাকে দেরি করিয়ে আটকে দিচ্ছিল। সত্যি এমন হয়? মা ফিরে আসে। তাদের তো বাপ-ব্যাটায় শুধু ফসকামি কপাল। এসব সত্যি?

বাপ-ব্যাটায় তোকে আমরা দেখতে যাই মা। সেই অ্যাতখানি পথ। বেগমপুরে পুকুর ধারে। জানিস মা?

সব জানি!

সব।

সত্যি?

সব। খেয়ে নে। আর দু' গরাস খেয়ে নে—

রাম-দা হাতে শরৎ মিস্ত্রী ফিরছিল। আমতলার এই ছবি দেখে তার তো চক্ষু স্থির। লক্ষ্মণ মজায় মজায় বাপের দিকে তাকালো। দ্যাখোসে! কে এসেছে। অবাক শরৎ মিস্ত্রীর হাতে রাম দা ঝুলছে। এক লহমায় কোথায় কি! সব ফক্কিকারি। ভোঁ ভাঁ। নতুন মা হাওয়া।

মেলা দেখে ফেরার পথে একখানা গণেশ ঠাকুর কিনেছে লক্ষ্মণ। খুকী কিনেছে রাধা কেষ্ট। জোড়ে। ওরে, মাটির পুতুল সাবধানে নে মা। হাত ফসকালিই টুকরো টুকরো। এ বাজি কার পেয়ারা বল। পাঁপড় খাবি মা? মুচমুচে।

ও লক্ষ্মণ? উঠবি নে বাপ। সন্ধ্যা করে খু মায় এখন—

বাপ আর শাউরো ঝিঙে বাগানে জল দিয়ে সবে ফিরেছে। মুড়ির বাটির আরামে খুকী। কেউ তার লক্ষ জেবলে বারান্দায় বসিয়ে দিল।

লক্ষ্মণ তখনো দেখছিল, ছেচতলার নিচেই ঘন ঘাস হয়েছে। সবুজ আর ঝিনঝিনে। সাদা ন্যাড়া উঠোনের লাগোয়া এই সবুজ জায়গাটুকুতে ঘরের চাল ধুয়ে নাগাড়ে বৃষ্টির জল এসে পড়ে। সেখানটায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে আছে। চোখের পাশেই ঘাসের গোড়া। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল লক্ষ্মণ। সিধে সিধে সব ঘাস দাঁড়ানো। সবাই তার চোখের সমকক্ষ। সেই পরিমাণ লম্বা। ঘাসগুলো যে বাড়ছে—তার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল লক্ষ্মণ। পৃথিবীর ভেতরকার টানে সে যেন উঠতে পারছে না। মাথাটা ভীষণ ভারি। দু চোখ তার ঘাসে টেনে ধরেছে প্রায়। শরীর তোলা যাচ্ছে না।

এই সময় শরৎ এসে ধাক্কা দিতেই লক্ষ্মণের চোখ খুলে গেল। দেখল, সামনে তার বাপের মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে। [illegible] আঁধার করে [illegible] [illegible]—

[illegible] করে উঠে বসতে গিয়ে [illegible] পারেনি না। এই একটু আগেও তো নতুন মা ছিল। [illegible] বাপের হাতে ছিল রামদা। [illegible] মানসিকে অনেক পাঁঠা বলি পড়ে। [illegible] জঙ্গলে রামদা।

বাবু আমি যে উঠতি পারিনে—

অনন্ত বলল, বেলাবেলি ঘুমোলি তাই অমন ধরে যায়—একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে।

রাতে লক্ষ্মণ কিছু খেল না। পরদিন সকালে দিনের আলো ফুটলে সবাই দেখল, লক্ষ্মণের সারা শরীর ফুলে গেছে। চোখের পাতা, নাক, কান, হাত—সব। সব। এখন সে একখানা শরীরে দু'খানা লক্ষ্মণ। আঙুল দিয়ে টিপলে সে-জায়গাটা বসে যায়।

সেদিনটা শরৎ আর বাগানে জল দিতে গেল না। মনে মনে বলল, কেন যে ছেলেটাকে ধানক্ষেতে নিড়েন দিতে পাঠালাম আমারই দোষ। ছেলের গর্ব বড় গর্ব কোন কাজে গর্ব করতি নেই। কোন কিছু নিয়ে গর্ব করতি নেই। সুখের গর্ব বড় খারাপ গর্ব।

লক্ষ্মণ ভারি চোখ মেলে দু'বার বলল বাগানে জল দিতি গেলিনে বাবু?

যাবানে—' বলেও শরতের যাওয়া হল না

সন্ধেবেলা ডাক্তার নীরদবরণ এ[illegible] গুনে গুনে আটটি টাকা নিল। ঝিঙে বে[illegible] টাকা। লক্ষ্মণের সাধের বাগানের পুঁ[illegible] ঝিঙে। এই আঁতে বড় বড়।

যাবার সময় নীরদবরণ উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, কাল সকালেই ক্যালকে জ[illegible] করে দিয়ে এস। নুন খাবে না। লক্ষ্মণ শুনিয়ে বলল, এখন স্ত্রী সংসর্গ বিল[illegible] বন্ধ।

সেদিনও রাতে জ্যোৎস্না ছিল খ[illegible] খাটে লক্ষ্মণ আর খুকী। মাটির মেঝে[illegible] বউ।

ভাগ্য ভাল। নীরদবরণের চি[illegible] গোরাচাঁদে ফ্রি বেড পেল। মাসখানেক ফিরে এল লক্ষ্মণ। খুব রোগা। গায়ে নেই। লোকে জানতে চাইলে বলে, মানুষে টানাটানি গেল। বড় বড় ইঁদের পেচ্ছাবের দোষে ফুলে গেলাম।

ক'দিনের ভেতর লক্ষ্মণের ধানে এল। চকচকে রোদে গোল গোল [illegible] কাঠিগুলো এবার ফেটে গিয়ে বেরোবে। তারপর তাতে দুধ ধরবে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে লক্ষ্মণে[illegible] নতুন লাগে। গাঁয়ের রাস্তা। দীঘির কাঁঠাল গাছটা। বউকে। ভোরবেলা [illegible]

ভেজা ঝিঙে [illegible]।

শনিবারের মতো লক্ষ্মণ আবার ফুলে গেল। এবার ডবল। নীরদবরণ জানতে চাইল, নুন খেয়েছিলি? আলুনি খাওয়া যায় কখনো? তা একটু আধটু কি খাইনি।

তবেই সামলাও। চোখ, জিভ দেখে নীরদবরণ বলল, পানী খেয়েছিস?

তা দু' একবার কি হয়নি।

তবেই সামলাও। বড় ভাত রোগী। হাঁফানি আছে। আমাশা আছে। অত কিসের। নীরদবরণ বলল, কাল সকালের ট্রেনে আমার কলেজে যাবি।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এবার লক্ষ্মণের সবকিছু নতুন লাগছিল। [illegible] জুড়ে ফেলেছে. [illegible] ধরেছে। [illegible]। বর্ষায় হাল দেবার সময় [illegible] থেকে জোঁক উঠে আসে। সেই টাকায় একটা সাইকেলমত গরু কিনে বড় বাছুরটাকেও সেই সঙ্গে হালে ধরাবে। জমি বাড়াবে। চাষে আরও মন দেবে। কলকাতার হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়স্বজনকে আসতে দেখেছে বিকেলবেলা। তাদের মেয়েছেলের মত তার নিজের বউয়ের জন্যে জুতো কিনবে। কানে কানপাশা। খুকীর সোয়েটার। বাবা আর শোউয়ের জন্যে দু'খানা কম্বল। যে শীতের মধ্যি বাগান চৌকি দিতি হয়। ঠাণ্ডায় দাঁত নাচে টকাটক।

রাতে হাসতে হাসতে বউকে বলল, আমি কলেজে যাচ্ছিনে।

অনেকদিন পরে বউয়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। লক্ষ্মণ আবার ফুলে যেতে সে-মুখে আর হাসি নেই। বউ বলল, তবে?

এবার কলেজে গেলি আমি মরে যাব বউ। ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে। ইউনিয়ন পিসিডেন্ট ছেল জানো জ্যাঠা? সে কলকাতার তার চেনা কবিরাজবাড়ি নে যাবে। একেবারে ধন্বন্তরী।

টাকা?

তা একবারে এট্টু বেশি লাগবে। নীরদবরণের মত বারে বারে নেয় না। দশ-কাঠা জমি লিখে দিলি ভুবন মিস্ত্রী তিনশো টাকা দেবে—

লণ্ঠনের আলোয় বউ লক্ষ্মণের দিকে তাকাতে পারছিল না। মাথাটা ফুলে ডবল। নাকটাও তাই। চোখ ফুলে মণি ঢেকে গেছে। লণ্ঠনের কাঁপুনি ধরা আলো সেই ভারি মুখে পড়ে দুলে দুলে বেড়াচ্ছিল। বউ খুব আস্তে বলল, তাই যাও।

লক্ষ্মণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সংসারে আমার এত টান। বউয়ের তো তা নেই। মুখ ঘুইরে কথা বলে। কথায় মন নেই। ছাই পণ্ট শোনাও গেল না।

লক্ষ্মণ উপুড় হয়ে পড়ে থাকল বিছানায়।

ক'দিন ধরে কবিরাজবাড়ি হাঁটাহাঁটি গেল। তিনশো টাকা দেখতে দেখতে ফোত। সাইখোলা গরুটাও ভুবন মিস্ত্রী কিনে নিল। সে-টাকাও কবিরাজের ট্যাঁকে পেঁছে গেল।

জানো জ্যাঠা আর আসে না। শরতের ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ায় অকথা। ছেলের গরু গেল। এবার বর্ষায় চষবে কি দিয়ে?

লক্ষ্মণ এখন দাওয়ায় বসে থাকে দিন রাত। পাড়ার খেলুড়ে বাচ্চা ছেলেরা বলে, [illegible]! এখন সে তিনগুণ। মেঝে দিয়ে কালো বড় ডেয়ো পিঁপড়ে হেঁটে যেতে দেখতে পায়। বিকেলের দিকে আস্তে [illegible] বলল, বাবু বাগানে জল দিলিনে? ঝিঙের ফুলগুলো চৌটকা করে দিসনি?

আবার কোনদিন বা আপন মনে বলে, বাজে এবার থোড় এল তাই না? একদিন সন্ধেবেলা শরতকে একা পেয়ে বলল, নতুন মাকে তো চেনা দিলাম না বাবু!

শরৎ সেই ফোলা মুখে খানিকক্ষণ চোখ রেখেও বুঝতে পারল না, ছেলের মুখে হাসি? না দুঃখু?

সেদিনই রাতে মিস্ত্রীপাড়ার দিঘীর পাড়ে শিরিশতলায় এক সাধু এল। কেউ তাকে দিল লাউ। কেউ গাইয়ের দুধ। ভুবন মিস্ত্রী দিল—মরিচশাল ধানের খই আর নিজের গাছের মর্তমান কলা একজোড়া। শরৎ বেশি রাতে গেল। গোটা কয়েক ঝিঙে হাতে। তখন সেখানে কেউ নেই। রাতের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। গরুগুলো নিঃশব্দে একা জাবর কাটছিল। দূরে ডিসট্যান্ট সিগ-ন্যালের লাল বাতিটা তখন ধকধক করে জ্বলছে।

একেবারে অল্পবয়সী সাধু। লক্ষ্মণের চেয়ে দু'দশ বছরের বড় হবে। গিয়েছিল, ছেলের কথাটা বলতে। যদি কিছু জানা যায়। কেউ কি বাণ মারল তার ছেলেটাকে? কেউ কি কোন শেকড় বাকড় খাইয়ে দিল? যদি জানা যায়!

কিন্তু সাধুকে দেখে শরতই জানতে চাইল, বে হয়েছে?

সময় পাইনি।

বে করনি। সংসার করনি তো জানবেটা কি!

সাধু তখন দাড়ি চুলকে স্বর্গের কথাটা পাড়ল। শরৎ খানিক মন দিয়ে শুনলো। একবার তার মনে হল, সাধু বুঝি বা এমন কোন খালের কথা বলছে—যার সন্ধান এখনো লোকজনে পায়নি। তাতে অনেক মাছ। আটল, হাতজাল নিয়ে গে পড়লেই হয়। চিংড়ি, পারসে, ভেটকি, ভাঙনে বোঝাই হয়ে যাবে।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে শরৎ জানতে চাইল, স্বর্গ জায়গাটা কেমন? কেননা, সাধু যতই বলে যাচ্ছিল—শরতের ততই গুলিয়ে যাচ্ছিল। এখন শশা ক্ষেতে শেয়াল গড়াগড়ি দিচ্ছে। পিঠে যেখানটা উঁচু ঠেকবে—সেখানটায় লতাপাতার নিচে ঠিক শশা আছে। এর নাম স্বর্গ?

শরতের কথায় সাধু থতমত খেয়ে থেমে পড়ল। আবার বলতে গেল, স্বর্গ মানে—

তখন মাঠে মাঠে জোনাকি। শরৎ জানে, নতুন বেয়াই, নাতনি, ব্যাটার বউ এখন ঘুমোচ্ছে। জেগে আছে লক্ষ্মণ। কালো পাথরখানা হয়ে দাওয়ায় বসে। উঠোনে হয়ত এখন ছায়া-গোলা জ্যোৎস্নায় বেড়ালগুলোর খেলা দেখছে। বেড়ালরা এই সময় গোলার গা থেকে ইঁদুর ধরে এনে আধমরা করে ছেড়ে দেয়। তারপর উঠোনময় সেটাকে নিয়ে তাদের লাফালাফি দাপাদাপি। এর নাম স্বর্গ?

সাধু আবার বলল. স্বর্গ মানে—

শরৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সেখানে কি বর্ষায় গোরুর পায়ে এসো হয় না? কোন গো-বাদ্যি লাগে না?

তা কেন? সাধু নতুন কথা হাতড়াচ্ছিল। তবে?

এই আধপাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে সাধু ভয় পেল। চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলছে। ধুনির আলোয় মশা যায়নি। তাদের পিন পিন।

শরৎ বলল, সে জায়গাটা আমাদের এই জায়গার চে' কোনদিক ভেন্ন? তফাতটা কি? সেখানে জ্বর হলি গা পোড়ে না?

সাধু বলল, তুমি কাল সক্কালে এস। সব বলে দেব।

'দুচ্ছাতা' বলে ঝিঙেগুলো হাতে নিয়েই শরৎ ফিরে এল। লক্ষ্মণ তখনো বসে। সেও শুনেছে—কে এক সাধু এসেছে। টেনে টেনে বলল, সাধু কিছু দিল?

কি দেবে? জানলে তো।

শরতের খিদে মরে গেছে। ছেলের মুখখানা অনেকদিন দেখা হয় না। লণ্ঠন জ্বালিয়ে লক্ষ্মণের পাশে এসে বসল।

আলো সয় না চোখে। তুই শুগে যা বাবু।

যাচ্ছি রে। এখন কেমন বাসিস।

আর কেমন!

ভালো হয়ে যাবি দেখিস। তুই সেরে ওঠ। আবার বেগমপুর যাব। ধানে শিষ এল এবার—

জল আছে তো মাঠে?

সব আছে। সে চিন্তে আমার। তুই ভালো হয়ে ওঠ।

ঝিঙের কি দর যাচ্ছে বাবু?

বাইশ টাকা মণ।

আরও উঠবে দেখিস। তুই শুগে যা বাবু।

—এই যাই—

কথা শেষ হল না শরতের। আচমকা ডান পা তুলে লক্ষ্মণ লণ্ঠনটার লাথি কষালো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার।

করলি কি? বলে শরৎ লণ্ঠনটা কুড়োচ্ছিল। ঘরে নিয়ে গিয়ে ফের জ্বেলে

অনবে। লক্ষ্মণের কোলা মুখে তখন হাসি। তারি পা তুলতে কষ্ট হয়েছে বলে একটু হাঁফাচ্ছিল। শরৎ ঘরে ঢুকতেই লক্ষ্মণ কোমর থেকে শিশিটা বের করল। ধানের পোকা মারার কালিজল। গত সনে ক্ষেতে দিয়ে কিছুটা বেঁচেছিল। কুলুঙ্গিতে তোলা ছিল। আজ বউ ঘাটে নাইতে নামলে লক্ষ্মণ খুঁজে পেতে বের করেছে।

ক্যাটার বউ অসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। শরৎ লণ্ঠনটা জেলে নিয়ে ফের বারান্দায় এসে বসল। নীরদবরণ পঞ্চাশ টাকা পেলি তোকে আবার কলেজে ভর্তি করে দেবে। সবই তো হাতের লোক সেখানে ওর। জোর হলেই মন আড়াই খিঙে পাইকেরের ঘরে তুলে দিয়ে নীরদবরণকে টাকাটা দিয়ে আসবে। হালের গরু গেল। পাশে দাঁড়াবার এমন মদ্দ ছেলেটার এই অবস্থা। এখন যে করে হোক লক্ষ্মণকে খাড়া করা দরকার। মাঠে ধান। তিন বিঘের ডাঙায় —ঝিঙের বাগান। এ সব কে সামলাবে। ও কি? লক্ষ্মণ?

শরতের বুকের গর্তের ভেতর থেকে আওয়াজ চিরে বেরিয়ে এল। ও লক্ষ্মণ?

অনন্ত ঘুমোচ্ছিল। উঠে পড়েছে। তার মেয়েও উঠেছে।

লক্ষ্মণ ততক্ষণে কাত হয়ে পড়ে বাঁ হাতের নখে দাওয়ার নিকোনো মাটি খামচে ধরেছে। বুকের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে শব্দ দাওয়া দিয়ে গড়িয়ে পুকুরে নামতে লাগল।

শিশিটা কুড়িয়ে পেল অনন্ত। শরৎ সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। লণ্ঠনের আলোয় ধরে বলল, ওঃ! সব্বনাশ!

তার চেঁচানিতে পাশাপাশি ঘরের জ্ঞাতিগোত্ররাও উঠে পড়েছে। লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছিল। দু চোখের জলের ফোঁটা এক লাইনে মিশে গিয়ে মাটিতে পড়ল, বাগানে জল দিসনি বাবু—

সবচেয়ে বেশি দৌড়োদৌড়ি করল লক্ষ্মণের খুড়ো। পঞ্চা খুড়ো। পঞ্চানন মিস্ত্রী। তার এককালের খেলুড়ে। এই সেদিন তো লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যাদবপুর ঘুরে এসে সবাইকে বুক ফুলিয়ে বলছিল—ও সব্বনাশ! লক্ষ্মণের পহলা বউয়ের একেরদম রাণীর কপাল! দোবারা যে বসল। এখন দু'হাত ভর্তি গয়না। হাত ঘুরোলি সোনায় দানায় ঝকমক করে—

নীরদবরণ এল না। কেউ না।

কোন ডাক্তারকে না পেয়ে পঞ্চানন যখন ফিরল—তখন পুবের আকাশে কাক উড়ছে। বলবান ধান গাছের গায়ের শিশির মরেনি। সবজি আর মাছের ট্রেন দাপাতে দাপাতে স্টেশনে ঢুকলো। শরৎ বা অনন্ত—কেউ ঝিঙে তুলতে যায়নি বাগানে। লক্ষ্মণের খুকীটি সাত সকালে মুড়ির বাটি পেয়ে বসল। বউটা ঘরের দোর ধরে দাঁড়ানো।

ভুবন মিস্ত্রী বলল, এ মড়া মড়া কেউ ঘাটে নেবে না। লক্ষ্মণ তখন সবে যেন পাশ ফিরে শুয়েছে দাওয়ায়। ধুতির বাইরে বাঁ পাখানা দাওয়া ছাড়িয়ে ঝুলেছে।

দীনবন্ধু এ তল্লাটের অঞ্চলপ্রধান। রেশন কার্ড বিলি করে। সবাই মাটি কেটে এসে তার কাছ থেকে কালি করিয়ে নেয়। হিসেবে লিখুতে। দলিল করাতে তার সাক্ষী নেয় সবাই। সে বলল, আত্মঘাতীর কেস। কোন ডাক্তার তো লিখে দিতে রাজি হবে না রে। তোরা বরং থানায় যা—ওরাই কাটাছেঁড়া করে পুড়িয়ে দেবে। ঘাটের খরচ খরচার হাত থেকে বেঁচে গেলি শরৎ। তোর ছেলেটা বড় সুন্দর ছিল রে শরৎ। আহা-হা-হা! শেষ বেলায় সব ঘুঝেলুঝেই মরে গেল—

শরৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো। মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, ও আমার সম্বন্ধী রে! এখন বিপদ কাছে। মুখ ফসকে কিছু বলে এখন শত্রু বাড়ানো বুদ্ধির কাজ হবে না। দুনিয়া দেখতে বড় সরল জায়গা। এখানে আসলে কিন্তু সাবধানে চলা চাই। সব দিকে নজর থাকা চাই। না হলিই মুশকিল।

থানায় গেল পঞ্চানন। দুটো স্টেশন পরেই থানা। ফিরে এল সাড়েবেলা। থানার ভ্যান এল দু'টোয়। লক্ষ্মণ ততক্ষণে তিনগুণ ফুলে গেছে। এই অ্যাত্ত বড় মাথা। অ্যাত্ত বড় নাক। সব দেখে শুনে এ এস আইয়েরো মনে খটকা লাগল। হলেও আত্মঘাতী। কিসের না কিসের রোগী। কিছু বলা যায় না। শরতকে ডেকে বলল, দুটো তো স্টেশন। লাইন ধরে সোজা পথে যাবি। ঘণ্টা খানেকের রাস্তা তো। থানায় পৌঁছে দে মড়া—

পাকের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে পুলিশ ভ্যান ফিরে গেল। মাঠে আধা রোদ্দুরে তাকানো যায় না।

পঞ্চানন তার প্রায় বাপের বয়সী দাদা শরৎকে বলল, চল যাই শ্যামল বাঙালের কাছে যাই। এমন সময় কেঁদে পড়লি টাকা পাবি—

আমি যাব না। তুই যা—

লোকটার সঙ্গে ভাগের জমিতে ধান চাষ করে পঞ্চানন। ছিল বিদিশী। এখন প্রায় এ-দিশী। পুকুর কাটিয়ে শ্যামল বাঙাল লাখগঞ্জের ইটের পাঁজা পুড়িয়ে ঘর করেছে। পাকা বাড়ি। ইটের পাঁজায় আগুন দেবার সময় তিন ভরি গাঁজা কিনে

দিয়েছিল। এখন তাড়ি খায় হাঁড়ি হাঁড়ি। ওদের কাছেই হাত্তেখড়ি। সময় অসময়ে চাইলে দেয়। দেশের নাকি ভাল করবে! বড্ড বাঙালে কাণ্ড! পঞ্চানন গিয়ে চাইতেই দশ টাকার একখানা নোট ধরে দিল। শ্যামল বাঙাল। লোক ধরে নিয়ে থানায় যেতে হবে। এই পাঁচ মাইল রাস্তা তো মড়া নে যেতে হবে। একটা খরচ খরচা আছে না? পঞ্চানন চলে যাচ্ছিল। শ্যামল বাঙাল আমাল, কতবার শরতকে বললাম—চল হাসপাতালে ভর্তি করে আসি।

আমার কথাটা শুনলে লক্ষ্মণ মরত না রে—

আর বোলো না বাবু। বড্ড বন্দরের কাণ্ড। সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরে সব জানাব। তোমার কি বাগানের মাটি কাটা হবে বাবু? বলতো কাল সকাল থেকে লাগি। আমরা পাঁচজনের একখাতা বসে আছি—

কেন? আর কোথাও কাজ নেই এখন?

কোথায় কাজ? ভুট্টা দু টাকা বাট! কাজ দেবে কে? সামনের দিন সকাল থে লাগি? লাগ। কিন্তু এখন তো না কাটলেও চলতো আমার—

তুমি এট্টু দেখ আমাদের বাবু। এই সময়টা এট্টু দেখে যাও। ধান উঠলি সব ঠিক হয়ে যাবে—বলতে বলতে পঞ্চানন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে বলল, তোমার পুকুর ধারের বড় মানকচুটা কে নিয়েছে জানো? লক্ষ্মণ আর বেচো মিস্ত্রী দুজনে খেয়েছিল। যাক, দুঃখু রেখো না, আমার ভাইপোটা খুব স্বাদ করে খেয়ে গেছে—

ভাত ঘুমের ভেতর একবার যেন হরি-বোল শুনতে পেল শ্যামল বাঙাল। আহা! লক্ষ্মণ এখনো তার চোখে ভাসে। 'এই তো সেদিন তার সাদা টেরিলিনের বুশ শার্টটা চেয়ে নিল লক্ষ্মণ। পুরনো সুতো খুলে যাচ্ছিল। আরেকবার সেলাই দিয়ে নিলে অনেক দিন চলতো। সেই শার্ট গায়ে দিয়ে লক্ষ্মণ আবার বিয়ে বসল। ফিরে এসে তার কাছে জমি চেয়েছিল। ভাগে করবে। চাষে বড় যত্ন ছিল। মন ছিল। বাবরটি যেছে জমি তকতাকে করে নিত। কত ফুর্তি। কত মেশামেশি। বড় মানকচুটা তাহলে লক্ষ্মণরা চুরি করেছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরে বাঁধা ভাঁড়ের চার গ্লাস রস খেয়ে বেড়াতে বেরোল শ্যামল বাঙাল। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। অন্ধকার কেটে এবারে জ্যোৎস্না বেরোবে। পঞ্চাশের এখনো ঢের দেরি। তবু এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ছড়ি। এসব হাতে নিলে বেশ সম্পন্ন গেরস্থ ভাবটা আসে। এখানকার লোকজনও তাতে বেশ মানে। পছন্দ করে। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ধানক্ষেতের দেখেন এক-দিন জানতে চায়—ও বাঙালমশাই! ধান উঠলি এবার কি দেবেন জমিতে? আমি বলি মুসুরি কড়াই ছড়িয়ে দিন। কোন হাঙ্গাম নেই। জলের বালাই নেই।

দেখি। আগে ধানটা তো উঠুক। কত্তা কত করে হবে মনে হয়?

একশো কুড়ি টাকা তো ছাড়িয়ে যাবেই—বেশিও হতি পারে—আপনি ওই মুসুরিই করুন। বোশেখ মাসে ডাল উঠে আসবে।

দেখি। চলতে চলতে শ্যামল বাঙাল ছড়ির ডগা এগিয়ে দেয়। টর্চের বোতাম টেপে। অর্থাৎ এবার আমি এগোই। এই গেরস্থ ভাবটা প্র্যাকটিস করতে এত আরাম। শহরে থাকতে এসব একদম জানা ছিল না। বে-মেয়েমানুষটি রেখেছে—সেটিও পালটানো দরকার এবার। এদেশের কথায় বাসি জলপাত্র তিতকুটে হয়ে যায় শেষে। সারাদিনের রোদে পোড়া সন্ধ্যের তাড়ি। ঠিক তিতকুটে নয়। তার মুখে আলুনি ঠেকে এখন। কিন্তু মায়া? বড় পাজি জিনিস। এই বাজারে তাড়ালে যাবে কোথায়? এখন ভাঙানো ভুট্টার কেজি দু টাকা বাট। থাক। থেকে যাবে। ঘরের কাজকর্ম করবে। ভালো জলপাত্রের খবর এসেছে একটা। নতুন পুকুরের ওদিক থেকে। বয়সকালের মেয়েছেলে। বনিবনা হচ্ছে না। ঠিকমত খেতে দেয় না। স্বামীর ঘর ভেঙে আসবে। কিছু ঝকমারি আছে। তা তো থাকবেই। কিসে নেই। ভাল জিনিসে ও একটু আধটু হবেই। হাঁটতে হাঁটতে শ্যামল বাঙাল ঠিক করতে পারছিল না—এবার জমিতে কি দেবে? চৈতি মুগ। না মুসুরি। এখানকার লোক বলে, মুসুরি কড়াই। ডাল মাড়াই করে বের করে নেবার পর গাছ-গুলো হালের গরুতে খুব আদর করে খায়। বলকারী। এখানকার লোকে বলে, স্বাদিষ্ট। এখানে সব আগে আগে হয়। জন্ম। মৃত্যু। এখানে অল্প বয়সে লোকে আত্মঘাতী হয়। আহা যে লক্ষ্মণ। আগে আগে চুল পাকে। দাড়ি পাকে। আগে আগে পাটিল তোলে সবাই।

বোতাম টিপতেই টর্চের আলোর ভেতর পঞ্চানন মিস্ত্রী পড়ে গেল। দু ধারের দোকানঘরগুলোতে এখন গাঁয়ের মানুষজন সওদা করতে এসেছে। সরষের খোল—দশ কেজি। নুন আড়াই শো। রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছিল।

হাত দিয়ে আলো আড়াল করে দাঁড়াল পঞ্চানন, দিয়ে এলাম বাবু। ওরাই পোড়াবে।

জর্দা-পান চিবোচ্ছে। সঙ্গে দিশির ভুরভুরে গন্ধ।

কজন গেলি? কোন জবাবের জন্য জানতে চায়নি শ্যামল বাঙাল। এই সময়টুকু একটু হাঁটা দরকার তার। এদানী বড্ড অম্বল হচ্ছে। পরিশ্রম কম। হাঁটাচলা না হলে তাড়িটা পেটের ভেতর খলখল করে।

আমরা সেই পাঁচজন। মাটি কাটার এক খাতা।

কে কে?

আমি। গণেশ। ভালা। তুলসী আর হাজরা—কাল সকালে থেকো কিন্তু। ভোর থেকে কাটব—বলতে বলতে পঞ্চানন কাটলো। শ্যামল বাঙাল ঠিক করতে পারল না—এখন এতটা পথ নতুন পুকুর অবধি যাবে? না ফিরে যাবে?

পরদিন খুব ভোরে উষাকালের আলো তখনো ঠিকমত ফোটেনি। সূর্য আকাশে এলো বলে। শ্যামল বাঙাল উঠে দেখল, তার জলপাত্র চায়ের জল চাপিয়েছে সবে। তোলা বাসি জলে নিশ্চয়। মনটা খুঁত খুঁত করে উঠল। পই পই করে কতদিন বারণ করেছে, বাসি জলে চায়ের জল বসাবি নে—স্বাদ পাইনে—

ঘাটলার পুকুরের ওপারে একখাতা লোক তখন মাটি কাটছে। পঞ্চানন মাটি বোঝাই ঝোড়া তুলে দিল ভাসার মাথায়। সদ্য কাটা মাটি। সূর্য আসেনি বলে ঘোলাম আলোয় মাটির গা দেখা যাচ্ছিল। সকালটা একদম আলো দিয়ে ধোয়া। পরিষ্কার তকতকে। ঠিক করল, আজই নতুন পুকুরে যাবে—

দাঁতনের জন্যে শ্যামল বাঙাল নিমের ডাল ভাঙতে বাঁ দিকে ঘুরতেই দেখল—শরৎ মিস্ত্রী আলে বসে আছে। হাতে বাজারের থলে। তার ভেতর থেকে শিশি বোতলের মুখ বেরিয়ে। উবু হয়ে বসে শরৎ ফলা ধানের নুয়ে পড়া শিষ হাত দিয়ে তুলে তুলে দিচ্ছিল। বোধহয় কাল কারও ছাড়া গরু খানিক জায়গা মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধামসানো শিষগুলো ধানের ভারে শুয়ে পড়ে আছে। শরৎ মিস্ত্রী একটা একটা করে সাবধানে তুলে দিচ্ছিল। তার হাতে খুব আদর। তোয়াজে তোয়াজে দু'এক শিষ খানিক খানিক খাড়া হল।

মুখ তুলে তাকাতেই শ্যামল বাঙালের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। শরৎ উঠে দাঁড়াল। কদিন দেখতি পারিনি। গাছ একদম শুয়ে পড়েছে বাবু।

ধান তো ভাল হবে শরৎ।

মন তো তাই বাসে। সব শিষ পোবেনি এখনো। দেরি আছে এখনো। আরও পুষবে। পুষ্ট হবে দানা আরও—

শরতের বাজারের থলের ভেতর এক-জোড়া খালি শিশি নড়ে চড়ে ঠুঙঠাঙ করে উঠল। যাই বাজার যাই বাবু।

কম্পৌলে কেরোচিন এল?

শুনছি তো।

বুদ্ধদেব বসু

আশরাফ সিদ্দিকী

"...ভাবলে আমি নিজকে দেখতে পাই রমনার বিশেষ একটি রাস্তায়, যা চলে গেছে পুরানো পল্টনের মোড় থেকে সোজা পশ্চিম দিকে...। এই মাত্র খেয়েছি দিদিমার রান্না অতি তৃপ্তিকর মাছের ঝোল ভাত, হাঁটছি হালকা পায়ে প্রফুল্ল হাতে দু' একটি বইখাতা মেঘলা অথবা রোদালো দিনের বেলা দশটায়...। পাঁচ মিনিট পরে মেয়েদের হস্টেল—রমনার সব সুন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেই 'তথাকথিত চামালিয়া হাউস...সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি অথবা সাতটি সহপাঠিনী... খৃস্টান সন্ন্যাসিনীদের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে হাঁটছেন তাঁরা, সমতালে পা ফেলে ফেলে মাথা আঁচলে ঢাকা...পথে পথে আরও অনেক চেনা মুখ; কখনো দেখি বিজ্ঞান বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু চলেছেন মন্দ চরণে হাতে গোল্ডফ্লেকের টিন, জামা বোতাম হীরা... চুল উস্কোখুস্কো!...ছাঁটা চুল, চোখে সোনার চশমা, গিলে করা চুড়িদার পাঞ্জাবিতে সুপ্রসাধিত ডক্টর দে...সংস্কৃত বাংলার অধিনায়ক সুশীল কুমার।...ঢুকলেন ইতিহাস বিশারদ রমেশচন্দ্র মজুমদার... ইংরেজী বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ রায়...তিনি মৃদু ঝোঁকে নরোম আওয়াজে বলেন, "এই যে বন্ধু, ভালো আছো?"...লিখি চিঠির উত্তর...একটি বা দু'টি সনেট, বা জাপানী ধরনে এক গুচ্ছ তানকা। লিখে সুখ পাই —কেননা, আমার অনবরতই লেখা আসছে।" ("আমার যৌবন", দেশ, ১৩৮০)

হাঁ—ঢাকা—সেই ঢাকা—যে ঢাকার ফরাসগঞ্জে এসে ১৯২১-এর শেষের দিকে অসুস্থ দাদামশাই চিন্তাহরণ সিংহকে নিয়ে নোয়াখালী থেকে বদলি হয়ে বাসা নিলেন আর যে ফরাসগঞ্জের সামনে ছিল উতল-বিতল-নিতল-শীতল বুড়ীগঙ্গা আর ১৯২২-এর সেই কলেজিয়েট স্কুল ঘরের সামনে ছিল বিভিন্ন লাইব্রেরী—বই কেনা হোক বা না হোক উইন্ডো পিপিং-এ আনন্দ কি কম ছিল? না কিনলেও বই-পত্রিকা পড়তে দিত তারা। তারপর ফরাসগঞ্জ থেকে পুরানাপল্টন—টিনের ঘর। আষাঢ়-শ্রাবণে চালের উপর বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্, কখনো সেতার কখনো পিয়ানোর সুরে, সকাল আসে সোনাঝরা রৌদ্রের দাক্ষিণ্যে—সন্ধ্যা আসে চুপি চুপি পিদিমের শান্ত আটপৌরে সৌন্দর্য নিয়ে। সেই পুরানা পল্টন থেকে ঠন্-ঠন্-ঠন্—সাইকেল ঠন্ ঠন্—ঘোড়ার গাড়ির ঝক্কর-ঝিক্কর-ঝিক্কর-ঝিক্কর ছন্দে ছন্দিত রমনার ময়দানের দিকে সবুজ ঘাসের গালিচায় ছাওয়া রাস্তা, , লাল ইঁটে গাঁথা দুই দিকে অধ্যাপকদের বাসা—। বর্ষায় বর্শার মত ফুটে থাকে দুইদিকে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার রঙীন অভিনন্দন। রাস্তার লোকগুলি সহজ সরল—কথাগুলি আঞ্চলিক মাধুর্যে হৃদয়বেদ্য—আর মস্তো মস্তো সব ক্লাসঘর —বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীগুলি যেন ঘরোয়া সাহচর্যে 'আসুন আসুন', 'বসুন' 'বসুন' আহ্বানে সহজিয়া—পূর্ণ—নিজের গৌরবে নিজেই যেন পূর্ণ—নিরাভরণ জ্ঞানপীঠ।

আর টুনু—মানে—অজিত দত্ত—যার সঙ্গে ডাবলিং করে সাইকেল চালিয়ে দূরে, অনেক দূরে ঘোরা যায় বিনি ভাড়ায়।

এসব কথা বুদ্ধদেব বসু বহু বার বলেন,—পূর্ববাংলা থেকে যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন শুনিয়েছেন আমাদের কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে।

এরও বহু পরে সেই ১৯৬৩-৬৪র মার্কিন মুল্লুকে বসে, ইনডিয়ানার ব্লুমিংটনে।

আমার স্যার 'কঙ্কাবতী', 'সুরঙ্গমার' সুরেলা কবি, আমার প্রিয় কবি, ঢাকায় আসবেন। অক্টোবর ১৯৫০।৩।৪ ; ঢাকায় কায়েতটুলিস্থ ফ্রেন্ডস সেন্টার-এর উদ্যোগে। ফ্রেন্ডসগণ একটি মার্কিন সংস্থা ছিল।

আমরা—আমি, কবি আবদুর রশীদ খান (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র এবং "নতুন কবিতার" যুগ্ম সম্পাদক), মোহাম্মদ মামুন (কবি, বর্তমানে মরহুম), মনোজ রায়চৌধুরী (কবি ও "সোনার বাংলার" ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, (শহীদ) এবং আরও অনেকে গেলেন। ফ্রেন্ডসগণ আমাকে বিশেষ ক'রে যেতে বললেন ; কারণ প্লেন থেকে নামলে যাতে চিনতে এবং চেনাতে দেরী না হয়। বলেছিলেন জ্যোতির্ময়বাবুকেও। যথারীতি "এয়ার ইন্ডিয়ার" প্লেন এসে ল্যান্ড্ করলো। কিন্তু স্যার—বুদ্ধদেব বসু কই? হ্যাঁ— আছেন—প্রায় সবার শেষে ধীরে ধীরে নামলেন। শরতের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথায় উপর—কাস্টমস-এ চেকিংপর্ব শেষ হল। এবার মৃদু হাসির সঙ্গে বের হয়ে এলেন লাউঞ্জের ভেতরের দিকে প্রসারিত ডান দিকের দরজা দিয়ে। গলের ডান দিকটা জুলফির কাছে বেশ কাটা। বললাম, কাটলো কিভাবে? প্লেনে কিছুতে আঁচড় লেগে? না—মৃদু হেসে বললেন—'ক্ষুরে'—

বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তী (কেন্টনে তোলা ছবি, ১৯৫৪-এ)

যাবে দাড়ি কামাতে—সাত সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে। ফ্রেন্ডসদের গাড়িতে করে ওঁকে কায়েতটুলী সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হল। ওঁকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমি এবং রশীদ সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে এলাম আমাদের আস্তানায়। বিকেলের দিকেই সম্ভবত অনেকেই দেখা করতে এলেন—সৈয়দ আলী আশরাফ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোহাম্মদ মামুন, রশীদ, শামসুর রাহমান প্রমুখ অনেকে। ফ্রেন্ডস-এর দুই তিন দিন ব্যাপী কয়েকটি বৈঠকেই আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং সমস্যা—বিশেষ করে আধুনিক কাব্য নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক হয়। ফ্রেন্ডসদের উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল আলোচনা ঘরোয়া পরিবেশেই হোক—কোন টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে ঘটা করে নয়। পরদিন সকাল ৯—১০টায় আসর বসলো ফ্রেন্ডস সেন্টারের ঢালা বিছানায় মেঝের কার্পেটের উপর। আমার যতদূর মনে পড়ে এই আসরে সৈয়দ আলী আশরাফ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক) বাংলা কবিতায় ইংরেজী কাব্যের প্রভাবের উপর একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়েন—সৈয়দ আলী আহসান ইংরেজীতে প্রবন্ধ পড়েন। যতদূর মনে পড়ে জ্যোতির্ময়বাবুও একটি প্রবন্ধ পড়েন। আলোচনা ও সমালোচনায় যোগ দেন খান সারোয়ার মুরশিদ (ইংরেজীর অধ্যাপক), জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল গণি হাজারী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আবদুল মতিন (পরে জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক) মোঃ মাহমুদ (পরে লংম্যান কোম্পানীর কর্মকর্তা) প্রমুখ। এই বৈঠকে কবিতা পড়েন "নতুন কবিতা" গোষ্ঠীর আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, মনোজ রায় চৌধুরী, আমি। এবং আরও অনেকে। ফ্রেন্ডস সেন্টারের ঢালা বিছানায় পূবের দিকের কোণে বসে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু বেশ ঘরোয়া ভঙ্গীতে—দুটি পা মুড়ে। পরিধানে পাট-ভাঙা পাজামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি—পাঞ্জাবির বোতাম গলার বাম দিকে। ঐ ভাবেই তাঁকে পাঞ্জাবিতে দেখেছি তাঁর "কবিতাভবন"—২০২-এর রাসবিহারী এভিনিউতে এবং শান্তিনিকেতনে। তারও বহু পরে ঘরোয়া পরিবেশে সুদূর আমেরিকার ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানায়—১৯৬৩-৬৫তে।

বুদ্ধদেব বসু সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকার নতুন-পুরানো কপি। "কবিতা"-কে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কিনা—যে "কবিতা"-কে কেন্দ্র করে এদেশে আধুনিক কাব্য-কবিতার একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, এ নিয়ে তাঁকে ভাবিত, চিন্তিত মনে হল। সকলকেই বললেন এই সমস্যার কথা। কিভাবে ঢাকায় সে যুগে অজিত দত্ত (টুনু) প্রমুখকে নিয়ে "প্রগতি'র" সূচনা হয়; "কল্লোল" "কালি-কলম" যুগে আধুনিক কবিতার কি মূল্যায়ন হল—বর্তমান ইউরোপীয় ও মার্কিন কবিতা তার প্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার কি হচ্ছে—বিশেষ করে মালার্মে এবং বদলেয়ারের কবিতা—টি এস এলিয়ট, —চমৎকার আলোচনা করেন ঘরোয়া পরিবেশে। বুদ্ধদেববাবু তাঁর প্রতিটি আলোচনাতেই আন্তর্জাতিক পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলে মনে পড়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকায় সকাল, কায়েতটুলীর পত্রশোভিত গাছগাছালি, পুরাতন বাড়ির কড়িকাঠে একটি কি দুটি চড়াই পাখির কিচিরমিচির—বাইরে কাকের কা-কা-কা—এরই মধ্যে ধীরে-সুস্থে "উইজডম ইন এ স্মাইলিং মুড" বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা—বক্তৃতা ঠিক নয়—সাহিত্য-আলাপন, বেশ লাগছিল। প্রশ্ন আসছিল উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে। মীমাংসা হচ্ছিল সে প্রশ্নের। জোর করে চাপিয়ে দেয়া একতরফা মীমাংসা নয়—; আমি ত' এই মনে করি—অমুকেত', মানে জীবনানন্দ দাশ—বিষ্ণু দে—সুধীন দত্ত—বদলেয়ার—এলিয়ট এই বলেন—আপনি কি মনে করেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে সুকান্ত (ভট্টাচার্য) সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো একজন। বললেন—"কবিতায়" আমাদের বক্তব্য আমরা রেখেছি—পড়ে দেখবেন। "কবিতায়" সুকান্তর প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশংসা করা হয়েছিল—দুঃখও করা হয়েছিল— এই বলে যে, প্রচারের মানে রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওঁকে ফুটতে দেওয়া হলো না। বললেন, সবাই আজ দুঃখ করছেন কিন্তু ছেলেটা সুদূর বেলেঘাটা থেকে রাহা-পয়সা বাঁচাবার জন্য যে জ্বর গায়ে হেঁটে যেত আর সময়মত খেতে পারতো না—এমনকি একটা ভালো কলমও কিনতে পারতো না, সুতো পেঁচিয়ে ভাঙা কলমে কবিতা লিখতো, কই কেউ ত' বলেন নি তখন, কেমন আছো, কিভাবে চলছে, কি পড়ছো, কি ভাবছো—পরিচয় আছে বিদেশী কবিদের সঙ্গে? সুকান্ত সম্বন্ধে তাঁর এই দুঃখ-বোধ (সেটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যক্তিগত) আমার আমেরিকা প্রবাসকালে সেখানেও তাঁকে বলতে শুনেছি। বুদ্ধদেববাবু ফ্রেন্ডস আসরের আলোচনায় যতদূর মনে পড়ে আর যতদূর আমার ডাইরীতে নোট আছে, যতদূর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যতদূর পুরাতন চিঠিপত্র থেকে খুঁজে পাই—বাংলা কাব্যে তুলনামূলক পাঠাভ্যাসের প্রতি গুরুত্ব দেন। যার যার [illegible]—পড়তে হবে, বাইরে কি হচ্ছে জানতে হবে। কুনো ব্যাঙ হলে ত' আজ চলবে না।

সিটিং বসে পরের দিনও। প্রধান চালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান সাহেব তাঁর স্বাভাবিক সহজাত বচন ভঙ্গিতে শ্রোতাদের নিমগ্ন রাখতে পারেন—সমস্যার মূল [illegible] ভাবিত করে তুলতে পারেন। যতদূর মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবু তাঁর বক্তব্যেও একটা মীমাংসা দিতে পেরেছিলেন। এই উপলক্ষে তদানীন্তন রিটজ রেস্তোরাঁয় (বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এখন যেখানে ক্যানিস-এর দোকান) একটি খানাপিনারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেববাবু পুরানা পল্টন বেড়াতে গেলেন। কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেগুন বাগিচা দেখলেন। বেড়ালেন রমনার ময়দানের ধারে—গেলেন পুরাতন পরিচিতদের গৃহে।

যাবার আগে কিনলেন রানুর (প্রতিভা বসু) জন্য শাড়ি—ঢাকাই বুটিদার আর জামদানী। মিষ্টি কিনবেন—নামে ঢাকাই মিষ্টি। না, আজ নয়—কাল যাবার আগে।

রশীদ, মামুন, এরা সব মাটির পাতিল ভরে কিনে এনে দিল ঢাকার কালাচাঁদ, মরণচাঁদের অমৃতি, সন্দেশ, প্রাণহারা (বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় প্রাণহরণকারী?) এবং দই। রানু নিজে বলেছেন। ঢাকার মেয়ে রানু এ-সব মিষ্টি খু-উ-ব পছন্দ করে।

এবারে বিদায়ের পালা। পুরানা পল্টন—সেগুন বাগিচা—কার্জন হল—কৃষ্ণচূড়া—রাধাচূড়া—মখমলের মত সবুজ রমনার ময়দান সেই ঢাকা থেকে বিদায়। কতবার বলেছেন আসবেন—ঢাকা আসবেন—বাংলা একাডেমীর বিগত সাহিত্য সম্মেলনেও নাকি আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেননি। কাজেই ১৯৫০-এর শরৎ অপরাহ্নে সেই-ই শেষ বিদায়। এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে উঠলেন ধীরে ধীরে—চাইলেন পেছন ফিরে—দুই হাতে ঢাকাই মিষ্টির ভারী ভারী বোঝা—প্লেন উড়লো—শূন্যে আরও শূন্যে ওড়ার জন্য চক্কর দিল ঢাকার উপর দিয়ে বুদ্ধদেব—১৯২২, ২৩, ২৪, ২৫......২৯-এর বালক-কিশোর-যুবক বুদ্ধদেব কি কাঁচের জানালায় মাথা রেখে দেখছিল কি দুঃসহ এক স্মৃতি বেদনার উত্তল-নিতল যন্ত্রণার মত মিলিয়ে যাচ্ছে তার ঢাকা—সবুজ ঢাকা—চোখের জলের মত এর নদীগুলি—টুনুদের ঘুড়ি ওড়ানো খেলার মাঠ—রানু সোমদের বাড়ি—কলেজিয়েট স্কুল—রমনার ময়দান—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—আর সব চেনা মুখগুলি।

চিঠি লিখলাম। ১৯৫০-এ প্রকাশিত আমার ও আব্দুর রশীদ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত নতুন কবিতা—তেরজন তরুণ কবির কবিতা সংকলন—'নতুন কবিতা' আর আমার 'ডাকের মাষ্টারের' সমালোচনা দাবী করি। পূর্বের মতই জবাব দিলেন ত্বরিৎ। পাঠালেন কিছু বই। 'কবিতা'র কিছু সংখ্যা

—কিছু বিজ্ঞাপন। এই পত্রে শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার উল্লেখ আছে। নতুন পত্রটি-ঃ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি, বই পেয়েছি। রিভিউ তুমি যত তাড়াতাড়ি চাও তা সম্ভব হ'লো না—আগামী সংখ্যা জো মার্কিন, তার পরের সংখ্যায় সচেষ্ট থাকবো। আমাদের মুশকিল এই যে, পত্রিকার আয়তন স্বল্প এবং ওরই মধ্যে নানা রকম জিনিস দিতে হয়। প্রায়ই কুলিয়ে ওঠে না। পূর্ববঙ্গে তোমরা 'কবিতার' প্রচারের চেষ্টা করছো জেনে সুখী হয়েছি। খুব বেশী আশা না করাই ভালো, ঢাকা শহরে কিছু সত্যিকার গ্রাহক (সত্যিকার মানে—যাঁরা পড়বেন) পেলেই ঢের হলো ভাববো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম, হল লাইব্রেরী ইত্যাদির হওয়া উচিত মনে হয়। এই সঙ্গে মার্কিন সংখ্যার কয়েকটা কাগজ পাঠালাম—যদি তোমাদের কাজে লাগে।

'কবিতার' বিজ্ঞাপনের স্থানও অতি পরিমিত। সেটা সম্ভব হবে কিনা এখনই বলতে পারছি না। অতএব তোমার প্রস্তাবিত 'ঢাকা প্রকাশে' কবিতার বিজ্ঞাপন আপাতত বন্ধ রাখো। পরে দেখা যাবে। গ্রাহকদের টাকা পাঠানোর অসুবিধা আছে, তোমরা সংগ্রহ ক'রে ফ্রেন্ডস্-এর মারফৎ পাঠাতে পারো। কিংবা জ্যোতির্ময় গুহ-ঠাকুরতা এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর এখানকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

ঢাকায় তোমাদের নূতন সাহিত্য-গোষ্ঠীর রচনা মাঝে-মাঝে 'কবিতা'য় প্রকাশ করা সম্ভব হলে সুখী হবো। তোমরা সকলে আমার শুভকামনা গ্রহণ করো।

—বুদ্ধদেব বসু

'কবিতার' এজেন্সি বিষয়ে ওয়ারি বুক স্টলের চিঠি পেলে তাদের কাছে বিবরণ পাঠাবো। ঢাকার ব্যাঙ্কের চেক তো এখানে চলবে না—কলকাতায় ব্যাঙ্কে ব্যবস্থা করতে হবে।—তোমার বইয়ের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চেয়েছো। এর কোনো-কোনো কবিতা আগেই দেখেছিলাম—ভাল লেগেছিলো—বইয়ে মনে হলো গদ্য কবিতার সংখ্যা কিছু বেশি। ছন্দে হাত পাকলে তোমার লেখা মজবুত হতে পারে।

—বু. বসু

এ তো গেল এখানকার, ১৯৫০-এর কথা।

আরও কিছু আগে ফ্ল্যাস-ব্যাক করা যাক।

স্থান কলিকাতা, পার্ক সার্কাসের বাসা। সময় রাত ৮টা কি ৯টা। ১৯৪৪ সাল। হঠাৎ অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করলো, 'এখানে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন বুদ্ধদেব বসু।......'বন্দীর বন্দনা ও 'কঙ্কাবতী' থেকে ইথারে ভেসে আসতে লাগলো স্বরতরঙ্গ ঃ সুরতরঙ্গ ঃ

—আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মত
তনুলতা তব
(ওগো কঙ্কাবতী।)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে
ভালোবাসিবার
(ওগো কঙ্কাবতী।)
ওগো কঙ্কাবতী!—
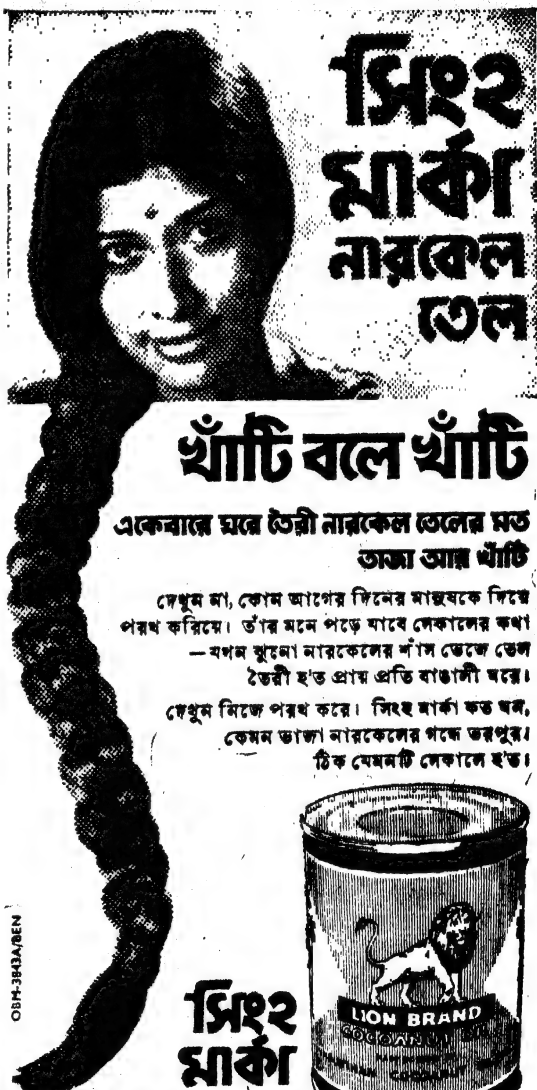
অপূর্ব আবৃত্তি। কথাগুলি যেন একটু থেমে থেমে বলা। বেশ দীর্ঘ কবিতা। চমৎকার ওঠানামা করছে স্বর—সুর—আর আবৃত্তিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আবু সাঈদ চৌধুরী এবং তাঁর সে যুগের প্রেসি-ডেন্সি কলেজের বন্ধু এবং কবি কামাল চৌধুরী। কবিতার বই যেখানে যা পাই হাভাতের মত পড়ি—বুঝি আর নাই বুঝি। 'কঙ্কাবতী' কবিতার সুর গুন গুন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজীর ক্লাশ করতে গিয়ে শুনলাম আমার এই ক্লাশের শিক্ষক কাল রাতে শোনা 'কঙ্কাবতীর কবি' এবং খ্যাতিমান লেখক 'বুদ্ধদেব বসু'। বুদ্ধদেব বসু আমাদের ভাষায় বি-ডি-বি—পড়াতেন

আমাদের ইংরেজী র‍্যাপিড রীডার। ক্লাশে এলেন। পরিধানে টাইবিহীন স্যুট—একটু যেন ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত—তার উপর বেশ লাজুক—গাল ও ঘাড়ের কাছে একটি কালো জন্মদাগ। ছাত্রদের মুখের দিকে বড় একটা তাকাচ্ছেন না। কখনো বই-এর দিকে, কখনো অবিশ্রান্ত ভিড় ও জনস্রোতমুখর রিপন স্ট্রীটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে থেমে থেমে পড়িয়ে যাচ্ছেন। এক সময় শেষ হ'ল ঘণ্টা। ছাত্রদের স্রোত এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে লাজুক লাজুক মুখে তিনি চলে গেলেন নীচের তলায় ইংরেজী বিভাগের কক্ষে—পরবর্তী ক্লাশের জন্য প্রস্তুত হবার জন্যে। এরপর প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে ক্লাশ করেছি ইংরেজীর—তিনি কোনদিন কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন—বা জিজ্ঞেসিত হয়েছেন, মনে পড়ে না। আসতেন। পড়িয়ে চলে যেতেন। বাহ্য বাইরের দিক থেকে তাঁকে যেন অত্যন্ত গম্ভীর অথচ লাজুক মনে হত। মনে হ'ত বড় ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত। কে শুনছে—কে শুনছে না—কে থাকছে বা থাকছে না—কোনই কেয়ার নেই। ইতিপূর্বে অধ্যাপক বুদ্ধদেববাবুর 'মর্মবাণী' (১৯২৫), 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সব না হলেও কিছু কিছু পড়েছি। মুগ্ধ করেছিল তাঁর ছন্দ—বিশেষ করে কঙ্কাবতীর সেই ছন্দ—অপূর্ব আবেশঃ কঙ্কা...কঙ্কা...কঙ্কাবতী গো...অথবা... অন্য কবিতাঃ

ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা?
মনে কি পড়ে? মনে কি পড়ে?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে,
সারা দিন রাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর দোলা—

বলা নিষ্প্রয়োজন এ ছন্দ যে কোনো তরুণ কবিকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং করেও ছিল সে যুগের বহু বহু কবিকে। আমার বন্ধু শৈলেন সেন (পরে শ্রীহর্ষের সম্পাদক)-এর সঙ্গে যথেষ্ট দ্বিধা নিয়ে একদিন উপস্থিত হলাম তাঁর ছোট কলেজ কক্ষটিতে। শৈলেন বললোঃ এ কিছু কিছু লেখে।

লেখে? বেশ তো।—কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বললেনঃ দেশ-বিদেশের সাহিত্য পড়া দরকার। পড়ছে কি? তৃতীয় বচনে কথাটি বলে—শৈলেনের দিকে তাকিয়ে আবার মগ্ন হয়ে গেলেন কি একটি ইংরেজী বইতে। দুত্তেরি। কবি হলে কি হবে। বড় বেরসিক। বন্দীর বন্দনা এবং কঙ্কাবতীর কবি সম্বন্ধে অন্তত আমার তাই ধারণা হ'ল। তাঁর লেখা পড়েছি। বই পড়েছি কিন্তু আর বড় একটা ঘেঁষিনি আমার ছয় মাসের সংকীর্ণ রিপন কলেজের ততোধিক সংকীর্ণ পরিসরে।

এরপর বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল শান্তিনিকেতনে। এসে উঠলেন উত্তরায়ণের উলটো দিকে—'হিরণকুঠি'তে। সস্ত্রীক। সকন্যা। কন্যাটির বয়স কম—চঞ্চলা। সঙ্গে দময়ন্তী। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের অনেকের ভিড় দেখা গেল। দেখা গেল বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেককে যারা তাঁর "কবিতা" পত্রিকায় লিখতেন। শান্তিনিকতনে সেবারে তিনি ২।১ দিনের বেশী থাকেননি। এসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে বাংলা ছন্দ নিয়ে কোন আলোচনা করতে। তখন তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন অর্থাৎ আধুনিক কাব্যে বাংলা ছন্দ কি কোন সমস্যা হয়েছে কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে, পরিষ্কার হতে। কবিতা পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধও বের হয়। লেখেন আরও অনেকে। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর (শহীদ হায়দার ভাইর) একটি প্রবন্ধ বের হয় এই সময়। শুনেছি, তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' এবং 'বৈশাখী' বার্ষিকীর লেখা বাছাইতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অনেক সময় মনোনীত লেখায় ছোটখাটো পরিবর্তন করে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে তিনি তা আবার লেখকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন তার সম্মতির জন্য। লেখক ও সম্পাদক হিসাবে তাঁর এই নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দিকটি নিয়ে কেউ কিছু লিখেছেন কিনা আমার জানা নাই। তার ফাইলে মনোনীত লেখা দীর্ঘদিন অপেক্ষাও করতো। তখন থেকেই চিঠিপত্র লিখেছি। উত্তরও পেয়েছি। আছে সে সব পত্র। কেউ কেউ বলতেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি রবীন্দ্র-বিরোধী। জানি না, এই মিথ্যা অপবাদ অপনোদনের জন্যই কিনা তিনি 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১) লেখেন—তাঁর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের একটি রসমধুর স্মৃতিচারণ। বলা বাহুল্য, বইটি শান্তিনিকেতনে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। এরপর 'দেশ', 'প্রবাসী' ও 'বসুমতী' (মাসিক) প্রভৃতি পত্রিকায় এবং 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত'-এ আমার কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। যতদূর মনে পড়ে দু-একটি মুদ্রিত কবিতা তার কাছে কাগজ থেকে কেটে পাঠিয়েছিলামও। সম্ভবত ১৯৪৬-এর দিকে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও তার সতীর্থ সুসাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের (বরিশাল) সঙ্গে ট্রামে চড়ে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি গেলাম আমরা, কবিতা ভবনে—বালিগঞ্জে ২০২, রাসবিহারী এভিনিউয়ে, ভাড়া করা বাড়ি। কলেজ স্ট্রীট থেকে ট্রামে যেতে বেশ সময় লাগলো। বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্নটি ছিল বড় মাদকতাময়। রাস্তার দু-পাশে রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাতে ধরেছে লাল ও হলুদ ফুলের গুচ্ছ, বর্শার মত খাড়া। মনে পড়ে 'কবিতা' পত্রিকায় আবুল কালাম শামসুদ্দিনের একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে দোতালার দক্ষিণমুখী প্রথম ঘরটিই বৈঠকখানা। উপরে থাকতেন ঢাকার টুনু, মানে কবি অজিত দত্ত, ঢাকার স্মৃতির মতই। (এখনও থাকেন)। বুদ্ধদেববাবু বাইরের ঘরেই একটি ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি, পরিধানে ঢিলে পাজামা—প্রুফ দেখছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার অথবা চিন্তা ভাবনা করছিলেন নিজের লেখা কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সুমার্জিত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের। হায়দার ভাইয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছে একাধিকবার। পূর্বেই বলেছি, 'কবিতা' পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ' নামে তাঁর একটি সুলিখিত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। এক ফাঁকে বললাম, রিপন কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলাম। হায়দার ভাই ও আবুল কালামকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন—আমাকেও করলেন, শান্তিনিকেতনে কে কেমন আছেন ইত্যাদির কুশলাদি। বললেন, শান্তিনিকেতনে গিয়ে কোথায় কোথায় থেকেছেন। বিশেষ করে লালবাঁধ-এর তীরে ও সাঁওতালপাড়ায় বেড়ানো তাঁর বেশ ভালো লাগতো ইত্যাদি নানাকথা—'সাহিত্যিকার' (আশ্রমের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান) খবর প্রভৃতি। বললেন, সেই পুরানা ঢাকার জীবন—বিশ্ববিদ্যালয়—পুরানা পল্টনের বাড়ি—রাস্তা-ঘাটের বিবরণ—উচ্ছ্বাস নেই কথায় কিন্তু গাঢ়তা আছে। আসলেন রানুদেবী—মানে স্ত্রী প্রতিভা বসু—মানে আমাদের ঢাকার মেয়ে রানু সোম। দেখো গো, তোমার বাপের দেশের লোক এসেছে। চা এলো। মিষ্টি এলো। মিষ্টি আর চা খেতে খেতে বারবার বলতে লাগলেন কোলকাতার মিষ্টি কি আর সেই কালাচাঁদ আর মরনচাঁদের মত হবে? কোথায় পাবে বিক্রমপুরের রাবড়ি, সন্দেশ আর দই। বললেন, মায়ের (দিদিমাকে মা বলতেন, নিজের মা ছিল না) কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল থেকে কয়েক কদম হেঁটেই কেমন পেঁছে যেতেন কালাচাঁদের দোকানে — চমৎকার দই—চমৎকার ছিল তার স্বাদ। আশ্চর্য—এই যে কথা হচ্ছে কোথাও যেন উচ্ছ্বাস নেই—যাকে বলে ব্যালেন্সড। ঢাকার কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই যেন তাঁর কৈশোর-যৌবনে চলে যাচ্ছিলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ঢাকার প্রতি যেন তাঁর ছিল কোথায় প্রচ্ছন্ন মনস্তাত্ত্বিক এক দুর্বলতা। হায়দার ভাই এক ফাঁকে বললেন, 'আশরফ ত কবিতা লেখে'। 'হ্যা—দেখেছি—'

'নয়ছন্দাস উত্তর। 'সঙ্গে এনেছো নাকি দু-একটা?' বুদ্ধদেববাবু বললেন। পড়লাম কয়েকটি। এর মধ্যে 'হাওয়া বুবুদের দেশে' (পরে 'তালেব মাস্টার' গ্রন্থে সংকলিত) তাঁর ভালো লাগলো। বললেন, রেখে যাও—'কবিতা'য় দেবো। আর শোনো, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান কবিতা খুব পড়বে। তোমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরী ত সুপার্ব' ('সুপার্ব' কথাটির প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতা ছিল—প্রায়ই বলতেন পরেও দেখেছি)—আর শিক্ষকদের সাহায্যও পাবে। শালবীথি-আমবীথিতে নিরিবিলি বসে বসে পড়বে। কবিতাত রেখে এলাম। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়। ডিমাই সাইজের, উপরের কভারে দু-দিক থেকে ময়ূরে পুচ্ছের মত পেখম তোলা শিল্পচিত্রে ভূষিত ঝকমকে চকমকে প্রচ্ছদের 'কবিতা' পত্রিকা আসে; কিন্তু আমার 'হাওয়া বুবুর' কি খবর? পত্রও দিলাম। জবাব নেই। এর মধ্যে সাগরদা' (সাগরময় ঘোষ—'দেশ'-এর ভার-প্রাপ্ত সম্পাদক) শান্তিনিকেতন এলেন। তাঁকে দেখালাম কবিতাটা। বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে নিলাম। সেই বছরই (১৯৪৬) শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা 'দেশ'-এ কবিতাটি ছাপা হল। বুদ্ধদেববাবুকে লিখে জানালাম—কিছুটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের সঙ্গে অর্থাৎ আপনি ত ছাপালেন না—এই দেখুন 'দেশ' ছেপেছে। এবার জবাব এলো তরিৎ। গাঢ় নীল রং-এর উত্তাল স্রোতে ভাসছে নৌকা—এই মনোগ্রামের কার্ড।

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯, ১৮-১১-৪৬

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিতাটি পত্রান্তরে ছাপা হয়ে গেছে, সেখবর আগেই জানানো উচিত ছিল। তোমার জন্য বেশ একটু অসুবিধা হল আমাদের।

—বুদ্ধদেব বসু

এরপর ১৯৪৭-এর মার্চে 'সাহেরবানুরা পাঁচ বোন' নামে একটি কবিতা পাঠালাম (কবিতাটি পরে 'তালেব মাস্টার' গ্রন্থে সংকলিত)। জবাব এলো :

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯, ৩১-৩-৪৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'শাহেরবানুরা পাঁচ বোন' 'কবিতা'য় প্রকাশ করা গেল। সঙ্গে টিকিট থাকলে তখনই জানানো হয়—এটা বোধ হয় আমাদের আপিসের ভুল হয়েছিল।

আমার কল্যাণ কামনা গ্রহণ করো।

—বুদ্ধদেব বসু

চিঠিটার মেজাজ দেখে মনে হল, এই তরুণ ছাত্র লেখকের প্রতি তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি আছে। অন্তত সামান্য কিছু সহানুভূতি। ইতিমধ্যে 'দেশ', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'ক্রান্তি' (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত) 'অরুণ', 'চতুরঙ্গ' (হুমায়ুন কবির সম্পাদিত) এবং বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যা ও 'আজাদ', 'কৃষক', 'মিল্লাৎ' 'ইত্তেহাদ' প্রভৃতির বিশেষ ঈদ সংখ্যায় আমার কবিতা বের হচ্ছে আষাঢ়ের নব জলধারার মত। চিঠি লিখলাম বুদ্ধদেব-বাবুকে। জবাব এলো : এবারে জাফরানী রঙের প্যাডে। প্যাডের উপরে সেই বাদামওয়ালা একটি নৌকা : উত্তাল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে : এই মনোগ্রাম। খামটিও একই মনোগ্রামে সুশোভিত। কিছুটা যেন নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গ মোটিভ। সে গবেষণা থাক, আপাতত পড়ুন পত্রটি।

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ৩০-৯ তারিখের চিঠি এখানে পৌঁছলো ১১-১০ তারিখে। যে সব বই চেয়েছো পাঠানো হলো, আশা করি পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হবে না।

সাময়িক পত্রাদিতে তোমার কবিতা দেখে আসছি। তুমি যেটা সুর ধরেছো : এই সুরটা কল্লোলযুগেই জেগেছিল, অনেকের মনকেই ছুঁয়েছিল তখন। মিষ্টি সুর, কিন্তু বড়ো ছোটো, বেশিক্ষণ শোনা যায় না, আর কোনো বড়ো ভাবের পানও এতে ধরে না। সেইজন্য তোমার সব রচনাই প্রায় একরকম হয়ে পড়ছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো তোমার এখন নানারকম চেষ্টা করা উচিত, নানা সুরে, নানাভাবে, নানা ছন্দে। হয়তো তোমার নিজের ভিতর থেকেই পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার চেতন-চেষ্টাও চাই।

'বৈশাখী' আর বেরোয় না। তুমি যে-প্রবন্ধের উল্লেখ করেছো তা আমি পড়িনি।

আমার শুভকামনা তোমাকে জানাই।

—বুদ্ধদেব বসু

অতঃপর আমার আরো কাব্যগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। পাঠিয়েছি। একজন শিক্ষকের মতই তাঁর স্বাভাবিক বাগাড়ম্বরহীনতার মধ্যে দু-এক কথা লিখেছেন। যা 'ভালো' ভালোই বলেছেন—মন্দকে আরো ব্যাপক অনুশীলন অথবা তুলনামূলক পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে 'উত্তরিত' হতে উপদেশ দিয়েছেন। বিদেশে গিয়েছি একাধিকবার। যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়বার বিদেশে যাবার প্রাক্কালে যোগাযোগ করলেন তিনিই আমাদের আরেক বন্ধুর মাধ্যমে। তিনি তখন সস্ত্রীক আমেরিকায়। এবং আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে পড়েছি এবং এখন যাচ্ছি—সেই ব্লুমিংটন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়—ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে—তুলনামূলক সাহিত্যে। বন্ধুটি পত্র দিল বসু পরিবারের জন্য আমি যেন ঢাকার বুটিদার ও জামদানী শাড়ি নিয়ে যাই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই দেবো।

দীর্ঘদিন পর ১৯৬৩-৬৪-এর শিক্ষাবর্ষে আবার দেখলাম বুদ্ধদেব বসুকে। প্রায় ১৩।১৪ বছর পর। স্বাস্থ্যের সেই লাবণ্য নেই। শরীরে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। কিন্তু কবি-মনটি আছে আগের মতই সবুজ এবং সরেস। সম্ভবত আরও সরেস।

ব্লুমিংটন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে হেঁটে একটু পূর্বদিকে গেলেই ব্যালেনটাইন হল। সেই ব্যালেনটাইন হলে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে তাঁর অধ্যাপনা। আমার বিভাগীয় প্রধান ডক্টর রিচার্ড ডরসনকে বললাম তুলনামূলক সাহিত্যে কিছু ক্লাশ করার অনুমতি দিতে। অনুমতি মিললো। বুদ্ধদেববাবু সেবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন রামায়ণ-মহাভারত এবং বেউলফ, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি ভারতীয় মহাকাব্য বনাম পাশ্চাত্য মহাকাব্য নিয়ে। তিনি প্রথম কয়েকদিন মহাকাব্যগুলির কাহিনী ঘরোয়া পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের গল্পের আকারে বলে গেলেন। মহাকাব্যের নায়কনায়িকাদের নাম বোর্ডে লিখে যেতে লাগলেন আমেরিকান ও বিদেশী ছাত্রদের নামগুলির সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য। তারপর ক্লাশের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে গল্পগুলি এবং কাহিনীর বিশেষত্ব নিয়ে সেমিনারের জন্য প্রবন্ধ তৈরী করতে দিলেন। আর কি। ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরী চাষ করতে লেগে গেল। এরপর প্রতিদিন চলতে লাগলো ছাত্রদের প্রবন্ধ পড়া এবং পঠিত প্রবন্ধের উপর সমস্ত ক্লাশ এবং সর্বশেষে বুদ্ধদেব-বাবুর আলোচনা। জমে উঠলো ক্লাশ। তখন দেখেছি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে—বিভিন্ন রেফারেন্স গ্রন্থ ঘেঁটে ঘেঁটে তিনি তাঁর নোট বইতে লিখে নিয়েছেন বিভিন্ন উদ্ধৃতি। এখনো যেন অবসর মুহূর্তে চোখ বুজলে দেখতে পাই—সামার সিজনে ঝরে পড়ছে উইলো গাছের পাতা—আর ব্যালেনটাইন হলে বুদ্ধদেববাবুর বক্তৃতা চলছে : "ইয়েস, প্যাটারনাল কোয়ালিটি—ইয়েস, লং কনটিনিউইং ট্রাডিশন—ইয়েস, রিলিজিয়ন উইথ সিনসিয়ারিটি অ্যাণ্ড সাবলিমিটি'—এই হ'ল ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যে মিলন-বিরহ, ত্যাগ তিতিক্ষা নিয়ে এই জীবন দর্শন, আর প্রতীচ্যে আছে ঐহিক আকাঙ্ক্ষা, আছে দৈহিক আকাঙ্ক্ষা। ওখানে ত্যাগের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় মোহনীয় দুঃখের ধরিত্রী। আর এখানে জ্বলে যাক নগর—জ্বলে যাক গৃহ—পুড়ুক ট্রয় নগরী। আমি চাই—আরও চাই—।

শীতে বরফ পড়ছে ব্যালেনটাইন হলের বাইরে, মেঘাচ্ছন্ন আমেরিকার আকাশ—কিন্তু পথে-ঘাটে তবু জনস্রোত। ঘরে বসে থাকে না পশ্চিমের ব্যস্ত মানুষ। নো ওয়র্ক—নো ফুড। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কামাই করে না। চলছে যানবাহন—বলছেন বুদ্ধদেব : "কিভাবে তোমরা বুঝে নেবে প্রভেদটা। তোমরা সংগ্রামী। তোমরা কর্মী। তোমাদের নেই গুরুজনদের দায়িত্ব। তোমরা পিতা-

পিতামহ বৃদ্ধ হলে তাকে বৃদ্ধলোকদের এসাইলামে পাঠিয়ে দাও। আর এদিকে বেচারা রামচন্দ্রকে তরুণী স্ত্রী নিয়ে বনে গিয়ে পিতৃসত্য, 'প্যাটারনাল রাইট' রক্ষা করতে হয়। আর বেচারা লক্ষ্মণ। তাকে শুধু পিতৃসত্য নয়, ভ্রাতৃসত্যকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকেও পিতৃগৃহে ফেলে যেতে হয়।"

জনৈকা সুন্দরী ছাত্রী হয়তো প্রশ্ন তুললো, এ বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি। আরেক সুন্দরী বললো, আমি কিন্তু ঐরূপে ডলরথের (দশরথের) পুত্রবধূ হতে চাইবো না। মৃদু হাসছেন বুদ্ধদেব বসু। বলছেন, একটা শান্তি কিন্তু তারা পায়—সে হ'ল মৃত্যুর পরে একটা স্বর্গলোকের প্রতিশ্রুতি। আর মৃত্যুটা এমন একটা জটিল ব্যাপার যে, এর আদি বা অন্ত কেউই বলতে পারে না। রাইকেলও নয়। এমনকি উরের রূপসী হেলেনও নয়। কিন্তু সীতা বা লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্মিলার কাছে তার অন্য অর্থ ছিল।

আমেরিকায় শরৎ এলো। আকাশে বাতাসে নব পত্রপল্লবের বিজয়গীতি। অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ সবুজ বনভূমি। বুদ্ধদেববাবু পড়াচ্ছেন :

"......শকুন্তলা আর টেম্পেস্টের মীরান্দা এক নয়। এক নয় রাজা দুষ্যন্ত এবং ফার্দিনান্দ। দুই-ই পরিপূর্ণ নিজেদের পটভূমিতে। পটভূমিটাই আসল। দারিদ্র্য সব ক্ষেত্রে শান্তি আনতে পারে না বলেই প্রাচুর্য শান্তি আনতে পারে—এটাও ঠিক নয়।"

আমেরিকান এবং ইংরেজগণ বস্তুবাদী হয়েও কিন্তু বঙ্গ-ভারতীয় গণকের নাম শুনলে দুই হাতই বাড়িয়ে দেয়। তারা ম্যাজিকের আশ্চর্য জগতের কথা শুনলে অনুসন্ধিৎসু হয়। বঙ্গ-ভারতীয় অধ্যাপকগণও তাই এদেশের সনাতন জীবনের—দর্শনের এবং ধর্মতত্ত্বের কথা বলে একজন তরুণ বা তরুণীর মাথাটা বিলকুল ঘুরিয়ে দিতে পারেন—কারণ তারা গভীরে যেতে চায়—আর গভীরে একবার ঢুকলে ওদের পক্ষে ফেরাও মুশকিল—হয় পি-এইচ-ডি পর্যায়ে যাবে নয়তো হিপ্পী হয়ে যাবে। এই জন্যই বুদ্ধদেববাবুর ক্লাশগুলি বেশ জমে উঠতো—অজস্র প্রশ্নের শরাঘাতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আরও জানার আগ্রহ। বুদ্ধদেববাবু তৈরী থাকতেন। উঠুক প্রশ্নবাণ, পরিষ্কার হোক প্রাচ্যের মহাকাব্যগুলির বিরাট অরণ্যানীর অন্ধকার। তপোবনের। তপোমনের। তপোজীবনের।

সেই ১৯৪৪-৪৫ এর লাজুক অধ্যাপককে দেখেছি ক্লাশ শেষে অথবা বিরতিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন. তাদের দেওয়া সিগারেট অম্লানবদনে তাদেরই লাইটারের আগুনে একটু নিচু হয়ে ধরিয়ে নিচ্ছেন। ছাত্রীগণ তার কাছ থেকেই লাইটার ধার করে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করছে, আর পক্ষপাতি সেবিকা বেচারা দ্রৌপদীর (ড্রাউপডী) অন্তহীন শাড়ি (এনড্লেস ক্লোদিং) আর সতীত্ব (চ্যাস্টিটি) নিয়ে সব মারাত্মক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে। বুদ্ধদেববাবু উইলো গাছের আপেলবীথির দূর্বাসবুজ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুচকি হেসে বলছেন—কখনো আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন সেই প্রবাদটি......ঐ সে বিশ্বাসে' সব মিলে হ্যাঁ, 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'—"ইউ আর টু বিলিভ ম্যাডাম—ইউ আর টু বিলিভ মেনি থিঙ্কস ইন ইন্ডিয়ান মিথ—দ্যাট ইজ এ পার্ট অব ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ান।"

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেববাবুর আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ আমাদের কাছে পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগলো ত্রৈমাসিক টার্ম পেপার লেখার সময়।

আচ্ছা, তপোবনে 'সীটা'—সীতাকে একটি সার্কল—বৃত্তের মধ্যে রেখে রাম 'ম্যাজিক ডিয়ার'—মায়ামৃগের পেছনে কেন গেলো? ওয়াজ ইট এ ম্যাজিক? এটা কি কোন ইন্দ্রজাল। আর 'ডসানানা' দশাননের দশ মাথা। ব্যাপারটা কি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এমনটি নেই কেন? ইত্যাদি—ইত্যাদি। নেই কেন সেটা বুঝবার জন্য বুদ্ধদেববাবু একদিন তাঁর ক্লাশে ডেকে নিয়ে এলেন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী স্টিথ থম্পসন সাহেবকে—ইংরেজী তুলনামূলক সাহিত্য ও লোক-বিজ্ঞানের অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক। থম্পসন বললেন, ইন্দো-ইউরোপীয় যে মানবগোষ্ঠী এশিয়া-মাইনর থেকে গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে গেলো, তারা সংখ্যায় 'অজস্র' ছিল না। আদিবাসীদের সঙ্গে তারা মিশেছে, মিশতে হয়েছে, বিবাহ করেছে, বিবাদ করেছে। যেমন হয়েছে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রেড ইন্ডিয়ানদের। তিনি ক্লাশের একটি আধুনিকা রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠিসম্ভূতা সুন্দরী মহিলাকে (এখন খাঁটি আমেরিকান) অঙ্গুলি সংকেত করে দেখিয়ে বললেন, কি ম্যাডাম—আপনি কোন কালচারে বিশ্বাসী? মহিলা ত্বরিৎ জবাব দিলেন. "বোথ—বাট ইন এ রিফাইনড ওয়ে" অর্থাৎ উভয়ই, তবে আধুনিক সভ্যতাকে স্বীকার করে। থম্পসন বললেন, ভারতীয় মহাকাব্যেও তেমনি প্রাচীন আদিবাসীদের সংস্কৃতি আছে—"বাট ইন এ রিফাইন্ড ওয়ে।" ভীমের দুঃশাসনের বক্ষরক্তপানের ব্যাপারটা আসলে 'ক্যানিবালিজম' বা নররক্ত পানের কোন প্রাচীন বিশ্বাসের জের। প্রাকৃতিক আবহাওয়া, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, সহজলভ্য জীবনপথ—মানুষকে একটু কবি ক'রেছে। ভক্ত সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর মহাকাব্যের নায়ক—কি আইরিস কুহুলীন, কি রাশিয়ান ইলিয়া মুরোমেট, কি যেউল্‌ফের হুনগার কি সাহরাব ও রুস্তম আর কি লক্ষ্মণ আর অর্জুন—সবই সেই প্রাচীন শিভালরীর ধারা। আর যেখানে শিভ্যালরী—সেখানেই ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল, অসাধ্য সাধন। জন্মটাও মানে বীরের জন্মটাও এক ইন্দ্রজালিক ব্যাপার—ম্যাজিক্যাল বার্থ মটিফ।

ক্লাশ জমে উঠলো।

বুদ্ধদেববাবুকে দেখি ক্লাশের অবসরে কাগজের গ্লাসে কোকাকোলা খাচ্ছেন আর তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জাজিম বিছানো লবীতে কথা বলছেন। এরপর দেখা হয়েছে লাইব্রেরীতে। বই নিচ্ছেন—বই পড়ছেন। দেখা হয়েছে পথে ঘাটে, গ্রোসারী দোকানে — মুরগী-মাংস তরিতরকারী কিনছেন। কখনো একা—কখনো কখনো স্ত্রী প্রতিভা বসুর সঙ্গে। কখনো সঙ্গে তার ছেলে শুদ্ধশীল বসু, ওরফে পাপ্পা। পাপ্পা। তখন পড়ছে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে—প্রিগ্রাজুয়েশন বা প্রাক ডিগ্রী পর্যায়ে। দেখা হয়েছে, বিভিন্ন সেমিনারে, ইন্টারন্যাশনাল হাউসে অথবা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মিলন সম্মেলনীতে। আমার যেন মনে হয়েছে—'যস্মিন দেশে যদাচার'—অর্থাৎ বিদেশে গিয়ে তাঁর সেই লাজনম্র ব্যক্তিগত গণ্ডী যেন একটু প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি খুশি। বেশ কাটছে কিন্তু দিনগুলি। একটি ঘটনা বলি। প্রথম পর্যায়ে আমি থাকি ব্লুমিংটনের ৩০৭, ইস্ট থার্ড স্ট্রীটে। আর বুদ্ধদেব বাসা নিয়েছেন সাউথ ফেস্ এভিনিউতে। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট। গাড়িতে দুই মিনিট। বাসায় আছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু, ছেলে পাপ্পা। একদিন লাইব্রেরী থেকে বের হচ্ছি। পরিশ্রান্ত। বললেন, চলো—বাসায় কফি খাবে। গেলাম। কীহে তুমি এত মনমরা কেন? হোম সিক? দেশের জন্য মন কেমন? হ্যা—বলো কোন চীজ খাবে? দেশী না বিদেশী? প্যারিসের না আমেরিকার না লণ্ডনের। আমি [illegible] সাথে বললাম, ড্রিংক করি না। [illegible] পালন করছি—মানে তাঁর ক্লাশ বক্তৃতার কথা বললাম। বেশ-বেশ—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রও যদি এমনি বয়সে বিপত্নীক, মানে বিনাপত্নী আসতেন তবে এই ডরোথী, মেরিলীন, ক্যামেলিয়ার সঙ্গে কি স্পিকটি নট—মানে কথাও বলতো না। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কথা বলো—নাচো—হাসো—গাও, নইলে তো মন খারাপ লাগবেই। কবিতা লেখো না কেন তোমাদের বান্ধবীদের নিয়ে?

প্রতিভা বসু বাঙালী কায়দায় খাবারের ডালি সাজিয়ে আনতেন। শুধু ভালো লেখিকা নন ভালো রন্ধন-পটিয়সীও বটে। বলতেন, ওর স্ত্রী আছে, ও কেন মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে যাবে। বুদ্ধদেববাবুর উত্তর, আহা, লেখক তো—কল্পনায় কি আর ভাব করা যায় না। লেখো—লেখো—দেখো সব কিছু। বুদ্ধদেববাবুর সাউথ ফেসের বাসাটি

দেখলাম একটি ছোটখাটো লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে।

এরপরও দেখা হয়েছে। কখনও লাইব্রেরীর সামনে ক্যারিস-এর দোকানে বই দেখছেন। কিনছেন, তন্ময় হয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন। হাতে কফি বা কোকোকোলা। কখনো লাইব্রেরী ভবনের তিনতলার বেসমেণ্ট-এ তার নির্দিষ্ট টেবিলে বই-এর সমুদ্রে নিমজ্জিত। ভাবছেন ভারতীয় মহাকাব্যের কোন সমস্যার সমাধান।

আরও দেখা হয়েছে।

অনেক—অনেকবার......।

এর মধ্যে শরৎ অবকাশের পূর্বে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ বিল্ডিং-এ রাইটার্স ওয়ার্কশপে আবার বুদ্ধদেববাবুর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হল। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই হয় লেখকদের একটি বিশেষ ক্লাশ আছে। যারা লেখক-লেখিকা তারা শখ করে এই কোর্সটি নেন। নিজেদের লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ক্লাশে পড়া হয়. এই উপলক্ষ্যে খ্যাতিমান লেখক-দেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয়—ওয়ার্কশপ অনেক সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও ভাবের আদান প্রদান করে সেখানকার ওয়ার্ক-শপের সঙ্গে। তাদের পত্রিকাও আছে। প্রতিটি লেখারই পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ হ'ত—কি করলে লেখাটি আরও ভালো হতে পারতো, বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিকগণ তা বলতেন। বড় বড় লেখক-গণ তাদের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করতেন। বুদ্ধদেববাবু বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবের উপর বক্তৃতা দেন। থেমে থেমে তার সেই বক্তৃতাভংগী আমার এখনও মনে আছে — ইয়েস ইয়েস-আওয়ার লিটারেচার, আই মীন মডার্ন বেংগলী লিটারেচার, হ্যাজ বীন বর্ন আপ ইন দি স্কুল অব ইংলিশ থট এন্ড সেন্টিমেন্টালিটি।' ইংলিশ বিল্ডিং থেকে লাইব্রেরীতে আসতে বললেন, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এই ধরনের লেখার স্কুল থাকা উচিত। তাহলে তরুণ লেখকদের ভালো লেখা কাকে বলে এবং ভালো লিখতে কি, কেন এবং কিভাবে (হোয়াট, হোয়াই এন্ড হাউ) পড়া দরকার তাও বুঝবে। আমরা ত সব কুনোব্যাঙ হয়েই রইলাম। আমি বললাম, মিসিসিপি অঞ্চলের নিগ্রো-দের জীবন নিয়ে ওখানকার এক লেখক উপন্যাস লিখছেন। তিনি তো ফোর্ড-ফাউন্ডেশনের গ্রাণ্ট নিয়ে আজ তিন মাস ধরে আমাদের ফোকলোর লাইব্রেরীতে মিসিসিপির লোক-সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন। আমাদের দেশে এত তেল কি পুড়বে? রাধা কি নাচবে?

আরও দেখা হয়েছে। অনেক—অনেকবার...... বসে আছি নিজের বাসায়—অ্যাপার্টমেন্টে। বরফ পড়ছে চারিদিকে। হঠাৎ টেলিফোন এলো। পাপ্পা (বুদ্ধদেব বসুর ছেলে) বলছে বাবা আসতে বলছেন। কবিতা নিয়ে আসবেন। নতুন লেখা কবিতা।

নতুন কবিতা ছিল না। পি-এইচ-ডি'র থিসিসের ধাক্কা সামলাতেই জান কাবার। কবিতা লিখবো কখন? বই নিয়ে গেলাম—আমার প্রকাশিত ৫টি কাব্যগ্রন্থ। দেখলাম আসর বসেছে মন্দ নয়। আছে হরি উপাধ্যায়। ভারতীয়, বিহারী বলছেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ চাকরি আর সাহিত্য—দুটো এক সংগে হয় না। চাকরি করলে কি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্র হতেন। পায়ে থাকবেন না। যাঁরা মোজা চাইলে আ নিত্য পরিষ্কার মোজা পরবেন। দেখছো ত বে... ফিরে কিছুক্ষণ ... চাকুরী ছেড়ে দিই মধ্যে মধ্যে। ... করে যদি পারা যেত, তবে আরও ভালো হ'ত।

এলেন ঢাকার জহুরুল হক। বংগবাসী। আছে বাংলা ভাষা অনুরাগী বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী। আরও অনেক বংগবাসী। কবিতা পড়লাম। সেই পুরনো উপদেশ। ছন্দে কবিতা লিখবে। বললেন, লিখেছো অনেক। লিখবে। লিখবে। আমি বললাম, ১৯৪৪-এ

পিতামহ বৃদ্ধ হলে তাকে বুড়োবেলায় এসাইলামে পাঠিয়ে দাও। আর এখানে বেহায়া রাজহংসকে হংসী [illegible] দিয়ে পিতৃসত্য, [illegible] করতে হয়। আর বেহায়া [illegible] পিতৃসত্য নয়, [illegible]

বাইরে বরফ পড়ছে। সাদা সাদা পেঁজাতুলো। সূর্যের আলো পড়ে সে বরফ আরও সাদা দেখায়। স্বপ্ন জগৎ যেন।

—হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ায়
বেহালাখানি
কঙ্কাবতী!
জানালার কাঁচে হানা দেয় তার অন্ধের বাণী,
কঙ্কাবতী!
কোন্ কথা কয়? তুমি কি শুনবে?
শুনবে নাকি?
আধো বিস্ময়, আধো সংশয়ে মেলবে আঁখি?
কঙ্কা, জাগো—

তখনো আঁধার ধারায় বাইরে পড়ছে বরফ—পত্রহীন উইলো গাছের সারি। আর ১৯৬৪-র সেই—ব্লুমিংটন।

এরপর আবার সুরঙ্গমা। অন রোধক্রমে।

'ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে সুরঙ্গমা—'

মহৎ কবিতা—তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন—আবেদন সর্বত্র—সর্বকালগামী। এ কবিতা সেই দূর বিদেশ থেকে টেনে নিয়ে গেল সেই সুদূর বাংলায়—যেখানে চোখের জলের মত নদী—সবুজ গালিচার মত মাঠ—আর উতল-বিতল-নিতল-শীতল সন্ধ্যায় বর্ষার ফলার মত ফুটে ওঠে এক গন্ধে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া।

আর হাওয়া বয়—উতল হাওয়া।

রাতে টেলিফোন করে জানালাম, আপনার কবিতা বড় 'হোমসিক' করে তুলেছে। পড়াশোনা বন্ধ।

বাইরে বরফ পড়ছে—বেশ তো পড়ো না কবিতাই। লেখো।

বুদ্ধদেব বসুকে একজন বক্তা, মার্জিত অথচ যাকে ইংরেজীতে বলে 'স্কলারলি ওরেটর' হিসাবে দেখেছি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সেমিনারে। এমনিতে লাজুক হলেও বক্তৃতামঞ্চে তাঁকে আমার মনে হয়েছে খাপখোলা তলোয়ার—ধারালো। এইসব সেমিনারে ভারতীয় মহাকাব্যের সমস্যা, আধুনিক বাংলা কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন। তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর তুলনামূলক মন্তব্য—যাকে বলে 'লাইভলী এবং শার্প।' অতঃপর দেখলুম মে-ফ্লাওয়ার হোটেলে। ওয়াশিংটন ডি সি-র 'বার্ষিক এশিয়ান ফোকলোর কনফারেন্স'—জুন, ৩।৪।১৯৬৪-তে। বিশ্বের বহু বরেণ্য লোকবিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন এই কনফারেন্সে। বাংলার লোকসাহিত্য গবেষণার অগ্রগতির উপর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম আমি (পরে এশিয়ান ফোকলোর পত্রিকা, ১৯৬৪-তে প্রকাশিত)। সভাপতি ডঃ রিচার্ড এম ডরসন। বক্তা ছিলেন বিখ্যাত বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী। ছিলেন এস্টেইন ফার্কল্যান্ড এবং ভারত থেকে বুদ্ধদেব বসু। আমার প্রবন্ধে ছিল ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অর্থাৎ সার্ভে। বুদ্ধদেববাবু লোকবিজ্ঞানী নন। কিন্তু বললেন:

আমেরিকা এসে আমার একটি লাভ—ডকটর ডরসনের সঙ্গে আলাপ। লোক-সংস্কৃতি যে কিভাবে আধুনিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে তার ইতিহাস আমাদের দেশে এখনো লিখিত হয় নি। আমার নিজের রচনাতেও জ্ঞাতসারে—অজ্ঞাতসারে আমি লোক-সংস্কৃতির 'মটিফ' নিয়েছি—নিয়েছেন শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। একজন কবি গাল্পিক এবং ঔপন্যাসিকের এই লোক-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সাহিত্য রচনার সুবিধা হয় বইকি। নিশ্চয়ই হয়। আমি আশা করি এই প্রবন্ধের লেখক আমাদের কাব্য-উপন্যাসে এই মটিফগুলি কিভাবে এসেছে ভবিষ্যতে একটি সমীক্ষা বা সার্ভে করবেন।

এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন দূতাবাস থেকে (ওয়াশিংটন) ডক্টর সুরত আলী খান—এডুকেশনাল এটাচী—বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ও ঢাকায় অবস্থানরত। তিনিও চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাংলার লোকজীবনের উপর। বাজানো হয়েছিল বাংলাদেশের লোক-সংগীতের উপর টেপ—রানিং কমেন্টারী সহ। তন্ময় হয়ে শুনলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর পূর্ববাংলার গান। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে-সাহিত্যে গল্পে-উপন্যাসে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, যেখানে কেটেছে জীবনের দীর্ঘ অবসরগুলি, কি নেই?

বাংলাদেশেরই বিচিত্র জীবন আর মানুষ তার সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা আর আত্মভাবনা—এই কি আমরা দেখিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস সাড়া (১৯৩০), আমার বন্ধু (১৯৩৩), সূর্যমুখী (১৯৩৪), লাল-মেঘ (১৯৩৪), ঘরেতে ভ্রমর এলো (১৯৩৫), কালোহাওয়া (১৯৪২) প্রভৃতিতে? এর মধ্যে ভোজনবিলাসী যে-সব নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তারা কি নোয়াখালী, কুমিল্লা অথবা ঢাকা এবং পরবর্তী সময়ে শহর কলকাতায় তাঁর অভিজ্ঞতা আর পরিচিতির আলোকে পরিবর্ধিত হয়নি?

বুদ্ধদেববাবু এর পর বাসা নিলেন ব্লুমিংটনের হেসিয়ার কোর্টের কাছে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপার্টমেন্টে। একদিন খবর দিলেন কলকাতা থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা এসেছে—বিশেষ করে শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যাগুলি। পড়তে চাইলে আনতে পারি। তেমনি একদিন সন্ধ্যায়—সঙ্গে বিহারের রবি উপাধ্যায় (এখন জর্জিয়ার অধ্যাপক), কলকাতার মুকুল বানার্জি, ঢাকার জহুরুল হক, তাঁর স্ত্রী মনিরা ও অধ্যাপিকা মাহমুদা খাতুন (এখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপিকা)। দেখলুম আমেরিকায় কেনা ঢোলা পাজামা আর সার্ট পরে তিনি বসে আছেন বারান্দায়। চোখ দুইটি দূরে নাসিকাগ্রে লোকের দিকে প্রসারিত। ডানে টিপয়ের উপর অনেকগুলি বই—অধিকাংশই বিদেশী কাব্যগ্রন্থ বা তার ইংরেজী অনুবাদ। বললেন, ঢাকার কথা। পূর্বেও বহুবার বলেছেন। বহুবার। সেই পুরানা পল্টন, সেই টিনের বাড়ি, বৃষ্টি নামতো—অপূর্ব সেতার বাজতো টিনের চালে। আর রমনার ঐ ময়দান। বড্ড মনে পড়ে। বড্ড মনে পড়ে। শুনেছি তাঁর বিবাহের গল্প। ঢাকার মেয়ে রানু সোমের সঙ্গে কিভাবে বিয়ে হল। কবি নজরুল ইসলামের ঢাকায় অবস্থানের গল্প।

—আসুন না একবার।

—যাবো—যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। আমি না গেলেও আমার আত্মা যাবে। ঢাকাকে কি তিনি ভুলতে পারেন?

এসেছিলেন কি বুদ্ধদেববাবু ঢাকায়? হাঁ—সেই ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চের পর একদিন। তাঁর আত্মা এসেছিল। দেখে গিয়েছিলেন বিধ্বস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নিজের কথাতেই বলি:

কদিন থেকে জোর হাওয়া দক্ষিণ থেকে,
বাইরে ঝড়খসলো আর শুকনো
পাতা, টেবিলের কাগজপত্র দুখান—জোর
হাওয়া, যেমন বইতো মস্ত ফাঁকা
মাঠ পেরিয়ে পুরানা পল্টনে চৈত্র মাসের
সবুজ কোন সকাল বেলায়।
সবুজ হয়ে ছড়িয়ে আছে রমনা। আমার
উনিশ বছর বয়সের মত সবুজ।
শান্ত নির্জন রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে
চলেছি, আমার ডাইনে-বাঁয়ে [illegible]
আর ছবির মত একটি দুটি বাড়ী
চুপচাপ—

০ ০ ০

আর আজ শুনছি, বিধ্বস্ত সেই
বিদ্যাপীঠ।—

০ ০ ০

—কিন্তু আমি কি দিতে পারি বলো,
কোন্ উপহার পাঠাতে পারি তোমাদের
জন্যে?—

০ ০ ০

উপহার? কেন, রইলো তাঁর সাহিত্য, রইলো কাব্য। আর পুরানা পল্টনের সেই স্মৃতিমুখর সন্ধ্যাগুলি। যে পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা তাঁকে কবি করেছিল। সাহিত্যের হাতে খড়ি। যেখানে তাঁর সাহিত্যিক আত্মা বিচরণ করবে—শত-সহস্র বৎসর।*

---

* কৃতজ্ঞতা: দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বাচল এবং দেশ (শারদীয়া, ১৩৮০)।

ঘরে বাইরে

পদমর্যাদার জন্য

কথায় বলে 'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা।' পা দুটি আপনার জীবনের মস্ত অবলম্বন। যদি দিনে ১৮০০০টি পদক্ষেপ হয় তবে সত্তর বছর বাঁচলে ১,১২,০০০ কিলোমিটার চলা হয়। তার উপর পদযুগল যে ওজন বহন করে তারও মাত্রা কম নয়। যদি ৭৫ কিলো ওজনের একটি মানুষ ১·৮৫ কিলোমিটার চলে তবে তার পা দুখানার উপর বোঝা হয় ৮০ টন।

যে পদযুগল এ কাজ করে সেটি একটি ক্রিয়াবৈগুণ্যজাত বিস্ময় বললেও হয়। সামান্য ধনুকাকৃতি একটি সেতু যেমন শত শত বোঝা বহন করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনই আপনার অল্প বাঁকা পা দুখানাও অসাধ্য সাধন করে। চেটালোপা বা flat foot হলে এই ধনুকাকারটি থাকে না। বোঝা বহনে কষ্ট হয়। ব্যথা বেদনা ও নানারকম অস্বস্তি হয়। কাজেই পায়ের ধনুকাকৃতি সেতুটি সংরক্ষণে নিত্য যত্ন নেওয়া উচিত।

দৈহিক গঠনতন্ত্র হিসাবে পদযুগলের গঠন বিস্ময়কর ব্যাপার। ২৮টি ছোট ছোট হাড় সমন্বয়ে একটি পায়ের গড়ন। ১১২টি সন্ধিবন্ধনী বা লিগামেনট দিয়ে ছোট অস্থিগুলি বাঁধা। ২০টি মাংসপেশী ভিন্ন অসংখ্য শিরা-উপশিরা ধমনীর জালবোনা আছে পায়ে। এত জটিল কার্যসাধনের বন্দোবস্ত বজায় থাকে বলেই আপনি যথা ইচ্ছা হাঁটাচলা করতে পারেন, পাকে পাক দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারেন, নাচতে পারেন ও দরকার হলে পদাঘাতে বিপক্ষকে বিপন্ন করতে পারেন। প্রতি পদক্ষেপে এই ছোট ছোট অস্থি শরীরের সব ভার বহন করে। সেজন্য বয়স হলে, ওজন বাড়লে পায়ে ব্যথা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যাঁদের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাঁদেরও পায়ে অস্বস্তি হওয়া সম্ভব। সেজনাই দেখবেন জুতো জোড়া খুলে ফেলে বিশ্রাম করবার জন্য সবাই পাগল হয়। শোনা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিক শিবিরে বা হাসপাতালে পেঁৗছে প্রথমেই অনুরোধ করতো জুতোটি খুলে দিতে। জুতো খুললে তার অবসাদ ও ক্লান্তি কিছু কমতো। শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে যেন বেদনা থেকে একটু অব্যাহতি পেত। আমাদের দেশে দ্বারপ্রান্তে পাদুকাটি রেখে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রাচীন প্রথাটি ঠিক এইভাবে পাকে আরাম দিত। গৃহে বাইরের আবর্জনাও আসতে পারতো না। জুতো পরে ঘরে চলাফেরা করার রেওয়াজ আধুনিক জাপানে নেই। বড়জোর নরম দুখানা চটি, যা সহজেই পায়ে গলানো চলে তা পায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলার বিধি আছে।

হাঁটাও একটি জটিল গতিবিশেষ। মাধ্যাকর্ষণ পাদুখানাকে পৃথিবীর কাছে টেনে নিতে চায়। পায়ের পিছনের মাংসপেশী সে আকর্ষণ থেকে পা উঠিয়ে আনতে সাহায্য করে। পাখানা তুললেই শরীরের সব ভার সামনের দিকে চলে আসে। তখন অন্য পা'টি এগিয়ে এসে সে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই গতিরহস্য মাত্র পায়ে নয়, সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। তাই হাঁটা অতি উত্তম ব্যায়াম বিশেষ। পেশীর সঞ্চালন আর দেহের ভারসাম্য রক্ষায় দেয় আপনাকে

বোঝা তুলবার সময় মনে রাখবেন ভারসাম্য রক্ষা করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না। বাজারে যদি বেশী জিনিস কিনতে হয় তবে দুটি থলিতে সমান ভাগ করে নিলে কষ্টও অনেক কম হবে। এমন কি দুর্বল হৃদরোগীও এমন বোঝা নির্ভয়ে তুলতে পারেন। বিদেশে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এক হাতে খুব বড় ভারী বোঝা নিলে, এমন কি পিঠে করে নিলেও ক্ষতি হয়। সে ক্ষতি হয় না বোঝা ভাগ করে দু হাতে নিলে। ধরুন ২০ কিলো ওজন বইতে হবে। তখন ১০ কিলো করে ভাগ করে নেবেন। তাতে হৃৎপিন্ড স্বচ্ছন্দগতি থাকবে ও রক্তের চাপ বাড়বে না।

স্বাভাবিক মাধুর্য এবং সৌষ্ঠব—যাকে ইংরাজীতে বলে grace। যদি সেই স্বাভাবিক সৌষ্ঠবের অধিকারিণী হতে চান তবে পদযুগলের সাহায্য নিতেই হবে।

তাই বলছি, চরণ দুখানা পায়ে ঠেলবেন না। আদরে রাখুন। রাত্রে শোবার আগে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখবেন। টুল, মোড়া বা জলচৌকিতে বসে বড় পাত্রে রাখা উষ্ণ জলে দশ মিনিট পা ডুবিয়ে রাখবেন। আস্তে আস্তে জলের তাপ বাড়াবেন। আপনার পা দুটি গরম জলে লাল হয়ে উঠবে। তখন চট করে ঠান্ডা জলে পা দেবেন। গরম ও ঠান্ডা পর পর মিনিট কুড়ি লাগান—আপনার রক্ত সঞ্চালন ভাল হবে। ভাল ঘাম হবে, বিশ্রাম সম্পূর্ণ হবে। এবার পা দুটি খুব শুকনো করে মুছবেন। তারপর তেলাক্ত মালিশ করে নিলে পায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে, স্বচ্ছন্দগতি হবেন।

তবে যত্ন করে পা মুছবেন। ভিজে পায়ে থাকলে চর্মরোগ হতে পারে। দিনেও ভিজে পায়ে থাকবেন না। যাঁরা মোজা পরেন তাঁরা নিত্য পরিষ্কার মোজা পরবেন।

দিনান্তে ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ জুতো খুলে পা দুটি উঁচু করে শুয়ে থাকবেন। যেমন তেমনভাবে নখ কাটবেন না। অনেকে ব্লেড ইত্যাদি যা হাতের কাছে পান তাই ব্যবহার করেন। নানাভাবে বিপজ্জনক ব্যাপার হতে পারে। পায়ের নখ সোজা করে কাটবেন। বেশী ভিতরে ঢুকিয়ে কোণা কাটলে কুণি অর্থাৎ নখের কোণে প্রদাহ বা ভিতরে প্রবিষ্ট নখ যাকে ingrown toe nails বলে তা' হতে পারে। কুণি কষ্টকর তো বটেই, তার উপর বিষাক্ত হবার সর্বদা যথেষ্ট ভয় থাকে।

মেদবাহুল্য অনেক ক্ষেত্রে গায়ের স্বচ্ছন্দতা ও সৌন্দর্য নষ্ট করে। কাজেই মেদবাহুল্য যাতে না হয়ে সেদিকে যত্ন নেবেন। মোটামুটি এভাবে আপনি পা দুটির সেবা করে যাবেন। তাতে আপনার 'পদমর্যাদা' অক্ষুণ্ণ থাকবে! তার উপর যাঁরা আরও বাহার চান বা রঞ্জনী ইত্যাদি ব্যবহার করতে চান সেটা হবে উপরন্তু।

টুকিটাকি

জুতো কিনবার সময় আপনার পায়ের মাপ ভাল করে নিতে বলবেন। দোকানের বিক্রয়কারী কর্মচারী অর্থাৎ সেলস্ম্যান বসা এবং দাঁড়ানো দুই অবস্থায় পায়ের মাপ নিলে জুতোর মাপ ঠিক করা সহজ হয়।

জুতোর তলামাত্র দেখে কিনবেন না। উপরের দিক নরম ও আরামপ্রদ হওয়াও দরকার। আঙুলের দিকে চওড়া এবং গোড়ালির দিকে সরু জুতো আরামপ্রদ হয়।

দেখবেন জুতো যেন বেশ আরামে পায়ে লাগে। সামনের দিকে আঙুল ছড়িয়ে দেবার যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার।

যে মেয়েরা উঁচু হিলতোলা জুতো পরেন তাঁদের বিভিন্ন উচ্চতার হিলওয়ালা জুতো একাধিক থাকা উচিত। পরবার

সময় বদলে বদলে পরবেন। যদি তা করেন তবে আপনার পায়ের গড়ন নমনীয় থাকবে ও আপনি হিল উঁচু বা একেবারে নিচু হিল যেরকম জুতোই যখন ইচ্ছা পরতে পারবেন।

[illegible] পরিচ্ছন্ন [illegible] চেয়ে জুতো কেনা বেশী কঠিন কাজ। কাজেই বিশেষ দোকানের বিশেষ জুতো যদি খুব আরামদায়ক হয় তবে কিনবার সময় সেই বিশেষটির কথা মনে রাখবেন।

জুতোর সহজ নমনীয়তা পরীক্ষা করতে হ'লে জুতোটি অর্ধ বৃত্তাকারে বাঁকিয়ে দেখুন। জুতোর তলার দিকটি যতটা বেঁকে যাবে উপর ততটা নয়। তবেই সে জুতো স্বচ্ছন্দতা দেবে।

নানারকম পায়ের অসুবিধা, পায়ের কড়া ইত্যাদি বেশীরভাগের জুতোর দোষে হয়। আমাদের দেশের চপ্পল বা চটি গোড়ালির পিছন দিক খোলা থাকে বলে পায়ের চাপাচাপি হয় না ও স্বচ্ছন্দ চলনে বিশেষ সহজ ও আরামের। বন্ধ জুতো পরতে হ'লেই বেশী সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

শ্রীমতী

॥ একাত্তর ॥

মিল ফ্যাক্টরির কোয়ার্টারের অনেক শ্বেতাঙ্গিনী রমণীরাই ধূমপান করেন, ত্রিদিবেশের কাছে তা কোনো বিস্ময়ের বিষয় না। দেশীয় রমণীরাও অনেকে ধূমপান করে। চটকলের শ্রমিক রমণীগণ বা মাঠে ঘাটে কাজ করে বা মিউনিসিপ্যালিটির নানা রকমের শ্রমিক নারীরা। ধূমপান করে না কেবল বাঙালী ভদ্রলোকদের বাড়ির মেয়েরা। তাদের ধূমপান করতে দেখলে নিশ্চয় অবাক হতে হতো। এমন কি সর্দার মেহের আলীর তিনসির জোয়ানী বিবিও ভুড়ুক ভুড়ুক গড়-গড়া টানে, ত্রিদিবেশের নিজের চোখেই দেখা। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোকের 'মেয়েছেলেদের' কাছে ওটা মহাপাপ! নিয়মগুলো কেমন অদ্ভুত! ত্রিদিবেশের মনে হয় এবং আপাতত মিসেস ক্যাকাম্বারের আচরণে ওর অবাক লাগে, তাঁকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিতে দেখে। তিনি এমন অনায়াসে আর সহজ কথায় ধূমপানের কথা জিজ্ঞেস করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ত্রিদিবেশকে সিগারেট নিতেই অনুরোধ করেন বা আর কোনো শ্বেতাঙ্গিনী মেমসাহেবের কাছে আশা করা যায় না কারণ অনেক ধূমপায়ী শ্বেতাঙ্গিনী-দের কেউ কখনো ওকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়নি। ক্ষুধার্তের সমুখে ভোজ্যবস্তু যেমন তার মুখে অমৃতের সঞ্চার করে, এই মুহূর্তে মিসেস ক্যাকাম্বারের কথা শুনে সিগারেটের প্যাকেট দেখে ত্রিদিবেশের ধূম-পায়ী মুখ জলে ভিজে ওঠে। তথাপি, তৎক্ষণাৎ ও সিগারেটের প্যাকেট হাতে নেয় না, ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিকের মতো অবাস্তব, কারণ ওর সামনেই মেমসাহেবরা ওকে বলে, 'নেটিভ আর্টিস্ট বয়।' ও লজ্জায় সংকোচে এবং কিছু ত্রাসে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে হাসে, স্তিমিত স্বরে উচ্চারণ করে 'হ্যাঁ আমি ধূমপান করি।'

মিসেস ক্যাকাম্বার যেন অবাক খুশিতে হাসেন—তাঁর দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা না, সিগারেটের ধোঁয়া-জল দাগ কটকে ক'রেছে, তথাপি তাঁর হাসিটি সুন্দর লাগে, কারণ অতি সহজ আর অনায়াস এবং সরল, 'খুবই স্বাভাবিক, তুমি সিগারেট নাও না কেন?' বলে তিনি সিগারেটের প্যাকেট খুলে বাঁ হাতে একটি সিগারেট বের করে এগিয়ে ধরেন।

নতুন অভিজ্ঞতা ত্রিদিবেশের জীবনে, চটকলের মেমসাহেব তাঁর প্রাসাদের রাজকীয় ঘরে বসে ওকে সিগারেট দেন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে নতুন, মিসেস ক্যাকাম্বারও যিনি অনায়াসে এবং গ্রাসাচ্ছন্ন স্বরে বলেন, 'ভাবতে পারো ছ' বছরে চারটি সন্তান!' এবং গভীর দুঃখে ব্যক্ত করেন, সে বিষয়ে তাঁর স্বামী কোনো কথাই শুনতে চান না। কেন এই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম মিসেস ক্যাকামবার? ত্রিদিবেশের অভিজ্ঞতায় এই সব চটকলের য়ুরোপীয় সমাজেরই একটা বিরাট ব্যতিক্রম এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। তাঁর প্রসারিত হাত থেকে সিগারেটটা নেবার আগে ত্রিদিবেশ ডান দিকে খোলা দরজার পর্দার দিকে তাকায়। ওদিকে বারান্দা, বেয়ারা বাবুর্চিরা চলাফেরা করে এবং ও জানে, লোকগুলো এক ধরনের সাক্ষাৎ শয়তানের অনুচর। এই ধূমপানের অপরাধে ওরা হয়তো ত্রিদিবেশের গায়ে পানের পিক থু-থু করে ছিটিয়ে দেবে, মিসেস ক্যাকাম্বার জানতেও পারবেন না, অথবা ক্যাকাম্বার দম্পতীর মধ্যে যদি কোনো গোলযোগ থাকে তার সুযোগ নিয়ে তিলকে তাল সদৃশ মিথ্যা কথা সাহেবের কানে তুলে দিতে পারে, যার পরিণাম সর্বদিক থেকেই নিঃসন্দেহেই খারাপ। চটকলের সাহেবদের পারিবারিক ক্ষেত্রে বেয়ারা-বাবুর্চিদের ভূমিকা অবহেলা করার মতো মোটেই না, যদিচ বাইরের চেহারা দেখে তা বোঝা যায় না, কিন্তু ত্রিদিবেশ কিছু জানে এবং শোনাও আছে অনেক ঘটনা। তথাপি সে মিসেস ক্যাকাম্বারের হাত থেকে সিগারেট নেয়, কারণ তাঁর আচরণ ওর মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার করে এবং সিগারেট না নেওয়াটা ওর কাছে এক রকমের অন্যায় ও কাপুরুষতা বোধ হয়, যদিচ সিগারেট নিয়ে ধন্যবাদ জানায় না, এ সব আদব সহবত ওর জানা নেই। মিসেস ক্যাকাম্বার হাসেন, দেশ-লাইটা তুলে ওর দিকে এগিয়ে দেন। ও সিগারেট ধরায় এবং গভীর তৃপ্তিতে [illegible] ধোঁয়া ভিতরে টেনে উদ্গীরণ করে।

'[illegible]' একটা [illegible] শব্দ [illegible] ডাক শোনা যায়।

মিসেস ক্যাকাম্বারের সঙ্গেই ত্রিদিবেশও পাশের ঘরে যাবার দরজার ওপরে পর্দার দিকে তাকায়। পর্দার ফাঁকে টুকটুকে একটি মুখ উঁকি দিয়েই আড়ালে চলে যায়। মিসেস ক্যাকাম্বার ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠেন, হাসি তাঁর গোমেধবর্ণ চোখের তারায় ঝিলিক দেয় এবং দীর্ঘ শরীরে, তাঁর বুকে ছড়িয়ে পড়ে, বলেন 'আমার ছেলে।'

ত্রিদিবেশ তা জানে। একটু আগেই সে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে এ ঘরে এসেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে না কার নাম ধরে সে ডাকে। মিসেস ক্যাকাম্বার পর্দার দিকে একবার দেখে আবার বলেন, 'ও ওখানেই আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে। ওর নিশ্চয় খুব ইচ্ছা এখানে এসে তোমার আঁকা দেখবে। কিন্তু আমার ছেলেটি ভারি লাজুক।' বলতে বলতে তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে পর্দার দিকে দেখেন।

ত্রিদিবেশ মিসেস ক্যাকাম্বারের আকাশী চোখের গোমেধ তারায় স্নেহের ঝিলিক খেলা দেখতে পায় এবং একটু দ্বিধা করে বলে, 'আপনার ছেলে বোধ হয় কারোকে ডাকছিল।'

'ওহ্, ও তো আমার নাম ধরেই ডাকছিল।' হাসির ঝলকে মিসেস ক্যাকাম্-বারের মুখে রক্তের ছটা লাগে, বলেন, 'ওর বাবা ফিলিপ আমাকে যে-নামে ডাকে, ও সেই নামেই ডাকে।'

ডরোথি, মিসেস ক্যাকাম্‌বারের নাম, এবং তাঁর ছেলের নাম ধরে ডাকার কথা শুনে ত্রিদিবেশের ভাল লাগে আর ঝটিতি ওর মনে একটা জিজ্ঞাসা ঝিলিক হেনে যায়, ওর ছেলেও কি তার মাকে ফ্ল্যা[illegible] বলে ডাকবে? শিউলিকে ও ফুলি বলে ডাকে।

'তুমি মিলের কোন্ বিভাগে কাজ করো? আমার স্বামীর বিভাগে?' ডরোথি জিজ্ঞেস করেন, 'ও বলছিল, তুমি এই মিলেই কাজ করো।'

ত্রিদিবেশ অকারণেই হঠাৎ একটু বিব্রত হয়ে পড়ে এবং সেই মুহূর্তেই সিগারেটের ধোঁয়া ভিতরে টানতে গিয়ে ওর বিষম লেগে কাশির বেগ ছিটকে আসে। হাতের পিঠ দিয়ে মুখ চেপে ধরে। মিসেস ক্যাকাম্‌বার বলে ওঠেন, 'দুঃখিত।'

ত্রিদিবেশ চকিতে একবার তাঁর দিকে তাকায় এবং তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনে ও যেন আরো লজ্জা পেয়ে যায়। ওর কাশির বেগ প্রশমিত হলে ডরোথি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি নতুন ধূমপান করতে শিখছ?'

'না না।' ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মোটেই না, আমি অনেকদিন আগে থেকেই ধূমপান করি। আমার চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই।'

ডরোথি হেসে ওঠেন, বলেন, 'তাই বুঝি? আমিও তোমার মতো বয়সেই মাঝে মাঝে ধূমপান করতাম, কিন্তু নিয়মিত না। এখন আমার নিয়মিত তিরিশ চল্লিশটা সিগারেট লাগে।'

তিরিশ চল্লিশটা সিগারেট! রোজ এক-জন মহিলার! ত্রিদিবেশের অভিজ্ঞতার বাইরে, ও অবাক চোখে তাকিয়ে হাসে এবং বলে, 'আমি পনেরো থেকে কুড়িটা ধূমপান করি।'

'ছেলেমানুষ!' ঠাট্টার ভঙ্গিতে ডরোথি বলেন, এবং তাঁর গোমেধ চোখের তারা ঘুরে যায়, জিজ্ঞেস করেন, 'কতো বয়স তোমার?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'উনিশ।' এবং মনে মনে একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ভাবে, সময় চলে যায়, কখন আঁকা হবে?

'তুমি আমার থেকে অনেক ছোট, আমার এখন তিরিশ।' ডরোথি রীতিমতো অলস আলাপের ভঙ্গিতে বলেন, যেন ছবি আঁকার কথা তাঁর মনে নেই, কিংবা ও বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র চিন্তা নেই এবং তাঁর পরবর্তী জিজ্ঞাসায় তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?'

ত্রিদিবেশ আবার অকারণেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে, সঙ্কুচিত হেসে বলে, 'হ্যাঁ।'

'অবাক কাণ্ড!' ডরোথি খুশির স্বরে বললেন, 'তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব ছেলেমানুষ?'

ত্রিদিবেশ এবার জবাব দিতে যেন রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করে। ডরোথি আবার বলেন, 'আমি শুনেছি, তোমাদের মেয়েদের চার পাঁচ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়।'

ত্রিদিবেশ হেসে বলে, 'গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সে রকম হয়। আমার স্ত্রী আমার থেকে দু'এক বছরের ছোট।'

'বাস্তবিক!' ডরোথি তাঁর আকাশী চোখের ফাঁদ দীপ্ত করে বলেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পড়তেই কপালে তাঁর ভ্রূকুটি রেখা ফোটে, প্রায় শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি বাবা হয়েছ?'

ত্রিদিবেশের অস্বস্তি একটা সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়ে, প্রায় অপরাধীর মতোই ও মিসেস ক্যাকামবারের চোখের দিকে একবার তাকায় এবং চোখের পাতা নামিয়ে হাসে।

'ওহ্ ঈশ্বর! ক'টি সন্তান তোমার?' তাঁর স্বরে আতঙ্ক।

ত্রিদিবেশ আশঙ্কা করে, মিসেস ক্যাকামবার হয়তো বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ সব মহিলাদের প্রতিক্রিয়া ও আচরণসমূহ ও এখনো সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না, তবু প্রায় ভয়ে ভয়েই বলে, একটি, ছ' মাসের একটি ছেলে।'

ডরোথি হঠাৎ কী বলে ওঠেন, ত্রিদিবেশ অনুধাবন করতে পারে না। সব সময়েই ওকে ইংরেজি কথা খুব সাবধানে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয়, অন্যথায় বুঝতে পারে না, অতএব জবাব দেওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে, যদিচ, ও জানে ওর ইংরেজি কথাবার্তা ভুলে ভরা, অধিকাংশ সময় জবাব দেবার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পায় না এবং বোকার মতো বারে বারে একটি কথা বলতে হয়, বেগ য়োর পার্ডন?' এই সব মুহূর্ত-গুলোতে মোহনের কথা ওর বিশেষভাবে মনে হয় এবং এখনো ওকে সেই ইংরেজি কথাটি বলেই জিজ্ঞাসু চোখে উৎকর্ণ হতে হল।

ডরোথি তাঁর সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আর একটি সিগারেট ধরান এবং চোখ বুজে ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন, তাঁর স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া উদ্‌গীরিত হয়। তিনি যেন বিশেষ অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু ক্রোধের বা বিরক্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখে নেই। চোখ খুলে বললেন, 'আমি বলছি। বালক, এ সব লক্ষণ খুব খারাপ। এ হচ্ছে এক ধরনের শুরু, বুঝতে পারছো? একবার শুরু হলে তুমি আর থামাতে পারবে না, তুমি কেবল বাবাই হতে থাকবে। কী ভীষণ ব্যাপার! তুমি এখন থেকে বাবা হতে থাকলে চল্লিশ

ডরোথির উদ্দীপ্ত গোমেধ চোখের তারার দিকে তাকিয়ে ত্রিদিবেশ বিভ্রান্ত বোধ করে। চল্লিশ বৎসর বয়সে ওর কী হবে, ও নিজেও অনুমান করতে পারে না এবং ডরোথির প্রশ্নের মর্মও সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না, অবোধ বিভ্রান্তিতে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'কেন?' ডরোথি অবাক শঙ্কিত স্বরে বলেন, 'কেন আবার? চল্লিশ বছর বয়সে তুমি কম করে ডজন সন্তানের বাবা হবে! ওহ্ ঈশ্বর!'

ডরোথির ওহ্ 'গুড্‌গাড্!' শব্দ যেন ত্রিদিবেশের বুকে সজোরে আঘাত করে, তাকে অতি অসহায় দেখায় এবং বারোটি ছেলেমেয়ের চিন্তা ওকেও ভয়চকিত করে তোলে, বলে ওঠে, 'না না, তা হবে কেন?'

'কেন হবে না?' ডরোথি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকান, বলেন, 'যেমন করে একটি হয়েছে, তেমনি করেই হবে।'

ত্রিদিবেশের লজ্জা সঙ্কোচ বা দ্বিধা এই মুহূর্তে অপসারিত, বলে, 'না না। এটা হঠাৎ হয়ে গেছে।'

'হঠাৎ?' মিসেস ক্যাকামবারের স্বাভাবিক রক্তাভ ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়, সিগারেটের ধোঁয়ায় হলুদ ছোপ লাগা জিভ দেখা যায় এবং ওপরের পাটির কয়েকটি দাঁত। তাঁর উদ্দীপ্ত চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ—মানে, হঠাৎ, বুঝতে পারি নি—মানে, জানতাম না।'

ত্রিদিবেশের কথা শেষ হবার আগেই ডরোথি তাঁর দীর্ঘ শরীরে হিল্লোল তুলে প্রায় বালিকার মতো খিলখিল শব্দে হেসে ওঠেন, কাত হয়ে এলিয়ে পড়েন তাঁর সোফায়। ডানদিকের ঘাড়ের পাশে তাঁর জামার কলারের কাছে সোনালি ফিল্লান লুটিয়ে পড়ে, আবার বলে ওঠেন, 'ওহ্ ঈশ্বর, এটা কী একটা ছেলে!' বলতে বলতেই তৎক্ষণাৎ আবার সোজা হয়ে চীনে মাটির ছাইদানিটা হাতে নিয়ে ত্রিদিবেশের দিকে ঝুঁকে পড়েন, বলেন, 'সিগারেটের শেষ টুকরোটা ফ্যালো, হাত পুড়ে যাবে।'

এবং তৎক্ষণাৎ যেন ত্রিদিবেশের চেতনা চকিত হয়, অনুভব করে জ্বলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ। তাড়াতাড়ি সেটা ছাইদানিতে ফেলে দেয় এবং ডরোথির বুক খোলা কোটের মতো জামার ফাঁকে দৃষ্টি যায়, যেখানে তাঁর বিশাল বক্ষান্তরের সঙ্গম দৃষ্ট হয়। ঝটিতি সংকোচে চোখ সরিয়ে ও আবার বলে, 'মানে, জানতাম, কিন্তু ঘটে গেল।'

ডরোথির হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ডান হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে তাঁর সিগারেট, বাঁ হাতের ছাইদানি হাতেই থেকে যায় এবং হাসির প্রাবল্যে তাঁর মুখ

হাসির তরঙ্গ তাঁর সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হয়। তিনি আবার সেইভাবেই উচ্চারণ করেন, 'ওহ্ গ্ গাড!'

ত্রিদিবেশ নিজেও জানে না, ওর মুখে বিভ্রান্ত হাসি, যা অতি হাস্যকর, কারণ ডরোথির হাসির প্লাবনে ওকে অসহায় আর অবুঝ বোকার মতো দেখায়। ডরোথি হাসি সংবরণের চেষ্টা করেন, তাঁর আকাশী চোখে রক্তের ছটা, গোমেধবর্ণ তারায় নিবিড়তর। জিজ্ঞাসা করেন, 'এবং তারপর?'

ত্রিদিবেশের আগের লজ্জা ও সংকোচ আবার ফিরে আসে, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারে না।

'বলো আমাকে, আমাকে শুনতে দাও।' ডরোথির স্বরে প্রায় ব্যগ্র অনুরোধের সুর।

ত্রিদিবেশ আস্তে আস্তে বলে, 'মানে, লুকিয়ে ঘটেছিল বিয়ের আগে।'

'বিয়ের আগে?' ডরোথির চোখের তারা আবার উদ্দীপ্ত হয়, 'বিয়ের আগে তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মিশতে? ভালবাসার বিয়ে?'

ত্রিদিবেশ লজ্জিত হেসে মাথা ঝাঁকায়। ডরোথি বলেন, 'চমৎকার!'

ত্রিদিবেশ ডরোথির চোখের দিকে তাকায়, তাঁকে সহজ মনে হয়। ও বলে, 'আমার স্ত্রী ওষুধ খেয়েছিল, আমিও ও[ষুধ] দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু হয় নি।'

'কেন?' ডরোথি ভ্রুকুটি অবাক চো[খে] তাকিয়ে বলেন, 'গর্ভপাতের জন্য?'

ত্রিদিবেশ ঘাড় ঝাঁকায়। ডরোথি ঘাড় নড়েন, বলেন, 'সেটা ঠিক না, বিপদ ঘটতে পারে। আগের থেকে সাবধান হওয়া ভালো, তা হলে তোমার অনেক সন্তান হবে না। কিন্তু তুমি বললে না তো, তুমি কোন্ বিভাগে কাজ করো? তুমি নিশ্চয় বাবুর কাজ করো?'

বাবু—এ ক্ষেত্রে কেরানী বোঝায়। ত্রিদিবেশ বলে, 'না, আমি বাবু না, আমি মার্কিং ঘরের কাজ করি।'

'মার্কিং ঘর? সেটা কী?' ডরোথি সিগারেটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করেন।

ত্রিদিবেশ বলে, 'বড় বড় গাঁটের গায়ে তুলি আর রঙ দিয়ে নাম্বার লিখি আর চিহ্ন দিই।'

'কতো টাকা বেতন পাও?'

'এখন সপ্তাহে আট টাকা।'

ডরোথি আবার সেই একভাবেই বৃহৎ চক্ষে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'ওহ্ ঈশ্বর!' কিন্তু তাঁর উচ্চারণ শেষ হবার আগেই তিনি সহসা ভ্রুকুটি উৎকর্ণ মুখে ঝটিতি ঘাড় [ফিরিয়ে] ঘরের দরজার দিকে [তাকান।] সিগারেট ছাইদানিতে [রেখে চিৎ]কার করে ওঠেন, 'আমা[র ...]' [...] তিনি সোফা ছেড়ে দ্রুত [...] অদৃশ্য হয়ে যান।

ত্রিদিবেশ শিশুর কান্নার চিৎকার শুনতে পায়। চিৎকার পাশের ঘর থেকে না যেন আরো দূর থেকে ভেসে আসে। মিসেস ফ্র্যাকামবারের শিশু? কয়েক মুহূর্ত পরেই কান্নার শব্দ থেমে যায়। ত্রিদিবেশ এখনো কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে এবং মিসেস ফ্র্যাকামবারের সঙ্গে কথাবার্তায় ধান্তমতা ওকে অবাক করে, মুখ নামিয়ে কাগজের দিকে তাকায়। ডরোথির মুখাবয়বের বাইরের রেখা মাত্র আঁকা, এখনো অনেক বাকী। ও পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়। ডরোথি সামনে এসে দাঁড়ান, তাঁর ভারি ও গভীর বুকে ছ মাসের টুকটুকে একটি শিশু। তিনি ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, 'আমার কনিষ্ঠতম সন্তান—মেয়ে—আমার মধু।'

ত্রিদিবেশ সন্তান ও জননীকে দেখে, একটি নিষিদ্ধ মুগ্ধতা বোধ করে।

ক্রমশ

তাঁর
ত্রিদিবেশের ভাল লাগে আর ঝাঁটি

শ' রোগীর

যায়।

বিশ্ব বিজ্ঞান

কলেরার চিকিৎসায় অভূতপূর্ব পদক্ষেপ

সম্প্রতি কলকাতার কলেরা রিসার্চ সেণ্টার কলেরা চিকিৎসার জন্যে এক ধরনের ওষুধ তৈরি করেছেন। নাম ওরোসল (Orosol)। এ বছর অকটোবর মাসে কুচবিহারের কয়েকটি অঞ্চলে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে ওই সব অঞ্চলের প্রায় ১২৮০ জন কলেরারোগীর ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়। সংবাদ : এই ওষুধ আক্রান্তদের শতকরা পঁচানব্বই জনকেই সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রচলিত অর্থে যাকে স্যালাইন দেয়া বলে, এ ক্ষেত্রে তার আর দরকার হয় নি। এতে খরচও যেমন বেঁচেছে, তুলনায় চিকিৎসকরা অনেক আয়াসে আক্রান্তদের সাহায্য করতে পেরেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ পৃথিবীতে এই প্রথম।

ডঃ সুধীরচন্দ্র পাল মনে করেন ওরোসল শুধু খরচই বাঁচাবে না, ভারতের গ্রামাঞ্চলে কলেরা চিকিৎসার পথ আরও সুগম করে তুলবে

কয়েক দিন আগে কলকাতায় কলেরা রিসার্চ সেণ্টারের ডাইরেকটার ডাঃ সুধীরচন্দ্র পালের সঙ্গে ওরোসলের গুণাগুণ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওরোসলের নাম করতেই ডঃ পাল বললেন, দাঁড়ান, আগে ওষুধটি আপনাকে দেখিয়ে নিই।

বলেই পাশের টানা থেকে তিনি একটি ছোট্ট সবুজ প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটটি পলিথিনের মোড়ক দিয়ে এমন ভাবে মোড়া, যাতে করে তার মধ্যে বাতাস না ঢুকতে পারে।

ডঃ পাল বললেন, দেখুন, ওষুধটির উপাদান কী, প্যাকেটের গায়েই লেখা আছে।

লেখা পড়লাম। সোডিয়াম ক্লোরাইড ৩·৫ গ্রাম। পটাশিয়াম ক্লোরাইড ১·৫ গ্রাম। সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ২·৫ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম গ্লুকোজ। অর্থাৎ প্যাকেটের সমস্ত উপাদানের মোট ওজন মাত্র ২৭·৫ গ্রাম। সমস্তই গুঁড়ো। নিচে লেখা : এক লিটার জলে গুলে নিন।

তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ পাল এবার মূল প্রসঙ্গে এলেন।

বললেন, কলেরার চিকিৎসার সময় প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নজর দিতে হয়। এক, এ রোগের মূলে রয়েছে এক ধরনের জীবাণু। এই জীবাণু পানীয় জল অথবা খোলা খাবারদাবারের মাধ্যমে কারোর শরীরে গিয়ে ঢুকলে এই রোগটি হয়ে থাকে অথবা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আক্রান্ত রোগীর দেহে অ্যাণ্টিবাইওটিক ইঞ্জেকশন করে শরীরের মধ্যেকার সংক্রমিত জীবাণুদের ধ্বংস করা হয়। দুই, কলেরা আক্রান্ত রোগী মুহুর্মুহু ভেদ বমি করে বলে খুব কম সময়ের মধ্যে তার শরীরের সঞ্চিত জল কমে আসতে থাকে। সেই সঙ্গে লবণ এবং ক্ষার।

বলা বাহুল্য, কলেরা রোগের এই শেষোক্ত উপসর্গটি সব চাইতে মারাত্মক। ভেদ বমির সঙ্গে শরীর থেকে দ্রুত জল এবং লবণ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে রোগীর দেহ-কোষ আর্দ্র হতে থাকে। জলের সঙ্গে লবণের বেশ কিছু অংশও বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যথাযথ ভারসাম্য বজায় থাকে না। নানা রকম বিপাকীয় কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। অবশেষে মৃত্যু।

ডঃ পাল বললেন, সত্যি কথা বলতে কী, কলেরার চিকিৎসার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে বড় দিক এবং বড় রকমের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে স্যালাইন দেওয়া। যা তার শরীরের জলীয় অংশ এবং লবণ উভয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। সময় মত এটা না করতে পারলে বেশির ভাগ সময়ই রোগীকে বাঁচান শক্ত হয়।

'অথচ স্যালাইন দেবার অসুবিধেগুলির কথা ভাবুন।' বললেন ডঃ পাল। 'ধরুন কেউ হয়ত কলেরায় আক্রান্ত হলেন।

এইভাবে কলেরা রোগীদের স্যালাইন দেয়া হবে। নানা রকম প্রস্তুতির জন্যে এ ধরনের চিকিৎসায় অনেকটা সময় নষ্ট হয় শুধু ব্যবস্থাপনার জন্যেই। অথচ কলেরার চিকিৎসায় রোগীর কাছে প্রতিটি মুহূর্তের বিলম্ব মানে মৃত্যুর কাছে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। ওরোসল সময়ের এই অপচয়কে রোধ করতে পারবে বলেই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস

বলতে বাধা নেই, আমাদের দেশে বেশির ভাগ সময় কোন রোগের লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যে চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া দরকার, সে কথাটা যেন অনেক সময় মাথায় আসে না। বিশেষ করে গুরুতর ব্যাধির ক্ষেত্রে তো বটেই। কলেরা এদের মধ্যে অন্যতম। রোগের প্রথম দিকে অনেকে যেন ভাবতেই চান না।—কলেরা? না, না। সে কি কথা? এমন রোগ হবে কেন? এ সবের দরুন প্রথম থেকেই খানিকটা বিলম্ব ঘটতে থাকে। অবশেষে স্থানীয় ডাক্তারের যখন সাহায্য নেয়া হয়—তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : তাতে অসুবিধেটা কোথায়?

ডঃ
তাঁর যে
দ্বিতীয়ে

অথচ চিকি... ...নে যার ...
পাওয়া যায় ...
ব্যবস্থাপনা ... রোগ... ...। করা সম্ভব তাংক্ষণিকভাবে তখনই সেগুলি হয়ত তিনি যোগাতে পারেন না। যেমন ধরুন, স্যালাইন দিতে হবে। হ্যাঁ, এটাই এ রোগ চিকিৎসার প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন, এই স্যালাইন দিতে গেলে প্রথমেই দরকার, ভেদ-বমির ফলে রোগীর দেহ থেকে কী পরিমাণ জল বেরিয়ে গেছে সেটা জানা। জানা দরকার কতটা করে জল বেরিয়ে যাচ্ছে এবং কী পরিমাণ জল শরীরে তখনও রয়েছে। এ ছাড়া ঘামের সঙ্গেই বা কতটা জল বের হয়। এসব জানার পর তবেই নির্ধারণ করা সম্ভব, রোগীকে কতটা স্যালাইন দিতে হবে। বিশেষ করে বাচ্চাদের বেলায় এ ব্যাপারে অনেক বেশি নজর দিতে হয়। কারণ তাদের শরীরে বেশি স্যালাইন ঢুকলে তার জল তাদের ফুসফুসকে আক্রান্ত করে মৃত্যুও ঘটাতে পারে। বলতে আপত্তি নেই, এসব কাজের জন্যে

ডঃ পাল : অসুবিধে অনেক। ... বিরাট সময়েরও কলেরা রোগী হ্যান্ডেল করার জন্যে বি... ...ালাইন হয়ত প্রশিক্ষণের দরকার। কিন্তু তেমন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য-...ৎসক সব সময় হাতের কাছে ...কিন্তু ধরুন, তৈরি পাওয়া গেলেও, ... চিকিৎসককেই তখন তা তৈরি করে ...তে হয়।

প্রশ্ন : কাজটা কি খুবই শক্ত?

ডঃ পাল : শক্ত নয়, তবে বড় নিটপিটে কাজ। যেমন ধরুন, এর জন্যে চাই পাতন করা জল বা ডিসটিলড ওয়াটার। সেই জলে স্যালাইনের দ্রাবক গুলে নিতে হবে। গোলার পর দ্রবণকে নিজীর্বাণুকরণ বা স্টেরিলাইজশনের দরকার। বুঝতেই পারছেন, স্যালাইন দিতে হয় ইনট্রা ভেনাস (ধমনীর মধ্যে) ইনজেকশনের সাহায্যে। অতএব এতটুকু জীবাণু থাকলে ওই স্যালাইন বিপদ ঘটাতে পারে। অতএব এর জন্যেও দরকার বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা এবং দক্ষতা। এসব কাজ গৃহচিকিৎসক বা যে-কোন একজন সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। একমাত্র হাসপাতালের পক্ষেই সম্ভব। সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স প্রভৃতি থাকেন, সেই সঙ্গে থাকে স্যালাইন দেবার মত ব্যবস্থা।

এখানেই যত রকমের অসুবিধে। বেশির ভাগ হাসপাতালই তো শহুরে ব্যাপার। গত কয়েক বছরে সরকারী প্রচেষ্টায় ভারতের গ্রামাঞ্চলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে অনেক। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা এখনও নগণ্য। আর ওই নগণ্য সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবগুলিতেই যে কলেরা চিকিৎসার মত সুব্যবস্থা আছে, এ কথাও নিশ্চয় কেউ বলবেন না। এ ছাড়া এমন গ্রামও আছে নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যাদের দূরত্ব কখনও দশ মাইল, কখনও পনের মাইল। কখনও বা তিরিশ। ধরুন, এমন কোন একটি গ্রামে হঠাৎ কেউ যদি কলেরায় আক্রান্ত হন, চিকিৎসার জন্যে অত দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ... তাঁকে নিয়ে যাবেন? এত ... দূরত্ব। হয়ত ভাল পথ ঘাট নেই। যা আছে যানবাহনের সুব্যবস্থা। এমনও হতে পারে, কাছে-কোলে কোন ডাক্তারও নেই। এমন ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবি যা, তা হল মৃত্যু।

অথবা চরম কোন ঘটনার কথাই ধরা হচ্ছে। এক আধজন নয়। কলেরা কোন কোন অঞ্চলে হঠাৎ মহামারীরূপে দেখা দিল। এবং ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, বন্যা, ঝড় অথবা ভূমিকম্পনের মতই এ রোগটিও যেন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কখন এবং কোথায় তা ঘটবে, তার দরুন কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এ সব আগে থেকে অনুমান করা শক্ত। ফলে আগে থেকে প্রস্তুত হবার মত সময়ও পাওয়া যায় না। যেমনটি গত অকটোবর মাসে কুচবিহারে ঘটেছিল। এমন কিছু ঘটলে অত রোগীকে এক সঙ্গে স্যালাইন দিতে গেলে কী বিরাট ব্যবস্থাপনার দরকার সহজেই তা অনুমেয়।

যদি শত শত লোক হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়, তখন কী করবেন? বলা বাহুল্য, দূরে গ্রামাঞ্চল অথবা দুর্গম কোন অঞ্চলে তেমন কিছু ঘটলে কলেরার প্রচলিত স্যালাইন ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার মত অবস্থা বড় একটা থাকে না।

ডঃ পাল বললেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এশিয়াটিক কলেরার মত কলেরা হলে একজন পূর্ণবয়স্ক রোগীকে প্রায় চার বোতলের মত অর্থাৎ দুই লিটার স্যালাইন দিতে হয়। যদি ধরে নেয়া হয় ওই স্যালাইন অকুস্থলে নিয়ে যেতে হবে। ভাবুন তার জন্যে কত বোতল স্যালাইন দরকার। সেই সব বোতলের ওজন আছে। এক এক বোতল স্যালাইনের দামও বড় কম নয়। কোথাও মহামারী শুরু হলে শত শত বোতল স্যালাইন দরকার। তাদের ওজনের কথা ভাবুন। সেই সঙ্গে তাদের পরিবহণ সমস্যার কথাটাও ভাবতে হবে। এ সবের জন্যে উপযুক্ত ডাক্তারি সাহায্য পৌঁছে দেবার ব্যাপারটা অনেক সময়ই বিলম্বিত।

নতুন ওষুধে খরচ এবং ঝক্কি অনেক কম

ওরোসল এ ক্ষেত্রে কতটা সাহায্য করতে পারে?

পাল : গোড়ায় কলকাতার আই ডি হাসপাতালের সহযোগিতায় আমরা ভাল ফল পেয়েছিলাম। এবার কুচবিহারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। ওরোসল ব্যবহারের সবচাইতে লাভজনক দিক : এক, ওরোসল ইনজেকশন করে স্যালাইনের মত ধমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয় না বলে এ ক্ষেত্রে সে সব কোন সাজসরঞ্জামের দরকার নেই। দুই, এর প্রয়োগ পদ্ধতি খুব সোজা। সাধারণ পানীয় জলেই গুঁড়ো ওষুধটি গুলে নেয়া চলে, ডিসটিলড ওয়াটারের দরকার নেই। ফলে খরচও পড়ে কম। যেমন ধরুন, ইনটার ভেনাস ইনজেকশন দেবার উপযোগী এক-এক বোতল স্যালাইনের জন্যে এখন খরচ পড়ে প্রায় পনের টাকা। তাহলে রোগী পিছু চার বোতল স্যালাইন দরকার হলে খরচ পড়বে ষাট টাকা। অথচ ওরোসলের ক্ষেত্রে অত খরচের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ওরোসলের দাম খুবই কম। কয়েক পয়সা মাত্র। আর এর দ্রবণ তৈরির জন্যে সাধারণ যে জল আমরা পান করি সেই জলই যথেষ্ট বলে জলের জন্যে পয়সা গুণতে হয় না। তিন, এক প্যাকেট ওরোসল দিয়ে তৈরি করা হয় এক লিটার দ্রবণ। যা দুই বোতল প্রচলিত স্যালাইনের সমান। এই দ্রবণ খাইয়ে দিলেই কাজ হয়। প্রসঙ্গত বলব, কলেরা আক্রান্ত রোগীর পিপাসা অত্যন্ত বেশি। জল মুখের সামনে ধরলেই সে পান করতে চায়—তা সে জল মিষ্টিই হোক অথবা তেতো। ফলে ওরোসল দ্রবণ খাওয়ানর জন্যে পীড়াপীড়ির দরকার হয় না। আবার রোগী যে বেশি জল খাবে, তারও আশংকা কম। কারণ, আমাদের সিস্টেমই এমন, শরীর যে মুহূর্তে তার হারান জলের অংশটুকু উদ্ধার করে নেয়—রোগী সেই মুহূর্তেই অতিরিক্ত জল খাবার প্রবণতা ত্যাগ করে। ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে বেশি জল ঢুকলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে জল পাকস্থলীতে ঢুকছে। অতএব ঠিক যেটুকু জল দরকার প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে দেহ-কোষ বা রক্ত সেখান থেকেই সংগ্রহ করে নেয়। তবে হ্যাঁ, শিশুদের ওরোসল দ্রবণ দেবার সময় মেপে মেপে কম করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। চার, ছোট ছোট প্যাকেট হওয়ায় এক সঙ্গে অনেকগুলি রোগীর চিকিৎসার মত ওষুধ সহজেই দুর্গম অঞ্চলেও পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

অর্থাৎ ডঃ পালের বক্তব্য : এক, প্রচলিত স্যালাইন ইনজেকশন না দিয়েও সাধারণ পানীয় জলের মধ্যে ওরোসল গুলে খাইয়ে দিয়েই কলেরার চিকিৎসা করা সম্ভব। দুই, ওরোসলের প্যাকেট সংরক্ষণ করা সহজ। তিন, এতে খরচ কম। চার, স্যালাইন ইনজেকশন দেবার আগে রোগীর ওপর যে সব পরীক্ষার কথা আগে বলেছি —ওরোসলের ক্ষেত্রে তার আর দরকার হয় না। ফলে, ডাক্তার ছাড়াই সাধারণ মানুষই স্যালাইনের কাজটি সেরে দিতে পারেন। পাঁচ, প্যাকেটগুলির ওজন কম বলে ছোট একটি থলেতে ভরেই কয়েক শ' রোগীর ওষুধ সহজে দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া যায়।

স্বীকার করতেই হয়, কয়েকটি দিক থেকে ওরোসলের ব্যবহার লাভজনক হবে বলেই আমাদের ধারণা। ডিসটিলড জল, পরিবহণ সমস্যা, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির খরচ এতে দরকার হবে না। বলতে বাধা নেই, কিছুদিন আগে ইনট্রাভেনাস স্যালাইনের অভাবে কলকাতার হাসপাতালগুলি তাদের অপারেশন কেসগুলি সারতে গিয়ে কী দারুণ হিমসিম খেয়ে ছিল অনেকেরই হয়ত তা মনে আছে। ওরোসল চালু হলে অন্তত সেই স্যালাইনের কিছুটা বাঁচান সম্ভব হবে। এ ছাড়া, একটা হিসেবে বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সালে আই ডি হাসপাতালে মোট কলেরার রোগী ভর্তি করা হয়েছিল ৯০০০। স্যালাইনের দরুন ওঁদের মাথা পিছু যদি খরচ হয়ে থাকে ৬০ টাকা, তাহলে মোট খরচ হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। অথচ পরিবর্তে যদি শুধু ওরোসল দ্রবণ সেবন করান হত খরচ পড়ত মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা বাঁচান যেত। অথচ স্যালাইন ইনজেকশন দিয়েও যে কাজ হত, ওরোসলও সেই একই কাজ করত।

আরও একটা লাভজনক দিক এই, ডাক্তার বা হাসপাতালের সাহায্য ছাড়াই ওরোসল কলেরা রোগীকে খাইয়ে চিকিৎসা করা যায়। অতএব সুদূর গ্রামাঞ্চলে

যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বা ডাক্তারের সুযোগ কম সেখানে গ্রামের কোন একজন দায়িত্বশীল লোকের কাছে কিছু কিছু ওরোসল রেখে দেয়া যেতে পারে। যিনি তেমন কোন পরিস্থিতি হলে রোগীর চিকিৎসায় এগিয়ে আসতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা সরকার হয়ত বিবেচনা করতে পারেন। যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, ওরোসল তৈরির ব্যাপারে যেটুকু কাজ এ পর্যন্ত হয়েছে তার বেশির ভাগই করেছেন কলকাতার কলেরা রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা। এবং তাঁদের সহযোগিতা করেছেন আই ডি হাসপাতাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ওরোসল উৎপাদনের কাজটি যাতে ত্বরান্বিত করা যায় সরকার নিশ্চয় সে ব্যাপারে আশু সচেষ্ট হবেন, এটাই এখন সকলের কাম্য। তাহলে প্রচলিত স্যালাইনের পরিবর্তে নতুন এই ওষুধটির চল আর বিলম্বিত হবে না।

সমরজিৎ কর

চিত্র প্রদর্শনী

শিল্পকর্মে আপন বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে যে কয়জন শিল্পী খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে নীরদ মজুমদার একজন। বিভিন্ন সুনির্বাচিত অথচ চাপা রঙ মাধ্যমে একসপ্রেশানিস্টিক রীতিতে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করে এই বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পী দেশের শিল্পকলা ক্ষেত্রে আপন স্থান অধিকার করেছেন—এক কথায় যে কোনও প্রদর্শনীতে শতাধিক ছবির মধ্যেও তাঁর আঁকা ছবি দেখামাত্র সনাক্ত করা যায়। যাঁরা এই শিল্পীর বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা আকাদেমি গ্যালারিতে আয়োজিত একক প্রদর্শনীটি দেখে যুগপৎ বিস্ময়বোধ ও আনন্দ লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে নীরদ মজুমদার তন্ত্রশাস্ত্র ও পুরাণ অবলম্বনে নানা চিত্রমালা এঁকেছেন। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক নিদর্শনগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। সাম্প্রতিকতম চিত্রমালার মধ্য দিয়ে শিল্পী সমকালীন জীবন, চিন্তাধারা ও তথাকথিত সভ্যতা সংস্কৃতির ওপর তীব্র কশাঘাত করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশে শিক্ষার বিস্তার লাভ হয়েছে, অনেক স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষিতের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধের কি আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা-ই যেন শিল্পী ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পী প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র ছেড়ে সমসাময়িক যুগের মানুষ হিসাবে এই যুগে ফিরে এসেছেন ও বর্তমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার যে বীভৎস পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিজে শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও শিল্পকলা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সঙ্গীত, মঞ্চ ও ফিল্ম জগতেও বর্তমান যুগে সকলে কিভাবে আপন আপন ঢাক বাজান ও কলা-সৃষ্টির অজুহাতে যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেন তার প্রতিও কশাঘাত করতে শিল্পী দ্বিধা বোধ করেননি (লাইম লাইট)। দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে আধুনিক যুগের নরনারী কিভাবে নৈতিক অধঃপাতের পথে এগিয়ে চলেছে,—নিঃস্ব, অসহায়, গরীব জনগণ কিভাবে ধনী ক্ষমতাশালীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে, অথবা মামলা-মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, বিভিন্ন জাতীয় প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিল্পী তা ব্যাখ্যা করেছেন (লেফট, টিরানি ও ফিস্ট)। একদল পাখি আপনার মনে কিচির-মিচির করে চলেছে—এই প্রতীক অবলম্বনে রচিত

পিলগ্রিমস্‌ —নিকোলাস রোয়েরিক

পার্লামেন্ট ছবিটি অনেকেই উপভোগ করেন। এই প্রসঙ্গে মেরি-গো-রাউন্ডও উল্লেখ্য। তবে শিল্পী ঠিক নিরাশাবাদী নন। সমকালীন যুগে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দেশবাসী সকলেই এই ছন্দ ও লক্ষ্যহীন জীবন পথে চললেও একদিন যে প্রাচ্য দেশবাসীই যথার্থ পথের সন্ধান পেয়ে বৈতরণী পার হবেন সেটাই শিল্পী প্রকাশ করেছেন তাঁর মুখ্য বিরাট রচনা বৈতরণীতে মহাজন ঈষৎ কার্টুন জাতীয়। চাপা ছাই, নীল লাল ও হলুদ রঙের ছোট ছোট পরিমিত রেখাপ্রধান রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন—এই প্রদর্শনীর এটিই বৈশিষ্ট্য।

*

খ্যাতনামা শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশের নানা স্থানে আয়োজিত সভা সমিতিতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। দিল্লীতে ললিত কলা আকাদেমি ও অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস আন্ড ক্রফটস সোসাইটির (AIFACS) যৌথ উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয় ও সেই সঙ্গে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে রাশিয়ায় এই উপলক্ষ্যে বিপুল আয়োজন করা হয়। বাঙ্গালোর থেকে একটি বিশেষ রাশিয়ান প্লেনে নিকোলাস রোয়েরিক ও তাঁর পুত্র সুপরিচিত শিল্পী স্ভেতোস্লাভ রোয়েরিক-এর কয়েকটি ছবি মস্কোতে পাঠানো হয় ও সেগুলি ত্রেতিয়াকভ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়। ভারত সরকারও এই উপলক্ষে নিকোলাস রোয়েরিক স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। তাছাড়া বোম্বাই, চন্ডীগড়, বারাণসী, এলাহাবাদ ও ত্রিবান্দ্রমেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কলকাতা আকাদেমি গ্যালারিতেও এই উপলক্ষে রোয়েরিকের চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পী, সাধক, গ্রন্থকার ও দার্শনিক নিকোলাস রোয়েরিক ১৮৭৪ সালে রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি এদেশে আসেন ও বিশেষ করে হিমালয়ের বিরাট রূপ দেখে মুগ্ধ হন ও শেষ পর্যন্ত নগর-কুল্লুতেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। আপন দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও অঙ্কন-রীতির মধ্য দিয়ে তিনি হিমালয়ের মহান রূপ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে গেছেন। বিভিন্ন ঋতু ও কালে হিমালয়ের বিভিন্ন শিখর বা অংশের যে বিশেষ আকার ও রূপ ফুটে ওঠে, নিকোলাস রোয়েরিকের শিল্পী-সুলভ অনুসন্ধানী চোখ ও সুপটু তুলিতে সেগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। প্রধানত নীল রঙ ও তারই নানা সূক্ষ্ম স্তরভেদের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের বিরাট মহান রূপ তিনি এঁকে গেছেন আজও তার তুলনা মেলে না। বাস্তবিকই তাঁর চিন্তাশীল সমাহিত চিত্তই যেন ছবিগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে—তাই পার্বত্য চিত্রমালার শ্রেষ্ঠ

শিল্পী হিসাবে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

*

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাদেমিতে পরলোকগত শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে উভয় শিল্পীর গ্রাফিক প্রিন্ট ও জল এবং তেল রঙে আঁকা কয়েকটি ছবি দেখা যায়। আধুনিক-ধর্মী ও সমকালীন ছবি দেখে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা এই প্রদর্শনীটি দেখে যে ভারতীয় চিত্রকলাধারার কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দেখতে পেলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, এককালে প্রাথমিক অঙ্কন-বিদ্যায় কতটা গুরুত্ব দেওয়া হত, প্রদর্শনী দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মণীন্দ্রভূষণ প্রথমে শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিল্পী অসিত হালদার ও পরে কলাভবনে আচার্য নন্দলালের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এক-দিকে তিনি যেমন চীন ও জাপানের অঙ্কন-পদ্ধতি সম্বন্ধে শেখেন, অন্য দিকে তেমন তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য প্রথাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুতরাং তাঁর শিল্পকর্মে দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। দু-একটি নিসর্গ দৃশ্যে পাশ্চাত্ত্য রীতির পরিচয় মেলে, যেমন রবীন্দ্র সরোবর সায়াহ্নদৃশ্য-এ। অন্যান্য নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে বাংলাদেশ ভিলেজ ও বিশেষ করে বাংলাদেশ ল্যাণ্ডস্কেপ-এর নাম করা চলে—দুটিই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর—মনে হয় যেন সেদিনে আঁকা। ড্রয়িংয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে মালবিকা ও অ্যাট দি টেম্পল ডোর উল্লেখ্য। কয়েকটি উডকাট দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন, যেমন দি পিলগ্রিম ও রোপ ব্রিজ। বলিষ্ঠ প্রতিকৃতি নিদর্শন হিসাবে অ্যান ওলড ম্যানস পোর্ট্রেট-এর নাম করা যায়।

শিল্পী রমেন চক্রবর্তী কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুল ও সেই সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেন ও পরে শান্তি-নিকেতন কলাভবনে আচার্য নন্দলালের কাছেও দীর্ঘকাল অঙ্কনবিদ্যা শেখেন। পরে বিলাতে গিয়ে তিনি গ্রাফিক শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে রমেন্দ্রনাথ অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার ডিরেক্টর ও পরে কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজ, দিল্লী পলিটেকনিকের কলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন ও শেষে সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। প্রদর্শনীতে জল ও তেল রঙে আঁকা নানা ছবি ও সেই সঙ্গে কয়েকটি এচিং নিদর্শন দেখা যায়। জল রঙের চিত্রমালার মধ্যে অনবদ্য ড্রয়িং, কম্পোজিশন ও পরিচ্ছন্ন রীতির জন্য রামায়ণ চিত্রমালা দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। তেল রঙের ছবির মধ্যে বেণারস ঘাট সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাশীর ঘাট অবলম্বনে বহু শিল্পী ছবি এঁকেছেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী, রচনা-রীতি ও রঙ ব্যবহার প্রণালীর দিক থেকে রমেন চক্রবর্তীর বেণারস ঘাট, মনে হয় বুঝি-বা আজও অতুলনীয়। আর একটি ছবি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—গ্রীনওয়ে। সবুজ রঙের স্তরভেদ প্রধান এই ছবিটির আবেদনও চিরন্তন। প্রদর্শনীতে এচিংয়ের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়ে—বিশেষ করে অ্যাকোয়াটিণ্ট প্রিণ্টগুলি দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। এই প্রসঙ্গে ক্যালকাটা রোড-দার্জিলিং, ভিলেজ অন চর ও ভিউ ফ্রম পিরপাহাড় (উড এনগ্রেভিং)-এর নাম করা চলে। প্রদর্শনীর অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে একটি স্কেচ—অ্যাট পল্ট নিয়ফ বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য। বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ দুজন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিদর্শন দেখার সুযোগদান করে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট কর্তৃপক্ষ যে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন তা বলা বাহুল্য।

চিত্রপ্রিয়

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

না বাপু, প্রশ্নটা আমাদের কারোর মাথায় আসে নি, ওটা প্রথম তুলেছিলেন সেই বিখ্যাত বুড়ো অধ্যাপক। বছর পাঁচেক আগে একটা লেখার মধ্যে অধ্যাপক রবারট দেব্রে প্রথম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেনঃ ছাত্ররা কেন বার বার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে? সেই সঙ্গে জবাবের পথও উনিই বাতলে দিলেন, দেখ তো জীববিদ্যার সাহায্যে প্রশ্নটার কোন সদুত্তর মেলে কি না?

একটু থামলেন ফ্রানসের প্রাক্তন ডিরেকটর জেনারেল অব স্কুল হেলথ ডাক্তার ড্যানিয়েল ডুআর্ডি। কলকাতায় মৌলালির মোড়ে স্টুডেনটস হেলথ হোমের তেতলার একটা হলঘরে আমরা কয়েকজন ও'র মুখোমুখি বসে শুনছিলাম এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সমীক্ষার কথা। পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের কম করেও পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চালানো হবে এই সমীক্ষা। প্রাথমিক পর্যায়ে তারই ব্যবস্থা করতে অন্যান্য দেশ ঘুরে জাপান যাওয়ার পথে ভারতে এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্য। চীন, ইরান, ইজরায়েল, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, বৃটেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া সুইডেন, ফিনল্যান্ড, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, উরুগুয়ে ইত্যাদি ঘোরা সারা। ভারতেও আগে একবার এসেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় এদেশে এসে দিল্লিতে প্রথম উঠেছিলেন। পরে দুটো দিন কাটিয়ে গেলেন কলকাতায়।

কিছুক্ষণ আগে হেলথ হোমের দরোয়ান বাহাদুর আমাদের কয়েক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের কাপ কখন শেষ। ডুআর্ডি কথায় ব্যস্ত ছিলেন। এবার জুড়িয়ে যাওয়া কাপে একটা চুমুক দিয়ে ফের শুরু করতে গিয়েই বাধা পেলেন।

—বিখ্যাত বুড়ো অধ্যাপক রবারট দেব্রে কে ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রশ্নটা করলেন নন্দন ভট্টাচার্য। তবে প্রশ্নটা আমাদের সকলেরই। আমাদের মানে দেবু রায়, কল্যাণ দাশগুপ্ত, মৃণাল রায়চৌধুরী, ডাক্তার দীপক চন্দ ও আমার। আমাকে বাদ দিয়ে এদের বাকি সবাই এদেশে ছাত্রদের হেলথ হোম আন্দোলনের পুরোনো কর্মী। যদিও বয়সে সবাই নবীন। ভিন্ দেশের একই আন্দোলনের এক প্রবীণ পুরোহিতের কাছ থেকে সব কিছু ও'রা খুঁটিয়ে জেনে নিতে চান।

—মিশাইল দেব্রের নাম নিশ্চয় শুনেছ? দ্য গলের আমলে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। তারই বাবা রবারট দেব্রে। বয়স এখন বিরনব্বই। প্রচন্ড পন্ডিত। দার্শনিক, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। ডাক্তারি পড়াশোনার মোড়

একদা এই মানুষটিই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন—এখনো ডাক্তারি শাস্ত্রে ও'র প্রচলিত পদ্ধতি দেব্রে পদ্ধতি নামে বিখ্যাত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ব্যাপারটা খোলসা করতে গিয়ে ডুআর্ডির যে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া, মানুষটা বিখ্যাত বুড়ো অধ্যাপকের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট হলেও আমাদের যে ডবল বয়স ও'র—সত্তর। ছোটখাট গড়ন। ঢলঢলে

ডাঃ ড্যানিয়েল ডুআর্ডি

প্যান্টের ভেতরে শার্টের কিছুটা একটা মোটা বেল্ট দিয়ে আটকানো। পায়ে মোজার ওপর স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল। কথা বলার সময় চোখের কোণে কৌতুক চলকে ওঠে। হাসলে ও'কে দেখতে লাগে স্নেহশীল দাদুর মত।

আবার খেই ধরলেন ডুআর্ডিঃ বুড়ো অধ্যাপকের ছেলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও বাপের মত ওর মাথা অত সাফ নয়। বাপ যেন খাপ-খোলা তলোয়ার। উনি প্রশ্নটা যখন তুললেন, ঠিক তার এক বছর আগে ১৯৬৮ সালে, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর দিয়ে ছাত্র বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গিয়েছে। ছ বছর হয়ে গেল, এখনো সেই ঝড়ের ধাক্কা আমরা ভুলতে পারি নি। ওই ঝড়ের ধাক্কায় দেশের রাজনীতির চেহারাটাই আমূলে বদলে গেল। স্বয়ং দ্য গলকে বিদায় নিতে হল। বামপন্থী দলগুলি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। তাই ওই সময় প্রশ্নটা উঠতেই মনে ধরে গেল। সবাই যখন ছাত্র বিদ্রোহের কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাগত পরিবেশ, পুঁথি-পত্তরের বস্তাপচা জঞ্জালে, ঠিক তখন একটা নতুন পথের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে এলেন অধ্যাপক দেব্রে।

ছাত্রদের অসন্তোষ বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিপ্লব এ তো দেশে দেশে নিত্য ঘটে চলেছে। ফ্রানস কোন ব্যতিক্রম নয়। তোমাদের ইনডিয়ার খবরও তো আমরা পাই। কিন্তু কেন? কেন ছাত্ররা ক্ষেপে ওঠে? কেন সব তারা ভেঙ্গে ফেলতে চায়—খারাপ লাগলে চায়ের কাপ থেকে সামাজিক প্রথা, আচার-বিচার, প্রচলিত মূল্যবোধ সব কিছু। এর জন্য কতখানি দায়ী তাদের স্বাস্থ্যহীনতা, মানসিক ভারসাম্যের অভাব, সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ? দেব্রের নির্দেশে এই নতুন পথেই বহু পুরোনো প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে নেমে পড়লাম।

—নেমে তো পড়লেন ডাকতার ডুআর্ডি, কিন্তু নিজের বয়সের কথা ভেবে দেখেছেন? এবার প্রশ্নকর্তা দেবু রায়। এই বয়সে এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায়?

একবারে দেবুর তড়বড়ে ইংরেজি ধরতে পারলেন না ডুআর্ডি। বার কয়েক প্রশ্ন করে ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই হো হো করে হেসে উঠলেন, যেন এর চেয়ে ফানি প্রশ্ন জীবনে আর শোনেন নি। হাসি থামল। মুখটা ঈষৎ গম্ভীর। চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক। ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা বুকের ওপর ঠেকানো! ডুআর্ডি বললেন, ছেচল্লিশ বছর আগে একটা লাংস আমার অকেজো হয়ে গিয়েছে। বছর চোদ্দ আগে আমার বাঁ চোখটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কাজ করার উৎসাহটা যে কিছুতেই মরছে না, কি করি বলো তো! নইলে আমার তো সেই কবেই মরে যাওয়ার কথা, তখন তোমরা জন্মাও নি, ১৯২৮ সালে যখন আমার বুক পরীক্ষা করে ধরা পড়ল রাজরোগে ভুগছি। অথচ তখন আমি নিজেই ডাকতার।

বাবা মা দুজনেই ইংরেজির শিক্ষক। বাবা জুলেস ডুআর্ডি লিয়ঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। মা পড়াতেন একটা হাই স্কুলে। দু ভাই এক বোনের মধ্যে আমিই বড়। কি বললে, বাবা-মা ইংরেজির শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন গড় গড় করে ইংরেজি

বলতে পারি না? সিগমুন্ড ফ্রয়েড মশাই জীবিত থাকলে প্রশ্নটা তাকেই একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতাম। আসলে বাড়িতে আমরা ভাই বোনরা কোনদিনও ইংরেজি বলি নি। আমাদের ভগ্নীপতিটি কিন্তু ইংরেজির অধ্যাপক।

স্কুলের পড়া শেষ হলে বাবা জানতে চাইলেন কি করব? বললাম, আর যাই করি মাস্টারি করব না। ডাক্তারি পড়ব। মজার কথা কি জানো, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে বাবার প্রশ্নের জবাবে আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম, ঠিক সেই উত্তরই আমি ফেরৎ পেয়েছি আমার ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে। আমার এক মেয়ে, চার ছেলে। মেয়েটি বায়োকেমিস্ট। ছেলেদের একজন অধ্যাপক, একজন নগর স্থপতি, একজন ফলিত গণিত নিয়ে কম্পিউটার সেনটারে কাজ করে, আর একজন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী। ওরা সবাই বিবাহিত। আমার জামাই ও বৌমারা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী। কেউ ডাকতার হল না। এক-একজন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকতে গিয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছি, কি পড়বি? ওরা বলেছে —আর যাই করি বাবা, ডাকতারি পড়ব না। ডাকতারি পড়ে শেষ পর্যন্ত তোমার মত ব্যুরোক্র্যাট হওয়া পোষাবে না।

ওদের না পোষাক, আমার পুষিয়ে গিয়েছিল। ডাকতারি ডিগ্রি পাওয়ার পর আরো উঁচু ধাপের পড়াশোনার জন্য নিজেকে তৈরি করতে লাগলাম। সে সময় আমাদের একটা কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে হায়ার কোরসে ঢুকতে হত। সেই পরীক্ষাতেও পাশ করলাম কিন্তু আমার স্বাস্থ্য আমাকে ডাহা ফেল করিয়ে দিল। আমি তখন যক্ষ্মায় ভুগছি। ১৯২৮ সাল। বয়স চব্বিশ।

সে সময়ের ফ্রানসের কথা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। প্রতি দশজনে একজনের যক্ষ্মা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে দেশ জুড়ে চলছে এক অনাসৃষ্টি অবস্থা। খাদ্যের অভাব। রোগ, বিশেষ করে যক্ষ্মা হলে সবাই তখন গোপন করে চলে। বাড়িতে কারো যক্ষ্মা হলে তাকে হয় ঘরে লুকিয়ে রাখে, নয় অবস্থা ভাল হলে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেয়। কেউ জানতে চাইলে বলে, বিদেশে বেড়াতে গিয়েছে।

আমিও ওইভাবেই বেড়াতে গেলাম। আলপসের গায়ে একটা ছোট স্যানাটোরিয়াম। দু বছর ছিলাম। একটা লাংস সিল করে দিল। ওখানে থাকতেই আলাপ হল ডাকতার এডোয়ার্ড রিসটের সঙ্গে। আমার বন্ধু, আমার গুরু। রোগী অবস্থাতেই স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসা করতাম। গুরু কানে মন্ত্র দিলেন: হাজার হাজার ছেলে মেয়ে [illegible] বছর যক্ষ্মায় মারা যাচ্ছে। একটা স্যানাটোরিয়াম খুললে কেমন হয়?

ডাকতার রিসট ছাত্রদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। উনি ছিলেন ন্যাশানাল ইউনিয়ন অব স্টুডেনটসের সহ সভাপতি। ওঁর বহুদিনের স্বপ্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানাটোরিয়াম খোলার। আমিও ওই স্বপ্নের প্রেমে পড়ে গেলাম।

দেখ দেবু, নন্দন তোমরা তো এদেশে বহুদিন ধরে স্টুডেনটস হেলথ হোম আন্দোলন চালাচ্ছ। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম। কি প্রচণ্ড অর্থাভাব। লোকের অভাব। কেউ সাহায্য করতে চায় না। ওদেশেও চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ঠিক তোমাদের মতই অবস্থা ছিল। আমি যখন এই আন্দোলনে নামলাম তখন অনেক বছর আগে থেকেই ডাকতার রিসট একটা স্যানাটোরিয়াম গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালে গ্রেনোবল বিশ্ববিদ্যালয় টাউনে গড়ে তুললাম একটা স্যানাটোরিয়াম। বিশ্বাস করবে, প্রথমে কোন ছাত্র রোগীই আমি পাই নি? কারণ, ততদিন এই আন্দোলনের ওপর লোকের আস্থা চটে গিয়েছে। দশ বছর ধরে লোক শুনে আসছে স্যানাটোরিয়াম হবে, কিন্তু হয় না। তাই খোলার পর ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য একজন ইনজিনিয়ারকে প্রথম রোগী হিসেবে ভর্তি করি স্যানাটোরিয়ামে। দ্বিতীয় রোগী কামবোডিয়ার এক ছাত্র।

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয় নি। ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে এগিয়ে এল। তাঁদের অল্পস্বল্প দামের টাকায় কোন রকমে কাজ চলতে লাগল। কিন্তু ততদিনে প্যারিসের বড় কর্তাদের কানে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে। এরপর সরকারই খরচের সিংহভাগ বহন করতে এগিয়ে এলেন। আমার জীবনের দশটা বছর কেটেছে এই স্যানাটোরিয়ামে। বিয়েও করতে হল এই স্যানাটোরিয়ামের কাজ করতে গিয়ে। গুরুর নির্দেশে।

তখন সবে স্যানাটোরিয়ামটি চালু হয়েছে। একদিন ডাকতার রিসট আমাকে ডেকে বললেন: ড্যানিয়েল, তোমার রোগীদের মধ্যে ছেলে মেয়ে দুই থাকবে। মন দিয়ে যদি কাজ করতে চাও, বিয়েটা আগে সেরে ফেল। গুরুবাক্য শিরোধার্য। আমার গিন্নীর বাবা সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জুওলজির অধ্যাপক ছিলেন। গিন্নী প্যারিসে ছবি আঁকত। দারুন আঁকায় হাত। আমার হাতে পড়ে ওর সেই প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল। তেত্রিশ সালে বিয়ে করলাম। ছ বছরে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে গিন্নী হেন আদ্যোপান্ত জননী হয়ে গেল। কোথায় পড়ে রইল ইজেল, ক্যানভাস আর তুলি।

বড় বেশি ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছি না! জিজ্ঞাসা করলেন ডুআর্ডি। জবাব দিলেন দেবু, একটুও না, বরং কতগুলো প্রশ্নের পড়ায়, ছুটির সময় ছাত্র বা সহকর্মীদের নিয়ে কাশ্মীর টু কন্যাকুমারিকা চষে বেড়ায়। বাকি সবটুকু সময় বরাদ্দ স্টুডেনটস হেলথ হোমের কাজে।

একটা কথা, বললেন ডুআর্ডি, শুধু ছাত্রদের জন্য স্যানাটোরিয়াম খোলার আইডিয়াটা কিন্তু ফরাসীদের মাথায় প্রথম আসে নি। ওটা আমরা ধার নিয়েছি সুইশদের কাছ থেকে। প্রথম এই ধরনের একটা স্বাস্থ্যনিবাস সুইজারল্যান্ডের লেজিন শহরে গড়ে তোলেন ডাকতার ভাভিয়ের। এই স্যানাটোরিয়ামেই, সালটা ঠিক মনে নেই, বিশের দশকের গোড়াতেই সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রোমা রোঁলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

দেখ, এতক্ষণ যে ভাবে এই আন্দোলনের কথা বলছি তাতে আমি লোকটা যেন কত বড় একটা শহীদ এরকম একটা ভাব ফুটে উঠছে। এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমি দুদিক থেকে উপকৃত। এক নম্বর, স্যানাটোরিয়ামে কাজ করতে করতে আমি হয়ে উঠলাম যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ। একদা আমারই একটা লাংস সিল করা হয়েছিল। ওই সিলিং-এর পদ্ধতিটা বহু প্রাচীন। নিজে কাজে নেমে ওই প্রাচীন পদ্ধতিটাকে কিছুটা বদলাতে পেরেছিলাম। দু নম্বর, প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করে কিছু টাকা জীবনে কম রোজগার করেছি ঠিকই, কিন্তু শুধু নিজের দেশ নয়, তামাম বিশ্ব জুড়ে পেয়েছি তোমাদের মত সঙ্গী।

দশ বছরের চেষ্টার ফল পেতে লাগলাম। একদিন যা ছিল একটা বিশ্ববিদ্যালয় শহরে সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তা গোটা ফ্রানসে ছড়িয়ে গেল। চোদ্দটা স্যানাটোরিয়াম গড়ে উঠল। তবে যুদ্ধের পর, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মার প্রকোপ অনেকটা কেটে যেতে ওই সব স্যানাটোরিয়ামে অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও শুরু হল। বিশেষ করে মানসিক রোগের। তা ছাড়া, ১৯৪৮ সালে সোসাল সিকিউরিটি আইন পাশ হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার দায়িত্ব পুরোপুরি বর্তাল সরকারের ওপর।

১৯৪৩ সালে আমি প্যারিসে চলে এলাম। ঠিক করলাম যক্ষ্মা থেকে সেরে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা আফটার কেয়ার হোম গড়ে তুলব। সবে কাজে হাত দিয়েছি এমন সময় সরকারী শিক্ষা দফতর থেকে ডাক এল: তোমাকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের ভার নিতে হবে। পদটা নাম ডিরেকটর জেনারেল অব স্কুল হেলথ ১৯৪৫ সাল। রাজি হয়ে গেলাম।

১৯৬১ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে করে বছর বাদ দিয়ে দশটা বছর ওই দায়িত্বে [illegible]

যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন ডাক্তার চন্দ : আপনাদের দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা বুঝি শিক্ষা দফতর দেখাশোনা করে?

দেখাশোনা করে মানে, ডুআডি বললেন, ওই নিয়ে কত রাজনৈতিক কাজিয়া হয়ে গেল, এখনো চলছে। এই যে সেদিন আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে ভোটের লড়াই হল, যদি বামপন্থী প্রার্থী মিতেরাঁ দাগলপন্থী প্যাঁপিদুকে হারাতে পারত, তাহলে নিশ্চয় স্কুল হেলথ বিভাগটা আবার শিক্ষা দফতরে ফিরে আসত। ১৯৬৪ সালে ওই বিভাগটা শিক্ষা দফতরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে চালান দেওয়া হয়। কাজটা ঠিক হয় নি। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য বাদ দিয়ে শিক্ষা হতেই পারে না। মিতেরাঁ কথা দিয়েছিলেন, ওই বিভাগটা শিক্ষা দফতরে ফিরিয়ে দেবেন। তা হল না। ইলেকশনে যে হেরে গেল। তবু যাই হোক, আমাদের দেশে সরকারী দফতরগুলির মধ্যে টাকায়, লোকবলে সবচেয়ে পাওয়ারফুল হল শিক্ষা দফতর।

ডিরেকটর জেনারেল হয়ে দেখলাম প্রায় সোয়া কোটি স্কুলের ছেলেমেয়ে ও পাঁচ লাখ শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাস্থ্যের ভার আমার ওপর। সবে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ততোধিক। বহু ছেলেমেয়ের যক্ষ্মা। এক গ্লাস দুধ পর্যন্ত পায় না।

ঠিক করলাম বছরে অন্তত একবার করে, সব না পারি আশি ভাগ ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু অত ডাক্তার পাই কোথায়? প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে কে আসবে? তা ছাড়া সরকারী কাজে মাইনেও খুব কম। স্কুলের ডাক্তারের মাইনে মাস্টারমশাইদের সমান। ভেবে চিন্তে আমি ডাক দিলাম মেয়ে ডাক্তারদের। প্রায় এক হাজার ডাক্তারের একটা দল আমি গড়ে তুলেছিলাম। এর মধ্যে আশি ভাগই মেয়ে। কেন মেয়ে জান? মেয়েরা বিবাহিত, মায়ের জাত। শিশুদের সম্বন্ধে আকর্ষণ এমনিতেই স্বাভাবিক। তার ওপর বিবাহিত হওয়ার জন্য অর্থের চাহিদা কম। ওর আয় বড়জোর স্বামীর আয়ের পরিপূরক হবে। আইডিয়াটাতে কাজও হল।

তারপর ঠিক করলাম—এক গ্লাস দুধ অন্তত ছেলেমেয়েদের রোজ সকালে দেব। কপাল ভাল, এখন ফ্রানসের প্রধানমন্ত্রী মেঁদেস ফ্রাঁস। উনি আবার প্রচণ্ড দুধভক্ত। পারলামেনটে সর্বদাই ও'র টেবিলের সামনে এক গ্লাস দুধ মজুত থাকত। প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। ফল হল, সোয়া কোটি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে রোজ এক গ্লাস করে দুধ তখন দিতে পেরেছি।

তবে এখন ফ্রানসে দুধ আর কেউ খেতে চায় না। দেশে দুধের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। জানতে চাইলাম প্রাক্তন ডিরেকটর জেনারেল অব স্কুল হেলথের কাছে : আপনাদের ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাবারের মেনুটা বলবেন?

তা ধর সকাল সাড়ে সাতটায় এক পিস মাখন মাখানো রুটি ও এক গ্লাস কফি-দুধ। কফি বেশি, দুধ কম। দুপুরে সাড়ে বারোটা নাগাদ লানচ। একটা একশ' গ্রামের ছোট মাছ, ওই পরিমাণ মাংস, কিছুটা কাঁচা শাক-সবজি, একটা মিষ্টি ও রুটি। বিকেলে বাড়ি ফিরে চারটা পাঁচটা নাগাদ একটা ছোট রুটি, এক গ্লাস চকোলেট। রাতে আটটা নাগাদ ওই লানচের খাবার—তবে পরিমাণে কম।

বাঁ চোখটা নষ্ট হয়ে যেতে ১৯৬১ সালে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। তার দু বছর আগে থেকে নতুন একটা আন্দোলন নিয়ে মেতে উঠেছি। এই আন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্কুল অ্যানড ইউনিভারসিটি হেলথ অ্যানড মেডিসিন। সংস্থার সদর দফতর প্যারিসে। চাকরি ছেড়ে ইন্টারন্যাশনালের কাজে পুরোপুরি ডুবে গেলাম। সেই সঙ্গে চলল আমার আদি সংস্থা স্যানাটোরিয়ামগুলির কাজ। বর্তমানে ওই স্যানাটোরিয়াম সংস্থাটির নাম ফ্রেনচ স্টুডেন্টস হেলথ ফাউনডেশন। বর্তমানে আমি ফাউনডেশনের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার।

এমন সময় আটষট্টিতে দেশ জুড়ে ঘটে গেল ছাত্র বিদ্রোহ। এমনই তার শক্তি যে অত বড় শক্তিশালী জননেতা দ্য গলের গদি প্রচণ্ড টলে গেল। পরের বছর অধ্যাপক দেব্রে ওই প্রশ্নটি ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনটারন্যাশনাল ঠিক করল দেব্রের নির্দেশিত পথেই কাজ শুরু করবে। এগিয়ে এল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনেসকো। আমরা একটা স্কিম দিলাম। ওই স্কিমে বলা হল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত দিক ছাড়া জীবনের অন্য সব দিক নিয়ে একটা সমীক্ষা চালান হোক।

প্রথম পর্যায়ে ফ্রানস, চেকোশ্লোভাকিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আরজেনটিনা ও জাপানের ছটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মিনি সমীক্ষা করা হল। উদ্দেশ্য, পদ্ধতি নির্ণয় করা। সেই পরীক্ষার ফল নিয়ে গত বছর ডিসেমবরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতর জেনেভাতে ছত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিরা চুল-চেরা বিচার করে রায় দিলেন—ঠিক আছে, এই পথেই চল। সেই সঙ্গে স্থির হল এবার পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশে কম করেও পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ভাষায় ছাপানো প্রশ্ন তালিকা গোড়ায় পাঠানো হবে। তারপর তরুণ মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা ধরে ধরে ছাত্রছাত্রীদের ইনটারভিউ নেবেন। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ। চলবে অনেক দিন ধরে।

ভারতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আপাতত এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে—কলকাতা ও যাদবপুর। ইনটারন্যাশন্যালকে এই সমীক্ষায় ভারতে সাহায্য করবে স্টুডেনটস হেলথ হোম।

তোমাদের এই হোমের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। সতেরো বছর আগে যখন এই বাড়ি-টাড়ি কিছু হয় নি, মেস, তখন একবার কলকাতায় এসেছিলাম। এই হোমের জানেই। এবার দেখছি পাল্টে গেছে সব। এত বড় বাড়ি, চিকিৎসার সুন্দর ব্যবস্থা।

আর কোন পরিবর্তন আপনার চোখে পড়েছে কি ডাকতার ডুআডি, জানতে চাইলাম। দেশের কথা বলছ? বললাম, হ্যাঁ। একটুও না ভেবে উনি বললেন : রাস্তায় গাড়ির ভিড় অনেক বেড়ে গিয়েছে এই সতেরো বছরে, সেই অনুপাতে গরুর ভিড় এখন অনেকটা পাতলা। আর সেবার দেখেছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শহরের বাইরে, এবার দেখলাম কলকাতা নিজের চৌহদ্দীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে টেনে নিয়েছে।

পরের দিন বিকেলে একটি আলোচনা চক্রে এই সমীক্ষা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়ে ডুআডি জাপানে চলে গিয়েছেন। সমীক্ষার উদ্দেশ্য সবার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য সত্তর বছরের মানুষটি সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। সবার সহযোগিতা চাই। না পেলে কাজ হবে না। তবে এই সমীক্ষার ফল বেরোতে যদি বহুদিন লেগে যায় তাহলে, জানতে চেয়েছিলাম। হেসে ডুআডি বলেছেন : অর্থাৎ তার আগেই যদি টেঁসে যাই, এই তো! তা যাব। ফল তোমরা ভোগ করবে।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

আলোচনা

বিশ্ব-বিজ্ঞান

'দেশ'-এর (৫০ সংখ্যা ঃ ১২ অকটোবর '৭৪) "বিশ্ববিজ্ঞান" বিভাগে মাকড়সার চামচিকে শিকার, মাছ শিকার ইত্যাদি বিষয়কেন্দ্রিক যে আলোচনাটুকু প্রকাশিত হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংযোজক ঘটনা হিসাবে মাকড়সা এবং চামচিকে ঘেরা আমার প্রত্যক্ষীকৃত একটু ভিন্ন স্বাদের পৃথক পৃথক দুটি ঘটনা 'দেশ' এর সুধী পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

অতীতের ঘটনা।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ঘরের বাইরে-কার নিচু আলসের নিচের অভ্যস্ত পথ ধরে যেতে যেতে ঘরের কোণটা সবে ছাড়িয়ে যাব এমন সময় আচমকা এক না-ধাক্কা-না ছোঁয়া লেগে মাকড়সার একটা জালের বেশ চটচটে কিছু দড়ি-দড়া ছোট্ট ছোট্ট পটপট আওয়াজ তুলে ছিঁড়েছুটে এসে আমার চোখে-মুখে মাথায় একেবারে লেপ্টে গেল।

সামনের বাগানে সদ্য ফুল ফুটে ওঠা কটা অতসী গাছে কদিন থেকে দুটি একটি করে ভোমরা আসছে। বিকেলের দিকে ওদেরই একটা ভোমরা মধু খাওয়া শেষ করে উড়ে চলে যেতে গিয়ে ঘরের সেই কোণটায় চাল দেওয়াল জুড়ে পাতা, মেরামত করে নেওয়া মাকড়সার সেই জালটায় পা-পাখা-শরীর নিয়ে একটু আটকা পড়ে গেল। মাকড়সাটা জালের একটা কোণার দিকে বসে ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সে আটকে পড়া ভোমরাটার কাছে ছুটে চলে এলো এবং এসেই সময়ের কিছুমাত্র অপচয় না করে বস্তুত পক্ষে ভোমরাটার চারপাশে বনবনিয়ে ঘুর-পাক খেতে শুরু করে দিল, শুরু করে দিল সেই সঙ্গে আশ্চর্য এক সুতো ছাড়ার খেলা —প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি চওড়া মাপের ফিতের মত খুব পাতলা সুতোর পর্দা ওর পেট ভরভরিয়ে ছেড়ে ছেড়ে প্রায় ২০/২৫ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ভোমরাটার সারা শরীর একেবারে ঢেকে দিল। এখন সেখানে সাদা মত একটা পুঁটলি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না এবং সেই পুঁটলির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা করুণ চুঁকু-উঁ-উঁ শব্দ ভোমরাটার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে মাত্র। মাকড়সাটা এবার ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে জালের একটা পাশের দিকে গিয়ে চুপ-চাপ বসে রইলো। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি—মাকড়সাটা সেখান থেকে সরে এসে সুতো বন্দী করে ভোমরাটার উপর নিশ্চুপ হ'য়ে বসে আছে।

পরের দিন সকাল বেলায় দেখলাম—জালটা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়তি সুতো-ফুতোর কোন চিহ্ন ওতে নেই। জালের নীচের মাটিতে সম্পূর্ণ রস-রক্তহীন শুকনো ঐ কেমন একটা ডেলা পাকানো মত অবস্থায় ভোমরাটার ছোট্ট একটু দেহা-বশেষ পড়ে রয়েছে।

এমনি করেই বেশ কিছুদিন ধরে মাকড়সাটার ভোমরা শিকার পর্ব চলছিল—কোনদিন একটা, কোনদিন বা দুটো। কিন্তু মাঝের একটা দিন, ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারলো ঢেলা— হটাৎ ছোট্ট কোন এক পাখীর একটা আর্ত চিৎকার কানে ভেসে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে ঘর থেকে বাইরে বার হ'য়ে এসে দেখি—একেবারে ডাকাতে কাণ্ড! মাকড়সাটা তার জালে একটা টুনটুনি পাখীকে পাকড়াও করে বসেছে এবং সেই একই ভোমরা-ধরা কায়দায় সুতো ছেড়ে ছেড়ে টুনটুনিটার চারপাশে বনবনিয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। টুনটুনিটা এই নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরিত্রাহি চিৎকার-চেঁচামেচি-ছটফটানি শুরু করে দিয়েছে। মাত্র ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যেই মাকড়সাটা ঐ টুনটুনিটার সব চিৎকার-চেঁচামেচি-ছটফটানি একেবারে স্তব্ধ করে দিল। সুতোর বেড়ে বেড়ে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে সেই পুরনো চালে জালের একটা পাশের দিকে সরে গিয়ে চুপচাপ বসলো। রাতের দিকে দেখলাম মাকড়সাটা টুনটুনিটার উপর এসে বসেছে। পরের সমস্ত দিন এবং (অনুমান করি) রাত ও ঐ-অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু সকাল বেলা দেখি—জালটা একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এলোমেলো কোথাও কিছু নেই। মাকড়সাটা সেই অন্যান্য দিনের মতই জালের একপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে। কেবল, ব্যতিক্রমের মধ্যে নীচের মাটিতে টুনটুনিটার কোন দেহাবশেষ দেখতে পেলাম না।

ইউরোপের সোয়ালো বা আমাদের নাকুটি প্যাখদের জ্ঞাতিভাই আমার এই পাখি। পোশাকী নাম এর জানিনে। তবে জেলার কোথাও কোথাও এদেরকে 'চটা' পাখি বলে ডাকে। ছোট আকারের পাখি। ঘাড়ে-গদানে চেহারা। পায়ের নখ ভীষণ ধারালো, বাজপাখিদের মত, মানুষের শরীরের কোন অংশ একবার ধরতে দিলে কিছু রক্ত বার হতে না দিয়ে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। লেজটা নাকুটি বা সোয়ালোদের মত এদের অতটা লম্বা নয়, চেরা নয়—

খোল মত। পাখা থেকে লেজের শেষ প্রান্ত-রেখাটাও ওদের মত এদের অত সুডৌল নয়।

যত জায়গায় আমি এদের দেখেছি সর্বত্রই দেখেছি বাসা বাঁধবার জায়গা হিসাবে এরা বেছে নিয়েছে পুরনো আমলের পাকা বাড়ির কড়ি-বরগার ফাঁক-ফোকরগুলো। সেখানে এরা সরু সরু, শক্ত এক জাতের ঘাস, পাখির পালক ইত্যাদির মাধ্যমে কেমন এক রকম আঠালো পদার্থ দিয়ে খুবই মজবুত এবং সুরক্ষিত ভাবে বাসা বেঁধে বাস করে। বাসা বাঁধার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি আর পাঁচটা পাখিদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (এদেরই একটা জাতকে আমি লছমনঝোলায় সন্নিকটস্থ গীতা ভবনে সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে বাসা বাঁধতে দেখেছি, খণ্ডার ঘাটের rest shed-টাতেও দেখেছি)।

যাই হোক, আমার মেদিনীপুর শহরের বাসা বাড়িটায় এই পাখিদের একটা জমাটি আড্ডা ছিল (অবশ্য এখনও আছে)। সারা দিন ধরে এরা এমন কর্কশ গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি করে যে কান পাতা দায়। তবু ওরাও ছিল, আমিও ছিলাম।

একদিন সন্ধ্যার ঠিক পরে পরেই বাড়ির বাইরেকার বারান্দার আড্ডাটায় এদের ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলো। রাতের বেলায় এরা সাধারণত কোন ডাকাডাকি করে না। কোন কোনদিন যদিও বা করে থাকে কিন্তু তাতে তেমন গুরুত্ব দিইনে। কিন্তু আজকের চিৎকার-চেঁচামেচির স্বর এবং তীব্রতা একটু ভিন্ন ধরনের, কেমন একটা আর্তনাদের সুর—গুরুত্ব দিতে হলো। টর্চ-লাইটটা হাতে করে বাইরে এলাম। শব্দ লক্ষ্য করে আলো জ্বালালাম। জ্বালিয়েই চমকে উঠলাম—দেখি ছাতের (ceiling) বরগার সঙ্গে (আমার দেখা তিন জাতের ছাই-রঙা চামচিকের মধ্যে) মাঝারি জাতের একটা চামচিকে আলোচিত পাখিদের একটাকে ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরে ঝুলছে। তীব্র আর্ত চিৎকার এই ঝুলন্ত পাখিটার। অন্যান্য পাখিদের কেউ কেউ বাসার মধ্যে থেকেই ডাক হাঁক ছাড়ছে।

চামচিকেতে ব্যাং ধরে খায়, ফড়িং ধরে খায়—জানা ছিল। পাখি ধরে খায়, তাও আবার এমন ধারালো নখওয়ালা পাখি জানা ছিল না। চামচিকেটা পাখিটাকে মুখে করেই উড়ে বারান্দার অন্য একটা বরগায় গিয়ে ঝুলতে লাগলো, বাইরে অন্য কোথাও পালালো না। পাখিটা পালাবার জন্যে আগের মতই চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগলো, চামচিকেটা জুল জুল করে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বরগাটায় ঝুলতে থাকলো।

কোনরকম হই-হুল্লোড় আর না করে কি হয় দেখবার জন্য আলো জ্বেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম পাখিটার গোটা মুণ্ডুটা চামচিকেটার মুখের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচি ওসব হুল্লোড়ে কাণ্ড-কারখানা একেবারে স্তব্ধ। ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে পাখিটার দেহ ক্রমশ ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল তার পা-পালক-ঠোঁট-হাড় মাংস, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, সম্পূর্ণ এক ব্যস্ততাবিহীন অবস্থায়।

ভবেশ রায়
কেশিয়াড়ী। মেদিনীপুর।

জাদুঘর থেকে চুরি

বিগত ১৬ কার্তিক 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে 'যাদুঘর থেকে চুরি' প্রসঙ্গে শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তীর আলোচনাটি পাঠ করেছি। চব্বিশ পরগনা জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়ের বর্তমান দুরবস্থা ও এ ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্যে চক্রবর্তী মহাশয়ের মত আরও অনেকে মর্মাহত। তবে বেড়াচাঁপা সম্পর্কে চক্রবর্তী মহাশয়ের দু-একটি মন্তব্যের তথ্যগত আলোচনা প্রয়োজন।

চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে, 'গঙ্গারিডই নামে তখন বেড়াচাঁপা ছিল পরিচিত।' এ মন্তব্যের সমর্থনে কি অকাট্য যুক্তি বা সংশয়-হীন প্রমাণ প্রদর্শন করা যেতে পারে জানি না। 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪২) স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করেছিলেন, 'এই দিবগঙ্গাই ছিল, গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গাবন্দর —ইহাই আমাদের বিশ্বাস।' আলোচ্য গ্রন্থে (পরিশিষ্ট 'গ', পৃঃ ৪৬৭) আশুতোষ সংগ্রহ-শালার প্রাক্তন কিউরেটর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এ মন্তব্যের সমর্থনে লিখেছেন, "..... the conclusion of the renowned historian, Prof. Satish Chandra Mitra, some fifty years ago, that the city of Ganga the royal residence of the Gangaridai mentioned by Ptolemy and author of Periplus, likely to be located at Deganga, may be said to be almost prophetic". অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কারমাইকেল অধ্যাপক দীনেশ-চন্দ্র সরকারের মতে (দ্রঃ 'The City of Ganga'—The Proceedings of Indian History Congres 1947) বর্তমান সাগর দ্বীপে ছিল গঙ্গারেজিয়ার অবস্থান। বর্তমানকালের বেড়াচাঁপা (দেগঙ্গা) বা সাগরদ্বীপকে কোনো প্রত্ন-তাত্ত্বিক বা ভৌগোলিক প্রমাণ দ্বারা সংশয়-হীনভাবে প্রাচীন গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গে বন্দর বলে সনাক্ত করা আজিও সম্ভবপর হয়নি। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকে রচিত টলেমীর ভৌগোলিক পরিলেখনে সংযোজিত আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতের মানচিত্র অনুসরণে কোন গাণিতিক বা ভৌগোলিক হিসাব-প্রক্রিয়ায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া [illegible] পর নয়। প্রত্নস্থল বা ঐতিহাসিক [illegible] এ ধরনের কল্পনা-নির্ভর মন্তব্য বিভ্রান্তিকর।

আলোচনায় অন্যত্র চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন, 'গুপ্তযুগে তৈরী বাংলার সব থেকে পুরানো ইটে গাঁথা মন্দির 'খনা মিহিরের ঢিপি' খুঁড়ে বের করেছেন আশু-তোষ সংগ্রহশালা।' আবিষ্কৃত মন্দিরটি গুপ্তযুগের—এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে কি অকাট্য যুক্তি বা সংশয়হীন প্রমাণ প্রদর্শন করা যেতে পারে! দীর্ঘদিন পূর্বে আশুতোষ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ খনা-মিহিরের ঢিবিতে উৎখননকার্য পরিচালনা করে আলোচ্য মন্দিরের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করেন। এ উৎখননের আধিকারিক দ্বারা কৃত বিবরণী আজিও অপ্রকাশিত। সর্বশ্রী কুঞ্জ-বিনোদ গোস্বামী, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদগণ অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আলোচ্য মন্দিরটি গুপ্তযুগের বলে তাঁদের বিভিন্ন প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন। উৎখননিত প্রত্নস্থলে এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তিও রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আজিও বস্তুগত বা তথ্যগত সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব একান্তভাবে আবিষ্কৃত তথ্য ও বস্তু-গত প্রমাণ-নির্ভর। প্রত্নস্থল বা পুরাবস্তুর সময়কাল নির্ণয়ে কল্পনা-নির্ভর অনুমান শাস্ত্র তথা সত্যনিষ্ঠার পরিপন্থী।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১

কবিপত্নী মৃণালিনী

পত্নী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের মানসিক সম্পর্কের ব্যাপারে সম্প্রতি আপনাদের পত্রিকায় আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। নানা উদ্ধৃতির উল্লেখে আমরা উভয়ের মধ্যেকার প্রীতিমধুর সংযোগের কথা জানতে পারছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখা মৃণালিনী দেবীর কোন চিঠি সংরক্ষণ করেননি। কেন? পত্নীকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে এমন সব পঙ্‌ক্তি ও মন্তব্য আছে যা পড়ে মনে হবে বহু সময়ে মৃণালিনী দেবীর মনের আকাশে অভিমান এবং সংশয়ের বিষণ্ণ মেঘ সঞ্চিত হয়েছিল। এ সব-কিছু আমরা হয়তো দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিকতা বলে মেনে নিতাম যদি না রবীন্দ্রনাথের ওপর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সুবিপুল প্রভাবের প্রমাণ থাকতো। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা, যেখানে রবীন্দ্রনাথের পত্নীশোক শ্লোকে পরিণত হয়েছে, পড়লে অনুমান করা যায় আপনার সম্পূর্ণ প্রকাশে মৃণালিনী দেবী কুণ্ঠিতা ছিলেন এবং বিচ্ছেদের আলোকে কবির সে-কারণ অনুশোচনার চাপা স্বর যেন শ্রুত হয়। এ ছাড়া নানা বই-এর উৎসর্গে, [illegible] কবিতায় [illegible] দেবীর স্মৃতি-চারণের মধ্যে আমরা উভয়ের মধ্যে সুগভীর আত্মিক সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাই। প্রসঙ্গত,

২ নভেম্বর, ১৯৭৪-এর দেশ পত্রিকায় শ্রীঅবনীমোহন কুশারী যে কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে পত্নী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্য সংযোগের কথা বলতে চেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কবিতাটি (নিমন্ত্রণ) একদা জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে চন্দননগর বাসের মধুর স্মৃতিচারণ। এই রকম অন্য একটি কবিতা 'ছবি'। একজন বধূর পক্ষে স্বামীর ওপর জা-এর এই প্রভাব সহজ প্রশান্তিতে মেনে নেওয়া সম্ভব কিনা তা অনুমানের বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ! তাই সুগভীর স্নেহ সোহাগে 'ছুটি'র সব বেদনাকে অবলুপ্ত করে হৃদয়ের নিভৃত সিংহাসনে তাঁকে বসিয়েছিলেন। পত্নীর মৃত্যু কবির জীবনে যে কী বৃহৎ শূন্যতার সৃজন করেছিল তার প্রমাণ, "বুঝিয়াছি আজি./বহু কর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি/শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে./যদি সেই স্তূপাকার উদযোগের পিছে/না থাকে একটি হাসি: নানা দিক হতে/নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে/এক গৃহে ফিরে যদি নাহি নাথে স্থির/একটি প্রেমের পায়ে শত নত-শির।" (স্মরণ—২৩ সংখ্যক)

রথিন মিত্র
কলকাতা-৪

ঘরে বাইরে

'ঘরে-বাইরে'র লেখিকা শ্রীমতী 'চায়ের পেয়ালা'য় লিখেছেন (দেশ—১৯ অকটোবর '৭৪) "ট্যানিক অ্যাসিড থেকে চা-এর রং হয়।" এটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। Tea Tannin এ অ্যাসিড আছে ঠিকই (চারিত্রিক ভাবে) কিন্তু Tea Tannin আর Tannic Acid এক নয়, কেননা

"The Tannin of Tea, it must be clearly understood, is not the same as the tannic acid commonly used in medicine". (Johnsons Note Book for Tea Planters—শ্রীলঙ্কা থেকে প্রকাশিত। আরও পরিষ্কার উল্লেখ আছে Indian Tea its culture and manufacture বইতে। "Tea-tannis will not tan skins (for the tanning industry), and moreover is different from ordinary tannin or tannic acid, in its physiological effect on human system. Tannic acid is constipating whereas tea-tannin has a mildly laxative effect."

মুকুল চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৬

ব্যক্তিপূজা ও কমিউনিজম

গোর্কি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসু ৯ নভেম্বরের 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা শীর্ষক স্তম্ভে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক মতবাদের সাফল্য সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আদর্শের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় এবং সান্নিধ্য ছিল তাতে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তিনি কোন তকমা-আঁটা সুবিধাবাদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধেননি। চিরকাল একক নিঃসঙ্গ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু সোমেনবাবুর প্রাঞ্জল বক্তব্যের একাংশ সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। তিনি লিখেছেন, "ব্যক্তিপূজা যে কমিউনিজমের আদর্শের পরিপন্থী, সে কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ স্ট্যালিন প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন।" কমিউনিজমের ইতিহাস কিন্তু

অন্য কথাই বলে। এই ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে ব্যক্তিপূজা কমিউনিজমের পরিপন্থী নয়, পরিপোষক। মাও সে তুং থেকে শুরু করে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে যাঁরা এখন সিংহাসন দখল করে আছেন তাঁরা সকলেই বড় বা ক্ষুদে 'স্টালিন'। চীনে মাও সে তুং-এর নামে প্রশস্তি বচন প্রতিদিনই উচ্চারিত হয়। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে হয়তো এখন স্ট্যালিনের আমলের মত কোন এক ব্যক্তিগত নেতার উদ্দেশে পূজা নিবেদিত হয় না। কিন্তু সে-সব দেশে পুলিশী-রাষ্ট্র শাসনের কড়াকড়ির মধ্যে ব্যক্তিপূজা প্রচ্ছন্ন।

প্রকৃত কথা এই, ব্যক্তিপূজার সঙ্গে কমিউনিজমের কোন বিরোধ নেই। অন্যথায় লেনিনের মৃতদেহ 'মমি' ক'রে রাখার ঘটনাকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিপূজার উদাহরণ ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? এটি মিশরীয় 'পিরামিড' সভ্যতার পুনরাবৃত্তি নয় কি? কমিউনিজমকে যাঁরা 'সামগ্রিক বিজ্ঞান' বলে মনে করেন, তাঁরা কী বলেন?

হরি দাশগুপ্ত
জয়েশবর

গানের আসর

গান না স্বরলিপি-পাঠ

স্বরলিপি যেমন আমাদের একদিকে সুবিধা প্রদান করেছে, অপর দিকে বেশ খানিকটা অসুবিধারও সৃষ্টি করেছে। অসুবিধাটা তাদের কাছে যারা কেবলমাত্র স্বরলিপিটুকুই তুলতে শিখেছে কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। মনে হচ্ছে আজ আমাদের দেশে এদের সংখ্যাই বৃহৎ, নইলে যে গানই শুনি সে-গানই নিষ্প্রাণ স্বরসমূহের আবৃত্তি বলে মনে হয় কেন? পক্ষান্তরে, যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁরা স্বরলিপি দেখবামাত্র আঁচ করে নিতে পারেন সুরের ধরণটা, গানের ভঙ্গীটা কিরকমের হবে। তাঁদের কণ্ঠে স্বরলিপি থেকে তোলা গানও যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়। অতএব সঙ্গীতে ব্যাপক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন নইলে স্বরলিপির মেড-ইজিও নিষ্ফল হয়ে যাবে—যেমনটি চোখের সামনে দেখছি।

রবীন্দ্র সঙ্গীত যাঁরা বরাবর শুনে এসেছেন তাঁরা জানেন রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণশক্তি কত প্রবল; কত রকম আবেদন বিভিন্ন ভঙ্গীতে পৌঁছোচ্ছে কানে এবং তাঁদের মর্মস্পর্শ করছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে গাইতেন তাঁর গানের প্রতিটি ভাবকে বিশ্লেষণ করে —শ্রোতা গায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। দিনেন্দ্রনাথের গানেও তার পরিচয় পুরোপুরি ছিল এবং আরও ছিল তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ। বর্তমানে এর একমাত্র ধারক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। বহু শিষ্য শিষ্যা তাঁর কাছে শিখেছেন কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায় সেটি জানতে চেষ্টা করেছেন কি? হয়ত শুধু সুরটুকুই তুলে নিয়েছেন কিন্তু তার পরিবেশনের যে একটা বৃহৎ এবং মহৎ পদ্ধতি আছে, সেটা জানতে চেষ্টাও করেননি। পরলোকগত অনাদিকুমার দস্তিদার খুব সরলভাবে গান গাইতেন, কিন্তু যখনই তিনি গাইতেন গানের পরিচয়টুকু ব্যক্ত করে দিতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গান যখন দিলীপকুমার রূপায়িত করেন (দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব সুরে অবশ্য) তখন তার একটা দৃপ্ত, সাবলীল ভঙ্গিমা সবাইকে আকৃষ্ট করে, যাতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয়তা কোথায় বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না। অতুলপ্রসাদ নিজেও গাইতেন খোলা ভরাট গলায় তাঁর গান। সেখানেও তাঁর গানের উদাত্ত বৈশিষ্ট্যটুকু যেমন ধরা যেত তেমনি অনুভব করা যেত তাঁর সঙ্গীতের একটা মর্মস্পর্শী আকুতি। কাজী নজরুল ইসলাম যখন গাইতেন তখনও তিনি যেটি বোঝাতে চাইতেন সেটিকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করতেন।

এই যে প্রতিটি কম্পোজারের আবেদনের বিশেষ ভঙ্গী, তার বিশ্লেষণ আজকাল আর করা হয় না। অবশ্য আমাদের দেশে এটা বরাবরই অবহেলিত, তথাপি সেকালে একটা বলিষ্ঠ ভঙ্গী ছিল, একটা সহজাত উদাত্তভাব ছিল, যাতে গান এই অসহ্য ন্যাকামির স্তরে পর্যবসিত হয়নি। লালচাঁদ বড়ালের ছিল একটা নাটকীয় ভঙ্গী। গানের মাধুর্যকে তিনি তখনকার রীতিতে নানাভাবে লীলায়িত করতেন। আজকে সেসব ঢঙের অনেকখানি ভাল লাগবে না মোটেই, কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁদের গান সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি ছিল যেটা তাঁরা যথেষ্ট স্বকীয়তার সঙ্গেই ফোটাতে চাইতেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে—এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন; এই জন্য তাঁর গান এত জনপ্রিয় হতে পারত। এ যুগে শচীন দেববর্মণ বহু রেকরডেই গায়নভঙ্গীর বিশিষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী ইন্দুবালা কাজী সাহেবের নানান ধরনের গান রূপায়িত করেছেন তাঁর বিচিত্র বৈভব সম্পন্ন কণ্ঠে যাতে গানের বিশেষত্বগুলি নানাভাবে বিচ্ছুরিত হত।

আজকের গানে আর যাই হোক, বৈশিষ্ট্য বলে বস্তুটি অতি করুণভাবে তিরোহিত হয়ে চলেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই আড়ষ্ট স্তিমিত ভাবটি একান্তভাবে পীড়াদায়ক। স্বরলিপির দিক থেকে বিচার করলে কিছু বলবার নেই, সেটা ঠিকই তোলা হয়েছে; কিন্তু আসলে গানের যে প্রাণ তা যেন অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে কোনক্রমে গায়ক-গায়িকার ক্ষীণ কণ্ঠের দুর্বল আশ্রয়ে দ্বিধার সঙ্গে আত্মরক্ষা করে চলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গান, অতুলপ্রসাদের গান, কাজী সাহেবের গান— প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ওই একই কথা বলা যায়—কেবলই স্বরলিপির প্রতিচ্ছবি মাত্র, প্রাণের স্পন্দনাবেগে সমুদ্ভাসিত নয়। ফলে এক রচয়িতার সঙ্গে অপর রচয়িতার পার্থক্যও ধরা যায় না।

শিক্ষিতপটুত্ব আজকালকার দিনে দুর্লভ। অ্যাকাডেমিকভাবে গান শেখা আমাদের হয় না। এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা খুব কম যাঁরা বহুবিধ বাংলা গানে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং এমন ব্যক্তি আরও কম যাঁরা কম্পোজারদের বিশেষত্বগুলি শিক্ষার্থীদের গোচরে এনে তাঁদের কাছে একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগ্রত করতে সমর্থ। ফলে যে গাইতে শিখল সে তার পুঁজি বাড়াবার তাগাদায় বা রেডিওতে গাইবার জন্যই একাধিক গান শিখতে আগ্রহী হল এবং গানগুলি কোনক্রমে কণ্ঠধার্য করল মাত্র। ইস্কুল কলেজেও ওই একই রীতি—অমুক অমুক রচয়িতার এই এই গান সিলেবাসে আছে, অতএব সেগুলির স্বরলিপি যোগাড় কর এবং সেগুলি গলায় তোল। এইভাবে গান গেয়ে কি লাভ? অনেকে রবীন্দ্রনাথের খুব পুরাতন রচনাগুলি গাইছেন, কিন্তু হায় সেই যুগ সম্বন্ধে তাঁরা একান্ত অন্ধ। ফলে কি হচ্ছে? সেই স্বরলিপি-পাঠ ছাড়া তো আর কিছুই নয় —এ যুগের কণ্ঠে সে যুগের নিজস্ব আবেদনটি ফুটে উঠছে না। প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক গান শুনি কিন্তু তাতে কেবলমাত্র বহু কণ্ঠের সম্মেলন ছাড়া আর কোনও গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় না। গান আমাদের আর্টিস্টরা গেয়ে চলেছেন কিন্তু এই গাওয়াটুকুই সব নয়, প্রধান প্রেরণা গানের সৌন্দর্যগত উপলব্ধি। সেই এস্থেটিকস সম্বন্ধে সচেতন না হলে গানের রস কোনক্রমেই ফুটে উঠবে না;— আর কণ্ঠস্বরে আর একটু তেজ, বলিষ্ঠতা, প্রাণবন্ততা জাগ্রত করলে সেটা সঙ্গীতেরই চাহিদা মেটাবে, রুক্ষতার পরিচয় দেবে না।

শার্ঙ্গদেব

নব মূল্যায়ন

ত্রয়ী : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ডঃ অপর্ণা মৈত্র। প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৫.।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটি উপন্যাস যেমন সাহিত্যে 'ত্রয়ী' বলে খ্যাত তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'নৌকা-ডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাসত্রয়ও ত্রয়ী বলে পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থে লেখিকা বঙ্কিম-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী'-র আলোচনা করেছেন। লেখিকা তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাব-রাজ্যের রূপ ও রূপান্তরের একটি সুন্দর চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বাংলা সাহিত্যের এই দুই মনীষীই তাঁদের উপন্যাসের মাধ্যমে দেশের মানুষকে এই কথা জানাতে চেয়েছেন যে মানবিকতা ও জাতীয়তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর একথাও দুজনেই স্পষ্টভাবে তাঁদের রচনায় দেখিয়ে-ছেন যে চারিত্রিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নেই। তবে রাজনৈতিক নেতাদের মত রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউই জাতীয়-জীবনের সমস্যাকে হাল্কাভাবে দেখেননি। দুই মনীষীর 'ত্রয়ী'-র মধ্যে ভিন্ন প্রতিভার লক্ষণ অবশ্যই আছে তবে দুজনেরই যেন চিন্তার একটা যোগসূত্র রয়েছে। আর তাছাড়া 'ত্রয়ী' খ্যাত ছয়টি উপন্যাসেই মানবজীবনের প্রেমকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

লেখিকার বর্তমান গ্রন্থটি দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল। তিনি উল্লিখিত উপন্যাস সমূহের শুধু সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণই গ্রন্থে করেননি—ঐতিহাসিক, দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্র-নাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তবে ভিন্নভিন্ন উপন্যাসের ভাব-সাম্য সম্পর্কে বর্তমান আলোচনাটিই প্রথম বলে মনে হয়।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হবে বলে মনে করি। বর্তমান গ্রন্থটিতে গ্রন্থপঞ্জীর পাশাপাশি যদি একটি নির্ঘণ্ট থাকতো তাহলে ভালো হতো।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাত্রই তিন বছরের বিবাহিত জীবনের অবাদ, পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় নিখোঁজ স্বামীর স্মৃতি, নিজের রূপ-সৌন্দর্য, প্রখর বুদ্ধি, অসম্ভব সাহস এবং অটুট মনোবল—এই নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল একটি মেয়ে। নিজের চেষ্টায়, বহু প্রলোভনপিচ্ছিল পথ এড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে সে। একটি সচ্ছল চাকরি এবং মাথা গোঁজার জন্য চাকুরে মেয়েদের হস্টেলে একটি সীট—এই নিয়ে নন্দিতার দিন মন্দ কাটছিল না। সময় কাটাবার জন্য সন্ধ্যের দিকে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে ভর্তি হল নন্দিতা। সেখানেই পরিচয় তরুণ অধ্যাপক অমিতের সঙ্গে। নন্দিতার মারফৎই নন্দিতার রুমমেট রুবির সঙ্গে আলাপ অমিতের। রুবি এবং অমিতের পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা যখন স্বাভাবিক পথে এগোচ্ছে, তখনই যেন নন্দিতার রূপসচেতন মনে সুপ্ত এক যন্ত্রণা জেগে ওঠে। প্রথম এক ঈর্ষার কাঁটা বিদ্ধ করে নন্দিতাকে। এক রকম জোর করেই অমিতকে বিয়ে করে নন্দিতা। কিন্তু বিয়ের পরই ভুল ভাঙে। সব কিছুরই সময় বাঁধা। প্রাকৃতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করা যায় না। নন্দিতার বয়স আজ চল্লিশের অসার্থক দিকে নিষ্ঠুর ভাবে ঝুঁকে পড়েছে। এ-বয়সে আর নারীত্বের পূর্ণ পরিণতির দিকে ইচ্ছে থাকলেও পৌঁছনো যায় না। ক্লান্ত, বিষণ্ণ নন্দিতা পরাজয়কে মেনে নেয় নির্মম আত্মহননের মধ্যে দিয়ে।

তরুণ কথাশিল্পী বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস **বিষণ্ণ পরবাস**-এ (সুপ্রকাশন, কলকাতা-৯, সাড়ে সাত টাকা) বেশ স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন একটি গতিময় কাহিনীকে। নন্দিতার আত্মহত্যার পূর্বে তার ভাবনা ও যন্ত্রণার ছবিটি তিনি যে দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন তা বিশেষভাবে অভিনন্দনের যোগ্য।

*

কবি হিসেবে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের পরি-চিতি খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্য-

গ্রন্থের সংখ্যা ইতিমধ্যেই চার ছাড়িয়েছে। অন্দুত সঙ্গীত (উলুখা প্রকাশন, কলকাতা-১২, চার টাকা) তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ।

সম্প্রতি ও পরিচ্ছন্ন এই কাব্য সংকলনের কবিতাবলী পড়ে কবির সম্বন্ধে স্পষ্ট একটি ধারণা পাঠকের মনে চিহ্নিত হয়ে যায়। তরুণ কবির পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতার প্রধান গুণ, তিনি খুব অস্পষ্ট হন নি কোথাও। সহজ, অথচ রহস্যময়তা-বর্জিত নয় তাঁর কাব্যপঙক্তি। তাঁর আরেকটি সুলক্ষণ, সুরেলা একটি ভঙ্গি তিনি আদ্যন্ত রক্ষা করে চলেছেন। কি গদ্য কবিতায়, কি ছন্দোবন্ধ রচনায়—তিনি সর্বত্র সুরনির্ভর। ফলে একটা গুনগুন রেশ তাঁর কবিতায় আবহ রচনা করে। এইরকম একটি ছন্দোবন্ধ রচনার নমুনা—"তাকে দেখেই কাটাচ্ছি দিন, কেটে যাচ্ছে সময়। / তাকে দেখেই দুঃসাহসীর তৃষ্ণা যাচ্ছে বেড়ে। / তাকে দেখেই কেটে যাচ্ছে দুপুরে বেলার ভয়, / রাত্রি জাগা ফুলের স্মৃতি কেবল মনে পড়ে!" (জাদুকরী)

*
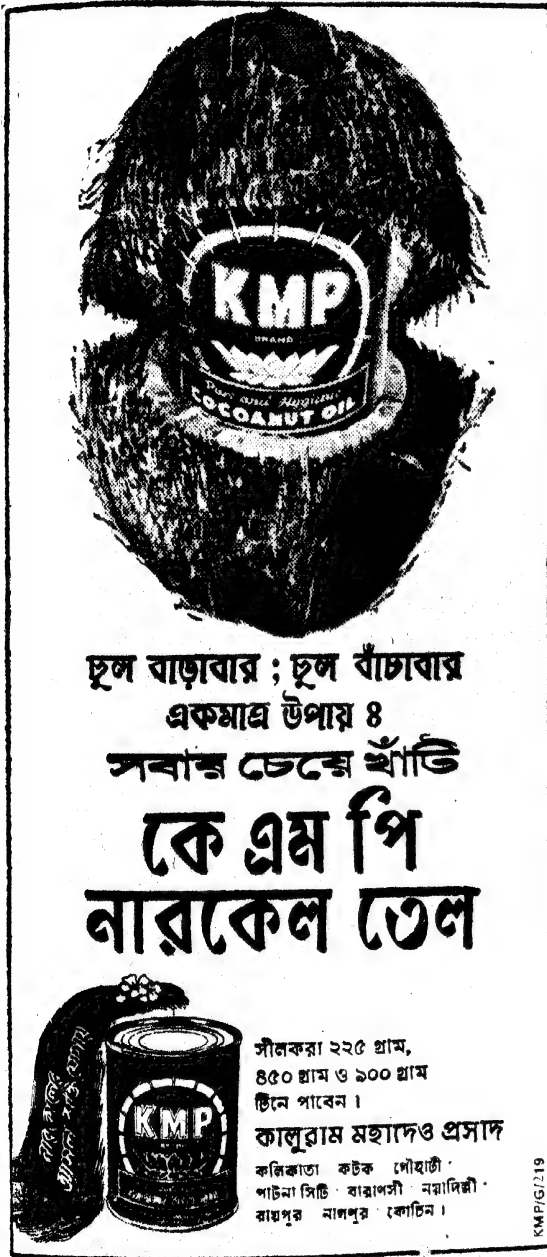
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্বর্গতা শেফালি নন্দীর বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল 'নানা চিন্তা'র প্রথম খণ্ডে। সম্প্রতি শ্রীমতী নন্দীর নানা বিষয়ে লেখা টুকরো প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে প্রকাশিত হয়েছে নানা চিন্তা (দ্বিতীয় খণ্ড) (পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, পাঁচ টাকা)।

পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গতা নন্দীর রচনায় পাণ্ডিত্যের অভিমান কিংবা অভিজ্ঞতার অহংকার কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এক ধরনের সরল আন্তরিকতা তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদেশ ভ্রমণের এক ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত। কিন্তু সর্বদাই তিনি শিক্ষামূলক তথ্য সরবরাহ করেছেন। 'বিলাতের রান্নাঘর', 'ক্রেতা প্রতিরোধ' কিংবা 'শেক্সপীয়রের কয়েকটি নারী চরিত্র' যেমন মহিলামহলের নিজস্ব বক্তব্য, তেমনি 'আমাদের ছেলেমেয়েরা', 'একটি শিশু নিকেতন' কিংবা 'শিশুর ভবিষ্যৎ' জাতীয় প্রবন্ধে শিক্ষিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়। বাংলা ছাড়াও ইংরেজী দুটি প্রবন্ধ এই সংকলনে রয়েছে। তার মধ্যে 'ডাঃ মারিয়া মন্তেসরী' প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

*

অসীমানন্দ মহারাজ বোধহয় আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে, তাঁর উপন্যাসের নাম দেবেন বাসবধূ (জ্যোতি প্রকাশন, কলকাতা ৯, সাত টাকা)। সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত ছোটগল্পের সাম্প্রতিক সাফল্যই সম্ভবত তাঁকে এহেন অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। কিন্তু এর ফলে তাঁর উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায়টি যে একেবারে অযথা যোগ করতে হয়েছে, এবং খাপছাড়া এই ঘটনাপ্রবাহ যে একেবারেই সঙ্গতিবিহীন যে-কোনো পাঠকেরই তা চোখে পড়বে। বস্তুত তাঁর উপন্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এসেই। কিন্তু শ্মশানের রচনা যাঁর লক্ষ্য তিনি 'বিড়াল'-এর ওপর রচনা লিখলেও শেষ করবেন শ্মশানে এনে, অকারণ প্রাণী হত্যার সুযোগ নিতেও তাঁর বাধবে না—এ-গল্প আমরা জানি। সুতরাং অবাক হই নি।

তবে মূল উপন্যাসের কাঠামো মোটামুটি সুখপাঠ্য—এ-টুকুই সান্ত্বনা।

বার্নার্ড জুলিয়েন সোবার্সের ছায়া

ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর পঁচিশ বছর বয়সী খেলোয়াড় বার্নার্ড ডেনিস জুলিয়েন আটটি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছে। দলের সত্যিকারের তিনজন অল-রাউণ্ডারের অন্যতম। আটটি টেস্টে ৪৩·৫৫ অ্যাভারেজে রান করেছে ৩৯২। একটি সেঞ্চুরিও আছে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। উইকেট পেয়েছে ২৩টি। গড় ২৮। বল করে বাঁ হাতে। ব্যাট করে ডান হাতে। যে কোন পজিশনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফিল্ডার।

বর্তমানে পৃথিবীর বিরল বোলারদের অন্যতম বার্নার্ড জুলিয়েন। কেননা বিশ্ব ক্রিকেটে বাঁ-হাতি পেস বোলারের সত্যিই অভাব আছে। নামী ন্যাটারা অধিকাংশই ধীর বোলার। অ্যালান ডেভিডসনের অবসর গ্রহণের পর অস্ট্রেলিয়ায় একজনও বাঁ-হাতি পেস বোলার তৈরী হয়নি। ডেনিস লিলি, মবৃ ম্যাসী, জেফ্ হ্যামণ্ড, ম্যাক্স ওয়াকার—সবাই ডান হাতের বোলার। ভারতে বা পাকিস্তানে বাঁ-হাতি পেসার নেই। ইংলণ্ডের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। যদিও কয়েকজন তরুণ এসেক্সের জন লিভার, নটস-এর ব্যারী স্টিড, ওয়ারউইকশায়ারের মিক রাউস ও ইয়র্কশায়ারের আর্থার রবিনসন এখন রয়েছে সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। নিউজিল্যাণ্ডে রিচার্ড কলিঞ্জ ছাড়া আর কেউ নেই। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গ্যারি সোবার্সের পর একমাত্র জুলিয়েন। সুতরাং সোবার্সের পরিপূরক। অল-রাউণ্ডার হিসাবেও বটে। অন্তত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের ধারণা, অল-রাউণ্ডার হিসাবে সোবার্সের শূন্য স্থান পূর্ণ করার মত সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় জুলিয়েন।

লেফট-আর্ম পেস বোলারদের বৈশিষ্ট্য, তারা প্রায়শ ব্যাটসম্যানদের বিপাকে ফেলে। বিশেষ করে ডান-হাতিদের নতুন বলের প্রথম পাঁচ-ছয় ওভারে। তাদের বলের লাইন একটু ভিন্ন ধরনের। যখন তারা রাউণ্ড দি-উইকেট বল করে তখন ব্যাটসম্যানের কাছে সাধারণত বল আসে ইন্-সুইঙ্গার হয়ে। কিন্তু যখন ওভার-দি-উইকেট বল করে তখন বলের গতি ও নিশানা ঠাহর করা বড় ব্যাটসম্যানের পক্ষেও শক্ত হয়ে ওঠে। বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যানই বাঁ-হাতি পেসারকে পছন্দ করে না।

গ্যারি সোবার্স লিখেছেন, "ইংলণ্ডের এক নম্বর ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট কোনদিনই আমার প্রথম পাঁচ-ছয় ওভার আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেননি। এবং অন্যান্য টেস্ট বোলারদের তুলনায় আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বার তার উইকেট পেয়েছি।"

ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কলিন কাউড্রে লিখেছেন, "বোলারের গুণ বিচার হয় বেস্ট ব্যাটসম্যানের উইকেট গ্রহণে। জুলিয়েন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে ৮টি টেস্ট খেলেছে তার মধ্যে পাঁচবার নিয়েছে আমাদের বেস্ট ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কটের উইকেট।"

১৯৭৩এ ইংলণ্ড সফরের ৩টি টেস্টে জুলিয়েন ১২১ রানের একটি সেঞ্চুরি সহ ২২০ রান করেছিল। গড় ছিল ৪৪। উইকেট পেয়েছিল ৭টি। কিন্তু এ বছর ইংলণ্ডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে

বার্নার্ড জুলিয়েন

পাঁচটি টেস্টে ১৬টি উইকেট পেয়ে বোলিং অ্যাভারেজের শীর্ষ স্থান পেয়েছে। পাঁচ ইনিংসে রানের গড় ৪৩।

জুলিয়েন এক ক্রিকেট পরিবারের ছেলে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের সেই দ্বীপের ছেলে, যে দ্বীপ থেকে বিশ্ব ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছে জেফ্ স্টলমেয়ার, গেরি গোমেজ, জো ক্যার, ওয়েসলী হল এবং চার্লি ডেভিডসের মত সব খেলোয়াড়। জুলিয়েনের বালক জীবনের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠারও প্রতিশ্রুতি ছিল। ১৩ বছর বয়সে ত্রিনিদাদ প্রাইমারী স্কুল দলের হয়ে দু সপ্তাহের সফরে বারবাডোজে গিয়ে সেখানকার 'ক্রিকেট-দেবতা' সোবার্সের শিশুকালের স্মৃতি জাগিয়েছিল। ১৬ বছর বয়সে সেণ্ট মেরীজ কলেজ (আসলে স্কুল) দলের পক্ষে করেছিল ২১০ নট আউট। স্কুল ছাত্রের পক্ষে স্মরণীয় ইনিংস। তারপর নং বনাম সাউথ-এর খেলায় নতুন বলে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সমেত পেয়েছিল ৫৯ রানে ৮টি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটে এই সম্ভাবনা সত্বেও সেখানে কিন্তু ওর প্রতিষ্ঠার পথ খোলেনি। জুলিয়েনকে বড় ক্রিকেটের মধ্যে টেনে এনেছিলেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ১৯৬৯এ যখন ইংলণ্ড দল নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়েছিলেন। ওর গায়ে সোবার্সের গন্ধ পেয়ে কাউড্রে ওকে নিজের কাউন্টিতে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কেণ্টের দ্বিতীয় দলে জুলিয়েনের প্রথম বছরের খেলা খুব উৎসাহব্যঞ্জক না হলেও প্রমাণ মিলেছিল ছেলেটির মধ্যে ক্রিকেট-গুণের ঘাটতি নেই। অভিজ্ঞতার অভাব আছে। অবশ্য কাউড্রেই লিখেছেন—জুলিয়েন ইংলণ্ডে এসেছিল জীবনের মহা-দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে। আসার আগে বাবা ও মাকে হারিয়েছিল। সম্ভবত তাই খেলার উপরও পড়েছিল মানসিক অনিশ্চয়তার ছাপ।

কিন্তু যে সত্যিকারের শক্তি ও নৈপুণ্যের অধিকারী বেশী দিন তার মন্দাভাব থাকে না। ১৯৭২-এ জুলিয়েনও কেণ্ট কাউণ্টির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করে। নর্দাণ্টস-এর বিরুদ্ধে ৯০ মিনিটে তার ৯০ রান ভারতীয় বোলার বেদীর এক দুঃখজনক স্মৃতি। গিলেট কাপের প্রথম খেলায় বয়কটের উইকেট সমেত ইয়র্কশায়ারের পাঁচটি উইকেট মাত্র ২৯ রানে দখল করায় 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর পুরস্কার পায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে তার প্রথম ডাক পড়ে ১৯৭৩-এ ইংলণ্ড সফরের জন্য। এজবাসটনের দ্বিতীয় টেস্টে তার ৫৪ রান এবং ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে তার সেঞ্চুরির মধ্যে ছিল শিল্পীর ছাপ এবং সহজাত শক্তির প্রকাশ-লাবণ্য।

চমৎকার দেহের গড়ন বার্নার্ড জুলিয়েনের। স্বাস্থ্যের অধিকারী। পেশল দেহ, অথচ শক্ত-সমর্থ। বাহুর শক্তি যে-কোন শক্তিধর খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনীয়। নিক্ষিপ্ত বলের পাল্লা মাঠপ্রান্ত পর্যন্ত। আবার বারবাডোস টেস্টে ওর হাতে ক্যাচ আউট হবার পর ইংলণ্ডের ডেনিস অ্যামিস স্বীকার করেছেন, 'জুলিয়েন সুপার্ব ক্লোজ ফিল্ডার'।

মুকুল

খেলার মাঠে

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নাটক জমে উঠেছে। পুনায় পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে প্রথম ম্যাচের প্রথম বলে সূচনাকারী ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডারিকস-এর আউট হওয়া যেন ক্রিকেটের নাটকীয়তা এবং অনিশ্চয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখন আকাশে বাতাসে ক্রিকেট বাণী। প্রতিশ্রুতিমত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা প্রাণবন্ত ক্রিকেটের প্রত্যাশা পূর্ণ করে চলায় তাদের খেলা দেখার আকর্ষণও দিন দিন বাড়ছে। ডিসেম্বরের ২৭ থেকে জানুয়ারীর ১ তারিখ পর্যন্ত (৩০ ডিসেম্বর বিরতি) কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় টেস্ট খেলার উদ্যোগ আয়োজনে ইডেন এখন সরগরম। সারা শহরের ক্রীড়ামোদীরা চঞ্চল। টেস্ট টিকেট নিয়ে চলছে কানাকানি। একখানা টেস্ট টিকিট এখন সাত রাজার ধন এক মানিকের মত।

ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের নেপথ্য নাটকও বেশ একটু জমে উঠেছে প্রথম টেস্ট দল থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাঁ-হাতি স্পিন বোলার বিষেন সিং বেদী বাদ পড়ায়। বেদীর বিরুদ্ধে এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তার অপরাধ, ইংলণ্ড সফরের সময় ক্রিকেট বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে টেলিভিশনে অবতীর্ণ হওয়া এবং সম্ভবত কিছু খোলা কথা বলা। যে কথাগুলো বোর্ডের বাদশাজাদাদের বদহজম হয়ে থাকতে পারে।

বেদীকে আমি ধোয়া তুলসী বলছি না। বোর্ডের নিয়মাবিধি অবশ্যই তার মেনে চলা উচিত ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের আগে তার বিচারটা কি শেষ করা যেত না? এতদিন বোর্ডের কর্তারা কি ঘুমুচ্ছিলেন? ইংলণ্ড সফরে সামগ্রিক ব্যর্থতা, হাই কমিশনার্সের পার্টিতে দেরিতে পৌঁছে খেলোয়াড়দের অশালীন আচরণ, দোকান থেকে মোজা চুরির অপরাধে সুধীর নায়েকের জরিমানা প্রভৃতি ঘটনা তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটিই বা বেদী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিল না কেন? কোন কোন খেলোয়াড়ের আচরণে দেশ হিসাবে ভারতের উপর যেটুকু কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে, টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বেদী নিশ্চয়ই সে ধরনের অপরাধ করেনি। তবু সে আজ পাপিষ্ঠ। বোর্ডের রায়ে অন্যরা ঘটনার শিকার মাত্র। সুতরাং, নিরপরাধ। বিচিত্র আমাদের বিচার ব্যবস্থা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের সঙ্গে বোধ হয় একটি অভিশাপ জড়িয়ে আছে। ১৯৪৮-৪৯-এ প্রথম সফর থেকেই সেই সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই অধিনায়ক লালা অমরনাথের টসে পরাজয় এবং আম্পায়ারদের খামখেয়ালীতে পঞ্চম টেস্ট জয় থেকে বঞ্চনা বোধ হয় সেই অভিশাপেরই ফল। ১৯৫৮-৫৯-এর সফর আরও অভিশপ্ত। পাঁচটি টেস্টে অধিনায়কত্বের ভার পড়েছিল চারজনের উপর। ক্রিকেট শিবির তখন প্রায় ছিন্নভিন্ন। আর ১৯৬৬-৬৭র সফরের কথা ভুলে থাকাই ভাল। কলকাতা টেস্টে অগ্নিকাণ্ডের সে স্মৃতি মনে পড়লে টেস্ট টিকিটের কালোবাজারীরাও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে পারে। বেদীকে কেন্দ্র করে এবার আবার ঝড়-ঝাপ্টার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

টেস্টের আগের তিনটি খেলায় ৩০২৮ রান

পুনায় পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে এবং ইন্দোরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে তিন দিনব্যাপী দুটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সফরের তৃতীয় খেলায় ৯ উইকেটে বিজয়ী হয় দক্ষিণাঞ্চল দলের বিরুদ্ধে। তিনটি খেলাতেই তারা চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলেছে হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে। জয়ের জন্য ১০০ মিনিটে ১৬৩ রান করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মাত্র ৭৫ মিনিটে ওই রান তুলে দিয়ে তারা প্রথম জয় করায়ত্ত করেছে। কিভাবে খেলতে হয় এবং কিভাবে তার আকর্ষণ বজায় রাখতে হয় এই খেলাটি তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের পরাজিত অধিনায়ক বেঙ্কট-রাঘবনেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। যে খেলার গতি ছিল ড্র-র দিকে দুই অধিনায়কের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার ফলে সে খেলার ফল নিষ্পত্তি হয়েছে। দর্শকরা খেলা উপভোগ করেছে মারমুখী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যানদের মারের শক্তি ও সাবলীলতা দেখে।

তিনটি খেলায় মোট সংগৃহীত হয়েছে ৩০২৮ রান ৫১টি উইকেটের বিনিময়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা ১৮ উইকেটে সংগ্রহ করেছে ১৫৯৩ রান। পশ্চিমাঞ্চল, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণাঞ্চলের খেলোয়াড়রা সংগ্রহ করেছে ৩৩ উইকেটে ১৪২৫ রান। সেঞ্চুরি হয়েছে মোট ৮টি। সেঞ্চুরি করেছে ৭ জন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অন্যতম ওপেনার লিওনার্ড বেচন একাই করেছে দুটি সেঞ্চুরি। অপর ওপেনার রয় ফ্রেডারিকস করেছে একটি ডাবল সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরির হিসাব নিম্নরূপঃ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible]—ভিভিয়ান রিচার্ড—১০[illegible] নট আউট (পুনায় পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে)। লিওনার্ড বেচন—১৫৮ ও ১১৪ নট আউট (ইন্দোরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে)। রয় ফ্রেডারিকস—২০২ (ইন্দোরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে)। আলভিন কালীচরণ—১৫১ (হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে)।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরি—অংশুমান গাইকোয়াড়—১০৫ (ইন্দোরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে)। গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ—১১৪ (হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে)। ব্রিজেশ প্যাটেল—১০৬ (হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে)।

তিনটি খেলায় তিন হাজারের উপর রান সংগৃহীত হওয়া থেকেই প্রমাণিত হয়েছে পুনায়, ইন্দোরে এবং হায়দরাবাদে পীচ ছিল ব্যাটসম্যানের সহায়ক। বোলাররা ওই পীচ থেকে কোন সুযোগ পায়নি। তা হলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলারদের সম্পর্কে আমাদের যে ভীতি ছিল অন্তত প্রথম তিনটি খেলায় তারা তার প্রমাণ দিতে পারেনি। হায়দরাবাদে ব্রিজেশ এবং বিশ্বনাথ তো নতুন বলের আক্রমণের বিরুদ্ধেও হাত খুলে ব্যাট চালিয়ে পঞ্চম উইকেটে যোগ করেছে ২১০ রান। ভীতি-জাগানো বোলার অ্যানডি রবার্টস বা ভ্যানবার্ন হোল্ডার তাদের কাছ থেকে কোন সমীহ পায়নি। পুনায় গাভাসকার (৮১ রান), নায়েক (৬৫ ও নট আউট ৬৮ রান) কানিৎকার (নট আউট ৭০ রান) এবং মানকড়ও (৬৯ রান) ব্যাট করেছে বোলারদের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ডি কে গাইকোয়াড়ের পুত্র অংশুমান গাইকোয়াড় ইন্দোরে প্রথম সেঞ্চুরি করে প্রমাণ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের বিরুদ্ধে খেলা শক্ত নয়।

সমভাবে ভারতের বিশ্বখ্যাত স্পিনাররাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যানদের কাছে কোন সমীহ পায়নি। তিনটি খেলায় তারা প্রমাণ করেছে তাদের ওপেনিং জুড়ির সমস্যা নেই। তিনজন ওপেনার গ্রিনিজ, ফ্রেডারিকস এবং বেচন যেমন আত্মবিশ্বাসী, তেমনই দৃঢ়। তিনজনেরই হাতে আছে চাবুকের মত মার। তিনটি খেলার পাঁচ ইনিংসে গ্রিনিজের রান লক্ষ করার মত। ৬৬, ৬৯, ৭০, ৫৫ নট আউট এবং ৩২—গড় ৭৩। প্রয়োজনে অধিনায়ক লয়েডও ওপেন করতে পারে। হায়দরাবাদ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ৭৫ মিনিটে ৭৯ রান সংগ্রহ তার প্রমাণ।

ভারতের কিন্তু ওপেনিং জুটির সমস্যা বহুদিনের। বিগত ইংলণ্ড সফরে গাভাসকারের সঙ্গে তিনটি টেস্টে তিনজন

ওপেন করেছিল। প্রথম টেস্ট ব্যাঙ্গালোর, দ্বিতীয় টেস্টে এনজিনিয়ার, তৃতীয় টেস্টে দুর্ধর্ষ নায়েক। ব্যাঙ্গালোর টেস্ট শেষ হবার পর এ লেখা পাঠকদের হাতে পড়বে। ব্যাঙ্গালোরে গাভাসকারের সঙ্গে কে ইনিংসের সূচনা করে লক্ষ করার বিষয় এবং লক্ষ করার বিষয় অধিনায়ক হিসাবে ভারত দলে ফিরে এসে পাতাউডি কতটা স্থান পান কিনা।

বোম্বাই গ্রাঁ-প্রীর কথা

নিউজিল্যান্ডের ২৭ বছর বয়সী খেলোয়াড় ওনি পারুনের বোম্বাই গ্রাঁ-প্রী জয় প্রতিযোগিতার সামগ্রিক ধারার অপ্রত্যাশিত ফল, যদিও পুনাতেও ছিল। বাছাই তালিকায় পারুন দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানে ছিল অস্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড় টনি রোশ-এর। ফাইনালে রোশকেই ৬—৩, ৬—৩ ও ৭—৬ গেমে পরাজিত করে পারুন বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ট্রফির সঙ্গে পুরস্কার অর্থ পেয়েছে ৮৮০০ ডলার। আমাদের টাকার হিসাবে ৬৬ হাজার টাকা। তার চেয়েও বড় কথা, কমার্শিয়াল ইউনিয়নের গ্রাঁ-প্রীর অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিযোগিতা জয়ের ফলে পারুনের নামের পাশে যোগ হয়েছে ৪০টি পয়েন্ট, বিশ্ব টেনিসের ক্রমপর্যায়ে যার মূল্য অনেক।

গতবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম গ্রাঁ-প্রীর পর ভারতে এটি দ্বিতীয় গ্রাঁ-প্রী, যদিও প্রধান উদ্যোগী গড্‌ফ্রে ফিলিপস প্রতিযোগিতার নাম "ফোর স্কোয়ার কিং ওপেন" টুর্নামেন্ট অনুমোদন করে নিয়েছিলেন। তবু এটি ভারতের দ্বিতীয় গ্রাঁ-প্রী বা ওপেন টুর্নামেন্ট হিসাবেই পরিচিত। গত বছর দিল্লি গ্রাঁ-প্রীতে পুরস্কার অর্থ ছিল ২৫ হাজার ডলার। এবার পুরস্কারের অর্থ দ্বিগুণ করা হয়েছিল নামী খেলোয়াড়দের আগ্রহ বাড়াতে। কিন্তু অতীত দিনের দু'চারজন নামী খেলোয়াড় ছাড়া বর্তমানে পৃথিবীর প্রথম সারির কোন খেলোয়াড় বোম্বাইয়ে খেলতে আসেন। তবে ভারতের প্রথম সারির সব খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিদেশের বেশ কিছু উঠতি তরুণ খেলতে এসেছিল। যেমন সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছর বয়সী ছাত্র জন অ্যান্ড্রুজ, পশ্চিম জার্মানির রলফ গেরিং, উলি পিনার, উলি মার্টিন, হল্যান্ডের রলফ থুং, চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলান হোলেনেক প্রভৃতি। বয়সী খেলোয়াড়দের মধ্যে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা, আমেরিকার ব্যারী ম্যাকে, অস্ট্রেলিয়ার টনি রোশ এককালে ছিল বিশ্ব টেনিসের সব গালভরা নাম। কিন্তু সবারই গৌরবের দিন অস্তমিত। ১৯৬৯-এর উইম্বলডন সেমি-ফাইনালিস্ট ব্যারী ম্যাকের কাছ থেকে ৩৯ বছর বয়সে কি খেলা আশা করা যেতে পারে? কিংবা প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ম্যানুয়েল সান্তানা কি ৩৬ বছর বয়সে যৌবনের খেলার দীপ্তি ফিরে পেতে পারে? আমাদের জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালও কি ফিরে পেতে পারেন আগের খেলা? অবশ্য কেউ কেউ খেলার মধ্যে অতীত দিনের ছিটেফোঁটা ছাপ না ফুটিয়েছে, এমন নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বোম্বাই গ্রাঁ-প্রীর খেলা দিল্লির মত জমেনি, পুরস্কার অর্থ দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও।

ওনি পারুনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ প্রতিযোগিতার খেলার সঙ্গতিসূচক ফল, আগেই লিখেছি। এই জন্যই লিখেছি যে, প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত একটি সেটও না খুইয়ে সে বিজয়ী হয়েছে। অপর দিকে তার ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী টনি রোশ সেমিফাইনাল ওঠা পর্যন্ত প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে একটি করে সেট হারিয়েছে। ফাইনালে পারুনের কাছে তো হেরেছে স্ট্রেট সেটেই। তবে সেমিফাইনালে ২৯ বছর বয়সী রোশ সেমি-ফাইনালে আমেরিকার সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় ২২ বছর বয়সী জন অ্যান্ড্রুজকে ৫০ মিনিটের মধ্যে হারায় স্ট্রেট সেটে, যে অ্যান্ড্রুজের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হারস্বীকার করে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ম্যানুয়েল সান্তানা।

ভারত চ্যাম্পিয়ন বিজয় অমৃতরাজের কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয় অপ্রত্যাশিত ফল। গতবার দিল্লি গ্রাঁ-প্রী চ্যাম্পিয়ন বিজয় সহজভাবে স্ট্রেট সেটে হেরে যায় অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ দেহী খেলোয়াড় ডিক ক্রিলির কাছে। বিজয়ের দেহের উচ্চতাও কম নয়। ছ' ফুটের উপরে। কিন্তু ক্রিলি ছ' ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি মাথায় উঁচু। দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়ের বাড়তি সুযোগ থাকে। কিন্তু একুশ বছর বয়সী বিজয়ের পক্ষে ত্রিশ বছরের ক্রিলির কাছে এমন হার রীতিমতই অপ্রত্যাশিত। প্রথম রাউন্ডে বয়সী আখতার আলির সঙ্গেও বিজয় ভাল খেলতে পারেনি।

তুলনায় বিজয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর আনন্দ অমৃতরাজ অনেক ভাল খেলেছে। স্বদেশের বিদ্যুৎ গোস্বামী এবং বিদেশের রলফ থুংকে হারাবার পর কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছে টনি রোশ-এর সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে। ৬—৪-এ প্রথম সেটটি পায় আনন্দ। ৬—৪-এ দ্বিতীয় সেটটি টনি রোশ। মীমাংসাসূচক তৃতীয় সেটটি চলে ২২ গেম পর্যন্ত। ১৮ গেমে ম্যাচ পয়েন্টের মুখে এসেও আনন্দ শেষ পর্যন্ত ১০—১২ গেমে হেরে যায় রোশ-এর অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামী শক্তির কাছে। বলতে গেলে রোশ-আনন্দ কোয়ার্টার খেলাটি বোম্বাই গ্রাঁ-প্রীর সব চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা। স্ট্রেট সেট জয় সত্ত্বেও পারুনের আকর্ষণীয় খেলাটি হয়েছে সেমি-ফাইনালে ওনি পারুন ও ডিক ক্রিলির মধ্যে। টাই ব্রেকারে ৭—৬ ও ৭—৬-এ দুটি সেট জিতে পারুন ফাইনালে ওঠে। ক্রিলি ছিল ৮ নম্বর বাছাই। অবাছাই খেলোয়াড় হয়েও বাছাইদের শ্রেণী ভাঙ্গ দিয়েছে আমেরিকার জন অ্যান্ড্রুজ এবং ভারতের আনন্দ অমৃতরাজ। তৃতীয় বাছাই বিজয়ের ব্যর্থতা এই কারণে আরও উল্লেখ্য যে প্রথমে যে বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছিল তাতে বিজয়ই ছিল শীর্ষস্থানে। পরে খেলোয়াড়দের বিদেশের ফলে বাছাই তালিকা বদল করতে হয় এবং গ্রাঁ-প্রীতে প্রাপ্ত পয়েন্ট ও স্থানের হিসাব অনুযায়ী বাছাই তালিকা তৈরি হয়।

বিজয় অবশ্য তার সিঙ্গলসে পরাজয়ের গ্লানি আংশিক মুছে দিয়েছে সহোদর আনন্দর সঙ্গে ডাবলস জয়ীর খেতাব পেয়ে। বলবার কথা, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলীয় জুটি টনি রোশ ও বিল বাউরিকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে বিজয় ও আনন্দ ফাইনাল জিতেছে ফরাসীর ওপেন চ্যাম্পিয়ন ওনি পারুন ও ডিক ক্রিলির বিরুদ্ধে।

সারা প্রতিযোগিতায় কোন সেট না হারিয়ে পারুনের সহজ সাফল্য ভারতের বেশ একটু মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। কেননা, আগামী ৯—১১ জানুয়ারি লক্ষ্ণৌতে ডেভিস কাপের খেলায় ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। ওনি পারুন সেখানে হবে ভারতের জয়ের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ব্যবসায়িক মনোভাব

একটি সঙ্গত প্রশ্ন: কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট খেলা দেখার টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি কি দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার বর্তমান সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? অথচ রাজ্য সরকারই সরকারী প্রেসনোটে মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন করেছেন। বিগত ভারত-ইংলন্ড টেস্ট খেলায় টিকিটের দাম ছিল ২০, ২৫, ৪৫, ৬০ ও ২০০ টাকা। এবার ৪৫-এর জায়গায় করা হয়েছে ৫৫, ৬০-এর বদলে ৯০, ২০০র পরিবর্তে ৩৫০।

টেস্ট খেলার টিকিট নিশ্চয়ই ভারি শিল্প বা কুটির শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য নয়। সি এ বি ও নয় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। তবু কেন এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি? বিশেষ করে ব্যাঙ্কে যে সি এ বির ৫০ লাখ টাকা জমা আছে, মাসে মাসে যার সুদ বাড়ছে—সেই সি এ বিকে টিকিটের দাম বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি।

একলব্য

অবসর বিনোদন ছাড়াও সিনেমায় গভীরতর বস্তু যাঁরা খোঁজেন কিংবা নতুনতর বিষয় বা আঙ্গিকের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান, তাঁরা সকলেই ডি সিকার মৃত্যুতে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত মনে করবেন। এই ক্ষতি সিনেমারও। ডি সিকার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাইসিকল থিভস-এর কথা মনে পড়ে। পরবর্তীকালে তিনি কিছু মনোরঞ্জক ছবিও করেছিলেন। যেগুলি এখানকার দর্শকরাও দেখেছেন এবং উপভোগ করেছেন। "টু উইমেন", "ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল" কিংবা

মতামতের মন্তাজ

"ইয়েসটারডে টুডে অ্যান্ড টুমরো" প্রভৃতি ছবির বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবিনোদন। পরে ডি সিকা আবার সীরিয়স ছবি তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেন। যেমন 'আমমনদো' নুয়োভো" (১৯৫০), "লে স্টেগি"। তাঁর গার্ডেন অব দ্য ফিনজি কনটিনেফ" ১৯৭১ সনে পুরস্কার পায়। এই ছবিই প্রমাণ করেছে ডি সিকা আবার সীরিয়স ফিলমের জগতে ফিরে যেতে চান। অবশ্য ডি সিকার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাইসিকল থিভস এবং শুশাইন ছবি দুটির জন্য। এই দুটিই তাঁর বিশিষ্ট নিও-রিয়ালিস্ট ছবি। "দ্য চিলড্রেন আর ওয়াচিং আস" ছবিটিও ওই পর্যায়ে পড়ে।

* * *

ইটালির নিও-রিয়ালিজম যুদ্ধোত্তর-কালের সিনেমায় আলোড়ন এনেছিল। ওখানকার নিও-রিয়ালিসট সিনেমা আমাদের দেশেও নতুন সিনেমার গোড়াপত্তন করেছে। সত্যজিৎ রায় তো নিজেই বলেছেন, বাইসিকল থিভস ছবিটি দেখে তিনি ফিলম তৈরির বিশেষ প্রেরণা পেয়েছেন। ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিলম ফেস্টিভ্যাল-এ ডি সিকার বাইসিকল থিভস ছবিটি দেখানো হয়। এই নিও-রিয়ালিস্ট ছবির প্রভাব বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা গিয়েছিল। তবে সেটা খুব ব্যাপক হয়নি। নিও-রিয়ালিজম না হোক, কলকাতায় অন্তত নতুন ধারার ছবির সূত্রপাত দেখা গেছে '৫২ সালের পরেই। পথের পাঁচালি দিয়েই এই নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত।

* * *

ইটালির নিও-রিয়ালিজম আসলে কী বস্তু সেটা সঠিকভাবে জানবার সুযোগ এখানকার দর্শকরা পাননি। অবশ্য ইটালির

চিত্রপরিচালক ডি সিকা

একাধিক ছবি এখানে মুক্তি পেয়েছে। লা দলচে ভিতা-ও দেখানো হয়েছিল। ফিলম ক্লাবের বিশেষ আয়োজন ছাড়াও দর্শকরা পাবলিক সিনেমায় ডি সিকা, ফেলিনি ভিসকন্তি, রসেলিনি প্রভৃতি পরিচালকের ছবি দেখেছেন। ডি সিকা, ভিসকন্তি রসেলিনি বা জাভাত্তিনি সিনেমায় কী ধরনের আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সাধারণ দর্শকরা সম্যক না জানলেও এখানকার অল্প দুয়েকজন পরিচালক এই বিপ্লবের ধারাটি লক্ষ্য করেছেন। তাছাড়া পঞ্চাশ দশকের প্রথম ভাগেই কলকাতায় ফিলম সোসায়েটি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা নিও-রিয়ালিজম নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন।

* * *

নিও-রিয়ালিজম-এর পরেই যে সিনেমা-দর্শন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়, সে হল ফরাসী নিউ ওয়েভ। নিউ ওয়েভ ইটালির নিও-রিয়ালিজম-এর পরের ধাপ কিনা সেটা অন্য গবেষণার বস্তু। তবে এই দুই সিনেমা-ভাঙা নিয়েই আলোচনা হয়েছে বিস্তর। ইটালির নিও-রিয়ালিজম এদেশে একাধিক শক্তিশালী পরিচালককে প্রবুদ্ধ করেছে। তাঁদের ফিলমে আসলে মূলে ওই নিও-রিয়ালিজম এর প্রভাব। নিউ-ওয়েভকেও তাঁরা পরবর্তীকালে বিশেষভাবে জেনে নিয়েছেন। নিউ-ওয়েভ-এর পর এখানে কিন্তু দুঃসাহসী পরিচালকের আগমন তেমন ঘটেনি। নিউ-ওয়েভ ছবি এখানকার পরিচালক ও কলাকুশলীরা অনেকেই দেখেছেন। বিভিন্ন ক্লাবের ব্যবস্থাতেই সেটা সম্ভব হয়েছে। এর কোন প্রভাব সাধারণ বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি। এখানকার ছবি বদলাতে চায় না, বয়স্ক হতে চায় না, আধুনিক হতে জানে না। নিও-রিয়ালিজম বা নিউ-ওয়েভ হয়ত শুধুই নাম। আসলে ফিলমে নতুন কিছু করার কিংবা ফিলম নামক মিডিয়মটাকে গভীর ব্যাপ্তি বা তাৎপর্যদানের চেষ্টাকেই বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। নামই শুধু পাল্টায়, পরীক্ষা এগিয়ে চলে।

* * *

চল্লিশ দশকের প্রথমে ডি সিকা-সহ তিনজন চলচ্চিত্রকার সিনেমায় যে বিপ্লব ঘটালেন, তাই ইটালির সিনেমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে উন্নীত করেছে। বাংলা

[illegible] এনেছিল। তাকে এখানকার পরিচালকেরা বর্জন করেন। অন্য দু-একজন ছাড়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকেরা যেমন ছবি বানাতেন তেমনই তৈরি করতে লাগলেন। বিশ্ব-সিনেমার কত পরিবর্তন এল এবং দৃষ্টিভঙ্গি কত দ্রুত পালটাল। বাংলা ছবি কিন্তু এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে। যাঁরা নতুন ভাবনা ও আঙ্গিকের প্রবর্তন করলেন তাঁদের অনুসরণ করতেও সাধারণ পরিচালকদের আপত্তি বা অনীহা। সকলেই আর্ট ফিল্ম তৈরি করবেন এমন আশা করা অন্যায়। অন্তত এক দল বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী পরিচালক বেরিয়ে আসবেন এমন আশা কিন্তু অযৌক্তিক নয়। হয়ত কেউ কেউ বলবেন পরিবেশ কখনও এর উপযোগী নয়। পথের পাঁচালি তৈরি হয়েছিল কোন পরিবেশে? বাধা তখন আরও বেশি ছিল না কি? শুশাইন বা বাইসিকল থিভস-এর প্রভাব আন্তর্জাতিক সিনেমায় দেখা গেছে। সিনেমার শিল্পগুলো দাবি স্বীকার করেন, ডি সিকার মৃত্যুতে (প্যারিসে ১৩ নভেম্বর) তাঁরা মর্মাহত। এখানকার চলচ্চিত্রলোকের সাধারণের কাছে এটা হয়ত শুধু একটি খবর মাত্র, শোক অনুভব করার মতো ঘটনা নয়। যেদিন পরিচালক মারা যান, সেদিনই তাঁর নতুন ছবি দা ভয়েজ (পিরানদেল্লোর উপন্যাসের ভিত্তিতে) মুক্তি পাবার কথা। ডি সিকা কর্মজীবন থেকেই মারা গেছেন। এই কারণে ক্ষতি আরও বেশি।

সিনেমায় ডি সিকা অভিনয়ও করেছেন—একটি ভূমিকায় সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে। প্যারিসে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ডি সিকার পাশে ছিলেন সোফিয়া লোরেন

বোম্বাই বিচিত্রা

বিমল রায় প্রোডাকশনসের চৈতালী চিত্রের একটি গান রেকরড করবার দিন স্থির হয়েছিল ৩১ অকটোবর। বহুকাল পর এত দিনে ছবিটির প্রথম গান গৃহীত হতে যাচ্ছিল। বস্তুত, সংগীত গ্রহণের ব্যাপারে গণ্ডগোল না থাকলে চৈতালী এ বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়ে যেত। যন্ত্রশিল্পীদের সুদীর্ঘ ধর্মঘটে বিলম্বের সূত্রপাত। কিছুতেই যেন বিরোধ মিটতে চাইছিল না। যে গানটির বিষয়ে বলা হচ্ছে, আসলে সেটি ১৯৭৩ সনের ডিসেম্বরে রেকরড করবার কথা ছিল। যন্ত্রশিল্পীদের ধর্মঘট মিটে যাবার পর, রেকর্ডিংয়ের কাজ যখন আবার শুরু হল, তখন সায়রা বানু হঠাৎ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। কবে যে তাঁকে ফ্লোরে পাওয়া যাবে, বোঝা যাচ্ছিল না। অতএব ছবির কাজও ধামাচাপা পড়ল।

সায়রা একদিন সুস্থ হলেন। তখন আবার লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল অতিশয় কর্মব্যস্ত—"ববি"র পর থেকেই তো তাঁদের দম ফেলবারও সময় নেই। "চৈতালী"কে তাই অপেক্ষায় থাকতে হল। আগসট মাসে যদি বা সংগীত গ্রহণের একটি তারিখ পাওয়া গেল, তখন আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন লতা মঙ্গেশকর।

দিন পেছতে পেছতে ঠেকল ৩১ অকটোবরে। এবার কোনও ভাবনা নেই, সবাই তাই ভেবেছিলেন। এল সেই তারিখ। লতাজী আগের দিনও অন্য একটি ছবির জন্য গান গেয়েছেন। এবং গেয়েছেন চমৎকার মেজাজে। সেই সন্ধ্যায় মনোবীণা রায়কে টেলিফোনে জানিয়েছেন, পরের দিন তিনি গান রেকরড করাতে অবশ্যই যাবেন। আরও বলেছেন, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল যেন দুখানি গান রেকরড করানোর জন্য প্রস্তুত থাকেন। শ্রীমতী রায় নিশ্চিন্ত। হায়, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই" বলে একটি প্রবাদ আছে এবং সেই প্রবাদ সিনেমা-লাইনের ক্ষেত্রে কত সত্য।

৩১ অকটোবরের সংবাদপত্র একটি দুঃসংবাদ বহন করেছিল। গজল-সম্রাজ্ঞী বেগম আখতারের মৃত্যুর খবর। বেগম-সাহেবার অনুরাগী, মর্মাহত লতাজী বিমল রায় প্রোডাকশনসকে সকালে জানালেন, ওই দিন তাঁর পক্ষে গান করা অসম্ভব। তারিখ বাতিল হয়ে গেল। লতাজী বললেন, ৮ নবেমবর গান রেকরড করা হোক।

শ্রীমতী মঙ্গেশকর এইভাবে বেগম আখতারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অন্য গায়ক-গায়িকারা, শুনেছি, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি।

* * *

৩১ অকটোবর আরও একটি ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। ঘটনার নায়ক জিতেন্দ্র—কিছু দিন আগে হেমা মালিনী যাঁর প্রাণে দাগা দিয়েছেন। এক সময়ে এই জিতেন্দ্রর সঙ্গে এয়ার-হোস্টেস্ শোভা সিপপির বাগদান-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জিতেন্দ্র আবার তাঁর কাছেই ফিরে এসেছেন। ৩১ অকটোবর বোম্বাই শহরের কোনও এক জায়গায় জিতেন্দ্র-শোভা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ।

* * *

তারকা-সমাবেশের একটি জমজমাট ব্যাপার সম্প্রতি দেখা গেল নয়াদিল্লিতে।

ব্যাপারটা ক্রিকেট [illegible] দিল্লী[illegible] একাদশ বনাম রাজ্য [illegible] প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ-ভাণ্ডারে টাকা তোলা ছিল উদ্যোক্তাদের লক্ষ। সাধারণত, এই ধরনের ক্রিকেট খেলায় বড় বড় তারকারা নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকেন। এবার কিন্তু সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। দুষ্টু লোকেরা বলছে, তারকারা মিসা নামক বস্তুটির শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁরা কোনও কারণে আর চটাতে চান না।

খেলাটা আমার দেখা হয়নি। তবে কয়েক দিন পরেই দিল্লি গিয়েছিলাম। শুনলাম—শুনে খারাপই লাগল—মাঠে ধর্মেন্দ্র নাকি পা টলছিল। হয়তো, আগের রাত্রে মাত্রা বেশী হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা?

সুরঞ্জন

পলাতকা (পরিচালক: শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা) ছবিতে বাসবী নন্দী ফটো—দেশ

খেলা ভাঙার খেলা

(সংকেত)

'খেলা ভাঙার খেলা'-র শুরুটা দেখে ভেবেছিলাম শেষ অবধি বুঝি কিছু একটা পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন থেকে নেওয়া নামটা শুনে স্বভাবতই গভীর কোন বিষয় জানবার একটা মানসিক প্রস্তুতি অনায়াসেই এসে যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রেম-ভালবাসার কোন কথা বা জীবনের কোন কঠিন দ্বন্দ্ব এখানে দেখা গেল না।

নাট্যকারের (রঞ্জন রায়, নির্দেশনার দায়িত্ব এঁরই) সুন্দর একটা পরিকল্পনা যে ছিল সেটা অস্পষ্ট নয়। অনেক জায়গায়ই তার প্রমাণ মেলে। তা সত্ত্বেও ঠিক গুছিয়ে তিনি বক্তব্য পরিবেশন করতে পারলেন না। ফলে সম্ভাবনা থাকাতেও নাটকটি মনে দাগ কাটলো না।

নাটকের প্রধান চারটি চরিত্র বিকাশ, সন্দীপ, পলি এবং অর্চনার জীবনের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ নিয়ে একটি মনোরম কাহিনীও হয়ত গড়া যেতে পারত।

আগাগোড়াই নাটকটির গতি মন্থর। সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল। তা ছাড়া একই সংলাপ বার বার ব্যবহৃত। কোন কোন শিল্পীর ভুল উচ্চারণের দরুন প্রযোজনাটি ক্ষতিগ্রস্ত।

স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অনেক কারণ থাকে, থাকতেই পারে। এই নাটকে বিকাশ ও পলির বিচ্ছেদের সূত্রপাত কোথায়? কেনই বা? কলেজ জীবনের বন্ধু সন্দীপকে বিয়ে করতে পারলো না বলেই কি স্বামী বিকাশকে সে সহ্য করতে পারত না? নাকি অন্য কিছু। যদি তাই হবে সেটা বোঝা গেল কই? বিকাশের অফিসের স্টেনো, বন্ধুকন্যা অর্চনাকে ঘিরে পলির সন্দেহ নিতান্তই মামুলি। বিকাশের সংসার ছেড়ে পলির হঠাৎ চলে যাওয়া এবং সেই দিন রাত্রে সন্দীপের কাছে আত্মসমর্পণ অবিশ্বাস্য। যে রকম মেনে নেওয়া যায় না ওঁদের ছেলে আশিসকে। এই চরিত্রের শিল্পীর বয়সটা খুবই বেমানান।

সন্দীপের কাছে পলি চলে যাবার পর-মুহূর্তেই নাট্যকার বিকাশের হাতে যথা-রীতি মদের বোতল ধরিয়ে দিয়েছেন। মত্ত অবস্থায় বিকাশের সাথে অর্চনার একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দেয় তাঁদের সম্পর্ক। অর্চনাকে বিকাশ পুত্রবধূরূপেই পেতে চেয়েছিল, পেয়েওছিল। আশিস-অর্চনার মিলনে প্রেক্ষা-গৃহে তখন উলুধ্বনি।

ইতিমধ্যে অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত সন্দীপকে ধরবার জন্য পুলিসের তৎপরতাও দেখা গেছে। বিবেকের দংশনে সন্দীপ যখন দিশেহারা সেই ক্ষণটি আরও মর্মস্পর্শী হতে পারত। নেপথ্যে মাইকে বিবেকের কথা শুনতে খারাপ লাগে। অপরাধীর বিবেক কি অতই সোচ্চার!

অভিনয়, আগেই বলেছি, মন্দ নয়। কয়েকটি মুহূর্তে হেনা চক্রবর্তীকে (পলি) ভাল লাগে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে যেখানে তিনি বিভ্রান্ত। শুভ্রা চক্রবর্তীর (অর্চনা) অভিনয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। অজিত ঘোষ (সুপ্রকাশ), কল্যাণ সেনগুপ্ত (বিকাশ), আশিস গুহরায় (সন্দীপ), অসীম গুহরায় (চোরেগা), স্বপন দেওয়ানজি (আশিস), নির্মল [illegible]রায়, বাসুদেব সেনগুপ্তর অভিনয় চরিত্রোচিত।

নাট্য সমালোচক

বারবধূর সাতশততম অভিনয়

চতুর্মুখ নিবেদিত 'বারবধূ' নাটকের সাতশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতাপ মঞ্চে। অনিবার্য কারণে প্রধান অতিথি শ্রীমতী কানন দেবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। গুণী সংবর্ধনার তালিকায় ছিল চারটি নাম। তার মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায় ও অভিনেতা সন্তোষ সিংহ অনুপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা জানানো হল শ্রীমতী ইন্দুবালা ও প্রবীণ মঞ্চকর্মী কালীপদ সোমকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত-কুমার পাঁজা।

অনুষ্ঠানারম্ভে অভিনেতা নির্দেশক অসীম চক্রবর্তী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে একটি আবেদনপত্র তুলে দেন। যে কোন হাস-পাতালে নাট্য-শিল্পীদের জন্য একটি স্থায়ী শয্যা সংরক্ষণের জন্য ওই পত্র মারফৎ অনুরোধ জানানো হয়। চতুর্মুখের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকাও এর জন্য দেওয়া হয়েছে। সভাপতি শ্রীপাঁজা এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যদিও এই পরিমাণ অর্থ একটি শয্যা সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু তিনি কথা দিচ্ছেন, নাট্যশিল্পী-দের জন্য একটি স্থায়ী শয্যা সুখলাল কারনানি হাসপাতালে সংরক্ষিত থাকবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, 'বারবধূ' নাটকের ৩০০তম স্মারক উৎসবের পর এর কোনো শিল্পীই আর কোনো স্মারক উপহার গ্রহণ করেন নি। ওই সঞ্চিত অর্থ থেকেই দশ হাজার টাকা দান করা হয়। সভাপতি বলেন, নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত সম্ভবত এই প্রথম। শ্রীমতী পাঁজা এদিন

সকল শিল্পীর হয়ে যোজের নাটকের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের পর বারবধূ অভিনীত হল। সাতশো রজনীর আয়ু যে-কোন নাটকের পক্ষে মোটেই কম নয়। বারবধূ অভিনয়ে এখনও জনপ্রিয়তার লক্ষণ আছে। তবে একই ভূমিকায় বহু রজনী (৩৫৪) অভিনয় করার ফলেই কিনা জানি না নায়ক অসীম চক্রবর্তীর বলনে-চলনে মন্ত্রাপেরের মতো কী যেন এসে গেছে—বিশেষ করে শরীর দোলানোতে। অবশ্য এই ভূমিকায় নাটকটিকে অনেকখানি আকর্ষক করে তুলেছেন তিনি। অন্য বড় আকর্ষণ নাম চরিত্রে কেতকী দত্তের অভিনয় ও গান। দুলালের চরিত্রে শঙ্কর পাল সব চাইতে বেশি দিন (৬৯৪) অভিনয় করার পরও এখন যেন আরও প্রাণবান। দরাজ গলায় তাঁর গাওয়া "জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু" গানটির সময় চোখে জল আসে। সাতশো রজনীর অভিনয়ে ছন্দা চ্যাটার্জি আভার চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। তাঁর অভিনয় আভা একান্ত বাস্তব—চরিত্রটির লোভ ও অস্থিরতা সমেত। নৃপুর হয়েছেন মঞ্জু চক্রবর্তী। তাঁর অভিনয় আড়ষ্ট, নাচ স্বচ্ছন্দ। এঁরা ছাড়া তরুণ মিত্র আগের মতোই আনন্দ দিয়ে চলেছেন। অন্য শিল্পীদের মধ্যে সমরকুমার, চিন্ময় মণ্ডল, লোকনাথ চন্দ্র, জয়গোবিন্দ চক্রবর্তী, নীতীশ সান্যাল, রথীন দে, সুশীল দাস, হারাধন সাহা প্রমুখ সকলকেই ভাল লাগে। পিন্টুর চরিত্রে মাঃ রাজা সপ্রতিভ।

নাটকের অন্য দিকেও—মঞ্চসজ্জা, আলোকপাত এবং পরিচালনা — বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। নাটকের আয়ু যে আরও বাড়বে সমগ্র প্রযোজনায় তার পরিচয় আছে।

স্বয়ংসিদ্ধা (পরিচালক : সুশীল মুখার্জি) ছবিতে মিঠু মুখার্জি ফটো—দেশ

অতুলপ্রসাদের জন্ম-জয়ন্তী

অতুলপ্রসাদ স্মারক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গীতিগুঞ্জের পক্ষ থেকে অতুলপ্রসাদের ১০৩তম জন্মজয়ন্তী ও সঙ্গীত শিক্ষায়তন বিভাগ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাহানা দেবী, হরেন চট্টোপাধ্যায় রেণুকা দাশগুপ্তকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন প্রেক্ষাগৃহে শান্ত সুগম্ভীর পরিবেশে শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হল।

সম্বর্ধিত শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র হরেন চট্টোপাধ্যায় সেদিন স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন। সাহানা দেবী এবং রেণুকা দাশগুপ্তের কণ্ঠে গীত কিছু টেপ-রেকর্ডবিধৃত গান অনুষ্ঠানের শেষ বাজিয়ে শোনানো হয়।

গীতিগুঞ্জ মূলত অতুলপ্রসাদের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তাই একদা যাঁদের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান লীলায়িত হত, তাঁদের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উদাহরণযোগে সংক্ষেপে আলোচনা করেন মঞ্জু গুপ্ত। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে হিমঘ্ন রায়চৌধুরী, সুশীল চট্টোপাধ্যায় এবং নবীন শিল্পী গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

—আনন্দবর্ধন

পরলোকে হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়

(সানুবাবু)

পূর্ণ থিয়েটারের ম্যানেজার সানুবাবুর হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়) মৃত্যুর খবর (১৮ অক্টোবর সকালে) ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার চলচ্চিত্র মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সানুবাবুর পরিচয় শুধু সিনেমা হলের ম্যানেজারই নয়, তার চাইতেও বেশি। তিনি বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। নির্বাক যুগে ট্যুরিং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সানুবাবু—চলচ্চিত্রশিল্পের সকলের সানুদা—ছিলেন বহু শিল্পী, প্রযোজক ও পরিচালকের অভিভাবকস্বরূপ। তাঁকে ঘিরে পূর্ণ থিয়েটারে ফিল্ম জগতের যে আড্ডা বসত তেমনটি আর কোথাও ছিল না। সে শুধু আড্ডাই ছিল না, সিনেমা জগতের বহু লোকের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনার জন্যও ওই সান্ধ্য বৈঠক বিখ্যাত ছিল। সানুবাবু পূর্ণ থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থেকে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে অবসর নেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮।

সানুবাবুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ফিল্ম জগতের বহু ব্যক্তি শ্মশানে ও তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। অনেকেই তাঁর কাছে নানা উপদেশ নিতে যেতেন। সানুবাবুর গুণমুগ্ধরা কানন দেবীর বাড়িতে একবার বিরাটভাবে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তাতে শ্রী বি এন সরকার, উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখার্জি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। আজ এঁরা প্রমুখ সকলেই সানুবাবুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত।

অহীন্দ্র স্মরণে

মাথার ওপরে বটবৃক্ষের ছায়া বলতে আর কিছুই থাকলো না। এ যুগের শেষ নাট্যাধ্যক্ষ বলতেই বা থাকলো কে? এবং যখন কিছু জানবার প্রয়োজন, প্রয়োজন শিখবার, তখন যাঁর কাছে ছুটে গেলে সকল প্রশ্নের জবাব মিলত, সেই নাট্যাচার্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অভাবে নাট্যজগৎ অন্ধকার'—থেকে থেকে চোখ মুছছিলেন জহর রায়, কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল কণ্ঠ, তবু বললেন, 'যাঁরা অহীন্দ্র যুগ শেষ হয়ে গেল বলে মনে করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই বলি, ওই যুগ বরং এখন থেকেই শুরু।' থিয়েটার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অহীন্দ্র শোকসভায় (৭ নবেম্বর, মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত) উপস্থিত সকল নাট্যশিল্পীর চোখও ছিল বাষ্পাচ্ছন্ন, জহর রায়ের শোকোচ্ছ্বাস সেখানে কান্নার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা ছটায় প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান নেই। উপস্থিত শোকার্তরা সকলেই চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রাশিল্পের পরিচিত মুখ, কোনো না কোনোভাবে অহীনবাবুর স্নেহধন্য। সাড়ে ছটায় ধূপাধার রাখা হল প্রতিকৃতির সামনে। তারপর মাল্যদান। মঞ্চে ছিলেন সভানেত্রী সরযূ দেবী, অভিনেতা সন্তোষ সিংহ, নাট্যকার-নির্দেশক দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং আরও অনেকে। নটসূর্যের মানসকন্যা সরযূ দেবী বললেন, 'আমার অভিনয় জীবনের সূচনা অহীন্দ্র চৌধুরীর পুত্রের ভূমিকায়। পরে কন্যারূপে। এবং সারা জীবন ধরেই আমি কখনও ভগিনী, কখনও বধূ, কখনও মাতারূপে মঞ্চে অভিনয় করেছি। সরযূ দেবী আগাগোড়াই তাঁর ভাষণে অহীনবাবুকে পিতা সম্বোধন করেছেন। বললেন, 'এ আমার পিতৃশোক।'

'নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী বোধ হয় বিশ্বের প্রথম অভিনেতা যিনি সমর্থ থাকা সত্ত্বেও অভিনয় জীবন থেকে সরে দাঁড়ান—' এই কথাটি সকল গুণমুগ্ধরাই এ দিন বলেছেন। হরীন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্পর্কে বললেন, শিল্পীমাত্রই যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ কাজ করতে চান। নটসূর্যই একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি যখন খ্যাতির শীর্ষে ঠিক তখনই হঠাৎ অবসর নিলেন। তাঁর শেষ কীর্তি সর্বভারতীয় নাট্য গবেষণা সংস্থা 'থিয়েটার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সংস্থার বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি একে একে কার্যকরী হবার মুখে।' নাট্যকার নির্দেশক দেবনারায়ণ গুপ্ত বললেন, 'বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

'থিয়েটার রিসার্চ ইনস্টিটিউট' আয়োজিত এক শোকসভায় বহু নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্যকর্মী নটসূর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় আলোচিত বহু প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি জীবনী গ্রন্থের প্রকাশ। অন্যটি তাঁর বাসভবনের সামনের রাস্তা গোপালনগর রোডের নাম পরিবর্তন করে অহীন্দ্র সরণী নামকরণের স্বপক্ষে। **প্র-ব-জ**

সন্ন্যাসী রাজা (পরিচালক : পীযূষ বসু) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ভারতবর্ষের এই ভাবমূর্তি অবলম্বনে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিণামে সেগুলি এক-একটি সংগতিবিহীন বিচিত্রানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। মডার্ন হাই স্কুলের ছাত্রীরা সম্প্রতি ও'দের শিক্ষায়তনে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এখানেও যে সমস্ত অনুষ্ঠানে খুব একটা ভাবগত ঐক্যবোধের অনুভূতি ছিল তা নয়, কিন্তু তা হলেও, ওই বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অংশের উপস্থাপনায় যে মাত্রাবোধ, শিল্পদক্ষতা এই সৌন্দর্য চয়নার পরিচয় ছিল, তার বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সম্মেলক গানগুলি সংগীত, নৃত্যের পরিবেশনায় ছিল সুন্দর সংগতি, একক নৃত্যে ছিল সাধনা ও দক্ষতার ছাপ। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটির মধ্যে এমন একটা স্বচ্ছন্দ গতি ছিল, যা দর্শকমণ্ডলীকে আগাগোড়া অভিভূত করে রাখতে পেরেছে। কিন্তু কিছু অনুষ্ঠান অন্যত্র এ ধরনের আয়োজনে বিশেষ দেখা যায় না। যেমন—কাওয়ালি গানের আসর। এর জন্য শিল্পীরা উপযুক্ত সাজপোশাক গ্রহণ করেছে, সুন্দর অভিনয় করেছে, তাতে সমগ্র আসরে একটা স্বাভাবিকতার স্বাদ পাওয়া গেছে। সম্মেলক নৃত্যের মধ্যে ভাংরার অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, এই নৃত্যে যে কেবল উদ্দামতা নেই, একটা স্নিগ্ধ শিল্পসৌন্দর্যও আছে, সেটা এ'দের নাচে বেশ বোঝা গেল। ধ্রুপদী নৃত্যকলায় কথাকলি, ভরত নাট্যম এবং ত্রয়ী কত্থক নাচের সুন্দর সংগতি অনুষ্ঠানটির মধ্যে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছিল। সংগীত নির্দেশনায় শ্রীমতী দাশগুপ্ত, নৃত্য পরিচালনায় শ্রীমতী বটব্যাল, আবহসংগীতে রবি বিশ্বাস এবং আলোকসম্পাতে তাপস সেনের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

রূপসী কলকাতা ও ছড়ার গান

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে অপটুতা এবং শৈথিল্যকে অনিবার্য অঙ্গরূপেই বুঝি প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। এর এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেখা গেল রবীন্দ্রসদনে বাণী বিদ্যাবীথি প্রযোজিত 'রূপসী কলকাতা'-র অনুষ্ঠানে। কনটেমপরারি বিষয়বস্তু নিয়ে শিশুদের দিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনায় যে কী অসামান্য শিল্পসৃষ্টি সম্ভব, তার এক দুর্লভ নিদর্শন ওই রূপক নাট্য। কলকাতা শহরের সাম্প্রতিক বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত রূপটি ছায়া দত্ত পরিকল্পিত 'রূপসী কলকাতা'র প্রণব রায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় প্রায় ষাটজন শিশুশিল্পী যে কী সুন্দর শৃঙ্খলা এবং শিল্পনৈপুণ্যে

অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে (পরিচালনা : যাদু সেন) দীপঙ্কর দে ও রাজশ্রী বসু

সজীব করে তুলেছেন, তা ভাবতে শুধু ভাল লাগে তা নয়, অবাকও লাগে। ভারতমাতা (স্নেহা চট্টোপাধ্যায়) ও কলকাতা (কাকলী দাস)—এই দুটি চরিত্র সুন্দর ব্যঞ্জনায় তাদের সাম্প্রতিক চেহারা নিয়ে ফুটে উঠেছে। সুস্মিতা মিত্র (নৃত্য পরিকল্পনা), রবি রায়চৌধুরী (আবহসংগীত) এবং গানের সুরসংযোজনায় গীতালি সেনগুপ্ত, শিপ্রা গুপ্ত ও নীলিমা চন্দ মুন্সী বিষয়টিকে সার্থকভাবে ফুটে উঠতে সাহায্য করেছেন।

সেদিন 'রূপসী কলকাতা'র সঙ্গে বাণী বিদ্যাবীথির শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র পরিবেশনাতেও প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শিশুদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সম্প্রতি কলামন্দিরে জয়জয়ন্তী প্রযোজিত জপমালা ঘোষের একক সংগীতের আসরের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানটিকেও জপমালা ঘোষ যে সব প্রকার শৈথিল্য থেকে মুক্ত রেখেছেন তা নয়, সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনার মধ্যে প্রশংসনীয় কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মঞ্চসজ্জার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন যার পরিকল্পনার কৃতিত্ব দেবেশ্বর সেনের প্রাপ্য।

জপমালা ঘোষের গাইবার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ ও চিত্তাকর্ষক। তবে গানের নির্বাচনে তাল ও ছন্দে আরও কিছু বৈচিত্র্য থাকতে পারত। বস্তুত সেদিন বেশ অনুভব করা গেছে, শিশুমনের ভালো লাগবার মতন গানের অভাব এখনও দূর হয় নি। তাই, কোনো মুহূর্তে যদি অনুষ্ঠানটি কিছু ক্লান্তিকর বলে মনে হয়ও তা হলেও তার জন্য শিল্পী নিঃসন্দেহে দায়ী নন। ওয়াই এস মুলকির পরিকল্পিত যন্ত্রানুষঙ্গ প্রশংসনীয়। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে অবশ্য ভাইব্রোফোন অথবা জাইলোফোনের ব্যবহারে আরও কিছু মনোরম বৈচিত্র্য আসতে পারত।

আনন্দবর্ধন

যাদুনাটক "যাদুর মায়া"

নাটকের আঙ্গিকে যাদুখেলা বা ইন্দ্রজাল অনেকটা অসবর্ণ যোগ নয় কি? তরুণ যাদুকর প্রবীরকুমার রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীত "যাদুর মায়া" সেরকমই এক ব্যাপার। এই যাদুনাটক না হতে পেরেছে নাটক, না হয়েছে চিত্তগ্রাহী যাদুর খেলা।

বেকারীর যন্ত্রণায় অস্থির এক তরুণের ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাধ্যমে উদ্ভাসিত কতগুলো রঙীন দৃশ্যকল্পের উপস্থাপনাই মূলতঃ এ নাটকের বিষয়বস্তু। যেখানে রাজা রাণী থেকে শুরু করে রূপকথার রাজ্য, মন্ত্রী-সান্ত্রী সবই রয়েছে। তারপর আচম্বিত কোন ঘটনায় সেই মধুময় স্বপ্ন ভেঙে গেলে যুবক ফিরে এসেছে আবার এই বাস্তবের পৃথিবীতে। সেখানে আছে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, ব্যর্থতা-হাহাকার, দুর্নীতি-দুর্দশা ইত্যাদি। কিন্তু তাই যদি হয় অর্থাৎ কল্পনা ও বাস্তব এ দুয়ে কনফ্রনটেশন দেখানো-টাই যদি আলোচ্য নাট্যবস্তুর মূল প্রতিপাদ্য হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রেও বিশেষ চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারেননি পরিচালক।

তা রূপকথার জগত থেকে বাস্তবের জগতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটি যদিও আপাত বোঝা গেল, কিন্তু কলের পুতুলের আব্দার মেটাতে সুরখানা, ছিনতাই পার্টির আবির্ভাব—মায় ক্যাবারে দৃশ্যের আয়োজন সম্পূর্ণতই জোড়াতালি বলেই মনে হচ্ছিল। এবং যার জন্য নাট্যগতি অনেকাংশে ব্যাহত। তবে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর মুহূর্তগুলোতে কতকগুলো দৃশ্য অবশ্যই চমকপ্রদ। যেমন—খাঁচার ভেতর থেকে রাণীকে উদ্ধারের দৃশ্য অথবা খালি চোঙের ভেতর থেকে রঙ-বেরঙের কাগজের মালা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি বের করে দেখানো কিংবা জীবন্ত পাখি অদৃশ্য করে নিয়ে আসা প্রভৃতি। প্রবীরকুমার শুধু ইন্দ্রজাল দেখালেই বোধ হয় দর্শক বেশি খুশি হতেন। আলোর কাজও স্থানে স্থানে অনাটকীয় এবং ঘটনা বিশেষে অত লাউড মিউজিক এফেক্টের কোনই যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দলগত অভিনয়ে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে প্রবীরকুমারের সঙ্গে জলী ঘোষ, আশিস মজুমদার, জলী মালাকার, নুপুর ঘোষ সুষ্ঠুভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

—নাট্য সমালোচক

চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য নৃত্য

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে প্রযোজিত নটরাজ ডান্সিং স্কুলের চিত্রাঙ্গদায় রবীন্দ্র-রচনার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য সত্ত্বেও প্রকৃত উপভোগ্য মুহূর্ত যদি বিশেষ না খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য প্রধানত দায়ী উপযুক্ত কল্পনাশক্তির অভাব এবং দ্বিতীয়ত, সম্মেলক গানের ও নাচের দুঃসহ ব্যর্থতা। কেননা, এঁদের প্রযোজনায় চিত্রাঙ্গদার একাংশের গানে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, অর্জুন এবং মদনের গানেও যথাক্রমে ধীরেন বসু ও সুশীল মল্লিক প্রার্থিত রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যাংশে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠের সঙ্গে অলকানন্দা রায় রূপায়িত চিত্রাঙ্গদার চরিত্রটি সুচিত্রিত এবং চিত্রাঙ্গদার অপর ভূমিকায় মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যহীনতা সত্ত্বেও নৃত্যদক্ষতায় প্রশংসনীয়। কুণাল দত্তের অর্জুন এবং সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদনও পৃথকভাবে নিন্দনীয় নয়। কিন্তু তথাপি সামগ্রিকভাবে সেদিনকার প্রয়োজনায় শৈথিল্য এবং রস-সৃষ্টির ব্যর্থতা বেদনাদায়ক।

চিত্রাঙ্গদার পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যকলার এক ক্রমান্বিক পরিচয় দেবার প্রয়াসেরও খুব প্রশংসা করা চলে না। এতে অবশ্য বহু-সংখ্যক শিশু শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল, কিন্তু যথাযথভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত, তাঁরা এ-বিষয়ে আরও অনেক তৎপর এবং যত্নবান হলে অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য হ'তে পারত। তাছাড়া নৃত্যের এই অসংলগ্ন বিচিত্রানুষ্ঠান 'পথহারা পথিক' নাম-করণে অথবা মামুলি এবং অত্যন্ত অপরিণত ভাষায় রচিত ধারাভাষ্যের সংযোজনায় খুব একটা তাৎপর্য অর্জন করল কি?

আনন্দবর্ধন

অরণ্যদেব লী ফক

এদিক লিজা রত্ন-গুহায় পৌঁছল কিনা তা আমরা জানব কীভাবে?
ওর কাছে একটা ছোট্ট বেতার-যন্ত্র আছে ওর হাত-ব্যাগের মধ্যে ···

রত্ন-গুহার হদিশ পাবামাত্র লিজা বেতার-সংকেত পাঠাবে।
সাবাশ!
যন্ত্রটা ঠিকমতো কাজ করবে তো?

বেতার-সংকেতের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে —
কিন্তু লিজা যদি সংকেত না-পাঠায় কিংবা না-পাঠাতে পারে?
আরে দূর, নিশ্চয়ই সংকেত পাঠাবে!

মর্মর-কুঞ্জে একটা সাদা মেয়ে-??

লিজা জানে না, তারই জন্যে ঢাক বাজছে ···
চতুর্দিকে ঢাক বাজছে কেন? এর অর্থ কী?

বড় বড় মাকড়সা··· সাপও দেখলুম··· এসে ভুল করেছি·····
4,7

কেন যে মরতে এখানে এলুম!
উঃ মাগো!

গাছের উপরে বাঘ!! লাফ দেবে নাকি?
১০

জনৈক বিহারী বন্ধুর পত্রালাপ : 'কলকাত্তামে জারা আভি কৈসন? জোর? জেয়াদা? জাস্তি?'

নেহি জী! জারা জারা।

* * *

ভারতে খাদ্যাভাব রয়েছে ঠিকই, কিন্তু না খেয়ে কেউ মরছে না—এই খবর দিয়েছেন শ্রীরাম।

না খেয়ে বেঁচে থাকার অদ্ভুত আরামেই তারা বেঁচে বর্তে।

* * *

পুজোর মত দেওয়ালির মরশুমেও কাপড়ের দোকানে খদ্দেরের তেমন ভিড় না দেখে এক ব্যবসায়ী রসিকতা করেছেন নেহাত মিসা-য় না ধরে আনলে এ বাজারে কেউ আর ভিড়ছে না।

নিদেন মিসেসরা যদি পাকড়ে আনেন!

* * *

নির্বাচন ব্যয় কমবে না, কমানো হবে না। —খবরের হেডলাইন।

এদিক দিয়ে অর্থ বন্টননীতির বদান্যে সবাই সমান SHOW-শিয়াল।

* * *

কলকাতা বিমানবন্দর জাম্বো জেট বিমান অবতরণের উপযোগী আরো বেশ লম্বা চওড়া করে বানানো হচ্ছে বলে জানা গেল।

শুধু হনুমানই নয়। রামরাজ্যে জাম্বোবানেরও জয়!

* * *

রাশিয়ার সম্পর্কে চীনের mood পালটাচ্ছে বলে খবর। স্বভাবতই, ব্যাকরণের অলঙ্ঘ্য নিয়মে, mood-এর সঙ্গে ভয়েসও পালটায়।

* * *

এম-পি শ্রীসমর গুহর হিসেব মতন কন্টাই-এ সাতশো জন অনাহারে খতম্ হবার খবর জানলাম।

আর কতো জনার কণ্ঠাগত প্রাণ কে জানে?

* * *

খৃষ্টজন্মের দুশো বছর আগে মধ্য-প্রদেশের রামগড় গুহায় কোনো দেবদাসীর প্রতি উদ্দিষ্ট খোদাই-করা ব্রাহ্মী হরফে লেখা এক তরুণ ভাস্করের প্রণয় নিবেদন গাথা পাওয়া গেছে—যোগীমন পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ এইটিই পৃথিবীর প্রথম প্রেমলিপি—অনুমান করা হচ্ছে।

এক উদ্যোগী মনের পরিচয়।

* * *

জানা গেল বিভিন্ন ডাকঘরে এখনো নাকি দেদার চিঠি বিলির অপেক্ষায় রয়েছে। পাওনাদারের চিঠি না হয়ে প্রেমপত্র হলে স্বচ্ছন্দে বিলিয়ে দেওয়া যায়। যাকে খুশি।

* * *

বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় ভারতের স্থান তৃতীয়—কিসিংগার সাহেবের সার্টিফিকেট। একই কথা। আমরাও অ-দ্বিতীয় বলেই জানি।

* * *

মহামতি ভূট্টোর রাজনৈতিক হজযাত্রা নাহক্ হয়েছে—মস্কো থেকে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন প্রকাশ।

মস্ক-ওর সম্মুখে তাঁর গান বাজনা বা নমাজ পড়ায় কোন সুরাহা হল না।

* * *

পাবনা জেলার থেকে তিন লাখ টাকার গাঁজা আর ভাঙ উদ্ধার হয়েছে। ফলে ভাঙ খেয়ে চুর হয়ে রাজনৈতিক ভাঙচুরের আন্দোলন ঘা খাবে আশঙ্কা করি।

* * *

নহুস আর বেঁহুস—দুধারে এই দুই সরকারের মাঝখানে পড়ে বাংলাদেশী শরণার্থীদের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

মানহুঁস নেই।

* * *

শ্রী সুধাংশু চৌধুরী : বর্ধমান জেলার বুদ্বুদ্ থানার ভাতকুন্ডা গ্রামের তিনজন জোতদারকে উগ্রপন্থীরা মানকর বাজার থেকে ফেরার পথে আউস গ্রাম থানার কাছে কুপিয়ে হত্যা করেছে—জায়গার নামগুলি লক্ষ করবেন।'

দুর্লক্ষণ বলে বোধ হচ্ছে।

* * *

শ্রীধূর্জটিমোহন লস্কর : 'গত বছরের তুলনায় এবার পাটের দর উঠতির দিকে থাকায় গরিব চাষীদের মুখে হাসি দেখা দিয়েছিল, এখনই ত পাট বেচা-কেনার মরশুম। ঠিক এই সময় কলকাতার জুট কমিশনারের কাছে দিল্লির নির্দেশ এসেছে —পাটকল মালিকদের পাট কিনতে মানা করুন। দিল্লীর এই নির্দেশ কেন তা রাজ্য সরকারের বুদ্ধির বাইরে। এর মানে কী বলতে পারেন?'

একটাই মানে। পাট চাষীদের লোপাট করা।

* * *

শ্রী স্বপনকুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী বন্দনা বিশ্বাস : 'লাইসেন্স কেলেঙ্কারির সহিত জড়িত শ্রীতুলমোহন রামকে এত তুলকালামের পর এতদিনে ধরা হয়েছে, এমন রামরাজত্বেও তিনি আরামে থাকতে পেলেন না।......'

শীতের এই তুলো ধোনার মরশুমেই তাঁকে নিয়ে এখন তুলোরাম খেলারাম!

* * *

শ্রীতরুণতপন বিশ্বাস : 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইদানীং জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে দেখছি। তাই 'নতুন জীবন' থেকে আরম্ভ করে 'জীবনসঙ্গীত', 'জীবন সৈকতে', 'জীবন যে রকম', 'জীবনটাই নাটক' থেকে একেবারে 'জীবন মৃত্যু' পর্যন্ত সবই ওই 'জীবন থেকে নেওয়া'—এর রহস্যটা কোথায়, বলতে পারেন?'

আজ্ঞে, সমস্তটাই 'জীবন জিজ্ঞাসা'।

* * *

শ্রী সুশীল রায় : 'তামিল নাড়ুতে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়েছে—সেখানকার মদ্যপদের অবস্থাটা এখন কেমন?'

মদ রাজি সবাই কিন্তু সরকারী হুকুম তামিল হবেই।

—শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

বাংলাদেশে ১.২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে পবিত্রকুমার মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত ও অরূপ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ২২৪৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা		৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা

Like a butterfly
has picked up a
exciting prints for you

দেশ

২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুই ঐতিহাসিক দিবস—		... ৯৫১
ব্যঙ্গচিত্র—		... ৯৫২
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত		.. ৯৫৩
বৈদেশিকী—দেবরাজ		... ৯৫৪
রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা—		... ৯৫৫
দিয়ে দাও (কবিতা)—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত		... ৯৫৬
অনুমতিপত্র (কবিতা)—অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়		... ৯৫৬
পুরুলিয়ার কৃষকের প্রতি (কবিতা)—প্রদীপচন্দ্র বসু		... ৯৫৬
যন্ত্রণা (কবিতা)—ফজল-এ-খোদা		... ৯৫৬
কবিতা (কবিতা)—শান্তি সিংহ		... ৯৫৬
শৈশবের নীচে (কবিতা)—শংকর চক্রবর্তী		... ৯৫৬
এ বৎসর কেমন যাবে—রঞ্জন		... ৯৫৭
হে বিদেশী ফুল—কৃষ্ণা বসু		... ৯৫৯
চিত্রগত কাহিনী—নীরোদ রায়		... ৯৬৫
একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু—দিব্যেন্দু পালিত		... ৯৬৭
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়		... ৯৭১

আয়েশের আমেজ পেতে আরামের

সি.এস.সি.

এখন দামটাও আপনার সামর্থ্যের মধ্যে।

এতো বেশী আরামের চপ্পল এর আগে কক্ষণো পরেন নি। দামটা দিতে আপনার মোটেই গায়ে লাগবেনা।
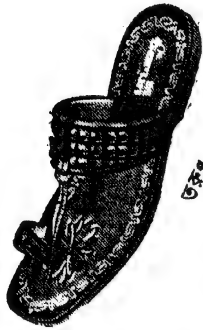
সি.এস.সি—বহু কাল ধরে বেপরোয়া পরার চপ্পল!

নির্মাতা:

করোনা সাহু কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস: ২২১, দাদাভাই নওরোজী রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১

CHAITRA-C.S. 14 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		... ৯৭৫
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায়		... ৯৭৯
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর		... ৯৮৩
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু		... ৯৮৭
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী		... ৯৯১
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত		... ৯৯৩
আলোচনা—		... ৯৯৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		... ১০০১
পুস্তক পরিচয়—		... ১০০৩
চৌকস ক্রিকেটার মদনলাল—মুকুল		... ১০০৫
খেলার মাঠে—একলব্য		... ১০০৬
অরণ্যদেব—		... ১০০৮
রঙ্গজগৎ—		... ১০০৯
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী		... ১০১৪
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র—		... ১০১৫

প্রচ্ছদ : মানব বড়ুয়া

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৩
শনিবার ১১ মাঘ ১৩৮১

দুই ঐতিহাসিক দিবস

তেইশে জানুয়ারী, তার তিন দিন পরে ছাব্বিশে জানুয়ারী, কাছাকাছি এই দুটি দিন ভারতের রাজনীতিক জীবনের স্মৃতিরমণীয় দুটি ঐতিহাসিক দিবস। তেইশে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস, ছাব্বিশে জানুয়ারী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিবস। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র একটি ভাস্বরিত নেতৃত্বের নাম। দেশপ্রেমে অভিমণ্ডিত একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নাম। তাঁর জীবন ভারতের রাজনীতিক প্রতিভা চেতনা ও প্রেরণার একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। ভারতের যে মুক্তি সংগ্রাম দেশ ও বিদেশের মনস্বী ইতিহাস-গবেষকদের অভিমতে এশিয়া ও আফ্রিকার পরশাসিত জনজীবনের রাজনীতিক মুক্তির পথ অবারিত করেছে, তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব একটি বিশিষ্ট গৌরবে পরিশোভিত হয়ে পরিণামপ্রবণ ঘটনা সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে বলা চলে, তিনি মহৎ তাৎপর্যে অভিষিক্ত সেই ভারত নেতৃত্বেরই একজন সুকৃতিকুশল সংগঠয়িতা। শুধু ভারতের রাজনীতিক মুক্তির ইতিবৃত্তে নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার গণমুক্তির ইতিবৃত্তেও সুভাষচন্দ্রের নাম সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধায় অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে প্রজাতন্ত্রের নূতন সংবিধান গ্রহণ করে ভারতীয় জনজীবনের নূতন এক পথযাত্রার শুভ ঘটনার সূচনা হয়েছিল। এই সূচনাই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। সরল অর্থে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হবার ঘটনা অবশ্যই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু গূঢ় অর্থে, সূচনা ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি সহজ সম্বন্ধ থাকলেও কঠোর একটি প্রভেদও আছে। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে জাতির সামগ্রিক জীবনের যে পরিণাম পরিকল্পিত হয়েছে, তার বাস্তবায়িত রূপের একটি প্রত্যক্ষ সম্ভবই যথার্থ প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত হতে পারে। এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটিকে ছেড়ে দিয়েও বলা চলে যে, জাতির জীবনে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা এখনও বস্তুত একটি আশাময় অপেক্ষার চেয়ে খুব বেশী-কিছু সার্থকতায় সত্যে পরিণত হতে পারেনি। শাসনে প্রশাসনে বিচারে ও অর্থনীতিক নিরাপত্তায় প্রজাসাধারণের স্বার্থ যদি নূতন ও উন্নত কোন প্রসন্নতা না পায়, তবে একথা বলবার কোন যুক্তি থাকে না যে, প্রজাতন্ত্রের সম্যক প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিক সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে অনেক অধ্যবসায়ের সফলতা কীর্তিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের অঙ্ক খুবই সহজে জাতিক সমুন্নতির একটা বিরাট হিসাব দাখিল করে দিতে পারে। প্রজাতান্ত্রিক আদর্শটা কিন্তু জাতিক সমুন্নতির এরকম একটা মোট হিসাবের মধ্যে তার সার্থকতার হিসাব আশা করে না। সমুন্নতির একটি নৈতিক রূপ এবং প্রকার আশা করে। অর্থাৎ সমুন্নতির ব্যাপারটা প্রজাসাধারণের জীবনে প্রতিফলিত হওয়া চাই। বিশেষ কোন সমাজ অথবা শ্রেণীর বৈষয়িক জীবনের মান নয়, সাধারণ মানুষের বৈষয়িক জীবনের মান, তার শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিবিধ সামাজিক মর্যাদার মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত এই দুঃখকর অভিযোগের সত্যতায় বিশ্বাস করতেই হবে যে, প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের সংবিধান স্বয়ং নির্ভুল হলেও তার গতি তিন চাকা রথের গতির মতো অস্বচ্ছন্দ হয়ে রয়েছে। সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি নিহিত রয়েছে, প্রশাসনের নিষ্ঠা ও চেষ্টার দীনতায় তার সফল সম্ভাবনার আশা পদে পদে বিড়ম্বিত হতে বাধ্য হচ্ছে।

তবু ভারতের কেউই আজ এমন অভিযোগ করবে না যে, প্রজাতন্ত্র ভারতীয় জীবনের অভীষ্ট হওয়ার উপযুক্ত একটা আদর্শ নয়। প্রজাতন্ত্রের সূচনা অথবা প্রতিষ্ঠা ভারতের তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে একটি অভিনব পরিণামের ঘটনা। বাঙালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রায় একশত বছর আগে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করে যে কথা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আধুনিক ভারতের রাজনীতিক আগ্রহের একটি অর্থপূর্ণ পূর্বাভাস নিহিত ছিল।

রুদ্ধ নাহি সূর্য বংশ
গেছে অস্তাচলে,
চন্দ্র বংশ হইয়াছে
রাহু কবলিত।

বিশ্বের ইতিহাসে কল্যাণকৃৎ রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধুনিক বিশ্বজীবনের অভিজ্ঞতায় রাজতন্ত্র বস্তুত একটি রাজনীতিক কুসংস্কারের তন্ত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রজাসাধারণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের শাসনিক সিংহাসনের অধিকার পেয়ে সর্বজনীন কল্যাণের পরিচালক হবে, এটা আধুনিক ভারতীয় জনজীবনেরও একটি উপলব্ধির সত্য। এক্ষেত্রে ভারতীয় জনমতে দ্বিধার কোন সমস্যা নেই। প্রজাতন্ত্রই ভারতের কাম্য রাষ্ট্রিক প্রকৃতি ও পরিচালনার আদর্শ। এবং জাতির পক্ষে সর্বদা সাবধান হয়ে থাকবার প্রয়োজন আছে যে, প্রচ্ছন্ন কোন ব্যক্তি-আধিপত্যের তন্ত্র যেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য বিড়ম্বিত করবার সুযোগ না পায়। বিশ্বের ঘটনায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যার মধ্যে দেখা যায় যে, সাময়িক গোষ্ঠীর অথবা দলের কিংবা ব্যক্তির নিরঙ্কুশ ইচ্ছার আধিপত্য ও অধিকারের তন্ত্রও প্রজাতন্ত্র বলে নিজেকে আখ্যাত করেছে। ভারতেও দেখা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করে কেউ-কেউ এমন অভিমত প্রচার করে থাকেন, যেটা বস্তুত প্রজাতন্ত্রেরই সার্থকতার বিরুদ্ধে একটি সংশয়ের প্রচার।

কবি বায়রন বলেছেন, মাই কান্ট্রি রাইট অর রং—ভাল করুক বা দোষ করুক, আমার দেশ হলো আমার দেশ। উক্তিটির সহজ অর্থ এই যে, কবি বায়রনের ইংলণ্ড শত দোষ করলেও তিনি ইংলণ্ডেরই পক্ষে থাকবেন। বায়রনের এই উক্তির অনেক সমালোচনাও হয়েছে। যা-ই হোক, বায়রনের এই উক্তির অনুরূপ আর-একটি উক্তি কল্পিত হতে পারে; যার মধ্যে কোন ভুল আছে বলে কেউ সমালোচনা করতে পারবে না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রীতি-নীতির মধ্যে কেমন ভুল থাকুক বা না থাকুক, ভারতীয় নাগরিকের কাছে প্রজাতন্ত্রই হলো তার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও কামনার সমাদৃত একটি রাষ্ট্রিক আদর্শের তন্ত্র।। সে প্রজাতন্ত্রের রূপ একদিন পূর্ণতর গৌরবে বিকশিত হবে, বহু অকৃতকার্য ও অকথিত ব্যথার দুঃখ সত্ত্বেও এমন আশা করবার অনেক সঙ্কেত আধুনিক ভারতের জাতিক জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সুপ্রভাত!
প্রজাতন্ত্র

দৃশ্যপট

বিশ্বনাথবাবুরা কতদূর এগোতে রাজি ?

সি পি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন শেষ হল। এবং এই সম্মেলনে কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে :

প্রথমেই যেটা প্রমাণিত হল এই সম্মেলনে তা হল : সি পি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্ব ত্রিধা বিভক্ত—দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী—এই রকম তিন ভাগ। এই ভাগাভাগিটা এখন এতই উগ্র যে পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনে যাতে প্রকাশ্যে খুব বড় কোনও কেলেংকারী না ঘটে যায় সেইটে দেখার জন্য দলের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকে সব সময় অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত দেখা গেল, সি পি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ শাখায় বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি। দলের জাতীয় নেতৃত্ব যেভাবে চলছেন, পশ্চিমবঙ্গে পার্টির ভিতরে তার বিরোধিতা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে বামপন্থীদের শক্তি বেড়েছে। বামপন্থীরা বিশ্বনাথবাবুর কৌশলমত যদিও শেষ পর্যন্ত জাতীয় নেতৃত্বের সংগে একটা রফা করে নিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য কিন্তু এখনও পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক কৌশলের যথেষ্ট সমালোচনামূলক।

তৃতীয়ত এই অধিবেশনে প্রমাণিত হল যে, দলের ভেতরে প্রগতিশীল-কংগ্রেসী বাছাই নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদের মধ্যে কাকে কাকে প্রগতিশীল বলা যায় সেই ব্যাপারে দলীয় নেতৃত্ব কিছুতেই একমত হতে পারছেন না।

*

আসলে সি পি আই এখন একটা কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সি পি আইয়ের পক্ষে একদিকে যেমন রুশ স্বার্থ অবজ্ঞা করা ও রাশিয়ার নির্দেশকে অমান্য করা অসম্ভব, অন্যদিকে তেমনি ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব না।

রাশিয়ার এখন ভারতকে বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষত যতদিন না চীনের সংগে কোনও মিটমাট হচ্ছে। এই জন্যই রুশ নেতৃত্ব ভারতকে অর্থাৎ ভারতের শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বকে খুশি রেখে চলতে চায়। এইজন্যই রুশ নেতৃত্ব আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবং, এইজন্যই রুশ নেতৃত্বকে লজ্জার মাথা খেয়েও বলতে হচ্ছে যে, ভারত ক্রমে ক্রমে তার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করছে—ভারতে অর্থনৈতিক সংঘাতও কমে আসছে। রাশিয়া সব দেখে শুনেও এসব কথা বলছে তার নিজের স্বার্থেই। স্বদেশবাসীকেও রুশ নেতৃত্বের কিছুটা বলার প্রয়োজন আছে যে কেন তাঁরা ভারতকে সমর্থন করছেন।

কিন্তু সি পি আইয়ের পক্ষে প্রকাশ্যে এইসব কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। ভারতে বর্তমানে যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট চলছে সি পি আই নেতৃত্ব তা উড়িয়ে দেবেন কি করে! সি পি আইয়ের নেতারা এদেশে বসে বলবেন কি করে যে ভারতে অর্থনৈতিক সংঘাত কমে আসছে!

আবার প্রকাশ্যে তার উল্টো কথা বলতে গেলেও সি পি আই-কে রুশ নেতৃত্বের সংগে সংঘাতে আসতে হয়। তাদের অস্বীকার করতে হয়। নানা কারণেই সি পি আইয়ের পক্ষে সেটও অসম্ভব। তাই, তাঁদের নানাভাবে গোঁজামিল দিয়ে চলার চেষ্টা করতে হচ্ছে। এবং, যত বেশি এই গোঁজামিলের চেষ্টা করছেন সি পি আই নেতৃত্ব ততই বেশি তাঁদের সংকট বাড়ছে।

এই অবস্থা থেকে চট করে তাঁদের পক্ষে ত্রাণ পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে সেইসব কেন্দ্রে যেখানে দক্ষিণপন্থী তেমন শক্তিশালী নন। দক্ষিণপন্থীরা যেসব রাজ্যে শক্তিশালী সেইসব রাজ্যে তাঁরা তবু জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারছেন যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে সেই জন্য কংগ্রেসের সংগে চলা প্রয়োজন। কিন্তু যেসব রাজ্যে বামপন্থীরাই শক্তিশালী সেইসব রাজ্যে এ কথা বলার সুযোগই নেই। তাই, সেইসব রাজ্যে সি পি আই নেতৃত্বের সংকটও বেশি।

সি পি আই-ও মূলত একটি বামপন্থী পার্টি। ওই দলের কর্মী এবং সমর্থকরাও বামপন্থী মনোভাবের। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সি পি আই নেতৃত্ব কী করে দলের কর্মী ও সমর্থকদের বোঝাবেন যে প্রতিক্রিয়াশীলদের ঠেকাবার জন্য কংগ্রেসের সংগে হাত মিলিয়ে চলা উচিত? এখানে তাই সি পি আই নেতৃত্বের সংকট আরও বেশি। এখানে তাই তাঁদের আবোল-তাবোল বকতে হচ্ছে। কখনও বলতে হচ্ছে, আমরা কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশন সরকার চাই, কখনও বা বলতে হচ্ছে, আমরা প্রগতিশীল কংগ্রেসী ও রুশপ্রেমী সি পি এমওয়ালাদের সংগে মোরচা চাই!

*

রাজ্যে সি পি আইয়ের ভিতরে বামপন্থীদের শক্তি বাড়ছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এইটা হওয়াই স্বাভাবিক। সি পি আই মূলত একটি বামপন্থী দল। এই রাজ্যে এই দলের পক্ষে কংগ্রেস ভজনা করে চলা অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু এই বামপন্থীরা কতটা এগোতে পারেন? ধরুন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আইয়ের ভেতর বামপন্থীরাই একক গরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। তাহলেই এঁরা দলের জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ বিরোধী কোনও কর্মসূচী অনুসরণ করতে পারবেন? তাহলেই কি এঁরা পশ্চিমবঙ্গে নির্ভেজাল কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার বিরোধিতায় নামতে পারেন?

না, তা পারেন না। কারণ, দলের জাতীয় নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে এ জিনিস হতে দিতে পারেন না। রাশিয়াও সে জিনিস বরদাস্ত করবে না।

তাই, এখানে যদি একক গরিষ্ঠতা পেয়ে এখন সি পি আইয়ের বামপন্থীরা নির্ভেজাল কংগ্রেস বিরোধিতায় নামেন তাহলে তাঁদের একটি মাত্র পরিণতি হতে পারে। সেই পরিণতি হল, দল থেকে বিতাড়ন। জাতীয় নেতৃত্ব তখন তাঁদের দল থেকে বের করে দেবেনই।

বিশ্বনাথবাবুরা ততদূর যেতে রাজি কি? না, তাঁরা এখন যেভাবে চলছেন সেই ভাবেই দুকূল বজায় রেখে চলতে চান?

১২-১-৭৫।

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

দেবরাজ

তিন হাঁড়ি

ভিয়েতনামের এখন তিন হাঁড়ি—উত্তরে এক, দক্ষিণে দুই। কম্যুনিস্ট সরকার উত্তরে একেশ্বর হলেও দক্ষিণে অকম্যুনিস্ট গণতন্ত্রী সরকারের ক্ষমতার ভাগীদার হচ্ছে কম্যুনিস্টপন্থী ভিয়েতকং যার পোশাকী নাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। ১৯৭৩-এর প্যারিস চুক্তিতে ও সরকারকে জাতে তোলা হয়েছে, তাকে এখন আর সরকার-বিরোধী বেআইনী গেরিলা সংগঠন বলা চলে না। তবে তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে দক্ষিণী গণতন্ত্রীরা রাজী নয়। তারা চায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে কম্যুনিস্টদের উচ্ছেদ। দক্ষিণ এলাকার কম্যুনিস্টরাও পণ করেছে তারা অকম্যুনিস্ট সরকারকে টিঁকতে দেবে না—যেমন করে পারে তাকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। আপাতত গুনতিতে তিন হলেও আসলে কিন্তু ভিয়েতনামের হাঁড়ি দুটো। একটা কম্যুনিস্ট আর একটা অকম্যুনিস্ট গণতন্ত্রী। উত্তর ভিয়েতনাম যা করেছে তাই করতে চাইছে দক্ষিণ এলাকাতেও ভিয়েতকং—গোটা দক্ষিণে কম্যুনিস্টপন্থী সরকার কায়েম করার জন্যেই তারা লড়ছে।

ভিয়েতকংয়ের এ পরিকল্পনায় সায় আছে উত্তরের কম্যুনিস্ট সরকারের। তাঁরা চান গোটা ভিয়েতনামই লাল হয়ে যাক। তারই পয়লা ধাপ গণতন্ত্রী দক্ষিণী সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের গেরিলা ফৌজের লড়াই। তারা স্বীকৃতি আদায় করেছে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের আমেরিকার কাছ থেকে। উপায় না দেখে দক্ষিণের গণতন্ত্রী সরকারও সে সরকারকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেনে নিয়েছেন। সে স্বীকৃতি অবশ্য আন্তরিক নয়, নেহাতই লোক-দেখানো একটা ভাণ। ভিয়েতকং তাতে অখুশী নয়। সে চেয়েছিল নাকের ডগাটুকু গলাতে। তারপর আস্তে আস্তে গোটা শরীরটাই সে ঢুকিয়ে দেবে দক্ষিণী প্রশাসনে, এই তার মতলব। সবুর করতে ভিয়েতকং রাজী, একসঙ্গে পুরো দক্ষিণ এলাকাটা গিলতে সে চায় না পাছে সব বরবাদ হয়ে যায় দক্ষিণী সরকারকে মদত দিতে বিদেশী দোস্তরা দৌড়ে আসে আবার ভিয়েতনামে। ভিয়েতকং-এর এই ধৈর্যের খেলায় আপত্তি নেই উত্তর ভিয়েতনামেরও। একবার যদি তামাম দক্ষিণ অঞ্চল কব্জা করতে পারে ভিয়েতকং—অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার বনে যাবে স্থায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার—তখন উত্তর দক্ষিণ এক হয়ে যাবে। অখণ্ড হবে কম্যুনিস্টদের ভিয়েতনাম।

প্যারিস চুক্তির শর্ত ছিল দক্ষিণ এলাকায় সরকারী ফৌজ আর বিপ্লবী ফৌজ যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকবে। দখল করবে না, করার চেষ্টাও করবে না। নতুন অস্ত্রশস্ত্র কেউ আমদানি করবে না—সামরিক শক্তি যার যা আছে তাই থাকবে। তবে পুরোনো, বাতিল, নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যবহার করে ফেলা মালপত্তর পালটানো চলবে। তা ছাড়া গোটা ভিয়েতনাম ছেড়ে বিদেশী সেনাবাহিনীদের চলে যেতে হবে। পয়লা দফায় এই করে থামানো হবে যুদ্ধ। এর পর মিলেজুলে শান্তির বনিয়াদ পাকা করার কাজ হবে শুরু। চুক্তিতে বলা হয়েছে উত্তরের ব্যবস্থা যা হবার তা তো হয়েই গেছে। দক্ষিণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করবে সেখানকার বাসিন্দারা—তারাই ভোট দিয়ে জানিয়ে দেবে কী ধরনের সরকার তাদের চাই। কম্যুনিস্ট, অকম্যুনিস্ট আর নির্দল-দের নিয়ে গড়া একটা কমিটী ব্যবস্থা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালাবে। নির্বাচন হবে আন্তর্জাতিক তদারকিতে। সবাই চুক্তির এ সব শর্ত মেনে নিয়েছিল, আমেরিকা তো বটেই, উত্তর দক্ষিণ দুই ভিয়েতনামও, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারও। কিন্তু আমেরিকা ছাড়া ও সব শর্ত মেনে চলার মতলব কারুরই ছিল না।

তাই ভিয়েতনাম থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে মার্কিনীরা সরে গেলেও শান্তির হাওয়া সেখানে বয়নি। লোকের দুর্ভাবনা-দুর্ভোগও যায়নি। উত্তর ভিয়েতনাম তক্কে তক্কে আছে কখন ভিয়েতকং গেরিলাদের হাতে মার খেয়ে দক্ষিণে সরকারী ফৌজ কাবু হয়ে পড়ে। গেরিলাদের সমানে মদত দিয়ে যাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামীরা। কেবল অস্ত্রশস্ত্রই যোগাচ্ছে না, সেপাই শান্ত্রীও পাঠাচ্ছে। প্যারিস চুক্তির শর্ত তাতে ভাঙা হচ্ছে স্পষ্টই। কিন্তু সে চুক্তির তোয়াক্কা আর কে রাখছে? মার্কিনী সেনাসামন্ত আমদানি করে নিজেদের ফৌজের জোর বাড়ানো দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, হাতেনাতে তারা ধরা পড়ে যাবে আমেরিকাও পড়বে বেকায়দায়। আমেরিকা হাতিয়ার দিচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম সরকারকে, দিচ্ছে সলাপরামর্শ, শেখাচ্ছে লড়াইয়ের কায়দা পেছন থেকে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সামনাসামনি আসতে তারা নারাজ। যে অসুবিধে মার্কিনীদের আছে তা উত্তর ভিয়েতনামীদের নেই। ভিয়েতকং-এর শরিকদার তাদের স্বজাত স্বজন। উদি পরানো উত্তর ভিয়েতনামী ফৌজ দক্ষিণী গেরিলা বেশে অনায়াসে নেমে পড়ছে তাদের সঙ্গে। চিনছে কে? তারা করছেও তাই, ভোজ

প্যারিস চুক্তি মেনে নির্বাচন করতে দিতে ভিয়েতকংয়ের আপত্তি নেই। সে নির্বাচনে হারলেও তাদের লাভ, জিতলে তো তারা হাতে স্বর্গ পাবে। সরকারী দল সে নির্বাচনে গরিষ্ঠতা যদি পায়ও কিছু এলাকাতে তো ভিয়েতকং জিতবে। তখন তারা হয়ে যাবে এখনকার সরকারের শরিক। তখন অনিশ্চয়তার দরিয়া থেকে তারা উঠবে স্থিতির ডাঙায়। তারপর পুরো ডাঙাটা দখল করে নেওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার হবে না এই তাদের বিশ্বাস। তাদের এ ফন্দি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের অজানা নয়। রাষ্ট্রপতি থিউ নাচার হয়ে প্যারিস চুক্তি মেনেছেন কিন্তু নির্বাচনের ফাঁদে তিনি কিছুতেই পা দেবেন না এই তাঁর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। প্রাণ থাকতে তিনি কম্যুনিস্টদের ক্ষমতার অংশীদার করে নিতে রাজী হবেন না। সমানে লড়াই চলছে যুদ্ধবিরতির পর থেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে যদিও উত্তর ভিয়েতনাম একদম ঠাণ্ডা। ৩৫০০ সরকারী ঘাঁটির ওপর হামলা চালিয়েছে গেরিলারা। সরকারী ফৌজও ছেড়ে কথা কয়নি। লোক মারা যাচ্ছে দু তরফেরই প্রচুর। লড়নেওয়ালারা তো মরছেই, সাধারণ মানুষেরও রেহাই নেই। তাদের নিয়ে দেশেই কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, তা বিদেশে।

হালে দাপট বেড়েছে গেরিলাদের। তারা নাস্তানাবুদ করে তুলছে সরকারী ফৌজকে। তারা দখল করে নিয়েছে এ বছরে প্রাদেশিক রাজধানী ফুক বিন। শহরটা সায়গনের ১২০ কিলোমিটার উত্তরে। এত দিন চলছিল ঠুকঠাক। এ যে একেবারে কামানের এক ঘা। এর পর ভিয়েতকংকে রুখতে না পারলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের টিঁকে থাকাই দায় হবে। ব্যাপার দেখে টনক নড়েছে আমেরিকার, দক্ষিণী গণতন্ত্রী সরকার যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা হলে ভিয়েতনামে গণতন্ত্রীদের মদত এতদিন যে আমেরিকা দিয়ে এসেছে তা তো বিফলে যাবে। কিন্তু মার্কিনীরা করবেই বা কী? হাতিয়ার আর টাকা না হয় দিলে থিউ সরকারকে কিন্তু তাতে কি ভিয়েতকংয়ের আক্রমণ সরকার ঠেকাতে পারবেন? আর তাও তো আগের মতো দেদার দেওয়া চলবে না—মার্কিন কংগ্রেস অর ভিয়েতনামের ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজী নয়। কিসিংগার নাকি উত্তর ভিয়েতনামকে ভয় দেখানোর জন্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডকে ভিয়েতনাম দরিয়ায়। সে পরামর্শ ফোর্ড কানে তোলেননি। ওদিকে রাশিয়াও হুমকি দিয়েছে আমেরিকাকে ভিয়েতনামে আবার না জড়িয়ে পড়তে। রাশিয়া হুমকি দিক আর নাই দিক ভিয়েতনামে আমেরিকা

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

চালিয়াতি

পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় বেঙ্গল ফাইন রাইস কেন দেওয়া হয় না, এই চাল তবে যায় কোথায়, এই ধরনের আচমকা প্রশ্ন জনৈক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী নাকি বিষম খান। এবং একটু সামলে নিয়ে খাদ্য কমিশনারকে বিস্মিতভাবে হট-লাইনে প্রশ্ন করেন, "হ্যালো, শুনেছেন? আমার সাংবাদিক ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করছেন, রেশনে বেঙ্গল ফাইন রাইস দেওয়া হচ্ছে না কেন?"

খাদ্য কমিশনার : কি বললেন স্যার, কি দেওয়া হচ্ছে না?

খাদ্যমন্ত্রী : বেঙ্গল ফাইন রাইস।

খাদ্য কমিশনার : জিনিসটা কি স্যার, দয়া করে একটু বলতে পারবেন, মানে জিনিসটার ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশনের কথা বলছি।

খাদ্যমন্ত্রী : বাঃ! তা আমি কি করে বলব? আমি কি জিনিসটা কখনও চোখে দেখেছি? আপনি তদন্ত করে আমাকে একটা রিপোর্ট দিন।

খাদ্য কমিশনার : হ্যাঁ স্যার, দিচ্ছি স্যার। কিন্তু কোন্ ধরনের তদন্ত হবে স্যার?

খাদ্যমন্ত্রী : কোন্ ধরনের তদন্ত হবে মানে? আমি এমন ধরনের তদন্ত চাই, যাতে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা একটা সংগত প্রশ্ন যখন তুলেছেন তখন তার উত্তর দেওয়া আমাদের কর্তব্য, আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা দেশের লোককে আমার সাংবাদিক ভাইয়েদের মারফত এই কথাটা জানিয়ে দিতে চাই যে, এটা আমাদের সকলের সরকার। এই সরকারের কাছে তোমরা আর আমরা বলে কিছু নেই। আমরা সবাই ভাই। যেমন একান্নবর্তী পরিবারে সকলে মানুষ হয় আমরাও তেমনি সকলে মিলে এখানে মানুষ হচ্ছি। এই কথাটা আমি জোরের সঙ্গে বলছি। আমার সাংবাদিক ভাইদের কাছে মন্ত্রী বলে নয়, খাদ্য মন্ত্রী বলেও নয়, ভাই ভাইয়ের কাছে যেভাবে আবদার করে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা কয়, আমি সেই ভাইয়েদের একজন হিসেবেই সেইভাবে কথা কইছি, বলতে চাইছি মানুদা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নন, ভাই, দাদা, এই একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের হেড, বাড়ির কর্তা, বাড়ির কর্তার উপর বাড়ির অন্যান্য লোকেরা যেমন সময়বিশেষে একটু রেগে যায়, আবার দাদা হিসেবে, তাঁর প্রাপ্যপ্রেম শ্রদ্ধাও তাকে দেয়, সেই কথাটাই আমি আমার সাংবাদিক ভাইয়েদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমরা মানুদাকে সেই রকম বড় ভাইয়ের চোখে দেখি। হ্যাঁ, কি যেন জানতে চাইছিলাম?

একজন : বেঙ্গল ফাইন রাইস সম্পর্কে—

খাদ্যমন্ত্রী : হ্যাঁ হ্যাঁ, বেঙ্গল ফাইন রাইস সম্পর্কে একটা তদন্ত। (ফোনে) হ্যালো, শুনেছেন?

খাদ্য কমিশনার : হ্যাঁ স্যার, শুনছি।

খাদ্যমন্ত্রী : এতক্ষণ শুনছিলেন নাকি?

খাদ্য কমিশনার : হ্যাঁ স্যার। ফোনটা আর নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হল না। জানেন তো, ফোন একবার ছাড়লে আর কানেকশন পাওয়া যায় না।

খাদ্যমন্ত্রী : তা বেশ। তা বলুন এবার তদন্তের রিপোর্ট কি?

খাদ্য কমিশনার : কোন্ তদন্তের রিপোর্ট স্যার?

খাদ্যমন্ত্রী : কোন্ তদন্ত মানে, তা হলে এতক্ষণ বললাম কি?

খাদ্য কমিশনার : আপনি স্যার এতক্ষণ আপনাদের সাংবাদিক ভাই স্যারদের কাছে একান্নবর্তী পরিবারের সিসটেম বর্ণনা করছিলেন।

খাদ্যমন্ত্রী : তাই নাকি? কিন্তু কেন বলুন তো?

খাদ্য কমিশনার : ঠিক বলতে পারব না তো স্যার।

খাদ্যমন্ত্রী : কেন বলতে পারবেন না তা জানেন?

খাদ্য কমিশনার : সরি স্যার, না।

খাদ্যমন্ত্রী : আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও কমন ওয়েভ লেংথ নেই। আর তার কারণ, আপনারা আমলাতন্ত্রের দ্বারা কবলিত, আপনারা প্রতিক্রিয়াশীল এস্টাব্লিশমেন্টের খুঁটি আর আমরা জনগণের ভাই। আমি একান্নবর্তী পরিবারের কথা এইজন্যে বলেছিলাম যে, সেখানে কারো কাছেই কারো লুকোবার কিছু নেই। আমার এই তদন্তেও আমরা কোনও রাখতে চাইনে। তদন্তের ফলাফলও কুইকলি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। বুঝেছেন?

খাদ্য কমিশনার : বুঝেছি স্যার! আপনি যেমন রেজাল্ট পেতে চাইবেন, আমাদের সেই ধরনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর তা... আমরা করে দিতেও পারব। কিন্তু তদন্তের দ্বারা কিরকম ফল পেতে চান, সেটা স্যার সম্পূর্ণত পলিসি ম্যাটার, আমি সেটা নির্ধারণ করে দিতে পারিনে। সেইটে স্যার আগে বলে দিন। তা ছাড়া স্যার এটাও বলে দিন, এটা ফ্যাকট ফাইন্ডিং হবে, না কেলেঙ্কারি বাড়ানো হবে? তদন্তটা স্যার ডিপার্টমেন্টাল হবে, না কি জুডিশিয়াল হবে, না—

খাদ্যমন্ত্রী : থামুন মশাই, থামুন। ওঃ মাথা বনবন করে ঘুরছে। কি করলে ভাল হয় একটু সাজেসট করুন না।

খাদ্য কমিশনার : স্যার এক কাজ করুন, খানুবাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি স্যার সুরাবর্দীর আমল থেকে র‍্যাশনিং-এর এক্সপিরিয়েনস গ্যাদার করেছেন। উনিই স্যার আপনাকে ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

খানুবাবু এসেই খাদ্যমন্ত্রীকে "প্রাতঃপ্রণাম স্যার, আজ ধন্য হলাম স্যার, ভেরি গুড ল্যাক স্যার" বলে দাঁড়ালেন।

খাদ্যমন্ত্রী : খানুবাবু, আপনি কার লোক?

খানুবাবু : হোহাই কোশ্চেন স্যার, আমি আপনার লোক স্যার।

খাদ্যমন্ত্রী : বেশ তবে বলুন বেঙ্গল ফাইন রাইস রেশনে পাওয়া যায় না কেন?

খানুবাবু : এই কোশ্চেন স্যার! ভেরি ইজি আনসার স্যার। পারটিশন কাট বেঙ্গল স্যার। নো বেঙ্গল নাউ স্যার দেয়ারফোর নো বেঙ্গল ফাইন রাইস স্যার। এ তো সোজা কথা স্যার।

খাদ্যমন্ত্রী : তবে বেঙ্গল ফাইন রাইস কথাটা কোথেকে এল?

খানুবাবু : ফ্রম এনসেনট ইনডিয়ান হিস্ট্রি স্যার। এনসেনট ইনডিয়াতে স্যার অনেক রকম বেঙ্গল রাইস ছিল স্যার। মেনি ভ্যারাইটি স্যার। তাই থেকে এসেছে স্যার। ভেরি ইজি উত্তর স্যার।

খাদ্যমন্ত্রী : তা হলে এখন যে-সব চাল রেশনে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কি চাল?

খানুবাবু : জনতা চাল স্যার, ভেরি ভেরি গুড স্যার। খান না-খান হেলথ ইমপ্রুভ করবে স্যার।

খাদ্যমন্ত্রী : তা হলে বেঙ্গল ফাইন রাইসের যে দাবি উঠেছে তার জবাবে কি বলব? প্রেসের ভাইয়েরা জবাবের জন্য যে বসে আছেন।

খানুবাবু : প্রেসের বড়দাদের বলে দিন স্যার যে, ব্যাপারটা তদন্তের জন্য সি বি আই-এর কাছে পাঠানো হয়েছে। তা হলেই ওদের বড় হেডিং হয়ে যাবে। ওরা স্যার চাল চান না, চালিয়াতি চান, বড় হেডিং পেলেই খুশী হবেন স্যার।

দিয়ে দাও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যে যা চাইছে,
তাকে দিয়ে দাও—
অনেক তো আছে!

সেন্ট মেরী হিল থেকে
কিছু দূরে, কার্সং বাজার—
সেইখানে যাও, কিনে রাখো
টুকিটাকি শৌখিন জিনিশ—
দার্জিলিঙের মালা, ভুটানের রঙচঙে থলি,
তিব্বতী মোজা।

'রমলা-ভিলায়' গিয়ে
সবাইকে জনে জনে ডেকে
সব দিয়ে দাও।

পাহাড়ী সূর্যাস্ত বড়ো উদারতা শেখায়—শেখোনি?
তুমি তো পনেরো দিন
পাহাড়, সূর্য, আর অর্কিড দেখেছো—
আজ সব দিয়ে দাও।
মীরা ঘোষালকে দাও পুজো-সংখ্যা 'দেশ'—
তারপর
ট্রেনে উঠে পড়ো॥

পুরুলিয়ার কৃষকের প্রতি

প্রদীপচন্দ্র বসু

আবার বর্ষার দিনে তুমি ফিরে পেতে পারো লুপ্ত সম্ভাবনা!
এখন চৈত্রের শেষ; রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে
জ্বলে যায় মাটি, যাযবীজ, বিচ্ছিন্ন আগাছা
এই নির্জন ভদ্রাসনে আজ কাকপক্ষীর সাড়া নেই।
ব্যর্থ আশা নিয়ে কে মানুষ বসে আছো ঘরের দুয়ারে!
ওঠো, ক্লান্তির সকল চিহ্ন মুছে নাও গামছার খুঁটে;
দাওয়ায় ঘুমন্ত স্ত্রী, ওকে তুমি জাগিয়ে তুলোনা
শুধু, ওর উন্মুক্ত বুকের লজ্জা ঢেকে দাও।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নয়,
বাঁচায় তাগিদে এখন খুঁজতে হবে বিকল্প প্রয়াস।

কবিতা

শান্তি সিংহ

ক্লান্তিতে ঘুমের মতো অনায়াসে নেমে এসো
জলের মতন ছন্দে সাবলীল অনির্বচনীয়
নিঃসীম খরার দেশে, অসুখে সেবার মতো
রাতজাগা বিহ্বল উৎসুক—

অপার সহজময়ী
বিচিত্র দ্বান্দ্বিক এই চরাচরে সারাৎসার
[illegible] অঙ্কুরের পাঁজর অমৃত।

অনুমতিপত্র

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার অনুমতি নিয়ে বাগানে ঢুকেছো
জানাজানি হতে পারে, পালাও, পালাও
এ সমস্ত ফুল নয়, এই লতা-পাতা
এই গাছ, এই নদী, এই বনভূমি
শাণিত মেঘের থেকে আরো ভয়াবহ
জটিল বিন্যাস এর প্রকরণবিধি

নিমগ্ন হয়েছো তুমি অপরূপ ভোরে
সিঁথিতে উজ্জ্বল হওয়া হলুদ রোদ্দুর
জেগে আছে, এইসব দেওয়াল লিখনে
তাচ্ছিল্য তোমারই সাজে।
তুমি অবহেলা
করজোড়ে হাতে নিয়ে অঙ্গুলির ক্ষীণ ঘেরাটোপে
আগুনের শোক-তাপ সহ্য করেছিলে

আয়ু নয়, এরা কেউ হলাহল-ও নয়
এ বাগানে সূর্যালোক কদাচিৎ আসে

যন্ত্রণা

ফজল-এ-খোদা

বুকের কথা মুখের মধ্যে জমে
মুখতো খোলা যায় না তবু কাজে
মাথার দোষে ভাবনা আজে বাজে
শিহর জাগে দেহের প্রতিলোমে।

দুখের দিনে কেবল দুঃখ বাড়ে
সুখ তো ভয়ে দেয় না দেখা নিজে
রোগীর মত বাড়ায় জ্বালা কি যে
দুয়ার এঁটে ইচ্ছে মত মারে।

আগের দিনে লোকের মুখে শোনা—
সময় ছিলো হাজার যেতো গোণা।

শৈশবের নীচে

শংকর চক্রবর্তী

কিছু থাকে, স্মৃতিহীন নির্লজ্জ বেহায়াভাব—নখের পশ্চাতে
রঙিন উলের আঁশ হা হা উড়ে আসে
সেখানে তৃষ্ণার্ত পাখি ঘরের কাঙালী যেন চক্ষু ফিরে পায়,
তার রং নেই কোনো—নেই হাল্কা বিবস্ত্র পুতুল,
এ কোন্ আশ্চর্য ফুল বিঁধে আছে নীল দস্যু বুকে?
সে তো ভগ্ন জানু রাখে বাঁপাশে স্মৃতির টিপ পাথুরে আইনাতে
এনে দ্যায় পাখিদের চকচকে খাবার।
কেউ ক্ষুধার্তকে জানে, কেউ ক্রোডে পরবাসী, হায়!
মধ্যরাতে ভূগোলের স্পর্ধিত মানচিত্রে
কেউ ছোঁড়ে কণ্ঠমালী মূর্খ গণিকার।

এই বৎসর কেমন যাবে

রঞ্জন

সীমাহীন জ্ঞানসমুদ্রের নানা পুরীতে নুড়ি কুড়িয়েছি এখন তখন, প্রধানত খেলাচ্ছলে, সাধ ছিল, ছিল না সাধনা। কিন্তু জ্যোতিষী চেষ্টা করিনি কোনো দিন। অদ্যও সে উদ্যোগে উৎসাহী নই। অতীত প্রোথিত থাক ইন্দিরার মিথ্যাকীর্ণ ক্যাপসুলে; ভবিষ্যৎ থাক তার অখোলা খামে। টেলিফোনের ঘণ্টা কিন্তু আমায় বিব্রত করে। বাজামাত্র জবাব না দিলে আমার অস্বস্তি হয়: মনে হয় কোনো বিপন্না প্রতিবেশিনীর আর্তনাদে আমি সাড়া দিচ্ছি না। ইংরেজি নববর্ষ টেলিফোন করে আসে না। ঘণ্টা বাজিয়ে আসে। গীর্জার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করলে, যেমন আমি করি, ঘণ্টা শুনতেই হয়। আগে এই ঘণ্টা-ধ্বনি আনতো আশার আশ্বাস। এখন আনে না এবং ব্যক্তিগত জরাই তার একমাত্র কারণ না হতে পারে। কী বার্তা বহন করে এনেছে এই রবাহূত ১৯৭৫? বলা বাহুল্য, জানি না। অসাফল্য যদি সাফল্যের সোপান হয় তাহলে অজ্ঞতা লেখনীর প্রধান বাহন। কিছু জানলে লেখা দ্বিধাগ্রস্ত হয়; অজ্ঞতা পায়ে হেঁটে নদী পার হয়।

নববর্ষ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ভৃগু নিশ্চয়ই করে গেছেন। তাঁর বংশধর বা শিষ্যরা সর্বত্র প্রাপ্তব্য। আমি তাঁদের কেউ নই। বর্তমান নিয়ে কালোবাজারি যদি অব্যাহত থাকে তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে ঈষৎ পাটোয়ারি নিশ্চয়ই অমার্জনীয় নয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আবির্ভাব আমাকে আশার চাইতে আশংকা দিয়েছে বেশি। স্বয়ং সিদ্ধার্থশংকর রায় আমাকে একটি ছাপানো কার্ড পাঠিয়ে সাদর সম্ভাষণ বা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন। এমন লিপি নিশ্চয়ই গেছে সহস্র তথাকথিত বুদ্ধি-জীবীর কাছে। খরচাটা কার? এমন অনর্থক জনসংযোগ দিয়ে যদি নববর্ষের উদ্বোধন হয় তাহলে আমার আতঙ্ক নিশ্চয়ই অমূলক নয়। যেদিকে তাকাই নৈরাশ্য ছাড়া কিছু খুঁজে পাইনে। রাজনীতি আজ শত্রুনীতি। অর্থনীতিতে না আছে অর্থ না নীতি। সরকার বলে একটা পদার্থ আছে বটে নয়াদিল্লীতে কিন্তু সে তো আত্মস্বল্প-সংখ্যক কয়েকটি সংসারের সম্প্রসারণ মাত্র। আমার এক অধ্যাপক গোটা ভারত সরকারকে যুগান্তরে বর্ণনা করতেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উত্তরাধিকারী বলে। বর্তমান সরকার বণিকের প্রকাশ্য শরিক। নববর্ষের শর্বরী পোহাবার পূর্বেই চেনা শক্ত কোনটা মানদণ্ড আর কোনটা রাজদণ্ড। ইন্দিরা গান্ধীর সোচ্চার সমাজতন্ত্রে আমার আস্থা তাই সীমিত। তিনি গরিব হটানান; হটিয়েছেন গরিব আমাকে। আগামী বছরে আমার অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতির ইঙ্গিত পাইনি। অবনতির সুস্পষ্ট পন্থা অগণ্য। পুলিস চাই জনসংযোগের জন্য (মৃদু লাঠি চার্জ এ কার্যে প্রায়শ অপরিহার্য) আর পাসপোর্ট চাই বহির্বিশ্বের সঙ্গে অন্তহীন অর্থহীন বাক্যবিনিময়ের জন্য। তার জন্য অর্থ জোগাতে হবে তোমাকে, তোমাকে আর তোমাকে। আমাদের নিষ্কপর্দক সরকার প্রকাশ্য দিবালোকে পকেটমারি করে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তার শতাংশের সদ্ব্যবহারও সর্বজনপ্রত্যক্ষ হলে সার্বজনীন অসাধুতা এমন বীভৎস আকার গ্রহণ করতো না।

*

কালোবাজার শুধু বাজারকে কালো করেনি; সে জায়গাটা কখনোই অমলিন ছিল না। কালোবাজারী মনোবৃত্তি সমস্ত সমাজের উপর কালিমা লেপন করেছে। আর্থনীতিক অপরাধ বলে সম্প্রতি একটা কথা ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই বা সর্বত্র আদালতে গৃহীত। এমন অনির্দিষ্ট অভিযোগে বাক্স্বাতন্ত্র্য সহজেই হস্তগত হতে পারে। বহুধা অভিযুক্ত শকুনি আমারে নয়, তৎপূর্বে বহুধা অর্থভৃমিক লেনিনী কালেও এক ভদ্রমহিলা, রাশিয়ান ও খাঁটি কম্যুনিস্ট, ইটালিতে টগলিয়াত্তিও সিলোনেকে সিখে-ছিলেন, যদি শুনতে পাও আমি ক্রেমলিন থেকে কয়েকটি কাঁটা বা চামচে চুরি করেছি বলে আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তাহলে জানবে যে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছে রাষ্ট্রীয় কূটনীতি সম্পর্কে। আর্থ-নীতিক অপরাধ বর্তমান ভারতে অতি বাস্তব ও নিষ্ঠুর সত্য কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী জানেন যে দুয়েকটি মস্তানকে পাকড়াও করলেও চোর, জুয়াচোর ও পকেটমার তাঁর নিকটেই আছে—যেমন রেলগাড়িতে আগে যাত্রীদের সতর্ক করা হোতো। এঁরা বর্তমান রাজনীতির সৃষ্টি: এঁরা ভবিষ্যৎ রাজনীতির স্রষ্টা। আগামী বছর, যা স্টেশনে পৌঁছে গেছে, কেমন যাবে তা নির্ধারণ করবেন এঁরাই। আমার আপনার জন্য আলোর আশা সামান্য। সামনে এক সরু আর অতিদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা অন্ত যার দৃষ্টির অতীত। ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন নয়: কুয়াশায় দৃষ্টিসীমা সত্ত্বেও প্রগাঢ় একটা শান্তি থাকে, থাকে কবোষ্ণ রহস্য। আমাদের ভবিষ্যতে রহস্য সামান্যই; সে যেন সকালে কারখানার চিমনির বেহায়া ধোঁয়ার নির্লজ্জ অনাবরণ। রাস্তায় বেরুলেই দেখা যায় তার নিরাবরণ রূপ; ছাড়গুলি খুঁজে দেখতে হয় না, ওরা চোখে খোঁচা দেয়। কিন্তু সাবধান, সামনেই গাড়ি আছে মার্কিন মুলুকের। পরাজিত পদাতিক।

এই সামাজিক অশ্লীলতা আজ প্রায়-সম্ভ্রান্ত। কোন কুবেরকন্যার বিবাহ হবে তার জন্য একটা গোটা রাস্তা পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে পক্ষকালের জন্য, পুলিসী পৃষ্ঠপোষকতায়। ধৃত কিন্তু এখনো প্রধানত অনভিযুক্ত কথাকথিত চোরাচালানকারীর আদালতে যেতে পারবেন না: কে জানে কোন কেঁচো খুঁড়তে কোন কেউটের আবিষ্কার হয়। আদালতের অবমাননা তো প্রাত্যহিক ঘটনার। সরকারের হাতে আছে অর্ডিন্যান্সের অমোঘ অস্ত্র। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, যদিও সাবেকী বিচার ব্যবস্থা সমালোচনার অতীত ছিল না নিশ্চয়ই। সদ্যোজাত বৎসরটাতে অর্ডিন্যান্স পরিবার পরিকল্পিত হবে এমন সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল। জয়প্রকাশকে আমি সন্ত বলে জ্ঞান করিনে, কিন্তু তাঁর উপর প্রস্তরনিক্ষেপের অধিকার প্রধানমন্ত্রীর পরিষদদের নেই।

*

বিরোধী দলগুলির মধ্যে তো নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। দলাদলি ব্যতীত দ্বিতীয় কাজ নেই। এটা আশার কুহক মাত্র যে সমগ্র সমাজ যখন কলুষিত তখন বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রাজনীতির দলগুলি এই সামগ্রিক দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েই পবিত্র থেকে যাবে। আর্থ-নীতিক ও রাজনীতিক নীতিহীনতা যখন সমগ্র সমাজকে গ্রাস করেছে তখন কয়েকটি অতীতে শ্রদ্ধেয় সংস্থার ইমস্যুলেশন সম্ভব নয়। সাংবাদিকরাও এই সত্য স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন, অন্তত আত্মানু-সন্ধানী হবেন শুধু পরসন্ধানী না হয়ে।

নববর্ষে তবু নবচিন্তা জাগে। বোধ হয় পুরোনো অভ্যাসের বশেই। মরীচিকা হলে ভাবতে ভালো—ভাবতে নয়, কেমনা ভাবনার ভিত্তি অদৃশ্য, শুধু আশা ও কামনা করতে—যে বর্তমান রাত্রির অন্ধকার গভীরতর হলেও তার পরে আছে নব অরুণোদয়। কবি আজ জীবিত থাকলে বর্তমান শাসক-কুলকে অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য কী কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতেন তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কিন্তু তার শেষে থাকতো একটা দৃঢ় প্রতীতি। এই প্রতীতিই এবারের নববর্ষে ভাষা পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যাহীন প্রতিশ্রুতি তো বাগাড়ম্বরের বাচালতা।
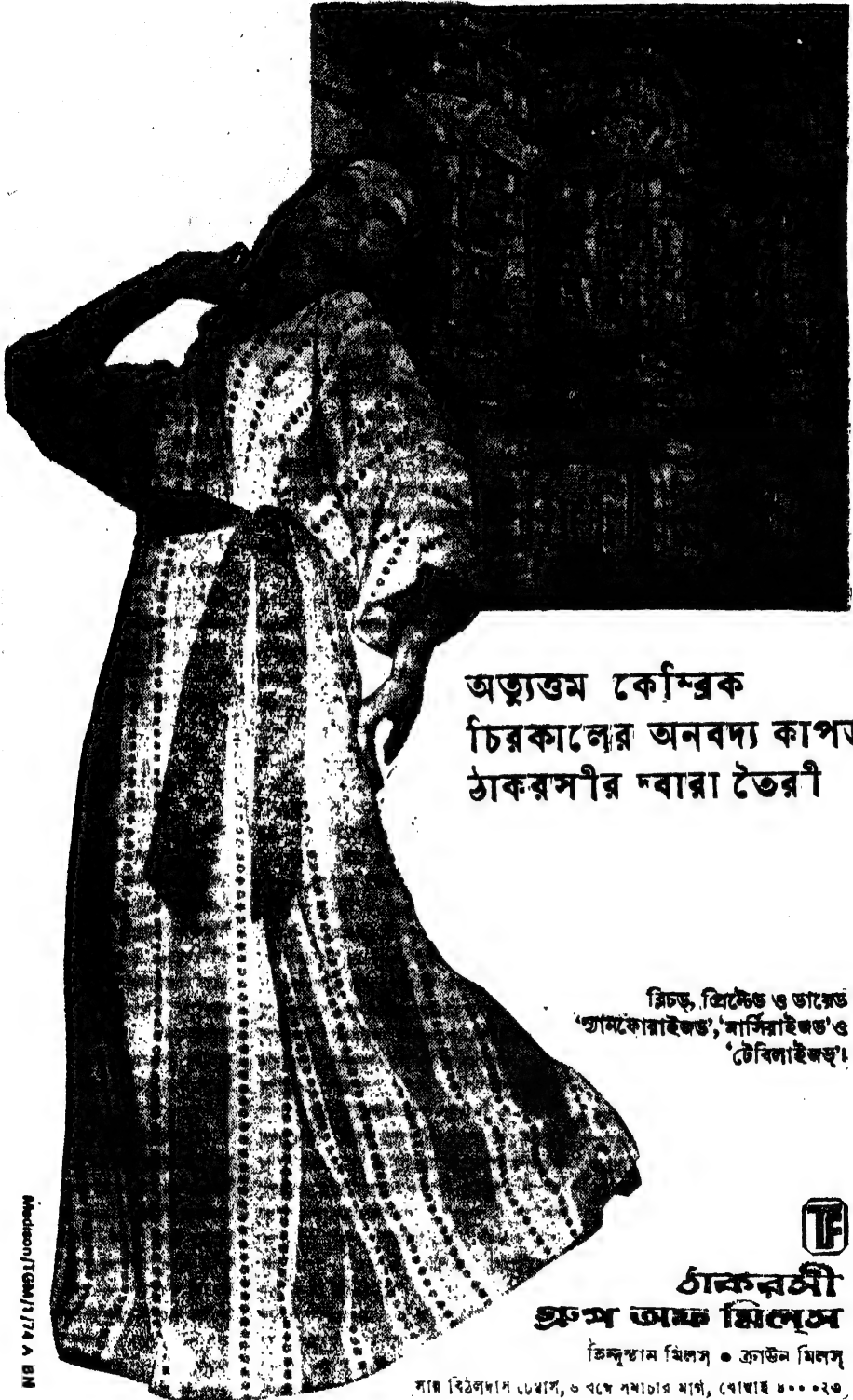
হে বিদেশী ফুল

কৃষ্ণা বসু

'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী, মাধুর্য সুধায়—'। কোন কোন বিদেশিনী শুধু যে এই দূরদেশী পথিককেই আপনার করে নিয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর জীবনের স্বপ্নও অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সেই স্বপ্ন সফল করে তুলতে প্রেরণা দিয়েছেন, বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বারবার। এঁদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি? অথচ সুভাষচন্দ্রের জীবনে তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁদের দান বড় সামান্য নয়।

সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রবাস জীবন ছাত্র অবস্থায় ইংলণ্ডে। বিভিন্ন কারণে ওঁর নিজের এই প্রবাস জীবন খুব সুখকর মনে হয়নি। হয়ত বিলেতে I. C. S পড়া নিয়ে তাঁর মনে যে দ্বন্দ্ব ছিল, এই অসুখী মনোভাবের তা অন্যতম কারণ। তাছাড়া বিলেত দেশটাকে সুভাষচন্দ্র দেখলেন প্রভুরাষ্ট্র হিসেবে। তাই তিনি সেখানে মন খুলতে পারলেন না—এইভাবে দ্বার রুদ্ধ করে রাখার ফলে ইংরেজ জীবনধারার অনেক ভাল জিনিসও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

ইংলণ্ডের প্রবাস জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে তাঁর যোগাযোগ হল শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে। এই ইংরেজ মহিলার জন্ম হয়েছিল রাশিয়াতে। আর বিয়ে করেছিলেন পাঞ্জাবের ডাক্তার এন আর ধর্মবীরকে। এই তরুণ দম্পতি সে সময় ল্যাংকাশায়ারে থাকতেন, ডাক্তার ধর্মবীর সেখানেই প্র্যাকটিস করতেন। এখানেই সুভাষচন্দ্র এলেন বন্ধুবর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে।

এই ইংরেজ মহিলার আতিথ্যে ও মধুর ব্যবহারে তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। অথচ শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পথে দুটি বিরাট বাধা। একথা সুভাষচন্দ্র ভুলতে পারেন না যে তিনি ইংরেজ দুহিতা। যা কিছু ব্রিটিশ তার প্রতি তাঁর মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন। আর দ্বিতীয় আরো গুরুতর কারণ, সুভাষচন্দ্রের মেয়েদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারার অক্ষমতা।

এ সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু দিলীপকুমারের মত বিশদভাবে ও সরলভাবে আর কেউ বলেননি। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ব্যাপারে তিনি এ সময় অত্যন্ত আড়ষ্ট ও অপ্রস্তুত বোধ করতেন। ". . . awkward and shy and ill at ease vis-a-vis women!" নিজে মেলামেশা করবেন না, আবার বন্ধুদেরও রাশ টেনে রাখবেন। অবশ্য দিলীপকুমার অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে রাশ টেনে রাখায় সুভাষচন্দ্র প্রায়শ ব্যর্থ হতেন। এ ব্যাপারে তিনি বন্ধুর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সুভাষচন্দ্রের কলকাতার কলেজ জীবনের সহপাঠী কাজী আবদুল ওদুদ এ সম্বন্ধে কবিতায় লিখে গেছেন—

'কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম স্বদেশ প্রেমিককেই—
সাড়া জাগাতো না অন্তরে তার সন্ন্যাসের আহ্বান।
জেনেছি তখন তরুণীর মাধুর্য ও শুচিতা
বাধতো ভাবতে নারী পথের বাধা।"

সহজাত নেতা সুভাষচন্দ্র যতক্ষণ অন্তত সামনে আছেন, ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রবন্ধুরা সম্মোহিতের মত তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলেন। তাঁরা দেখে বিস্মিত হতেন মেয়েরা সহজেই সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তার একটা বড় কারণ—" . . he is so good and unapproachable: অন্য বন্ধুরা যা পাবার জন্য লালায়িত, উনি তা পেয়েও ফিরে তাকান না। দেখে ওঁরা চমৎকৃত হয়ে যান।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার বিচার করতে হবে। যে কদিন তিনি ওঁদের সঙ্গে কাটালেন, মুখ ফুটে তাঁর ভালো

শ্রীমতী ধর্মবীর ও ডাক্তার ধর্মবীরের সঙ্গে ডালহৌসিতে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৭)

মনের কথা প্রকাশ করতে পারতেন না। ডাক্তার ধর্মবীর সোশ্যালিস্ট, লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। সুভাষচন্দ্র তখন সবে I. C. S. ছেড়েছেন; তাঁকে নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। ডাক্তার ধর্মবীর আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আলাপ-আলোচনায় অবশ্য ইংরেজদের সম্বন্ধে হয়ত তিনি এমন মন্তব্য করে বসেন যা তাঁর তরুণী ইংরেজ ভার্যার কাছে কঠোর মনে হতে পারে। চিরদিনের ব্রিটিশের প্রতি বিরাগ ভুলে সুভাষচন্দ্র তাড়াতাড়ি সে সব মন্তব্য মোলায়েম করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

চলে আসার দিন রেনকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুভাষচন্দ্র দেখলেন একটা প্যাকেট উঁচু হয়ে আছে। প্যাকেট খুলে দেখলেন, কিছু খাবার। স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্মবীরেরা। কামরার ভিতর দুই বন্ধুর কোলে দুটি প্যাকেট ছুঁড়ে দিলেন মিসেস ধর্মবীর। তাতে আছে শুকনো ফল আর চকোলেট। প্যাকেট হাতে সুভাষচন্দ্রের চোখে জল এল। দিলীপকুমারের দিকে ফিরে বললেন—"Women will always be women."

এর কিছুকাল পরে জাহাজে চড়ে ইংলেণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। ১৯২১ সালের জুন মাস। জাহাজে বসে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন মিসেস ধর্মবীরকে। সেদিন থেকে তিনি সুভাষচন্দ্রের দিদি। আমরা দেখেছি যে সব মহিলা সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা যেন সকলেই ও'র কাছে mother-figure—মাতৃস্থানীয়। যেমন বাসন্তী দেবী বা বিভাবতী বসু। মিসেস ধর্মবীর পেলেন দিদির আসন। এর পর আমরা দেখব ত্রিশ দশকে উনি যখন য়ুরোপে এলেন তখন উনি আরো অনাড়ম্বর ও সহজ হয়েছেন। সে সময় যে সব বিদেশিনী তাঁর কাছে এসেছিলেন—হেডি ফুলপ-মিলার, নাওমি ফেতার বা কিটি কুর্টি,—তাঁদের তিনি আর মা বা দিদি-তে পরিণত করেননি। তাঁদের সঙ্গে বলা যায় ছিল তাঁর অনাবিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

জাহাজ দুলছে, হাতের লেখা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, তবুও তিনি লিখে চলেছেন দীর্ঘ চিঠি। মিসেস ধর্মবীরকে তিনি জানাচ্ছেন যদিও সাক্ষাতে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করতে পারেননি, তাঁর সাহচর্যে তিনি কতদূর অভিভূত হয়েছেন। ইংলণ্ডে আর কেউ তাঁকে এত আপনার করে নেয়নি, পথে তিনি কি খাবেন ভেবে ব্যস্ত হয়নি, চিন্তা-মগ্ন হয়ে থাকলে উনি যেমন করে জিজ্ঞাসা করতেন—'a penny for your thoughts' তা আর কেউ বলেনি। উনি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যা রাজনৈতিক সম্পর্ক তাতে ও'র পক্ষে ইংলণ্ডে বাস কখনোই সুখের হয়নি। তাই ইংলণ্ড ছেড়ে যেতে ও'র মনে একটুও খেদ নেই, একমাত্র ব্যতিক্রম মিসেস ধর্মবীরের সঙ্গে কাটানো এই দিনগুলি। I was genuinely happy during my short stay there-—এই কটি দিনের স্মৃতি ও'র কাছে মূল্যবান।

শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে এই অল্প দিনের পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। চিঠিপত্রের শেষে 'প্রীতি-সম্ভাষণ ও নমস্কার' ধীরে ধীরে পরিণত হল সশ্রদ্ধ প্রণামে—'respectful pranams'। ১৯৩৭-এ ডালহৌসি পাহাড়ে ও'দের কাছে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এলেন সুভাষচন্দ্র। নানান দিকের বিবরণ থেকে মনে হয় বেশ আনন্দ-মুখর দিন এখানে কাটিয়েছিলেন। মিসেস ধর্মবীরের পোষা বিড়াল সঙ্গে নিয়ে পাঠান-কোট থেকে ট্রেন জার্নির কৌতুককর ঘটনা রয়েছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে খেপে গিয়ে বেড়াল তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করছে। গ্রীষ্মকাল, আম খাওয়া হচ্ছে, ধর্মবীর-ক[illegible] সীতা পাঠিয়েছে লখনৌ থেকে। [illegible]র ধর্মবীর হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, খরমুজা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং লাগে, ডিনারে সবাইকে খরমুজা খেতে বাধ্য করছেন।

এই সূত্রে সুভাষচন্দ্রকে একটি মধুর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। জীবনে কত না ভূমিকাতে ও'কে দেখা গেছে। কিন্তু ঠিক এই ধরনের ভূমিকাতে বেশি দেখা যায়নি। বিবাহের কথায় মধ্যস্থতা করছেন। ধর্মবীর কন্যা সীতার মনোনীত ডঃ সন্তোষ সেনকে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন তাঁদের বন্ধুতার ব্যাপারে উনি কোন সাহায্য করতে পারেন কি না। তারও বছর খানেক পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি চেয়ে মিসেস ধর্মবীরকে চিঠি লিখলেন।

১৯৪১-এ জানুয়ারীতে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কয়েক দিন আগে মিসেস ধর্মবীরকে

একটি ছোট চিঠি লিখেছেন। আবার শীগগিরই হয়ত জেলে ফিরে যেতে হবে—এমনি কথা আছে তাতে। এই সময় কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি এ ধরনের কিছু চিঠি বন্ধু ও সহকর্মীদের লিখেছিলেন। তবে মনে হয় মিসেস ধর্মবীরের চিঠিতে সেই উদ্দেশ্য ছাড়াও বোধ হয় তাঁর My dear didi-র কাছে একটা না বলা বিদায় প্রচ্ছন্ন আছে।

*

১৯৩৩-এ বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য য়ুরোপ যেতে অনুমতি দিলেন। শুরু হল সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রবাসজীবন। ইতিমধ্যে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন হয়েছে, মেয়েদের সম্পর্কে আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটেছে। মেয়েদের সম্পূর্ণ বাদ দিলে একটি জাতির জীবনধারা সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়—একথা তাঁর মনে হয়েছে। বন্ধুবর দিলীপকুমার রায় বলেছেন "He had come to realise that a stolid indifference to all that is best in the sex he fought shy of could be anything but rewarding."

এই পরিবর্তনে উৎসাহিত হয়ে বিদেশ যাবার সময় অন্যান্য চিঠির সঙ্গে তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী হেডি ফুলপ-মিলারের কাছে একটি পরিচয়পত্র দিলেন দিলীপকুমার রায়। হেডির কণ্ঠস্বর অপূর্ব, তিনি একজন সুখ্যাত অপেরা-গায়িকা। তিনি জন্মসূত্রে হাঙ্গেরিয়ান, কিন্তু বিয়ে করেছেন অস্ট্রিয়ান লেখক রেনে ফুলপ-মিলারকে। তাঁরা বাস করতেন ভিয়েনাতে। হেডির বিবাহিত জীবন অবশ্য খুব সুখের হয়নি। পরবর্তী কালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়।

সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় পৌঁছবার পর অল্প দিনের মধ্যে হেডির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে প্রথম ভিয়েনায় পৌঁছবার পর ও পরে তাঁর অপারেশনের সময় হেডি আপ্রাণ দেখাশুনো করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে বলা বাহুল্য, হেডি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওঁর সম্বন্ধে 'wunderbar', 'fablehaft' এই ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন। হেডি বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের মত আরো দু-একজন য়ুরোপে পাঠাতে পারলে ভারতবর্ষের জন্য আর কোন প্রচার নিষ্প্রয়োজন। হেডি ছিলেন যেমন গুণী শিল্পী তেমনি বুদ্ধিমতী। ভিয়েনার বিভিন্ন মহলে, এমন কি রাজনৈতিক মহলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন।

বহুকাল পরে, তাঁর তখন বেশ বয়স হয়ে গেছে, আমার এই মহিলার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভিয়েনায় ওঁর বাড়িতে বসে বহুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল।

হেডি ফুলপ-মিলারের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র (ভিয়েনা ১৯৩৫-৩৬)

মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও বেশভূষায় ও সাজ-সজ্জায় সযত্ন পারিপাট্য আছে। ঘরের আসবাবপত্র, ছবিতে শিল্পীমনের পরিচয়। আমাদের জন্য চায়ের যে আয়োজন তাতেও সুরুচির ছাপ। চা খেতে খেতে হেডির কলকাতায় বেড়াতে আসার গল্প শুনেছিলাম।

সুভাষচন্দ্রের বিদেশিনীদের মধ্যে নাওমি ক্ষেত্র কখনো ভারতবর্ষে আসেননি। কিটি কুর্টি অতি সম্প্রতি ১৯৭০ সালে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধর্মবীর অবশ্য ভারতবর্ষেরই বধূ। একমাত্র হেডিই সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে কলকাতায় এসেছিলেন। অবশ্য সুভাষচন্দ্র তখন বন্দী। কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। সরকারী অনুমতি নিয়ে গিয়ে গিয়ে দেখা করে আসতেন উনি। কলকাতায় উনি শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের গৃহে অতিথি ছিলেন। বসু-পরিবারের সঙ্গে এ সময় তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা হয়। উনি শাড়ি পরতেন, ভারতীয় রান্না খেতে ভালবাসতেন। কলকাতারই একটি ইংরেজী পত্রিকায় উনি ওঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখেছিলেন।

কিছুদিনের জন্য উনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়েছিলেন। ওঁর গান শুনে শ্রীঅরবিন্দ মুগ্ধ হন। তিনি ওঁর ভারতীয় নাম দিয়েছিলেন নীলিমা—"I have thought of the name Nilima for Heddy as a symbol of her aspiration." কলকাতার রেডিও আপিস থেকেও উনি গান গেয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সংগীতরসিকেরা বলেছিলেন, এমন উঁচু দরের গান তাঁরা বহু দিন শোনেননি।

ভিয়েনায় ১৯৫৯-এর ক্রিসমাসে এই সাক্ষাৎকারের সময় হেডিকে আমার কেমন যেন রহস্যময়ী মনে হয়েছিল। একদিকে ওঁর ভারতবর্ষের 'মিস্টিক' বা অধ্যাত্মজীবনের প্রতি ঔৎসুক্য আছে। রাজনীতিতেও উৎসাহের অভাব নেই। অন্য দিকে আছে ওঁর শিল্পজগৎ, সংগীতচর্চা। ব্যক্তিগত জীবনে কোথায় একটা শূন্যতা আছে। কলকাতায় উডবার্ন পার্কে থাকার সময় এই নিঃসন্তান রমণী গৃহস্বামীর চার বছরের শিশু-পুত্রকে দত্তক নিতে আগ্রহ প্রকাশ

শ্রীমতী নাওমি ফেটার, সংগে বসু পরিবারের একটি শিশুপুত্র (ভিয়েনা, ১৯৫৯)

করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভিয়েনা যখন মিত্রশক্তি অধিকার করে নেয়, হেডি পড়ে যান রাশিয়ান অধিকৃত অঞ্চলে। সে সময় অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সংগে সুভাষচন্দ্রের সংগে ওঁর সমস্ত পত্রালাপ ও অন্যান্য কাগজপত্র খোয়া যায়। সামান্য কয়েকটি ছবি বাঁচাতে পেরেছিলেন।

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে ভিয়েনায় গিয়ে আবার যখন হেডির সংগে যোগ যোগের চেষ্টা করি, তখন জানতে পারলাম মাত্র দু মাস আগে তিনি মারা গেছেন। সুভাষচন্দ্রের বন্ধু হেডি ফুলপ-মিলার, শ্রীঅরবিন্দের নীলিমা আর নেই।

*

ভিয়েনা বড় প্রিয় শহর সুভাষচন্দ্রের। ১৯৩৩ সাল থেকে ফিরে ফিরে এসেছেন তিনি এখানে। দেশে থাকলেও সর্বদা খোঁজ-খবর নিয়েছেন ভিয়েনার। ডালহৌসি পাহাড়ে ডিসেল ধর্মবীরের সংগে থাকার সময় ১৯৩৭-এ চিঠি লিখছেন ভিয়েনায়—"ভিয়েনার অন্যান্য খবর কি? মিস শেংকলের চিঠি মধ্যে মধ্যে পাই "......মিসেস মিলার ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ ঘুরে গেলেন। কলকাতায় বিশেষ অনুমতি নিয়ে হাসপাতালে আমার সংগে দেখা করেছিলেন। মিসেস ফেটার গত সপ্তাহে লিখেছেন যে, ইহুদীদের মধ্যে বড় আতংক উপস্থিত হয়েছে।"

ভিয়েনার প্রতি তাঁর কেন এই দুর্বলতা সে কথা উনি শ্রীমতী নাওমি ফেটারের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। নাওমি ও তাঁর স্বামী, দুজনেই সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী। বিদেশে বসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁরা অনেক করেছেন। এই যে ওঁর দেশের দুঃখ-দুর্দশায় ওঁরা কাতর হন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে চান, এতে সুভাষচন্দ্র যেন তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকেন। "Grateful that you are interested in my country. I am dedicated to my country."

শ্রীমতী নাওমি ফেটার অনেক রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে সুভাষচন্দ্রের দোভাষীর কাজ করতেন। সুভাষচন্দ্র হয়ত 'এক্সটেমপোর' বক্তৃতা করবেন, কিন্তু মোটামুটি তার বিষয়-বস্তু নোট করে নাওমিকে পাঠিয়ে দিতেন আগে যাতে তাঁর দ্রুত অনুবাদের সুবিধা হয়।

অস্ট্রিয়ান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের চেষ্টা চলছে তখন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কনস্টিটিউশনের ড্রাফট তৈরী হয়ে আসার পর নাওমিকে ভাল করে দেখে দিতে বললেন সুভাষচন্দ্র। বার্লিনে, প্যারিসে, যখন যেখানে গেছেন তিনি, মিসেস ফেটার তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন। পরাধীন দেশ থেকে আসা একজন অখ্যাতনামা যুবক সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এসব সেদিন খুবই মূল্যবান হয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার কাগজে নানা প্রবন্ধ লিখেও মিসেস ফেটার আমাদের দেশের কথা য়ুরোপে প্রচার করেছেন।

নাওমি ফেটারের সংগে যখন আমার ভিয়েনায় পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয় তখন প্রথম দর্শনেই তাঁকে অত্যন্ত ভাল লেগে যায়। ভারী স্নেহময়ী মায়ের মত মহিলা। আমার মনে হয়, আরো কয়েক বছর আগে যদি সুভাষচন্দ্রের ওঁর সংগে আলাপ হত তবে তিনি নিশ্চয় তাঁকে মা বলে সম্বোধন করতেন। তিরিশ দশকে য়ুরোপে ওঁর সব মেয়েকে 'মাদার ফিগার'এ পরিণত করার ঝোঁক একটু কমেছিল। তবু ও মনে হয় মিসেস ফেটারের সংগে তিনি যে সবচাইতে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে মিশতেন তার একটা কারণ তাঁর এই স্নেহমধুর অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বভাব।

ভিয়েনায় মিসেস ফেটার আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন যুদ্ধের শেষে ভিয়েনা যখন মিত্রশক্তি দখল করে নিল, ওঁরা বাড়িঘর ছেড়ে পালালেন। ফিরে এসে দেখলেন প্রায় সবই লুটপাট হয়ে গেছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত সব কাগজ ও চিঠি-পত্র আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে, কেউ স্পর্শ করেনি। যুদ্ধের সময় বার্লিনে পৌঁছেই সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় মিসেস ফেটারের সংগে যোগাযোগ করেছিলেন। সে চিঠিতে উনি তাঁর ইটালিয়ান ছদ্মনাম 'ও মাৎসোটা' সই করেছিলেন। সে চিঠি আজ নেতাজী মিউজিয়ামে আছে।

সে সব অনেক পরের কথা। সেই ৩৩।৩৪ সালেও সুভাষচন্দ্রের সংগে নাওমির ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ থেকে আম এলে ওঁকে পাঠিয়ে দিতেন সুভাষচন্দ্র। আবার সুভাষচন্দ্র বার্লিনে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন হোটেলের ঘরে নাওমির পাঠানো ফুল সাজিয়ে রাখা আছে।

য়ুরোপে তাঁর সব কাজকর্মের খুঁটিনাটি খবর নাওমিকে দিতেন তিনি। রোমে বা মিলানে কোথায় প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন করছেন, মুসোলিনী কি বললেন তাও যেমন জানাচ্ছেন, আবার অপারেশনের পর কার্লোভি ভারীতে কবে প্রথম আরামে ঘুমোতে পারলেন সে খবরও দিচ্ছেন।

আমাদের সঙ্গে গল্প করার সময় লক্ষ করলাম সেদিনকার মত মিসেস ফেটারের আজো ভারতীয় রাজনীতিতে উৎসাহ আছে, স্বাধীনতার পর কেমন অগ্রসর হচ্ছে দেশ জানতে চান। এক সময় আমাকে বললেন—আজকাল আর ভিয়েনার ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে কোন অনুষ্ঠানে আমায় ডাকে না। শুনে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। আমাদের দুঃখের দিনে যাঁরা সংগ্রামের সাথী ছিলেন তাঁদের কথা ভারতীয় দূতাবাস যদি ভুলে যায়, তা কত বড় অকৃতজ্ঞতা। অথচ কেন তিনি বারবার ভিয়েনাতে আসেন সে কথা বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র নাওমি ফেটারকে লিখছেন—"How can I thank you sufficiently for your kindness ? People have wondered why I have spent so much of my time in Vienna during the last three years—but I do not wonder."

*

"যদিও আমি জন্মেছি ও বড় হয়েছি চেকোশ্লোভাকিয়াতে কিন্তু আমার পড়াশুনা ভিয়েনাতে—" শ্রীমতী কিটি কুর্টি তাঁর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিচারণ এইভাবে শুরু করেছেন। হেডি বা নাওমির মত কিটিরও ভিয়েনার সঙ্গে যোগ নিবিড়। সঙ্গীত ও সাইকোলজি এই দুই বিষয় তিনি চর্চা করেছেন ভিয়েনাতে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার উপর চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে কিটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তার কারণ হিটলার। অস্ট্রিয়ান কালচারের মধ্যে কিটি আলো-আঁধারের খেলা দেখেছেন। তিনি বলছেন —"For had not Austria given a Mozart to the world—the infinite joy and bliss of his music ? and had not Austria given birth to a Hitler—the man who brought world war II upon mankind ?"

হিটলার ও নাৎসীদের প্রতি কিটি কুর্টির তীব্র ঘৃণা। অথচ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়েছিল বার্লিনে ১৯৩৩ সালে। সুভাষচন্দ্র তখন নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য চাইছেন য়ুরোপের দেশে দেশে এবং সে সাহায্য নাৎসী জার্মানী থেকে এলেও তাঁর আপত্তি নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল তা বেশ কৌতূহলজনক।

বার্লিনে ফুরফুস্টেনডাম দিয়ে হেঁটে যেতে পথে এক ভারতীয়কে দেখে কিটি আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর

শ্রীমতী কিটি কুর্টি নেতাজী 'অরেশন' দিচ্ছেন (১৯৭০)

চেহারায় এমন কিছু ছিল যে দেখেই মনে হয়েছিল ইনি একজন 'মিস্টিক', অধ্যাত্ম-ভাবসম্পন্ন অসাধারণ মানুষ। পর পর তিনবার এই রকম হঠাৎ দেখা হল কিন্তু আলাপ হল না। কিটি বলেছেন, আমি যদি ছেলে হতাম তবে নিশ্চয় এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু তরুণীসুলভ লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। এদিকে চারদিকে হিটলারের অশুভ ছায়া দেখছেন তিনি এ সময়। মনের এই অশান্ত অবস্থার ঠিক এমনি একজন যোগীজনসুলভ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ারই যেন প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু যখন কাছে থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তিনি দেখলেন ইনি তো যোগী নন, দার্শনিকও নন, ইনি একজন ভারতীয় রাজনীতিক। বার্লিনের ফরেন অফিসে হাঁটাহাঁটি করছেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, কিটি কুর্টি এতে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হল, উনি ধীরে ধীরে ওঁদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা যেমন নাৎসীদের ঘৃণা করো, আমরা ভারতীয়রা তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণা করি। নানান কথাবার্তার মধ্যে কিটি আর তাঁর স্বামী আলেকস দুজনেই কখন যেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজের দাবীর সমর্থক হয়ে ওঠেন।

আবার নিজের দেশের স্বার্থে নাৎসী জার্মানীর সাহায্যপ্রার্থী হলেও তাঁর যে নাৎসীদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহ নেই, একথাও ও'রা ততদিনে বুঝতে পেরেছেন। নয়ত বারে বারে বার্লিন ছেড়ে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে যাবার জন্য কুর্টি দম্পতিকে উনি তাগিদ দেবেন কেন! ওঁরা চেকোশ্লোভাকিয়া চলে যাবার কথা ভাবছিলেন, সুভাষচন্দ্র বললেন, না, অত কাছে নয়, আরো দূরে। এর চাইতে আমেরিকা ভাল।

রাজনীতি ছাড়া অন্য কথাও হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্রয়েড, ইয়ুং, সাইকো-অ্যানালিসিস-এর তাৎপর্য নিয়ে কিটির সঙ্গে আলোচনা করতেন। উনি যে রাজনীতিতে না এলে সাইকোলজিস্ট হতেন একথা আমরা কিটির কাছে জানতে পারি। "If I had not taken to political life —I would probably have been a pshchylogist". আবার তখনি তরুণ ইঞ্জিনিয়র আলেকস-এর দিকে ফিরে বলছেন, ইঞ্জিনিয়ারিংও ভাল—ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্য এখন চাই টেকনিকাল জ্ঞান। ওঁর সঙ্গে কথা বলেন আর কিটি ভাবেন —এমন যাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব এত 'চার্মিং', তাকে ব্রিটিশরা বলে কিনা বিপজ্জনক।

সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ নিয়ে ওঁরা আমেরিকাতেই চলে গিয়েছিলেন। আজ ও'রা আমেরিকান নাগরিক। ১৯৭০ সালে নেতাজী 'অরেশন' দিতে কলকাতায় এলে ওঁর নেতাজীর দেশে আসা হল। কিন্তু তাঁর বন্ধু তখন কোথায়! কিটি কুর্টি তাঁর কবিতায় বলেছেন—

আজ তোমার জন্মদিন, নেতাজী
তোমার জন্মদিন আজ

নবজীবন
নবশক্তি
নূতন প্রাণ হোক তোমার,
নব জন্ম
জন্মান্তর
যৌবন মধুর মহান।

অর্থাৎ যে কজন নারী নেতাজীর সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই কেন য়ুরোপীয় মহিলা, এ প্রশ্ন নেতাজী সম্পর্কে গবেষকদের মনে জেগেছে। এমন কি পরবর্তীকালে তাঁর জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনেও তিনি বেছে নিয়েছেন ভিয়েনারই মেয়ে শ্রীমতী এমিলি শেংকল। সত্যিই কি য়ুরোপের প্রতি তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল, না ইতিহাসের ঘটনাচক্রে জীবনের কতকগুলি মূল্যবান বছর বিদেশে কাটিয়েছিলেন বলে দৈবাৎ এমন হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? এই সব বিদেশিনীরা আমাদের কাছে কখনো কিছু চাননি, চিরদিনই নিজেদের নেপথ্যে রেখেছেন। যদি বা আমরা কখনো প্রশ্ন করে থাকি 'কী তোমার নাম' ওঁরা নীরব।

'হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।'
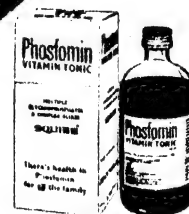
চিত্রগত কাহিনী

নীরোদ রায়

॥ ১ ॥

আমার একটি পুরনো ফটো-অ্যালবাম আছে। তাতে কিছু ছবি বহুদিন ধরেই অতীতের স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসছে। সে সব স্মৃতি একান্তভাবে আমারই। তাই অবসরক্ষণে যখনই সেগুলো দেখতে অ্যালবাম নিয়ে বসেছি, তখনই সুভাষচন্দ্র বসুর এই ফটো দুটি আমার নজরকে যেন বেশী সময় ধরে রাখতে চেয়েছে। একটি ছবিতে দেখতে পাই তিনি হেঁটে এগিয়ে আসছেন যুবকদের সঙ্গে, আর অন্যটিতে তিনি একা বসে আছেন—মাথটা কিঞ্চিৎ নিচু করে।

প্রায় তিন যুগ শেষ হয়ে গেল, এই ছবিগুলো অ্যালবামের পাতায় আবদ্ধ থেকে আজ ফ্যাকাসে ভাব ধরেছে। কেমন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ছবি দুটো দেখে যদিও বা অপরের চোখে ত্রুটি ধরা পড়বে, কিন্তু আমার মনের বিচারে একবারও এর মূল্য কমাতে পারিনি। বরং প্রতিবারই অনুভব করেছি, এই ছবি দুটোর মূল্য যেন ফিক্সড ডিপোজিটের মত ক্রমশই বাড়ছে।

আমার এখনো মনে পড়ে, সুভাষ বসু কবে সেই ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশের কড়া নজর এড়িয়ে অন্তর্ধান হয়েছিলেন রহস্যজনকভাবে। তারপর অন্য দেশে নেতাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কীভাবে জাপান-কোহিমা-ইম্ফল রণক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করেছিলেন—সে সব বিস্ময়কর কাহিনী আজ স্বাধীনতার সতাশ বছর ধরে শুনে আসছি আমরা। সে সব কাহিনীর যেন শেষ নেই, শেষ যেন হবে না কোনদিনই। নেতাজীর রূপ ও তাঁর ভাবমূর্তি চিরজাগ্রত থাকবে আমাদের মনে।

তবে আমার অ্যালবামের এই ছবি দুটোতে চোখ পড়লেই অন্য সব স্মৃতি ডিঙিয়ে মনে ভেসে আসে শুধু তাঁর সেই অর্থপূর্ণ রসিকতার কথা। ছবি তোলার সেই সুন্দর মুহূর্তের কথা। আর আমার কেন জানি মনে হয়, কান পাতলে আজো শুনতে পাবো সে কথাগুলো।

আজ আমার সাঠক সময়-কাল মনে নেই। তবে এটুকু আমার স্মরণ আছে যে, তখন তিনি কংগ্রেসের ভেতরেই "ফরোয়ার্ড ব্লক" নামে আর একটি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে আন্দোলন করছিলেন। সেই সূবাদেই তিনি গোহাটি গিয়েছিলেন জনসভা করতে। বিশেষ করে আসামের জনপ্রিয় নেতা 'তরুণরাম ফুকনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আলোচনা হয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে।

পত্রিকার জন্য সংবাদ-ছবি তুলতে আমি চলে গিয়েছিলাম ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ওপারে আমিনগাঁও স্টেশন পর্যন্ত। তখন নদীর ওপার থেকে ফেরি-স্টীমারে এপারে পাণ্ডুতে আসতে হত। সেদিন ব্যবস্থা হয়েছিল, আমিনগাঁও স্টেশন থেকেই এই জনপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গোহাটি নিয়ে আসা হবে। সে হিসেবে গোহাটির নবীন-প্রবীণ বহুজনই, বিশেষ করে ছাত্র মহল, অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। তারপর নিয়ে এলেন ফেরি-স্টীমারের ওপরতলায়।

এপার থেকে ওপার যেতে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, তারই ভেতর দেখা গেল সুভাষ বসুকে ঘিরে এক বিশেষ আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমিও যেন একটা ভাল সুযোগ পেলাম। তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম—একা একটি ছবি তোলার কথা।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠে এলেন। নিজেই বসলেন একটা ছোট টেবিলে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন —'এখানে হবে তো?'

আমি না বলিনি।

কিন্তু ফোকাস করতে গিয়ে খেয়াল করলাম, তাঁর পুরু কাচের চশমায় অত্যধিক reflection আসছে। এতে ছবিটি ভাল লাগবে না। মনে একটু খুঁতখুঁত নিয়ে অগত্যা তাঁকে জানালাম আমার সমস্যার কথা। তিনি বুঝলেন এবং জানতে চাইলেন —'এজন্য আমাকে কী করতে হবে?'

আমি বললাম—'আপনাকে শুধু মাথাটা একটু নোয়াতে হবে।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—'আমি কারো কাছে মাথা নোয়াই না।'

কথাটা কিন্তু বেশ গম্ভীর মেজাজে বলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সেটা বজায় রাখতে পারেননি শুধু আমাদের সবাইর হাসির জন্য। দেখা গেল তিনিও হাসছেন মুখ চেপে।

তারপর থেকে ভারতের ইতিহাসে কত পৃষ্ঠা যে রক্তাক্ষরে লিখিত হয়েছে এই বীর সন্তানের কথা, তার ইয়ত্তা নেই। আজ অবধি আমরা জানি না তিনি কোথাও, কোন কারণে মাথা নত করেছিলেন কিনা। কিন্তু আমরা তাঁকে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা জানাতে চিরদিনই নতমস্তকে থাকবো। কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বে চিরসত্য। তাই চিরসত্য ২৩শে জানুয়ারী।

একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু

দিব্যেন্দু পালিত

সেবার শীতে অনেকেরই ঘরবাড়ি গেল পুড়ে। ঘরবাড়ি বলতে চালা আর খাপরা। কিন্তু পোড়ায় তো আগুনেই! সর্বভুক সে, ছোট থেকে বড়ো হয়ে একটা কান্ড বাধিয়ে বসতে সময় নেয় না। তখন হা-কপাল করে যতোই মাথা চাপড়াও সে আর ফিরিয়ে দেবে না।

আগুন নিবে যাবার পর কথাটা বলল মহিম।

লোকে ডাকে, লেংড়া মহিম। খোঁড়ার চলায় ছাঁদ নেই কোনো, বাঁধন নেই মুখেও। যেটুকু বলে সবই গুছিয়ে গাছিয়ে, যত্ন করে। লোকে প্রশংসা করে তার কথার; কিন্তু শোনে যে কতোটুকু বলা মুশকিল।

আগুনের আবির্ভাব প্রথম টের পেয়েছিল মহিম। ধোপাদের ছেলে, বাপ-ঠাকুরদার রুজিতে মন টেঁকেনি। ছোটবেলা থেকেই ভোর-ভোর উঠে চলে যেত গঙ্গার ঘাটে, বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে। ঘাটে স্নান সেরে পুণ্যার্থীরা উঠে আসে একে-একে, ফোঁটা কাটে কপালে। সেজন্য ব্যবস্থা করে রাখে নেবী ঠাকুর, ফোঁটা-প্রতি পাঁচ পয়সা। ঠাকুর বসে জলচৌকির ওপর। বামুন মানুষ, ছোঁয়াচ সহ্য হয় না সকলের। কিন্তু ধোপাদের খোঁড়া ছেলেটির উপস্থিতি ভুলে যায় বেমালুম। মহিম তার সাকরেদি করে, কখনো চন্দন বাটে, কখনো তুলসীপাতা ধুয়ে আনে গঙ্গাজলে।

শীতে লোকের ভক্তি যায় কমে, শুকনো নদীর জল থির হয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। ফোঁটা কাটার জন্যে ভিড় হয় না তেমন। তখনই কাজ বাড়ে মহিমের। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘাট পর্যন্ত নেমে গিয়ে পুণ্যার্থী ধরে আনে নেবী ঠাকুরের জলচৌকির সামনে। ঠাকুরের না হলে তারই বা কিছু হবে কেমন করে! এইভাবেই বছর দশেক বয়স থেকে গোটা শৈশবকালটা কাটিয়ে দিল মহিম।

ইতিমধ্যে বাপটা মরে গেল কলেরায়। পিঠোপিঠি একটা ভাই ছিল; বাপ-ঠাকুরদার পেশায় তারও জাত হয়নি তেমন। বয়স থাকতেই ভিড়ে গিয়েছিল ওয়াগন ব্রেকারদের দলে। এ খবরটা সকলে জানত না। মদ-গাঁজা খেত বলে মহিমের এই ভাইটির নাম হয়েছিল গেঁজা। একদিন জি-আর-পি'র একটি লোক খুন হতে ডেরা থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে। সেই যে শহর ছেড়ে চলে গেল গেঁজা, আর ফিরল না। শোনা গেল দ্বীপান্তর হয়েছে তার। তখন একটু বেশী দিনের সাজা হলেই লোকে দ্বীপান্তরে পাঠাত।

বাপ, ভাই গেলে থাকল শুধু মা। মহিমকে বাগে মানাতে না পেরে কিছুদিন নিজেই সে ধোপাগিরি করল। রোজ সন্ধ্যায় দেখা যেত তিনটি গাধার পিঠে কাচা কাপড় তুলে টিকুতে টিকুতে ডেরায় ফিরছে মহিমের মা। খাপরার চালার নীচে কুপি জ্বালিয়ে সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত ইস্ত্রি করছে কাপড়। ঘরের বাইরে রাস্তার গা-ঘেঁষে বালতি উনুনের গনগনে আঁচে গরম হচ্ছে লোহার ইস্ত্রি। আর রাত একটু বেশী হলেই চেঁচায় প্রায় অভ্যাসে, ডাক পড়ছে 'মহিম এ মহিম! আরে তোরা ঘর নেহি ছে কী!'

কে কানে তোলে সে-কথা! ঘর কি

পিত্তিরই আছে! দ্যাখো গিয়ে ঘাটের চাতালে বসে হরপার্বতীর ছবি আঁকছে কি না!

এক বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছর ঘরের বাইরে খাটিয়ায় ঘুমতো মহিম। ঘরটা ছেড়ে দিত তার রুগ্ন বুড়ী-হয়ে-যাওয়া মাকে। মহিমের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকত তিনটি গাধা। রোগে-মড়কে একাকার হতো তারা। সেজন্যে মহিম বা গাধাগুলির ব্যস্ততা ছিল না কোনো। এমনিতে নির্বিকার গাধাগুলির কিছু-কিছু গুণও ছিল। অন্ধকারে জোয়ের গন্ধ পেলেই ঘুম-কাতুরে মহিমকে জাগানোর জন্যে সমস্বরে ডাক পাড়ত তারা—হেঁকো, হেঁকো, হেঁকো। দেখত ঠিক-ঠিক ঘুম ভাঙছে কিনা মহিমের। খাটিয়ায় জেগে উঠে বসে সদ্য শুরু-হওয়া পাখির কূজন শুনত মহিম। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে লক্ষ করত বুকে—বোঁয়া। এর পর সে চলে যাবে ঘাটের দিকে। ফিরবে সেই সন্ধ্যা পেরিয়ে, রাতে। এ-সব গাধাগুলিও জানত। মহিমদের পরিবারের পাঁচটি প্রাণীর মধ্যে এক অলিখিত শান্তি ছিল।

দারোগা-পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে সাপে কাটল মহিমের মাকে। মহিম যখন টের পেল তখন মার গেছে বুড়ী। শ্মশানে মাকে জ্বালিয়ে এসে সারারাত খাটিয়ায় বসে বুক-খুন করে কাঁদল মহিম—'এ মাই, মাই-গো' বলে। বাড়ো করুণ সেই স্বর, যে শোনে তারই বুক ফাটে। কান্না শুনে লোক জড়ো হতে লাগল। কাছাকাছির বস্তির লোকেরা ছিল, তারা এলো। বস্তির গা-ঘেঁষে নতুন বাড়ি তুলেছেন উকিলবাবু, তিনিও এলেন। প্রত্যুষের আলোয় মানুষের সমবেদনায় ভরে উঠল মহিম। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'রোনেসে মা লোট আবে গী? চুপ রহ, চুপ রহ।' তা শুনে দ্বিগুণ কান্না জুড়ে দিল মহিম। রকম সকম দেখে মনে হলো বাপ-ভাই গেছে যাক, মা যে কোনো দিন মরবে এটা সে বিশ্বাস করেনি। মহিমের শোকে তিনটি গাধাও চোখের জল ফেলল। আঁচলে বাসন-ধোয়া হাত মুছতে মুছতে বস্তির মেয়ে শকুন্তলা বলল, 'মার নেই তার ওপরেই ভগবানের যতো নজর!'

সবাই যে সমবেদনা জানাতে এসেছিল তা নয়। বুড়ী ছিল জোগাড়ে। সেই সুযোগে ধোলা-কাচা করতে বিস্তর কাপড় জড়ো করেছিল ঘরে। কাচা না-কাচা সেই শাড়ি জামা ধুতি পাতলুনের বিলি-ব্যবস্থা লোকেই করে নিল যে যার মতো করে। সারাদিন ঘরের বাইরে খাটিয়ায় বসে বাবুদের কাপড় কাচাই লক্ষ করল মহিম। সন্ধ্যায় ক্লান্ত কায়ে কেঁদে ঘরে ঢুকল।

পাকা দেয়ালের ওপর খাপরার চাল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কম নয়। মহিমের বাপ সুন্দর এটা তৈরী করেছিল। এতোদিন কাপড় ঠাসা থাকায় বোঝা যায়নি; সকালে খালি ঘরের পিছন দিকের জানলাটা খুলে দিতেই আলোয়, হাওয়ায়, রোদ্দুরে ঠেসে গেল ঘরটা। সেই আলোয় ঘরভর্তি নানা ছবির ওপর চোখ পড়ল মহিমের। কালী আছে, গণপতি আছে, হনুমানজী আছে, আছে সুরাইয়া আর নূরজাহানের ছবি। রঙীন কাগজে ছাপা একটা মেমসাহেবের ছবি চোখে পড়ল—পা খোলা, টান-টান চেহারা। মহিম অবশ্য কার ছবি চিনল না। ওর বাপও চিনত না। প্রায়-ন্যাংটো মেমসাহেবের ছবি দেখেই সুন্দর ওটা ঘরে টাঙিয়েছিল।

মহিমের ভাবনায় পাপ নেই। মেয়েমানুষের ছবিগুলো সরিয়ে দিয়ে সেখানে টাঙালো ঠাকুর-দেবতার ছবি। ধূপধুনো জ্বালল। তিন দিন কামাই করে ঘাটে গেল মাথা মুড়োতে। নেবী ঠাকুরকে বলল, 'ঘর খালি হয়েছে ঠাকুর, ওখানে একটা মন্দির করব। পুজোপাঠ করব। ভালো দেখে একটা শিবলিঙ্গ কিনে প্রতিষ্ঠা করে দাও।'

ঠাকুর শুনে থ। এতোদিনে তার খেয়াল হলো মহিম ধোপার বাচ্চা; জাত পেতের বালাই নেই। জিব কেটে বলল, 'আরে তু পাগলা হো গিয়া ক্যা! ইয়ে সব ধান্দা ছোড় দে—'

বলল আরো কথা। সে-সবই মহিমের ইচ্ছেয় জল ঢালার জন্যে।

মহিম তবু দমল না। ইদানীং যেতে-আসতে উকিলবাবু দুটো চারটে কথা বলতেন তার সঙ্গে, হাসতেন। উকিলবাবুর হাবভাব দেখে মহিমের মনে হয়েছিল বাবুর প্রাণে দয়া আছে, তাকে ভালোও বাসেন একটু আধটু। রবিবার সকালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে উকিলবাবুর দুয়োরে গিয়ে ধর্না দিল।

মক্কেলদের নিয়ে সদরে বৈঠক করছিলেন উকিলবাবু। মহিমকে দেখেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কী রে লেংড়া, কী হলো?'

খোঁড়া ডান পায়ের হাঁটুটা ডান হাতে চেপে রেখেছে মহিম। বাঁ হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কিছু টাকা দিন, বাবু। মন্দির হবে।'

'মন্দির! কোথায়?' কপালে চোখ তোলেন আর কি! সামলে নিয়ে বললেন, 'লেংড়া, তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি!'

কথাটা গায়ে মাখল না মহিম। আগে আগে লেংড়া বললে কষ্ট হতো তার, এখন ওটাই হয়ে গেছে ডাক নাম। হাত তুলে নিজের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

'দিন না বাবু! খেটে শোধ করে দেবো।'

'আরে ছিয়া ছিয়া! ধোবীর ঘরে মন্দির!' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেলেন উকিলবাবু।

মহিম বুঝল না এটা ঠিক প্রত্যাখ্যান কি না, সে টাকা পাবে কি না। তখনই উকিলবাবুকে ফিরে আসতে দেখা গেল। আঠারো, বিশটা বছর ঘাটে চন্দন বেটেছে সে, তুলসীপাতা ধুয়ে এনেছে, তাতে কি দোষ হয়েছিল! ভাবল বুঝিয়ে বলবে।

অতশত শোনার সময় নেই উকিলবাবুর। সরাসরি কথাটা পাড়লেন এবার।

'টাকা চাস দেবো। শ' দুয়েকেও আপত্তি নেই। ঘরটা আমাকে ছেড়ে দে, লেংড়া।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু পা পিছিয়ে গিয়ে মহিম বলল, 'সে কি বাবু! বাপের ঘর আমার, ছেড়ে দেবো! থাকব কোথায়?'

'সে ব্যবস্থা করে দেবো। গ্যারাজটা খালি আছে, থাকিস ওখানে। জমিটা তো তোর বাপের ছিল না—'

শেষের কথাটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মহিম। চন্দন-বাটা মাথায়-বিষয়বুদ্ধি খেলে না তেমন, তবু প্রস্তাবটা যে প্যাঁচালো তা বুঝতে দেরী হলো না। মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল দূরে।

উকিলবাবু বললেন, 'সময় নে, ভাব। ধোবীখানা গেছে, কিছু তো করতে হবে!'

একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মহিম। কী কথায় এসে গেল কোন্ কথা—বলেছিল মন্দির বানাবে, তার বদলে এলো ঘর ছাড়ার কথা। না, ঘর সে ছাড়বে না। তার বাপের জমি না হলে কার জমি! এ-ঘরেই জন্ম হয়েছিল তার, বাপ মরেছে এ-ঘরে, এখান থেকেই শ্মশানে নিয়ে গেছে মাকে। নয় বললেই হলো!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা বেলা ঘরের মধ্যে ধূপধুনো জ্বেলে শুয়ে কাটালো মহিম। ঘাটে গেল না। গাধাগুলোর এখন আর কোনো কাজ নেই। অভ্যাস থেকে তবু রোজ সকালে দারোগা-পুকুরের দিকে হেঁটে যায় তারা, ফেরে সন্ধ্যে পেরিয়ে। অন্ধকারে খাটিয়ায় বসে দেখতে পায় মহিম, বহু দূর থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে তিনটি মন্থর জীব—পায়ে গতি নেই কোনো, ভাষা নেই মুখে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে চালিত হয় তারা। ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, ঝিমোয়।

বর্ষার দিনেও বৃষ্টি পড়ে না তেমন। রাতে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে শরীর। ঘুম আসে না চোখে। হঠাৎ দ্যাখে খাণ্ডু বস্তির ডাকসাইটে মেয়ে শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে সে এলো টেরই পায়নি।

'কী রে লেংড়া, একা বসে আছিস?'

'তো কী করব!' অনিচ্ছেয় জবাব দিল মহিম, 'বহুৎ গরম—'

'হাঁ। তো গরমে গরম হবে না!' খাটিয়ার কোণে বসে পড়ল শকুন্তলা, 'অন্ধকারে তোকে ওই গাধাগুলোর মতো লাগছিল—'

'তা হবে—'

একটু সরে বসল মহিম। মেয়েমানুষের

গন্ধ লাগছে নাকে। কী মতলবে এসেছে বোঝা যায় না। তবে এটুকু বুঝল, মতলব আছে। যে সে মেয়ে নয় শকুন্তলা। এককালে গোঁসাইর সঙ্গে মেলামেশা ছিল। গোঁসাইর অন্তর্ধানের পর একটা রিকশাওলাকে বিয়ে করে, একটা বাচ্চাও হয়েছিল। কিছুদিন হলো কলেরায় মরে গেছে দুটোই। শকুন্তলার শরীর, স্বাস্থ্য, ঠাটঠমকে ভাঁটা পড়েনি এতোটুকু। এখন বাবুদের বাড়ি ঠিকে খাটে। আর ভিতর-বাড়ির কেচ্ছা ছড়িয়ে দিয়ে আসে বস্তি পর্যন্ত।

'এ মহিম, তুই ধোবীখানা খুলছিস না কেন আবার!' চুপ করে থাকতে দেখে শকুন্তলা বলল, 'এতোদিনের ব্যবসা ছেড়ে দিবি?'

'ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না—'

'তো তুই খাটিয়ায় বসে থাকিস, পুজোপাঠ করিস। কাজ আমি করব।'

'তা কী করে হয়—!' খোঁড়া পায়ে মশা বসেছিল, মহিম একটা চাপড় মারল।

'কেন, তুই আমাকে সাদী করে নে। বাচ্চা পয়দা কর! আমার জবানী আছে, তোরও তো দরকার!'

কথাটা আশা করে নি মহিম। অবাক হয়ে তাকাল শকুন্তলার দিকে। গরমে জামা পরে নি গায়ে, এখন মনে হচ্ছে এসব বলবে বলেই পরে আসে নি। জ্যোৎস্না ফিনিক দিচ্ছে শরীরে। মহিম তাকাতেই আঁচলটা এমড়ো ওমড়ো করে ঘাম মুছল গলার। গন্ধটা তীব্র হয়ে লাগল নাকে।

মহিম বলল, 'আমার মন খারাপ। তুই ভাগ এখান থেকে—সাদীফাদী আমি করব না। ওসব মতলব আর করবি না।'

'ওরে লেংড়া, খুব রোয়াব হয়েছে তোর! তুই না করলে অন্য লোক করবে। সবাই তোর মতো লেংড়া নাকি!'

রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল শকুন্তলা। কিন্তু, আবার এলো দিন দুই বাদ দিয়ে। সেই রাতের অন্ধকারে। এবার গলা অনেক নরম।

'সাদী না করিস, থাকতে দে ওই ঘরে। তোর সব কাজ করে দেবো, ঘর পাহারা দেবো। শোয়াবসা করিস আমার সঙ্গে। লেংড়া তো কী, পুরুষ মানুষ তো! শরীরে গরম নেই তোর!'

মহিমের ঘর জুড়ে দেবদেবীর ছবি। সকাল সন্ধ্যে ধূপ জেলে আনতে চায় একটা পবিত্রতার আভাস। পুরনো ময়লা কাপড়ের ভ্যাপসা দুর্গন্ধ যা ছিল ধুয়ে মুছে গেছে এতোদিনে। এখনো তার চোখে জেগে আছে মন্দিরের স্বপ্ন। শুরু করবে ছোটো করে, একটু বাড়-বাড়ন্ত হলে চুড়ো তুলবে মাথায়—ঘাটের শিবমন্দিরের আদলে। ও ঘর কি মেয়েমানুষ তোলার জন্যে! শকুন্তলার শরীরে মাংস আছে ঢের, মনটাই নেই। থাকলে পবিত্রতার আভাস পেত।

রাগ দেখিয়ে মহিম বলল, 'তুই ওই গাধাটার চেয়েও খারাপ। ওটাও মেয়ে-মানুষ, কিন্তু তোর মতো মতলববাজ নয়!'

একে খোঁড়া, তার গোঁসাইর ভাই বলে নিজের সুখ সুবিধের ভাবনা ছাড়াও মহিমের প্রতি একটু আলাদা টান ছিল শকুন্তলার। সেই মহিমের মুখে এই কথা। অপমানে কাঁই হয়ে পালটা দিল শকুন্তলা।

'বটে! এই কথা! আরে লেংড়া, ওই গাধীর সঙ্গেই সাদী কর তাহলে...'

বলতে বলতে সেই যে চলে গেল, সাত দিন আর মুখ দেখাল না। মহিম ভাবল, আ-হা, তিনকুলে কেউ নেই বলেই বোধ হয় এতো মতলব এ'টেছিল। এভাবে বিদায় করা ঠিক হলো না। কাছে রাখলে মেয়েমানুষটা হয়তো সত্যিই তার দেখভাল করত।

মন গেল মুষড়ে। ঘরে বসে, ঘর পাহারা দিতে দিতে শরীরও কাহিল হতে লাগল ক্রমশ। উকিলবাবু একদিন লোক পাঠিয়ে ডাকলেন। মহিম জানত দরকারটা কী হতে পারে। কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল।

'কী রে লেংড়া, কী করবি ঘরটার?'

'মন্দির বানাবো, বাবু।'

'মন্দির বানাবি! ধোবির বাচ্চা তুই, লোক খেপিয়ে লাভ কী!'

মহিম নীচু হলো না। বিনয় বজায় রেখেই বলল, 'পুজো তো আর নিজে করব না, বাবু, পূজারী করবে। লোকে বলবে কেন! ধাঙড় বাড়িতে মা কালীর মন্দির নেই!'

'হুঁ!' গম্ভীর হয়ে গেলেন উকিল-বাবু, 'পাঁচ শো টাকা দিতাম। ঘরটা ছেড়ে দিলে ভালো করতিস। ও জমি তোর বাপ ঠাকুরদার নয়, জবর দখল করেছিল। তোর কাছে দলিল আছে কোনো?'

নেই। মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেল মহিমের। লক্ষ করে উকিলবাবু বললেন, 'ছেড়ে দিলে ভালো করতিস। অন্য কেউ নিলে কানাকড়িও দেবে না।'

বুকে জোর এনে মহিম বলল, 'গরীবের একটা চালাঘর, কেন নেবেন বাবু আপনারা!'

'ঠিক আছে, যা এখন—'

আশঙ্কায় অন্যমনস্ক হতে লাগল মহিম। জমিটা কার জানে না। কিন্তু ঘরটা তার বাপের। তিরিশ বছর কেউ অন্য কথা বলেনি। আজ বলছে! কিন্তু বললেই সে ছেড়ে দেবে কেন! ভগবান ভরসা, তার মনে পাপ নেই কোনো। ভগবানই বাঁচাবে। এই ভেবে, আট আনা দিয়ে একটা পাথরের শিব কিনে এনে মেঝের পুঁতে রাখল মহিম। পুরো একদিন [illegible] ভগবানকে বলল, 'জোয়ার যায় [illegible] দাও, ভগবান। আমি [illegible] ধান্দায়।'

মধুর সাজরেদ রেখে [illegible] লেখা [illegible]। মহিম প্রায়ই জ্বর খাচ্ছে, তাতে কিছু কাজ চলছিল না। পুরো দুটো দিন মন্দিরের সিঁড়িতে বেকার বসে থাকল মহিম। খোঁড়া মানুষ মুটেমজুরি করতে পারবে না, রিকশা চালাতে পারবে না। তাহলে পেট চলবে কী করে!

অনেক ভেবেচিন্তে উপায় বের করল একটা পয়সা খরচ করে গোয়াটাক জল আঁটে এমন মাটির কলস কিনল কুড়িটা। তাতে গঙ্গাজল ভরে মুখ চাপা দিল মাটি দিয়ে। গলায় সুতো বাঁধল যাতে আঙুলে তুলে নেওয়া যায়। সেগুলো নিয়ে এলো মন্দিরের চাতালে। চক দিয়ে আঁকল বড়ো এক শিবমূর্তি—তাঁর হাতে ত্রিশূল, মাথায় ফণা তুলেছে সাপ। ছবির নীচে সাজিয়ে রাখল কলসগুলি। পুজো দিতে এসে লোকে সেগুলো কিনতে লাগল নির্দ্বিধায়।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিকিয়ে গেল সব। পরের দিন বিক্রি হলো আরো কিছু বেশী। মহিম ভাবল, তার প্রার্থনা মিথ্যে হয়নি। এ-সবই দিচ্ছেন ভগবান। আশীর্বাদ-স্বরূপ কিছু খেয়ে রোজই আট আনা এক টাকা আনতে লাগল ঘরে।

দেরিতে-আসা বর্ষা চলল অনেকদিন ধরে। বান ডাকল গঙ্গায়। ঘাট ছাড়িয়ে জল উঠে এলো রাস্তা পর্যন্ত। ভেসে-যাওয়ার ভয়ে কেউ আর জলে নামে না। পর পর ক'দিন ঘাটে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে এলো মহিম। হাত পড়ল জমা টাকায়। সে আর কতোই বা! এভাবে চলব না বেশী দিন। ভেবেচিন্তে আবার উকিলবাবুর দুয়োরে ধর্না দিল সে।

'দশ-বিশটা টাকা দিন, বাবু। মা বর্ষা, পেট চলছে না!'

'ভালো পরামর্শ দিলে তো শুনবি না!' সাদাসিদে গলায় বললেন উকিল-বাবু, 'ঘরটা ছেড়ে দিলেই পারতিস!'

মহিম জবাব দিল না। দশটা টাকা হাতে দিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'পুরনো চাল, খাপরা ফুটো হয়েছে। আর দু চার-দিন বর্ষা চললেই ভেঙে পড়বে। আমার ঘরে ঘরামি কাজ করছে, বলিস তো ছেয়ে দিক।'

'আপনি কেন খাটাবেন, বাবু!' কাঁচু-মাচু হয়ে বলল মহিম, 'কাঁচা বাঁশের ভারা দিয়েছিল আমার বাপ, সহজে পড়বে না। বর্ষা আর ক'দিন!'

টাকাটা ফেরত চাইলেন না উকিলবাবু। খানিক অপ্রত্যয়ে চেয়ে থেকে বললেন,

লেংড়া তো নয়, উকিলের বুদ্ধি। তুই শুকুমি মন্দির! যা, ভাগ! আর আসবি না এদিকে!'

মাঠের ভিতর গলে গেল দশ টাকার নোটটা। সুদ দিনও গেল না।

কাছাকাছি পুলের ওদিকে বাসস্ট্যান্ড। সকাল সন্ধ্যে সারাক্ষণ দেওঘর, দুমকা, জাসিডি, রাঁচির বাস ছাড়ে। ভাড়া গাড়িতে ঘি আর সিলকের গাঁটরি পার করে অদ্ভুত-দারয়া। একে ওকে ধরে গাড়ি ধোয়ামোছা করে কদিন পেট চালাল মহিম। জোর-জোর চলে যায় বাসিমুখে, ফেরে সন্ধ্যে পেরিয়ে। কালসিটে-পড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে খাটিয়ায়। গাধাগুলো ঝিমোয়, নাক ঘষে ধুলোয়, পিছনে পা তুলে লাথি ছোঁড়ে অকারণ। কলেরায় মরা শব নিয়ে 'রাম নাম' হাঁকতে হাঁকতে শ্মশানের দিকে চলে যায় মানুষেরা। নাকের সামনে ভনভন করে মশার ঝাঁক। জলমাটি গাধার নাদির গন্ধে ঝিকঝিক করে হাওয়া। মহিম বুঝতে পারে খিদে মোচড় দিচ্ছে পেটে—মাটির নীচে ক্রমশ মলিন হয়ে যাচ্ছে পাথরের শিব। বড্ডো একা লাগে নিজেকে। মনে পড়ে মাকে, গোজাকে, বাপ সুন্দরের ঘাড়ের আঁচিটকে, আর নেবী ঠাকুরকে। শকুন্তলা আজকাল লরি-ড্রাইভার কালুর সঙ্গে জমেছে। কী অদ্ভুত শরীরী ক্ষুধা মানুষের! পেটের ভিতর খলবল করে শূন্য হাওয়া। ভাবে, শরীরের কষ্ট বড়ো কষ্ট—মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

একদিন রাতে আবার ফিরে এলো শকুন্তলা। কোমরের কষি থেকে পরোটা আর মেঠাই বের করে বলল, 'নে লেংড়া, খেয়ে নে!'

'মেঠাই কোথায় পেলি?'

মাগরমলদের বাড়ি সাদী ছিল, ফেলে দিচ্ছিল। নিয়ে এলাম তোর জন্যে।' একটা মেঠাই নিজের মুখে পুরে প্রাণপণে চোয়াল নাড়তে লাগল শকুন্তলা, 'শালাদের বড্ডো রোয়াব! একটা শাড়ি চাইলাম, দিল না!'

মহিম হাসল। পরিতৃপ্তির হাসি।

'কাল রাতে তুই কাঁদছিলি কেন?'

'শুনেছিস তুই! লেংড়ারও কান আছে!' ঘৃণা করার ধরনে বলল শকুন্তলা, 'কালু শালা জানোয়ার একটা। খুব পিটেছে। পিটিতে পিটিতে রাস্তায় বের করে দিল। আমাকে রাণ্ডি বলল—'

'তো আর কী বলবে!' মহিম বলল, 'তুই রাণ্ডি, তোর শরীর ঝুটা। তুই পাপী!'

'ঔরতের শরীর ঝুটা হবে না তো কি তোর হবে!' নির্বিকার গলায় বলল শকুন্তলা, 'তুই শালা নিমকহারাম। তোর মেঠাই নিয়ে এলাম, এখন রাণ্ডি বলছিস!'

কথাটায় বিলক্ষণ মজা পেল মহিম। খালি পেটের হাসিতে হিল্লোল জাগল শরীরে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তুই রাণ্ডি তো কী! মন্দির হোক, তোকে আমি সেওদাসী করে নেবো—'

'মাঈ গে মাঈ!!' গালে হাত ঠেকিয়ে শকুন্তলা বলল, 'তুই আজব আদমি মহিম! খানা জোটে না, তুই বানাবি মন্দির! ভগবান তোকে সত্যিই পাগল বানিয়ে ছাড়ল।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মহিম। হয়তো ঠিকই বলেছে শকুন্তলা। হয়তো পাগলই হয়ে গেছে সে।

আকাশে চোখ তুলে ভাবল, ভগবান, তুমি কি বলো!

বর্ষা ছাড়তেই টান ধরে হাওয়ায়। হুড়মুড় করে এসে পড়ে শীত। জল সরে গিয়ে মাঠেময়দানে থকথক করে পাঁক। সিকি মাইল পাঁক পেরিয়ে কেউ আর শ্মশানের ঝুঁকি নেয় না। দাম বাড়ে আনজপাতির। মানত আর শ্রাদ্ধের কাজ ছাড়া কেউ আর মন্দিরমুখো হয় না।

ঘাটের কাছে মহিমকে ঘুরঘুর করতে দেখে অনেকদিন পরে সস্নেহে ডেকে নিল নেবী ঠাকুর। কাছে বসিয়ে বলল, 'দিন-কাল খারাপ হলো। লোকে পেটের চিন্তা করবে, না পুজোপাঠ করবে!'

মহিম ঘাড় নাড়ে, 'সে তো ঠিক কথা।'

নেবী ঠাকুর বলে, 'মুলুক চলে যাবো। ছেলে চিঠি দিয়েছে। এখানে চাল্লিশ বছর হলো—'

জবাব না দিয়ে ভাষাহীন চোখ তুলে তাকাল মহিম। বয়স খুঁজল ঠাকুরের পাকা ভুরুর তলায়। ঠাকুরের মুলুক আছে, সে কোথায় যাবে! ফিনফিনে একটা ব্যথা পাশ কাটিয়ে গেল বুকে। কাজ-কর্ম নেই, এখন শুধু ভাবনা আর খিদে। দুটোই চলে সমানে। পাশাপাশি।

শীতের হাওয়ায় খড় ওঠে গায়ে সন্ধ্যার মুখে কাছারি-ফেরত উকিলবাবু কী ভেবে গাড়ি থামায় মহিমের সামনে এসে।

'কী রে লেংড়া, খবর কী?'

'ভালো, বাবু।'

খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মহিম। উকিলবাবু বললেন, 'কী হলো গোসা করে! দেশে ফসল নেই। লোকে ঘরবাড়ি বেচে দিচ্ছে জলের দামে। তখন দিলি না। এখন আর দাম পাবি না।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মহিম। জীবনে একবার রেগে উঠতে ইচ্ছে করে। তবু সামলে নেয় নিজেকে।

'ঘর আমি বেচব না, বাবু।'

'আচ্ছা আচ্ছা—'

উকিলবাবু আর দাঁড়ালেন না। বুকের নীচে পর্যন্ত মদিরের গন্ধ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল মহিম। যতোক্ষণ ঘরটা আছে, আশা আছে। ঘর গেলে খোঁড়া মহিম কানা হয়ে যাবে। চোখে পড়ে গাধাগুলো। মাদীটার পেট ফুলেছে। মনে হয় গাভীন। সুন্দর বেঁচে থাকলে গায়ে হাত বোলাতো এসময়। গাধার বাচ্চা খেপায় ভাগ্য ফেরায়। মহিম খোপা নয়। তবু আস্তে উঠে গিয়ে মূক প্রাণীটার গায়ে আদরের হাত রাখে সে। জলে ঢিল পড়ার মতো থিরথির করে কেঁপে ওঠে শরীর—লম্বা কান দুটো খাড়া করে মহিমের বুকের কাছে মাথা নিয়ে আসে মাদীটা। মহিম ঠিক বুঝতে পারে না এগুলো এখনো থেকে গেছে কেন! অন্ধকারে গাধাগুলোর উপস্থিতি ছমছমে ভয় ধরিয়ে দেয় বুকে। চারজনকে নিয়ে পরিবার ছিল সুন্দরের। সংখ্যাটা ভাঙেনি এখনো!

স্বপ্নের মতো বিষয়টা গেঁথে যায় মাথায়। রাতে ঘুমের মধ্যে বিচরণ করে গাধাগুলি—দারোগা পুকুরের দিক থেকে হুহু করে ছুটে আসে উত্তুরে হাওয়া। কাঁচা বাঁশের ভিতর তাদের আনাগোনা শব্দ তোলে মট্-মট্-মট। এতো শীতেও গরমের তাপ লাগে মহিমের, হাঁসফাঁস করে শরীর। অস্বস্তির ভিতর কানে আসে গাধাগুলির চীৎকার—হেঁকা, হেঁকা-হেঁকা। ঘুমচোখে তাকিয়ে দেখতে পায় মহিম, শিবের জটা থেকে নেমে এসেছে অজস্র সাপের ফণা, লকলকে জিভ মেলে ছুটে আসছে তার দিকে। একটুক্ষণ থম মেরে থাকে সে! তারপরেই বুঝতে পারে আগুন লেগেছে ঘরের চালে। স্বপ্ন থেকে খোঁড়া পা হিঁচড়ে বেরিয়ে আসে সে। চীৎকার করে পরিত্রাহি গলায়—'আগ, আগ লাগ গেলে—জাগো—আগ—আগ—'

তার একার নয়। পাশাপাশি পুড়ছে কয়েকটা চালা; উত্তুরে হাওয়ার তাড়ায় তেজী ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে আগুন। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সম্মোহিত বোধ করে সে। অসহায়ভাবে শীতল হয়ে আসে হাত-পা।

চারিদিকে হুড়োহুড়ি, চীৎকার। বস্তি ভেঙে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে লোক। আলোর-অন্ধকারে তাদের বীভৎস মুখগুলি বড়োই করুণ লাগে মহিমের। কেঁদেকেটে লাভ নেই, জনে জনে ডেকে বলতে চায় সে—মাটির নীচে পুড়ছে স্বয়ং ভগবান। কে শুনবে! কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না কোনো।

আজও উকিলবাবু এসে হাত রাখেন তার কাঁধে। মহিম হাসে। চুপচাপ। ভাবে, একটা দুশ্চিন্তা গেল। পেটের ভিতর গুরগুর করে ওঠে আগুনের জিবগুলো। অনেকক্ষণ পরে সে শুধু বলে, 'ঘর তো আগুনেই পোড়ায় বাবু!'

॥ ছত্রিশ ॥

অজিত দরজা খুলে ভারী অবাক হয়। শ্বশুরমশাইকে তার বাড়িতে সে একদম প্রত্যাশা করেনি। তার ওপর দুপুরের কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে, ভারী থতমত খেয়ে গেল। এ সময়টায়, বিশেষত ছুটির দুপুরে সবাই ঘুমোয়।

ব্রজগোপালের মুখে-চোখে একটু অপ্রসন্নতার ছাপ। বললেন—আছে সবাই?

—আসুন। বলে দরজার পাল্লা হাট করে দিয়ে বলে অজিত—ঘুমোচ্ছে। ডাকছি।

ব্রজগোপাল ঘরে এসে বসলেন। চারিদিকে চেয়ে টেয়ে বললেন—ভালই।

অজিত সেণ্টার টেবিল থেকে সন্তর্পণে তার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার সরিয়ে নিচ্ছিল। ব্রজগোপাল সেটা নিশ্চই চোখে দেখলেন। অজিত তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল—কী ভাল? বাড়ি?

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বললেন—ঘরদোর তো বেশ বড় বড় দেখছি। কখানা?

—দুটো বেডরুম আছে দুদিকে। একটা প্যাসেজ, আর যা যা সব থাকে। বলে হাই তুলল।

রণেন একটু দূরে বসেছে। এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলল—ওরা দোতলা করে নীচের তলাটা ভাড়া দেবে।

ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন—লাভ কী?

—বাড়ির কস্টটা খানিকটা উঠে আসে।

—ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকা সংগত নয়। ব্রজগোপাল তেমনি নিশ্চিত স্বরে বলেন—বাড়ির বড় মায়া। পর মানুষ দেয়ালে পেরেক ঠুকলেও বুকে লাগে।

—আমিও ভাবছিলাম, বাড়িটা যদি হয় তো তিনতলার ভিত গেঁথে করব। একতলাটা ভাড়াটে, দোতলা আর তিনতলায় আমরা।

ব্রজগোপাল একবার ছেলের মুখ নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—তোমরাই থাকবে, তোমাদের যা ইচ্ছে।

অজিত ভিতরের ঘরে এসে দেখে শীলা এক কাত হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এ সময়টায় চেহারা রুক্ষ হয়ে যায়, মুখে মেচেতার মতো দাগ পড়ে। চোখ বসা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। কিছু পেটে রাখতে পারে না, সব উল্টে বের করে দেয়। তা হোক। তবু পেটের বাচ্চাটিকে ধরে রাখতে পেরেছে। নষ্ট হয়নি শেষ পর্যন্ত। ঘুমন্ত শীলাকে ডাকতে বড় মায়া হয়। পাশেই শাশুড়ী ঠাকুরুণ গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যেও মাথায় ঘোমটা।

অজিত গলা খাঁকারি দিল। শাশুড়ীকে মা বা শ্বশুরকে বাবা বলে ডাকার অভ্যাসটা তার এখনো হয়নি। শীলা সেজন্য রাগ করে। বলে—তোমার মা বাবাকে আমি মা বাবা ডাকতে পারি, আর তুমি আমার মা-বাবাকে পারো না? অজিত অবশ্য ঝগড়া করে না, কিন্তু ডাকেও না।

অজিত গলা খাঁকারি দিতেই অবশ্য ননীবালা মুখখানা সন্তর্পণে তুলে বললেন—কে এসেছে? বাইরের ঘরে আওয়াজ পাচ্ছি।

অজিত ইতস্তত করে বলে—উনি।

ননীবালাকে আর বলতে হল না। বুঝলেন। যেন উনি বলতে বিশ্বসংসারে একজনই আছে। শীলাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললেন—ওঠ্।

শীলা আদুরে ঘুম-গলায় বলে—উঁ।

—উনি এসেছেন। উঠতে হয়। তোর বাড়িতে প্রথম এলেন।

ঘুম থেকে উঠলেই একটা সিগারেটের তেষ্টা পায়। অজিত তাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিতে থাকে দ্রুতবেগে। পরশুদিন একটু বৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য বৃষ্টিতেই সামনের রাস্তার ধুলো ধুয়ে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। খাটালের জমানো গোবরের টাল থেকে পচাটে গন্ধ আসে। ওপরে ঘুলোটে আকাশ। ফর্সা রোদ

শুকনো গরম হাওয়া দিচ্ছে। বহু ওপরে আকাশের গায়ে দাগের মতো বড় পাখি চিল বা শকুন উড়ছে। ভারী নিরালা দুপুর। আকাশে ছড়ানো ডানামেলা পাখি, রোদ, নিস্তার দেখে অজিতের মনটাও নিরালা হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন আজকাল তার ভাল লাগে না। আগেও লাগত না। মা বাবা ভবানীপুরের সংসার ছেড়ে এসে আরো নিষ্ঠুর হয়ে গেছে সে। বাড়িতে আত্মীয় এলে তার অকারণ উৎপাত মনে হয়। কথা বলতে হবে, সামনে গিয়ে বসে থাকতে হবে, সিগারেট লুকোতে হবে। কিংবা আবার ভদ্রতা রক্ষার জন্য কখনো কখনো যেতে হবে তাদের বাড়িতেও। ভাবতেই ক্লান্তি লাগে। নিজের মতো নিরালা জীবন পাওয়াটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার কাছে।

তাড়াতাড়ি জোরে টান দেওয়ায় সিগারেটটা ফেঁসে গেছে, ধোঁয়া আসছে না। সেটা ফেলে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল সে। এতক্ষণ সময় কাটানো যায়। জলের ঝাপটা চোখেমুখে দিতে গিয়ে এক কোষ জল নাকে ঢুকে দম আটকে দিল। অস্বস্তি। জলের গন্ধে কী যেন এক রকম লাগে। বুকচাপা নিঃসঙ্গতা। অজিত জানে, পৃথিবীতে তার কেউ নেই। একদম কেউ না। ছিল লক্ষ্মণ। তাকে একা করার জন্যই ভগবান বুঝি তাকে দূরে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ভগবান মানে না অজিত, ভাগ্য ও না। তবু ঐরকম মাঝে মাঝে মনে হয়। কার অদৃশ্য হাত তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাকে একাকীত্বে রেখে দেখার জন্যই বুঝি!

বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা ধাক্কা দিয়ে [illegible] হাতে খুলে শীলা ঢুকল। বলল—ইস্, বাথরুমে এত দেরী কেন, মেয়েদের মতো! বাইরে যাও।

ভিজে মুখ অজিত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল—তাড়া কিসের?

—ভীষণ পেয়েছে। তুমি যাও তো, বাবা বসে আছে। মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে প্রথম এল, জামাইয়েরই পাত্তা নেই। শীলার গলায় যথেষ্ট রাগ।

ভদ্রলোকের মত নিয়ে শীলা আজকাল ইস্কুলে যায়। শিক্ষকতা করে। একবার বাইরের স্বাদ পেলে মেয়েরা আর ঘরবন্দী থাকতে চায় না। হাঁপিয়ে ওঠে। ক'দিন আগে সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে অজিত একটু অবাক হয়ে দেখে, বাইরের ঘরে একটা অপরিচিত ছেলে বসে আছে। ভারী সুন্দর চেহারা, আর ভীষণ স্মার্ট। শীলা পরিচয় করিয়ে দিল। তার নাম সুভদ্র। বলল—শোভনাদির লীভ ভ্যাকেন্সিতে চাকরি করছিল আমাদের স্কুলে। শোভনাদি ফিরে এসে জয়েন করেছেন, বেচারীর চাকরি গেছে। এখন আমার কাছে এসেছে, যদি তুমি ওকে এল আই সির একটা এজেন্সি পাইয়ে দাও।

একটু অবাক হয়েছিল অজিত। এল-আই-সির এজেন্সি পাওয়া কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। ধরা করার দরকার হয় না। তাহলে তার কাছে আসা কেন। সে-রহস্যের ভেদ হল না বটে কিন্তু ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগে গেল। এ ছেলেটা খুব সুন্দর বটে কিন্তু নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন নয়। গালে দাড়ি আছে, লালচে নরম গোঁফ আছে একটু। পোশাক-আসাকে সাধারণ। চমৎকার কথা বলে। ভীষণ হাসায়। টকটকে ফর্সা রং, লম্বা এবং রোগাটে চেহারার মধ্যে আবার একটু বাচ্চাদের মতো লাজুকতাও আছে।

যতক্ষণ সুভদ্র ছিল ততক্ষণ শীলার চেহারাই অন্য রকম। চোখেমুখে একটা উত্তেজিত চকচকে ভাব। ঠোঁটে হাসি, মুখে অনর্গল কথা। বারোটা মিষ্টি সব যত্ন করে সাজিয়ে দিল। লম্বা সোফাটায় সুভদ্র বসে ছিল, অন্য ধারে বসল শীলা। নিঃসংকোচে। কোনো হাসির কথা উঠলে ঝুঁকে সুভদ্রকে ঠেলা দিয়ে বলছিল—এই সুভদ্র, বলুন না সেই নক্সালাইটরা ইস্কুলে বোমা ফেলল অচলাদি আর দীপ্তিদি কেমন করে পায়খানায় ঢুকে গিয়েছিলেন, আর ঢুকেই দেখেন সেখানে পন্ডিতমশাই...হি...হি......

রাত নটা পর্যন্ত সুভদ্র ছিল। ততক্ষণ শীলাকে মনে হচ্ছিল একটি কুমারী মেয়ে। শরীরে কোনো অস্বস্তি নেই। কোনো সম্পর্ক নেই অজিতের সঙ্গে।

সুভদ্র চলে গেলে এ বাড়ির ভূতটা নেমে এল। তখন শাশুড়ী ঠাকরুণ ছিলেন না। শুধু অজিত আর শীলা থাকলে এ বাড়িতে ভূত নামে। সে ভূতটার নাম গাম্ভীর্য। কথার শব্দ নেই, হাসির শব্দ নেই, ফাঁকা নিঃসঙ্গতা শুধু। শীলার শরীর তখন খারাপ লাগতে লাগল বলে গিয়ে শুয়ে রইল ঘর অন্ধকার করে। পাশের ঘরে অজিত নতুন কেনা একটা ফাঁকা কাচের টিউব থেকে অন্তহীন রুমাল বের করতে থাকল। দর্শকহীন ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকের প্যাটার মুখস্ত বলে যেতে যেতে একটা লম্বা কার্ডের খেলা দেখাতে লাগল নিজেকে। ম্যাজিক মানেই হাত, চোখ, মুখ, ভঙ্গী আর কথার কৌশল। জীবন মানেও কি তাই নয়? কিন্তু সেইসব কৌশল অজিতের জানা নেই। তাই বাড়িতে ভূত নামে। অনেকক্ষণ ম্যাজিক করে ক্লান্ত অজিত সিগারেট ধরিয়ে একা বাইরের ঘরে এসে বসে থাকল। ঘরে আলো জ্বালেনি, পাশের ঘর থেকে আবছা আলো আসছে। বসে থেকে থেকে সে টের পেল, এ বাড়ির ভূতটা সে নিজেই। ভূত মানে, যে ছিল, এবং এখন আর নেই। অজিত তো তাই। সে ছিল, সে এখন আর নেই। নইলে ঐ যে সুন্দর চেহারার ছেলেটা, সুভদ্র, ওর কারণে একটু হিংসে হতে পারত তার। একটু সন্দেহ। কিন্তু কিছু হচ্ছে না। বরং অজিত ভাবছিল, শীলা অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বড় ভাল হয়। সে নিজে আর একটু আলগা হতে পারে, আর একটু একা। একা হওয়া কী ভীষণ ভাল। আহা, শীলা ওই ছেলেটার সঙ্গে হালকা একটু প্রেম করুক না। ক্ষতি কি?

জীবন মানেও এক রকম কৌশল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা দুজনেই ভারী নিস্তেজ, পরস্পর সম্পর্কে কৌতূহলহীন। তাই মাঝে মাঝে নিজেকে একটু উসকে নেয় অজিত, শীলাকেও উসকে নেয়। এইভাবে অনুভব করার চেষ্টা করে যে, তারা সম্পর্কিত, তারা আছে।

বাথরুমের বাইরে যাওয়ার জন্য শীলা তাড়া দিচ্ছিল, অজিত র‍্যাকে তোয়ালেটা রেখে বেসিনের ওপর ছোটো আয়নার দিকে চেয়ে আঙুলে চুল পাট করতে করতে বলল—লজ্জা কি, বসে পড়ো না। আমি দেখছি না।

—সে খালি বাড়িতে। এখন দেয়ালা কোরোনা। বাইরে যাও তো শীগগীর। কেউ এসে পড়বে......ছি ছি...

অজিত গম্ভীরভাবে বলল—শোনো, একটা কথা।

—পরে হবে। উঃ। বাবা বসে আছে, দাদা মা...তুমি একটা কী বলো তো'

—কী?

—এখন যাও না।

—আমার কানে কয়েকটা উড়ো কথা এসেছে শীলা।

—পরে শুনবো।

—না, এখনই। সুভদ্রর সম্পর্কে...

শীলা হঠাৎ যেন থমকে গেল। গলার স্বরটা হয়ে গেল অন্যরকম। বলল—কী কথা? কী শুনেছো?

—তোমার সঙ্গে সুভদ্রর রিলেশনটা...

—কি রকম?

—লোকে বলে।

—কে লোক?

—আছে। তুমি চিনবে না।

বাথরুমের ঝুঁঝকো আলোয় শীলা কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল। অবাক বড় চোখ, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে ক্ষতচিহ্নের মতো।

—তারা কী বলেছে? শীলা নরম গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

শীলার চেহারা দেখে অজিত ভয় পেয়ে গেল। ঠাট্টার এমন প্রতিক্রিয়া হবে, একটা পাল্টে যাবে শীলা তা সে ভাবেনি। হাত বাড়িয়ে বলল—কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি!

—তুমি ও কথা বললে? শীলার গলায় মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কাঁদবে।

—কিছু না। কেউ কিছু বলেনি। বলল অজিত। কিন্তু গলায় কোনো আন্তরিকতা ফোটাতে পারল না। মাঝে মাঝে মানুষের বড় ভুল হয়ে যায়। গলা খাঁকারি দিয়ে অজিত বলে—ঠাট্টা করছিলাম। আমি যাচ্ছি।

ম্লান মনে বেরিয়ে এল অজিত। হঠাৎ বুঝতে পারল, সে যে ঠাট্টা করে কথাটা

জন্মেছে তা শীলাকে কোনোদিন বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কিন্তু ঠাট্টাটা কি? অজিতের মনেও কি কিছু ছিল না!

সম্পূর্ণ আনমনা অজিত বাইরের ঘরে এসে দেখল তার শ্বশুর ব্রজগোপাল লাহিড়ি তার শাশুড়ি ননীবালা লাহিড়ির হাতে একটা মোটা টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন। দৃশ্যটা অনেকটা খবরের কাগজের ছবির মতো, কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে কেউ যখন বন্যাত্রাণ বা ঐরকম কিছুর জন্য রাজ্যপাল বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দেয়, স্রেফ পাবলিসিটির জন্য। বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে সংবাদে নাম তোলা অনেক বড় বিজ্ঞাপন। আজকাল সবাই সংবাদ হতে চায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্রজগোপালও এখন সংবাদ। শেষ পর্যন্ত টাকাটা তিনি দেবেন এমন বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে চেকটা দেওয়ার সময়ে তাঁর ভাবমূর্তিটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ননীবালা বাঁ হাতে চোখ মুখ ধরা গলায় বললেন—রণোর নামে দিলেই ত পারতে!

ব্রজগোপাল রক্তাভ লাজুক মুখে বললেন—তোমাকেই দেওয়ার কথা ছিল।

শ্বশুরকে বহুকাল বাদে একটু মন দিয়ে দেখল অজিত। ক্ষ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত বুড়ো। তবু মুখের ঐ রক্তাভায় যে লাজুকভাব, যে চাপা অস্থিরতা তার মধ্যে একটা গভীর মমতাময় হৃদয়ের চিহ্ন আছে। বুড়ো মানুষরা চিঠির শেষে পাঠ লেখে ইতি নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী অমুক। সেটা কথার কথা। কিন্তু এই লোকটার শরীরের মধ্যে যেন সেই কথাটা গোপনে ভোগবতীর মতো বয়ে যাচ্ছে—নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

ননীবালার চোখে বুঝি জল এল আবার। প্রায় রুদ্ধ গলায় বললেন—বাড়িটা যদি হয়, তাহলে......

বলে এক রকম প্রত্যাশায় তাকালেন স্বামীর দিকে। ঘোমটাটা আর একটু টেনে মুখখানা প্রায় ঢেকে বললেন—রণো বলছিল, বাড়ি করলে বাবার জন্য একটা আলাদা ঘর করব।

কথাটায় ইংগীত ছিল। নির্দ্দিষ্টের প্রতি আহবান।

ব্রজগোপাল একটু চেয়ে রইলেন ননীবালার দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—কলকাতায় আর না। তোমরা থাকো। গোবিন্দপুর ছেড়ে আসা হবে না। তাহলে সব দেখবে কে?

ননীবালা উত্তর দিলেন না। রণেন চুপ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক চুপ করেও নেই। তার ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। আপনমনে কথা বলছেন নাকি?

অজিত সকলের কাছ থেকে দূরে। ঘরের কোণে একটা গদীআঁটা শান্তিনিকেতনী মোড়ায় বসে রইল। ব্রজগোপালের দিকে চোখ। এ লোকটিকে তার বড় হিংসে হয়। সব থেকেও কেমন একা, আলুগা। হৃদয়হীন বলে মনে হয়। মনে হয়, বুঝি সন্ন্যাসী। সে যাই হোক, লোকটা সংসারকে লাথি মারতে পেরেছে। বুকের পাটা আছে এ বয়সেও।

উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিল অজিত। বাথরুমে শীলা অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছে। বড় ভয় হয়। পাঁচ মাসের পেট নিয়ে, যদি পড়ে টড়ে যায়। ঠাট্টাটা করা ঠিক হয়নি।

আবার অজিত ভাবে, ঠাট্টা! ঠাট্টাই কি! আর কিছু নয়? উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এ বাড়ির নিঃসঙ্গতার ভূতটা কখন যে কার ঘাড়ে ভর করে কী অনর্থ ঘটায়! সেই নিঃসঙ্গতা ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন আসছে। উগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে অজিত। শীলা, পড়ে-টড়ে যেও না, সাবধান! মন খারাপ কোরোনা, ওটা একটা ভুতুড়ে ইয়ার্কি।

ব্রজগোপাল চেক-দান অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীরতা থেকে হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে চারদিকে চেয়ে বললেন—শীলুকে দেখছি না!

ননীবালা ডাকলেন—অ শীলা।

—বাথরুমে। জবাব দিল অজিত।

—ও। ব্রজগোপাল খানিক চুপ করে থেকে বললেন—শীলুর বাড়িতে এলাম, অথচ ওর জন্য হাতে করে কিছু আনিনি।

—কী আনবে! ননীবালা বলেন।

—বাচ্চাদের কাছে আসতে বাপের কিছু হাতে করে আনতে হয়। ব্রজগোপাল বলেন।

—ওরা কি বাচ্চা! ত্রিশের কাছে বয়স হল। বলেন ননীবালা। একটু হাসলেনও বুঝি।

—বড় হয়েছে! বলে ভ্রূকুটি করেন ব্রজগোপাল। যেন বা তাঁর বাচ্চারা যে বড় হয়েছে এটা তাঁর বিশ্বাস হয় না। তিনি জানেন, ওরা এখনো ভুলে ভরা, বায়নাদার, অবুঝ শিশু তাঁর। বড় হয়নি, একদম বড় হয়নি।

বাচ্চা ঝিটা বাইরে থেকে মিষ্টি নিয়ে ঘরে এল। রান্নাঘর থেকে চায়ের জলের শিস্ শোনা যাচ্ছে। শীলার এবার বাথরুম থেকে বেরোনো উচিত।

ব্রজগোপাল জামার ভিতরের পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে অজিতের দিকে চেয়ে বললেন—তোমরা মিষ্টি খেও।

অজিত হাসল, বলল—না, না। সে কী!

রণেন দৃশ্যটা দেখে হাসল। ননীবালাও হেসে বলেন—ওরা কি আর সেই ছোটোটি আছে যে বাপ মিষ্টি খেতে টাকা দেবে!

ব্রজগোপাল নিপাট গম্ভীর চোখে চেয়ে বললেন—নাও।

হাতটা বাড়িয়ে রইলেন। অজিত বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক ভঙ্গীতে উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। কিছু বলার নেই।

—উঠি। ব্রজগোপাল বলেন।

—বসুন। চা হচ্ছে। অজিত বলল।

—পর মানুষের মতো কেবল উঠি-উঠি-ভাব কেন? শীলা আসুক। ননীবালা এই বলে মুখের পানের ছিবড়ে ফেলে এলেন জানালা দিয়ে।

অজিত উৎকর্ণ হয়ে আছে। শীলার কোনো শব্দ নেই। বড় দেরী করছে শীলা। এত দেরী হওয়ার কথা নয়। ক্রমশ

ট্রু-টোন

হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো অনবদ্য হেয়ার ডাই

এই কলপ খুব সহজেই সারা মাথায় সমান ভাবে লাগানো যায়। চুলের রঙ নকল বলে ধরাই যায় না। তাছাড়া, এই হেয়ার ডাইতে হেয়ার কণ্ডিশনার থাকায় চুল নরম, উজ্জ্বল আর পরিপাটী থাকে।

পূর্বভারতের পরিবেশক: জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

everest/৭৭৪/HC-৮০

চিত্র প্রদর্শনী

সুযোগ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষককে যে স্মরণে ছাত্রদল আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল সরকারী আর্ট কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র আয়োজিত পরলোকগত শিল্পী-শিক্ষক অজিতকৃষ্ণ গুপ্তের একক প্রদর্শনীতে। অজিত গুপ্তও এককালে তদানীন্তন এই সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন ও পরে হুগলী ট্রেনিং স্কুল, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও ঢাকা ট্রেনিং কলেজে কলা-শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। শেষে তিনি কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজেই সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের আদর্শ স্বরূপ। তা ছাড়া টেম্পারা মাধ্যমে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী—তা সত্ত্বেও তাঁর আঁকা বহু নিদর্শন অনেকের কাছে সুরক্ষিত আছে, এমন কি লোক সংসদেও কোণারক অবলম্বনে তাঁর রচিত একটি শিল্পকর্ম সুরক্ষিত আছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন আজ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর জীবনের বিভিন্নকালে জলরঙ ও টেম্পারায় আঁকা ৩০টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায় ও সেই সঙ্গে কয়েকটি গ্রাফিক প্রিন্টও চোখে পড়ে। নির্ভুল ও অনবদ্য ড্রয়িং যে চিত্রকলার প্রধান অঙ্গ তা প্রদর্শনীটি দেখে বোঝা যায়। কি স্টিল লাইফ, কি নিসর্গ দৃশ্য, কি কমপোজিশন—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতীয় রীতিতে রচিত ছবিগুলির পরিকল্পনা, রঙ ব্যবহার পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গীমা দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। কম্পোজিশনের দিক থেকে শিবের বিবাহ যাত্রা, বিশেষত এটির পরিকল্পনা ও অঙ্কনরীতি, অনেকের চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বোট লাইফ ও অর্জুন বিষাদযোগেরও নাম করা যায়। নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে দি উইন্ডিং রিভার-এর চমৎকার পরিবেশ রচনার কথা অনেকের মনে গাঁথা থাকবে। তবে অজিত গুপ্তের বিভিন্ন ফুল ও লতাপাতায় অনবদ্য স্টাডি ভোলবার নয়। নির্ভুল ড্রয়িং শিল্পীসুলভ সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর ও নিছক বাস্তববাদী রঙ, বিশেষ করে টেম্পারা নিদর্শন হিসাবে চিত্রকলা জগতে এগুলি শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে গন্ধরাজ, বাহারী কচু, মাধবীলতা, অর্কিড ও শিল্পীর আঁকা শেষ স্টাডি, ক্রিসান্থিমাম-এর উল্লেখ করা যায়। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ছিল, বুগেনভিলা ও নাইট কুইন-এর নাম করা যায়। বলা বাহুল্য, ভিন্ন ধর্মী এই প্রদর্শনীটি দেখে বিগত যুগের অঙ্কনরীতি ও নিষ্ঠার পরিচয় মেলে।

প্রেসিডেন্ট অ্যালেন্দে লাস্ট ডে (ওয়ার্লড প্রেস ফটোর সৌজন্যে)

*

হল্যান্ড-এর ওয়ার্লড প্রেস ফটো ফাউন্ডেশন অ্যামস্টারডাম শহরে প্রতি বৎসর 'বিশ্ব সংবাদ স্থির চিত্র'-এর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সমগ্র বিশ্বের নানা দেশ থেকে বিভিন্ন সংবাদ চিত্রশিল্পী তাঁদের তোলা স্থিরচিত্র নিদর্শন পাঠান ও নির্বাচিত নিদর্শনগুলি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। বলা বাহুল্য এই বিশ্ব সংবাদ স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতা

[illegible] —বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

প্রদর্শনীতে সত্যিই কয়েকটি উত্তম নিদর্শন দেখা যায়। এই বার্ষিক প্রদর্শনীটি পৃথিবীর নানা শহরেই অনুষ্ঠিত হয়। সুখের বিষয়, কলকাতার ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ ফটো নিউজ এজেন্সি (প্রা) লিঃর উদ্যোগে ১৯৭৪ সালের অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনীটি সর্বপ্রথম কলকাতার মার্কেট স্কোয়ারে দেখা গেল। আরও সুখের এই যে, এই সংস্থারই সুপরিচিত স্থিরচিত্রশিল্পী অলোক গুহকে ওয়ার্লড প্রেস ফটো ফাউনডেশন ১৯৭৪ সালের আন্তর্জাতিক জুরিমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করে স্থিরচিত্রাদির মূল্যায়নের সুযোগ দেন। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর ৩৮টি বিভিন্ন দেশ থেকে ৬০৩ জন স্থিরচিত্রশিল্পী এই বৎসর মোট ৩,৫০০ নিদর্শন পাঠান। আন্তর্জাতিক জুরিমণ্ডলীর মতামত অনুযায়ী নির্বাচিত স্থিরচিত্রগুলি প্রদর্শনীভুক্ত হয়। গ্রাণ্ড প্রিক্স "প্রেস ফটো অব দি ইয়ার" বিজয়ী স্থিরচিত্রশিল্পী প্রথম পুরস্কার হিসাবে পান নগদ ৫,০০০ ডাচ গিলডার, গোল্ডেন আই ট্রফি, শ্রেষ্ঠতার সার্টিফিকেট ও প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন ও পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদান করার জন্য কে এল এম বিমানে বিনামূল্যে আমস্টারডাম যাতায়াতের সুবিধা। এখানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটি ঠিক সম্পূর্ণ নয়, কারণ কর্তৃপক্ষ যে কয়টি স্থিরচিত্র নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন, সেগুলিই এখানে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের ছবির সঙ্গে ভারতের রঘু রায় (স্টেটসম্যান, দিল্লী), বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত (ফিনানশিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড কলকাতা) ও অনিলবরণ এর (ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ, কলকাতা) তোলা স্থিরচিত্রও কর্তৃপক্ষ পাঠান।

প্রদর্শনীতে একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয়-বস্তু অবলম্বনে তোলা নিদর্শনাদি দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি একই বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক ছবিও চোখে পড়ে। শিল্পী-সুলভ অনুসন্ধানী দুটি চোখই স্থিরচিত্র-শিল্পীর প্রধান মূলধন, তার ওপর ক্যামেরা চালনা ত আছেই। তবে সংবাদ স্থিরচিত্র-শিল্পীকে যে সর্বদাই কত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয় তার পরিচয় প্রদর্শনীতে মেলে। তার ওপর দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখেও চলতে হয়। প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত 'প্রেসিডেন্ট অ্যালেন্দে'স লাস্ট ডে' ছবিটির সন্ত্রস্ত পরিবেশ দেখে তা বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, স্থিরচিত্র-শিল্পী অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন, কারণ তিনিও প্রেসিডেন্টের দলভুক্ত ছিলেন। এত বড় বিপদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট অ্যালেন্দের সঙ্গে থেকেও এই ঐতিহাসিক ছবিটি তুলে শিল্পী হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে রইলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালে গোল্ডেন আই ও পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত একটি ছবির উল্লেখ করা সঙ্গত মনে

অর্ধদগ্ধ বালককে অগ্নিকাণ্ডের মধ্য থেকে উদ্ধার করছে দমকল বাহিনীর কর্মী
—[illegible] (ওয়ার্লড প্রেস ফটোর সৌজন্যে)

৪ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকে কলকাতায় শুরু হয়েছে 'চলমান শিল্প' নামে এক নতুন ধরনের শিল্প আন্দোলন। শিল্পী অসিত পাল এর আহ্বায়ক। শিল্পীদের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের শিল্পকে ঘর ছেড়ে পথে আনবার জন্য। উপরের ছবিতে শিল্পী অসিত পাল চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের দেয়াল চিত্রিত করেছেন। সারা শহরের দেয়াল, পেট্রল পাম্প, গাড়ি ইত্যাদি রঙীন ছবিতে ভরিয়ে দেওয়া ওই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ডাক। এই পরিকল্পনায় অন্যান্য শিল্পীগোষ্ঠী উদ্যোগী হলে ব্যাপারটা শহরের পক্ষে সুখকর হবে নিঃসন্দেহে।

করি। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে বোমাবর্ষণের সময়ে নাপাম বোমার মাত্র নয় বছরের মেয়ে ফান্ থি কিম্ ফুয়ের ফ্রক আগুনে জ্বলে ওঠে—জ্বলন্ত ফ্রকটি ছিঁড়ে ফেলে আতঙ্কে উন্মাদের মত অর্ধনগ্ন অবস্থায় সে পালাতে থাকে! নিক উৎ-এর (সাইগন) তোলা এই মর্মন্তুদ ছবিটি একটি পত্রিকায় দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সংবাদ স্থিরচিত্রশিল্পীর এটিও চমৎকার নিদর্শন। হ্যাপি নিউজ বিষয় বিভাগে কয়েকটি ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যেমন স্যালভেন্ডর-এর (এ পি-নিউ ইয়র্ক) স্থিরচিত্র যুদ্ধবন্দীর ঘরে ফিরে আসার আনন্দ। পিতাকে দেখামাত্র আনন্দে অধীর হয়ে ছোট্ট ছেলে ও মেয়ে হাত তুলে ছুটে আসছে—পত্নীর চোখে ফুটে উঠেছে উল্লাসের ভাষা। আর একটি ছবি অনেকের চোখে পড়ে—মুইদারবার্গের সমুদ্রতীরে সাঁতারের পোশাক পরিহিতা আসন্নপ্রসবা দুই নারী মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। স্থিরচিত্রটি তুলেছেন রবার্টো পিটারস (ফ্রি ল্যান্স, এ এন পি-র তরফে, নেদারল্যান্ডস)। খেলাধুলো বিভাগে এরিথ নৌম্যানের তোলা হ্যাট অফ স্থিরচিত্রটি অনেকের ভাল লাগে—বিশেষ করে লাফিয়ে ঘোড়ায় ওঠার ক্ষণমুহূর্তটি ছবিতে ধরা পড়েছে। প্রতিকৃতি বিভাগে প্রথমেই চোখে পড়ে আলেকজান্ডার রুব্যাচকিনের (সোভিয়েৎস্কায়া কালটুরা, মস্কো) মিসেস অ্যালেন্দে—আতঙ্কগ্রস্ত মুখমণ্ডলের অবিকল ছবি! নিউজ ফিচার বা সংবাদ-ঝলক বিভাগে এডি অ্যাডামস-এর (টাইম, নিউইয়র্ক) ইসরেলি সোলজার অন দি সুয়েজ দেখে অনেকে অভিভূত হন—বিরাট উন্মুক্ত স্থানে হাঁটুতে মাথা গুঁজে নীরবে একজন সৈন্য বসে আছে। ধারাবাহিক স্থিরচিত্রগুলির মধ্যে রন ফ্রেম-এর (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস) আগুন ও দমকলবাহিনীদের উদ্ধার কাজের ছবিগুলি উল্লেখ্য—বিশেষ করে দমকলকর্মী কিভাবে অর্ধদগ্ধ একটি ছেলেকে উদ্ধার করে সযত্নে নামিয়ে আনছে—ছবিটি দেখে অনেকেই মুহ্যমান হন। ছবির মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বিভাগে ম্যাক্স অ্যালবার্ট-এর (নভোস্তি, মস্কো) খ্যাতনামা সোভিয়েত শল্যচিকিৎসক নিকোলাই আমাসভের অস্ত্রোপচারকে কেন্দ্র করে তোলা স্থিরচিত্রগুলি অনেকের চোখে পড়ে। অপরাপর স্থিরচিত্রের মধ্যে ল্যারি ব্র্যানিথ (কলম্বাস ডেসপ্যাচ, ওহায়ো আমেরিকা) ওয়েলকাম হোম ড্যাড, মাইকেল পল লরেন্ট-এর (গামা প্রেস ইমেজেস, প্যারিস) সিরিয়ান মিগ শট ডাউন ওভার গোলান হাইটস, মিচা বার আম-এর (ম্যাগনাম ফটোজ, ইসরায়েল) হিউম্যান ককটেলস্-ইসরায়েল অ্যারাব ওয়ার-এর নাম করা যায়। ভিন্ন রসধর্মী দুটি স্থিরচিত্র অনেকের মনে থাকবে। নবজাত সন্তানকে দেখবার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টার ছুটিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটে এসেছেন একজন ইসরেলি সৈন্য—যাবার পূর্বে বিচ্ছেদকাতর পত্নীর মুখে রেখে যাচ্ছেন গভীর চুম্বন চিহ্ন। ইসরায়েলের ফ্রি ল্যান্স স্থিরচিত্রশিল্পীর তোলা এই ছবি দেখে সকলেই মুগ্ধ হবেন। অপর পক্ষে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিহত দুটি ছোট ছেলের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদছেন তাদের মা। পেরি ক্রেজ-এর (স্টার্ন পত্রিকা) তোলা ছবিটির করুণ আবেদনে সকলেই যেন সাড়া দেন। ভারতীয় নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশ্বরঞ্জন রক্ষিতের ওয়েটিং ফর রেসকিউ অনেকের চোখে পড়ে—বিশেষ করে বন্যাবিধ্বস্ত লোকের উদ্ধারের জন্য আর সকলে কত উৎকণ্ঠিত, তা উপবিষ্ট কয়েকজন গ্রাম্য নারী ও শিশুর মুখ দেখে বোঝা যায়। এই প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি স্থিরচিত্রই স্বাভাবিকভাবে তোলা, কোনটিতে ক্যামেরা বা ডার্করুমের কোনও কৌশল নেই, আর তার সুযোগও এ জাতীয় ছবি তোলায় মেলে না। প্রদর্শনীটির আয়োজন করে ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ কর্তৃপক্ষ সকলেরই ধন্যবাদভাজন হলেন। তবে মুক্ত অঙ্গনে বিন্যাসের সুবিধা ছিল না, আলোক ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত হয়নি। যোগ্যতর স্থানে ও উপযুক্ত পরিবেশে প্রতি বছরই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করলে কলকাতা শহরের রসিকবৃন্দ যে খুশী হবেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

চিত্রপ্রিয়

একটি শার্ট কেনার সময় আপনার মুনাফা তিনটি শার্টের
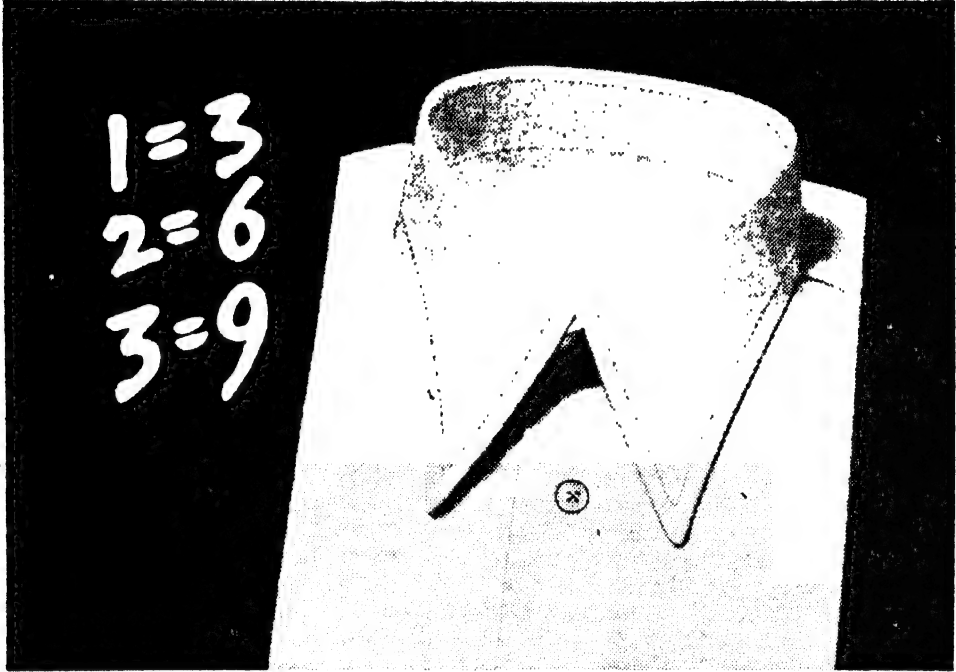
অবাক হচ্ছেন বোধ হয়। সত্যিই, 'টেরীন'® কাপড়ের গুণগুলো আশ্চর্য করে। 'টেরীন' কাপড়ের একটি শার্ট টেকে সাধারণ কাপড়ের তুলনায় তিনগুণ বেশী। হ্যাঁ, এর দামটা বেশী বটে। তবে তাতে আপনার তিনগুণ লাভ। সেই কারণে কাপড় কেনার সময় 'টেরীন' ট্রেডমার্ক দেখে নিলে আপনি লাভবান হবেন। 'টেরীন' কাপড় শুধু যে টেকে অনেক দিন তাই নয়, এর যত্ন করাও সহজ—লণ্ড্রির খরচ নেই। 'টেরীন' দিয়ে তৈরী শার্ট আপনি ঘরে অনায়াসে ধুয়ে নিতে পারেন। আর নিশ্চিন্তে বেপরোয়া ব্যবহার করতে পারেন।

কাপড়ের ওপর 'টেরীন' ট্রেডমার্ক দেখলেই আপনি কাপড়ের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

®'টেরীন'—কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

CHAITRA-CAFI-313 BEN

মুখ চাই মুখ

মিলন মুখোপাধ্যায়

নয়

সকালবেলায় জর্জ এসে হাজির। বললে,

—"কাল আসতে পারিনি ভাই। ভীষণ দুঃখিত! সন্ধের পর হোটেলে টেলিফোন করেছিলুম। ছিলে না তুমি। যাক গে, তোমার জন্যে এর চেয়ে সস্তা হোটেলে ঘর খুঁজে বের করেছি। বুক করে এসেছি আজ থেকে। চল।"

—"কত করে?"

—"কুড়ি ফ্রাঁ!"

—"বলি, এই তোমার সস্তা হল?"

জর্জ হেসে দু'হাত নেড়ে বলল,

—"এর থেকে সস্তা হোটেল বাপু প্যারিসে পাবে না।"

—"কোথাও পেয়িং গেস্ট থাকার বন্দোবস্ত করে দাও না!"

—"সময় লাগবে শিল্পী। হুট্ বললেই তো পেয়িং গেস্ট হিসেবে তোমাকে কেউ কোলে টেনে নেবে না। খোঁজ করতে হবে আমাদের। নাও, এখন চলো।"

হোটেল ডি ওরিয়েন্ট। সস্তা কেন তাও বুঝলুম উঠতে উঠতে। সাততলায় ঘর। লিফ্‌ট নেই। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জর্জ বলল,

—"নিউ ইয়র্কের সেই গল্পটা জানো তো?"

—"কোন্‌টা?"

—"সেই দুই বন্ধুর গল্প! বেড়াতে এসেছে নিউ ইয়র্কে। অনেক খুঁজে পেতে মাঝ রাত্তিরে একটা সস্তা হোটেল পাওয়া গেছে। আটাশতলায় ঘর। লিফ্‌ট নেই। সারা দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে দুজনেই ক্লান্ত। প্রথম বন্ধু এক বুদ্ধি বের করলে। বললে, 'চল্, এক কাজ করা যাক। দোতলায় পৌঁছে আমি তোকে একটা জোক শোনাব। তিনতলায় উঠে, তুই শোনাবি একটা। চারতলায় আবার আমার পালা। এমনি করতে করতে হেসেখেলে আটাশতলায় পৌঁছে যাব। নইলে, অতদূর সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই পারব না।' রাজী হয়ে, পালা করে জোক শোনাতে শোনাতে সাতাশতলা অবধি পৌঁছে গেছে ওরা। দম ফুরিয়ে দুজনেই ভোঁস ভোঁস করে হাঁপাচ্ছে। শেষ ক'টি সিঁড়ি বাকি। প্রথম বন্ধুটির জোক বলার পালা এবার। দ্বিতীয় বন্ধু বললে, 'কি হল, বল!' প্রথম জন বলল, 'হাঁ—বলছি! আমরা না—আমরা আমাদের ঘরের চাবিটি নীচের কাউণ্টারেই ফেলে এসেছি—'"

জর্জের গল্প শুনে হাসব কি, আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমি চাবি ফেলে আসোনি তো?"

একটু দাঁড়িয়ে দম নিলুম দুজনে। ফ্যাসফেঁসে গলায় হাসল জর্জ, বললে,—"না।"

—"এটা কোন্ তলা?"

—"ছয়। আর একটা বাকি।"

ছাতের সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো ঘর। আকারে বেশ ছোট। একটি বিছানাপাতা খাট। মালপত্র রেখে দুজনেই বসে পড়লুম খাটে। একটু জিরিয়ে নিয়ে মেজোন্দালেনের কথা বললুম জর্জকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, —"শিগগির চল তাহলে। ওখানে জায়গা পেলে খুব সস্তায় হয়ে যাবে। দশ বারো ফ্রাঁর মধ্যে।"

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম দুজনে। গাড়ি চালাতে চালাতে জর্জ বলল,

—"জানী বলে দিয়েছে আজ রাত্রের খাবার আমরা একসঙ্গে খাব। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এসে নিয়ে যাব তোমায়। হোটেলে থেকো।"

জর্জের ডানপাশে বসে আছি। সকাল থেকে বৃষ্টি ধরেছে। পথঘাট এখনো ভেজা-ভেজা। মেঘ জমে আছে আকাশ কালো করে। গাড়ির কাঁচের বাইরে হুহু হাওয়ায় মানুষজনের কোট-ওভারকোট উড়ছে। মেয়েরা রঙীন, গরম জামা গায়ে হেঁটে চলেছে ফুটপাথ দিয়ে। এক একটি মেয়ের মুখের দিকে চোখ পড়ছে, নকশা বদলে রোজমারীর মুখ। ওর নীল চোখ থরথর কাঁপছে। দমকা হাওয়ায় গাছপালা যেমন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে ওঠে, আমার ভেতরে তেমনি এক ঝোড়ো ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে রোজমারী।

—"কি ভাবছ অত, চুপচাপ?" জর্জ জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে। বললুম,

—"না। তেমন কিছু না।"

জর্জ বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, —"আরে বাবা। হয়ে যাবে! ঘরের জোগাড় হয়েই যাবে একটা। ঘাবড়াবার কি আছে ইয়াংম্যান!"

হেসে বললুম,

—"না, না, আমি ঘাবড়াচ্ছি না তো ইই।"

তোমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হতে ইচ্ছে করলে

ডান হাতের মধ্যমা তর্জনীর ওপর তুলে দিয়ে জর্জ বলল,

—"কিপ ইয়োর ফিঙ্গার্স ক্রসড! হয়তো মেজোন্দিল্যান্দেই ঘর পেয়ে যাবে।"

সীতে ইউনিভারসিত্যার এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাঁদিকে তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে চতুর্থ বাড়িটির গায়ে লেখা MAISON DE L'INDE। সামনে ভেজা ঘাসের কার্পেট। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম। চার পাশে কাঁচের দেওয়াল। সোজা সামনে রিসেপশন কাউন্টার। ভেতরে বসে টেলিফোনে কথা বলছে একজন। বাঁ দিকে কয়েকটি সোফা সেট। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনজন লোক বসে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাদের দিকে একবার দেখে নিয়ে কাগজে মন দিল আবার। দেখেই বোঝা যায় দেশী মানুষ। কোট-পাতলুন-পরা ইউ-পি, বিহার কিংবা দক্ষিণ ভারত।

লম্বা লম্বা পায়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জর্জ। ইঙ্গিতে আমাকে বলল,

—"দাঁড়াও। আমি আগে কথা বলে দেখি!"

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে ফরাসী ভদ্রলোক জর্জের দিকে তাকালেন। জর্জ বলল,

—"আমার নাম জর্জ বোয়াগনতিয়ে। এই ভারতীয় বন্ধুটি কদিন হল প্যারিসে এসেছে। থাকার জায়গা নেই। হোটেলে থাকবার মত অত খরচ করবার পয়সাও নেই। শিল্পী মানুষ। মাস ছয়েক থেকে প্রদর্শনী করতে চায়। আপনি কি অনুগ্রহ করে ওঁকে এখানে কয়েক মাস রাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

আমার দিকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে [illegible]

—"ঘর খালি হলে প্যারিসে হিসেবে ছ' মাস থাকতে পারেন। কিন্তু, এখন তো ঘর খালি নেই।"

—"শিগগির ঘর খালি হবার কোনো সম্ভাবনা আছে?" জর্জ জানতে চাইল।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। মুখ কাঁচুমাচু করে, আমার ভয়ংকর ফরাসীতে বলে ফেললুম,

—"যে কোনো ঘর—সী ভু প্লে!"

আমাকে আর একবার দেখে নিল লোকটা। যেন কোনো পাত্তাই দেবার লোক নই আমি। মনে মনে বললুম—শালা! জর্জকে বললে,

—"দিন সাতেকের মধ্যে একটি ঘর খালি হবে বোধ হয়। চব্বিশ নম্বর। পাকা খবর পরশু এসে জেনে যেতে পারেন।"

জর্জ একেবারে গদগদ গলায় বলে উঠল,

—"মের্সী! মের্সী বোকু! আর কাউকে দিয়ে দেবেন না যেন। পরশুই আমরা আবার আসব। মের্সী বোকু!"

ধন্যবাদ দিতে দিতে মাথা নাড়তে লাগল জর্জ। আমি মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালুম। কুতকুতে চোখ, চোয়াড়ে মুখে লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। কাঠখোট্টা কোথাকার! তবু, ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনে বেরিয়ে আসছি, জর্জ আবার ফিরে গেল। গিয়ে, আমার নাম বলে ওর নামটাও জেনে এল। আনন্দ্র চাড়াল। মনে মনে বললুম, ব্যাটা চাড়াল।

—"অ'ভোয়া ম'সিয়, অ'ভোয়া।" চাড়ালকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে এসে বসলুম।

খুশিতে দুজনেই ডগমগ। জর্জ সিগারেট খায় না। আমি উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়ে বললুম,

—"জর্জ! হয়ে গেলে চাড়ালকে আমি একটা চুমু খাবো!"

ও হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল,

—"ঐ যাঃ। কত কষ্টে ঘরভাড়া জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম। যাব আবার?

—"সেটা কি ভাল দেখাবে?"

"না থাক।" বলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নিজের মনেই আবার বলল,

—"কত আর হবে? দশ-বারো ফ্রাঁর বেশী কিছুতেই নয়। ছাত্ররা থাকে যখন। কি বল?"

—"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই।" পরিষ্কার বাংলায় বললুম।

—"সেটা আবার কি?"

—"আমার বাংলা ভাষায় একটা প্রভার্ব। অর্থাৎ, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।"

—"অফ কোর্স!"

শহরের দক্ষিণ প্রান্ত সিতে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে ছুটল গাড়ি। জর্জ জিজ্ঞেস করল,

—"তোমাকে কোথায় নামাব?"

—"কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি?"

একটু ভেবে জর্জ বললে,

—"তুমি ভিনসেন্ট ভ্যানগগের ছবি ভালোবাসো?"

বউ, তুমি তো জানোই ভ্যানগগ আমার কাছে প্রাণ। ওর ছবি, ওর জীবন, ওর রং—সব মিলিয়ে ও একটা ভীষণ দামাল ব্যাপার। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলুম,

—"ওর আমি প্রচণ্ড ভক্ত। কেন, হঠাৎ?"

—"এক কাজ করো। তোমাকে লুভ্র-এ নামিয়ে দিচ্ছি। ওখানে একটি গ্যালারীতে ভ্যানগগের প্রায় সমস্ত ছবির একক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। তুমি দুপুরটা ওখানে কাটাতে পার।"

লুভ্র-এ আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল জর্জ।

বিরাট লম্বা লাইন গ্যালারীটির সামনে। এত মানুষ-মানুষী ভ্যানগগের ছবি দেখতে এসেছে আজ! পাঁচ ফ্রাঁর টিকিট কিনে এক একজন ঢুকছে। বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলল, ভাই! ওর সময়ের কথা কল্পনা কর বউ! ওর ছবি দেখে পাগলামী বলত সবাই। বেঁচে থাকতে ভিনসেন্ট ভ্যানগগ ছবি বিক্রি করে দিন গুজরান করতে পারেনি। আজ ওর ছবি শুধু দেখবার দাম পাঁচ ফ্রাঁ। লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ উপার্জন করছেন ফরাসী সরকার শুধু ওর ছবি দেখিয়ে। ভাবতে ভাবতে আমার কেমন মনে হল, ভিনসেন্টের অতৃপ্ত আত্মা কাছাকাছিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পেছনেই হয়তো দাঁড়িয়ে পড়েছে এসে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে,

—"যাও, দেখে এসো। ভালো করে

দেখে এসো গিয়ে। মনে রেখো, তোমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়তো ইচ্ছে করলে আমার একটি ছবি কিনতে পারত। কেনেনি। এ লাইনে যত লোক দেখছো, তাদের সবার গ্র্যান্ড-ফাদার, গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদাররা আমার প্রতি অবিচার করেছে। আমার পাগল বলে হেসে হেসে আমাকে পাগল করে দিয়েছে। খেতে-পরতে দেয়নি! যাও, দেখে এসো! আর এখন, তুমি ইচ্ছে করলেও, একটি ছবিও ছুঁয়ে দেখতে পারবে না। আমার এক একটি অযত্নে বেঁচে-থাকা সন্তানকে আজ ফরাসী পুলিস গার্ড দিচ্ছে। ওদের বেশী কাছে গেলেই পুলিস ধমকে দেবে তোমাকে, বলবে, 'অত কাছে যেও না, তোমার গরম নিঃশ্বাস লাগলে ছবির ক্ষতি হবে'। কত খাতির আজ ওদের। দেখো গিয়ে, যাও!"

ভেতরে ভেতরে ভীষণ রোমাঞ্চ আমার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে লাইন। ডান দিকে লুভ্র-এর বিশাল বাড়ি। সামান্য দূরে বাঁদিকে ইম্প্রেশানিস্ট গ্যালারী। পেছনের চওড়া রাস্তা দিয়ে বুলেটের মত গাড়িগুলি ছোটাছুটি করছে। পায়ের নীচে নরম সবুজ ঘাস। ঘাসের জমির ওপর দিয়ে দূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে মানুষ-মানুষীরা। এসে, লাইনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এক একটি রঙিন মেয়ের মুখের ওপর চোখ পড়ছে আর মনে হচ্ছে রোজমারী। চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছি, রোজমারী। থমথমে কালো আকাশে তাকাচ্ছি, রোজমারীর নীল চোখ ধূসর হয়ে ভেসে উঠছে।...

রঙিন স্কার্ফটি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসলুম আবার। সরাসরি বোতল থেকে আরো খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলুম। চারিদিকে পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্ব নীচের দিকে নেমে গেল। রোজমারীর পাশে এসে বসলুম গা ঘেঁষে। ও সামান্য সরে বসে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। শব্দ করে হেসে উঠলুম। বললুম,

—"কি হল? ঘাবড়ে গেলে নাকি?"

চোখে চোখ রেখেই ও বলল,

—"না। আমি ঘাবড়াব কেন। ঘাবড়াবার কথা তো তোমার। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, তোমার নেশা চড়ে গেছে।"

কথা বলার সময় ওর ঠোঁটের নকশা বদলে বদলে যায়। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলুম,

—"নেশা তো একটু হবেই! নেশা করার জন্যেই তো মদ খাওয়া! না কি বলো?"

ও কিছু বলবার আগেই আবার বললুম, খুব গভীর গলায় খুব নরম চোখ মেলে

—"তোমার অমন গোলাপী ঠোঁটের দিকে আমি তাকিয়ে [illegible] পারছি না!"

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিলুম একটা। অল্প শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। গাঢ় গলায় ডাকলুম,

—"রোজমারী!"

আমার ডান হাত আলতোভাবে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতেই সাপের ফণার মত সোজা উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। সমস্ত শরীর ওর ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে। দূরে সরে গেল না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। ওর নীল চোখ আমার দৃষ্টিতে লাল হয়ে উঠল। চোখের নীল ছড়িয়ে গেছে সারা গায়ে। মেয়েটির হলুদ সোনালী চুল একেবারে কালো এখন। একে আমি চিনি না একদম। এ আমার রাজ্যে এই গভীর রাতে কোথা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল! আমার একলার গোটা রাজ্যপাট টলোমলো। ইতিহাস তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পেছনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে যেন শব্দ করে হেসে উঠল। চমকে চোখ ফেরালুম। কেউ নেই। সামলে নেবার জন্যে বললুম,

—"কি হল রোজমারী! বোসো!"

মেয়েটি তেমনি তাকিয়ে আছে আমার চোখের মধ্যে। আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল,

—"ছিঃ! তুমি আমাকে কি ভেবেছো, তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু, তোমাকে আমি এরকম ভাবিনি!"

জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম,

—"আমি আবার কি করেছি?"

মেয়েটি দু' পা হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল,

—"তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। নোয়েলের বন্ধু হিসেবে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি সেই জন্যেই এসেছিলুম। তোমার মত নোয়েলের বন্ধু আছে জেনে আমার এখন কষ্ট হচ্ছে।"

তীব্র সাপের বিষ ছড়িয়ে গেছে আমার রক্তের মধ্যে। দপদপ করছে নীল শিরা-উপশিরা। নিজের মুখ নিজেই দেখতে পাচ্ছি এখন। ঠোঁটের দু পাশ ঝুলে পড়েছে। সাদা সাদা কষ গড়াচ্ছে থুতনি বেয়ে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভীষণ জ্বালা। ঝনঝন করে বিশাল এক কাচের দেওয়াল ভেঙে গেল অনেক দূরে কোথায়!

দরজা খুলে ছোট্ট করে বলল রোজমারী,

—"চলি।"

সিঁড়ি দিয়ে ওর পায়ের শব্দ নীচে নেমে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। কি হয়ে গেল ঠিক যেন বুঝতেই পারছি না। এমন তো হওয়ার কথা নয়! এমন তো হয়নি কখনো! এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। রিসেপশন হলের শেষ প্রান্তে কাচের দরজার সামনে পৌঁছে গেছে ও। আড়ষ্ট গলায় ডাকলুম,

—"রোজমারী! শোনো, একটা কথা শুনে যাও—"

ফিরে তাকাল না মেয়েটি। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। শীত আর বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল আমার জীবনের সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্রমহিলা। বলে গেল, আমাকে চিনে গেল। কাউন্টারের মাদাম উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। জড়ানো গলায় বললুম,

—"ও কিছু নয়।"

শুনে, আমার চারপাশের দেওয়াল লজ্জায় লাল হয়ে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে যেন হা হা করে হাসতে লাগল। ফিরে দেখি, নোয়েল। ভারতবর্ষের নোয়েল ক্যাস্টেলিনো।

ক্রমশ

(সি [illegible])

আমি ওর খুস্কি এক সপ্তাহেই পরিষ্কার করেছিলাম হেলো হেয়ারগার্ড দিয়ে

ও ভাবে, ও ব্যবহার করছে শুধু আমার একটা কণ্ডিশনিং শ্যাম্পু!

শুধু 'এল-ও-৭' মিশ্রিত হেলো হেয়ারগার্ড খুস্কি পরিষ্কার করে আর চুল চমৎকারভাবে সুস্থ সুন্দর করে তোলে

অধিকাংশ ওষুধমিশ্রিত শ্যাম্পু শুধু মাথার আলগা খুস্কিই দূর করে। আর তার সঙ্গে চুলের সহজাত তৈলপদার্থগুলিও। হেলো হেয়ারগার্ডে আছে দুই কার্যকরী ফর্মুলা: যা নিশ্চিতভাবে খুস্কি থেকে চুলকে রক্ষা করে, আর চুলের স্বাস্থ্য মজবুত করে তোলে। হেলো হেয়ারগার্ডে যে 'এল-ও-৭' (লোরামিন এস.ডি ইউ-১৭৫) আছে তা মাথার খুলিতে গিয়ে খুস্কি সাফ করে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে এর নিয়মিত ব্যবহারে মাথায় খুস্কি হতে পারে না। 'এল-ও-৭' যখন আপনার চুলকে খুস্কি থেকে রক্ষা করে, তখন এর কণ্ডিশনিং উপাদানগুলি আপনার চুলের প্রকৃতিদত্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে চুল চিকন করে তোলে।

হেলো হেয়ারগার্ড নিয়মিত ব্যবহার করুন। খুস্কি-নিরোধী এই শ্যাম্পু আপনার চুলের স্বাস্থ্য মজবুত রাখে। যা বলতে পারেন স্বাস্থ্য মজবুতকারী শ্যাম্পু যা খুস্কি দূর করে।

খুস্কি দূর করুন সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনুন!

২টাকা বাদ

সীমিত সময়ের প্রবর্তনকারী বিক্রয় উপহার

পাশের কুপনটি কেটে নিয়ে ইংরেজীতে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখুন এবং কুপনে লেখা ঠিকানায় ডাকে পাঠান। আপনাকে একটি বিশেষ ডিস্কাউন্ট কুপন পাঠানো হবে যা দিয়ে আপনি হেলো হেয়ারগার্ডের একটি জায়েন্ট সাইজ শিশি ২ টাকা কম দামে পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। সীমিত সময়ের জন্য এই উপহার, শুধু কলকাতা শহর আর শহরতলীগুলির জন্যে।

2 To:
Halo HairGard Shampoo D.O.
C/o. Post Box No. 1965, Bombay 400 001

Dear Sirs:
I would like to have my Halo HairGard Shampoo Discount Coupon sent to:

Name: ______________________

Address: ______________________

HGS.G.I BN

বিশ্ব বিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-১৯৭৫ নতুন সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করল

বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে বসে শুধু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা অথবা গবেষণা নয়, দেশের তাবৎ বিজ্ঞানী এমন ধরনের নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে কাজ করুন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দুটি। এক, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করা। দুই, সর্বসাধারণের দারিদ্র্য দূরীকরণ। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব বিজ্ঞানী যোগ দিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে এ দুটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখেই তাঁরা যেন বার বার কথা বলতে চেয়েছেন। এবার তাঁরা তথাকথিত 'গবেষণা-পত্র পাঠ' এবং কে পরের বছর বিভাগীয় সভাপতি অথবা 'রেকডার' হবেন—এই নিয়েই শুধু মাথা ঘামান নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে সামগ্রিক অগ্রগতি ঘটে, সেই অগ্রগতি যাতে বিজ্ঞান এবং জনস্বার্থে কাজে লাগে, তরুণ গবেষকরা যাতে গোষ্ঠীগতভাবে কাজ করতে পারেন, এমন অনেক কিছু নিয়েই যথেষ্ট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীকে এবার কথা বলতে দেখেছি। যাতে মনে হয়েছে, এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেস যেন এক নতুন সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করল। তথাকথিত 'মেলা' এবার গৌণ। যেটা মুখ্য, সেট হল, বৈজ্ঞানিক অপচয় কী করে রোধ করা যায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উদ্ভাবনা এবং তার যথাযথ প্রয়োগ কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব এসব নিয়েই এবার বিজ্ঞানীরা অনেক বেশি সরব হয়ে উঠেছিলেন। অনেক বেশি কথাও বলেছেন।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থানীয় অফিসে প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি। কয়েকটি বিভাগীয় অনুষ্ঠানেও মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে—আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন কিভাবে চিন্তা করছেন, কী ধরনের সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, অথবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে তাঁদের উদ্যোগই বা কতটা—এ সব জানার চেষ্টা করেছি। প্রায় সর্বত্রই একই সুরে। একই ধরনের আত্মসমালোচনা। পুঁথিগত গবেষণা নয়। চাই এমন ধরনের উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য হবে সুনিশ্চিত। যার প্রধান লক্ষ্য হওয়া

৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যে বিশিষ্ট মহিলা-বিজ্ঞানী সভাপতিত্ব করলেন
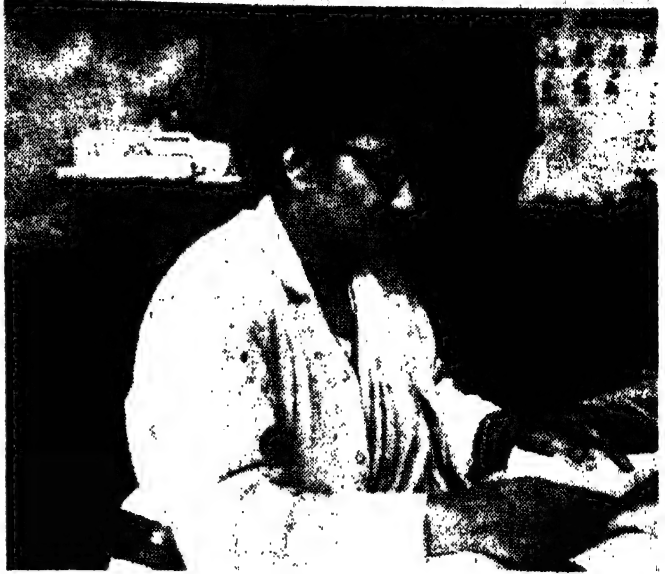
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের সায়ান্টিফিক অফিসার এবং তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ অসিতবরণ কুণ্ডু বললেন, 'সবার কাছে ওঁর পরিচয়, উনি আমাদের মাস্টার।' সায়ান্স কংগ্রেসের প্রাক্ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, জনৈক বিজ্ঞানীর সঙ্গে তখন উনি রসায়নের বিশেষ একটি প্রবলেম নিয়ে কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচন্ড ব্যস্ততা। সিন্ডিকেটের মিটিং, গবেষক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা অথবা জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো। কারণ অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞানীমহলে এখন শিরোনামে। আর শিরোনাম মানেই তো ব্যস্ততা!

ব্যস্ততা। কিন্তু কোন ব্যাপারেই তাঁর বিরক্তি নেই। ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং কর্মচারী সবার কাছেই তিনি 'মাস্টার'। সবাই তাঁর কাছে অবারিত। এবং তিনি সবার কাছেই শুভার্থিনী।

জন্ম ১৯১৭। ভেষজ উদ্ভিদ এবং সংশ্লেষণ জৈব-রসায়নের ওপর অসামান্য গবেষণার জন্যে ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব সায়ান্স উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য, তাঁর ওই গবেষণাপত্র নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ আর টড, এফ আর এস, অধ্যাপক আর ডি হেওয়ার্থ, এফ আর এস এবং অধ্যাপক জি আর ক্লোমোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৯৪০ সালে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হিসেবে অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষকতা জীবন শুরু কলকাতার ব্রেবোর্ন কলেজে। ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে রীডার। ১৯৬২ সালে তিনি ওই বিভাগে খয়রা অধ্যাপকের পদে বৃত হন এবং বর্তমানে ওই পদ এবং ডিন অব দি ফ্যাকালটি অব সায়ান্স পদে অধিষ্ঠিতা।

বিশিষ্ট সম্মান লাভ : নাগার্জুন পুরস্কার এবং পদক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি, মাউন্ট স্বর্ণপদক, যোগমায়া দেবী স্বর্ণপদক, স্যার পি সি রায় গবেষণা বৃত্তি, ভাটনগর পুরস্কার, এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির ফেলো।

যে সমস্ত বিদগ্ধ সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত তাদের মধ্যে প্রধান, ইনডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সিগমা XI (মার্কিন দেশ), কেমিক্যাল সোসাইটি), লন্ডন প্রভৃতি। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা পর্ষদের রাসায়নিক গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি।

দেশজ গাছগাছড়া থেকে যে সমস্ত উপাদান সংশ্লেষিত করে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে খ্যাতি অর্জন করেছে, পক্ষাঘাত শ্বেতী প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

'যা চাই, তা হোল' বর্তমান লেখকের কাছে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ভাল কাজ হচ্ছে, সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের উচিত ওই সব কাজ যাতে শিল্পপদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করা। এটা না করে আর কতদিন আমরা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব?'

চাই তাৎক্ষণিক মানব কল্যাণ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধি।

✻

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস একটি কারণে ঐতিহাসিকও বটে। এবার মূল অধিবেশনে সাধারণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন মহিলা-অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায়। পৃথিবীর বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে মহিলার সভাপতিত্ব এই প্রথম।

এবং বলা বাহুল্য, মূল অধিবেশনের সভানেত্রী হিসেবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একটি নজিরও স্থাপন করেছেন।

এর আগে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যাঁরা সাধারণ সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন—তাঁদের বেশির ভাগই ওই ধরনের ভাষণ দিতে গিয়ে নিজের নিজের বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন বেশি। যেমন, যিনি গণিতশাস্ত্রের লোক, তিনি গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যিনি পদার্থবিজ্ঞানী, তাঁর বক্তব্য পদার্থবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই মুখ্যত পরিবেশিত হয়েছে। এবং ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত এই ধারায় ব্যতিক্রম ঘটালেন অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বখ্যাত রসায়নবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের ভাষণে রসায়নের স্থানটি ছিল গৌণ। পরিবর্তে তিনি আত্মসমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন। বরং আরও পরিষ্কার করে বলা চলে, কোন রকম ‘অ্যাকাডেমিক’ বিষয়ের অবতারণা না করে তিনি সরাসরি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং কীভাবে সে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যায় এসব নিয়েই কথা বলেছেন বেশি।

তাঁর বক্তব্য, ষষ্ঠতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বৎসর দেশের কাছে এক সন্ধিক্ষণ। ইতিমধ্যে চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় মৌল-গবেষকরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তুলনায় প্রায়োগিক গবেষণার সাফল্য অত্যন্ত সীমায়িত। তাঁর মতে, এই শেষোক্ত ব্যাপারটির ওপর গুরুত্বও আরোপ করা হয়েছে কম।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গবেষণাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাদের ওই গবেষণা এবং উদ্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয়নি।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক বিজ্ঞানের স্নাতক বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এখন বড় রকমের একটি সমস্যা। এ সমস্যার আশু সমাধান না হলে সামাজিক সমস্যাই শুধু বাড়বে। দেশের সমৃদ্ধির জন্যে দরকার বেশি সংখ্যক বিজ্ঞানী নয়, প্রযুক্তিবিদ্।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেন, কেউ কেউ বলে থাকেন, স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা কতটুকু সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন? প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক গবেষণায় যে ব্যয় করা হচ্ছে, তার প্রতিদানে দেশ কতখানি উপকৃত হল?......বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য শিল্পসমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা সব সময় সম্ভব নয়। এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং দক্ষ গবেষকের সংখ্যাও কম নয়। তবু আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ার কারণ, যে সব সংস্থায় তাঁরা কাজ করেন, সেই সব সংস্থার দুর্বল পরিচালনা ব্যবস্থা।

পরিশেষে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ভেষজ গবেষণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এদেশের ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা করা দরকার। তাতে করে দেশের বনৌষধিকে যে শুধু আমরা কাজে লাগাতে পারব তা নয়, ভেষজ শিল্পকেও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে।

✻

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশন বসেছিল ৩ জানুয়ারি। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় চার হাজার ভারতীয় বিজ্ঞানী। এ ছাড়া ছিলেন রাশিয়া, বাংলাদেশ, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইউ কে, পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের স্বাগত জানান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আর সি মেহরোত্রা। এবং উপস্থিতবর্গের কাছে বিদেশী বিজ্ঞানীদের পরিচয় করিয়ে দেন অধ্যাপক এস এম সরকার।

এর পর শ্রীমতী গান্ধী কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানীকে তাঁদের কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ
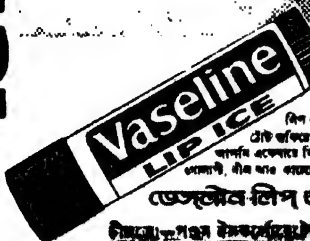
ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি পদক অর্পণ করেন। পরে অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭৫ আন্তর্জাতিক মহিলা বছর হিসেবে পালিত হচ্ছে। এমন একটি সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করছেন একজন প্রখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী। সারা পৃথিবীতে এই ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

উদ্বোধন ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পারমাণবিক বিস্ফোরণঘটিত গবেষণার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ঘটনায় আমরা সবাই আনন্দিত। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যান্য দিকও দেখা দরকার।' জনসাধারণকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানীদের তিনি আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেন। এবং বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সব চাইতে বড় সমস্যা বীজ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর অভাবেই চাষের জন্যে সেখানকার মানুষকে বীজের সন্ধান করার জন্যে ছুটতে হয় পাঞ্জাব, হরিয়ানার মত দূরাঞ্চলে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে কৃতী বিজ্ঞানীর সংখ্যা অনেক বেশি। আমার প্রশ্ন, চেষ্টা করলে তাঁরা কি এ ধরনের সমস্যার সমাধান বের করতে পারেন না?'

'প্রশ্ন এই', শ্রীমতী গান্ধীর মন্তব্য 'এমন সময়ে আমরা শিল্প উন্নয়নে হাত দিয়েছি যখন তা সত্যিই ব্যয়বহুল। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আবার একভাবে এটাকে সৌভাগ্যও বলা চলে। কারণ, অপরের অভিজ্ঞতা নিরিখ করে, কোনটা আমাদের দরকার, কোনটা নয়, সেটা আমরা বেছে নিতে পারি।

*

এবারকার বিভাগীয় অধিবেশনগুলির মধ্যে অন্যতম কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ।

কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডঃ টি ডি বিশ্বাস বললেন মৃত্তিকা গবেষণা এবং অধিক ফলনের ওপর। তিনি বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে ভারতে গড় ফলন এখনও অনেক কম। যেমন, নেদারল্যাণ্ডে প্রতি হেক্টরে গমের সর্বোচ্চ গড় ফলন যেখানে ৪৯·৫ কুইন্টাল,- সেখানে ভারতে গমের সর্বোচ্চ গড় ফলন মাত্র ১৩ কুইন্টাল। নিউজিল্যাণ্ডে হেক্টর প্রতি ভুট্টার সর্বোচ্চ গড় ফলন ৬৯·১ কুইন্টাল, ভারতে ১২ কুইন্টাল। স্পেনে চালের গড় ফলন হেক্টার প্রতি ৫৮·৯ কুইন্টাল, ভারতে ১৭·১ কুইন্টাল। নেদারল্যাণ্ডে হেক্টর প্রতি আলুর সর্বোচ্চ গড় ফলন যেখানে ৩৮০ কুইন্টাল, ভারতে মাত্র ৯০ কুইন্টাল। ডঃ বিশ্বাস বলেন, ফলন বাড়ানর ব্যাপারে মাটি পরীক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দেয়া দরকার। এতে করে সারেরও সাশ্রয় হতে পারে।

এবার উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের আলোচনাচক্রে কতকগুলি [illegible] কৃষিসমস্যার উপর আলোকপাত করেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালক ডঃ এস এম সরকার, কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা সংস্থার ডঃ ই এ সিদ্দিক এবং ডঃ জি এম ভেঙ্কটরমন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ সরকার বলেন, সালোক সংশ্লেষণ চলার সময় এবং তাপমাত্রার ওপর ধানের ফলন অনেকাংশে নির্ভর করে। তিনি দেখিয়েছেন, সেপ্টেম্বর অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারি, মার্চ—এই চার মাস ধান চাষের পক্ষে উপযুক্ত সময়। কারণ ওই ওই সময় আবহাওয়ার তাপমাত্রা কম থাকায় ধানের গাছ পরিপুষ্ট হয়। এবং সূর্যের আলোয় যেভাবে সালোক সংশ্লেষণের সুযোগ পায়, ভাল ফলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট সাহায্য করে। ডঃ ভেঙ্কটরাঘবন দেখান, বিশেষ ধরনের শ্যাওলা ব্যবহার করে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োগ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'হিসটো-কেমিক্যাল'-এর ভূমিকা নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ চণ্ডীচরণ দেব। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁর এই বক্তৃতা তাঁদের যথেষ্ট কৌতূহলী করে তুলেছিল।

নতুনত্ব ছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান বিভাগ, ভূ-বিজ্ঞান এবং ভূগোলের আলোচনাচক্রেও। এই সব বিভাগের অনেক আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই প্রায়োগিক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। হিমালয়ের পর্বতমালার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আই সি পাণ্ডে। ভূ-বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিভাগে এবার তিনি সভাপতিত্ব করলেন। অধ্যাপক আই সি পাণ্ডে হিমালয়ের উপর বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে ওই এলাকার উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করে বলেন, সাম্প্রতিককালে ভারতে মোট উষ্ণপ্রস্রবণ আবিষ্কৃত হয়েছে মোট ৩০০টি। হিমালয় অঞ্চলের পুরো উষ্ণপ্রস্রবণের জলের গড় তাপমাত্রা ২৬·৬—৭৮·৯

ভিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এছাড়া মধ্য এবং উত্তর হিমালয়ে রয়েছে বশিষ্ঠ প্রস্রবণ (৪৭—৫১ ডিগ্রি), মণিকরণ (৪০—১০০ ডিগ্রি), বদ্রীনাথ (৫২ ডিগ্রি), তপোবন (৪৫ ডিগ্রি), যমুনোত্রী (৮৯·২ ডিগ্রি) প্রভৃতি। এই সব প্রস্রবণ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ভূতাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে অজস্র বেগবতী জলধারার প্রবাহ। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ওই সব জলধারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও লাগান যেতে পারে।

*

দৃষ্টান্ত

বিজ্ঞান কংগ্রেসের বড় একটি অনুষ্ঠান বিভাগীয় সভা। বলা বাহুল্য, একটি ছাড়া প্রায় সব বিভাগীয় সভাতেই এবারও নতুনত্ব কিছু দেখিনি। ব্যতিক্রম সোসাইটি ফর নিউক্লিয়ার টেকনিকস ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড বাইওলজি। ২ জানুয়ারি বল্লভভাই প্যাটেল চেস্ট ক্লিনিকে এই সোসাইটির সভাটি পরিচালনা করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার ডাইরেক্টার জেনারেল ডঃ এম এস স্বামীনাথন। দেখলাম, প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীদের সেখানে ভিড়। রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান—এমন অনেক বিষয়ের ওপর গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে বিকিরণ শক্তির সাহায্যে কিভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ করা যায়, তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছেন। নিঃসংশয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন। বিশেষ এই দিকটি নিয়ে ওঁরা যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করলেন, সেই সঙ্গে তাঁদের সেই সব আলোচ্য বিষয়কে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়—সে ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার দিকটি নিয়েও খোলাখুলি কথা বললেন।

ধন্যবাদ, ডঃ স্বামীনাথনকে। সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেখলাম যথেষ্ট কৌতূহল এবং ধৈর্য নিয়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানী, বিশেষ করে তরুণ বিজ্ঞানী—যা যা বললেন, শুনলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। নিজের মতামত বিনিময় করলেন। পরে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডঃ স্বামীনাথন বললেন, পরের বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসে তথাকথিত 'বিষয়' নিয়ে আলোচনা না করে, আমরা কয়েকটি মুখ্য বিষয় বেছে নেব। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে মানব কল্যাণে কাজে লাগান যায়—তার জন্যেই এই প্রচেষ্টা। বলতে বাধা নেই, ডঃ স্বামীনাথনের মত অন্যান্য বিজ্ঞানীও প্রবীণ এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে এইভাবে মিলিত হলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি থেকে অনেক বাস্তব রূপরেখাই হয়ত সৃষ্টি হতে পারে। অন্যান্য বিভাগীয় সমিতির কাছে ডঃ স্বামীনাথনের এই উদ্যোগ অবশ্যই একটি দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। নিউক্লিয়ার টেকনিকস ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড বাইওলজি সমিতির সম্পাদক ডঃ বি ভি সুব্বাইয়া বললেন, ২৯ নভেম্বর, ১৯৭১ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। তারপর চার বছরের এই সীমায়িত সময়ে বহু বিজ্ঞানীই সমিতিকে কার্যকর করে তোলার জন্যে এগিয়ে এসেছেন।

দেশের কর্ণধাররা অনুপস্থিত কেন?

হ্যাঁ। দিল্লির বিজ্ঞান কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে বার বার এই কথাই আমার মনে হয়েছিল। এত বড় একটি অধিবেশন। দেশের কৃতী বিজ্ঞানীদের এত বড় সমাবেশ। এই সমাবেশে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যাপারে কত রকমের বিষয় নিয়েই না প্রবীণ এবং তরুণ বিজ্ঞানীরা আলোচনা করলেন। আলোচনা করলেন কৃষিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে। আর সমস্যা, শক্তি উৎপাদন, চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা জন-সমস্যা — মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই এসব নিয়ে কথা বলেছেন। প্রশ্ন এই—এমন একটি সংগঠন-মূলক সমাবেশে কোন মন্ত্রী, পার্লামেণ্টের সদস্য অথবা জননেতা—এঁদের কেউই অন্তত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না কেন? বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে, বিশেষ এই পরিবেশে তাঁদের উপস্থিতি দুটি কারণে প্রয়োজন। এক, বিজ্ঞানীরা তাহলে কর্ণধারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারতেন, উৎসাহিত হতেন। দুই, পারস্পরিক এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা ভারতের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হতে পারতেন।

বলতে বাধা নেই, সঙ্গীতরসিক না হলে যেমন সঙ্গীতের আসল রস অনুভব করা যায় না, ঠিক তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতার অধিকারী না হলে কোন বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত উদ্যোগই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। মন্ত্রী অথবা লোকসভার সদস্যরা দেশের বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত হন শুধু গুটিকয় ব্যক্তির মাধ্যমে। এই সব ব্যক্তির কেউ প্রশাসক অথবা বিজ্ঞানী। যাঁদের অনেকেরই চিন্তা রুটিন ধরে কাজ করে। কখনও বা এক পেশে। ওঁদের বাইরেও দেশে প্রচুর বিজ্ঞানী রয়েছেন, যাঁরা হয়ত রাজনীতি করেন না, হিল্লি-দিল্লি ছোটাছুটিও করেন কম। বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তি যাঁদের চিন্তা ভাবনার একমাত্র উপজীব্য। বছরে একবার হয়তো একমাত্র বিজ্ঞান কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা তাঁদের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার কথা বলেন। ওই সময় দেশ নেতাদের কেউ কেউ তো, যাঁরা কৃষি, জন-স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা রূপায়নের সঙ্গে জড়িত, এখানে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার শরিক হতে পারেন? এতে করে তাঁরা যে শুধু ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজের সঙ্গেই মেশার সুযোগ পাবেন তা নয়—নিজেদের চিন্তা-ভাবনা কতখানি বাস্তব অথবা অবাস্তব, তাঁদের উদ্যোগের মধ্যে ত্রুটি কোথায় অথবা কিভাবে সেই ত্রুটি দূর করা যায়—এমন অনেক কিছুই তাঁরা বুঝে উঠতে পারবেন। আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের ক্ষেত্রে কর্ণধাররা এটা ভেবে দেখুন।

সমরজিৎ কর

॥ ঊনআশি ॥

সম্ভবত আকাশের কোনো এক প্রান্তে ছোট এক টুকরো চাঁদ বিরাজ করে অথবা করে না, কিন্তু রাস্তার ঠুলি-পরানো সমস্ত বাতিগুলো নির্বাপিত, এবং আশে-পাশে সমস্ত বাড়িগুলোর কোথাও একটি আলোর রেখা না থাকা সত্ত্বেও সব কিছু অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অন্ধকারের নানাবিধ রঙ—কালো, কৃষ্ণকালো, লোহকালো—কালো অন্ধকার শিশির পড়া গাছের পাতায় চিকচিক করে, পুকুরের জলের রেখায় বিচ্ছুরিত গৃহকোণে নিকষ কালো, স্তম্ভে জমাট ঘুটঘুট, সাদা দেওয়ালে প্রদোষের আলোয় আবছা, আকাশ সুদূরে, নক্ষত্ররাজি কোথায় ঊর্ধ্বও, মাঝে মাঝে দু একটি ঝিকিমিকি ব্যতিক্রম।

ত্রিদিবেশ খালি পায়ে হাঁটে, গন্তব্যহীন, অতএব অনিশ্চিত ওর গতিবিধি, মোড় পেলেই বাঁক নেয়, অন্যথায় সমুখে যতক্ষণ বাধাহীন সিধা ও চলতে থাকে। রাত্রিকার পাখিদের দেখা যায় না, কিন্তু যে-কোনো ঋতুর তুলনায় গভীরতম নিঃশব্দ শীতের এই রাত্রে কোথায় কী বিচিত্র অতি ক্ষীণ শব্দ বেজে যায়। বাতাসহীন, নিশ্চল অন্ধকার প্রকৃতি, তার স্তব্ধতার মধ্যে সহসা কখনো ঝিল্লিস্বর শোনা যায়—স্তিমিত এবং স্খলিত, ছেদহীন ঝিঁঝিতা এখন নেই, অথবা হঠাৎ কোথায় টুপটাপ আচম্বিতে দু একটি অতি মৃদু শব্দ, যেন শীতে কোঁকড়ানো উঁচু গাছের পাতা থেকে নিচের বুক-খোলা ডাগর পাতায় ঝরে শিশিরের ফোঁটা। কিংবা রুদ্ধদ্বার ঘর থেকে হঠাৎ আসে ভেসে, চকিত ঘুম ভাঙা কুহর।

ত্রিদিবেশ শোনে না, মস্তিষ্কের সীমানা জুড়ে এক অবোধ যন্ত্রণা, চোখ ঝাপসা এবং গালে জল, ফাটা পায়ে রক্তপাত হয়, শীতবোধ নেই। 'না না না, তুমি চলে যাও, তোমার মধুর কাছে।' অবোধ যন্ত্রণায় নানা বিস্মিত জিজ্ঞাসা বিদ্ধ হয় অধিকতর যন্ত্রণায়। সমস্ত ঘটনাসমূহকে মনে হয়, কী এক অজ্ঞাত অপরাধে অভিশপ্ত, নরককে টেনে নিয়ে যায় জীবনকে। এখন একবারের জন্যও মনে আসে না সন্ধ্যা রাত্রের কথা, ইন্দ্রনাথ-মায়াকোভস্কি-ইলিয়া এহরেনবুর্গ-প্যারীর পতন—জয়নাল আবেদিনের ছবি—তুলির টানে ক্ষুধার গোঙানি শোনা যায়—আর সেই অভূতপূর্ব স্থির চিত্রসমূহ ক্যামেরায় ধরা, সোঁদা গন্ধ কচি ডাঁটার মতো মেয়েরা চলে যায় ট্রাকভর্তি—বিমান অবতরণের ক্ষেত্র তৈরী করতে—অন্নের সন্ধানে, প্রকৃতপক্ষে সৈনিক ক্রেতার সন্ধানে, নিজেদের বিক্রয়ার্থ। স্থির চিত্রের নিচে শুধু একটি জিজ্ঞাসা মুদ্রিত, 'কন্ট্রাকটররা এদের কোথায় নিয়ে যায়? কাজের সন্ধানে অথবা আত্ম-বিক্রয়ার্থে?' জিজ্ঞাসা অকারণ, নয় কী? অথবা বিদ্রূপাত্মক? সকলই অনিবার্য, যুদ্ধের কারণে। ত্রিদিবেশের প্রশ্নে ইন্দিরদা—ইন্দ্রনাথ বিরক্ত জবাব দেন, ভারতের যুদ্ধরত ফৌজের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী—অতএব, তারপরে জিজ্ঞাসায় আপনাকে খোঁচানো নিরর্থক বোধ হয়, সমুখে জেগে থাকে শুধু একটি মুখ—উজ্জ্বল আয়ত দুই চোখে গভীর প্রেরণা—নাম জয়া। ইন্দ্রনাথের মেয়ে, বেথুনের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, রোজ কলকাতায় যায়। আজ সন্ধ্যারাত্রে অতএব, বিজলি বাতির আলোয়, ফুটে উঠল একটি মুখ পেন্সিলের রেখায় এবং তারপরে ইন্দিরদার 'দুর্ভিক্ষ' প্রবন্ধের অনুমোদন, নতুন লাইব্রেরি ও স্টাডি সার্কেল গড়ে তোলার আলোচনা এবং বিদায়ের শেষ মুহূর্তে জয়ার সেই কথা, 'যুদ্ধের ছবি আঁকুন না, নিজের যা ঠিক মনে হয়।'...

ত্রিদিবেশের এখন সে-সব কিছুই মনে নেই, যে-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি ও হাসি এবং দুই ভুরুর মাঝখানে স্থাপিত ছিল, এবং তারপরে ও গিয়েছিল শ্রমিক বস্তিতে, ছায়া ও কম্পিত রক্তিম আলোর মাঝে মাঝে জেগে থাকা নানা মুখ—যেন গুহার গভীরে। এই তো যুদ্ধের ছবি। মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশের। গালের উঁচু হাড়ে গ্লানি মাখা এবং ভুরুর নিচের গভীর অন্ধকারে এক বিন্দু আলো ঝিকিমিকি, ঈশ্বরকে ডাকে গানের সুরে, আর ত্রিদিবেশকে দেখা মাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে ফিরে আসে শ্রমিকরাজ সন্ধানের সংবাদ শুনতে।...

সেই এক মন নিয়ে ত্রিদিবেশের গৃহে

প্রত্যাবর্তন—যদিচ অদ্ভুত ক্লান্ত, তথাপি রজনীতে এক বিচিত্র ঝংকার, চিত্র এক গভীর ও সুদূরের উদাস-সম্ভাষণী। এখন সকলই বিস্মৃত এবং চোখের সামনে জেগে থাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণায় প্রজ্জ্বলিত দুটি চোখ, অতি নির্মম প্রত্যাখ্যান ও বহিষ্কার এবং জিজ্ঞাসার মস্তিষ্ক ছিন্নভিন্ন হতে থাকে, যার অঙ্গুলি সংকেতে এক বছর এক মাস আগে ওর কলকাতায় গমন—কার ষড়যন্ত্রে সহসা বেজে উঠেছিল সাইরেন, কামানের বজ্র হুংকার, নারীর আলিঙ্গন, ফেলে আসতে হয়েছিল আলোয়ান? সকলই কি পূর্বাপর সাজানো—এই রাত্রি যার পরিণাম?

ত্রিদিবেশ থমকে দাঁড়ায়. ফোঁস ফোঁস গর্জনের সঙ্গে মানুষের স্খলিত অস্পষ্ট কথার টুকরো কানে আসে। ডান দিকে ফিরে তাকায়। পুরনো দরমার বেড়ার ফাঁকে ভিতরের আলো দেখা যায়, কোথাও অনেকখানি ভাঙা বেড়ার ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যায় মানুষের মুখের ভগ্নাংশ আর দুই একটি আগুনের ফুলকি। বুঝতে অসুবিধে হয় না কামার হাপর টানে. শীতের গভীর রাত্রে কাজ চলে কামারশালায়। ত্রিদিবেশ জামার হাতা দিয়ে চোখ মোছে, পায়ে এখন যন্ত্রণা বোধ হয়, ইচ্ছা করে আগুনে জ্বালানো হাপর-টানা কামারের ঘরে ঢোকে। রাত্রি জেগে কাজ করে, ওদের মধ্যে কামার-বউয়েরা হয়তো ঘুমায়, কি কথা ওরা বলে কে জানে। হয়তো কাজের কথা বা অন্য কিছু, কিন্তু ওদের সুখী মনে হয়, এবং ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, এখন কামারশালায় ঢোকা যায় না, যার পরিণাম কিনার সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নানা জিজ্ঞাসা। ও হাঁটতে আরম্ভ করে, ভাঙা-চোরা শক্ত ইঁটের রাস্তায় পা ফেলতে কষ্ট হয়। স্যান্ডেলে তবুও পায়ের নিচে একটা আবরণ থাকে, এখন উন্মুক্ত গোড়ালি এবং ধারে ধারে ফাটলগুলো বাড়তে থাকে। চলতে গিয়ে বুঝতে পারে, এই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় দৃঢ়ভাবে চলতে পারে না, খোঁড়াতে হয় এবং এই প্রথম জিজ্ঞাসা জাগে, কোথায় যাওয়া যায়?

ত্রিদিবেশ একবার পিছন ফিরে তাকায় কিন্তু দাঁড়ায় না, আবার সম্মুখে ফিরে চলতে থাকে, ওর চোখের সামনে শিউলির শক্ত মুখ, অঙ্গার চোখ। শিউলির প্রতিটি কথা আবার ওর কানে ঝংকৃত হতে থাকে। ঘৃণা আর অবিশ্বাস আর তীব্র অভিযোগ। শিউলির মুখে উচ্চারিত ওর তেরো বছর বয়সের সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে। যে-কথা শিউলি ব্যতিরেকে আর কারোর কাছেই ত্রিদিবেশ উচ্চারণ করতে পারেনি, মোহন বা রাখাল, কারোর কাছেই না। শিউলির কাছে করেছিল। মা ওকে মেরেছিলেন। মায়ের সেই প্রহারের সঙ্গে কি শিউলির আজকের এই আচরণের কোনো সাদৃশ্য বর্তমান? মাসীমা বা মধুদি, কারোর সঙ্গে কোনো ঘটনার জন্যই ত্রিদিবেশ প্রস্তুত ছিল না, তথাপি ওর ভাগ্যে প্রহার ও লাঞ্ছনা জোটে। জীবনের সমস্ত কিছুই কি এমন অসহায়, অজ্ঞাত এবং ভয়ংকর? এই সব ঘটনার মধ্যে ওর সঠিক ভূমিকা কি, ও বুঝতে পারে না। শিউলির এতো উন্মত্ত রাগ ও ঘৃণা কিসের? ত্রিদিবেশের কোনো কথা শুনতে চায় না। এবং এই প্রথম ওর মনে হয়, শিউলির মুখে একটি নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি, কে আলোয়ান দিয়ে গিয়েছে। ত্রিদিবেশ ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, উদ্বেগাকুল সংশয়ে মধুদির নামটা মনে এসেছিল। অথবা সবিতা পণ্ডিত? দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান। ত্রিদিবেশ আর কখনো মধুদির কাছে যেতে অনিচ্ছুক ছিল, তা না। মনে প্রত্যাশা ছিল, প্রতীক্ষা করেছে পণ্ডিতদা কোনো একদিন প্রথমবারের মতো ওকে যেতে বলবেন। বলেননি, দুজনের মধ্যে অনেকবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও। ত্রিদিবেশ নিজে মনে মনে পা বাড়াবার পূর্বমুহূর্তেই সেই রাত্রি দু পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে, যে-রাত্রি এখনো অভাবিত, নিরুত্তর, দুর্বোধ্য। শিউলি এতো নিশ্চিত কেন, সেই রাত্রে কিছু ঘটেছিল? যদি এতো নিশ্চিত তবে ত্রিদিবেশের কোনো কথাই শুনতে চায় না কেন?

ত্রিদিবেশ আবার দাঁড়ায়, রাস্তার ধারের কোনো বদ্ধ ঘর থেকে ধুপ্ ধুপ্ শব্দ ভেসে আসে। ও বাঁ দিকে ফিরে তাকায়, প্রায়ান্ধকার খোলা দরজার ভিতরে একটি মানুষের পিছন-ফেরা মূর্তি দেখা যায়। অতি স্তিমিত আলো সেই মানুষের আড়ালে, মাথা সুদ্ধ পিঠের ওপর কিছু ঢাকা, তার ডান হাতে হাতুড়ি ওঠা-নামা করে। মুচিপাড়া, ত্রিদিবেশ চিনতে পারে। মুচি কাজ করে। শীতের গভীর রাত্রে এই সব মানুষদের কাজ করার বিষয় ওর অজানা। লোকটার বিশ্ব-সংসারের কোনো দিকে নজর নেই। একটা কুকুর লোকটার গায়ের কাছ থেকেই যেন গর-গর করে ওঠে, তার পরেই হঠাৎ লাফিয়ে দরজার কাছে এসে রাত্রের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ঘেউ ঘেউ শব্দে ডাকে। লোকটা ফিরে তাকায় না, কেবল তার গোঙানো স্বর শোনা যায়, 'চুপ রহো বেটা, ইধার আও।' কুকুরটা তথাপি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু দরজার গণ্ডি একবারও অতিক্রম করে না। মুচি তার কাজ করে। ত্রিদিবেশ হাঁটতে থাকে, পায়ের যন্ত্রণা ঊর্ধ্বগামী হয়ে শরীরের অন্য অংশে ছড়ায় এবং সারা শরীরে একটা

রেণ লাগে। 'আমি কি সত্যি মিথ্যুক না?' দিবেশ জিজ্ঞাসা করে এবং জানে ওর যা ভাষণের কথা। এক বছর এক মাস শে শিউলিকে ভয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় তলায় পড়ে থাকতে দেখে না, মধুদির ড়ির কথা বলা ও একান্ত অসম্ভব বোধ য়েছিল। সেই অসম্ভব এখন শিউলির ে, ত্রিদিবেশ ঘটনা ব্যক্ত করতে প্রস্তুত, উলি শুনতে নারাজ, কারণ এখন তা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ত্রিদিবেশের দায় িকর ও মুক্তির উপায় কী? এবং কে সছিল?

ত্রিদিবেশ দাঁতে দাঁত চাপে, আবার হরণ লাগে। ও পকেটে হাত দেয়, ডান কের পকেটে দোমড়ানো মোড়ক। পকেট কে বের করে সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। তাড়াতাড়ি দোমড়ানো প্যাকেট সোজা করে, তরে হাত দেয়, এখনো দুটি সিগারেট বশিষ্ট। ওর মুখে জল এসে পড়ে, একটা ের অনুভূতি উজ্জীবিত হয় এবং অন্য কেট হাত দিতেই দেশলাইয়ের শব্দ পায়। টি সিগারেট তুলার মতো নরম ও িলে, সাবধানে টেনে টেনে সোজা করে টি চেপে ধরে এবং এই প্রথম ঠোঁটে একটা দু বাথা অনুভূত হয়। দেশলাইয়ের কাঠি লিয়ে সিগারেট ধরায় এবং দেশলাই কেট রাখতে গিয়ে টের পায়, পকেট সা, শিউলির পুরনো শাড়ির ছেঁড়া কটি টুকরো, রুমালের প্রয়োজন। ও গলি কে বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতে না াঁড়াতেই বাঁ দিকের বাঁকের মুখ থেকে তীব্র লোর ঝলক ঝটিতি ধেয়ে আসে ট্রাকের ীব্র গর্জনে। গর্জন শুনেই বোঝা যায়, কাধিক ট্রাক অতি দ্রুত ছুটে আসে। কিন্তু ত্রিদিবেশ কৌতূহলিত হয়, উল্লাস অট্টহাসির শব্দ এবং তা ধাবমান ট্রাক থেকে আসে। ের গায়ের ওপর আলো পড়তেই ও সরে আসে এবং অট্টহাসি হঠাৎ ক্রুদ্ধ চিৎকারে পরিণত হয়, ট্রাকের গতি মন্থর হয়ে আসে। লির মুখের কাছে এসে প্রথম ট্রাকটি প্রায় থেমে যায় এবং ট্রাকের ওপর থেকে কেউ যেন ঝপ করে লাফিয়ে নামে বা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, চিৎকার শোনা যায়, 'স্টার্ট বোয়!'

ট্রাকগুলো গর্জন করে নিমেষেই চলে যায় এবং চাদর জড়াতে জড়াতে একটি মূর্তি ত্রিদিবেশের দিকে এগিয়ে আসে, যার ধুতির প্রায় সবটাই রাস্তার ধুলোয়। ঝটিতি আলোর অপসারণে কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার নিবিড় বোধ হয়, তার পরে বিস্মিত ত্রিদিবেশের চোখে পড়ে, একটি পুরুষ গোঙানো স্বরে কাঁদে, কিছু বলে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে এবং শীতে জড়িয়ে নগ্নতাকে ঢাকবার চেষ্টা করে। বিভ্রান্ত ত্রিদিবেশ একটু সরে যেতেই মূর্তি তার দিকে ফেরে এবং হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, 'শুয়োরের বাচ্চারা আমাকে মেয়েমানুষ ভেবেছিল!' বলতে বলতে শিশুর মতো আঁ আঁ শব্দে কাঁদে এবং আবার বলে, 'আমি গায়ে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে আসছিলাম, আর শালারা মনে করেছে, আমি বুঝি মাথায় ঘোমটা দেওয়া বউ, মেয়ে-ছেলে, অমনি গাড়ি থামিয়ে কুত্তার বাচ্চারা আমাকে তুলে নিল।' বলতে বলতে আবার শিশুর মতো আঁ আঁ শব্দে কাঁদে, কিন্তু অসাধ্যান্ত হাতে যথেষ্ট চেষ্টা করে ধুতি পরতে পরতে 'নিগ্রো বেজন্মাদের' সম্পর্কে একসঙ্গে অনেকগুলো কটু বিশেষণ প্রয়োগ করে যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলে, 'শালারা আমার শরীরের আর কিছু রাখেনি, উহ্। কী মার মারলে মেয়েছেলে নই বলে। মাতাল শালারা চোখের মাথা খেয়েছে! আমার দোষ?'

অভাবিতভাবে লাঞ্ছিত মূর্তি এবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। ত্রিদিবেশ কেবল বিভ্রান্ত না, ঘটনা এতো অবিশ্বাস্য মনে হয়, এমন অভূতপূর্ব ও বাকরুদ্ধ হয়ে থাকে। কী বলা উচিত এ বিষয়ে ও কিছু স্থির করতে পারে না। অন্ধকার অনেকটা স্তিমিত হলেও মানুষটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না, বয়সও সঠিক অনুমান করতে পারে না, কেবল অবিন্যস্ত খাড়া খাড়া চুল আর মুখটা লম্বা মনে হয়। লোকটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'কে তুমি?'

ত্রিদিবেশ তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারে না, কিন্তু ওর ঘ্রাণে মদের গন্ধ স্পর্শ করে। লোকটি এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সহসা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গলির ভিতরে এগিয়ে যায় এবং গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। ত্রিদিবেশ নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সমস্ত চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে এই ঘটনা যেন তীক্ষ্ন ছুরিকাঘাতে একটা

ছেদ টেনে দেখলে সংসারের যাবতীয় ঘটনা-সমূহকে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিন্তু অলৌকিক প্রতিভাত হয়। লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়, স্তব্ধতা নেমে আসে, এবং আঙুলে সিগারেটের অঙ্গারের স্পর্শে ত্রিদিবেশ সচকিত হয়। শেষাংশ ফেলে দেবার আগে, আর একবার দুই আঙুলের ফাঁকে শেষ টান দিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু মুহূর্তের ঘটনা, লোকটির কথা এখনো অবাস্তব আর অবিশ্বাস্য মনে হয়। যদিচ লোকটি মাতাল ন., মদের গন্ধ ছিল তার মুখে, ঘটনা অতি করুণ।

ত্রিদিবেশ বড় রাস্তায় উঠে আসে. ঠান্ডা রাস্তা নিঃসঙ্গেহে, তথাপি পিচের মসৃণ রাস্তায় পা দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করে। ও উত্তর দিকে এগিয়ে যায় এবং লোকটির দুর্দশার কথা মনে হতেই একবার পিছন ফিরে তাকায়। ওর গায়ে মাথায় মুড়ি দেওয়া নেই, চাদর নেই গায়ে, ভিতরে একটি মোটা গেঞ্জির ওপরে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। ঘরের কথা ওর একবার মনে আসে, দরজা-বন্ধ ঘরে শিউলি আর ছেলে। ও চলতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ ওর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, লোকটির দুর্দশার কথা মনে করে। অতঃপর ট্রেকের আলো আর শব্দের পরিণাম, রাস্তার ধার থেকে বড় ইটের টুকরো তুলে নেওয়া এবং সোজাসুজি তাকানো। কিন্তু আপাতত তার কোনো লক্ষণ নেই। সামনের রাস্তা আবছা, একদিকে গভীর নর্দমা, মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়। একটা চটকলের রেল ইঁডিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশ এক মুহূর্ত ভাবে. চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনাথ মিস্তিরির মুখ। এখানে রাস্তা তিন—ত্রিমুখী। এত্তো রাত্রে মিস্তিরির বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে না, মনের ভিতর থেকে কোনো সায় আসে না। সোজা উত্তরে গেলে, দুটো মিল অতিক্রমের পরে, ভিতরের বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে ইন্দ্রনাথদের বাড়ি। বাড়িটা চোখের সামনে ভাসে, দরজা জানালা বন্ধ স্তব্ধ ঘুমন্ত পুরী—এবং জয়া। ত্রিদিবেশ আর একবার পিছন ফিরে তাকায়, এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিজের বা ইন্দ্রনাথের, কারো বাড়ি যাওয়াই সম্ভব না। উত্তরের কিছু দূরে নিঝুম রাত্রে, ভারি বুটের শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসে। ওদিকে থানা, সম্ভবত পুলিস আসে, এবং এই সাক্ষাৎ ত্রিদিবেশের কাছে অবাঞ্ছিত বোধ হয়। এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে লছমনদের বস্তি। হয়তো সেখানে কোনো আশ্রয় মিলতে পারে। এখন কোথাও, যে-কোনো আচ্ছাদনের নিচে, অথবা কোনো ঘুপচিতে একটু আশ্রয় দরকার, অতএব ত্রিমুখী রাস্তার উত্তর-পূর্বগামী কোণ ঘুরে পায়ে পায়ে বাড়ায়। এই পথে লছমনদের বস্তি—লছমন ডাক্তা।

ত্রিদিবেশ কয়েক পা অগ্রসর হতেই, একাধিক ব্যক্তির স্বর কানে আসে, এবং সুদীর্ঘ দরমার বেড়ার ফাঁকে আলো চোখে পড়ে। আরো কয়েক পা অগ্রসর হতেই অর্গল খোলা বেড়ার দরজার ভিতরে, দাওয়ার ওপরে একাধিক মানুষের ঘিরে বসা জটলা দৃষ্টিগোচর হয়। কারোর মুখ দেখা যায় না, আলোকে চার পাশে ঘিরে সবাই আসীন, এবং সকলেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত বস্তাবৃত। ত্রিদিবেশের ঘ্রাণে লাগে তীব্র মদের গন্ধ, এবং সহসা একটি মূর্তি ওর সামনে ছায়ার মতো ভেসে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকার আলোক ঝলকে ঠিকরে পড়া পশুর চোখের মতো দুটো চোখ ওর প্রতি নিবদ্ধ, এবং কুকুরের গরগর করার মতো স্বরে জিজ্ঞাসা শোনা যায়, 'কৌন্ ?'

সেই মুহূর্তেই এক পাশ থেকে ভারি বুটের শব্দ এগিয়ে আসে, টর্চের আলো তীক্ষ্ণ ঝলকে চোখে হানে। ত্রিদিবেশ চোখ বোজে এবং আবার খোলে এবং সেই আলোতেই একজন সেপাইকে ওর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। টর্চের আলো নিবে যায় এবং অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকারের সংঘর্ষে ধাঁধা লাগে। সেপাই জিজ্ঞেস করে, ক্যা বে লওন্ডা, তু কৌন হ্যায় ?'

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে লক্ষ করে, পুলিস এবং প্রায় চার-পাঁচজনের দ্বারা ও বেষ্টিত। ও কিছু বলবার আগেই, একজন বলে ওঠে, 'আরে, ই মার্কিংবাবু হ্যায় না ? লাল ঝান্ডাবাবু। ছোড় দেও জী, ই কোই জুয়াড়ি খেলোয়াড়ি নহি হ্যায়।' তার পরেই জিজ্ঞাসার স্বর শোনা যায়, 'ইত্‌নি রাত মে কহাঁ যা রহে' বাবু ?'

ত্রিদিবেশ কোনো রকমে উচ্চারণ করে, 'এই এদিকেই—।' এবং কথা অসম্পূর্ণ রেখে, বেষ্টন ভেদ করে দ্রুত অগ্রসর হয়, এবং ওর মনে পড়ে যায় এটা রহমানের জুয়ার আড্ডা। ওর বিস্ময়, শীতের এই গভীর রাত্রেও জুয়া খেলা চলে। এবং পুলিসের সেপাইটি এখানে কেন ? রাত্রে কত লোক জেগে থাকে—কামার, মুচি, জুয়াড়ি, পুলিস, এবং ক্রমশ সরু হয়ে আসা গুহার মতো রাস্তার ধারে, টিনের দরজা বন্ধ ফুটোয় আলো, নানা শব্দ ও গন্ধে ও টের পায়, ছোটখাটো বেকারির শ্রমিকরা কাজ করে।

'উঠ্ শালে, হামি কো কি এত্‌না তাগদ হ্যায়, তুকো লে যায়ি ?' স্ত্রীলোকের ক্লান্ত রুদ্ধ স্বর।

ত্রিদিবেশ থমকে দাঁড়ায়, ওর পায়ের কাছেই, নর্দমার ধারে একটি মূর্তি শায়িত, এবং স্ত্রীলোকটি তাকে হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে। ও মাথা নিচু করে, এবং বুঝতে পারে শায়িত লোকটির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে জড়ানো একটি [illegible] নিজেই উঠতে চেষ্টা করে, পারে না। ত্রিদিবেশের মনে হয়, স্ত্রীলোকটির

গায়ে কোনো জামা নেই, কাপড় [illegible] বয়স অনুমান করা [illegible] পুরুষটি [illegible] শূকরের মতো [illegible] করে। এবং অস্ফুট উচ্চারণ 'পাঁকড়া।'

স্ত্রীলোকটি পুরুষের হাত ছেড়ে [illegible] স্বরে বলে, 'পাকড়া তো না।' বলেই, হাত ছেড়ে দিয়ে অন্ধ [illegible] হেসে ওঠে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, এ[illegible] 'শালে, পাঁড়া পিয়ে মস্ত।' বলেই [illegible] তার চোখে পড়ে। সে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসে, বলে, 'হেই বাবা। [illegible] এশালে মরদ মাতাল পাঁড়া বা, [illegible] লাগাও হামি সাথ, ঘর যিবো।'

ত্রিদিবেশের ঘ্রাণে আবার [illegible] জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কে ?'

'মরদ মরদানি বা।' বলেই আবার স্খলিতভাবে হাসে, বলে [illegible] ঘর পর বাচ্চালোগ রোবে কর্[illegible] পাঁড়াকো উঠাও হামিকে সাথ[illegible]

ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করে, 'কোথা[illegible] তোমরা ?'

'কঙ্কাল সর্দারকে বস্তি নর্দমা[illegible]' স্ত্রীলোকটি হাত তুলে দেখায়।

ত্রিদিবেশ এক মুহূর্ত ভাবে, এবং [illegible] সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিচু হয়ে [illegible] লোকটির দুই কুক্ষির নিচে দুই হাত [illegible] চেপে ধরে, টেনে তোলবার চেষ্টা ক[illegible] ঠান্ডা, এক বস্তা পাথর কুচির মতো [illegible] শরীর। স্ত্রীলোকটিও ত্রিদিবেশের সঙ্গে হা[illegible] লাগায়, এবং ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, [illegible] মাতাল লোকটি একান্ত অসহায়, তথা[illegible] সেও ওঠবার নিরর্থক চেষ্টা করে। কয়েক বারের চেষ্টার পরে ত্রিদিবেশ স্ত্রীলোকটি[illegible] সহায়তায় লোকটিকে তুলে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়। লোকটি অনায়াসে তার [illegible] মাথা এক হাত দিয়ে ত্রিদিবেশের গল[illegible] জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে স্ত্রীলোক[illegible] গলা[illegible] স্ত্রীলোকটি এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে বলে, 'শালে পাঁড়া।'

কী অর্থ এই পাঁড়া শব্দের, ত্রিদিবে[illegible] জানে না, এবং ও স্ত্রীলোকটির হাসি শু[illegible] অবাক হয়। পুরুষটি সমর্থন সূচক শব[illegible] করে, 'হুঁ-হুঁ।' তার পরে ত্রিদিবেশের কাঁধে[illegible] ওপর মাথা এলিয়ে দেয়। তীব্র মদ ও রাস্তা[illegible] ময়লার গন্ধ লাগে ওর ঘ্রাণে, গায়ে শিহর[illegible] লাগে।

'চলো বাবা।' স্ত্রীলোকটি বলে, এবং এ[illegible] হাত দিয়ে পুরুষটির গলা বেষ্টন কর[illegible] যে-হাতের ঠান্ডা আঙুলগুলো ত্রিদিবেশে[illegible] গাল স্পর্শ করে।

ত্রিদিবেশের নাকে গোবর আর কা[illegible] মেশানো গন্ধ লাগে, ঠান্ডা আঙুলগুলো স্পর্শ কর্কশ। লোকটির পুরো বোঝা প্রা[illegible] ওর ওপরে, ধীরে ধীরে টলতে টলতে চ[illegible]

ক্রমশ

রাগ শৈশবে ও কৈশোরেও হয়

দ্‌রোগকে আমরা সাধারণত বড়-
র ব্যাধি এবং বার্ধক্যের না হলেও
র সীমানার পীড়া বলে মনে করে
এতদিন। কিছুদিন আগের এক
ায় পাওয়া গেছে আতঙ্কজনক খবর।
র্ষে প্রতি হাজার স্কুল-পড়া বাচ্চা-
ধ্যে দশ-বারোটির দুর্বল হৃদয় এবং
কিছু হৃৎপিণ্ডের বাত রোগাক্রান্ত।
টি অবশ্য বড় শহরে বেশী। এখানে
তো. বিশেষ করে মা, যিনি
াসের জন্য দায়ী, তাঁর বিশেষ
দরকার। প্রত্যেক বাচ্চার সুস্থ
জন্য স্নেহ পদার্থ খাওয়াও যেমন
ঠিক তেমনই অতিরিক্ত হলে
কারণ হতে পারে।

যে হৃদ্‌রোগের বীজ বপন করা
থম ধরা পড়ে কিছুদিন আগে।
াস্ত্রেও ধমনীর কাঠিন্য বা
অব আর্টারিজ'-কে পরিণত
বস্থা মনে করে নেওয়া হতো।
যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের শবদেহ
করে দেখা গেল দশটির
আর্টটির ধমনীর ওই অবস্থা।
বয়সে এরা সবাই তরুণ।
ও বা কাঁচা কিশোর বয়স. বিশ
রেরও বেশ নীচে। কেউ বা বিশ-এর
ান্য উপরে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অবাক হয়ে
শ এই নতুন খবরে। তাঁরা চমকে উঠে
ষণা করলেন উত্তরকালের হৃদ্‌রোগীর
শার কারণ বহু সময় হয় অল্প বয়সে।
য়ের দেওয়া খাদ্য হয়তো উপযোগী
য় না।

আদর করে বেশির ভাগ সচ্ছল গৃহে
চ্চাদের নানা মিষ্টান্ন ভাজাভুজি খাওয়ানো
য়। ঘন স্নেহবহুল দুধ, ক্রীম, ডিম,
াংস বিশেষ করে মানুষের শরীরে
ক্লোরেস্ট্রল বাড়ায়। বেশী মিষ্টি,
কক পেস্ট্রি ইত্যাদিও অপকার করে।
নস্পতি. মাখন. ঘি, নারকেল তেল রক্তের
স্নেহ বৃদ্ধি করে। তুলোর বীজের তেল,
তিল তেল, সয়াবীনের তেল, ভুট্টার তেল
ব্যবহারে রক্তের ক্লোরেস্টল নামে। সেদিক
থেকে সরষের তেল ও বাদাম তেলও ভালই।
পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে যে, রক্তে স্নেহ
কম থাকা ও ক্লোরেস্টল বৃদ্ধি না হওয়া
হৃদরোগ থেকে বাঁচবার উপায়। শাকসব্জী.
ফল. কম চর্বিযুক্ত মাংস, মাছ খাওয়ার
অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই পত্তন করা
দরকার।

দেখা গেছে. শিশুরা যখন মাতৃস্তন্য
পান থেকে গরুর দুধ খাওয়া ধরে তখন
তাদের ধমনীর ভিতরের দিকে
স্নেহ পদার্থের আঁকাবাঁকা ডোরা
কাটা দাগ পড়ে। তাতে বড় একটা

ঘরে বাইরে

ক্ষতি হয় না। কালে এগুলি অদৃশ্য
হয়েও যায়। কিন্তু কোন কোন-ক্ষেত্রে এগুলি
থেকে যায় ও নতুন ক্লোরেস্টল ও স্নেহ বা
চর্বি জমা হয়। জন্তুদের মধ্যে বাঁদরকে
বেশী স্নেহযুক্ত খাবার দিয়ে দেখা গেছে
যে তাদের মধ্যে ধমনীর কাঠিন্য অচিরেই
বেশ দেখা দেয়। সেই বাঁদরকেই যদি কম
স্নেহ দেওয়া হয় তবে তার কাঠিন্য বাড়ে না
বরং কমের দিকে যায়। খাদ্য এবং হৃদ্‌-
রোগের ঘনিষ্ঠ যোগ এভাবে প্রমাণিত
হয়েছে।

কয়েক বছর আগে হৃদরোগে মৃত্যু ছিল
মৃত্যুর কারণসমূহে ষষ্ঠ। এখন হয়েছে
তৃতীয়। গত তিন বছরে বেড়েছে শতকরা
২২৫! মার্কিন দেশে মৃত্যুর কারণ হিসাবে
হৃদ্‌রোগ সবার আগে। শিশু ও কিশোরের
ক্ষেত্রেও মেদাধিক্য হৃদরোগের কারণ হয়।
শিশুরা খুব মোটাসোটা হলে আমরা খুশী
হতাম। এখন সুস্থ শিশু বেশী মোটা হবে
তা কেউ আশা করে না। বর্তমান তৈল-
সংকট তেল সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা
অসতর্ক করেছে। তার উপর ভেজালের
ঢালাও সম্ভাবনা রয়েছে। তেল সম্বন্ধে
বিচার করবার অবকাশ কম। এইটুকু
সৌভাগ্য যে বেশী খাবার উপায় নেই!
তাতে মনে দুঃখ হয় বটে, তবে এরও একটা
ভাল দিক দেখুন। বিনা চেষ্টায় হৃদ্‌রোগের
ভয় কমে যাচ্ছে! অবশ্য যদি চিন্তায়
হৃৎপিণ্ড ধুকপুক না করে।

টুকিটাকি

সাধারণ সর্দিলাগা বা 'কমন কোল্ড'-এর
কোন ওষুধ আজও মেলেনি। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ
হাঁচি আর খক্ খক্ কাসি ইতিহাসের
প্রথম অধ্যায় থেকে মানুষকে কাবু করেছে।
কত রকম প্রক্রিয়ার প্রয়োগ
হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ
বা বলেছে ঠেসে খেলে সর্দি সারে।
অবশ্য জ্বর থাকলে উপোস! কত
আরক, বনাপসা, পাঁচন, গাছগাছড়া সিদ্ধ,
আদা-তুলসীপাতা আমরা খেয়েছি, তবু
কারও বা সহজে সেরেছে আবার কারও বা
ক'দিন হেঁচে কেসে কেটেছে।

যে জীবাণু থেকে সর্দি হয় তা আক্রমণ
করার তিন দিন পরও আপনার সর্দি হতে
পারে। আপনি হয়তো জানতে পারবেন না
কবে কোথায় ছোঁয়াচটি লেগেছে। আক্রান্ত
ব্যক্তির হাঁচি কাসি থেকে বেশ দূরে পর্যন্ত
ছোঁয়াচ লাগতে পারে। পানীয় জলের পাত্র,
তোয়ালে, রুমাল যদি জীবাণুভরা থাকে তার
ব্যবহারেও সর্দি লাগে। শীতকালে সর্দি
এবং তার নানা কষ্টকর উপসর্গ ও ফলাফল

থেকে অন্তত কিছুটা অব্যাহতি [illegible]
কয়েকটি কথা মনে রাখবেন।

১। মুখচুম্বন থেকে ছোঁয়াচ [illegible]
আসে। আক্রান্ত ব্যক্তি যেন বিশেষ করে
শিশুদের মুখচুম্বন না করেন।

২। হাঁচি-কাসির সময় সাবধান না হলে
বেশ দূরে পর্যন্ত জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে
পারে।

৩। দিনে বেশ কয়েকবার হাত ধোবেন।
বিশেষ করে খাবার আগে হাত পরিষ্কার
করে ধুয়ে নেবার অভ্যাস বাচ্চাদের করানো
দরকার।

৪। সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে
থাকবেন। তার ব্যবহৃত কোন জিনিস
ব্যবহার করবেন না। তার গলা ও নাকে
অসংখ্য সর্দির জীবাণু গিজগিজ করছে।
সর্দি লাগার প্রথম দিকটাই সংক্রমণের
প্রশস্ত কাল।

৫। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখা সবচেয়ে
বেশী প্রয়োজন। হাজার চেষ্টা করেও
সংক্রমণ আটকানো সব সময় সম্ভব হয় না।
কাজেই প্রতিষেধক ক্ষমতা মজুদ থাকলে
সেটাই সবচেয়ে বেশী রোগনিবারক। ঠান্ডা
লাগানো, পা ভিজে রাখা এবং ক্লান্তি থেকে
সতর্ক হবেন। সুষম খাদ্য গ্রহণ করবেন।
অতিভোজন বা গুরুপাক আহার থেকে
বিরত থাকবেন। বিশেষ যে সময় চারদিকে
সর্দি-কাসির মহামারী চলে তখন সাবধান
হওয়া দরকার।

*

পরিমার্জিত, সূক্ষ্ম, মিহি খাদ্য তথা-
কথিত সভ্যতার দান। এতদিন পরে আঁশ
ও তন্তুযুক্ত মোটা খাবারের গুণের প্রতি
পুষ্টিবিশেষজ্ঞের নজর পড়েছে। উন্নতির
পথে অগ্রসর হতে হলে যে সাদা ময়দা বা
পালিশ করা চাল সহায়ক নয় তা [illegible]
দেখলাম। কাজেই—

(১) সাদা ময়দা না খেয়ে লাল আটা
খান। তারও ভুষি বেশী ফেলবেন না।

(২) চিনি বা মিষ্টি যথাসাধ্য [illegible]
দিন। মেঠাই মণ্ডার লোভ যতটা [illegible]
সম্বরণ করা যায় তত ভাল।

(৩) আঁশ বা তন্তুবিশিষ্ট খাদ্য [illegible]
খাবেন। খাদ্যের স্থূল বা অসার [illegible]
মূল্য অনেক। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের একটি
বড় কারণ যথেষ্ট মোটা ও তন্তুবিশিষ্ট
খাবার না খাওয়া। আফ্রিকা দেশের অভ্যন্তরে
মোটা খাবার যাঁরা খান তাঁদের পেট বেশ
ভালভাবে পরিষ্কার হতে যা সময় লাগে,
ব্রিটেনে সভ্য মানুষের মার্জিত খাদ্য খেয়ে
যাঁরা থাকেন তাঁদের তার [illegible] সময়
লাগে।

যাঁরা স্থূলত্বের জন্য নানা উপায় অব-
লম্বন করে মেদভার কমাতে চান, তাঁদের
জন্য 'ফাইবার-কনটেনট' অর্থাৎ আঁশযুক্ত
মোটা আনাজ খাওয়া দরকার। বৃহদন্ত্রের
ক্রিয়া মোটা খাদ্যে ভাল হয়। খাদ্য গ্রহণের

যন্ত্রটা অন্ত্রে আত্মভূত করা অর্থাৎ শুষে নেওয়া উচিত নয় সেই ক্রিয়া পেট পরিষ্কার হওয়ার দেরি হলে বাধা পায়।

মিষ্টি শর্করাজাতীয় খাদ্য, মেঠাই ইত্যাদি বেশী পাওয়া ও সেজন্য বেশী খাওয়ার ফলে বহুমূত্র রোগ সভ্য সমাজ, বিশেষ করে সচ্ছল সভ্য সমাজের একচেটিয়া রোগে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে হৃদ্‌রোগও সভ্য সমাজের খাদ্য থেকে কিছুটা হতে পারে। 'ফাইবার ডেফিসিয়েন্ট' মিহি মুখ-রোচক উপাদেয় খাদ্যসম্ভার নাকি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের কারণও হয়। ব্যাপক হিসাব করে ধরা পড়েছে যে, মোটা খাদ্য যারা খায় তাদের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগ কম হয়।

শিম্বিগোত্র খাদ্যে (যেমন মটর, বিন প্রভৃতি) যে আঁশ থাকে এবং ফলাক উদ্ভিজ্জমূলে বা কন্দে (যেমন আলু, কচু) 'ফাইবার' থাকে তা শাকসব্জীর ফাইবা এমন কি ফলের 'ফাইবার' থেকে উপকার কাজেই 'ফাইবার' বা তন্তুযুক্ত আহার জন্য কোন মহার্ঘ খাদ্যের সন্ধানে যাব দরকার হয় না।

শ্রীমত

ভারতের অর্থনীতি

কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি নিখিল ভারত শ্রম-অর্থনীতি সম্মেলন (All India Labour Economics Conferne) সভাপতির ভাষণে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং বিশিষ্ট অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা (Emplyment Oriented Planning) সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। যেসব দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমিক রয়ে গেছে সেগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ হল কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা। মজুরী-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য ব্যবস্থা হল, প্রকৃত মজুরি (real wage) স্থির থাকলে আর্থিক মজুরির স্তর কমিয়ে কাজের সুযোগ আরও বাড়িয়ে দেওয়া, অপর একটি ব্যবস্থা হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের অনুপাতে শ্রমের অনুপাত বাড়িয়ে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রথম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট মজুরি-নীতি নির্ধারণ করা দরকার। দ্বিতীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতির নির্বাচন (choice of technique) সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। উৎপাদন পদ্ধতির নির্বাচন সম্পর্কে বিগত কুড়ি বছর ধরে অনেক অনুশীলন হয়েছে। কোন দেশের মূলধন-সৃষ্টির হার উৎপাদিত সামগ্রী এবং উৎপাদন-পদ্ধতির নির্বাচনের উপর যে নির্ভরশীল তা-ও পরিলক্ষিত হয়েছে। ফেলডম্যান (Feldman) এবং মহলানবীশ (Mahalanobis) প্রদত্ত মডেলে দেখানো হয়েছে যে, যদি বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে বেশি করে মূলধন সামগ্রী উৎপাদন করার দিকে চালিত হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পর কর্মসংস্থানের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। উৎপাদন পদ্ধতির নির্বাচন প্রসঙ্গেও ডব্ (Dobb) অমর্ত্য সেন, মার্গলিন (Marglin) প্রমুখ অর্থ বিজ্ঞানীগণ প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত নির্বাচন (technological choices) এবং সঞ্চয়-হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনুশীলন করেছেন। এক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে যে একমাত্র দৃষ্টিক্ষীণতার ক্ষেত্রেই কেউ জোর করে বলতে পারেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত। কর্মসংস্থান নীতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল আজকের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক চক্রবর্তী কয়েকটি প্রচলিত যুক্তির উল্লেখ করেছেন যেগুলির প্রকৃত যাচাই হওয়া দরকার। প্রথম যুক্তি হল, যেসব উন্নতিকামী দেশ উন্নত দেশগুলির অনুসরণে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করছে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম মূলধন-নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে বর্তমানে প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত যে-ব্যবস্থা চালু আছে তার চেয়েও অনেক বেশি প্রযুক্তি বিদ্যাগত সম্ভাবনা সেক্ষেত্রগুলিতে নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই যুক্তি প্রায়ই শোনা যায় যে শ্রম-বহুল দেশগুলির উচিত শ্রম-নিবিড় (Labour-intensive) সামগ্রী উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সেগুলির বিপক্ষে বেশি মূলধন-সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা। তৃতীয়ত, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সীমায়িত আবিষ্টকর ক্ষমতা (absorptive capacity) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। চতুর্থত, মিরড্যালের যুক্তি অনুযায়ী শ্রমের উৎপাদনী শক্তিই মজুরির স্তরের উপর নির্ভরশীল। সবশেষে, অনেকে বিশ্বাস করেন, সরকারী আয়-ব্যয় নীতি উৎপাদন পদ্ধতির নির্বাচনকে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় সৃষ্টি থেকে আলাদা রাখতে পারে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির কোনটিই নতুন নয়। একমাত্র তৃতীয় যুক্তিটি, যে যুক্তিটি রোজা লুক্সেমবার্গ (Rosa Luxemburg) তাঁর The Accumulation of Capital বইয়ে উল্লেখ করেছেন, কিছুটা নতুন মনে হতে পারে যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাশিয়ায় এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছিল এবং পরে অন্যান্যদের মধ্যে লেনিন ও টুগান-বারানোস্কিও এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে প্রথম যুক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, যদি প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত দক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়, তবে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না হলে (Other things remaining the same) আমাদের উচিত শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা। তবে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন; কেননা অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অথবা না থাকা বহুলাংশে সরকারী রাজস্ব নীতির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রে ধারণাগত অসুবিধার (Conceptual difficulty) সৃষ্টি হতে পারে। কারণ দ্ব্যর্থহীনভাবে কোন সামগ্রীকে মূলধন-নিবিড় (Capital-intensive) অথবা শ্রম-নিবিড় (Labour-intensive) বলা সর্বদা সম্ভব নয়। যেমন, খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন মূলধন-নিবিড় ও শ্রম-নিবিড় উভয় পদ্ধতির মাধ্যমেই হতে পারে। তৃতীয় যুক্তিটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতেও কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে, এ-দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হল দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা। যদি ভারতের পক্ষে এই যুক্তি ঠিক হয়ে থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হার বৃদ্ধি ও আয়ের আরও অপেক্ষাকৃত বণ্টনের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে তা আরও জোরদার হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আরও কর্মসংস্থান আয়ের আরও অপেক্ষাকৃত ভাল বণ্টন সুনিশ্চিত করবে ততক্ষণ কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ সরকারী নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে

স্বীকৃতি পাবে। তবে যাঁরা কর্মে নিযুক্ত আছেন তাঁদের মজুরি বাড়িয়ে অথবা যে-সব এলাকা বেশি শ্রম-নির্ভর নয় সেগুলিতে যতদূর প্রয়োজন বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে এই যুক্তির যথার্থতা মেনে নেওয়া যেতে পারে। চতুর্থ যুক্তি অনুযায়ী যদি সমাজ-সেবার কাজ আরও বাড়িয়েও খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো যায়, তবে আমরা আশা করতে পারি যে সেক্ষেত্রে শ্রমের মান উন্নত হবে এবং মূলধন-বিনিয়োগ না বাড়িয়েও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। সর্বশেষে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি একটি সুদক্ষ কর-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবে আমাদের একাধিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে আমরা আরও এক-ধাপ এগিয়ে যাব।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির উল্লেখ অধ্যাপক চক্রবর্তী কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন সম্পর্কে ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সমীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারতের বেকার সমস্যার উল্লেখ করে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, যখন ভারতের প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল তখন ১৯৫১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে ১·২৫ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়বে বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকে জনসংখ্যা বেড়েছিল বাৎসরিক ২. শতাংশ হারে। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় জন্মহার কমে যাবে বলে যে ধারণা করা হয়েছে তা যদি ঠিকও হয় তবুও ১৯৭ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে আর সাড়ে ছয় কোটি লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। শুধু চাকুরির খাতিরে চাকুরি সৃষ্টি করার জন্য যে জরুরী কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে তার পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তি জোরালো নয়। কারণ, আমাদের ভোগ্য সামগ্রী শিল্পগুলিতে অতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি খুবই কম, এবং মাথাপিছু খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহও প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল রয়েছে। অথচ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরী প্রয়োজন—তবে এই সম্প্রসারণ এমনভাবে করতে হবে যেন তার ফলে দেশের মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ে। সেজন্য প্রয়োজন হল বিনিয়োগের; তাছাড়া দেশের মোট ভোগেরও পুনর্বণ্টন প্রয়োজন। বর্তমানে ভোগসামগ্রী শিল্পগুলিতে শ্রমের উৎপাদনী শক্তির ভিত্তিতে যতটা কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা সম্ভব, তার চেয়েও বেশি করা যেতে পারে আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে। তবে এ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জনাও সরকারী আয়-ব্যয় নীতির যথাযথ সংস্কার প্রয়োজন। সরকারী রাজস্ব নীতির [illegible] ছাড়া বিনিয়োগ-প্রকল্পগুলির অর্থ সংস্থান করা সম্ভব হবে না। কৃষিক্ষেত্রেও আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়ে গেছে। গ্রামে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের হাতে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বা উপাদান (inputs) ও মূলধন পৌঁছে দেওয়ার উপর কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের সাফল্য নির্ভরশীল। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ভূমি সংস্কারের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে জড়িত। দেশে মূলধন সৃষ্টির হার আরও বাড়াবার জন্য মজুরি-বহির্ভূত আয় যতটা বেশি সঞ্চয় করা যায় তার চেষ্টা চালানো দরকার; তাছাড়া কর-ব্যবস্থার সংস্কার এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। দেশের কর্ম-সংস্থান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক চক্রবর্তীর সুচিন্তিত অভিমত বিশেষভাবে ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সুব্রত গুপ্ত

আলোচনা

ামাদের খাদ্যনীতির ত্রুটি কোথায় ?

দেশ ২৪ সেপ্টেম্বর 'ভারতের অর্থ-ীতি' বিভাগে খাদ্যনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ২৮ ডিসেম্বর ালোচনা বিভাগে বীরেশ্বর বসু মহাশয়ের ত্রটি পড়ে সরকারের খাদ্যনীতি ব্যর্থতার ারণ অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বশ্লেষণ করে মনে হল, আমাদের জাতীয় রিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য [এবং দুর্ভাগ্য] াই যে, সমাজ ও প্রশাসনে সর্বত্রই রাজ-ীতিবিদদের প্রভাব ও আধিপত্য বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেচে যে অর্থনীতি-বষয়ক সিদ্ধান্তগুলি সুদৃঢ় ও স্বীকৃত র্থনীতিকতত্ত্বের উপর ভিত্তি না করে তা াস্তব পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কহীন রাজনীতিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত য়ে গ্রহণ করা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি ও সংগ্রহ মূল্য সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে নূতন দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল রাখার পক্ষে যথাক্রমে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি রাজ্যগুলি পরস্পর যে মত প্রকাশ করেছে তা রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথা বিষয়টি অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়নি।

পঞ্চাশ লক্ষ টন চাল ও পনের লক্ষ টন মোটাদানা শস্য সংগ্রহের জন্য কৃষি মূল্য কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন তাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রক প্রকারান্তরে এই কথাই স্বীকার করেছেন যে, কমিশন নির্ধারিত ৭৪ টাকা কুইনটাল ধানের সংগ্রহ মূল্য, যা গত বছরের তুলনায় মাত্র ৪ টাকা বেশী, তা বাস্তববর্জিত এবং উৎপাদন ব্যয় ও বাজার দরের সাথে সম্পর্কহীন। আবার এই ঘোষণায় পরোক্ষে একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে গত বছরের তুলনায় এ বছরে খারিফ শস্যের মোট উৎপাদন কম। অধিকন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ খরা ও বন্যায় চাষীদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার বিষয়টিও কমিশন হিসাবের মধ্যে ধরেননি।

এই সাথে আরও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৯·৯ কোটি টন এবং ৭০-৭১ সালে ১০·৭ কোটি টন, সেখানে ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরি-বর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে তা হ্রাস পেয়ে ৭১-৭২ সালে হয় ১০·৫ কোটি টন এবং ৭২-৭৩ সালে মাত্র ৯·৫ কোটি টন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন জন-সংখ্যাও যথারীতি ২·৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ প্রতি বছর দেশকে সওয়া এক কোটি নূতন মুখের আহার যোগানোর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। স্পষ্টতই মোট যোগান ও চাহিদার মধ্যে ফারাক ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অর্থনীতি শাস্ত্র অনুযায়ী মূল্য উর্ধ্বমুখী হয়। আবার চাষীকে সার, সেচ, শস্যদানা, লাঙ্গল, মজুর প্রভৃতির জন্য শেষ পর্যন্ত যে মূল্য দিতে হয়, কমিশন মূল্য নির্ধারণের সময় সে হিসাবটিও ধরেননি। একথা এখন বোধ হয় অবিদিত নয় যে, কমিশন কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের নির্ধারণে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ছিলেন। আর এখানেই হয়েছিল গলদ, কারণ কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। ভুললে চলবে না যে আমাদের দেশে খাদ্য-শস্যের ফলন প্রধানত প্রকৃতি নির্ভরশীল। লোকসান ও শস্য বরবাদের সম্ভাবনা সেখানে অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, বিগত কয়েক বছরে ট্রাক্টরের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৮০ শতাংশ, পাম্প ও যন্ত্রপাতি ৬৫ শতাংশ, সার ১২৫ শতাংশ, মজুর ১১০ শতাংশ [অতি সম্প্রতি খেত মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরী ৮ টাকা করার দাবি উঠেছে] এবং জ্বালানি ১৩০ শতাংশ [সেপ্টেম্বর '৭৪-এ জ্বালানির মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে]। এই পরিসংখ্যান পাইকারী মূল্যের। খুচরা বাজারে এই বৃদ্ধি আরও অনেক বেশী। আবার ১৯৭৩ সালে যাবতীয় পণ্যের গড় পাইকারী মূল্যসূচক [CPI] বৃদ্ধি পেয়েছিল ২২ শতাংশ এবং '৭৪-এর প্রথম আট মাসে গড়ে ৩৬ শতাংশ। এ হিসাবও পাইকারী এবং খুচরা বাজারের—এই বৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে চাষীকেও এই অগ্নিমূল্য দিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য যথা খাদ্য, বস্ত্র, কয়লা, ওষুধ, বই ইত্যাদি কিনতে হয়। তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে চাষ। তাঁর না আছে কোন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসন অথবা বোনাস। পান না তিনি মূল্যসূচকের বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিক হারে মাগগীভাতা। অথবা না আছে কম মূল্যে খাদ্য ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কোন সরকারী বাধ্যতা। কিন্তু সরকার স্বরচিত আইনের ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও বাজারের অর্ধেক দামে তাঁর উপর লেভি প্রয়োগ করতে একটুও পেছপা নন। স্বভাবতই চাষী নিজের পরিবারবর্গ ও ভবিষ্যৎ দায়-দায়িত্বের জন্য চিন্তিত। তাই রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফসল ছাড়তে নারাজ। আবার চালের অলাভজনক সংগ্রহ মূল্য যে কোন 'প্রগতিশীল' চাষীর নিরুৎসাহের কারণ হতে পারে। ফলে তিনি অন্য কোন বেশী লাভজনক শস্য চাষ করলে খাদ্য-শস্যের মোট উৎপাদন হ্রাস পেতেও পারে।

আমাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে দেশের মোট জনসংখ্যার খুব বেশী

হলে মাত্র ১০ শতাংশ লোক পূর্ণ রেশন ব্যবস্থার আওতায় বাস করে। এদের ক্রয়-ক্ষমতা বেশী বলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সরকার দয়ারপরবশ হয়ে ভরতুকী দেওয়া হ্রাস মূল্যে চাল গম ও চিনির সবটাই এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কেন কিছু পরিমাণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। অপরপক্ষে অবশিষ্ট ৯০ শতাংশকে খোলা বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় প্রায় পুরোপুরি কারণ আংশিক রেশনে সারা বছরে ৫২ সপ্তাহের বড় জোর ৫-৭ সপ্তাহ চাল দেওয়া হয়। আর তার পরিমাণ এতই কম যে বড়জোর তা দিয়ে সারা সপ্তাহে একদিন একবেলা হয়। গম সরবরাহের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। অর্থাৎ যে পরিমাণ গম দেওয়া হয় তাতে সপ্তাহে বড়জোর তিনবেলা হয়। আবার এই ৯০ শতাংশের অধিকাংশই গরীব এবং ৭৫ শতাংশ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে। সরকার কি জানাবেন, এই শহরবাসীদের যাঁরা লাখ ও কোটিপতি এবং যে সব কর্মচারী মাসে হাজার হাজার টাকা বেতন পান তাঁদেরকে ভরতুকী দেওয়া হ্রাসমূল্যে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করার কী সামাজিক যুক্তি আছে! এঁরা অনায়াসেই খোলা বাজারের দাম দিতে পারেন। আবার যখন কোন শ্রমিক কর্মচারী যাঁর মাসিক আয় ১০০—১৫০ টাকা, তিনি দেখেন যে তাঁর মালিক যিনি গাড়ী-বাড়ীসহ টাকার উপর গড়াগড়ি দিতে পারেন—তিনিও রেশনের দোকানে সস্তা দরের সমান সুযোগ নিচ্ছেন, তখনই বা যুক্তি কোথায়? এর নাম সমাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র তো নয়ই। এ হল গরীবশোষণ ও বড়লোক-তোষণতন্ত্র! এ গরীবি হটাও নয়, এ গরীব হটাও। আর এই নীতির জয়গানে আজ দিল্লি থেকে মহাকরণ পর্যন্ত ঢাক পেটান হচ্ছে। দিল্লির মসনদে অথবা মহাকরণের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে গ্রামের মানুষের দুর্গতি সম্পর্কে সান্ত্বনা জানান ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকারের আজ উচিত অল্প-বেতনের যাবতীয় শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য ভরতুকী মূল্যে এবং সেই সাথে মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনের এখনই ব্যবস্থা করা। আরও উচিত সংসারে নির্ভরশীল প্রত্যেকের মাথা-পিছু ২০০ টাকা বেশী আয়ের সমস্ত কর্মচারী এবং ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের রেশন সরবরাহের আওতা থেকে বাদ দেওয়া।

সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে বলে যে যুক্তি দেখান হয় তা শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। '৭৪ সালের খাদ্যশস্যের মূল্য পূর্বেকার যাবতীয় রেকর্ডকে অতিক্রম করেছে, তার কারণ হিসাবে গত বছরের খারিফ শস্যের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধিকে অবশ্যই দায়ী করা যায় না। স্পষ্টতই, খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এক অবিচ্ছিন্ন এবং দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তথা কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ এক স্বাভাবিক সূত্রে বাঁধা। অর্থাৎ একের মূল্যবৃদ্ধি অপরকে প্রভাবিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, চাষীর জীবিকা-নির্বাহের ব্যয়ের উপর খাদ্যশস্যের মূল্য অনেকখানি নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গত বছরে নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের মূল্য মার্চ ও জুলাই এই দুই বাজেটে একুনে প্রায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যে চাষী তাকেও কাপড় কিনতে হয়। সুতরাং যদি খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্য আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না করা হয় তখন চাষী যাবে কোথায়? আবার সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করলে তার প্রভাব যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় তার উপরেই পড়ে। আমাদের দেশে মোট যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তার দশ শতাংশেরও কম রেশনের দোকান মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সংগ্রহ করা হয়। এবং যে মূল্যে এই পরিমাণ শস্য বিক্রয় করা হয় তা খোলাবাজারের মূল্যকে আদৌ প্রভাবিত করে না। আবার এই সংগ্রহের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার যত নিচে থাকবে তার প্রভাবও তত কম হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় ৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশ চাল সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু খোলা-বাজারের দাম সংগ্রহমূল্য কম থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ ছিল। সুতরাং বাজারে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য-সূচক গভীরভাবে বিবেচনা করে তবেই খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা উচিত। আবার এই মূল্য-সূচক বহুলাংশে সরকারী অর্থনীতি তথা করনীতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকার যখন বিভিন্ন কর ও শুল্কের পরিমাণ পৌনঃপুনিক হারে বৃদ্ধি করে চলেছেন এবং যার ফলে গত আট মাসে দ্রব্যমূল্য অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন বর্তমান সংগ্রহমূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার চেষ্টা দুরাশা নয় কি? মিসা প্রয়োগ করলেও সফল হবে না।

অর্থনীতিশাস্ত্র অনুযায়ী কোন পণ্যের মূল্য যোগান ও চাহিদার দ্বারাও নির্ণীত হয়। যোগানের চেয়ে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে মূল্য স্বভাবতই ঊর্ধ্বমুখী হয়। সরকার যখন নিয়ন্ত্রণ চালু করে এবং লেভি তথা উৎপাদন ব্যয়ের কমমূল্যে ও বাজারের অর্ধেক মূল্যে বলপূর্বক সংগ্রহ করে মূল্য কম রাখার চেষ্টা করেন তখন বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা চাষীকে শস্য মজুত করে তা বাজারে সরবরাহের ঘাটতির সময়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করে। কারণ, এই লোকসানের পয়সা তাকে উশুল করতেই হবে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতিই চাষীকে প্রাণধারণের জন্য অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। বিগত এক দশকের বেশী এই এক অবস্থা চলে আসছে। আমেরিকা থেকে হ্রাসমূল্যে কোটি কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি করে এবং ভরতুকী দিয়ে বাজারের চেয়ে অনেক কম মূল্যে সরবরাহ করে সরকার দীর্ঘদিন রেশন ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। একটিবারও ভেবে দেখা হয়নি যে রেশনের দোকানে যে মূল্য ধার্য করা হয় তা বাজারের চেয়ে কত কম এবং উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সম্পর্কহীন।

সরকারের এই অবাস্তব নীতির আর এক উদাহরণ হচ্ছে গম ব্যবসায়ীদের উপর লেভি তথা তাঁদের সংগ্রহের অর্ধেক পরিমাণ সরকারকে ১০৫ টাকা কুইনটাল দরে দেওয়া বাধ্যবাধকতা। এই ব্যবসায়ীরা চাষীদের কাছ থেকে ১৫০—১৮০ টাকা দরে গম কেনেন। এখন অর্ধেক পরিমাণ সরকারকে ১০৫ টাকা দরে দেওয়ার অর্থ বাকি অর্ধেকটা ৪৫-৭৫ টাকা বেশী দরে বিক্রয় করতে বাধ্য করা। এখানেও মজা এই যে, শহরবাসীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় গমের সবটাই রেশন থেকে পাওয়ায় এই 'লেভি-মুক্ত' গমের সবটাই গ্রাম ও মফঃস্বলবাসীদের কাছে অর্থাৎ যারা প্রয়োজনীয় গমের ১০ শতাংশও রেশনে পান না—তাঁদেরকে বিক্রয় করা হয় খুশিমত মূল্যে। এও সেই গরীব মারার নীতি যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গরীবি হটাও'।

মুদ্রাস্ফীতির প্রাথমিক কারণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। মুদ্রাস্ফীতি খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতির একটি কারণ মাত্র, তার ফল নয়।

বর্তমান অর্থনীতিক সংকটের প্রধান কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতিজনক অর্থনীতি। ১৯৭১-৭২ সালে যে পাঁচ বছর শেষ হয় সেখানে জাতীয় আয়ের গড় বৃদ্ধি ছিল ৪·৭ শতাংশ, কিন্তু অর্থ যোগানের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় বার্ষিক ১২·৬ শতাংশ ; অর্থাৎ প্রায় ৮ শতাংশ বেশী। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭১ সালের পর বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর থেকে জাতীয় আয় ও অর্থ যোগানের মধ্যে ফারাক বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে জাতীয় আয় ১·৭ শতাংশ কমে যায়, কিন্তু অর্থ যোগানের গড় হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৫·৬ শতাংশ হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে জাতীয় আয় গড়ে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও অর্থ যোগান বৃদ্ধি পায় ১৯·৬ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে প্রথম ছ' মাসে অর্থ যোগানের হার আগের বছরের সেই সময়ের তুলনায় বেশী ছিল গড়ে ১৭·১ শতাংশ। বর্তমান আর্থিক বছরে জাতীয় আয় ৩ শতাংশের বেশী হবে না বলে অনুমান করা হচ্ছে, যদিও অর্থ যোগানের গড় হার প্রায় ১৪·৬ শতাংশ দাঁড়াবে। অধিক কি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘাটতি বাজেট ৬৫৬ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। সুতরাং এইরকম একটানা ঘাটতি খরচের পরিপ্রেক্ষিতে কোনরকম আইনগত ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারবে না। আমাদের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে ঘাটতি অর্থনীতি—পণ্যের ঘাটতি নয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য স্টেট ট্রেডিং, জাতীয়করণ প্রভৃতি যে সব 'প্রগতিশীল ব্যবস্থার' কথা সরকার প্রায়ই বলে থাকেন তা শূন্যগর্ভমাত্র।

খোলাবাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে ধান ও গমের সংগ্রহমূল্য ন্যায্যভাবে বৃদ্ধি করে একটি 'বাফার স্টক' গড়ে তোলা এবং রেশনের দোকান মারফত সরবরাহের মূল্যও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণের হার বৃদ্ধি করা তথা খোলাবাজারের উপর জনসাধারণের পুরোপুরি নির্ভরতাকে কমিয়ে আনা। এর ফলে শস্য বোনার ঋতুতে অর্থাৎ যখন খাদ্যশস্যের মূল্য সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় তখন ব্যবসাদারদের সবরকম 'স্পেকুলেশান' ও মজুতদারী বানচাল করার জন্য সরকার যথেষ্ট পরিমান খাদ্যশস্য বাজারে ছেড়ে চাল ও গমের মূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পারবেন। ন্যায্য সংগ্রহমূল্য ও রেশনের দোকানে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমান নিয়েও বিতর্ক থাকা উচিত নয়। এ কথা কেউ দাবি করছে না যে সংগ্রহমূল্য খোলাবাজারের দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। এ ব্যাপারে চাষীদের অভিযোগ অর্থাৎ বর্তমান সংগ্রহমূল্য অলাভজনক তা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা উচিত। আর রেশনে সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য প্রথম শস্য ওঠার সময়ে যে মূল্য বাজারে থাকে অর্থাৎ যখন সবচেয়ে কম—তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত হবে। খাদ্যশস্যের মূল্যে ভরতুকী দিয়ে সরকার সাধারণ মূল্যরেখা কখনই নিম্নমুখী রাখতে পারবেন না, কারণ মূল্যরেখা পূর্ববর্ণিত নানা কারণ দ্বারা নির্ণীত হয়। অপরপক্ষে লেভির পরিবর্তে সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করলে সংগ্রহের পরিমানও বৃদ্ধি পাবে এবং মজুতদারী ও মুনাফাবাজীর সুযোগও সীমায়িত হবে। অধিকন্তু, এই ব্যবস্থায় লক্ষ টন পিছু আমদানির জন্য ১৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার খরচ থেকেও নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক গরীব হটাও সরকার অর্থনীতির এই সরল তত্বটি কী একবার ভেবে দেখবেন ?

অমল চট্টোপাধ্যায়
বারুইপুর

কবিপত্নী মৃণালিনী

'দেশ', ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ (পৃঃ ৭০০) শিলিগুড়ির শ্রী দেবেন মজুমদার মহাশয়ের ...'বিংশ শতাব্দীর বর্তমান যুগে রবীন্দ্র-জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচণ্ড গবেষণা চলছে' যখন তখন 'রবীন্দ্র-জীবন-প্রবাহের' 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনারও স্পষ্ট বিশ্লেষণ প্রয়োজন, এটি 'দেশের' পাঠকবর্গেরই ইচ্ছা নয় শুধু, সম্ভবত সমগ্র গবেষকবৃন্দেরও। আমাদের ভাগ্যক্রমে এবং 'দেশের' সহৃদয় আতিথেয়তায় আমরা যে মিলতে পেরেছি এবং এই মূল্যবান আলোচনার প্রেক্ষিতে সত্য উদ্ধার হ'লে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনীকারগণ যে নিতান্তই উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য। আমার ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৪ (পৃঃ ২১৯-২২১) এর আলোচনায় বিবাহ কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর ৭ মাস ২ দিন (রবীন্দ্র-ভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য প্রাগুক্ত শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও যার যথার্থতা পাওয়া গেল) এবং বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (মৃণালিনী দেবীর ভাইপো) প্রদত্ত, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলোচিত তথ্যানুসারে মৃণালিনী দেবীর বয়স ৯ বৎসর ৯ মাস ৮ দিন (গড়ে ৩০ দিনে মাস ধরে) বলে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর দেশ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ (পৃঃ ৪৫৩) আলোচনায় বিবাহ কালে পুনরায় কবিকে 'তেইশ' (?) ও কবিপত্নীকে 'দশ' (?) বছরের বলে মন্তব্য রেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মৈত্রেয়ী দেবীর একজন ভক্ত পাঠক এবং তাঁর অমূল্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থাদি, বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে বিশেষভাবেই সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে বিবাহকালে তাঁর বয়স ২২ (?) বৎসর বলেছেন, এবং শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' (পৃঃ ১৮৯-১৯০) গ্রন্থেও তা উদ্ধৃত। 'জীবনী' গ্রন্থে মৃণালিনী দেবীর বয়সও 'দশ-

এগারো' (?) বলা হয়েছে। বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতনের) সহ-গ্রন্থাগারিক এবং কবি বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭-১১-৭৪-এর এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, শ্রীরায়চৌধুরী... "বহু পূর্বে দক্ষিণ ডিহিতে গিয়ে তাঁদের বাড়ীর চিলে কোঠায় পুরানো জমিদারী খাতা থেকে মৃণালিনী দেবীর জন্মসময় ও তারিখ আকস্মিকভাবে পেয়ে লিখে আনেন...এখনো সেই খাতাপত্র আছে কিনা সন্দেহ। পূর্ণানন্দ তাঁর লেখাতে বীরেনবাবুর কাছ থেকে যে সময় তারিখ সব পেয়েছেন তাই ব্যবহার করেছেন. এটাই সঠিক বলে মেনে নেওয়া উচিত...।" 'সঠিক তারিখটি' চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হোক এই অভিলাষেই আমার ১৬ই নভেম্বরের পূর্বোক্ত আলোচনায় (পৃঃ ২২০) আমি 'হেমলতাদেবী এবং মৃণালিনী দেবীর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে' 'গবেষণা সম্মত' 'প্রামাণিক তথ্য' প্রার্থনা করেছিলাম। অন্তত হেমলতা দেবীর জন্ম তারিখ সম্বন্ধীয় প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গেলেও মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে অনেকটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে। পূর্ব হিসাবমতে হেমলতা দেবী ২ মাস-এর মত ছোট। বিগত ২২-২৩ ডিসেম্বর (১৯৭৪) কুষ্টিয়ায় 'লালন দ্বি-শত জন্ম বার্ষিকী উৎসবে' শরিক হতে গিয়ে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি কবিতীর্থ শিলাইদহ ও কুঠিবাড়ীও পরিদর্শন করে আসি। আমার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম বাংলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক রতন নন্দী প্রমুখ গবেষকবৃন্দ। কুঠি বাড়ীর বিভিন্ন কামরায় রবীন্দ্র-মৃণালিনীর বিভিন্ন সময়ের ফটো ইদানীং সযত্নে রক্ষিত। কিন্তু কোনটিতেই মৃণালিনী দেবীর জন্ম বা মৃত্যু দিবস উল্লিখিত নাই। স্থানীয় বর্ষীয়ান লোকদের কাছে (কখনও অন্যের মারফৎ শোনা) কবি ও কবিপত্নীর মধুর সংসার জীবনের ও অন্যান্য বহু তথ্য পাওয়া গেল. (ডক্টর তুষার কিছু কিছু টেপ করেও নিয়েছেন)। এই যেমন, কবিপত্নীর কুঠিবাড়ির কর্মচারী চাকর-মালীদের প্রতি মাতৃসুলভ দয়াদাক্ষিণ্য, এমনকি খাজনা মাপ, 'উনি-মানে কর্ত্রী-গিন্নী বলেছেন, এর উপর আর কথা কি'...স্বামীর বক্তব্য, খোকা-খুকীদের দস্যিপনায় নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা, কুঠিবাড়ির তেতলায় ঐতিহাসিক চিলে কোঠা, যেখান থেকে ছবির মত দেখা যায় উত্তালবিতল পদ্মা আর গোড়াই, বর্ষায় যা কূল ছাপিয়ে সমুদ্র হয়, দূরে ছবির মতো ভাসে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ আর পাবনা, যেখানে কবি সাহিত্য সাধনায় ধ্যানমগ্ন, 'তোমরা কেউ ওখানে যেওনা গো, উনি বিরক্ত হবেন', কবি-গিন্নীর বক্তব্য; সেই স্বামীর পংক্তিতে লেখা সম্ভব 'ধরাতলে দীনতম ঘরে যদি জন্মে প্রেয়সী আমার নদীতীরে. কোন এক গ্রাম-প্রান্তে'...শুনলাম স্ত্রীর মানা সত্ত্বেও কবীন্দ্র-রবীন্দ্র একবার এখানে চুষমাল, আখ এবং পাটের ব্যবসাও নাকি শুরু করেছিলেন কিন্তু ব্যবসা জমে নাই। এ ব্যবসা পরে স্ত্রীর দেশের আদরের চাকর যজ্ঞেশ্বরকে দেওয়া হয়, তার হাতে ব্যবসা জমে উঠলে 'ঝুলির অম্বল আর মুগির ডালের' বাঙাল দেশের স্ত্রী নাকি ঠাট্টা করতেন এ নিয়ে। উভয়ের দাম্পত্য জীবনের আরও বাস্তব চমৎকার চিত্র এঁকেছেন এই এস্টেটেরই প্রাক্তন কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, যাঁর নিবাস ছিল কুঠিবাড়ী থেকেই কয়েক কদম মাত্র দূরে। স্মৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধাই কি চন্দ্রশেখরের 'দেদীপ্যমান' কবিকে দ্বিতীয় সংসার গ্রহণে বিমুখ এবং মাতৃহারা সন্তানদের আরও বুকের কাছে জড়িয়ে ধরতে প্রলুব্ধ করে নাই? মৃণালিনী সম্বন্ধে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হল, স্বামী ও ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব ও বংশমর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ ও আস্থাবান। উভয়ের দাম্পত্য-জীবনে 'অসমবিবাহ' বা 'অশিক্ষিতা বালিকা' সুলভ কোন 'চ্যালেনজ' (প্রাগুক্ত, মৈত্রেয়ী দেবী) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও' উপলব্ধি করি না।

কুঠিবাড়িতে কবি পত্নীর বয়স সম্বন্ধে কোন কিছুই উদ্ধার করা গেল না। কুঠি বাড়ীর বহু মূল্যবান দলিলপত্র ভূত-পূর্ব নতুন মালিকগণই অযত্নে নষ্ট করে ফেলেছেন। এ সম্বন্ধে এখন কেউ কি আলোকপাত করে মৃণালিনী-জন্ম তারিখ—ধাঁধার নিরসন ঘটিয়ে পাঠক ও গবেষক-বৃন্দের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন? 'দেশ' ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ (পৃঃ ৬২৩) শান্তি-নিকেতনের রমা দেবীর সংশোধনীর জন্য ধন্যবাদ। বিষয়টি নিতান্তই মুদ্রণ প্রমাদ, টাইপ-কপিতেই তা' ঘটেছে।

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী
ঢাকা-৫।

জাতির নামে বজ্জাতি

গত ১৪ই ডিসেম্বর, সংখ্যা ৭ 'দেশ'-এ রঞ্জনের 'জাতির নামে বজ্জাতি' লেখাটির জন্যে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনেকদিন পর জাতির নামে বজ্জাতির উপর এমন তথ্যনিষ্ঠ স্পষ্ট ভাষণ শুনতে পেলাম। কে না জানে, আমরা (এবং বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘও) অবস্থা বিশেষে চোখ থেকেও দেখি না, কান থেকেও শুনি না!

তেল নিয়ে আরবীয় ঔদ্ধত্য কিংবা দুবাই বিমান বন্দরে হালফিলের ফিলিস্তিনি বর্বরতা যে কোন সভ্য মানুষকে শুধু লজ্জাই দিতো না, প্রতিবাদে মুখরও করে তুলতো। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? একক মানুষ হয়ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন মনে মনে কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র? সবাই নিজের নিজের বখরার পুঁটলি সামলে দিতে এই অন্যায় ও সন্ত্রাসী নগ্নউল্লাসে মৌনী। যে আরাফতী আন্দোলনের অগ্রংলিহ আস্ফালন নিরপরাধ মানুষের রক্তে তৃপ্ত,

সেই আরাফত কী করে রাষ্ট্রসংঘে বক্তৃতা দেয়, কী করে পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলি এবং তাদের তদানীন্তন নেতা স্বয়ং নাসের পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইস্রায়েলকে মুছে দেবার সদম্ভ ঘোষণায় মুখর হতে পারেন এবং পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র—ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক—এত বড় জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ এবং রাষ্ট্রবিদ্বেষ নির্বিচারে মেনে নেয় তাও কম বিস্ময়ের নয়।

আরব রাষ্ট্রে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য আমরা নানা সময়ে তাদের মনস্তুষ্টির কারণে ইস্রায়েলের নিন্দায় মুখর হয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছি কি? পাকিস্তানের সংগে ভারতের বিভিন্ন সংঘর্ষে, বাংলাদেশ-প্রশ্নে এবং তেলের রাজনীতিতে এ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার।

রঞ্জনকে ধন্যবাদ, তিনি একটি বহু পুরনো প্রশ্নকে প্রখর সত্যের আলোয় তুলে ধরেছেন। লাখ দুয়েক প্যালেস্টিনিয়ান উদ্বাস্তুর জন্যে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ যে অপরিমেয় দরদে উদারহস্ত, হায়, তার এক কণাও মেলেনি ইন্দো-পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্যে। রঞ্জন ঠিকই বলেছেন, ওরা লাট মাল। পড়ে থাক শিয়ালদহে বা করাচিতে। কিন্তু তাই বলে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্যে ইন্দিরার অশ্রুপাত কি বন্ধ থাকতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন এই, সত্যের সংগে এই চোখ ঠারাঠারি আর কতকাল চলবে, তথাকথিত সেকুলারিজমের ভূত আর কতকাল আমাদের মনুষ্যত্বকে বারংবার একটা বীর্যহীন, সত্যভাষণে পরাঙ্মুখ, ক্লীব রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এভাবে অপমানিত করবে?

অভিখ ভট্টাচার্য
বহরমপুর

ফরাসী শব্দের উচ্চারণ

শ্রীনন্দদুলাল সেন-এর (দেশ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৪) ব্যাখ্যার পর এ বিষয়ে অলমতিবিস্তরেণ। তবু শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায়ের অন্য কয়েকটি উক্তি এবং উচ্চারণ সম্পর্কে অনেকেই দ্বিমত হবেন মনে হয়, যথা—২৩শে নভেম্বর সংখ্যায়—"তাছাড়া, ফরাসী ভাষা সম্পর্কে সামান্য সচেতন থাকলে পত্রলেখক লিখতেন না, "ফরাসী ভাষায় শেষের "r"টি প্রায়ই উচ্চারিত হয় না।" আমার ত মনে হয় পত্রলেখক শ্রীরহমানের ঐ উক্তি পুরোপুরি ভুল নয়। বস্তুত, c, f, l, r ছাড়া অন্য সব পদের অন্ত্যোস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ অনুচ্চারিত থেকে যায়, কিন্তু বিতর্কিত 'r'ও যে সব সময় উচ্চারিত হবেই তাও নয়- যথা, parler (পার্লে, কথা বলা)। তাই বলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের "পেটি-কাফে-নোয়া" (দেশ, ৩০শে নভেম্বর) নয়, ওটি "নোয়ার" (noir) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। "মুখ চাই মুখ"-এর লেখক চন্দ্রবিন্দু সংযোগের ক্ষেত্রেও খুঁতখুঁতে সুবিচার দেখাচ্ছেন বলে মনে হয় না, যেমন—১৪ই ডিসেম্বর সংখ্যায়—"পাঁদ" নয় হবে পাদঁ" (pardon), "সান্তে" নয় হবে "সাঁতে" (sante)।

চিত্রা রায়
রাঁচী।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

(৪২ বর্ষ, সংখ্যা ৭, শনিবার ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮১) সংখ্যার "দেশে" পুণ্যলতা চক্রবর্তীর দেহান্তের সংবাদ ছাপা হয়েছে—লেখিকা লীলা মজুমদার।

"সুখলতা রাও সম্পর্কে আমার বড়দিদিমা। লেখিকা লীলা মজুমদার লিখেছেন, "সুখলতা রাওয়ের দুই কন্যা", কিন্তু তাঁর এক পুত্র "জিকু" তার কথা বোধহয় তিনি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এঁরা তিন বোন ও এক ভাই। মধ্যমা কন্যা "মণিকা" পিতামাতা বর্তমানেই মারা গেছেন।

নন্দিতা দাশগুপ্তা
পাটনা-৪

বিনোদন সংখ্যা

আমি শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি, দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ১৩৮১ সনের 'দেশ বিনোদন' সংখ্যায় এবারের জাতীয় সাঁতারে মহিলা বিভাগে যে তিনজন সফলকাম সাঁতারুর ছবি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আমার নাম যুক্ত ছবিটি প্রকৃতপক্ষে আমার ছবি নয়। আশা করি আপনারা ভ্রম সংশোধন করিবেন।

শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী

কলেরা চিকিৎসায় অভূতপূর্ব পদক্ষেপ

বিশ্ব বিজ্ঞান বিভাগে "কলেরা চিকিৎসায় অভূতপূর্ব পদক্ষেপ" শীর্ষক প্রবন্ধে গুরুতর তথ্যগত ভুল রয়েছে। কলেরা রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি কলেরা রোগীদের সেলাইনের পরিবর্তে লবণ ও শর্করার মিশ্রণ খাওয়ানো শুরু হয়েছে। বিস্ময়ের কথা, প্রবন্ধকার 'এ ধরনের উদ্যোগ পৃথিবীতে এই প্রথম' হিসেবে দাবী করেছেন। কলেরা রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টার নিশ্চয়ই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী নন। তিনি অবশ্যই অবগত আছেন যে এই ধরনের প্রচেষ্টা পঞ্চাশ দশক থেকেই চলছে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত মিশ্রণটির উদ্ভাবক ডাঃ নলিন (Nalin, D. R.) ও তাঁর সহকর্মীদের নিবন্ধ ১৯৬৮ সালে ল্যান্সেট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ডাঃ ক্যাশ (Cash, R. A.) ও তাঁর সহকর্মীরা কলেরা রোগীদের ওপর ব্যাপক হারে এটি প্রয়োগ করে সুফল পান। যে সমস্ত রোগী শক (Shock) অবস্থায় থাকে তাদের ক্ষেত্রে শিরাতে দ্রুত সেলাইন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শক অবস্থা অতিক্রান্ত হলে এদের ক্ষেত্রেও সেলাইন ইনজেকসানের প্রয়োজন থাকে না। অপরাপর রোগীদের মত এঁদেরও তখন লবণ ও শর্করার মিশ্রণ পান করিয়ে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। আমেরিকান জার্নাল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন পত্রিকায় ১৯৭০ সালে এই বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে (১৯৭৩) ডাঃ মহলানবীশ ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের মধ্যে কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীদের ওপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন। এঁদের অভিজ্ঞতা জনস হপকিনস মেডিক্যাল

...কার্যালয়ে লিপিবদ্ধ আছে। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানী লবণ ও শর্করায় মিশ্রণ রোগীদের পান করিয়েছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা মোটামুটি এক।

বোম্বাইয়ের হ্যাফকিন ইনস্টিটিউটের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে (১৩—১৫ মার্চ ১৯৭৪) কলেরা সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কলেরা রিসার্চ সেণ্টারের বর্তমান অধিকর্তা ডাঃ সুধীরচন্দ্র পালও উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ হার্সহর্ন (Hirschhorn, N.) এই একই প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 'ওরোসলের' উপাদান ও মাত্রা এই সভায় বর্ণিত মিশ্রণের উপাদান ও মাত্রার অনুরূপ। কলেরা রিসার্চ সেণ্টার এই বহু পরীক্ষিত মিশ্রণের বহুল প্রচারে উদ্যোগী হয়ে জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশান অ্যাণ্ড রিসার্চ
কলকাতা-২০
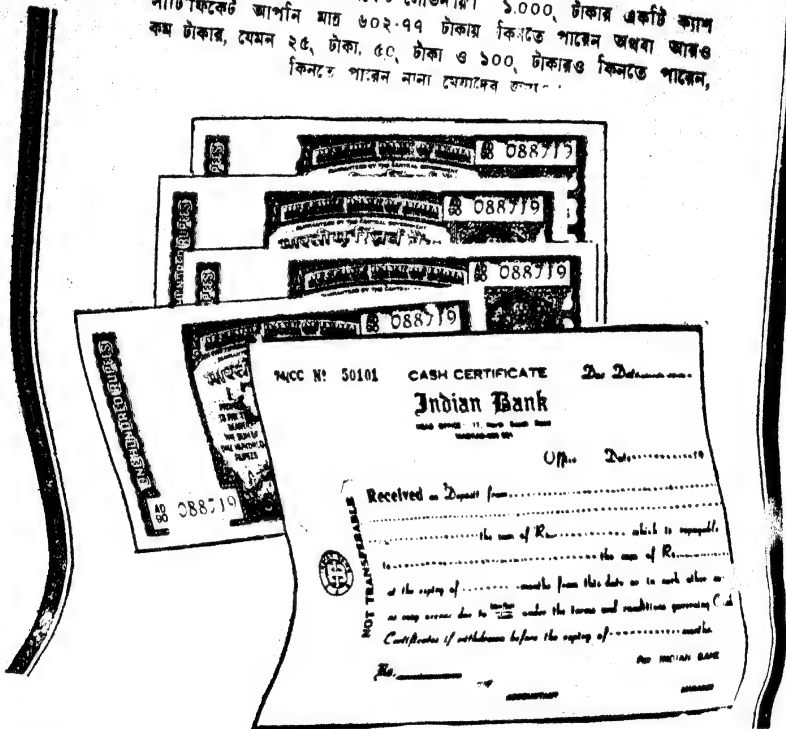
ত্রৈলোক্যনাথ

অনেক দিন চাপা পড়েছিলেন বসুমতী [illegible]রিজের হলদে মড়মড়ে কাগজের [illegible]থ্যাবলীতে, কিছুদিন ছিলেন অজ্ঞাতবাসে, [illegible]রপর হঠাৎ সম্প্রতি সোনার জল নাম [illegible]খা মলাটে, শক্ত বাঁধাইয়ে নতুন ত্রৈলোক্য-[illegible]থকে পেয়ে চমকিত খুশী হলাম। অনেক [illegible]ন আগে পড়েছিলাম, আবার আদ্যোপান্ত [illegible]ড়া যায়। শুধু পড়া নয়, এই বই নিয়ে [illegible]মি কয়েক দিন পথে পথে ঘুরেছি, ট্রামে-[illegible]বাসে একটু বসার জায়গা পেলেই বই খুলে ব'সেছি এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেই, দুপুরে খাবার সময়েও ত্রৈলোক্যনাথকে ছাড়া যায় না।

ত্রৈলোক্যনাথের নাম যতজন শুনেছে, ততজন তাঁর বই পড়েনি। অল্প বয়েসী অনেক পাঠককে প্রশ্ন ক'রেই আমি এ কথা জানতে পারি। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত সমালোচকরা ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি তেমন সুবিচার করেননি। তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেওয়া হয়নি। বস্তুত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতন বিচিত্র রসের লেখক আমাদের বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁকে ঠিক হাসির গল্প বা ব্যঙ্গ সাহিত্যের স্রষ্টা বললেও কিছুই বোঝা যায় না। এ রকম উদ্দাম কল্পনাশক্তি, কিংবা বলা যায় এরকম নির্লজ্জ কল্পনার প্রকাশ আর কোথায় দেখেছি? স্পষ্টই বোঝা যায়, এঁর কোনো [illegible]ল্পই আগে থেকে চিন্তা ক'রে লেখা নয়, [illegible]থায় যা আসছে লিখে যাচ্ছেন, এবং কি [illegible]খানা মাথা!

[illegible]ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ১৮৪৭-এ এবং [illegible]ছিলেন ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। লিখতে [illegible]রেছেন বেশ বেশী বয়সে, এবং [illegible]র ভঙ্গিও এক মজলিসী বুড়োর [illegible]র মতন। কিন্তু যে ত্রৈলোক্যনাথ [illegible]বন ছিলেন আদর্শবাদী, দেশ [illegible] একরোখা এবং অনেক রকম শিল্প-[illegible]ন আগ্রহী, তিনিই গল্প লেখার সময় [illegible]রাজ্যের উদ্ভট জিনিসের কথাই চিন্তা [illegible]রতেন কি করে! বস্তুত, তাঁর প্রায় সব [illegible]টি লেখাতেই অদ্ভুত বা উদ্ভট রসের উপদ্রব এবং সেই জন্যই তাঁর লেখা সকলের থেকে আলাদা হয়ে গৌরবের আসন পেয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ যখন লিখেছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যা কিছু দেওয়ার দিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গেছেন নোবেল প্রাইজ। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের লেখা পড়লে মনেই হয় না, বাংলা ভাষায় ঐ দুজন লেখক জন্মেছেন। তাঁর ভাষায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্র-নাথের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই—এ এক অনর্গল গল্প বলার ভাষা, কোথাও আটকার

সাহিত্য সংবাদ

না, কোথাও ভাষার তারিফ করার জন্যও থামতে হয় না—এবং এই অনায়াস সরলতাই এই ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ!

আমরা অনেক রকম ভূতের গল্প পড়েছি, কিন্তু টেলিগ্রাফ করে কোনো মানুষকে বিলেতে পাঠাবার কথা কখনো শুনবো বলেও কল্পনা করেছি কি? এবং ভূতকে শুয়েস্তা করা যায় গাঁজা খাইয়ে? এবং সেই ভূতের আবার কাগজের সম্পাদক হবার দারুণ যোগ্যতা! ডমরুধরের গল্পা-বলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়ক ডমরুধর নিজে একটি অতি পাজি, জোচ্চোর এবং পাষণ্ড—কিন্তু অব-লীলাক্রমে এবং দাপটের সঙ্গে সে নিজের কুকীর্তিগুলি বলে যাচ্ছে, কোনো গ্লানি নেই। ত্রৈলোক্যনাথ বিশেষ কোনো মন্তব্য করা পছন্দ করেন না। হিন্দু বামুন ধর্ম-রক্ষার শুচিবাইতে অল্প বয়সী বিধবা কন্যাকে একাদশীর দিন জল পর্যন্ত পান করতে দেয় না, তৃষ্ণায় মেয়েটি ঘরের মেঝে চাটতে চাটতে মারা যায়। এ ঘটনা কত নির্লিপ্ত ভাবে বলেছেন! তবু সর্বক্ষণ বোঝা যায়, একজন বুদ্ধিমান, সংস্কারমুক্ত লেখক এই সমাজের গোঁড়ামি, ধর্মীয় পাগলামির প্রতি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছেন।

গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন যে, ত্রৈলোক্যনাথের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অনেকটা কারণ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। এবং এটা হচ্ছে "অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেগের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও বঙ্গালক্ষণাক্রান্ত ঘটনা।" হয়তো এটাই সত্যি। ত্রৈলোক্যনাথের মতন এমন একজন লেখকের যোগ্য সমাদর না-হওয়া একটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের ঘটনা। জীবিতকালেও ত্রৈলোক্যনাথ খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

তবে, বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়নি, তা শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে গেছে—কখনো রাজশেখর বসুতে, কখনো প্রমথনাথ বিশীর মধ্যে। এবং পরবর্তীকালে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং কিছুটা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও এর রেস খুঁজে পাওয়া যায়।

শঙ্খমল্ল

কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না, তবু আকস্মিকতা এই ক্ষেত্রে মধুর। শঙ্খমল্ল নামে একটি পত্রিকা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কেই একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। প্রেসের গোল-মালে কাগজ বেরুতে দেরি হয়ে যায়, ইতিমধ্যে আসে নীরেন্দ্রনাথের আকাদমি পুরস্কারের সংবাদ। পত্রিকাটিতে কোথাও ঐ সংবাদের উল্লেখ নেই, তবু পুরস্কার ঘোষণার পরেই এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকদের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়েছে।

এই পত্রিকায় নীরেন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনার বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন লেখক। তাঁর সমবয়েসীরা লিখেছেন মানুষটি সম্পর্কে। গৌরকিশোর ঘোষ জানিয়েছেন, আমি নীরেনদাকে সাং এডিটর, সাময়িকী সম্পাদক, অনুবাদক, আবৃত্তি-কারক, বক্তা, তাস-খেলুড়ে এবং শখের স্থপতি ইত্যাদি কয়েকটি ভূমিকাতেও দেখেছি। বলাই বাহুল্য, আমি নীরেনদার উপরে কথিত সব গুণেরই গ্রাহক। তবে আয়কর প্রদানের ব্যাপারটা সম্পর্কে তার বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে!

এই সংখ্যায় প্রকাশিত নীরেন্দ্রনাথের একটি চমৎকার কবিতা এখানে উদ্ধার করছি :

আলগা করে রাখি আঙুল আঁকড়ে
ত রাখার।
ধুলোর মতো হাঁরে এবং মাটির মতো সে
অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই অনেক
থাকার।
এইটে যদি বুঝতে, কোনো সমস্যা থাব

সনাতন পাঠ

বঙ্কিম বিচার। শংকরপ্রসাদ নস্কর ॥ বিশ্ববাণী ॥ ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা ৯ ॥ ... টাকা।
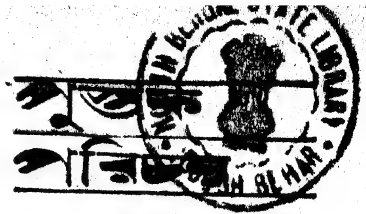
বঙ্কিম বিচার বইখানির প্রথম পর্বে আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। লেখক বলেছেন উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে "হয়তো অন্যান্য আলোচনা এসে গেছে।" প্রকৃত প্রস্তাবে একশ' একাত্তর পৃষ্ঠার বিবরণাংশের ভিতরে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জায়গা জুড়ে আছে "অন্যান্য আলোচনা" যা পড়তে ভালোই লাগে। তবে সে আলোচনাতে একদিকে কপালকুণ্ডলাকে, অন্যদিকে রোহিণীকে এক নিঃশ্বাসে সেক্সপীয়রের ডেসডিমোনার সঙ্গে তুলনা করে, "প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের মনস-মানচিত্র" রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা' কবিতাটিতে আবিষ্কার করে ফেলে লেখক তাঁর সাদৃশ্য-সন্ধান-শক্তিকে একটু বেশিরকম দৌড় করিয়েছেন বলে মনে হয়।

শ্রীনস্করের কল্পনার বেগ রয়েছে, কলমও কুশলী। শুধু উচ্ছ্বাসকে কিছু সংযত রাখলে এবং আর একটু সাবধানে এগোলে হয়তো তিনি সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সত্যিই কোনো বিশিষ্ট রীতি যোজনা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু সাবধানতা এখনো তাঁর প্রধান গুণ নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের নারীচরিত্র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে অনেক তত্ত্ব এনে ফেলেছেন যার প্রাসঙ্গিকতা অল্প, লেখকের নিজের বক্তব্যও এখানে অসতর্ক। কখনো কখনো স্ববিরোধী। "নারীধর্ম ও পতিধর্ম" বলে তিনি যে আলোচনা তুলে এগিয়ে এসেছেন সেখানে অনেক প্রশ্ন এখনো সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের ভিতরে "মাতৃত্বের বাসনা" প্রকাশিত হয়েছে কি? বিষবৃক্ষ উপন্যাসে শ্রীশচন্দ্রকে নগেন্দ্র লিখছেন, "আমি নিঃসন্তান"—সূর্যমুখীর কোনো খেদ শোনা যায়নি। এমনকি, কমলমণিও ভাজের সন্তানহীনতা নিয়ে বাক্যব্যয় করেননি। অন্যান্য রমণীকুলেরও পতিপ্রাণতা যেমন প্রকট, সন্তানস্নেহ তেমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা' নিয়ে কোনো প্রবন্ধ লেখা খুব শক্ত কাজ। এ বিষয়ে শ্রীনস্কর কোনো নতুন আলোকপাত করলে এ বইয়ের মূল্য অনেকখানি বেড়ে যেত। অন্যদিকে আবার কৃষ্ণকান্ত রায়ের কথা বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রের আলোচনাকে অনেকখানি পটভূমিকায় ঠেলে দিয়ে লেখক বিচারপদ্ধতিকে খণ্ডিত করেছেন মনে হয়। নায়কদের বাতিল করে দিয়ে আলোচনা এগোলে হয়তো বিধবা নারী, সধবা নারী, নিম্নবংশের নারী, উচ্চবংশের নারী—এই সব ছোট ছোট ভাগে নারীসত্তা বোঝবার চেষ্টায় বঙ্কিমবিচার ভারগ্রস্ত হতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরুষেরা কেন্দ্রিক চরিত্র। সে কথা এ বিচার থেকে ধরা শক্ত।

ইতিহাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (প্রথম পর্ব)। মদনমোহন কুমার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। মূল্য: পনেরো টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশি বছর পূর্ণ হয়েছে। এই বই সেই উপলক্ষে প্রকাশিত। কিন্তু এটিকে সাধারণ স্মারক পুস্তক মনে করলে ভুল হবে। পরিষদের সম্পাদক মদনমোহনকুমার বইটিকে আলাদা চরিত্র দিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায় একই সময় হিন্দী নাগরী প্রচারণী সভাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এটাই আদ্য-ইতিহাস নয়। সম্পাদক শ্রীকুমারের কৃতিত্ব, তিনি অনেক গুপ্ত তথ্য ও ঘটনার সাহায্যে পরিষদের পূর্ব কীর্তিকে নতুন গতি ও শক্তি দিতে চেয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'পাথুরে প্রমাণ' নয় কিন্তু আবশ্যিক কেতাবী প্রমাণ তিনি এতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সাহিত্য পরিষদ ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান নয়, ইতিহাসের অমোঘ প্রয়োজনে, ভারত-রিনেসেন্সের অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে এর ক্রমিক উৎপত্তি। দেখা যাচ্ছে জন বীমস-এর বাংলা অভিধান পরিকল্পনার আগেই বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে বসন্তরঞ্জন রায় ১৫০০ শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য এই একাশি বছরেও পরিষৎ একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলা অভিধান রচনা করে উঠতে পারেনি। ১৩০১ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতিদের নিয়ে 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' কমিটি তৈরী হয়েছিল এবং তাঁরা বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কিছু তালিকাও করেছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে পরিষদের গুরুতর কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যসহ জন বীমস-এর নিবন্ধটি খুবই মূল্যবান। বীমস এতে য়ুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিবর্তন দেখিয়ে তার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আপন পরিচয় এবং কর্তব্য স্থির করে নিতে বলেছেন। ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব, আশা করা যায়, অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ হবে।

(সি ১৮৬৪২/২)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যে-গ্রন্থের নাম **জেন তুই সর্বনাশী** (পরিবেশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, দশ টাকা) সে-লেখকের মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া শক্ত নয়। লঘু, তির্যক, কৌতুকপ্রবণ একটি মন যে এই নামকরণের পিছনে কাজ করেছে সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশের গল্পকার মাহফুজ সিদ্দিকীর এই গল্পগ্রন্থের সেই ধরনের গল্পগুলিই বেশী মাত্রায় আকর্ষণীয়, যেখানে তিনি সরস, পরিহাস-উজ্জ্বল পরিবেশ নির্মাণে তৎপর হয়েছেন।

যেমন, এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প : 'মেয়েমানুষ চেনা মুশকিল'। গল্পের নায়ক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বয়েস ষাটের বেশী। দু-গালে ছটাকখানেক তেল ঘষবে'—এই একটি মাত্র বাক্যেই হরেকৃষ্ণর অনবদ্য জীবন্ত ব্যঙ্গচিত্র হয়ে উঠেছে। এল এম এফ ডাক্তার হরেকৃষ্ণ বৃদ্ধ বয়সে দুশ্চিন্তাহীন আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য এক কিশোরীকে আশ্রয় দিয়েছে বাড়িতে। আশ্রিতা শিবানীকে নিয়ে নানা মহল থেকে হরেক কানাকানি ও চাপ সৃষ্টি হওয়ায় নিজ বয়ে শিবানীর বিয়ের ব্যবস্থাও করেছে বৃদ্ধ। কিন্তু তরুণী শিবানী যে ইত্যবসরে বৃদ্ধের প্রতিই অনুরক্ত, সেই কথা জানাজানি হল এক চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে। এই গল্পে লেখকের কোনও ভান নেই। পরিষ্কার হাসির গল্প, অনাবিল রসের। এই ধরনের গল্প এখনকার তরুণ লেখকরা লিখতে চান না। শ্রীসিদ্দিকী সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রাচীনপন্থী। কিন্তু স্বাদ বদলের জন্য যে মাঝে-মধ্যে এ-রকম মজার লেখাই পড়তে ইচ্ছে করে এতে কোনও ভুল নেই। তাই, লেখকরা যতই নাক কোঁচকান, পাঠকের অভিনন্দন তিনি পাবেনই। 'নাকে নোলক পরেছি' এবং 'দোষ নাকি বয়সের' গল্প দুটিও চমৎকার লঘু পরিবেশে রচনা।

এই গ্রন্থের আরেক ধরনের গল্পে শ্রীসিদ্দিকী কিছুটা ব্যর্থ। গভীর রস এখনো তাঁর কলমে তেমন ধরা পড়ে নি। দুটি গল্প ছায়ানুবাদ। এর মধ্যে জাপানী গল্প অবলম্বনে 'খুন' অতীব সুন্দর।

*

"আশ্চর্য সহজভাবে কোন্ এক অলৌকিক স্বর/জলের মতন ছন্দে নেচে ওঠে শব্দের ভিতর?" জানতে চেয়েছেন শান্তি সিংহ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে : **লাল মাটি নীল অরণ্য** (গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, কলকাতা ২৭, তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। এর উত্তরও যে তিনি জানেন তা এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলীতে স্পষ্ট। কবিতার অলৌকিক স্বর তাঁর বহু লেখাতেই মোটামুটি সহজভাবে ফুটেছে।

অধিকাংশ তরুণ লেখকের রচনা যখন নগরকেন্দ্রিক, শ্রীসিংহ তখনই মুখ ফিরিয়েছেন খোয়াইয়ের লাল মাটি আর সীমান্ত বাংলার নীল আরণ্যক পরিবেশের দিকে। নিসর্গ এই তরুণ কবির রচনায় বেশ বড়ো জায়গা অধিকার করে রয়েছে—স্পষ্ট বোঝা যায়। 'শিশু আর সেগুনের ডালে ডালে উদাসী বাতাস', 'ফলসার ডালে রাঙা বুলবুলি', 'নাগকেশরের ঝোপে শালিখ', 'করমের ডালে ফিঙে' এ-রকম অজস্র ছবি তাঁর কবিতায় ছড়ানো। 'ভাটিয়ালি গান থেকে টুসু-ভাদু-করমের সুর' এবং 'লাল মাটি আর শাল পলাশ মহুয়ার নীল অরণ্যের বুকে' অস্ত্যপুরুষের মাদলের বোল তাঁর কবিতায় পক্ষে সমান জরুরী বিষয়। শুধু বিষয়ান্তরের জন্যই নয়, শব্দে-ছন্দে আস্থাবান এই কবির নম্র ভঙ্গির আন্তরিক উচ্চারণের গুণেও গ্রন্থটি কাব্য-পাঠককে আকর্ষণ করবে, বলা অত্যুক্তি হবে না।

*

কানাইলাল ঘোষের **শরৎচন্দ্র** (পরিবেশনা : দে বুক স্টোর, কলকাতা-১২, পনের টাকা) বেশ ভিন্ন স্বাদের জীবনীগ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের জীবন তাঁর গল্প উপন্যাসের থেকে কম কৌতূহলকর নয় কিন্তু তাঁর জীবনের বহু খবরই পাঠকের অজ্ঞাত। লেখকরূপে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব কালে তাঁর সম্বন্ধে কেউই কিছু জানতে না। পরবর্তী কালে তাঁর বলা সামান্য কথা এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের টুকরো স্মৃতি থেকে মোটামুটিভাবে কৌতূহল মেটানো উপকরণ পাওয়া গিয়েছে।

কানাইবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত জীবনীকারদের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাল-মসলা যোগাড় করেছেন। ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ করে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, স্মারকগ্রন্থ ও জীবন-গ্রন্থে ছড়ানো জীবন সংগ্রহ করে তিনি চলচ্ছবির মতো এ বৃহৎ জীবনী রচনা করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের যাবতীয় কৌতূহলজনক ঘটনা তাঁর অন্যতম উপজীব্য। গতিময়, আকর্ষণীয় এই জীবনী যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে চারটি সংস্করণ প্রকাশ থেকেই তা অনুমান করা সম্ভবপর।

*

'মধ্যবিত্ত-সুলভ মানসিকতায় সমাজের একাংশের কাছে কবির প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বীকৃতি না মিললেও সমাজের সর্বহারা শ্রেণীর মানস-পটে তাঁর স্থান ও মূল্যমান যে চির উজ্জ্বল থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।' **সুকান্তের সমাজচেতনা** (মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-৬০, ন' টাকা) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন নিখিল পাল। কথাটা যে কিঞ্চিৎ ভাবিয়ে তোলে বলাই বাহুল্য। যে-দেশে শতকরা সত্তর জনাই নিরক্ষর সে-দেশে সর্বহারা শ্রেণীর কবি হিসেবে একজন কত-দূর যেতে পারেন এ-সমস্যা বেশ ধাঁধায় ফেলে দেয়। বস্তুত, 'কৃষকের মজুরের' কবি ঘোষণা করা যত সহজ, তাঁদের কবি হয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছনো যে তত সহজ নয় এ কথা নিখিলবাবু কী আর জানেন না? তিনি নিশ্চিত এও জানেন যে, সুকান্তের সমাজচেতনা সম্বন্ধে এই বইটিও কোনো সর্বহারার হাতেই পৌঁছবে না। সে-আশা যদি থাকত, তাহলে ১০০ পৃষ্ঠার এই বইয়ের দাম ন' টাকা রাখতেন না, কিংবা লিখতেন না এমন ইংরেজী-উদ্ধৃতি দিয়ে যার বাংলা করা কঠিন ছিল না।

চৌকস ক্রিকেটার মদনলাল

কলকাতার তৃতীয় টেস্টে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ৮৫ রানে পরাজিত করার মূলে আমরা বিশ্বনাথ ও চন্দ্রশেখরের ভূমিকাকেই বড় করে দেখেছি, বেশী গৌরব দান করিনি সেই বোলারকে, যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে ভাঙন ধরিয়েছিল। অবশ্যই দলের বড় সাফল্যের পেছনে সবারই কিছু-না-কিছু ভূমিকা থাকে। খেলা এক-দুইজনের নয়, এগারো জনের। তবু কিন্তু বহুক্ষেত্রে দুই এক-জনের কৃতিত্বেরই জয় বিঘোষিত হয়।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে মদনলাল পেয়েছে মাত্র ২২ রানে চারটি উইকেট। আঘাত হেনেছে ইনিংসের সূচনায়, মাঝে এবং শেষে। এক ওভারের দ্বিতীয় বলে সে ফিরিয়ে দেয় ওপেনার গ্রীনিজকে, চতুর্থ বলে কালিচরণকে। পর-পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম দুটি উইকেট পড়ে। সেঞ্চুরিকারী ফ্রেডরিকসের আউটে পড়ে দলের পঞ্চম উইকেট। মদন সব শেষে অ্যানডি রবার্টসের উইকেটটি নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস খতম করে দেয়।

তার আগে ওর ব্যাটের ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথম ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বিশ্বনাথের ৫২ রানের পরেই মদনলালের ৪৮। এবং মদন এবং বিশ্ব-নাথের ৭৫ ওই ইনিংসে জুড়ির বড় রান। শুধু তাই নয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন আবিষ্কার এই সিরিজের সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান ভিভ রিচার্ডস চতুর্থ দিনে মদনলালের যে বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যায়, বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা খেলায় ওই রানের বল একটি দুটির বেশী পড়ে নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের পক্ষেও ওই বলের সামাল দেওয়া শক্ত। ওটিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের বড় আঘাত। সুতরাং জীবনের তৃতীয় টেস্টে মদনলালের এক গৌরবময় ভূমিকা।

সত্যি কথা, বে-সরকারী টেস্টে শ্রীলঙ্কায় সফল হলেও ১৯৭৪-এর ইংলণ্ড সফরে টেস্টে মদনলালের ব্যর্থ ভূমিকা। দুটি টেস্টের ৪ ইনিংসে রান মাত্র ১১; ৯৪ রানে উইকেট ২টি। অন্য খেলায় লেস্টারের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে ৭টি উইকেট এবং হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে নট আউট ৭৯ রান অবশ্যই চৌকস ক্রিকেটারের পরিচয়।

মদন দশাসই চেহারার বিরাটদেহী পুরুষ নয়, যদিও মাথায় উঁচু পাঁচফুট ৯½ ইঞ্চি এবং দেহের ওজন ৭০ কেজি। প্রকৃত ফাস্ট বোলার বলতে যা বোঝায় তাও নয়। বলের গতি মিডিয়াম পেসের একটু উপরে। সুইংয়ের ধারও কম। বল বেশী বাঁক নেয় না। কিন্তু লক্ষ্য ও নিশানায় অভ্রান্ত। ওর বোলিংয়ের মোক্ষম গুণ লেংথ। দুরন্ত গতিই পেস বোলারদের একমাত্র গুণ নয়।

সাধারণভাবে পেস বোলারদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর যারা গতির সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাটস-ম্যানকে বিভ্রান্ত করে বলের লাইনে ঠিক-ভাবে ব্যাট আনতে। আর এক শ্রেণীর, যারা লেংথ ও নিশানা ঠিক রেখে ধারাবাহিকভাবে বল করে যায় অল্প সুইংয়ে। মদনলাল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। একটানা বহু সময় বল করে যেতে পারে। দুদিকেই বল ঘোরাতে পারে। তবে আউট সুইংয়ের চেয়ে ইনসুইং দেয় বেশি। বহু বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের মতে বেশি বাঁক-খাওয়ানো বলের চেয়ে অল্প বাঁক-খাওয়ানো বল অনেক ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেশি। ব্যাটকে ফাঁকি দেওয়া বা বলের স্পর্শে ব্যাটের কানা চুম্বন করাই বড় কথা। মদনলালের বলের এই গুণটিই স্বীকার করেছিলেন টনি গ্রীগ এবং অ্যালান নট। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে হাত জমে যাওয়া গ্রীগের হাতকে ফাঁকি দিয়েছিল মদন-লালের বল। বলের লাইন বুঝতে না পেরে নট হয়েছিল এল বি ডবলিউ আউট। এবং বলবার কথা, মদনের এক ওভারেই দুই মহীরুহের পতন।

মদনলাল —ফটো দেশ

আমরা পেস বোলার পেস বোলার বলে সব সময় চেঁচামেচি করি, কিন্তু সম্ভাবনা-ময়দের সময়ে সমাদর করি না, যেমন এখন করছি না পান্ডুরঙ্গ সালগাঁওকারকে। মদন-লালেরও ১৯৭১ সালে ইংলণ্ড সফরে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ওই বছর ব্যাটে-বলে ছিল শীর্ষস্থানীয়দের সারির উপরের দিকে। উত্তরাঞ্চলের পক্ষে ভিজি ট্রফির সেমি-ফাইনালে শক্তিশালী পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে পেয়েছিল প্রথম ইনিংসে ৪০ রানে ৮টি উইকেট; দুই ইনিংসে ৯১ রানে ১৫টি। অসাধারণ বোলিং কৃতিত্ব। ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পেয়েছিল ৬৫ রানে ৩টি এবং ১৩১ রানে ৪টি। রঞ্জি ট্রফির চারটি খেলায় পেয়েছিল ২৪টি উইকেট, রান করেছিল ৩০০। কিন্তু ইংলণ্ড সফরের দল গড়ার সময় মদনলাল উপেক্ষিত হয়েই রইল। জাতীয় নির্বাচকদের নজরে পড়ে ১৯৭২ সালে ইরানী ট্রফির খেলায় বোম্বাই ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বড় সাফল্যের সুবাদে। খেলাটি হয়েছিল পুনায়। নির্বাচকরা সবাই উপস্থিত ছিলেন এম সি সি দলের ভারত সফরের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের খেলোয়াড়দের গুণাগুণ পরখ করার প্রয়োজনে। আব-হাওয়া ছিল ভারী। পুনা পীচে ঘাসও ছিল কিছুটা। পেস বোলিংয়ের ওই চমৎ-কার পরিবেশে মদনলাল বলও করেছিল চমৎকার। নির্বাচকরা পিঠ চাপড়ে বলে-ছিলেন, 'বাহবা বেটা।' ওই পর্যন্তই। কোন টেস্টেই সে ডাক পায়নি। প্রথম ডাক আসে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য।

অমৃতশহরের ছেলে, যে শহর থেকে এসেছে বিষেণ সিং বেদী। দুজনে একই স্কুলে, একই কলেজে পড়েছে। ক্রিকেটের প্রথম পাঠ নিয়েছে একই কোচ গিয়ান প্রকাশের কাছ থেকে। একজন হয়েছে বিশ্বখ্যাত স্পিন বোলার, আর একজন পেস বোলার এবং ব্যাটসম্যান। গিয়ান প্রকাশ গর্ব করে বলেন, একজন আমার ডান হাত, একজন বাঁ হাত। দুজনই দিল্লি ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠিত। বেদী চার বছরের বড় মদনের চেয়ে। মদনের বয়স এখন ২৩। বেদীই ওর উপদেষ্টা, অভিভাবক ও বন্ধু; যাকে ইংরাজীতে বলে ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড।

মদনলাল শ্রমের দ্বারা সাফল্য লাভে বিশ্বাসী। ক্রিকেটের প্রতি ওর অন্তহীন আসক্তি। অনুশীলনে কণামাত্র ফাঁকি নেই। আচার আচরণ এবং চরিত্রমাধুর্যে প্রকৃতই ক্রিকেটার। কে জানে ওর জন্য ক্রিকেটের কী সম্মান অপেক্ষা করছে!

মুকুল

মোহনবাগানের ডুরাণ্ড জয়

ফাগোয়ারার জগজিৎ কটন ও টেক্সটাইল মিলসকে ফাইনালে ৩—২ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান ক্লাবের এবার ডুরাণ্ড কাপ জয় নানা কারণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। প্রথমত, নামে একটি মিল দল হলেও পাঞ্জাব রাজ্য টিমের পাঁচ-ছয়জন নামী খেলোয়াড় নিয়ে জগজিৎ কটন মিলস দল গঠিত। দলটি যে খুবই শক্তিশালী তার প্রমাণ কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপ লীগের খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাদের জয় লাভ। সুতরাং যাদের কাছে মোহনবাগান হেরে গিয়েছিল, ফাইনালে তাদেরই হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে পরাজিত করেছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবকে, যে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছর কোন খেলায় বিজয়ী হতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গলকে মোহনবাগান শেষ-বার পরাজিত করেছিল ১৯৬৯-এর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে। সুতরাং পাঁচ বছর পরে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করা যেমন কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমন ৯ বছর পরে ডুরাণ্ড কাপ জয় খেলোয়াড়দের দৃঢ় মনোবলের প্রমাণ। একবার যুগ্ম জয়ের হিসাব সহ এবার নিয়ে মোহনবাগান মোট ৭ বার ডুরাণ্ড কাপ জয় করল।

কলকাতা ফুটবলের দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে এবার কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপ লীগ থেকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। লীগের বি গ্রুপে মোহনবাগান ৪—০ গোলে পরাজিত করে বোম্বাইয়ের মফৎলাল মিলসকে, একই ফলে গতবারের রানার্স রাজস্থান আর্মড কনস্টাবুলারিকে হারায়। আগেই লিখেছি, তৃতীয় খেলায় ১—২ গোলে হেরে যায় জগজিৎ কটন ও টেক্সটাইল মিলসের কাছে। ফলে মোহনবাগান ৪ পয়েন্ট পেয়ে বি গ্রুপের রানার্স হয়। মোট ৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মিল দল।

'এ' গ্রুপ লীগে ইস্টবেঙ্গল বোম্বাইয়ের মাহীন্দ্র ও মাহীন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ভাবে প্রথম খেলা ড্র করলেও পরে দুটি খেলায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে ৪—৩ গোলে এবং সিমলা ইয়ংসকে ২—১ গোলে হারিয়ে ৫ পয়েন্টসহ চ্যাম্পিয়ন হয়। সিমলা ইয়ংস হয় রানার্স। এক গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে অন্য গ্রুপের রানার্সের সেমি-ফাইনাল খেলার বিধানের ফলেই কলকাতার দুই প্রধানকে দিল্লিতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় ফাইনাল খেলার আগেই। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এবং জে সি টি মিলস ৩—০ গোলে সিমলা ইয়ংসকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্য বঞ্চনার কথা অস্বীকার করা যায় না। বেশী আক্রমণ করে এবং গোল করার বেশী সুযোগ পেয়েও ইস্ট-বেঙ্গল বিজয়ী হতে পারেনি। খেলাটি শেষ হবার ৩ মিনিট আগে রাইট আউট উলাগানাথনের গোলে মোহনবাগান জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে।

এই উলাগানাথনের একক কৃতিত্বে মোহনবাগান এবার ডুরাণ্ড পেয়েছে বললে হয়তো বাড়িয়ে বলা হবে না। রাজস্থান আর্মড কনস্টাবুলারির বিরুদ্ধে ৪টি গোলের মধ্যে ৩টি উলাগার। জে সি টি মিলসের বিরুদ্ধের গোলটিও ওর। সবচেয়ে বড় কথা, ফাইনালে ওর হ্যাটট্রিক। ডুরাণ্ড ফাইনালে হ্যাটট্রিক লাভ এক বিরল কৃতিত্ব। হাতের কাছে রেকর্ড বইয়ে ফাইনালে হ্যাটট্রিক করার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাচ্ছি না।

মোহনবাগান ও মিল দলের খেলাটি সাম্প্রতিককালের ডুরাণ্ড ফাইনালে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা। আগাগোড়াই খেলার মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সুতীব্র উত্তেজনা। মোহনবাগান বিরতির পর প্রথম মিনিটে ২—০ গোলে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খেলা হয়েছে ওঠা-পড়ার ছন্দসুখের মধ্যে। একবার আক্রমণ করেছে মোহনবাগান, একবার মিল দল। মিল দল কোন স
খেলার হাল ছাড়েনি। ০—২ গোলে পিছি
পড়েও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়ে গেছে, ১—
গোলের ঘাটতি কমিয়ে ২—৩ গোল কর
পর শেষ ১০ মিনিট লড়েছে মরীয়া সংগ্রা
মোহনবাগানকে কোণঠাসা করে রে
তবে কলকাতা টিমের কৃতিত্ব পারস্পর
বল দেওয়া-নেওয়া এবং চমৎকার বোঝাপ
মধ্যে এগ্যারজন একাত্ম হয়ে ৯০ মি
খেলে গেছে, সাময়িকভাবে ক্লাবের নষ্ট সম
পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে।

মোহনবাগানের উলাগানাথনের
ভূমিকা জগজিৎ কটন মিলস দলের অধিনা
ও স্ট্রাইকার ইন্দার সিংয়েরও। ইন্দা
দুটি গোলেই ওদের মফৎলাল মিল
বিরুদ্ধে জয়। ইন্দারের দুটি গোলেই গ্র
লীগে মোহনবাগানের পরাজয়
ফাইনালেও ইন্দারের একটি গোল।

কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং এবা
ডুরাণ্ডে তাদের খ্যাতি বজায় রা
পারেনি। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার
সিমলা ইয়ংসের কাছে ৩—২ গোলে হেরে
বিদায় নিয়েছে।

ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক নিমাই গোস্বামী রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আমেদের কাছ থেকে অন্যতম পুরস্কার সিমলা ট্রফি গ্রহণ করছেন

ইডেনে মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেটের ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে ফিল্ড করতে মাঠে নামছে বাংলার মেয়েরা। বাঁ দিক থেকে দেখা যাচ্ছে রূপা বসু, সম্পা মজুমদার, বনশ্রী দাস, বন্দনা মুখার্জী, কেয়া রায়, শ্রীরূপা বসু (অধিনায়িকা) ও শিরিন কন্ট্রাক্টরকে —ফটো দেশ

...লার মেয়েরা আবার ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন

গতবারের মত একারও ফাইনালে ...টককে হারিয়ে মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট ... করেছে বাংলার মেয়েরা। এবার ...কাতাতেই মেয়েদের সর্বভারতীয় এই ...কেট আসর বসে। খেলতে আসে ১৪টি ... দল। সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত একদিন ...শী খেলাগুলি ৫০ ওভারের মধ্যে ...মিত ছিল। ফাইনাল খেলাটি ছিল তিন ...নের। বেশীর ভাগ খেলাতেই কোন দলের ... ওভার খেলার প্রয়োজন হয়নি। অনেক ...েই ইনিংস শেষ হয়ে গেছে। ফাইনাল ...দার মীমাংসা হতেও তিনদিন সময় ...গেনি।

এ থেকে প্রমাণ মেলে ক্রিকেট খেলার ...ক মেয়েদের কোমল হাত এখনো অপটু। ...টিং ও বোলিংয়ের জন্য যে শক্তি, নৈপুণ্য ... টেকনিক প্রয়োজন তা অনায়ত্ত। সত্যিই ...ই। আমাদের দেশের মেয়েরা সবে ...কেটের ব্যাট বল হাতে নিতে শুরু ...রেছে। বাংলার মেয়েরা শুরু করেছে ...ত বছর থেকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে ...দের কাছ থেকে বেশি কিছু আশাও করা ...য় না। তবে তাদের উৎসাহ এবং ...ন্তরিকতা যে প্রচুর তার প্রমাণ মিলেছে। ...দের সাধনাও আছে। কিছু কিছু মেয়ে ...াটিং ও বোলিংয়ের টেকনিক বেশ কিছুটা ...ত্ত করে ফেলেছে। কতটা রপ্ত করেছে ...বং অন্য দেশের মেয়েদের তুলনায় আমাদের ...েয়েদের ক্রিকেট খেলার পার্থক্য কতখানি ...র প্রমাণ মিলবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে যখন অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ক্রিকেট দল ভারত সফর করতে আসবে। ইডেনেও একটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা আছে।

কলকাতায় এবার খেলতে এসেছিল বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, তামিলনাড়ু, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক এবং বুন্দেলখণ্ড থেকে মোট ১৩টি দল। বাংলা তো ছিলই। ব্যাটে ও বলে কয়েকটি মেয়ের বিশেষ কৃতিত্বের খতিয়ান নীচে দেওয়া হল।

ব্যাটিং—তামিলনাড়ুর সুধা সাহ ১৩টি বাউন্ডারি সহ নট আউট ৭৬ রান দিল্লির বিরুদ্ধে। বোম্বাইয়ের সুধা পাণ্ডতের ৫১ রান গুজরাটের বিরুদ্ধে। মধ্য প্রদেশের রাজু ঢোলকিয়ার ৬২ রান বুন্দেলখণ্ডের বিরুদ্ধে। বাংলার শিরিন কন্ট্রাক্টরের ৪১ রান তামিল নাড়ুর বিরুদ্ধে। বাংলার চন্দ্রিমা সাহার ৩৪ রান কর্ণাটকের বিরুদ্ধে।

বোলিং—উত্তর প্রদেশের আশা মিশ্রের ৮ রানে ৭ উইকেট রাজস্থানের বিরুদ্ধে। বাংলার শর্মিলা চক্রবর্তীর ২ রানে ৫ উইকেট তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। লোপমুদ্রা ভট্টাচার্যের ২৫ রানে ৬ উইকেট এবং শর্মিলার ১ রানে ২ উইকেট উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। তামিলনাড়ুর সুশান-ইডেচোরিয়ার ২৩ রানে ৬ উইকেট বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। ফাইনালে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসে বাংলার লোপমুদ্রা ভট্টাচার্যের ৪ রানে ৩ উইকেট, রূপা বসুর ৬ রানে ৪ উইকেট এবং বনশ্রী দাসের ৩ রানে ২ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেটের মহাসম্মান আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে এল চার বছর পরে। ছয়-টেস্ট সিরিজের চারটি টেস্টের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ৩—০ জয়ে এগিয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়া ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট জিতেছিল ১৬৬ রানে, পার্থের দ্বিতীয় টেস্ট ৯ উইকেটে। মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টের ফল নিষ্পত্তি হয়নি মাত্র ৮ রানের জন্য। সিডনির চতুর্থ টেস্ট ১৭১ রানে জিতে অস্ট্রেলিয়া 'অ্যাশেজ' ফিরে পেয়েছে। বাকি দুটি টেস্ট এখন প্রায় নিয়ম-রক্ষার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। এডিলেডে পঞ্চম টেস্ট আরম্ভ হবে ২৫ জানুয়ারি থেকে। শেষ ও ষষ্ঠ টেস্ট শুরু হবে মেলবোর্নে ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে। শেষ টেস্টটি আবার ৬ দিনের।

অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার টমসন ও লিলি যেভাবে ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের মনোবল ভেঙে দিয়েছে, দেহেও বলের আঘাত হেনেছে, তাতে ইংলণ্ড কোন টেস্টে জিততে পারবে কিনা সন্দেহ। ব্যাটে রান পাচ্ছেন না বলে চতুর্থ টেস্টে সহ-অধিনায়ক জন এডরিচের উপর নেতৃত্বভার ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ড অধিনায়ক মাইক ডেনেসের সরে দাঁড়ানো এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত। নতুন নজিরও বলা যেতে পারে। সিরিজ শেষে সমগ্র বিষয়টির পর্যালোচনা করা যাবে।

একলব্য

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

আগামী সপ্তাহে: অরণ্যদেবের বিচার ২৩

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিদা এবং 'সিদ্ধার্থ' ছবির পরিচালক কনরাড রুক্‌স। সংবাদ ভিতরের পৃষ্ঠায়

বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য রাজ্য সরকারের ভাবনা-চিন্তা এবং নানা পরিকল্পনার কথা অনেক শোনা গেছে। এমন কী বাংলাদেশের যুদ্ধের পর অন্য সব রাজ্য যখন সিনেমার টিকিট পিছু দশ পয়সার সেস তুলে নেন তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই ওই সেস চালু রাখেন। দশ পয়সা সেস এখনও আছে। রাজ্য সরকার ওই সেস বাবদ লব্ধ টাকা বাংলা সিনেমার জন্যই ব্যয় করতে চান। এই যুক্তিতেই সেস-টি এখনও পর্যন্ত তোলা হয়নি। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের যত দুশ্চিন্তা। আর কোন রাজ্য সরকারের তা নেই। একটি মৃতপ্রায় চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার দায়িত্বও বুঝি এখন একমাত্র পশ্চিমবাংলা সরকারের। তাই এত টাকার দরকার। সেস বাবদ বছরে প্রায় দু কোটি টাকা আয় হয়। রাজ্য সরকারের আয়ের খাতেও এই টাকা জমা পড়ছে। কিন্তু বাংলা সিনেমা ওই আয়ের কতটুকু অংশ পাচ্ছে?

• • •

বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব বা পরিকল্পনা তো অনেক কিছুই আছে। বিশেষ কোনটাই কিন্তু এখনও বাস্তব রূপ পায়নি। ধরা যাক ওই আটজন চিত্র প্রযোজকের কথা। তাঁরা কি টাকা পেয়েছেন? পরিকল্পনাটি বেশ সুন্দর ছিল। রাজ্য সরকার বছরে অন্তত আটটি ছবি বানাবার জন্য টাকা দেবেন—প্রতি ছবি পাবে দেড় লাখ টাকা। ভাগ্যবান (নাকি হতভাগ্য বলব) কয়েকজন প্রযোজক

মতামতের মণ্তাজ

জেনেও গিয়েছিলেন যে তাঁরা ছবি তৈরির জন্য সরকারী ঋণ পাবেন। বেশ কিছুকাল পরে জানা গেল, অর্থমন্ত্রক খুব সহজ শর্তে ঋণ দিতে নারাজ। ব্যাপারটা সাময়িক চাপা পড়ল। সরকারী টাকার ভরসায় যাঁরা কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরা এখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। কথা এবং কাজের মধ্যে এমন ফারাক বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ এদিকে বাংলাদেশের যুদ্ধের অনেক পরও সেস ঠিকই চালু আছে। সেস-টি রেখে দেওয়ার মূলে যে সুন্দর অজুহাত ছিল বাস্তবে তার কোন হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।

• • •

মজার ব্যাপার আরও আছে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য গত দুই বছরের বরাদ্দ টাকার অর্ধেকও খরচ হয়নি। অর্ধেক তো দূরের কথা, পঞ্চাশ লাখ টাকার মধ্যে আট-দশ লাখ টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। হয়ত সরকার বাংলা ছবির জন্য নগদ টাকার যে পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন তাতেই বেশি টাকা খরচ হয়েছে। নগদ টাকার পুরস্কারে, বাংলা ফিলমের কিছুটা উপকার নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু তাতেই সব সমস্যার নিরসন হয় না। চলচ্চিত্র শিল্পের লোকেরা এখনও সরকারের উপর আস্থা হারাননি। কারণ রাজ্য সরকার বাংলা ছবির উন্নতি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি এতবার এতভাবে জানিয়েছেন যে চলচ্চিত্রসেবীরা এখনই নিরাশ হতে পারছেন না। তা-ছাড়া সরকারের তরফে কিছুই করা হয়নি তাও বলা যাচ্ছে না। সমস্যা হয়ত এইখানেই। সরকার যদি কিছু না বলতেন কিছু না করতেন তবে কোন ঝামেলাই থাকত না। চলচ্চিত্র শিল্পের লোকেরা জানতেন, সরকারের কাছ থেকে তাঁদের

বিদেশ কিছুই পাওয়া নেই। যেমন এতকাল ছিল না। কিন্তু সরকার নানা রকমের প্রত্যাশা জাগিয়ে এবং কিছু সাহায্য দিয়ে ও সম্পূর্ণ না দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও বেশি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। চলচ্চিত্র শিল্প মহল স্বভাবতই এখন হতভম্ব। প্রতিশ্রুতি পালন কিংবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এই দুটোই বোঝা যায়।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে বিজয় মেহরা, শত্রুঘ্ন সিনহা প্রমুখ ভারতীয় শিল্পী

প্রতিশ্রুতি যদি অর্ধেক পালিত হয় তবেই বিপদ। তাতে কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। নিজের উপর ভরসা করে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহেও যখন ভাটা পড়ে, প্রতিশ্রুত সাহায্যও মেলে না, তখন অবস্থাটা বড় ক্ষতিকরক হয়ে ওঠে। বাংলা চলচ্চিত্র এখন ওই ক্ষতির সম্মুখীন। অথচ এদিকে সেস বাবদ সরকারের ঘরে টাকাও জমা পড়ছে। কিন্তু যা করবার কথা ছিল তার প্রায় কোনটাই হচ্ছে না। স্টুডিওর সংস্কার, সিনেমা হল নির্মাণ, দুঃস্থ সিনেমা কর্মী ও টেকনিশিয়ানদের সাহায্য দান এবং সর্বোপরি ছবি তৈরির জন্য আর্থিক ঋণ—তার কোনটাই বা হয়েছে। এই অবস্থা আরও দুঃসহ নয় কি?

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসব থেকে—২

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পঞ্চম দিনে দেখা গেল, অধিকাংশ প্রযোজক এবং তারকা দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বিজ্ঞান-ভবনের সামনে অতি কুৎসিত এক কাণ্ড ঘটল। এক দল যুবক শুধু অসভ্যতা আর কুরুচির পরিচয় দিয়ে গেল। দুটি ছবির প্রেস-প্রিভিউয়ের পরেই এটা ঘটে। যুবকেরা, জানা গেল, পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র। ওই প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট চলছে, সেটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ, এই সুযোগে ছাত্ররা দিল্লিতে জমায়েত হয়েছে। তা না-হয় হল, কিন্তু তাই বলে, শিষ্টতা-সভ্যতা বিসর্জন দিতে হবে?

উৎসবের দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য চিহ্নিত ছবিগুলির অ্যাডভান্স বুকিং আরম্ভ হতেই "এ" মারকা ফিল্মের টিকিট-সংগ্রহের ব্যাপারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। "ইউ" মারকা ছবির অবস্থা দুয়োরাণীর মতো। সব ছবিকে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' হিসাবে চিহ্নিত করলে সমস্যার একটা সমাধান হতে পারত। ছোটদের জন্য তো চণ্ডীগড়ে একটি চলচ্চিত্র উৎসব হতে চলেছে, সেই উৎসবের ছবি পরে অন্যান্য বড় শহরেও দেখানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক উৎসবকে পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাপার করা যেত। অবশ্য এখানে বলা দরকার, বর্তমান উৎসবের "এ" মারকা ছবি-মাত্রই কিছু উত্তেজক যৌন-দৃশ্য সংবলিত নয়। যেমন ধরা যাক, *সিদ্ধার্থ*। এই ছবিতে সিমির যেসব নগ্ন দৃশ্য ছিল, নয়াদিল্লিতে প্রদর্শনীর আগে সেগুলি পরিচালক কনরাড রুকস সযত্নে কাঁচিকাটা করে দেন। ফলে দর্শকরা বেশ হতাশ হয়েছেন। তাঁদের ঠকানো হয়েছে, এই মনোভাব অধিকাংশের। ব্রাজিলের যে-ছবিটি এই উৎসবের প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত, সেটি কান উৎসবের কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বাতিল করে দিয়েছিলেন এই কারণে যে, ওই ছবির প্রতি চরিত্র উলঙ্গ। উক্ত ছবিটির প্রেস-প্রিভিউ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা চাঞ্চল্যকর কিছু দেখবেন ভেবেছিলেন, তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। দিল্লির একটি পত্রিকা বলেছে, "হ্যাঁ, নগ্নতা আগাগোড়াই আছে, নিঃসন্দেহে; কিন্তু ব্যাপারটা অস্বস্তিকর নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক মনে হয়।" ষোড়শ শতকের দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইনডিয়ান এক উপজাতির কাহিনী নিয়ে এই ছবি। সেই সময়ে ওই উপজাতির স্ত্রী-পুরুষ অনাবৃত শরীরে বিচরণ করত। নগ্নতা সেই কারণে। কিন্তু ছবির কোথাও যৌন উত্তেজনা জাগানোর চেষ্টা নেই। সেকস বলতে যা

"সাড্টিছাড়া" (পরিচালনা ঃ গুরু বাগচি) ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী ও পার্থ মুখোপাধ্যায়

বোম্বার সেতা চড়া মাত্রায় পাওয়া যায় আমেরিকার **দ্য ব্রুকওয়ারক অরেন্জ** (কুব্রিক-পরিচালিত) চিত্রে।

চলচ্চিত্র-সমালোচকরা সত্যজিৎ রায়ের ছবির অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। অনেকে ভেবেছিলেন, তাঁর সাম্প্রতিক চিত্র **সোনার কেল্লা** এখানে দেখা যাবে। উৎসবের বিচারকমণ্ডলীর প্রধান, সত্যজিৎবাবু চাননি, ছবিটি এখানে দেখানো হোক।

ইট হ্যাপন্ড ওয়ান নাইট দেখার পর থেকেই যাঁরা ফ্র্যাংক কাপরার ভক্ত হয়ে গিয়েছেন বর্তমান লেখক তাঁদের একজন। অশোক হোটেলে কাপরাকে দেখে তাই উত্তেজিত বোধ করা গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ আলাপ করা গেল না। কাপরা কিছুটা অসুস্থ, গলা একেবারে বসে গিয়েছে। অতি কষ্টে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন, উৎসবের শেষ অবধি তিনি দিল্লিতে আছেন, পরে কোনও সময়ে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলে আপত্তি নেই। উৎসবের অপর আমন্ত্রিত অতিথি, জিনা লোলোব্রিজিদা কোনও বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজী হননি, তবে শাস্ত্রী-ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক-সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। শাস্ত্রী-ভবনে সেদিন একটি চেয়ারও খালি ছিল না। সাংবাদিকরা এসেছিলেন দলে দলে। এ-ছাড়া সরকারী অফিসাররাও। শ্রীমতী জিনাকে (এখন, ৪৭) স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা তাঁরা মিটিয়ে নিয়েছেন।

সাংবাদিক-সভাটি খুব জমেছিল। কথার প্যাঁচে শ্রীমতী জিনার সঙ্গে ভারতীয় তা-বড় তা-বড় সাংবাদিকরাও এঁটে উঠতে পারেননি। তাঁকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব তিনি সপ্রতিভ, সরস ভঙ্গীতে দিয়েছেন, একটুও আমতা-আমতা না করে।

ভারতীয় ছবি তাঁর কেমন লাগে, এই প্রশ্নের উত্তরে ওই ইতালীয় অভিনেত্রী বলেন, তিনি যে-কয়টি দেখেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে, হাতে অনেক সময় নিয়ে ভারতীয় ফিল্ম দেখতে হয়। ছবিগুলি অতি দীর্ঘ। কোন্ বয়সে বিয়ে করা উচিত?—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৪০। ওই বয়সটা তাঁর মতে সবচেয়ে নিরাপদ। সিনেমায় পর্নোগ্রাফি তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। সেক্সের জায়গা, শ্রীমতী জিনা বলেন, স্বামী-স্ত্রীর বিছানা; ছবির পরদাকে সেই জায়গা করে তোলার কোনও মানে হয় না।

ভদ্রমহিলার নামের প্রকৃত উচ্চারণ কী হওয়া উচিত—গিনা অথবা জিনা আমার জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল, সাহস হয়নি। যাই হোক, শ্রীমতী লোলোব্রিজিদা এখন ফোটোগ্রাফি নিয়ে খুব ব্যস্ত। সাংবাদিক-সভায় আসার আগে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ফোটো তুলতে গিয়েছিলেন। বললেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যা নির্ধারিত ছিল তার চেয়েও বেশী সময় দিয়েছেন। "শ্রীমতী গান্ধী সুন্দরী মহিলা", তিনি সপ্রশংস ভঙ্গীতে বললেন। রূপ চর্চার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বিশেষ কোনও পরামর্শ দিয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি হেসে বলেন ঃ "উলটে আমাকেই তিনি কিছু শেখাতে পারতেন।"

শ্রীমতী জিনা সম্প্রতি প্যারিসে ফোটোগ্রাফির জন্য একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। তার জন্য তিনি রীতিমতো গর্বিত। তাঁর তোলা ছবির একটি বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। শ্রীমতী জিনা অবশ্য অভিনয়-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। তাঁর পরবর্তী ফিল্ম ঃ **কিং কুইন অ্যান্ড নেভ**। ছবিটির নায়ক ডেভিড নিভেন।

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবের গুমোট পরিবেশে কিছু স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শ এনে দিয়েছেন এই অসাধারণ মহিলা, জিনা লোলোব্রিজিদা।

বিশেষ সংবাদদাতা

মৌচাক

কমেডি ছবির নামটি "মৌচাক" হল কেন সেটা বোঝবার চেষ্টা না করাই ভাল। নাম একটা হলেই হল। এবং কমেডির নামে কিছু ভাঁড়ামি ও মোটা রকমের কৌতুকই যথেষ্ট। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্ভবত স্থির বিশ্বাস যে এতেই দর্শক হেসে লুটোপুটি খাবেন। তবে যে-সব দর্শকের কিছুটা আত্মসম্মান-বোধ আছে তাঁরা ওই সব স্থূল রঙ্গরস দেখে খুব একটা মন খুলে হাসবেন মনে হয় না। কারণ বোকার মতন কেউ হাসতে চান না।

মফঃস্বলে চাকুরি নিয়ে যাবার পর সীতেশের (রঞ্জিত মল্লিক) উপর কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতারা যে-ভাবে চড়াও হয়েছেন সেটা এই কমেডি-চিত্রের মূল উপকরণ বলা যেতে পারে। এই কমেডিতে কোথাও কোন সূক্ষ্ম কল্পনার রেশ নেই। সবটাই কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর মতন। সীতেশ যে প্রেমে পড়েছে অর্থাৎ তার প্রণয়ের যে ঘটনা তাও একান্ত মামুলি। আর ওই রক্ষণশীল শিক্ষকের মেয়ে নীপার (মিঠু মুখার্জি) যে সাজ তাও অদ্ভুত। বাবাকে যার এত ভয় তার এমন সাজ কেন? ওই সাজে নায়কের মন ভুলাতে পারে, দর্শকের কাছে সেটা বিরক্তিকরই মনে হবে। কমেডিতে যে বাস্তবকে না মানলেও চলে এটাই মনে হয় পরিচালকের একমাত্র ভরসা। তবে এই কমেডি-লাইসেনস-এরও একটা সীমা আছে। আরও তাজ্জব ব্যাপার মফঃস্বলের ফাংশানে ছেলে-মেয়ের গানের লড়াই। ওই বিকারের প্রমোদ অনুষ্ঠান যে হিন্দীচিত্রেও অভাব যায় না। তবে গানে মান্না দে ও আশা ভোঁসলে গলা দিয়েছেন এবং নচিকেতা ঘোষ সুররচনা করেছেন বলে রক্ষা।

পরিচালক সংলাপেও কমেডি রচনা করতে চেয়েছেন। যদিও সে-কাজ বিশেষ সফল নয়। জনৈক গুলবাজ ব্যক্তির কথা-গুলি বার বার শোনার ফলে পরের দিকে আর হাসাতে পারে না। তা-ছাড়া এই গল্পটি তো 'ব্রজবুলি'-র, নতুন করে শোনাতে গেলে যে নকলটাই ধরা পড়ে। পরিচালকের বেশি আস্থা দেখা গেল শিল্পীদের উপর, বিশেষ করে কমেডি-অভিনয়ে যাঁদের সুনাম। তবু অনুপকুমার বা রবি ঘোষকে পরিচালক বিশেষ কাজে

"এই তিন মঞ্জ" (পরিচালনা : সুবীর সরকার) ছবিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ বসু
ফটো—দেশ

লাগাতে পারেননি। ছবিটিকে অভিনয়ের জন্য অবশ্য দেখতে ভাল লাগে। সে অভিনয় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের। রঞ্জিত মল্লিক ও মিঠু মুখার্জি যথাসম্ভব চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। কৌতুকে যোগ দিয়েছেন অনেকেই—শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, দিলীপ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ'রা নিজস্ব অভিনয়ের গুণে অনেক পরিস্থিতি জমিয়ে দিয়েছেন। নতুবা সব মিলিয়ে মৌচাক কাঁচা কমেডি, হাসির হুল ফোটাতে পারে না।

বোম্বাই বিচিত্রা

কৌতুকাভিনেতা অসিত সেনের এক ফাঁড়া গেল। তিনি একটি দুরন্তগতি জীপে যাচ্ছিলেন, জীপটি উলটে গিয়ে পর পর দুটি ডিগবাজি খায়, অবশেষে চিৎ হয়ে পড়ে। এই গোটা দুর্ঘটনা ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। আসলে চলন্ত জীপের দৃশ্যটি ছিল একটি ছবির—ফরেব—শুটিঙের বিষয়। দুর্ঘটনাটা ফাউ হিসাবে পাওয়া গেল। জীপে পুলিসের বেশে অসিত সেন ছাড়া ছিলেন আরও তিন তরুণ শিল্পী। একমাত্র অসিত সেনের আঘাতই কিছু গুরুতর। তাঁর ডান হাতের হাড় ভেঙেছে। নানাবতী হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়।

* * *

তিন ধরনের হিন্দী ছবি পরিণয়-এ এখন তারকা ঘটিত গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। কান্তিলাল রাঠোড় যখন শুটিং শুরু করেন, তখন এই ছবির নায়ক এবং নায়িকা ছিলেন একরকম অখ্যাত। তাঁরা হলেন : রমেশ শরমা এবং শাবানা আজমী।

পরিণয় শেষ হওয়ার আগেই শাবানা-অভিনীত অংকুর ছবিটির প্রচুর প্রশংসা হয়, ফলে শাবানা আজমী 'তারকা' হয়ে যান। রমেশ শরমা-অভিনীত দুখানি ছবি (আলিঙ্গন, দুসরী সীতা) ইতিমধ্যে চলেছে, কিন্তু রমেশকে নিয়ে তেমন হইচই হয়নি। পরিণয় চিত্রের প্রযোজক ছবির প্রচারলিপিতে শাবানার নামটি শীর্ষস্থলে ব্যবহার করেন। এতে রমেশ শরমা ক্ষুব্ধ। রমেশের বক্তব্য, 'টপ বিলিং' তাঁরই পাওয়ার কথা, প্রযোজক সংস্থা তাঁকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাছাড়া পুনা ইনস্টিটিউটেও তিনি শাবানার চেয়ে সিনিয়র ছিলেন, দুজনেই সেখানে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

প্রযোজক-সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ব্যাপারটার জন্য দায়ী ছবির পরিবেশক-সংস্থা। পরিবেশকদের ধারণা, ছবিটির স্বার্থে প্রচারলিপিতে শাবানার নাম আগে রাখা উচিত। এই কথা শুনে রমেশ বিরক্ত বোধ করেছেন, তাঁর ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশও করেছেন। কিন্তু ছবির কাজ তো শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই আর কিছু তাঁর করার ছিল না।

প্রযোজকদের তরফ থেকে পরে ত্রুটি সংশোধনের কিছু চেষ্টা হয়। একটি প্রচারলিপিতে এখন রমেশ শরমার নাম প্রথমে রাখা হয়েছে। আর একটি প্রচারলিপিতে শাবানার নাম আগে—সেটি আগেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল। ছবির পরিচয়লিপিতে (সেটি নতুন করে আবার তোলা হয়) রমেশ শরমার নাম প্রথমে; কিন্তু ছবির বুকলেট-এ শাবানাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ পরিবেশকদের কথাও থাকল, থাকল রমেশ শরমার কথাও—অর্ধেক, অর্ধেক।

কিন্তু এই পাবলিসিটিতে কি রমেশ শরমার সত্যিই কিছু সুবিধা হবে? আসলে পরিণয় ছবিটি যদি দর্শকদের ভাল লাগে, সেই সঙ্গে রমেশের অভিনয়, তবেই তাঁর সাফল্যের পথ হবে সুগম। সাফল্যের ওই একটিই পথ। বিজ্ঞাপনে কার নাম আগে, কার নাম পরে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী।

* * *

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্প্রতি গুলজার এবং রাখী সম্পর্কে বাজে খবর রটানো হয়েছে। ও'দের নাম করা হয়নি বটে, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংবাদে উল্লিখিত দম্পতিটি গুলজার-রাখী। বলা হয়েছে, ও'রা আলাদা থাকছেন। আরও আভাস দেওয়া হয়েছে, রাখী নতুন ছবিতে কাজ নেবার জন্য প্রস্তুত।

এটা হচ্ছে তিলকে তাল বানানোর একটি নমুনা। ঘটনাটা এই : খুশবু ছবির আউটডোর শুটিঙের জন্য গুলজারকে বোম্বাইয়ের বাইরে যেতে হয়েছে। পালি হিল ফ্ল্যাটে একা থাকতে না পেরে রাখী আপাতত খার-এ তাঁর পুরনো ফ্ল্যাটে এসেছেন, কিছুদিনের জন্য। এই সহজ ব্যাপারটাকে সহজ দৃষ্টিতে কেন দেখা যায় না, বুঝি না।

* * *

অভিনেত্রী বীণা সম্পর্কে বিশেষ লেখা হয় না, এবার তাঁর বিষয়ে আপনাদের কিছু জানাই। বীণার অভিনয়-জীবন শুরু হয় পাঞ্জাবে, ১৯৪২ সনে। বীণা তখন কলেজের ছাত্রী, তাঁর ভাই সহকারী চিত্র-পরিচালক। বীণাকে তিনি বলেন, ও'দের নতুন ছবির জন্য ও'রা নায়িকা খুঁজছেন। বীণা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমাকে নিচ্ছ না কেন?' ভাই তো অবাক। ভদ্র, গোঁড়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে এগিয়ে আসবেন, সেকালে এটা ভাবা যেত না। বীণা ওইসব সংস্কারের তোয়াক্কা করেননি, উক্ত ছবিতে নেমে গেলেন। পরে অভিনয় করলেন আরও একটি পাঞ্জাবী ফিল্মে। ১৯৪৩ সনে মেহবুবের এক কথায় চলে এলেন বোম্বাইয়ে।

বোম্বাইয়ে তাঁর প্রথম ছবি নাজমা। সেকালের শিল্পীরা ছবির চুক্তিপত্রে সই দেবার সময় কোনও রকম শর্ত আরোপ করতেন না। কোনও প্রশ্ন তোলাও ছিল রীতি-বিরুদ্ধ। বীণা তাই জানতেও চাননি, কে ওই ছবির নায়ক। পরে শুনলেন, নায়ক 'বাবু।' বীণা ভাবলেন, বাবু নিশ্চয় কোনও নবাগত অভিনেতা। শুটিঙের সামান্য আগে জানতে পারলেন, এই বাবু অশোককুমার, যাঁকে তিনি কংগন, বন্ধন, ঝুলা-য় দেখেছেন, এবং যিনি বীণার

"প্রেমের ফাঁদে" (পরিচালনা : চিত্রগুপ্ত) ছবিতে কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি

একান্ত প্রিয় নায়ক। অশোককুমারকে যে মেহবুব "বাব্দু" বলেন, এটা তাঁর জানা ছিল না। যাই হোক, অশোককুমারের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে জেনে তিনি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। "আপনি নারভাসনেস্ কাটালেন কেমন করে"—এই প্রশ্নের উত্তরে বীণা সেদিনের কথা স্মরণ করে একটু হাসলেন। বললেন, "না, ওটা মোটেই কাটাতে পারিনি। তবে একটা সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। নাজমা তো মুসলমান সমাজের গল্প, তাই বরাবরই আমি ছিলাম পরদার আড়ালে। ওই ব্যাপারটা আমাকে বাঁচিয়ে দেয়।" বীণার পরবর্তী ছবির নায়কও ছিলেন অশোককুমার। সেটিও মেহবুব প্রোডাকশনসের ছবি—হুমায়ুন। বীণা রাজপুত রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, নাম-ভূমিকায় অশোককুমার।

পৃথ্বীরাজ এবং রাজ কাপুরের পাশে তিনি বিভিন্ন ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন। এক চিত্রে পৃথ্বীরাজের প্রণয়িনী, অপর চিত্রে রাজ কাপুরের—এতে তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়নি? না, সেটে পৌঁছে গেলে নিজের চরিত্র ছাড়া অন্য ভাবনা তাঁর থাকত না, "সহ-অভিনেতার ব্যক্তিগত পরিচয়ও ভুলে যেতেন।" শিল্পী এবং পরিচালক হিসাবে রাজ কাপুরের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। বীণার দুঃখ, রাজ কাপুর-পরিচালিত কোনও ছবিতে তিনি অভিনয়ের সুযোগ পাননি। পুরনো পরিচালকদের মধ্যে সোহরাব মোদী, ভি শান্তারাম, মেহবুব এবং কে আসিফ তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এখনকার পরিচালকদের মধ্যে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, কামাল আমরোহী এবং আলো সরকারকে তিনি প্রশংসা করলেন। উত্তরকুমারের ছোটীসী মুলাকাত (আলো সরকার-পরিচালিত) ছবিতে কাজ করে তিনি আনন্দ পেয়েছেন।

চল্লিশের দশকে অভিনেতা আল নাসিরের সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়। অকালে স্বামীর মৃত্যু হল। বীণার একমাত্র সন্তান একটি কন্যা। বীণা এখন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বয়স্ক-চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর উৎসাহ এবং উদ্যম এখনও অদম্য—হাসেন দিল্ খুলে। উচ্ছল এই হাসির ধরন আলাদা, তাঁর অভিনীত এখনকার চরিত্রের সঙ্গে সেটা মেলে না।

সুরঞ্জন

কর্কট লগ্ন

(রোটারী ক্লাব)

আজকাল অনেক অপেশাদার সংস্থা কখনো কখনো বিশেষ পেশাকে নাট্য বিষয়-বস্তু করে অভিনয় করছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার রোটারী ক্লাব তাঁদের উৎসব লগ্নে মঞ্চস্থ করলেন এমনি একটি নাটক, নাম—'কর্কট লগ্ন'। ক্যান্সার রোগ নিয়ে অতি রুগ্ন প্রযোজনার নাট্যকার ডঃ সরোজ গুপ্ত এবং নির্দেশনায় ছিলেন কৃষ্ণ কুণ্ডু।

তা নাট্যকথা যদিও ক্যান্সার সম্পর্কিত ইতিবাচক-নেতিবাচক দিকগুলো নিয়েই আবর্তিত তথাপি ক্যান্সার রোগ বিরোধী অভিযানের যথার্থ রূপকআলেখ্য তো হতেই পারলো না, উপরন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জোড়াতালি ধরনের কিছু বলেই কানে মনে হয়েছে। উল্লেখ আবশ্যক নাট্যকার নিজে একজন এই রোগ বিশেষজ্ঞ। সুতরাং সেখানে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কিছু অজ্ঞাত এবং নতুনতম তথ্য ও সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সতর্কতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাতটাই একান্ত এবং সঙ্গত প্রত্যাশা বলতে হয়। কিন্তু সেখানে পুরোপুরিই হতাশ করেছেন তিনি। তথৈবচ এর প্রয়োগ কৌশল। নাটকের গোড়াতে যখন সাদা পর্দায় ছায়াপাতের মাধ্যমে ক্যান্সারের জীবাণুগুলোকে দেখানো হচ্ছিল সেই মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষাটুকু সম্পূর্ণতই ধূলিসাৎ হয়ে যায় তখনই যখন পরবর্তী দৃশ্য থেকেই শুরু হলো সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষদের জীবনকাহিনী। নাটকের সেট-সেটিং সবই ভালো এবং দৃশ্যোপযোগী, কিন্তু টিমওয়ার্ক একেবারেই অপরিণত। উল্লেখ করা যেতে পারে পাত্র-পাত্রীদের প্রায় সকলেই যার যার নিজের সংলাপটুকু মুখস্ত করেছিলেন বলে তো মনেই হয় না, তাছাড়া মঞ্চে ওদের আগমন নির্গমনও রসিক দর্শকের সমীপে রীতিমত হাসির খোরাকই যুগিয়েছে। কে কাহিনীর নায়ক অথবা কেই বা নায়িকা এটা খুব একটা স্পষ্ট না হলেও নাটকের কনক্লুশন অংশে দেখা গেছে মাত্র তিনজন—অতনু রায়, বিনতা চৌধুরী এবং সুব্রত সেন। স্ব স্ব ভূমিকায় তিনজনই সমান উত্তীর্ণ, তবে বিনতা চৌধুরী হয়তো বা এঁদের চাইতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা উজ্জ্বল। আর খানসামা নিধুরাম তো অনবদ্য। সাবলীল অভিনয়ে, সরস সংলাপ কথনে, চাল-চলনে গোটা প্রেক্ষাগৃহকেই মাতিয়ে রেখে-ছিলেন তিনি। মিঃ মিত্র অর্থাৎ সুবিমলের ভূমিকায় অতীন মিত্র স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। মাঝে-মধ্যেই তাঁর মুখে রবীন্দ্র কবিতার উদ্ধৃতি নাট্যগতিকে ব্যাপ্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আপাত সহায়কই বলতে হয়। নিজস্ব রূপদক্ষতায় কোথাও কখনো দু'-একটি চরিত্রোচিত সংবেদনশীল মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বিনতা চৌধুরীর রূপকার রুনু বড়াল। এ ছাড়া বাদবাকী-দের সবাই যে যার মত পেরেছেন অভিনয় করে গেছেন। অন্যত্র ভুল-ভ্রান্তি, উল্টো-পাল্টা আলোর প্রক্ষেপ, উইংসের পাশ থেকে প্রম্পটারের বারংবার সোচ্চার নির্দেশ আলোচ্য প্রযোজনার উল্লেখ্য ত্রুটি শুধু নয় —রীতিমত অসহ্য। আবহসংগীতও বড্ড উৎকট এবং কোন কোন অংশে বেমানানও বটে। নাট্য কাহিনীর অনুযায়ী মঞ্চে এসে-ছিল আরও কিছু চরিত্র। যেমন—মিঃ ও মিসেস ঘোষাল, কুনাল সেন, ডঃ মুখার্জী, নার্স, জনৈক রোগী, পল্লীবধূ......প্রমুখ। আলোচ্য নাটকের আরও একটি অন্যতম চরিত্র মিসেস মিত্র অর্থাৎ জয়া মিত্র—যে কিনা এই তথাকথিত হাই সোসাইটির রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যারেক্টার স্বরূপ। কিন্তু সব চাইতে বেশী হতাশ করেছেন তিনি।

—নাট্য সমালোচক

শ্রীউৎপল চক্রবর্তী : নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সেদিন এক বন্ধুকে রামায়ণ পড়াতে শুরু করলাম। আগে অক্ষর পরিচয় মাত্র হয়েছিল তার। তা প্রথম কাণ্ডের প্রথম পাতাতেই সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বললাম, আহা, এখনও তো তেমন দুর্দৈবজনক কিছু ঘটেনি। সে বলল, না দাদু, ছোটবেলায় কত বড় বড় অ আ ক খ দেখেছিলাম, এখন এতটুকু হয়ে গেছে। কতদিন দেখিনি ওদের! এর মধ্যেই এই চেহারা!

বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। বড় বইয়ের বেলাতেও তেমনি ছোট ছোট হরফ।

*   *   *

সদাশয় সরকার বাহাদুর কলকাতায় আরেকটি আধুনিক শ্মশান প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছেন—এটি আধুনিক সুখ-সুবিধা সব

নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক শ্মশান হবে, সম্ভবত শীততাপনিয়ন্ত্রিতও হতে পারে।

অতঃপর নাগরিকদের আর মরার কোনো অসুবিধা রইল না।

*   *   *

শ্রীমতী গান্ধীর প্রাক্তন সচিব শ্রীহাকসারের ধারণা, আর দু চার বছরের মধ্যে চীন শান্ত সমাহিত হয়ে যাবে: তখন তাঁরা চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাবার হেতু এগোবেন।

হ্যাঁ, ঠান্ডা মেরে যাবার পরই মাও ধরা সহজ।

*   *   *

দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের শ্রমিকদের ডাক দিয়েছেন অবশেষে।

ডাকটা ঠিকঠাক হয়েছে। কেন না, তাদের পক্ষেই তা করা সহজ, যেহেতু

নিজেদের অভাবমূর্তি নিয়ে পাশে দাঁড়ালেই তুলনাপ্রেক্ষিতে, স্বভাবতই আর সবার ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল হবে।

*   *   *   *

ডাঃ গৌর সেন : 'আমরা জানি যে প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে মাছের মাথা খেলে, মাথা খোলে, বুদ্ধি বাড়ে। বন্ধু জানালেন, এটি ভুল ধারণা। কেন না কেবল বোকা মাছরাই ধরা পড়ে। চালাক মাছ সহজে ধরা দেয় না। তবে বোকা মাছের মাথা খেলে ত বুদ্ধি আরো কমে যাবে। কথাটা ভারী ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে।'

যাক্, এবার মাথায় মাথায় রক্ষা পেলাম—আমরা আর মাছরা।

*   *   *

শ্রীকোকিলচন্দ্র খুটিয়া : 'শুনলাম বিলাসপুরের কোন এক পাড়ায় নাকি একটি মেয়ে টাকা ম্যানেজ করার ধান্দায় কয়েকদিন যাবৎ ঠিক সন্ধ্যে হলে এক একজন যুবকের বাড়ি ঢুকে যেত। তারপর বলত, দেখুন, চটপট কিছু টাকা দিয়ে দিন, নইলে আমি চিৎকার করে পাড়ার লোকদের ডাক দেব, ডেকে বলব আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে জোর করে অসঙ্গত আচরণ করছেন। কয়েকজনকে এরূপ ধোঁকা দেওয়ার পর একজন অ্যাডভোকেটের বাড়ি ঢুকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে পুলিসের হাতে তুলে দেন।

ম্যানেজ করতে এসে আসল উওম্যানেজারের পাল্লায়!

*   *   *

শ্রীমতী সবিতা নন্দী : 'আমার স্বামীর বন্ধু এক আয়কর অফিসার নানা গল্পের মাঝখানে জনৈকা ভদ্রমহিলা (যিনি কানাঘুষায় বারবণিতা হিসেবে পরিচিতা) আয়কর রিটার্নে নির্ভুল নির্ভেজাল, নিঃসন্দেহ সত্য আয়ের হিসাব দাখিল করার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। উক্ত ভদ্রমহিলার আয়কর রিটার্নে দাখিল করা আয়ের হিসাব সম্পর্কে অফিসার বন্ধুটি এতটা নিশ্চিতভাবে সন্দেহহীন হলেন কি করে? তবে কি ঐ অফিসারটি নিজের ব্যয়ের হিসাবটি যে নির্ভুল নির্ভেজাল সত্য সে সম্পর্কে একেবারে সুনিশ্চিত?'

আয়কর অফিসারের ঘাড় ভেঙে আয় করলে তার কোনো হিসাব থাকে না।

*   *   *

ব্যাংকের যে কোনো বাচ্চা অ্যাকাউণ্ট হোল্ডার যদি আরেক বাচ্চার অ্যাকাউণ্ট খুলিয়ে দিতে পারে তবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ দুটি ঘুড়ি দেওয়া হবে।

আসলে টাকা ঐ ঘুড়ির মতই উড়িয়ে দেবার জিনিস তো।

*   *   *

শ্রীসুদীপ্ত চক্রবর্তী : পশ্চিমবঙ্গে সহজে নাকি চাকুরি হয় না, তার কারণ কি কম্পিটিশন বলে আপনার ধারণা।

আজ্ঞে না, বেশি পিটিশন বলেই আমার মনে হয়।

*   *   *

মুখ্যমন্ত্রী বার্ডওয়ান স্টেশনের নাম পালটে বর্ধমান রাখার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এক ঢিলে তাঁর এবার একটি [illegible] সাবাড়।

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পুর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

বাঙলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বিজিতকুমার মুখার্জী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
অধীশ সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাষিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা		৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৪২ বর্ষ

১ম সংখ্যা থেকে ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত

—অ—

অনুশীতপত্র (কবিতা)—অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৫৬
অরণ্যদেব— ৭৯, ১৫৮, ২৩৯, ৩১৯, ৩৯৩, ৪৭২, ৫৫৯, ৬৩৯, ৭১৪, ৭৯৪, ৮৬৬, ৯৪৩, ১০০৮
অলীক (কবিতা)—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪১৪
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী ৮০, ১৬০, ২৪০, ৩২০, ৩৯৪, ৪৭৮, ৫৬০, ৬৪০, ৭২০, ৮০০, ৮৭২, ৯৪৪, ১০১৪
অশন বসন ভাষণ—রঞ্জন ... ৪১৩

—আ—

আমার কাঁচা সবুজ (কবিতা)—অপর্ণা সেন ... ৬৫৬
আরও এক বছর— ... ৯
আলোচনা— ৫৭, ১৩৯, ২১৯, ২৯৯, ৩৭৭, ৪৫১, ৫৩৭, ৬২১, ৬৯৯, ৭৮১, ৯২৫, ৯৯৫
আলো থেকে অন্ধকারের সন্ধানে—রঞ্জন ... ৭৩৪

—উ—

উৎসব হবে (কবিতা)—অজয় নাগ ... ৮১৩

—এ—

এ কেমন উৎসব?— ... ৩২৯
এ বৎসর কেমন যাবে—রঞ্জন ... ৯৫৭
একটি প্রবাল দ্বীপের কথা— ... ৬৪৯
একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু—দিব্যেন্দু পালিত ... ৯৬৭
এমনি করে হারাই (কবিতা)—দেবতোষ বসু ... ৩৩৫

—ও—

ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন অধিনায়ক—মুকুল ... ১৫০
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাহাতি কানহাই—মুকুল ... ৪৬৯
ওয়েস্টল্যান্ড-পাউন্ড ও এলিয়ট পরিবার— ... শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৬৮৯

—ক—

কবিতা (কবিতা)—শান্তি সিংহ ... ৯৫৬
কল্পনাতীত (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৭৩৫
কালের পদাবলী—সত্যেন্দ্র আচার্য ... ৮৯১
কায়াকল্প—প্রসূন মিত্র ... ৮১৭
কি বর্ণের ঘুম (কবিতা)—রাণা চট্টোপাধ্যায় ... ৩৩৫
'কিং' সোবার্স এখন স্যার গ্যারফিল্ড—মুকুল ... ৯৩৪
কিশোরীর ফুল (কবিতা)—দেবারতি মিত্র ... ৩৩৫
কেন জানি না—শিশির লাহিড়ী ... ২৮৫
কোথাও ভিতরে (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা ... ৯৪
ক্যালিপ্সো ক্রিকেটের শিল্পী লরেন্স রো—মুকুল ... ৩১০

—খ—

খেলার মাঠে—একলব্য ৭৩, ১৫১, ২৩১, ৩১১, ৩৮৫, ৪৭০, ৫৫২, ৬৩৩, ৭১১, ৭৯২, ৮৬৩, ৯৩৫, ১০০৬

—গ—

গজল সম্রাজ্ঞী—জ্যোতির্ময় বসুরায় ... ২০৯
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব ৫৫, ২০৭, ৩৮১, ৫৮৯, ৭৪৩, ৮৯৭
গারো গোষ্ঠীর উৎস সন্ধানে—আরতি দাস ... ৭৮৩
গ্রহণের স্নান—সমরেশ মজুমদার ... ১০১

ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী ৪৯, ১১১, ১৯৭, ২৯৫, ৩৬১, ৪৪৫, ৬০৭, ৬৮৭, ৮৩৭, ৯১১, ৯৯১
ঘরেও নহে পারেও নহে—রঞ্জন ... ৮৮৪

—চ—

চড়ুই—প্রভাত দেব সরকার ... ৪৯৭
চাপ সৃষ্টি করুন (কবিতা)—শঙ্খ ঘোষ ... ৯৪
চিত্রগত কাহিনী—নীরোদ রায় ... ৯৫৯
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় ৫১, ' ৩৭, ১৯৯, ২৮৩, ৩৭১, ৪২৯, ৫৩৫, ৬৬৭, ৭৭৯, ৮৩৯, ৯১৭, ৯৭৫
চৌকস ক্রিকেটার মদনলাল—মুকুল ... ১০০৫

—ছ—

ছিল রুমাল হয়ে গেল একটা বেড়াল—রঞ্জন ... ১৭৭

—জ—

জাতির নামে বজ্জাতি—রঞ্জন ... ৪৯৫
জাপানের এ বি সি ডি—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ... ১৮৫
জীবন্মৃত্যু অমরতা : গিলগামেশের এপিক— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ... ৯১৯

—ঝ—

ঝোড়ো বর্তমান (কবিতা)—শান্তনু দাস ... ৪৯৩

—ট—

টেস্ট ক্রিকেটে নব অভিষিক্ত—মুকুল ... ৮৬২

—ঠ—

ঠাকুর ঘর (কবিতা)—রাজলক্ষ্মী দেবী ... ৯৪

—ড—

ডেকে নাও (কবিতা)—শংকর চট্টোপাধ্যায় ... ২৫৫
ডেলিগেট—কল্হন্ ... ৭০৭

—ঢ—

ঢাকার চিঠি ১৩৩, ২১৫, ৪৪৭

—ত—

তুমি কি বেসেছ ভাল—চিত্ররথ দত্ত ... ১৭৯

—থ—

থাকো, যেও না (কবিতা)—প্রান্তিক বসু ... ২৫৫

—দ—

দিয়ে দাও (কবিতা)—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ... ৯৫৬
দুই ঐতিহাসিক দিবস— ... ৯৫১
দুর্দিন—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৫৭৯
দেখো ফুল কিনছে ফুলকুমারী (কবিতা)— সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৭৬
দেশী ভূগোলের বিলাতী বিপদ— ... ৪৮৯
দোরঘড়ি (কবিতা)—কমল চক্রবর্তী ... ৪১৪
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত ১১, ৯১, ১৭৩, ৩৩১, ৪০৯, ৫৭১, ৬৫১, ৭৩১, ৮০৯, ৮৮১, ৯৫৩
দৃশ্যমান (কবিতা)—সুরজিৎ ঘোষ ... ৪১৪

—ন—

নষ্ট মধু (কবিতা)—[illegible] চক্রবর্তী ... ২৫৫
নিজে [illegible] (কবিতা)—[illegible] চট্টোপাধ্যায় ... ১৫
নিজের জন্য (কবিতা)—[illegible] মিত্র ... ২৫৫
নিস্তাপ (কবিতা)—[illegible]কুমার বসু ... ৩৫৫

—প—

পদাবলি (কবিতা)—অজিত চক্রবর্তী ... ৭০৫
পাপ (কবিতা)—সুব্রত রুদ্র ... ৪১০
পিকনিক (কবিতা)—বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় ... ৪১৪
পুষ্পলতা চক্রবর্তী—লীলা মজুমদার ... ৫২১
পুনরুত্থান (কবিতা)—রজত মিত্র ... ১৭৬
পুরাকীর্তির সংরক্ষণ— ... ৫৬৯
পুরুলিয়ার কৃষকের প্রতি (কবিতা)—প্রদীপচন্দ্র বসু ... ৯৬৬
পুস্তক পরিচয়— ৬৭, ১৪৭, ২২৭, ৩০৯, ৩৮২,
৪৬৬, ৫৪৭, ৬২৭, ৭০৮, ৭৮৭, ৮৫৯, ৯৩১, ১০০৩

—ফ—

ফ্লান্সিস জেভিয়ারের গোয়া—আরতি সেন ... ৭৪৯

—ব—

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ—ভবতোষ দত্ত ... ৭৫৭
বন্ধু তুমি যুগে যুগে (কবিতা)—দেবাঞ্জলি মিত্র ... ৮১৩
বন্ধুর স্মরণে (কবিতা)—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ৫৭৫
বয়েল—লেগ স্পিনার থেকে ফাস্ট বোলার—মুকুল ... ৭৯১
বাংলায় মহাভারত চর্চা—প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৯৭
বার্নার্ড জুলিয়ন সোবার্সের ছায়া—মুকুল ... ৩৮৪
বিজ্ঞানের আদর্শ— ... ৮৭৯
বিদেশী বই— ... ৩০৮
বিনে স্বদেশী ভাষা— ... ২৪৯
বিপন্না এ পৃথিবী—ইন্দ্রজিৎ ... ৮৮৭
বিশ্বাজ্ঞান—সমরজিৎ কর ৪১, ১১৯, ১৯৩, ২৭১, ৩৬৭,
৪৩৫, ৫২৯, ৫৯৫, ৬৭৯, ৭৭১, ৮৩১, ৯০৩, ৯৮৩
বিহারে বিপত্তি আর গ্যাংটকে গণ্ডগোল—রঞ্জন ... ২৫৬
বুদ্ধদেব বসু—আশরাফ সিদ্দিকী ... ৩৫৩
বেস্ট বাঁ-হাতি ওপেনার—মুকুল ... ৭১৩
বৈদেশিকী—দেবরাজ ১২, ৯২, ১৭১, ২৫২, ৩৩২,
৪১১, ৪৯১, ৫৭৩, ৬৫২, ৭৩২, ৮১০, ৮৮২
ব্যংগচিত্র— ৯০, ১৭০, ২৫০, ৩৩০, ৯৬৪
৪০৮, ৪৯০, ৫৭০, ৬৫০, ৭৩০, ৮০৮, ৮৮০, ৯৬২
ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়—সৈয়দ আবদুস সুলতান ... ২৫৭
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব— ৩৩, ১২৯, ২১১, ৩৭৩, ৫০৫, ৬৯৫, ৮৪৫
ব্যথা সারে! (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৩৩৪
ব্যাধিবিহীন বিশ্বজীবন— ... ৪০৭

—ভ—

ভারতে ইতিহাসের গবেষণা— ... ৮০৭
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত ৫৩, ৯৬, ২১৭, ২৯৭,
৩৩৬, ৪৪৯, ৫১৩ ৬১৯, ৬৯৭, ৭৭৭, ৮১৪, ৮৮৬, ৯৯৩
ভারতের এক নম্বর ব্রিজ খেলোয়াড়—মুকুল ... ২২৯

—ম—

মধ্যপ্রাচ্যের উন্মত্ততা—রঞ্জন ... ৮১২
মনে নেই (কবিতা)—তারাপদ রায় ... ১৫
মানুষের আদি জন্মভূমি— ... ১৬৯
মুখ চাই মুখে—মিলন মুখোপাধ্যায় ৩৩৯, ৪৩৯, ৫১৫,
৬০১, ৬৬৯, ৭৫৩, ৮৩৪, ৯০৭, ৯৭৯
[illegible]—ইন্দ্রজিৎ ... ৬৭৩
[illegible] পাড়ার জন্য (কবিতা)—[illegible] ইসলাম ... ১৭৬

—য—

যখন একাকী রেখে যাও (কবিতা)—গোবিন্দপ্রসাদ বসু ... ২৫৫
যন্ত্রণা (কবিতা)—ফজল-এ-খোদা ... ৯৫৬
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৭, ১২৩, ১৮৯, ৪২৩,
৫০৯, ৫৯১, ৬৭৫, ৭৪৫, ৮২৭, ৮৯৯, ৯৭১
যাত্রার পুনরুত্থান—রঞ্জন ... ৫৭৭
যাঁর হাতে টেস্ট টিকিটের চাবিকাঠি—মুকুল ... ৬৩১
যুক্তিতর্ক (কবিতা)—শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ... ৪১৩
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু ৪৫, ১১৫, ২০১, ২৭৫,
৩৬৩, ৫৪১, ৫২৫, ৬১১, ৬৮৩, ৭৬৫, ৮৪১, ৯১৩, ৯৮৭

—র—

রংগজগৎ— ৭৫, ১৫৩, ২৩৩, ৩১৩, ৩৮৭,
৪৭৩, ৫৫৫, ৬৩৫, ৭১৫, ৭৯৫, ৮৬৭, ৯৩৯, ১০০৯
রমণীগোলাপ (কবিতা)—সাধনা মুখোপাধ্যায় ... ৬৫৫
রিপোর্ট (কবিতা)—অরুণকুমার সরকার ... ৯৪
রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা— ৯৩, ১৭৫, ২৫৩, ৩৩৩,
৪১২, ৪৯৪, ৫৭৪, ৬৫৪, ৭৩৩, ৮১১, ৮৮৩, ৯৫৫

—ল—

লক্ষ্মণ মিস্ত্রির জীবন ও সময়—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৪৩
লালীর জন্য—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ... ২৩

—শ—

শহীদ বেদীর আড্ডা—সিদ্ধার্থ রায় ... ৬৫৭
শাশ্বতের ঘরে (কবিতা)—রফিক আজাদ ... ৮১৩
শৈশবের নীচে (কবিতা)—শংকর চক্রবর্তী ... ৯৫৬
শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী—মুকুল ... ৭১

—স—

সমকালীন কবির প্রতি কীর্তনিয়া (কবিতা)—
জিয়া হায়দার ... ১৭৬
সম্পর্ক (কবিতা)—সমীর রায়চৌধুরী ... ৪[illegible]
সাত্ত্বিক ফাস্ট বোলার অ্যান্ডি রবার্টস—মুকুল ... [illegible]
সাবধান, সব দরজা জানালা বন্ধ রাখো—সমীর রক্ষিত ... ৪১৫
সামাজিক জেলা সম্মিলনী— ... ৭২৯
সাহিত্যবিলাসী সিরিল কনলি—রঞ্জন ... ৬৫৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক ৬৫, ১৪৫, ২২৫, ৩০৭,
৩৩৭, ৪৬৩, ৫৪৫, ৬২৫, ৭০৫, ৭৮৫, ৮১৫, ৯২৯, ১০০১
সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী—
নকুল চট্টোপাধ্যায় ... ৯৭
সুন্দরবন—কার্তিকচন্দ্র শাসমল ... ৮৪৯
সে আমার কেউ নয় (কবিতা)—রণজিৎ দাস ... ৮১৩
স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা— ... ৮৯
স্বাধীনতা হীনতায়—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ২৭৯

—হ—

হাওয়া উড়ে যায় (কবিতা)—দিব্যেন্দু পালিত ... ৬৫৬
হে বিদেশী ফুল—কৃষ্ণা বসু ... ৯৫৯
হে শাসক (কবিতা)—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ... ১৫

মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ, বম্বে-৪০০ ০১২
mcm/mg/28 bn

দেশ
১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ ॥, ৮০ পয়সা
সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
৬ বছরের পুরাতন

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
'একবিংশ'-	... ৭
ব্যঙ্গচিত্র—	... ৮
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত	... ৯
বৈদেশিকী—দেবরাজ	... ১০
রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা—	... ১১
দড়ি ধরে ওঠো (কবিতা)—বিজয়া মুখোপাধ্যায়	... ১২
স্কেচ (কবিতা)—গিরিধারী কুণ্ডু	... ১২
আঙুল, গান এবং নদী (কবিতা)—ফিরোজ চৌধুরী	... ১২
যদি ওড়ে (কবিতা)—মৃণাল বসু চৌধুরী	... ১২
এই দুর্মর, দুর্মুখ দুর্নীতি—রঞ্জন	... ১৩
চিত্রগত কাহিনী—নীরোদ রায়	... ১৫
দুই বৃদ্ধের কাহিনী—অসীম রায়	... ১৭
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর—শিবরাম চক্রবর্তী	... ২৫
পথ ও পাথেয় : রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য-প্রতিবেদব	... ২৭
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	... ২৯

সূচীপত্র

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	৩৩
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায়	...	৩৫
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	৩৯
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর	...	৪১
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু	...	৪৫
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত	...	৫১
আলোচনা—	...	৫৩
বিদেশী বই—	...	৫৮
পুস্তক পরিচয়—	...	৫৯
বিশ্বযজ্ঞের দুই প্রধান পুরোহিত—মুকুল	...	৬১
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৬৩
অরণ্যদেব—	...	৬৬
রঙ্গজগৎ—	...	৬৭
অল্প-বিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী	...	৭২

প্রচ্ছদ : পি এম ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪
শনিবার ১৮ মাঘ ১৩৮১

'একবিশ্ব'

সমাজ রাষ্ট্র ও জনপদজীবনের সুখী এবং সমৃদ্ধ অবস্থার একটি নিখুঁত রূপ কল্পনা করে আধুনিক কালের কোন টমাস মুর দ্বিতীয় কোন 'উটোপিয়া' লিখেছেন বলে শোনা যায় না। অন্য এক ধরনের কল্পনা-সাহিত্যের উদ্ভব দেখা যায়, যেটা বিশ্বজীবনের পরিণাম সম্বন্ধে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর সাহিত্য। এক শত অথবা দুই শত বৎসর পরে বিশ্বজীবনের যে রূপান্তর সম্ভাবিত হবে, তারই পরিচয় এই দ্বিতীয় প্রকারের কল্পনা-সাহিত্যে চিত্রিত হতে দেখা যায়। যথা, অরওয়েলের কল্পনার সাহিত্য। এর মধ্যে ভবিষ্যতের কোন নিখুঁত সমৃদ্ধ অবস্থার রূপ কল্পনা করবার চেষ্টা নেই। বর্তমানের বাস্তবতা তার গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে যে পরিণাম লাভ করবে, তারই একটি কল্পিত চিত্র। লেখকের বিচার বাস্তবানুগ হলেও আপন-মনের মাধুরী মেশাবার চেষ্টা এ ধরনের রচনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান কালের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে যে বিশেষ একটি আগ্রহের সমুদ্ভব দেখা যায়, তার কথা অনেকের কাছে একটা কল্পনার কিংবা স্বপ্নের কথার মতো বোধ হলেও বস্তুত সেটা বর্তমান বিশ্ব-জীবনের একটি প্রিয় সংকল্পের সাড়া। সাড়াটা মৃদু বটে, এবং সংকল্পের দাবিটাও বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক জীবনে বিরাট ও প্রবল কোন মুখরতা জাগিয়ে তোলেনি, কিন্তু তার সত্তার ব্যাহত না হয়ে বরং আরও স্পষ্ট করে প্রকট হয়ে উঠছে। সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বলতে পারা যায়, 'একবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার আগ্রহ। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সংস্থার ষোড়শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার নাম—বিশ্ব ফেডারেশানপন্থীর বিশ্ব সমিতি। 'একবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার আগ্রহে অনুপ্রাণিত, এমন দুই শত বিদেশী প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীও বিশ্ব-সমিতির এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গত বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শিক যোগ্যতার সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার আদর্শিক উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পারেনি। তবু রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই গুরুত্ব স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্বের জীবনে শান্তিরক্ষা করবার কাজে দ্বিতীয় কোন যোগ্যতর বিশ্বসঙ্ঘ নেই।

বিশ্বজীবনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি ঐক্যসমন্বিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য জাতিসঙ্ঘ তথা 'লীগ অব নেশনস'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন। কিন্তু স্বয়ং জাতিসঙ্ঘ এবং তার আশা, দুইই ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের মার্কিন রাষ্ট্র এই জাতিসঙ্ঘের সদস্য হয়নি। সেই জাতিসংঘ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে সংগঠিত ও স্থাপিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ, উভয়েরই প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে বিশ্বের অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতার বাণীতে এই আশাবাদ মুখরিত হয়েছিল যে, সেদিন আর দূরবর্তী নয়, যেদিন এই সঙ্ঘের কৃতিত্বে 'একবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ওয়েন্ডেল উইলকির লিখিত একবিশ্ব তথা 'ওয়ান ওয়ার্লড' নামক বহু-আলোচিত গ্রন্থটির কথা আজও অনেকে স্মরণ করতে পারবেন। সেই গ্রন্থ সেদিন যেমন অনেকের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল, তেমনই আবার অনেকের সমালোচনায় এই বলে অভিযুক্ত হয়েছিল যে, গ্রন্থ-লেখক খুবই অদ্ভুত এবং হাস্যকর একটা সস্তা বিশ্বাসের বাকাঘটা দেখিয়েছেন। এক বা একাধিক শক্তিমান রাষ্ট্রের শুভ নেতৃত্বের গুণে 'একবিশ্ব' স্থাপিত হবে, এমন ধারণাটাই একটি মৌলিক ভুল। বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখনও এই ভুল ধারণার প্রকোপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি সর্বজাতির সমন্বিত নেতৃত্ব লাভ করবার সুযোগ পায়, তবে 'একবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার পথ অবারিত হবে।

'একবিশ্ব' কথাটির অর্থ নিয়ে নানা ধারণা ও অভিমতের তর্ক দেখা দিতে পারে। সহজ অর্থটি বোধহয় এই যে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র প্রত্যেকেই বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের বিধান মেনে নিয়ে, এবং সর্বপ্রধান এক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের বিহিত রীতি-নীতির শাসন ও প্রশাসনের অংশীদার হয়েও অনুগত হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে কেউ বড়াবাদো বিচ্ছিন্ন না হয়ে সর্বজাতির স্বার্থের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সহযুক্ত হবে।

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্য-পটের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, এ ধরনের একটি 'একবিশ্ব' আদর্শ সামান্য প্রয়াসে অথবা সহজে সফল হতে পারে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেও 'একবিশ্ব' আদর্শের সফলতা লাভের কোন ভরসা নেই, এমন নৈরাশ্যেরও কোন অর্থ হয়না। এমন কথা মনস্বী ঐতিহাসিকের মন্তব্যে শুনতে পাওয়া গিয়েছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি আর পঞ্চাশটি বৎসর বেঁচে থাকতে পারে, তবে নানা সঙ্কট ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার শক্তিতে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘই সেই মহান্ যোগ্যতায় সমুন্নত হতে পারবে, যার কৃতিত্বে 'একবিশ্ব' আদর্শ একটি বাস্তবায়িত ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হবে। যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়, বিশ্ব যেখানে একনীড় হয়, ভারতীয় উপলব্ধির বাণী অনুযায়ী সেখানে অখণ্ড শান্তি, প্রেম ও সৌহার্দের সম্বন্ধে জীবনের পরিবেশ প্রসন্ন হয়ে রয়েছে। তত্ত্বের কথাটিকে বিংশ শতাব্দীর মানবীয় প্রতিভার, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিভার, সবচেয়ে দুরূহ অথচ মহত্তম পরীক্ষার কথা বলে অভিহিত করা চলে। শান্তিময় পৃথিবী, যার নানা জাতি ও নানা দেশের স্বার্থ অধিকার ও মর্যাদা একটি অখণ্ড সাহচর্যের সম্বন্ধে নিরাপদ হবে, তার ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির সমুন্নত রূপ উটোপীয় কাল্পনিকের আশাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

উদ্ধার
অভিযান
হাকসার
পাঁচসালা পরিকল্পনা

দৃশ্যপট
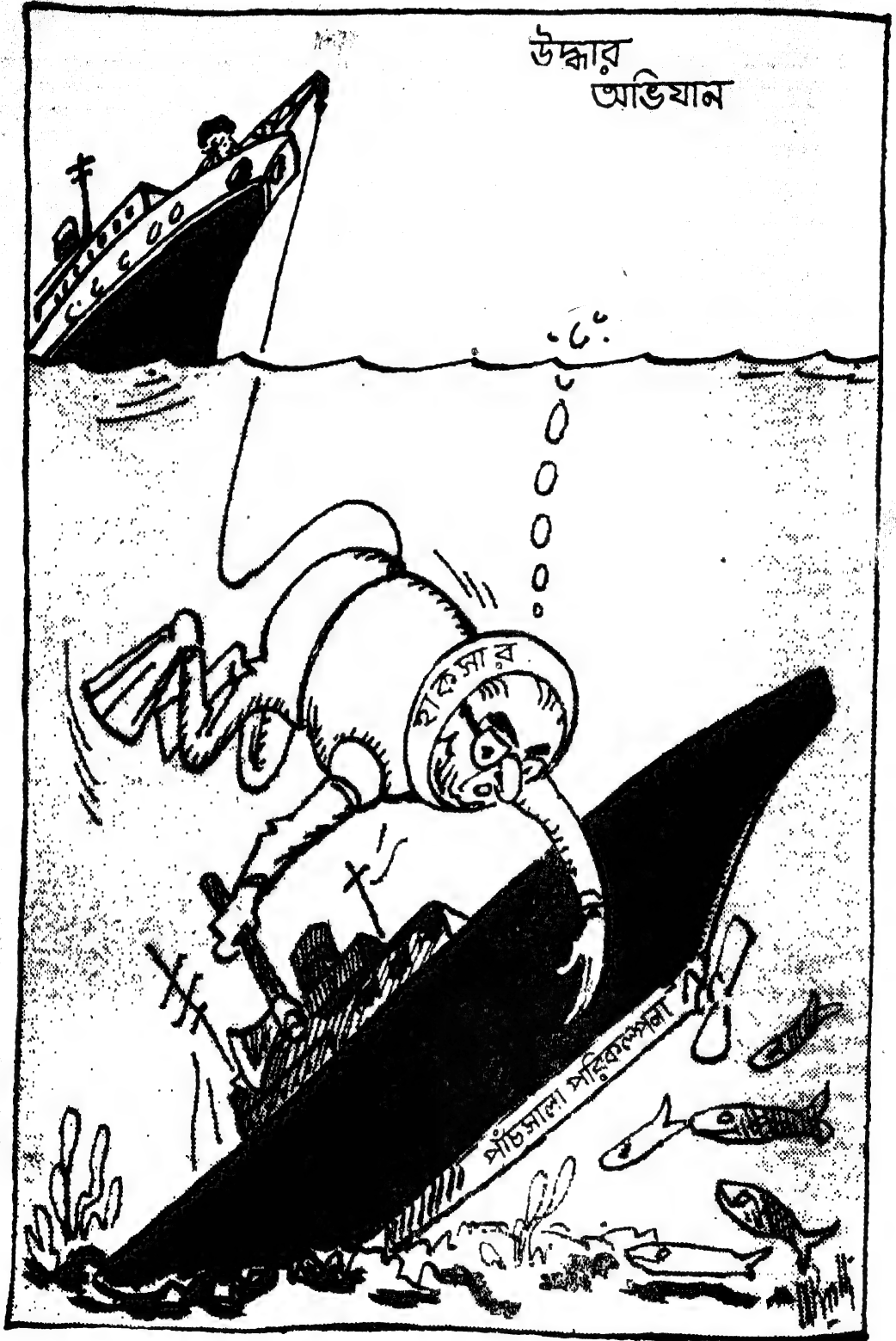
বামপন্থীরা এখন প্রফুল্ল সেনের শরণাপন্ন

সাত আট বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কতটা পাল্টে গিয়েছে দেখুন—যে বামপন্থী নেতারা একদিন প্রফুল্ল সেন মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতেন, বলতেন প্রফুল্ল সেনের পুলিসী রাজ চলবে না, চলবে না, তাঁরাই আজ সেই প্রফুল্ল সেনের দ্বারস্থ! রাজ্যে সরকারবিরোধী আন্দোলনে তাঁরা আজ সঙ্গে সেই প্রফুল্ল সেনকে পেতে একান্ত আগ্রহী।

সেদিন তাঁরা প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন একসঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অবাধ নির্বাচনের দাবিতে একটা সম্মেলন করার প্রস্তাব নিয়ে। বামপন্থীরা অবশ্য এখনও বলছেন যে, সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কোনও আন্দোলন করতে তাঁরা রাজি নন। কারণ, সংগঠন কংগ্রেস একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল। কিন্তু তৎসহই দেখা যাচ্ছে, সংগঠন কংগ্রেস যাতে তাঁদের সঙ্গে একত্রে একটা সম্মেলন করতে রাজি হয় সেজন্য তাঁরা পরম আগ্রহী!

সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যাপারটা বোঝা একটু মুশকিল। আমরা একসঙ্গে সম্মেলন করতে পারি, কিন্তু একসঙ্গে আন্দোলন করতে পারি না! সম্মেলনে যাঁরা পরম পূজনীয়, আন্দোলনে তাঁরা একেবারে অচ্ছুৎ! তাঁরা কার সঙ্গে একত্রে চলবেন, কার সঙ্গে চলবেন না—সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু এই ছুৎ অচ্ছুৎ-এর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা— বিশেষ করে সি পি আই (এম)—যা বলছেন সেটা বুঝতে যার ব্যাখ্যা চলে না গোছের ব্যাপার।

*

আসল প্রশ্ন অবশ্য এটা নয়। আসল প্রশ্ন হল, রাজ্যের বামপন্থীরা, বিশেষ করে সি পি আই (এম) কেন সংগঠন কংগ্রেসকে সঙ্গে পাওয়ার জন্য এতটা আগ্রহী হয়ে উঠল? যে-দলকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন, তাঁরা সেই দলেরই নেতার দ্বারস্থ হলেন কেন?

আমার মনে হয়, এর প্রধান কারণ হল রাজ্যে বামপন্থীদের শোচনীয় অবস্থা এবং নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের ভীতি।

এটা সত্যি যে, বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি অঞ্চলে, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতার কতগুলি অঞ্চলে এখনও অবাধ রাজনীতির অধিকার পান নি। যে সব এলাকা সি পি আই (এম)-এর শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং যে সব এলাকায় রাজনৈতিক মারামারি খুব বেশি হয়েছিল সি পি আই (এম)-এর বহু সক্রিয় কর্মী ও নেতা এখনও সেই এলাকায় ঢুকতে পারেন নি। এখনও সেই সব এলাকায় তাঁদের প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু এই এলাকাগুলি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও বামপন্থীদের পক্ষে, বিশেষ করে সি পি আই (এম)-এর পক্ষে সেভাবে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষ যেন এখনও তাঁদের উপর ভরসা করতে পারছেন না। সেইজন্যই বর্তমান কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে ব্যাপক হতাশা আসা সত্ত্বেও এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু এলাকায় বামপন্থীদের অবাধ রাজনীতির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের অবস্থা এখনও শোচনীয়।

আর এই শোচনীয় অবস্থাটাকে কিভাবে কাটানো যায় বামপন্থীরা কেউই এখনও এককভাবে বা যৌথভাবে সে সম্পর্কে কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছেন না। গত তিন বছর ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করা যাচ্ছে না। তাঁরা তাই এখনও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। রাজ্যের সব বিরোধী দলকে নিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অবাধ নির্বাচনের দাবিতে সম্মেলন করাও এই রকমই একটা পরীক্ষা।

*

কিন্তু এর চেয়েও বড় যে কারণ বামপন্থীরা, বিশেষ করে সি পি আই (এম), সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেনের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং জনসংঘের সঙ্গেও একত্রে সম্মেলন করতে রাজি—তা হল নির্বাচনের ভয়।

১৯৭৫-এই হোক, আর ১৯৭৬-এই হোক—এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আসছেই। বিধানসভার না হোক অন্তত লোকসভার নির্বাচন। ১৯৭২-এর বিপর্যয়ের পর এই নির্বাচন সি পি আই (এম) এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বামপন্থী দলের সামনে সবচেয়ে বড় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি নিয়ে আসছে। এই নির্বাচনে যোগ দিলেও বিপদ। আবার, এ থেকে সরে থাকলেও বিপদ।

বামপন্থীরা, বিশেষ করে সি পি আই (এম) জানেন যে, ১৯৭৫ বা ১৯৭৬ সনের নির্বাচনে ইচ্ছা করলেই কংগ্রেস প্রায় সব আসনে জিততে পারবে। জিততে না পারুক অন্তত রাজ্যের সর্বত্র সি পি আই (এম)-এর পরাজয় নিশ্চিত করে তুলতে পারবে। নির্বাচনে যোগ দিয়ে সব আসনে হারলে (যতই প্রচার করা হোক না যে, অবাধ নির্বাচন হয় নি) তার ফলে দলে আসবে বিপর্যয়। সাধারণ সমর্থকরা সরে যাবেন, বহু সক্রিয় কর্মীও বসে পড়বেন।

আবার, নির্বাচনে যোগ না দিলেও বিপদ। এই বামপন্থী দলগুলি মুখে যতই বিপ্লবী কথা বলুন, এঁদের মূলে ভিত্তি এখনও নির্বাচনী রাজনীতি এবং টাকা-পয়সা পাইয়ে দেওয়ার লড়াই। মোটামুটি সেইভাবেই রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি গঠিত। তাই এঁদের মধ্যে যিনিই নির্বাচন থেকে সরে থাকবেন তাঁকেই বিপদে পড়তে হবে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের অনেকেও (বিশেষ করে অবাধ রাজনীতি যে সব এলাকায় সম্ভব সেই সব এলাকার মানুষ) মনে করবেন যে, বামপন্থীরা ভয়ে নির্বাচন বয়কট করলেন। নির্বাচন হলে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবেই। দলীয় বিরোধী প্রার্থী না থাকুন, বিভিন্ন এলাকায় নির্দল প্রার্থী থাকবেই। এবং, তাঁদের মধ্যে, দুচারজন নির্বাচনে জিতবেনও।

এই অবস্থা বামপন্থীদের ভয়াবহ হতে বাধ্য।

কংগ্রেস ও সি পি আই নেতারা আবার এর উপর একটা চাল দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। তাঁরা এই সুযোগে সি পি আই (এম)কে পুরোপুরি খতম করতে চান। সংগঠন কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, আর এস পি প্রভৃতি যাতে এই নির্বাচনে যোগ দেয় তাঁরা সেই রকম একটা গোপন বন্দোবস্ত করতে চান। লক্ষ, সি পি আই (এম)কে একঘরে করা।

সি পি আই (এম) নেতারাও এই পরিস্থিতিটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন। অন্য অনেকে নির্বাচনে যোগ দিচ্ছে, এক-আধটা আসনে জিতেছেও—এই অবস্থা তাঁদের পক্ষে ভয়াবহ হতে বাধ্য।

তাই, তাঁরা আগাম একটা আন্দোলন শুরু করতে চান সবাইকে নিয়ে। তাতে কাজ হল ভাল। নাও যদি হয়, যদি শুধু সেই আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সব রাজনৈতিক দলকে দিয়ে নির্বাচন বয়কট করানো যায় তাহলেও ভাল। পার্টি অন্তত বলতে পারবে যে, সব দলই নির্বাচন বয়কট করেছে। তাতে কিছুটা মুখরক্ষা হতে পারে।

সেই জন্যই সি পি আই (এম) আজ প্রফুল্ল সেনের দ্বারস্থ। প্রফুল্ল সেনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বয়কটের শ্লোগান তোলানোই আজ সি পি আই (এম)-এর প্রধান লক্ষ।

১৯-১-৭৫।

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

দেবরাজ

খুঁচিয়ে ঘা

রুশিয়ার কাছে এখন আর আমেরিকা দুশমন নয়, আমেরিকাও এখন আর রুশিয়াকে একঘরে করে রাখতে চায় না। দু দেশের মধ্যে যে বেড়া গড়ে উঠেছিল তা একেবারে ভেঙে না পড়লেও তাতে অনেক ফাঁক দেখা দিয়েছে, সে ফাঁক দিয়ে হাতিও দিব্যি গলে যেতে পারে। মনে হচ্ছিল অন্য দেশের সংগে আমেরিকার যে রকম সহজ সম্পর্ক তেমনটা আস্তে আস্তে রুশিয়ার সঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে। এ দেশ থেকে ও দেশ জাহাজ, উড়ো জাহাজ যাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য দু দেশের মধ্যে অনেক দিন আগেই চালু হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে তত তা বেড়ে চলেছে। দু দেশের প্রধানরা মাঝে মাঝে বৈঠকে বসছেন, সে সব বৈঠকে তাঁরা গালগল্প করছেন না, পাড়ছেন কাজের কথা। বিশেষ একটা মতের অমিল সে সব বৈঠকে হয়নি, বরঞ্চ মিলই হয়েছে। নিক্সনের সংগে পটেছিল রুশী প্রধানদের। তিনি বিদেয় নেওয়ার পরও রুশিয়ার সংগে আমেরিকার ভাব চটে যায়নি। নতুন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডও সাইবেরিয়ায় ভ্লাদিভস্টককে পাড়ি দিয়ে মোলাকাত করে এসেছেন ব্রেজনেভের সংগে।

সবই দিব্যি চলছিল, দু দেশের মধ্যে অবনিবনা প্রায় ঘুচে আসছিল। তিন বছর পরে কিন্তু হঠাৎ যেন সব আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। মস্কো থেকে মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৯৭২ সনে নিক্সনের রুশ সফরের পর দু দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল তা বাতিল করে দিয়েছেন সোভিয়েট সরকার। তার মানে অবিশ্যি এ নয় যে, রুশ-মার্কিন বাণিজ্য সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে গেল। আপাতত অন্তত ব্যবসা বাণিজ্য যেমন চলছিল তেমনই চলছে। মার্কিনী সদাগররা এখনও ঘাবড়াননি—তাঁদের ধারণা চুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক রুশীরা মার্কিনীদের সংগে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করবে না, কেন না তারা বুঝেছে রুশ মার্কিন বাণিজ্যে লাভ দু পক্ষেরই, মার্কিনীদেরও, রুশীদেরও। রুশীরা এমন বোকা নয় রাগ করে তারা আমেরিকার মাল নেবে না, তাকে কিছু দেবেও না। মার্কিন কংগ্রেসের রীতিনীতি তাদের যে পছন্দ নয় এটাই তারা জানিয়ে দিয়েছে বাহাত্তরের চুক্তি বাতিল করে। কংগ্রেসের চাল পালটালে তারা আবার নতুন করে বাণিজ্য চুক্তিতে সই করতে অরাজী হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

খামখা মাথা গরম করেনি রুশিয়া। তাদের চটবার কারণ আছে। কথা ছিল রুশ-মার্কিন বাণিজ্যের ব্যাপারটা কংগ্রেসকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হবে একটা আইন পাস করে। সে আইনের একটা খসড়াও তৈরি করা হয়েছিল বিশ মাস আগে। এতদিনে সেটা মঞ্জুর করেছে মার্কিন কংগ্রেস বিস্তর টালবাহানার পর। কিন্তু যে বাণিজ্য সংস্কার বিল তারা পাস করেছে তার শর্ত দেখে পিত্তি চটে গেছে রুশীদের। তাতে কড়ার করা হয়েছে ব্যবসার সুযোগ সুবিধে সবই আমেরিকা রুশিয়াকে দেবে—রুশী মালের ওপর সব চেয়ে কম শুল্ক নেবে মার্কিনীরা, আমেরিকা থেকে ধারে মাল কেনার সুবিধেও রুশীরা পাবে। রুশিয়াও লড়ায়ের সময় ধারে কেনা মার্কিনী মালের দাম বাবদ সত্তর কোটি ডলার শুধতে রাজী হয়েছিল ওই সব সুবিধের বদলে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। রাষ্ট্রপতিকে বেকায়দায় ফেলতে অনেক সময় আইনের খসড়ার হেরফের করে এমন সব শর্ত জুড়ে দেয় যে, অনেক সময় আইনের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। তাই করেছে তারা বাণিজ্য সংস্কার বিলে যাতে রুশ-মার্কিন বাণিজ্যের বনিয়াদ পাকা করার ব্যবস্থা আছে। কংগ্রেসী প্যাঁচে সে বনিয়াদ পাকা না হয়ে একেবারে ধসে পড়ার জো হয়েছে।

গোটা দুই শর্ত যোগ করেছে সিনেটার জ্যাকসনের উদ্যোগে সে আইনের খসড়ায় মার্কিন কংগ্রেস। তার একটা হচ্ছে বছরে বছরে কয়েক হাজার ইহুদি কিংবা অন্য জাতের লোককে রুশিয়া ছেড়ে বিদেশে বসবাস করার ছাড়পত্র দিতে হবে সোভিয়েট সরকারকে। অপরটা হচ্ছে চার বছরে তিরিশ কোটি ডলারের মাল আমেরিকা থেকে কিনতে পারবে রুশীরা ধারে, তার সুদও হবে নামমাত্তর। হালে রুশী ইহুদিরা অনেকেই সোভিয়েট দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে বিদেশে, বিশেষ করে ইস্রায়েলে। অবাধে তাদের দেশ ছাড়তে দিতে রুশিয়া রাজী নয়। দেশ ছেড়ে যেতে সহজে কাউকে দেওয়া হয় না রুশিয়ায়। কিন্তু ইদানীং কড়াকড়ি অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে রুশী ইহুদিদের বেলায়। মার্কিন সরকার তাদের হয়ে উমেদারি করেছে। কিসিংগার নিজে এ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, রুশিয়া অনেকটা নরমও হয়েছিল, ইহুদিদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়াও হচ্ছিল। এমনি করে কিসিংগার বেশ কিছু রুশ ইহুদির জন্যে দেশ ছাড়ার ছাড়পত্র আদায় করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সেনেটার জ্যাকসনের জেদে কংগ্রেস ইহুদি আর অন্যদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার অঙ্গীকার বাণিজ্যিক সুবিধের একটা শর্ত বলে আইনে ঢুকিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় তিনি কংগ্রেসের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন ষাট হাজার করে ইহুদিকে বিদেশে যেতে দিতে কড়ার করেছে রুশীরা। তার ওপর রুশিয়া চেয়েছিল একশো কোটি ডলারের মতো মার্কিনী মাল ধারে কিনতে তিন বছরে, সে ধারও কমিয়ে করা হয়েছে তিরিশ কোটি ডলার—তাও মিলবে চার বছরে। দেখে শুনে চটে লাল হয়ে রুশিয়া মূলে চুক্তিটাই খারিজ করে দিয়েছে। এখন হবে যেলো কড়ি মাখো তেল গোছের ব্যাপার। মাল কেনাবেচায় কোনও বাধ্যবাধকতা কারুরই রইলো না। কাউকে ছাড়পত্র দিতে রুশিয়া আর বাধ্য নয়। ইস্রায়েল থেকে বলা হয়েছে, এর মধ্যেই রুশিয়া থেকে ইহুদিদের ও দেশে আসা বন্ধ হয়ে গেছে যদিও এর আগে পর্যন্ত রুশিয়া থেকে তারা দিব্যি দলে দলে চলে আসছিল—যারা আসতে চাইছিল তাদের কোনও বাধা সোভিয়েট সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছিল না।

এর পর কী হবে? আবার আমেরিকার সংগে রুশিয়ার সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায় হয়ে দাঁড়াবে? অতটা না হোক মনকষাকষি খানিকটা যে হবে সে বিশ্বাস কিসিংগারেরও, ফোর্ডেরও। আর কিছু না হোক নতুন করে আমেরিকার কাছ থেকে কোনও বৈষয়িক সাহায্য নিতে রুশিয়া চাইবে না। পশ্চিমে খোলাখুলি বলে দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যের নতুন শরিক খুঁজে নেবেন সোভিয়েট সরকার। সাইবেরিয়ার গ্যাস কাজে লাগাবার জন্যে পশ্চিমী টাকা আর কারিগরী বিদ্যে তাঁদের দরকার। টাকা আর কারিগরী বিদ্যে আমেরিকার আছে বটে কিন্তু তা তো তার একচেটে নয়। কিসিংগার আর ফোর্ড দুজনেই অবিশ্যি উপায় খুঁজছেন ভুল বোঝাবুঝির অন্ত ঘটাতে ও সব শর্ত তুলে দেবার জন্যে আইনের হেরফের করে। তা করা হয়তো অসম্ভব হবে না। কেননা, রুশিয়া যে বলেছে তার ঘরোয়া ব্যাপারে বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে আমেরিকা নাক গলাচ্ছে তা মিথ্যে নয়। ব্যবসা হচ্ছে লেনদেনের ব্যাপার। তার সংগে অন্য কোনও ব্যাপার জড়িয়ে ফেলার মানেই হচ্ছে অন্যায় চাপ দেওয়া। তাই করেছে আমেরিকা বাণিজ্যের ওপর অন্যায় শর্ত চাপিয়ে। কথার খেলাপও সে করেছে। বাহাত্তরের চুক্তির সময় ঠিক হইয়াছিল ব্যবসা বাণিজ্যের যে সুবিধে রুশিয়া পাবে তা হবে নিঃশর্ত। ছোটোখাটো দেশ হলে চাঁদির পয়জার হয়তো মুখ বুজে হজম করতো। শক্তিমান দেশ রুশিয়া তা করবে কেন?

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

পশ্চিমবঙ্গের জামাই হোন

পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ দফতর এই মর্মে সত্বর এক বিজ্ঞাপন ছাড়তে পারেন। যথা:

দুনিয়ার আইবুড়ো ছেলেরা। অ্যাটেনশন প্লিজ! আপনাদের সম্মুখে আজ চমৎকার সুযোগ উপস্থিত।

দুনেয়াকো কুঁয়ারা নওজওয়ানো! কৃপয়া খ্যাল কিজিয়ে। আপকি আচ্ছা ইক মওকা মিল গয়া হৈ'!

ব্যাচেলরস অব দ্য ওয়ারল্ড। অ্যাটেনশন প্লিজ। ইট্‌স্‌ এ গোলডেন অপারচুনিটি। ডোন্‌ট মিস্‌ ইট। কিস ইট।

আসুন! পশ্চিমবঙ্গের জামাই হোন। আইয়ে, পচ্ছিম বংগাল কা দামাদ বন যাইয়ে। বি দ্য সন-ইন-ল অব ওয়েসট বেংগল।

মহাশয়গণ। প্যারে বাবাজীবনো। জেন্টেলমেন!

হমারে আদরণীয়ো মুখ্যমন্ত্রী ভারত-ওয়েসট ইনডিজ চতুর্থ টেসট ম্যাচ মে পশ্চিমবঙ্গের সন-ইন-ল লোগোকো পারফরমেনস দেখ কর একেবারে স্থির নিশ্চিত হয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ফিউচার লাইফ ডিপেন্‌ড্‌স নট অন দ্য সনস অব দ্য সয়েল, বাট অন দ্য সন-ইন-লজ অব দ্য সয়েল।

তাই আমাদের আজকের শ্লোগান: সন অব দ্য সয়েল নয়, সন-ইন-ল অব দ্য সয়েল।

আসুন! পশ্চিমবঙ্গের সন-ইন-ল বন যাইয়ে। একে একে দুয়ে দুয়ে শয়ে শয়ে দলে দলে আসুন এবং পটাপট পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে বিয়ে করুন। এবং অতঃপর পরম সুখে সয়েল কা ঘরজামাই হো কর চিরকাল কাটিয়ে দিন।

কাম ওয়ান অ্যানড কাম অল
নড়েছে বিয়ের কল
ইট ড্রিংক অ্যানড ম্যারি অ্যানড ম্যারি
আই কাম উই কাম শ্বশুরবাড়ি
শালী শালাদের ফস্টিনষ্টি
বচ্ছরে একবার জামাই ষষ্ঠী
নারা লাগাও মেরা শ্বশুরাল
উগ উগ জীও পচ্ছিম বংগাল

আমাদের স্পেকটাকুলার এবং সেকুলার মুখ্যমন্ত্রী আগামী পাঁচসালা যোজনার যে বুনিয়াদ রচনা করেছেন তা যে শুধু এই রাজ্যে শালার উৎপাদনই বৃদ্ধি করবে তা নয়, শালী উৎপাদনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। অতএব আগামী পাঁচশালা যোজনা বলতে পাঁচশালী যোজনাও বুঝতে হবে। কারণ, এতো জানা কথা যে শালীর উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে না পারলে এই রাজ্যের ভিন দেশী জামাতাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ভাল জাতের জামাই আমদানীকল্পে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করছিনে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে যে কতটা আগ্রহী তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখেছেন। চতুর্থ টেস্ট বিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট একাদশের আইবুড়ো খেলোয়াড়দের এই রাজ্যের জামাই করবার জন্য তিনি সংবাদপত্র মারফৎ আন্তরিক আবেদন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও এক ধাপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন।

প্রধানত তিনি নিজের উদ্যোগে এবং উৎসাহে পাবলিক সেকটর দি ওয়েসট বেংগল স্টেট সন্‌-ইন্‌-ল ইমপোরট করপোরেশন নামে এক স্বয়ংশাসিত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব তৈরি করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়ে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের সংগে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এস টি সি-র পক্ষ থেকে যে আপত্তি দাখিল করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, "ভারতের বাইরে থেকে জামাই আমদানী করা হবে না" এই উপধারাটি দি ওয়েসট বেংগল স্টেট সন্‌-ইন্‌-ল ইমপোরট করপোরেশনের গঠনবিধির মধ্যে না থাকায় এস টি সি আশংকা করছেন যে তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী এটাকে এস টি সি-র রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দিল্লির স্টেপ মাদার-ইন্‌-ল জনোচিত মনোভাব বলে মনে করছেন। পশ্চিমবঙ্গ কোত্থেকে জামাই আমদানী করবে সেটা তার নিজের ব্যাপার, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্লোজ ডোর মিটিং-এ এই ধরনের এক হুমকি দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ যা দাঁড়িয়েছে তার থেকে তাকে যদি সারভাইভ করতে হয় তবে ভাল জাতের জামাই আমদানী করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব ও ছাত্র ঐক্য সম্মেলনে সম্ভাব্য উদ্‌বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলতে পারেন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। ১৯৭৫ সালের মধ্যেই যাতে এক লক্ষ অধিবাসীযুক্ত মিউনিসিপ্যাল শহরের প্রতিটি ওয়ারডে অন্তত একটি করে এবং সি এ ডি পির এলাকাভুক্ত প্রতিটি গ্রামে অন্তত দুটি করে আমদানিকৃত ভাল জাতের জামাই সরবরাহ করতে পারেন তার জন্য তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে দশ লক্ষ লোকের জমায়েতে প্রাক্‌ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন।

বিষয়টা আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে এতই জরুরি যে শুধু সরকারী করপোরেশনের মাধ্যমে ভাল জাতের জামাই ইমপোরট করাটাই যথেষ্ট নয়, ভাল জাতের জামাই আকৃষ্ট করার জন্য বেসরকারী স্তরেও চেষ্টা চালানো চাই। এবং সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী যুব ও ছাত্রদের কাছে এক আবেদনে বলেন, "আপনারা এখন নিজেদের কলহ ভুলে গিয়ে ভাল জাতের জামাই আমদানীর ব্যাপারে আমার হাত শক্ত করুন। এবং যাতে নিজেরাও ভাল জাতের শালা হতে পারেন, তার জন্য প্রস্তুত হোন।" মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে সকল যুব ও ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রামে ও শহরে ব্রাদার-ইন-ল পরিষদ গড়ে তুলতে পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে মন্ত্রের মত কাজ হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিবদমান দুই গোষ্ঠীর যুব ও ছাত্র নেতারা "ব্রাদার-ইন-লজ অব্‌ দি ওয়েসট বেংগল ইউনাইট" বলে কোলাহল করে ওঠেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত যুব ও ছাত্র ব্রাদার-ইন-ল পরিষদ গঠন করেন। সংযুক্ত যুব ও ছাত্র নেতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী ব্রাদার-ইন-ল পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মতি দেন বলে উক্ত পরিষদের মুখপাত্রগণ দাবী করেন।

নড়েছে বিয়ের কল
কাম ওয়ান অ্যানড কাম অল্‌
ইট্‌ অ্যান্‌ড্‌ ড্রিংক্‌ অ্যান্‌ড ম্যারি
অ্যান্‌ড্‌ ম্যারি......

হারি! হারি!

দড়ি ধরে' ওঠো

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সকালে যতটা দড়ি ধরে' ওঠো
ততটাই নেমে যাও সন্ধ্যায়।
কে বলবে, কীভাবে নিষ্কাশন করলে,
জীবন থেকে সবটুকু রস আদায় করা যায়
প্রত্যেক দিনের চেহারা একরকম—
সর্বাসন্ত বা কিং লীয়রের পঙক্তি চিবিয়ে যদি শুরু,
শেষ তবে সুনীলমাধবের ধর্ষবিভ্রমে
কিংবা এস্পেরান্তোর একতায়।
চোখের সামনে ভিড় করে পরশ্রীকাতর, ভণ্ড ও
বেহায়া মুখগুলি
কানের পাশে ফাটতে থাকে ভিখিরির মর্মান্তিক চিৎকার—
কে বলবে, ভিক্ষা কার বাণিজ্য, কার অসহায়তা।
প্রত্যেক দিনের চেহারা একরকম—
প্রগতির পুতুল পোড়ানো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়
ফুটপাথে, শুঁড়িখানার পেছনের ঘরে, জনসভায়।

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

টাইগার হিলে ভোরের সূর্য দেখার আকর্ষণে
এখনো বাঙালী—
দেখছি জয়ের গড়ানো পথে ওঠা কিংবা নাবা...
জাপানী সিফনে বিকশিত
তীব্রতর তরুণী শরীর ভেজে। যখন পাহাড়ের চেয়েও
উঁচু আরোহী বাতাস—

মেঘও বরফ!
মাথার ছাতা নাড়িয়ে তার নেমে আসা ভগ্নাংশ।
ক্রমশই হয়ে উঠছে কুয়াশা—মৎস্যগন্ধাও ধর্ষিত অদৃশ্য।
প্রতিবিম্বিত পাথরে তাই কান্না যেন ছন্দহীন
মানুষের বাষ্পীভূত দু চোখের একান্ত ধ্বনি।

তবু আমার সারা শরীরে আগুনের তাপ,
দুর্ঘটনার মতো রৌদ্র, কোঁচকানো পিঠে শুকোয় বন্যসবুজ;
দাঁড়াবার স্থির মাটি নেই—আঘাত পেলেই সূর্যাস্ত!
ধ্বস!!
বিপ্লবের হাত বাড়িয়ে যন্ত্রমানুষ
সাদা চাদরে ঢাকা দীর্ঘ আঙুলের ঝরনা
পাহাড় ভেঙে ঝিরঝির করে বয়ে চলে।

আঙুল গান এবং নদী

ফিরোজ চৌধুরী

এখনো আঙুলে আঙুল ঠেকে গেলে গান হয়
এখনো শুধু দুটো কথা হলে নদী তৈরি হয়
তাই এবার দেখা হলেই সবুজ ত্রিকোণ পার্ক
প্রেমিকের ভূমিকায় কাব্যপাঠ
কিংবা শুরু হবে কিছু বিপর্যস্ত সংলাপ

সবাইকার কিছু না কিছু বক্তব্য থাকে
সেইসব ভুল অথবা নির্ভুল চিত্র ফুটে ওঠে
মাছ ধরার গল্প থেকে শুরু করে ট্রামের পা-দানিতে
একটু জায়গা করে নেবার ঘটনা থেকে
কেউ কেউ তাই অনেক দূরে যেতে পারে
বিপদ-সীমা অতিক্রান্ত করে রেখে যায় নিশ্ছিদ্র পায়ের চিহ্ন
আবার কেউ মাঝ পথেই সহজ আপোসের মগ্ন শিকার

তবু জীবন মানে এরকমই চলা—ক্লান্তিহীন হেঁটে যাওয়া
কিংবা ফিরে আসা
জীবন মানে এরকমই মাঝে মাঝে উথালি-পাথালি
হঠাৎ আলো কিংবা কিছু বিষণ্ণতা এই সব
তবু এখনো আঙুলে আঙুল ঠেকে যায়
এখনো কথা হয়
গান হয়
এবং নদী তৈরি হয়

যদি ওড়ে

মৃণাল বসুচৌধুরী

যদি ওড়ে
উড়ে যায় নীলবর্ণ পতাকা আমার
মধ্য রাতে
অনার্য আঙুল থেকে
যদি ঝরে বিষ
ভেঙে যায় দুরূহ নির্মাণ
যদি ওড়ে
মাছরাঙা
মহুয়ার গন্ধ নিয়ে
ছেঁড়া আলোয়ান
ধানদূর্বা ছড়ানো চৌকাঠে
রক্তের বিকল্পে চোখ
দাক্ষিণ্যবিহীন
যদি ওড়ে
উড়ে যায় নীলবর্ণ
পতাকা আমার

এই দুর্মর, দুর্মুখ দুর্নীতি

রঞ্জন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি পুনরোক্তি করেছেন যে দেশের দুর্নীতি নিয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় হচ্ছে। তিনি তিনবার যা বলবেন তা নিশ্চয়ই অসত্য হতে পারে না। এমনও অবশ্য হতে পারে যে, দুর্নীতি নিয়ে সরবতার সমারোহ শুরু হয়েছে কেননা অন্য পক্ষে নীরবতার অন্ত নেই। এ রিপোর্ট প্রকাশিত হবে না; ও রিপোর্ট গোপন দলিল। দুর্নীতির বাক্‌-বাগীশরা গেরুয়া আর ভস্ম পরিধান করলেও তাদের আমি সাধু জ্ঞান করি না, কিন্তু সাধুতা বর্তমানে অদৃশ্য হলেও সাধুতাকে সম্মান করি। কিছুদিন আগে একটি জর্মান নাটকের বাংলা সংস্করণ দেখে প্রত্যয়ের প্রত্যাবর্তন হলো। ব্রেখট আমি পড়িনি বললেই চলে। আমি ওঁর ভাষাই জানিনে। তিনিও বাংলা জানতেন বলে জানিনে। কিন্তু বাংলা দেশের, মানে পশ্চিমবঙ্গের, এমন জীবন্ত অর্থাৎ মুমূর্ষু চিত্র ইদানীং চোখে পড়েনি। আমি নাট্যরসিক নই। আসলে আমি সমগ্র সাংস্কৃতিক জগৎ থেকেই বিদায় নিয়েছি বছর পনেরো আগে। তবু "ভালোমানুষ" সেদিন ভালো লাগল। বড়ো বেশি দীর্ঘ। অতি নাটকীয়তা আর আত্যন্তিকতা প্রায়শ পীড়াদায়ক। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে আছে যাকে বলে রিং অব ট্রুথ, সত্যের পরশ। মন-ভোলানী মঞ্চে আর কী চাই? "ভালোমানুষ" মন ভোলায় না: মনকে জাগায়। যদিও শান্তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সে নিজেও বাঁচতে চায় কিনা জানি না। শান্তা (বেশ্যা) শান্তাপ্রসাদ (মস্তান) হলেও অভিনয় অপূর্ব। তার বেশি তো কিছু বলবার নেই। সাধারণত বড়ো জোর গলায় অভিনেতা আর অভিনেত্রীরাই তাঁদের মুখর বক্তব্য সতেজে নিবেদন করেছেন। মৃদুভাষী শুধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জার্মানির খবর রাখি সামান্যই। আর ব্রেখটের জার্মানিও আজকের জার্মানি না হতে পারে, যদিও সাদৃশ্য থাকা সম্ভব। আমি বাসিন্দা কায়ক্লেশে বাংলার। "ভালোমানুষ" নাটকের প্রধান দাবি বাস্তবতার। কঠোর কথা এতে বলা হয়েছে কঠোরভাবে। তবু যেন কোথাও ফাঁকি আছে। ঝোঁকটা অন্যের উপর দোষ চাপানোর। শান্তা কেন বাঙাল কথা বলে? শান্তাপ্রসাদ কেন রাজস্থানী পোশাক পরে অবাঙালী উচ্চারণে কথা বলে? দুই-ই যে বাঙালী সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা কেন? দান নাকি শুরু হয় স্বগৃহে। স্বীকৃতির আরম্ভ কেন হবে ঢাকায় বা মেবারে? কলকাতার কেলেঙ্কারির ভূগোল মানচিত্র জাল করলে সত্যের অপলাপ হয়। আত্মবঞ্চনা ঘটে। কলঙ্কিনী কলকাতাকে কলকাতা বলেই চেনা উচিত। আরু কেন? হিন্দীর বা পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ঘোমটা কেন?

*

সামাজিক অবক্ষয় একটি বৃহৎ বিষয়। তার আলোচনা আবশ্যক। বাঙালী সমাজে নানা ক্ষুদ্রতা বৃহদকার ধারণ করেছে তা অতিপ্রত্যক্ষ। ব্রেখট দেখিয়েছেন যে বেকারের প্রথম দুর্ভাগ্য আয়হীনতা নয়। বেচারীকে অন্তরে অন্তরে বুঝতে হয় তার সামাজিক অবান্তরতা, সামগ্রিক অর্থহীনতা। অ-বেকারের পক্ষে সম্ভব নয় অবস্থাটা কল্পনা করা। অর্থনীতিতে আমি অপটু। রাজনীতি নাকি গভীর গাঙের জল। বেকারত্ব একটা বায়ুভূত অবস্থা। ক্যাপিট্যালিজম এ বিষয়ে উদাসীন, নির্দয়। অন্য সমাজ ব্যবস্থায় এর সমাধান আছে বলে গুজব শুনেছি; গুজবে কান দিইনি বড়ো একটা। একান্ত মানবীয় সমস্যাটা যেন দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সবায়ের, হিন্দীর আড়ালে, বাঙাল ঘোমটায়, বা মার্কসীয় পাণ্ডিত্যে। আমি কর্মহীন, আমি বেকার, অর্থাৎ সমাজের কোনো প্রয়োজন নেই আমার বা আমার সহ-অকর্মীদের জন্য। তবে হ্যাঁ, শান্তা হলে আমি দেহবিক্রয় করতে পারি। দেহের প্রয়োজন আছে। শান্তাপ্রসাদ হলে আমি সমাজের দেহ ক্রয় করতে পারি। সমাজ ক্রীত হতে চায়। এই দ্বিমূর্তি মার্গ অজ সমাজের সরল বিকাশ। কখনো ত্রিনয়ন। কখনো দশানন। মূলগত পার্থক্য সামান্য।

আর্থনীতিক মুদ্রাস্ফীতি আনে সামগ্রিক সমাজের নৈতিক অবমূল্যায়ন। হ্বাইমার রিপাব্লিকে তাই ঘটেছিল। তারই যমজ সন্তান হিটলার আর ব্রেখট। ভারতীয় সংস্করণের নামকরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির কথা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও অস্বীকার করেননি। নৈতিক অবমূল্যায়নের কথা তো রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ তাঁর জপমালায় অন্তর্গত করেছেন। টাকার দাম নেই, কেননা টাকা এত বেশি। কথার দাম নেই, কেননা বক্তৃতার এত বাহুল্য। অশনি সংকেত নয়। এ যে সম্যক শনি সংকেত। বাঙালী এক মরণাপন্ন জাতি; এ তত্ত্ব শুনে আসছি শৈশব থেকে। তত্ত্বাধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরো অনেকে, কেন জানি না, বাঙালীকে নাকি বাঁচাতে হবে। ইতর প্রাণীও বর্তমান। কিন্তু বাঙালী বাঁচাও-র কাজটা বাঙালীকেই করতে হবে। আর সে বাঁচাইয়ের কাজটার আগে চাই যাচাই, নিজেকে জানা। এই যাচাইয়ের কাজটাই যে অদ্যাবধি অনারব্ধ। জর্মন চোখে বাঙলা দেখায় কোথায় যেন ভুল আছে গো ভুল আছে। "ভালোমানুষ" নই তো মোরা; ভালোমানুষ নই।

*

বক্তব্যটা বীরবলী শোনাবে, তবু বলতেই হবে। বাঁচতে হলে আজকের বাঙালীকে বাঙালী হতে হবে। নইলে অবাঙালী হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা না বাঙালী না অবাঙালী। "ভালোমানুষ" নাটকের শান্তা বাঙাল, শান্তাপ্রসাদ আধা-বাঙালী। এই মহানগর উভয়কেই গ্রহণ করে; কখনো আপন করে না। উভয়েই বাসিন্দা হয়, বাসী হয় না। ভাড়াটে হয়; তার বেশি নয়। কলকাতার অস্তিত্বটাই থেকে যাচ্ছে অজানা, যদিও স্বনির্বাসিত ব্রেখটের কাছে বার্লিন ছিল অতি জীবন্ত। কলকাতা এখনো তার ব্রেখটকে খুঁজে পায়নি। অনুবাদ করেছে। অনুবাদে বিদেশী গন্ধ অত্যন্তই সামান্য। তবু, তবু, কলকাতা যেন রয়ে গেল অধরা, অছোঁয়া। কলকাতা তো এমন সতী নন।

বিদেশী বাজারের জন্য অকুণ্ঠ আত্ম-নিন্দনের অশংসয়ী প্রশংসক আমি নই, যদিও কয়েকজন জানা বা অজানা ভারতীয় এ ব্যবসায়ে কিছু করে থাকেন। এর মধ্যে একজন সত্যকার পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক অন্তত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: আত্মানং বিদ্ধি। এই বাক্য আদর্শ স্বরূপ। "ভালোমানুষ" নাটকের শেষে পরিচালক দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সমাজের এই অব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু একটা করা দরকার। ওটা বিপ্লবের আহ্বান ছিল না। করুণ মিনতি বলেই তা হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ঈষৎ পরিহাসপ্রয়াস দৃশ্যটিকে আরো গ্রহণযোগ্য করেছিল, বিশেষ করে কেয়া চক্রবর্তীর হার্দিক স্ট্রিপ টিজের পরে। শাড়ি উত্তোলন তো নিত্যকার ঘটনা। শান্তাপ্রসাদ খুললেন যোধপুরী। উদ্‌ঘাটিত হলো একটা উলঙ্গ সমাজ। কুৎসিত সমাজ। সত্য সর্বদা সুন্দর নয়। "ভালোমানুষ" অসুন্দর। আমরা অসুন্দর।

চিত্রগত কাহিনী

নীরোদ রায়

॥ ২ ॥

কথায় বলে লাট। সেই লাটের আদেশ অমান্য করে কোন সরকারী কর্মচারী তার পরেও বহাল-তবিয়তে থাকতে পারে, এমন কথা চিন্তা করা একটু কঠিন। তবে সেটা আমি নিজেই করেছিলাম এবং তার পরেও যে সসম্মানে কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সে কথা আজ এখানে লিখতে পারছি। বলতে পারছি সেই কাহিনী।

একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমার পক্ষে এটা অবশ্যই একটি স্মরণীয় স্মৃতি-কথা। সেই স্মৃতি ফিরে আসে যখনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম লাট-সাহেব রাজাজীর এই ছবিখানা দেখি। মনে পড়ে যায় তাঁর আদেশের কথা।

সেটা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন লাটসাহেব জেলা পরিদর্শনে যেতেন মাঝে মাঝে তাঁর স্পেশাল ট্রেনে পুরোপুরি বৃটিশের কায়দায়। হতে পারে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত লাঠি হাতে বৃদ্ধ এক ভারতীয় লাট—তবুও তিনি মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন সেই আমাদের ছেড়ে-যাওয়া মনিবদের মতই। লাটের মর্যাদা রক্ষার্থে রেলের প্ল্যাটফর্মে থাকত বিস্তৃত লাল-সালু, চতুর্দিক বেষ্টন করে রাখত সতর্ক পুলিসবাহিনী, আর অতি বিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রেল স্টেশনের কর্মচারীবৃন্দ। ওদিকে লাট ভবনের অন্দর-মহলের কর্মচারীরা বহির্জগতে ভ্রমণের আনন্দে যোগদান করতেন, আর থাকতেন কিছু ভিন্ন মহলের সরকারী অফিসার। এ সব পাচমিশেলীর ভেতর প্রচার দফতর থেকে 'অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার' হিসেবে থাকতাম আমি।

তেমনি এক স্পেশাল ব্যাপারে লাট-সাহেব রাজাজী গিয়েছেন মুর্শিদাবাদ সফরে। সেদিন সকালের দিকে যথারীতিতে মুর্শিদকুলি খাঁর স্মৃতিসৌধ এবং তৎকালীন নবাবদের কবরখানা পরিদর্শন করে এসেছেন নসীবপুরে জগত শেঠের বাড়িতে।

তখনকার দিনে ক্যামেরায় ফ্লাশ-আলোর ব্যবস্থায় কিছু জটিলতা ছিল। ফ্ল্যাশ পৃথকভাবে হাতে করে জ্বালাতে হতো বলে ওটা খুব কমই ব্যবহার করা হতো। আমিও সেদিন ঘরের ভেতর ভিড়ের ঝামেলা এড়িয়ে বাইরে এসে আপন মনে দাঁড়িয়ে আছি। তখনি কে একজন ছুটে এসে জানাল, লাট-সাহেব ছবি তোলার জন্য আমাকে ডাকছেন ভেতরে।

ভেতরে যেতেই রাজাজী বললেন—'দেখ, এই মুক্তাখচিত কাপড়টি বিশেষ মূল্যবান। আমি একটা ছবি চাই, যেভাবে হাতে নিয়ে দেখছি এখন।'

আমি সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানিয়ে ক্যামেরা 'ট্রাইপডে' লাগিয়ে নিলাম, আর হাতে তুলে নিলাম ফ্ল্যাশের আলো। তখন ফ্ল্যাশে ওভাবে ছবি তুলতে—ক্যামেরার দীর্ঘ-সময় এক্সপোজার দিয়ে তারই মাঝ-খানে হাতের ফ্লাশ টিপে দিতে হত। আমিও ঠিক তাই করলাম। ছবি আমার হিসেবে ঠিকই তোলা হল। কিন্তু লাটসাহেব কেন জানি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন—"তোমার ও-ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি বরং আবার ছবি নাও।"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানালাম—"না, ছবি তোলা ঠিকই হয়েছে।"

তবুও আবার লাটের আদেশ হল—"আমার মনে হয় না ওটা ঠিক হয়েছে। তুমি আর একটা ছবি তোল।"

আমি কেন জানি আবার তেমনভাবেই তাঁর আদেশ মানতে রাজি না হয়ে সবিনয়ে বললাম—"না স্যার, আমি জানি ওটা ঠিকই হবে।"

এবার লাটসাহেব যেন নিরাশ হয়ে বললেন—"আচ্ছা, তা হলে ঠিক আছে।" তাঁর ক্ষুন্ন মনের কিঞ্চিৎ আভাস যেন পেলাম।

তারপর আমি বাইরে চলে এলাম। আসা মাত্রই আমাকে সবাই বোঝাতে লাগলেন, আমি কতদূর মারাত্মক অন্যায় করেছি লাট-সাহেবের আদেশ মত ছবি তুলতে অস্বীকার করে। উগ্র-ধাঁচের কেউ বললেন, যদি লাট-সাহেব চান, তা হলে একটা কেন, একশোটা ছবি তুলবেন। আর এখানে তিনি হুকুম করছেন একটা ছবি তুলতে, আর আপনি কিনা সেটা অমান্য করলেন!

এতখানি পরেও আমি সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, ছবি তোলায় আমার ত্রুটি কোথায় হয়েছে সেটা যদি আমি

মুক্তাখচিত বস্ত্র হাতে রাজাজী

নিজে বুঝে উঠতে না পারি তা হলে তো একই ত্রুটি আবার হবে। সুতরাং আবার তুলে লাভ কী?

কে যেন একজন বললেন—'মশাই লাভ কিছু নয়, কিন্তু ক্ষতিটা কোথায়?'

যাই হোক, এভাবেই সেই পর্ব সেখানে শেষ হল। কিন্তু আমার শুরু হল এক নতুন চিন্তা। সেই চিন্তা ক্রমেই পরিণত হল এক দুশ্চিন্তায়। যার জন্য কলকাতা ফিরবার পথে সারাটা রাত ট্রেনে ঘুমোতে পারিনি। মনে তখন নানা কথা এসে অশান্তির জটলা পাকাচ্ছে। শুধু মনে হতে লাগল, যদি ফিল্মটা ডেভেলপ করার সময় বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে? তখন কি এই ডেভেলাপের অজুহাত দিয়ে আমার অপরাধ চাপা দেওয়া যাবে? রাজভবনে যখন ছবি যাবে, তখন লাটের সেই আকাঙ্ক্ষিত ছবি না পেলে তারপর কি হবে, তা আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। তা হোক, চাকরির প্রশ্নটাই সেখানে আমার কাছে ততখানি বড় ছিল না, যতটা ছিল পরাজিত হবার প্রশ্ন। এভাবেই চিন্তায় ঘুম আর হল না। শিয়ালদহে স্পেশাল থামল ভোরবেলা।

আমি যত সত্বর সম্ভব ফিল্মটা ডেভেলপ করে সেই বিশেষ নেগেটিভের দিকে তাকাতেই মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠল। ভুলে গেলাম সেই মুহূর্তে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, মন থেকে চলে গেল সেই অশান্তিকর আশংকা। গর্বিত হলাম আমি রণ-বিজয়ী এক বীরের মত। আমার ছবি ঠিক আছে।

সেইদিনই মুর্শিদাবাদের অন্যান্য ছবির সংগে এ-ছবিটি একটু বড়-সাইজের এনলার্জ করে পাঠিয়ে দেওয়া হল লাটভবনে রাজাজীর কাছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আর কেউ না বুঝলেও যার বুঝবার তিনি ঠিকই বুঝে নেবেন—কেন ও-ছবিটা একটু বেশি বড় করা হয়েছে। আমার এই নীরব উত্তর বিশেষ কাজ করেছিল, তার আভাস আমি পেয়েছিলাম পরবর্তী সময়ে।

*

ভারতের ইতিহাসে অতি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে যিনি চিরদিন পরিচিত হয়ে এসেছেন, তাঁর সেদিনকার বিচার-বিবেচনায়ও কিছুমাত্র ভুল ছিল না। বরং যে-বিষয়টি লক্ষ্য করে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার ছবি তুলতে বলেছিলেন, সেটি তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রমাণই দিয়েছিল শুধু। কারণ, তখন ছবি তুলতে, আমার ফ্ল্যাশ জ্বালাবার পরেও, ক্যামেরার শাটারে একটা শব্দ শোনা যেত। তিনি সেটাকেই ধরে নিয়েছিলেন, শাটার পরে কাজ করেছে বলে। আসলে ফ্ল্যাশটাই [illegible] এক্সপোজারের কাজ করে—সেটা [illegible] জানবার কথা নয়। তাই, সেদিনকার ছবি তোলার ব্যাপারে অত সব ঘটেছিল একটু ভুল বোঝাবুঝির ভেতর। কিন্তু ভুল ছিল না কোথাও।

দুই বৃদ্ধের কাহিনী

অসীম রায়

শম্ভু হেমব্রম ঝালের ধারে ডোঙগায় হাত দিয়ে হাঁপায়। খানিকটা দম নিয়ে আবার শরীরখানা ঝটকা দিয়ে নামায়, আবার তোলে। তবে ডোঙগার আঁকড়া খসে যাওয়ায় টানতে জোর পড়ে। একাশি বছরের দড়-পাকানো হাতখানা ওঠে নামে।

সামনে তিনটে ঝাল থেকে বড়হড়ার জল ওঠে আলুর ক্ষেতে। ঝাল মানে নালি কেটে জমানো জল। সামনের ঝালে তার ছেলে শিবু। জল দেওয়া বন্ধ হলেই থালি নিয়ে জল ছিটোয় আলুর ক্ষেতে। এখনও যে দেড় বিঘে জমিতে আজ ছেঁচ দেবার দিন তাতে ভালোভাবে বুক দেওয়া হয়নি। শুধু দাঁড়া কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলুর বীজ ওপরে ঠেলা দিতে শুরু করলেই মাটি উঁচু করে বুক দিতে হবে। ডোঙা থেকে হাত নামিয়ে সামনের জমিটা নিরীক্ষণ করে শম্ভু হেমব্রম তার কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ির মধ্যে হাত চালায়। নাঃ! দু-দিন পর বুক দিলেই হবে।

অঘ্রাণের ভোলরের রেল-লাইন পর্যন্ত পশ্চিমের মাঠে ধান পেকেছে, তারপর বড়-হড়ার গায়ে বাঁশ ঝাড়ের দিকে চাইতেই ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে। ভোরবেলার কুয়াশায় শম্ভু ভালো থাকে। ভোরবেলা আর বিকেলে যখন রোদ পড়ে আসে তখন চারদিক চক-চক করে। বছর চল্লিশ আগে গাঁয়ের প্রান্তে যে নদীটির ধারে সে আরও দু-তিন ঘর সাঁওতাল এসে পত্তন করেছিল সেই ঘিয়া নদীর বাঁক স্পষ্ট চোখে পড়ে। কিন্তু রোদ বাড়লেই সব ধোঁয়া ধোঁয়া।

এমন কি রোদ যতো বাড়ছে তার ছেলে-বউ যেখানে ছেঁচ দিচ্ছে তাও অস্পষ্ট। বুক থরথর করে কাঁপে শম্ভুর এবং কিছু পরিমাণ বিচলিত বোধ করে। চোখে না দেখা কি মৃত্যুর লক্ষণ? এবং সংগে সংগেই স্মরণে আসে তিনটে গোরুকেই জাব দেওয়া হয়নি। শিবুর জামাই কাল রাতে পলাতক। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন নেশা করার সামান্য পয়সা পাওয়া গিয়েছিল এবং দাওয়া থেকেই বাঁশ ঝাড়ের নিচুতে চকচক করছিল ঘিয়ার জল তখনই তার নাতনি আর নাতজামাই ঝটাপটি লাগাল দাওয়ায়। আট আনা পয়সায় কত-টুকু নেশা হয়। আর অনেক কষ্টের পয়সা দিয়ে কেনা সেই দুর্লভ কাঁচা মদের নেশা-টুক ছুটিয়ে দেয় তার নাতনি, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তার স্বামীর পিঠ জাপটে তার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। শম্ভু ঘাড় ঘোরায়নি। সে চিন্তা করছিল, দিনে দিনে কত কিছুই পাল্টে গেছে: বিড়ির বদলে সিগারেট উঠেছে, আবার পাইপ খায় অনাদি সরকার। পোকার বিষ মারতে শয়ে শয়ে টাকা খরচা হচ্ছে। পোকা মারার বিষ যখন এত সহজলভ্য তখন মানুষ মারার বিষ নেই? একটু জলে গুলে দিলেই তো হলো।

হঠাৎ হাঁকার দেয় শিবু। নালায় জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এ ক্ষেতটা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে শেষ করে পাশের ক্ষেত ধরতে হবে। শিবু বুঝতে পারে সব দিক থেকে সে প্যাঁচে পড়ে যাচ্ছে। তার বাবার এত শক্তসমর্থ শরীর, অথর্ব হয়ে পড়ার মানে কী? তাদের সাঁওতাল পাড়ার বিশুর বয়স তার বাবার থেকে চার বছর বেশি। সে আগাছা সাফ করছে সামনের দুটো ক্ষেত পেরিয়েই।

থালি হাতে উঠে আসে শিবু বাপের কাছে। 'এক সের চালে আমরা কটা লোক খাব?' কালো কুচকুচে নাটা শরীরখানা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসে, উত্তেজনায় চোখ কুতকুত করে।

'ধোঁয়া ধোঁয়া দেখি রে বাপ!'

'আমি কী করব? এক সের চাল দিয়ে কজন খাব?' থালিখানা শূন্যে ঘোরায় শিবু।

অথচ শিবু গোটা সাঁওতালপাড়ার আদর্শ সন্তান। এবং সে কবি। তার সাঁওতালী ভাষায় লেখা পালা শুধু এই হুগলী জেলার গাঁয়ে গাঁয়েই নয়, বিহারের সাঁওতালী অঞ্চলে এমন কি খোদ কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর পালার মূলে বিষয়বস্তু মাতাপিতার প্রতি সন্তানের অনাদর অবজ্ঞা ও শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ। সেই শিবু যখন হাঁকার দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায় তখন শম্ভুর চিন্তা হয় সে তার বাপের বুড়ো শরীরে হাত তুলবে

স্যাঁক। বিপদে মেয়েটার দিকে তাকায় শম্ভু। শিবু মাটির ওপর থালাটা রেখে বলে, 'তুমি বসে থাকবে, মা বসে থাকবে। সবাই ধোঁয়া ধোঁয়া দেখবে। আমি কি তোমাকে দেখব?' শিবু ছেলেবেলার মতো এখনও তার বাপের সাথেও। বাবা যেমন করে আলের ওপর ওঠে শম্ভু। 'তোর পাড়ায় বাবা মাও অন্ধ হয়েছিল না রে? বাবা মা-ও ভিক্ষে করছে, ছেলেও ভিক্ষে করছে। ভিক্ষে করতে করতে দেখা। বাঃ! খুব ভালো রহস্য করেছিস।'

শিবু নীরবে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে বাপের দিকে। সে বুঝতে পারে। বাপের নিশ্চয় এক্ষুণে মাজা ব্যথা শুরু হয়েছে, দেহ হড়কাতে মাজায় লাগে, নইলে শুধু চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখলেই কাজ ছাড়ার মানুষ তার বাবা নয়। নালিতে জল দিতে দিতে বলে, 'শরীর ভালো লাগছে না, বাড়ি যাও। গরুগুলোকে জাব দাও। আর মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও ক্ষেতে।'

এবার শিবু আর শিবুর বউ দুজনেই ডোঙায় হাত লাগায়। আবার নালা জলে ভরে উঠল জল ছিটোয়। শম্ভু আল ধরে এগোতে থাকে এক রুপোলী ধোঁয়ায় আলুর ক্ষেত-গুলো পার হয়ে ঘিয়া নদীর ধারে সাঁওতাল পল্লীর দিকে।

লিকলিকে কালো আঠারো বছরের মেয়েটা দাওয়ায় বসে তার ছোট মেয়েটাকে দুধ দেয়। বড় মেয়ে উঠোনে পাতা উনুনের ধারে উবু হয়ে বসে কলাইয়ের থালা থেকে ফ্যান চিপে চিপে ভাত মুখে দেয়। তার হাঁটু পর্যন্ত কাউর, সারছে না।

শম্ভু দাওয়ায় উঠে চারদিক ঠাওর করে এবং ঠাওর করা মাত্র রাগ হয়। রাগ হয় তার নাতনির ওপর, নাতজামাইয়ের ওপর। নাত-জামাইটা থাকলে তাকে বলা যেত গরু-গুলোকে জাব দিতে। অবশ্য সে শুনতো না। ঘোঁত ঘোঁত করে বেরিয়ে যেত। নাতনি মেয়ে নামিয়ে উঠোনে পাতা উনুনে বসানো হাঁড়ি থেকে কয়েক হাতা ফেনাভাত কলাইয়ের বাটিতে রাখে। তারপর সেই ধোঁয়া-ওড়া ভাতের বাটি নিঃশব্দে শম্ভুর পাশে রেখে রান্নাঘরে ঢোকে।

বিয়ের আগে থেকেই মেয়েটার চালচলন এই রকম। বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো মদ খায় না। এমন কি পাড়ায় ঘুরেড়ায় না। কাজ করে, কাজ না থাকলে শুয়ে থাকে। সেই মেয়ে কি করে স্বামীর সাথে, দাঁত বাঁধিয়ে দিলে চিন্তা করে কুল পায় না শম্ভু। কিন্তু চুপ করে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। গরুগুলোকে জাব দেয়, তারপর দাওয়ার কোণ থেকে তালপাতার ঝাঁটাগাছা নিয়ে দাওয়া ঝাঁটায়।

কে একজন হাঁকছে খেয়াল হয়নি। ঝাঁটার আওয়াজে চাপা পড়ে গিয়েছিল। এবার স্পষ্ট শোনা গেল, 'কি গো, ক্ষেতে যে পাত্তা নেই, এদিকে দাওয়া ঝাঁটাচ্ছো।'

লোকটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট। তার চশমার ঝলকানি শম্ভুর চোখে বেঁধে।

শম্ভু ঝাঁটা ফেলে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে আসে।

'কবে এলে?'

'সেকেন্ড ট্রেনে।'

'আজ আছো?'

'আজ রাতটা আছি। ডোঙার আঁটা সারাতে বলেছি। আর কী বুঝছো? এবার নতুন কায়দায় আলু বুনেছি তো, কলকাতা থেকে লোক এনে। জ্যাঠতুতো ভাইরা বলছে এতগুলো টাকা মারা গেল। বলছে কি জানো, তিন হাজার টাকা মাটি চাপা দিলে। তুমি কী বলো?'

'একটা সিগারেট দাও।'

'এই যে এই নাও, তোমার জন্যই এনেছি।'

শম্ভু সিগারেটের ফিল্টারের দিক চোখের সামনে তুলে বললে, 'পাইপ দিয়েছো না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পাইপ', পবিত্র কথা বাড়ায় না।

'তুমি ভালো করে দেখেছো? তুমি তো জানো, আর সবাইকে ঠিক আমি বিশ্বাস করি না।'

সিগারেটে টান দিতে দিতে শম্ভু ...

'না না, ও সব বাজে কথা। আমি আজই দেখেছি। তেল দিয়েছে।'

'মাটি কামড়ে ধরেনি তো?'

'না না, মাটি ঝুরো।'

'তা তুমি এতো সকালে ক্ষেত ছেড়ে '

'মাজা ভেঙে গেছে, আর পারি না। আর সব ধোঁয়া ধোঁয়া দেখি।'

'চোখে ছানি পড়েছে। তোমাকে তো কাঁকুড় থেকে বলছি, কলকাতায় নিয়ে যাব। হাসপাতালে ভর্তি করে ছানি কাটিয়ে দিচ্ছি তোমার এক পয়সা খরচা নেই।'

'সে হবে হবে, এই পৌষ মাসটা যাক।'

'তুমি বরাবরই ওই রকম,' পবিত্র বেজার-ভাবে বলে।

'কলকাতা আমার খোঁয়াড় খোঁয়াড়

লাগে। হাগব কোথায়?' ফিচেল হাসি খেলে শম্ভুর কাঁচাপাকা ছাগল-দাড়ির মধ্যে, মলিন দাঁতে। 'এইখানে যেমন চারদিকে মাঠ জঙ্গল। বাজ্যে পেচ্ছাপের অসুবিধে নেই,' শ্যামার বলে।

'সে তোমায় ভাবতে হবে না। হাসপাতালে সব ব্যবস্থা আছে। আসলে তোমার মন স্থির নেই।'

শম্ভু আর পবিত্র দুজনে দাওয়ায় বসে সিগারেট খায়। পবিত্রর বয়স পঞ্চাশ, প্যান্টের ওপর গরম পুলওভার। কলকাতায় ভালো চাকরি করে। বিঘে পঁচিশ-তিরিশ জমি ভাগে দিয়েছে। খুব করিতকর্মা চোখ কান খোলা। গাঁয়ের মধ্যে সেই প্রথম নতুন পদ্ধতিতে আলুর চাষ দিয়েছে কলকাতা থেকে কৃষি বিভাগের লোক এনে। সার ওষুধে কয়েক হাজার টাকা খরচা করেছে।

'সেবার যখন কলকেতায় গেলাম তোমার বাবার সঙ্গে।'

'সেবার মানে তো চল্লিশ বছর আগে।' পবিত্র হাসে।

'তা হবে। তখন ভাসা পোল ছিল গঙ্গার ওপর। গঙ্গার ধারে তোমার বাবার অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে সব কাজ-টাজ দেখলাম। ফিরছি, জানো। একটা পুতুল কিনেছি, শিবু তখন সবে হয়েছে। হঠাৎ পাশ থেকে 'দেখি দেখি' বলে একটা লোক পুতুলটা তুলে নিলে। আমি চাইলাম, লোকটা বললে, ওটা ওর পুতুল। আমি তখন তোমার বাবাকে ডাকলাম। তোমার বাবা ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেছে। তোমার বাবাকে দেখে বলে কি, আমি রগড় করছি। তোমার বাবা বললে, তোমার বাড়ির লোক? রগড় করছো?'

'সকালে একবার হয়েছে?'

'কোথায় হবে? পয়সা নেই। দুটি ভাত দিলে খেলাম।'

'তোমার জামাইটা তো বেশ ডাঁটো ছিল। দেখলাম না ক্ষেতে।'

'বউ-এর সঙ্গে পেটাপেটি করে পালিয়েছে।'

'তা ডেকে আনো।'

'পায়ে হাত দেবো? গিয়েছে গিয়েছে, শুনছি দুর্গাপুরে ভেগেছে।'

'বেশ কাজের লোক ছিল গো,' পবিত্র আবার বললে।

'একটু খোলো ছিল। বাড়ির কাজ করে না, ক্ষেতের কাজ করে। বললাম, গরুগুলোকে জাব দিতে। গর গর করতে করতে বেরিয়ে গেল।'

'তা হলে পৌষ মাস গেলে তুমি আসছো কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, যখন এতদিন মরিনি, তখন একটা দুটো মাস মরব না। এবার ঠিক যাব। তুমি এলে, তোমাকে কী খাওয়াব? আমাকে শিবু কি বলে জানো, নেশাটেশা ছেড়ে দিতে। এখন মরবার আগে নেশাটেশা ছেড়ে কি হবে? বলো। আট আনা পয়সা আছে?'

প্যান্টের পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা দিয়ে পবিত্র বলে, 'আবার যাবে বাজারে?'

'নাঃ, এই স্থিরার ধারেই আসে। এখনই আসবে। এই বেলাটা পড়লেই।'

'আমি উঠি, আচ্ছা দাঁড়াও।' বুক পকেট থেকে দুটো ধানের ছড়া বার করে। 'রং কেন পাল্টে যায়, বল তো শম্ভু। দুটো রং দেখেছো আলাদা। আগেরবার আরও মেটে ছিল।'

চোখের সামনে তুলে ছড়া দুটো নামিয়ে রাখে শম্ভু। 'তা আলাদা হবে না? মাটি আলাদা।' তারপর চোখ কুতকুত করে বলে, 'তোমার লেভি নোটিস এয়েছে?'

'হ্যাঁ। নোটিস দেওয়ার মালিক তো মল্লিক। আমি আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের কায়দা নিয়েছি, বুঝলে। আমাদের তিন ভাইয়ের আলাদা আলাদা দেখিয়ে দিয়েছি। খণ্ডনাপত্তর আলাদা, নোটিস একসঙ্গে দিলে তো হবে না।'

শম্ভুর মুখে যে ফিচেল হাসিটা খেলছিল, তা এখন পবিত্রর মুখেও ছড়িয়ে পড়ে। বছর পঞ্চাশেক কালো দাঁত মোচটার নীচে আরও কম দেখায়।

'তা তো নিশ্চয়, তা তো নিশ্চয়', শম্ভু উৎসাহ দেখায়।

'মল্লিক বললে কি জানো?' বললে, কাগজপত্তর যা বানিয়ে রেখেছো, তোমাকে কে ছোঁয়।'

পবিত্র দাঁড়িয়ে ওঠে। এবং শম্ভু বেশ মমত্ববোধ করে এই ছোকরা সম্পর্কে যদিও সে জোতদার বটে। এই ব্যাপারটা সে বিশুকে বোঝাতে পারে না। শহরের বাবুরা যারা কয়েক বছর আগে গলায় লাল রুমাল বেঁধে তাদের গাঁয়ে এসেছিল তাদেরও ঠিক বোঝাতে পারেনি। ভালোর মধ্যে খারাপ, খারাপের মধ্যে ভালো, সব জাঁকোড়ে ভাবলে চলবে না। নইলে চার পাঁচ বছর আগে যে সব ঘটনা ঘটে গেল গাঁয়ে তার কোন হদিশ পাওয়া যায়? পালবাবুকে গাছে বেঁধে মার দেওয়া হলো, ধর্মগোলা করবে বলে ছোকরারা এসে ধান লুট করল। কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ তখন এই বিচারবো'

লুপ্ত। পালবাবুরা গিয়েছিল পবিত্রর বাড়িতে, এমন কি হাওড়া কোর্টের অনাদি সরকারের কাছে। গবমেণ্ট বদ্লাল। এবার বদলা নেবার সময়। কিন্তু পবিত্র উৎসাহ দেয়নি, কারণ গাছে বেঁধে মারপিট করার রেওয়াজ পালবাবুরা প্রবর্তন করেছে এ গাঁয়ে, এখন চাষীদের জোর বেড়েছে। তারা পালবাবুকে পিটিয়ে দিয়েছে। তবে সবাইয়ের সঙ্গে মিটিং করে স্থির হলো, ধর্মগোলা করতে হলে লিখিতপড়িতভাবে করতে হবে। ধর্মগোলার নামে লুটতরাজ চলবে না।

ভালোর মধ্যে খারাপ, খারাপের মধ্যে ভালো, এ কথাটা শিবুকে বোঝানো যায় না। শিবু এখন থিতিয়ে গেছে। চার পাঁচ বছর আগে লাল রুমাল গলায় আঁটা ছোকরাদের সে ছিল স্থানীয় নেতা। তারপর যখন সরকার পাল্টাল তখন বহু দিন সাঁওতাল-পাড়ার লোকজন ভয়ে ভয়ে ছিল। এই যে লোকটা পাইপ খায়, চোখে দেখে না, সেই লোকটা আর পবিত্র এরাই ঠেকিয়েছে। ভালোর মধ্যে খারাপ, খারাপের মধ্যে ভালো, এই জগৎ সংসারের নিয়ম।

তা ছাড়া, শম্ভু হেমব্রম চিন্তা করতে করতে উঠে পড়ে। শহরের বাবুরা এসে জোতদার জোতদার করে চেল্লাচেল্লি করলে কী হবে? বাবুরা তো এসে হুচোক দিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা ধান দেবে? কাজ দেবে? এই পবিত্র লোকটার গলাখানা কেটে দিলে ধান পাওয়া যাবে? ধান যদি পাওয়া যায় তা হলে বলো আমিও ভিড়ে যাব। কিন্তু লুটের ধান থাকে না, লুটের ধান বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাওয়ায় উড়ে যায়।

ঘিয়ার ওপর ক'বছর হলো সিমেণ্টের পোল বসেছে। ঘিয়ার জল সরু। কাদায় বক ঘোরে। পোলের পাশ দিয়ে পবিত্রর মাথা দেখা যায়, হন হন করে চলেছে, আলুর মরসুমে লোকটা কারিতকর্মা হয়ে উঠেছে. ছাঁটিতে প্রায়ই কলকেতা থেকে আসছে তদারক করতে। ওদিক থেকে আর একটা লোককে আসতে দেখা যায়। মেটে লুঙির ওপর মেটে গরম কোট। এক হাতে পাইপ, আর এক হাতে লাঠি। ঘিয়ার জল চক চক করে। ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবখানা কেটে যাচ্ছে। নদীর গায়ে ঝুপড়িতে ঢোকে শম্ভু হেমব্রম।

ওদিকে সাঁওতালপাড়া শেষ হতে না হতেই হাড়িপাড়া। স্থানীয় অন্নপূর্ণার মন্দিরে এ সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো সমস্ত গাঁয়েরই দুর্গাপুজো। পালেদের ছেলেরা চেয়েছিল বাজনা বাজিয়ে লরীতে নেচে ফিলিমের রেকর্ড বাজিয়ে এই বাঁশবনে দুর্গাপুজো করবে। কিন্তু গাঁয়ের লোকের আপত্তিতে তা হয়নি। অনাদি সরকার হাড়ি-পাড়া পার হতে গিয়ে পেছন থেকে হাঁক শোনেন, 'এই যে কাকা, এদিকে কোথায়?'

'কবে এলি?' অদৃশ্য আগন্তুকের দিকে ছুঁড়ে দেয় প্রশ্নটা অনাদি সরকার, কারণ সে প্রায় অন্ধ, সামনের এক হাত দু-হাত পর্যন্ত একটা অস্পষ্ট ঠাওর হয়, তারপর সব অন্ধকার। দশ বছর আগে গ্লকোমা-আক্রান্ত অনাদি সরকার কিন্তু গোটা গ্রামখানা চরে বেড়ায় নিজের বাড়ির উঠোনের মতো।

'তোমার সেই মেয়েটা আছে?'

'বন্দনা? তুই একবার দেখে যা মেয়েটা কেমন কাজ করে। বলে কি, আমি ধান সেদ্ধও করতে পারি, কিন্তু কার কথন বলো তো। তুই আয় না, এক কাপ চা খাবি। বন্দনা খুব ভালো চা করে।'

'আমি আজ আছি। ও বেলা যাব। তোমার গৌরাঙ্গে জাল দিয়েছিলে?'

গৌরাঙ্গ অনাদি সরকারের বাড়ির লাগোয়া চার বিঘে জল।

'গত শনিবার।'

'কত দর পেলে? দু কিলো হয়েছে?'

'নাঃ, এই তো আবাড়ে ছেড়েছি। এক কিলোটাক। আট টাকা দর পেলাম।'

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে অনাদি সরকার রাস্তার মাঝখানে গরুর গাড়ির চাকা যে বিরাট দাঁড়া কেটেছে তাতে নেমে পড়ে দূর থেকে একটা সাইকেলের আওয়াজে। লাঠি তুলে বলে, 'দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। আমি যে অন্ধ বন্দনা বিশ্বাস করে না।' দুজনে পাশা-পাশি হাড়িপাড়া পার হয়ে যায়।

রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেদিকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি সরকার, 'তুই আয় না, এক কাপ চা খাবি আমার সঙ্গে। তুই খেলে আমিও একটু খাব। বন্দনা বলে, তুমি বুড়ো হয়েছো, কবার করে চা খাবে। তুই একবার দেখে আয়, আশ্চর্য মেয়ে!'

'আমি একটু পাঁচু জেলের কাছে যাচ্ছি। স্টেশনে মাস্টার মশাইকে বলে রেখেছিলাম।'

'তুই তো গত সন খাঁপুকুর কিনেছিস?'

'পাঁচু বলেছিল আজ ভোরে টানা জাল দিয়ে আসবে।'

'তোর দু কিলো হবে?'

'দূর্। আধ কিলো হলেই হলো। বা পাব ঝেড়ে দেব। কাল সকালটা থাকতে হবে।'

'আমার একটা ব্লেড কিনতে হবে।'

'ছনার দোকানে?'

'ও-বেলা আসিস।'

লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোয় অনাদি সরকার। এ জায়গাটা জংলা। খানিকটা এগিয়েই ঘন আম কাঁঠাল বাঁশবন। একদিকে উঁচু চালের মাথায় একটা নিঃসঙ্গ শিমুল। লাঠি ঠোকার আওয়াজ রাস্তার ওপর জমে থাকা শুকনো শিশিরে ভেজা পাতায় বেশী দূর ওঠে না। এগোতে না এগোতেই গোবর চোনার গাঢ় গন্ধ। গাঁয়ের সবচেয়ে ধনী ঠোঁটি মোল্লার বাড়ির সামনেই পাকা গোয়ালে সার সার তাগড়া দুধেল গরু মোষ অনাদি সরকারের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে। ঠোঁটি মোল্লা দাঁড়িয়ে গেছে ছেলেগুলোর জন্যে। একজন স্থানীয় ফার্টিলাইজার আর একজন পাম্প যন্ত্রপাতির এজেন্ট।

মুসলমান পাড়ার রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকা খুব বড় খাদ করেনি। ঠোঁটি মোল্লার মেঝো ছেলে গাড্‌ডা গর্ত বুজিয়েছে মাটি চাপা দিয়ে। তারপর আবার আলুর ক্ষেত। এবং ক্ষেতের ঠিক মাঝখানেই বলতে গেলে গাঁয়ের ঠিক মধ্যিখানে পালেদের লাইসেন্স-বিহীন হাসকিং মিল থেকে ধক্ ধক্ শব্দ ওঠে। এই হাসকিং মিল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ কৌতূহল অনাদি সরকারের এখনও আছে, কারণ যখন তার দৃষ্টিশক্তি ছিল তখন এ মিল বসেনি। ঢেঁকি কমে এলেও ঢেঁকির পাট ছিল। এখন সে পাট উঠে গেছে। কোন কোন বাড়িতে পৌষ মাসে পিঠে বানাতে গুঁড়ি কোটার জন্যে একটু আধটু ব্যবহার হয়।

ছনার দোকানে ব্লেড কিনে ফিরোয় অনাদি সরকার। তারপর পাইপ ধরায়। ফেরার পথটা সে বরাবর তার পিতৃপুরুষের ভিটের গা দিয়ে যায় যে ভিটে বিশ-পঁচিশ বছর আগে ছেড়ে ঘিয়ার ধারে সাঁওতাল-পাড়ার গায়ে তার পত্তন করেছে। এদিকে এক ঝাঁক পাকাবাড়ি, বাঁশবন, পুকুর। এইটা ছিল তাদের খিড়কির পথ। আর এই পথে ভোর রাত্তিরে অনাদি সরকার যাতায়াত করেছে। অদূরে বাঁশঝাড়ের নীচে খিড়কির দরজা ধরে এক নারীমূর্তি, মাথার ওপর জ্বলজ্বলে ভোরের তারা। এইখানে এলেই অনাদি সরকার তার যৌবনে ফিরে যায়। ঠিক প্রথম যৌবন নয়, বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বয়স থেকে শুরু হয় এই ভোর রাত্তিরের যাতায়াত। তারপর বছর পঁচিশেক আগে হাওড়ায় তার নিজের পরিবার, এখানে-তাদের জ্ঞাতিবর্গকে তুড়ি মেরে সেই ডাক-সাইটে সুন্দরী বিধবা নলিনীকে নিয়ে ঘিয়া নদীর ধারে জঙ্গল কেটে সংসার পাতলে। গাছের ছায়ায় থমকে দাঁড়ায় অনাদি সরকার। পাইপ নিবে গিয়েছে। ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে সেই প্রবল আকর্ষণের স্মৃতি তার মন আচ্ছন্ন করে। অনাদি ছিল বরাবর অত্যন্ত সামাজিক কেজো মানুষ, গাঁয়ের কোঁদলের মধ্যে গজরালির মধ্যে কোনদিন থাকেনি। সামাজিক কিন্তু রোখা। সেই রোখা লোকটা দমে গিয়েছে। দুনিয়া একদিকে আর নলিনী একদিকে, এই করে যে সকলের থেকে সরে নতুন জগত তৈরি করেছিল ঘিয়া নদীর ধারে সেই জগত আজ ছিন্নভিন্ন। বয়সে কি সবই পাল্টে যায়? অবশ্য নলিনীর হাঁটা চলা, যেন হাওয়ায় ভেসে যায় সে শরীর, তা বছর দশেক হল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল অনাদি সরকার টের পায় নলিনী চেতরে গেছে, শরীরে মনে সে নলিনী নেই। হপ্তা দুই আগে তার এই নতুন জীবনের ছেদ পড়েছে। নলিনী ভয়ংকর ঝগড়া করে চলে গিয়েছে।

জলে থান ইঁট পড়ার গুপ্ গুপ্ শব্দ আসে, তারপর বাঁশঝাড় নাড়ানোর শব্দ।

'কে রে' পাঁচু? মাছ তাড়াচ্ছিস?' আবার শব্দ লক্ষ করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অনাদি সরকার। পাশে কুমীরডোবা। কেনই যে এ পুকুরের নাম কুমীরডোবা এবং তার নিজের

পুকুরের নাম গৌরাঙ্গ, ভগবান জানেন।

'মাছগুলো শীতে ঘাপটি মেরে আছে বাঁশ ঝাড়ের আওতায়।' পাঁচু জেলে উত্তর দেয়।

'তাড়া দে, তাড়া দে', অনাদি সরকার লাঠি ঠুকঠুক করে এগোয়।

এবার খানিকটা রাস্তা খারাপ। বর্ষার জলে গরুর গাড়ির চাকায় আচমকা গাড়া-গর্ত। রাস্তার পাশ দিয়ে যে সরু ঘাসের পাড় আলের মতো জেগে আছে তার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। সোঁদা গন্ধ আসে। তার মানে বড় দ, কচুরীপানায় বোজা ঝিল, সরকারী সম্পত্তি। বড় দ-র পাশ কাটিয়ে বাঁক নেয়। এবার খানিকটা ফাঁকা, জোড়া আমতলা। আমগাছের নীচে ঝিরঝিরে শীতের হাওয়া দেয়। সামনে অনেকখানি আলুর ক্ষেত। সেখান থেকে কথা ভেসে আসে, খাল থেকে ডোঙ্গায় জল তোলার ছপ ছপ শব্দ। এবার একটু এগোলেই তাল নারকেলের ঝোপঘেরা গৌরাঙ্গ। সেই চুয়াল্লিশ প'য়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে আজ একাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তাদের ডেরা, হাওড়ার বাড়ি থেকে গাঁয়ের পৈতৃক ভিটে থেকে পালিয়ে তাদের এই জল গাছ ফুল আর সাপে-ভরা ছোট রাজত্ব গত বছরও সাতাশটা সাপ মারা পড়েছে, বেশীর ভাগই বোড়া, দুটো গোখরো ছিল।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে? অনাদি সরকার ঠিক সমাজ সংসার মিছে সব করে নি। হাওড়া শহরের যে ক'জন কৃতি আইনজীবী তাদের মধ্যে একজন। ফৌজদারী কেসে ল-পয়েন্ট তার ছিল নখাগ্রে। বিশেষ করে মুসলমান মক্কেলদের মধ্যে তার খ্যাতি অবিসংবাদিত। 'ওপরে আল্লা', নীচে অনাদি সরকার', বেশ চালু কথা স্থানীয় অঞ্চলে। খুন করেই লোকে ছুটে আসত, আর আইনের বইয়ের যে সব সূক্ষ্ম অলিগলি সেই সব অলিগলি দিয়ে হাঁটিয়ে মক্কেলদের খালাস করে আনে অনাদি সরকার। দুটি ছেলেকে যত্ন করে মানুষ করেছে সে। একমাত্র জামাই ইঞ্জিনিয়ার। যখন জংগল কেটে বসত বাটি বানালে তখন থেকেই এ গ্রামের সংগে তার পরিবারের যোগ যোগ ছিন্ন। এতদিন যাকে নিয়ে সংসার সেও বিদায় নিয়েছে।

'বন্দনা!' কালো সিমেণ্টের চকচকে পালিশওয়ালা মেঝেতে উঠতে উঠতে ডাক দেয় অনাদি সরকার।

ফ্রকপরা তেরো চোদ্দ বছরের স্বাস্থ্যে ভরপুর একটি মেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, 'চানের জল দিয়েছি। চান করে নাও।'

বিকেলের আলো পড়ে আসছে গৌরাঙ্গের জলে। অদূরে আলুর ক্ষেত থেকে ভেসে আসা আওয়াজও কদাচিৎ। সামনে ইঁট দিয়ে বাঁধানো পথে, সদ্যবসানো চন্দ্রমল্লিকার চারায়, মুরগীর ঘরে ছায়া পড়েছে। পুকুরের পাশ দিয়ে শুকনো পাতার ওপর মচমচ আওয়াজ ওঠে। বাগানের কোণে ঘুমন্ত কুকুরটার ডাকে অনাদি সরকারের চটকা ভাঙে।

'কে পবিত্র?' আবার শব্দভেদী প্রশ্ন।

'এই অবেলায় ঘুমোচ্ছ। কই চা খাওয়াও কাকা।' পবিত্র আসার সংগে সংগে শোরগোল লাগিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি আমার একটা সিগারেট খাও, পাইপ ধরাতে হবে না।'

আগুনটা অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনাদি সরকার বলে, 'আমি যে দেখতে পাই না, বন্দনা বিশ্বাস করে না।'

'তোমার এখানে আর যে সব জীব নড়ে চড়ে বেড়ায় তাদের গায়ে পা চাপিয়ে দাও না?'

'সাপ? না সাপে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই কাল সন্ধেবেলা বাগানে ঘুরছি। বন্দনা বললে, পা সরাও, পা সরাও। আরে বল কোন দিকে সরাব, ডাইনে না বাঁয়ে। আমি দাঁড়িয়ে আছি।' একটু থেমে বললে, 'কলকাতাতেও তো যাতায়াত করি। সেখানেও তো ট্রামবাসে চাপা পড়তে পারি। সাপ আর ভাবি না।'

'আসলে', সতর্কভাবে পবিত্র বলে। 'নলিনীপিসি না থাকাতেই......'

'না না, শেষকালটা বড় ছিঁচিবাই হয়ে গেছিল। সকলের সংগে ঝগড়া করত, কাউকে টিঁকতে দিত না। ভালই হয়েছে। আর বন্দনা আরও কাজের।'

বিস্ময় ফোটে পবিত্রর চোখে। বোধ হয় তুলনাটা তার পছন্দ নয়।

'বন্দনা বলে, আমি ধানও সেদ্ধ করতে পারি, কিন্তু কখন করব। সাতা এত কাজ।' প্রসংগ পাল্টে বললে, 'লেভির নোটিস দিয়েছে? যাই করো বাপু, কাগজপত্তর ঠিক রেখো।'

'কাগজপত্তর কাকা সব ঠিক। আমরা ভাইরা ভিন্ন দেখিয়ে দিয়েছি। নোটিসের আওতায় পড়ব না।'

'পড়লও অবজেকশান দিয়ে দিবি। তারপর তো এক বছর। ওরা কী করবে? একটা অর্ডিনান্স পাশ করবে, এই তো?'

পবিত্র চলে যাবার পর ঝপ করে অন্ধকার নামে। এবং তারপর ম্লান জ্যোৎস্না। অদূরে সরু ঘিয়া নদীর জল চকচক করে। অনাদি সরকার ভাবে যদি ঘিয়ার ধারে শম্ভু হেমব্রমের মতো এক পাত্তর নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকতে পারত। এই শম্ভু আর তার দাদাই জংগল কেটে তার বসত বানিয়েছে। এখন সেও তার মতো রণক্লান্ত। হঠাৎ তার একটা আশ্রয়ের কথা মনে পড়ে। 'বন্দনা' অন্ধকারে বারান্দায় ডাক দেয় অনাদি সরকার। মেয়েটা কাছে আসতেই দু হাত দিয়ে টেনে বসায় তার পাশে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

অন্ধকার ছলছল করে মেয়েটার গলা, 'তোমার ভিমরতি ধরেছে বুড়ো।'

'আমার যে আর কেউ নেই বন্দনা।'

'ছাড়ো।' হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। তারপর অন্ধকারে বাগানের পথ ধরে মিলিয়ে যায়।

॥ ত্রিশ ॥

বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।
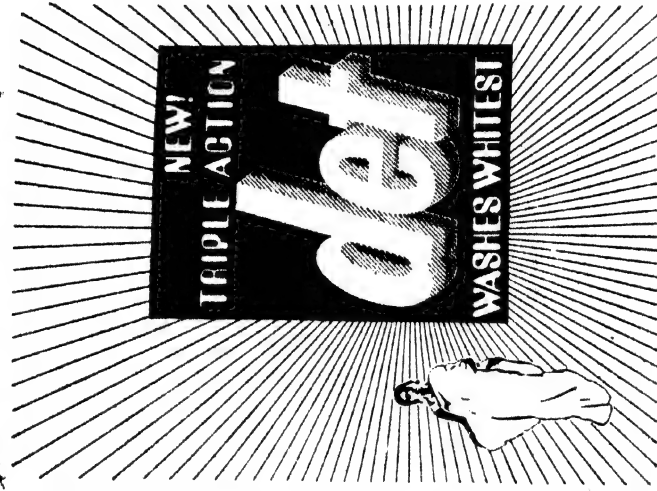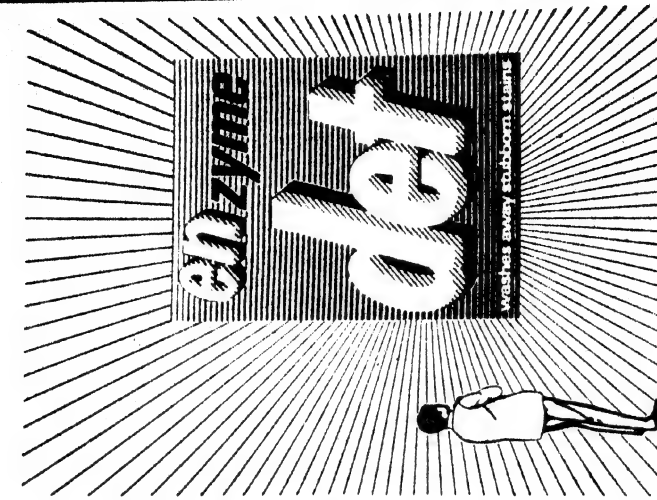
একটি নয়, দু-দুটি সিন্ধুর।

দুই-ই সমান উত্তাল, সম উতরোল, সম্যক অতলান্ত।

কন্যা কুমারিকায় যেমনটি। একদিকে বঙ্গোপসাগর অপরদিকে আরব সমুদ্র পরস্পরের মুখোমুখি সম্মুখীন।

আমার আস্তানাটাও প্রায় তেমনি। এক-দিকে চোরাবাগানের উদ্ধত যৌবন সর্বদা সমুদ্যত; অন্যদিকে কলাবাগানের উন্মার্গ নয়া জোয়ান যতো। পরস্পরের প্রতি মুখিয়ে। একবার সামনে পেলে হয়।

আমার বাসাটা উভয়ের মাঝে পড়ে দুধারের ধাক্কা সামলাচ্ছে।

বলেছি আগেই—আমার এই একশো চৌত্রিশ নম্বর, মুক্তারামবাবুর নাম ধরলেও ঠিকানাটা ঠিক সেখানে নয়। চোরবাগান এলাকার একটা গলিতে শুরু হয়ে কলা-বাগানের সাথে গলাগলির মতলবে মুখ বাড়িয়ে একেবারে মার্কাস স্কোয়ার মাঠের কিনারায় এসে হাজির। মধ্যপদলোপী সমাসের মত আমার আস্তাবল সর্বদাই আত্মবিলোপের সম্মুখীন।

স্বাধীনতার প্রাক্কালীন প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিন তিনবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধাক্কা আমার বাসার পৈঠায় এসে আছড়ে পড়েছে, একধারে মার মার হিন্দু যুবকের দল, অন্যদিকে কাটকাট মুসলিম নওজোয়ান যতো—এই দুই মারমুখী দুর্জনতার মাঝখানে আমি। ত্রিশঙ্কুর মতই নিঃশঙ্ক।

এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! তিন তিনটে জোয়ার আমার আস্তানার সামনের রাস্তা দিয়ে বয়ে গেছে। উদ্দাম বেগে। উন্মাদ উল্লাসে।

সেই সব অকুসময়ে অকুস্থলে শুধু একলা আমি। বাসার আর সবাই সুরেপাত্তেই হাওয়া! কে কোথায় গেছে পাত্তা নেই। ফিরে এসেছে দাঙ্গা হাঙ্গামা সব চুকেবুকে যাবার পর।

তিন তিনটে এই ঐতিহাসিক পাগলামির সাক্ষী আমি।

যদিও এই তিনবারের একটাতেও কোনো বিদ্ঘুটে কাণ্ড আমার সাক্ষাতে ঘটতে দেখিনি। একই আমার দুর্বল হৃদয় চোখের ওপর অমন কারোর হতাহত হওয়ার দৃশ্য দেখলে তারপর আর দেখতে হোতো না। পাড়তে হত না কাউকে,

‘ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’

প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর অমূল্য স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় পর্যায় ‘ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’এর প্রথম পর্ব ঊনত্রিশটি পরিচ্ছেদে ইতি-পূর্বে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। ২৯তম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয় গত ৩০ ডিসেম্বর, ’৭২ তারিখের সংখ্যায়।

এখন, বর্তমান সংখ্যা (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) থেকে আবার ‘ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’-এর দ্বিতীয় পর্বের—৩০তম পরিচ্ছেদে যার সূচনা—ধারা-বাহিক প্রকাশন শুরু হল।

হতজ্ঞান হয়ে এমনিতেই আমার মাথা লুটিয়ে পড়ত ভুঁয়ে। খুনোখুনি কাণ্ড সয় না।

চোখে দেখিনি তবে কানে এসেছে বিস্তর। শুনেছি মাঠের ওধারটায় মেছো-বাজারে কাফেরের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কারা নাকি মহোল্লাসে ফুটবল খেলছে, বিধাতার কৃপা। সে দৃশ্য দেখতে হয়নি আমাকে। যাইওনি দেখতে। আর যাই হোক, নিজের মুণ্ডপাত করে দাঁড়িয়ে দেখার মত দৃশ্য সে নয় নিশ্চয়।

প্রথমবারের ঘটনাটা ঘটেছিল হঠাৎ। আগের থেকে কোনো নোটিশ না দিয়ে আচমকা ঘটে যাওয়া—একান্ত অভাবিতই।

অঘটনের দিন সকালে মার্কাস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে হাঁটছি, ঊর্ধ্ব মাত বাইয়ে বাবু।

একজন আমায় থামিয়ে সাবধান করে দিল—বহুৎ হুজ্জত হ্যায়। আমার পাড়ার বাসিন্দে কোনো মুসলমান বলে মনে হলো, আমার চেনা নয়। তার হাতে ঝকঝকে প্রকাণ্ড এক ছোরা! রাস্তার ধারে বসে শানাচ্ছিল। একটু এগুতেই ছোটখাট একটা জটলা চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি তার এবং তার ছোরার ধার ঘেঁষে অকুস্থানের পাশ কাটালাম।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখি একটা জখম লোককে ঘিরে জট পাকিয়েছে কতকগুলো মানুষ। সর্দার গুলও ছিল সেই ভিড়ের ভেতর। তাকে ডেকে শুধালাম, কী হয়েছে দাদু?

দুষমন আড়িয়া লোককা কাম। সংক্ষেপে সারল সে।

হাসপাতালে পাঠাও এখুনি। দেখছো কী? এভাবে এখানে ফেলে রাখলে মারা পড়বে যে। দেখছ না, লাঠি মেরে মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছে লোকটার। কী রক্ত পড়ছে—বাবা!

ওহি আড়িয়া লোক।

বলে তারপরে সে জানালো যে হাস-পাতালে পাঠানোর কোনো উপায় নেই। চার দিকেই ওই দুষমনরা লাঠি নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে। ওই আড়িয়ারা! ঘিরে আছে একেবারে। বেরুতে দিচ্ছে না এই এলাকার থেকে।

তা বটে। চারধারে হিন্দু মহল্লার মাঝ-খানে এ জায়গাটা ঠিক দ্বীপের মতই অনেকটা। ব-দ্বীপ আর নবদ্বীপ—বাঁচাতে হবে লোকটাকে!

আচ্ছা, দাঁড়াও। দেখছি আমি। কোনো-খান থেকে একটা ফোন করতে পারলে অ্যাম্বুলেন্স এসে একে নিয়ে যাবে এক্ষুনি

বালক দত্তর গলি গলে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে পড়তেই সামনে এক মারোয়াড়ির গদি বিগলিত আমি সেখানে গিয়ে বলি—একটু ফোন করতে দেবেন? হাসপাতালে করব। তাঁরা শুধালেন কী হয়েছে আমি জানালাম, পাড়ায় একটা মুসলমান

জখম হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। অ্যাম্বুলেন্স-এ খবর দেব। এখুনি হাসপাতালে না পাঠালে মারা পড়বে বেচারা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চার ধার।

মরলে দেও। নির্বিকার মুখের জবাব এল। ফোনটা পাওয়া গেল না।

এমনি পাড়ার আরো কয়েক জায়গায়।

মুক্তারামবাবু স্ট্রীট পেরিয়ে কর্নওয়ালিসের মাথাতেই মহৎ আশ্রম। সেকালের সম্ভ্রান্ত এক আবাসিক হোটেল। সেখানে গেলাম ফোন করতে।

এই যে, মটনচপবাবু! সাত সকালে এখন যে? আমাকে দেখেই সহর্ষে অভ্যর্থনা করল ঘুনটি চন্দর। মহৎ আশ্রম মালিকের ছেলে।

—এখনো আমাদের মটন চপ নাবেনি মশাই! সে জানায়।

নাববে কি, চাপেই নি এখনো। উত্তোর গাইল ওর ভাই।

ওখানে মাটন চপ গ্রেভি দিয়ে কোনো কোনো বিকেলের আমার ব্রেক-ফাস্ট সারতাম —খবর কাগজ বেচে মোটামুটি কিছু রোজগার হলে। ওদেরও কখনো সখনো একাই তার ভাগ দিয়ে থাকবো বোধ হয়।

আসার কারণটা আমি জানালাম।

টেলিফোন বাক্সে কুলুপ আঁটা যে। চাবি বাবার কাছে।

মহৎ বাসিন্দারা পয়সা না দিয়ে খেয়ালখুশি মাফিক যখন তখন ফোন করে চলে যায় সেই হেতুই ওদের বাবা টেলিফোন যন্ত্রটিকে ওইভাবে আগলে রেখেছেন, জানা গেল ঘুনটিদের কাছে।

সেখান থেকে সোজা গেলাম ব্রাহ্মসমাজ ভবনের পাশের গলি দিয়ে প্রবাসী মাসিকপত্রের কার্যালয়ে। বলতেই ফোনটা মিলল।

ফোন সেরে কালীদের বস্তির পাশ দিয়ে আসছি, আমাকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল সে।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' রুদ্ধশ্বাসে শুধোলো।

'কী হবে আবার?'

'হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেছে যে। মুসলমানরা হিন্দু দেখলেই খতম্ করছে।'

'তাই নাকি? আমি তো দেখলাম একটা মুসলমানই জখম্ হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। মার্কাস স্কোয়ারের পাশটায়।' আমি জানাই : 'তার হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। অ্যামবুলেন্সে ফোন করে দিয়ে আসছি এই।'

'কিছু খবর রাখো না বাপু। কাল রাতে আমার পেশোয়ারি মামা এসে সাবধান করে দিয়ে গেছে আমাদের। ওদের ওধারে মোটেই কেউ যেন-না যাই আমরা এখন, কেন, দারু তোমায় কিছু বলেনি?'

'দারু বললে যে বাঙালীদের সঙ্গে বাধেনি হাঙ্গামাটা। আমাদের কিছু বলছে না ওরা, কেবল আড়িয়াদের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে নাকি।...হ্যাঁ রে, আড়িয়া কারা, তুই জানিস?'

'তুমি জানো না?'

'জানব না কেন? আমার এক মাসি থাকে আড়িয়াদহে। আমি জানব না? কতোবার গেছি সেখানে। আড়িয়াদহকে তারা এঁড়েদা বলে। আড়িয়া মানে সাদা বাংলায় হচ্ছে এঁড়ে। বুঝেছিস?' তারপরে আরো কই : 'যাই বল বাপু, আমাদের ঘটিদের রুচি বলে কিছু নেই। জায়গার সঙ্গে পাশবিক সম্পর্ক স্থাপন কি ভালো? শেয়ালদা এঁড়েদা—কী এ সব? আমরা শেয়ালদা হয়ে এঁড়েদায় যাই। মামার বাড়ির আবদার!'

'তোমার মুণ্ডু! কিছু জানো না তুমি। তুমি বাপু দিনকতক এখন বাসার থেকে একদম বেরিয়ো না। হাঙ্গামাটা মিটে যাক, তারপর......'

'দারু বলছে, আমাদের সঙ্গে নয়, আড়িয়াদের সঙ্গে। আমি কি তোর আড়িয়া যে—আমাকে এঁড়ে সন্দেহ হয় নাকি তোর?'

'হও না হও, একটু সাবধানে থাকতে দোষ কি? সবাই ওরা গোরু খায়। গো-খাদক সববাই। এঁড়ে বলদ বাছে না। এঁড়ে বলে তোমায় ছেড়ে দেবে না। গাই বাছুর বাছবিচার নেই ওদের।'

'বেড়ে বলেছিস। কিন্ত যাই কোথায় বল তো? আমার কি তিনকুলে যাবার কোনো চুলো আছে আর?'

'চুলো না থাক, চাল তো আছে একটা! আমাদের আটচালায় চলে এসো না! আমাদের বাঙালে রান্না চাখলে আর ভুলতে পারবে না মশাই। দিনকতক তাই এসে খাও না হয় তাই।'

'খাওয়ার দিকে কোনো বাধা নেই আমার। কিন্তু শোয়ার দিকে...তোর মা...' আমি আবার না ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। দিনে রাতে ঘুমোনোটি চাই আমার।' যোগ করি তার ওপর।—'কিন্তু তোর মা..'

'কিচ্ছু বলবে না মা। এমন বিপদের সময় মানুষ মোটেই অত স্বার্থপর হয় না। সবাই সবাইকে দ্যাখে। মা বরং খুশিই হবে তুমি এলে। দেখো তুমি।'

'তা কি হয়!'

'মা নিজের থেকেই বলেছিল কাল। মামা কথাটা বলে যাবার পর। ছোঁড়াটাকে বল্ না আমাদের এখানে এসে থাকতে। তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।'

'তা হবে না ঠিকই। যাই খাই না কেন, আমার হজম হয়ে যাবে সব। যা একখানা পেট নিয়ে এসেছি না! খাওয়ার ব্যাপারে ভাবিনে, পাইস হোটেলও তো আছে, কিন্তু তা নয়। শোবো কোথায়?'

'কেন, চৌকিতে। তোমাকে ভুঁয়ে শুইয়ে রাখব না। জেনো ঠিক।'

'ঘরে তো দুটি মাত্তর চৌকি। একটাতে তোর মা শোয়, আরেকটাতে—'

'আরে, কতোক্ষণ থাকে মা? ডিউটিতে বেরোয় না রোজ রাত্তিরে?'

'তারপর তোর বোন কালী রয়েছে।'

'সে তো রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। সারা রাত্তিরই তার ফন্দি-ফিকির। টানা রোজগার। তোমার কোনো অসুবিধা করবে না সে।'

কালী বলল : 'মা ডিউটিতে যাবার পর তুমি না হয় আমার চৌকিতে উঠে এসো। আমার পাশটিতে।'

'তাই কি হয় নাকি?'

'কেন হয় না? না হয়, বিয়ে করে ফ্যালো না আমায়। কালীঘাটে গিয়ে মন্তর পড়ে সিঁদুর লাগিয়ে এলেই হয়। সে কথাও হয়েছে মার সঙ্গে আমার। আমাদের বস্তির মেয়েদের বেশির ভাগই তো ওমনি বিয়ে।'

'তা জানি। বিয়ে মানেই পাঁঠা-বলি। তা কালীঘাটে গিয়েই কি, আর নিজের বাড়ির চৌকাঠের মধ্যে হলেই বা কী, কিন্তু...' তবুও একটা কিন্তু থাকে : 'কিন্তু আমি যে একেবারে অপাঠা রে! বলির অযোগ্য—সেকথা কি করে বোঝাই তোকে। নিজেরই খাবার সংস্থান নেই, সংসার বাঁধার দায় ঘাড়ে নিই কী করে। তুই বেজায় দুঃখু পাবি আমায় বিয়ে করলে। জীবনভোর দুর্ভোগ হবে তোর।'

'সে আমি বুঝব। ঘর বাঁধো তো আগে, আমি ঠিক চালিয়ে নেব আমাদের সংসার। দুজনের সংসার তো! মা বলেছে তা হলে এই বস্তির এ ঘরটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালের নার্সদের হোস্টেলে গিয়ে থাকবে'খন...দেখো না, দু দিনে এ সব ঘরদোরের ছিরি কেমন ফিরিয়ে দিই আমি। তুমি দেখো। দেখবে যে এই বস্তিই যেন হাসছে—এই ঘরই হয়ে উঠেছে স্বর্গ।'

তা মেয়েরা পারে। তার এ কথায় আমার বিশ্বাস হয়। বস্তিকে স্বর্গ করে তোলার জাদুকাঠি ওদের হাতে।

মায়া বদলায় ময়দানবকে [illegible] মানায়। [illegible] ভিখারীকে ইন্দ্র বানিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যায়।

ক্রমশ

পথ ও পাথেয় : রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য-প্রতিবেদক

যে পথ দিয়ে সবাই চলেছি, সে পথেরই হিসাব নেবার জন্য পথিক মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ায়; কতটা এসেছি, আরও কতটা যাবো, পাথেয় কি ফুরিয়ে গেলো, এই সব নানা প্রশ্ন পথচলা মানুষকে ভাবায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ, রবীন্দ্রনাথই আমাদের পাথেয়। তাই যখন কেউ উচ্চকণ্ঠে বলে যে রবীন্দ্রনাথকে আর চাইনে তখন উত্তরে বলতে ইচ্ছে করে 'কতদূরে এসেছি জানতে হলে জানতে হবে কোথা থেকে এসেছি।' পথের নেশায় পাথেয় যেন হেলা না করি।

সেই কথাই বলেছিলেন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। ৩১ ডিসেম্বরের শীতের কুয়াশা তখনও ভাল করে কাটেনি। দলে দলে লোক ছুটে গেছে ময়দানে-ইডেন গার্ডেনসে, ক্রিকেটের দুর্নিবার আকর্ষণে। কিন্তু তারই মধ্যে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রের ছোট হলটি ভরে উঠলো কানায় কানায়—নানা বয়সের নানা প্রদেশের মানুষের একটি সমাবেশ হলো সেখানে। মঞ্চে কোন সাজসজ্জার আড়ম্বর ছিল না। একটি নীল রঙের পর্দা পিছনের পটভূমিতে আকাশের ঔদার্য ছড়িয়ে দিয়েছিল তার উপরে গেরুয়া কাপড়ে লেখা ছিল এক পরমাশ্চর্য বাণী, যেন উদাসীন আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে তার নিত্যসম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছিল "রবীন্দ্রচর্চা বাঙালীর জীবনচর্চা, রবীন্দ্রনাথ পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পড়ুন।" সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন যে এই সম্মেলন অন্য দশটি সম্মেলন থেকে পৃথক আর এক সুরে বাঁধা। ঠিক দশটায়, বাঙালীর অনিয়মানুবর্তিতার অপবাদ ব্যর্থ করে, সম্মেলন শুরু হলো।

সমবের প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বললেন যে, যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই গৃহস্থ—এক গৃহে, এক সংসারে দায়দায়িত্বে, আশা আকাঙ্ক্ষায়, সুখে দুঃখে সকলেই সমভাগী—সে গৃহের নাম রবীন্দ্রনাথ; তারই কক্ষে কক্ষে আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখি, আবিষ্কার করি নিজেদের নিহিতার্থ। অভ্যর্থনায় মামুলী বাক্যবিন্যাসের পথ দিয়ে তিনি গেলেন না ফলে সম্মেলনের প্রথম ভাষণটিই আভাস দিল এক উন্নত মৌলিক চিন্তার স্বচ্ছ অনুসৃতির ধারাটি পরবর্তী কোন অধিবেশনেই ক্ষুণ্ণ হয়নি।

প্রধান অতিথির আসন থেকে গুজরাট-দেশীয় সাহিত্যিক শ্রীউমাশঙ্কর যোশী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্নিগ্ধ শান্ত ভঙ্গীতে প্রায় একঘণ্টা তাঁর উপলব্ধির কথা বললেন। ভাল বক্তৃতার দিন বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে, সেই আকালের মধ্যে এমন সংযত অভিজাত রসিকচিত্তের নিবেদন বহুদিন শুনিনি। চীৎকার ছিল না, ভাষায় অলঙ্কৃত উচ্ছ্বাস ছিল না, আত্মপ্রচারের লেশমাত্র চিহ্ন ছিল

ভাষণ দিচ্ছেন উমাশঙ্কর যোশী

না। বাংলা উদ্ধৃতি যোগে বারবার রবীন্দ্র-সাহিত্য পঠনের আনন্দকেই তিনি তুলে ধরছিলেন। বললেন, রবীন্দ্রনাথ গজদন্ত মিনারের অধিবাসী ছিলেন না, মূঢ় ম্লান মূক মুখে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। বললেন, রবীন্দ্রনাথ তো প্রবাহ, তাঁকে বাদ দিয়ে সাহিত্য করার কথা আজ আর কেউ ভাবেন না। উল্লেখ করলেন চিত্রাঙ্গদার, দেখালেন স্বভাব থেকে মানুষ কেমন করে ধর্মে উত্তীর্ণ হয়। সেই প্রসঙ্গেই বললেন শকুন্তলা সম্বন্ধে গোয়েটের উক্তি—স্বর্গ ও মর্ত, ফুল ও ফল এক সঙ্গে পাবার কথা রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হয়ে মর্ত থেকে স্বর্গ, ফুল থেকে ফলে পরিণত হয়েছে—দুই কবি একই সত্যকে দুটি রূপে প্রকাশ করেছেন। উমাশঙ্করের ভাষণ লিখিত ছিল না, ফলে বিশদ উল্লেখ সম্ভব নয় অল্প পরিবর্তনেও মূল থেকে অনেকটা বিচ্যুতি ঘটতে পারে। দেখেছি টেপে এ বক্তৃতা তুলে নেওয়া হয়েছে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তা সম্ভবত কোনদিন ছেপে প্রকাশ করবেন।

সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ভাষণ ও বক্তব্যে তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রবীন্দ্র অনুরাগী শুধু নয়, রবীন্দ্র-নির্ভর মানুষ নামে একদলকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। যাঁরা বাংলার অধ্যাপনা করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁদের জীবিকা, বাংলা সাহিত্যে যাঁরা নব নব সৃষ্টির প্রয়াসী, যাঁরা পেশাদারী রবীন্দ্রনাটকের অভিনেতা—তাঁদের সকলেই রবীন্দ্র নির্ভর। তাঁদের পরিশোধ্য ঋণ শুধু ঋষিঋণ বা গুরুঋণ নয় তা আরও বাস্তব আরও স্পষ্ট।

সম্মেলনের শুরুতে একটি বেদগান গীত হয়েছিল আর একক কণ্ঠে শোনানো হয় 'ঐ মহামানব আসে।' গান হিসেবে শুধু নয় সমস্ত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সুর যেন প্রবেশ করলো অন্তরে, আচ্ছন্ন করলো সমস্ত বাক্তিত্ব।

বেলা দুটোয় রবীন্দ্র জীবনীর অধিবেশন শুরু হলো। এই সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ এই অধিবেশনটি। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী নিপুণ হাতে সভার কাজ পরিচালনা করলেন। রবীন্দ্র জীবনী সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেল কোন কোন সদস্যের প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি, জার্মানীর চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে; চীনের উপর জাপানের অত্যাচার তাঁর লেখনীতে ধিকৃত হতে দেখেছি; কিন্তু জানা ছিল না যে ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধু অপঘাতের (সানাই) শেষ দুই পংক্তি নয় একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তা তৎকালীন অলকা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। শ্রীমতী মাধবী ঘোষের এই অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি নিটোল মুক্তার মত সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। সম্মেলনে যাঁরা পনেরো ষোলো পাতা দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েন তাঁদের কাছে এই প্রবন্ধের নজির তুলে বলতে পারি বিষয়বস্তুর জ্ঞান স্পষ্ট হলে কত সহজে এবং সংক্ষেপে গুরুত্বের কণামাত্র লঘুতা না ঘটিয়ে তা প্রকাশ করা যায়। শ্রীমতী ঘোষ তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের সংশোধিত প্রুফ কপিটি দিয়েছেন; সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সেই লেখাটি ব্লক করে ছেপে দিয়েছেন সঙ্গে। মজা বিষয়বস্তুর ছবি সম্বলিত আর একটি লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হলো 'রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত সংস্করণ'। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের একটি চিঠি রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশনার ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করলো। লেখক শ্রীদেবব্রত সিংহ এই

চিঠিটি প্রকাশ করে রবীন্দ্রজীবনী চর্চায় উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন। শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীকালীপদ রায় যে প্রবন্ধ দুটি পড়লেন সে দুটির গুরুত্ব অসাধারণ কিন্তু উপস্থাপনায় ত্রুটি থেকে গেল। পিয়ারসন সম্পর্কিত পুলিস রিপোর্টের যে তথ্যাদি প্রণতি মুখোপাধ্যায় শোনালেন তা শ্রোতৃবৃন্দের ক্ষুধা জাগালো কিন্তু সে ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা ছিল না। পিয়ার্সনকে গ্রেফতারের এবং ইংলণ্ডে পাঠানোর যে পরোয়ানা উল্লেখিত হলো তার ছবি প্রবন্ধের সঙ্গে দিলে ঐ প্রবন্ধটি বোধ হয় সম্মেলনের সবচেয়ে সেরা প্রবন্ধ হতো। ঠিক একই কথা বলতে পারি শ্রীকালীপদ রায়ের 'প্রেসিডেন্ট উইলসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি' সম্বন্ধে। কত তথ্য, কত অজানা বিষয়ে প্রবীণ প্রবন্ধকার আলোকপাত করলেন কিন্তু নবাবিষ্কৃত চিঠিটির কোন চিত্ররূপ না থাকায় ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধ আশানুরূপ ঔৎসুক্য জাগাতে পারলো না। পিয়ার্সন উপলক্ষে শ্রীকালীপদ রায় ও শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসুর প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তরের লড়াই উপভোগ্য হয়েছিল এবং দুজনেই পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রম রক্ষা করে academic repartee-র সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই জাতীয় অধিবেশনের ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে হাতে হাতে পাওয়া যায়, নতুন তথ্য জানা যায়, বেরিয়ে এসে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কিছু জানা গেল।

সন্ধ্যার আসরে কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ে ঘরে ফিরলেন প্রতিনিধিরা। শোনা গিয়েছিল শিল্পী সভাপতি শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অসুস্থ হয়েছেন, আসতে পারবেন না। কিন্তু গুঞ্জনের অবকাশ থাকলো না, তিনি এলেন। তাঁর ছাপানো ভাষণ যা বিতরিত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি কিছু শোনালেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দুদিকে দিয়ে তাঁর ভাষণটি সম্মেলন কর্তৃপক্ষ সুন্দর করে ছেপেছিলেন। [illegible] পল্লী উপস্থিত না থাকলেও তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধ সমস্ত পঠিত হয়েছিল। প্রথম দিনের শেষ [illegible] মন ভরে দিল সকলের। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্লাইড দিয়ে দেখালেন রবীন্দ্রনাথের ছবি। দর্শকেরা [illegible] নিছক [illegible] পাঠের নীরস কঠিন তত্ত্ব নয়, রূপের সঙ্গে রসিকের ভাষা মিলে এ এক আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশনা।

সাহিত্য অধিবেশন শুরু হলো বেলা ১টায় ৯ জানুয়ারী। সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা [illegible] শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ ছিল অনেক। সব পড়া হলো না, আলোচনারও সময় পাওয়া গেল না। কিন্তু তবু পড়া হলো তার মধ্যেই উল্লেখ করবার মত কথা খুঁজে পাওয়া গেল। ১৯২৯ সালে যখন চলচ্চিত্র বলতে বিশেষ গুরুত্বের কিছু গড়ে ওঠেনি এদেশে তখনই রবীন্দ্রনাথ এর গতিপ্রকৃতির এক আশ্চর্য দিকনির্দেশ করেছিলেন। বলেছিলেন সাহিত্যের সেবাদাসী হিসেবে নয়, নিজস্ব প্রকাশমাধ্যম সন্ধান করেই সিনেমাকে গড়ে উঠতে হবে। রবীন্দ্রনাথের একটি অমূল্য চিঠির সন্ধান দিয়ে শ্রীসুশান্ত নাগ রবীন্দ্রনাথের সিনেমা চিন্তার পর্যালোচনা করলেন। এই বিষয়ে এই কি প্রথম আলোচনা এদেশে! রীতিমত সাড়া পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে যখন শ্রীপিনাকী ভাদুড়ী পড়লেন 'ভালবাসা বর্বর।' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সবটাই যে ভাবুকতা নয়, আধ্যাত্মিকতা নয়, ঔপনিষদিক প্রেম নয় সেখানেও যে মর্ত্য-ধূলির দেহসংলগ্ন প্রেমের প্যাশন স্বীকৃত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক তা প্রমাণ করতে চাইলেন। কেউ কেউ উন্নাসিকতার ভঙ্গীতে বললেন, এ আর এমন কি কথা, কিন্তু দেখা গেল এই সম্মেলনে ঐ প্রবন্ধটিই সবচেয়ে গুঞ্জন জাগিয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব', 'রবীন্দ্রনাটকে পুরাণচেতনা' 'গল্পসল্পের শিল্পরূপ', 'রবীন্দ্রনাথের ভ্রাম' নিয়ে প্রবন্ধ পড়া হল—আক্ষেপ হলো আর একটু সময় পেলে হয়তো আলোচনা করা যেত আর একটু।

সন্ধ্যার গানের আসরে গান ছিল কিন্তু প্রধান ভূমিকায় নয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন আলোচনা হবে গানের, গান হবে সেই আলোচনার অঙ্গ। সভাপতি শ্রীসুবিনয় তাঁর ভাষণ পড়ে সভার কাজ শুরু করলেন—সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যে উপযুক্ত perspective অর্জন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাট্য এবং সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী, শিক্ষক, ছাত্র ও অনুরাগী শ্রোতার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে।' রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একটি ফলিত শিল্পকলা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, এ কথা তিনি তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে বললেন।

সঙ্গীত অধিবেশনে প্রথম আলোচনা শুরু করেন প্রবীণ সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীকিরণশশী দে। রবীন্দ্রনাথের প্রামাণিক স্বরলিপি কোনগুলি এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখাতে লাগলেন কিভাবে দিনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপি পরিবর্তিত হচ্ছে, সম্পাদিত হচ্ছে কোন কৈফিয়ৎ না দিয়েই। এই স্বরলিপি সমস্যা দিনে দিনে আরও জটিল হবে এবং রবীন্দ্রনাথের আসল সুরটি কোনটি সে তর্ক এমন পর্যায়ে একদিন গিয়ে পৌঁছবে পাছে যাতে আর কোন সমাধানই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। শ্রীসিতাংশু রায় কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুললেন; তাঁর প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন হলো সুরের কি সত্যি সত্যিই কোন সুনির্দিষ্ট ভাবরূপ আছে। ভৈরবী কি কোন বিদেশীকে প্রভাতের আমেজ দেবেই, মুনলাইট সোনাটায় কি চাঁদনী রাতকে সত্যই অনুভব করে কোন ভারতীয় শ্রোতা। রবীন্দ্রনাথের উক্তি খণ্ডন করে সিতাংশুবাবু তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তরুণ এই বক্তা প্রথম প্রবীণ বক্তার মতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শ্রীসলিলচন্দ্র ঘোষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রবীন্দ্রনাথকৃত কতকগুলি নতুন সুর সম্বন্ধে। তাঁর অভিমত ছিল এই যে শুধু পুরানো সুরের অনুসৃতি নয় বিচিত্র ধরনের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নতুন সুর তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সে সম্পর্কে গীতরসিকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমতী নীলিমা সেনের প্রবন্ধটি পড়েছিলেন শ্রীতন্ময় সেন। সঙ্গে গান করেছিলেন শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে 'রবীন্দ্রসংগীতে সুরান্তর' প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই গানে রবীন্দ্রনাথ একাধিক সুর বসিয়ে একই কথায় একাধিক 'মুড' সঞ্চার করতে পেরেছেন। চারটি গান দুজন শিল্পী দুই সুরে গাইলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ শ্রোতাদের মধ্যে সে কি বিহ্বল আনন্দের প্রবাহ। 'লক্ষ্মী যখন আসবে', 'বসন্তে কি শুধু কেবল', 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' 'হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে।'

শ্রোতাদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত সভাপতি সুবিনয় রায় গাইলেন 'ডাকে বার বার'। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গাইলেন 'প্রথম আদি তব শক্তি।'

এ জাতীয় সম্মেলনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, বাঙালীর ঢিলেঢালা আচরণের অপবাদ ব্যর্থ করে, যথাসময়ে আরম্ভ করা ও শেষ করার দ্বারা উদ্যোক্তারা নতুন আদর্শ রাখলেন। দুদিন ধরে কোন কাজেই কোন অসংলগ্নতা ছিল না, উদ্যমের অভাব ছিল না; দলে দলে ছেলেমেয়ে নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন দেখেছি, কিন্ত একটিও অকারণ শব্দ সম্মেলনে ব্যাঘাত ঘটায় নি, অনাবশ্যক চলাচলে হলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। এমন নিঃশব্দে এত বড় একটি অনুষ্ঠান চালানো টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এ জাতীয় কর্মের নিঃসংশয় যোগ্যতা প্রমাণ করে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ব্রজগোপাল আর ননীবালা কথা বলছেন। সেই ফাঁকে নিঃশব্দে উঠে গেল অজিত। নিঃশব্দ পায়ে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এল। ভিতরে কলের জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল অজিত। সাড়া নেই। আর একটু জোরে টোকা দিতেই আটকানো কপাটের পাল্লা নরমভাবে একটু খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। অজিত কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে ঢুকে গেল ভিতরে।

শীলা বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে আছে। বাড়ানো হাতে দেয়ালে ভর। হিক্কার মতো শব্দ করছে। গলায় আঙুল দিয়ে এক ঝলক বমি করল। পিছন থেকে অজিত পিঠে হাত রাখে। অন্য হাতে মাথাটা ধরে শীলার। বমির সময়ে কেউ মাথা চেপে ধরে রাখলে কষ্ট কম হয়।

কিন্তু বমি আর এল না। শীলা জলের ছাটে চোখ মুখ ভিজিয়ে নিতে থাকে। অজিত মৃদু গলায় বলে—শ্বশুরমশাই বসে আছেন। তাড়াতাড়ি করো।

জলে ভেজা মুখটা ফেরাল শীলা। তীব্র, সজল, বড় বড় চোখ। এক পলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—আমি যাব না।

অজিত বুঝল, রেগেছে খুব। বলে—বিশ্রী দেখাচ্ছে কিন্তু। চলো। ও'রা অপেক্ষা করছেন।

একটু ক্লান্তির স্বরে শীলা বলে—তুমি যাও।

অজিত বলে—যাচ্ছি। দেরি কোরো না, প্লীজ।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে শীলা নাটুকে ভঙ্গীতে হাতটা বাড়াল। বলল—ওগো!

অনেকটা আর্তস্বরের মতো ডাক। অজিত একটা শ্বাস ছাড়ল মাত্র। এটা নেকামো। নইলে ও এমন কিছু অসুস্থ নয় যে, হেঁটে ঘরে যেতে পারবে না। এ অবস্থায় বমি কে না করে! গত চার মাস ধরে শীলাও করছে।

অজিত একটু কুণ্ঠিতভাবে বলে—কী?

—ধরো। পারছি না। শীলা হাত বাড়িয়ে চেয়ে আছে। অভিমান ঘনিয়ে আসছে চোখে।

অজিত বিরক্তি চেপে বলে—বাইরের ঘরে শ্বশুরমশাই। দেখতে পাবেন।

শীলা সেটা শুনল না। জীবনের শেষতম প্রশ্নের মতো গভীর গলায় বলে—ধরবে না?

আর একটা অসহায় শ্বাস ছেড়ে অজিত হাত বাড়িয়ে শীলার কোমর ধরল। শীলার ভেজা হাত বেষ্টন করে তার কাঁধ, খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। এইভাবেই তারা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। পুরো নাটক। শীলা হঠাৎ মুখটা তুলে কাঁধে মুখ ঘষে কান্নায় ধরা গলায় বলে—তুমি কি নিষ্ঠুর!

সব স্ত্রীই স্বামীকে এই কথা বলে। কারণে, অকারণে। তবু শীলার এই কথাটা যত আলগাভাবে বলা ততটা মিথ্যে নয়। অজিত তো জানে, সে কত নিস্পৃহ! কত উদাস! এ বোধ হয় অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি! ডিমিনিশিং ইউটিলিটি? না কি, তারা কেবলমাত্র যৌন অংশীদার? নাকি পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য একটা প্রাইভেট লিমিটেড? বিবাহ শব্দটির মধ্যে একটি বহ্‌ ধাতু আছে। তার মানে কি বহন করা? বহন করাই যদি হয়, তবে সে বড় কষ্টের। বহন কেন করবে? একদিন অফিস যাওয়ার আগে খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অজিত। হঠাৎ মাথার মধ্যে চিড়বিড়িয়ে উঠল একটা রগ। বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস এভাবেই হঠাৎ হয়, জানা ছিল। সেই স্মৃতিই বোধ হয় আচমকা এসেছিল মাথায়। দু হাতে মাথা চেপে ধরে 'এ কী। এ কী।' বলে বসে পড়েছিল অজিত। শীলার সায়া-ব্লাউজ পরা হয়ে গেছে, শাড়িটা ফেরতা দিয়েছিল মাত্র, অজিতের কাণ্ড দেখে শাড়িটা দু হাতে থামছে খুলে পক্ষিণীর মতো ঝাপটে ধরল তাকে, দু হাতে মাথা বুকে নিয়ে 'ঠাকুর! ঠাকুর! এ কী সর্বনাশ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেও জানে এইভাবে আজকাল আচমকা থ্রম্বসিস হয়, মানুষ চলে যায় বিনা নোটিশে। কিছুক্ষণ বসে থেকে সামলে নিল অজিত। কিছু না। তবু শীলা অফিস যেতে দিল না, নিজেও গেল না স্কুলে। সারা দিন আগলে বসে পাহারা দিল অজিতকে। কয়েক দিন চোখে চোখে রাখল। বিবর্ণতার মধ্যে সে ছিল উজ্জ্বল কয়েকটা দিন। প্রেমে পূর্ণ, নিস্তরতায় গদগদ। তবু অজিত ভাবে, কেন ঐ পক্ষিণীর মতো ছুটে আসা, কেন আগলে ধরা! সে কি ভালবাসা! নাকি নিরাপত্তার জন্য? সে কি

নান্দনিক! না কি অর্থনৈতিক। তবে কি দুটোই? ভেবে পায় না অজিত। শুধু বোঝে, মৃত্যুই মানুষকে কখনো কখনো মূল্যবান করে তোলে, নিতান্ত অপদার্থও হয়ে ওঠে নয়নের-মণি। মৃত্যু নামে এক ভাবাবেগহীন, অবশ্যম্ভাবী, শীতল ঘটনা মানুষের সব সময়ে মনে থাকে না, যখন মনে পড়ে, যখন মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যায় কেউ, তখনই জাতিস্মরের মতো তার ভালবাসার কথা মনে আসে, বিরহ মনে পড়ে। জীবন বুঝি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক নিরন্তর লড়াই। নানাভাবে ভেবেছে অজিত। সিগারেট পুড়েছে কত! কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি আজও।

বাইরের ঘরের পর্দাটা উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। স্পষ্ট ব্রজগোপালকে দেখা যাচ্ছে। উনিও চেয়ে আছেন হয়তো। দেখছেন। তবু শীলাকে ঐ রকম ঘনিষ্ঠভাবে ধরে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে আসে অজিত। বহন করা যাকে বলে।

শীলা বিছানায় বসে। সময়োচিত কয়েকটা ব্যথা বেদনার শব্দ করে। মেয়েরা বোঝে না পুরুষ কখন তাদের সম্পর্কে বিরক্তি বোধ করে। যেমন এখন। অজিত জানে শীলার কিছু হয়নি। তবু বড় বড় চোখে চেয়ে শ্বাস টানছে শীলা, মুখে যথোচিত বেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। সুভদ্রর প্রসঙ্গটার ওপর ঐভাবেই সে কি জয়ী হতে চায়? বড় বোকা। ও জানেও না সুভদ্রর প্রতি কোনো হিংসা বিন্দুমাত্র বোধ করে না অজিত। বরং মাঝে মাঝে ভাবে, ঐ রকম করে যদি সময়টা ভালই কাটে শীলার, কাটুক। তবু কথাটা বেরিয়ে গেছে অজিতের মুখ থেকে। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত।

—এখন কেমন? অজিত খুব আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে গলায়।

শীলা বোধ হয় বুঝতে পারে। যতই চেষ্টা করুক অজিত, আন্তরিকতাটা বোধ হয় ফোটে না। অজিতের ভাঙা, মেদহীন মুখে কয়েকটা অবশ্যম্ভাবী রাগ, বিরক্তি, হতাশার রেখা আছে, যা ফুটে ওঠে। সে লুকোতে পারে না। শীলা বোধ হয় সেটা টের পায়। অভিমানে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ভাল। তুমি যাও।

অজিত এসে আবার বাইরের ঘরে মোড়ায় বসে। একটু অন্যমনস্কভাবে শ্বশুরের দিকে তাকায়। একটা সিগারেট খেতে বড় ইচ্ছে করছে। পায়জামার পকেটে একবার বে-খেয়ালে সিগারেটের প্যাকেটটার জন্য হাত ভরেছিল। মনে পড়ল, শ্বশুর বসে আছে সামনে।

অবশ্য ব্রজগোপাল অজিতকে লক্ষ্য করছিলেন না। ওদিকের চেয়ারে রণেন এতক্ষণ নিঃশব্দে কথা বলছিল। ঠোঁট নড়ছে, হাতের আঙুল নাড়ছে। একটা মূকে অভিনয় যেন। ব্রজগোপাল অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েছিলেন। রণেন খেয়াল করে নি। হঠাৎ ব্রজগোপালের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল। খুব বিনীতভাবে বসে রইল, মাথা নামিয়ে দু হাত কোলের ওপর জড়ো করে।

পুরো ব্যাপারটা নজরে এল অজিতের। ও কি করছিল রণেন? অদ্ভুত তো! মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে অজিত দেখেছে বটে, একটু খ্যাপাটে ধরনের এক-আধজন লোক এ রকম একা একা কথা বলতে বলতে যায়। হয়তো পাগল নয়, কিন্তু ওরকমই। রণেনের সে রকম কিছু হয় নাকি আজকাল!

ব্রজগোপাল থমথমে মুখটা ফিরিয়ে অজিতকে বললেন—শীলুটা! কী করছে? শরীর খারাপ নাকি?

একটু চমকে অজিত বলে—না। এই অসুস্থ।

ব্রজগোপাল একটু গলা পরিষ্কার করলেন। বললেন—তোমার এ বাড়ি ক' দিনের?

বিনীতভাবে অজিত বলে—কয়েক বছর হয়ে গেল। আপনি তো দেখেন নি?

—না। বলে একটু চুপ করে থাকেন ব্রজগোপাল, বলেন—আসতে ইচ্ছে হলেও কি আসা সোজা! কলকাতার রাস্তাঘাট আজকাল একটুও চিনতে পারি না। নতুন নতুন বাড়ি উঠে সব অচেনা হয়ে যাচ্ছে। এত ভিড়ে ঠিক দিশেও পাই না।

কলকাতার ওপর ব্রজগোপালের একটা জাতক্রোধ আছে, অজিত তা জানে। তাই একটু উদাস গলায় বলল—পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কলকাতায় তো বাড়বেই।

ব্রজগোপাল উত্তরটা আশা করেন নি। একবার তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন—সবাই তাই বলে। জনসংখ্যা। আজকাল জন-টাকে কেউ পাত্তা দেয় না, সংখ্যাটা নিয়ে মাথা ঘামায়। মানুষকে কেবল সমষ্টিগত করে দেখা ভাল না।

অজিত এককালে বিস্তর পলিটিক্স করেছে। পথ-সভা, বিতর্ক, দাবি আদায়ের বৈঠক। তর্কের গন্ধ পেলে আজও চনমনে হয়ে ওঠে। এই স্থবির বিশ্বাসের মানুষটাকে যদিও কিছু বোঝানো যাবে না, তবু একটু ধাক্কা দেওয়ার জন্য সে বলে—সমষ্টিই তো আমাদের কাছে সব। সমষ্টিই শক্তির উৎস। তাকে নিয়ে তাই মাথা ঘামানোর দরকার। প্রতি জনকে নিয়ে মাথা ঘামানো তো সম্ভব নয়।

ব্রজগোপাল বাবাদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর অশেষ করুণ বললেন—কোনো মানুষই নিজেকে ভিড়ের একজন বলে ভাবতে ভালবাসে না বাপু। এ হচ্ছে মিথ্যা কথা। বুকের মধ্যে সব মানুষই টের পায়, সে একজন আলাদা মানুষ, সবার মতো নয়। তিনশ' কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজনা বেনম্বরী মানুষ, গোবিন্দপুরের ছেলে চাষাটাও এমন ভাবতে ভালবাসে না। বাসে, বলো?

—না বাসলেও কথাটা তো সত্যি।

—সত্যি কি না কে জানে। তবে আজকাল যাকে রাষ্ট্র বল, সেই রাষ্ট্র তোমাকে আমাকে মানুষের সমুদ্রে সত্তাহীন এক ফোঁটা জল যেমন, তেমনি মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে মানুষ পিণ্ডাকার একটা সমষ্টিসত্তা। কোথায় কোন মানুষ মরল, কোন মানুষ বেঁচে রইল, কে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকল, কে পাগল হয়ে গেল তাতে তার কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্র তা টেরও পায় না, পৃথিবীর ভারও তাতে কমেও না, বাড়েও না। মানুষ যখন এটা টের পেতে শুরু করে, তখনই তার মধ্যে হতাশা, ক্লান্তি আর নানা রকম বিকৃতি আসতে থাকে। দু'চারজন যারা বড়টড় হয়, তাদের কথা ছেড়ে দাও। যারা গোলা মানুষ, অল্পবুদ্ধি, বা যারা তেমন বড়টড় হতে পারেনি, তারা নিজেদের নিয়ে পড়ে যায় বড় মুশকিলে। এই বিপুল রাষ্ট্রে তাদের স্থান কোথায়, কাজ কি, কেন তাকে পৃথিবীর দরকার, এ সব বুঝতে না পেরে সে ক্রমে নিজেকে ফালতু লোক বলে ভাবতে শুরু করে। কটা লোক ভাবতে সাহস পায় যে, তাকে ছাড়া পৃথিবী চলবে না? শহরে, গাঁয়ে, গঞ্জে, জনে জনে জিজ্ঞেস করে দেখো তো বাপু, এ রাষ্ট্রের তারা কে, পৃথিবীর তারা কে, এটা টের পায় কিনা?

ব্রজগোপাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান বুঝি। চোখটায় একটা ঘোর লাগা ভাব, মাথা নেড়ে বলেন—বেঁচে থাকার একটা জৈব তাগিদ আছে। মরতে কেউ চায় না। কেবল সেই তাগিদে যে যার মতো পৃথিবীর সঙ্গে সেঁটে আছে প্রাণপণে। নইলে সবাই জানে সে মরলে বা পড়লে পৃথিবীর কাঁচকলা। এই কথা সার বুঝে গেছে বলেই আজ আর কেউ রাষ্ট্র বলো, দুনিয়া বলো, জনগণ বলো, কারো কাছে কোনো দায় আছে বলে মনে করে না। বুঝে গেছে, সার হচ্ছে নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকা। সে কেন, কোন দুঃখে রাষ্ট্র-ফাস্ট্র, দুনিয়া-টুনিয়া, ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবে! সে তো জনগণ, জনসংখ্যা, ভিড়ের একজন।

অজিত শ্বশুরের দিকে চেয়ে থাকে। একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বলে—কোনো মানুষই তো বিচ্ছিন্ন নয়। আলাদা ব্যক্তি হয়ে যেমন তেমনি আবার সে সমষ্টিরও একজন। কোনোটাই মিথ্যে নয়।

—মিথ্যে হওয়া উচিতও নয়। ঠিকই তো। মানুষ যেমন আলাদা আবার তেমনি গোষ্ঠীবদ্ধও। কেউ না স্বীকার করান কিন্তু এখনকার রীতিই হচ্ছে আগে সমষ্টিকে দেখা, ব্যক্তির কথা তার পরে। অশেষ সংখ্যা,

তারপর জন। কিন্তু আবার তোমার বিজ্ঞানই বলছে, পৃথিবীর কোনো দুটো জিনিসই হুবহু এক রকমের নয়। পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণা, প্রতি গাছ, প্রতি ফল, প্রতিটিই আলাদা রকমের। সে হিসেবে পৃথিবীতে ঠিক এক রকমের জিনিস একাধিক নেই। তাই কারো সঙ্গে কাউকে যোগ করে এক-এ এক-এ দুই করাই যায় না। কারণ প্রতিটি একই আলাদা এক। তার কোনো দ্বিতীয় নেই। এটা আগে সবাই তোমারা বোঝো, তারপর সমষ্টির কথা ভেবো। জনগণ বা জনসংখ্যা এ কথাগুলোও অস্পষ্ট। প্রতিটি মানুষকে আগে বুঝতে দাও যে সে সমাজ সংসারের অপরিহার্য একজন। তাকে না হলে চলে না। নইলে মানুষ কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব হয়ে যাবে, মানুষের ভিড় দেখে মনুষেরই ক্লান্তি আসবে। ভবিষ্যৎ বচনেরও দরকার নেই, এসে গেছে।

এই সব তত্ত্ব কথা শুনেই বোধ হয় ননীবালা উঠে পড়লেন। বললেন—যাই, দেখি গে।

ব্রজগোপাল নড়ে চড়ে বললেন—আমিও উঠে পড়ি।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—উঠবে কি! বোসো। আসছি।

ননীবালা চলে গেলেন। রান্নাঘরের দিকেই বোধ হয়। যেদিক থেকে তাঁর গলা পাওয়া গেল, বাচ্চা ঝিটাকে বকছেন—তুই খাবার বেড়ে নিয়ে যাচ্ছিস কি রে! সবাইকে কি আর ঝি চাকরে খাবার দিতে আছে! এ কি যে সে লোক। রাখ, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

অজিত চুরি করে একটু হাসল। শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া অনেক হাজার টাকার চেক আঁচলে বেঁধে শাশুড়ি ঠাকরুণের ভালবাসাটাসা সম্মান বোধ সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিয়ের সম্পর্কটা কি তবে অর্থনৈতিক! ভালবাসার জাল কি টাকা আর নিরাপত্তার ভিতরে বীজাকারে নিহিত রয়েছে! সংসার থেকে প্রায় বহিষ্কৃত ব্রজগোপালের তো এত সম্মান প্রাপ্য নয়! সংসারের কারো ব্রজগোপালের প্রতি কোনো দরদ আছে বলে অজিত জানে না। সবাই বলে, এ লোক হচ্ছে একগুঁয়ে জেদী মানুষ, কারো সঙ্গে বনে না। কথাটা ঠিক। তবু অজিত মনে মনে এ-লোকটাকে হিংসে করে। এ লোককে দিনে দশবার বউয়ের অকারণ রাগ অভিমান ভাঙাতে হয় না, এ লোক বিবাহের বহন করার কষ্টকর কাজ থেকে কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে। এ সব তো বটেই। তার ওপর অজিত দেখেছে, এ লোকটার ভিতরে এখনো ভালবাসা মরে যায়নি। নইলে কেউ বয়স্ক জামাইয়ের হাতে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিতে পারে। অজিত হলে পারত না।

একটা চমৎকার মিঠে কমলা রঙের শাড়ি সদ্য পরে ঘর আলো করে শীলা ঘরে এল। চুলটুল আঁচড়ে এসেছে। চোখে এখনো কান্নার ফোলা ফোলা ভাব। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দগদগে। মুখে একটু পাউডারের ছোঁয়া। এ সবই মুখের ভাব, কান্নার চিহ্ন ঢাকার ছদ্মবেশ। কোনো কথা না বলে প্রণাম করল বাপকে। ব্রজগোপাল মাথায় হাত রাখলেন। একটু বেশীক্ষণ রাখলেন যেন। চোখটা বুজলেন। ইষ্ট স্মরণ করলেন বোধ হয়।

শীলা বাপের পাশ ঘেঁষে বসল। আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে চাপা দিল একটু। বলল—কেমন আছো বাবা?

ব্রজগোপাল উদাস স্বরে বললেন—আছি। আমাদের আর বিশেষ কি। তোরা কেমন?

শীলা মাথা নেড়ে বলে—ভাল।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন—সংসারের কাজটাজ সব করিস নিজের হাতে?

শীলা হাসল একটু। বিবাহিতা বয়স্কা মেয়ের উপযুক্ত প্রশ্ন নয়। তবু বলল—করি।

—করিস! বলে ব্রজগোপাল হাসেন—কখন করিস? তুই তো চাকরি করছিস, শুনেছি।

—দুটোই করি।

—চাকরি করিস কেন? অজিতের আয়ে তোদের চলে না? ওর তো রোজগার ভালই।

—আজকাল সব মেয়েই করে।

—তাই করিস? নিজের ইচ্ছের নয়? প্রয়োজনও নেই?

শীলা একটু অপ্রস্তুত হয়। অনেক দিন পর বাপের সঙ্গে দেখা, তাই বোধ হয় মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারে না। এক পলক বাবাকে দেখে নিয়ে বলে—টাকার দরকার তো আছেই। সময় কাটে না। লেখাপড়া শিখেছি, সেটাও তো কাজে লাগানো উচিত।

—ও। বলে ব্রজগোপাল বুড়োটে মুখে দুষ্টুমীর হাসি হাসেন। যেন তাঁর এ-মেয়েটা নাবালিকা এবং তিনি তার সঙ্গে খুনসুটি করছেন। বলেন—মেয়েরা কেন এত টাকার ফিকির খোঁজে রে? পুরুষ যদি খাওয়াতে পরাতে না পারে তখন না হয় কিছু করলি। এমনি খামোখা চাকরি করবি কেন? এক কাঁড়ি টাকার মধ্যে কি সুখ? বেশী বহির্মুখী হলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাটাছেলের ভাব এসে যায়। সংসারেও বিরক্তি আসে। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা টানে। ও ভাল নয়।

শীলা মাথা নিচু করে চুপ করে আছে। তর্ক করে লাভ কি!

ব্রজগোপাল তেমনি দুষ্টুমীর হাসি হাসেন। আচমকা বলেন—ট্রামে বাসে পুরুষের বগলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে রোজ যাতায়াত। সেও বিশ্রী। পুরুষেরাও তো ভাল নয়। কত লোকের মনে কত বিকৃতি আছে। তার চেয়ে বরং হামলে সংসার করবি। নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে

দিদি। স্বামীর সেবা নিজের হাতে করলে ভালবাসা আসে। এ তো আর অংশীদারী কারবার নয় যে, যে-যার ভাগের টাকা ফেলে সংসার চালাবি।

ব্রজগোপাল ডান হাতে মেয়ের দীর্ঘ এলো চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—বাচ্চা কাচ্চা যখন হবে তখন দেখবি। মা-বাপ ছাড়া বাড়িতে কেমন অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ননীবালা খাবারের প্লেট আর চা হাতে এলেন।

ব্রজগোপাল একটু তাকালেন মাত্র সেদিকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—ও নিয়ে যাও।

—মেয়ের বাড়িতে এসেছো, একটু মুখে দিতে হয়।

—যখন তখন খাই না আজকাল। অভ্যেসও নেই। ওদের সব খাও।

বলে ছেলের দিকে তাকালেন। অজিত লক্ষ করে, রণেনের ঠোঁট আবার নড়ছে। আঙুলে বাতাসে একটা শূন্য আঁকল রণেন। কাকে যেন উদ্দেশ্য করে নিঃশব্দে কী বলে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

চিত্র প্রদর্শনী

ব্ল্যাক লাইট! শিল্পী প্রকাশ কর্মকার বিড়লা আকাদমিতে আয়োজিত তাঁর একক প্রদর্শনীভুক্ত ছবিগুলির ঐ নামকরণ করেন। শত শত শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর সবপ্রই অশিক্ষা, অভাব-অভিযোগ-দারিদ্র্য, হতাশা, হিংসা, বিক্ষোভ ও সংগ্রামে ছেয়ে গেছে—বর্তমান যুগের ত কথাই নেই। অজ্ঞতা, ব্যর্থতার সংগ্রামের ঘনীভূত অন্ধকারে পৃথিবী যেন নিমজ্জিত হয়ে আছে—যেটুকু আলোকের আভাস মেলে তাও ব্ল্যাক, অর্থাৎ অন্ধকারেরই নামান্তর। এক কথায়, পৃথিবীর সর্বত্রই ব্ল্যাক লাইট—অন্তত শিল্পীর মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু এই। বর্তমান যুগের অনিশ্চয়তা ও বিক্ষুব্ধ পরিবেশে, অর্থাৎ শিল্পীর 'ব্ল্যাক লাইট'-এর মধ্যেও যে অনেকে আজও আলোর সন্ধান পান, সম্ভবত শিল্পী সে কথা বিশ্বাস করেন না। তাই-ই বা বলি কি করে? তিনিও স্বীকার করেছেন যে, এই দুঃসহ, যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের মধ্য থেকেই আবার নতুন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। শিল্পী হয়ত নিরাশাবাদী—তাঁর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু সকলেই যে তাঁর বক্তব্য মেনে নেবেন তাও নয়। তবে শিল্পকলা-ক্ষেত্রে শিল্পীর চিন্তাধারা মতামত তথা বক্তব্যের বিশেষ কোনও মূল্য নেই—শিল্পকলার তাৎপর্য নির্ভর করে শিল্পী কতটুকু ও কিভাবে তাঁর বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে, প্রকাশ কর্মকার অনেকাংশে সাফল্যলাভ করেছেন। শিল্পী প্রধানত বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন, কমপোজিশন হিসাবে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন ও সুরচিত। কোনও ছবির পৃথক পরিচয়লিপি না দিয়ে শিল্পী ভালই করেছেন, কারণ প্রদর্শনীর প্রায় প্রত্যেক ছবিই সমগ্র বিষয়বস্তুরই এক-একটি অংশ। অধিকাংশ ছবিই গভীর রঙে আঁকা, কালো রঙের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও অন্য রঙ ব্যবহারও চোখে পড়ে। অসহায়, যন্ত্রণাকাতর বিক্ষুব্ধ নরনারীর মুখ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্ন, বিকৃত আকারের প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন সমকালীন জনজীবনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি ছবিতে বক্তব্য ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ব্যথাতুর বিকৃত মুখ, সান্ত্বনা ও আশ্রয়লাভের আশায় প্রসারিত দুটি হাত ও প্রতীকপ্রধান কুটিল সাপ অবলম্বনে আঁকা ৩ নং ছবি উল্লেখ্য। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সমকালীন যুগের এক শ্রেণীর বঞ্চিত নিপীড়িত জনের ব্যর্থ যৌবন তথা অতৃপ্ত যৌন পিপাসারও আভাস দিয়েছেন (২২ নং)। আকাশের বুকে অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা সাদা মোমবাতির কালো শিখারও তাৎপর্য আছে (০)। সমগ্র রচনা-ক্ষেত্রটির গভীর কালো রঙের পরিপ্রেক্ষিতে এক কোণে প্রতীকমূলক ছোট্ট আঁকার একে অ্যাপ্টি আর্ট জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন আরও স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, যদিও ঠিক ছবি হিসাবে তিনি এগুলি উপস্থাপিত করেননি। প্রকাশ কর্মকার কৃতী বিমূর্ত শিল্পী, উল্লেখ্য শিল্পনিদর্শন হিসাবে সুসমন্বিত, পরিমার্জিত ও সুরচিত কয়েকটি ছবি অনেকের ভাল লাগে।

*

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগ কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে-বসে-ছবি-আঁকা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আনুমানিক ৬০০ ছেলে-মেয়ে এই প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীতে যোগদান করে। কি বিপুল উৎসাহে যে ছেলে-মেয়েরা তথ্যকেন্দ্রের পুরানো ও নতুন প্রেক্ষাগৃহে বসে একাগ্রচিত্তে ছবি আঁকে, তা বিশেষত তাদের মাতাপিতা ও অভিভাবকবর্গ দেখে থাকবেন। এবারকার প্রতিযোগিতা তথা প্রদর্শনীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে গত বছরের তুলনায় এবারের ছবিগুলির মান আরও উন্নত। শুধু তা-ই নয়, এবারে অপেক্ষাকৃত ছোটদের বিভাগের ছেলেমেয়েরা জল রঙ ও প্যাস্টেল ব্যবহারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সকলেই শিশুসুলভ কল্পনা অনুযায়ী নানা আজগুবি মূর্তি ও দৃশ্য এমন কি দু-একজন কার্টুন জাতীয় ছবিও আঁকে। বড়দের বিভাগে (বয়স ৯—২১) অনেকেই রঙ নির্বাচন ও ব্যবহাররীতিতে রসবোধের পরিচয় দেয়। ছোটদের বিভাগে প্রথমেই, কমপোজিশন রীতি ও রঙ ব্যবহারের জন্য সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (বঃ ৬) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর যাদের ছবি চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে পম্পা পাল (বঃ ৮), সিদ্ধার্থ বসু (বঃ ৬), কবিউল গণি (বঃ ৭), দীপক সেন (বঃ ৫), অনুসূয়া রায় (বঃ ৮), লতা দে (বঃ ৫) ও কুমার-জ্যোতি রায়চৌধুরীর (বঃ ৬) নাম করা যায়। নয় থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের কাজে নিষ্ঠা ও নিয়মিত শিল্পকলা চর্চার আভাস মেলে। অন্তত দু'চারজনের রচনায় বয়সের তুলনায়, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কনরীতির সন্ধান মেলে। প্রধানত পরিচিত নানা দৈনন্দিন বা উৎসবের দৃশ্যই তারা এঁকেছে, কিন্তু আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী যেন সেগুলিতে নতুনতর রূপদান করেছে—বিশেষ করে সুসমন্বিত কমপোজিশনের দিক থেকে কয়েকজন কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই বিভাগে রঙ ব্যবহার ও প্রকাশভঙ্গীমার জন্য অনুরাধা চ্যাটার্জী (বঃ ১১½) প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুদেষ্ণা সেন (বঃ ১২), শিখা প্রামানিক (বঃ ১১½), সোমনাথ মুখার্জী (বঃ ৯), সর্বারি গণি (বঃ

ব্ল্যাক লাইট —প্রকাশ কর্মকার

১০), শরদেন্দরী রায়চৌধুরী (বয় ১), বন্দ্যোপাধ্যা বর্মন (বয় ১০) ও অনুপরতন চৌধুরীর (বয় ১০) আঁকা ছবিগুলি দেখে অনেকে খুশী হন। সুখের বিষয়, তথ্য ও প্রচার বিভাগ পরিচালিত এই বার্ষিক প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীটি ক্রমশই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, এবং ছোট ছোট গুণী শিল্পীদের উপযুক্ত পুরস্কার দান করে কর্তৃপক্ষ তাদের উৎসাহবর্ধন করছেন। তবে, কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে যদি কোনও উপযুক্ত স্থানে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তাহলে যে আরও অনেক ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতি বছরই সেখানে দু-চারটি উল্লেখ্য শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। এবারকার বার্ষিক প্রদর্শনীর বিষয়েও সেই কথা বলা চলে, তবে কমার্সিয়াল বিভাগের ছাত্রবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ড্রয়িং ও পেন্টিং বিভাগে বিশেষ উল্লেখ্য ছবি চোখে পড়েনি। স্টাডির সংখ্যা অল্প। রীতির দিক থেকে অধিকাংশ ছাত্রই বিমূর্ত সমবিমূর্ত ও সাররিয়ালিস্টিক ছবি এঁকেছেন। ভারতীয় বিভাগে দু-একটি প্রশংসনীয় নমুনা দেখা যায়। জলরঙ, স্কেচ ও গ্রাফিক বিভাগেও দু-একজন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাস্কর্য, বিশেষত প্রচার চিত্রক্ষেত্রে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশই পরীক্ষামূলক এবং তা স্বাভাবিক। ইঙ্গিতপ্রধান মূর্তি ও বলিষ্ঠ ড্রয়িংয়ের মধ্য দিয়ে একান্ত শর্মা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন (মুডস অ্যান্ড মুভমেন্টস)। বেড়াল অবলম্বনে আঁকা মহী পালের কমপোজিশন অনেকের চোখে পড়ে। আলো-ছায়া বিন্যাসে সুবীর সেন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন (স্টেয়ারস)। এই প্রসঙ্গে অলকা চিন্তামণির দি হোলি ক্যালেডিস্কোপের নাম করা যায়। অন্যান্য ছবির মধ্যে বাণী দাশগুপ্তের লাল রঙের স্তরভেদপ্রধান বসন্ত, অশোক ভৌমিকের নীল রঙ প্রধান সাররিয়ালিস্টিক কমপোজিশন, ও তপন দাস ও নিতীশ রয়ের দুটি নিসর্গ দৃশ্য উল্লেখ্য। ভারতীয় রীতিতে আঁকা নিদর্শনের মধ্যে দু-একটি প্রাচীন চিত্রের কপি ও মিনিয়েচার জাতীয় ছবি দেখা যায়। লোকচিত্র জাতীয় চিত্রে সফলতার জন্য ধর্ম পালের লক্ষ্মী, এ সিমবলিক রিপ্রেজেন্টেসন দেখে অনেকে খুশী হন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আঁকা শিব চতুর্দশীও উল্লেখ্য। অপরাপর ছবির মধ্যে মনোজ মিত্রর রথযাত্রা মেলা, অমিতাভ গাঙ্গুলীর কালী টেম্পল ও অনুপ রায়ের বেগারস মন্দ লাগে নি। স্কেচ, জলরঙ ও গ্রাফিক বিভাগে অনেক নিদর্শন দেখা গেলেও মাত্র কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন সুধাংশু ব্যানার্জীর আঁকা নিসর্গ দৃশ্য, বিশেষ করে জল ও গাছের রঙ ব্যবহার পদ্ধতি প্রশংসা দাবি করে। এই সঙ্গে মানব দেবের ১৯ নং ছবিরও নাম করা চলে। গ্রাফিক ক্ষেত্রে অভিজিৎ গুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন (কলারড উডকাট)। এই মাধ্যমে স্তরভেদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে প্রদ্যুৎ বর্মণও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (৩০ নং)। সমীর মণ্ডলের লিনোকাট নিদর্শনও অনেকের চোখে পড়ে। যাঁরা ভাল স্কেচ করেছেন তাঁদের মধ্যে অরূপ রায়, দেবাশীষ দেব ও দীপক ঘোষের নাম করা যায়।

কমার্সিয়াল বিভাগটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খোলা বিজ্ঞাপনের প্রচারপত্র থেকে শুরু করে শো-কার্ড, ক্যালেন্ডার রেকর্ড-কভার মোবাইল ও প্রচারপত্রের বহু নিদর্শন দেখা যায়। পরিকল্পনা ও আবেদনের দিক থেকে সুপেন্দ্রনারায়ণ নাথের ডিনার, চাইনিজ স্টাইল ও প্রবীর চ্যাটার্জীর লিপিকা ক্যাম্পেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে —বিশেষ করে রঙের সামঞ্জস্য ব্যবহারের জন্য। অসিত পোদ্দারের মোবাইল রেকর্ড কভার স্ট্যান্ড দেখে অনেকে আকৃষ্ট হন। প্রাচীরপত্রে মানস মোদক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন : সমগ্র রচনাক্ষেত্রটি গভীর কালো রঙে ঢাকা, নীচে, এক কোণে একটি ছোট্ট হৃষ্টপুষ্ট শিশুর নিষ্পাপ মুখ—দুটি চোখে ফুটে উঠেছে—আতঙ্কের বিভীষিকা যেন বলছে—আর যেন যুদ্ধ না হয়। পরিকল্পনার দিক থেকে মৃণাল সেনের পোস্টারও উল্লেখ্য। পদাবলী কীর্তন অবলম্বনে রচিত সমীর মণ্ডলের রেকর্ড কভারেরও এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। ভাস্কর্য বিভাগে সকলেই কাঠ, সিমেন্ট ও প্লাস্টার মাধ্যমে প্রথাগত রীতিতে কাজ করেছেন, যদিও দু-এক জনের নিদর্শনে সমকালীন পদ্ধতির সন্ধান মেলে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই গোপাল মণ্ডলের বোন ফর্ম ২ (কাঠ) চোখে পড়ে, বিশেষ করে নেগেটিভ ফর্মের প্রাধান্যের জন্য। তাপস সরকারের মিশ্র মাধ্যমে গঠিত সপ্রেশনও অনেকের ভাল লাগে। প্রাচীরচিত্র বিভাগে ধাতুর পাত ও বিশেষ করে ছোট ছোট রঙীন টালি মাধ্যমে রচিত নিদর্শনগুলি সকলের চোখে পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ তলাপাত্র ও নির্মল বর্মণের নাম উল্লেখ্য—দুজনেই মোজাইক মাধ্যমে রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি করেছেন। দেবব্রত ঘোষের পেটানো পাতের প্রাচীরচিত্রে নতুনত্ব আছে।

কারুকলা বিভাগে কাঠ, চামড়া ও বাটিকের নানা ছোট বড় সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। কাঠের ছোট ছোট নানা খেলনা, কারুকার্যখচিত ফুলদানী ও ট্রে দেখে অনেকে খুশী হন—বিশেষত নারকেলের খোল ও কাঠ অবলম্বনে তৈরী ধনঞ্জয় অধিকারীর পেঁচা দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। গৌতম বোসের কারুকার্যখচিত ট্রেও উল্লেখ্য। রঙীন চামড়ার খোদাই করা নিদর্শনাদির মধ্যে নানা জাতীয় ছোট বড় পার্স, লেডিজ ব্যাগ, আয়না-চিরুনীর খাপ দেখা যায়। বাটিকের নানা জাতীয় নিদর্শনের মধ্যে ছবি, বটুয়া, স্টোল, টেবলক্লথ, রুমাল, নেকটাই ও কুশন কভার দেখা যায়। এগুলি দেখে বোঝা যায় যে সকলেই মাধ্যমটি আয়ত্ত করেছেন। বিশেষত দোলা চৌধুরী (খেলনা ও বটুয়া), ভবানী পাল (স্টোল), বিভা চাকি (শার্ট), সারণি ঘোষ (বুক কভার) শ্রীলেখা দাশগুপ্ত (কুশন কভার) ও পূরবী কুমারের (লুঙ্গি) নাম উল্লেখ্য।

চিত্রপ্রিয়

মুখ চাই মুখ

মিলন মুখোপাধ্যায়

দশ

মঁমার্ত্রর ঘিঞ্জি অলিগলিতে ঘুরছি। দু' পাশে আলোকিত দোকানপাট। বড়বাজারের মতই ভিড় প্রায়। সন্ধ্যের তরল অন্ধকার আর কুয়াশা বাড়িগুলির কোণা-ঘুপচিতে আটকে আছে। শব্দহীন ফিরফির বৃষ্টিকে কেউ গ্রাহ্যই করছে না। ওরই মধ্যে মানুষজন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, আড্ডা দিচ্ছে জটলা পাকিয়ে। ফুটপাথের যেখানে সেখানে কপোত-কপোতিরা একে অপরের কোমর জাপটে ধরে মুখোমুখি কথা বলছে, আদর করছে। দু' পাশে আলো থাকা সত্ত্বেও পথের গোটা চেহারাটি ধূসর। কালো, ময়লা অথবা বিবর্ণ কোট, ওভারকোট এবং বর্ষাতি নিয়ে চারপাশের মানুষ-মানুষী। উজ্জ্বল রং-চঙা প্যারিসের যে সব খবর দেশে থাকতে পত্র-পত্রিকায় পড়েছি, শুনেছি, তার সঙ্গে এই ছোট্ট এলাকাটির কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। শীত, বৃষ্টি, কুয়াশায় কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে মঁমার্ত্র অঞ্চল।

গলির গলি তস্য গলির মুখে এসে থামলুম। একটি যুবক সামনের বাড়ির দেওয়ালের দিকে মুখ করে পেচ্ছাব করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রুক্ষ একমাথা ঝাঁকড়া চুল ঘাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভিজছে। ভেজা চুলে উল্টো ফুটের আলো হাই-লাইটের মত পিছলে যাচ্ছে। একটু কাছে এগিয়ে দেখি, না, ছেলেটি একা নয়। পেচ্ছাবও করছে না। আপন ওভারকোট দিয়ে একটি তন্বী তরুণীকে আঁকড়ে ধরে আছে নিজের শরীরের সঙ্গে। সঙ্গিনীটিকে প্রায় দেখাই যায় না। প্রেমিকটি আমার চেয়ে বেশ লম্বাও বটে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হতে মেয়েটির ফর্সা মুখের একাংশ এবং বাঁ চোখটি দেখতে পেলুম। পেছনে, দু' পাশে অন্ধকার, ছেলেটির কালচে চুল, গাঢ় রঙের কোটের কলার, পিঠ এবং কাঁধের পটভূমির ভিতর অত ধবধবে ছোট্ট মুখটি জ্যোৎস্নায় কোনো সাদা ফুলকে মনে করিয়ে দিল। এক পলক তাকিয়েই বোঝা গেল, দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে মেয়েটি। আধো-অন্ধকারে ফিসফিস কথা। প্যারিসের সব রাস্তার নামই মোড়ে মোড়ে দেওয়ালে লাগানো থাকে। আবছা অন্ধকারে এই গলির নামটি খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল, ওরা দুজনে মিলে গলির নামটার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রেম করছে না তো! তা হলেই তো চিত্তির! ওরা যে অবস্থায় আছে, এখন ওদের, —"দেখুন, একটু সরবেন, এক মিনিট—গলির নামটা দেখে নিতুম", বললে ধোলাই খাওয়াও বিচিত্র নয়।

বিশুর বাড়ি খুঁজছি। মোঁমার্ত্রের বিশুখুড়োর। দুপুরে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম শিল্পীদের বাজারে। ব্যস্ত ছিল খুব। একটার পর একটা পোর্ট্রেট করছিল। ওরই ফাঁকে ফাঁকে বললুম,

—"তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

—"কি ব্যাপারে? বলে ফ্যালো।" মুখ তুলে এক পলক আমায় দেখে নিয়ে কাজে দিল [মন]। তারপরেই আবার ফিরে তাকাল। বলল,

—"কি গো ইন্ডিয়ান পেইন্টার! কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। এক মাসও তো হয়নি এসেছো। বলি, এরই মধ্যে ফরাসী হাওয়ায় শুকিয়ে গেলে, অ্যাঁ!" বলেই, মুখ নামিয়ে আবার ক্রেয়ন ঘষতে লাগল কাগজে। আমি হেসে ফেললুম। বললুম,

—"না ভাই, ফরাসী হাওয়ায় নয়, ফরাসী খাওয়ায় শরীর একটু বেগতিক হয়েছিল। এখন ঠিক আছে।"

—"যাক, কি ব্যাপার? আমার সঙ্গে কি কথা ছিল বল দিকি।"

চার পাশে দেখে নিয়ে বললুম,

—"এই ভিড়ের মধ্যে হবে না ভাই। একটু নির্জনে তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই।"

আবার আমার দিকে এক পলক চোখ তুলে বলল,

—"গুরুতর কিছু?"

—[illegible] না। তেমন গুরুতর নয়। তোমার কাজ সেরে নাও, তারপরে হবেখন।"

কিন্তু, অল্প সময় বসে [illegible] টের পেলুম, কাজ সারা হতে ওর সময় লাগবে আজ। একটি মুখ শেষ হতেই আরেকটি মুখ ধরে ফেলল বিশু। রঙিন মুখ চাই ভদ্রমহিলার। রঙিন মানেই সাদা-কালোর থেকে প্রায় তিন গুণ বেশী সময়। আবার বসে পড়ল শিল্পী। আমি বললুম,

—"আজ বরং চলি ভাই। কাল আবার আসব।"
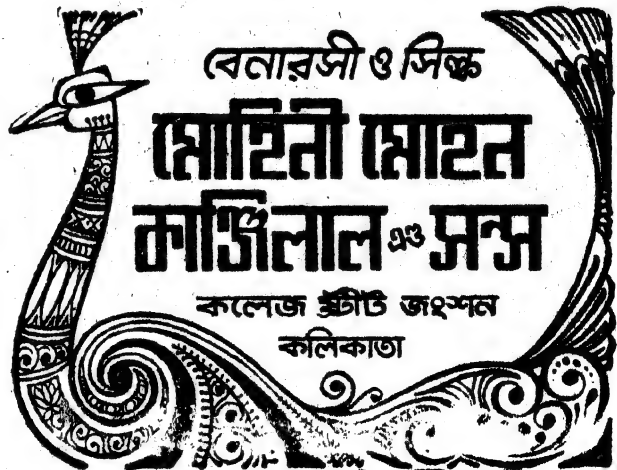
ভদ্রমহিলাকে চেয়ারে বসিয়ে আমাকে একটু পাশে টেনে নিয়ে এল যিশু। বললে,

—"দেখেছেই তো পারছো। রোজ তো এমন কপাল হয় না। আজ এইটে নিয়ে পার্টি, পোর্ট্রেট হবে।—"

ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম,

—"পড়ে থাক। চালিয়ে যাও।"

হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রাখল যিশু। রেখে, অদ্ভুত নরম এবং গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল,

—"কি হয়েছে তোমার? কোনো বিপদে পড়েছো?"

এতটা আশা করিনি, বউ। সদ্য পরিচয়ে এক বিদেশীর কাছ থেকে এতটা আশা করিনি। এমন স্বর, এমন স্পর্শ। খানিকটা অভিভূত হয়ে নিজেরই গলার স্বর কেমন পাল্টে গেল। বললুম,

—"না, না। তেমন কিছু নয়।"

আমার মুখের কাছে আরো একটু এগিয়ে এল যিশু। আরো নরম, আরো কাছের, যেন কোনো প্রাণের মানুষের গলায় বলল,

—"টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে বুঝি!"

চোখে হঠাৎ ধুলো ঢুকে গেলে যেমন হয়, তেমনি করকর করছে আমার চোখ দুটি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। দূরে, গীর্জার চূড়ায় কি একটা পাখি উড়ে এসে বসল। ডান দিকের রেস্তোরাঁয় দুই বুড়োবুড়ি মাতাল গলায় গান গাইছে। সামনা-সামনি বসে, দুলে দুলে। যিশুর পেছনে ওর খদ্দের সেই ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসে উশখুশ করছিলেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই গলায় কাশির শব্দ করে তাঁর শিল্পীকে দেখলেন।

হেসে যিশুর দিকে তাকিয়ে বললুম,

—"সে সব কথা কাল বলব। তুমি যাও তো এখন ওঁর কাছে। কাজে বসে পড়।"

ভদ্রমহিলার দিকে এক পা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল,—"এই ইন্ডিয়ান! এক কাজ করো না!"

—"কি?"

—"বলি, সন্ধ্যেবেলা কোনো মেয়েটেয়ের সঙ্গে রাঁদেভু নেই তো?" বলেই চোখ টিপল যিশু।

বউ, রাঁদেভু হল গিয়ে আমরা কিভিতিতে যাকে বলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা মিটিং। হেসে বললুম,

—"দূর! কোথায় কে!"

—"তাহলে এক কাজ করো! সন্ধ্যের পর আমার ঘরে চলে এসো। এক সঙ্গে খাব।"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ড্রয়িং পেন্সিল দিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল। বলল,

—"নাও ধরো।"

তারপর বাঁ পকেট হাতড়ে বের করল দোমড়ানো কতগুলো দশ ফ্রাঁর নোট। মাথা দুলিয়ে মুচকি হেসে বলল,

—"দেখছো, আজকে একেবারে রাজা ব্যক্তি। কিং অফ মোঁমার্ত্র!"

চট করে একটা নোট আমার পকেটে গুঁজতে যেতেই আমি দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললুম,

—"না হে, দরকার নেই!" আপন পকেটে হাত ছুঁয়ে হাসলুম, "আছে!"

আমার চোখে চোখ রাখল যিশু। স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত। বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করল আমি মিথ্যে বলছি কিনা। বলল,

—"ঠিক?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ মঁসিয়ে! ঠিক! পরে দরকার হলে চেয়ে নেবো।"

হা হা করে হেসে উঠল যিশু। বলল,

—"তোমার যখন দরকার হবে, তখনই যে আমার কাছে টাকা থাকবে—এমন আশা কোরো না বন্ধু।" তারপর ভদ্রমহিলার দিকে চোখের কোণে দেখে নিয়ে বলেছিল,

—"বুড়ি খচে যাচ্ছে। আমি যাই। ওর তোবড়ানো রঙিন থোবড়া বানিয়ে পাঁচাত্তর, নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ ফ্রাঁ খসিয়ে নিচ্ছি। সন্ধ্যের পর চলে এসো তুমি। অপেক্ষা করব—" শেষের দিকে গলা তুলে বলতে বলতে ভোম্বা মুখের দিকে চলে গিয়েছিল।

যিশুর ঠিকানাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখছি কপোতের পিঠ এবং ভদ্রমহিলার ধবধবে মুখের সামান্য অংশ। এদের থেকে হাত দুয়েক পেছনে আমি। "আমিও জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পড়ে গেল"—বদ্ধ পায়খানার বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যাড়ভাগুলো কথা বোঝাতে গেলে যে ধরনের কাশির শব্দ করতে হয়, তাও করলুম দু'বার। কিসের কি! না রাম, না গঙ্গা। ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই! হাতের খুব কাছে আর কাউকে না পেয়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম,

—"মাফ করবেন! এটাই কি অমুক রাস্তা?"

যুবকটি নট্-নড়ন্-চড়ন্-নট্-কিচ্ছু! ঘাড় ফিরিয়েও দেখলে না। শুধু গলা চড়িয়ে বিরক্তির শব্দ করে বললে,

—"না হে বাপু, এটা নরকের রাস্তা নয়!"

তার মানে বুঝলে তো, বউ! ঘুরিয়ে আমাকে নরকে যেতে বলছে। কাঁচ গলায় মেয়েটির খিলখিল হাসি বাজল। ওর বাঁ চোখ দেখতে পাচ্ছি। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই বোধহয় মুখটি উঁচু করল। হাসতে হাসতেই চকচক করে দুটো চুমু খেল যুবকটির অদৃশ্য গালে। আমি তাকিয়েই ছিলুম। কি করব! ওদের যখন লজ্জাশরম নেই, তখন আমারও নেই। দৃশ্যমান সেই একটি চোখ আমার চোখে ফেলে মেয়েটি ভারি মিষ্টি গলায় বলল,

—"হ্যাঁ মঁসিয়ে! এটাই আপনার দরকারী গলি। ঢুকে যান।"

গলিটি বেশ অন্ধকার। কোনো দোকানপাট নেই। বড়জোর চারজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। তিন চারটে বাড়ির পর আধো অন্ধকারে একটি প্রশস্ত চত্বর। এখন আমার চার পাশেই বাড়ি। ডানদিকের কোলাপসিবল গেট দিয়ে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁকে যিশুর নাম বলে জানতে চাইলুম কোন বাড়ি।

—"পীয়ের দ্যালমী!" একটু ভেবে বললেন, "শিল্পী তো! উঠে যান। এই বাড়িরই তিন তলায়।"

একেবারে লোড-শেডিংয়ের অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি। হাতড়ে হাতড়ে তিন তলায় উঠে এলুম। দু'দিকে দুটি দরজাই বন্ধ। 'যা থাকে কপালে' করে বাঁদিকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। কোনখানেই কোনো দেখলুম—না আছে নেম-প্লেট, না কলিং বেল। টোকা দিলুম আস্তে আস্তে। সাড়া নেই। আবার একটু

জোরে দিলুম টোকা। খুট করে দরজাটি খুলল। ভেতরে খুব ঝাপসা আলোর আভাস। একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। গলা দিয়ে শব্দ বেরোতেই বুঝলুম মেয়ে। জিজ্ঞেস করলে,

—"উয়ী?"

বললুম,

—"পীয়ের ভ্যালমী।"

অল্প পেছনে সরে গিয়ে পাশ হয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। বললে,

—"ইন্ডিয়ান পেইন্টার? আসুন, ভেতরে আসুন!"

ছোট্ট প্যাসেজটি পেরিয়ে মৃদু আলোয় মাঝারি আকারের একটি ঘর। আসবাব বলতে একটি গদিওয়ালা মোড়া। মেঝে ঢাকা বিবর্ণ কার্পেটে। এত অল্প আলোয় রং বোঝা যাচ্ছে না। দু' পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দুটি বিছানা পাতা। এলোমেলো কম্বল, চাদর, বালিশ। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বাঁদিকের বিছানায় যিশু বসে আছে। সেই লাল গলাবন্ধ মেয়েটার গায়ে। ওর মাথার কাছে কোণ ঘেঁষে খুব কম ওয়াটের বালব জ্বলছে। গোলাপী রঙের কাগজ দিয়ে মোড়া। আমাকে দেখে একগাল হাসল যিশু। বলল,

—"এসো, এসো।"

ডান হাতে নিজের পাশের জায়গা চাপড়ে দেখাল,

—"বসে পড়ো।"

অন্য বিছানায় মেয়েটি বসেছে। যিশু আলাপ করিয়ে দিল,

—"অ্যানী! অ্যানব্রীট ওলসেন। মেয়েদের ফান্সী পোশাকের ডিজাইন বানায়।"

অ্যানব্রীটের রুক্ষ চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে বুক অবধি। টলটলে গড়নের মুখে কেমন একটু ফ্যাকাশে ভাব। কটা চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরনে ময়লা বাদামী কোট। কোমরে বেল্ট। ফুল প্যান্টের পায়ের কাছে ছেঁড়া ছেঁড়া সুতো ঝুলছে। কুড়ি-বাইশ বছরের লম্বাটে চেহারায় ভরপুর যৌবন। তবে, উগ্র নয়। পা ছড়িয়ে বসে আছে। ডান হাতে সিগারেট। জ্বলন্ত সিগারেটটি দেখিয়ে বলল,

—"চলবে নাকি?"

ঘরে ফায়ার-প্লেস বা হীটার নেই। বাইরের মত কনকনে না হলেও শীতভাব জমে আছে চার দেওয়ালের মধ্যে। একটা উগ্র গন্ধ পাচ্ছি তখন থেকে। অনেকটা গাঁজার গন্ধের মত। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি আছে ওতে?"

যিশু জবাব দিল,

—"হশিহশ। নাও, দম মারো।"

ওর হাত থেকে সিগারেটটি নিয়ে টানলুম। গোলওয়াজ সিগারেটের তামাক বের করে হাশিহশ ভরে নিয়েছে। এক টানেই কোলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছে

জ্বলন্ত সিগারেটটি দেখিয়ে বলল, "চলবে নাকি?"

গেলুম। সুদীপ্তর চোয়াড়ে মুখ ভেসে উঠল। নাটক-টাটক করতুম তখন। রিহার্সাল দিয়ে ফেরার পথে সুদীপ্তই সব জোগাড়-যন্তর করত। কলকে, ভেজা ন্যাকড়া, গাঁজার পুরিয়া। তপন, সুদীপ্ত, করুণাময় আর আমি। দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসে বসে ঘুরে ঘুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলকে ফাটাতুম আমরা। বহুকাল পরে, প্যারিসের এক ঘুপচি ঘরে বসে ওদের কথা মনে পড়ল। তিন-তিনটে নাটকীয় মুখ। ওরা কে কোথায় আছে, কি করছে কিছুই জানি না। সময় ছিঁড়ে ছিঁড়ে এতগুলো বছরের পার! শুধু মুখ তিনটি লালচে হয়ে টিঁকে আছে জ্বলন্ত গাঁজার কলকে ঘিরে।

—"আগে খেয়েছো কখনো?"

যিশুর জিজ্ঞাসার জবাব দেবার আগেই অ্যানব্রীট হেসে ফেলল,

—"পীয়ের, তোমার নেশা হয়েছে! কি বলছো যা-তা। ইন্ডিয়ার লোককে জিজ্ঞেস করছো হাশিহশ খেয়েছে কি না?"

আমিও হেসে ফেললুম। বললুম,

—"তোমাদের ধারণায় কি সব ইন্ডিয়ানই গাঁজাখোর? আমার তো মনে হচ্ছে তোমারই নেশা হয়েছে অ্যানব্রীট!"

তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। যিশু বললে,

—"বজ শিল্পী! কি যেন আলোচনা ছিল বলছিলে আমার সঙ্গে—বলে ফ্যালো।"

—"বলছি।" বলে আড়চোখে একবার অ্যানব্রীটকে দেখে নিলুম।

যিশু বলল,

"অ্যানের সামনে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিছু নেই। আমার খুব পুরোনো বন্ধু। নিশ্চিন্তে বলে যাও।"

কি রকম পুরোনো বন্ধু জানো, বউ! একেবারে সেই ছোটবেলায়। ওরা তখন লিয়'তে। ফ্রান্সের পশ্চিম সমুদ্রতীরে লিয়'। যিশুর বাবা মারা যাবার পর মা আবার বিয়ে করলেন। যিশুর হাত সেই ছোটবেলা থেকেই ভালো। ইস্কুল শেষ হয়েছে তখন। বাড়িতে মন টিঁকতো না। চলে এলো প্যারিসে। প্রায় ন' বছর আগেকার কথা। একোল দ্য বুজার্ট ড্রয়িং শিখে গত বছর চারেক মোমার্ত্রে আড্ডা জমিয়েছে।

বিশ্ব হাসতে হাসতে বলল,

—"জানো শিল্পী, অ্যানী আমার থেকে কত ছোট? ওকে আমি কোলে তুলে ক্ষেতে, মাঠে ঘুরতুম।"

অ্যানী কপট ধমক দিল বিশ্বকে,

—"অ্যাই, মিথ্যুক কোথাকার! বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি!"

তারপরেই আমার দিকে ফিরে হেসে বললে,

—"ওর কথা মোটে বিশ্বাসই করবে না। একে তো প্রচণ্ড গুল মারে, তার ওপর গাঁজা খাচ্ছে! ও ভীষণ পেটরোগা লিকলিকে ছিল ছোটবেলা। আমি ছিলুম নাদুস-নুদুস। আমার ছবি তোমায় দেখাবো'খন। ও যদি আমায় কোলে তোলার চেষ্টা করতো না, নিজেই লটপটিয়ে পড়ে যেত।"

বিশ্ব হাসতে হাসতে বলল,

—"তা ঠিক, ওর তখনকার ছবির ওজনই ছিল কত, বাপস্!"

অ্যানী রাগ-রাগ মুখ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। আমি জিজ্ঞেস করলুম,

—"তা, তুমি প্যারিসে এসেছো কদ্দিন?"

—"বছর চারেক।"

বিশ্ব নতুন সিগারেটের তামাক বের করছিল দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। অ্যানী যে বিছানায় বসে ছিল সেইটে দেখিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"ওটাতে কে থাকে?"

অবাক চোখে আমায় দেখল বিশ্ব। বলল,

—"কে আবার! অ্যানী থাকে।"

—"অ্যা!"

কেমন বোকার মতন দিশী মতে জিজ্ঞেস করে ফেললুম,

—"তোমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে নাকি!"

আর যাবে কোথায়! হাসতে হাসতে বিশ্ব প্রায় বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে শব্দ-অক্ষর বসিয়ে বলল,

—"শুনছো! শুনছো অ্যান্! গেঁইয়াটার কথার ধরন শুনছো!"

অ্যানীও হাসিতে যোগ দিয়েছে। তবে অতটা সোচ্চার নয়। বোধ হয় চোখের ভুল আমার, ওর হাসির ধরন কেমন যেন একটু লজ্জা-লজ্জা!

বিশ্বর হাসি থামলে বললুম,

—"একেবারে গাঁজাখোরের মত হাসলে দেখি! শেষ হল?"

আবার হো হো করে উঠল বিশ্ব। বলল,

—"তোমার কথা শুনে হাসবো না তো কি অ্যানীর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসব! পাগল কোথাকার!"

বুঝলে তো বউ, এই হচ্ছে ব্যাপার! স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এক ঘরে যুবক-যুবতী রাত কাটাচ্ছে শুনলেই আমাদের মা-ঠাকুমা-দের, শুধু মা-ঠাকুমা কেন, যে কোনো ভারতীয়েরই বোধ হয় চক্ষু কপালে উঠে যাবে। ঘেন্নায় ঘিনঘিনে গলায় 'ছ্যা-ছ্যা' করবে।

নতুন সিগারেটে হাশিশ ভরে আমার দিকে এগিয়ে দিল বিশ্ব। বলল,

—"তুমি ধরাও। অতিথি ব্যক্তি! পেসসাদ করে দাও।"

ঠিক গাঁজার কলকে ধরার মত করে ডান হাতের পাঁচ আঙুলে সিগারেটটি ধরলুম। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতে মুঠি পেঁচিয়ে মোক্ষম টান দিলুম। চিড়িক চিড়িক করে আগুনের ফুলকি ছড়াল। বিশ্ব, অ্যানী দুজনেই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। বিশ্ব বললে,

—"বা-বা! বাঃ! দারুণ তো!"

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করে সিগারেটটি ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। গলগল করে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললুম,

—"গাঁজা আমাদের দেশে এইভাবে খায়।"

বিশ্ব বললে,

—"শিখিয়ে দাও, দোস্ত! মোমার্ত্রের বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেব।"

অ্যানও আমার ডান পাশটিতে এসে বসল। খুব উৎসাহের গলায় বেশ খানিকটা আবদার মাখিয়ে বললে,

—"হ্যাঁ, শিল্পী! শিখিয়ে দাও তো আমাদের! প্লীজ!"

(ক্রমশ)

গানের আসর

মূল্যায়নিক শিক্ষা

আজকাল কেউ কেউ কম্পারেটিভ এডুকেশন বা মূল্যায়নিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। মূল্যায়নিক আলোচনায় সাহিত্য কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে শুনেছি। সাহিত্যে এই আলোচনা যত বিস্তৃতভাবে করা যায়, সঙ্গীতে সেটা সম্ভব কিনা জানি না, কারণ আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এরকম তুলনাত্মক বিশ্লেষণের সুযোগ নেই; কিন্তু মধ্য প্রাচ্য বা প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে হতে পারে। যদি ধীরে ধীরে এই কাজ ভালভাবে করা যায় তাহলে শুধু সঙ্গীতের দিক থেকেই নয়, অপরাপর বহু দিক থেকেই এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম বলে মনে হবে। আমরা গ্রীক লাটিন সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনা করি, এতে আমাদের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্বন্ধে বহু ধারণা স্পষ্ট হয়; ঠিক সেইভাবে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণেরও অবকাশ আছে। এতে আন্তর্জাতিকভাবে সঙ্গীতের একটি মূল্যায়ন হবে, যার সময় বর্তমানে এসেছে। আমাদের দেশে যে সুযোগ আছে আমরা তা গ্রহণ করিনি। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের এই রকম মূল্যায়ন আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার সহায়ক হবে। উত্তর ভারতে আমাদের অনেকেরই দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে ধারণা নেই, দক্ষিণ ভারতীয়দেরও একই অবস্থা। লোক-সঙ্গীতের দিক থেকেও বিভিন্ন প্রদেশের সংগীত, বাদ্য সম্বন্ধে তুলনা করলে আমরা বহু বিষয়ে আলোকপাত করতে সমর্থ হব। আকাশবাণী কিছুকাল ধরে এই রকম নানা ধরনের সঙ্গীত প্রচার করে খুব ভাল করছেন; এটিকে বাহুল্য বলে মনে না করাই শ্রেয়।

এত বিস্তৃতভাবে যাবার প্রয়োজন যাঁদের আছে তাঁদের অনেক বেশী চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর পরিপ্রেক্ষিতেও এটি সুষ্ঠুভাবে করা যায়- এবং তাতেও আমাদের অনেক উপকার হতে পারে সাঙ্গীতিক উপলব্ধির দিক দিয়ে। যেমন ধরুন—রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল। আপাতদৃষ্টিতে দুজনের কম্পোজিশন ভিন্ন দিকে গেছে, আবার এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে গভীর মিল চোখে পড়ে। কেন পড়ে, সেটা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তা হলে দেখা যাবে একটা যুগের প্রভাব সামগ্রিকভাবে উভয়ের উপরেই সমানভাবে পড়েছে। তখনই অনুসন্ধান করতে হবে সেই যুগের সঙ্গীত ও তার রীতিনীতি কি রকম। এই পরিশীলন যদি ভালভাবে করা যায় তা হলে দেখা যাবে গবেষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কত বিস্তৃত হয়ে গেছে। অনেকে যে বলেন, একশ্রেণীর গায়কের অপর শ্রেণীর গানে মাথা গলানো কাজের কথা নয়, এতে অপকার হতে পারে—এটা কোনও কাজের কথা নয়, বরঞ্চ এটা অজ্ঞ ধারণার ফল। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধিৎসাই প্রাণের পরিচয় এবং তা থেকেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। ঢপ-কীর্তন, কথকতা, পাঁচালি, কবি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বহু মিল এবং বহু অমিল আছে। কিন্তু এটা ঠিকই যে, পরস্পরের প্রভাবও এইগুলিতে কম নেই। এগুলি সবই আমাদের তুলনীয়ভাবে অধ্যয়নের বিষয় হওয়া উচিত।

আমরা যদি অনুরূপভাবে বাংলার রাগসঙ্গীত এবং হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তা হলে দেখতে পাব বিষয়টা মূলত এক হলেও নানা কারণে উভয় রীতি এক হতে পারে নি। বহু দিক থেকেই উভয় রীতির কতক-গুলি বৈষম্য রয়ে গেছে যা একেবারে অন্তর্নিহিত। বাংলার টপ্পা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণে বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু বাংলার টপ্পাকে আমরা সর্বতোভাবে টপ্পাই বলতে পারি, কারণ মনোহারিত্ব টেকনিক ও বৈশিষ্ট্যে তা সম্পূর্ণভাবেই টপ্পা। বাংলা-খেয়াল নামক বস্তুটি যখন শুনি তখন জানিনে কেন স্বতই মনে হয় এটি পুরোপুরি হিন্দী খেয়ালের নকল—এর যেন একটা স্বাতন্ত্র্য নেই। টপ্পা যেভাবে বাংলার নিজস্ব সৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়েছে খেয়াল আজও বোধ করি সেভাবে একটি সম্পূর্ণ বঙ্গীয় সৃষ্টি বলে দাবী করতে পারে না। যখন সেটি সম্ভব হবে তখন বাংলা-খেয়ালও একটা বিশেষ পর্যায়-রূপে গণ্য করা সম্ভব হবে। কিন্তু, খেয়াল শব্দটি আমার মনে হয় কিঞ্চিৎ অবমাননা-সূচক। এই শব্দের মধ্যেই একটা লঘুতা এবং হেয়তার ইঙ্গিত আছে। যাঁরা এই রীতির প্রাথমিক নামকরণ করেছিলেন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই এই রীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। ধ্রুপদ গান ধ্রুবপদরূপে পরিচিতি লাভ করেছে—এতে তার গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়েছে। টপ্পা, ঠুংরীও লৌকিক রীতি অনুযায়ী নিজেদের পরিচিতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু, একটি সীরিয়াস স্তরের রাগসঙ্গীতকে 'খেয়াল' বলব—এ কেমন কথা? নিজেদের উন্নতমানের সঙ্গীতকে খেয়াল বলে লঘু করব কেন? অনেকে বলেন, আমীর খসরু এই নামকরণ করে-ছিলেন। এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে একমাত্র এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই

এই নাম দিয়েছিলেন। অনেকে বলতে পারেন, এই শব্দটি একটি ঐতিহাসিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে, এর বদল না করাটাই সঙ্গত হবে। সেটা মেনে নিতে আপত্তি নেই; কিন্তু তা হলে 'রাগপ্রধান' শব্দটিকেও আমরা বর্জন করবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনে। বরং সুরেশবাবু অত্যন্ত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এই নামকরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলব। এই রাগপ্রধান গানটি কোন রাগ অবলম্বন করে গাওয়া হচ্ছে সেটি বলে দিলেই তা পুরোপুরি বাংলা খেয়ালের অভাব মেটাতে সমর্থ হবে এবং আমরাও একটি নিজস্ব জাতীয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারব।

তাই বলছিলাম, সঙ্গীতের নানা স্তরেই কমপারেটিভ স্টাডি বা মূল্যায়নিক শিক্ষা এবং আলোচনা হওয়া দরকার। এটিকে আমাদের সঙ্গীতশিক্ষার একটি বিশেষ বিষয় হিসাবে অবলম্বন করাটাও যুক্তিযুক্ত হবে। এতে আমরা প্রকৃত আত্ম-সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব এবং একটা সর্বাঙ্গীন ধারণায় নিজেদের উন্নততর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করতেও পারব।

শার্ঙ্গদেব

বিশ্ব বিজ্ঞান

দুধ কেন হজম হয় না ?

কথাটা যে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা অবশ্য নয়। তবে অনেকের মুখেই শোনা যায়, না, মশায়, দুধ দেবেন না। দুধ আমি সহ্য করতে পারি না। দুধ খেলেই আমার পেটের অসুখ হয়।

এবং শুধু বড়রাই নন। একই অভিযোগ কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রেও। দুধ খেলে তারাও নাকি অজীর্ণতাতে ভোগে। পেটের অসুখে কাহিল হয়ে পড়ে। তা সে দুধ গরুরই হোক। অথবা নিজের মায়ের।

কারণটি অবশ্য পরিষ্কার। দুধ পরিপাকের জন্যে দরকার 'ল্যাকটেজ' নামে এক ধরনের এনজাইম বা জারক রস। যার দায়িত্ব ল্যাকটোজ বা দুগ্ধ-শর্করাকে (milk sugar) সরল রাসায়নিক যৌগে ভেঙে দিয়ে বিপাকীয় কাজে. সাহায্য করা। শরীরে ল্যাকটেজের অভাব ঘটলে ল্যাকটোজের এই ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা বাধা পায়। দুধ হজম করা তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

পুষ্টি এবং শারীরবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, অনেক শিশু শরীরে ল্যাকটেজ তৈরি করার অক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এর মূলে কাজ করে বংশগত কোন ত্রুটি(?)। এ ধরনের শিশুরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই দুধ সহ্যই করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শৈশবে ল্যাকটেজ তৈরির ক্ষমতা রাখলেও বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন বলেই একই ধরনের অসুবিধে ভোগ করতে থাকেন। শেষোক্ত এই ঘটনার মূলে কাজ করে দৈহিক চাপ বা ফিজিক্যাল স্ট্রেস, বিভিন্ন রকম রোগের আক্রমণ কোন কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া. এবং ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, দুধের অন্যতম প্রধান উপাদান তিনটি। ল্যাকটোজ, ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং প্রোটিন। ল্যাকটোজ আসলে এক ধরনের চিনি। রাসায়নিক ভাষায় বলা চলে ডাইস্যাকারাইড বা দ্বি-শর্করা শ্রেণীর সামগ্রী। গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন মনোস্যাকারাইড বা এক-শর্করার রাসায়নিক মিলনই তৈরি করে ল্যাকটোজ অণু। স্তনের মধ্যে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে। ইংরেজীতে যাদের বলা হয় 'ম্যামারি গ্ল্যানড্স'। ল্যাকটেটিং ম্যামারি

- এক নজরে

নাম ক্লারা এবং আলতা রডরিগেজ। বাকি ল্যাম দেশে। এরা দুই বোন। যমজ। এবং যখন জন্ম হোল, একজনের কোমর আর একজনের কোমরের সঙ্গে জোড়া। চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন, এ অবস্থায় এরা হয়ত বেশি দিন বাঁচবে না। গোড়ায় অপারেশন করার ঝুঁকিও কেউ নিতে চাইছেন না।

অবশেষে তেরো মাস যখন বয়েস, তখন অপারেশন করার দায়িত্বটি নিলেন ফিলাডেলফিয়ার শিশু হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসক ডঃ সি এভারেট কুপ। মেয়ে দুটি তাদের পৃথক সত্তা ফিরে পেল।

উপরে দুই বোন অপারেশনের আগে। নিচে অপারেশন করার পরের অবস্থা। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর কোন বিপদ নেই। ক্লারা এবং আলতা এখন থেকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।

...গ্ল্যানড এদের অন্যতম। ইউরিডিন ডাই-ফসফেট গ্ল্যাকটোজ এবং গ্লুকোজ এই দুই রাসায়নিক যোগ শেষোক্ত ওই গ্রন্থির কোষ-কলার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরি করে ল্যাকটোজ। সংশ্লেষণের কাজে সহায়তা করে এক ধরনের রাসায়নিক যোগ। নাম আলফা-ল্যাকটাল-বুমিন। প্রোটিন জাতীয় এই বস্তুটি দুধের মধ্যেই থাকে। টেস্ট টিউবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শরীরে আলফা-ল্যাকট্যালবুমিন তৈরি করার জন্যে যেমন প্রয়োজন কয়েকটি হরমোন—ইনস্যুলিন, করটিসোন, এস্ট্রো-জেন এবং প্রোল্যাকটিন, ঠিক তেমনি আর এক ধরনের হরমোন, নাম প্রোজেস্টারোন আলফা-ল্যাকট্যালবুমিন তৈরির কাজে বাধা দেয়। সন্তানসম্ভবা মায়েদের প্রসবের সময় যতই এগিয়ে আসে তাঁদের শরীরে প্রোজে-স্টারোনের মাত্রা ততই কমতে থাকে। প রি ব র্তে আলফা-ল্যাকট্যালবুমিনের সংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বাড়ে ল্যাকটোজেরও সংশ্লেষণ।

অবশ্য কতটা ল্যাকটোজ তৈরি হবে সেটা এক এক প্রাণীর ক্ষেত্রে এক এক রকম। যেমন, মানুষের দুধে বিশেষ এই চিনিটির পরিমাণ সবচাইতে বেশি দেখা যায়। ১০০ মিলি লিটারে ৭·৫ গ্রাম। গরুর দুধে এই পরিমাণ প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৪·৫ গ্রাম প্রভৃতি। ব্যতিক্রম শুধু জলজ-স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন, সীল, সিন্ধুঘোটক, প্রভৃতির দুধ। একমাত্র এই সব প্রাণীর দুধেই ল্যাকটোজ থাকে না। ফলে এরা ল্যাকটোজ সহ্য করতেও পারে না।

প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে, ১৯৩৩ সালে জনৈক ব্যক্তি, আলাসকা থেকে একটি সিন্ধুঘোটকের বাচ্চা ধরে জাহাজে ক্যালি-ফোর্নিয়ায় চালান দিয়েছিল। বাচ্চাটি তখনও মায়ের দুধ ছাড়েনি। জাহাজীরা বিপদে পড়লেন। বাচ্চাটিকে খাওয়াবেন কী তাঁরা? শেষে তার জন্যে গরুর দুধ বরাদ্দ হল। এবং কয়েকদিন পর দেখা গেল, গরুর দুধ খেয়ে বেচারা সিন্ধুঘোটক শাবক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড পেটের অসুখে তার মারা যাওয়ার মত অবস্থা।

পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল ল্যাকটেজের অভাবই তার এই অসুস্থতার কারণ। গরুর দুধে আছে ল্যাকটোজ অথচ জলচর-স্তন্যপায়ী প্রাণী সিন্ধুঘোটক শৈশব থেকেই যে দুধ খেয়ে থাকে তাতে কোন ল্যাকটোজ থাকে না। ফলে ল্যাকটোজ পরিপাকের জন্যে বিশেষ ধরনের সেই জারক রস ল্যাকটেজেরও দরকার হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে বংশপরম্পরায়, এই ল্যাকটোজশূন্য দুধ খাওয়ার ফলে এদের শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থাই এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, বংশগতভাবে এরা এখন ল্যাকটেজ তৈরির অক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। এ থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, দুধ হজম করার ক্ষমতা হয়ত বংশগত ব্যাপার। মানুষের মধ্যেও যারা দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিশেষ করে দুধ পেটে পড়লেই যে সব শিশু পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়, অনেকের বিশ্বাস, বংশগত যুক্তিই এর অন্যতম কারণ। এর জন্যেই তাদের শরীরে 'ল্যাকটেজ' নামক এনজাইমটি সংশ্লেষিত হতে পারে না। তাই দুধ খেলেই তাদের অসুখ করে।

*

প্রশ্ন এই: ল্যাকটোজ পরিপাকের ব্যাপারে ল্যাকটেজের আসল ভূমিকাটি কী ধরনের?

এর উত্তর: কয়েক ধরনের ল্যাকটেজ আছে। তবে ল্যাকটোজ পরিপাকের জন্যে নির্দিষ্ট একটি ল্যাকটেজই দরকার হয়। যার নাম বিটা গ্ল্যাকটোসাইডেজ। অন্ত্রের যে অংশে পরিপাকের কাজটি চলে বিশেষ এই জারক রসটি সেখানে এসে দুধের ল্যাকটোজের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। দ্বি-শর্করা ল্যাকটেজ তখন ভেঙে গিয়ে তৈরি করে সরলতম চিনি গ্লুকোজ এবং গ্ল্যাকটোজ। এই গ্লুকোজের কিছু ... ক্ষুদ্রান্ত্রের এক ধরনের কোষ (V...) নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগায়। অবশিষ্ট গ্লুকোজ এবং গ্ল্যাকটোজ রক্তপ্রবাহের মধ্যে মিশে চলে যায় যকৃৎ-এ। সেখানেই চলে বিপাকীয় কাজকর্ম।

সমস্যাটি দাঁড়াচ্ছে এই। ধরা যাক, কেউ খানিকটা দুধ খেলেন। এই দুধের মধ্যে দিয়ে কিছুটা পরিমাণ ল্যাকটোজ নিশ্চয় তাঁর পেটে গিয়ে পড়বে? এখন দেখা গেল, যে পরিমাণ ল্যাকটোজ এসে হাজির হয়েছে তার সবটা ভেঙে সরল-চিনি গ্লুকোজ এবং গ্ল্যাকটোজে পরিণত করার মত উপযুক্ত পরিমাণ ল্যাকটেজ তৈরি করার মত ক্ষমতা শরীরের নেই। আর তেমন অবস্থা ঘটলে দুটি মাত্র পথই খোলা। এক, কিছুটা ল্যাকটোজ সরল-চিনিতে রূপান্তরিত হয়ে শরীরের প্রয়োজন মেটাবে। দুই, অবশিষ্ট ল্যাকটেজের কিছুটা গিয়ে মিশবে রক্তের
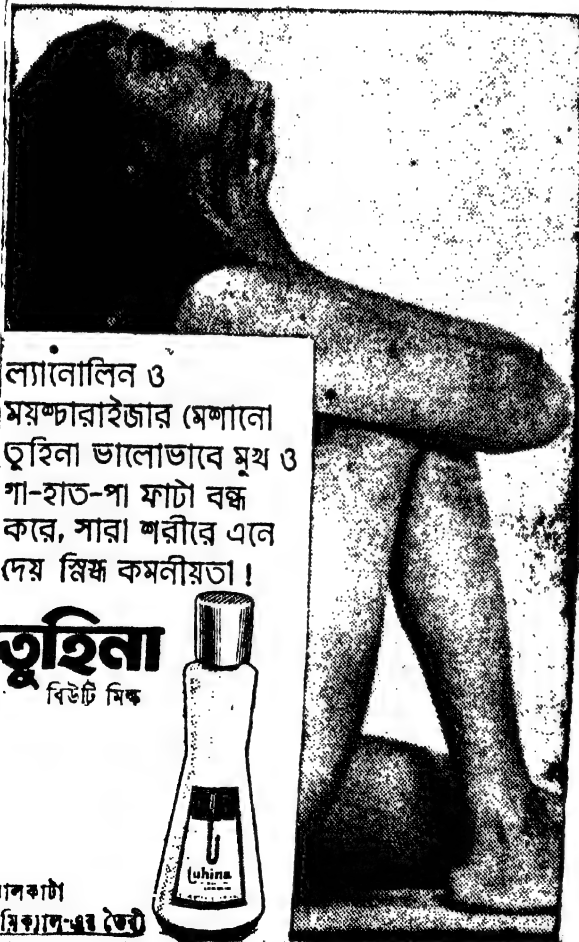
সঙ্গে এবং অবশেষে প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যাবে। বাকিটা বৃহদন্ত্রের মধ্যে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেঙে গিয়ে তৈরি করবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং বিভিন্ন ধরনের জৈব-অম্ল বা অরগ্যানিক অ্যাসিড। যার পরিণতি প্রচণ্ড রকমের পেটের অসুখ। শিশুদের ক্ষেত্রে এ রোগ কখনও কখনও মৃত্যুরও কারণ হয়ে থাকে।

ল্যাকটোজ সংক্রান্ত এই ব্যাপারটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ১৯৫০-এর দশকে জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আয়োন হোলজেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ পাওলো দুরান্দ এবং ম্যানচেস্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শতাধিক শিশুর ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখেছেন, ওই সব শিশুর অনেকেরই দুধের ওপর প্রচণ্ড অনীহা। গরুর অথবা নিজেদের মায়ের, কোন দুধই তারা খেতে চায় না। দুগ্ধ-শর্করা খেয়ে তাদের অনেকেই মারাত্মক পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়। কেউ কেউ মারাও যায়। পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশু এবং বয়স্কদের নিয়ে পরীক্ষা করে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন, দুধ হজম করার ক্ষমতা হয়ত বংশগত ব্যাপার।

ও'দের বক্তব্য, 'হয়ত' শব্দটি আমরা উপেক্ষা করছি না। তবে একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। অনেক শিশু ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। অন্তত তথাকথিত শারীরবৃত্তীয় মাপকাঠিতে তাদের কারোকেই আমরা দুর্বল বা রোগগ্রস্ত বলতে পারি না। ওদের অনেকের বাবা এবং মা'র স্বাস্থ্যও ভাল। কিন্তু ফ্যাসাদ শুধু ওরা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যেই দুধ খেতে দেওয়া হল, অমনি পেটের অসুখ। ওদের দেখে একটা সিদ্ধান্তই শুধু করা যায়। বংশগত সূত্রে হয়ত ওরা এমন কোন ত্রুটি নিয়ে জন্মেছে, যার ফলে 'ল্যাকটেজ' নামক এনজাইমটি হয় তাদের শরীরে তৈরি হয় না, অথবা হলেও, এত কম পরিমাণে হয়, যা দিয়ে ভুক্ত ল্যাকটোজের পরিপাকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করা যায় না।

এ ধরনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু কিছু সমীক্ষাগত প্রমাণও পাওয়া গেছে। ১৯৬৫ সালে জন হপকিনস স্কুলে ডঃ পেড্রো কুয়েত্রেকাসাস ও তাঁর কয়েকজন সতীর্থ এবং ডঃ থিওডোর এম বেলেস ও ডঃ নরটন এস রোজেনসীভগ কয়েকজন কালো এবং সাদা আমেরিকানকে ল্যাকটোজ খাইয়ে পরীক্ষা চলান। ল্যাকটজ খাওয়ানোর আগে ওদের কারোরই পেটের অসুখ ছিল না। কিন্তু ল্যাকটোজ খাওয়ার পর দেখা যায় সাদাদের মধ্যে শতকরা ৬ থেকে ১৫ ভাগ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কালোদের মধ্যে অসুস্থ হয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ। এ থেকে

নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কেন কিছু সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তিও দুধ সহ্য করতে পারেন না। পরবর্তীকালে ম্যাকেরেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ডঃ এস কাজুরি এবং জি সি কুক দেখিয়েছেন, উগান্ডায় অধিবাসীদের মধ্যে যারা গো-চারণের ওপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ লোক দুধ খেলে অসুস্থ হয়। এবং গো-চারণ যাদের পেশা নয়, তাদের শতকরা ৮০ ভাগ দুধ সহ্যই করতে পারে না।

এ ব্যাপারে একে একে পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ছাড়া ছাড়া ভাবে কোন পরিবার অথবা অঞ্চলের এক আধজন মানুষই নয়, গোষ্ঠীগতভাবে কোন কোন দেশের মানুষ ল্যাকটোজ সহ্যই করতে পারে না। যেমন, জাপানে জাপানী, ইস্রাইলে ইহুদী, এস্কিমো, এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসী এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী। অনেকের মতে, ওদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে হয়ত দুধ খাওয়ার অভ্যাসটি বজায় ছিল। পরে অনিবার্য কারণে এই অভ্যাসটি তাদের ছাড়তে হয়। বংশগতির মধ্যে দিয়ে সেই অভ্যাসই হয়ত তাদের উত্তর-পুরুষদের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।

প্রশ্নঃ তা না হয় হল। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় গো-চারণ যাদের পেশা, গোষ্ঠীগত-ভাবে দুধ যাদের প্রধানতম খাদ্য, তাদের মধ্যেও দুধ সহ্য হয় না এমন লোকও তো দেখা গেছে? এর কারণ কী?

উত্তরে বলা হয়েছে, সামাজিক সংমিশ্রণই হয়ত এর অন্যতম কারণ। যারা গো-চারণ পেশা হিসেবে কোন দিনই গ্রহণ করেননি, তাদের বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে মিলনের জন্যও এটা হওয়া সম্ভব।

সমালোচকরা আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে প্রশ্ন তুলেছেন, অনেক সময় দেখা যায়, শৈশবে সে দুধ সহ্য করতে পারে। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যত গোলমাল। এরই বা কারণ কী?

এ প্রশ্নের উত্তরঃ বিভিন্ন রোগের আক্রমণ, দৈহিক চাপ অথবা নানা রকম ওষুধই এর জন্যে দায়ী। এরাই শরীরে অঘটন ঘটিয়ে ল্যাকটেজ তৈরির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বলেই অমনটি ঘটে।

কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, শৈশবে দুধ ছাড়ার পর দীর্ঘকাল দুধ খাওয়ার অভ্যাস যদি না থাকে, এবং বেশি বয়েসে আবার যদি দুধ খাওয়ার চেষ্টা করেন, শরীর খারাপ হতে পারে। এ বক্তব্যের পেছনেও একই যুক্তি। বেশিদিন দুধ না খাওয়ার ফলে শরীরের সেই বিশেষ জারক রস তৈরির ক্ষমতা কমে যায়। তাই এই বিপত্তি।

কারণ যাই হোক না কেন, পুষ্টিবিজ্ঞানী-দের কাছে এটা এখন বড় রকমের সমস্যা। তাঁদের বক্তব্য, দুধ মানুষের একটি আদর্শ খাদ্য। এ বস্তুটি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজনে যে-সব এলাকার মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে সেখানে সহজে পাঠানোও যায়। অপুষ্টি দূরীকরণের ব্যাপারে দুধ একটি অবলম্বন। এ সব কথা মনে রেখে দুধ খেলে কোন কোন মানুষ কেন অসুস্থ হয়, পৃথিবীর সব দেশেরই এ সমস্যাটি নিয়ে মিলিতভাবে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালান দরকার।

পুষ্টি নিয়ে আলোচনা

১১ জানুয়ারি কলকাতার ইনসটিটিউট অভ্ জুট টেকনোলজির কেনেডি হলে ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। পরিচালকদের ধন্যবাদ, গত বছরের মত এ বছরের এই সম্মেলনেও দেশের পুষ্টিসমস্যা দূরী-করণের জন্যে তাঁরা নতুনভাবে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন। সম্মেলনে এবার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল **পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা**।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ অমিয়কুমার বসু বলেন, ভারতে প্রোটিন-ক্যালোরি এবং ভিটামিন-এ জনিত অপুষ্টি এখন বড় রকমের সমস্যা। ভিটামিন-এ'র অভাবের দরুন শিশু-দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। এদেশে একজন মানুষ দৈনিক গড়ে স্নেহ-জাতীয় খাবার খেতে পায় মাত্র ৯ গ্রাম। এই পরিমাণ অদূরভবিষ্যতে যাতে ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম পর্যন্ত তোলা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া দুধের বিকল্প স্বরূপ সোয়াবিনের দুধ অথবা ডাব না খেয়ে নারকেল তৈরি করে সেই নারকেলের শাঁস বেটে যে দুধ বের হয়, বাচ্চাদের জ... মেশান আটা বা চালের গুঁড়ো না খাইয়ে সেটাও যদি খাওয়ান তাতেও অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়। তার খাদ্যমূল্য দুধের সমান না হলেও তার প্রা... কাছাকাছি।

ডঃ বসু বলেন, দেশে খাদ্যের পরিমাণ সীমায়িত, এ কথা যেমন ঠিক আবার এটাও সত্য, আমাদের চারপাশে নাগালের মধ্যে যে যে খাদ্যসামগ্রী রয়েছে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে চেষ্টা করলে তাদে... অনেক কিছুই আমাদের পুষ্টি সমস্যা মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে। এর জন্যে দরকার স্কুল থেকে শুরু করে সর্ব... শিক্ষা ব্যবস্থায় পুষ্টি বিষয়ক ... প্রাধান্য দেয়া। সবাইকে যদি অবহি... করা যায়, কী কী জিনিস স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার, নাগালের মধ্যে যে সব খাদ্য রয়েছে কী ভাবে তাদের কাজে লাগা... সম্ভব, সেক্ষেত্রে সীমায়িত সংস্থানের মধ্যে হয়ত অনেক কিছু করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় এদেশের বেশির ভাগ শিল্প সংস্থা জনসাধারণের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তাদের পুষ্টি সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হও... উচিত।

সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ড... পি. কে. বসু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকা... পুষ্টির মত জাতীয় এবং গুরুত্বপূ... সমস্যার সমাধানে চিরদিন কার্পণ্যই দেখি... এসেছেন।

আলোচনাচক্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুষ্টি বিষয়ক কাজকর্মে হাতে কলমে যা করছে বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে সেটাই প্রাধান্য পা... গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধোঁয়া... সৃষ্টি করে বক্তারা নিজের নিজের প্রতিষ্ঠা... কে কীভাবে কাজ করছেন, সে সবই তু... ধরেন। আমাদের বিশ্বাস, সরকারী দপ্ত... ওই দিনের আলোচ্য বিষয়গুলি যত্ন নি... একটু লক্ষ করলে নিশ্চয় লাভবান হবেন। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন ডঃ কে ... আচাইয়া, কল্যাণী পট্টনায়ক, ডঃ এস এ... চৌধুরী, সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনা... সি ডোরে, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, রেভারে... বিলাস দাস, এস কে সুর এবং ডঃ সত্যভা... কুমার মুখোপাধ্যায়।

সমরজিৎ কর

॥ আট ॥

ধুলো-কাদা মাথা, নিম্নাংগে একটি ান্য কাপড়ের টুকরোর আবরণ ছাড়া -শরীর মাতাল পুরুষটি দীর্ঘাঙ্গ না াও চওড়া দশাশয়ী, রীতিমতো পেশাল শক্ত। তার শরীরের ওজন সম্ভবত দবেশের দ্বিগুণ, এবং যে কারণে সে ়কর দহে পড়া হস্তীর মতো ভূমি থেকে) দাঁড়াতে অসমর্থ ও অশক্ত ছিল জর পায়ে শরীরের ভার রাখতে, এখন ই কারণেই অতি অসহায়তায় শরীরের গ্র ভার ত্রিদিবেশের ওপর ন্যস্ত করে। আর অসুস্থ মানুষের মধ্যে যে ব্যতি- থাকে, এক্ষেত্রেও সেইরূপ মত্ত ুষটির আলিঙ্গন ও ভার যেন ত্রিদি- শকে প্রতি পদক্ষেপে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ়ে চায়, যা মাতালের ইচ্ছাকৃত না। চুক্ত ক্লান্ত ত্রিদিবেশ রক্তাক্ত নগ্ন পায়ে জেকে সোজা রাখবার এবং দাঁতে দাঁত পে ভার সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টায় তে থাকে। লোকটির চিবুক ওর ড়ের নিচে, বুকের কাছে স্থাপিত— দচ শিথিল ও নড়বড়ে এবং সে যেন ছে, বলবার চেষ্টায় গোঙায়, আর লালা গে ত্রিদিবেশের গলায় এবং গোঙানির ঙ্গ তপ্ত নিঃশ্বাসও লাগে। অবাঞ্ছিত ই সব ঘটনাসমূহ কেমন করে ঘটে যায়, কল্পিত, আকস্মিক বৎসরাধিক কালের তীত মিথ্যাচারের পুনরোদ্ঘাটন, াড়ীলির অভাবনীয় উষ্মা ও ঘৃণা, িদিবেশের গভীর রাত্রে ঘর ছাড়া, উন্মত্ত সৈনিকদের হাতে স্ত্রীজ্ঞানে পুরুষের প্রতি াঞ্ছনা, এবং এখন এই মাতাল নরনারীর ার। অপ্রাকৃত বোধ হয় এবং ত্রিদিবেশের স্তব অবস্থাও যেন অপ্রাকৃত, কারণ ও কন স্ত্রীলোকটির অনুরোধ গ্রাহ্য করে ভয়াকে ঘরে পৌঁছুবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, ়জেও সম্যক জানে না। ও মুখ সরিয়ে খার চেষ্টা করে, যেন ঘ্রাণের মধ্যে লাকটির তপ্ত নিশ্বাসবাহী অম্ল ও কটু, ন গায় এবং গলায় লালার স্পর্শে গা ঘিনঘিনে ভাব আসে। লোকটির বাঁ হাত ওর পিঠের ওপর দিয়ে নাভির কাছে চেপে ধরা। কিছুটা চলার পরে ত্রিদিবেশ ওর ডান হাত নিষ্ক্রিয় রাখতে পারে না, ভার সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, অতএব ও লোকটির কুক্ষির নিচে দিয়ে তার কোমর ধরে রাখবার চেষ্টা করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্বস্তি হয়, স্ত্রীলোকটির অনাবৃত কটি ঊর্ধ্বে স্পর্শ লাগে। অস্বস্তির সঙ্গে অবাকও বোধ করে, ওর ঠাণ্ডা কনকনে হাতে স্ত্রীলোকটির কটি ঊর্ধ্বের অনাবৃত অংশ রীতিমতো উষ্ণ। এবং প্রকৃতপক্ষে, প্রায় অচেতন্য মাতালের খালি গা, এই শীতের রাত্রে যতোটা ঠাণ্ডা থাকা উচিত, তা নেই।

ওরা কারা? ত্রিদিবেশের মনে প্রথম জিজ্ঞাসাটি জাগে। হঠাৎ একটা কুকুর যেন পাতাল ভেদ করে একেবারে পায়ের কাছে ফুঁসে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। ত্রিদিবেশ প্রায় থমকে দাঁড়াতে উদ্যত হয়, নিচের দিকে তাকায়, কুৎসিত জানোয়ারটাকে দেখা যায় না। কিন্তু সে যেন পায়ের কাছে লেপটে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। স্ত্রীলোকটির প্রায় জড়ানো স্বর শোনা যায়, তু কে হো বেটা, হেই! জানত নাই কি হামি মঙ্গলি, জঙ্গল সর্দার কে বলিত যে রহবে কাঁহ? এ বাবা! বাবা হো!'

স্ত্রীলোকটি কাকে ডাকে? ত্রিদিবেশকে? যদি তা-ই হয়, ত্রিদিবেশ কোনো রকমেই জবাব দিতে পারে না। পুরুষটি মত্ততায় গোঙায়, অথবা গভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করে, ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না। স্ত্রীলোকটি কি কুৎসিত কুকুরের কাছে নিজের পরিচয় দেয়? ওর নাম কি মঙ্গলি? তার গলার স্বর আবার শোনা যায়, 'কুছু ডর নাই বাবা। পেড় ভরে মিট্টি হাসে, গারাজি মেঘ না বরষে।' বলে সে একটু শব্দ করে হাসে। তার পুটের খিল-খিল হাসি এখন কিঞ্চিৎ স্খলিত।

ত্রিদিবেশ অনুমান করতে পারে না, স্ত্রীলোকটি ভারতের কোন্ অঞ্চলের ভাষা বলে, তথাপি অবাঙালী শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে, ও জানে, পেড় মানে গাছ, মিট্টি মাটি। বাকি কথাগুলো আরো সহজসাধ্য। স্ত্রীলোকটি যেন খনার বচনের মতো ছড়া বলে, 'গাছ ডরায়, মাটি হাসে, গরজিত মেঘ বর্ষায় না।' সে কি ফোঁসা রোষা কুকুরের জাতের তুলনা দেয় এবং ত্রিদিবেশের ভয় নিবারণ করে? কিন্তু কুকুরটার এতো নৈকট্য, অথচ অদৃশ্য এবং ক্রুদ্ধ চিৎকারে মোটেই ওর ভয় নিবারিত হয় না। ও আর একবার নিচের দিকে তাকিয়ে গর্জমান পশুটিকে দেখবার চেষ্টা করে এবং তৎক্ষণাৎ ওর শরীরে আচমকা একটা ঝটকা লাগে, পুরুষটির খোঁচা-খোঁচা চুল ওর চিবুক গালে বেঁধে, স্ত্রীলোকটির অনাবৃত কটি-উর্ধ্ব শরীর হাতের ওপর চাপ দেয়, আর কুকুরটা যেন সহসা আঘাতে, ক্রুদ্ধ গর্জনের পরিবর্তে করুণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকটির খিলখিল হাসি শোনা যায়। হাসির মধ্যেই একবার উচ্চারিত হয়, 'শালে কমিনা। কুত্তেকা বাচ্চা।'...কুকুরের আর্তনাদ ও হাসির সঙ্গেই একটা ধাবমান ছুঁচোর তীক্ষ্ম ডাক শোনা যায়, চিক্ চিক চিকা চিকা।...কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত, ত্রিদিবেশ যেন ঢেউয়ের দোলায় বেসামাল হয়ে কণ্ঠলগ্ন শরীরের ভার ধরে রাখবার চেষ্টা করে। কুকুরের আর্তনাদ পিছন ফিরে উধাও হতে থাকে এবং শরীরগুলোর এই সহসা আন্দোলিত হয়ে ওঠার কারণ, স্ত্রীলোকটির কুকুরকে আঘাত করা ও হাসি, ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে। ও অবাক হয়, স্ত্রীলোকটি কেমন করে কুকুরটিকে এমন মোক্ষম ও নির্ঘাৎ আঘাত করতে সক্ষম হয়। স্ত্রীলোকটির উচ্ছসিত হাসি সংবৃত হয়, অতএব শরীরের অতি তরঙ্গ স্তিমিত হয়, এবং সে বলে, 'দেখা! এ বাবা। লাথসে মরে, হাত্ত মে পাকাড় য তো, হামি কুত্তে কো কাট দিবে ক হুঁ।'

কী অর্থ এই কথার? লাথিতেই ম হাতে পেলে সে কুকুরকে কামড়ে দি অভূতপূর্ব! এমন আশ্চর্য প্রতিকারে ব্যবস্থা ত্রিদিবেশের জানা নেই, যদিচ বিশ্বাস করে না, মানুষ কখনো কুকুর কামড়াতে পারে। কিন্তু কোথায়, অ কতো দূরে সেই জঙ্গাল সর্দারের বস্তি অসহ্য এই লালা নিস্বঃসরণ গলায় লাগ উষ্ণ নিঃশ্বাস আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। কার এরা? কোনো চটকলের শ্রমিক? মাতাল নর নারী রাস্তার ধারে এ দৃশ্য খুব আশ্চর্য বা বিরল না, যদিচ শীতের এই গভী রাত্রে এরকম দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা ত্রিদিবেশে কাছে নতুন। চটকলের শ্রমিক রমণীর ত্রিদিবেশের অভিজ্ঞতা, পুরুষ শ্রমিকদে মতো সুরাসক্ত না, বিশেষত বাইরে তাদের সাক্ষাৎ মেলে কচিৎ। পুরুষের ঘাড়ে জড়িয়ে ধরা, স্ত্রীলোকটির বাঁ হাত ত্রিদিবেশের রুক্ষ চুলের গোছা আলগোছে মুঠি পাকিয়ে ধরে, এবং আবার ছেড়ে দেয়। পুরুষের নিশ্বাসে অম্ল কটু গন্ধের সঙ্গে কাদা মাটির গন্ধ ঘ্রাণে আসে। ত্রিদিবেশের ডান হাতে স্ত্রী-লোকটির কটির উর্ধ্বে অনাবৃত পাঁজরের হাড় অনুভূত হয় এবং স্ত্রীলোক শরীরকে যথার্থ চিনে নিতে প পুরুষটির গোঙানি ঈষৎ দীর্ঘতর এবং গোঙানির মধ্যে ভাষা উ চেষ্টা যেন। স্ত্রীলোকটির স্বর শো যায়, হুঁ। যেন সে জবাব দেয়। পুরুষের গোঙানি তেমনিই শোনা যায় এবং স্ত্রী-লোকটির স্বর আবার তেমনি শোনা যায়, হুঁ। এবং কয়েকবার এই রকম গোঙানি ও জবাবের পরে স্ত্রীলোকটি বলে, 'কহো। মঙলি কি বহেরা বা?'

পুরুষটি হঠাৎ ত্রিদিবেশের ঘাড়ের ওপর থুবড়ে রাখা মাথা তোলবার চেষ্টা করে, যার অনিবার্য পরিণাম বাঁ কাঁধে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় ত্রিদিবেশকে পতনের উদ্যোগ থেকে ঝটিতি টাল সামলাতে হয়, কিন্তু পুরুষের মাথা তৎক্ষণাৎ আবার ওর কাঁধে থুবড়ে পড়ে, তার গোঙানির মধ্যে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, 'বাবা।'..

'হুঁ।' স্ত্রীলোকটি জবাব দেবার সুরে বলে, 'হামি তুরন্তে জান গেইল, বাবা বঙালি বা। বহুত বড় বাবা।'

পুরুষটির পা মাটিতে থমকে যায়, আবার তার মাথা ওঠে এবং 'হা-আ-আ।' শব্দে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, গোঙানো স্বরে উচ্চারিত হয়, 'রামজী বাবা।'...

'রামজী বাবা।' স্ত্রীলোকটি যার নাম মঙলি, এখন অনুমান করতে অসুবিধা হ

রুষের কথার প্রতিধ্বনি করে।
রুষটির মাথা আবার ত্রিদিবেশের ঘাড়ে পড়ে এবং ওর গলায় লাগা লালায় পুরুষটির গোঁফ এবং গাল একবার পিছলিয়ে যায়। ত্রিদিবেশের একটা বিশ্রী অস্বস্তি অনুভূত হয়, ও উঁচু দিকে তোলে। ওর কোমর কশা, পুরুষটির বাঁ হাত, ওর মেদ নাভির কাছে জামা চেপে ধরে, এবং এবং ধরা ছাড়া করতে থাকে। কেটি বাঁ হাত দিয়ে, আবার শের চুলের গোছা আলগোছে মুঠি ধরে, এবং ছেড়ে দেয়, এবং আবার 'তু শালে হামিকো জান খা লেইল্ কা মিসিন ভি এঁক্তু ওজন না হোইবে ইতে দারু তু পিন্না। শালে, ঘরমে কো বাচ্চা রহছে, জানবার মহছে— র কি গোদমে ছ্যগো বাচ্চা রহছে—' কথা শেষ করতে পারে না, কান্নায় ন্বেগে বা শুধুমাত্র গোঙানিতে তার ডুবে যায়। পুরুষটি তপ্ত নিঃশ্বাস করে, গোঙানো স্বরে উচ্চারণ করে ী বাবা।'...

ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না, জানোয়ার জানোয়ারের গোদ মে বাচ্চা, কাদের শ মণ্ডল বলে। যাত্রি কি শেষ হয়ে ? শীতের রাত্রের দীর্ঘ সময় স্তব্ধতায় সেই হাওয়ার মৃদু ঝাপটা লাগে, য ন উত্তর থেকে। ত্রিদিবেশ অতি ক্লান্ত, পি শীতের অনুভূতি এখন মোটেই বরং ও উষ্ণতা বোধ করে, নিশ্বাস ও দ্রুত, সম্ভবত কপাল ঘামে। এই য়, বাঁ দিকে একটি বেড়ার কাছে, অতি সলিতার লম্ফর আলো চোখে পড়ে। বেশ ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে। টি মানুষের মূর্তি, কোনো কিছুতে । আর একটু কাছে যেতে বুঝতে র মাথায় গামছা জড়ানো, গায়ে একটি া, মূর্তি বিরাট একটা কাদামাটির ঠাসাঠাসি মাথামাখি করে। তার নে একটি জলের বালতি, এবং বালতির শেই, অস্পষ্ট দেখা যায়, কাঠের নিশ্চল াতচক্র। মাথার ওপরে নিম গাছ।

ত্রিদিবেশ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, মনের বস্তি ইতিমধ্যেই পিছনে ক্রান্ত, কারণ, এটি মৃৎকর্মীর বস্তি, টর বাসন গড়ার কারিগর কাজ করে। মার মূর্তি পদশব্দে চমকায় ও মুখ রিয়ে তাকায়। সে কিছু জিজ্ঞেস করে না, ঠও দাঁড়ায় না, এবং কাদা মাটির তালে রেখে কেবল দেখতে থাকে, যদিচ দিক আলোর আড়ালে তার মুখের কোনো খা বা চোখ বা অভিব্যক্তি দেখা যায় না। দিবেশের মনে হয়, কুমোরের অনুসন্ধিৎসু াক দৃষ্টি ওকেই একমাত্র লক্ষ করে। ম্ভবত বাকি দুজন তার পরিচিত।

আগেকার দিনের বাচ্চাদের জন্যে ছিল সেকেলে পাউডার
আজকালকার বাচ্চাদের জন্যে
নতুন টেণ্ডার কেয়ার
কোমল ত্বকের জন্যে
নিখুঁত ভাবে বাফার করা
আপনার বাচ্চা সত্যিই খুব ভাগ্যবান। কারণ, আপনি তার কত যত্ন করেন আর তার জন্যে সবসময়ে সেরা জিনিসটি খুঁজে বার করতে আপনার চেষ্টার অন্ত নেই।
এখন আপনি পাচ্ছেন টেণ্ডার কেয়ার। এটি হ'ল শিশুদের জন্যে বিশেষ পাউডার যা বিজ্ঞান কৌশলের পদ্ধতিতে সযত্নে আগলে রাখে আপনার বাচ্চাকে। সেকেলে পাউডার বাফার করা হ'ত না, তাই বাচ্চাদের তুলতুলে গায়ে দাগ পড়ে যন্ত্রণা হ'ত। কিন্তু নতুন টেণ্ডার কেয়ার নিখুঁতভাবে বাফার করা। সেইজন্যে গায়ে চুলকানির দাগ ফুসকুড়ির হাত থেকে বাচ্চাদের এখন রক্ষে। তাছাড়া, টেণ্ডার কেয়ারে র'য়েছে ঘাম শোষার বাড়তি শক্তি। পাউডার লাগালে বাচ্চারা এখন আর কাঁদে না—হাসে। কত তফাৎ! টেণ্ডার কেয়ারে সবই সাবধানে নির্বাচন করা হয়েছে—রেশমের মত নরম ট্যাল্‌ক—এমনকি শিশু-কোমল গন্ধও। তাইতো এর নাম টেণ্ডার কেয়ার।
আপনার বাচ্চার জন্যে—আজই কিনুন।
NEW
COLGATE
tender care
BABY POWDER
For comfort & protection
MADE IN INDIA
আপনার বাচ্চার জন্যে মমতামধুর স্নেহাঞ্চল টেণ্ডার কেয়ার

ত্রিদিবেশ অতি শ্রান্তি ও পায়ের নিচে ব্যথা অনুভব করে, ব্যস্ত ও বিরক্ত হয়। কুয়াশার লম্বর স্তিমিত আলোর সীমানা অতিক্রম করে জিজ্ঞেস করে, 'আর কতো দূর?' কথা বলতে গিয়ে, শুকনো গলায় কথা যেন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না।

মণ্ডলি নিদ্রাকাতরতা বা আচ্ছন্নতার গভীর থেকে সহসা জেগে ওঠার চেষ্টা করে। এবং গোঙানো স্বরে বলে, 'হেই বাবা, কৃপা করে, অর দুইয়ে কদম।'

দুই কদমের কি শেষ নেই? প্রতিবাদ অর্থহীন, ত্রিদিবেশের সম্যক কোনো ধারণা নেই, কেন এই রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মাতাল দম্পতীকে ও পৌঁছে দেয়। কিন্তু কোনো বিতৃষ্ণাবোধ বা রাগ ওর মনে জাগে না। ও এখন বিশ্রাম চায়, বিশ্রাম এবং ঘরের আশ্রয় এবং বা এখন একান্ত অসম্ভব, খাদ্য। সে-অসম্ভবকে সম্ভব করার কোনো উদগ্র অনুভূতি ওর নেই, কিন্তু পা দুটো ঢেকে এমন জায়গায় একটু বসার দরকার, যেখানে হঠাৎ উত্থিত এই হিমেল হাওয়ার প্রবেশ পথ নেই। অথচ, ও এখনো অনুমান করতে পারে না, দুই কদমের দূরত্ব কতো, এবং কতোখানি পথ ফিরে গিয়ে লছমনের বস্তি।

'এ বাবা, রোখো, গড্ডার গাড়া বা হেনে।' মণ্ডলি বলে ওঠে।

তৎক্ষণাৎ একটি কুকুর ডেকে ওঠে, এবং মণ্ডলির সাবধান করা সত্ত্বেও, ত্রিদিবেশের এক পায়ের পাতা ঠাণ্ডা জলে ও কাদায় প্রবেশ করে, কারণ পুরুষটি সহসা ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে। এই ধরার কারণও, মণ্ডলি তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং ত্রিদিবেশ দেখতে পায়, একটি ছায়ার মতো মণ্ডলি নিঃশব্দে লাফ দিয়ে বাঁ দিকে যায়। সম্ভবত সেই গড্ডার গাড়া সে পার হয়। এবং অনতি উচ্চস্বরে ধমকায়, 'হেই, চুপ হো বেটা, আপন আদমিকো তু চিনহল্‌ না?'

কুকুরটার চিৎকার তৎক্ষণাৎ থামে এবং অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে কুকুরটা খুশি, ফোঁস ফোঁস শব্দে মণ্ডলির পায়ে পায়েই ছোটে। এই সময়ে দু'একবার বিলম্বিত এবং গম্ভীর স্বরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা যায় এবং যেন তারই জবাবে মণ্ডলির স্বর শোনা যায়, 'হুঁ হুঁ বেটি, আগেইলবানি। তোরি গোদ্ পর বালবাচ্চা কো কুছ দিক্‌কত নাই না?'

জবাবে আর একবার বিলম্বিত গম্ভীর 'আঁ' শব্দ ভেসে আসে এবং তারপরেই শিকল খোলার ঝনাৎকার। ত্রিদিবেশ ঠাণ্ডা পাঁকে-ডোবা পায়ে এক মুহূর্তের জন্য একটু আরাম বোধ করে এবং লোকটির ভারকে বজায় রেখে চেষ্টা করে পা তুলতেই রক্ত ফাটা পায়ের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে ওঠে। ও দাঁতে দাঁত চেপে মাটি থেকে পাটা যথা-সম্ভব আলগা করে চলতে চেষ্টা করে, যদিচ লোকটির ভার বজায় রেখে তা একান্ত অসম্ভব। পুরুষটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্নার মতো শব্দ করতে আরম্ভ করে এবং সে প্রকৃতই কাঁদে, কারণ তার কান্না-কম্পিত পেশিসমূহ ত্রিদিবেশের গায়ে চেপে চেপে বসতে থাকে, ওর শরীরও কাঁপে। সহসা এই কান্নায় ত্রিদিবেশ বিমূঢ় হয়ে পড়ে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না, কিংকর্তব্য চিন্তা করে। এই সময়ে ফোঁস ফোঁস শব্দে আবার কুকুরটা ছুটে আসে এবং হঠাৎ আবার ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে আরম্ভ করে। লোকটি তার শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞান, জানে না তার কান্নাকম্পিত কঠিন আলিঙ্গনে ত্রিদিবেশ যে-কোনো মুহূর্তে কাঁচা গভীর নর্দমায় পড়ে যেতে পারে। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু নর্দমা অতিক্রম করে এ-পারে আসে না। মণ্ডলির উচ্চ স্বর ভেসে আসে, 'এ কালুয়া, আ তুরন্ত।'

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ আবার থামে এবং মণ্ডলির স্বরের লক্ষেই সম্ভবত ছুটে যায়। একটি শিশুর কান্না ভেসে আসে, তার সঙ্গে মণ্ডলির ত্রস্ত আদরের স্বর, 'হুঁ হুঁ বেটা সমঝবানি। বিন চুচিয়া পিয়ে, জান শুক্ গেইল বা। লে-অব্ লে।' তার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর কান্না স্তব্ধ হয় এবং মণ্ডলির স্বর আবার শোনা যায়, 'এ বুধুয়া, থোড়ি হটকে শুত্ বেটা। হুঁ আই হুঁ হুঁ, বেটা তু এত্তি মুতোলবানি, সব ভিজ গেইল।'

স্পষ্টতই বোঝা যায় মণ্ডলি তার শিশুদের পরিচর্যা করে যদিচ আলোর বিন্দুও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু কি কর্তব্য এখন ত্রিদিবেশের? এই কান্না-দুরন্ত মাতাল পুরুষের কষ্টকর ভারি বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা? নিশ্চলতার জন্য শীতের অনুভূতি বাড়ে, উত্তরের হিমেল হাওয়ার থাবায় পলকে পলকে নখ দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ হতে থাকে।

'এ বাবা, শালাই বা কী? আন্ধার ঘর মে নাই মিলল।' মণ্ডলির স্বর দ্রুত কাছে এগিয়ে আসে।

ত্রিদিবেশের পকেটে দেশলাই কিন্তু পুরুষটির দ্বারা ও যে-ভাবে আলিঙ্গিত, পকেটে হাত ঢুকিয়ে তা বের করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি ও চেষ্টা করে এবং তখনই পুরুষটি হু হু কান্নার স্বরে বলে ওঠে, 'মণ্ডলি, রামজী হমার বাবা।'

ত্রিদিবেশ টের পায় কাঁচা নর্দমার এ-পাশে মণ্ডলি এক পা বাড়িয়ে দেয় এবং অস্পষ্ট দেখা যায়, ওর কোলে গায়ের কাপড় ঢাকা দেওয়া শিশু। ত্রিদিবেশকে অবাক করে দিয়ে মণ্ডলিও হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার স্বরে বলে ওঠে, 'তু কি বাতাইবে হো বুধুয়া কে বাবা। হামি জানত, বাবা রামজী বা।'

মণ্ডলির পেটেও সুরা বর্তমান কিন্তু তাকে ততোধিক মাতাল মনে হয়নি। এখন স্বামীর মাতাল কান্না কি তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়? অথচ এখন সে পুরুষটিকে আর 'শালা' বলে না, 'বুধুয়ার বাবা' সম্বোধন করে। ইতিমধ্যে ত্রিদিবেশ পকেটে হাত ঢোকাতে এবং দেশলাইটি বের করতে সমর্থ হয়। সম্ভবত মাতালের মতো চোখের জল ও মুখের লালায় ওর গাল ঘাড় বুক ভিজে যায়। কিন্তু ও দেশলাইটা মণ্ডলির দিকে বাড়িয়ে দিতে পারে না, কাঠি জ্বালানো তো অসম্ভব। ও পুরুষটির
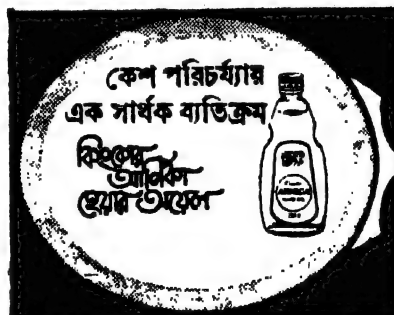
আলিঙ্গন থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে, এখনো ওর নিজস্ব ভাষাতেই বলে, 'দেখি, এই, দেশলাইটা দিতে দাও।'

'দো বাবা, হামিকো হাতমে পর দো।' মঙ্গলি হাত বাড়িয়ে ত্রিদিবেশের গায়ে হাত দেয় এবং পা থেকে হাতড়ে নিচের দিকে এনে, দেশলাইটি নেয়, কিন্তু তার গলার স্বরে কান্নার সুর। সে এপার থেকে পা তুলে নিয়ে ওপারে রাখে এবং সেখানেই বসে পড়ে বাঁ হাত থেকে কিছু একটা রাখে। বুকের শিশুকে ঠিক রেখে দু হাতে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালে, বাতাসে কেঁপে ওঠে শিখা। সে দ্রুত জ্বলন্ত কাঠি স্পর্শ করে কাছের কেরোসিনের ডিবের সলতেয়। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাতাস কম্পিত রক্তিম আলো ছড়ায়। মঙ্গলি ডান হাতে কেরোসিনের বাঁকা-নল ডিবে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ত্রিদিবেশ এই প্রথম মঙ্গলির মুখ অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পায়। কালো, কয়েকটি বসন্তের ক্ষত-চিহ্নিত মুখ, একটু বসা নাক, অনতিস্থূল ঠোঁট, কালো বড় দুই চোখের ক্ষেত্র লাল টকটকে এবং প্রকৃতই তার চোখের কোণে জল চিকচিক করে। বাতির শিখা বাতাসে কাঁপে। মঙ্গলির কাঁধে কোনো কাপড় নেই, এবং কণ্ঠার নিচও অনেকখানি উন্মুক্ত, বুকে স্তনপানরত শিশুকে ঢাকা দিতেই অবশিষ্টাংশ শেষ। কাপড়ে ঢাকা শিশুর অবয়ব স্পষ্ট, হাঁটুর একটু নিচে বর্ণহীন পাড়ের শাড়ি। কোমরের ওপরে কিছু অংশ অনাবৃত, কোমল এবং কঠিন সংমিশ্রিত শরীর এবং ত্রিদিবেশের ধারণা থেকে তাকে অনেক কম বয়স দেখায়। ত্রিদিবেশ বলে, 'এবার একে নিয়ে যাও।'

পুরুষটির আলিঙ্গন অকস্মাৎ অতি-মাত্রায় কঠিন হয়ে ওঠে এবং সে বালকের মতো ব্যাকুল কান্নার স্বরে বলে, 'নহি নহি, এ বাবা, গোড় লাগি বাবা, রামজী বাবা, এক্‌ঠো দফে ঘর'পর চলো।'

'কৃপা করো বাবা।' মঙ্গলি অতি উদ্বেগজনক ভাবে কেরোসিনের ডিবেসহ দুটি অনুজ্জ্বল পিতলের চুড়িসহ হাত জোড় করে।

ত্রিদিবেশ উৎকণ্ঠিত হয়, শিশুকে ঢাকা দেওয়া বুকের কাপড়ে কম্পিত বাতির শিখা না স্পর্শ করে। উভয়ের দূরত্ব অতি সামান্য। মঙ্গলি আবার বলে, 'ম আইসে করি তো বাবা, হম সবি কো বহুত পাপ হোইবে করি।'

'গোড় লাগি বাবা।' পুরুষটি বলেই, ত্রিদিবেশকে নালার ওপারে ঠেলে দেয়।

ত্রিদিবেশ কাঁচা নালায় পতন থেকে বাঁচবার জন্য চকিতে এক পা ওপারে বাড়িয়ে দেয় এবং মঙ্গলির স্বামী সহসা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মাতালের যা অনিবার্য পরিণতি, সে নালার মধ্যে পড়ে। নালা প্রকৃতপক্ষে অত্যধিক গভীর না, যদিচ মাতালের পতনে ময়লা কাদা ছিটকে যায়, এবং সে কোমর ভেঙে বসে পড়লেও ত্রিদিবেশের একটি পা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। যা ত্রিদিবেশের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। কিন্তু মাতাল বালকের মতোই কেঁদে বলে, 'পাপ না দো বাবা, গোড় লাগি, এক দফে ঘর'পর বৈঠবে করো বাবা।'

'আহ্‌, ফির গিরলবানি।' মঙ্গলি এই কথা বলে বাতিটি সেখানে বসিয়ে ছুটে ঘরের দিকে চলে যায়।

ত্রিদিবেশ বিপজ্জনক অবস্থায় নিজের শরীরের লাঞ্ছনার মধ্যেও মাতালের জন্য দুঃখবোধ করে। অতি দুঃখী বালক সদৃশই মনে হয়। বাতাসে কম্পিত বাতির শিখা মুমূর্ষু। মূর্ছিতপ্রায়। ও নিচু হয়ে মাতালকে আবার তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং বলে, 'আমার পা ছাড়ো, আমি পড়ে যাবো।'

লোকটি ওর পা ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে এবং নর্দমার মধ্যে পা চেপে ত্রিদিবেশের হাত সজোরে টেনে ধরে ওঠবার চেষ্টা করে। কুকুরটা হঠাৎ ছুটে এসে গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে, ব্যস্তভাবে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে। মঙ্গলিও দ্রুত এগিয়ে আসে, এখন বুকে শিশু নেই। আঁচল বুকের ওপর দিয়ে বাম কুক্ষিতলে চাপা। হাত বাড়িয়ে স্বামীর এক হাত ধরে নিচু হয়ে সেই হাতটি নিজের গলায় বেষ্টন করে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বামীকে সহ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ত্রিদিবেশও সেই সঙ্গে দুই হাতে স্বামীর হাত ধরে টান দেয়। কয়েকবার পিছলিয়ে যাবার পরে স্বামী উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হয় এবং বলে ওঠে, 'রামজী বাবা।'

ত্রিদিবেশ শ্রান্ত মহিষের মতো হাঁপায়। মাতাল পুরুষ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, আবার ওকেই দু হাতে জড়িয়ে ধরে। মঙ্গলির বুক থেকে আঁচল খসে যায়, বিরাট নত মাতৃ-বক্ষ, কিন্তু সেদিকে ওর চেতনা নেই। নিচু হয়ে দ্রুত হাতে বাঁকা-নল বাতি তুলে নিয়ে বলে, 'কৃপা করো বাবা।' বলে ত্রিদিবেশের একটি হাত ধরে।

ত্রিদিবেশ যেন অজ্ঞাত নির্দেশে এগিয়ে যায়। বাতি নিয়ে মঙ্গলি দরজার সামনে দাঁড়ায়, বুকে কাপড় তুলে দেয়। দরজার চৌকাঠ অতি নিচু, বাতির কম্পিত আলোয় সম্মুখে গুহার মতো মনে হয়। মঙ্গলি বাতি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। ত্রিদিবেশ মাথা নিচু করে ঢুকতে উদ্যত হতেই মঙ্গলির স্বামীর মাথা চৌকাঠে ঠুকে যায়। কিন্তু আবার নিজেই মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে টলে পড়ে। মঙ্গলি সরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ওর স্বামী ত্রিদিবেশের পা জড়িয়ে থেবড়ে বসে এবং বলে, 'দেওতা বাবা, হমারা সেবা লো।' বলে ওর ফাটা কাদা-মাখা রক্তাক্ত পায়ে মাথা চেপে ধরে।

ত্রিদিবেশ শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মঙ্গলি একটি মাটির দেওয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে বাতি রেখে ঘরের এক কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তুলে নিয়ে আসে একটি পাট করা গামছা। এগিয়ে এসে প্রথমেই ত্রিদিবেশের মুখ আর গাল মুছিয়ে দিতে থাকে। ত্রিদিবেশের ঘ্রাণে নতুন গামছার গন্ধ কিন্তু ওর নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, ওর শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। ও দেওয়ালে হাত রেখে আস্তে আস্তে পিছন দিকে হেলে পড়তে থাকে।

ক্রমশ

মুদ্রাস্ফীতি এবং অধ্যাপক মিলটন ফ্রিডম্যান

প্রথিতযশা অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক মিলটন ফ্রিডম্যান সম্প্রতি ব্রিটেনের Institute of Economic Affairs কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং এ জন্য প্রধান প্রয়োজন হল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য Quantity Theory of Money সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করে অধ্যাপক ফ্রিডম্যান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বা Quantity Theory of Money অনুসরণ করলে টাকার সরবরাহ কমালে জিনিসপত্রের দাম কমে, অবশ্য সে-ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। অধ্যাপক ফ্রিডম্যান তাঁর প্রবন্ধে যদিও ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন তবুও তিনি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা ভারতের ক্ষেত্রেও অনেকটা প্রযোজ্য। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে টাকার সরবরাহ কমাবার জন্য যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ-যোগ্য তার উপকরণ সবই আছে—তবুও যে এই উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না তার জন্য দায়ী হল সরকারের সুদৃঢ় ইচ্ছার অভাব। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারের অনীহার কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ফ্রিডম্যান বলেন,

"Ending inflation would deprive government of revenue it now obtains without legislation. Ending inflation would also have the side-effect of producing a temporary, though perhaps fairly protracted, period of economic recession or slowdown and of relatively high unemployment. The political will is lacking today to accept that side-effect."

অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের এই উক্তি ভারতের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রথমেই এ কথা বলে রাখা ভাল যে, টাকার সরবরাহ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভারত সরকার যেভাবে টাকার সরবরাহ কমাবার চেষ্টা করছেন তা দেশের বহু বিশিষ্ট অর্থবিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ঘাটতি অর্থ সংস্থানের পরিমাণ কমিয়ে এবং ব্যাংক রেট ও তৎসহ বাণিজ্য-মূলক ব্যাংকগুলির সব রকম সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে ঠিকই; তবে শুধু এভাবে যে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সফল হয়নি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি-আর-ব্রহ্মানন্দর নেতৃত্বে ভারতের এক শ্রেণীর অর্থবিজ্ঞানী SEMIBOMBLA (Scheme of the Economists for Monetary Immobilisation through bond medullions and blocked assets) সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন, তাতে দেশের প্রচলিত মুদ্রার অন্তত ৩০ শতাংশ আটকে রাখার প্রস্তাব আছে, কিন্তু ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেননি। যাঁরা অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের যুক্তি সমর্থন করেন, তাঁদের মতে হয়ত সরকারের এই নীতি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনীহার-ই পরিচায়ক। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয় বলেই মনে হয়। ভারত সরকারের দিক থেকে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা যে চলছে না তা নয়। তবে সরকারের এই প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হয়নি এটা অনস্বীকার্য। অধ্যাপক ফ্রিডম্যান যা বলতে চেয়েছেন তা হল, সরকার যদি আন্তরিকভাবেই মুদ্রা-স্ফীতির মূলে আঘাত করতে চান তবে তা করা অসম্ভব নয়; কেননা, সরকার জোর করে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতির সার্থক রূপায়ন করতে পারেন। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে "If monetary correction fails, the alternatives are runaway inflation or authoritarian enforcement of incomes." তাঁর মতে মুদ্রাস্ফীতির নীতি অনুসরণ করার যৌক্তিকতা নাই, কারণ বর্তমান পৃথিবীতে মুদ্রাস্ফীতি হলো সব অশান্তির মূল। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, মুদ্রা-স্ফীতির নীতি বর্জন করলে দেশে বেকার সমস্যা ও মন্দার লক্ষণ পরিস্ফুট হবে, এই যুক্তি বিশ্বের কোন কোন উন্নত দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও ভারতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতার মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বেকার সমস্যা তো ভারতের এখন স্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভারতে আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি তাকে Stagflation বলা চলে। মুদ্রাস্ফীতি যদি আরও চলতে দেওয়া হয় তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির গতি হঠাৎ রুদ্ধ হলে দেশে মন্দা দেখা দেবে; সুতরাং সময় থাকতেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে অধ্যাপক ফ্রিডম্যান মনে করেন।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হলেও কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি প্রতি-রোধের ক্ষেত্রে সরকারকে এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি। প্রথমেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা কি সবটাই মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে যাবার দরুণ সৃষ্ট হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলতেই হবে, বাজেট ঘাটতির দরুণ অতি-রিক্ত মুদ্রা সরবরাহ যেমন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ, অপরদিকে তেমনি উৎপাদনের খরচ-বৃদ্ধি, কালো টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, অত্যাবশ্যক সামগ্রী-গুলির বণ্টন নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, শিল্প-ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা ও খরাজনিত পরিস্থিতির দরুন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা থেকে কৃষি-উৎপাদনে পিছিয়ে থাকা, প্রভৃতিও মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। টাকার পরিমাণ হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত করা যেতে পারে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির মূলে যে-সব কারণ আছে তাতে সেগুলি সব দূর করা যাবে না। অধ্যাপক ফ্রিডম্যান মুদ্রাস্ফীতি প্রতি-রোধের জন্য যে সুপারিশ করেছেন তা যদি পুরোপুরি কার্যকর হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত করা সম্ভব হবে; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন হল উৎপাদনের পরি-মাণ দ্রুত বাড়ানো এবং তার সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

বার্ষিক যোজনায় আর্থিক সংগতির গুরুত্ব

যোজনা কমিশনের নতুন সহ-সভাপতি শ্রী পি এন্ হাকসার দেশের নিরবচ্ছিন্ন মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনায় বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা এবং সীমায়িত আর্থিক সংগতিকে আরও ভালভাবে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৪ সালে দেশের জিনিসপত্রের দাম গড়ে ২৩ শতাংশ বেড়েছে। যদি ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনা যেমন হওয়া উচিত তা রাখতে হয়, তবে ১৯৭৪-৭৫ সালে যা খরচ হয়েছিল (৪৪,৮৪০ কোটি টাকা) তা থেকে আনুপাতিক হারে খরচের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির পরি-

প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে যোজনা খাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হয়ত সম্ভব হবে না; সুতরাং প্রকৃত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে (জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায়) ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনায় বরাদ্দের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে কম হবে। দেশের উন্নয়নমূলক ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য মুদ্রাস্ফীতিকেই দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু এ-জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা যাবে তা নয়। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত উৎপাদন বাড়ানো দরকার,—এজন্য যোজনা কমিশন কৃষি, সার, বিদ্যুৎ, পরিবহণ কয়লা এবং তৈলানুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য সরকার যে উদ্দীপন, যোজনা কমিশনের বার্ষিক যোজনায় তা প্রতিফলিত হবে বলে আশা করা যায়। শ্রী পি এন হাকসারের প্রচেষ্টা যদি সফল হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি জর্জরিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যদি তাঁর নীতি ফলপ্রসূ হয় তবে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

সুব্রত গুপ্ত
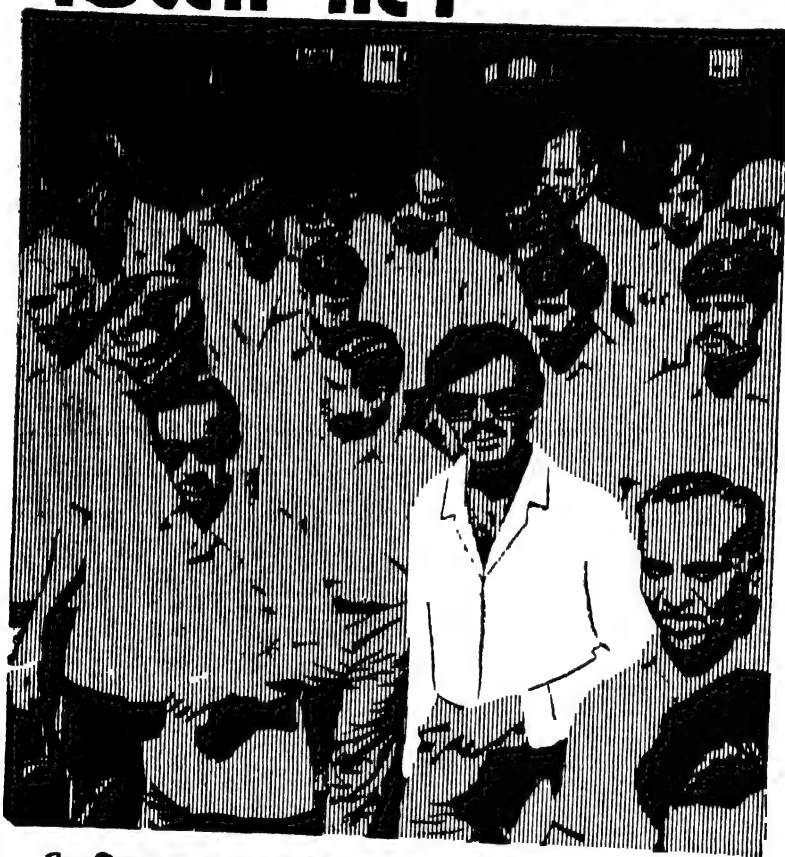
আলোচনা

সন্ন্যাসী ও বিপ্লব

গত ২৮শে ডিসেম্বরের দেশ পত্রিকার 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' কলামে শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি পড়লাম। ভারতীয় সমাজ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্পর্কে শিবনারায়ণের দু'একটা কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু শিবনারায়ণের পুরো কথা তাঁর নিজের ভাষায় না দেখলে কোন বিতর্কমূলক আলোচনায় যাওয়া যায় না। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণ আলোচনার জন্য আমার কথাগুলি পেশ করছি।

উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের বিবরণে শিবনারায়ণের মত বলে লেখা হয়েছে: কিন্তু সন্ন্যাসী সমাজসমাদৃত, আবার সমাজবিশ্লিষ্ট, তাই সমাজ বিপ্লবের পতাকা বহনের ভূমিকায় তাঁকে দেখার সম্ভাবনা ছিল না।' সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাটি অনৈতিহাসিক। বুদ্ধ হতে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত এঁরা সকলেই কিন্তু সন্ন্যাসী, এবং সামাজিক আন্দোলনে এঁদের অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। অসন্ন্যাসী ব্যতিক্রম আসামে শংকরদেব ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় রামমোহন। আর এই ব্যতিক্রমদেরও একটা জায়গায় সন্ন্যাসীদের সংগে মৌলিক সাদৃশ্য ছিল—তা হল ধর্মীয় পরিচ্ছদ। এমন কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ব্যক্তিটি ভারতীয় জনতায় ব্যাপক সম্পৃক্তি ঘটালো, সেই গান্ধীজীরও ধর্মীয় পরিচ্ছদ ছিল। তিনিও রামরাজ্যের কথা বলেছেন, প্রার্থনা সভা করেছেন, রামধুন গেয়েছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় (হিন্দু সমাজে অন্ততঃ পক্ষে) সমাজের পরিবর্তন আন্দোলনে যাদের ভূমিকা আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখেছি, তাঁদের অধিকাংশই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী তুল্য বা সন্ন্যাসী স্বভাবধর্মে অন্ততঃ খানিকটা অনুশীলিত। (গান্ধীজী সম্পর্কে নেংকেড ফকির কথাটা অনুধাবন যোগ্য।) আমি এখানে বিদ্যাসাগরের নাম আনছি না। কারণ, বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রমদেরও ব্যতিক্রম: বললে অত্যুক্তি হবে না, বিদ্যাসাগর অনন্যসাধারণ। তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন ও সমসাময়িক অনেকের সঙ্গেই তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল।

অবশ্য শিবনারায়ণ 'বিপ্লব' শব্দের কি অভিধা করেছেন, সেটা জানতে হবে। যদি বিপ্লব বলতে সমাজের অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কথা বোঝানো হয়, তেমন আমূল বিপ্লবের পতাকাধারী বৈপ্লবিক চরিত্র—অর্থাৎ ভারতীয় লেনিন বা ভারতীয় মাও সে তুং এখনো আমাদের সমাজ জন্ম দিতে পারেনি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইতিহাসেরই গর্ভে। আর যদি সামাজিক সংস্কার কার্যকে বা সংস্কার কার্যের প্রচেষ্টাকে বিপ্লবের অতি সাধারণ প্রাথমিক স্তর হিসেবেও গণ্য করা হয়, তবে উল্লিখিত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীতুল্য ব্যক্তিদের সংস্কারক ভূমিকা তো ছিলই এবং সেই অর্থে খানিকটা বৈপ্লবিক ভূমিকাও ছিল। সাধারণ ইতিহাস পড়ে তাই মনে

হয়। যদি এমন কোন তথ্য ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় যা এই যুক্তিগুলোকে মোচড় দিতে পারে, তবে সেটা খুব আকর্ষণীয় ও অনুধ্যানের যোগ্য হবে। প্রসঙ্গত আরেকটা কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিপ্লবের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ন্যাসীকুলের লক্ষ্য রেখেই বিচার, উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ব্যক্তিই প্রগতির পরিপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল হচ্ছেন। নিশ্চয়ই বিদগ্ধ শিবনারায়ণ এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত নন। তাছাড়া শিবনারায়ণ এই তত্ত্বের পরিপোষকও নন; কারণ আংশিক হলেও বাংলায় একটা রেনেশাঁ হয়েছিল তিনি তা স্বীকার করেন। সুতরাং কোন যুক্তিতে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার চৈতন্য, তারও সামান্য আগে আসামের শঙ্করদেব উত্তর ভারতের কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতির সামাজিক ভূমিকাকে বাদ দিয়েছেন? আর ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস থেকে বুদ্ধকে বাদ দেবার তো কোন উপায় নেই।

সন্ন্যাসীর সমাজ-বিচ্ছিন্নতাকেও মাপা দরকার। সামাজিক কোন কোন নিয়ম কানুন, আচার ব্যবহার — সন্ন্যাসীর

ক্ষেত্রে শিথিল হতে পারে, কিন্তু সেই শৈথিল্যও সমাজ অনুমোদিত ও স্বীকৃত। সুতরাং সন্ন্যাসীর সমাজ-বিচ্ছিন্নতা সমাজ বিপ্লবের পতাকা বহন করার পক্ষে তেমন কোন বাধা হতে পারে-না।

মৃণাল স্বামী বিদ্রোহের কেতন তুলে সে কেতন যদি শ্রীক্ষেত্রেই প্রোথিত করে, সন্ন্যাসী দর্শনের আবহাওয়ায়, সেখান থেকেই যদি স্বামীদের চক্রান্তজালমুক্ত হয়ে মৃণাল সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবে না বলে জানায়—তবে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব কাকে দিয়েছিল? কার পক্ষে সেটা সহজতর ছিল?

একথার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সমাজে একমাত্র সন্ন্যাসীরাই বিপ্লবের পতাকা বহন করার যথার্থ বাহক। কিন্তু সেই সঙ্গে সেটাও মানা যায় না যে, সমাজ বিপ্লবের ভূমিকায় সন্ন্যাসীদের দেখার সম্ভাবনা ছিল না বা থাকবে না। সামাজিক চাপ, অর্থনৈতিক টানা-পড়েন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের উপরই পড়বে। সেখানে সামাজিক দাবিকে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তিনি বা তাঁরাই বিপ্লবের পতাকা বহন করেন। তিনি সন্ন্যাসী হতে পারেন, হতে পারেন কেরানী, শিক্ষক বা শ্রমিক। অবশ্য এখানে যুগগত বিভাগ, অর্থনৈতিক পর্যায় ভেদে কোন শ্রেণীর লোক কখন সমাজ প্রগতির নেতৃত্ব দিতে পারেন সে প্রশ্নটা সঙ্গত কারণেই ওঠে। আর সেই প্রশ্নের বিচারে আমরা এইটুকু বলতে পারি, সন্ন্যাসীর যুগ ফুরিয়েছে। বস্তুতপক্ষে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পর অন্তত পূর্ব ভারতে সন্ন্যাসীকৃত আর কোন সামাজিক আন্দোলন ঘটেনি। এখন আমরা যাদের দেখছি তাদের কোন সামাজিক অবদান নেই, সামাজিক প্রয়োজনে এদের উপস্থিতি আবশ্যিক নয়। আজ সন্ন্যাসী যুগের শেষ হয়েছে, তার কারণ এই নয় সন্ন্যাসীরা সমাজ-বিচ্ছিন্ন। কারণ হল, আজকের সামাজিক বাস্তবতা, সামাজিক দায়-দাবির চরিত্র ভিন্নতর। আগের তুলনায় এর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং সন্ন্যাসী-সুলভ শুধুমাত্র ধর্মীয় বা নৈতিক শ্লোগান তুলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না।

বিজয়মাধব ভট্টাচার্য
করিমগঞ্জ, আসাম

বুদ্ধদেব বসু

দেশ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮১, আশরাফ সিদ্দিকী (ডক্টর) লিখিত মর্মস্পর্শী স্মৃতি-চারণটির জন্য পত্রিকা ও লেখককে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। লেখাটি পড়ে দুই চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল। আমি বুদ্ধদেব বসুর শুধু একজন ভক্ত পাঠকই নই, বুদ্ধদেব-খ্যাত "কৃষ্ণচূড়া ও রাধা চূড়ার রঙীন অভিনন্দনে" নন্দিত একই পুরানাপল্টনের স্থায়ী বাসিন্দা। দেশ (শারদীয়া, ১৩৮০) এবং বিশেষ করে এ স্মৃতিচারণটি পড়ার পর, আমরা, এখন কেউ আমাদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলি, —'বাড়ি?' বুদ্ধদেবের পুরানাপল্টন। এখন যেখানে এপার বাংলার প্রশাসনিক স্নায়ু-কেন্দ্র ইডেন বিল্ডিং, তার ডাইনে, 'দৈনিক বাংলা' অফিসের কাছেই এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ। বাড়ীটি এখনো আছে তবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত। আগামী কোন সময়ে সঙ্গত কারণে এখানেই হয়তো বসবে আন্তর্জাতিক প্রতিভার অধিকারী এই ঢাকাই-ফুলের স্মৃতি-সভা। কিছুদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্যকে ডক্টরেট, ডি-লিট প্রভৃতি মরণোত্তর উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছে ভবিষ্যতে পুরানাপল্টনের এই ঢাকাই-ফুলও যেন সম্মানিত হন (হয়তো হবেন) সে যুগের ঢাকা ও পুরানাপল্টন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট লিখে ঢাকা-পুরানাপল্টনবাসীদের চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, গ্রন্থ-বিখ্যাত করেছেন, কিন্তু ঢাকা-পুরানাপল্টনে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক এপার বাংলা ওপার বাংলার বন্ধুবর্গ খুব বেশী লেখেন নি (বর্তমান প্রবন্ধ ছাড়া) মনে হয়। এ সম্বন্ধে এপার বাংলা ওপার বাংলা তৎপর হলে এই দীন পুরানাপল্টন তথা ঢাকাবাসীদের আরও কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন কি?

মাহবুব সাদিক
পুরানাপল্টন, ঢাকা।

ওয়েস্টল্যান্ড ও এলিয়ট পরিবার

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ওয়েস্টল্যান্ড-পাউন্ড ও এলিয়ট পরিবার' (দেশ, ২৮শে ডিসেম্বর, '৭৪) রচনাটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। ১৯৭১-এ প্রকাশিত শ্রীমতী ভ্যালেরী এলিয়ট সম্পাদিত "The Waste Land—A Faccimile ane Transcript" গ্রন্থটির প্রসঙ্গে বাঙালী এলিয়ট অনুরাগীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

কাব্যসৃজনতত্ত্বের দিক থেকে এলিয়ট নিজে যদিও নৈর্ব্যক্তিকতায় (impersona-lity) বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি লেখক যথার্থই The Waste Land কবিতা আলোচনায় কবির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। কেননা কবি নিজেই কবিতাটির প্রকাশের আগে তাঁর মাকে লিখেছিলেন যে কবিতাটির মধ্যে তাঁর জীবনের অনেক কিছুই নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গেই লেখক হারভার্ড ও সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির অধীত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত, প্রাচ্য দর্শন ও ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখ কিন্তু করা হয়নি। মনে রাখা প্রয়োজন যে কবি ফরাসী সাহিত্য ও ভাষা অধ্যয়ন করার পর ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন এবং এই সময় ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথাও চিন্তা করতে থাকেন।

কবিতার তৃতীয় পর্বে প্রথম সত্তর লাইন পাউণ্ড বাদ দিয়েছেন এবং এলিয়ট মাত্র বারো লাইনের একটি টুকরো লিখে সেই শূন্য স্থান পূরণ করেছেন; আবার চতুর্থ পর্বের প্রথম বিরাশি লাইন "bad" বলে পাউণ্ড বাদ দিয়ে শেষের দশ লাইন রেখেছেন—Facsimile সংস্করণ দেখে লেখক এই তথ্যগুলি জানিয়েছেন। প্রথম ক্ষেত্রে লেখক মন্তব্য করেছেন যে সেখানে পাউণ্ডের প্রতি এলিয়টের "মৃদু ক্ষোভ" প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি "ক্ষুন্ন" হয়ে চিঠি লিখেছেন ওই দশ লাইনও বাদ দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন হল এলিয়ট "মৃদু ক্ষোভ" প্রকাশ করেছেন বা "ক্ষুন্ন" হয়েছেন মনে করা কি ঠিক হবে? চতুর্থ পর্বের শেষ দশলাইন কবির ১৯১৬ কিংবা ১৭ সালে লেখা "Dans le Restaurant" নামে ফরাসী কবিতার শেষ সাত লাইনের ইংরাজী ভাষান্তর (কিছু পরিবর্তন সহ)। শুধু এই অংশটিই নয় The Waste Land কবিতার অনেক অংশই কবির আগেকার লেখা কবিতার থেকে নেওয়া। যে জন্য তাঁর বন্ধু এবং কবি Conrad Aiken প্রকাশিত কবিতাটি প্রথম পাঠ করেই দেখেন যে তার অনেক অংশই তাঁর পূর্বপরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি মন্তব্য করেছেন

". . . I had long been familiar with such passages as, 'A woman drew her long black hair out tight,' which I had seen as poems, or part-poems in themselves. And now saw inserted into the waste land as into a mosaic."

খণ্ড বিচ্ছিন্ন এই সব কবিতাংশগুলিকে (১৯৪৬ সালে কবি 'Sprawling chaotic poem' বলে উল্লেখ করেছেন।) গ্রথিত করার সময় কবি কবিতাটির সামগ্রিক ঐক্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তাই তিনি চতুর্থ পর্বের এই লাইনগুলি শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা পাউনডের কাছে এই পরামর্শ চাইলেন। "না ওটা থাকবে" মর্মে পাউনড যে উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি ঐক্যসূত্রটিও ব্যাখ্যা করেছিলেন :

"I Do advise keeping phlebas. In fact I more'n advise Phlebas is an integral part of the poem; the card pack introduces him, the drowned phoen. Sailor. And he is needed ABsolutly where he is. Must stay in."

(নিতম্ব জোর ... জীবনতে পাউন্ডের বানান পরিবর্তন করেছেন।)

যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবি বন্ধু ক্লোভের সঙ্গে নিজের অভিমানবশত পাউন্ডের প্রস্তাব ... চাপে পড়ে নিজের সুন্দর কাব্যাংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় The Waste Land তাঁর অতি অপরিণত মনের রচনা। পাউন্ডের হাত ধরে এলিয়ট হাঁটতে শিখছেন—এই জাতীয় মন্তব্য করে লেখক সেই কথাই অবশ্য বুঝিয়েছেন। কবির যথার্থ প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্য তিনি The Waste Land-এর পরে লেখা তাঁর কবিতা, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ ইত্যাদির সাফল্যের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন কেমন করে যে The Waste Land লিখবার আগেই তিনি The Sacred wood-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি লিখেছেন এবং স্বয়ং পাউন্ডেরই মূল্যায়ন করেছেন Ezra Pound : his Metric and Poetry নামক রচনায়?

দান্তের উদ্ধৃতি (মহত্তর শিল্পী) দিয়ে কবি পাউন্ডকে কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন। ১৯৩৮ সালে জনৈক পাউন্ড সমালোচককে কবি জানাচ্ছেন :

"the phrase, not only as used by Dante, but as quoted by myself, had a precise meaning. I did not mean to imply that pound was only that : but I wished at that moment to honour the technical mastery and critical ability manifest in his work, which has also done so much to turn The Waste Land from jumble of good and bad passages into .a poem."

পাউন্ডের "tehnical mastery" এবং "critical ability"র প্রতি কবির আস্থা থাকায় তিনি তাঁর কবিতাংশ নষ্ট করে ফেলার স্বপক্ষে পাউন্ডের অভিমতের যৌক্তিকতাকে গ্রহণ করেছেন এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছেন। তাঁর এই যুক্তিকে তিনি সমর্থন করেছিলেন বলেই পাউন্ডের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছের ভূমিকায় কবি ঐ যুক্তির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

কবিতার উৎসর্গপত্রে লেখক 'দান্তের সেই উদ্ধৃতি' বলে যে উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন এবং যার 'সরল বাংলা মানে' জানিয়েছেন সেই উদ্ধৃতি কি দান্তের? রোমান লেখক Petronius-এর Satyricon নামক ব্যঙ্গ রচনায় Trimalchio নামে একটি চরিত্রের উক্তি কি এটি নয়?

প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক Facsimile সংস্করণে উদ্ঘাটিত তথ্যের আলোক এলিয়টের প্রথমা পত্নী ভিভিয়েনকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করেছেন। এই সব তথ্য যখন অপ্রকাশিত ছিল তখনও ভিভিয়েনের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন কাব্য শিল্প অনুরাগী মনস্বীরা; যে কারণে তাঁরা কৃতজ্ঞ আছেন বোদলেয়ারের প্রণয়িনী জান দ্যুভালের কাছে জান গণের প্রেমাস্পদ 'কব কাছে' অথবা কীট্সের প্রেমিকা ফ্যানীর কাছে। এরা কেউই তাঁদের স্বামী বা প্রেমিককে সুখ দেননি। নিজেদের প্রতিভার ... সৃষ্টিগুলি থেকে ... হতাম।

লেখক জানিয়েছেন ১৯৪৮ সালে ভিভিয়েনের মৃত্যুর বছরে এলিয়ট নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অমৃতসর

বিদেশী বই

আঠারো শ' সত্তরে রাশিয়ায় পপুলিস্টরা শ্রেণীবদ্ধ সমাজ এবং যাবতীয় য়ুরোপীয় কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে বিপ্লবী মত প্রচারে তৎপর ছিল। জারের দশকে বিপ্লবকে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে তারাই শাসক শ্রেণীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে বলেছিল, 'এখন বৃহৎ কর্তব্যে মেতে ওঠার সময় নয়।' চারপাশে তখন বেনিয়োজনের হুড়োহুড়ি, জগ্যা খা ন; প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কৃষকদের ব্যাপারে তাঁরা হন্দ হয়ে গেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রায় অচলাবস্থা, খবরের কাগজের আলাদা কোন ভূমিকা নেই, বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান শহরগুলোতে কে কত মদ খেতে পারে আর জুয়া খেলতে পারে তারই লড়াই চলে। বামপন্থী তরুণ চারণ-কবি নাদসন; যক্ষ্মায় তার দু' বুক ঝাঁঝরা, কেঁদে কেঁদে তার যুগকে জানিয়ে গেল, 'পথ নাহি পাই'। গোধূলিবেলার পান্থ চেখভ তখন উঠি-উঠি করছেন। বুকে তাঁর অসুখ নয়; তিনশ' বছরের আশা। এর মধ্যে পৃথিবীটা বদলাবেই। সর্বব্যাপী এই ভীষণ নীতির সংকট তলস্তয়কে আমূল বদলে দিয়েছিল ১৮৭৮ সালে। গণ-জীবনে তখন তাঁর দুরন্ত প্রভাব। তিনি অমোঘ আশ্বাস দিলেন হিংসা করো না, যুদ্ধ করো না, আত্মার আত্মীয় হও, রাজার রাজাকে খুঁজে পাও, হৃদয়ে বসাও। টিফলিস-এর ক'টি মেয়ে প্রশ্ন করল, সেই প্রশ্ন কাগজে-কাগজেও প্রতিধ্বনিত হল: আমরা এত সাধু-সাধু (স্বাদু-স্বাদুও বটে) জীবন কী করে যাপন করব? সেই সময় অর্থাৎ ১৮৮০ সালের বর্বর রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলেক-জান্দার উলিয়ানভ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবেশ করল। তার ছোট ভাই ভ্লাদিমির তখন সিমবিরস্ক হাইস্কুলের ছাত্র। দেখতে সে মোটেই ভালো নয়, বরঞ্চ তার চেহারায় আদিমতার ঝোঁক স্পষ্ট। চওড়া একরোখা কপাল, পুরু ঠোঁট, গালের হনু এবং নরুন চেরা চোখে এশীয় আভাস। শান্ত, সজীব মুখ কিন্তু বড় বেশি বন্ধ, আঁটসাঁট সেই মুখের ভাব। এই হল লেনিনের কিশোর বয়সের ছবি।

ট্রটস্কি দু খণ্ডে লেনিনের জীবনী লিখতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর প্রবল অর্থাভাব। ১৯২৪ সালে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, রাজনৈতিক গণজীবন ঘুচে গেছে, ইতিহাস থেকে তাঁকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেই সময় ম্যাক্স ইস্টম্যানের সঙ্গে তাঁর আলাপ। তখন থেকে তিনি ট্রটস্কির অন্তরঙ্গ অনুবাদক। তিন খণ্ডে বিপ্লবের ইতিহাস, রেভোলিউশন বিট্রেড এবং আনুষঙ্গিক প্রবন্ধ সবই ইস্টম্যানের অনুবাদ করা। ১৯২৯ সালে যখন ট্রটস্কি দেশচ্যুত, তাঁর পেছনে ফেউ লেগে আছে, তখন প্রধানত বইয়ের আয়ে তাঁর চলত। ১৯৩৪ সালের ২ নভেম্বর একটি চিঠিতে ইস্টম্যানকে তিনি জানাচ্ছেন : 'লেনিনের তরুণ বয়সের বেশি আমি আর এগোতে পারিনি।'

কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হল, কেননা তখন তাঁর টাকার টানাটানি। আগে তিনি স্তালিনে হাত দিলেন। এদিকে ইস্টম্যান এতদিনে 'লেনিনে'র বারোটি অধ্যায় অনুবাদ করে বসে আছেন—১৩, ১৪, ১৫ এই তিনটি অধ্যায় মোটে বাকি। এরপরই শুরু হয় পাণ্ডুলিপির রহস্যময় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। পাণ্ডুলিপি গায়েব হয়ে যায় ইস্টম্যান-এর ডাক থেকে। হতাশ অনুবাদক ধরে নেন, এ নির্ঘাত ট্রটস্কির ভয়ংকর শত্রুদের কাজ।

THE YOUNG LENIN by Leon Trotsky. Penguin Books. Price : 60P.

তাদের দুঃসাধ্য কিছু নেই। ছায়ার মতোই তারা শেষ রক্তপাত পর্যন্ত ট্রটস্কির সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

বিশ বছর পরের এক সন্ধ্যা। ইস্টম্যান বাচ্ছেন বেতার সম্প্রচারে। বিষয়: সোভিয়েত রাশিয়ার কোনও কোনও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ট্রটস্কি এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি উধাও হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সেই সঙ্গে নিজের সন্দেহটুকু জুড়ে দিতে ভুললেন না। দিন দুয়েক পরে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইটন লাইব্রেরি থেকে খবর হলো, কে বা কারা একটি পাণ্ডু-লিপি 'জমা' দিয়ে গেছে। এইভাবে হৃত সম্পত্তি ফিরে এলো কিন্তু তখনো শেষ তিন অধ্যায়ের খোঁজ নেই। ডাবলডের সঙ্গে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী সংস্করণ থেকে উধাও সেই তিন অধ্যায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা চলছে। এমন সময় ইস্টম্যানের ফাইল ফোলডারের জঞ্জাল থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এলো নিখোঁজ, অননুদিত শেষ তিন পরিচ্ছেদ।

একটি পাণ্ডুলিপির এই আকস্মিক হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসা বোঝাই যাচ্ছে, খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এ থেকে বহু রকম কথা উঠতে পারে, দুশ্চিন্তা হতে পারে। কে নিয়েছিল, কেন নিয়েছিল, কেন ফিরিয়ে দিল, রচনা ঠিক রইল, না চোলাই হল ইত্যাদি

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

প্রশ্ন ছাড়া ইস্টম্যানকেও লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। এই যেমন হচ্ছে ক্রুশ্চেভের আত্মজীবনী নিয়ে। কিন্তু বইটি পড়ার পর পাণ্ডুলিপি-ষড়যন্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা কঠিন। ট্রটস্কির লেখা রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, তাঁর লেখায় বিশেষ কয়েকটি চরিত্র-লক্ষণ আছে। এ-বইতেও তাঁর বিচক্ষণ যৌক্তিকতা, তাৎক্ষণিক ইতিহাসকে চিরস্থায়ী চেহারা দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যাবে। 'চিরস্থায়ী বিপ্লবে'র প্রবক্তার পক্ষেই সেটা সম্ভব। তরুণ লেনিনকে তিনি এ-বইয়ে সরাসরি নির্মাণ করেন নি, ১৭০৮ সালে পিটার দি গ্রেটের সময়কাল থেকে রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে তিনি ধীরে ধীরে নির্মাণ করেছেন। ১৮৬১ সালে দাসপ্রথা লুপ্ত হয় তার আগে পর্যন্ত মানুষ হাঁড়ি-কুড়ির মতো বিক্রী হত; গোগোলের 'বিদেহী আত্মাদের' দীর্ঘনিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত রাশিয়ার বাতাসে ভাসত। ১৮৮০ সালে নীতির চরম সংকট এবং বিদ্রোহের পূর্বাভাস, আলেকজান্দার জারকে হত্যার চেষ্টায় আলেকজান্দার উলিয়ানভ-এর ফাঁসি যাওয়া, ১৮৯১-৯২র ভীষণ আকাল ও দুর্ভিক্ষ; চিন্তার রাজ্যে প্লেখানভ, মার্কস, বাকুনিন-এর প্রভাব, কাজান ও সামারায় থাকা ও লেখাপড়া করা—এইসব বিভিন্ন অবস্থা এবং আবহাওয়ার মধ্য থেকে তরুণ লেনিন একদিন আপন প্রত্যয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। ট্রটস্কি নিজে যোদ্ধা, জন-নায়ক, তাছাড়া ইতিহাস তাঁকে লিখেছে। অথচ লেনিনের সরকারী জীবনী-কাররা সযত্নে জানিয়ে গেছেন যে, তিনি বংশসূত্রে বিপ্লবী এবং মায়ের পেট

থেকে পড়েই মার্কসবাদী। ট্রটস্কি ধাপে ধাপে ইতিহাসকে গড়ে তুলেছেন, সেইসঙ্গে আবশ্যিকভাবে তরুণ লেনিনকেও গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। কেননা, লেনিন ইতিহাসের স্রষ্টা। অন্যদিকে যারা মার্কসবাদ এবং লেনিনকে নিয়ে চটুলতা করতে চেয়েছে, তাদেরও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। আইভান বুনিন-ই প্রথম রুশ সাহিত্য-শিল্পী যিনি নোবেল পুরস্কার পান, বিদেশে আশ্রয় নেন। সেই বুনিনের কথা তিনি বলেন নি। আরেকজন কুপ্রিন। বাইরে তাঁকে 'জ্যাক লণ্ডন' বলা , হত, বুনিনের তুলনায় বহুতর নিকৃষ্ট লেখক তিনি, শেষ দিকে হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করেন লেনিনের চোখ ছিল সবুজ, বাঁদরের মতো।' ট্রটস্কি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এ-কল্পনা উগ্র উদ্দেশ্যপ্রসূত। পশ্চিমী জীবনীকার রবার্ট পেইনের ধারণা, লেনিনের শরীরে এক ফোটা রুশীয় রক্ত ছিল না। ট্রটস্কি তেমন ধরে কিছু বলেন নি। ইটারকহব, জোলোতজাহব-এর কুৎসা-প্রচারকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। আবার, লেনিন ও রাশিয়ার সব কিছুতে যারা শুধু জ্যোতি ও প্রভা দেখতে পেয়েছে, তাদেরও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি।

দাদার শোচনীয় মৃত্যু, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে যাওয়া, অগাধ পরিশ্রম ও পড়াশোনা—সত্তেরো থেকে তেইশ বছর বয়স। লেনিনের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। তখনি তরুণ লেনিন বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন। বই আর জীবনের মাঝখানে পাঁচিল রইল না। মার্কসবাদকে তিনি তখন থেকেই ছুতোরের বাটালি, তুরপুনের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ট্রটস্কি তরুণ লেনিনকে এখানেই ছেড়ে দিয়েছেন।

অসিত গুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

The Indian National Movement. An Outline by Dr. Nemai Sadhan Bose : Firma K. L. Mukhopadhyay, 257-B B. B. Ganguly St., Cal-700012. Price : Rupees Fifteen

কোনো কোনো বিষয় কখনো পুরোনো হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকের কাছেও তেমনই একটি বিষয়। স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের তিন খণ্ডে লিখিত 'হিসটরি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয় নিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ। ঐতিহাসিক, ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের জন্য এ-নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও কৌতূহলী পাঠক-সাধারণের ও প্রবেশার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে তথ্যভিত্তিক সুরচিত একটি গ্রন্থ ছিল অপেক্ষিত।

সুখের কথা, ডক্টর নিমাইসাধন বসু তাঁর 'দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্ট' গ্রন্থটি কৌতূহলী পাঠক সাধারণের ও প্রবেশার্থী ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ রেখেই লিখেছেন। ভারতের জাগরণ ও সেই সূত্রে বাংলার ভূমিকা নিয়ে তাঁর বিস্তৃত গবেষণাগ্রন্থ ও রচনাদি আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি যা চেয়েছেন, তা তিনি পেরেছেন।

মাত্র দেড়শো পৃষ্ঠার পরিসরে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক রেখালেখ অংকন করা সহজ কথা নয়। আলোচ্য বিষয়ের ওপর ভালো দখল না থাকলে এই ছবি হতো বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। অধ্যাপক বসু অধ্যায়-পরিকল্পনায় ও তথ্যবিন্যাসে তৃপ্তিকর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব, জায়মান জাতীয়তাবাদ, কংগ্রেস-যুগের সূচনা, স্বদেশী ও স্বরাজ, একজন নতুন নেতা ও একটি নবযুগ, স্বাধীনতার পথে চূড়ান্ত পদক্ষেপ—এই ছটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। পাঠকসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখলেও গ্রন্থকার প্রয়োজনীয় তথ্য চয়নে কার্পণ্য করেন নি। সেইজন্যই দেখি, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলন থেকেই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকাল গণনা করতে সঙ্গতকারণেই অনিচ্ছুক। হিন্দুমেলার (১৮৬৭) কথা তো তাঁর মনেই আছে, মেদিনীপুরে স্থাপিত (১৮৬৬) জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার উল্লেখ করে তিনি বস্তুনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন, আবার মাদ্রাজের মহাজন সভার (১৮৪৪) উল্লেখ না করলে তথ্যবিন্যাস হতো একদেশদর্শী। 'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৮৫৭) ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ ক্ষেত্রে ডক্টর বসু ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন-এর মধ্যপন্থী বিশ্লেষণকেই বহুলাংশে স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে সিপাহী বিদ্রোহের ভূমিকা অস্বীকার করা উচিতও নয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল অ্যাডাম যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করে অর্ডিনান্স জারি করেন, তখন রামমোহনের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকেই ভারতের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনরূপে গণ্য করা যায়, এই সংবাদও গ্রন্থকার জানিয়েছেন আমাদের।

এইভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বহু তথ্যই বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হয়েছে। আবার সংক্ষেপ-অবলম্বনের আনুষঙ্গিক অতৃপ্তিও থেকে গেল। বন্দে মাতরম্ পত্রিকা প্রসঙ্গে শুধু অরবিন্দ কেন, রাজা সুবোধ মল্লিক ও বিপিনচন্দ্র পালের নামও উল্লেখ করলে ভালো হতো। অবশ্য, রচনায় ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত পাঠক-সাধারণের বিশ্বস্ত সঙ্গী হতে পারছে : এখানেই সমালোচকের তৃপ্তি। লেখকেরও।

উপন্যাস

নিরুপায় মনের আকাশ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রামায়ণী প্রকাশ ভবন ১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একসময়ে 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন, শ্রমিক জীবন নিয়ে তিনি বলতেও পারেন সুন্দরভাবে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবার শ্রমিক জীবনকে কেন্দ্র করেই এই ছোট উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন যদিও আগের মতো বিশাল পটভূমি নেন নি। নীপা রায়ের চরিত্রটিতে আজকের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং লেখকের দরদী মন এই চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়ক হয়েছে।

উপন্যাসটির আঙ্গিক একটি দীর্ঘ পত্রের। পত্রটি লিখেছেন নায়িকা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই পত্রের মাধ্যমে নায়িকা তার জীবনের কথা লেখককে জানিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন তিনি যেন নায়িকাকে নিয়ে কিছু লেখেন। কিন্তু চিঠিটি শেষ পর্যন্ত তারাশঙ্করবাবুর কাছে পৌঁছয়নি, এই উপন্যাসের লেখক গৌরীশঙ্করবাবুই সেই অসমাপ্ত কাজটি করেছেন। অর্থাৎ, শ্রমিক কন্যা নীপা রায়কে নিয়ে তিনিই লিখেছেন উপন্যাসটি।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খুব সজ্জিত চেহারায় বই শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের কল বিদ্যুৎ কলকাতা (পশ্যোরী প্রকাশনী, কলকাতা ২৭, চার টাকা)। দুটি ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, অনুবাদে সিদ্ধহস্ত শুভরঞ্জন ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বাঙালীর ইংরেজীতে কবিতা লেখার ঘটনা যতই স্মার্ট ব্যাপার হোক, একটু খাপছাড়াও যেন মনে হয়।

শুভরঞ্জনের এই বইতে একটি কাব্যনাটিকা, একটি দীর্ঘ কবিতা এবং বাইশটি ছোট কবিতা জায়গা পেয়েছে। শুভরঞ্জন শব্দের দিক থেকে বেশ ঝকঝকে, আধুনিক। বোঝাই যায়, তিনি নিজের মতো ভাবনায় বিশ্বাসী। তিন প্রগাঢ় কবিতা তিনি একটিও লেখেননি। তাঁর শব্দচয়নেও, সে-কারণে, নিজস্ব প্রবণতার ছাপটি স্পষ্ট। 'রজতরাত্রি', 'ম্যাবিকনের বাগান', 'পারস্য আয়নে', স্বনির্বাচিত নিঃসঙ্গতা', 'মেকী-মধ্যান্তর' 'ক্ষুদ্রে মিনার', 'মিথুনে গোধূলি', 'সাঁইকু উকীব', 'আর্জনাচুম্বন'—এই ধরনের উজ্জ্বল অব্যবহৃত বহু শব্দ তাঁর কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। একঘেয়ে শুকর-আধ্যর ব্যবহৃত শব্দাবলীর পাশে এই নতুন চয়ন কাব্যপাঠককে স্বাদ-বদলের সুযোগ দেয় বলা বাহুল্য।

তবে শব্দ যেমন তাঁর কবিতার অন্যতম উপকরণ, ছন্দকে ততটাই অনিবার্যভাবে কাজে লাগাতে পারেননি শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর বেশ কিছু রচনাতে ছন্দ-একটু নড়বড়ে, বিশেষত যেখানে স্পষ্টত প্রচলিত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে। উদাহরণত 'ভিলানেল' নামের দুটি কবিতা নেওয়া যেতে পারে। চৌপদীতে অক্ষরবৃত্তে রচিত ভিলানেলের (প্রথমটি) দ্বিতীয় পংক্তি 'আনত পল্লবকে চোখ বন্ধ করে'। এখানে কোনোমতেই 'আনত পল্লবকে' আটমাত্রায় পড়া যায় না। 'সন্ধ্যাবিন্দুর', 'জাগ্রত পল্লবেই' সম্পর্কেও একই আপত্তি। স্খলিতকেশপাশ' 'দৌড়ে প্রহরে' 'রজতরাত্রি' —দ্বিতীয় ভিলানেলের এই জাতীয় শব্দেও একটু বেশী স্বাধীনতা নিতে চেয়েছেন তিনি। অক্ষরবৃত্তের বিশ্লেষ-ক্ষমতা অনস্বীকার্য, কিন্তু তারও মাত্রা আছে। তাছাড়া, এখনকার ঝোঁক অক্ষরবৃত্তের মাত্রা চুরির দিকে। সেক্ষেত্রে এই উল্টো ঝোঁক সমর্থনযোগ্য নয়।

● অসিত পালের স্কেচ এ-বইয়ের অন্যতম মনোহরণ সংযোজন।

*

প্রথম খণ্ডে ছিল উত্তরখণ্ড ও রাজস্থান ভ্রমণের দীর্ঘ বর্ণনা। তীর্থপথে-র দ্বিতীয় খণ্ডে (সাহিত্যকল্প, কলকাতা ১২, আট টাকা) তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছেন সৌরাষ্ট্র-মহারাষ্ট্র ও মধ্যভারত পরিভ্রমণের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত। খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত এই ভ্রমণ কাহিনীর পরিকল্পনা খুব অভিনব কিছু বলা যাবে না। তবে রচনার স্বাদে তারতম্য থাকেই।

দ্বারকা থেকে খাজুরাহ পর্যন্ত অনর্গল ভ্রমণের এই গ্রন্থ তারকনাথবাবু খুব আটপৌরে ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি লক্ষ তাঁর স্পষ্ট, বিভিন্ন জায়গায় কৌতূহলকর দ্রষ্টব্য স্থান সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করে ভ্রমণকারীদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলা। সে-কাজে তিনি নিশ্চিত সফল। তবে কিনা, অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বইটিকে আর-একটু সংক্ষিপ্তায়তন নিঃসন্দেহে করা যেতো।

*

হৃদয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী মন্দিরতলার মন্দির (প্রাপ্তিস্থান : সরোজিনী প্রকাশনী, কলকাতা ১২, চার টাকা) পাঁচ অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। বহু প্রাচীন এক মন্দির থেকে চুরি হল নারায়ণের বিগ্রহ। তারপর থেকেই ইন্দ্রনারায়ণের বংশে একের-পর-এক ভাঙনের পর্ব। শনি ও রাহুর দৃষ্টিতে নানা দুর্বিপাক ঘটার পর মন্দির-সংস্কারের দায়িত্ব নিলেন উত্তরপুরুষ শিবশঙ্কর। গ্রহের পুজার এই ব্যবস্থায় দেবতারা তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ জানালেন।

চড়াসুরের এই নাটকে ভক্তিরসেরই প্রাধান্য। কিছুটা যাত্রার আঙ্গিকে রচনা। এ-ব্যাপারে যাঁদের উৎসাহ রয়েছে, তাঁদের ভালো লাগবে লেখাটি।

বিশ্ব যজ্ঞের দুই প্রধান পুরোহিত

ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ থেকে ১৬ রিখ পর্যন্ত কলকাতায় ৩৩তম বিশ্ব ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ছে। এই বিশ্ব প্রতিযোগিতার জনাই া সরকারের আনুকূল্যে প্রায় দেড়কোটি া ব্যয়ে ইডেনে তৈরী হয়েছে সর্বা- নিক সুরম্য একটি ইনডোর স্টেডিয়াম ং তারই পাশে কাঠের পাটাতনের উপরে বিস্তৃত প্র্যাকটিস হল। স্টেডিয়ামের ম হয়েছে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম, কটিশ হলের নাম করা হয়েছে শহীদ দিরামের নামে।

কলকাতা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ও লাধুলোর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ই অনুষ্ঠান, যেখানে যোগ দিতে আসছে টি দেশের প্রায় ৮০০ খেলোয়াড় এবং য় তিন-চারশো বিদেশী অভ্যাগত, সেই নুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাধারণ সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন। ল যেতে পারে ইডেনের টেবিলের উপর রাজ বিশ্বের আমন্ত্রণ এবং বিশ্ব প্রতি- যোগিতা বিশ্ব যজ্ঞের মতই এক মহা নুষ্ঠান। এই যজ্ঞে আচার্য, গুরু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, স্বামী, ঋত্বিক, সৈন্য সামন্ত সবারই প্রয়োজন। তবে প্রথম প্রয়োজন হয়েছে কয়েকজন পুরোহিতের যাঁরা নীরবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞকর্মের প্রাথমিক কাজগুলি সম্পন্ন করছেন।

যেহেতু টেবল টেনিসের বিশ্বযজ্ঞ হচ্ছে ভারতে, সেহেতু সর্বাপেক্ষা দায়িত্ব ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশনের। কিন্তু যজ্ঞস্থান কলকাতা বলে সংগঠন, কাজকর্ম এবং ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব তার বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উপরে।

খেলাধুলার যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে এই সংস্থাটিকে সবচেয়ে সুসংগঠিত, সুষ্ঠু এবং সুখী পরিবার বলা যায়। শক্ত হাতে সংগঠনটির হাল ধরে আছেন দুজন—সহ-সভাপতি প্রবীর মিত্র এবং সম্পাদক গোপীনাথ ঘোষ। নিরলস এবং নিষ্ঠাবান কর্মীরও অভাব নেই। কার কথা বলব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দায়িত্ব মাথায় পড়ার পর স্টেডিয়াম তৈরির স্থানে ভূমিপূজা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেখছি দিন রাত হাসিমুখে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন আর নারায়ণ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, রথীন বসু, রবি চ্যাটার্জী, আশিস মিত্র, অনিল দাশগুপ্ত, সমীর মুখার্জী, সরোজ ঘোষ, অসীম দে প্রভৃতি কাউন্সিল সদস্যরা। কোন কাজে কারো কণামাত্র দ্বিধা বা বিরক্তি নেই, মুখে কথা নেই। বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সবাই যেন পূর্ণ সচেতন। সবাই যেন কর্মযোগী। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সব কাজ এগিয়ে চলছে। ঘড়িতে ঠিকভাবে দম দিয়ে যাচ্ছেন প্রবীরবাবু ও গোপীবাবু।

একটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্য অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বিদেশী খেলোয়াড়দের আতিথ্য দানের প্রশ্ন রয়েছে, নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে, যানবাহন, প্রতি- যোগিতা পরিচালনা, প্রচার, পরিচর্যা, টিকিট বিক্রি, গেট ম্যানেজ, গাইড ও দোভাষীদের আচার আচরণ প্রভৃতি নানা প্রশ্ন রয়েছে। সুতরাং খুঁটিনাটি ব্যাপারে পান থেকে চুন খসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বেঙ্গল টেবল টেনিস সংস্থা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যেভাবে কাজ করে চলেছে তাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্যই আশা করা যায়।

কলকাতায় খেলাধুলার এই বিশ্বমেলার আয়োজনে প্রবীর মিত্র এবং গোপীনাথ ঘোষের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দু বছর আগে সেরাজেভো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিল— ৩৩তম চ্যাম্পিয়নশিপ হবে ভারতে, তখন থেকেই ওঁরা দুজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—বিশ্বের ক্রীড়ামানচিত্রে কলকাতাকে নতুন করে চিহ্নিত করতে হবে।

দাবিদার ছিল অনেক শহরই। বিশেষ করে দিল্লি, বোম্বাই এবং বাঙ্গালোর। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশনকে ৫ লক্ষ টাকা দান হিসাবে দিতেও সম্মত ছিলেন। ওই প্রয়োজন এবং রাজধানীর দাবি কাটাতে প্রবীরবাবু ও গোপীবাবুকে পর্দার অন্তরালে অনেক কিছু করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি রয় ইভান্স সরেজমিনে স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতে আসার আগেই ওঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন এবং দুজনে কদিন ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। একটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খুঁটিনাটি বিষয় সহ যা কিছুর প্রয়োজন সব কিছু ছিল ওই পরিকল্পনার মধ্যে। কলকাতায় কত হোটেল আছে। কোন হোটেলে কত খেলোয়াড়ের স্থান সংকুলান হবে। কোন হোটেলের চার্জ কত। যানবাহনের কি ব্যবস্থা করা যাবে। যদি অল্প সময়ের মধ্যে ইডেনে স্টেডিয়াম খাড়া না হয়ে ওঠে তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কি করা হবে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় কলকাতার তাপমাত্রা এবং আবহাওয়া কেমন থাকবে। কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থান, তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। খেলাধুলায় কলকাতার জনপ্রিয়তার বিবরণ প্রভৃতি সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে দুজন এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন। রয় ইভান্স দিল্লি, বাঙ্গালোর হয়ে কলকাতায় এলেন গত মার্চ মাসের ১৪ তারিখে। অ্যাসেম্বলি হাউসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। স্টেডিয়াম তৈরি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতায় তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। সন্দেহ ছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে। পরিষ্কার বলেছিলেন—৮ মাসের মধ্যে স্টেডিয়াম তৈরি করবে? আমরা তো সাহস পাই না। তাছাড়া শুনেছি তোমাদের দেশে কাঁচা মালের অভাব আছে। অভাব আছে লোহা সিমেন্টের।

ওয়েলসের নাগরিক ইভান্স আবার দিল্লি ফিরে গেলেন। ১৬ মার্চ ওখানে বসল ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভা, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের স্থান নির্বাচনের প্রশ্নে। ইভান্স সেখানে উপস্থিত এবং তাঁর মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইভান্স কলকাতার পক্ষে এত জোরাল যুক্তি উত্থাপন করলেন যে কারো কোন যুক্তিই ধোপে টিকল না। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতির এই যুক্তির পেছনে কি ছিল? ভারতীয় সংস্থার সহ-সভাপতি প্রবীর মিত্রের ওই প্রতিবেদন, গোপীবাবুর সঙ্গে বসে যেটা তাঁরা আগেই তৈরি রেখেছিলেন। রয় ইভান্স এবং প্রবীর মিত্র দিল্লিতে একই হোটেলে উঠে- ছিলেন। ওই প্রতিবেদনে কলকাতা সম্পর্কে সব কিছু বোঝাতেও পেরেছিলেন ইভান্সকে। যার ফলে পরে ইভান্স বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, কলকাতার ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে না উঠলেও বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মত অস্থায়ী ছাউনির নিচেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা হতে পারে।

শুধু কি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আদায় করেই প্রবীরবাবু, গোপীবাবুরা নিশ্চিন্ত ছিলেন? স্টেডিয়ামের জন্যও লেগে ছিলেন সরকারের পেছনে। সরকার টেন্ডার ডাকার আগেই চারটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে আগ্রহী করে তাঁদের দিয়ে স্টেডিয়ামের নকশা ও ব্লু প্রিন্ট পেশ করিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের কাছে, যাতে তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করা যায়। তারপর ভূমি পূজা থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম প্র্যাক্টিস হল ও নেতাজী

স্টেডিয়ামের উদ্বোধন পর্যন্ত রাতের তন্দ্রার মধ্যেও দুজনে দেখেছেন স্টেডিয়ামের স্বপ্ন। "সত্যিই ভাল করে ঘুমুতে পারিনি, একটা দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটিয়েছি"—দুজনেরই স্বীকৃতি। "আর এখন তো রাতের নিদ্রা, দিনের আহার নামে মাত্র। ভাল করে ঘুমোবো ১৬ ফেব্রুয়ারির পর।"

প্রবীর মিত্র এবং গোপীনাথ ঘোষের এই আন্তরিকতার মূলে রয়েছে খেলাধুলো
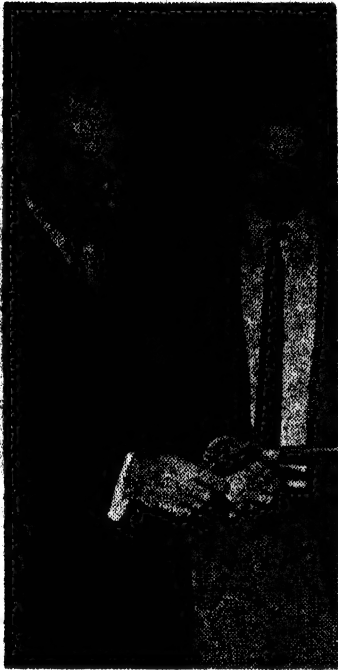
প্র্যাকটিস হলের উদ্বোধনের সময় বিশ্ব টেবল টেনিস সংস্থার সভাপতি রয় ইভান্সের সঙ্গে যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক গোপীনাথ ঘোষ ফটো—দেশ

এবং সংগঠনের প্রতি অন্তহীন ভালবাসা। খেলাধুলোয় দুজনের ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে সে সম্পর্কে স্বল্প আলোচনা অবশ্যই অবান্তর হবে না।

গোপীনাথ ঘোষ

প্রবীরবাবুর মত গোপীবাবুও বড় ঘরের ছেলে। প্রসিদ্ধ মিষ্টি ব্যবসায়ী দ্বারিকানাথ ঘোষের পৌত্র। এলগিন রোডের মিত্র বাড়ির মত শ্যামবাজার স্ট্রীটের দ্বারকা ভবনের ছেলেরাও খেলার ভক্ত। সেই সূত্রে ছেলেবেলা থেকে ফুটবল ক্রিকেট হকি —সব খেলায় গোপীবাবুর আগ্রহ। হকি খেলেছেন টাউন ক্লাব, উয়াড়ি এ সি, মোহন-বাগান ও কাস্টমস ক্লাবে। ফুটবল উয়াড়ি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটে। ক্রিকেট ওয়াই এম সি এ এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটে। হকি এবং ক্রিকেটে পোস্ট গ্রাজুয়েটের ব্লু। ক্রিকেটে ছিলেন ব্যাটসম্যান ও উইকেট কিপার। হকিতে গোলকিপার।

হকি খেলাতেই ওর প্রতিষ্ঠা বেশী। ১৯৫৩তে বোম্বাইয়ে জাতীয় হকি প্রতি-যোগিতায় ছিলেন বাংলা দলের দুই নম্বর গোলকিপার। এক নম্বর গোলকিপার ছিলেন ক্রিস্টি। সেবার বাঙালীবিহীন বাংলা দলে একমাত্র বাঙালী। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ল কলেজে ছিলেন অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি। তখন থেকে সাংগঠনিক শক্তির পরিচয়। এম এ পাশ করার পর কিছুদিন বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করে জে কে ইণ্ডাস্ট্রিসে যোগ দেন। এখন ওখানকার পি আর ও।

"ইনডোর গেমে আমার কোনই আগ্রহ ছিল না। সরোজই আমাকে ওয়াই এম সি এতে টেনে নিয়ে গিয়ে টেবল টেনিস র‍্যাকেট হাতে ধরিয়ে দেয়"। বাংলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন সরোজ ঘোষ জে কে-রই কর্মী। গোপীবাবু ও সরোজের ক্রীড়াকুশলতায় জে কে ইণ্ডাস্ট্রিস আন্তঃ অফিস টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হলেও টেবল টেনিস সম্পর্কে গোপীবাবুর উক্তি—'হকি ক্রিকেট একটু আধটু খেলেছি, টেবল টেনিসে আমাকে আনাড়িই বলতে পারেন'

কিন্তু সংগঠনে? গোপীবাবু নিরুত্তর থাকলেও আমরা জানি, অত্যন্ত দক্ষ। তিন বছর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭৪-এ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারপর মাথার উপর পড়েছে অত্যন্ত গুরুভার। গোপীবাবু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যুগ্ম সম্পাদক।

ডিরেক্টর অফ অর্গানিজেশন টি ডি বংগরামানুজন যদি বিশ্ব ক্রীড়াযজ্ঞের আচার্য হন, সংগঠন সমিতির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থশংকর রায় হন যজ্ঞগার, তবে দুই প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন প্রবীর মিত্র ও গোপীনাথ ঘোষ।

প্রবীর মিত্র

মস্ত ঘরের ছেলে প্রবীর মিত্র। প্রখ্যাত আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় প্রধান বিচারপতি (অস্থায়ী) স্যার রমেশ মিত্রের প্রপৌত্র এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের সদস্য স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। স্যার প্রভাসের দাদা স্যার বিনোদ মিত্র ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলার।

ঐশ্বর্যের কোলে লালিত পালিত হলেও প্রবীর মিত্র খেলার প্রয়োজনে মাটিতে নেমে এসেছেন ছোট বেলা থেকেই। অন্য পাঁচ রকমের খেলা ছেড়ে টেবল টেনিসকে আঁকড়ে ধরেন ১৯৫৪ সাল থেকে। অচিরেই আক্রমণী খেলোয়াড় হিসাবে বেশ কিছু খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জা প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের প্রতিনিধি সুযোগ পান। ১৯৫৯ সালে লাভ ক রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, তখনকার দুই না খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও ব্যানার্জিকে সেমিফাইনালে ও ফাইনালে পর পরাজিত করে। ওই বছরই বিলেত যাত্রা করেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। ইংলণ্ডে খেলা ছাড়েননি। ইংলিশ ওপেন চ্যাম্পি শিপেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৬০-৬১ ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড শিপ ব্রোকার

বিশ্ব টেবল টেনিসের সংগঠন সম্পাদ প্রবীর মিত্র—প্রাক্তন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন

ফেলো হয়ে ১৯৬৫ সালে ভারতে আসেন এবং পাঁচ বছর রত্নাকর কোম্পানীর কমার্সিয়াল ম্যানেজার হিস কাজ করে নিজেই এক শিপিং কোম্পা খোলেন। এখন ওই হিমালয় শি কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর।

খেলাধুলোর সংগঠনের মধ্যে আ ১৯৬৭ সালে বেঙ্গল টেবল টে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রূপে। ও সুব্যবস্থায় ১৯৭০-এ ইডেনে আয়োজি জাতীয় টেবল টেনিস সবচেয়ে সফল অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি পায়। প্রবীরব এখন রাজ্য ও জাতীয় টেবল টে সংস্থার সহ-সভাপতি। ওঁর উপ ৩৩তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সংগ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব।

মু

ইডেনে ক্ষুদিরাম প্র্যাকটিস হলের উদ্বোধনের পর আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি রয় ইভান্স ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রদর্শনী খেলার আগে করমর্দন করছেন

ফটো—দেশ

খেলার মহামেলায় কলকাতা প্রস্তুত

আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। বিশ্ব টেবল টেনিস খেলার মহামেলার জন্য কলকাতা পুরোপুরি প্রস্তুত। উৎসব স্থান ইডেনে প্র্যাকটিস হলের উদ্বোধন আগেই হয়ে গেছে। নেতাজীর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি উদ্বোধন হল সর্বাধুনিক ধরনে তৈরী নেতাজী স্টেডিয়ামের। প্রধানত বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এটি গড়ে উঠলেও এই সুরম্য স্টেডিয়ামটি কলকাতার স্থায়ী সম্পদ হয়ে রইল। ওখানেই ফেব্রুয়ারি ৬ তারিখে আরম্ভ হচ্ছে দশদিনব্যাপী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। খেলতে আসছে পৃথিবীর প্রথম সারির প্রায় ৮০০ খেলোয়াড়।

ইডেনের খোলা মাঠে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্টে ২২ জন খেলোয়াড়ের পাঁচদিনব্যাপী ব্যাট-বলের লড়াই কলকাতাকে যেভাবে নাড়িয়ে গেছে, হল ঘরের টেবিলের উপর ছোট ব্যাট, ছোট বলের দশদিনের দিন-রাতের খেলা হয়তো কলকাতাকে তার চেয়েও বেশি নাড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, খেলা হবে দিনে রাতে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত, সমান তালে ২০টি টেবিলে। প্রথম পাঁচদিন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ সোয়েদলিং কাপ ও কার্বিলন কাপের খেলা। একদিন বিরতির পর পরের পাঁচদিন ব্যক্তিগত ও জুটিগত প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে সাতটি ইভেন্ট। তাছাড়া পুরুষ ও মেয়েদের কনসোলেশন সিঙ্গলস এবং নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন, ডেলিগেট ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জুরি ও কাউন্সিল সদস্যদের জন্য আছে জুবিলি কাপের খেলা। খেলার এক রাজসূয় যজ্ঞ।

শুধু খেলাই তো নয়, ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ভারতে বিশ্ব খেলাধুলোর আসর বেশি বসেনি। কলকাতায় বিশ্ব বিলিয়ার্ড এবং দিল্লির (১৯৬৭ সাল) বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের সাদামাটা আসরের কথা বাদ দিলে প্রকৃত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসর বসেছিল টেবল টেনিসেরই, ২৩ বছর আগে বোম্বাইতে। তখন আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য ছিল গোটা চল্লিশ দেশ। বোম্বাইয়ে খেলতে এসেছিল মাত্র ১৭টি দেশ। আর এখন ১২০টি দেশ বিশ্ব টেবল টেনিস সংস্থার সদস্য। কলকাতায় খেলতে আসছে ৬২টি দেশ। পুরুষ বিভাগে খেলবে ৫৩টি, মেয়েদের বিভাগে ৪১টি। এক বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠান। দিন রাতের এই মহা-অনুষ্ঠানকে সফল করার প্রয়াসে সংগঠন সমিতিও দিনেরাতে কাজ করে চলেছেন, বিশ্বকে আতিথ্য দেওয়ার গুরু দায়িত্বের কথা পুরোপুরি স্মরণ রেখে।

খেলার তালিকা তৈরি অনেক আগেই হয়ে গেছে। নামী যোগ্যতা অনুযায়ী বাছাই তালিকাও। বিদেশী দলগুলিও একে একে আসতে শুরু করেছে। প্র্যাকটিস হলের টেবিলের উপর এখন দিন রাত ব্যাট-বলের চটাং বোল। ৫ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনের এবং পরের দিন থেকে খেলা আরম্ভের শুধু অপেক্ষা।

টেবল টেনিস অসাধারণ জনপ্রিয় খেলা। খেলা দেখে মনেও সুখ এবং চোখেরও তৃপ্তি। বিশেষ করে জাপান ও চীনের খেলোয়াড়রা টেবল টেনিসের মধ্যে মারের প্লাবন এবং বিদ্যুতের গতি সঞ্চালিত করার পর থেকে। আগে যেখানে প্রধানত রক্ষণ-মূলক খেলার মধ্যে ছিল কব্জির পেলবতা ও শিল্পের ছাপ, এখন তার সংগে যোগ হয়েছে কব্জির কারিগরি এবং ঝড়ের গতি।

অরলোয়াস্কি | স্নিডোভা | রিডলোভা | কুনজ | সিক | গ্রোফোভা

[চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলান অরলোয়াস্কি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন এবং ৬ নম্বর বাছাই। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে কুনজ-এর স্থান ৩২। গ্রোফোভা গতবার মেয়েদের রানার্স। রিডলোভা বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ২৬ নম্বর]

শী য়েন-টিং   লি চেন-শি   চিয়াং চো-চিয়াং   লি চে-মিন   তিয়াও ওয়েন-উয়াও   লি পেং

[চীনের শী য়েন-টিং গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং এক নম্বর বাছাই। লি চেন ৪ নম্বর বাছাই। চিয়াং চো ১২ নম্বর বাছাই এবং লি পেং ১৬ নম্বর বাছাই। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তিয়াও ওয়েন-উয়াও ১৬ নম্বর খেলোয়াড়]

দর্শকদের সংখ্যার ও উত্তেজনার দিক দিয়েও বোধ হয় টেবল টেনিস সব খেলাকে হার মানিয়েছে। না হলে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে দলগত প্রতিযোগিতার একটি লড়াইয়ের মীমাংসা হতে? যুগোস্লাভিয়ার সেরাজেভো শহরে বিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চীন-জাপানের খেলাটির মীমাংসা হয়েছিল দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর। চীন-রাশিয়ার খেলা চলেছিল সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে। এই সংগ্রামের জন্য খেলোয়াড়দের কত বেশি শারীরিক পটুতা ও স্ট্যামিনার প্রয়োজন সহজেই অনুমেয়।

টেবল টেনিসে শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে উত্তর কোরিয়ার প্রতীক দল ছাড়া সব দেশই কলকাতায় আসছে। সুতরাং টেবলের উপর ওই ধরনের মহারণ কলকাতাতেও আমরা দেখতে পাব।

১২০টি দেশ আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য হলেও খেলায় কয়েকটি দেশেরই প্রাধান্য। প্রথম দিকে ছিল ইউরোপের কয়েকটি দেশ—হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, রুমানিয়ার প্রাধান্য। ১৯৫২ থেকে জাপানের এবং ১৯৫৯ থেকে চীনের খেলোয়াড়দের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য। এখন কিন্তু এশিয়ার এতটা আধিপত্য নেই। সেরাজেভোয় সুইডেন, রাশিয়ার খেলোয়াড়রা দারুণ খেলেছে। জার্মানিও অসাধারণভাবে টেবল টেনিসে এগিয়ে গেছে। সেরাজেভোয় দলগত প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে চীন ৫—৪ খেলায় হারিয়েছিল রাশিয়াকে। যদি রাশিয়া কয়েকটি পয়েন্ট বেশি সংগ্রহ করতে পারত তাহলে তারাই লাভ করত সোয়েদলিং কাপ। কিংবা জাপান যদি সুইডেনের কাছে না হারত তবে সোয়েদলিং কাপ পেত চীন। শীর্ষস্থানীয় চারটি দেশকেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। চীন হেরেছিল সুইডেনের কাছে। আবার সুইডেন রাশিয়ার কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। রাশিয়া হেরেছিল জাপানের কাছে, আগেই বলেছি জাপান হেরেছিল সুইডেনের কাছে।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও ছিল অপ্রত্যাশিত ফলের বছর। ৮ জন বাছাই খেলোয়াড়ের মধ্যে ৭ জনই বিদায় নিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালের আগে। আগের বারের চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের স্টেলান বেংটসন দ্বিতীয় রাউণ্ডেই হেরে গিয়েছিল রাশিয়ার স্ট্যানিশলাভ গোমোজকভের কাছে যে গোমোজকভ কলকাতায় ১৫ নম্বর বাছাই। নিজ দেশের ক্রমপর্যায়ে পাঁচ নম্বর হয়েও চীনের শী য়েন-টিং লাভ করেছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, এবার যে এক নম্বর বাছাই। মেয়েদের এক নম্বর বাছাই চীনের হু উ-লানও গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিজ দেশের তিন নম্বর হওয়া সত্ত্বেও। দক্ষিণ কোরীয় মেয়ে লি আইলেসা, যার জন্য ওর দেশের সর্বপ্রথম কর্বিলন কাপ জয় এবং যে দলগত প্রতিযোগিতায় কোন খেলায় হারেনি, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রথম দিকেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল সুইডেনের ব্রিজিটা ব্রাণ্ডবার্গের কাছে হেরে। আশা করছি এ ধরনের অভাবনীয় ফল এবার ইডেনেও ঘটবে। জয়ে-রঙ্গে হাসি-কান্নায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরও জমে উঠবে।

ডেভিস কাপ থেকে ভারতের বিদায়

ডেভিস কাপের গতবারের ফাইনালিস্ট ভারত এবার লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইনালে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ১—৩ জয়ে হেরে ডেভিস কাপ থেকে বিদায় নিল। বিজয় অমৃতরাজ ও আনন্দ ফেয়ারলির শেষ সিঙ্গলসটি সমাপ্ত না হওয়ায় চারটি খেলার ফল রেকর্ডভুক্ত হয়। কিন্তু পঞ্চম ও শেষ খেলাটির গুরুত্বও ছিল না চতুর্থ খেলার শেষে নিউজিল্যাণ্ড ৩—১এ এগিয়ে থাকায়।

আপাতদৃষ্টিতে ভারতের ফল শোচনীয় বলে মনে হলেও খেলায় কিন্তু আগাগোড়াই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সিঙ্গলসের মীমাংসিত তিনটি খেলাই চলেছে পাঁচ সেট পর্যন্ত, চার সেটের পর ডাবলসের মীমাংসা হয়েছে ভারতের অনুকূলে। অসম্পূর্ণ খেলাটি নিয়ে মোট খেলা হয়েছে ২৬৩টি গেম। এর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড পেয়েছে ১৩৪টি গেম, ভারত ১২৯টি। প্রথম দিন আনন্দ ফেয়ারলির কাছ থেকে প্রথম দুটি সেট দখল করে তৃতীয় সেটে ৫—৪ গেমে এগিয়ে গিয়ে জয় প্রায় হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলে। তখন সার্ভিস ছিল আনন্দর। কিন্তু ফেয়ারলি ওই অ[illegible] আনন্দর সার্ভিস ভেঙে খেলার মো[illegible] ঘোরায় এবং তৃতীয় সেট দখল করে

হু উ-লান   চ্যাং লি   হুয়াং লি-লিং   চেং হুয়াই-ইঙ্গ   কে শিনি-আই   লিন মেই-চুন

[চীন মেয়ে দলের হু উ-লান গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং এক নম্বর বাছাই। চ্যাং লি ২ নম্বর বাছাই। চেং হুয়াং-ইঙ্গ বিশ্ব ক্রমপর্যায়ের ১২ নম্বর]

কং মুন সু   কিম সুক জা   লি চে-চুন   লি আইলেসা   লি সুংমুক   চুং হায়ুন সুক   চই সুং সুক

[দক্ষিণ কোরিয়ার লি আইলেসা মেয়েদের ৩ নম্বর বাছাই। প্রধানত ওর জনাই কোরিয়া কর্বিলন কাপ বিজয়ী হয়। কোন খেলায় হারেনি। দক্ষিণ কোরিয়ার এই সব খেলোয়াড় ১৯৭৪-এ ইডেনে খেলে গেছে]

পরের দিন বাকি দুটি সেট নিয়ে জিতে যায়। অসম্পূর্ণ খেলাটিতেও ফেয়ারলির বিরুদ্ধে বিজয়ের জয় কষ্টসাধ্য ছিল না। সুতরাং আনন্দ একটি গেম লাভ করতে না পারায় ভারতকে বিদায় নিতে হয়েছে।

অবশ্যই নিউজিল্যাণ্ডের জয়ের মূলে তাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার কথা স্বীকার্য। তাদের দুজনই ওয়ার্লড টেনিসের পেশাদার খেলোয়াড়। ২৭ বছর বয়সী ওনি পারুন গত বছর বোম্বাই থেকে গ্রাঁ প্রী জয়

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

করে গেছে। ২৬ বছর বয়সী ফেয়ারলিও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা নিপুণ খেলোয়াড় যে ১৯৭৩এ লণ্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে পর পর তিনদিনে পরাজিত করেছিল বিশ্ব টেনিসের তিন নামী খেলোয়াড়—মার্ক কক্স, আর্থার অ্যাশ ও টম ওক্কারকে।

নিচে লখনৌয়ের খেলার ফল দেওয়া হল।

ওনি পারুন ৪—৬, ৬—২, ১০—১২, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে বিজয় অমৃতরাজকে এবং ৫—৭, ৬—৪, ৬—৩, ৬—৮ ও ৬-২ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করে।

ব্রায়ান ফেয়ারলি আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করে ৩—৬, ৬—৮, ৯—৭, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে। ফেয়ারলি ও বিজয়ের সিঙ্গলটি বিজয় ৬—৪, ৮—৬ ও ৫—৭ গেমে এগিয়ে থাকা অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায় দর্শকরা কোর্টে প্রবেশ করায়।

ডাবলসে বিজয় ও আনন্দ ১৩—১১, ৬—৪, ৪—৬ ও ৬—৪ গেমে পারুন ও ফেয়ারলিকে পরাজিত করে।

মাদ্রাজের টেস্ট জয়

মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ১০০ রানে জয় এবং ২—২এ সিরিজ করা অনেক দিনের পুরনো খবর। এ লেখা পাঠকদের কাছে উপস্থিত হবার আগে সিরিজেরও মীমাংসা হয়ে যাবে। ভারত সিরিজ জিতুক আর হারুক দুটি টেস্টে হারার পর দুটি টেস্ট জিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে নষ্ট সম্মান অনেকখানিই উদ্ধার হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলকাতার মত মাদ্রাজ টেস্টেও জয়ের মূলে সেই বিশ্বনাথের ব্যাট এবং সহায়ক উইকেটে স্পিনারদের ঘূর্ণি বল। বিশেষ করে এরাপল্লী প্রসন্নর, যে দুই ইনিংসে ১১১ রান দিয়ে পেয়েছে ৯টি উইকেট। ১২১ রানে ১২টি উইকেট পেয়েছে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার অ্যান্ডি রবার্টসও। কিন্তু ব্যাটেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ মার খেয়েছে। দলনায়ক ক্লাইভ লয়েড, প্রধানত যাঁর ব্যাটের ফুলিঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতায় ও মাদ্রাজে তার ব্যর্থতাই পরাজয়ের প্রধান কারণ। প্রথম দুটি টেস্টের তিন ইনিংসে লয়েডের সংগ্রহ ২৬৪ রান, পরাজিত দুটি টেস্টের ৪ ইনিংসে মাত্র ৯৩। শুধু রানই নয়, ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লিতে পতন মুখে লয়েডই খেলার মোড় ঘুরিয়ে নিজেদের অনুকূলে খেলাটিকে টেনে নিয়েছেন। কলকাতা ও মাদ্রাজে পারেনি। অপরদিকে কলকাতায় অসাধারণ দুটি ইনিংস খেলার পর বিশ্বনাথ মাদ্রাজেও দুটি ইনিংসে দিয়েছে শৌর্য ও সংগ্রামের পরিচয়।

ভারত—প্রথম ইনিংস ১৯০ (বিশ্বনাথ ৯৭, অশোক মাকড় ১৯; রবার্টস ৭-৬৪, জুলিয়েন ২-১২)

এরাপল্লী প্রসন্ন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস ১৯২ (রিচার্ডস ৫০, লয়েড ৩৯; প্রসন্ন ৫-৭০, বেদী ৩-৪০)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ (অংশুমান গাইকোয়াড় ৮০, বিশ্বনাথ ৪৬, কারশন ঘাউড়ি ৩৫, এঞ্জিনিয়ার ২৮; রবার্টস ৫-৫৭, বয়েস ২-৬১)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৪ (কালিচরণ ৫১; প্রসন্ন ৪-৪১, বেদী ৩-২৯, চন্দ্রশেখর ২-৫১)

[ভারত ১০০ রানে বিজয়ী]

একলব্য

অরণ্যদেব ★ লী ফক

নিজেদের লোভের ফাঁদে তারা বন্দী!
রাইফেল নামাও!

এ ব্যাপারে আমাদেরই ঠিক করতে হবে যে, কী শাস্তি তোমাদের পাওয়া উচিত!

ঠিক হয়েছে। এই বামনদের গ্রামে দশ বছর তোমরা নর্দমা সাফ করবে। রাজী?
না না, ও সব আমাদের দ্বারা হবে না।

তাহলে বরং কেউটে-সাপের গর্তে কিংবা বিষাক্ত মাকড়শার গুহায় তোমাদের ছেড়ে দেব।
কেমন?

কেউটে সাপ! বিষাক্ত মাকড়শা! ওরেব্বাস!
এর চেয়ে বরং নর্দমা সাফ করাই ভাল।

আমরা বরং নর্দমাই সাফ করব।
ভাল কথা! মেয়েটিকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। ওকে শহরে পাঠিয়ে দেব।

কেউটের গর্ত... মাকড়শার গুহা... এসব আবার কোথায়?
তা কি আমিই জানি? কিন্তু কাজ হয়েছে।
এরপর নতুন কাহিনী (২৪)

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বারবারা স্ট্রেস্যান্ড। উৎসবের বিস্তারিত সংবাদ ভিতরের পৃষ্ঠায়

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারের অনেক কিছু পরিকল্পনাই হয়ত এখনও বাস্তব রূপ নেয়নি। তবে গত দু বছর যাবত একটি কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়ে আসছে। সে হচ্ছে বছরের সেরা বাংলা ছবি এবং পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নগদ টাকার পুরস্কার দান। এই পুরস্কার নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র মহলে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এবং এটাও অনুমান করা যায় যে এই পুরস্কারের ফলে সৎ চলচ্চিত্র তৈরির প্রেরণাও বাড়ছে। নগদ টাকার পুরস্কারের উদ্দেশ্য কী সেটা বিশদভাবে বলার দরকার হয় না। আজকাল দেখা যায়, যে-কোন রকমে অথবা এমন কী মামুলি হিন্দী চিত্রের আমোদ মশলা আমদানি করে দর্শকদের তুষ্ট করা কিংবা হিন্দী চিত্রের দর্শকদের আকৃষ্ট করাই অনেক চিত্র-পরিচালকদের লক্ষ্য। এর বিষময় ফল বাংলা চলচ্চিত্রে এখনও কিছুটা দেখা যাচ্ছে—ওই সব ছবি না পায় কৌলিন্যের মর্যাদা, না টিকিটঘরের আনুকূল্য।

• • •

সরকার গত দুই বছর যাবত বাংলা ছবিকে যে পুরস্কার দিচ্ছেন তার ভিতর দিয়ে একটি নীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরস্কার এমন ছবিকে দেওয়া হচ্ছে যাতে

মতামতের মন্তাজ

শিল্প সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস কিংবা সুস্থ ও শিল্পসম্মত আমোদ-গুণ রয়েছে। এই বিচারে কোন ভুল হচ্ছে না। হয়ত পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি বহু সংখ্যক দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। কিন্তু সমালোচক ও বোদ্ধা দর্শকরা ওই ছবিকে যথেষ্ট মূল্য দিতে কার্পণ্য করেন নি। এই আপসহীন বিচার ক্রমে ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতে প্রভাব বিস্তার করবে। ভিন্ন ধরনের এবং সত্যিকারের উপভোগ্য ছবি তৈরির গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা যেদিন শুরু হবে সেদিন এই পুরস্কারের তাৎপর্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে। পুরস্কার নিয়ে সব সময়েই দ্বিমত থাকে। বিশেষত শিল্প বিচারে ঐকমত্য বুঝি কখনই সম্ভব নয়। তবে এটা অনস্বীকার্য, এবারের পুরস্কারেও সৎ চলচ্চিত্রকেই মর্যাদা দেবার অভিপ্রায় নিঃসংশয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এবং বিচারও আপসহীন। চলচ্চিত্র শিল্প এবং সিনেমা দর্শকরা এই পুরস্কার নিয়ে নানা মত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু পুরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝতে নিশ্চয়ই ভুল করবেন না। রাজ্য সরকারের এই পুরস্কার বাংলা সিনেমাকে নানা দিক দিয়েই লাভবান করবে। ভাল ছবি তৈরির প্রতিযোগিতা যদি শুরু হয় তবেই পুরস্কারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

চলচ্চিত্র-উৎসব থেকে ফিরে

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা উনিশশো বাহান্নর সালে। দ্বিতীয়, একষট্টি সালে। তৃতীয়, পঁয়ষট্টি সালে—প্রথম প্রতিযোগিতামূলক। যথেষ্ট সাড়া মেলে। উনিশটি দেশের ছবি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ছবি দেখানো হয়। একইভাবে চতুর্থবার, উৎসব সুসম্পন্ন হয় উনসত্তর সালে। সেই সূবাদে বিগত তিরিশে ডিসেম্বর নয়াদিল্লিস্থিত আধুনিকতম সরকারী প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান ভবনে পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল। মঞ্চের একটি আলোকিত অংশে অভিনেত্রী সিমিকে দেখা গেল। হাতে একটি থালা। তার ওপর পঞ্চ প্রদীপ এবং রাশীকৃত ফুল। মঞ্চে দণ্ডায়মান ছিল একটি মুভি ক্যামেরা। ক্যামেরায় উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি হল। আরতি করলেন সিমি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। দর্শকদের সঙ্গে বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ান অভিনেত্রী নাতালিয়া বন্দরচুক, কানাডার অভিনেত্রী তিউ লেক, মিশরের অভিনেত্রী মেরভাতে আমিন, বুলগেরিয়ার অভিনেত্রী নেভানা কোকানাভা, অভিনেতা পিটার শ্লাবোকভ, চেক পরিচালক এম তাপাক ও

উৎসবের শ্রেষ্ঠ পরিচালক জেলিতো ভিয়ানা

স্টেফান উহের, ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর রাউজিল, বাংলাদেশের অভিনেতা-পরিচালক হাসান ইমাম, অভিনেত্রী ববিতা ও প্রযোজক হাশিম, ব্রাজিল থেকে পরিচালক জেলিতো ভিয়ানা, ফ্রান্স থেকে ফিয়াপ-এর সভাপতি এ ব্রিসন, পশ্চিম জার্মানী থেকে ইণ্টারন্যাশনাল ফোরাম অব ইয়াং সিনেমার পরিচালক উলরিশ গ্রেগরী ও পরিচালক রেনড হফ, শ্রীলংকা থেকে পরিচালক অমরনাথ জয়তিলক, ইরাণের অভিনেতা বেহরুজ ভাসোগি, জাপানের মাদাম কাওয়াকিতা, আমেরিকান অভিনেতা মাইকেল ইয়ক এবং ইতালীয়ান অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিদা। সত্যজিৎ রায়ের নেতৃত্বে জুরী বোর্ডে উপস্থিত হলেন নেদারল্যানডের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক বার্ট

জুরিদের বিচারে নির্বাচিত "এম্পটি চেয়ার" ছবিকে পুরস্কৃত করেন সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা। অন্যতম জুরি অপর্ণা সেনের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন তাজকে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত

হানস্ট্রী, আমেরিকার ফ্রাঙ্ক কাপরা, মিশরের শাদী আবদুল সালাম, পোল্যাণ্ডের জানুসি, জাপানের ওশিমা, ইরাণের মের জুই, রাশিয়ার পরিচালক-অভিনেতা ও টোবোকভ এবং ভারতের অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হলে কনরাড রুকস পরিচালিত 'সিদ্ধার্থ' দেখানো হল। একত্রিশে ডিসেম্বর থেকে প্রতিযোগিতার ছবি দেখানো হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশের ছাব্বিশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। আঠাশটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। প্রথমদিন দেখানো হয় বেলজিয়ামের উইলো 'দ্য উইসপ্' এবং পশ্চিম জার্মানীর 'ওয়ান অব দি আদার'। বেলজিয়ামের ছবিটিতে পরিচালক ফ্রানজ বায়েনস-এর স্টাইল অফ দি ট্রিটমেণ্ট লাইন প্রশংসনীয়। তিনি ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কনটেনট-এর দিকে মোটেই নজর দেন নি। ক্ষণে ক্ষণে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর ছবিটি অতি সাধারণ ক্রাইম-থ্রিলার।

রুকস-এর "সিদ্ধার্থ" নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা হতে পারে না। কারণ ছবি অত্যন্ত সাধারণ মানের। বিষয়বস্তুর গভীরে পৌঁছতে পারেন নি পরিচালক। বরং মিস রিপ্রেজেনট্ করেছেন। সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রকারান্তরে রুকস এই কথা স্বীকার করে নেন। বলেন: আমি কালকের কথায় বিশ্বাস করি না। আমি আজকের মানুষ। যা হয়ে গিয়েছে, গিয়েছে। নিজের সম্পর্কে কখনই হতাশ নই। গতকালের কথা ভাবি না, ভাবি আগামীকালের কথা। আমি ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে ভালবাসি। এখানে আমি আরো কয়েকটা ছবি করব। ইচ্ছে আছে নকশালাইটদের নিয়ে একটা ছবি করব। পনেরো বছর স্টাডি করে "সিদ্ধার্থ" নির্মাণ করেছি। নকশালাইটদের সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে। অনেক সময় লাগবে। কয়েক বছর তো বটেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও আমার অনেক কিছু জানবার আছে। এতবড় ক্যানভাস। মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

রুকস, উনিশশো উনষাট সালে সর্বপ্রথম ভারতে আসেন। এখানে থাকতে থাকতেই তিনি তাঁর প্রথম ছবির পরিকল্পনা করেন। স্বদেশে গিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেন। এই ছবি, 'চাপাকুয়া', তাঁর ডায়েরী অবলম্বনে। দু'বছর ধরে বিভিন্ন দেশে শুটিং করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আধুনিক অলংকরণের শিল্পঘনিষ্ঠ ভাষাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে—সামগ্রিকভাবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবেশে অন্তর্নাটক এক অসামান্য অনুভূতি সৃষ্টি করে নৈরাশ্যজনক অস্থিরতায়। একজন ড্রাগ অ্যাডিকটেড পারসন, তার চারপাশের পৃথিবী—অস্পষ্ট, ঘোলাটে কিম্বা ধূসর। জীবন-তৃষ্ণা আর জীবনযন্ত্রণার এমন অনুচ্চারিত নায়ক খুব কম আধুনিক ছবিতেই দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছবিখানি উনিশশো ছেষট্টি সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হন রুকস। সেই ছবি এখানে প্রতিযোগিতার বাইরে দেখানো হয়।

উৎসবের শ্রেষ্ঠ চিত্র হাঙ্গেরীর "ড্রিমিং ইউথ"-এর একটি দৃশ্য

শাস্ত্রীভবনে পি আই বি'র কনফারেন্স রুমে জিনা লোলোব্রিজিদা সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমেই বলে নেন—কেউ আপনারা আমাকে জিগ্যেস করে বসবেন না আমি কতগুলি ছবিতে অভিনয় করেছি। যদি বলতে হয় তাহলে আপনাদের ধারণা হবে আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সকলেই একযোগে হেসে ওঠেন। জিনা আরো বলেন: আমরা ইটালিয়ানরা কখনো গোমড়া মুখ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা হাসি এবং হাসাতে ভালোবাসি।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে করতে জিনা হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। বেশ কিছুদিন হল তিনি ছবিতে অভিনয় করবেন না। ক্যামেরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুভি নয় স্টীল। এর মধ্য দিয়ে তিনি সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করছেন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে তিনি ছবি তোলেন। মাঝে মাঝে তিনি আবার লাইফ পত্রিকার হয়েও কাজ করেছেন। ভারতে আসবার অন্যতম আকর্ষণ তাঁর কাছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ওঁর ছবি তুলবেন।

ভাল আঁকতে পারেন জিনা। তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'ইতালিয়া মিয়া' বইতে। বইটা জিনা প্রকাশ করেছেন। একদিকে তাঁর তোলা ছবি এবং অন্যদিকে আঁকা ছবি—অপূর্ব সমন্বয়।

এসবের মধ্য দিয়ে জিনার আত্মোপলব্ধি হচ্ছে। তাঁর কথা হচ্ছে, এখন আমার কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান। হিসেব করে ব্যয় করতে হয়। জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত।......

প্রতিযোগিতার ছবি পশ্চিম জার্মানীর দি ব্রুটালাইজেশন অফ ফ্রানজ ব্লুম প্রায় সকলেরই ভালো লাগে। পরিচালক রেনভ হফ এ ছবিতে কারাগারে বন্দী জীবনের প্রতি আগাগোড়া আলোকপাত করেছেন। নায়ক ব্লুম ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত বিচারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। শিক্ষিত ব্লুম কারাগারে এসে এক অসনহীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ল। মার্কামারা আসামীদের এড়িয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু পারল না। কারণ এখানকার সিস্টেমটাই ভয়ানক। ব্লুম বুদ্ধিমান। সে নিজেকে এরই মধ্যে ধীরে ধীরে সংশোধনের পথে নিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল অনেকে। পরিচালক, সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন: সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই ছবি। অটো বায়োগ্রাফিকাল নভেল, লিখেছেন বারখারড ড্রায়স্ট। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন লেখক নিজেই। শ্যুটিং করেছি অ্যাকচুয়াল লোকেশানে। প্রধান কয়েকটি চরিত্র ছাড়া বাকী সবাই সত্যি সত্যি কারাজীবন যাপন করেন। ছবিতে মানুষের সংশোধনের যে পথ দেখানো হয়েছে তাতে বন্দীরা যথেষ্ট উৎসাহিত হবেন। আমি ওদের এই ছবি দেখাবো।

উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ইরাণের বেহরুজ ভাসোগী

সফল হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচনে অনেক চিত্র-সমালোচকই দ্বিমত হয়েছেন, আপনি কি বলেন?

হাঙ্গেরীর 'ড্রিমিং ইউথ' অসাধারণ ছবি। ছবিটি বলা যেতে পারে, সর্বসম্মতি-ক্রমে নির্বাচিত হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করে নিতে হবে উৎসবের ছবির মান ভাল ছিল না। সেভেন্টি পার্সেন্ট ছবি বাজে।

অন্যান্য নির্বাচন প্রসঙ্গে আপনার মতামত...।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের নির্বাচনও প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে। ব্রেজিলের এই তরুণ পরিচালকের কাজ মনে রাখার মতো। ছবিটি ওয়েল ডিরেকটেড। ছবির কিছু কিছু অংশ অসাধারণ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচনে জুরীরা অনেকেই একমত হয়েছেন। ইরাণের বেহরুজ ভাসাগি শক্তিশালী অভিনেতা। বারবরা স্ট্রেসণ্ডের অভিনয় সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি চেকোশ্লোভাকিয়ার 'অটোম্যাটিক' ইনটারেস্টিং।

এই উৎসবের কিছু বৈশিষ্ট্য কি আপনার চোখে পড়ল?

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্দায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি দেখানো হয় সেটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 'ফেস্টিভ্যাল হাইলাইটস' দেখানো। হয়—বেশ সুন্দর পরিকল্পনা।

স্বপনকুমার ঘোষ

বোম্বাই বিচিত্রা

সদ্য দিল্লির আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ফিরে বোম্বাই বিচিত্রা লিখতে বসেছি। কিন্তু বোম্বাইয়ের খবরের চেয়ে দিল্লির ঘটনাই মনকে আচ্ছন্ন করে আছে বেশি। সুতরাং বোম্বাইয়ে বসে দিল্লির খবরই শোনাচ্ছি। ইতিমধ্যে নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদনে ওই উৎসবের খানিকটা সংবাদ আপনারা জেনেছেন। আমি শুরু করছি তার পর থেকে।

অবশেষে ৫ জানুয়ারি থেকে উৎসব-চিত্রের প্রেস-প্রিভিয়ুতে কিছু শৃঙ্খলা দেখা গেল। এর আগে বড়, মেজ, ছোট কর্মচারীরা সপরিবারে বিজ্ঞান-ভবনের চেয়ারগুলি দখল করে থাকছিলেন, চলচ্চিত্র-সমালোচকরা বাধ্য হচ্ছিলেন দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে। সাংবাদিকরা চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী 'বয়কট' করবার হুমকি দিল ওঁদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

তবে অন্যত্র গণ্ডগোল ঠিকই চলেছে। বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত দৈনিকের সমালোচক চলচ্চিত্র-উৎসবের শুরু থেকেই দিল্লিতে আছেন, কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরেও দেখা গেল, প্রেস-পাস তাঁর হাতে আসেনি। ভদ্রলোক সমানে দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন প্রেস-কার্ডের জন্য —কিন্তু বৃথাই। বন্ধুরা দয়া করে যে ক'টা আনুকূল্যে কয়েকটি ছবি কোনওক্রমে দেখতে পেয়েছেন। তিক্ত-বিরক্ত, তিনি উৎসব শেষ হওয়ার আগেই বোম্বাই ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। বর্তমান প্রতিবেদক আগের চলচ্চিত্র-উৎসবগুলিতে উপস্থিত ছিল না, তার পক্ষে বলা শক্ত, এর রকম বিশৃঙ্খলা আগের চেয়ে কম, না বেশী। বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিকের প্রতিনিধি বিদেশী ডেলিগেটদের ফোটো দেখে চেনবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কে কোন্ জন ধরতে পারছিলেন না। মুশকিল, ওঁদের নামের একটি পূর্ণ তালিকাও পাওয়া গেল না। তার চেয়েও অস্বস্তিকর—ভুল বললাম, অস্বস্তিকর নয় শুধু, রীতিমতো হাস্যকর দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিলেন কেউ কেউ। তাঁরা দেখলেন, এক বিদেশী ভদ্রলোক অসহায়-ভাবে সভাগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সরকারী কর্মচারীদের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। সেই বিদেশী ভদ্রলোক, পূর্ব জারমানির চিত্র-পরিচালক রোলান্ড ওয়েম, এক সরকারী অফিসারকে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলতে শুনলেন, "দেখুন, আমরা খুবই দুঃখিত, পরিচালক রোলান্ড ওয়েম এসে পৌঁছতে পারেননি, অতএব যে সাংবাদিক-সভাটি অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল, সেটি হবে না।" এই পরিস্থিতিতে বিদেশী ভদ্রলোকটি সবিনয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে জানালেন, তিনিই রোলান্ড ওয়েম, সভার অপেক্ষায় রয়েছেন।

লেবাননের লেডি অব দ্য ব্ল্যাক মুন ছবিটিকে 'ইউ' মারকা দেওয়া হয়েছিল গোড়ায়, পরে যখন দেখা গেল ছবিটিতে প্রচুর গরম জিনিস রয়েছে তখন তাড়াতাড়ি দেওয়া হল 'এ' ছাপ। ইতিমধ্যে ছবির দুটি প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, স্ক্রীনিং কমিটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছবিটি দেখে-ছিলেন। যাই হোক, এ ছবির খবর রটে যেতে দেরি হয়নি এবং ফিল্মস ডিভিশন অডিটোরিয়ামে ঢোকার জন্য রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। পুলিস এসে গণ্ডগোল থামায়, তবে তার আগেই কিছু ভাঙচুর হয়ে গিয়েছিল।

• • •

টি-পারটি, রিসেপশন, ককটেল পারটি এই সব যথারীতি চলেছে। দিল্লির চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের কোথাও প্রবেশাধিকার নেই, তাঁরা চুপচাপ শীতে কাঁপছেন। প্রদর্শকদের কাছ থেকে তাঁরা পাচ্ছেন শীতল ব্যবহার। জনৈক চিত্র-পরিবেষক হেসে বললেন, "ঠিক আছে, চোদ্দ দিনের মামলা তো, এদিন কেটেই যাবে। তার পর? তখন প্রদর্শকরা যাবেন কোথায়?"

সুরঞ্জন

শ্রীশুভপ্রসন্ন ঘোষ : [illegible] পশ্চিমাজার থেকে আমাদের [illegible] জন্যে নটি বেবুন পাঠিয়েছিল, [illegible] আজকের কাগজে, বিমান পথে [illegible] পৌঁছতেই দেখা গেল তারা দশটি হয়ে দাঁড়িয়েছে—' আমাদের বরাতে অপ্রত্যাশিত এই বেবুন বেড়ে যাওয়াটাকে কী বলবেন আপনি?'

এ বুন।

• • •

কংগ্রেসের ভেতরকার দুর্নীতির দূরী-করণে কংগ্রেসিকদের সময়োচিত নেতৃত্ব দিতে শ্রীবিজয় সিং নাহার এবার এগিয়ে এসেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

দেশবাসী এখন তো অনাহারে—সতিাই।

• • •

ধান চাষে কচুরি পানার সার দিলে ফসল চারগুণ বাড়ে বলে কৃষিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এদিকে পুকুরের জঞ্জাল সাফ

হয়ে মাছের দুঃখ দূর হয়। মাছ ভাত দুই-ই জোটে আমাদের। ডবোল লাভ দাঁড়ায় বরাতে।

এবং হাতে হাতেই। ওই (জল) জাল তুললেই তার সাথে মাছও উঠবে নিয়াত।

• • •

কলকাতার এক ডাক্তার মায়া-কার্ডিয়াল ব্যাধির প্রতিষেধ নির্ণয় করেছেন বলে প্রকাশ। হৃদয় ঘটিত কোনো কার্ডিয়াল কাণ্ডের মায়ায় জড়াবেন না।

• • •

শ্রীপল্লবকুমার ব্যানার্জি ও সমীরকুমার

ব্যানার্জি : "সিনেমায় কোনো কোনো অভিনেতাকে দেখেছেন, দর্শকেরা গদ্গদ্ গদ্গদ্ বলে চেঁচায় কেন বলতে পারেন?"

গদ্গদ্ মশায় গদ্গদের দুর্দশায় তারা পীড়িত বোধহয়।

• • •

ভারতের পূর্বাঞ্চলে সিমেন্ট ও সোনার দর পড়ছে বলে খবর। গৃহ এবং গৃহিণীর দুঃখ দূর হল এবার।

• • •

দেশের মশক দূর করতে WHO-র বিজ্ঞানীরা তাবৎ পুং মশাদের ধরে ধরে নপুংসক করে ছাড়বার চেষ্টায় রয়েছেন বলে প্রকাশ।

আণ্ডা বাচ্চা সব বরবাদ? যৌনতাহীন মৌন মিছিল হবে তা হলে।

• • •

বন্দনা, ডলি, স্বপনকুমার বিশ্বাস : বর্ধমানের ভাতার নিয়ে হাসাহাসি হলে মুর্শিদাবাদের শালারা কেন বাদ পড়ে বলুন? কেনই বা হুগলির দাদপুর আর নসীবপুরের নসিবটা পৃথক?'

আমাদেরও এই চোরবাগান আর ঠনঠনেই বা কম কিসে?

• • • •

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় : 'এই ভাগলপুরের এক ব্যক্তি খেসারির ডাল ছাড়া অন্য ডাল কখনো স্পর্শ করেনি। একদিন ইচ্ছে হয়েছিল রাহাড় কি ডাল খাবার কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছে সে দমন করল এই ভেবে যে, বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গিয়েই সে ডালের স্বাদ পালটাবে। উক্ত ব্যক্তি এই প্রথম ট্যাকসি চড়ে বিয়ে করতে গেল। বে থা নির্বিঘ্নে চুকে যাবার পর খেতে বসে দ্যাখে সেখানেও সেই খেসারির ডাল। সে তখন

ঐ [illegible] তাই, তাড়াতাড়ি পৌঁছব বলে তো [illegible] এলাম, কিন্তু তুমি কি করে এসে আমার আগেই পৌঁছে গেলে?

যেমন করে বায় ঠিক তেমনি করেই—হড়হড় করে।

• • •

শ্রীমতী সুচিত্রা চক্রবর্তী : 'মিথ্যে বলতে জুড়ি নেই ওর।'/'ইঙ্গিতে দেখায় স্বামী নিজের বউকে।/'কী করে জানলে তুমি?' বন্ধু শুধালো।/স্বামী বল কানে কানে ফুঁকে/'বলছে ও ছিল নাকি ঝিনির ওখানে কাল রাতে/ওরই সাথে এক খাটে।'

কী হয় তাতে?/মেয়ে তো মেয়ের কাছে...'/স্বামীটি অমনি ফুঁসে ওঠে: 'জানো? আমিই ছিলাম কাল ঝিনির ফ্ল্যাটে'॥

• • •

সংবাদ যে রাজ্য সরকার এবার জাহাজের ব্যবসায়ে নামতে ইচ্ছুক।

আদা(য়ে)র ব্যাপারে তেমন সুবিধা হচ্ছে না বুঝি?

• • •

শ্রীকার্তিক দত্ত : 'অনিবার্য সাফল্যের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ। অলৌকিক ক্ষমতায় অসাধ্য-সাধন। কঠিন সমস্যার অব্যর্থ প্রতিকার। এক জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন পাঠে জানলাম। কিন্তু তাবিজ আর কবচের সাহায্যে বেকার সমস্যা অন্ন সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

কেন, ঐ গণকঠাকুরের তো হয়েছে!

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

বাঙলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে

বিজিতকুমার মুখার্জী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
অশোক সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩·২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাষিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
		৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা

১ মার্চ, ১৯৭৫॥ ৪০ পয়সা

আপনি দারুণ ফোটোজেনিক
কিন্তু, আপনার চামড়াটা...

আমার চিরদিনের স্বপ্ন মডেল হব! 'মডেল চাই' বলে বিজ্ঞাপন দেখলেই সেখানে গিয়ে হাজির হই!
আপনার মুখ আর ফিগার দুইই অপূর্ব... কিন্তু গোল বাধছে আপনার চামড়া নিয়ে!

নিরাশ হলাম- কিন্তু- কথাটা তো সত্যি! আমার চামড়াটা বড্ড ম্যাড়ম্যাড়ে প্রাণহীন হয়ে গেছে।

দেখুন, আমি একজন মডেল। কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি- আপনার অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক ব্যবহার করা দরকার...

নিয়মিত অ্যান ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করুন- দেখবেন আপনার চামড়ার ম্যাড়ম্যাড়ে ভাব ঘুচে গিয়ে কেমন সুন্দর জেল্লা ফুটে উঠবে!

এই দেখুন, অ্যান ফ্রেঞ্চ ময়লা আর বাসি মেক-আপ কেমন সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলে, যা সাবানও পারে না। কাজে কাজেই, চামড়া পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!
নিয়মিত রোজ রাতে আমি অ্যান ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করতে শুরু করলাম।

তারপর যখন আবার ফোটোগ্রাফারের কাছে গেলাম... অবাক হয়ে তিনি বললেন-
বা-রে! এই ছবিগুলো তো দেখছি দুর্দান্ত হবে!

এখন আমি ফুলটাইম মডেলিংই করি। ধন্যবাদ সুন্দর রঙরূপকে... আর অ্যান ফ্রেঞ্চকে!
Anne French
DEEP CLEANSING MILK

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিপন্ন মর্ত্যলোক—		... ৩০৩
ব্যঙ্গচিত্র—		... ৩০৪
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত		... ৩০৫
বৈদেশিকী—দেবরাজ		... ৩০৬
একটি গীতের দৃশ্য (কবিতা)—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়		... ৩০৭
ছিন্নবিচ্ছিন্ন (কবিতা)—শক্তি চট্টোপাধ্যায়		... ৩০৭
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত		... ৩০৮
সরোজিনী-স্মরণ—অনিলকুমার চন্দ		... ৩০৯
গীতধর্মী রবীন্দ্র-কবিতা ও গীতবিতান— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		... ৩১৩
ঊর্মি—কণা বসু মিশ্র		... ৩১৫
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর—শিবরাম চক্রবর্তী		... ৩২১
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		... ৩২৩
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়		... ৩২৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী		... ৩৩১
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায়		... ৩৩৩
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর		... ৩৩৯
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব		... ৩৪৩
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু		... ৩৪৫
আলোচনা—		... ৩৫১
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		... ৩৫৫
পুস্তক পরিচয়—		... ৩৫৭
খেলার মাঠে—একলব্য		... ৩৬০
সপ্তদশী বিশ্ব বিজয়িনী—মুকুল		... ৩৬২
রংগজগৎ—		... ৩৬৩
অরণ্যদেব—		... ৩৬৭
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী		... ৩৬৮

প্রচ্ছদ ঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮

শনিবার ১৬ ফাল্গুন ১৩৮১

বিপন্ন মূর্তিলোক

দেশের মঠ মন্দির ও সংগ্রহশালার মূর্তি চুরি করবার জন্য দেশী-বিদেশী তস্করদের ব্যস্ততা আজও যদি একটা কঠোর আঘাত না পায়, তবে জাতির জীবনের বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক হানি দুঃসহতার শেষ মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাবে। দেশের মানুষকে প্রায়ই এই সংবাদ শুনতে হয় যে, অমুক মন্দির কিংবা অমুক সংগ্রহশালার মূর্তি অপহৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূর্তি চুরি করবার কৌশলটা খুবই চতুর রীতিতে নিষ্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের শিবপুরম্ মন্দিরের যে নটরাজ এখন একজন বিদেশীর শখের সম্পত্তি হয়ে তারই দখলের ঘরে রয়েছে, সে নটরাজের অপহরণের কৌশলের মধ্যে এই চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। দশ শতকের নটরাজের একটি নকল মূর্তি নির্মাণ করে ও মন্দিরের ভিতরে স্থাপিত করে আসল মূর্তিটিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিছুকাল আগে কলকাতার জাদুঘরের কিছু ঐতিহাসিক অলংকার-সামগ্রীর এই কৌশলে অপহৃত হবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তৈরী করা যত অর্বাচীন নকল সামগ্রীকে জাদুঘরের কক্ষের আশ্রয়ে রেখে দিয়ে আসল প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে অপসারিত করা হয়েছিল। স্বভাবিত প্রশ্ন দেখা দেয়, ভিতরের কোন ব্যক্তি যদি বাইরের দেশী-বিদেশী ক্রেতার শঠ চক্রান্তের সহযোগী না হয়, তবে এরকম চতুর রীতির অপহরণ কি সম্ভব হত?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে অপহৃত একটি বিষ্ণুমূর্তি দীর্ঘ দশবছর পরে বোস্টন মিউজিয়ামের আশ্রয় থেকে আবার পরিষদের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। পরিষদের সন্ধান ও চেষ্টা সফল হয়েছে। বোস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা মূর্তিটিকে ফেরত দিতে কোন আপত্তি করেননি। বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে পরিষদের সম্পাদক বলেছেন, ভিতরের ও বাইরের দুই চক্রান্তের যোগসাজসে এই বিষ্ণুমূর্তি অপহৃত হয়েছিল। সুতরাং, মূর্তিলোকের বিপদটা শুধু বাইরের লুব্ধ ক্রেতার একক চেষ্টার প্রতিফল নয়, মঠ মন্দির ও সংগ্রহশালার অন্তঃপুরে যারা রক্ষাকর্মের দায়িত্ব নিয়ে বিচরণ করে, তাদেরই কেউ-না-কেউ বাইরের তস্করের দালাল হয়ে কাজ করে। এটাই সমস্যার একটি বিশেষ জটিলতার গ্রন্থি। এবং সমস্যার প্রতিকার করতে হলে যেমন বাইরের তস্কর-সংহতিকে তেমনই ভিতরের চৌর্যপ্রবণ হীনতার সংহতিকেও দমন করতে হবে। মঠ মন্দির ও সংগ্রহশালার পক্ষে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সরকারের সতর্কতা প্রবল না হলে মূর্তি-চুরির ঘটনার তেমন-কিছু হ্রাস হবে না।

স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, যিনি ভারতীয় প্রত্ন-নিদর্শনের যত্ন ও সংরক্ষার বিধি প্রথম প্রচলিত করেছিলেন, তিনিই সাঁচী স্তূপ থেকে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গলানের পবিত্র অস্থির দুটি মঞ্জুষা অপসারিত করে তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পরে, বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার সারিপুত্ত ও মোগ্গলানের অস্থি-নিদর্শন ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। দুই বুদ্ধশিষ্যের পবিত্র অস্থি আবার সাঁচী স্তূপে আশ্রিত হয়েছে। কিন্তু অপহৃত ঐতিহাসিক নিদর্শনের এরকম ফিরে আসার কোন ঘটনা আর দেখতেই পাওয়া যায় না। একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুমূর্তির ফিরে আসা। অজস্র অপহৃত ও অপসারিত মূর্তির আর কেউই ফিরে আসেনি। ভারত ও অন্যান্য যে-সব দেশে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনীয় ঐশ্বর্যের অভাব নেই, সেইসব দেশকে দীর্ঘকাল ধরে এই দুর্ভাগ্যে উৎপীড়িত হতে হয়েছে। সে উৎপীড়নের অবসান আজও হয়নি। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক অধীন হওয়ার কারণে প্রাচ্য দেশগুলির প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুঁথি মূর্তি ও রম্যকলার অসংখ্য সামগ্রীর উপর পাশ্চাত্ত্য শখের গ্রাস খুবই সহজে সম্ভাবিত হয়েছে। এই শখের কিছুটা বিশুদ্ধ শখ, অ্যান্টিক শোভা দিয়ে ড্রইং-রুম আর সংগ্রহের গ্যালারি সাজাবার শখ। এবং কিছুটা ব্যবসায়িক বুদ্ধির ব্যাপারও বটে। সামগ্রীগুলি, বিশেষ করে প্রাচীন মূর্তিরা পণ্যের মতো লক্ষ-লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়, এক ক্রেতার হাত থেকে অন্য ক্রেতার হাতে চলে যায়, এবং তার দর ও কদর বাড়তেই থাকে। কোন কোন দেশীয় ধনীও তাঁর সাংস্কৃতিক চরিত্রের শোভা প্রদর্শিত করবার ইচ্ছায় অ্যান্টিক সামগ্রী দিয়ে ঘর সাজিয়ে থাকেন। তাঁরাও হয় জেনে-শুনে নয়তো একেবারে না জেনেই অপহৃত মূর্তি ক্রয় করেন। এ ধরনের শখ এবং ব্যবসায়িক লাভ, দুই-ই মূর্তি-চুরির একটি ভয়ানক তাগিদ সৃষ্টি করেছে।

অরেল স্টাইন, যিনি মধ্য এশিয়ার সভ্যতা ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন, তিনি সহস্র-বুদ্ধ গুহার কাছে একটি মঠের অজস্র প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহের চেষ্টা ও পরিকল্পনার যে ইতিবৃত্ত তিনি লিখেছেন, সেটা বস্তুত একটি অপহরণের বিবরণ। মঠের লামার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাঝরাতের অন্ধকারে মঠের পুঁথি অপসারিত করা নিশ্চয় অপহরণ করা। দেখা গিয়েছে, এ ধরনের সংগ্রহের কাজ অনেক অনু-সন্ধানী ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে একটুও লজ্জার ব্যাপার বলে বোধ হয় না। এ ধরনের অপহৃত সংগ্রহ দীর্ঘকাল ধরে তাবৎ দেশের সরকার ও শিক্ষিতজনের কাছে একটি চমৎকার অধ্যবসায় হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্নের নীরবতা একটি অদ্ভুত ব্যাপার। মূর্তিচোরেরাও কোন নৈতিক প্রশ্নের ধার ধারে না। সন্দেহ করবার যুক্তি আছে যে, প্রত্ন সংগ্রহের বড়-বড় কৃতিত্বের অসঙ্গত পদ্ধতি ও প্রকার নিন্দিত না হয়ে নৈতিক প্রশ্নের ধার অনেকদিন আগেই ভোঁতা করে দিয়েছে। যা-ই হোক, অতীতে যা হয়েছে তাতো হয়েই গিয়েছে। দেশের সাংস্কৃতিক রূপকলার মূর্তিলোক এখনও কেন বিপন্ন হবে? স্বাধীন দেশের সরকারের পক্ষে উপলব্ধি করা উচিত যে, মূর্তিচুরির সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের উৎসাহ কঠোর আঘাতে স্তব্ধ না করে দিলে পরিণাম খুবই হানিজনক হবে। মূর্তিলোকের বিপন্নতা বস্তুত একটি সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের ও রম্য ঐতিহ্যের বিপন্নতা।

নতুন করে দম দেওয়া
ভুট্টো

দৃশ্যপট

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে একটা নতুন রাজনীতি এসেছে—এই রাজনীতির মূল ভিত্তি হল সংগঠন কংগ্রেস ও সি পি আই (এম) সহ নয় বামের সমঝোতা। এটাকে কোনও মতেই রাজনৈতিক জোট নিশ্চয়ই বলা চলে না। কিন্তু, যে ভাবেই আসুক, যা নামেই আসুক এটা একটা রাজনৈতিক সমঝোতা নিশ্চয়ই। এই রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে আপাতত এরা সবাই মিলে অর্থাৎ বাম দক্ষিণ সবাই মিলে শাসকদলের বিরুদ্ধে এ রাজ্যে "গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার" আন্দোলন চালাচ্ছেন।

এই আন্দোলন যে সর্বক্ষেত্রে একত্রে হবে তাও নাকি নয়। কখনও কখনও আলাদা আলাদা চলবে। কখনও আবার চলবে এক-যোগে, নব নির্মাণ সমিতির নামে।

আপাতত এদের লক্ষ্য :

(এক) রাজ্যে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সব রাজনৈতিক দল যাতে রাজ্যের সর্বত্র অবাধে রাজনীতি করতে পারে তেমন অবস্থা সৃষ্টি করা।

(দুই) রাজ্যে অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। এখন রাজ্যে যে আবহাওয়া আছে তাতে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয় বলেই সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ ও নয়বাম মনে করেন। তাই, তাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহাওয়া চান।

(তিন) নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার চাওয়া। বর্তমানে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা আছে তাকে এরা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন। যদিও কিভাবে এর সংশোধন হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে এরা সবাই একমত নন। এ সম্পর্কে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ এবং সি পি এমের বক্তব্যে অনেক তফাৎ।

প্রধানত এই তিনটি বিষয় নিয়ে আগামী কয়েক মাসে রাজ্যের সব বিরোধী দল "একযোগে" আন্দোলন করতে চান। কখনও কখনও এরা অবশ্য এক মঞ্চ থেকে আন্দোলন না করে একই সময় (সমন্বয়ের মাধ্যমে) আলাদা মঞ্চ থেকেই একই বিষয়ে আন্দোলন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

*

এই নতুন রাজনীতি নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেও মতভেদ আছে। যেমন, সি পি আই (এম)-এর একদল ক্ষুব্ধ এই কারণে যে, দলের নেতৃত্ব সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতি "প্রতিক্রিয়াশীল" দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। যে প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে এক সময় তাঁরা আন্দোলন করেছেন সেই প্রফুল্ল সেনকেই আবার মাথায় তুলে নাচার আয়োজন করছেন।

আবার, ক্ষুব্ধ সংগঠন কংগ্রেসের বেশ কিছু লোকও। তাঁরা আশংকা করেন, যে সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল সেই সি পি আই (এম)কে এইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র সেন আবার বাঁচার সুযোগ করে দিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা সেই বাঘের গলা থেকে কাঁটা বের করে দেওয়ার মত। কাঁটা গলা থেকে বের হওয়ার পর বাঘ উপকারীকেই প্রথম আক্রমণ করতে উদ্যত হবে।

এমন কি, তাঁরা অনেকে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে অজয় মুখোপাধ্যায়ের এবং হুমায়ুন কবিরেরও তুলনা করেছেন। বলছেন, ওরা যে ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে রাজনীতিতে প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছেন সেই ভুল প্রফুল্ল সেনও করতে যাচ্ছেন।

ওরা আরও বলেন : প্রফুল্লদাই স্মরণ করুন তিনি এই বিষয়ে ১৯৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ সনে অজয়দাকে কী কী বলেছিলেন।

*

যিনি যাই বলুন, এই নতুন রাজনীতি কিছু দূর এগোবেই। তার কারণ, উভয়েরই আজ উভয়কে প্রয়োজন। প্রফুল্ল সেনের নতুন একটা ইমেজ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষ করে ১৯৭২ সনের পর। কিন্তু তাঁর সংগঠন নেই। আবার, সি পি আই (এম)-এর সংগঠন নেই নেই করেও এখনও ওরা সাংগঠনিকভাবে বেশ শক্তিশালী। কিন্তু সি পি আই (এম)-এর ইমেজ নেই। তার পক্ষে মাঠে নামারও বিস্তর বাধা।

প্রফুল্লবাবু ভাবছেন, তিনি সি পি আই (এম)-এর সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে শাসক কংগ্রেসকে এ রাজ্যে আঘাত হানবেন। তিনি ভাবছেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবেন।

সি পি আই (এম) আবার মনে করছে, প্রফুল্ল সেনকে সামনে রেখে তাঁরা এগোতে পারবেন। একা এগোতে গেলে শাসক দল ভাণ্ডা নিয়ে তাড়া করবে। কিন্তু প্রফুল্ল সেন সামনে থাকলে তা পারবে না। প্রফুল্ল সেনের মাথায় ডাণ্ডা মারতে শাসক কংগ্রেস ভয় পাবে। তাই তাঁরা প্রফুল্ল সেনকে সামনে রাখতে চান বাহ্যত, এই নতুন আন্দোলনের নেতা হিসাবে। কিন্তু, কার্যত তাঁদের দলের রাজনৈতিক সংগ্রামের শিখণ্ডী হিসাবে।

এই নতুন রাজনীতি থেকে তাই দু দলই লাভবান হতে চান।

সি পি আই (এম) যদি পারে তাহলে এই আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বয়কটের আন্দোলনেও নিয়ে যেতে চাইবে। ১৯৭৬ সনের গোড়ায় লোকসভার নির্বাচন। সি পি আই (এম) যদি দেখে সেই নির্বাচনে সুবিধা হবে না তাহলে তাঁরা তাকে বয়কট করতে চাইবেন। সেই বয়কটে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে পাওয়া গেলে আর কথা নেই। কিন্তু প্রফুল্ল সেনের পক্ষে ততটা যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না।

আসল প্রশ্ন হল। এই নতুন রাজনীতি থেকে কে কতটা লাভ তুলতে পারেন. দু পক্ষই সেই উদ্দেশ্যেই এই রাজনীতি করছেন এবং দুই পক্ষই মনে করছেন তাঁরাই বেশি লাভবান হবেন।

১৭-২-৭৫

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

কাঁটা তোলা

বাংলাদেশের নতুন শাসনতন্ত্রকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন শেখ মুজিবর রহমানকে টিটকিরি মেরেছিলেন তখন বুঝি বিধাতা-পুরুষ একটু মুচকে হেসেছিলেন। তখন কি আর ভুট্টো বুঝতে পেরেছিলেন দু হপ্তা কাটতে না কাটতেই তাঁর গণতন্ত্রের ফাঁক হয়ে যাবে, তাঁর গণতন্ত্রের রং চটে গিয়ে ভেতরের নোংরা খড় বেরিয়ে পড়বে। সত্যিকারের গণতন্ত্র অবিশ্যি পাকিস্তানে কস্মিনকালেও ছিল না। জঙ্গীশাহী গদিতে কায়েম হয়েছিল গণতন্ত্রকে জবাই করে। ভুট্টো গোড়ায় গণতন্ত্রী ভেক ধরেছিলেন, দিনকতক গণতন্ত্রী রেওয়াজ মেনে চলতে চেষ্টাও করেছিলেন। সেটা কিন্তু নেহাতই লোক দেখানো। নিজ মূর্তি ধরতে তাঁর খুব বেশী দেরি হয়নি। তিনি যে একজন খাঁটি গণতন্ত্রী তা বোঝাবার জন্যে তিনি বিরোধী জাতীয় আওয়ামী দলের ওপর জঙ্গীশাহী যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল তা তুলে নিয়েছিলেন গদিতে বসেই। যে প্রদেশে তাঁর পিপলস পার্টি ছিল সংখ্যালঘু, সে দু প্রদেশে বিরোধীদের মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগও দিয়েছিলেন। বালুচিস্তান আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসনভার নিয়েছিল জাতীয় আওয়ামী দল জামিয়াত ই উলেমা ই ইসলামের সঙ্গে জোট বেঁধে কিন্তু ভুট্টোর কারসাজিতে বিরোধীদের গড়া সরকার টিঁকলো না।

বালুচিস্তানের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন ভুট্টো নিজেই ১৯৭৩ সনে। অজুহাত বালুচরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তাল ছিল বালুচিস্তানকে পাকিস্তানের আওতার বাইরে নিয়ে গিয়ে আলাদা রাষ্ট্র বানাতে। কাণ্ডটা তিনি করেন ইসলামাবাদে ইরাকী দূতাবাসে বাক্সভরা সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়বার পর। ভুট্টোর নালিশ সেগুলো আমদানি করা হয়েছিল বিদ্রোহী বালুচ সরকারের হাতে তুলে দেবার জন্য। সে নালিশ যে সত্যি তার অকাট্য কোনও প্রমাণ ভুট্টো দেননি। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের গড়া বালুচিস্তানের সরকারকে ওই অজুহাতে তিনি খারিজ করেছিলেন। সে অন্যায়ের প্রতিবাদে ইস্তফা দিলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারও। বিরোধী দল নিয়ে গড়া কোনও সরকার আর সেই থেকে পাকিস্তানে নেই। থাকা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের বুলি যতই কপচান না কেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মনে প্রাণে তিনি একনায়কত্বে বিশ্বাসী, তিনি একাই দেশ শাসন করবেন এই-ই তিনি মানেন, কাউকেও ক্ষমতার ভাগ দিতে, বরদাস্ত করতে তিনি নারাজ। ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচই তাঁর পছন্দ।

এতদিন তবু গণতন্ত্র নিয়ে একটু পুতুল খেলা তিনি করছিলেন। জিইয়ে রেখেছিলেন বিরোধী দলগুলোকে। তাদের সভাসমিতি করতে কিংবা কথা কইতেও দিচ্ছিলেন। কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারি ও পাট তিনি প্রায় চুকিয়ে দিয়েছেন—পাকিস্তানের পয়লা নম্বর বিরোধী দল জাতীয় আওয়ামী দলকে তিনি বেআইনী ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে আওয়ামী দলের নেতাদের ওপর হামলা। রুই কাতলা থেকে চুনোপুঁটি কেউ বাদ যাননি। দলের নেতা খাঁ আবদুল ওয়ালি খাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর যাঁরা সাকরেদ তাঁরাও সবাই গারদে। ওয়ালি খাঁ কেবল আওয়ামী দলের প্রধান নন, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বিরোধীদের তিনিই নেতা। এখন পরিষদের বৈঠক চলছে। আইন অনুযায়ী এখন পরিষদের কোনও সদস্যকে আটক করা যায় না। অত আইনের পরোয়া তো আর পাকিস্তানী সরকার করেন না। তবে কাঁচা কাজ করার পাত্তর ভুট্টো নন। পাছে আদালতে তাঁর হুকুম পাল্টে যায় তাই তিনি জাতীয় পরিষদকে দিয়ে আইন পাল্টে আইনসভার সভ্যদেরও বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা আদায় করে নিয়েছেন।

ভুট্টোর অস্বস্তির অবিশ্যি কারণ আছে। ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর একান্ত অনুগত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হায়াত মহম্মদ খাঁ শেরপাও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা যান একটা বোমায় ঘায়েল হয়ে। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার উদ্যোগ করছিলেন তখন বোমাটা ফাটে। ভুট্টো তখন বিদেশে। তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন মার্কিনী হাতিয়ার যোগাড় করতে। তাঁকে নাকি মার্কিন রাষ্ট্রপতি কথা দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেন বলে যদিও খোলাখুলি সে খবর তখনই জানানো হয়নি। খুশিতে ডগমগ ছিলেন ভুট্টো। কিন্তু তাঁর পেয়ারের প্রাদেশিক মন্ত্রী শেরপাওয়ের অপঘাত মৃত্যুর খবর শুনে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। মাঝপথে সফরের ইতি টেনে ফিরে এলেন দেশে। সেখানে মাটিতে পা দিয়েই জেহাদ শুরু করে দিলেন জাতীয় আওয়ামী দলের বিরুদ্ধে। দলকে নিষিদ্ধ করেছেন নেতাদের পাকড়েছেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন কাগজপত্তর আটকেছেন। জাতীয় পরিষদে সে দলের সদস্য মোটে সাত। কিন্তু সে সাত ছিল সাতশোরও বাড়া ভুট্টোর কাছে।

গণতন্ত্রের ছোট্ট পিদীমটি এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে ভুট্টো ভাবছেন এবার তিনি নিরাপদ, তাঁর দোষ ধরবার আর কেউ দেশে রইলো না। কিন্তু তা কী হবে? জাতীয় আওয়ামী দল পত্তন করেছিলেন মৌলানা ভাসানি। তিনি এখন ভিন্ন দেশের লোক। পাকিস্তানী আওয়ামী দলের ভার বর্তেছে সীমান্ত গান্ধীর ছেলে ওয়ালি খাঁর ওপর। তিনি বামপন্থী, ভুট্টোকে তিনি ধুলো ধোনা করে ছাড়েন সুযোগ পেলেই। তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর তিনি চক্ষুশূল। তাঁকে আর তাঁর দলবলকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে আর, বুঝি, যদ্দিন বাঁচবেন তদ্দিনই হয়তো হবে। কিন্তু তাতে তিনি ঘাবড়াননি, ভয়েও ভেঙে পড়েননি। এই নিয়ে তিনবার আওয়ামী দলকে বেআইনী করা হলো পাকিস্তানে। পয়লা বারে করেছিলেন আয়ুব খাঁ গদিতে বসেই, তারপর ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব বাংলায় জঙ্গী আইন জারী করার পর। সে হুকুম পাল্টেছিলেন ভুট্টো একাত্তরের ডিসেম্বরে ক্ষমতা হাতে পেয়ে। এখন তিনিই আবার জঙ্গীশাহীর উগ্রনীতির নকল করে আওয়ামী দলকে নিষিদ্ধ করলেন নিজের গদি বজায় রাখতে।

বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবার পর থেকেই ভুট্টো আর তাঁর চেলাদের ভয় পাকিস্তান বুঝি চার টুকরো হয়ে যায়—বুঝি বা পাঞ্জাবটুকু নিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁদের টিঁকে থাকতে হয়। স্বাধীন সিন্ধুদেশ গড়ার দাবি উঠেছে, দাবি উঠেছে পাখতুনিস্তান আর বৃহত্তর বালুচিস্তান পত্তন করার। অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে বালুচদের ওপর তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য। অশান্তি বাড়ছে দিন দিন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও। সরকারী গুলি গোলাও চলছে। ফাটছে বোমাও শহরে শহরে। কিন্তু কারা যে ফাটাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। বালুচিস্তানের মন্ত্রিসভাকে ভুট্টো বরখাস্ত করেছিলেন সেখানে নাকি বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছিল এই অভিযোগে। কিন্তু তিনি প্রমাণ দেখাতে পারেননি যে তার পেছনে জাতীয় আওয়ামী দল কিংবা বালুচ সরকারের হাত ছিল। এবারও ধুন্দুমার কাণ্ড বাধিয়েছেন পেয়ারের শেরপাও খুন হবার পর। কিন্তু এবারও তিনি কোনও প্রমাণ দেননি যে এর পেছনে আওয়ামী দলের চক্রান্ত আছে। লোকে বলছে ওই খুনকে পুঁজি করে তিনি নিজের কাজ গুছিয়ে নিলেন পাকিস্তানে। তুলে ফেলেছেন তাঁর পথের কাঁটা আওয়ামী দলকে।

একটি শীতের দৃশ্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মায়া মমতার মত এখন শীতের রোদ
মাঠে শুয়ে আছে

আর কেউ নেই
ওরা সব ফিরে গেছে ঘরে
দু'একটা নিবারকণা খুঁটে খায় শালিকের ঝাঁক
ওপরে টহল দেয় গাংচিল, যেন প্রকৃতির কোতোয়াল।

গোরুর গাড়িটি বড় তৃপ্ত, টাপটুপু ভরে আছে ধানে
অন্যমনা নারীর মতন শ্লথ গতি
অদূরে শহর আর ক্রোশ দুই পথ
সেখানে সবাই খুব প্রতীক্ষায় আছে
দালাল, পাইকার, ফড়ে, মিল, পার্টি, নেকড়ে ও পুলিশ
হলুদ শস্যের স্তূপে পা ডুবিয়ে
ওরা মল্লযুদ্ধে মেতে যাবে
শোনা যাবে ঐকতান, ছিঁড়ে খাবো চুষে খাবো
ঐ লোকটিকে আমি তোমাদের আগে ছিঁড়ে খাবো।

সিমেন্টের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে সেই লোকটি
বিড়ির বদলে সিগারেট
আজ সে শৌখিন বড়, চুলে তেল, হোটেলের ভাত খেয়ে
কিনেছিল এক খিলি পান
খেটেছে রোদ্দুরে জলে দীর্ঘদিন পিতৃস্নেহ
দিয়েছিল মাঠে
গোরুর গাড়ির দিকে চোখ যায় বড় শান্ত এই
চেয়ে থাকা
সোনালী ঘাসের বীজ আজ যেন নারীর চেয়েও গরবিনী
সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে
রোদের আদর
এখনই যে লুট হবে কিছুই জানে না
যারা অগ্নিমান্দ্যে ভোগে তারা ঐ লোকটির
রক্ত মাংস খাবে!

আচার্য শঙ্কর, আমি করজোড়ে অনুরোধ করি
অকস্মাৎ এই দৃশ্যে আপনি এসে যেন না বলেন
এই সবই মায়া

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যদি কোনোদিন যাই মেঘের ওপারে
তোমাকেও নেওয়া যেতে পারে।
তারপরে, পথ নেই। ফুটে আছে ফুলের প্রদীপ
তুমি কি পোড়াবে কিছু? জ্বালিয়ে নেবে না সন্ধ্যাদীপ?
আরো কিছুক্ষণ যেতে হবে
পথ বড়ো সংকীর্ণ, কঠোর
তারই মধ্যে হাওয়া এলোমেলো—
বলে, শান্ত, কে এখানে এলো?

২
রাত্রি বড়ো নিবিড় এবং রাত্রি বড়োই কালো
এখানে তার না আসাটাই ভালো
তার তো যাবার অনেক জায়গা আছে
বসত আমার পোড়া গাছের কাছে!

৩
ভিতরে একা যাবার বাধা, ভিতরে একা পাবার বাধা, তবে
বাহিরে একা থাকাই ভালো হবে।
ভিতরে কেউ এখনো নেই, ভিতরে কেউ কখনো নেই যবে
বাহিরে একা থাকাই ভালো হবে॥

ভারতের অর্থনীতি

মুদ্রাস্ফীতি ও ভারত—একটি আকর্ষণীয় আলোচনা-চক্র

বিশ্ববিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে কে গ্যালব্রেথ মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির উপর খুব বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির নজির দেখিয়ে অধ্যাপক গ্যালব্রেথ বলেন, উঁচু সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সংকোচন প্রভৃতির ফলে বহু শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদনী ক্ষমতা এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দার সৃষ্টি হয়েছে। বহু দেশে বর্তমানে যে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার সহাবস্থান (Stagflation) দেখা যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল ব্যাংক ব্যবস্থার অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রা সংকোচন নীতি অনুসরণ। প্রসঙ্গত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ বোম্বাইয়ে Tata Economic Consultancy Services এবং The Associated Business Programmes of U K-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Inflation India and the World Economy শীর্ষক আলোচনাচক্রে সম্প্রতি একথাগুলি বলেছেন। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে গৃহ নির্মাণ শিল্পে এখন মন্দা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার ফলে বেকার সমস্যাও এখন গুরুতর আকার ধারণ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ হাজার ডলার বার্ষিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তি ও পরিবার মোট ভোগের এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার। এই জনসমষ্টির ভোগের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য অধ্যাপক গ্যালব্রেথ মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উপর বেশি নির্ভর না করে দেশের কর ব্যবস্থার উপর বেশি নির্ভর করার পক্ষপাতী। কর-হার বাড়ালে তার বোঝা ক্রেতার উপরেই পড়ে; কিন্তু সুদের হার খুব বাড়ালে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় শিল্পক্ষেত্রে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য অধ্যাপক গ্যালব্রেথ মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী। মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি জোরদার করলে বড় বড় ফার্মগুলি তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খইয়ে নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মুনাফাজনিত আয়ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অধ্যাপক গ্যালব্রেথ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন শ্রী এল কে ঝা। শ্রী ঝা এখন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল হলেও এককালে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার গভর্নর ছিলেন। আমাদের দেশের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। শ্রী ঝা সরকারের আয়-ব্যয় নীতি ও মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে অন্যান্য ব্যবস্থার উপরেও এক্ষেত্রে নির্ভর করা যায় কিনা তার প্রচেষ্টা চালাবার পক্ষপাতী। শ্রী ঝা বলেন, কোন উন্নতিকামী দেশই এখন উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। যদি বলা হয় যে, দেশের উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করার চেয়ে টাকার ক্রয়-শক্তি বজায় রাখা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তবে বলতে হয় যাঁদের এমনিতেই কিছু আয় ও চাকরি আছে তাঁদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা যাঁদের চাকরি বা আয় কিছুই নেই, তাঁদের অবস্থা উন্নত করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ-যুক্তি টিকতে পারে না। ভারতের কথা উল্লেখ করে শ্রী ঝা বলেন, যদিও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের আয়-ব্যয় নীতির উপযুক্ত প্রয়োগের ফলে আমাদের দেশে মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি কিছুটা রুদ্ধ হয়েছে, তবুও মুদ্রা সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা দরকার যেন এজন্য কৃষি-উন্নয়ন ও শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস না পায়। তাঁর মতে, গুরুভার শিল্পে কতটা বিনিয়োগ হবে এবং ভোগ-সামগ্রী শিল্পে কতটা বিনিয়োগ হবে সে সম্পর্কে কোন সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষ প্রশ্ন নেই; কিন্তু নতুন বিনিয়োগ থেকে কতটা ভোগ-সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে এবং অতীতের বিনিয়োগ থেকে কতটা ভোগ-সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। মূলত নিত্য ব্যবহার্য ভোগ-সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি বলে শ্রী ঝা মনে করেন। যাতে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে সেজন্য এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা দরকার যার ফলে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিনিয়োগ নীতি পরিচালন করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম যথেষ্ট উৎপাদিত হচ্ছে; অথচ সিমেন্ট, কাগজ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বলা হয়, শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনে যে ভারসাম্য নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। শ্রী ঝা শিল্পক্ষেত্রে নতুন উৎপাদনী ক্ষমতার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণকল্পে শিল্প-লাইসেন্স নীতির যথাযথ প্রয়োগের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আমাদের দেশের শিল্প-কাঠামোর ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট রয়ে গেছে এবং তার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকটাই স্বাভাবিক। উৎপাদনের স্বল্পতা থাকায় শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলেই মূল্য স্তরের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ করা যাবে না; এজন্য প্রয়োজন হল সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা ও ভোগ নিয়ন্ত্রণের, তা না হলে শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হলে কালোবাজারের সৃষ্টি হতে পারে। রেশনিং ব্যবস্থার ফলে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রে বণ্টন ব্যবস্থার উপরেও সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।

এই আলোচনা-চক্রে অধ্যাপক গ্যালব্রেথ ও শ্রী এল কে ঝা উভয়েই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সন্দেহ নেই। অধ্যাপক গ্যালব্রেথের যুক্তি উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। অবশ্য আমাদের দেশে বর্তমানে যে মন্দা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অন্যতম কারণ হল অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যাংকের ঋণ সংকোচন। কিন্তু ব্যাংকের ঋণ সংকোচন নীতি অনুসৃত হবার দরুন বিনিয়োগের হার কমে গেলেও ব্যবসায়ীদের হাতে এখনও অনেক কালো টাকা আছে। সরকারকে যদি সেই কালো টাকা বিনিয়োগের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হয় তবে কর-নীতির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। শ্রী এল কে ঝা বিনিয়োগের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ যাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে বেশি হয় সেজন্যও দেশের কর-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা দরকার। তাছাড়া উৎপাদনের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থাসহ মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন বিতর্কের প্রশ্ন ওঠে না।

সুব্রত গুপ্ত

সরোজিনী-স্মরণ

অনিলকুমার চন্দ

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। বিশ্বভারতীর তখন চরম আর্থিক সংকট। অনেক বছর থেকেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হচ্ছিল; বছরের পর বছর সেই ক্ষতি পুঞ্জিত হয়ে বিরাট আকার ধরল। গুরুদেবের স্বাস্থ্য তখনই ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তবু তিনি ১৯৩৩ সালে স্থির করলেন, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বোম্বাই যাবেন। সঙ্গে যাবে বিশ্বভারতীর একদল ছাত্রছাত্রী: গানের দল, তারা সেখানে গীতিনাট্য 'শাপ-মোচন' ও 'তাসের দেশ' অভিনয় করবে। দিনুবাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ক্ষিতিবাবু (ক্ষিতিমোহন সেন), নন্দবাবু (নন্দলাল বসু) প্রমুখ অনেক মুরুব্বিরা দলে চললেন। মাস কয়েক পূর্বে আমি গুরুদেবের সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছি। নানা কারণে আমার নিজের পক্ষে এ যাত্রা অবিস্মরণীয়। তার প্রধান কারণ, সেবারেই প্রথম গুরুদেবের সঙ্গে বাইরে সফরে চল্লাম। বোম্বাই-এ সেখানকার নগর প্রধানেরা এক শক্তিশালী সম্বর্ধনা সমিতি গড়েছিলেন। কিন্তু প্রায় সব ভারই ছিল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর উপরে। তিনি তখন বোম্বাই-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, থাকতেন "তাজমহল হোটেলে।" কংগ্রেস ছাড়াও সেখানকার জনহিতকর কোনো অনুষ্ঠানই বাদ ছিল না, যার মধ্যে তিনি জড়িত না ছিলেন।

বোম্বাই-এর আতিথেয়তা নিতান্ত রাজকীয় ভাবে হয়েছিল। গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল স্বর্গীয় স্যার দোরাব টাটার প্রাসাদে। দলের অন্য সবাই ছিলেন হিন্দুস্থান ইনসিওরেনস্ কোম্পানীর অতিথিশালায়। বোম্বাই-এ পৌঁছুবার অল্পক্ষণ পরেই সরোজিনী দেবীর সঙ্গে আলাপ হল। পিতৃ পরিচয়ে তিনি সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। আমার পিতা কামিনীকুমার চন্দের সঙ্গে রাজনীতিসূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার aunty হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘকাল নানাভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি, এবং এই মহীয়সী মহিলার কাছ থেকে আমার স্ত্রী এবং আমি অজস্র ভালবাসা, স্নেহ ও উৎসাহ পেয়েছি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজ তা স্মরণ করি।

কিন্তু প্রথমেই তাঁর সঙ্গে একটু খিটিমিটি ঘটেছিল। গুরুদেবের বোম্বাই-এর কার্যসূচী যখন তৈরি করা হচ্ছিল, আমি দু-একটি জায়গায় নানা অসুবিধার কারণে আপত্তি জানাবার দুঃসাহসী হয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তখনই বজ্রকঠিন কণ্ঠে আমাকে তাড়না করে বল্লেন "ছোকরা, বেশী কথ বোলো না—আমি যা নির্দেশ দেবো যথাযথ ভাবে করে যেও।" মাথা নিচু করে রইলাম এবং তখনই বুঝতে পারলাম শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি।

আমরা যে কয়দিন বোম্বাইয়ে ছিলাম সরোজিনী দেবী অনবরতই আমাদের সঙ্গে

সরোজিনী নাইডু

ছিলেন, এবং সব কিছুই তাঁর নির্দেশ মত হ'ত। দেশের লোক তাঁকে একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবেই জানে, কিন্তু তারা জানে না তাঁর ভিতরে কি একটা গভীর মাতৃত্বের স্রোত বয়ে চলতো। আমাদের শান্তিনিকেতনের ছোট ছেলেমেয়েদের ওখানে গুজরাটী মারাঠী খাবারে অসুবিধা হবে বলে তিনি প্রতিদিন প্রবাসী বাঙ্গালীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানা প্রকার খাবার আচার চাটনী ইত্যাদি যোগাড় করে নিজে তাদের খাবার সময় উপস্থিত থেকে খাইয়ে আসতেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৬ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। গুরুদেব তখন দিল্লীতে। সরোজিনী দেবীও তখন দিল্লী। কন্যা পদ্মজা খুবই অসুস্থ। তারা রয়েছেন শ্রেষ্ঠী স্বর্গীয় স্যার শংকরলালের অতিথিশালায়। সরোজিনী দেবী যখন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, গুরুদেবের ঘর তখন ফুলে, মালায় ভর্তি। সরোজিনী দেবী আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বল্লেন —"বিবি খুব অসুস্থ, তুমি কিছু ফুল নিয়ে ওর কাছে যাও এবং বল, গুরুদেব তোমাকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন।" পীড়িতা কন্যার মায়ের সেই ছলছল চোখের কথা আজো ভুলতে পারি নি। গুরুদেব তক্ষুনি দুই-এক ছত্র পদ্মজাকে লিখে দিলেন এবং যতদূর মনে পড়ে, পরে তাঁকে দেখতেও গিয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ের ভ্রমণ পর্ব শেষ হলে আমরা ওয়ালটেয়ার হয়ে হায়দ্রাবাদে যাই। হায়দ্রাবাদ সরোজিনী দেবীর স্ব-দেশ। তাঁর "গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড" (Golden Threshold) বাড়ি হায়দ্রাবাদের একটি পীঠস্থান। কিন্তু হায়দ্রাবাদের সব ব্যবস্থা সরকারীভাবে হয়েছিল, এবং সরোজিনী দেবী সেখানকার অনেক অনুষ্ঠানেই অতিথিরূপে ছিলেন, উদ্যোক্তারূপে নয়।

অবনীন্দ্রনাথের পর সরোজিনী দেবী বিশ্বভারতীর আচার্য পদে বৃতা হ'ন। সেই হিসাবে তিনি বার কয়েক শান্তিনিকেতনে এসেছেন। অবশ্য আগেও এসেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি তখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এবং বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজগোপালচারিও এসেছেন। আগের দিন সন্ধে বেলা সরোজিনী দেবী এসেছেন—আর পরের দিন ভোরবেলা রাজগোপালচারী বোলপুরে ট্রেন থেকে নেমে এলেন। প্রাথমিক সাদর সম্ভাষণের কিছু পরেই রাজাজী তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে—কী যেন এক গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমাদের মনে হ'ল দুই রাজ্যপালের মধ্যে কোন একটা রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছে, হয়ত বা কোনো একটা জরুরী সলা-পরামর্শ। কিছুক্ষণ পরে বেশ একটু গম্ভীর মুখ করে সরোজিনী নাইডু আমাদের আসরে ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যেন হাসি চাপতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে বল্লেন, তোমাদের কাছে 'সিরিয়াস' কোনো কথা বলা যায় না। জান, তোমাদের রাজ্যপাল কী বল্লেন? অবশ্যি তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন আমি কাউকে কিছু না বলি। তিনি বল্লেন, তোমার একটুকুও গাম্ভীর্য নেই— কিন্তু খেয়াল রেখো, তুমি এখন রাজ্যপাল, আমিও এই প্রদেশের রাজ্যপাল। গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলাফেরা করো। এমন কিছু করো না, বা, এমন কিছু বলো না যে লোকে হাসিঠাট্টা করতে পারে। বলেই তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

নিজের সম্বন্ধে তিনি বেপরোয়া হয়ে

হাসিঠাট্টা করতেন। রাজাজীর সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি, তাঁর কাছেই শোনা। সরোজিনী দেবী তখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ও রাজাজী দিল্লীতে বড়লাট। সরোজিনী দেবী কি একটা সরকারী কাজে দিল্লী এসেছেন ও বড়লাটের অতিথি। রাজাজী স্বয়ং সরোজিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বড়লাটের বিরাট প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, এবং শেষে লাটের নিজের থাকবার অংশে এলেন। তাঁর শোবার ঘরে বিরাট এক পালঙ্ক বোধ হয় ভূতপূর্ব অতিকায় বড়লাট লিনলিথগোর আমলে তৈরী। রাজাজী বল্লেন, "দেখো সরোজিনী, আমি এতো ছোট অথচ কী প্রকাণ্ড একটা পালঙ্ক আমাকে দিয়েছে।" সরোজিনী দেবী উত্তর করলেন, "রাজাজী, জীবনে অনেক দুঃসময়েই আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি তো কিছুই করতে পারবো না"।

এই গল্প বলতে গিয়ে সরোজিনী দেবী পদমর্যাদা, বয়স সব ভুলে গিয়ে, ছোটো শিশুর মত হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

নন-কোঅপারেশনের যুগে তাঁকে একবার প্রবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে পূর্ব আফ্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেখানকার প্রতিটি নগরে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। সেদেশে বহু গুজরাটী ও খোজা ব্যবসায়ী থাকতেন। সেখানে কোনো এক ছোট শহরে একজন খোজা ব্যবসায়ী অভ্যর্থনা সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। তাঁর প্রচুর অর্থ প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু তিনি ইংরেজীতে খুব একটা দক্ষ ছিলেন না। স্থানীয় একজন শিক্ষিত যুবক তাঁর অভিনন্দনটি লিখে দিয়েছিলেন। এবং তার মধ্যে তিনি সরোজিনী দেবীকে নাইটিংগেল অব ইন্ডিয়া (Nightingale of India) আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই বেনিয়া ভদ্রলোক জীবনে কখনো নাইটিংগেল কথাটি শোনেন নি। তিনি নাকি তাই শুদ্ধ করে বলেছিলেন সরোজিনী দেবী the famous naughty girl of India।

নিজের সম্বন্ধে এমনিতর অনেক গল্প তিনি নির্বিবাদে করে যেতেন। সদাপ্রসন্ন সরোজিনী দেবী গান্ধীজিকেও ঠাট্টা করতে ছাড়েন নি। তিনি ছাড়া আর কে গান্ধীজিকে 'মিকি মাউস' বলতে পারতো? শুনেছি, একবার কে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি তো গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই ভালোভাবে জানেন। তাঁদের মধ্যে কে বেশী cultured? তিনি তক্ষুনি ভুরু কুঁচকে বল্লেন, "What does Gandhi know of Culture? He might know something of agricul-ture." সে সময় গান্ধীজি দিল্লীতে এলে সাধারণত দিল্লীর শেষ প্রান্তে ভাঙ্গী কলোনীতে থাকতেন। অবশ্য তাঁর আসবার আগে সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কেতাদুরস্ত করে রাখা হ'ত। এ সম্বন্ধে সরোজিনী দেবী বলেছিলেন, "If Bapu knew what it costs us to keep him inpoverty, he would have lived a more normal life.

১৯৩৬ সালে গুরুদেব যখন দিল্লীতে, সরোজিনী দেবীও সেখানে ছিলেন। তিনিই উদ্যোগ করে প্রিন্সেস অব বেরারের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন—প্রিন্সেস গুরুদেবকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন। আমার বেশ মনে আছে, নিমাটের পথে আমরা হায়দ্রাবাদ হাউসে লাঞ্চ খেয়ে গিয়েছিলাম। এ সম্বন্ধে একটা কাহিনী বহু প্রচলিত আছে যে, প্রিন্সেস কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন—Poet, you are so beautiful এবং গুরুদেব নাকি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন—Princess, so are you। আমি লাঞ্চে উপস্থিত ছিলাম—কিন্তু এ ঘটনা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আমার মনে হয় গল্পচ্ছলে সরোজিনী দেবী এটা বানিয়েছিলেন এবং কালক্রমে এটা বহুলভাবে প্রচারিত হয়।

সরোজিনী দেবী সাধারণত আমাকে 'রাস্কেল' বলে ডাকতেন, দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন—"কী সব নতুন কেচ্ছা জোগাড় করেছ?" তারপর নিজেই তাঁর ঝুলি থেকে অনেকসব গল্প আমাদের শোনাতেন। এবং তার বেশী ভাগই একটু risqui ধরনের। সেবার গরমের সময় তিনি দিল্লীতে—গরমের জন্য সবাই আইঢাই করছেন—এমন সময় একজন বাঙ্গালী M.L.A. নাকি বলেছিলেন—কেন? আমিও আমার backside খুলে রাখি—বেশ হাওয়া পাওয়া যায়। চলতি ইংরেজীতে backside-এর অর্থ অনেকেই বোধ হয় জানেন। ভদ্রসমাজে কথাটা অপাঙ্‌ক্তেয়। সরোজিনী দেবী কিন্তু অবিচলিতভাবে গল্পটি করতেন।

একবার আমি অত্যন্ত একটা বেপরোয়া বাচালতা করেছিলাম। গুরুদেবের মৃত্যুর পর সরোজিনী দেবী শান্তিনিকেতন এসেছেন। তিনি যখন এখানে আসতেন আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাধারণত তাঁর সঙ্গে রথীদার ('রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ওখানে খেতাম। কিন্তু সেদিন আমার স্ত্রী কি একটা কাজে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন ও তিনি টেবিলে উপস্থিত ছিলেন না। তখন তাঁর 'ঘরোয়া' বইখানা সদ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। সরোজিনী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—"রানী ছবিটবি আঁকছে?" রথীদা বল্লেন, "রানী এখন লেখিকা হয়ে উঠেছে, খুব নাম কিনেছে।" সরোজিনী দেবী তখন আমার দিকে ফিরে ব্যঙ্গ করে বল্লেন— And what are you?" আমি বলে বসি—"Why Madam, I am Sarojini Naidu husband." তিনি তখন হেসে "Yo impudent rascal" বলে আমার পি বেশ একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

তাঁর স্বামী মেজর নাইডুর সঙ্গে এক পরিচয় হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর মত বিখ্যাত না হলেও তিনি দাক্ষিণাত্য প্রথিতযশা সার্জেন ছিলেন। বৃদ্ধ ব তাঁকে দেখেছি—কী সুন্দর তাঁর চেহারা কী পরিমার্জিত ও রসাল আ আলোচনা।

একবার শুধু সরোজিনী দেবী অপ্রস্তুত হতে শুনেছি। কংগ্রেস ওয়ার কমিটির এক জমায়েতে সরোজিনী আমাদের বিধানচন্দ্রকে বলেন, "বিধান, are over sixty and yet, when smile there are dimples on y cheek." বিধানচন্দ্র উত্তর দিলে "Sarojini, you are over sixty yet you can notice it." সরোজি দেবী আর উত্তর দিতে পারেন নি।

তিনি অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন যখনি কলকাতায় আসতেন, আমার, দাদা ওখানে ("অপূর্ব কুমার চন্দ") কখনই একবেলা না খেয়ে যেতেন না। তাঁর বিশেষ মায়েশী ছিল, আমাদের সিলেটী রান্না কুচো চিংড়ির অতি ঝাল চচ্চড়ি। আমাদের দিশী ভাষায় ওর নাম আমরা দিয়েছিলাম "খাইয়া নাচুনী"—অর্থাৎ ঝালের জন্য খেয়ে নাচতে হয়। এ জিনিষটা তাঁর খু পছন্দের ছিল। কোনো কখনই ভুলতেন না—আমার "খাইয়া নাচুনী" ঠিক থাকে।

তিনি যখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপা দুবার তাঁর ওখানে আতিথ্য নেবার আম সৌভাগ্য হয়েছিল। সকালে প্রায়ই দর্শনে জিজ্ঞেস করতেন—"আজ কী খাবে ইংরেজী না মোগলাই না তোমাদের মা ঝোল? তারপরে রীতিমত একটা পা বারিক ক্যাবিনেট বসে যেতো—এবং অনে ক্ষণ ধরে খাবার সম্বন্ধে আলোচনা সেদিনের ভোজ্য তালিকা প্রস্তুত হ'ত। সভায় লাটভবনের মেজরডোমো গোয়ানী ফ্রান্সিস প্রায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরই মত আ আলোচনা করত।

তাঁর পিতামাতা দুজনেই বাঙ্গা কিন্তু বাংলা প্রায় জানতেনই না। ভাষা তেলেগুও তাঁর আয়ত্তের বাইরে হায়দ্রাবাদের উর্দুই ছিল বলতে গেলে নিজের ভাষা। তাঁর বাগ্মিতার কথা সকল জানেন—শুনেছি, উর্দুতেও নাকি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। আমাদের দে বড়ছোট প্রায় সব বক্তারই বক্তৃতা শু কিন্তু কেউই বোধ হয় তুলনায় তাঁর সম

ছিলেন না। তাঁর এই অতুলনীয় বাগ্মিতার কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কন্যা পদ্মজা নাইডু ও পুত্র জয়সূর্য পেয়েছিলেন।

তরুণ লেখক, গাইয়ে বা শিল্পীদের সব রকমের উৎসাহ দিতে তিনি নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। তাঁরাই বিশেষ আগ্রহে ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে আইফ্যাকস-এ আমার স্ত্রীর এক ছবির প্রদর্শনী হয়। এর জন্য তিনি বিশেষভাবে লখনউ থেকে এসেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের ধরে এনে এনে অনেকগুলি ছবি বিক্রীর ব্যবস্থা করে দেন। এই প্রদর্শনীর জন্য তিনি একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। গান্ধীজির বড় একখানা ছবিও তাঁর সরকারের জন্য কিনে নিয়েছিলেন।

গুরুদেবের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের ছাত্র সমিতির আমন্ত্রণে গুরুদেব সেখানে যান। তখন লাহোরে হাড়-কাঁপানো শীত, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হচ্ছে। গুরুদেব বেশ একটু অসুস্থই বোধ করছিলেন। যেদিন শহরে মহিলা সমিতির সম্বর্ধনা হয়, সেদিন গুরুদেব রীতিমত পীড়িতই ছিলেন। সেই সভায় অত্যন্ত করুণ-অক্ষ ভাষণ দিয়েছিলেন গুরুদেব, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন, আমার যাবার দিন হয়ে এলো। তোমরা মনে রেখো তোমাদের কবি তোমাদের কাছে এসেছিলেন, তোমাদের ভালোবেসেছিলেন, এ কথাটাই শুধু মনে রেখো। সেদিন অনেকেরই চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। তার পরদিন সকালবেলায় ট্রেনে সরোজিনী দেবী কোনো এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য লাহোর পৌঁছান ও সংবাদপত্রে পূর্ব দিনের সভার বিবরণ পড়ে সোজা স্টেশন থেকে গুরুদেবের কাছে এসে উপস্থিত হন। ঘরের চারপাশে ছাত্রদের ভিড় ও তারা উঁকিঝুঁকি মারছিলেন কিভাবে তাঁদের দুজনের কথাবার্তা হয় জানবার জন্য। সরোজিনী দেবী গুরুদেবের কাছে এসে বললেন—"Poet, what is all this? তুমি এভাবে আমাদের কাঁদাতে পার না।" এই বলে তাঁর কাছে ঝুঁকে পড়ে গালে চুমো দিলেন। তারপর বললেন, 'আমি লাহোর ছাড়বার আগেই তুমি সুস্থ হয়েছে যেন দেখতে পাই।"

সে সময় কন্যা পদ্মজা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ১৯৩৯ সালে চিকিৎসার জন্য পদ্মজা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। পরে স্থির হয়, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে শরীরের পরিচর্যা করবেন। সে সময় সরোজিনী দেবী নিতান্ত করুণ একখানা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, "পদ্মজা অসুস্থ হয়ে তোমাদের ওখানে যাচ্ছে। আমি মা হয়েও এ সময় তার কাছে যেতে পারছি না। তোমরা আমাদের 'আনটি' বলে ডাকো, নিশ্চয়ই সেটা শুধু মুখের কথা নয়। তোমরা 'আনটি'র এই অসুস্থা কন্যার যথাযথ শুশ্রূষা করবে, আমি আশা করি ও বিশ্বাস রাখি। আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ তোমরা নিয়ো।" এই চিঠির মধ্যে প্রতি অক্ষরে বাংলা মায়ের স্পর্শ ফুটে উঠেছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে এ আই সি সির মিটিং-এ সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন, তখন ক্ষিপ্ত জনতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানসূচক ব্যবহার করেছিল। তিনি সেবার ডাঃ বিধানচন্দ্রের ওখানে অতিথি ছিলেন এবং সেই জনতা বিধানচন্দ্রের বাড়ির অনেক কাচের জানলা ও বাইরের বড় ঘাড়ীটি ভেঙে চুরমার করে দেয়।

আমি তার কিছু পরেই তাঁকে নিয়ে গুরুদেবের কাছে আসি ও তিনি পরে "পরিচয়"র সাহিত্য আসরেও যোগ দিতে যান। কিন্তু তিনি ওই ঘটনার জন্য একবারও কোনো রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। বরং বার বার বলছিলেন, "সুভাষ আমাদের লীডার, আজকে না হয় একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে, কিন্তু দু দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে—সুভাষকে কি আমরা ফেলতে পারি? সুভাষ আবার আমাদের লীডার হবে।"

রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত ছিলেন বলে শেষ জীবনে তিনি সাহিত্যচর্চার সুযোগ পান নি। এ জন্যে তাঁর অনুশোচনাও ছিল। ১৯১৮ সালে হোম রুল আন্দোলনের পর থেকে যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে তিনিই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম সভাপতি হন। ভাষার মাধুর্যে সেই অভিভাষণটি কবিতার মত শুনিয়েছে।

আজ প্রায় ২৫ বৎসর তিনি আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছেন, কিন্তু যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন—তিনিই তাঁকে কখনো ভুলতে পারবেন না। আমরাও তাঁকে ভুলি নি, ভুলি নি তাঁর মনীষা, বাগ্মিতা, কৌতুকপ্রিয়তা, স্বদেশ সেবা এবং সর্বোপরি পরদুঃখকাতরতা।

গীতধর্মী রবীন্দ্রকবিতা ও গীতবিতান

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানের কালানুক্রমিক সূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে জেগেছে যা আপনাদের পত্রিকা মারফৎ রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগী ও রবীন্দ্রকাব্য-বোদ্ধাদের নিকট পেশ করছি।

প্রশ্ন—গীতবিতানের সকল গানই কি গেয়? অর্থাৎ সকল গানেই কি সুরতালাদি প্রদত্ত হয়ে গীত হয়?

আমরা জানি গীতবিতান প্রথম দুই খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে। এই সংস্করণের সম্পাদনার ভার অর্পিত হয় তরুণ কর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র করের উপর। অধ্যাপক অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন এই সম্পাদনার পরামর্শদাতা। "কৈশোরক পর্যায়ের গান হইতে বসন্ত-গীতিনাট্য অবধি মোট ১১২৮টি গান লইয়া গীতবিতান প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কবির নির্দেশ মত এই সংগ্রহ হইতে ১৪৮টি গান বাদ পড়িল।" মোট কথা, গীতবিতানের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩০ সাল পর্যন্ত রচিত গানের সংগ্রহ।

অতঃপর ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়। কিন্তু কালে গীতবিতানের এই সংস্করণ কবির কাছে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর মতে "সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গান-গুলিকে বিষয়ানুক্রমিক শৃংখলাবিধান করতে পারেননি। তাতে যে কেবল ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয় সাহিত্যের দিক থেকে রসোবোধেও ক্ষতি হয়েছে।" তাই জীবন সায়াহ্নে কবি তাঁর প্রায় দু হাজার গানকে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে' সাজিয়ে গীতবিতানের নূতন রূপদান করেন। ছাপার কাজ ১৩৪৬ সালের ভদ্র মাসে সমাপ্ত হয়। গীতবিতানের এই সংস্করণ ছাপা হলে কবিকে দেওয়া হয়—প্রকাশকাল ১৩৪৬ মাঘ। কিন্তু এই সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়নি কারণ পূর্বতন সংস্করণের দুই সহস্র কপি তখনও নিঃশেষিত হয়নি। কবি-কৃত গানের সংস্করণ খণ্ডটি বিক্রয়ার্থে বাজারে ছাড়া হয় ১৩৪৮ মাঘ মাসে। অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ছয় মাস পরে Title Page পাল্টিয়ে। তারপর গীতবিতান ৩য় খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৩৫৭ সালে। কবির তিরোধানের নয় বৎসর পরে।

এখন আমাদের সমস্যা এই তিন খণ্ড গীতবিতানে যেসব গান আছে তাদের সব-গুলিতেই কি সুর দেওয়া হয়েছিল? একটা গান (?) হঠাৎ মনে পড়লো—'তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা।' (গীতবিতান পৃঃ ৩২২) গানটির রচনার তারিখ ১১ই আষাঢ় ১৩২১ বোলপুর—প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রবাসী পত্রিকায়। আসলে এটি ছিল ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের স্বাক্ষর সংগ্রহ খাতায়। 'গান' গ্রন্থে ১৩২১ সালের সংস্করণে গানটি (?) প্রথম গ্রন্থিত হলো (পৃঃ ১৩৪)। এখন আমরা এটাকে কি গান বলে উল্লেখ করবো? কারণ সুর-তালাদির তো উল্লেখ নেই-ই—গ্রন্থভুক্ত-কালে গীত হয়েছিল বলেও জানা যায় না। কবি স্বয়ং এইটিকে 'গান' বলেই মনে করে গীতবিতানের ১ম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (পৃঃ ৩৯৬)। কিন্তু সুর কোথায়? এরকম আরও বহু গান আছে এবং এখনও গীতবিতান ৩য় খণ্ড নূতন সংস্করণ করার কালে অনেক নূতন নূতন গান সংযোজিত হচ্ছে। এসব গানগুলির সুরতালাদি কোথায়—কেউ বলতে পারেন? মনে পড়ছে একটি কবিতার দুই পংক্তি—প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ॥ উপরি-উক্ত পংক্তি দুটি আছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। কিন্তু গীতবিতান ৩য় খণ্ডে গানটি যখন অন্তর্ভুক্ত হলো তখন পাণ্ডু-লিপি থেকে পুরো গানটি নেওয়া হয়—একটি সম্পূর্ণ গীতরূপ পেলাম—কিন্তু এর সুর কে বলবেন? কখনো কি আদৌ সুর দেওয়া হয়েছিল? তাও কেউ বলতে পারবেন কি? গানটি রচিত হয় ১৩৪১ সালে ১৬ই শ্রাবণের কাছাকাছি সময়ে। এ রকম উদাহরণ আর কতো বাড়াবো?

আমাদের প্রশ্ন গীতধর্মী কবিতাকে যদি কবি স্বয়ং গীতবিতানে অন্তভুক্ত

করে থাকেন এবং তারপরে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে যদি প্রত্যেক সংস্করণ কালে নূতন নূতন গীতধর্মী কবিতাকে গান বলে স্বীকৃতি দান করা হয়—তবে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির বহু গীতধর্মী কবিতাকে কেন 'গান' বলে আমরা স্বীকার করবো না?

পঙ্কজ মল্লিকের সুর দেওয়া বিখ্যাত গান 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' 'শেষ খেয়া' গীতবিতানে 'গান' বলে স্বীকৃতি পাবে না কেন? পঙ্কজ মল্লিক আরও কয়েকটি রবীন্দ্র কবিতায় যথার্থ সুরারোপ করে সেগুলিকে গীত-পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—আমাকে লেখা ব্যক্তিগত পত্রে এর উল্লেখ আছে।

কিছুদিন আগে শ্রীপাঁশ্বমল হোম একটি গানের তালিকা পাঠিয়েছেন—তাতে তাঁরই সুর প্রদত্ত গান রয়েছে অথচ সেগুলি সম্পূর্ণ কবিতা। একটি উদাহরণ দিই—আপনাদের বহু পরিচিত কবিতা 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে'—এটিতেও তিনি সুরারোপ করেছেন—তাহলে এটিকে কেন আমরা গান রূপে স্বীকৃতি দেবো না।

অথচ নিছক কবিতাতেও কবি সুরারোপ করে গানে রূপান্তরিত করেছেন, যেমন সোনার তরীর 'দুই পাখী', 'কৃষ্ণকলি'—এ তালিকা দীর্ঘ করা যায়। সাধারণ কবিতাকেও কবি স্বয়ং গীতরূপ দান করেন। ১৩০৮ সালে লিখিত 'তোমার কটি তটের ধটি' কবিতাটি ১৩৩৮ সালে গীতরূপ প্রদত্ত হয়।

এখন আমাদের প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথে সমস্ত গানেই কি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সু আরোপিত হয়েছে? তাতো ঠিকভাবে ব যায় না। জীবনস্মৃতিতে তিনি স্প ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে আহমদাবা বাসকালে নিজ গানে প্রথম সুর করেন। তারপর বহু গান সারাজীবন ধ রচনা করেছেন—কিন্তু সবগুলিতেই তিনি সুরারোপ করেছিলেন তার তো কে উল্লেখ পাই না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ম মরীতে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুর পূর্বে প্রদত্ত—যেমন ভানুসিংহ ঠাকু গানগুলি। আমাদের মনে তাঁর অনেক গানে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক সুর প্রদত্ত হ আমাদের প্রশ্ন গীতধর্মী যে কবিতা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি রয়েছে সেগুলিকে যথাযথ সুরতাল প্রয়োগ করে পুরো গানের মর্যাদা গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা? বিষয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করছি যা প্রধান গীতধর্মী—

১। যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যে যাই (গীতাঞ্জলি)

২। হে মোর দুর্ভাগা দেশ (গীতাঞ্জলি

৩। সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে (গীতাঞ্জলি)

৪। কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নি গো কিনে? (গীতিমাল্য)

৫। কত দিন যে তুমি আমায় ডেকে নাম ধরে (গীতিমাল্য)

৬। সকল দাবি ছাড়বি যখন পাওয়া সহ হবে (গীতিমাল্য)

৭। কাণ্ডারী গো, যদি এ পেী থাক কূলে (গীতালি)

৮। আমার সুরের সাধন রইল প (গীতালি)

৯। সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল তোম চরণতলে (গীতালি)

১০। তব দক্ষিণ হাতের পরশ কর সমর্পণ (সানাই)

১১। ধূপ আপনারে মিলাইতে চা গন্ধে (উৎসর্গ)

১২। আজিকে তুমি ঘুমাও আ জাগিয়া রব দুয়ারে (স্মরণ)

১৩। আজি উন্মাদ মধুনিশি ও নিশীথ শশী (কল্পনা)

১৪। কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎ নিশীথে (চিত্রা)

১৫। আমার দিনের শেষ ছায়াটি মিশাইলে মুলতানে (রোগ শয্যায়)।

ঊর্মি

কণা বসু মিশ্র

ঊর্মি বসে বসে খাতা দেখছিল। ওর দুটো ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে মাঝে যখন লাল পেন্সিলের কড়া খাতার প্রায় প্রতিটি পাতাই ভরে । এত ভুল লেখে মেয়েরা! আলেক-ার কালিন্দী পর্বত অতিক্রম করে আক্রমণ করেছিলেন! হিন্দুকুশ ত লিখেছে কালিন্দী। আর ওদিকে ারের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ন যদুভট্ট। কোথায় তানসেন লিখবে, া লিখেছে যদুভট্ট এসব কথা পড়ে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। আর পড়াতে ভাল লাগে না। দু দিন পর শুধু উইক্‌লি টেস্ট আর মান্‌থলি টর ঘটা। গাদা গাদা খাতা দ্যাখো। তারপর যদি একটাও ভাল খাতা হয়। ক্লাসে পড়ানোর সময় ওরা এমনভাবে র দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মিস্ যা ন, সব বেদবাক্যের মতন শুনে যাচ্ছে। র মনে হয়, প্রেম করে করেই মেয়ে-ার এই অবস্থা হয়েছে। অল্প বয়েসে মী করলে যা হয়। আজকাল সেভেন র মেয়েরাও যা পাকা! এই তো সেদিন ের সঙ্গে বাঁধ দেখতে গিয়ে ঊর্মি ক ডজন ছাত্রীর মুখোমুখি হয়েছিল, সঙ্গে রয়েছে অতিআধুনিক হিপি- যুবকেরা। ঊর্মিকে দেখেও ওদের রকম সঙ্কোচ হয়নি। বরং অজস্র ইভনিং শুনিয়ে শুনিয়ে ওরা মিসকে ন করে তুলেছিল। হলের অন্ধকারে চাপা হাসি আর ফিস্‌ফিসানির জ্বালায় ঊর্মি অস্থির হয়ে উঠেছিল। সুগতকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির পর এখন একটু রোদ উঠেছে। অবশ্য বাতাসে বাদলার ছোঁয়া এখনও রয়েছে। তবুও ঘরে ফ্যান চলছে। ঊর্মির গরম বোধটা একটু বেশী। তারপর আবার এই খাতার বোঝা ওকে রীতিমত কাহিল করে ফেলেছে। মনে মনে ঊর্মি ছটফট করছে, কখন এই দায় থেকে সে উদ্ধার পাবে। কলেজে একটা কাজ পেলে হত। প্যানেলে ইণ্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু কোন লাভই হয়নি। সুগতরও কোন একটা হিল্লে হল না। সমানে ইণ্টারভিউ দিয়েই চলেছে। চাকরি আর হচ্ছে না। এখন দিল্লীতে গেছে ফার্টিলাইজার কর্পো-রেশন অব ইণ্ডিয়াতে একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে। কাজটা ওর হবে বলে মনে হয় না। একটা পাকাপাকি কাজ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারছে না সে ঊর্মিকে। এদিকে বিয়ের অজস্র সম্বন্ধ আসছে ওর। বাবা-মার কথার অবাধ্য না হয়ে পাত্রপক্ষের কাছে দুএকটা ইণ্টারভিউও দিয়েছে ঊর্মি। তার মধ্যে একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ারও আছেন। তিনি এখন মাইথনে। আর সব সম্বন্ধগুলো নাকচ হয়ে গেছে। শুধু এইটেই ঝুলছে। কেননা, পাত্রের বড় বেশী ভাল লেগে গেছে ঊর্মিকে। মা, বাবারও ইচ্ছে এখানেই হোক। বেকার এঞ্জিনিয়ার সুগতর হাত থেকে তাঁদের মেয়েটা অন্তত রেহাই পাক। অথচ ঊর্মির পছন্দ নয় সেই পাত্রকে। সুগতকে তার জীবনের কোন একটা সমস্যা বলেই মনে করে না ঊর্মি। ওকে যে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন দাসখতও লিখে দেয়নি সে। আসলে ভদ্রলোককে ওর খুব উন্নাসিক মনে হয়েছিল। খাবার প্লেট সামনে রেখে মা যখন তাঁকে বললেন, খাও বাবা, লোকটা তখন চাবির রিঙ দোলাতে দোলাতে বলে-ছিল, অন্‌লি এ সিঙ্গল কাপ অব টি। —ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ লেগেছিল ঊর্মির। সাধারণ এক বাঙালী বয়স্কা মহিলার এই আন্তরিকতাটুকু প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আর যাই হোক, বাহাদুরী কিছু নেই। টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

ঊর্মির ইচ্ছে করছিল না। হলঘরে গিয়ে ফোন ধরতে হবে। সিম্‌কুটা করছে কি? ফোনটা ধরতে পারছে না? কিছুক্ষণ আগেও তো ওর কলরব শোনা যাচ্ছিল, ডায়ভুককে নিয়ে পিংপং বল খেলছিল সিম্‌কু। এখন বেলা দুটা। এই অসময়ে-ফোন করলই বা কে? সুগত সাধারণত এই সময় ফোনটোন করে। কিন্তু সে তো এখন কলকাতার বাইরে। ফোনটা বেজেই চলেছে। বেজে বেজে থেমে গেল ফোন। আবার নতুন করে রিঙ হতে থাকল। ঊর্মি ততক্ষণে আরেকখানা খাতা টেনে নিয়েছে। ও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, সিম্‌কু, সিম্‌কু!

সিমকু বাইরের গাড়িবারান্দা থেকে

চেঁচিয়ে বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন পিসি, ষাঁড়ের মতন? —ঊর্মি থমকে গেল। অতটুকু ছেলের মুখে কি কথা। ও বলল, এই, খুব পেকেছিস তো। যা ফোনটা ধর।

সিমকু তবুও ফোন ধরল না, দরজার কাছে এসে বুড়ো আঙুল দেখানে তারপর ডায়ভুর চোখের সামনে পিংপং বলটা নাচাতেই থাকল। ডায়ভুর ঘেউ ঘেউ বাড়ছে। প্রচণ্ড জোরে লাফালাফি করছে। ওদিকে টেলিফোনের আর্তনাদ। ঊর্মির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ও দ্রুত গিয়ে ফোনটা ধরল। ঊর্মি বললো, হ্যালো। —ও পাশের পুরুষ কণ্ঠ বলল, আপনি, মানে ঊর্মি, ঊর্মি তো? —চিনতে পারল না ঊর্মি। তবু বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

—আমি। আমায় চিনতে পারছেন না? আমি মানে......। ততক্ষণে চিনে ফেলেছে ঊর্মি।

কিন্তু চিনতে পেরেও ও না-চেনার ভাবই করলো। ওর বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে তখন। ওর পায়ের তলা ঘামছে। হাত কাঁপছে। ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রিসিভার কানে চেপে ও তাকিয়ে আছে। ঘরের সিলিং দেখছে। ফ্যানটা বন বন করে ঘুরছে। ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে ফরফর করে উড়ছে সিমকুর ছেঁড়া ঘুড়িটা। দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে থমকে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা অনেকক্ষণ। আজ চাবি দেওয়া হয়নি। জয়ন্তানুজ সেন এতদিন পর কি মনে করে ফোন করছে? ঊর্মি ভাবছে। সেই লাজুক, মুখচোরা যুবক, পাপড়ির দাদা। ঊর্মি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এতদিন পর শেষ পর্যন্ত ফোন করল। এই সাহসটুকু সঞ্চয় করতে ভদ্রলোকের পাঁচ বছর লেগে গেল। মনে হয় যেন একটা যুগ।। আশ্চর্য!

ডায়ভু অসম্ভব গোলমাল করছে। এই মুহূর্তে সিমকুটা কি একটু চুপচাপ থাকতে পারছে না?—আমি জয়ন্তানুজ সেন। —ও পাশের ভরাট গলায় বেজে উঠল নামটা। ঊর্মি বলল, কি ব্যাপার? (ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না, ওর গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল কিনা) জয়ন্তানুজ বলল, আপনাকে বড় প্রয়োজন।

সেকি! কেন?

সব কথা কি ফোনে বলা যায়? —একটু যেন বাধো বাধো গলায় জয়ন্তানুজ বলল।

বুঝতে পারছি না, এতদিন পর আমার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে?

ওদিকের কথা থেমে গেল। তারপর দু পক্ষেরই কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে বাজলো ঊর্মির। ওর বলতে ইচ্ছে হল, কাপুরুষ। কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ বলল, আসুন না বিকেলে গড়িয়াহাটের মোড়ে? আপনাকে খুব দরকার।

দরকারটা কি হঠাৎ আজই হয়ে পড়ল? —কৃত্রিম কাঠিন্যের সুর ঝরে পড়ল ঊর্মির গলায়। ও তরফের কোন জবাব নেই। ঊর্মি বলল, হ্যালো! হ্যালো!

শুনছি বলুন।

আমার সময় বড় কম। স্কুলের মেয়েদের খাতা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

বিরক্ত না করে উপায় নেই। আসবেন ঠিক ছটায়? ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে...

কথা শেষ হল না। লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলো ঊর্মি। টেলিফোন বিভ্রাটটা যেন আজকাল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবল জয়ন্তানুজ কে জানে! হয়তো ভাবতে পারে ঊর্মি ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দিয়েছে। ছি, এতখানি অভদ্র সে নয়। ওর বুকের মধ্যে যেন ভারী একটা রোলার চলে যাচ্ছে। অসহ্য একটা চাপা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে ঊর্মি। ঊর্মি ভাবছে, এতদিন পর ও কেন এলো? বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিন-গুলো। এতদিন যে লোক তার কোন খোঁজ খবর রাখেনি, তার নরম মনটা নিয়ে খেলা করেছিল পাঁচ বছর আগে, সেই লোকটার আজ দুম করে টেলিফোন না করলেই কি চলত না? ওর ঘাড়ে এই যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দেবার কি অধিকার ছিল? লোকটা জানতে পারল না, সে ওর কতখানি ক্ষতি করে ছিল। ওর সমস্যাহীন জীবনে সে যে নতুন করে সমস্যা তৈরি করল।

বাইরে বৃষ্টির আকাশ। আকাশে এখন স্লেটের মতন মেঘ। ঊর্মি ভাবছে জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসটা কি খুব বেশী দূরে? বাড়ির সামনে সদর রাস্তা।

অসংখ্য বাস ছুটছে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়। এ সময় বেরুনো খুব কষ্টকর হবে? আজ ট্রাম স্ট্রাইক। একটু না হয় ভিড়ই হবে বাসে। মিনি বাসও তো রয়েছে কিংবা ট্যাক্সি। ছুটার আগেই যদি ওর কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়? একেবারে ওর অফিসের চেম্বারে? তারপর ওখান থেকে যদি বেরিয়ে পড়া যায়! ইডেনের নির্জন ছায়ায়, বার্মিজ প্যাগোডার কাছে বেশ নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লে বেশ হয়। কিন্তু কি কথা বলবে প্রথমে? কি কথা দিয়ে শুরু করবে? ঠিক তেমন মুহূর্তে কি কোন কথা বলা যায়! সিগারেটের আগুনের মত যে লোকটা একটু একটু করে পুড়িয়েছে তার অষ্টাদশী মনটাকে, সেই মানুষটাকে কি ক্ষমা করা যায়? ও হয়ত খুব রূঢ়ও হতে পারবে না। অভিমান, যন্ত্রণা, আবেশ সব মিলে ও যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাকে এক সময় প্রত্যেক সকালে, প্রত্যেক সুন্দর সন্ধ্যায় মনে মনে আরতি করেছে, কামনা করেছে, সেই দুর্লভ মানুষকে হঠাৎ এভাবে পাওয়াটাকে ওর লটারীতে জেতা ভাগ্যফলের মতন মনে হচ্ছে। ঠোঁট কেটে কেটে হাসল ঊর্মি। নিজেকে এখন ওর খুব দামী মনে হচ্ছে, কোন একজনের কাছে নিজেকে দুর্লভ ভেবে। হয়ত সেও তাকে অমনি করেই চেয়েছিল, এত বছরেও ভুলতে পারেনি। আশ্চর্য! আমরা যদি একে অন্যের মন দেখতে পেতাম! ঊর্মি ভাবছে যদি কোনও ক্যামেরায় সেই মনের ছবি তোলা যেত! কি বলতে চায় ও এতদিন পর? আবেগ, সেণ্টিমেণ্টের কথা, নাকি রোমাণ্টিক মনের কয়েক টুকরো ফুলঝুরি? যে জিনিসটা ছেলেদের কাছে দারুণ একচেটিয়া। বড় অসময়ে কেটে গেল লাইনটা। ঊর্মির আফশোস হচ্ছে, ওকে দুটো কথা শোনাতে পারল না বলে। ও মনে মনে আওড়ালো জয়ন্তানুজের সংলাপগুলো, এমন কি তার অসমাপ্ত কথাটাও। ওর খুব ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওকে। ওকে অপমান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ওপরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি আরেকজনকে ভালবেসেছি। আমরা শিগগিরই বিয়ে করছি। অথবা সব থেকে সুন্দর অপমান হয়, যদি ওর সঙ্গে আজ দেখা না করা যায়।

সিমকুটা সমানে ক্ষেপাচ্ছে ডায়মণ্ডকে। তার চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়ছে। বেড়ালের মতন লেজ ফুলিয়ে ও ঘরর্ ঘরর আওয়াজ তুলছে। খুব অসহ্য লাগছে ঊর্মির। অন্যদিন হলে সেও হয়ত ভিড়ে যেত সিমকুর দলে; কুকুরটাকে উত্তেজিত করত। কিন্তু আজ আর পারল না ওদের সুরে সুর মেলাতে। ও ঠাস করে একটা চড় মারলো সিমকুর গালে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল

সিমকু। কাঁদতে কাঁদতে বলল, দাঁড়া, আমি দাদুকে বলে দেব। যা না, বলে দে।

—উর্মি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। ও যেন সিমকুর বয়েসী হয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে। সিমকুকে আরেকটা চড় মেরে ডায়ভুর গলায় চেন পরিয়ে বেঁধে দিল উর্মি রেলিঙের সঙ্গে। সিমকু চেঁচালো কাঁদলো। অভিমানী চোখে তাকাল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দাদুর কাছে। উর্মি অনামনস্কভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর অভিমানী জলভরা চোখ দুটো। অন্যদিন হলে ওর বুক টন টন করত। ও কিছুতেই পারত না সিমকুকে এভাবে কাঁদাতে। কিন্তু আজ যেন ওর পক্ষে সবই সম্ভব। এই তো কিছুক্ষণ আগেও ছিল অন্যজগতে। সিমকু কত বায়না করেছিল, তাকে সব থেকে বেশী প্রশ্রয় দেয় পিসি। কিন্তু টেলিফোনটা আসার পর থেকেই উর্মি কেমন বদলে গেল। ও বার বার অনামনস্ক হয়ে পড়ছে। খাতা দেখায় মন দিতে পারছে না। ওদিকে স্প্যানিয়াল কুকুরটার চেঁচানি বাড়ছে। তার কান্না, সিমকুর কান্না, বাসের শব্দ মিলে ওর কানের মধ্যে বিচিত্র এক অর্কেস্ট্রা বেজে চলল। নিজেকে এত গোলমালের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও একটা মুখ ও ভুলতে পারল না। সে মুখ জয়ন্তানুজ সেনের। কেমন দেখতে হয়েছে? উর্মি ভাবছে, ওর স্বাস্থ্যটা কি আরেকটু ভাল হয়েছে? না তেমনি রোগাই রয়েছে? চশমার পাওয়ারটা নিশ্চয় আরেকটু বেড়েছে! চোখ দুটো কি দারুণ উদাসীন ছিল। ওই চোখ দুটো তো তাকে প্রতারণা করেছিল উর্মির মনে হয়। ওই দু চোখের এমন ভাষা ছিল, যা উর্মিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ওর দিকে অপলক চেয়ে থেকে থেকে নীরবে ভালবাসা জানিয়েছিল। অথচ সেই চোখের মানুষ কোনদিনই কাছে আসেনি।

তখন কলেজ জীবনের প্রথম দিনগুলো। পাপড়িটা প্রায়ই টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। পাপড়ির পাশের ঘরটাই ছিল তার দাদার পড়ার ঘর। দু ঘরের মাঝখানে একটা খোলা দরজা। হাওয়ায় উড়ে উড়ে যেত ছিটের পর্দা। উর্মির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যেত কতবার। প্যাকিং বাক্স কেটে কোনরকম একটা টেবিল করা হয়েছিল। তার পড়ার টেবিল। সে বসত একটা সস্তা কাঠের চেয়ারে। তার বই থাকত কেরোসিন কাঠের তৈরী বুক-সেলফে। নিতান্তই সাদামাটা জীবন। পাপড়ির বাবাকে দেখলে মনে হত, জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নায়ক। নেহাৎ ভাল ছেলে ছিল বলেই জিওলজি নিয়ে অত পড়াশুনো করার সুযোগ পেয়েছিল জয়ন্তানুজ, পাপড়ির দাদা। ফি মাসে মাসে সে স্কলারশিপ পেত। বাকী টাকাটা জোগাড় করত টিউশনি করে। নিজের পড়ার খরচ চালাত এতে এবং সেই সঙ্গে বোনেরও। পাপড়ি গল্প করত। তার দাদার গল্প। বইটই পড়ে তার দাদা।

পাপড়ি বলতে তার দাদা গল্প লেখে।
পাপড়ি বলত, তার দাদা কবিতা লেখে।
পাপড়ি বলত, তার দাদা ছবি আঁকে।

—পাপড়ির মুখে তার দাদার প্রশস্তি শুনতে শুনতে উর্মি একেবারে হাঁ হয়ে যেত। একথা তখন ওর মাথায় আসত না যে, ওই বয়েসে বাঙলাদেশের অনেক ছেলেই কবিতা লেখে, গল্প লেখে। ওটা এমন-একটা বয়েস, যে-সময়ে অ-কবিকেও কবি করে ছাড়ে, অরসিকও রসিক হয়।

পাপড়ির মুখে তার দাদার গুণের কথা শুনতে শুনতে এক ধরনের ভালবাসা জন্মেছিল উর্মির মনে। বৈষ্ণব সাহিত্যে একেই তো বলে গুণগত প্রীতি। নলের প্রতি দময়ন্তী আকৃষ্ট হয়েছিল যেমন। দময়ন্তীর মনেও জন্মেছিল এই গুণগত প্রীতি। উর্মিকে একলা ঘরে রেখে নানা ছল করে বেরিয়ে যেত পাপড়ি। উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে ওদের এই চোখাচোখির খেলাটা বেশ লাগত উর্মির। মাঝে মাঝে কয়েক পলক তাকিয়েও থাকত ওরা। সে চাউনিতে ছিল কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল, একটু মুগ্ধতা। তখন উর্মির উদ্ধত যৌবন। ভালবেসে দেউলে হবার মতন মন। শরীর মন সব কিছু দিয়েই ও চাইত তাকে। ও কতদিন আশা করেছে ও ঘরের মালিক এগিয়ে আসবে। দু ঘরের মাঝখানে তো সামান্য এক চৌকাঠ। একটু বেরোন কি সম্ভব হবে না? কিন্তু সম্ভব তো হ'ল না কোনদিনই। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে উর্মি। ওর পিপাসা বেড়েছে দিন দিন। তবু সে আসেনি। শেষ পর্যন্ত একটা সলজ্জ চাউনি ছুঁড়ে জয়ন্তানুজ বইয়ের খাতায় মুখ ডুবিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত তো এই করে করেই কেটে গেল। সে এল না। কিন্তু আজ এলো, যখন ওর প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ফার্স্ট ইয়ারের সেই মনটা তো আর নেই। নেই সেই অভিসারে যাবার মতন মনের প্রস্তুতি।

ভাল লাগছে না উর্মির। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আজ। ও আবার খাতা দেখায় মন দিল। সুগত দিল্লী গেছে। কাল পরশুর মধ্যেই ফেরার কথা। আজকের এই ঘটনাটা যদি সুগতর কানে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারে না উর্মি। যদিও সুগতর সঙ্গে এমন কোন শর্ত করে নি উর্মি যে তাকেই বিয়ে করবে। বরং ও বলেই রেখেছে মা, বাবা জোর করলে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে করেও ফেলতে পারে। অবশ্য সুগত সে কথা বিশ্বাস করে না। ও হেসে উড়িয়ে দেয়। ও বলে, তোমার মতন সিনসিয়ার মেয়েরা ওসব বিয়ে ফিয়ে করে না। আসলে করার মতন হিম্মত নেই।

উর্মি বলে, যদি কারো সঙ্গে প্রেম-টেম করি?

প্রেম করবে তুমি? আমিই তো তোমায় হাতে খড়ি দিলাম।

যদি তোমার আগেও আর কেউ দিয়ে থাকে?

দিয়ে থাকলেও তা ধোপে টিঁকবে না।

হেসেছিল উর্মি। ভেবেছিল, সুগতর এই শেষ কথাটাই হয়ত কাজে লেগে যাবে। উর্মির মনে হয় সুগতর ভালবাসাটা যেন এক ধরনের জুলুম। ও জোর করে কেড়ে নিতে চায় উর্মিকে। ও দিল্লী থেকে ফিরলেই আবার সেই ছকে বাঁধা রুটিনের জীবন। সকালে স্কুল, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকা, বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তারপর বই পাল্টানো আর বই নেওয়ার খেলাটা খেলতে হবে অন্তত কিছু সময়, যতক্ষণ না সুগত এসে দাঁড়ায়।

তারপর দুজনে মিলে রসকোয় গিয়ে গিয়ে বসা। নইলে আরেকটা কোন সস্তার রেস্টুরেন্ট। খুব বেশী দামী রেস্তোরাঁয় যাবার ক্ষমতা নেই ওদের। কারণ, সুগত বেকার। চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে উর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তার শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বখশিস দেয়। তার কারণ যাতে সে অনেকক্ষণ বসার সুযোগ দেয় তাদের এই পর্দা-ঢাকা কেবিনে। শরীরের চাহিদা পুরোপুরি মেটে না বলে সুগত দারুণ যন্ত্রণা পায়। ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। উর্মি কিছুতেই পুরোপুরি ছেড়ে দেয় না নিজেকে। তবু সুগতর এই স্পর্শ। ওর উত্তাপ তার মন্দ লাগে না। সে যাকে চেয়েছিল তাকে জীবনে পায়নি বলেই যেন ও নিজেকে আরো বেশী ছেড়ে দেয় সুগতর কাছে। এক সময় শরীরের উত্তেজনা মিটে যায়। তখন এক ধরনের ক্লান্তি আসে ওর মধ্যে। তখন সুগতকে ওর খুব বিশ্রী লাগে। অথচ পরদিন আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। সুগতের জন্য অপেক্ষা করে। ওর প্রয়োজনটা যেন উর্মির কাছে এক ধরনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে যেতে হবে। ওকে সঙ্গ দিতে হবে। আর ওকে এভাবে পেয়ে সুগতরও অধিকার বোধটা দিন দিন পোক্ত হচ্ছে। ও যেন স্বচ্ছন্দিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ওর ওপর কর্তৃত্ব

টায়। প্রায় ওর কথামতই চলতে হয় সুকে। এ যেন সেই সীতাকে লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দেওয়া—"এই গণ্ডীর বাইরে গেলেই তোমার ভীষণ বিপদ।"—সুগতর বাঁধা গণ্ডীর মধ্যেই পরিভ্রমণ করতে হয় ওকে। অথচ ওর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। সুগতকে অস্বীকার করতে। কিন্তু ও পারে না। বিবেকটা ওর মধ্যে যেন বড় বেশী উঁকি মারে। শুধু তাই নয়। ঊর্মি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছে, সুগতকে ও ভালবেসেছে। দিনের পর দিন ওর সান্নিধ্যে আসার ফলে এই প্রীতির জন্ম হয়েছে। একেই তো বলে বৈষ্ণব সাহিত্যে সাধিগক প্রীতি। সুগত খুব হাল্কা ধরনের চটুল, চপল কথা বলতে ভালবাসে। ঊর্মির প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। ওর ভালবাসা মনকে খুব স্পর্শ করে না ঊর্মির। তবু ওর সঙ্গ লাভের প্রয়োজন হয়। খুব গভীর কিছু ও আশা করে না সুগতর কাছে।

ও ঠিকই এসে দাঁড়াল বিকেলে। না এসে পারল না। বেরনোর আগে ওর মন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, আসবে কি আসবে না। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন ও অন্যমনস্কভাবে শাড়িটা পালটালো। বাড়ি থেকে পৌনে ছটায় বেরিয়ে ও কিছুতেই এসে পৌঁছুতে পারল না সময় মতন। বাসটাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আসছে। পাতাল রেলের রিহার্সাল চলছে এখন সারা কলকাতায়, তাই ট্রাম, বাসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সব জায়গায় লাইন বসানো হবে সে সব জায়গা থেকে।

গড়িয়াহাটে ভিড়। রোজই যেমন থাকে। ফুটপাথে কাতারে কাতারে মানুষ, দোকান। রঙ বেরঙের পোশাক আর যুবক যুবতীর জৌলুস দেখতে দেখতে ও এসে দাঁড়ালো ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে। ও আজ ফলসা রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউজ, এলো খোঁপা। এই সাধারণ সাজগোজের মধ্যেই ওকে সুন্দর মানিয়ে যায়। ওর মিষ্টি চেহারার একটা মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। ওর চলাফেরায় রয়েছে আভিজাত্য। একন্যই সুগত নাকি ওর প্রেমে পড়েছিল। কথাটা ভেবে একটু হাসল ঊর্মি।

ঘড়ির কাঁটা আরেকটু এগিয়ে চলল। যার জন্যে ওর অপেক্ষা সেই মানুষের দেখা নেই। অতএব ওকে আরো কিছু সময় দাঁড়াতেই হ'ল। ও ভাবল, ও কি জায়গা ভুল করল? অথবা সময় ভুল? নাকি আধঘণ্টা দেরী করেছে বলে সে এসে ফিরে গেল? এ সব ভাবতে ভাবতে ক্রমেই হতাশ হতে থাকল ঊর্মি। কেমন এক বেদনাবোধে ওর বুক ভারী হয়ে উঠল। এবং ও অনুভব করতে পারল, এতদিন পরেও ও জয়ন্তানুজকে ভোলেনি। কিন্তু আজ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয় ওকে তো ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে ঊর্মি। তবু ওর জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? নিজের কাঠিন্য বজায় রাখতে চেষ্টা করল ও। যদিও ভিড়ের মধ্যে ওর চোখ দুটো খুঁজতে থাকল সেই একজনকেই। ও নিজের মনকে বোঝাতে চাইল, পাঁচ বছর আগে যে লোকটা ওর হৃদয় মন নিংড়ে নিয়েছিল, ওর ফুলের মতন নরম মনে ছুরি চালিয়েছিল, সেই মানুষকে ও ক্ষমা করবে না। ও বোঝাতে চাইল নিজেকে, জয়ন্তানুজকে অপমান করার জন্যই তাকে ওর দরকার। পুরনো দিনের সেই মোহকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়।

সিক্সথ ইয়ারের শেষের দিকে সুগতর সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকে পরিচয় করেছিল সুগত। ঝড়ে বিধ্বস্ত মন তখন ঊর্মির। অতএব সুগতর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই থেকে অনেক ঘুরেছিল ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে, করিডোরে। নিজের মনের রুচির সঙ্গে সুগতকে মেলাতে পারেনি প্রথমেই। সুগতর চালচলনে যে চপলতা ছিল, তার সঙ্গে ও কিছুতেই ছন্দ মেলাতে পারেনি। তবু সুগতকে ও স্বাগতম জানাল। নিজের মনকে জোর করে সইয়ে নিল। ও জয়ন্তানুজকে ভুলতে চাইছিল আসলে। ভুলেও প্রায় গিয়েছিল। যদিও তা সাময়িক। অন্তত এ কথাই আজ মনে হচ্ছে ঊর্মির। সুগতর মতন ছেলেরা কয়েকটি দুর্বল মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

ঘড়ি দেখতে দেখতে ঊর্মি খুব ভাঙা মন নিয়ে ট্রাম লাইন পেরোল। সাতটা বেজে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। কিন্তু রাস্তার উলটো দিকে যেতেই ও দেখলে, জয়ন্তানুজ ট্যাক্সি থেকে নামছে চিনতে ওর এতটুকু ভুল হয়নি। একেবারে হুবহু সেই চেহারাই রয়েছে। শুধু একটু

মোটা হয়েছে এই যা। কোন ভূমিকা না করেই সে বলল, ছটা কুড়ি পযন্ত আপনার দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গড়িয়াহাট চক্কর দিলুম। তারপর আপনার বাড়ির সামনে তীর্থের কাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এই ফিরছি।

যাক্, খুজেছেন তাহলে? ঊর্মি একটু বাঁকাভাবেই বলল।

বাহ্, আমার ওপরে বুঝি সে বিশ্বাস ছিল না?

কথা না বাড়িয়ে বলুন, আপনার কি বক্তব্য?

এইখানে হাটের মধ্যে?

হাটের মধে কথা বলাই তো সব থেকে নিরাপদ।

ট্যাক্সির দরজা খুলে জয়ন্তানুজ বলল, এসো।—(এসো? একেবারে তুমি? কথাটা কানে বাজলো ঊর্মির) ঊর্মির ভাবতে অবাক লাগছে আজই ওদের প্রথম আলাপ। অথচ দুজনেই দুজনের কত বেশী চেনা। জয়ন্তানুজের পরনে দামী মেরুন রঙের প্যান্ট। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় টাই। দাড়ি কামিয়েছে নিখুঁতভাবে জয়ন্তানুজ। নীলচে ভাব রয়েছে ফর্সা গাল দুটোয়। সেই গভীর চোখ দুটো আগের মতই উদাসীন। ওরা পাশাপাশি বসে থাকল দুজনে। কেউ কারো সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

ঊর্মি বুঝতে পারছে জয়ন্তানুজ এখন খুব নার্ভাস। ও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ওর কপালে প্রচুর ঘাম জমেছে। তবু ওর উন্নতিই হয়েছে বলতে হবে। সাত বছর আগে ওকে এভাবে কোন মেয়ের পাশাপাশি বসে থাকাটা কল্পনা করা যেত না।

কোথায় যাবে?—কৃত্রিম স্মার্টনেস বজায় রেখে জয়ন্তানুজ প্রশ্ন করে।

যেখানে নিয়ে যাবেন। ওদের চোখাচোখি হয়।

আমি যেখানে নিয়ে যাব, তুমি সেখানে যাবে?

দেখা যাক, কোথায় আপনার ডেসটিনেশন?—বলল ঊর্মি। হাসল জয়ন্তানুজ।

ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে এসে জয়ন্তানুজ বলল, ট্যাক্সি রোককে। শান্তিনিকেতনী কাজ করা চামড়ার ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল ঊর্মি। জয়ন্তানুজ বলল, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?—জয়ন্তানুজের দিকে তাকিয়ে ঊর্মির কেমন সঙ্কোচ হল।

নিয়নের আবছা আলোয় ঘাসের মধ্যে বসল জয়ন্তানুজ। খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পাশে ঊর্মি। গির্জায় প্রার্থনা হচ্ছে। ওরা চুপচাপ বসে দুজনে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই কি সময় পেরিয়ে যাবে? জয়ন্তানুজ ভাবছে। আজও কি সে কিছুই বলবে না? ঊর্মি ভাবছে, সুগতর কথা। ঊর্মি ভাবছে, দুজনের পছন্দে এত মিল? ঠিক এইখানে, এই ঘাসের লনে সুগতও তাকে নিয়ে বসেছিল মাত্র কদিন আগেও। ও বলেছিল, জায়গাটা নাকি ওর খুব প্রিয়। ঊর্মি ভাবছে, জায়গাটা তেমনিই আছে, শুধু মানুষটাই বদল হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোডটাকে পেছনে করে ওরা আজ বসেছে দুজন। গির্জার চুড়োটার ওপর এক ফালি চাঁদ। চাঁদের আলো আর নিয়ন আলো মিলে একটা স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঠিক এই পরিবেশটা পছন্দ করে সুগতও। সুগত মানুষটার সবটাই স্থূল নয়। সে কিছুটা রোমান্টিকও। কিছু সময় পরে জয়ন্তানুজ একটা সিগারেট ধরায়।

নীরবে সিগারেট টেনে চলে জয়ন্তানুজ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, ভেবে দেখলুম নিজেকে আর প্রবঞ্চিত করব না।

মানে?—ঊর্মি অবাক হবার ভান করে।

তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।

তাই নাকি? কথাটা ভাবতে এত বছর সময় লেগে গেল?

সময় লাগতো না। আমি ঠিক সাহস পাই নি। ভেবেছি, যদি প্রত্যাখ্যান কর।

আজই হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠলেন।

ওর ব্যঙ্গের উত্তরে জয়ন্তানুজ বলল, তুমি আমার স্ত্রী হবে এটাই আমি এতদিন কল্পনা করেছি।

ঊর্মি বলল, শুধু কল্পনা করেছেন?

শুধু কল্পনা নয়। বিশ্বাস করেছি।

কিন্তু সে বিশ্বাসের জন্ম হয়নি বাস্তবে।—বাকী কথাটুকু শেষ করল না ঊর্মি।

তোমায় না পেলে আমি মরে যাব।—গভীর আবেগে কাঁপলো জয়ন্তানুজের গলা।

ঊর্মি ভাবলো, আশ্চর্য, ছেলেরা সব এক। ঠিক এই কথাই বলেছিল সু সেদিন, যেদিন প্রথম এসে ওরা এখানে ব ছিল দুজনে। ঊর্মি ভাবছে, এরপর ও বলবে, তোমার জন্য কত রাত ঘুমোই আমি?—যেমন করে সুগত বলেছিল?

ওর দারুণ জানতে ইচ্ছে করছে, মাসে জন্ম জয়ন্তানুজের?

ঊর্মি বলল, কেউই কাউকে না পেলে মরে না।

মাথা নীচু করল জয়ন্তানুজ। ঊর্মির জেদী মনটা ক্রমশ ওকে কঠিন করে তুলতে থাকল। ও বলতে চাইল, আজ যদি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিই? যদি বলি, আপনাকে না পেলেও আমি বেঁচে থাকব?—কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ দেখতে থাকল, ওর লাইনার আঁকা দুটি নিটোল চোখের গাম্ভীর্য। লিপস্টিক মাখা আবেগহীন ঠোঁটে বিদ্রুপ। অনেকক্ষণ ধরেই ওর হাতে সিগারেট জ্বলছে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। জয়ন্তানুজ ভাবছে, আর কি বসে থাকার কোন অর্থ আছে? ওর ফর্সা কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওর মাথায় চুল অবিন্যস্ত। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে পড়ছে কপালে। পরাজিত সৈনিকের মতন ও তাকিয়ে আছে। পেছনে ক্যাথিড্রাল রোড। গাড়ির আসা যাওয়ার বিরাম নেই। হেড-লাইটের তীব্র আলো ছিটকে এসে পড়ছে। সেই আলোর বন্যায় জয়ন্তানুজ ঊর্মিকে দেখছে।

ঊর্মি তাকিয়ে আছে দূরে। যেখানে মহানগরীর চলমান জীবনযাত্রা। চৌরঙ্গীপাড়ার আলোর মালা। যানবাহনের বিচিত্র সুর জনতার কলকাতা। ওর অন্যমনস্ক মন শুনছে গির্জার বাইবেল পাঠ।

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ও আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। চামড়া পুড়ছে। একটা যন্ত্রণার মাছ হেঁটে যা জয়ন্তানুজের বুকে। বুক থেকে গলা তবুও জয়ন্তানুজ বলল, কিছু ?

ঊর্মি বলল, কি বলবো?

এই পাঁচ বছরেও কি তোমার কোন ব জমা হয় নি?

চুপ করেই থাকল ঊর্মি। ও বলতে পা না, এক ভদ্রলোক আমায় ভালবেসেছি আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। বলতে পারল না আমি তোমায় প্রত্যা করতেই এসেছিলাম।

ওর চাঁপার কলির মতন নরম আ গুলোর ওপর নিজের হাতের স্পর্শ রা জয়ন্তানুজ। কোন বাধাই দিল না ঊর্মি শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন বসেই থা যদিও ও তখন ভাবছে, আমাদের যেন দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে দোলে আর দোলে। কোথায় থামবে জানে না।

।। চৌত্রিশ ।।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মহরমের মধ্যে দহরমেরও কিছু কমতি ছিল না। এই সময়ে, যেকালে প্রাণের মূল্য পণ্য হিসেবে একেবারেই গনণ্য, তখনই অভিজাত বিখ্যাত পল্লী পরিবারের দুটি কিশোরী সেলিনা আর আমিনা, বিপন্ন ভেবে আমায় বাঁচাতে এসেছিল একদিন। সাত সকালে তাদের মোটরে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে আমরা নোম্যানস ল্যান্ডে এসে হাজির।

'কী ব্যাপার?'

না, তোমাকে এই বিপজ্জনক এলাকা থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

'বিপদ কোথায়? আমি তো তেমন বিপদ দেখি না। মোটেই বিপন্ন নই ভাই!' আমি বলি: 'কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?'

'আমাদের বাড়ি। পার্ক সার্কাসের কাছে। তুমি তো গেছ সেখানে...'

'গেছি। সে তো খাবার জন্য গেছলাম। ভালোমন্দ খেতেই। খাদ্য হবার জন্যে যেতে চাইনে।'

'খাদ্য হবে কেন? সুখে থাকবে তুমি, নিরাপদে আর বহাল তবিয়তে।'

'কী খাওয়াবে তোমরা?'

'যা খেতে চাও। আমাদের বাড়ির রান্নার কী আর তুমি খেয়েছ? সেদিন তো সামান্যই চেখেছিলে। বিরিয়ানিই কেবল। আরো কতো রকমের উপাদেয় খাবার আছে আমাদের—কতো রকমের রান্না। খাওয়া দূরে থাক তার নামও শোনোনি তুমি কখনো। খাওয়াবো সব তোমাকে।'

'শুনে লোভ হয় বটে, কিন্তু বাধাও আছে। বাধ বাধও আছে একটু। এখানকার নোন্ ডেভিলদের ছেড়ে অজানা ডেভিলদের মাঝখানে গিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? না ভাই, সে-আমি পারব না, তপ্ত কড়াই আর গনগনে আগুন—দুয়ের ভেতর কার আঁচ বেশি সেটা আঁচিয়ে কড়ায় গণ্ডায় নিজে পরখ করার তেমন সখ আমার হয় না। সে সাহস আমার নেইকো। সাধ্যও নেই।'

'আমাদের কাছাকাছি থাকবে, নজর রাখব আমরা। কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করার সাহস পাবে না। তুমিও নিশ্চিন্ত থাকবে, আমরাও নিশ্চিন্দি।'

কিন্তু নিশ্চিন্দপুরের আওতায় যাওয়া আমার কপালে থাকলে তো!

'না ভাই, তা হয় না। তোমাদের সামনে হয়ত কেউ আমার গায়ে হাত দেবে না জানি। কিন্তু আড়ালে বাধা কিসের! হাতের কাছে এমন জলজ্যান্ত কাফের পেয়ে কোরবাণি করে সরাসরি বেহেস্তের পাট্টা নেওয়ার সাধ কার হয় না? যখন সেটা এমন কিছু অসাধ্য নয়। হাতের কাছে এমন সুযোগ কে হাতছাড়া করে?' বললাম তাদের।

বললাম তো, কিন্তু খট করে মনে পড়ল তখনই যে সেদিনই সকালে একজন সে সুযোগে হাতে পেয়েও অবলীলায় বেহাত করেছে।

পাড়ায় বেরিয়েছিলাম প্রাতঃকালে। বাজার থেকে কিছু মাংস কিনে এনে আমার ইকমিক কুকারে চাপাবার মতলবে।

বাসায় তো আর রান্নাবান্না হয় না, সে পাট উঠেই গিয়েছে। দাঙ্গাটা বাধতেই বাসার আর সবাই, এমন কি ঠাকুর চাকর অবধি যে যেখানে পেরেছে চম্পট। বাধ্য হয়েই এই সেলফ্ হেল্প করতে হচ্ছিল আমায়।

বাজারের পথে দেখি সর্দার গুলের ছোট ভাই তাজ মহম্মদ একধারে বসে এক মনে একটা ছোরা শানাচ্ছে। একটা মরচে-পড়া তলোয়ারও তার পাশে পড়ে।

তলোয়ারটা খাপছাড়া। তাছাড়াও সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া লাগে।

'কী হচ্ছে তাজু? ছুরি শানাচ্ছো কেন, কাকে শহীদ করার মতলব হে?'

'কোনো মতলবে নয়। এমনি শান দিয়ে রাখছি। এটাও শানাতে হবে'—জানালো সে: 'কখন কী দরকার পড়ে কে জানে।'

'কেমন শানিয়েছো দেখি তো,' ছোরাটা আমার হাতে নিয়ে পরখ করি: 'বাঃ, বেশ ধার হয়েছে।' তলোয়ারটা হাতে নিয়ে—'এটাও বেশ ধারালো। এখনো মরচে যদিও, তোমার হাতে পড়েছে যখন হয়ে যাবে।'

'তা হবে। না হলে ছাড়বো নাকি?'

'তা বটে। ছাড়াছাড়ির কোনো কথা নেই।' আমি সায় দিই।

'একটা কাফের গোছের কাউকে যদি হাতের কাছে পাই তো ছাড়াছাড়ির কোনো কথাই নেই। আর আঁড়িয়া পেলে তো কুছ বাত নেহি। ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ব একেবারে!'

'বাঃ বেশ।' আমি উৎসাহ দিই, আর এ-কথাও বলি সেই সাথে—'তবে আমাকেই বা হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ কেন এমন?'

'আপনাকে। আপনাকে কেন?'

'কেন, আমি কি এক কাফের নই? আর, তোমার হাতের নাগালেই এসেছি। আমাকে জবেহ্ করে বেহেস্ত হাতে পাবার এমন সুযোগটা ছাড়ছ কেন?' গুরুগোবিন্দ সিংহের পদাঙ্কে বাঘের বাচ্চাকে বাঘ বানাবার আমার প্রয়াস। আমার পদাবলী।

'আপনার কথাটা আমার মনে ছিল না। ভাবিনি তো।'

'ভাবতে হয়। ভাবতে হবে।' অকুণ্ঠিত কণ্ঠেই কি—আমার নিজের ধারণাতেও আমি বোধ হয় এমন অভাবিত কিছু নই।

'আপনি আমার দাদার দোস্ত, তাই...' বলে সে যেন ভাবতে লাগলো। ভাবতে বসে গেল সেই দণ্ডেই। আর কোনো কথা সে বলল না।

'আরে, এর জন্যে এত দুর্ভাবনা কিসের। তোমার দাদার সাথে আমার জবর রকমের দোস্তি এই কথাই বলছ তো? তা তোমার সঙ্গে না হয় একটু জবরদোস্তিই হল। একই কথা।'

আর, এখন এই আমিনারা এসে কইছে—তোমার কোনো ভয় নেই, পাড়ার কেউ তোমার ওপর কোনো জবরদস্তি করবে না। সে রকম কোনো সুযোগই পাবে না তারা।' আমরা তোমায় ঘিরে থাকব—আগলে রাখব। সব সময়। আর সেই সঙ্গে—'

'আমাদের বাড়ির খানদানি খানা,' সেলিনা জানায়: 'সেকথা তো আগেই বলেছি, মনে আছে সেই সব মোগলাই রান্না—।'

'খেয়েছি বইকি।' আমি কই—আমিনার হাতের তৈরি না হলেও, সিনেমা পাড়ায় আমিনা রেস্তরাঁয় খাওয়া। পকেটে রেস্ত থাকলেই চলে যাই খাইগে।'

'খালি মোগলাই নয়, আমাদের বাঙাল দেশের রান্না খাওয়াবো তোমাকে।' আমিনার অনুযোগ: 'খেলে কখনো ভুলতে

পারবে না, আমি নিজে রাঁধবো আমার এই লেখক দাদার জন্যে।'

'হিন্দুস্থানের মামামাসীমা? সেই সব তো। সেসব জানা আছে আমার। খেয়েছিও বহুৎ। আমার এক মাসী ফরিদপুরের মেয়ে, ভবানীপুরে থাকেন, সেখানে গেলেই খেতে পাই।'

বলে আমি চুপ করে যাই, আমার শালু মাসি ডাল, মাসিদের রান্নার ভালপালা সবিস্তার করব কি না ভাবি।

'তবে আবার ভাবছ কেন?' আমাকে নিরুৎসুক নিরুত্তর দেখে তাদের উৎসারিত করার উৎসাহ: 'তোমাকে অখাদ্য কিছু খাওয়াবো নাগো। সে ভয় নেই তোমার।'

'শুয়োরের কথা বলছো তো?' আমি বলি: গরু আমার খাওয়া। আমার বন্ধুদের সঙ্গে চীনা রেস্তরাঁয় গিয়ে কবে যেন বীফ কাটলেট খেয়েছিলাম। অখাদ্য না হলেও এমন কিছু সুখাদ্য বলে বোধ হয়নি আমার। কিরকম চিমড়ে চিমড়ে লেগেছিল যাই বলো। তোমার ওই মুর্গি কি পর্কের মতন অমন উপাদেয় নয়।'

'তোবা তোবা! ও হচ্ছে হারাম। ও কথা তুলো না।' তোবা তোবা!

নাসোক্তারাপেই ওরা আমায় বোবা বানায়। —'কিন্তু তার চেয়েও অখাদ্য আছে ভাই! পর্ক যেমন তোমাদের কাছে, গোরু যেমন আমাদের কাছে—তার চেয়েও গোরুতর অখাদ্য আছে, বলছি তাই।'

'তার চেয়েও অখাদ্য? গোরুর চেয়েও গুরুতর?'

'আছে বই কি, এই আমার কাছে একতক। আমার কথাই বলছিলাম।' পর্কের সম্বন্ধে নয়, নিজের সম্পর্কেই বলি এবার।

'বুঝলাম না।'

'এই আমি আমারই' হিন্দুর শাস্ত্রে গোরু আর বামুনকে একেবারে একাকার করে দিয়েছে না? গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ বলে দিয়েছে না এক মন্ত্রে। আমরা বামুনেরাও কিছু কম অখাদ্য নই গো।' বলেই আমার কথাটা শুধরে নিই।

'কে খাচ্ছে তোমাদের? খেতে যাচ্ছে কে?'

'কথাটা—আমরা না বলে আমি বলাই বোধ হয় ঠিক।' আমার সটীক ব্যাখ্যা।

'বামুনরা তোমাদের পাকঘরে রান্নাঘরে শুনেছি কিন্তু—' বলে সে চুপ করে যায়।

'কিন্তু আমাদের পাকাশয়ে তারা ঠাঁই পায় না। পেতে চায় না কিন্তু এক্ষেত্রে...'

'এক্ষেত্রে কী? পরিষ্কার করে বলো।'

'কী করে বলব? জানব কি করে। এমনকি খাবার সময়ও আমি টের পাবো কি না সন্দেহ, এমন কি কোনো প্রিয়জনের পাতেও যদি পড়ি, এমন কি তার মুখেও যদি উঠি তার সোয়াদ কি পাওয়া যাবে?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি: 'এমন-ভাবে প্রিয়জনের মুখে উঠায় কোনো মজা হয় না।'

'কী সব হেঁয়ালি বকছো বলো তো।'

'কোনো হেঁয়ালি নয়, সত্যি কথাই। কোনো সাত সকালে তোমাদের বাবুর্চিখানায় জবাই হয়ে তোমাদের খানসামার সোজনো সাত সকালে তোমাদের প্রাতরাশের টেবিলে গরম কাটলেটরূপে যখন পরিবেশিত হব তখন তোমরাই টের পাবে না তো আমি কোথায়! প্রিয়জনের সম্মুখে এলে মুখে উঠলে শুনেছি শুধু তাদেরই নয়, নিজেরও স্বাদ নাকি মিলে যায় তখন। কিন্তু হায়

'কিন্তু এই যোগাযোগে আমার কোনো আস্বাদযোগ নেই তো?'

প্রিয়জনের মুখপাতে পড়া আর পাতের সম্মুখে খাওয়া ঠিক একরকমের নয় বোধ হয়।' এই ভেবে মহাভারত পর্বের গোড়ায় অর্জুনের যেমন বিষাদযোগ হয়েছিল আমারও তেমন দেখা দেয়—'হায় নিজের টেস্ট কেমন নিজেই না পেয়ে চলে যেতে হবে আমাকে, এই আমার দুঃখ।'

আমার কথা শুনে তারা চুপ করে থাকে, কিছু বলে না।

'না ভাই, তোমাদের হৃদয়ের এক কোণায় একটুখানি ঠাঁই পেয়েছি, সেই আমার ঢের, তা ডিঙিয়ে তোমাদের পাকস্থলীতে ঠাঁই পেতে আমি চাইনে, রক্ষে করো, না, সেই হৃদয়ভেদী ব্যাপারে আমি নেই ভাই...!'

ক্রমশ

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই যদি কোনও না কোনও শিল্পকর্মে আগ্রহ থাকে ও তাঁরা যদি নিয়মিতভাবে সেই শিল্পের অনুশীলন করেন, তা হলে তাঁরা দুজনে মিলে যে কি এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তার পরিচয় পাওয়া গেল আকাদেমি গ্যালারিতে আয়োজিত তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীতে। স্বামী প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জীর নেশা দেশভ্রমণ, বিশেষ করে পর্বত অভিযান ও সেই সঙ্গে ছবি তোলা। তিনি যে একজন দক্ষ স্থিরচিত্রশিল্পী, তার প্রমাণ মেলে কয়েকটি চমৎকার পার্বত্য দৃশ্য—বিশেষ করে তুষারঝড়, বরফ-আচ্ছন্ন পাহাড়ের বুকে অভিযাত্রীর পদচিহ্ন, তুষার স্রোত ও নানা দৃশ্যাবলী উল্লেখ্য। শিল্পীর যে অনুসন্ধানী চোখ আছে, তার প্রমাণ মেলে কয়েকটি স্থিরচিত্রে। এই প্রসঙ্গে রাস্তার ধারে ভিখারীদের কলহ, বাড়ির সামনে বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভিখারী নারীর খাওয়া, বাজার ও ব্যস্ততাবহুল কলকাতার দৃশ্যের নাম করা চলে। ১৯৭০ সালের বিক্ষুব্ধ কলকাতার ভয়াবহ চেহারা থেকে শুরু করে পরবর্তী চার বছরে মহানগরীর ক্রমপরিবর্তনশীল রূপ শিল্পী কয়েকটি স্থিরচিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন—এগুলির অধিকাংশই ইঙ্গিতপ্রধান—বিশেষত সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে তোলা বিক্ষুব্ধ কলকাতার একটি ছবি দেখে অনেকেই অস্বস্তি অনুভব করেন। অপর পক্ষে, স্ত্রী শ্যামলী চ্যাটার্জি পুতুল রচনায় সিদ্ধহস্ত। কাগজমণ্ডে তৈরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর সুদৃশ্য পুতুল দেখে অনেকে খুশী হন—বিশেষত ছোট ছোট ক্রীড়ারত ছেলেমেয়ের পুতুলগুলি সুন্দর। বিভিন্ন পুতুলের মধ্য দিয়ে স্বপরচিত সিন্ডারেলার গল্পটি বর্ণনা করার জন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তবে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল পর্বত অভিযানের পুতুলগুলি—পর্বত অভিযানের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রায় অবিকল পরিবেশ রচনা করে শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর পরীক্ষামূলক ভাস্কর্য-নিদর্শনও দেখা যায়—মাতৃমণ্ডল (প্লাস্টার) ও আলিঙ্গন (কাগজমণ্ড) মন্দ লাগেনি।

*

আকাদেমি গ্যালারিতে শিল্পী সুশান্ত ঘোষ ও দীপালী পাল তাঁদের একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে প্রথমজনের ১৮ ও দ্বিতীয়জনের ৮টি শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। দুজনেই ছয় বছর আগে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন। সুশান্ত ঘোষ তেল ও জলরঙে কাজ করেছেন, ড্রয়িং ভাল। শিল্পীর রঙ-ব্যবহার রীতি সুন্দর, যদিও সব ক্ষেত্রে নয়। অঙ্কনরীতি মিশ্র। মিশ্ররীতি ও রঙ ব্যবহার পদ্ধতির জন্য লজ অব নেচার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর একটি ছবি সকলের চোখে পড়ে—নেচারস ক্যাপ্রিস। লাল, নীল, বেগুনী ও সবুজ রঙপ্রধান প্রায় বিমূর্ত ছবিতে তুলির বলিষ্ঠ টানের মধ্য দিয়ে শিল্পী গতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে ইম-প্রেশানিস্টিক ইউনিটি, ইঙ্গিতপ্রধান গার্ল উইথ দি ফোলিয়েজ উল্লেখ্য। দীপালী পাল জলরঙে ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকেছেন। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে তাঁর শিল্প-নিদর্শনগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পরিকল্পনার দিক থেকে অ্যালাস ইণ্ডিয়া মন্দ লাগেনি। অসহায় দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে স্বয়ং ভারতমাতাও নিরাশ ও অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। শিল্পী যদি ড্রয়িং বিষয়ে অধিকতর সচেতন হন, তা হলে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। অপরাপর ছবির মধ্যে সেলাই নেহাত মন্দ লাগে নি।

*

পরলোকে শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদার

খ্যাতনামা শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৯ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্যতম সাধক-শিল্পী। "ভারতের শিল্প ও আমার কথা"য় ও সি. গাঙ্গুলী শিল্পাচার্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, অবনীবাবু বলতেন, "আমি মুঘল শৈলীতে সিদ্ধ, নন্দলাল শৈবাচিত্র রচনায় সিদ্ধ, আর ক্ষিতীন চৈতন্যসিদ্ধ। ওর মত চৈতন্য আঁকতে আর কেউ পারবে না।" অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা শেষ করে ক্ষিতীন্দ্রনাথ কিছুকাল অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ শিক্ষকতা করেন ও পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। তরুণ বয়স থেকেই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের ভক্ত। নিয়মিতভাবে ভক্তি সহকারে তিনি কীর্তন গানের চর্চা ও সাধনা করতেন ও তাঁর শিল্পকর্মেও বৈষ্ণবধর্মের রূপটুকু ফুটে উঠত। প্রথম জীবনে তিনি আঁকেন চৈতন্য-লীলার চিত্রমালা। রেখারচনা ও বৈচিত্র্যে তাঁর দর্শন ছিল অসাধারণ। ও সি গাঙ্গুলী বলেন, স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'সূক্ষ্ম রেখারচনা ও সুমধুর বর্ণবিন্যাসে ক্ষিতীন আমাকেও পরাস্ত করেছে।' ১৯২৬ সালে ও সি. গাঙ্গুলী ক্ষিতীন্দ্রনাথের ২৬টি ছবি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন—ছবিগুলি শিল্পী আঁকেন ১৯০৯ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রত্যেক বার্ষিক প্রদর্শনীতেই এই চিত্রমালার কয়েকটি প্রদর্শিত হত, এবং লর্ড রোনাল্ডসে ও তাঁর স্ত্রী, মিঃ গার্নেট ও মিঃ কটন কয়েকটি ছবি কেনেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছবির মধ্যে শকুন্তলা, কৃষ্ণলীলা, সরস্বতী, মনসাদেবী, অর্জুন উর্বশী ও গঙ্গা-যমুনা সুপরিচিত। তবে চৈতন্যদেব ও জগাই-মাধাই ছবির তুলনা নেই বললেই চলে—বিশেষ করে চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করছেন এই বিষয়বস্তুটি শিল্পী অনবদ্য শিল্প কৌশলে ফুটিয়ে তোলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ললিতকলা আকাদেমির ফেলো ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মৃত্যুতে শিল্পজগতের যে ক্ষতিসাধন হল তা অপূরণীয়।

চিত্রপ্রিয়

॥ একচল্লিশ ॥

আকাশে ছমছম করছে মেঘ। গম্ভীর মেঘধ্বনি। ঘন কালো ছায়ার দুপুরেই ডুবে গেল কলকাতা। যেন বা প্রলয় হবে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস এল, তাতে ভেজা মাটির গন্ধ।

রাস্তা পার হবে বলে রণেন দাঁড়িয়ে ছিল ফুটপাথে। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের সরু ফুটপাথ, দাঁড়ানোর পক্ষে সুবিধের নয়। ক্রমান্বয়ে চলমান মানুষ গা ঘেঁষে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় গায়ে গায়ে গাড়ি, ট্রাম, ঠেলা সব দাঁড়িয়ে। জ্যাম। চীনেদের জুতোর দোকান থেকে চামড়ার কটু গন্ধ আসছে। একঝলক হাওয়া রাস্তার ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মুখেচোখে। জীবাণুতে ভর্তি কলকাতার বিষাক্ত ধুলো।

রণেন আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখল। বাড়ির চূড়ায় চূড়ায় বিঁধে আছে সরু এক-ফালি আকাশ। কিংবা আকাশের গলি। তার মধ্যে মুশকো কালো শরীর বাড়িয়ে দিয়েছে প্রলয়ংকর মেঘখানা। রণেন ঘাম মুছল রুমালে। হাতের ভারী ব্যাগটা হাতবদল করল একবার। শরীরটা ভাল নেই। মেঘ করলে মাথার মধ্যে কেমন যেন করে।

নীল একটা ঝলক চাবুকের মতো খেলে গেল চারধারে। তারপরই কানের কাছ বরাবর সর্বনাশের শব্দটা হয়। রণেনের বুকের মধ্যে ধড়ধড় করে হৃৎযন্ত্র নড়ে ওঠে। শরীর অবশ লাগে। ঘাম হয়। প্রেসারটা বেড়েছে। কদিন আগে ডাক্তার ডেকেছিল বীণা। ডাক্তার প্রেসার দেখল, বুক দেখল, পেচ্ছাব পরীক্ষা করাল। কটা দিন বাড়িতে আটকে রেখেছিল বীণা। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ঘরের মধ্যে আজকাল রণেন থাকতেই পারে না। রাতে যখন সদর দরজা বন্ধ হয়, তখনই রণেন ভারী ভয় পেয়ে যায়। কেবলই মনে হয়, রাতে ঘুমোলে যদি ভূমিকম্প হয় কি আগুন লাগে, তাহলে বেরোবো কি করে তাড়াতাড়ি? বীণা যখন শোওয়ার ঘরের দরজা দেয় রাত্তিরে, তখনো একটা বোবা ভয় তাকে ভালুকের মতো এসে ধরে। ঘরের ভিতর থেকে যেন বা সে আর কোনোদিন বেরোতে পারবে না। ভিতরকার চৌখুপীর বাতাস বড় কম। বুক ভরে কবার দম নিলেই তা ফুরিয়ে যায়। তারপর আসবে দমবন্ধ করা এক অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট। মৃত্যু? হ্যাঁ। তাই।

সে কঁকিয়ে উঠে বলে—দরজা খুলে দাও।

বীণা দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে—কেন?

—আমার অস্থির লাগে। দরজা জানালা সব খুলে দাও।

বীণার একটু ঠাণ্ডার বাই আছে। এই ঘোর গ্রীষ্মেও নাকি শেষ রাত্রে হিম পড়ে। বাচ্চাদের ঠাণ্ডা লাগে যদি! বীণার নিজেরও [illegible] নয় তাবে। [illegible] ইঞ্চহীটিস। বীণা দরজা খুলে দেয়, কিন্তু জানালা সব খুলতে রাজি হয় না। কেবল ড্রেসিং টেবিলের ধারের জানালায় একটা পাট খুলে রাখে। বিছানার ধারের জানালা খোলে না। ঘরে সবজে একটা ঘুম-আলো জ্বলে। সেই ঘোর সবুজ রঙের মধ্যে শুয়ে থেকে রণেন সেই এক-পাট খোলা জানালার দিকে চেয়ে থাকে। ঐ একটু, এক চিলতে ফাঁক—ঐটুকুই যেন তার প্রাণ, তার পরমায়ু, তার শ্বাসের বাতাস। রাতে ঘুম হয় না। প্রেসারের বড়ি আর ট্রাংকুইলাইজার খায়। তাতে হয়তো প্রেসার কমে, টেনশনও কমতে পারে। কিন্তু শরীরটা বড় দুর্বল লাগে। সারাদিন অবসাদ। মা এসে বুকে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথার তালুতে তেল চাপড়ে দেয়। দিতে দিতে চোখের জল ফেলে বলে—আজকাল কাঁচবয়সেই এ-সব তোদের কী রোগ হয় রে?

কাঁচ বয়স! মায়ের কাছে অবশ্য ছেলের বয়স বাড়ে না। কিন্তু বয়স কথাটা আজকাল বড় ধাক্কা দেয় রণেনকে। তার বোধ হয় আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশ চলছে। আর একটা বছর তিরিশের কোঠায়। তারপরই চল্লিশ। মধ্যবয়স, প্রৌঢ়ত্ব। সে ধাপটা পেরোলেই বুড়ো। বড় সাংঘাতিক। বয়স যত ঘনায় তত একে একে প্রিয়জন খসে পড়তে থাকে। বাবা যাবে, মা যাবে, বয়স্করা যাবে। একদিন তারও যাওয়ার সময় এসে পড়বে।

কেমন হবে সেই দিনটা? মেঘলা? নাকি

রৌদ্রোজ্জ্বল? শীত? না কি গ্রীষ্মকাল? বর্ষা হবে না তো! দিন, না রাত্রি? ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসে রণেন। খুব কাছে কে যেন বলে ওঠে—রাত্রির মরে যাচ্ছে। চমকে ওঠে রণেন। কে বলল ও-কথা? পর-মুহূর্তেই বুঝতে পারে যে, সে নিজেই বলেছে। তার ঠোঁট নড়ছে ঠিক এইমাত্র। আবার বলল—উঃ, মা গো!

নিজের ঠোঁটে হাত রাখে রণেন। সে এই একা-একা কথা বলাকে বড় ভয় পায়। সন্দেহ করে। কিন্তু ঠেকাতেও পারে না। আজকাল মাঝে মাঝে সে টের পায়, তার ঠোঁট নড়ে, জিব নড়ে, কথা উঠে আসে বুক থেকে। আপনিই। চমকে ওঠে রণেন। ঠোঁট চাপা দেয়। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। আর তখনই আবার বলে ওঠে—ক্যাভাভ্যারাম, ক্যাভাভ্যারাম, ইউ...ইউ... ইউ...

কথাগুলোর অর্থ কি! [illegible] থেকে, মাথা থেকে [illegible] অর্থ-হীন শব্দ উঠে আসছে [illegible]। কি হয়েছে তার? [illegible]? [illegible] সহজ অবস্থা [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] সঙ্গে [illegible]। [illegible]

আলোতেও ঘুমতে পারে, আর চোখে না ঘুমোনোর ক্লান্তি। একটু ঝুঁকে গেছে মোটা শরীর। ঘুম ভেঙে কখনো বীণা উঠে ধমক দেয়—কি হচ্ছে কি পাগলামী? বিছানায় এসো। ঘুমোও।

রণেন বিছানায় যায়। শুয়ে থাকে। ঘুমোয় না। বিড়বিড় করে বলে—কাভা-ড্যারাল কাজাজ্যারাস, ইউ...ইউ...ইউ...
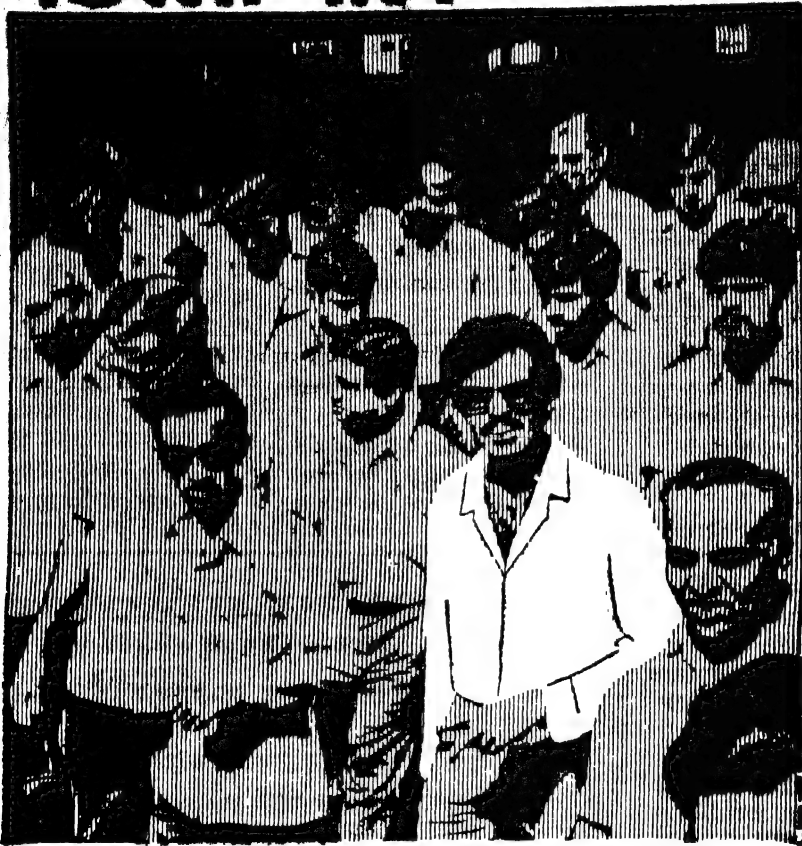
কদিন ঘরবন্দী রেখেছিল বীণা আর মা। এখন আবার বেরোয় রণেন। জোর করেই বেরোয়। শরীর খারাপ বলে আজকাল আর তাকে বাইরে ঘুরতে হয় না। অফিসেরই একটা সেকশনে বসে থাকে চুপচাপ। কিন্তু অফিসের লোকজন আজকাল তাকে বড় বেশী লক্ষ্য করে। হঠাৎ হঠাৎ কথা বলে ওঠে রণেন। সবাই তার দিকে ফিরে তাকায়। এও এক জ্বালাতন। তাই আবার আজকাল বাইরে বেরোয় সে। শরীর খারাপ লাগলেও মনটা একরকম থাকে।

একদিন অফিসে ঘোষের কাছে গিয়ে হাক্লান্ত রণেন বলেছিল—ঘোষদা, একটা কথা বলতে পারেন?

ঘোষ অফিসের ফাইলপত্র আজকাল প্রায় ছোঁয় না। ডিসেম্বরে রিটায়ারমেন্ট, কাজ করে হবে কি? বসে বসে পুরোনো টেস্ট পেপার থেকে খুঁজে পেতে অঙ্ক কষছিল অফিসের কাগজে। অঙ্কটা কষতে কষতেই বলল—কি?

—মানুষ মরার পর কি হয় বলুন তো, আত্মা-টাত্মা বলে কিছু আছে নাকি সত্যিই?

ঘোষ চোখ তুলে তাকে একবার দেখে নিয়ে মিচকে হাসে। বলে—বাঃ। বেড়ে প্রশ্ন। আজকাল এ-সব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি আপনার বয়সে?

ঘোষ জানে অনেক। ভারী স্থির বুদ্ধি। তবে কথাবার্তায় সবসময়ে একটু বাঁকাভাব থাকে।

রণেন বলেছিল—বলুন না ঘোষদা।

ঘোষ কাগজপত্র সরিয়ে রেখে চেয়ারে পা তুলে বসল, বলল—মশাই, আপনি যে আছেন, এটা কি সত্যি?

রণেন মাথা নাড়ে—সে তো আছিই।

ঘোষ তখন মৃদু হেসে বলে—আপনার থাকাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে আপনি যে ছিলেন, এও সত্যি। আর, আপনি যে থাকবেন, তাও সত্যি। এটা লজিক্যালি প্রুভড। আপনি ছিলেন না, আপনি থাকবেন না, অথচ আপনি আছেন—তা হয় কি করে? যুক্তিতে আসে না। সুতরাং জন্মের আগেও আপনি ছিলেন, মৃত্যুর পরেও আপনি থাকবেন। এটা থিওরেটিক্যালি প্রমাণ করা যায়।

রণেন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে বলে—কিন্তু কিভাবে থাকব, কিভাবে ছিলাম?

ঘোষ অন্যমনস্ক ও গম্ভীরভাবে বলে—বলা মুশকিল। তবে শুনেছি, অশরীরী আত্মা একটা ভাবভূমিতে অবস্থান করে। তার অনুভও থাকে, বোধও থাকে তবে সে মানুষের মতো নয়। অন্যরকম।

রণেন একটু কেঁপে উঠে বলেছিল—সে জায়গা কেমন?

ঘোষ একটু হেসে বলে—কি করে বলি? না মরলে তো জানতে পারা যাবে না। তবে শুনেছি, সেখানে আলো-অন্ধকার নেই, শীত-গ্রীষ্ম নেই।

তব কি অনন্ত গোধূলির দেশ? চিরবসন্ত? ঠিক বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। পরমুহূর্তেই ঘোষের দিকে চেয়ে থেকে তার আবার সেই একাকীত্বের কথা মনে পড়ে। লোকটার বউ নেই, ছেলেরা আত্মসর্বস্ব। এ লোকটা চাকরি শেষ হওয়ার পর একদম একা হয়ে যাবে। প্রাণের কথা বলার মানুষ না থাকলে মানুষ বড় কষ্ট পায়। তার গভীর মনের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটার কোনো সম্পর্ক থাকে না। ঘোষের দিকে চেয়ে তাই একরকম ভয় পায় রণেন। বলে—ঘোষদা, রিটায়ার করে কী করবেন?

ঘোষ প্রশ্ন শুনে হাসল। চেয়ার থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ঝুঁকে অঙ্ক কষার কাগজপত্র টেনে নিল আবার। বলল—বসে থাকব, যত-দিন না মরি।

কথাটা বড় ন্যাংটো, বড় কঠিন সত্য। বসে থাকব, যতদিন না মরি। রণেন বড় অস্থির বোধ করেছিল। উঠে আসছিল, ঘোষ পিছন থেকে ডেকে বলল—ব্রজদা আছেন কেমন?

—ক্ষেত খামার নিয়ে থাকেন। ভালই আছেন।

ঘোষ বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। হঠাৎ বলল—মাঝে মধ্যে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকবেন। দেখবেন তাতে মৃত্যু সম্পর্কে জড়তা কেটে যায়। আমি এখনো সময় পেলে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। সন্ধেবেলাটায় বেশ লাগে।

তাও গিয়েছিল রণেন। কেওড়াতলাটা কাছে হয়। দুপুর-দুপুর একদিন চলে গেল। দেয়ালঘেরা বন্ধ জায়গা, রোদের তাপ, চিতার আগুন, সব মিলিয়ে বীভৎস গরম। ছাই, ধোঁয়া চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে। পোড়া ঘীয়ের কটু গন্ধ। মানুষের পোড়া-আধপোড়া-না পোড়া শরীর চারধারে। মাথার মধ্যে একটা ভয়-ভাবনা ঘুলিয়ে উঠল। এক-ধারে একটা টিনের টুকরো চাপা গদির মড়া পড়ে আছে। টিনের তলা থেকে সিঁটোনো দু' জোড়া সাদা পা বেরিয়ে আছে। ঠিক তার

পাশেই সাদা পাকানো গোঁফওলা একটা পশ্চিমা লোকের মাথা। সবগুলো রাতে এক চিতায় দাহ হবে। রণেন পালিয়ে এল। সে-রাতে জেগে থেকে অনেক রকম শব্দ করেছিল সে। মনে হচ্ছিল, ওরকম আগুনে পুড়ে যেতে সে কোনোদিন পারবে না।

রাতের বেলাটা একা ভয় করে জেগে থাকতে। কিন্তু সঙ্গে জেগে থাকার কেউ তো নেই। বীণা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে ধমক দেয়, শুয়ে পড়তে বলে। কখনো কখনো একটু আদরও করে কাছে ডেকে। তারপরই বীণার কাজ ফুরোয়। পুরোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কিই বা কথাবার্তা থাকবে। রণেন জানে, তার কেউ নেই।

রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে রণেন। পার হতে পারছে না। দুদিকের দু'মুখো গাড়ির আঁটো জ্যাম। আকাশে মুখ তুলে দেখে, বৃষ্টি এল বলে। কালো মেঘ নীচু হয়ে চলে যাচ্ছে রেলগাড়ির মতো। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। খড়কুটো, ধুলোবালি উড়ে ঝাপটা মারছে। ফুটপাথের দোকানীরা দ্রুত মালপত্র তুলে নিচ্ছে। গাড়ি ঘোড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনেকে রাস্তা পেরোচ্ছে, কিন্তু রণেনের সাহস হয় না। কলকাতার ড্রাইভারদের মনুষ্যত্ববোধ কিছু কম। রাস্তা ফাঁকা পেলে মানুষজন মানে না। রণেন রাস্তা পার হওয়ার সময়ে যদি সামনের গাড়ি দু' হাত এগোয় তবে পিছনের গাড়িও হয়তো রণেনকে উপেক্ষা করে দু' হাত এগোবে। ড্রাইভারদের ঠিক বিশ্বাস করে না রণেন। এমনিতে তারা হয়তো লোক সবাই খারাপ না। কিন্তু কলকাতার জ্যাম, লক্ষ গাড়ি আর কোটি মানুষের ভীড়ে ভরা সরু অকল্পনীয় রাস্তা, পদে পদে থেমে থাকা—এ-সব থেকে মানুষ খ্যাপাটে হয়ে যায়—আসে রাগ বিরক্তি, অধৈর্য, ক্লান্তি। তখন আর স্বস্থ স্বস্থ জ্ঞান থাকে না। শুধু ড্রাইভার কেন, কলকাতার সব মানুষই কি তাই নয়? বিরক্ত, রাগী, উদাসীন ও নিষ্ঠুর। রণেনের চারদিকটা তাই ভয়ে ভরা।

রাস্তা পার হতে না পেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রণেন। মেঘ ডাকছে সিংহের মতো। জোর বাড়ছে হাওয়ার। টপাস করে একটা ফোঁটা এসে ফাটল রণেনের ডান গালে। কী ঠাণ্ডা ফোঁটা! রণেন ব্যাগটা হাত-বদল করে নিয়ে ফুটপাথ ধরে আস্তে আস্তে হাঁটে। যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত রাস্তা আটকে সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ রাস্তাটা পার হওয়া দরকার।

পান খাওয়া ডাক্তার বারণ করে গেছে। রণেন তবু খায়। কালাপাতি, পিল্লাপাতি আর মোহিনী দেওয়া কড়া পান। প্রথম প্রথম মুখ জ্বলে যেত, গলায় ধক্ লেগে মাথা ঘুরত। আজকাল সয়ে গেছে। সকাল থেকে আজ পান খায়নি। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে যাচ্ছে চারধারে। এখনো মুষলধারে নামেনি। কিন্তু প্যারেডের সৈন্যর মতো তারা এগিয়ে আসছে। আরো ক'বার নীল চাবুক ঝল্সে গেল চারধারে। মেঘলা আর বৃষ্টির দিনে রণেনের মাথা বড় ভার হয়। বুকের ভিতরটা অন্ধকার লাগে।

পানের দোকানের অল্প একটু ছাউনীর ভিতরে মাথাটা গুঁজে রণেন দেখল, বিল্ডিংক সব দেয়ালে বৃষ্টির প্রথম কয়েকটি ফোঁটা অনেকগুলো তেরচা দাগ টেনেছে। ভেজা দেয়ালের চুন-চুন একরকম গন্ধ। পানের প্রথম ঢোকটা গিলে ফেলল রণেন। কড়া জর্দার পান। মাথাটা একবার পাক খেল। সামলে গেল। পিক ফেলে দিয়ে গলাটা ঝাড়ল একটু। প্রেসারটা বেড়েছে, রক্তে চিনি আছে, হার্টও ভাল না। কি হবে? মাথাটা নাড়ল রণেন। বলল—দূরে ফোস্কা প'ড়বে। বলেই চমকে উঠল। এখনো সে চিতার আগুনের কথা ভাবছে।

থেমে থাকা ট্রাম থেকে অধৈর্য কয়েকজন মানুষ নেমে পড়ল। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে। কিশোরী? না, ঠিক কিশোরী নয়, তবে রোগা বলে ঐ রকম দেখাল বোধ হয়। বাঁ হাতে একটা খাতা উঁচু করে মুখ আড়াল দিয়ে নামল। সামনেই বাটার রিডাকশান সেল্-এর দোকান। এক দৌড়ে উঠে গেল দোকানে, যেখানে মাথা বাঁচাতে ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে কিছু লোক।

হেঁটে আসছে বৃষ্টি। দেয়ালে দ্রুত ফোঁটার দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছে ময়লা দেয়াল। বিবর্ণতা। পানের দোকান থেকে রণেন সরে আসে। বাটার দোকানে উঠে দাঁড়ায়। বৃষ্টি দেখে। কী গভীর বৃষ্টিপাত!

মেয়েটা হাতের খাতা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। খুব দূরে নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লম্বা, রোগাটে চেহারা। কিন্তু চামড়ায় কচি বয়সের চিকণতা। বয়সের দাগধরা, ছোপধরা নয়। মুখখানায় বয়সের অহংকার। পাতলা নাক, একটু মোটা ঠোঁট, দুখানা চোখ চঞ্চল, মাথায় তেলহীন নরম চুল, তাতে এখনো কয়েক ফোঁটা জল লেগে আছে। ডানধারে ঠোঁটের ওপরে একটা আঁচিল। ফর্সা মুখে কালো আঁচিল পাগল করে দেয় না, যদি জায়গা মতো হয়?

রণেনের দোষ সে যখন কোনো মেয়েকে দেখে তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, ভদ্রতাবোধ লোপ পায়। তাই চেয়ে ছিল রণেন। সময়ের জ্ঞান ছিল না। ঐ রকম লাগাতার চেয়ে থাকার জন্যই বোধ হয় মেয়েটা তার দিকে তাকাল। একবার স্বাভাবিক কৌতূহলে, পরের বার ভ্রূ কুঁচকে। গহীন চুলের মধ্য পথরেখার মতো সিঁথি ডুবে গেছে। মুখখানা লম্বাটে, থুঁতনির খাঁজ গভীর। কাপড় বা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে অনেকটা এরকম মুখের ছবি ছাপা হয়। বাঙালী মুখ, তবু যেন বিদেশী কাটছাঁট তৈরী।

রণেনকে পছন্দ হয়নি মেয়েটির। ভ্রূ কোঁচকানো মুখ ফিরিয়ে নিল আমন্ত্রে। তাতে অবশ্য রণেনের কিছু যায় আসে না। মেয়েদের মনের মতো চেহারা তার নয়, সে জানে না কি! তবু একটা শ্বাস ফেলে

রণেন। এখনকার দিনকাল বড় ভাল। সোমেনের কথা একবার মনে এল। কেমন শ্রীমান চেহারা ভাইটার! ও-সব সময়টাও ভাল, মেয়েদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়ায়, বকবক করে। রণেনের কলেজ জীবন কেটেছে নন কো-এডুকেশনে, ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। বরাবরই তার চরিত্রের খ্যাতি ছিল। সে নাকি মেয়েদের দিকে তাকায় না। সারা যৌবনকালটা সেই খ্যাতি রক্ষা করে গেছে রণেন। মেয়েদের উপেক্ষা করেছে। তাকায়নি। কেবল বহেরুর খামারবাড়িতে এক আধবার নয়নতারার সঙ্গে…। কিন্তু সেও কিছু নয়। যৌবন বয়সের ভাল ছেলে রণেন আজও একরকম বাঁধা আছে নিয়তির কাছে। বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে এখনো নেমে আসছে সুন্দর, কচি, হৃদয়বতী মেয়েরা।

রণেন দু'পা পিছিয়ে গেল। ছাট আসছে। চশমা ভিজে গেছে। রুমালে কাচ দুটো মুছে নিয়ে ভাল করে তাকাল। মেয়েটা ঘাড় ঈষৎ সামনের দিকে বাঁকিয়ে বড় বড় অন্যমনস্ক চোখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক, উত্তেজক।

নিজের শ্বাসের ঘোড়া শব্দে চমকে ওঠে রণেন। ভিতরে ভিতরে এক তীব্র কাম বোধ আনন্দস্পৃহা জেগে ওঠে। চামড়ার তলায় শরীরের ভিতরকার অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ করে লুকোনো বীজ। মাথার সব চিন্তা লোপাট হয়ে যায়। চোখের পাতা পড়ে না। ভিতরে ভিতরে ভাল ছেলে রণেন কি নারীধর্ষণকারী নয়? যেদিন বীণাকে মেরেছিল সেদিন সোমেন আর মা না চেঁচালে বীণা খুন হয়ে যেত তার হাতে। তাহলে, ভিতরে ভিতরে সে কি খুনীও?

রণেন নিজের মনে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে যেমন খুন করতে পারে, তেমনি নারী-ধর্ষণ করতে পারে। আরো পারে বহু কিছু। মানুষের অস্পৃশ্য অনেক পাপ। ভয়ে বা লজ্জায় বা অনভ্যাসে করে না। কিন্তু পারে।

মেয়েটা তাকাচ্ছে না, কিন্তু লক্ষ করেছে ঠিকই যে একজন মধ্যবয়সী মোটা লোক তাকে নজর দিচ্ছে। কাঁচবয়স, এ বয়সে যে কোনো পুরুষেরই চোখ নিজেকে জরিপ করে নিতে ইচ্ছে যায়। মেয়েটা তাই রণেনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আঁচল টেনে টান করে দিল কিছুটা। স্পষ্ট ফুটে ওঠে বুকের ডৌল। নাভির নীচে কাপড়, খাটো ব্লাউজ। পেটের অনেকখানি দেখা যায়। নীলচে একটা জাপানী জর্জেটের শাড়ি পরনে। ভাবা যায়?

বৃথা গেল বয়স। বৃথা গেল সময়; মাথা খুঁড়লেও ফিরে আসবে না।

রণেন তাই নিজের মনের কাছে বলে রাখল—আমি কিছুই পাইনি জীবনে।

মেয়েটি বৃষ্টির দিকে চেয়ে ছিল। চুল নড়ছে হাওয়ায়। মোটা বেণী। নীরবে সেই যেন উত্তর দিয়ে দিল রণেনকে—আহা।

—আমি মোটা মানুষ, ব্যক্তিত্বহীন, হাবা।

—একটু বয়সের পুরুষই ভাল। তারা হৃদয়বান হয়, চঞ্চলতা থাকে না। তুমি ভাল।

রণেন মাথা নাড়ে, বলে—সবাই তাই বলে। কিন্তু আমি আর ভাল থাকতে চাই না। ভাল থাকা বড় একঘেয়ে ক্লান্তিকর। একটু খারাপ হয়ে দেখি না! আমাকে খারাপ করবে? প্লীজ!

মেয়েটা মৃদু হাসল। সৌরভময় শ্বাস ফেলে বলে—মোটা তো কি! কেমন ফর্সা তোমার রং, কেমন ঠাণ্ডা মাথা। চাকরিও ভাল।

—কেমন লাগছে আমাকে? ভাল?

মেয়েটা চোখ তুলে তাকাল, শুভদৃষ্টির সময়কার মতো চোখ। কী লজ্জা ও শিহরণে ভরা বিদ্যুৎ! কথা বলল না।

রণেন বলে—আমি আর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব।

—তার মানে কি দুটো জীবন?

রণেন মাথা নাড়ল—শুধু বউ হলে আনতাম। কিন্তু বাচ্চাগুলো রয়েছে যে! বড় মায়া।

মেয়েটি বুঝেছে। মাথা নাড়ল। তৎক্ষণাৎ মেয়েটার একটা নাম দিল রণেন—লীনা। এই নামের একটা মেয়েকে বালক-বয়সে ভালবেসেছিল রণেন, যার সঙ্গে কোনোদিন কথাবার্তা হয়নি। লীনা করুণ চোখে চেয়ে মাথা নোয়াল। বলল—তাই হবে।

হবে! বাঃ! চমৎকার! সব সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল। সবাই থাকবে। বাচ্চারা, বীণা, আলাদা ফ্ল্যাটে লীনাও! বাঃ।

ভারী খুশী হয়ে ওঠে রণেন।

দুঘন্টার বৃষ্টি, কলকাতাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। ট্রাম বন্ধ, বাসে লাদাই ভীড়, ট্যাক্সির মিটার সব লাল কাপড়ে ঢাকা। বৃষ্টির পর কলকাতা থেমে যায়, কিংবা খুব আস্তে আস্তে চলে। রথের মেলার মতো মানুষ জমে আছে সর্বত্র। থিকথিক করছে জীবাণুর মতো মানুষ।

রণেন অফিসের হলঘরে তার ভেজা জামা আর গেঞ্জি ফ্যানের তলায় চেয়ারের পিঠে মেলে দিয়েছে। বসে আছে চুপচাপ। অফিসে এখনো কিছু লোকজন আছে। জনা ছয়েক লোক একধারে ফিস খেলছে। অন্যধারে ব্রিজের আড্ডা বসেছে। শুধু মুখোমুখী ঘোষ বসে নীরবে অংক কষছে। রণেন চোখ বুজে ছিল। ভাবছিল সবাইকে

ডেকে বলে দেবে, মরবার পর যেন তাকে না পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়। পোড়ানোটা বড় বীভৎস ব্যাপার। আবার পরক্ষণেই মনে হল, কবর! ওরেব্বাস, সেও তো মাটি চাপা হয়ে দমবন্ধ হবে। হাঁসফাঁস করতে হবে কেবলই।

ভেবেই সে হঠাৎ জোরে বলল—না না।

বলেই চমকে ওঠে। ঘোষ একবার মুখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল। কিছু জিজ্ঞেস করল না। রণেন লজ্জা পেল বটে, কিন্তু ঘোষ বড় বিবেচক মানুষ বলে লজ্জাটাকে সামলে গেল।

সাতটা বেজে গেছে। ফিসের আড্ডাটা থেকে দুজন বেরিয়ে গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল—ঘোষদা, এই বৃষ্টিতে কি ভাল জমে বলুন তো?

ঘোষ উত্তর দিল না। ব্রিজের আড্ডা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল—ভূতের গল্প, খিচুড়ি আর মেয়েছেলে।

—দূর। ঘোষদাকে বলতে দিন।

ঘোষ উত্তর দিল না। একটু হাসল কেবল, অংক কষতে লাগল।

আর একজন বলে—ইলিশ।

—কত করে কেজি জানিস? ঐ লাহিড়ি জানে, জিজ্ঞেস কর।

কে একজন চেঁচিয়ে ডাকে—লাহিড়ি, ও লাহিড়ি।

রণেন তাকাল। অ্যাকাউন্টসের বিপুল সেন। ভ্রূ কুঁচকে রণেন বলে—কি?

—ইলিশ মাছ কত করে যাচ্ছে?

—কি জানে।

—আমাদের মধ্যে তো এক আপনাকেই দেখছি যিনি ইলিশটিলিশ খান। আমরা তো আঁশটাও চোখে দেখি না। ইন্সপেক্টর না হলে সুখ কি!

রণেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়। ব্যক্তিত্ব না থাকলে এরকম হয়। যে-সে যা খুশী বলে সারতে পারে।

কে একজন বলল—ইলিশ খেয়ে পয়সা নষ্ট করবে কেন! লাহিড়ি লকারে রাখছে। টালিগঞ্জে বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, সব খবর রাখি।

হলঘরের দরজাটা খোলা। কে একজন ছাতা মুড়ে, গা থেকে বর্ষাতি খুলতে খুলতে দরজা দিয়ে ঢুকে এল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারধারে চাইছে।

রণেন চিনতে পারল। সোমেন। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। সোমেন অফিসে কেন? কোনো খারাপ খবর নেই তো! বাবা, মা, বীণা, বুবাই, টুবাই, খুকী, শীলা, অজিত—কত প্রিয়জনের নাম ঘাই মারে বুকের মধ্যে।

রণেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

সোমেন তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

ক্রমশ

তুমি আছ, আমি আছি

১৯৭৫ মহিলা বৎসর হিসাবে নারী সমাজের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশে বিদেশে নূতন করে নারীর মর্যাদা, সমাজে তার স্থান ও ভূমিকা নির্দেশ করবার দারুণ চেষ্টা চলেছে। ১৬ ফেব্রুয়ারী নারী দিবস হিসাবে সারা ভারতে পালন করা হয়েছে। দিনটি বেছেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সেদিন বাসন্তী উৎসবে, আমাদের শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজো। শ্রীপঞ্চমী শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী-মস্যাধার লেখনী পূজো। সকল শুভকর্মারম্ভের প্রশস্ত দিন। এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মোৎসব। নারীর মর্যাদার পরম সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সমীচীন ক্ষণ সন্দেহ নাই।

একটি বছর বা একটি দিন উদযাপন করা বড় কথা তখনই হবে যখন সেদিনের প্রভাব আগামী যুগকে উদ্বুদ্ধ করবে। মেয়েদের প্রতি পুরুষের একটা দারুণ রোম্যান্টিক শ্রদ্ধা ভালবাসা নিয়ে আমাদের সমাজ যে বড়াই করে সেটা মাত্র আংশিক-ভাবে সত্য। দেবীপূজার দোহাই দিয়ে, নারীর প্রেমের পরিধি পরিমাপ করে, তার আত্মত্যাগের বর্ণনা দিয়ে সবাই তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। যেমন ধনী গৃহের হীরামোতির ঝলক লুব্ধ করে তাদের দৃষ্টি। দৈনন্দিন জীবনের সত্য তখন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সত্যকে কি ভাবে আমরা চাই সেই বাস্তবধর্মী বা pragmatic প্রায়োজিক পরিকল্পনা কি তাই বিচার করবার দিন এখন এসেছে। সাম্যই সব নয়। সামগ্রিক মঙ্গল আসল লক্ষ্য। পথের দিশানা নিত্য বদলায়। জীবনের লক্ষণ এটা। আজ যাকে পরম সত্য মনে হয়, কাল তা হয়তো নূতন রূপ পরিগ্রহের অপেক্ষা করে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজের নানা সমস্যাকে ঘিরে তাই নারীর প্রতিষ্ঠার সোপান রচিত হয়। বিদেশী মনস্তাত্ত্বিক বলেন, মেয়েরা সাইকেল চড়েন, জিন পরেন, মিনি স্কার্ট পছন্দ করেন, ক্রিকেট খেলেন, দপ্তরে কাজ করেন কিন্তু তাঁদের ঠাকুমারা যে prince charming-এর স্বপ্ন দেখতেন, এখনও বেশীর ভাগ মেয়েই তা দেখেন। তা ছাড়া পুরুষে পুরুষে যে স্বার্থ লক্ষ প্রভৃতির একত্ব বা অভিন্নতা আছে তা মেয়েদের মধ্যে অনেক কম। মেয়েরাই মেয়েদের দোষ-দর্শী, সমালোচক, নিন্দক। মেয়েদের মধ্যে কত সহজে বনিবনার অভাব হয়। শ্বাশুড়ী বউ ননদ-ভাজ ইত্যাদি সম্পর্ক কুখ্যাত নারী প্রগতির সঙ্গে তার সেই প্রবাদগত মনোভাবের পরিবর্তন কতটুকুই বা হয়েছে? অথচ গৃহের নিশ্চিন্ত কোণ ছেড়ে দলে দলে মেয়েরা জীবিকার সন্ধানে বাইরে

ঘরে বাইরে

এসেছে। কর্মী মেয়েরা পর্যন্ত তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নেও তেমন আগ্রহী নন।

অবিবাহিত মেয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদের পরবর্তী অধ্যায় সমাজের আর একটি অবহেলা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার দিক। পর পর কত দৃষ্টান্ত দেখলাম যেখানে কুমারী, ডিভোর্সি ইত্যাদি একলা মেয়ে নিতান্ত অসুবিধায় কাল কাটান। তাদের মর্যাদা যেন একলা বলেই কম। তাঁরা যদি উপার্জনের উপযুক্ত কোন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত না হন তবে তো কথাই নেই। মূল্যস্ফীতির বাজারে তাঁরা কাঠকুটোর মত ভেসে যেতে পারেন। পরিত্যক্তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। সেদিন এক এমনই দেখলাম। দুটি শিশু নিয়ে এসেছে একটি মহিলা ত্রাণ সংস্থায়। পিতামাতা তাকে জেনেশুনে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে "বিবাহ" দিয়েছিলেন। মেয়েকে পার করা হলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত। স্বামীর আগের বিবাহের খবর জানতে সময় লেগেছিল। ততদিনে পর পর দুটি সন্তান এসে গেছে। লেখাপড়া বা উপার্জনের উপযুক্ত কোন শিক্ষাও নেই। স্বামী ঠেলে দিলেন বাইরে। কিছু শিক্ষার সন্ধানে সে এসেছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে। তার চেয়েও মর্মান্তিক মনে হলো শিক্ষিত সমাজের একটি ঘটনা। পরম পণ্ডিত স্বামী বিশ বছর সংসার করার পর আবিষ্কার করলেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মার্জিত মনের যোগাযোগ নেই। সম্পন্ন সংসারের কন্যা হয়েও বাপের ঘরে ফিরে যাবার মত সমাদর বোধ হয় ছিল না।

তাই দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরছিলেন জীবিকার সন্ধানে। এমন কোন কার্যকরী শিক্ষা ছিল না সহজে চাকরি মিলবার মত। মনের অবস্থা ছিল না স্বামী বা পিতৃ-গৃহের জানাশুনো অর্থাৎ contact ভাঙ্গাবার মত। সুপারিশ না হলে কোথাও কি কিছু হয়? মেয়েদের বেলায় সুপারিশের পথও কণ্টকময়। ভাবুন, সম্ভ্রম তখন কোথায় থাকে? তাই বলছিলাম সব শিক্ষার আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা নারীর সাম্যের প্রধান প্রয়োজন। বিয়ের বেলায় রাজপুত্তুর নাই বা হলো। দুটি কর্মী মানুষের সহযোগ সংসারকে করতে পারে মহিমাময়। আর্থিক স্তরের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে যাওয়ার স্বপ্ন এখন সেকেলে। ঘুঁটেকুড়ুনি দরিদ্র মেয়ে হঠাৎ রাজার দুলালের নজরে পড়লো আর তারপর তাকে জাঁকজমকে প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করা হলো এটা সেই সামন্ততন্ত্রের মনোভাবের গন্ধে ভরা।

পৃথিবীর সর্বত্রই অনুশীলন করে নাকি দেখা গেছে যে, মেয়েরা কাজ করে কেবল জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্য। কিন্তু তার অন্য দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয় যতদিন আর্থিক স্বাধীনতা না হয়। অন্যের উপার্জিত অর্থ সব সময় নিজের হয় না। তাতে বিলাস হয় কিন্তু আত্মপ্রত্যয় হয় না। ছোট শিশু বা সংসার নিয়ে যাঁরা বিব্রত, যাঁদের ঘরের বাইরে কাজ করা সম্ভব নয় বা তাতে সামগ্রিক মঙ্গলের ব্যাঘাত হয়, তাঁরাও জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা সংগ্রহ করতে যেন দ্বিধা না করেন। যোগ্যতা কাজে লাগাবার দরকার যে কোন সময় হতে পারে। ছেলেকে যেমন কারিগরী শিক্ষাদানের প্রশ্ন উঠছে, তেমনই মেয়েদের বেলায়ও কার্যকরী শিক্ষার কথা পিতামাতা বা অভিভাবকের মনে রাখা উচিত। আমাদের মেয়েরা অল্পবিস্তর যা করেন তা white collar কর্মী হিসাবে। BLUE collar কর্মীর বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও পূর্ণরূপে প্রাচীন ধারায় চলছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমান হবার সংসাহস যেদিন আসবে সেদিনই মহিলা বৎসরের সার্থকতা বুঝবো।

টুকিটাকি

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ গ্রানট কথায় প্রকাশ ভিন্ন মানুষের মনের আদানপ্রদান বিষয় গবেষণা চালাচ্ছেন। তিনি প্রায় ১০০টি সঙ্কেত বা ইশারার হদিস করেছেন। তার মধ্যে ভ্রূভঙ্গি আছে, ভ্রূকুটি আছে, চোখের ইঙ্গিত আছে। তাঁর মতে সব ইশারার সেরা হচ্ছে হাসি। হাসি দিয়ে মানুষ অনেক কিছু বলে। বিবাদেও মানুষ হাসে। সে হাসি আনন্দের হাসি থেকে আলাদা।

মনস্তত্ত্বের জটিলতা খুলতেও কথার চেয়ে মুখের ভাবের মূল্য বেশী। কথায় মানুষ গোপন করতে চাইতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু মুখের ভাব গোপন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ডাঃ গ্রানট মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করেন যখন তখন মুখের কথার চেয়ে প্রশ্নের উত্তরে মুখের পরিবর্তন দেখেন বেশী।

মানুষের আবেগ ও অনুভূতির আয়না তার মুখের হাসি। ভিন্ন ভিন্ন হাসিতে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির খোঁজ মেলে। কত হারানো ঠিকানা পাওয়া যায় হাসির মাঝে। মনোভাবের এই অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি বিদ্যার মত মহান। যত দান করা যায় তত বেড়ে যায়। মধুর হাসিতে মনের মাধুরী পরিবেশন করতে অভ্যাস করুন। দিন দিন হাসিতে মুখ আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যাদের বিলিয়ে দেবেন হাসি তাদেরও মনে ছোঁয়াচ লাগবে। অজানা ইংরেজ কবির কটি পঙক্তি এই প্রসঙ্গে ভাল লাগবেঃ

The more I smiled at people
The more they smiled at me;
Now I collect bright smiles each day
from everyone I see —

যত আমি সবার দিকে আনন্দে মৃদু হাসি, তত ফিরে পাই আরও বেশী মধুর হাসি। এখন আমি যাকে দেখি তারই কাছে সংগ্রহ করি প্রতিদিন উজ্জ্বল দীপ্ত হাসির পসরা।

হাতের কাজে মেয়েরা

শহর ও শহরের উপকূলে নানা স্থানে বহু মহিলা স্বাধীনভাবে নানাপ্রকার হস্ত-শিল্পসামগ্রী তৈরী করে সসম্মানে জীবিকা অর্জন করেন একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ঘরে বসে, স্বাবলম্বী হয়ে তাঁরা যে আজকাল কত বিভিন্ন জিনিস তৈরী করেন, আন্ত-র্জাতিক মহিলা বৎসর উপলক্ষে উওমেনস কো-অর্ডিনেটিং কাউনসিলের উদ্যোগে সরলা মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত একটি হস্ত-শিল্প প্রদর্শনী দেখে জানা যায়। কলকাতা ও শহরতলী থেকে বহু মহিলা এবং মহিলা প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ও প্রত্যেকেই তাঁর হস্তশিল্প সম্ভারের পরিচয় দেন। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূচি ও পশমশিল্প থেকে শুরু করে পুতুল, চামড়ার ছোট বড় ব্যাগ, বাটিকের শাড়ি ব্লাউজ, টেবলক্লথ, সুতি ও পশমের ছোট বড় জামা, ফ্রক, সোয়েটার, বেতের নানাবিধ জিনিস, সুদৃশ্য হালকা কাঠের জুতা, খাতা, পেনসিল, মোড়া প্রদর্শনীতে দেখা যায়। এছাড়া অনেক বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবার জিনিসও তৈরী করেন। বিশেষ করে দেব শীতলা সংঘের তৈরী হিঙের কুচুরির গুঁড়া পুর সত্যিই উপাদেয়। এক প্যাকেট পুরে ৩০।৪০টি হিঙের কুচুরি কয়েক মিনিটেই ভাজা যায়। বলা বাহুল্য, একটি প্যাকেট কিনে ও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এটি খুবই প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু, বিশেষত গৃহস্থের পক্ষে। সুন্দরবন মহিলা সমিতির সভ্যাবৃন্দের তৈরী হলুদ পাউডার ও উপাদেয় বড়িও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বৃদ্ধা অমিয়বালা মিত্র ছেঁড়া কাপ-ড়ের টুকরা অবলম্বনে ছোট কার্পেট জাতীয় যে আসন তৈরী করেছেন সেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঙীন সুতায় রেখাজাতীয় অতি সূক্ষ্ম সূচিশিল্পে তৈরী শাড়ির পাড় (সুরঞ্জনা) দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। বকুল ঘোষের পোড়ামাটির দুর্গা ও রিলিফ জাতীয় নানা নিদর্শন অনেকের চোখে পড়ে। অসীমা মুখার্জীর তৈরী নানা পুতুল ও নারী সেবা সংঘের সভ্যাদের তৈরী সুন্দর ছাপা শাড়ি ও তোয়ালে ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। মাত্র একদিনের জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে বহু মহিলার সমাগম হয় ও তাঁরা কেনাকাটাও করেন। তবে এ জাতীয় প্রদর্শনীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, কারণ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে এ জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হলে অনেকেই স্বাব-লম্বী মহিলাদের হাতে তৈরী নানা জিনিস কিনতে পারবেন ও অপরপক্ষে প্রচার ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে, যাঁরা সকলের অলক্ষ্যে কষ্ট স্বীকার করে জিনিসগুলি তৈরী করছেন তাঁরাও যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

শ্রীমতী

॥ চৌদ্দ ॥

হাসিমুখে জানীকে বললুম,

—"ছেলে হোক্, মেয়ে হোক, বাড়ির সামনে হিজড়ে নাচ হলেই হল!"

জর্জ ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলে,

—"কে নাচবে?"

—"হিজড়েরা।"

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে দেখে নিয়ে অবাক গলায় জিগ্যেস করলে,

—"কেন, ওরা নাচবে কেন?"

বউ, দেশে আমরা যেমন ওদের একেবারে আলাদা শ্রেণী করে রেখে দিয়েছি, এখানে তা ভাবাই যায় না। সাধারণ পুরুষমানুষের মতোই ওরা বড় হয়। লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি করে একই সমাজের মধ্যে জায়গা পেয়ে যায়। অবিবাহিত পুরুষের মতোই প্রায় ওদের জীবনযাপন। আমাদের দেশের কথা বললুম জর্জকে। বললুম,

—"মন্ত্রবলে ওরা খবর পেয়ে যায় কোন্ বাড়িতে বাচ্চা হয়েছে, কোন্ বাড়িতে বিয়ে!"

সব শুনে জানী বললে,

—"আহা, বেচারা!"

বললুম,

—"শুধু তাই নয়। ওরা জানে, আমরা ওদের দেখে হাসি। সেইজন্যেই হয়তো, সমাজের পুরুষ বা মেয়েদের আরো হাসাবার চেষ্টা করে—অংগভঙ্গি করে, তালি বাজিয়ে, গান গেয়ে।"

জানী জিগ্যেস করলে,

—"ওরা কি জোকার?"

সত্যিই তো বউ, একথাটা মাথায় আসেনি কখনো। আমাদের দেশের নপুংসকরা কি সার্কাসের জোকারের মতো! জোকারদের রং-চং মেখে বিশ্ভুত সেজে লোক হাসাতে হয়। এদের জন্মই এমন, কোনো মেক-আপ নিতে হয় না। রাস্তা দিয়ে একটু তালি বাজিয়ে হেঁটে গেলেই আমরা হেসে ফেলি। কাছাকাছি এসে পয়সা চাইলেই ভয়ে ভয়ে দিয়ে দিই—এক্ষুণি হয়তো কাপড় তুলে দেখিয়ে একটা বিশ্রী অসামাজিক দৃশ্য তৈরী করবে। দূরে থেকে বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়ে গালি খায়। এরা মানুষ-মানুষীর বাইরে। জোকাররা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে গণ্য হয়, আমাদের দেশের এরা শুধুই নপুংসক। হাত, পা, মুখ, চোখ সব মানুষের মতো, অথচ এরা মানুষ নয়! জন্তু-জানোয়ারও নয়! কি আশ্চর্য সব কান্ড আমাদের দেশে!

জানীকে বললুম,

—"না, ওরা জোকার নয়। মানুষই নয় বোধ হয়!"

—"তবে কি?"

—"জীবিত এক জাতের প্রাণী!"

পেটের ভেতরে কয়েক পাত্তর গিয়ে সহসা ওদের জন্যে মনটা ভার-ভার ঠেকল। 'আহা রে, কি কষ্ট' গোছের অনুভূতি। অথচ এক্ষুনি সামনে দুটি হিজড়ে গলা বিকৃত করে হেলেদুলে গান গাইলেই হয়তো হেসে ফেলব। জর্জ বললে,

—"তোমার বিয়েতেও ওরা এসেছিল হাততালি দিতে?"

ওরা তো এসেছিল, বউ তাই না! বললুম,

—"হুঁ! শুধু হাততালি নয়, ঢোল বাজিয়ে ছ'সাত জন একসংগে গান গেয়েছিল!"

—"কি রকম গান? কোনো স্পেশাল কিছু?"

—"না, ঠিক স্পেশাল নয়। সাধারণ বাংলা ভাষায় গান, অথচ ওদের ভাঙ্গা গলায় সামান্য বিকৃত উচ্চারণে যখন ওরা গান গায়, তখন খুব স্পেশাল কিছু মনে হয়। স্পেশাল সব হাসি-ঠাট্টার গান।"

—"একটু ঝুঁকে পড়ে আগ্রহের গলায় জর্জ বললে,

—"কি রকম? শুনি, শুনি।"

আমি হেসে ফেললুম,

—"তোমরা তো কিছু বুঝবে না ওই সব গানের!"

খুব উৎসাহের সঙ্গে জর্জ বললে,

—"তুমি বুঝিয়ে দেবে।"

আচ্ছা বউ, বলো! হিজড়েদের গানের ফরাসী তর্জমা কি করে সম্ভব!

জানী বললে,

—"সুরটা তো শুনি! গাও না!"

জানী বেশী খাচ্ছে না মদ। দ্বিতীয় পেগেই আটকে আছে। আমার কিন্তু বেশ ঝিমঝিম ভাব। জর্জের বোধ হয় একই ব্যাপার। আহা, সেই বাসী বিয়ের দিন সকালে, তোমাদের উঠোনে ওরা যে গানটা গেয়েছিল, তোমার মনে পড়ছে বউ? আমার তো সব মনে আছে, আমি তো কিছুই ভুলি না! সেই যে, ঢ্যাঙ্গা মতন হিজড়েটি ঢোল বাজাচ্ছিল কোমর দুলিয়ে। পোড়া তামা রং, চোয়াড়ে মুখের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গালের হাড়ে, কপালে বসন্তের দাগ। নাকে রুপোর নাকছাবি। দাঁতে পানের ছোপ। বাকি সবাই তালি দিয়ে দিয়ে গান গেয়েছিল। যতটা সম্ভব গলা বিকৃত করে শুরু করলুম,

"দিদিলা তুই কি করিলি! সোনার ডালে কাক বসালি!! গেঁথে ও মতির মালা ক'ন বাঁদরের গলায় দিলি'—

বলে, আমার থুতনি ছুঁয়ে আবার গাইল,

"বাঁদর ক্যানো এই বাসরে, তুলে দে না যাক সদরে—হে—"

তারপর সবাই এক সঙ্গে তালি বাজিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে তোমার দেখাল, গাইল,

"থর থর থর, পড়ল ঢলে বরের গায়েরে বরের গায়েতে লো, ও নয় মন মজায়তে—"

জর্জ গানের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পপ্ নাচের ভঙ্গিতে দুলতে লাগল, তালি বাজিয়ে বাজিয়ে। মুড এসে গেছে। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম।

বললুম,

—"না—না! ওরকম নয়! এই রকম—"

হাত উল্টে কোমরে রেখে দুলে দুলে দেখালুম। জর্জও আমার দেখাদেখি চেষ্টা করল। বলল,

—"দাও, দাও, পুরোটা শেষ করো—"

দীর্ঘদেহ এই ফরাসীটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বেশ মজা পেলুম। এত দূর দেশের একটি শ্বেতাঙ্গ শিল্পী ট্রাউজার, শার্ট, সোয়েটার পরে ভারতীয় হিজড়ে-নাচ চেষ্টা করছে। আমি এক ভেতো বাঙ্গালী প্যারিসের নির্জন শহরতলী মঁমার্তের নিবন্ধ পরিবেশে হিজড়েদের গান তাকে শোনাচ্ছি। কি রকম অদ্ভুত লাগছিল। আলোটি আবার শুরু করেছে লাল, নীল, সবুজ কাচের কুচি-গুলি ঘুরে ঘুরে জায়গা বদল করল। সব রং ঝলমলে হয়ে গিয়ে কেমন একটা পোড়া তামার মতো লাগছে। সেই পোড়া তামা রঙের চামড়ায় বড় বড় বসন্তের দাগ। চোয়াড়ে মুখে গালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নাকে রূপোর নাকছাবি। ঠোঁট নড়ছে না। ও এখন গান গাইছে না। কেমন বিচ্ছিরি ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে ও বলল,

—"বান্ধবী! আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছো! আমরা কিন্তু তোমার মঙ্গল কামনা করছি। দোরে দোরে ঘুরে সবার মঙ্গল কামনা করি আমরা।"

মনে মনে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম,

—"সরে যা! মরে যা, হিজড়ে কোথাকার!"

জর্জ বললে,

—"কি হল, গাও না! থেমে গেলে কেন?"

হেসে ওর দিকে তাকিয়ে ফিরে এলুম। হরিণের চামড়ায় বসতে বসতে বললুম,

—"আরো একটু মদ খেয়ে নিই, তারপর।"

জানী চুপচাপ বসে আমাদের মাতামাতি দেখছিল। করুণ মুখ করে কি যেন ভাবছে। হাতদুটি কোলের কাছে জড়ো করা। সামান্য বাঁদিকে হেলে রয়েছে মাথাটি। ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলে বড়সড় একটি আংটি। কালো ট্রাউজার, হালকা নীল রংয়ের পুলওভার পরে টানটান বসে আছে সোফায়। খুব শান্ত গলায় আস্তে আস্তে স্বগতোক্তির মত বলল,

—"ওদের নিয়ে এমন হাসিঠাট্টা করা বোধহয় তোমাদের উচিত নয়।"

ফিকে হেসে গেলাসে চুমুক দিলুম। বললুম,

—"সেটা বুঝি ঠিকই। কিন্তু কি করব বলো, ছোটবেলা থেকেই ওরা আমাদের চোখে হাসির খোরাক হয়ে বেঁচে থাকে। যখন বুঝতে শিখি, তখনো সেই নির্মম হাসির আবরণটি ভেঙে ফেলতে পারি না।"

—"খুবই লজ্জার কথা শিল্পী! তোমাদের দেশের সব কিছু সম্পর্কেই আমাদের কল্পনায় এক আশ্চর্য বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা জড়িয়ে আছে। যে বিরাট দেশের সূর্যের অমলিন উজ্জ্বলতায়, শুদ্ধ বাতাসে বড় বড় সব কবি, মনীষী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো বিদগ্ধজন জন্মেছেন সেখানে এই ধরনের অমানুষিক রুচি কি করে বেঁচে আছে, বুঝতে পারছি না।"

বেশ লজ্জা-লজ্জা করছিল, বউ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা এই স্নিগ্ধ বিদেশিনীর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। তবু ভালো, আমাদের ঐতিহাসিক দেশের অনেক অশুদ্ধ বাতাস আর অমানুষিক রুচির খবর সমুদ্র পেরিয়ে এ রাজ্যে পৌঁছোয় না। কিন্তু, আমার মনে হয়, সব খোলাখুলি বিশ্বময় বলে দেওয়া ভালো যে আমরা আর অত ভালো নেই। আমাদের আপাতমসৃণ ত্বকের ভিতরে ভিতরে অজস্র ফোঁড়ায় পুঁজ জমে গেছে, জমছে। তোমার, পৃথিবীর আধুনিক মানুষেরা, আমাদের আর অত শ্রদ্ধা জানিয়ে লজ্জিত কোরো না। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা সংহিতার দেশের আমরা আজ এই হয়ে গেছি। সূর্যকে শিয়রে রেখে গরীব হয়ে গেছি বড়। বুক ফুলিয়ে বোমা ফাটাচ্ছি, চামড়ার ভেতরের ফোঁড়াগুলি পেকে টস্‌টস্‌, আলপিন লাগিয়ে ফাটাতে পারছি না। তেমন কোনো বিশুদ্ধ আলপিন কোনো কারখানায় তৈরী হচ্ছে না এখন। দেশের অর্ধেকের বেশী লোক বোধ হয় অন্যায় করছে, বাকি যাঁরা তাঁরা সে অন্যায় সহ্য করছেন।

আমাদের দুজনের খালি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জর্জ বলল,—"তুমার কি হল, জানী? শেষ কর ফেল ওটুকু!"

সূর্যকে শিয়রে রেখে গরীব হয়ে গেছি বড়

আমি জুড়ে দিলুম,

—"সেই দ্বিতীয় পেগটি নিয়ে বসে আছো তখন থেকে, খেয়ে নাও!"

বোতলটি ডান হাতে নিয়ে ওর গেলাসে ঢালবার জন্যে অপেক্ষা করছে জর্জ। ও বলল,

—"আমি আর খাব না কিন্তু, ভাল লাগছে না—"

—"ইস্‌, ভালো না লাগলেই হল। আমাদের তো ভালো লাগছে—"

বলে, জর্জ বাঁ হাতে জানীর গেলাসটি ওর প্রায় মুখের কাছে তুলে ধরল। জানী বললে,

—"তোমাদের ভালো লাগছে, তোমরা খাও না, কে বারণ করেছে?—"

—"লক্ষ্মী সোনা, তোমার এই বুড়ো বর তোমাকে আদর করে একটু খেতে বলছে—" আদুরে গলায় বলতে বলতে জর্জ গেলাসটি জানীর ঠোঁটের সঙ্গে ছুঁইয়ে দিল। লিপস্টিক ছাড়াই আপন রংয়ে গোলাপী ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে গেল। মাথাটি পিছিয়ে নিয়ে সোফার গায়ে হেলান দিল জানী। জর্জের বাঁ হাতটি চেপে ধরে হেসে ফেলল। বলল,

—"এই, এই, করছো কি? উফ, থাচ্ছি বাবা, থাচ্ছি—"

ওর মুখে পানীয়টুকু ঢেলে দিয়ে জর্জ বলল,

—"মেরসী মাদাম! মেরসী বোকু!"

আমি হাসছিলুম। বাঁ হাতের ছোট্ট রুমাল দিয়ে আলতো করে ঠোঁট মুছল জানী। বলল,

—"বুড়ো হয়ে গেল লোকটা, দুষ্টুমী গেল না—"

ওর গেলাস ভর্তি করতে করতে জর্জ বললে,

—"হুম্‌হুম্‌বাবা! ওই দুষ্টুমিটুকু যদ্দিন আছে, তদ্দিন জানবে জর্জ বোয়া-গুনতিয়ের জীবিত আছেন!"

জানী আবার বোতলসমেত জর্জের হাতটি চেপে ধরে বলল,

—"করো কি—করো কি—অতখানি আমি খেতে পারব না—"

—"পারবে। নিশ্চয়ই পারবে সোনা। বরফ মিশিয়ে পাতলা করে দিচ্ছি!"

বলে, চারটে চৌকো বরফের টুকরো গেলাসে ফেলে দিল জর্জ। মদ লাফিয়ে উঠল গেলাসের মধ্যে। দু'এক ফোঁটা ছিটকে বাইরে পড়ল, টেবিলে। জর্জ আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল,

—"দ্যাখো, দ্যাখো! দেখলে তো—যা চাইলে তাই হল! কমে গেল অমৃতের চার-চারটি ফোঁটা!"

বোতলটি টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে বলল,—"আসছি।"

জিগ্যেস করলুম,

—"কোথায় চললে?"

বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে

ফায়ার প্লেস দেখিয়ে বলল,—"কাঠ নিয়ে আসি!"

ফায়ার প্লেসের ভেতরের ইংটগুলো জ্বলছে। আগুন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কারিক পরিশ্রম করে কাঠ জেলে আগুন তৈরী করার মূল্য প্যারিসে নেই বললেই চলে। এখন জামানা সভ্যতা মানেই সেণ্ট্রাল হীটিং ঘর। মোটা নল বেয়ে সারাক্ষণ গরম জল ঘরের মধ্যে আনতে থাকবে। পাশাপাশি রাখা চার-পাঁচটা নল ঘুরে ঘুরে ফিরে যেতে থাকবে সারাক্ষণ। এদের তো বেশ সচ্ছল অবস্থা, ঘরে গরম জলের নল নেই কেন? ফায়ার প্লেস থেকে চোখ সরিয়ে জানীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা জিগ্যেস করতে যাব, মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না। জানী ওর বড় বড় চোখ দুটি আমার মুখের ওপর ফেলে চেয়ে আছে। আগের মতোই কোলে রাখা হাত দুটি। তবে শরীরে এখন আর সেই টানটান ভঙ্গি নেই। ঢেউ তোলা মোটা শরীরটি হলুদ সোফার গায়ে বিশ্রাম করছে যেন। নীল পুলওভারের ওপর পুষ্ট স্তন আলাদা আলাদা একটি চেহারা নিয়ে স্থির। জানীর উদ্ধত বুক, না, ঠিক উদ্ধত বলা যাবে না, উন্নত, অপরিচিত বুক দুটিকে যেন আলতো করে ছুঁয়ে আছে। গলায় আর কোনো অলংকার নেই জানীর। পানের গড়ন মুখের সরু চিবুকে ওপর থেকে নিয়ন আলোর হাইলাইট। হাইলাইটের কোনো চলিত বাংলা আছে কি? উঁচু আলো, উজ্জ্বলতম আলো? দূর। শুনলেই হাসি পায়। অমুকের পোর্ট্রেটে হাই লাইট এই জায়গায়—এইটুকু বললেই বুঝে ফেলা যায় মুখটির অবস্থান মোটামুটি কি রকম। অবশ্যই আলোর সূত্রের সঠিক অবস্থাও জানা থাকা চাই। কারণ নানা জাতের, ধরনের আলো-অন্ধকার মিলেমিশে অথবা ঝগড়া করে একটি মুখের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। আলোর উজ্জ্বলতা, অন্ধকারের গভীরতার স্তরভেদ এক-একটি মুখ নির্মাণ করে। কিন্তু হাই-লাইটের জায়গা থেকে যায় সারা মুখে একটি। পৃথিবীর এমন কোনো ভালো পোর্ট্রেট বা মুখের খবর আমার জানা নেই, যেখানে একটির বেশী হাইলাইট বর্তমান। জানীর চিবুকে এখন হালকা নীল রংয়ের হাইলাইট। দুটি গোলাপী ঠোঁটের মধ্যে এত অল্প ব্যবধান যে ভিতরের সাদা দাঁত অন্ধকারে ডুবে আছে। নীচের ঠোঁটটি সামনা পুরু। ওপরেরটি টানটান ছিলায় ধনুকের আকার। ঠোঁট বেয়ে, ডান পাশের গাল, যেখানে আলো পড়েছে, সেই গালের উজ্জ্বল মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমার চোখ ওর চোখের সঙ্গে আটকে গেল। আমি জানি, আমার চোখের সাদা অংশটুকু এখন ফিকে গোলাপী। মাথার ভিতরে কোন অন্ধকার কোণে সেই প্রাগৈতিহাসিক গুবরে পোকাটির গায়ে নেশার জল পড়ে পড়ে জবজবে এখন! ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে কুৎসিত এক বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলে দুলে হেঁটে বেড়াতে লাগল। আমার দিকে পোকাসুদ্ধি তাকালো জানীর অপলক চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ও তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। গুবরে পোকাটা বললে,

—"বয়সে বড় তো কি হয়েছে! দেখতে সুন্দরী কিনা? কি সুন্দর মুখ, গোলাপ ফুলের মতো ঠোঁট দুটি, ভরন্ত বুক আর কোমর দিয়ে তোকে ডাকছে, দেখতে পাচ্ছিস না!"

কিন্তু ও তো জর্জের বউ! জানী বোঝাচ্ছেইতো। ও আমাকে চাইবে কেন?

—"দূর বোকা! তোকে এখন না চাইবার কি আছে! তুই তো জর্জের মত বুড়িয়ে যাসনি। একটা সুন্দর যুবক পুরুষ তো তুই!"

জর্জ মোটেই বুড়িয়ে যায়নি। তাছাড়া, ওদের ছেলে ফিলিপ আছে।

—"ফিলিপ যে ওদেরই ছেলে কে বললে?"

ক্রমশ পোকাটার কাছে হেরে যেতে লাগলুম। ও বলে চলেছে,—"তোর বাদামী রং ওকে খুব টানছে। ভুলে যাস না ওর মাথার মধ্যেও ঠিক আমার মতো একটা প্রাগৈতিহাসিক পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে! জর্জ তো বেরিয়ে গেল কাঠ আনতে!"

কি যেন গানটা? সেই যে কাঠুরিয়াকে নিয়ে! পল্লীগীতি টাইপের! জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছে কাঠুরিয়া। তার বউটি দেওরকে শুনিয়ে গান গাইছে, "ভাতার গ্যাছে কাঠ আনতে—তারে বাঘে খাইয়া থাউক! আমার দেওরা বাইচ্যা থাউক—"

আমি কি জানীর দেওর? গুবরেটা বললে,

—"মোটেই না! কোনো সম্পর্কই নেই!"

কিন্তু রোজমারী? রোজমারী যে আমার সব সাহস, আমার সমস্ত পাকা অভিজ্ঞতার কাগজগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে!

—"দূর দূর শালা! দুনিয়ার সবাই কি রোজমারী? ওরকম লাখে একটা মেলে—তাছাড়া, ও তখন ওর ভারতীয় প্রেমিকের বিরহে কাতর ছিল। তুই বড্ড তাড়াহুড়ো করেছিলি! আর একটু সবুর করলে—"

জানীর চোখে চোখ মিলাই। সামান্য হাসলুম। যতখানি মিষ্টি করে সম্ভব। আমি জানি, অন্য সময় আমার এইসব হাসি দেখে মেয়েরা বলতো,

—"তোমার ওই মিলিয়ন ডলার হাসি দিও না—মরে যাব!"

জানীর মুখে কোনো পরিবর্তন নেই। বোধ হয় ওর পোকাটির সঙ্গে তর্ক করে চলেছে। গলায় মধু ঢেলে খুব আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম,

—"ইওরোপিয়ানরা তো রোদে-পোড়া বাদামী! আমার এই বাদামী চামড়া তোমার কেমন লাগে?"

ক্রমশ

বিশ্ব বিজ্ঞান

কলকাতার সাইক্লোট্রন মানব-কল্যাণে কতটা লাভজনক হবে ?

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, কলকাতার সাইক্লোট্রন প্রকল্পের জন্য রাঁচির ভারি শিল্প কারখানা ১৯০ টন ওজনের অতিকায় যে তড়িৎ-চুম্বক তৈরির কাজ হাতে নিয়েছিল সে কাজ এখন শেষ। বিশেষ ধরনের সংকর ধাতুর এই চুম্বক কয়েকটি খন্ডে একে একে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। বাকিগুলিও এ মাসের মধ্যেই এসে পড়বে। দেশজ উপাদানে এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় কারিগরি সহায়তায় তৈরি এই চুম্বকটির বসানোর কাজ শেষ হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। এবং কোন অঘটন না ঘটলে এ বছরেই এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাজ শুরু হয়ে যাবে। বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত পরীক্ষা চালানোর পর মানব কল্যাণে পারমাণবিক উদ্যোগের ব্যাপারে ভারতীয় পরমাণুবিজ্ঞানীদের এটিই হবে দ্বিতীয় বিশিষ্টতম সাফল্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩২ সালে সাইক্লোট্রন নামক বিশেষ এক ধরনের পরমাণু চূর্ণকারী যন্ত্রের আবিষ্কার করে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ই ও লরেন্স নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের পটভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া। সাইক্লোট্রন এক ধরনের পারমাণবিক ত্বারক যন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটার। যার কাজ বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক কণা, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি অথবা হিলিয়াম, ডিউটেরিয়াম প্রভৃতির পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের গতিবেগ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে বিভিন্ন বস্তুর পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান। আর এ ধরনের কাজ করার জন্যে প্রথমে চাই পারমাণবিক কণার বর্ষণ ঘটাতে পারে এমন একটি উৎস। এই উৎস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি এমন ধরনের বিশেষ কণিকা নির্গত হয়ে এসে প্রবেশ করে সাইক্লোট্রনের কেন্দ্রস্থলে। বলা বাহুল্য, এরা প্রত্যেকটিই আহিত কণিকা। সাইক্লোট্রনের মধ্যে থাকে শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক। পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে ওই তড়িৎ চুম্বকের মেরু নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে এবং দ্রুত পরিবর্তিত করা হয়। অর্থাৎ

ই-ন ১৩৫৪ আ-ওনের এই কাঠামোটি [illegible] ভারত হেভি ইলেকট্রিকলস লিমিটেড-এর তৈরি। কলকাতার লবণ হ্রদে যে সাইক্লোট্রন বসানো হচ্ছে তারই [illegible] চুম্বকের প্রধান অংশটি তৈরি করা হচ্ছে এই কারখানায় [illegible]

প্রথমে তার যেটি উত্তর মেরু, সেটা রূপান্তরিত হয় দক্ষিণ মেরুতে। একই সঙ্গে দক্ষিণ মেরু হয়ে দাঁড়ায় উত্তর মেরু। আবার পরক্ষণেই দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পরিণত হয় এবং উত্তর মেরু হয়ে যায় দক্ষিণ মেরু।

চৌম্বক মেরুর পরিবর্তন ঘটলেই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেরও পরিবর্তন ঘটে। সাইক্লোট্রনের কেন্দ্রস্থল থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতির মত আহিত কণা এই পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে, পড়ে বৃত্তাকার পথে ছুটতে শুরু করে দেয়। প্রথমে ধীর গতিতে। পরে ক্রমান্বয়ে তাদের গতি বাড়তে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড গতিতে সাইক্লোট্রন যন্ত্রের একটি বিশেষ ছিদ্র পথের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে বুলেটের মত আঘাত করে লক্ষ্যবস্তুকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় টারগেট। নানা রকম মৌলিক পদার্থ এই টারগেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এখন কথা হলো, পারমাণবিক বুলেটের সাহায্যে কোন্ মৌলিক পদার্থের বুকে এভাবে সংঘর্ষ ঘটিয়ে লাভটা কী?

লাভ এই, এইভাবে সংঘর্ষ ঘটিয়ে নতুন নতুন আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

যেমন ধরুন, লিথিয়ামের বুকে প্রোটন কণা দিয়ে আঘাত করলে পাওয়া যায় আলফা কণা বা হিলিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্র। বোরনের বুকে ওই একই প্রোটন দিয়ে আঘাত করলে তৈরি হয় তিনটি আলফা কণা। আবার অ্যালুমিনিয়াম-২৭ পরমাণুকে যদি আলফা কণা দিয়ে আঘাত করা যায়, তৈরি হবে ফসফরাস-৩০ আইসোটোপ। পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি পজিট্রন কণা ছেড়ে দিয়ে ফসফরাস-৩০ রূপান্তরিত হয়ে যায় সিলিকন-৩০-এ। ১৯৩৪ সালে এইভাবে সংঘর্ষ ঘটিয়ে লরেন্স সাইক্লোট্রনের সাহায্যে সর্বপ্রথম তিনটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনটি আইসো-

[illegible] যন্ত্রপাতি, [illegible] এবং [illegible]।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য সাইক্লোট্রন তৈরি করা হয়েছে। আজ থেকে [illegible] এশিয়ার প্রথম একটি সাইক্লোট্রন বসান হয়েছিল কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরীর তত্ত্বাবধানে। অবশ্য, তারও আগে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ লরেন্স এক সময়ে সাইক্লোট্রন সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কলাকৌশলের কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোট্রন তৈরি হয়েছে পৃথিবীর একাধিক গবেষণাগারে। উদ্দেশ্য, সাইক্লোট্রনকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলা। বিভিন্ন ধরনের মৌল কণাকে বুলেট হিসেবে কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধান চালান। কলকাতার সল্ট লেকে ভারতীয় পরমাণু সংস্থা যে যন্ত্রটি বসাচ্ছেন সেটি একটি বিশেষ ধরনের সাইক্লোট্রন। নাম অ্যাজিমুথাল ভ্যারিয়িং ফিল্ড সাইক্লোট্রন।

দুই

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, কলকাতার এই সাইক্লোট্রন মানব কল্যাণে কতটা লাভজনক হবে? একথা ঠিক, শক্তিশালী এই যন্ত্রে বুলেট হিসেবে বিজ্ঞানীরা নানা রকম পারমাণবিক কণা ব্যবহার করতে পারবেন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গায়ে আঘাত ঘটিয়ে পদার্থের গঠন, বিভিন্ন রকমের পারমাণবিক বিক্রিয়া প্রভৃতির উপর আধুনিকতম পর্যায়ে মৌল গবেষণা চালানোর ক্ষেত্রে এ যন্ত্র যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রত্যক্ষভাবে যাকে আমরা মানব কল্যাণমূলক কাজ বলে আখ্যায়িত করে থাকি, সে কথা ধরলে এই মুহূর্তে অন্তত এটুকু বলা চলে : কলকাতার এই সাইক্লোট্রন ব্যাপক হারে নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রচুর সাহায্য করবে। মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে যাদের ভূমিকা এখন কেউই আর অস্বীকার করতে পারেন না। বিশেষ করে জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো বটেই।

পদ্ধতিটি খুবই সহজ। যে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে শক্তি। কখনও পারমাণবিক কণা, যেমন, ইলেকট্রন, আলফা, বিটা প্রভৃতি হিসেবে কখনও বা সাধারণ আলোর মত তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ, যেমন গামা রশ্মি প্রভৃতির মত। ওই সব কণা বা বিকিরণের শক্তিমাত্রা বা বিস্তারের কারণ- [illegible] জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নানা রকম মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, যাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, কখনও কখনও অসম্ভবও হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন ধরুন, ইদানীং অনেকেই বলে আসছেন, নানা রকম কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর মাটি, জল এবং বাতাসে পারদের মাত্রা বেড়ে চলেছে। এই পারদ প্রাণী এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিশু এবং ভ্রূণের পক্ষে পারদ খুবই বিপজ্জনক বস্তু।

প্রশ্ন এই, কতটা বিপজ্জনক?

পারদের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (পারদ-২০৩) ইনজেকশনের সাহায্যে গর্ভবতী ইঁদুরের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মা-ইঁদুরের মস্তিষ্কের চেয়ে ভ্রূণের মস্তিষ্কে পারদ গিয়ে জমে অনেক বেশি মাত্রায়। কীভাবে জানা গেল? ওই আইসোটোপ শরীরের যেখানে গিয়ে হাজির হয়, সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বের হতে থাকে। বের হয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে। সংবেদনশীল যন্ত্রের সাহায্যে বিকিরণ মেপে বলে দেয়া যায় ওই পদার্থটি শরীরে কোথায় গিয়ে জমে, কতটা জমে এবং কতক্ষণ ধরে জমে থাকে। কারণ, বিকিরণ যদি পরে ধরা না পড়ে, বুঝতে হবে বস্তুটি শরীরের ওই বিশেষ জায়গা থেকে সরে পড়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, প্ল্যাসেন্টা বা ফুলের আস্তরণ ভেদ করেও পারদ ভ্রূণের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এবং বয়স্কের মস্তিষ্ক কোষের যতটা না ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে ভ্রূণের মস্তিষ্ক কোষের।

অথবা ধরুন, তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন (হাইড্রোজেন-৩) ট্রিটিয়ামের কথা। ইদানীং ট্রিটিয়াম ঘটিত রাসায়নিক যোগ থাইমিডিন (thymidine)-এর সাহায্যে জীবন সৃষ্টির মৌল কণিকা ডি এন এ-র সংশ্লেষণ নির্ধারিত করা হচ্ছে। ট্রিটিয়াম এবং কার্বন-১৪ আইসোটোপের সাহায্যে শরীরে কি কি ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড কতটা পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকে সে সব ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করছেন নানান দেশের বিজ্ঞানীরা।

শরীরের erythropoietin নামে এক ধরনের রাসায়নিক যোগের পরিমাণ জেনে নেবার ব্যাপারেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ভূমিকা যেন অদ্বিতীয়ের। রক্তে লোহিত কণার উৎপাদন বাড়ানর ক্ষেত্রে বিশেষ এই যোগটি যথেষ্ট সাহায্য করে। পরীক্ষার জন্যে বস্তুটিকে প্রস্রাব থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু মুশকিল এই, প্রচলিত রাসায়নিক পদ্ধতিতে এর পরিমাপ বের করা এখনও সম্ভব হয় নি। [illegible] অবস্থায় লোহার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের (লোহা-৫৯) সাহায্যে।

নতুন কোন ওষুধ তৈরি হল। এই ওষুধ শরীরে ঠিক কোন কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় এবং কতক্ষণ ধরে কাজ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তা জানা যায়। অপুষ্টির দরুন কেউ রক্তাল্পতায় ভুগছে। কী ধরনের খাবার থেকে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা দূর করা যায় ইদানীং তাও জানা যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় লোহা-৫৯-কে কাজে লাগিয়ে।

[illegible], জন্মনিরোধ ওষুধ খাওয়ার ফলে কোন কোন মহিলা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। এর কারণ কী? তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ আইসোটোপ কাজে লাগিয়ে এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেছে।

রক্তের প্রবাহমাত্রা, শরীরের কোন কোন অঞ্চলে জল, প্রোটিন, লবণ, অম্ল এবং ক্ষার গিয়ে জমছে, গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা, ক্যান্সার নিরাময় বা প্রতিরোধ, শল্য চিকিৎসায় সাজসরঞ্জাম নির্বীজাণুকরণ, হৃদরোগীর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখার জন্যে পেসমেকার নামে যে যন্ত্র কাজে লাগান হয়, সেই যন্ত্রটি চালু রাখার মত শক্তি সরবরাহ, অথবা বিকিরণের সাহায্যে উচ্চফলনশীল বীজ তৈরি থেকে শুরু করে বীজ এবং খাদ্য সংরক্ষণ—সব ব্যাপারেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ভূমিকা।

গত কয়েক বছর ধরে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করে আসছে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে ওই গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ঘটিত প্রায় ৫০টি ওষুধ তৈরি করেছে। ওষুধগুলি ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগার কাজে লাগাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কলকাতার সাইক্লোট্রনও নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করবে। এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে কাজে লাগান যেতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষকও সহজে এখান থেকে প্রয়োজন মত আইসোটোপ সংগ্রহ করে কাজ চালাতে পারবেন।

ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র যতটা উৎপাদন করছে চাহিদার তুলনায় তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এছাড়া সাইক্লোট্রনের সাহায্যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির সুবিধেও অনেক। অতএব কণা পদার্থের ওপর মৌলিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা ছাড়াও মানব কল্যাণে কলকাতার সাইক্লোট্রনটির ভূমিকা অনেক বিরাট এবং ব্যাপক হবে।

সমরজিৎ কর

আগেকার দিনের বাচ্চাদের জন্যে ছিল সেকেলে পাউডার
আজকালকার বাচ্চাদের জন্যে
নতুন
টেণ্ডার কেয়ার
কোমল ত্বকের জন্যে
নিখুঁত ভাবে বানানো
সেকেলে পাউডার বানানো হ'ত না, তাই বাচ্চাদের তুলতুলে গায়ে দাগ পড়ে যন্ত্রণা হ'ত। কিন্তু নতুন টেণ্ডার কেয়ার নিখুঁতভাবে বানানো। সেইজন্যে গায়ে চুলকানির দাগ, কুটকুটির হাত থেকে বাচ্চাদের এখন রক্ষে। তাছাড়া, টেণ্ডার কেয়ারে র'য়েছে ঘাম শোষার বাড়তি শক্তি। পাউডার লাগালে বাচ্চারা এখন কাঁদে না—হাসে। কত তফাৎ! টেণ্ডার কেয়ারে সবই সাবধানে নির্বাচন করা হয়েছে—রেশমের মত নরম ট্যাল্ক—এমনকি শিশু-কোমল গন্ধও। তাইতো এর নাম টেণ্ডার কেয়ার। আপনার বাচ্চার জন্যে—আজই কিনুন।
আপনার বাচ্চার জন্যে মমতামধুর স্নেহাকুল টেণ্ডার কেয়ার
NEW
COLGATE
tender care
BABY POWDER
For comfort & protection

গানের আসর

পাঁচালী, কথকতা, পদাবলী কীর্তন

একটি প্রশ্ন পেয়েছিলাম—কথকতা পাঁচালী ও পদাবলী কীর্তনের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম। অনেকেই বোধ করি অবশ্যই উত্তর দিতে চাইবেন যে, পদাবলী কীর্তনই প্রাচীনতম। এই লেখকের মনেও সে রকমই একটা ধারণা যেন ছিল, কিন্তু তলিয়ে ভাবতে গিয়ে একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলাম।

পদাবলী কীর্তনের বেশ ভাল একটা ইতিহাস আমরা পাই সঙ্গীতের দিক থেকে এবং সেটি মহাপ্রভুর তিরোধানের খুব বেশী দিন পরে নয়। অতএব এর একটা অনেক দিনের ঐতিহ্য বর্তমান। পাঁচালীর বিবরণ যা সামান্য পাই তা আরও পরবর্তী কালের এবং কথকতা সম্বন্ধে তেমন কিছু লিখিত বিবরণ আছে কি না বলতে পারব না। কিন্তু পরবর্তী কালে উল্লেখিত হয়েছে বলেই, যা উল্লেখ পাওয়া যায় না বলেই যে এগুলির প্রাচীন ইতিহাস নেই, এ রকম ধারণা করাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। যাত্রাগানের কথাই ধরা যাক। এ সম্বন্ধেও যে আমরা খুব প্রাচীন তেমন কিছু উল্লেখ পাই তা নয়, তথাপি যাত্রাগানের ঐতিহ্য যে অতি প্রাচীন এ সম্বন্ধে বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই। একদা সংস্কৃত নাটকও যাত্রাগানের মত খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হত। নানা বাধার জন্য নাট্যগৃহ আবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও কোনও প্রাকৃত নাটকের ধারা সে সব বাধার সম্মুখীন হয়নি। বোধ করি যারা বাধা দিত তারাই এই ধরনের নাটকের সমর্থক ছিল। বরঞ্চ সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চে অভিনীত নাটকের ঐতিহ্য আমাদের দেশে বিলীন হয়েছিল, কিন্তু যাত্রা চিরাচরিতভাবে হয়ে আসছে। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র বা লৌকিক সাহিত্য এ বিষয়ে কিছু না জানালেও, আমাদের গ্রামীণ জীবনের মধ্যেই এটি প্রাচীন যুগ থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

পাঁচালী আর কিছু নয়, তা কাব্যবন্ধে কোনও একটি আখ্যায়িকা মাত্র। কোনও কোনও শাস্ত্রকার বলছেন, অতিবিস্তীর্ণ পদযুক্ত প্রবন্ধই পাঁচালী। মহাভারতকেও লোকে ভারত-পাঁচালী বলে থাকে। এর মধ্যে কিছু কিছু গান বা সাঙ্গীতিক বৈচিত্র্য যোগ করে দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এগুলি সবই পড়া হত লৌকিক সমাবেশে। অতএব বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক উপাদান না থাকলে লোকে এসব দীর্ঘ কাব্য শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারতেন। আমরা আজকে যাকে পাঁচালী বলে জানি, যার মধ্যে নানা-রকম 'উইট' আর 'স্যাটায়ার' এসে গেছে, সেটা হাল আমলের ব্যাপার। কিন্তু আগে ব্যাপারটা অনেক সাধারণ এবং সরলতর ছিল, তখন আখ্যানভাগটাই ছিল প্রধান বস্তু।

কথকতাকে যদি আমরা গদ্যে পাঁচালী বলি তা হলে অসঙ্গত হয় না। মূলত ব্যাপারটা একই—আখ্যায়িকার বর্ণনা। কথকতায় অবশ্য পুরো কাহিনীর চেয়ে উপকাহিনীই বেশি এবং তার সঙ্গে ভাবাবেগের প্রাচুর্য থাকে। গদ্যে বর্ণনা করতে করতে কথক গান করে ওঠেন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই ভাবাবেগ পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এ রীতিও খুবই প্রাচীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পুতুলনাচের সঙ্গে যে অভিনয়-ধর্মী বর্ণনা তাও কথকতারই একটি রূপ এবং এই ধারা যে কত প্রাচীন তা আজকাল অনেকে সন-তারিখ অনুযায়ী নির্ণয় করতে পারছেন না। পাঁচালী যখন থেকে নূতন ধারায় প্রবাহিত হয়, কথকতাও তখন যে কই তার স্বকীয় নূতন পথ ধরে, তার সঙ্গীতে এবং বলমাত্রেও বেশ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

আসলে পদাবলী কীর্তন খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটা মস্ত বড় মুভমেন্টের সঙ্গে ছিল তার যোগ এবং যাঁরা এর মূলে ছিলেন তাঁরাও এক একটি প্রখর পার্সোনালিটি। অতএব সমসাময়িক অপরাপর সব লৌকিক ধারাই এই বৃহৎ ধারাটিকে অনুসরণ করতে লাগল। তখন পাঁচালী, কথকতায় কীর্তনের পদ্ধতি বেশ খানিকটা এসে পড়ল এবং এদের মাঝখানেও কিছু কিছু মহাজনপদ গাওয়া হতে লাগল। এই ধারাটা এখনও যে প্রচলিত নেই তা নয়। তারপর যখন টপ্পা, খেমটা, খেউড়ের যুগ এল তখনও এই দুটিতে এই সব ধারার গান যথেষ্ট যুক্ত হয়েছে। আমরা সেই প্রভাবের পরিচয় বেশী পাই বলেই আজকের কথকতা পাঁচালীকে তেমন পুরোনো বলে মনে করতে পারিনে। কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখলে বোধ করি আমাদের সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, পদাবলী কীর্তনই সবচেয়ে পরবর্তী কালের প্রতিষ্ঠা, যা স্বকীয় পন্থায় একটি পৃথক ঐতিহ্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

শার্ঙ্গদেব

চিঠিপত্র

বাংলা খেয়াল

খেয়াল সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেবের বিচার যে রকমই হোক, তার একটি অন্যদিকও আছে। আসলে বাংলাদেশ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকেই অবলম্বন করেছে। ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি ধারাগুলি সমগ্র উত্তর ভারতেরই জিনিস, কেবল হিন্দীভাষীদেরই সম্পত্তি নয় যে এগুলি কেবলমাত্র উক্ত ভাষাতেই রচিত হবে। তেমনি অলঙ্কার, অলঙ্কার, তানবিস্তারে কোনও একটি বিশেষ ভাষার নিজস্ব বস্তু নয়, সে রকম এই ধারাগুলিও কারুর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গেই এগুলি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব বাংলা ভাষাতে ধরনটি বজায় রেখে খেয়াল গাইলে তা রাগপ্রধান তো হবেই, কিন্তু সেটুকুই নয়, সেটি প্রকৃতই খেয়াল হবে। খেয়াল শব্দটা ভাল কি খারাপ তা এত শতাব্দী পরে আর সমালোচনা নাই করা হল, এই নামটি এখন একটি আর্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এখন বক্তব্য হচ্ছে, আকাশবাণী বাংলায় ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা গাইলে সেগুলিকেই উক্ত আখ্যায় প্রচার করতে নারাজ, তাঁদের মতে সেগুলি রাগপ্রধান বাংলা পুরাতনী সঙ্গীত। এটি কোনমতেই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নয়। রাগপ্রধান বলতে আপত্তির কারণ নেই কিন্তু বাংলাভাষাতে রচিত হলেই যে তা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী হতে পারবে না এই জিদ আকাশবাণীকে পরিত্যাগ করতেই হবে। মূল আন্দোলনটা এই নিয়ে এবং আমরা আশা করব শার্ঙ্গদেব এই দাবির সঙ্গে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানিয়ে এই আন্দোলনকে দৃঢ়তর করে তুলবেন।

সন্তোষ সেনগুপ্ত
কলকাতা-১৪

রজনীকান্তের গান

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁহার 'বনস্পতির বৈঠক' রচনায় লিখিয়াছিলেন "আমাদের স্কুলেই পড়ত স্টিফেনস নির্মলেন্দু ঘোষ। তার অকাল মৃত্যুতে রবি ঠাকুর একটি গান লিখেছিলেন, "ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে" (দেশ ১২ ফাল্গুন, ১৩৭৯—৩৪২ পৃষ্ঠা)। প্রকৃতপক্ষে এই গানটির রচয়িতা 'রজনীকান্ত সেন। তাঁহার 'বাণী' নামক কাব্যগ্রন্থে এই গানটি 'ছিন্নমুকুল' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শ্রীবারিদবরণ ঘোষ তাঁহার 'ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রায় দুশো গানের স্বরলিপি তাঁর নিজের হাতে করা। এগুলির মধ্যে 'আমার যাবার সময় হল', 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে', 'মহা সিংহাসনে বসি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য" (দেশ ২৮ পৌষ, ১৩৮০—৯৬৪ পৃষ্ঠা)। এই ক্ষেত্রেও লেখক 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' গানটি সম্বন্ধে অনুরূপ ভুল করিয়াছেন। 'রজনীকান্ত সেনের 'কল্যাণী' নামক কাব্যগ্রন্থে এই গানটি "বিশ্বাস" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সন্তোষকুমার মুখার্জি
কলকাতা-২৯

॥ চুয়াল্লিশ ॥
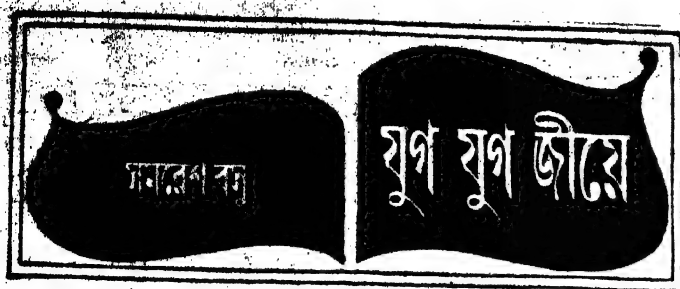
জয়া ত্রিদিবেশের দিকে তাকায় এবং ওর দৃষ্টি আবার ত্রিদিবেশের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে এবং ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, 'সেই জন্যই কি জামাকাপড়ের এই হাল?'

ত্রিদিবেশের জবাবের আগেই ইন্দ্রনাথ আবার বলে ওঠে, 'আর এই সঙ্গে আমার একটা অ্যান্টি ক্লাইমেক্স কোয়েশ্চেন আছে। এবার বলো তো ত্রিদিবেশ, কালকের গানের আসরে মদ গাঁজার ব্যবস্থাও ছিল নাকি?'

ত্রিদিবেশ বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠে বলে, 'না তো।'

ইন্দ্রনাথ হা হা করে হেসে ওঠে, সেই সঙ্গে জয়ার খিলখিল একটি দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ইন্দ্রনাথ বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলে, 'আরে না না, আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তোমার চোখ দুটো বেশ লাল হয়ে রয়েছে, বোধ হয় সারা রাত ঘুমোওনি।'

তার কথা শেষ হবার আগেই সাইকেলের টিং টিং ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে আসে। ইন্দ্রনাথ বলে ওঠে, 'খবরের কাগজ এসেছে।' বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ চোখ তোলে, জয়ার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হয়। জয়া হাসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'আপনাকে চান করে জামা কাপড় না বদলে আমি ছাড়বো না। আপনার শরীরেও তো একটা রিদম আছে, তা-ই না?' বলতে বলতে ওর মুখে আবার লাল ছটা লেগে যায়।

ত্রিদিবেশ জয়ার মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে ভুলে যায়।

জয়া মুখ ঘোরায়, তাকিয়ে থাকতে পারে না ত্রিদিবেশের সহজ অনায়াস অথচ নিবিড় মুগ্ধ অপলক চোখের দিকে। ত্রিদিবেশের সংবিত তথাপি ফেরে না, ওর চোখ এখন জয়ার ঘাড় ঢাকা খোলা চুলের প্রতি, মুখ তার আড়ালে, কিন্তু মুখহীন এলানো কেশ, লাল জামা, নীল পাড়, চেয়ারের হাতল ধরা একটি মাত্র হাত, যে-হাতে কয়েকটি চুড়ির ঝিলিক হাতের সুবর্ণকে অনুজ্জ্বল করতে পারে না—একটি অপরূপ ছবি। মুগ্ধতার অন্যতম যে কারণ জয়ার দাবীসূচক কথাগুলো ওর মস্তিষ্কে ধ্বনিত হতে থাকে, 'আপনাকে চান করে, জামা কাপড় না বদলে, আমি ছাড়বো না।'...এবং রিদম্, ত্রিদিবেশের কাছে যা বিভিন্ন শব্দের একটি মিল—একটি ছন্দের মতো, যা ও মানুষের শরীরে—জয়ার শরীরেও দেখতে পায়, এবং জায়া ওর শরীরে, এবং জয়ার এই আবিষ্কার ওকে অধিকতর মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে দেয়। এই মুহূর্তে ও গত রাত্রের ঘটনা বিস্মৃত, বর্তমান সময়, স্থান এবং পরে, এবং ঘটনার স্রোতে ভেসে যায়, বাস্তবের ক্ষেত্রে যা অভূতপূর্ব, অপ্রাকৃত, এবং ও বলে মুগ্ধ বিস্মিত স্বরে, 'আশ্চর্য, আমি কিন্তু এই ভেবেই এখানে চলে এসেছি।'

'কী ভেবে?' জয়ার মুখ সমুখে জাগে, এলানো কেশের পটভূমিতে। ঈষৎ ভ্রুকুটি তার জিজ্ঞাসু চোখে, যদিচ, রক্তের ছটা এখনো মুখে।

ত্রিদিবেশ বলে, 'এই জামাকাপড়গুলো বদলাবো, আর ইন্দিরদার জামাকাপড় পরবো, এই ভেবে। কিন্তু সেই ভেবেই যে আমি এখানে চলে এসেছি, আমি তা জানতাম না।'

'সে আবার কী?' জয়ার অপলক চোখে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসায় বিভ্রান্তির ছায়া, জিজ্ঞেস করে, 'জানতেন না মানে কী?'

ত্রিদিবেশ বিব্রত বোধ করে, অপ্রস্তুত হেসে বলে, 'জানতাম, মানে—জানতাম—কিন্তু, মনে ছিল না।'

ক্রমশ

ত্রিদিবেশের দিকে, চোখে সেই অতিজলোচ্ছ্বাস দৃষ্টি, প্রেমের জোয়ার মুখে যা আগ্নেয়র সদৃশ, এবং বলে, শুনেছেন তো, ইন্দ্রের খালি এইরকম কথা। আমি বলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাবুকে ঠাকুরপুকে নিয়ে জলখাবার ভাজের কাঁধের নিয়ে এলাম। একেই তো ঘুমন্ত-জাগন্ত মানুষ মানুষ, —বুঝলে না? শরীরে আড়ষ্টতা আছে, ঠান্ডায় বাধা থাকে, গাঁটের জাম কি ছাড়তে চায়?'

'তাই কালোদা বাবুকে দিদির গাঁটের জাম ছাড়াচ্ছিল।' ইন্দ্রনাথ বলে ওঠে, এবং গরম, ধূমায়িত পরোটার ছিন্ন টুকরো আলু-কপির ছেঁচকিসহ মুখে পোরে।

জয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে। ত্রিদিবেশও ঈষৎ হাস্য করে, জয়ার দিকে একবার তাকায়, দৃষ্টি বিনিময় হয়। ইন্দ্রনাথ খাবার মুখে নিয়েই বলে, 'তারপর কালোদাবাবু, ভেলোর বউয়ের হাতে-পায়ের গাঁটেও জাম, তা ছাড়িয়ে, উনোন নেপে পুছে, কয়লার আগুন ধরাতে—।'

'দেখেছো তো?' কালো অতি অসহায় দুঃখী বালকের মতো মুখ করে বলে, 'আমি কি ভেলোর মায়ের কথা একবারও বলেছি? ভেলোর মা তো সেই কোন্ ভোরে এসে আমাকে তার দুঃখের পাঁচালী শোনাচ্ছিল। বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না—আগীপ গণ্ডা তো আছেই, তাও বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে ভেলোটা, এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, বুঝলে দাদা, তার ওপরে আবার মায়ের মুখে মুখে চোপা। ভেলোর বাপটা যে কী কাজ করে, ভগবান জানে, কিন্তু বাবুর গাঁজা ভাঙের কথা সবাই জানে। সেদিকে দেখ, বাপ ব্যাটার কেমন—।'

'হ্যাঁ, শুনে যাও ত্রিদিবেশ।' ইন্দ্রনাথ কালোর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'এর পরে আমাকে দোষ দিও না। খালি দেখে যাও, কালোদাবাবু কেমন মুখ বুজে কাজ করে যায়, কথা বলে সময় নষ্ট করার লোক একটুও না।'

জয়া আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। কালো ত্রিদিবেশকে বলে, 'দেখেছো?'

জয়া বলে ওঠে, 'দেখেছে, কালোদা তুমি এখন যাও।'

কালো মুখ ভার করে, দরজার বাইরে চলে যায়। ইন্দ্রনাথ হেসে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে জয়া এবং ত্রিদিবেশও। ত্রিদিবেশ বলে, 'কালোদা মানুষটি বড় ভালো।'

'খুব!' ইন্দ্রনাথ খাবার খেতে খেতেই বলে, 'কিন্তু মাথায় কিঞ্চিৎ বস্তু থাকলে আরো ভালো হতো। সারাদিন কথা বলতে দাও, শুনে যাও, তাহলে তুমি খুব ভালো। ওর মাথাটা খেয়েছে মা। ও বুকঢক করবে, মা শুনুক না শুনুক, ঠিক হাঁ হুঁ দিয়ে যাবে। তেমনি হয়েছে বামুনদিদি, ভেলোর মা, সবাই কালোর কথা শুনেছে।'

জয়া আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে, এবং ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে, হাসি থামিয়ে বলে, 'একি, আপনি খান, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে!'

ত্রিদিবেশ এই মুহূর্তে তত্তোধিক ক্ষুধার্ত না। গতকালের একবেলা, এবং সারা রাত্রের ক্ষুধা কিঞ্চিৎ মিটিয়ে ওর এখানে আগমন। ময়দার পরোটা, যা প্রায় দুষ্প্রাপ্য, আলু-কপির ছেঁচকি, নতুন গুড়ের হাতের মুঠি পাকানো সন্দেশ, এইসব খাদ্য সমূহ, নতুন করে ওর ক্ষুধা বর্ধিত করে। ও খাবারে হাত দেয়।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করে, 'কটা বাজলো জয়া?'

'সাতটা বেজে গেছে।' জয়া পূর্বদিকের জানালার দিকে যেতে যেতে বলে।

ইন্দ্রনাথের চোখে মুখে ব্যস্ততা দেখা যায়, বলে, 'ওহ্, আমার আর দেরি করবার উপায় নেই, ন'টার ট্রেনে কলকাতায় যেতে হবে।'

'তাই নাকি কিন্তু...' জয়া কথা শেষ না করে ত্রিদিবেশের দিকে একবার দেখে

ইনি হলেন কোমল...
ইনি রহস্যময়ী মোলায়েম
ও কঠিন আর আগুনের উত্তাপ
ইনি সম্পূর্ণ মানবী

নিয়েই, উৎসুক অথচ অস্বস্তির দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায়।

ইন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরিয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় জয়ার দিকে, জিজ্ঞেস করে, 'কেন, কী হয়েছে?'

জয়া আবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়, এবং একটু হেসে, আবার ইন্দ্রনাথের দিকে, বলে, 'উনি যা ভেবে তোমার কাছে এসেছেন, তা ওঁর মনেই নেই। আসলে উনি যে ভেবেছিলেন, তা-ই ওঁর মনে ছিল না।'

ইন্দ্রনাথ তার মোটা কালো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'সেটা আবার কী, কী ব্যাপার?'

ত্রিদিবেশের খাবার চিবনো বন্ধ হয়ে যায়, মুখে বিব্রত লজ্জার হাসি। জয়া হেসে উঠে বলে, 'আমি বলছিলাম ওঁকে চান করে জামাকাপড় ছেড়ে রাস্তায় যেতে দেওয়া হবে। উনি বললেন, মনে মনে সেই ভেবেই আসলে উনি এখানে এসেছিলেন কিন্তু সে কথা মনে ছিল না।'

ইন্দ্রনাথ খাদ্যদ্রব্য শেষ করে গেলাস তুলে নিয়ে দীর্ঘ চুমুক দেয় এবং গেলাস নামিয়ে রেখে হেসে বলে, 'মনটা বোধ হয় এখনো কাল রাত্রের গানের আসরেই পড়ে আছে। আর্টিস্ট মানুষ তো। তা তোর ক্লাস আজ কটায়?'

'বারোটায়।' জয়া বলে, 'আমি এগারোটার ট্রেনে যাবো। কিন্তু—।' ও কথা শেষ না করে ইন্দ্রনাথের দিকেই তাকায় এবং বলে, 'আজকের জি বি-তে কি আমি যাবো মেজদা?'

ইন্দ্রনাথ বলে, 'তুই তো স্টুডেণ্ট ফ্রণ্টের লোক, অবিশ্যি পার্টি মেম্বারশিপ পাবি এখানকারই, কিন্তু তুই এখন ক্যানডিডেট, মেম্বার, না গেলেও ক্ষতি নেই। চারটের মধ্যে যেতে পারলে যাবি।'

'সেটাই ভাবছি।' জয়া বলে, 'মনে হয়, আমি চারটের মধ্যে হাজির হতে পারবো না।'

'ইন্দ্রনাথ বলে, 'তা হলে যাবি না। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে ডিসট্রিক্ট সেক্রেটারির সঙ্গেই ফিরতে হবে, জি বিতেও যেতে হবে। সেক্রেটারির সঙ্গে জি বিতে বঙ্কিম মুখারজিও আসবেন, পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের কাছে উনি বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন।' কথা বলতে বলতেই সে ত্রিদিবেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'তুমিও জি বিতে যাচ্ছো তো?'

ত্রিদিবেশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রনাথ জয়ার দিকে ফিরে বলে, 'তুই তো এগারোটার ট্রেনে কলেজে যাবি বলছিস। ঠিকই আছে, তুই তা হলে ত্রিদিবেশকে আমার জামাকাপড় দিস, আর বাইরের কলঘরে চানের ব্যবস্থা করে দিস। আমাকে তো ন'টার ট্রেন ধরতেই হবে।

ত্রিদিবেশ ব্যস্ততা ও দায়গ্রস্ত অস্বস্তিতে বলে, 'না না, আপনি ট্রেন ধরুন, অসুবিধে হলে আমি না হয়—।' ত্রিদিবেশ কথা শেষ করতে পারে না, কারণ পরবর্তী সিদ্ধান্ত ওর জানা নেই।

'অসুবিধের কিছুই নেই।' জয়া বলে ওঠে, 'উঠোনের ওপাশের কলঘরে বালতি ঘটি সবই আছে, আমি কালোদাকে দিয়ে তেল সাবান গামছা পাঠিয়ে দেবো, জামা-কাপড় দিয়ে যাবো এ ঘরে। আপনি কি এই জামাকাপড় আর মূর্তি নিয়ে রাস্তায় বেরোবেন নাকি?' ও মুখ ফিরিয়ে পুব দিকের জানালা খুলে দেয়।

জানালা উন্মুক্ত হবার আগেই যেন রোদ জানালা অতিক্রম করে ঘরের মেঝে স্পর্শ করে এবং তার বুকে জয়ার ছায়া। জয়া তার ছায়া নিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে আসে এবং সেই মুহূর্তেই ত্রিদিবেশের দিকে না তাকিয়ে ওর খাবারের পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'কালোদার চা আসতে দেরি হবে। আমি বরং ভেতরে গিয়ে চা খেয়ে বাথরুমে যাবো। তার আগে দাড়ি কামানো আছে, তারপরে চান।'

'হ্যাঁ, তুমি যাও মেজদা, আমি আছি।' জয়া বলে বরাভয়ের সুরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করে, 'কর্তা কি বেরিয়ে গেছেন?'

'আধ ঘণ্টা আগে।' জয়া ঈষৎ হেসে বলে এবং হাসিটিও বরাভয়ের।

ইন্দ্রনাথ বলে, 'যা লোক, হয়তো ত্রিদিবেশকে চানটান করতে দেখলে ওকেই মুখের ওপর কিছু বলে বসবেন।' বলে, ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমি তা হলে চলি ত্রিদিবেশ, জি বিতে দেখা হবে।' বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হয়েও জয়ার দিকে তাকিয়ে বসে পড়ে। জয়া একটু হাসে এবং নিজে ইন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে বসে। ত্রিদিবেশ জানে কর্তা বলতে ইন্দ্রনাথের পিতাকে বোঝায়, এবং ত্রিদিবেশের মতো মানুষদের প্রতি আতিথি-পরায়ণতা তাঁর আদৌ পছন্দ না, যে কারণে ইন্দ্রনাথের মতো শিক্ষিত সন্তানকেও দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়।

'আপনার পরোটাগুলো কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' জয়া বলে ওঠে, 'খাচ্ছেন না কেন?'

ত্রিদিবেশ প্রায় যান্ত্রিকভাবে খেতে ব্যস্ত হয়, এবং জয়াকে হাসতে দেখে কুণ্ঠা বোধ করে এবং হাসে এবং ধীরে পরোটা ছিন্ন করতে করতে বলে, 'আপনি খাবেন না?'

'খাবো, আপনার খাওয়া হলেই আমি খেতে যাবো।' জয়া বলে, এবং ত্রিদিবেশকে আবার মুখে তোলবার অবকাশ দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি কি আপনার বউ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে রেগে যেতো নাকি? কিন্তু সে তো জানে, আপনি বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ান, রাত্রে ওদের সঙ্গে থেকেছেন, জামাকাপড়ের অবস্থা এরকম তো হতেই পারে। আপনার দোষ কী?'

ত্রিদিবেশ ম্লান হাসে, জয়ার উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ কিছু না বলে অন্য দিকে চোখের তারা ঘোরায়।

ক্রমশ

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়
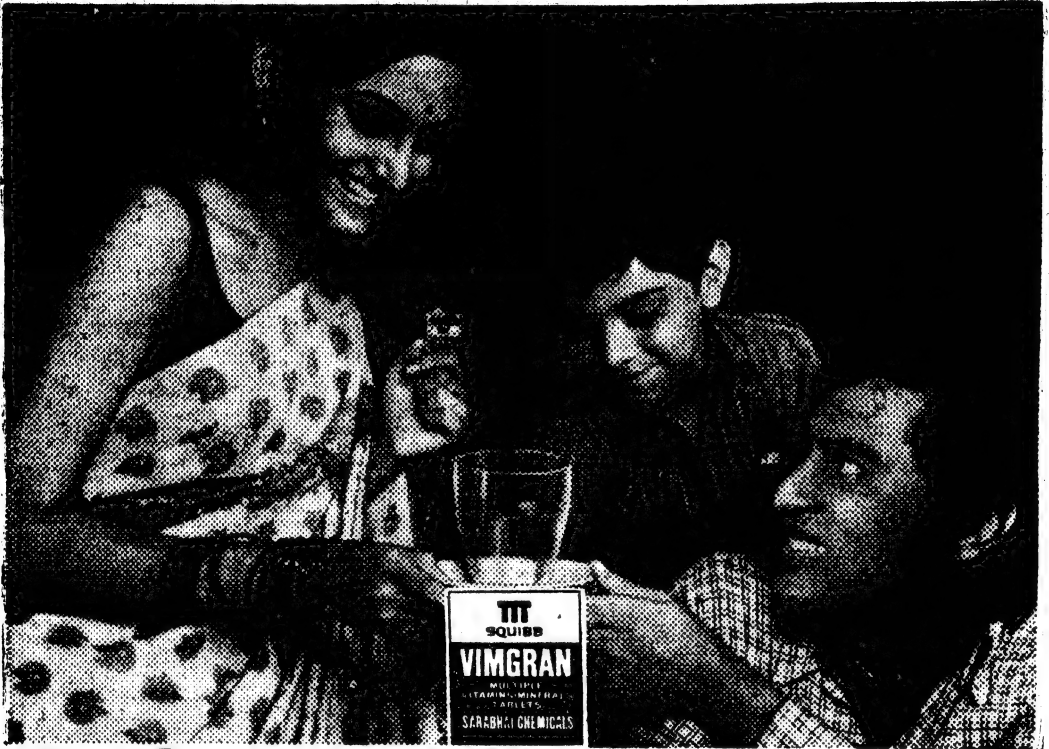
ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন?

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। অবসাদ, সর্দি, ক্ষুধালোপ, স্বাস্থ্যহানি, চর্মরোগ ও দাঁতের যন্ত্রণা—এসব সাধারণতঃ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবেই ঘটে।

আহার্য্যের মধ্যেও এসবের ঘাটতি থাকতে পারে। আপনার পরিবারের সকলকে একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভিটামিন ও খনিজ ঠিক-ঠিক অনুপাতে যোগান দিতে হ'লে রোজ ওঁদের ভিমগ্র্যান খেতে দিন। ভিমগ্র্যানে ১১টি ভিটামিন ও ৮টি খনিজ পদার্থ আছে। লোহা—রক্ত বাড়াবার জন্যে আর আপনাকে সক্রিয় করে তোলবার জন্যে, ক্যালসিয়াম—হাড় ও দাঁত শক্ত রাখার জন্যে, ভিটামিন সি—সর্দি প্রতিরোধ করবার জন্যে, ভিটামিন এ—ভাল দৃষ্টিশক্তি ও সুস্থ চর্মের জন্যে, ভিটামিন বি১২—ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বল সঞ্চারের জন্যে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থও আছে। আজ থেকেই শুরু করুন—ভিমগ্র্যান।

ভিমগ্র্যান®

অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত বড়ি
১১টি ভিটামিন + ৮টি খনিজ পদার্থ

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS PVT. LTD.

® ই আর স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকরপোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি সারাভাই কেমিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড।

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কার্য্যক্ষম রাখবে

Shilpi-HPMA 2A/74 Ben

সুন্দরবন

গত ১১ই জানুয়ারী দেশ পত্রিকায় কার্তিকচন্দ্র শাসমল সংরক্ষিত সুন্দরবন অঞ্চল সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের উদাসীনতা ও কর্মবিমুখতার নির্ভীক চিত্র অঙ্কন করেছেন—সেজন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু আবাদ-সুন্দরবনকে অতি সন্তর্পণে বাদ দিয়ে সংরক্ষিত সুন্দরবন সম্পর্কে একপেশে লেখার জন্য লেখক যেন "একলাফে অগ্রভাগে" পৌঁছানোর সামিল হয়েছেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ঐতিহ্য-বহুল সুন্দরবন সম্পর্কে লেখক একেবারেই নির্বাক।

অথচ শুনলে অবাক হবেন, সিন্ধু সভ্যতার মত এককালে গোটা সুন্দরবনে সুসভ্য জাতি বসবাস করত। তার প্রমাণ-স্বরূপ আজও সুন্দরবন জঙ্গলে বড় বড় অট্টালিকা, বহু মন্দির ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। তবে তখনকার জনজীবন সম্পর্কে এখনও সকলের অজানা। খুব সম্ভবত সুন্দরীবৃক্ষ বা সংস্কৃত অভিধানের "সমুদ্রবন" অর্থাৎ সমুদ্রের নিকটবর্তী বনাঞ্চল সৃষ্টি হওয়ার জন্য পৃথিবীর এই অতুলনীয় গহন অরণ্যের নামকরণ হয়েছে "সুন্দরবন"।

ঐতিহাসিকদের মতে দিল্লীতে যখন মোঘল রাজত্ব শুরু হয় তখনও আজকের সুন্দরবন ছিল সুসভ্য অধিবাসীদের বাস-স্থান। কিন্তু একদা কালের অমোঘ প্রভাবে একদিকে পর্তুগীজ ও আরাকান জলদস্যুদের অবাধ হত্যা-লুণ্ঠন, অপরদিকে প্রকৃতির অকস্মাৎ তাণ্ডবলীলায় খুলনা, বাখরগঞ্জ ও গোটা ২৪ পরগণা জেলা সকলের অজান্তে একদিন বিশ্বের এক অপরূপ গহন অরণ্যে পরিণত হয়। এমন কি আজকের এই শহর কলকাতার আশে-পাশেও একদা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের উপদ্রব ছিল।

আইন-ই-আকবরীতে রক্ষিত টোডর-মলের "আছলী জামা তোমার" রেন্টরোল থেকে জানা যায়, সুন্দরবনে ঐ সময়ে কোন খাজনা পত্র আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ১৬৫৮ সালে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর শাহ সুজার সুন্দরবনের দিকে লক্ষ্য পড়ে। তিনি মহামান্য আকবর বাদশার একজন সহসচিব মুরাদ খানের নামে বাখরগঞ্জ অঞ্চলের নামকরণ করেন মুরাদখানা বা জেরাদখানা এবং খাজনা হিসেবে ৮৪৫৪ টাকা আদায় করেন। এর পর মুর্শিদকুলি খান এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী পাওয়া পর্যন্ত সুন্দরবন সম্পর্কে আর কোন ইতি-হাস আজও জানা যায়নি।

বাংলার নবাবী আমলের সূর্য তখন পশ্চিমে অস্তগতপ্রায় এবং বৃটিশ বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ডরূপে কলকাতার বুকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, এমনি সময়ে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শীত শীত আমেজে বিভোর হয়ে মাত্র ২,২২,৯৫৮ টাকায় ২৪ পরগণা জেলা অর্থাৎ আজকের সুন্দরবনের জমিদারী সনদ দিয়ে দেন কর্নেল ক্লাইভকে।

১৭৭০ সাল। সর্বপ্রথম সুন্দরবন জঙ্গল পুনরুদ্ধারের কাজে মনোযোগ দেন তদানীন্তন কালেক্টর জেনারেল মিঃ ক্লাইভ রাসেল। তিনি জঙ্গল হাসিল করা সম্পত্তি প্রথম সাত বছর বিনা খাজনায় এবং চাষ আবাদ ভাল হলে সেইসব সম্পত্তি পরবর্তী সাত বছর বিঘা প্রতি ৪ আনা থেকে ৬ আনা কর ধার্য করেন। কিন্তু ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের

আলোচনা

বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করায় জমির মালিকানায় যাঁরা আগুয়ান হন তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ শামী, রাজবল্লভ রাই এবং আওয়েন জন ইলিয়াস হলেন অগ্রগণ্য। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত গোটা সুন্দরবনে চলেছিল জমিদারদের জঙ্গল হাসিল করার এক নগ্ন প্রতিযোগিতা।

সুন্দরবন জরীপ প্রসঙ্গে লেখকের সহিত একমত হলেও যে কষ্ট, যে বিপদ এমন কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৮২২ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে মিঃ অ্যানস ইন প্রিন্সেপ ও লেফটেন্যান্ট হগস যেভাবে শ্বাপদসঙ্কুল ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সুন্দরবন জঙ্গল জরীপ করেছিলেন তা স্মরণ করার প্রয়োজন ছিল। না হলে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বলিত "রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সুন্দরবন" নিছক মামুলী বলে মনে হবে না কী? আজও 'প্রিন্সেপ লাইন' ও 'হগস লাইন' সুন্দরবন জঙ্গলের প্রামাণ্য নিশানা এবং উত্তরসূরীদের কাছে তাঁদের মানচিত্র এখনও গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য নথি।

সমুদ্রের ভাঙাগড়ার সাথে সাথে সুন্দরবনের এখন অনেক রদবদল হয়েছে একথা ঠিক। সেজন্য অধুনা আফ্রিকার স্যারিঙ্গাটা জঙ্গলের মত যদি সুন্দরবন জঙ্গলের 'এরিয়াল-সারভে' বা আকাশ জরীপ করা হয় তাহলে পরিকল্পনা মত সুন্দরবনের পশু-পাখির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হওয়া সম্ভব।

সেদিন চাঁদখালির ক্যাম্পের কাছে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু মুসলমানের বনবিবির পুজোয় অংশ গ্রহণ দেখে লেখক সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট প্রশ্ন করেছেন। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবির সাহেবের 'ইণ্ডিয়ান হেরিটেজ' বইটি লেখককে একটু যত্নে পড়বার অনুরোধ জানাই। তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যিকারের ভারতীয় ঐতিহ্য কী! ভারতবর্ষের মানুষ পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া মানসিকতা এখনও পাল্টাতে পারেনি। তাই আজও ভারতবাসী আলী, আউলিয়া পীর দরবেশ ও সাধু-সন্তদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। তিনি হিন্দু কী মুসলিম তাতে কিছু যায় আসে না। ঘুটিয়ার শরীফের গাজী পীরের দরগাহ, শাকসরের বামন-পীরের মেলা, হাড়োয়ার গোরাচাঁদ পীরের মেলা এবং আজমীরের খাজা পীর সাহেবের দরগাহ, এমন কি শহর কল-কাতার মাওলালী সাহেবের দরগাহে গেলে দেখতে পাবেন হিন্দু-মুসলমান নরনারীর কী অপূর্ব আশীর্বাদ বা দোয়া-কামনার এক মহান মিলন পর্ব।

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের দু সন্তান বা নজরুলের কথায় একই বৃন্তের দু-ফুল। তাই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচরণে উভয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রভাবিত।

সমুদ্র যাত্রায় যেমন এককালে বদর-পীরের কদর ছিল তেমনই সুন্দরবন জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। তাঁকে পুজো না দিয়ে উপায় কী! এটাই হল আসল রহস্য। অর্থনৈতিক জীবনে পরি-বর্তন আনার প্রচেষ্টায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করায় বনবিবির পুজোয় মুসলমানের অংশ গ্রহণ লেখকের এ ধারণা অলীক ও কল্পনাপ্রসূত। তবে জঙ্গলে ঢুকবার আগে নিরাপত্তার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে সেই স্মরণা-তীতকাল থেকে চলে আসছে বনবিবির বন্দনা।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সম্পর্কে লেখক বড় আশাবাদী। কিন্তু দু-দু বছর হয়ে গেল সুন্দরবনে উন্নয়নের নামে চলছে এক তাজ্জব পরিহাস! এখানে ওখানে জেটিঘাট নির্মাণে দেখতে পাওয়া যাবে এক লজ্জাকর নিদর্শন। যেখানে বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ঠেলে সকলের যাতায়াত এবং ভয়াবহ দুর্বিষহ পল্লীচিত্র, সেখানে কোটি কোটি টাকা জলে ফেলে দিয়ে কী লাভ। প্রথমেই উচিত ছিল শক্ত হাতে কৃষকদের ঋণদান, এক ফসলী সুন্দরবনে কৃষিকার্যের উন্নয়ন, গ্রামে গ্রামে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং সর্বো-পরি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। অবশ্য কয়েক মাস আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরোজিনী মহিষী সরেজমিনে এসে অনুধাবন করে গেছেন। কিন্তু তবুও এখনও নৈব নৈব চ। এ সম্পর্কে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিদ্বয় মাননীয় তরুণকান্তি ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র নস্কর মহাশয়কে একটু লক্ষ্য করার আবেদন জানাই। যদিও তাঁরা স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা
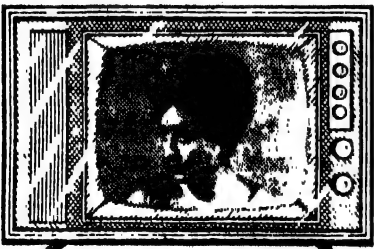
মন্ত্রী নন। বোধ হয় এ কারণেই সুন্দরবনে সরকারী নজরের এত অভাব। সরকারী অকর্মণ্যতার আর এক করুণ প্রতিচ্ছবি এই সুন্দরবন!

গুজরাটের ভেরাওয়ালের মত সাগরদ্বীপ থেকে সুন্দরবন জঙ্গলের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ৭০ মাইল খাঁড়ি ও খাড়িকামর এলাকায় প্রচুর সামুদ্রিক মাছ ধরার লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ কারণে ট্রলারের মাধ্যমে এখানে যদি মাছ ধরার প্রচেষ্টা চলে তাহলে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডি পি চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব ভারতে হংকং-এর মত বন্দর গড়ে ওঠার স্বপ্ন একদিন সার্থক হবে। এ ছাড়া অতীতে সাগরদ্বীপের লবণ উৎপাদন ও চর্মশিল্পের পুনরুদ্ধার হওয়ার বেশ সম্ভাবনা।

বন বিভাগের বড় কর্তার কাছে মেছুয়ার বেলাভূমিতে লেখকের ট্যুরিস্ট-লজের প্রস্তাব ঠিক বাস্তবধর্মী নয়, কারণে একদিকে ভ্রমণকারীদের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা, অপরদিকে সুন্দরবনবাসীদের কোন উপকার হবে না। তবে গোসাবা ও সাতজেলিয়ার মাঝে নদীর তীরে জঙ্গলের অপরাপর পাখির আলায় যদি ট্যুরিস্ট লজ নির্মাণ করা হয় এবং কলকাতার সঙ্গে কোদরা দেউলী বাসন্তীর মধ্য দিয়ে বাস চলাচলের সড়ক রাস্তার যোগাযোগ হয় তাহলে দীঘা উন্নয়নের সাথে সাথে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মত সুন্দরবনবাসীদের ভাগ্য হবে সোনায়-সোহাগা। তখন ভ্রমণকারীরা নদীর তীরে বসেই জঙ্গলের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে নৌকায় বা স্পীডবোটে জঙ্গল পরিদর্শনেও যেতে পারবেন। তাতে জঙ্গলের অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা কম পরন্তু ভ্রমণবিলাসীদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় হবে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী জমাদার
কলিকাতা-১৭

॥ ২ ॥

গত ১১।১।৭৫ তারিখে 'দেশ'-এ প্রকাশিত তথ্য-সমৃদ্ধ কার্তিকচন্দ্র শাসমলের 'সুন্দরবন' আলোচনায় ঐ অঞ্চলের 'মানুষ খেকো বাঘের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত; কার্তিক-বাবু বাঘের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় সন্তাত-আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সুন্দরবনের সব বাঘই বরাবর মানুষ খেকো কিনা সে বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেলুম না; এছাড়া বাঘের বংশনাশের কারণ কি সে সম্পর্কে আরও সবিস্তার আলোচনার অবকাশ ছিল। তাই ঐ এলাকার বাঘ সম্পর্কে দু' এক কথা বলি।

সুন্দরবন অঞ্চলের কবি মুনসী বয়নদ্দিন 'বনবিবি জহুর নামা' কাব্যে

(অষ্টাদশ শতক ঃ আনুমানিক) রামচন্দ্র-থেকে বাঘের আতঙ্ক যে অতীতের মানুষকেও অত্যন্ত বিচলিত করতো তার ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণরাম দাসের (জন্ম ঃ ১৬০৮ শকাব্দ) 'রায়মঙ্গল' কাব্যেও ঐ এলাকায় বাঘের নর-মাংস-প্রীতির কথা পাওয়া যায়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বনে জঙ্গলে' বইটিতেও সুন্দরবনের প্রায় প্রতিটি বাঘই যে নর খাদক বা পাকে-চক্রে নরশোণিতের আস্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত তেমন কথা লেখা আছে। তাই বলা চলে, আকারে ও শক্তিতে উত্তর ও মধ্য ভারতের বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও সুন্দরবনের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' চাতুরী, ক্ষিপ্রতা, দুঃসাহসিকতা ও নরখাদকতায় তার জ্ঞাতিভাইদের বরাবর টেক্কা দিয়ে এসেছে। অতীতে দুর্গমতার জন্যে বাদা অঞ্চলে অথবা দক্ষিণ বঙ্গের অরণ্যে মানুষের যাতায়াত ছিল কম। এখন ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বন কেটে কাঠ বিক্রয়, ব্যাপক ও নির্বিচারে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হরিণের বংশনাশ প্রভৃতি কারণে ঐ অঞ্চলের বাঘের জীবনে দেখা দিয়েছে প্রবল সংকট। তাছাড়া মানুষের বসতিও ছড়িয়ে পড়েছে অরণ্যের সীমানায়; জীবন ও জীবিকার তাড়নায় মধু, মাছ, কাঠ সংগ্রহের জন্যে মানুষ গিয়ে পড়ছে ইতোপূর্বে অবিঘ্নিত বাঘের স্বাভাবিক বিচরণ ভূমিতে বা তার জন্যে এযাবৎ সংরক্ষিত এলাকায়। ফলে বিনষ্ট হচ্ছে ecological balance। বাস্তবিদ্যা বিশারদদের (ecologist) মতে যে সমস্ত জৈবিক ও নৈসর্গিক উপাদান (factor) মিশ্র ভাবে প্রাণীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকে বলে পারিপার্শ্বিক (Environment); আর এই পারিপার্শ্ব সৃষ্ট নানা উদ্দীপনা (Stimulus) প্রাণীর যূথবদ্ধ জীবনেও আনতে পারে গভীর পরিবর্তন। বেশ কিছু কাল থেকেই ঐ উদ্দীপনা এ-এলাকার বাঘের খাদ্যাভ্যাসেও ঘটিয়েছে রদবদল। তাই সে বাধ্য হয়েছে 'মানুষ-খেকো' হতে। এর জন্যে তাই শুধু এক শ্রেণীর মানুষকে দায়ী করা ঠিক হবে না।

পরিশেষে, ১৯৭০ সালে লুপ্তপ্রায় রোডেশিয়ার কালো গণ্ডারের বংশ রক্ষার্থে আফ্রিকার কিছু পশুপ্রেমী যেভাবে ৪১টি গণ্ডারকে সযত্নে বন্দী করে তাদের স্থানান্তরিত করেছিলেন কারক শো' রাইল দূরবর্তী অভয়ারণ্যে, পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলাই এখন ব্যাঘ্রহীন। সেখানে এক একটি অভয়ারণ্য (বাঘের) খোলা যায়।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পুরস্কার-কাহিনী

নোবেল ফাউণ্ডেশন ও সুইডিস অ্যাকাদেমির তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন চার বছর আগে থেকে, এ যাবৎ সাহিত্যের জন্য যত-গুলি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকগুলি খণ্ডে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সজ্জিত এই বইগুলি পুস্তক সংগ্রহকারীদের কাছে বিশিষ্ট সম্পদ হিসেবে গণ্য হবার মতন। এতে থাকছে, নোবেল পুরস্কার কমিটি প্রতিটি লেখককে কেন পুরস্কার দিয়েছেন, পুরস্কার দেবার সময় সেই লেখকের কি পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তরে লেখকরা কি বলেছিলেন এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পুরস্কৃত রচনা। এই রকম একটি খণ্ডে আছেন চারজন লেখক, তাঁদের মধ্যে একজন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাকি তিনজন হলেন : ডব্লু বি ইয়েটস, আলেকজান্দ্র সোলঝেনিৎসিন এবং সিগরিড আনডসেণ্ট। শেষোক্তজন ডেনমার্কের লেখিকা, পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথের অংশে আছে সুইডিশ অ্যাকাদেমির নোবেল পুরস্কার কমিটির তৎকালীন সভাপতির ভাষণ, ইয়েটস-এর ভূমিকা সহ ইংরেজি গীতাঞ্জলি, ইংরেজি ডাকঘর, অমিয় চক্রবর্তীর লেখা কবির জীবনী এবং পুরস্কার কাহিনী। আর আমব্রোগিয়ানির আঁকা ছবি।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পটভূমিকা সম্পর্কে এই "দেশের" পৃষ্ঠাতেই কয়েক বছর আগে সৌরীন মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘ রচনা লিখেছেন। তিনি প্রায় কিছুই বাকি রাখেন নি—তবে পুরস্কার দেবার সময়কার সভাপতির ভাষণটিও তিনি ঠিক সংগ্রহ করেছিলেন কিনা মনে করতে পারছি না। এবং পুরস্কারের বিচার-কাহিনী সম্পর্কে এই কমিটি যে তথ্য দিয়েছেন, তা আমার মতন অনেক সাধারণ পাঠকেরই অজানা।

তখন ইংলণ্ডের লেখকদের নাম পাঠাবার দায়িত্ব ছিল স্টার্জ মুরের ওপর। ইয়েটসের কাছ থেকে গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি দেখে

সাহিত্য সংবাদ

তিনিই রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেন। সেবারে অন্যতম প্রার্থী টমাস হার্ডি, যাঁর সমর্থনে সাতানব্বইজন বিখ্যাত ব্যক্তির সই করা এক আবেদনপত্র গিয়েছিল। সেবার সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারের জন্য মোট ২৮ জন প্রার্থীর নাম ছিল এবং রবীন্দ্র-নাথের পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের পীয়ের লোতি, আনাতোল ফ্রাঁস এবং আনর্স্ট লাভিস্, ইটালির গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, এবং স্পেনের বেনিতো পেরে গালদোস—যাঁর সমর্থনে সই করেছিলেন সাতশো জন। এ'রা সকলেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন, সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ না।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই সময় নোবেল কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন যিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, বাংলা পড়তে পারেন এবং রবীন্দ্রনাথকে আগেই চিনতেন। আর একজন সদস্য, নিজেও কবি, ভের্নার ফন হেইডেনস্টাম গীতাঞ্জলি পড়ে প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন এবং এ বইয়ের সমর্থনে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট লেখেন। কমিটির অন্য সদস্যরা একেবারেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে না, মাত্র দু'জন সদস্য গীতাঞ্জলির স্বপক্ষে পড়ে যেতে লাগলেন, অন্যদের ঐ বই পড়াতে প্রবৃত্ত করলেন। কমিটি এমনকি এমিল ফাগে নামের একজন লেখকের নাম আগে সুপারিশ করে ফেলেছিলেন পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটিতে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৩ নভেম্বর তেরজন সদস্য বিশিষ্ট সেই মিটিং-এ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পড়ে বারোটি ভোট।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি কোনো জঙ্গলে অভিযানে বেরিয়েছিলেন (এ'রা এই কথা লিখেছেন, সত্যি কিনা আমি জানি না)—সেখান থেকে ফেরার পথে, সন্ধে হয়ে এসেছে, গ্রাম্য ডাকঘরের ভেতর থেকে এক-জন লোক দৌড়ে বেরিয়ে এসে কবির হাতে একটি টেলিগ্রাম দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেটি না খুলেই পকেটে রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটির পীড়াপীড়িতে তক্ষুনি খুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের সেটি পড়ে শোনালেন।

আমরা সবাই জানি, পুরস্কার নিতে রবীন্দ্রনাথ স্টকহল্‌মে যান নি। সুইডেনে তিনি গিয়েছিলেন এর আট বছর পরে, এবং রাজ সমাদর পেয়েছিলেন।

পুরস্কার সভার সভাপতির ভাষণটি বেশ দীর্ঘ, ছ'পাতা। সেটা সম্পূর্ণ অনুবাদ করার ধৈর্য আমার নেই, আগে কেউ অনুবাদ করেছেন কিনা আমি জানি না। সেটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কবি বলায় আমাদের কানে খটকা লাগে—যদিও সমগ্র ভাষণটি সুচিন্তিত এবং খুব একটা তথ্যেরও ভুল নেই। যে ভারতীয়রা ইংরেজিতেও লেখেন, তাঁদের তৎকালে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেখকই বলা হতো, আজকাল বলা হয়, ইন্দো-অ্যাংলিয়ান।

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধর্মীয় চেতনার ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রাহ্ম সমাজের কথা এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন এই সমাজের চোখে একজন গুরু এবং 'প্রফেট'। কথাটা সবাই মানবেন কিনা জানি না, তবে অবশ্য প্রফেট কথাটার বিভিন্ন অর্থও করা যায়। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি কিছুদিনের জন্য লেখাটেখা ছেড়ে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে পবিত্র গঙ্গা নদীর বুকে একটা নৌকোয় ধ্যানী তপস্বীর জীবন কাটিয়েছেন। অর্থাৎ সাহেবরা এই ব্যাপারটা কিছুই বোঝে নি।

পত্রের ওপর তাঁদের তিনি ছিলেন একজন বিদেশী কবিরূপে এবং সেই লিখেছেন অনেকগুলি লেখকের কৌতুক ও হাস্যের কবিতা, গল্প ও চিঠি—তাঁর রচনায় সেটা স্পষ্ট বলে বলা যায়। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ ও কবিতার যেমন যথার্থ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে, তেমনি বারবার একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাঁর ধ্যান ধারণার সঙ্গে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই। এবং পুরস্কারদাতাদের বিশ্বাস, এই কবির উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানের বিরাট তফাৎ ঘুচিয়ে দিয়ে মিলন ঘটানো।

পুরস্কার কমিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন সেটা আসলে তাঁরই কবিতার দুইটি লাইনের অনুবাদ অথবা ঐ ভাব নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" টেলিগ্রামটির বয়ান—

"I beg to convey to the Swedish Academy my grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near, and has made a stranger a brother."

পাঠক

সাহিত্যের তত্ত্ব ও সমালোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। মূল্য ২৭·৫০ টাকা।

প্রথম বই 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' লিখেই অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সমালোচনা-গ্রন্থ। এই বই তাঁকে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। আলোচ্য বিষয়ে তাঁর 'অথরিটি' নিঃসংশয়।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও তার উপস্থাপনায়, বিশ্লেষণে লেখক প্রচলিত ও ব্যবহৃত পথে পদচারণা করতে অনিচ্ছুক। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিয়ে কখনো কোনো ভাবনা লিপিবদ্ধ হয় নি। প্রাসঙ্গিকভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই এ বিষয়ে ভেবেছেন কিন্তু সমগ্র বিষয়টিকে এ পর্যন্ত অখন্ড দৃষ্টিতে বিচার করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় আর কেউ অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয় না। আসলে, দুরূহ প্রায়-নীরস অথচ সমালোচনার অন্তর্গত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন মগ্ন থেকে বহু যত্নে ও সাধনায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রয়াসে বাংলা সমালোচনার বোধ হয় সর্বাধিক দুর্বল দিকটিতে পুষ্টি ও পরিণতি এনে দিলেন। অতঃপর আলোচ্য বিষয়ের কোনো একটি দিক নিয়ে কিছু বলতে হলে বাঙালী পাঠক-সমালোচককে সত্যেন্দ্রনাথের বিচার-বিশ্লেষণ জেনে নিতে হবে।

'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' বলতে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কিত রচনাবলীরই বিশ্লেষণ নয়। কারণ, সাহিত্য সমালোচনার দুই শাখা : সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনা। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার এই দুই শাখাতেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এই গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনার উভয় শাখাতেই এই দুই যশস্বী পুরুষের কৃতিত্বের পরিচয়দান যেমন সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, তেমনই নিজের নিজের সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনায় মধ্যে তাঁরা কতটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পেরেছেন তার স্বরূপসন্ধান এবং পরিশেষে সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনামূলক বিশ্লেষণও সত্যেন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। অবশ্য, আলোচ্য বইটিতে ব্যবহারিক সমালোচনাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা তার ভূমিকা হিসেবে এসেছে। বস্তুত, এ দুইয়ের কোনো একটিকেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না সমালোচকের পক্ষে।

কারণ, সাহিত্যতত্ত্বই সাহিত্য-সমালোচনার ভিত্তি। অথচ, সমালোচকের ঘোষিত সাহিত্যতত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক সমালোচনা সব সময়েই কিছু হাত ধরাধরি করে চলে না। দুইয়ের যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তাদের সম্পর্ক অনেক সময়েই তেমন সরল ও একমুখী নয়। একজন সমালোচকের সাহিত্যতত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক সমালোচনায় সম্পর্কটি বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই জটিল। কিঞ্চিৎ বিরোধ-বৈপরীত্যও দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সম্বন্ধেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

ফলত, সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ নৈতিক বলে মনে হলেও তা সৌন্দর্য ও আনন্দবাদ-বিরহিত নয়, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ নান্দনিক বলে মনে হলেও তা কল্যাণবোধে

নির্ণিত। আবার, সাহিত্য সমালোচনার প্রশ্নে হয়ে নিজ নিজ সাহিত্যাদর্শ যাই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মানদণ্ড কার্যত সাম্প্রতিক আর রবীন্দ্রনাথের কখনো নান্দনিক, অনেক সময়েই স্পষ্টত নৈতিক।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জটিলতাকে দেশকাল সচেতন সমালোচক শুধু ব্যক্তিস্বভাবের বিশিষ্টতার সঙ্গেই অন্বিত করে দেখেন না, উনিশ শতকীয় 'রেনেশাঁসে'র প্রাতিনিধি-স্থানীয় চিন্তা-নায়কদের 'দ্বিখণ্ডিত-চৈতন্যের বহুস্তরান্বিত দ্বৈতভার কথা'ও ভোলেন না বলেই তাঁর অখণ্ডদৃষ্টির আলোয় একই সঙ্গে ধরা দেয় সত্যের নানা দিক : পাঠকের কাছে আনন্দটাই প্রথম কথা এবং সব থেকে বড়ো কথা। সাহিত্যের এই আনন্দকরতার দিকটিকে মুখ্য করে দেখাটাই হচ্ছে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখা। এই দেখাই খাঁটি পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। এই দেখাই সমালোচকের দেখা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ জানেন, 'এইটেই অবশ্য সব নয়।' এবং 'কোনো পাঠকই কেবল পাঠক নয়, সব পাঠকই রক্ত-মাংসের মানুষ, মানুষ হিসেবে সব পাঠকই সামাজিক জীব, মানুষ হিসেবে সব পাঠকই মানবেতিহাসের অংশ।...কোনো অবস্থাতেই মানুষ এই সব সম্পর্কজালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না, রসাস্বাদনের মুহূর্তেও নয়।'

সমালোচনা কী, তার বিবিধ গোত্র, সেগুলির বিশ্লেষণ, বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সমালোচনার জন্ম ও বিকাশ, এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যাখ্যা, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি নানা জরুরি প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত প্রথম অধ্যায়টির নাম—'ভূমিকা : সমালোচনার প্রেক্ষাপট।' ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার এই অধ্যায়টি নিয়েই একটি স্বল্পায়তন মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারতো। অন্যপক্ষে, অধ্যায়টি সমগ্র গ্রন্থের সার্থক ভূমিকা। এই অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক সমালোচক এবং সমালোচক সাহিত্যতাত্ত্বিক। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা-সাহিত্যতাত্ত্বিক, দার্শনিক-সাহিত্যতাত্ত্বিক। আর, সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কবি-সমালোচক। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের চলন রাজকীয়, কিন্তু তাঁর পথটা সাধারণের পথ। রবীন্দ্রনাথের পথ তাঁর নিজের রচিত। সে-পথে চলার অধিকার একা তাঁরই।' দ্বিতীয় অধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব', তৃতীয় অধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা', চতুর্থ অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব', পঞ্চম অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা', ষষ্ঠ অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা : দ্বিতীয় পর্ব' নামে চিহ্নিত। দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'উপসংহার' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়টিতে সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা, ভূমিকা ও সার্থকতা নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক রায় বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিতও রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ প্রবন্ধ দুটিকে প্রতি-তুলনায় স্থাপন করেছেন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই অধ্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিশিষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত। একটিতে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সমূহের কালক্রম', অন্যটিতে পাচ্ছি 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তামূলক প্রধান রচনা সমূহের কালক্রম।' দুটি তালিকাই সাহিত্যের সব পর্যায়ের ছাত্র ও গবেষকেরই কাজে আসবে। নির্দেশিকাসহ গ্রন্থটি পৌনে চারশো পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া গেল, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তা এক কথায় দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হবে না। বিষয়ের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকায় তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-বিলাসে পর্যবসিত হয়নি, আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা তাঁর রসবোধের গুণে খুলে গেছে, তাঁর অসামান্য বিশ্লেষণনৈপুণ্যের জন্যই পাঠক অন্য-মনস্ক হতে পারেন না। লেখকের কোনো কোনো মন্তব্য থেকে সেই আলো ঠিকরে পড়ে—একজন সৎ পাঠক যার টানে একজন সৎ সমালোচকের শরণস্থ হয়ে থাকেন : 'রবীন্দ্রনাথের আসল ঝোঁক সাহিত্য-তত্ত্বেই' 'বঙ্কিমচন্দ্রের আসল ঝোঁক সমা-লোচনায়' ... রোমান্টিক। কিন্তু ব্যবহারিক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র...অনেক বেশি রোমান্টিক, অনেক বেশি আধুনিক।' অথবা, 'বঙ্কিমচন্দ্র যান্ত্রিক-জড়বাদী অপেক্ষা বরং মার্কসবাদী দেরই বেশি সন্নিকটবর্তী।...আসল দুরূহ শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে।' এই রকম আরো আছে। লেখকের ভাষা ও উপস্থাপন আড়ম্বরমুক্ত। পরিণত মনের শুভ্র চেহারা তাঁর ভাষায় প্রতিফলিত।

দুরূহ বিষয় পণ্ডিত-অধ্যাপকের হাতে পড়ে রচনা-শৈথিল্যে বা জটিলতার জটে অনেক সময় দুর্বোধ্যতর হয়ে ওঠে। এই বই কি হয়েছে আগেই বলেছি। আরো একটি আশংকা থেকে যায়। অপ্রয়োজনীয় তথ্য সমারোহে, বাগ্‌বাহুল্যে গ্রন্থ হয়ে ওঠে স্ফীতকায়। সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও সুখ্যাত অধ্যাপক, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য : 'অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।'

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গৌরমোহন আঢ্যর নাম আ... বেমালুম ভুলে গিয়েছি। আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবে এ-লজ্জা কি সত্যি ঢাকবার মতো ? পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা কে জি স্কুল, নার্সারি স্কুল দেখে আমরা বেশ আত্মতুষ্ট। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই ভিনদেশী শিক্ষা ব্যবস্থাকে। কিন্তু ভুলেও মনে পড়ে না যে গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এমন একটি শিশু বিদ্যালয় সত্যিই খোলা হয়েছিল এই দেশে, যেখানে তিন থেকে ছ' বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা নাচ-গান-ছবি আঁকা-খেলা ধুলোর মধ্য দিয়েই প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হত। মনে কি পড়ে, ওই তৃতীয় দশকেই বাংলাদেশের একটি স্কুলে শেকসপীয়র পড়াতে গিয়ে ডেকে আনা হয়েছিল এক ফরাসী অভিনেতাকে, যিনি জুলিয়াস সীজার মঞ্চস্থ করেছেন নাটকের অন্তর্নিহিত রসটিকে ছাত্রদের মধ্যে আরও প্রবলভাবে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য? ভাবতে কি পারি, স্কুলের জন্য ভাল শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে ঝড় তুফানে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি, যাঁর নিজস্ব লেখাপড়া বলতে সম্বল তেমন ছিল না। কৃতজ্ঞতা যদি থাকত, তাহলে গৌরমোহন আঢ্যকে আমরা এভাবে ভুলে যেতাম না। 'হিন্দু কলেজের' বিকল্প হিসেবে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'র প্রতিষ্ঠাতা এই মানুষটি সেকালে অনেক ত্রাস ধারণ করে ... তার কিছু নমুনা পুরোনো

এ গ্রন্থ যেন ওঁরই অঙ্গীকার সেদিনরাত্রির কথা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল-বাড়িগুলির চত্বরে চত্বরে এমন অনেক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে যা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। অথচ উত্থান-পতনের সেই কাহিনী-গুলি যে-কোনো রোমাঞ্চকর গল্পের থেকে কম আকর্ষণীয় নয়। তাপস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আমাদের স্কুলের ইতিকথা (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুর, পনের টাকা) গ্রন্থে এ-রকম সাতাশটি স্কুলের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত আমাদের শুনিয়েছেন। পরিকল্পনার অভি-নবত্বে, পরিশ্রমের বিপুলত্বে অভিভূত হবার মতো এই বই। রম্যরচনার মতো স্বাদু এই গ্রন্থ, কিন্তু নির্ভার, বস্তুবর্জিত নয়। তথ্যমূলক, গবেষণাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও রচনার আকর্ষণ যে অটুট রাখা যায়, তাপস গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ করেছেন।

মাত্র সাতাশটি স্কুলের বিবরণীতেই তিনশো পাতার বেশী স্থান ভরে গিয়েছে। বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল এই খণ্ডে অন্ত-র্ভুক্ত হয় নি। বঙ্গবাসী, নিবেদিতা, ক্যালকাটা বয়েজ, সাউথ পয়েন্ট, ক্রাইস্ট চার্চ—এ-জাতীয় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নাম। আশা করব, পরবর্তী কোনো খণ্ডে তাপসবাবু এই অভাব পূর্ণ করবেন। তাঁর গ্রন্থটি শুধু যে চমকপ্রদ ইতিকথা তা ভাবলে ভুল করা হবে। আমাদের শিক্ষা-কাঠামোর সাফল্য, অভাব, গলদ ও প্রয়োজনের দিকটির একটি মূল্যবান বিশ্লেষণও এই স্কুলগুলির সাক্ষ্যের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই উপরিপাওনা গ্রন্থটিকে অন্যতর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। মারাত্মক কয়েকটি ছাপার ভুল পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে, আশা করব।

*

শ্রীমতী তুষারকণা দাস লেখা পাঁচমিশেলী (প্রাপ্তিস্থান : প্রভাত কার্যালয়, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) একটি সরল পদ্যের বই। 'রান্নাঘরের দেয়াল মাঝে শুধুই আমার ঠাঁই/অন্য দিকে চাওয়ার সময় নাইরে আমার নাই'—এই অমল স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও আধুনিকা কিশোরীদল, রকবাজের বেদনা, বারোয়ারী কালীপুজোর বাহ্যাড়ম্বর, বাইশে শ্রাবণ, বিজলী পাখা, চীনাসমাধি, ভ্রমণপথের সৌন্দর্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর পদ্য রচিত হয়েছে দেখা গেল। যে-কয়েকটি রচনায় কিছু প্রতিশ্রুতির চিহ্ন ছড়ানো সেগুলির নাম : চৈতী সন্ধ্যায় কালবৈশাখী, জীবন-রহস্য, আত্মার বিদায় এবং কালিম্পংয়ের পথের দু-একটি স্তবক।

*

বিল চরের নীল হাঁস (মণি প্রকাশনী, কলকাতা-২৩, আড়াই টাকা) উপন্যাসে নির্মল আচার্য কিছু খুচরো কাজ বেশ ভাল ভাবে সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশের একটি গ্রামজীবনের ইতস্তত অন্তরঙ্গ ছবি এই উপন্যাসে যে ফুটেছে তাতে সন্দেহ নেই। নানা-পার্বণ সংস্কার-বিশ্বাস সৌন্দর্য-সরলতা সব নিয়ে সেই গ্রাম যতটা স্পষ্ট, গল্পের মূল বক্তব্য ততটা জোরালো নয়। হতে পারে যে, শ্রীআচার্যর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমন ছিল না। দুটি ডানপিটে কিশোরের দুঃসাহস-বিস্ময়-অনুসন্ধিৎসা এবং যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার এক সাদামাটা কাহিনীই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে, কিছু বলার নেই। তবে গঙ্গারাম ও নীল-মণিকে বোম্বাইয়েতে নিয়ে ফেলার কি খুব প্রয়োজন ছিল? বস্তুত ওই পর্যায়ে এসেই শ্রীআচার্যর রচনার সীমাবদ্ধতা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

পত্রিকা

সমীক্ষা—১ম খণ্ড। বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়, বর্ধমান।

সমীক্ষা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিকী শাখার বাংলা মুখপত্র। সভা-পতি গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও আর আরও ছ'জনের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি উচ্চমানসম্পন্ন। কয়েকটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শিবনাথ শাস্ত্রী : পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা', এবং শব্দদর্শন সম্পর্কিত অযোধ্যানাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধটি।

টেবল টেনিসে চীনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় লী চেন-শী —কাজী সেন

বিশ্ব প্রতিযোগিতার বিস্ময়কর ফল

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বিস্ময়কর খেলা এবং ফলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লী য়েন-টিং নয়, সুরবেক নয়, জোহানসন-বেংটসন-অরলোয়াস্কি-লী চেন-শীও নয়—শেষ পর্যন্ত টেবল টেনিসে পুরুষ বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল ৮ নম্বর বাছাই হাঙ্গেরীর ইস্তভান জনিয়ার, মেয়েদের বিভাগে উত্তর কোরিয়ার পাক ইউং সুন। দীর্ঘ ২২ বছর পর ওপেন ইভেন্টের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সেণ্ট ব্রাইড ভাস আবার হাঙ্গেরীতে ফিরে গেল, উত্তর কোরিয়া পেল সর্বপ্রথম বিশ্ব প্রতিযোগিতার একটি পুরস্কার। এই ফল যেন সারা প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ কি আন্দাজ করতে পেরেছিল জনিয়ার খেতাব পাবে? এমন কি ফাইনালে ওঠার পরও! ফাইনালে অ্যান্টন স্টিপানসিচ অনায়াসে পর পর দুটি গেম জেতার পর সবাই ধরে নিয়েছিল সর্বপ্রথম সেণ্ট ব্রাইড ভাস যাচ্ছে যুগোশ্লাভিয়ায়। কিন্তু জনিয়ার অসাধারণ দৃঢ়তায় পর পর শেষ তিনটি গেম জিতে যেন অসাধ্য সাধন করল।

অবাছাই মেয়ে পাক ইউং সুন সম্পর্কে ঠিক একথা বলা চলে না। মেয়েটির সম্ভাবনা ছিল। সোয়েথলিং কাপ বা কর্বিলন কাপে উত্তর কোরিয়া খেলেনি বলে ওর প্রতি আগে কারো চোখ পড়েনি। তেহরান এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়ন এবং প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই চীনের চ্যাং লীকে পাক ইউং সুন ফাইনালে হারিয়েছেও অপেক্ষাকৃত সহজে, ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলে।

শুধু উত্তর কোরিয়ার ওই মেয়েটির খেতাব জয় ছাড়া এবার অপ্রত্যাশিত ফলের বহর গতবারের চেয়েও বেশি। সোয়েথলিং কাপ এবং কর্বিলন কাপের দেশগত প্রতিযোগিতাতেও এমন ফল প্রচুর ঘটেছে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ঘটেছে অনেক বেশি। পুরুষ ও মেয়েদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে বাছাই তালিকায় তৃতীয় স্থান পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় বা কোন জুড়ি খেতাব জিততে পারেনি।

মেয়েদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় বাছাইদের বিদায়। পুরুষদের বিপর্যয় শুরু হয় দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। মেয়েদের ৮ জন বাছাইয়ের (সপ্তম বাছাই রাশিয়ার জয়া রুডনোভা খেলতে আসেনি। শীর্ষ বাছাই চীনের হু য়ু-লান, ৩ নম্বর বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার লী আইলেসা এবং ৫ নম্বর বাছাই হাঙ্গেরীর জুডিথ ম্যাগোস (ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন) প্রথম দিন হারে যথাক্রমে রাশিয়ার গেড্রেটাইট, চীনের চেং হুয়াই-ইঙ্গ ও চেকোস্লোভাকিয়ার এলিসা গ্রোকোভার কাছে। গ্রোকোভা অবশ্য টেবল টেনিসের নামী মেয়ে। বিগত বিশ্ব প্রতিযোগিতার রানার্স। অজ্ঞাত কারণেই ক্রমপর্যায়ে স্থান পায়নি এবং প্রথম রাউন্ডেই খেলতে হয়েছে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে। দ্বিতীয় রাউন্ডে অষ্টম বাছাই জাপানের টমি এদানো রাশিয়ার এলমিরা অ্যানটোনিয়ানের কাছে [illegible] যাবার পর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র দুজন বাছাই, দক্ষিণ কোরিয়ার চুং হায়ুন সুক এবং চীনের চ্যাং লী। চুং হায়ুন কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায়। আগেই দ্বিতীয় বাছাই তালিকায় শেষ খেলোয়াড় চ্যাং লী হারে তখন খেলায়।

পুরুষদের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রাউন্ডে অপ্রত্যাশিত ফল ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন এবং ৬ নম্বর বাছাই মিলান অরলোয়াস্কি এবং ৪ নম্বর বাছাই লী চেন শীর পরাজয়। দুজনেই ছিল খেতাব জয়ের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। জাপানের খেলোয়াড় নোরিও তাকাশিমার কাছে মিলান অরলোয়াস্কির হারের শুধু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা চেকোস্লোভাকিয়ার এই সাড়া জাগানো খেলোয়াড়টি টিম ইভেন্টে অসাধারণ খেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। জয়ের জন্য দুদিন অনুশীলনও করতে পারেনি। তাছাড়া তাকাশিমা খেলেছেও অপূর্ব। বিশেষ করে শেষের দিকে। কিন্তু চীনের এক নম্বর খেলোয়াড়

সেণ্ট ব্রাইড ভাস হাতে বিশ্ব টেবল টেনিসের নতুন চ্যাম্পিয়ন ইস্তভান জনিয়ার —কাজী সেন

লী চেন-শী, যার হাতের চাকিং যারে বিদ্যুতের চমক এবং যার ক্রীড়া-শৈলী অনেক উঁচু তাকে যাবা—যুগোশ্লাভিয়ার উদীত খেলোয়াড় মিরান কের্ভানোবের কাছে হার হারের কোন যৌক্তিকতা নেই। এটিই ইন্দ্র পতনের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

বড় বিপর্যয় অবশ্য পরে আরও ঘটেছে কিন্তু শেষ যোলো জনের মধ্যে যাবার আগে নয়। ওই ১৬ জনের মধ্যে তিনজন ছিল চীনের খেলোয়াড়, দুজন জাপানের। বাকি ১১ জন ইউরোপের। এশিয়ার প্রাধান্য প্রায় ওখানেই খর্ব হয়ে যায়। ওখান থেকেই বিদায় নেয় দশম বাছাই চীনের সু-আও-ফা এবং যোড়শ বাছাই লী-পেং। কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই, গতবারের চ্যাম্পিয়ন শী-য়েন-টিং যুগোশ্লাভিয়ার স্টিপানসিচের কাছে হেরে যাবার পর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় শেষ হয়ে যায় চীনের চ্যালেঞ্জ।

দেশগত প্রতিযোগিতায় জাপান ষষ্ঠ স্থান পেলেও তাদের দুজন, কোনো এবং তাকাসিমা, খেলার টেবিলে নাটকের পর নাটক সৃষ্টি করে সেমিফাইনালে হেরে যায় যথাক্রম জনিয়ার ও স্টিপানসিচের কাছে। অবাছাই খেলোয়াড় তাকাসিমার বড় কৃতিত্ব তিনজন বাছাইকে বিদায় করা। অরলোয়াস্কির কথা আগেই বলেছি। পরে ওর কাছে হারে ১৪ নম্বর সিড ফ্রান্সের জ্যাকোয়েস সেক্রেটিন এবং গতবারের রানার্স তৃতীয় সিড সুইডেনের শেল জোহানসন। বলবার কথা, অরলোয়াস্কি স্ট্রেট গেমে, সেক্রেটিন এবং জোহানসন ৪ গেমের মধ্যে। মিৎসুরো কোনোর কৃতিত্ব আরও গৌরবময়। কেননা কোনো হারিয়েছে ১৯৭১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের স্টেলান বেংটসন এবং কলকাতার চ্যাম্পিয়নশিপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী দুই নম্বর বাছাই ড্রাগুটিন সুরবেককে। বাঁ-হাতি খেলোয়াড় বেংটসন হারে কোনোর সঙ্গে পাঁচ সেটে লড়ে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সুরবেক, যে দশদিনব্যাপী প্রতিযোগিতার নয়দিন ধরে নেতাজী স্টেডিয়ামের টেবিলে টেবিলে অনুপম ক্রীড়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে সুরের ইন্দ্রজাল, সে স্ট্রেট গেমে হেরে যায় জাপানী খেলোয়াড়ের কাছে, যেভাবে সোয়েদলিং কাপের ফাইনালে হেরেছিল চীনের কুড়ি বছর বয়সী ছেলে লু-উয়ান-সেংয়ের কাছে। আবার ওই কোনো এত ভাল খেলেও সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারে জনিয়ারের কাছে।

নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জনিয়ার কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই হেরে যেতে পারত সুইডেনের উইকস্ট্রোম ইনগেমারের কাছে। ডিউস করে প্রথম গেমটি জেতার পর দ্বিতীয় গেমে হেরে যায় ১২-২১ পয়েন্টে। তৃতীয় গেম জিতে আবার চতুর্থ গেম হারে ডিউস করে। পঞ্চম গেমে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার জারোশ্লাভ

হাঙ্গেরীর গারগোলি ও জনিয়ারের যুগ্ম হাতে ডাবল জয়ীর পুরস্কার ইরান কাপ
—ফটো দেশ

কুনজের বিরুদ্ধেও জনিয়ার প্রথম দুটি গেম হেরে পর পর শেষ তিনটি গেম জেতে ফাইনালে স্টিপানসিচের বিরুদ্ধে জয়ের মত। চীনের লী পেংয়ের বিরুদ্ধে একটি গেমে জনিয়ারের টানা ১৭টি পয়েন্ট লাভ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের এক বিরল ঘটনা। টেবল টেনিস খেলায় একের ভুলে অপরের পয়েন্ট। সেখানে প্রতিপক্ষকে একটিও পয়েন্ট না দিয়ে টানা ১৭টি পয়েন্ট লাভ কল্পনা করা যায় না।

যদিও অসাধারণ মনোবল এবং দৃঢ়তার পরিচয়ে জনিয়ার বিশ্ব খেতাব জিতেছে, তবু ফাইনাল খেলাটি দর্শকদের তেমন মন ভরাতে পারেনি, যেমন ভরিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল ও তার আগের রাউন্ডের খেলা। দুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে অনেক খেলার যবনিকা পড়েছে, যে সব খেলার স্মৃতি বহুদিন দর্শক-মনে আঁকা থাকবে।

তেত্রিশতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রায় ১২ শ' খেলার মধ্যে অনেকগুলির খেলাই সংগ্রামের উৎকর্ষে এবং রূপে রঙে এই স্মৃতির স্মারক হয়ে রয়েছে। স্বল্পাভাবে আলোচনা করা সম্ভব হল না। ভারতের ভূমিকা এবং কয়েকজনের সম্বন্ধে পরে আলোচনার ইচ্ছে রইল। নীচে ফাইনালের ফল দেওয়া হল।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল— (পুরস্কার সেণ্ট ব্রাইড ভাস) বিজয়ী—ইস্তাভন জনিয়ার (হাঙ্গেরী), রানার্স— অ্যান্টন স্টিপানসিচ (যুগোশ্লাভিয়া) ফল—১৭-২১, ১২-২১, ২১-১৪, ২১-১৫, ২১-১৯। ৩য়—নোরিও তাকাসিমা (জাপান) ও মিৎসুরো কোনো (জাপান)।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—(পুরস্কার—ইরান কাপ) বিজয়ী—ইস্তাভন জনিয়ার ও গ্যাবোর গারগোলি (হাঙ্গেরী), রানার্স—ড্রাগুটিন সুরবেক ও অ্যান্টন স্টিপানসিচ (যুগোশ্লাভিয়া)। ফল—২১-১৪, ১৯-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৬। ৩য়—সিগিও ইটো ও কাৎসুইকি আবে (জাপান) এবং জ্যাকোয়েস সেক্রেটিন ও জিন-ডেনিস কনস্টান্ট (ফ্রান্স)।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল—(পুরস্কার—গিস্ট প্রাইজ) বিজয়িনী পাক ইয়ং সুন (উত্তর কোরিয়া), রানার্স—চ্যাং লী (চীন) ফল—২৪-২৬, ২১-১২, ২১-১৪ ও ২১-১৫। ৩য়—এ ফারডম্যানস (রাশিয়া), কে সিন-আই (চীন)।

মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল—(পুরস্কার—ডবলিউ জে পোপ ট্রফি) বিজয়িনী—মারিয়া আলেকজাণ্ড্রু (রুমানিয়া) ও সোকো তাকাহাসি (জাপান)। রানার্স—চু সিয়াং-উন ও লিন মেই-চিন (চীন) ফল—২১-১৮, ৯-২১, ২১-১১, ২১-১৪। ৩য়—তকীক ওজোকি ও সাচিকো ইওকাটি (জাপান) এবং ফারডম্যান ও এলমিরা অ্যানটোনিয়ান (রাশিয়া)।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল— (পুরস্কার—(হদুসেক প্রাইজ) বিজয়ী— স্টানিশ্লাভ গোমোজকভ ও এ ফারডম্যানস, (রাশিয়া)।

রানার্স—সারখিস সারখোয়ান ও এলিমিরা অ্যানটোনিয়ান (রাশিয়া), ৩য়—লিয়ং কো-লিয়াং ও চ্যাং লী (চীন) এবং সিগিও ইটো ও তকীক ওজোকি (জাপান)।

জুবিলি কাপ ফাইনাল—বিজয়ী— কে নোয়েলার (লুক্সেমবার্গ), রানার্স— পুন ওয়েং হো (সিঙ্গাপুর)।

একলব্য

সপ্তদশী বিশ্ব বিজয়িনী

আজ যেখানে কলকাতার স্যাটিন হল, বছর আড়াই আগে, এখানকার ছাত্রীদের দিকে মেয়েটির খেলা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারিনি টেবল টেনিস খেলায় যে মেয়ের হাত এত পরিণত, যার পায়ে এত ছন্দবোধ, তার বয়স মাত্র চোদ্দ-পনেরো। উত্তর কোরীয় দলের ম্যানেজার জানিয়েছিলেন, ওদের [illegible] খেলোয়াড় পাক ইউং সুন-এর বয়স সত্যিই বেশি নয়। এখন স্কুলে পড়ে।

সেদিন নেতাজী স্টেডিয়ামে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর খেতাব লাভের পর জানালেন, পাক ইউং এবার স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে, কলেজে ভর্তি হবে। এখন বয়স সতেরো।

রিচার্ড বার্গম্যানের পর মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভবত দ্বিতীয় ঘটনা। বার্গম্যান পুরুষদের বিভাগে বিশ্বজয়ী হয়েছিল ১৭ বছর বয়সে। তার আগে বা পরে এত কম বয়সে এই গৌরব কেউই অর্জন করতে পারেনি। পাক ইউং নিজের দিক দিয়ে যেমন অনন্য কৃতিত্বের অধিকারিণী, তেমন দেশের দিক দিয়ে গর্বের পাত্রী। কেননা পাক ইউং সুনই টেবল টেনিস খেলায় উত্তর কোরিয়াকে প্রথম বিশ্ব খেতাব জিতে দিল।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব হুবহু মিলে গেছে। ১৯৭২এ ওর খেলা দেখে কল্পনার তুলিতে ওর গায়ে 'ভবিষ্যৎ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' কথাটি লিখে দিয়েছিলাম। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছিলাম সারাজেভো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ও কী ভূমিকা গ্রহণ করে। কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একই গ্রুপে পড়ায় উত্তর কোরিয়া সারাজেভো থেকে নাম প্রত্যাহার করায়। কলকাতায় ওরা খেলতে আসবে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল। তাই বিশ্ব টেবল টেনিস প্রসঙ্গে 'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় লিখেছিলাম—"সেই ছোট মেয়েটির কথা মনে পড়ছে, দম দেওয়া কল পুতুলের মত সে নেচে নেচে খেলে দু বছর আগে ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামকে মাতিয়ে তুলেছিল। [illegible] সেই খেলা আজও যেন চোখের উপর ভাসছে। তার মারের চটক এবং পায়ের ছন্দ কোনদিন ভোলবার নয়।"

জানুয়ারির ৩০ তারিখে [illegible] হলে দেখা হতেই একগাল হাসি। অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, 'গিফ্ট প্রাইজ' নিয়ে ঘরে ফেরা চাই। আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। উত্তর কোরিয়ার দলনেতা চুম সন গিল জানালেন ওরা মাত্র তিনজন খেলোয়াড় নিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে মেয়ে [illegible]

খেলায় ওরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না, শুধু ওপেন ইভেন্টে খেলবে। সেই একটি মেয়েই মেয়েদের বিভাগে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারিণী হল।

৩০ জানুয়ারি থেকেই জোর অনুশীলন করছিল। নেতাজী স্টেডিয়ামে যখন দুরন্ত উত্তেজনায় খেলাগুলি চলছিল দলগত ইভেন্টে, তখন পাশের [illegible] হলে পাক ইউং অনুশীলন করে চলছিল ওদের দেশের দুই পুরুষ খেলোয়াড় উন চুল ও পং কু জে-র সঙ্গে। তার আগে

বিশ্ব বিজয়িনীর পুরস্কার গিফ্ট প্রাইজ হাতে পাক ইউং সুন —ফটো দেশ

ভারতের পুরুষ খেলোয়াড়দের সঙ্গেও প্রচুর অনুশীলন করেছে। মোট কথা, সাধনার মাধ্যমে তিলে তিলে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল।

ওপেন ইভেন্টের সময় যখনই ওকে খেলতে দেখেছি পাশের সাংবাদিক ও বন্ধুদের বলেছি, ওই মেয়েটির খেলার দিকে লক্ষ রাখুন। দেখবেন কত সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন ওর খেলা। সবাই সায় দিয়েছেন ওর খেলা দেখে।

সত্যি কথা, আমাদের রুপা ব্যানার্জি (তখন রুপা মুখার্জি) বা ইন্দু পুরীর [illegible] খেলেছিল, রুপা ও ইন্দু দুজনেই [illegible] তালহীন নৃত্য করতে, কিন্তু তা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সেভাবে খেলতে পারেনি। খেলা [illegible] নয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible]। কিংবা নিজের জেদেও [illegible]। তুলনা বলব, পাক ইউং সুনের খেলার সহজ ও স্বচ্ছন্দ রূপ কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। ফোরহ্যান্ডের [illegible] মারগুলি দর্শকদের খুশির খোরাক হয়েছে। বাঁ দিকে খেলে বাঁ হাতে, শেষ মুহূর্তে [illegible]। এগিয়ে পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে চলার ছন্দ এত সুন্দর যে কোন মারে ওকে [illegible] খেলা শক্ত। সহজেই যেন সব বলের নাগাল পায়। স্পিন মিশিয়ে [illegible] করে। জোর মারের মধ্যেও থাকে ঘূর্ণী বলের জাদু।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পথে ওর শিকার কারা? ইংলন্ডের এক নম্বর মেয়ে জিল হ্যামার্সলী, ফরাসীর দুই নম্বর ব্রিগেটি থিরিয়েট, হাঙ্গেরীর তিন নম্বর হেনরিয়েট লোটালার, প্রতিযোগিতার ৬ নম্বর বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার চুং হায়ুন সুক, রাশিয়ার এ কতিম্যানন (মিক্সড ডাবলস বিজয়ী) এবং প্রতিযোগিতার দুই নম্বর বাছাই, চীনের শ্রেষ্ঠ মেয়ে চ্যাং লী।

ছজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে চারজনের সঙ্গে খেলতে হয়েছে পাঁচটি করে গেম। চার জনকেই শেষ গেমে হারিয়েছে বজ্র কঠিন সংকল্পে, সাহস-সুন্দর খেলায়।

শুধু কি সাহস-সুন্দর খেলা? ওর মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের কথাও ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার চুং হায়ুন সুকের সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলার সময় আম্পায়ার ওর সপক্ষে একটি 'এজ' পয়েন্ট দিলেন। দর্শকদের দাবিতে সে পয়েন্ট ফিরিয়ে নিলেন আম্পায়ার। পাক ইউং হাসিমুখে সিদ্ধান্ত মেনে নিল। চ্যাং লীর সঙ্গে ফাইনাল খেলার সময় মীমাংসাসূচক চতুর্থ গেমে পাক ১৪—১০ পয়েন্টে এগিয়ে। ওর একটি মার ফেরাতে পারল না চ্যাং লী। ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে আলোর রেখায় পয়েন্ট ফুটে উঠল ১৫—১০। পাক ইউং আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাতের কব্জির উপরটা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ বল তার ব্যাটে লেগে আসেনি, হাতের উপরে (কব্জির নিচের লাগলে ক্ষতি নেই) লেগে এসেছে। পয়েন্ট তার প্রাপ্য নয়, পয়েন্ট পাবে চ্যাং লি। স্কোর বোর্ডে পয়েন্ট ফুটে উঠল ১৪-১১। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাক ইউংয়ের এই খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। সতেরো বছরের মেয়েটিও অনেক বড় হয়ে উঠল নেতাজী স্টেডিয়ামের দর্শকদের সামনে।

মুকুল

"জীবনমরুর প্রান্তে" (পরিচালনা : সাধন চৌধুরী) ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী

কোন কোন প্রযোজক নাকি বলেন, আমি জানি আমার এই ছবির গল্প অতি স্থূল, বেশির ভাগ ঘটনাই অবাস্তব এবং একাধিক পরিস্থিতি বা উপকরণ অশালীন। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ছবি হিট করবে।

ছবি সত্যিই হিট করে, একের পর এক।

আবার হয়ত উনি এমন পরিচালককে দিয়েই ছবি করাতে চান যাঁকে তিনি পরিচালনা করতে পারেন। তেমন পরিচালকও তিনি পেয়ে যান।

এই অবস্থা বিপজ্জনক। ভাল ব্যবসা সব প্রযোজকই করতে চান। তাতে দোষ কিছু নেই। কিন্তু ভাল জিনিস দিয়ে ভাল ব্যবসা করতে পারলে ভয়ের আর কোন কারণ থাকে না। অবাস্তব বা অসুস্থ উপাদান যদি উতরে যায় তবেই বিপদ। বাংলা চলচ্চিত্র এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

* * *

কোন রকমে গোঁজামিল দিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ছবির কাজ শেষ করার ফরমুলা এক সময়ে দেখা গিয়েছিল। এখনও দেখা যাচ্ছে। তাতে ছবির সংখ্যাই শুধু বাড়ে, কিন্তু সব ছবি চলে না। এটাও চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। অর্থের অপচয় তো বটেই, শিল্প হিসাবেও

বাংলা ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একবার হয়ত এই পদ্ধতিতে তৈরি কোন ছবি বকস-অফিসে সফল হয়েছে। অমনি পর পর ওই জাতীয় কয়েকটা ছবি হয়ে গেল। তার অধিকাংশই হয়ত ফ্লপ। খরচের টাকা আর উঠে আসে না। সেই টাকা ইন্ডাস্ট্রিতে

মতামতের মন্তাজ

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাটানোও যায় না। বাংলা ছবির এই আর এক দারুণ সমস্যা।

* * *

সকল ক্ষেত্রেই আন্তরিকতার অভাব থাকে তা নয়। তবে বুঝতে ভুল হয়। দর্শকরা সত্যি কী চান কিংবা যা পরিবেশিত হচ্ছে দর্শকরা তা নেবেন কিনা সেটা হয়ত সব সময় পরিষ্কার বোঝা যায় না। সে কারণেও ছবি অনেক সময় অসফল। এই ব্যর্থতা কষ্টদায়ক, তবে তাতে ফাঁকি নেই। কিন্তু ফাঁকি দেবার জনাই যে প্রচেষ্টা এবং সেটা যেখানে সফল সেখানেই আসল বিপদ ও সমস্যা। ওই সমস্যা থেকে ত্রাণ লাভের উপায় কী?

* * *

উপায় আছে। যদি প্রযোজক ও পরিচালকদের এই চেতনা থাকে যে বাংলা ছবির প্রতি তাঁদেরও একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে তবে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। ছবি বকস-অফিসে চলবে না বলে কেউ ছবি বানান না। কিন্তু ছবি চালাবার জন্য যে-কোন নিয়ম বা ফরমুলার সংগে রফা চলে না। হিন্দীচিত্র চলে, তাই হিন্দী ছবির যাবতীয় উপকরণ বাংলা ছবিতে আমদানি করলেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের মঙ্গল হবে এই ধারণা অযৌক্তিক। তা-ছাড়া হিন্দী ছবির নিয়ম-কানুন আমদানি করলেই যে বাংলা ছবি চলবে এটাও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। এক বছরের বাংলা ছবির দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। দেখা যাবে যে ক্যাবারে নাচ বাংলা ছবির প্রায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অথচ ক্যাবারে-সম্বলিত সব ছবিই যে বকস-অফিসে খুব চলেছে তা নয়। এতে জাত যায় পয়সাও আসে না।

* * *

শুধু পয়সার জনাই ছবি—এই নীতিটা সমর্থনযোগ্য নয়। সিনেমা পয়সার জন্য নিশ্চয়ই, আবার নির্দোষ আনন্দের জন্যও বটে। তা-ছাড়া বাংলা সিনেমার একটা

নির্ণায়ক ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাকে আরও বেশি সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব প্রত্যেক প্রযোজক ও পরিচালকের। প্রযোজকরা কী চান সেটা স্পষ্ট। কোন কোন পরিচালক ছবি তৈরির সুযোগ পেলে যে-কোন শর্ত মেনে নেন। এমন কী কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালককে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ও বিসর্জন দিতে হয়। প্রযোজকের নির্দেশ মেনে নেওয়াই অনেক সময় বিভিন্ন ছবির নির্দেশকের কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পরিচালক স্টারের বুদ্ধি ও মতামত দ্বারা পরিচালিত। পরিচালককে দোষ দেওয়া যায় না। যে-পরিবেশে তাঁকে কাজ করতে হয় তাতে সব সময় স্বাধীন ইচ্ছা খাটানো সম্ভব নয়। পরিচালকই একচ্ছত্র ডিকটেট করে এসেছেন। এখন সময় পালটে গেছে, পরিচালককে নির্দেশ পালন করতে হয়। অবশ্য সব পরিচালককে পরিচালনা করা যায় না। সে-কারণে তাঁদের দিয়ে অর্থহীন, অবাস্তব ও আকাঙ্ক্ষিতকর ছবিও বানানো যায় না। এই সকল ছবি যদি সত্যিই বক্স-অফিসে সাফল্য পায় তবে সেটা বাংলা ছবির মঙ্গল না অমঙ্গল। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায়, অর্থহীন ও অরুচিকর ছবি দিয়ে বার বার বাজিমাৎ করা যায় না। কারণ এক্ষেত্রেও নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য। যে-সব দর্শকরা নিম্নমানের ছবির বাজার গরম রেখেছেন তাঁরাও কম-মূল্য বেশিদিন পছন্দ করেন না। অতএব যে-কোন উপায়ে টিকিটঘর জয় করাই যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা সাবধান হতে পারেন। এই সাবধানতার ফলে বাংলা ছবির কিছুটা মঙ্গল হতে পারে।

শর্মিলা

(সিনে ক্যোয়ালিটি)

মঞ্চের নাটক সিনেমা হলেও সেটা নাটকই থাকে। শর্মিলার চিত্রনাট্যটি অবশ্য সিনেমার উপযোগী করার চেষ্টা হয়েছে। যে-কারণে রোমান্টিক উপাখ্যানটি বিশদ ও বিস্তৃত। তাতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রাজশ্রী বসু রোমানটিক যুগলের মতোই জুতসই অভিনয় করেছেন। রাজশ্রী সাজানো দৃশ্যে (দর্শক বুঝতে পারেন গান শুরু হল বলে) প্লে-ব্যাক শিল্পীর (আরতি মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত) গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন। গান ভাল, গানের সুরও (সুধীন দাশগুপ্ত-কৃত)। সিনেমার এই সব মামুলি প্রকরণ সত্ত্বেও শর্মিলা যেন মঞ্চের নাটকই রয়ে গেল।

এর কারণ মূল কাহিনী (দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত) যেটা সেটা পারিবারিক। পরিবারের অশান্তি ও পরিশেষে মিলনের ব্যাপার-স্যাপারে কতকগুলি চিরাচরিত

"শর্মিলা"/রাজশ্রী বসু

সেগুলি নিতান্তই অন্দরমহলের ঘটনা, যা সংলাপ সূত্রে মঞ্চেই নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম। ফিলমের ব্যাপ্তিতে ওই সব পরিস্থিতি তেমন জমজমাট হয় না। শর্মিলা-তেও হয়নি। তবে গল্পের শেষে যখন ভাইয়েরা বোনের হাতে ফোঁটা নেবার জন্য মিলিত তখন দর্শকের চোখে জল আসে।

এই ঘরোয়া গল্পে অশান্তি সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন কণিকা মজুমদার—বাড়ির মেজ বউ। তিনি অভিনয়ের [illegible] সফল, অর্থাৎ দর্শককে রাগিয়ে দিতে পেরেছেন। এই ধরনের নাটকে কান্না এ[illegible]সি—দুই রকমের উপকরণই থাকে। উপকরণগুলি যে খুবই বাস্তব তা নয়, তবে নাট্যামোদী দর্শকের মন ভেজাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁদের নাট্য উপভোগে যাঁদের অভিনয় কাজ দিয়েছে তাঁরা হলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, দিলীপ রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অসিতবরণ, দীপ্তি রায় প্রভৃতি। কৌতুক সৃষ্টির কাজটি নিয়েছেন চিন্ময় রায়, তাঁর প্রেমিকা অঞ্জনা চৌধুরী। বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়—বাড়ির বড় বউ—তালিমনাড়ুর মেয়ে। অতএব তাঁর অভিনয়ের ধরনে দর্শকরা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবেন। শান্তিনিকেতনের এই মেয়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান থাকতেই পারত। মনে হয়, স্টার থিয়েটারে ছিল। শর্মিলা স্টারের অভিনয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। মঞ্চের একাধিক শিল্পীও ছবিটিতে রয়েছেন। পরিচালক সুনীল ঘোষ এই নাটকে নতুন কোন ডাইমেনশন অবশ্যই যোগ করতে পারেননি, তবে নাটকটির আবেগ-রস যথাযথ নতুন আঙ্গিকে

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

বাংলা সংগীতের পুরনো যুগের তিন কন্যা ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা ও কমলা ঝরিয়ার সুবিস্তৃত সংগীতজীবনের পরিচয় একসঙ্গে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। এ'দের প্রত্যেককে নিয়ে এক-একটি এই ধরনের ছবি তৈরী হতে পারত। তবু ভাল, চলচ্চিত্র সংস্থা অন্তত এগিয়ে এসেছেন ওঁদের তিনজনকে নিয়ে একটি ছবি করতে। অল্প পরিসরে যতটা বেশি পারা যায় ওঁদের সংগীত-জীবনের ইতিহাস জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন।

ছবির নাম নজরুলের গানের একটি কলি দিয়ে। নামকরণ যুক্তিযুক্ত। ওই তিন শিল্পীর জীবনে নজরুলের গানের একটি বড় অংশ আছে। তিনজনই নজরুলের সংস্পর্শে এসেছেন, দু-একজন সরাসরি সংগীতের পাঠও নিয়েছেন। সেসব অনেক দিনের কথা। অনেকে ভুলে গেছেন। কিন্তু শিল্পীরা নিজেরা কি সেসব দিন ভুলতে পারেন। ছবিতে তাঁরা সেইসব দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন। ছবির শুরুতে যখন তিন শিল্পী একত্র হয়েছেন তখন তাঁরা এই বয়সেও সেই পুরনো দিনের মত ছলছলিয়ে কলকলিয়ে উঠেছেন। চিত্রনাট্যকার ও নির্দেশক শ্যামল ঘোষ বোধহয় এমনি একটি মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করে ছিলেন।

আলাদা আলাদা করে তিনজন শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তথ্য সরবরাহ করেছেন—যার ভিত্তিতে শিল্পীরা ফিরে গেছেন পুরনো দিনের নানা মুহূর্তে। ও'দের বক্তব্যের সূত্র ধরে পরিচালক দৃশ্যগুলির চিত্ররূপ দিয়েছেন। ছেলেবেলার মুহূর্তগুলিকেও জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। সেটা খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং পুরনো দিনের নানা মুহূর্তের ছবি যখন পর্দায় এসেছে তখন দর্শক সেই সব পুরনো দিনের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন। পরিচালক শিল্পীদের গানের আসরে বসিয়েছেন। এই শেষ বয়সেও ওঁদের কণ্ঠ সতেজ এবং সুরেলা। একদিন ও'রা যে গানে গানে বাংলার আকাশ বাতাস মাতিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। ওঁদের সুদীর্ঘ সাধনারও আভাস মেলে। স্মৃতিচারণার শেষ পর্যায়ে একটা করুণ মুহূর্তের অবতারণা হয় যখন কেউ বলেন, আর কদিনই বা আছি। কেউ তুলসীতলায় প্রদীপ দেখান শেষের সেই দিনটিকে স্মরণ করে। কেউ বা নিজের অজান্তেই একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। সেইগুলিই বোধহয় ছবির সবচেয়ে করুণ এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্ত। ওইসব মুহূর্তকে আশ্চর্য সুন্দর এবং বিষাদময় করে ধরে রেখেছেন ক্যামেরাম্যান শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু আলো এবং কিছু আঁধারের মধ্যে। ছবির আবহ-সংগীত পরিচালক নিজেই রচনা করেছেন। অমলেশ শিকদারের সম্পাদনার কাজও ভাল। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত।

"পরস্ত্রী" (পরিচালনা : শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী

বোম্বাই বিচিত্রা

বোম্বাইয়ের একটি সংবাদপত্র সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরের অংশ তুলে দিচ্ছি : 'চণ্ডীগড় থেকে আগত যুবক রাজ অরোরার মৃতদেহ চেমবুরের একটি জলাশয়ে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, যুবকটি সিনেমায় কাজ পাওয়ার প্রত্যাশী ছিলেন।'

ঘটনাটা আত্মহত্যা কিনা খবরে উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক, ঘরছাড়া একটি যুবকের খ্যাতির অন্বেষণ এইভাবে শেষ হল। হাজার হাজার যেসব যুবক মনে মনে নানা রকম স্বপ্ন নিয়ে বোম্বাই শহরে ভিড় করে থাকে, রাজ অরোরা তাদেরই একজন। এদের মধ্যে অনেকে প্রথমে হতাশ, পরে মোহমুক্ত চিত্তে স্বস্থানে ফিরে যায়; কেউ কেউ সিনেমা মহলে কায়িক শ্রমের ছোটখাট কাজ জোগাড় করে ভবিষ্যতে কোনও সময়ে সিনেমায় যেমন-তেমন ভূমিকা লাভের আশায় দিন কাটায়। একটা হিসাবে দেখা গিয়েছে, এই রকম প্রতি দশ হাজার যুবকের মধ্যে মাত্র একজনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবু ওরা এখানে আসে, আসতেই থাকবে। প্রায় প্রতি ট্রেন থেকে কেউ না কেউ ভিকটোরিয়া টারমিনাস অথবা সেন্ট্রাল স্টেশনে নামবে, প্রযোজক অথবা পরিচালকের দরজায় গিয়ে ধরনা দেবে, ফিল্ম স্টুডিওর ফটকের সামনে ভিড় করবে। স্টুডিওতে ও'দের ঢুকতে দেওয়া হবে না, তবুও ওরা চলে যাবে না, ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

রাজ অরোরার পরিণতির ঘটনাটাও কোনও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। অতীতে এই রকম অনেক রাজ অরোরাকে আমরা দেখেছি, ভবিষ্যতেও দেখব আরও অনেককে। যেসব সিনেমা-পত্রিকা লোকের হাতে হাতে ঘোরে, সেগুলিতে সফল তারকাদের জীবন-কাহিনী কল্পনার রঙ মিশিয়ে ফলাও করে ছাপা হয়, কিন্তু এই মহলে প্রতিদিন দুঃখ-বেদনা-নৈরাশ্যের যে-ইতিহাস রচিত হচ্ছে তার বিন্দু-বিসর্গও সেখানে স্থান পায় না। রাজ অরোরার খবর ছাপা হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়। সিনেমা-পত্রিকায় এই খবরের জায়গা যে হবে না, তা এক রকম জোর করেই বলা যায়। যারা তারকা হবার স্বপ্ন দেখে, তারা রাজ অরোরার কাহিনী হয়তো জানতেই পারবে না। পরিবর্তে তারা পড়বে জনি ওয়াকারের বৃত্তান্ত, যিনি বাস কনডাকটর থেকে হলেন প্রথম সারির কৌতুকাভিনেতা; অথবা ধর্মেন্দ্রর কাহিনী, যিনি একদা ছিলেন ওভারসিয়ার, আজ নামকরা নায়ক। পরিচালক বাবুরাম ইশারার সাফল্যের কাহিনীও ওরা মন দিয়ে পড়বে, কর্মজীবনের শুরুতে যিনি ছিলেন ক্যান্টিন-ভৃত্য। শুধু ও'দেরই কথা ওরা পড়বে আর স্বপ্ন দেখবে, দেখতেই থাকবে।

চিত্র-সাংবাদিক এবং তারকা-প্রযোজকদের বিরোধের অবসান হয়েছে। তার আগে তিন পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। প্রথম আলোচনা-সভা হয় গত ৯ ফেব্রুয়ারি। সেখানে ফিল্ম প্রোডিউসারস কাউন্সিল, সিনে আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং ফিল্ম জার্নালিস্টস সোসায়েটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিনেতা ফিরোজ খাঁ সভায় ঢুকেছিলেন একটি সিনেমা-পত্রিকা বগলে নিয়ে। সেই পত্রিকার সম্পাদকও সেখানে ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্বন্ধে একটি লেখার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে ফিরোজ খাঁ হই-চই লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই লেখায় ফিরোজ খাঁকে 'ভুঁড়িওয়ালা' বলা হয়েছে। বিশেষ জায়গাটা পড়েই ফিরোজ খাঁ সকলের সামনে নিজের শার্ট, গেঞ্জি ফটাফট খুলে ফেললেন। অতঃপর বললেন, "আপনারাই দেখে বিচার করুন, আমার পেটে এক তিল অতিরিক্ত চর্বি আছে কিনা।" ফিরোজ খাঁর বক্তব্য হয়, লেখাটাকে সরস করবার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে হাস্যাস্পদ করা হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক সঙ্গে সঙ্গে লেখাটির ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন এবং বললেন, ঐ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের বক্তব্য শুনে তিনি তাঁর দিক থেকে যা করণীয় করবেন।

প্রযোজক এবং তারকাদের পক্ষ থেকে দিলীপকুমার বলেন, প্রযোজক অথবা তারকাদের কেউই সিনেমা-পত্রিকাদের সঙ্গে ঝগড়া চান না। তাঁদের বলবার কথা শুধু এই, ঘটনার সত্য বিবরণ ছাপা হোক কিন্তু তারকাদের সম্পর্কে বানানো গল্প যেন ছাপা না হয়; আর সিনেমা-ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের হীন প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা যায়, সেটা যেন এখন থেকে বন্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনটি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংযুক্ত কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কথা হয়েছে, এই কমিটি তাঁদের মনোনীত সাংবাদিকদের স্বীকৃতিসূচক কার্ড দিতে পারেন; যাঁদের

"রাগ-অনুরাগ" (পরিচালনাঃ দীনেন গুপ্ত) ছবিতে অপর্ণা সেন

সঙ্গে ওই কার্ড থাকবে না, ফিল্ম স্টুডিওতে অথবা পার্টিতে তাঁরা প্রবেশের অধিকার থেকেও হবেন বঞ্চিত। কার্ডহীন সাংবাদিকরা তারকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে পারবেন না, কার্ড না থাকলে ফোটোগ্রাফাররাও পারবেন না তারকাদের ছবি তুলতে। সেদিনের সভায় এই সব প্রস্তাব আলোচিত হয়।

এদিকে সিনেমা পত্রিকা পাঠকদের সম্ভাব্য যে-আন্দোলনের খবর শোনা গিয়েছিল, সে-বিষয়ে আর কিছু জানা যাচ্ছে না। সত্যিই কি তাঁরা কোনদিন কালো-টাকা-নেওয়া তারকাদের 'ঘেরাও' করবেন?

সুরঞ্জন

চমকবিহীন জাদু প্রদর্শনী

কিংবদন্তীর গল্পে শোনা যায়, নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে মঞ্চে এলেন জাদুকর, চঞ্চল দর্শককুলকে চমকে দিয়ে ঘাড় দেখতে বললেন; এবং অলৌকিক কাণ্ড, ঘড়ির কাঁটা কখন তিরিশ মিনিট পিছিয়ে গিয়েছে! গণ-সম্মোহনের এরকম কোনো জাদুখেলার অস্তিত্ব বাস্তবে অবশ্য নেই। এ নেহাৎই গল্পকথা। তাই শ্রী শিক্ষায়তন হলে বিগত ৮ ফেব্রুয়ারির জাদুকর তপনের প্রদর্শনী যখন নির্দিষ্ট সময়ের পাক্কা এক ঘণ্টা পরে শুরু হল, তখন মন্ত্রবলে ঘড়ির কাঁটা পিছনে সরে যাবে—এমন প্রত্যাশা কারো ছিল না। বরং যা অনিবার্য তাই হল, অনুষ্ঠানসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কিছু খেলা শেষ পর্যন্ত দেখানো গেল না।

তারই মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে যে-কটি খেলা দেখালেন জাদুকর তপন, সেগুলি হল ঃ খাঁচাবন্দী পায়রার বুকে ইতস্তত ছুরিকা-সঞ্চালন, বৈদ্যুতিক করাতে নারী-কর্তন এবং শূন্যে ভাসমান রমণী। ব্ল্যাক আর্টের সাহায্যে তাঁর মঞ্চে আবির্ভাবও দেখতে মন্দ লাগেনি। কিন্তু তাঁর প্রদর্শনী বহুলাংশে ত্রুটিমুক্ত নয়। তৎপরতার অনুপস্থিতি মহড়া ও সময়-সমন্বয়ের অভাব এবং সহযোগিতার অনৈকতান জাদুকর তপনের প্রদর্শনীকে প্রায়শই আত্মচার সুলভ করে তুলেছিল। বিশেষত, তাঁর প্রধান সহযোগীর চোখের ইশারা ও নিচু স্বরে সংলাপ অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছে। জাদুকর তপনের মঞ্চব্যক্তিত্বে পরিহাসপ্রবণ কৌতুকাভিনেতার ছাপ বেশী। হস্ত-কৌশলও অস্বচ্ছন্দ। ফলে বেশ কিছু ভাল খেলা প্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করতে পারেনি।

'কুহেলী' সংস্থা পরিবেশিত এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী প্রণতিকে 'ইন্দ্রজালের ক্ষেত্রে নবাগতা শিল্পী' রূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যত তিনি নৃত্য-পটীয়সী সহযোগিনী হয়েই রইলেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

দৃষ্টিহীনদের ডাকঘর

দৃষ্টিহীনরা উপযুক্ত সহযোগিতা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে যে সার্থক অভিনয়ে সক্ষম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দৃষ্টিহীন শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' তার জ্বলন্ত নজীর। এর কুশীলব প্রত্যেকেই দৃষ্টিহীন, অথচ অভিনয় তাদের কোথাও সে কারণে ব্যাহত হয়নি, আর মঞ্চ ও প্রয়োগগত বিশেষ ব্যবস্থা তাদেরকে সহজ ভাবে অভিনয় করতে সাহায্য করেছে। মুখ্য চরিত্র অমলের ভূমিকায় শ্রীমান অরূপ বিশ্বাস দর্শকমনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। অন্যান্য চরিত্রে সুকুমার মণ্ডল, রণজিৎ চৌধুরী, চন্দ্রনাথ সাহা, অসিত কর্মকার, কাশীনাথ নাথ, মহাদেব অধিকারী, বিধান দাস, গোপাল হাওলাদার, শ্যামাপদ নাথ প্রত্যেকেই সহজ ও সুন্দর অভিনয় করেছে। এই নাটকের প্রয়োগ প্রধান ত্রিলোকেশ চক্রবর্তী নিপুণভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে অভিনয়, দৃশ্য, উপস্থাপনা, আলোকসম্পাত প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের অভিনীত 'ডাকঘর' উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

আগামী সপ্তাহে: হাতির চিকিৎসা ④

শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ নন্দী : 'লেজ খসার পর বানর শব্দটা থেকে 'বা' খসিয়ে আমরা হয়েছি নর। বিবর্তনের ধারায় আর এক ধাপ এগিয়ে 'নর' শব্দ থেকে 'ন' খসিয়ে এখন আমরা কি হব? শুধু 'র'?

খসাবার উপায় নেই। এই Raw মেটিরিয়াল আমাদের মধ্যে থাকবেই।

* * *

পশ্চিম জার্মানীতে কুকুভক্তদের সম্মুখে সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে সেই আশঙ্কায় সেখানকার পুলিস কর্তারা আতঙ্কিত হয়েছেন বলে প্রকাশ।

আমি তেমনটা মনে করি না। নিতান্ত কুকপ্রাপ্তি ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো বিপদ থাকতেই পারে না।

* * *

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংগঠনিক কংগ্রেসিক প্রফুল্ল সেনের সাক্ষাতে নয় বামের ছয়

শরিক—খবরের হেডলাইন। এবার হয় ছয়লাপ, নয় নয়ছয়!

* * *

মে-র আগে মহা নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই, এক ঘোষণায় জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার, কিন্তু তাঁর এই কথায় কি আস্থা রাখা যায়?—একজনের জিজ্ঞাসা।

মে...বি, মে...নট্...বি!

* * *

শ্রীশুভেন্দু নন্দী : 'বন্ধ খাঁচায়, হাটে-মাঠে-বাটের ধারে গাছের ডালে ডালে বসে থাকা টিয়া কি চন্দনা, ময়না কি মনুয়া অথবা আর কোন পাখির শিস শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কখনো কোথাও শুনেছেন

কি বকের শিস্? শোনা যায়, সবাই শুনতে পায় সরকারী অফিসে গেলে নাকি। সেখানকার ঘরে ঘরে কোর্ট কাচারিতে, রাজদ্বারের টেবিলে টেবিলে ওখানে ফিস ফিস করা ঐ বকশিস না হলে কোন কাজই হয় না; সব কিছুই বিলকুল মিস্।'

বকশিস না দিলে শুধু বক দেখেই ফিরতে হয় শেষমেস?

* * *

না-সা-র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সাটার্ন প্রমুখ যেসব রকেট আমরা চাঁদের উদ্দেশে উৎক্ষেপ করেছি সেগুলির চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধ্বংসাবশেষে অসংখ্য টন ধরাতলে ফিরে এলে তার প্রত্যাঘাতে পৃথিবীর যন্ত্রণার অবধি থাকবে না।

আমাদের পৃথিবীর ত এমনিতেই টন টন।

* * *

শ্রীধূর্জটিমোহন নস্কর : 'দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত হৃদ্‌বিদ্ ডাঃ খ্রিষ্টিয়ান বারনারড এক রোগীর বুকের মধ্যে তার হৃদযন্ত্রের পাশে অন্য একটি হৃদযন্ত্র বসিয়ে দিয়েছেন। দুটো হৃদয় নিয়ে নিজের হৃদয়বত্তায় রোগী বেশ ভালই আছে জানা গেল...।

এখন দুটি হৃদয়ের মধ্যে হৃদয় বিনিময় হলেই হয়।

* * *

শ্রীসুব্রত লাহিড়ি : 'দুটো চোর, একজন বেশ পাকা আর একজন অ্যাপ্রেনটিস্, এক মহাজনের বাড়িতে চুরি করতে গেছে, সাঁঝ রাত্তিরেই। অন্ধকারে পাকা চোরটি হঠাৎ কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় শব্দ হওয়ায় গৃহস্বামী জিগ্যেস করছে—কে ওখানে? তা পাকা চোরটি মিউ করে আওয়াজ দিয়েছে, শুনে গৃহস্বামী নিজ মনেই বলেছেন—ওঃ একটা বিড়াল। খানিক বাদে আবার আওয়াজ, ফের ওই জিজ্ঞাসা—কে ওখানে? এবার বেচারী অ্যাপ্রেন্টিস্—হুজুর আমিও বিড়াল!

* * *

মেয়ে—মা, চন্দ্রগ্রহণ দেখতে যাব? মা—যাও, কিন্তু দূরে থেকে দেখো। একদম্ কাছে যেয়ো না।

* * *

শ্রীগৌরগোপাল বল্লভ : 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার যুবকদের অটো রিকশা চালানোর শিক্ষা ও কেনার সুযোগ দেবেন শোনা যাচ্ছে। যেসব ছেলেরা চাকরির আশায় এখন টো টো করে ঘুরছে তারা অতঃপর অটো অটো করে ঘুরবে।'

টো টো। কোম্পানির থেকে ঐ অটো-টো কোম্পানি আনলিমিটেড?

* * *

পিংপং দলের সহিত সমাগত চীনের খেলোয়াড় মন্ত্রী শ্রীচাও চেন হাং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের হেতু

উদ্‌গ্রীব বলে প্রকাশ পেয়েছে—শ্রীচাও-এর বিবৃতি থেকেই খবরটা জানা গেল।

'আমার মাঝে সুধা আছে চাও কী
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না'

* * *

বিহারের নালন্দা জেলায় হিলসা থানার রাজিয়াপুর গ্রামে আম জনতা অশস্ত্র পুলিসের সাইকেল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয় বলে খবর।

সেই বৌদ্ধ যুগের পরে নালন্দায় এখন এই নতুন ধারার শিক্ষাক্রম চালু

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

বাঙলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে

পবিত্রকুমার মুখার্জী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
অরূপ সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪০·৮০ টাকা	২০·৮০ টাকা	×
		৪৫·৯০ টাকা	২৩·৪০ টাকা	১১·৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪·৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা

REGD. No. WB|CC|184|74

Cast a spell
ever so gently.
For your face
has a magic. That's
sheer enchantment.
By Max Factor.
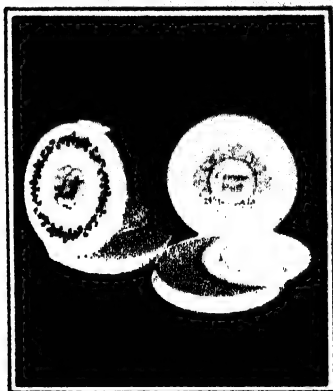
Creme Puff Compact and Refill in 7 soft shades

from the beautiful world of **MAX FACTOR** *...naturally*

SHILPI-MF-7A/74

৮ মার্চ, ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

এল আই সি বীমাপত্রের মালিকগণের স্বার্থে প্রচারিত

আপনার এল আই সি এজেন্টের ঠিকানাটি লিখে রাখুন

তিনি আপনার বীমার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারেন

আপনার জীবন বীমায় এজেন্ট হলেন আপনার বন্ধু। আপনার বীমাপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে সাহায্য করাই তাঁর কর্তব্য।...আর সেটি প্রত্যাশা করার অধিকার আপনার আছে। এল আই সি-র সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আপনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করুন। আপনি যদি আরো বেশি টাকার জীবন বীমা করাতে চান, তখনও তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

দাবী সম্পর্কিত চাহিদাগুলি ঠিকমত পূরণ করা হয় না বলে অনেকক্ষেত্রে এল আই সি-র দাবীর টাকা মেটানো সম্ভব হয় না বা মেটাতে দেরী হয়ে যায়। আপনার এজেন্ট আপনাকে বলে দেবেন কি কি করতে হবে। এগুলি হ'ল, উত্তরাধিকারীর নাম মনোনীত করা; বয়সের প্রমাণ দাখিল করা এবং বীমাপত্রে সেটি প্রমাণিত করে রাখা; সময়মতো প্রিমিয়াম দেওয়া; এবং আপনার ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে, আপনার বীমাপত্রটি এল আই সি-র যে অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের জানানো।

আপনি যে এজেন্টের কাছে বীমা করিয়েছেন, তাঁর সাহায্য নিন—এবং আপনার বীমাপত্রটি যাতে ঠিকমত চালু থাকে, সে ব্যাপারে তৎপরতার সঙ্গে ও সঠিকভাবে পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে কাছাকাছি এল আই সি-র অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

RADEUS/LIC/AS-6

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আটাশ কোটি নিরক্ষর—		... ৩৭৫
ব্যঙ্গচিত্র—		... ৩৭৬
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত		... ৩৭৭
বৈদেশিকী—দেবরাজ		... ৩৭৮
আষাঢ়ের এপারে ওইপারে (কবিতা)—বিষ্ণু দে		... ৩৭৯
যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি— সৈয়দ মুজতবা আলী		... ৩৮১
বকুর নিজস্ব বাড়ি—বাণীব্রত চক্রবর্তী		... ৩৮৭
বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব—তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ		... ৩৯৩
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর—শিবরাম চক্রবর্তী		... ৩৯৫
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী		... ৩৯৭
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়		... ৩৯৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় ... ৪০৫
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত ... ৪০৭
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায় ... ৪০৯
চিত্রগত কাহিনী—নীরোদ রায় ... ৪১৫
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর ... ৪১৭
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪২৩
আলোচনা— ... ৪২৭
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক ... ৪৩৩
পুস্তক পরিচয়— ... ৪৩৫
খেলার মাঠে—একলব্য ... ৪৩৭
দ্বি-মুকুটধারী ইস্তাম্বুল জনিয়ার—মুকুল ... ৪৪০
রঙ্গজগৎ— ... ৪৪১
অরণ্যদেব— ... ৪৪৭
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী ... ৪৪[illegible]

প্রচ্ছদ : নীরেন সেনগুপ্ত

ছোটদের বই

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র
১ম খণ্ড ২৫.০০ ॥ ২য় খণ্ড ৩০.০০

সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৬.০০

জীবজন্তু
সুকুমার রায় ॥ দাম ৮.০০

বাতাসবাড়ি
লীলা মজুমদার ॥ দাম ৪.০০

তিন নম্বর চোখ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৫.০০

ক্লাস সেভেনের মিস্টার স্নেক
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৪.০০

সীমানা ছাড়িয়ে
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৬.০০

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ দাম ৪.০০

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৬.০০

ওস্তাদ নটবর
মনোজ বসু ॥ দাম ৬.০০

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

ওআন্ডার মামা
বিমল কর ॥ দাম ৬.০০

সত্যি রাজপুত্র
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৫.০০

তরুণকুমার ভাদুড়ীর অসামান্য উপন্যাস

বিলকিস বেগম

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

কৈলাসে কেলেঙ্কারি
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

হৃৎপোকে নিয়ে গপ্পো
শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৫.০০

ছড়ায় মোড়া কলকাতা
পূর্ণেন্দু পত্রী ॥ দাম ৪.০০

বনের খাঁচায়
আনন্দ বাগচী ॥ দাম ৫.০০

দুষ্টুর দুপুর
গৌরকিশোর ঘোষ ॥ দাম ৩.০০

নিশীথ রাতের আহবান
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী ॥ ৩.০০

বাক্সরহস্য
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
বুদ্ধদেব গুহ ॥ দাম ৫.০০

পাথরের চোখ
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৬.০০

ননীদা নট আউট
মতি নন্দী ॥ দাম ৪.০০

কেমিক্যাল ম্যাজিক
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ দাম ৩.০০

কী করে কলকাতা হলো
পূর্ণেন্দু পত্রী ॥ দাম ৩.০০

ভয়ংকর সুন্দর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম [illegible].০০

ঘন্টাদার কাবলুকাকা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৩.০০

সোনার কেল্লা
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

যাঁর নাম ঘনাদা
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৪.৫০

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা
ইন্দ্রমিত্র ॥ দাম ৩.০০

গ্যাংটকে গণ্ডগোল
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

সমরেশ বসুর বিশিষ্ট উপন্যাস | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

মানুষ শক্তির উৎস ৮.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২৩ ফাল্গুন ১৩৮১

আটাশ কোটি নিরক্ষর

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা অবৈতনিক হবে এবং দেশের ছেলেমেয়েরা যাদের বয়স চৌদ্দ বৎসর পার হয়নি, তাদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার বাধ্যতা থাকবে। সংবিধানের এই নির্দেশ মান্য করে সরকার দেশের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারিত করেছেন বটে, কিন্তু সেটা সাংবিধানিক নীতি ও নির্দেশের পূর্ণ সফলতার প্রমাণ কিংবা পরিচয় বহন করে না। সংবিধানে অঙ্গীকার ছিল, পনেরো বছরের মধ্যে অনধিক চৌদ্দ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে। এই অঙ্গীকার সফল হয়নি, যদিও সময়মাত্রার পনেরো বছর কবেই পার হয়ে গিয়েছে। সরকার তাই সময়মাত্রা আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন। যা-ই হোক সরকারী কৃতিত্বের এই অপূর্ণতা বাস্তব অবস্থার এই পরিচয় সঙ্কেতিত করে যে, দেশের অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদের সমগ্র ও মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বস্তুত নিরেট নিরক্ষরতার একটি করুণ সংহতি। এর উপর বয়স্ক নিরক্ষরের জনসংখ্যার হিসাব ধরলে ভারতীয় জীবনের একটি বিশেষ দুর্বলতা ও দুঃখের হিসাব প্রকট হয়ে পড়ে। পাঁচ বছরের কম বয়সের বালক-বালিকার সংখ্যার হিসাব বাদ দিলে ভারতের নিরক্ষর জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় আটাশ কোটি। দেশের জনবল হিসাবে আটাশ কোটি বয়স্ক মানুষ জাতীয় যোগ্যতার একটা যেমন-তেমন সামান্য সম্বল নয়। কিন্তু নিরক্ষর হয়ে থাকবার কারণে আটাশ কোটি বয়স্ক মানুষের যোগ্যতা খণ্ডিত হয়ে জাতীয় যোগ্যতার সম্বলকেই খণ্ডিত করে রেখেছে। এই আটাশ কোটি বয়স্ক মানুষের প্রতিভা ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহ নিশ্চয়ই উন্নততর মানের একটি কৃতিত্বে বিকশিত হতে পারে, যদি তারা নিতান্ত নিরক্ষর না হয়ে অন্তত সামান্য মানের লেখা-পড়া করবার যোগ্যতা পায়। নিরক্ষরতাকে একটা আধি কিংবা ব্যাধি বলে কল্পনা করলে বলতে হয়, নিরক্ষরতা এক ধরনের পঙ্গুতা। জাতীয় প্রতিভার নিদারুণ এক অবরোধ সৃষ্টি করে এই নিরক্ষরতা। রামপ্রসাদী উপমাটি এক্ষেত্রে খুবই সার্থক। দুর্ভাগ্যটা যেন পতিত মাটির দুর্ভাগ্যেরই মতো একটি বঞ্চনার দুঃখ-জনিত রিক্ততা। আবাদ করলে যে মাটি সোনা ফলাতে পারতো, সেই মাটি পতিত হয়ে রয়েছে। কলকাতায় জাতীয় সাক্ষরতা সম্মেলনের তিন দিনের আলোচনার প্রত্যক্ষ সুফল কী হবে, সেটা কল্পনা করবার চেষ্টা না করেও বলা যায়, সম্মেলনের চিন্তায় ও আলোচনায় সমস্যার গুরুত্ব বহুতর সুবুদ্ধির জোর ও আবেদন নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। প্রমাণিত হয় যে, নিরক্ষরতা দূর করবার জাতীয় কর্তব্যের আদর্শটি নীরব হয়ে যায়নি, হারিয়েও যায়নি।

বয়স্কের নিরক্ষরতা দূর করবার অঙ্গীকার সরকারী কর্তব্যের নীতিতেও বিহিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সরকারী কর্তব্যের পরিকল্পনা যেন দীর্ঘকাল ধরে অদ্ভুত এক পঙ্গুত্বে অভিভূত হয়ে রয়েছে। অঙ্গীকার সমুচিত উদ্যোগের রূপে ও প্রকারে পরিস্ফুর্ত হয়নি। সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা অনুযায়ী বয়স্কের নিরক্ষরতা দূর করবার একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক মাত্র পাঁচ টাকার সাধারণ সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষকের বেতন মাসিক দশ টাকা। এ রকমের দীনতম প্রকারের অর্থ বরাদ্দ কখনই একটি সার্থক ও অনুপ্রাণিত অধ্যবসায় সৃষ্টি করতে পারে না। যে সমাজসেবী শুধু সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং নিতান্ত আদর্শিক পরিতৃপ্তির জন্য বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করবার ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁর কথা ছেড়ে দেওয়া চলে। কারণ তাঁর কাজ আর্থিক সাহায্যের কোন ধার ধারে না। কিন্তু সরকারের আর্থিক সাহায্যের বরাদ্দ যেখানে একটি প্রথাগত রীতি, সেখানে শিক্ষা-কর্মীর বেতনটাকে এত রিক্ত করলে চলবে কেন? আশঙ্কা করবার যুক্তি আছে এবং মাঝে মাঝে সত্যিই অভি-যোগ শোনা যায় যে, কোন কোন শিক্ষা-কর্মী শুধু বেতনটুকু আত্মসাৎ করেই কাজ সারেন, স্থানীয় নিরক্ষর বয়স্কের শিক্ষার কাজটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

কোন সন্দেহ নেই, বেসরকারী সমাজসেবী সমিতি ও সঙ্ঘের উদ্যম নিরক্ষরতা দূর করবার কাজের একটি প্রধান সম্বল। সরকারের পক্ষে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ একটা পরিচালন কর্তৃত্বের বিভাগ নির্মাণ করবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সমাজ-সেবীদের প্রত্যক্ষ উদ্যমের পরিকল্পনা যেন স্বচ্ছন্দ হয়, উদ্যম যেন বিস্তারিত হবার সহজ সুযোগ পায়। সরকারী সাহায্যের রীতি এবং পরিকল্পনারও তাই যথাসম্ভব উন্নতি চাই। সংক্ষেপে বলা চলে, বর্তমান ব্যবস্থা ও পরি-কল্পনার সংশোধন চাই। সুষ্ঠু, সুসম্বদ্ধ ও সুগঠিত প্রকারে রূপায়িত না হলে পরিকল্পনা যথোচিত কার্যকারিতায় সার্থক হতে পারবে না।

আর একটি বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করবার দরকার আছে। বয়স্ক নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখাবার রীতি ও পদ্ধতির উন্নয়ন চাই। শিক্ষা-কর্মীর নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন রকমের একটা রীতি হলেই তাতে কাজ হবে না। তাতে সময়ের অপচয় হবে এবং নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি দুর্বল রকমের একটা সাক্ষরতা লাভ করবে, এই মাত্র। ব্রিটিশ আমলে সাধারণ বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষার জন্য সরকারী চিন্তার কোন আগ্রহ যদিও ছিল না, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে ছিল। জেলের নিরক্ষর কয়েদীকে এবং সামরিক বাহিনীর নিরক্ষর সিপাহীকে সাক্ষর করবার চেষ্টা ছিল। শোনা যায়, নিরক্ষর সাধারণ সিপাহীকে অল্প সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মানের লেখা-পড়া শিক্ষা দেবার পদ্ধতি খুবই সফল হয়েছিল। জানি না, সেই পদ্ধতির সাক্ষরতার শিক্ষা আজও প্রচলিত আছে কি না। অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই সেই পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

অন্য একটি সমস্যার কথা প্রসঙ্গত এসে পড়ছে। ঘটনায় ও অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষরতা লাভ করেও কয়েক বৎসরের মধ্যে আবার নিরক্ষর হয়ে গিয়েছে। সাক্ষরতা লাভ করবার পর দীর্ঘকাল ধরে লেখবার ও পড়বার অভ্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণেই এই হানি সম্ভব হয়ে থাকে। বিদেশের চেষ্টার কথা উল্লেখ করা চলে। মিশনারীরা আদিম জাতির নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষরতা ঘটিয়েই কাজের হাত গুটিয়ে ফেলেন না। তাঁরা নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে পুস্তিকা আদিম জাতির ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা-বিধিও পালন করেন।

শৃগাল ডাকে চাঁদের
পানে চেয়ে—

চীন-ভারত . . পর্ক
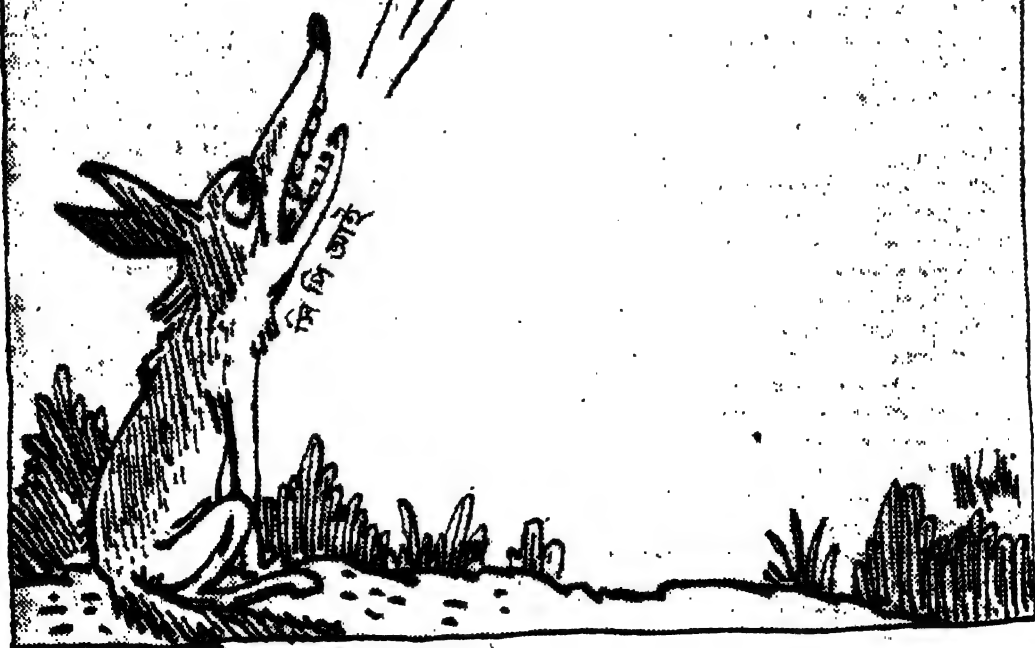
টেবিল টেনিস খেলার পরই প্রশ্ন উঠেছে, ভারত-চীন সম্পর্কের কি তা হলে এবার উন্নতি হবে? আবার কি ভারত-চীন সম্পর্কের নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে?

চীনা টেবিল টেনিস প্রতিনিধি দল যেভাবে কলকাতায় কথাবার্তা বলেছেন, যেভাবে চীনের পত্র-পত্রিকায় এই খেলার বিবরণ বেরিয়েছে তাতে এই প্রশ্ন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা কলকাতায় নেমেই বলেছেন : প্রতিযোগিতা বড় নয়, বন্ধুত্বই বড়। তাঁরা কলকাতায় যতদিন ছিলেন ততদিনই এই মনোভাব ব্যক্ত করে গিয়েছেন সব সময়।

এ দেশের সাধারণ মানুষও চীনের প্রতি বেশ বিরূপ, এইরকম একটা ধারণা নিয়েই এই প্রতিনিধি দলের অনেকে কলকাতায় নেমেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় দু' তিন দিন কাটাবার পরই তাঁদের ধারণা পাল্টে যায়। এমন কি দিল্লি থেকে যে চীনা কূটনীতিবিদরা কলকাতা এসেছিলেন তাঁরাও কলকাতার সর্বত্র চীনা প্রতিনিধি দলের গণ-অভ্যর্থনা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। চীনা খেলোয়াড়রা ভাল খেলার সময় নেতাজী স্টেডিয়ামে দর্শকদের কাছ থেকে যেভাবে অভিনন্দন পেয়েছেন প্রথম প্রথম তা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন চীনা প্রতিনিধি দলের সবাই।

খেলা তখনও শুরু হয়নি, চীনের সরকারী সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার এক বিশিষ্ট সাংবাদিক একদিন নেতাজী স্টেডিয়ামে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এখানে নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় অভ্যর্থনা পাবে রুশ প্রতিনিধি দল, তাই না?

আমি বললাম : কেন? আপনি এটা ধরে নিলেন কেন?

উনি বললেন : কারণ রাশিয়ার বহু সমর্থক আছে আপনাদের দেশে। এখানে ওদের প্রচারও অনেক জোরদার। এবং রাশিয়াকে আপনারা বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করেন।

আমি হেসে বললাম : আপনার ধারণা মোটেই ঠিক নয়। আমার অনুমান এখানে সবচেয়ে বেশী অভ্যর্থনা পাবে চীনা প্রতিনিধি দল। এর অনেক কারণ। প্রথম কারণ, একটা চীনা প্রতিনিধি দল বহু দিন পরে এই প্রথম ভারতে এল। চীন সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের জানার আগ্রহ খুব বেশী। দ্বিতীয় কারণ, টেবিল টেনিস খেলায় আপনারা অত্যন্ত পারদর্শী। আপনাদের খেলোয়াড়রা ভাল খেলেন। ভাল খেলোয়াড়দের তারিফ করে আমাদের দেশের সব লোক। তৃতীয় কারণ, আপনাদের প্রতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কোনও বৈরী ভাব নেই। যদিও অনেকেরই আপনাদের সম্পর্কে অনেক ক্ষোভ আছে।

বলা বাহুল্য, তখন সেই চীনা সাংবাদিক

আমার কথা তেমন বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই একদিন তিনি হাসতে হাসতে স্বীকার করলেন : আপনার বিশ্লেষণ দেখছি নির্ভুল ছিল। আমরা এখানে জনগণের অভিনন্দন পেয়ে মুগ্ধ।

✻

আসলে, টেবিল টেনিস খেলা উপলক্ষে যে চীনা প্রতিনিধি দল এসেছিল, সেটা ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের চেয়ে বেশী কিছু ছিল। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ওদের পররাষ্ট্র দফতরের লোকও এসেছিলেন। সাংবাদিক যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সবাই ঠিক ক্রীড়া সাংবাদিক নন। সিনহুয়ার একজন এসেছিলেন যিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ইসলামাবাদে অর্থাৎ পাকিস্তানে চীনা সংবাদ সংস্থার যিনি প্রধান, তিনিও এসেছিলেন। সম্ভবত, চীন সরকার এই সুযোগে ভারতীয় জনমত কিছুটা পরখ করে দেখার সংকল্প নিয়েই এইরকম একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন।

এঁরা দেখে গিয়ে নিজেদের সরকারের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছেন জানি না, তবে, চীনা পত্র-পত্রিকায় যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে তা থেকে জানা যায় "ভারতীয় জনগণের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব" চীনা প্রতিনিধি দলকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা লিখেছেন : সর্বত্র চীনা প্রতিনিধি দল বিপুল গণ-সংবর্ধনা পেয়েছেন।

এই সব দেখেই কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, চীন সরকার নতুনভাবে দেশের জনমতকে প্রস্তুত করছেন। ভারত-চীন সম্পর্ক একটা নতুন মোড় নিতে চলেছে। তার প্রস্তুতি-পর্ব এটা। চীনা প্রতিনিধি দল যেভাবে এখানে মেলামেশা করেছেন, যেভাবে চলাফেরা করেছেন, তাকেও কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য, যে দেশকে চীন সরকার শত্রু বলে মনে করে সেই দেশে কোনও চীনা প্রতিনিধি দল এইভাবে আচরণ করে না।

চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর কলকাতায় থেমে কাঠমাণ্ডু যাওয়াটাও কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। ১৯৬২ সালের পর থেকে বহু চীনা প্রতিনিধি দল কাঠমাণ্ডু গিয়েছেন। কিন্তু কখনও কেউ কোনও ভারতীয় বিমানবন্দর হয়ে যাননি। এই প্রথম গেলেন।

✻

চীন-ভারত সম্পর্কে একটা নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে বলে যখন অনেকে মনে করছেন, ঠিক সেই সময়ই এই উপমহাদেশের আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের প্রশ্ন নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার আবার প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে চলেছে। পাকিস্তানের এই নতুন মার্কিন অস্ত্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ভারত বিচলিত। সংগে সংগে ভারতে আসছেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন করে উত্তেজনা বাড়বেই।

ইয়াহিয়া খানের অপসারণের পর ভুট্টো যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন তিনি তাঁর দলের একাধিক বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন : আমরা মুর্খের মত লড়াই করতে যাব না। আমরা যখন লড়াইয়ে নামব তখন সেটা হবে সত্যিকারের লড়াই। আমরা লড়াইয়ে নামব আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াইতে নামব। আমরা প্রতিশোধ নেবই। আমরা কাশ্মীরকে মুক্ত করবই।

ভুট্টো কি সেই পথেই এবার এগোচ্ছেন? ভুট্টো কি এবার পুরোদমে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?

যদি তাই হয়, তা হলে এখনই ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতি হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, চীন এখন পাকিস্তানের মিত্র। চীনা পররাষ্ট্রনীতির একটা বড় সিদ্ধান্ত হল, যাতে পাকিস্তান যাতে অটুট থাকে সেজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা, সেজন্য পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। ২৩-২-৭৫

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

দেবরাজ

বাঘিনী

বিলেতে টোরি অর্থাৎ রক্ষণশীল দল চিরদিনই বড়লোকদের সংগঠন। এককালে সে দলে মুরুব্বিয়ানা করেছে খানদানী ঘরের জমিদাররা। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মোড়লি করে আসছে কলকারখানার মালিক কিংবা সদাগর-ব্যবসাদার কোটিপতিরা। বালফুর থেকে হিউম পর্যন্ত টোরি দলের নেতারা সবাই হয় অভিজাত বংশের লোক নয় তো কোটিপতি। সে রেওয়াজ ভাঙলো দশ বছর আগে যখন ছুতোরের ছেলে হীথ নেতা হলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীও। এক নাগাড়ে দশ বছর হীথ ছিলেন পার্লামেণ্টে টোরি দলের প্রধান, সেই সুবাদে হয় প্রধানমন্ত্রী নয় মুখ্য বিরোধী নেতা। এখন বিলেতে টোরিরা শাসক দল নয়, শাসক দল শ্রমিকরা। হীথ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তো নন‌ই, মুখ্য বিরোধী নেতাও নন। গেল বছরে বিলেতে নির্বাচন হয়েছে দুবার—একবার ফেব্রুয়ারিতে, আর একবার অক্টোবরে। দুবারই জিতেছে শ্রমিকরা, হেরেছে টোরিরা। মুখ্য বিরোধী নেতা হয়েছিলেন হীথ দুবারই। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে নেতা পালটেছে টোরিরা, কপাল ভেঙেছে হীথের।

বিলেতে মুখ্য বিরোধী নেতা আর ছায়া প্রধানমন্ত্রী এখন শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার। টোরিরা তাঁর হাতেই দল সামলাবার ভার তুলে দিয়েছে ১১ ফেব্রুয়ারী। শ্রীমতী থ্যাচারও কিন্তু নিতান্তই একজন সাধারণ মেয়ে, তাঁর বাবা ছিলেন মুদীখানার মালিক। সেই দোকান-বাড়ির দোতলাতেই তিনি প্রথম দুনিয়ার আলো দেখেন। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ভালো। জলপানি পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়েছেন। রসায়নে তিনি এম এ। তারপর আইন পাস করে ব্যারিস্টারও হয়েছেন। বছর কয়েক ব্যারিস্টারিও করেছেন। নির্বাচনে প্রথম তিনি নামেন ১৯৫১ সনে। হেরে গেলেও তিনি কিন্তু হাল ছাড়েননি। আট বছর পরে লণ্ডনের শহরতলী ফিঞ্চলে থেকে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন প্রথমবার। সেই থেকে ও কেন্দ্রটি তাঁরই দখলে আছে। ১৯৭০ সনে হীথ তাঁকে শিক্ষা আর বিজ্ঞান দপ্তরের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বেশ কাজ চালিয়েছেন [illegible]। অর্থনীতি তিনি বোঝেন ভালো—বৈষয়িক নীতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা তিনি অনেক করেছেন।

টোরি দলে যে নতুন হাওয়া বইছে তারই ঝাপটা দলের চূড়োয় তুলে দিয়েছে শ্রীমতী থ্যাচারের মতো একজন গৃহকর্ত্রী নিম্ন [illegible] মধ্যবিত্ত পরিবারের [illegible] মেয়েকে। আগের দিন থাকলে ও সম্মান পাবার কোনও সুযোগই তাঁর থাকতো না। এক তো অভিজাত-কোটিপতিদের দল টোরি তার ওপর তাদের চিন্তাভাবনা এখনও সাবেকী। রাজনীতি তাদের কাছে পুরুষদের পেশা—মেয়েরা সেখানে তাদের মতে বেমানান। যুগের দাবি মেনে নিয়ে দু-দশ জনকে তারা নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে, কাউকে কাউকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁইও দিয়েছে, কিন্তু দলের নেতৃত্ব তাদের কারুর হাতে তুলে দেবার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। টোরি দলের মোড়লদের প্রত্যয় নির্বাচনে হারুক আর জিতুক শাসক দল হচ্ছে একমাত্র টোরি দলই, দেশ শাসনের অধিকার তারা জন্মসূত্রে পেয়েছে। রাজার দল তারা দেশেও বিদেশেও। তারা মনে করে রাজনীতি একটা পুরুষালি আর্ট, ওতে পুরুষদের একচেটে অধিকারই দরকার। নইলে বিদেশী ফিচেলদের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারা যাবে না। টোরি রাজনীতিকদের ক্লাবেও মেয়েদের ঠাঁই নেই।

তবুও যে থ্যাচার নেতা বাছাই পর্বে জিতে গেছেন সেটা একটা অঘটন বইকি। এটা অবিশ্যি দুনিয়াতে মেয়েদের বছর। তাই ভেবে খাতির করে শ্রীমতী থ্যাচারকে টোরিরা তাদের প্রধান বাছাই করেছে এমন ধারণার কোনও কারণ নেই। রীতিমতো লড়াই করে তাঁকে জিততে হয়েছে। সে লড়াই ছিল কাঠে কাঠে—কেউ কাউকে রেয়াত করেনি। আগে টোরিদের নেতা পছন্দ করা হতো করতেন দলের কেষ্ট-বিষ্টুরা। তাঁরা পাঁচজনে গোপনে শলাপরামর্শ করে নেতা ঠিক করতেন, তাঁকে অনুরোধ জানাতেন দলের কাণ্ডারী হবার জন্যে আর নেতা 'তথাস্তু' বলে তাঁদের কৃতার্থ করতেন। দলের সভায় সে নির্বাচন মঞ্জুর করিয়ে নিতে কর্তাদের কোনও বেগ পেতে হতো না—সে নির্বাচন ছিল নেহাতই একটা মামুলি ব্যাপার। এখন দিন কাল পালটেছে, টোরিদের হালচালও। দলের সংবিধান বদলে গণতন্ত্রী প্রথায় নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুসারে নির্বাচন হলো এই প্রথম। আর তার ফলাফল দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে গোঁড়া মুরুব্বিদের। হীথের ওপর দলের লোকের ভক্তি চটে গেছে এ কথা তারা জানতেন না এমন নয়। কিন্তু তাঁর যে নেতাগিরির পালা ফুরিয়ে এসেছে, এতটা তারা ভাবেননি। ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত হীথই রয়ে যাবেন।

নতুন নিয়ম হয়েছে টোরি পার্লামেণ্টারি দলের যিনি নেতা হবেন তাঁকে অর্ধেকের বেশি সদস্যের ভোট পেতে হবে—তার ওপর [illegible] ১৫ শতাংশ ভোটের তফাত থাকা চাই তাঁর আর দু নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। পয়লা চোটে কেউ না জিতলে [illegible]র এক দফা নির্বাচন হবে। তাতেও নিষ্পত্তি না হলে চূড়ান্ত নির্বাচন হবে আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে। সেবারও এক দানে ফয়সালা না হলে যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাবেন তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর ভোট ভাগ করে দেওয়া হবে অন্যদের। এমনি করে শেষ পর্যন্ত যাঁর ভাগের ভোট সবচেয়ে বেশী হবে তিনিই হবেন দলের কাণ্ডারী পার্লামেণ্টে। এবারের নির্বাচনে গোড়ায় প্রার্থী ছিলেন তিনজন—এডওয়ার্ড হীথ, মার্গারেট থ্যাচার আর হিউ ফ্রেজার। ফ্রেজার পেলেন কুল্লে ১৬টা ভোট, হীথ ১১৯টা আর থ্যাচার ১৩০টা। থ্যাচার জিতে যেতেন আরও ৯টা ভোট পেলে। তা পাননি বলে পয়লা দফায় ফয়সালা হলো না—দরকার হলো আর এক দফা নির্বাচনের। হীথ কিন্তু আর লড়তে রাজী হলেন না, সরে দাঁড়ালেন নির্বাচনী বাজি থেকে। তখন আসরে নামলেন দলের চেয়ারম্যান হোয়াইটল। হীথের মন্ত্রিসভায় তিনি হয়েছিলেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সচিব, খানিকটা এলেমও দেখিয়েছিলেন তিনি সে ব্যাপারে। লোকে ভেবেছিল জিতবেন এবার তিনিই। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জিতলেন এবারও থ্যাচার ১৪৬ ভোট পেয়ে, হোয়াইটল পেলেন মোটে ৭৯। বাকী তিনজনের অবস্থা আরও শোচনীয়—দুজন ১৯ করে, একজন ১১।

দুনিয়াতে হইচই পড়ে গেছে উনপঞ্চাশ বছরের ঘরণী মেয়েটিকে নিয়ে। এই প্রথম বিলেতে সুধু কেন পশ্চিমী দুনিয়ায় একজন মেয়ে বড়ো একটা দলের কাণ্ডারী হলেন। এখন বিলেতে যদি নির্বাচন হয় আর টোরিরা জেতে তা হলে তিনি হবেন প্রথম মহিলা-প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু [illegible] কী হবে? টোরিদের এখন খুব [illegible] অবস্থা। হীথকে তারা বুঝে-সুঝেই [illegible] দিয়েছে এই ভেবে যে তিনি থাকলে শ্রমিকদের হারাবার কোনও ভরসা নেই। তারা চায় দলে পরিবর্তন। পরন্তু গেলে আনকোরা নতুন একজনের হাতে দলের ভার তারা সঁপে দিয়েছেন। অদৃষ্ট নিয়ে জুয়া খেলেছে। কিন্তু এর ফল কী দাঁড়াবে? শ্রীমতী থ্যাচার মেয়ে বটে কিন্তু মোমের পুতুল নন। তাঁকে তো অনেকে বলে বাঘিনী। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করবেন না। হীথের নরম নীতি তাঁর পছন্দ নয়। তিনি চান মধ্যবিত্তের মনের মতো করে দলকে গড়ে তুলতে যাতে সমাজতন্ত্রের বাড়াবাড়ি রোখা যায়। তিনি উদারতার ধার ধারেন না—মধ্যপথেরও নয়, রক্ষণশীল পথই তাঁর পছন্দ। কিন্তু তাতে কী শ্রমিকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে আনা যাবে? মধ্যবিত্তরা যদি বা তাঁর দিকে ঢলে পড়েন আর খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ তো আর তাঁকে বন্ধু বলে মনে করবে না।

আষাঢ়ের এপারে ওইপারে

বিষ্ণু দে

প্রত্যহ এ দিনকাটাও-বাদ মুমূর্ষার স্বাদ মুখে আনে।

ঘুমন্ত সাগরে নীলস্বপ্নোত্থিত ইউটোপিয়ায়
আর থেকে থেকে আচম্বিতে জাগরণে
যেন এক বেঘোর নৈরাশ।

কোনো আশার সন্ধানে সামগানে যদিবা জিরায়
জাগ্রত সত্তার ভাষা দেহেমনে সদ্য সারস্বত লাস্যে,
পাণ্ডুর ভোরের ব্যাপ্ত লাল আলো শুচি হাস্যে
ছুড়ে দেয় ভাড়াকরা ঘরে আরেক সংজ্ঞাতে
আমাদের মৃত্যুহীন দৈনিক প্রভাতে।

হয়তো কখনো—বস্তুত প্রায়ই—কারো মনে হয়
আবার সারাটা দিন সেই পাপপুণ্যক্ষয়!
আর নইলে পকেটে বা ব্যাংকে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।

হ্যাঁ, রোজ না হোক্, প্রায়ই প্রাণধারণের গ্লানি
ক্লান্ত করে, তাই আত্মপ্রকাশের বাণী
কণ্ঠাগত যদি হয়,—তাও ব্যর্থ নয়।
তবু যেন সূচিকাভরণ
আজীবন আমরণ সদ্যসূর্যে আকাশে জাগায় মৃন্ময়ে চিন্ময়।

আর রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী বিরাট দৃষ্টি
দেখা যায় চতুর্দিকে এখানে ওখানে মনে মনে,
ভুবনডাঙার মাঠে ব্যাপ্ত রৌদ্রে কোপাইতে বৃষ্টিজলে
চতুর্দিকে যথার্থই নানা মোল শিলাইদায় শান্তিনিকেতনে।

কি উত্তর কি দক্ষিণ অয়নের এই ধীর এই ক্ষিপ্র
প্রান্তরের সূর্যোদয়ে আলাপে বিস্তারে,
শহরের ভাঙাচোরা ঘরে, সমতলে পাহাড়ে বা গ্রামে
তেপান্তরে অটল পাহাড়ে অক্লান্ত নির্ভয়
সঙ্গীতের অন্তরস্থ ইতি-প্রত্যয়ের দেহে-মনে
এই দীপ্র এই স্নিগ্ধ দীপকে মল্লারে
আষাঢ়ের এপারে ওপারে
বৈশাখীতে আগামী শ্রাবণে ॥

ও দু'টি হাতের সুরভি
মাধুরী হবে চিরসাথী
ফরএভার
পারফিউম
SPREE
Forever
PERFUME
F.P.G I 81

যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ১৯৭৩ সনের ৩১ জানুয়ারি। ওই বছরটি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর বছর। ইন্দো ইটালিয়ান সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীরবি উদাসীনের (যিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাবার সময় কবির একান্ত সচিব ছিলেন) প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের সন্নিকটস্থ নতিবপুর গ্রামে ওই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রাজা রামমোহন ও যুবরাজ দারাশীকুহ্‌র উদার সহনশীল সমন্বয়ধর্মী কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ওই সভার সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু। ওই আলোচনা সভার জন্য এই প্রবন্ধটি রচনা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাক্তার মহম্মদ আব্দুল ওয়ালীর বিশেষ অনুরোধে এবং আলী সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়বার দায়িত্বও ডাক্তার ওয়ালীর উপর ন্যস্ত করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারী সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিন ডাক্তার ওয়ালী এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে দিয়েছেন। এই রচনার বৈশিষ্ট্য এবং বৈদগ্ধ্য অনস্বীকার্য। প্রবন্ধটি প্রকাশের সুযোগ পাওয়ায় ডাক্তার ওয়ালীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব যেরূপ কোনো এক শুভদিনে আপাদমস্তক নির্মিত হয়নি ঠিক সেইরূপ তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব হঠাৎ একদিন জন্মগ্রহণ করেনি। গ্রীক রোমান ঐতিহাসিকরা যে-সব জাতির সংস্পর্শে আসেন তাঁদের ধর্মের বিবরণও অল্পবিস্তর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এসব বিবরণের অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। আর এঁদের ভিতর যাঁরা নাস্তিক ছিলেন তাঁরা নানা ধর্মের বিবরণ দেবার সময় সব কটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেরটাকেও ব্যত্যয় দেননি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির স্থলে কেরিকেচার এঁকেছেন। তথাপি যে পদ্ধতির গ্রন্থই হোক না কেন, এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো বিশেষ ধর্মের বা একাধিক ধর্মের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও অসম্ভব।

খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার ফলে গ্রীক, রোমান তথা ইয়োরোপীয় অন্যান্য ধর্ম লোপ পায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ধর্মের বিবরণ লেখার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। আজ যাঁরা জানতে চান, গ্রীক, রোমান, ট্যুটনদের ধর্ম প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের তন্ন তন্ন করে গ্রীক ও রোমানদের সর্বপ্রকারের রচনা পড়তে হয় এবং সেখান থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর সন্ধান নিতে হয় প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের কোন্ কোন্ আচার অনুষ্ঠানে এরা নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশ করেছে, কিংবা খৃষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুশাসন উপেক্ষা করে নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণ নিজেদের প্রাক খৃষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান নূতন ধর্মে কিভাবে এবং ইয়োরোপের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রবর্তন তথা সংমিশ্রণ করেছে—এইসব তাবৎ তথ্য প্রভূত পরিশ্রম তথা গভীর গবেষণা দ্বারা সঞ্চয় ক'রে তবে খৃষ্টধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভবে। আজ যে-রকম ভারতীয় চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন পুনর্নির্মাণ করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম।

সপ্তম শতাব্দীতে নবজাত ইসলামের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সংঘর্ষের ফলে একে অন্যের [illegible] তীব্রতম কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাধ্য হয়ে অনেকখানি সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হল কারণ পবিত্র কুরানে খৃষ্টকে আল্লার প্রেরিত-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুসেডের নৃশংস যুদ্ধ সত্ত্বেও দুই ধর্মের গুণীজ্ঞানী একে অন্যের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন পদার্থ-বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করলেন ও পরবর্তী কালে আরব দর্শন শাস্ত্রের লাতিন অনুবাদ ইয়রোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করলো। এবং এ-স্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে আরব (ও পরবর্তী কালে ইরানের) সুফীপন্থা (ভক্তিবাদ ও রাজযোগের সমন্বয়) খৃষ্টীয় মিস্টিজিম বা রহস্যবাদের সঙ্গে বারম্বার নিবিড় সংস্পর্শে এল এবং ফলে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারিত করলো। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, ইতি-মধ্যে ভারতীয় রহস্যবাদ আরব সুফীতত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এ-স্থলে স্পেনবাসী আরব ধর্মপণ্ডিত ইবন্ হজম-এর উল্লেখ করতে হয়। তিনি

ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম নিয়ে অতি গভীর আলোচনা করেন, কিন্তু পুস্তকখানা যদিও বহু বহু স্থলে অমূল্য রত্ন ধারণ করে, তবু পূর্ণ পুস্তক পক্ষপাতদুষ্ট। ইবন্ হজমের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সপ্রমাণ করা : ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এবং শুধু তাই নয়, ইসলামে যে শতাধিক শাখা-প্রশাখা বহুবিধ সেক্ট্, স্কুল্স্ আছে, তার মধ্যে তিনি নিজে যেটিতে জন্মগ্রহণ করেন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট বটে ও সর্বগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

এক হাজার বছর পূর্বেকার, গজনীর বাদশা মাহমুদের সভাপণ্ডিত আল-বীরুনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যদিও তিনি মূলত তাঁর "ভারতের বিবরণ" গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, তার নানা শাখা প্রশাখা, আচার অনুষ্ঠান, কুসংস্কার কিংবদন্তীর বয়ান দিয়েছেন এবং যেহেতু ভারতীয় ধর্মমাত্রই কোনো না কোনো দর্শনের দৃঢ়-ভূমির উপর নির্মিত, তিনি তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সাতিশয় নৈপুণ্যসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং স্থলে স্থলে ইসলামের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রতিমা-নাশক, কট্টরতম মুসলমান মাহমুদের সভা-পণ্ডিত কোনো স্থলে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনো মতবাদ বা আচারের প্রতি দৈবাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করলে সেটা যে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় উপকারী হত না সেটা সে যুগের রাজ-জহ্লাদ ভিন্ন অন্যজনও নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। তৎসত্ত্বেও পরম আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইসলামের প্রতি সরল অনুরাগ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রশংসনীয় দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কোনো কোনো নিন্দনীয় আচারের কারণ দেখিয়েছেন। পাঠক মাত্রই সহজে প্রত্যয় করবেন না, যে-মাহমুদ হিন্দুর প্রতিমা ভঙ্গ করাটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরই সভাপণ্ডিত আভাসে ইঙ্গিতে এবং তুলনার সাহায্য প্রতিমা পূজার পিছনে যে হেতুটি রয়েছে সেটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। এ-স্থলে জরাজীর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করি : মক্কা গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, অথচ হজ পালন করা যখন তার একমাত্র অবশিষ্ট কাম্য সেই অর্ধমৃতজনকে যদি কেউ মক্কার একখানা ছবি দেখায় তবে কি তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে না; অশ্রুজল দুই চক্ষু সিক্ত করবে না, কম্পিত কলেবরে সে হজকামী ছবিখানাকে হয়তো বারংবার চুম্বন দিতে আরম্ভ করবে এবং হয়তো বা যুক্তিতর্কের বিধান বিস্মৃত হয়ে সেই অতি সাধারণ জড় কাগজখণ্ডকে অলৌকিক দৈবশক্তির আধার বলে সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে। অতএব যে স্থলে কলায় সুনিপুণ শিল্পী বহুমানবের ধারণা সাধনাকে মৃন্ময়রূপ দিতে সক্ষম হন, সে-প্রতিমার সম্মুখে কি সাধারণ মানুষ নতজানু হবে না? অবশ্য গোড়াতেই আল বীরুনী প্রতিমা পূজার প্রতি আপন বিরাগ প্রকাশ করেছেন। এ স্থলে স্মরণীয় যে অস্মদ্দেশীয় বহু বেদান্তবাগীশ তথা ব্রহ্ম সমাজ প্রতিমা-পূজা সমর্থন করেন না। অন্যান্য অনেকেই এ-মার্গকে নিম্নস্তরে স্থান দেন।

পাঠান যুগে যদিও নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি চিশ্তী সম্প্রদায়ের সুফী ভাবাপন্ন সাধুগণ অতিশয় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে যে-কোনো ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁদের শিষ্য হতে পারতো, তথাপি ব্যাপকভাবে উভয় ধর্ম নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা হয়েছে বলে এ অক্ষম লেখকের জানা নেই। তবে নিজামউদ্দীনের শিষ্য ও, সখা সুকবি আমীর খুসরৌ ভারতের

চলিত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

পাঠান রাজবংশ ভারতে বাস করার ফলে ক্রমে ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে ছিলেন। তাঁদের তুলনায় সে যুগের মোগলদের বর্বর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাবুর অসাধারণ মেধাবী, বহুগুণধারী পুরুষ। কিন্তু যদিও তিনি তাঁর রোজনামচায় ঘন ঘন আল্লাতালার নাম স্মরণ করেছেন সেজন্য তাঁকে সত্য ধর্মানুরাগী মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না (ইংরেজ প্রতিদিন পঁচিশ' বার "থ্যাঙ্ক্যু" আওড়ায়: অতএব তার কৃতজ্ঞতাবোধ, উপকারীর প্রতি তার আনুগত্য আমাদের চেয়ে পাঁচ শ' গুণে বেশী এহেন মীমাংসা বোধ হয় সমীচীন হবে না)। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-নিন্দিত একাধিক ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত তিনি তো ছিলেনই, তদুপরি যুদ্ধ জয়ের পর তিনি যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ইসলামের মূল সিদ্ধান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করে উৎপীড়ন, বর্বরতম পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সমাপন করেছেন সে-সব তিনি সগর্বে নিজেই আপন রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বস্তুত এক কথায় বলা যেতে পারে, ইসলামে দীক্ষিত বাবুরাদি তুর্কমান (মোগল নামে এদেশে পরিচিত) ইসলাম সেভাবে গ্রহণ করেনি বাঙলাদেশের মুসলমান যেরকম হৃদয় দিয়ে করেছে। আর মোগল রাজাদের ভিতর এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন স্বধর্ম ইসলামের প্রতি উদাসীন একাধিকজন সিনিক এবং প্রায় সকলেই কি ইসলাম কি হিন্দুধর্ম সব ধর্ম ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য।

হুমায়ুনের জীবন এতই সংগ্রাম বহুল যে তিনি অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করতে পারেননি। আপন যুবরাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইলেন তাঁরই চোখের সামনে।

নিরক্ষরজন যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনো আপ্ত বাক্য নেই।

নিরক্ষর জন সম্বন্ধে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাস করেনি তাই কোন পুস্তক উত্তম আর কোনটা অধমাধম, কোনটা সত্য আর কোনটা নিছক বুজরুকী, এক কথায় তার মূল্যায়ন-বোধ বিকশিত হয় না। তারই ফলে দেখা যায় নিরক্ষরজন সাধারণত আপন স্বার্থের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনো বাবদে বিশেষ কৌতূহলী নয়। পক্ষান্তরে এটাও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনো কোনো নিরক্ষর জনের বিধিদত্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী উত্তম অধম নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করেনি। ফলে তার মূল্যায়ন বোধ যথোপযুক্তরূপে বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

আকবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের সর্বপ্রধান সনাতন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, দুই ধর্মের শাখাপ্রশাখা, এবং হিন্দু মুসলমান সাধুসন্ত সর্বধর্মের মিলন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে-সব "পন্থা" প্রচার করেছেন এগুলোর কোনো একটা সমন্বয় না করতে পারলে সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যে কোনো দিন মোগল বংশ সিংহাসনচ্যুত হতে পারে। অতএব আহ্বান জানালেন, সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এমন কি যে-জৈনদের সংখ্যা ভারতে নগণ্য এবং সে-যুগে তারা প্রধানত গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড় ও মারওয়াড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁদেরও প্রধানতম জৈন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অতি সুন্দর ভাষায় জৈনধর্মের মূল সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে জীবে দয়া সম্বন্ধে আম-দরবারে বক্তৃতা দিয়ে মগ্ন আকবর সভাজনকে মুগ্ধ করলেন। ওদিকে আকবর ছিলেন ছিদ্রান্বেষী তথা "ইন-সাইড স্টোরি" জানবার জন্য মহা কৌতূহলী এবং তিনি জানতেন, হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ভাব আছে। রাত্রে ডেকে পাঠালেন হিন্দু পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, "জৈন গুরু যে এত সম্প্রচার করলেন তাঁকে শুধোবেন তো মহারাজ, এ-প্রবাদটির অর্থ কি

"হস্তীনাম তাড়্যমানোপি ন গচ্ছেজ্

জৈন মন্দিরম্

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও জৈন মন্দিরে
(বা গৃহে) প্রবেশ ক'রো না'।"

আকবর পরদিন প্রশ্নটি শুধানোর পর জৈন গুরু মৃদু হাস্য সহকারে বললেন, "আমি যদি উত্তরে বলি
'হস্তীনাম তাড্যমানাপি ন গচ্ছে
(শৈব) মন্দিরম্ ১

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও শৈব মন্দিরে (বা শৈবের গৃহে) প্রবেশ করো না।' তা হলে ছন্দ পতন হয় না, অর্থও তদ্বৎ—শুধু জৈনের পরিবর্তে শৈবের কুৎসা করা হয়। বিদ্বেষপ্রসূত এ-সব প্রবাদের কোনো সত্যমূল্য নেই।"

আকবর রাজনৈতিক কারণে, নিজ স্বার্থে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর স্বয়ং একটি নবীন 'ধর্ম' প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন "ইসলামের হজরৎ নবী ছিলেন নিরক্ষর, আমিও নিরক্ষর। তদুপরি আমার হাতে রাজদণ্ড। আমা দ্বারা এ-কর্ম সফল হবে না কেন?" সে যা-ই হোক, তিনি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ সন্ধানীজন নন। তবে এ-কথা অতি সত্য যে তিনি সর্বধর্মের সর্বগুরুকে বাদশাহী নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজদরবারে আসন দেওয়ার ফলে ধর্ম বাবদে মোগল রাজসভা অনেকখানি সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে যায়, এবং পরবর্তীকালে "সর্বধর্মজিজ্ঞাসা"র পন্থাটি সুখগম্য করে তোলে।

জাহাঙ্গীর সর্ব বিষয়েই ছিলেন উদাসীন—যা অত্যধিক মদ্যাসক্তজনের প্রায়শ হয়ে থাকে।

শাহজাহানের মতিগতি বোঝা কঠিন। সুবৃহৎ লালকেল্লাতে কত না রঙমহল, কত না হাম্মাম, সম্পূর্ণ একটি হট্ট, কত না নিষ্কর্মা এমারৎ, নহবৎখানা, বন্দীশালা, এবং দুই বিরাট সভাগৃহ। অথচ বেবাক ভুলে গেলেন (?) দুর্গবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার জন্য একটি ছোটা স ছোটা মসজিদ বানাতে। দিল্লীর দারুণ গ্রীষ্ম এবং নাকে মুখে আঁধির ধুলো খেতে খেতে তাদের দ্বিপ্রহরে যেতে হত জামি মসজিদে! দিল্লীর কাঠ-ফাটা শীতের রাত্রে এশার নমাজ পড়তে!

তা সে যাই হোক, তিনি অদ্ভুত একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন তাঁর চার পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এক পুত্রকে স্পেশালাইজ করালেন রণকৌশলে, অন্যকে সঙ্গীতাদি চারুকলায়, কনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবকে ছেড়ে দিলেন কট্টর মোল্লাদের হাতে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ দারা শীকুহকে শেখালেন সর্বধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন।

*

সর্বধর্ম চর্চা করার জন্য মোল্লাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আকবর যে-পথ সুগম করে দিয়ে সর্বধর্মগুরুকে রাজসভায় ডেকে এনে বসিয়েছিলেন সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম পুরুষ পুরুষ ধরে ছিল অনাবৃত অব্যাহত। দারা স্বয়ং সে পথ দিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, আকবরের কালে মৌলভী সাহেব সভাস্থলে প্রচা করতেন ইসলাম, হিন্দু পণ্ডিত প্রচা করতেন হিন্দুধর্ম, যে যার আপন ধর্ম দারা সম্মুখে আদর্শ ধরলেন সর্বশাস্ত্র মূ ভাষাতে অধ্যয়ন করে—ব্রাহ্মণ সন্তান রকম সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, মুসলিম সন্ত যে-রকম আরবী ভাষা আয়ত্তে আনে—তি একাই যেন সর্বধর্মের মুখপাত্র হ পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি কি আমাদের মনে যেন কোনো দ্বন্দ না থা দারা কোনো নবধর্ম প্রবর্তনের উ নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা তথা অনুবাদ লিপ্ত হননি। আকবর যে পদ্ধতিতে অ হয়েছিলেন সেটা দারার মনঃপূত হ আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলো সিদ্ধান্ত, গুলো ঐ ধর্মের প্রত্যেককে বিনা যুক্তি মেনে নিতে হয় অর্থাৎ ডকট্রিন, শি এবং ঐ ধর্মের অবশ্য করণীয় অ অনুষ্ঠান—রিচুয়াল এ-দুটি অংশের দিলেন প্রধান জোর; ডকট্রিন এবং রিচু অতঃপর আকবার সর্ব প্রধান প্রধান সর্ব ডকট্রিন ও রিচুয়াল সংগ্রহ করে করে দেখলেন এর কোন কোন এ-দেশের জনসাধারণে প্রচলিত ও জনগ্রাহ্য হয়েই আছে, কোন্ কোন্ আপন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও সে লোক ঐগুলো আপত্তিজনক বলে করে না এবং কোন্ কোনগুলো ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এমন বি পাত পর্যন্ত ঘটিয়েছে। বিচার বি পর তিনি তাঁর নবীন ধর্মে এমন ডকট্রিন্ ও রিচুয়েল নি যেগুলে ধর্ম গ্রাহ্য হয়েই অ এবং হওয়ার সম্ভাবনা ধরে।

দারা এ-পথ নিলেন না। তিনি করে দেখালেন, প্রত্যেক ধর্মের কয়েকজন গুণী আপন আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেত অল্পসংখ্যক ধর্মানুরক্তজনের ভিতরে বদ্ধ থাকলেও সেগুলি প্রাণবন নৈমিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সম্পদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুগ্ধ হলেন হিন্দুর উপনিষদের প্রবেশ করে। তসওউফ বা সুফ তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব বিশ্বাস রাখতেন—ইসলামের অধ্যয়ন করার পর। এবং নিশ্চয়ই হয়েছিলেন যে, দুই সাধনার সম্মিলিত হয়েছে একই সিদ্ধান্তে। উপনিষদ-সাধনা পুস্তকের নামকরণ ছিলেন মিবাসিন্ধু মিলন—মজমা বহরেন। সে-যুগে দুই ভিন্ন

---

১ অধমের সংস্কৃত জ্ঞান এতই অল্প যে তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করি। বানানে নিশ্চয়ই একাধিক ভ্রম আছে। পাঠক নিজ গুণে শুধরে নেবেন। কাহিনীটিও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছি।

সাধক একান্তে বসে ধর্মালোচনা করতেন না—বস্তুত আপন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিশেষ ভাষা হয় সেটা অন্য জনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবোধ্য।

দারার আশা ছিল, উপনিষদ সমূহ ফার্সী ভাষাতে অনুবাদ করলে মুসলিম তত্ত্বজ্ঞানী সুফী উজালে 'ইউরেকা' শব্দ দ্বারা 'আপন' আবিষ্কারজনিত হর্ষ প্রকাশ করবেন।

দারার বিশ্বাস ছিল ঃ যদিও আপাত দৃষ্টিতে হিন্দুর পুরোহিত তথা মুসলমানের মোল্লা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন তথাপি তাঁদের মূল উৎস দুই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী যারা তারাই।

মুসলিম সুফী একবার হিন্দুর উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ও হিন্দু ব্রহ্মবাদীর মধ্যখানে তো কোনো অন্তরাল থাকবে না—কুৎসা কলহের তো কথাই ওঠে না। ফলে এঁরাই পুরোহিত মোল্লাদের যে নূতন অনুপ্রেরণা দেবেন তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাশ্বত মিলন স্থাপিত হবে।

নিয়তি দারাকে আপন কর্ম সমাপ্ত করতে দিলেন না। নইলে তিনি যে হিন্দুর বিচিত্র সব মণিমানিক্য মুসলমানের সামনে এবং মুসলিম জওহর-জওয়াহির হিন্দুর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে তুলে ধরতেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতেরই নিয়তি, বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলেন না, শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল তো মাত্র বত্রিশ, চৈতন্যের বিয়াল্লিশ। রামমোহন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি হাত দিলেন একই সময়ে সর্বকঠিন দুটি কর্মে যার একটাই যে-কোনো কালের যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে নিঃশেষ করে দেয়— ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার যুগপৎ! তদুপরি তাঁকে ইচ্ছা অনিচ্ছায় আরো বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়; সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, পাদ্রী মোল্লাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁর কাল ক্ষয় হয় প্রচুর।

দারা ও রামমোহনের উভয়েরই শিক্ষার বাহন ফার্সী, সংস্কৃত এবং আরবী। দীক্ষা দুজনার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু উভয়েই মিলিত হয়েছিলেন উপনিষদের একই সিন্ধুতে। অতএব দারার গ্রন্থ 'মজ্‌মা উল-বহ্‌রন' এই উভয় সাধকের বেলাও প্রযোজ্য। অপিচ রামমোহনের ফার্সীতে লিখিত প্রথম কেতাব 'তুহফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন'—'একম এবং অদ্বিতীয়ম বিশ্বাসীজনের প্রতি সওগাৎ যদি কাউকে উৎসর্গ করতে হয় তবে রাজার সঙ্গে একই তীর্থের যাত্রী রাজপুত্র দারাকে। রামমোহনের প্রথম পুস্তক ফার্সীতে এবং দারার পুস্তকও ঐ ভাষায় এবং উভয়ের পুস্তকের শিরোনাম আরবীতে। দুজনাই পুস্তক লিখেছেন মুসলমান সাধকের উদ্দেশ্যে। দারা আপন বক্তব্য বলেছেন উপনিষৎ মারফৎ, রামমোহন তাঁর যুক্তিতর্ক সঞ্চয় করেছেন ইসলামের ভাণ্ডার থেকে। দুই পুস্তকই ধর্ম ও দর্শনের সংমিশ্রণ। আরো বহু ক্ষেত্রে দুজনার ঐক্য, একাত্মবোধ ধরা পড়ে—শুধু লক্ষ্যবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী তাই নয়।

মোটের দিক দিয়ে দেখলে যে-সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেটি বিস্ময়কর। কেউই কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করেননি, করতে চাননি।

দারা এবং রাজা সম্বন্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরে যে-সব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, শতাংশের একাংশ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। গ্রহচক্রে আমি সে মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই এই রচনায় বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ অনিবার্য। তবু কেন যে বার্ধক্যে এই অর্বাচীনসুলভ অপকর্ম করলুম সে-তত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন পাঠককে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখকের ভুলভ্রান্তি তার অজ্ঞতাজনিত হলে সে অকৃপণ হস্তে হস্তাবলেহের কর্ণমর্দন করার সময় আলো কর্ণপাত করে না—বেচারা লেখকের ওজুহাত-অজুহাত তথা করুণ কণ্ঠে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষার প্রতি॥

৩০।১।৭৩

নীচের কুপনটি কেটে নিন।

ইংরিজিতে আপনার নাম ও ঠিকানা ভরে এটি কুপনে দেওয়া ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দিন। তাহলে আপনি একটি স্পেশ্যাল ডিসকাউন্ট ভাউচার পাবেন। এই ভাউচারটি নিয়ে আপনার ডীলারের কাছে গেলে তিনি আপনাকে হ্যালো ভেইল অব লাভ ট্যাল্কের একটি ইকনমি সাইজ প্যাক দেবেন—নির্ধারিত দামের চেয়ে ১.৫০ টাকা কম দামে!

এই অভিনব উপহার কেবল সীমিত সময়ের জন্যে। কাজেই শিগগির করুন, আজই আপনার কুপনটি ডাকে পাঠিয়ে দিন।

COUPON

To
Halo Veil of Love Talc D.O.
C/o Colgate-Palmolive (India) Pvt. Ltd.
4, Canal West Road, Calcutta 700 015.

D

Dear Sirs,
I would like to have my Halo Veil of Love Talc discount voucher sent to :

Name ________________

Address ________________

বকুর নিজস্ব বাড়ি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

অলোকের কেন জানি না মনে হল বকু বাড়িতে নেই। শীতকাল চলে যাবার আগে হাড় কাঁপানো হাওয়া পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে হাওয়া এখন কলকাতার ভৌগোলিক পরিসীমাকে নাস্তানাবুদ করতে তৎপর। অলোকের মাথা ও গলা ফাঁকা, কান উন্মুক্ত সে টের পেল নির্ঘাৎ তার ঠাণ্ডা লাগছে। মাথা নিচু করে নিজের গায়ের দিকে চেয়ে দেখল তার গায়ে নীল রঙের হাফ স্লিভ সোয়েটার, পুরনো কালো প্যাণ্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। আঙুলের ফাঁকে হি হি করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। শীতকালের এই রাত ন'টায় বকুদের মামার বাড়িটা চুপচাপ। ওপরের সব জানলাগুলি বন্ধ। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। বিরল শব্দে বকুর মামার বাড়ি শান্ত। এখন এই মুহূর্তে কলিং বেল টিপে দরকার নেই। বকু সম্ভবত বাড়িতে নেই। কিংবা যদি থাকেও সে হয়তো দেখা করবে না। যদি দেখা করে তবে কি সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করবে না? কি ব্যাপার, আপনি? এত রাত্তিরে? অলোক তখন কি জবাব দেবে। অলোক কি তখন শুধু দাঁত বের করে হি হি করে হাসবে? তা ছাড়া আর কি। অলোকের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না ঠিক এই মুহূর্তে তার কি রকম জবাব মজুত রাখা উচিত। অলোক নিজের কাছে প্রশ্ন করলো—বকু বাড়িতে নেই এমন বিশ্বাস তার আসছে কি করে। নিজের কাছেই নিজে জবাব পেল। বিদ্রূপের সঙ্গে মন বলে উঠলো—কেন, আজ কি বার মনে নেই বুঝি? একটু আগে শ্যামেদের বাড়িতে সে রেডিয়োতে নাটক হচ্ছে শুনে এসেছে। আজ শুক্রবার। বকু মাসের মধ্যে একটা কি দুটো শুক্রবার কলকাতায় থাকে না। মা-বাবার কাছে আড়াই দিন কাটিয়ে আবার সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আসে। এইখানে, এই ছাইরঙের দোতলা বাড়িতে, মামার বাড়িতে। বকুর কাছে অলোক শুনেছে তাদের বাড়ি তমলুকে। এই প্রসঙ্গেই বকু একদিন বলেছিল, কি এমন দূর বলুন। তবু মনে হয়, মা বাবাকে ছেড়ে কত দূরেই না রয়েছি।

অলোক আবার বাড়িটার দিকে তাকালো। বাড়িটা শব্দহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বন্ধ দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে যা সামান্য আলোর ছিটে বাইরে এসে পড়েছে। সদরের কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলছে। অদূরের ল্যান্সডাউন রোড থেকে গাড়ির আওয়াজ কিংবা দেশপ্রিয় পার্কের স্টপে ট্রামের থামা ও ছেড়ে যাওয়ার ঘড়ঘড় শব্দ, কন্ডাক্টরের হাতের ঝাঁকুনিতে দড়ির প্রান্তে ঘণ্টির বেজে ওঠার শব্দ ভেসে আসে।

অলোক কলিং বেলের বোতাম টিপল। বেলটা সম্ভবত বাড়ির খুব ভেতরে। বোঝা গেল না তা বেজে উঠলো কিনা।

অলোক দাঁড়িয়ে রইলো সেইরকম চুপচাপ, হাওয়া এসে ছুঁড়ে দিয়ে গেল বিপজ্জনক শীতলতা। অলোকের নাকের ডগা, কানের লতি, হাতের আঙুল ঠাণ্ডা। দু'মিনিট ঐ রকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে আবার কলিং বেলের বোতাম স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় চটির শব্দ পেয়ে সে হাত সরিয়ে নিলো। কেউ একজন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন —কে। কি জবাব দেবে অলোক? আমি? আমি কে। চুপ করে থাকাই ঠিক। আলো জ্বলে উঠলো। কোলাপ্সিবল গেটের পরেই উঠোন। উঠোনে ভারি ভারি টবে কিছু ক্রোটন কিছু ক্যাকটাস। উঠোনের পরেই সিঁড়ির পাশে একটা বন্ধ ঘর। গায়ে কালো র‍্যাপার জড়ানো একজন গোঁপঅলা ভদ্রলোক চটিতে চটাস চটাস শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন 'কাকে চাই।' অলোক একটু থতমত খেয়ে গেল, অস্পষ্টভাবে বললো 'বকু আছে?' ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে উঠলো, বললেন, 'আপনি?'

অলোক বললো, 'আমরা এক সঙ্গে পড়ি, আমার নাম অলোক।' ভদ্রলোক এবার

পেছন ফিরে বাড়ির ভেতরের দিকে মুখ করে ডাকলেন, 'সুরো। সদরের চাবিটা দিয়ে যাও।' ঝি সুরো চাবি নিয়ে এলে ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। তারপর অলোকের দিকে চেয়ে বললেন, 'আসুন।' সিঁড়ির পাশের বন্ধ ঘরটির দরজা খুলে ভদ্রলোক আলো জ্বালালেন। অলোককে বললেন, 'আপনি বসুন। আমি বকুকে ডেকে দিচ্ছি।' ঘরে এলোমেলোভাবে কয়েকটি চেয়ার পাতা। সামনে একটা বিবর্ণ টেবিল। সাদা দেওয়ালে একটি নতুন বছরের ক্যালেন্ডার। বকু অবাক হতে পারে, আনন্দিত হতে পারে, রাগ করতে পারে, অপছন্দ করতে পারে। কারোর বাড়িতে কেউ কি এমন অসময়ে আসে, এমন রাত দুপুরে, তাও আবার যখন আসাটা এই প্রথম, হলোই বা ক্লাসমেট, কিন্তু বকু তো একজন আইবুড়ো মেয়ে, জন্ম ঊনিশশো তিপ্পান্নতে। বিস্ময় আনন্দ রাগ অপছন্দ ইত্যাদি বকুর মনে যাই জাগুক না কেন, অলোক আজ প্রসন্ন মনে সব মেনে নেবে। বকু এসেই বললো, সব জানলাগুলো বন্ধ কেন? বকু একটা জানলা খুলে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই দিকেই এসেছিলেন বুঝি?' বিস্ময় রাগ আনন্দ না অপছন্দ কোনটা এখন বকুর মন জুড়ে? বকুর মুখের দিকে তাকিয়ে অলোকের মনে হল চারটির সবগুলিই এখন কম বেশি বকুর মন জুড়ে। অলোক বললো, 'এখানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে?' বকু বললো, 'একটু দাঁড়ান।' দরজার কাছে গিয়ে চারদিকটা একবার দেখে এসে বললো, 'খান।' অলোক সিগারেট ধরাতে ধরাতে হেসে উঠলো, বললো, 'তোমার মামার বাড়ি বুঝি খুব কনজারভেটিভ। কই, তোমার মামাকে দেখে অতোটা মনে হল না তো।'

বকু বললো, 'মামাকে দেখলেন কখন?' অলোক নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'কেন, উনিই তো দরজা খুলে দিলেন।' বকু এবার হেসে ফেললো। বললো, 'ধ্যাৎ, উনি তো পানুকাকা।'

অলোকের ইচ্ছে হল এক্ষুনি ও চেনে নিক পানুকাকা লোকটিকে। অলোক কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানলো তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'কালীঘাট শ্যামের কাছে এসেছিলুম। ভাবলুম কাছেই তো, যাই তোমাদের বাড়ি।' ছন্নছাড়া একটা চেয়ারে বসে আছে অলোক। বিরল আসবাব আর ফাঁকা সাদা দেওয়াল নিয়ে ঘরটাকে বড় শূন্য মনে হল। ফাঁকা সাদা দেওয়ালে রামসীতার ছবিঅলা ক্যালেন্ডারটা একদম মানাচ্ছে না। বকু বসে আছে আর একটি চেয়ারে। তার বাদামি চামড়ায় অন্তত পাঁচটির বেশি পরিচিত তিল অলোকের চোখে পড়লো। খোলা জানলার বাইরে অন্ধকার এবং ঐ অন্ধকারের ভেতর থেকেই কখনো ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া. অলোক সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে ছেলেমানুষি করতে করতে বললো, 'আজ তো শুক্রবার। ভাগ্য ভালো তোমাকে পেয়ে গেলুম।' বকু অলস ভাবে হাসলো, জবাব দিলো, 'গত শুক্রবারে বাড়ি গিয়েছিলুম।'

অলোক বললো, 'এখন কি করছিলে?' বকু বললো, 'কি আবার করবো, রেডিয়ো শুনছিলুম।'

আধখানা সিগারেট মেঝেতে ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে চেপে অলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আজ যাই।' বকু বললো, 'এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারলুম না। এমন অসময় এলেন।' অলোক শুধু হাসল, বকু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'দাঁড়ান উঠোনের আলোটা জ্বালি।

বকুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অলোক খানিকটা এগিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকালো। অন্ধকারে কোলাপসিবল গেট ঝুলছে তালা। উঠানে টবে টবে ক্রোটন, ক্যাকটাস। নিচের ঘরটা কি অসম্ভব ফাঁকা। ছন্নছাড়া কয়েকটা চেয়ার আর একটা বিবর্ণ টেবিল। বকু থাকে কোন ঘরে। যেখানে রেডিয়ো শোনে, বই পড়ে, বালিশে মাথা রেখে ঘুমোয়, বকুর সে ঘর কেমন। শীতের আবহাওয়ার মধ্যে অলোক ঠকঠক করে কাঁপে, দু হাত পুরে দেয় পকেটে গলার বোতাম আটকানো।

নর্থ ক্যালকাটার একটা শান্ত গলির ভেতর অলোকদের বাড়ি। তাদের বাড়ির সামনে সিংহিদের বিরাট বাড়ির ভেতর একটা পুকুর আছে। ট্রামবাসের শব্দ বেশি রাত্তিরেই পাওয়া যায়। অলোক সেদিন ছাদে দাঁড়িয়েছিল। ছাদে একটাও ফুলগাছের টব নেই। খাঁ খাঁ। থাকার মধ্যে আছে মরা শুকনো একটা মনসা গাছ। মরচেপড়া ভাঙা লোহার টবে। বিকেলের আকাশ শান্ত। শীতের আকাশ। সামনের বাড়ির পুকুর ঘাট শূন্য, পরিত্যক্ত গোয়াল, বুনো গাছপালা,. জলের ওপর কচুরিপানার সবুজ চাদর। অলোকদের ছাদের দক্ষিণ দিকে গঙ্গাজলের ভাঙা ট্যাংক শুকনো, ভেতরে খড়খড়ে মাটি। তাদের বাড়ির কোনো ঘরে পর্দা নেই। তারা মেঝেতে আসন পেতে ভাত খায়। এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে উঠোনে। কলঘরে অন্ধকার। দিন-রাত্তির আলো জ্বালাতে হয়। বাড়িতে কত দিন রং পড়েনি। নিচের দেউড়িতে মিটারবক্সের চারপাশে ঝুল জমে আছে। অলোকের নিজস্ব কোনো ঘর নেই। একজোড়া স্যান্ডেল ছাড়া আর জুতো নেই। শীতের বিকেলের আকাশ থেকে আলো সরে যাচ্ছে। এই বিরাট আকাশের নিচে পৃথিবী। পৃথিবীর বিশালতার মধ্যে এই কলকাতাটা কত ছোট। সেইখানে থাকে দুজন দূরত্ব নিয়ে। কলকাতার দক্ষিণে বকু, উত্তরে অলোক। দোতলা বাসের ওপরতলায় জানলার পাশটিতে বসা অলোকের শখ। ভিড়ে-বাসে উঠে লাইনে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে তার টার্মের। জানলার
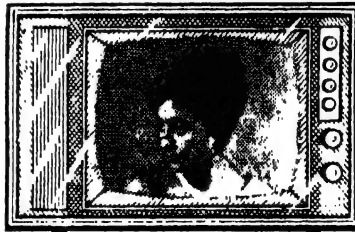
পাশে বসে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গত দু মাস যাবৎ সে কতবার ভেবেছে অচমকা রাস্তায় যদি বকুর সঙ্গে দেখা হয়। কথামতো দেখা হওয়ার চেয়ে এমন হঠাৎ দেখায় আনন্দ অনেক। নভেম্বরের মাঝামাঝি ক্লাস শুরু হয়েছিলো। আশুতোষ বিল্ডিঙের করিডরে একদিন নিজেই আলাপ করেছিল বকুর সঙ্গে। দুজনের একই সেকসন। প্রফেসর ক্লাস নিচ্ছেন। অলোক অপলকভাবে চেয়ে আছে বকুর দিকে। বকু মাথা নিচু করে নোট নিচ্ছে। আর যখনই বকু মুখ তুলছে তখনই তার কপালে চাঁদের মতো উজ্জ্বল টিপ প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে হইচই করে, কফি হাউসে আড্ডা দেয়, নুন শোয়ে সিনেমা দেখে। অলোক আর বকু দুপুর-বেলায় গোলদিঘিতে গিয়ে বসে। বকু বলে 'আপনি এই সাবজেক্ট পড়তে এলেন কেন?' অলোক প্রথম থেকেই বকুকে তুমি বলে। বললো, 'তুমি পড়তে এলে কেন?' বকু ঘাসের ভেতর থেকে একটা পায়রার পালক কুড়িয়ে নিতে নিতে বললো, 'আমি তো মেয়ে।' দিঘির পাড়ে গাছগুলি হাওয়ায় মাথা নাড়াচ্ছে। অলোক জিজ্ঞেস করে 'বকু, তোমার কি কোনো ছবি আছে?' বকু চোখ তোলে, বলে, 'আমার ছবির কথা শুনলে আপনি হাসবেন।' অলোক বললো, 'হাসবো কেন, তুমি বলো।' বকু বললো, 'পুরোনো চিঠি জমানো আমার ছবি।' অলোক হেসে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই অনেক চিঠি পাও।' বকু বললো, 'কই আর।'

অনেকদিনই অলোক ভেবেছে যে বকুকে চিঠি লিখবে। কিন্তু যার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয় তাকে চিঠি লেখা যায় না। বকু তার হবির কথা জানিয়ে প্রকারান্তরে কি সে অলোকের চিঠিই প্রত্যাশা করেছে।

অলোক ছাদ থেকে নিচে নেমে এলো। বউদি গা ধুয়ে এসে এখন শাঁখ বাজাচ্ছে। উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। বাড়ি ধোঁয়ায় একাকার। ক'দিন হল বকুর সঙ্গে দেখা হয়নি। অলোকদের টেলিফোন নেই। বকুর মামার বাড়িতে টেলিফোন আছে কিনা অলোক জানে না। ক্লাসে বকু অলোকের মতোই একা। বকুকে চিঠি লেখার এই তো উপযুক্ত সময়। বড়দার ছেলে তপু ঘ্যান-ঘ্যান করছে; বউদির সঙ্গে শিখার কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা বলছেন, 'শিখা চুপ কর। কি শুরু করলি বলতো?'

শিখাও নাছোড়, তার গলাও উঁচুতে উঠছে 'বউদি কেন বললো আমি বউদির শ্যাম্পুর শিশিতে হাত দিয়েছি।'

মায়ের গলা পুনর্বার শোনা গেল, 'বউমা, তোমারও দোষ আছে।...' তপু কাঁদছে, ঘ্যান ঘ্যান করছে, বউদি ছেলের পিঠে দুচার ঘা বসাতেই ছেলে চিল চিৎকার জুড়েছে। রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ক্রমশ সারা বাড়িটাতে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মাঝে কেমন করে চিঠি লেখা যায়। অলোকের নিজস্ব কোনো ঘর নেই। এর থেকে বাড়ির বাইরে থাকা ঢের ভালো। সারা বাড়ি জুড়ে নিত্য অভাব অভিযোগ, কলকাতার অস্থিরতা, অলোকের নিজস্ব হতাশ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুর বাইরে তার আর বকুর জগৎ। প্রেম তো একদিনেই হুট করে এসে হাজির হয় না। আলাপ হওয়ার কদিন পরে অলোক বলেছিল, জয়শ্রী নামটা কেমন আলঙ্কারিক। বকু নামটাই তার ভালো লাগে।

পরের দিন অলোক বকুকে চিঠি লিখলো। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে ত্বরিতে কাগজ কলম টেনে লিখে ফেলা নয়। এক পৃষ্ঠার এই চিঠিটা লেখার পেছনে আছে একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তুতি। ট্রাম রাস্তায় চিঠির বাক্সে সেটি ফেলে অলোক এখন ঘরে ফিরে এসেছে। সিগারেট টানতে টানতে অলোক দেখলো রোদ্দুর আড়াআড়ি-ভাবে পড়েছে। রোদ্দুরের ভেতর ধোঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে কবরের মতো আজও তা নীল প্রমাণিত হয়। হাওয়ার ভেতর অজস্র ধূলিকণা ভাসে। যেখানে রৌদ্র অনুপস্থিত সেখানে ধূলিকণা উপস্থিত কিন্তু অপ্রত্যক্ষ।

দুপুর বেলায় একদম একা একা একটি চিল আকাশে উড়ছে। যা একটা ময়লা পোকার মতন মনে হচ্ছে। তবু ঐ পাখির চোখের ক্ষমতা প্রবল, নিচের পৃথিবীকে সে দেখতে পাচ্ছে। অলোক ভাবে পাখি মানুষের মনের ভেতরে চোখ থাকে। দুপুরে বাড়িটা শান্ত। পাড়াটা আরো শান্ত। মা সারাদিনের কাজকর্মের পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। শিখা অফিসে। বউদি ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এইরকম মুহূর্তে বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে অলোক চিঠি লিখেছে। খাতাটাতা এমনভাবে চারদিকে ছড়ানো যে দেখে বাড়ির যে কেউ ভাবতে পারে অলোক পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। বকুর উদ্দেশে লেখা চিঠি এখন ট্রাম রাস্তার ধারে সেই বাক্সে। বকু তো এখানে মানিয়ে নিতে পারবে না। আমাদের এই সংসারে নেই নেই কথাটা বড়ো বেশি উচ্চারিত। তমলুকে বকুদের কেমন বাড়ি, কেমন তার বাবা মা, ভাই বোন!

অলোক ভাবে আমাদের আলাদা বাড়ি হবে। বকু ও আমার বাড়ি। সে-বাড়ির জানলায় থাকবে পর্দা, ছাদে থাকবে ফুলের টব আর টেবিলে বসে আমরা ভাত খাবো। সে বাড়িতে শাশুড়ী নেই, ভাজ নেই, আইবুড়ো ননদ নেই। সেখানে থাকবে একটি আলোকিত বাথরুম। অলোকের নিজস্ব ঘর তো থাকবেই। অলোক চেয়ে দেখল বারান্দার রেলিঙে বসে কাক ডাকছে। উঠোনে বেড়ালেরা ঝগড়া করছে। গলি দিয়ে জয়নগরের মোয়া অলা যাচ্ছে। সাতদিন পরে অলোক ক্লাস করতে গেল আশুতোষ বিল্ডিঙের সিঁড়ির মুখে লিফ্‌ট চওড়া সিঁড়ি টানা করিডর, আঠার নম্বর ঘরের সামনে ছেলেমেয়ের দল দাঁড়িয়ে আছে। আর পাঁচ মিনিট বাদে ঐ ঘর থেকে একদল ছেলেমেয়ে বেরোবে, তারপর

অপেক্ষমান দল ঢুকবে। ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়েও অলোক বকুকে খুঁজে পেল না। সাতদিনের মধ্যে উপর্যুপরি দুবার জ্বর হওয়াতে অলোক কাহিল হয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় এসে সে সামান্য হাঁপিয়েও পড়ছিল। বকুকে পাওয়া গেল না। বকুর স্পেশাল পেপার আলাদা। সেই ক্লাসেও বকুর দেখা মিলল না। অলোক দুপুর তিনটের সময় দু নম্বর বাসে উঠলো। এই দুপুরেও বাসে অসম্ভব ভিড়। অলোক ভুলে গেল তার শখের কথা। জানলার সামনে তার আর বসা হল না। সে লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। সাতদিন, নাকি আটদিন বকুর সঙ্গ দেখা হয়নি। এই সাতআট দিনের মধ্যে বকুর কি কি ঘটতে পারে এইসব স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কথা ভাবতে ভাবতে অলোক চলে এলো দেশপ্রিয় পার্কে। সেই বাড়ি। ছাই রঙের দোতলা বাড়ি। কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলছে। ক্যাকটাস আর ক্রোটনের টব সাজানো। তারপর ওপরে যাবার সিঁড়ি। বসার ঘরের দরজা সেই রকম বন্ধ। কিন্তু আজ ওপরের জানলাগুলি খোলা। সেই জানলায় সবুজ রঙের পর্দা। আজ বকুকে সব কথা বলবো। আমাদের বাড়ির কথা। আমাদের অবস্থার কথা। অলোক কলিং-বেলের বোতাম টিপল। আধ মিনিট বাদে ওপরের জানলায় সামনে এসে দাঁড়াল বকু, জিজ্ঞেস করলো 'কে।' অলোক ওপরের দিকে তাকালে বকু তাকে দেখতে পেলো, বললো, 'ও আপনি, দাঁড়ান।

আজ বকুর ঘরে এসেছে অলোক। দোতলায় বকুর ঘর। অলোকের কল্পনার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যায়। বকুর বিছানা কি পরিষ্কার। কি সুন্দর তার পড়ার টেবিল, বইয়ের র‍্যাক। একটা মিনি ফ্রিজের মাথায় রেডিও। ঘরের মেঝে সাদা-কালো পাথরের। যেন কতগুলো সাদা কালো কাগজের টুকরো পড়ে আছে। আর এ কোন বকু! বকুর পরনে আজ হাল্কা নীল বেলবটম, মভ রঙের শার্ট। বাড়িতে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসার সময় বকু বলেছিল 'বাড়িটা একদম ফাঁকা। দিদিমা মামা মামিরা আজ তারকেশ্বরে গেছেন।' অলোক বললো, 'তার মানে তুমি একদম একা?' বকু বললো, 'কেন, সুরো আছে।'

অলোক বললো, 'আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

বকু বলল, 'হ্যাঁ, আপনি এখন ভালো আছেন তো?'

অলোক বললো, 'বকু, আজ তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো।'

বকু হেসে ফেলল [illegible] বসুন, অত তাড়া কিসের, এই তো এলেন, বসুন, আর বলুন কফিতে আপনার আপত্তি নেই তো!'

অলোক বললো, 'না আপত্তি নেই।' বকু সুরোকে ডেকে বললো, 'সুরো আমাদের জন্যে কফি করো।'

অলোককে বকু তার পারিবারিক অ্যালবাম খুলে অনেক ছবি দেখালো। বকুর বিভিন্ন বয়সের ছবি। ছোটোবেলা থেকে আজ পর্যন্ত বকু কতোরকমভাবেই না কতোবার বদলে গেছে। বকুর বাবা মা ভাই বোন, বকুদের তমলুকের বাড়ি, তমলুকে স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়ানো বকু। তারপর কফি এল। বকু তার বাবার কথা মায়ের কথা আর তমলুকের কথা বললো। অলোক বকুকে যেরকম কল্পনা করেছিল বকু ঠিক সেই রকম। বকু বললো 'আপনার বলুন।' অলোক বলল, 'বকু, আমাদের বাড়ির কথা শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।' কিন্তু বকু মন দিয়ে সব শুনলো আর বললো, 'আমাকে একদিন আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন?' অলোক অবাক হয়ে তাকাল বকুর দিকে। বকুর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে অলোক বলল, 'বকু, আমি তোমায় ভালোবাসি।' বকু একটুও অপ্রতিভ হল না, অলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা আমি জানি।' তারপর আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বকু বললো, 'কিন্তু আপনি যে পরিণতির কথা ভাবছেন তা কোনোদিনই সম্ভব নয়।' অলোক উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বললো, 'কেন?' বকু উঠে দাঁড়াল। অলোক বসে রইল বিছানার পাশে একটি মোড়ায়। বকু আলমারি খুলে একটা খাম নিয়ে এসে অলোকের হাতে দিলো। অলোক খাম থেকে বার করল একটি ছবি। তেইশ চব্বিশ বছরের একটি তরুণের ছবি। বকুকে জিজ্ঞেস করার জন্য অলোক চোখ তুলে দেখে বকু কাঁদছে। অলোক বললো, 'এ কি বকু, তুমি কাঁদছো কেন!' বকু শার্টের হাতায় চোখ মুছে অলোকের মুখোমুখি অন্য মোড়াটায় বসল। তারপর বকু বলল, 'এটা স্বাধীনের ছবি।' অলোক বললো, 'ইনি কে?'

বকু বলল, 'আমার প্রেমিক।' অলোক একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'ইনি এখন কোথায়?' বকু আর কাঁদল না। বললো, 'মারা গেছে।'

স্বাধীনের মৃত্যুর কথা বলতে বলতে বকুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। স্বাধীন তমলুকের ছেলে নয়। ওর বাবা তমলুকে চাকরির জন্য এসে-ছিলেন। নরঘাটের চলন্ত বাসের ধাক্কায় স্বাধীন আর তার সাইকেল কেমন রবারের বলের মতো পাশের ধানক্ষেতে পড়ে যায় তা সবিস্তারে বকু বলে যায়।

অলোক বললো, 'তাই তুমি কলকাতায় চলে এলে?'

বকু এবার হাসল, বললো, 'না, না, সে তো এম এ পড়ার জন্যে এসেছি। জানেন, যখন বাড়িতে যাই তখন খালি ওর কথা মনে পড়ে। গত বছরও রূপনারায়ণ নদীর ধারে বাঁধের সুন্দর রাস্তাটায় আমরা কতোদিন বিকেলবেলায় বেড়িয়েছি।'

অলোক চুপ করে বসে থাকে। জানলায় একটি চড়াই পাখি বসে কিচমিচ করছে। বকু বললো, 'আপনি সারা জীবন আমার বন্ধু হয়ে পাশে থাকুন। প্লীজ, আর অন্য কোনো কিছু কল্পনা আমি করতে পারবো না। আর একদিন কিন্তু আপনাদের বাড়িতে যাবো, মনে থাকে যেন।'

বকুর নিজস্ব বাড়ি সম্পর্ক অলোক আজ নিশ্চিত হতে পারলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সিঁড়ির মুখে এসে বকু বললো, 'দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।'

বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

দুবছর পর দিন দশেকের জন্য ব্রুয়ারীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ঘুরে দেখে সেছি সেখানে কি রাজনৈতিক, আর্থ-তিক ও সামাজিক নানা দিকেই অবস্থার ন্নতি হচ্ছে, বিশেষত এখানকার সংবাদ-ত্রে ছয়-সাত মাস আগেও যে দুর্দশার র বেরুত তার নিরিখে। আইনশৃংখলার গতিও লক্ষ্যণীয়। জিনিসপত্রের উৎপাদন ড়ছে; সংগে সংগে বণ্টন ব্যবস্থায় উন্নতির নে ভোগ্য পণ্যের দাম কমছে। ছাত্রসমাজ াগের চেয়ে সংযত, পরীক্ষার নকল পুলিশ হরায় বন্ধ হয়েছে বললেই চলে। খুনে-হাজানি-লুণ্ঠন কমে আসছে। রেল চলা-ল উন্নতি খুব একটা বেশী হয়েছে বলা য় না এবং এখনও রাত্রে অধিকাংশ ড়িতেই আলো থাকে না। তবু বিনা কিটে যাত্রীর সংখ্যা কমে গেছে বলে বছর আগে যে অসহনীয় ভীড় দেখে-লাম এবার তার ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে। রিবহণের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সংযোজন সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টায় দূরে পাল্লার মোটর-সের প্রচলন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই ৌজন্য ও শালীনতার যে পরিচয় পেয়ে সেছি তা ভুলবার নয়।

সন্দেহ নেই, বাংলাদেশে জীবনযাত্রা াড় নিয়েছে; পরিবর্তনের এই টেউকে ন্তু রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর মানের দ্বিতীয় বিপ্লবের সংগে যুক্ত রতে আমি রাজী নই। প্রধান কারণ, দ্বিতীয় প্লবের সূচনা হয়েছে জানুয়ারীর ২৫ কে আর এই মোড় ফেরার আরম্ভ অন্তত ন মাস আগে. ঐ তারিখে সংবিধান পরি-র্তন করে বঙ্গবন্ধু শুধু নিজেকে প্রধান-ন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতিতে উন্নীত করেছেন ই নয়, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব রেছেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল িষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণায় শেখ-হেব এই পরিবর্তনকে দ্বিতীয় বিপ্লবের াখ্যা দিয়ে বলেছেন, ১৯৭১-এর বিপ্লবে ংলাদেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ রেছিল, ১৯৭৫-এর বিপ্লব দেশের অর্থ-ীতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করবে।

বাংলাদেশে জীবনধারণের জন্য নিত্য-য়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যমান সাধারণ-বে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এখনও দুগুণ-াড়াইগুণ। বেসরকারী হস্তান্তরে আমাদের ০০ টাকায় ওদেশের ২৩০ টাকা পর্যন্ত াওয়া যাচ্ছে। জানি না' দু দেশের দ্রব্য-মূল্যমান এই বেসরকারী মুদ্রামূল্যে প্রভাবান্বিত হচ্ছে কিনা। যেমন, চাল পাঁচ টাকা থেকে সাত টাকা সের (১৬ ছটাকে সের, আর ১৭ ছটাকে এক কিলোগ্রাম), দুধ চার থেকে পাঁচ টাকা, ডাল ছয় টাকা, চিনি ষোল টাকা, গুড় আট টাকা, আলু দ টাকা, বেগুন দেড় টাকা, একটি লুংগী ষোল টাকা, মাঝারি ধুতি তিরিশ টাকা, শাড়ি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, সরষের তেল ৩০-৩২ টাকা সের এবং সোনার গহনা ১২০০ টাকা ভরি। কয়েকটি জিনিস এখনও ভীষণ দুর্মূল্য : লবণ আড়াই টাকা

মুজিবর রহমান

সের, শুকনো লংকা ৮০ টাকা ও জিরা ১০০ টাকা। অন্যদিকে মাছ এখনও ওজনে বিক্রী না হলেও ওজন হিসাবে রুই ৮/১০ টাকা সের, ইলিশ ৫ টাকা সের এবং ডিম ৬০ পয়সা জোড়া। কয়েকটি বড় বড় শহরে সকলের জন্য (নয় বৎসরের বেশী ছেলে-মেয়ের পুরা হিসাব) এবং শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। মাথাপিছু সপ্তাহে আধ সের চাল ও তিন সের গম এবং তিন টাকা সের দরে চিনি, আট টাকা দরে সরষের তেল, ৫০ পয়সা দরে লবণ ও কেরোসিন দেওয়া হয়। ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সকলকে মাথাপিছু আধ সের গম সপ্তাহে দেওয়া হয়। এতে দেশের শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ লোককে সস্তাদরে খাবার দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলাদেশের শতকরা আশীভাগ অধি-বাসী কৃষিনির্ভর। ধানের দাম ১৫০ টাকা মণ; পাটের দর কিন্তু ৬০ টাকা মণের বেশী হয়নি। আগে কৃষক হিসাব করতেন দু'মণ ধানের দাম এক মণ পাটের দামের সমান; এখন সেই হিসাব উল্টে গেছে—বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই। ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর বাংলাদেশে দৈনিক ছয় টাকার মত আয় করেন, তার ওপর রয়েছে তিন বেলা খাওয়া জোতদারের ঘরে। কৃষকের আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে ওঠানামা করে উকিল-ডাক্তারের আয়। সুতরাং মুদ্রা-স্ফীতির দরুণ এদের সবায়েরই আয় বেড়েছে। আর যে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সরকারী-বেসরকারী ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল কল-কারখানা ও রাস্তা-ঘাট-পুল, গত তিন বছর ধরে, ওদের সংস্কার করতে যে শত শত কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে, পরিণামে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! শহরে একজন রিকশাওয়ালা রোজ প্রায় ২৫-৩০ টাকা আয় করে। সুতরাং আয়ের প্রাচুর্য অপ্রচুর ভোগ্যপণ্যের দামকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শোচনীয় অবস্থা নির্দিষ্ট আয়ের লোকের। একটি মহকুমা শহরে অন্তত দুজন মুন্সেফের কথা শুনলাম যাঁরা নির্ধারিত আয়ে সংসারের খরচ চালাতে না পেরে পদত্যাগ করেছেন—একজন নিয়েছেন অধ্যাপকের চাকরি, অন্যজন ওকালতী করছেন। অনাথ, জরাগ্রস্ত ও পংগু দরিদ্রের দুঃখ অপরিসীম। গ্রামাঞ্চলে ভিখারীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। গৃহস্থের বাড়ি থেকে পাতের ভাত কেড়ে নিয়ে খাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। ঢাকা থেকে ৮।৯ মাইল দূরে টংগীতে কয়েক লাখ উদ্বাস্তু যে নিঃস্বতার মধ্যে বাস করছে, জানি না কবে এদের দুর্গতি মোচন হবে।

বাংলাদেশের সাধারণ লোকের, মনে হল, কোন মাথাব্যথা নেই শেখ সাহেব আরও কতখানি ক্ষমতা নিলেন কিম্বা কতখানি ছাড়লেন। তাঁর উপর তাদের এখনও পুরো আস্থা। রেলে-বাসে লোককে বলাবলি করতে শুনেছি, শখ সাহেব বাংলাদেশকে "সোনার বাংলা" তৈরী করে ছাড়বেন। তরুণদের মধ্যে দেখেছি প্রত্যয়ের প্রতিভাস : নিজেদের সোনার ছেলে হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। রাজ-নৈতিক হানাহানি একেবারে বন্ধ না হলেও খুবই কমেছে—সন্দেহ নেই। যদিও এ ইঙ্গিতও কানে এসেছে : বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি এবং মুজাফ্ফার আহেমেদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবকে দু' হাত তুলে অভিনন্দিত করেছেন এই আশায় যে এবার যদি শেখ সাহেব ব্যর্থ হন তবে তাঁরা আসর জাঁকিয়ে বসতে পারবেন। এটুকু অন্তত নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, অন্য সব

দলকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে বস্তুত মুলতুবী রেখে এবং মন্ত্রিসভা রেখেও মন্ত্রীদের ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে মুজিব নিজের সম্ভাব্য ব্যর্থতার কোন সাফাই আর রাখতে চাননি।

মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবকে বাংলা-দেশের কোন কোন রাজনৈতিক নেতা জনান্তিকে প্রশ্ন করেছেন; তুলনা করেছেন চীনের একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে। চীনেও একদলীয় শাসন; চীনের মত বাংলাদেশেও আমলাদের শাসকদলের অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিপ্লবে করা হচ্ছে। কিন্তু তফাৎটাও তাঁরা তুলে ধরেছেন। চীনের নায়ক তাঁর দলকেই নয়; সমগ্র আমলাতন্ত্রকে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত করতে পেরেছেন—ভিন্ন মতকে তার জন্য যতই মূল্য দিতে হোক না কেন। বাংলাদেশে শেখ সাহেব গত তিন বছরে আমলাদের তো নয়ই, তাঁর নিজের দলকেও দেশসেবার আদর্শে উৎসর্গ করতে পারেন নি। নইলে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এতখানি অনাচার, অত্যাচার, অবিচার চলতে পারতো না। দেশ মোড় যদি নিয়ে থাকে তবে তা যতটা দেশবাসীর নৈতিক মনোবলের জন্য, আওয়ামী লীগ কিংবা প্রশাসনের কৃতিত্বে ততটা নয়।

এখানে বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ও-দেশের জনগণ বারবার প্রমাণ করেছে যে, তারা তাদের নেতাদের চেয়ে প্রাগ্রসর। স্মরণ করুন ভাষা আন্দোলন। ছাত্র-যুবাদের অনেক রক্তদান, অনেক কাঁচপ্রাণ বলি দেবার পর নেতৃবর্গ এগিয়ে এসেছিলেন সেই আন্দোলনে সামিল হবার জন্য। ৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনেরও সেই ইতিহাস। রমনা মাঠে স্বাধীনতার দাবী প্রথম ধ্বনিত হয় ছাত্র-যুবাদের কণ্ঠে; মুজিব তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তেমনি এখনও দেশ গড়ার উদ্দীপনা ছাত্র-যুবাদের ভিতর যে আলোড়ন এনে দিয়েছে, নেতৃবর্গ যদি তাকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত না করতে পারেন এবং তার জন্য আমলাশাহীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা পরিহার না করেন তবে অনিয়ন্ত্রিত কোন তৃতীয় বিপ্লবের জোয়ার বাংলাদেশকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে। এখানেও রয়েছে দিকনির্দেশক একটি ঘটনা : যশোর থেকে ময়মনসিংহ যাবার পথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবে একটি নীচুস্তরের সরকারী অফিসার বণ্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতির উল্লেখ করলেন; পরে একই প্রশ্নের জবাবে একজন মাঝারি সামরিক অফিসার দায়ী করলেন দৈব-দুর্বিপাককে এবং বললেন "বঙ্গবন্ধু দেশের দুর্গতি দূর ক'রে ছাড়বেন, ইনশাল্লা।"

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

'চলো আমাদের পাড়াটা পার করে দিয়ে আসি', বললাম আমি আমিনাদের—'মুসলিম এলাকায় ছেড়ে দিয়ে আসি তোমাদের।'

'না তোমাকে আর মুসলিম পাড়ায় ছাড়তে যেতে হবে না। যেমন করে এসেছি তেমনি করেই যেতে পারব আমরা।' বলল তারা।

'কেমন করে এসেছ? কোনদিক দিয়ে এলে?' আমার কৌতূহল হয়।

স্রেফ মুসলিম এলাকার দিয়ে। পার্ক সার্কাস থেকে সার্কুলার রোড ধরে রাজা বাজারে এলাম। সেখান থেকে সরাসরি কেশব সেন স্ট্রীট ধরে তোমাদের মেছো বাজারে পড়ে মার্কাস স্কোয়ারে পৌঁছলাম। তার ধার দিয়ে সটান তোমার এই আস্তানায়—'

'বাঃ!' আমি বাহাদুরি দিই ঃ কিন্তু এই আস্তাবলের পাত্তা পেলে কি করে?'

'সেদিন তোমাদের যাবার কথা ছিল না মেট্রোয়? ম্যাটিনি শো-তে আমাদের তিনজনের সাথে তোমার আর শৈলদার? তুমি তো গেলে না। শৈলদা গেছলেন। তাঁর কাছ থেকে তোমার এই বাড়িটার হদিশ জেনে নিয়ে ছিলাম সেইদিনই।'

সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়ল।

কী অকাজে আটকা পড়েছিলাম মনে নেই, কিন্তু তার কদিন আগের কথাটা মনে আছে বেশ, যেদিন ঐ মেট্রোয় ম্যাটিনিতে যাবার কথাটা হয়। আমার বন্ধু শিল্পী শৈল চক্রবর্তী আর আমি আমিনাদের আমন্ত্রণে সন্ধ্যার দিকে গেছলাম ওদের বাড়িতে...

ঠিক এখানে যে ছিল বাড়িটা স্মরণে নেই এখন, তবে আভাস আবছায়ায় যা ঠাহর হয়...পার্ক সার্কাসের কাছাকাছিই কোথায় যেন ছিল সেটা। পার্ক সার্কাস থেকে একটু বেঁকে গেলেই তো বেক বাগান, তার ধারে কাছেই কোথাও তারা থাকত।

কোনো কিছুর বরাতে দেওয়া থাকলে, দেখেছি, আমার বরাতে সেটা কখনো ঘটে না। এমনি আমার বরাত! সেদিনের সিনেমা দেখার ফন্দাও করা সেই প্ল্যানটা তাই আমার অদৃষ্টে ফলেনি। তেমনি আবার সেলিনার বিয়ের নেমন্তন্নেও যেতে পারিনি আমি—সেটা ঢের পরেই হয়েছিল যদিও। আমার বরাতে যা সব ঘটে তা একান্তই অভাবিত অচিন্তিতপূর্ব অকস্মাৎ! আচমকা কিছু আচম্বিতে ঘটে যাওয়া। অবারিত হঠকারিতা এ বরাতে ঘটার। ঘটা করে কিছু হবার নয়।

তবে সেদিনের সন্ধ্যাতেই ওদের বাড়ির রান্নার সোয়াদ পেয়েছিলাম। এক কথায় অপূর্ব। এক মুখে খাওয়া গেলেও তার বর্ণনায় পাঁচ মুখের দরকার। তবুও বোধ হয় তার এক পদের একটি বর্ণেরও পরিচয় দিতে পারব না।

শৈলবাবু খুব কুণ্ঠাভরে মুর্গির রোস্ট মুখে তুলছেন দেখলাম। বামুন মানুষ জন্মগত সংস্কার যাবে কোথায়! মজা করবার জন্য আমি বললাম, মুর্গির টেস্ট ঠিক টোস্টের ওপর মেলে না। এর ঝোলটাই হোলো আসল। ভাত মেখে না খেলে তার তার পাওয়া যায় না। রাত্তিরে ভাত খাওনা তোমরা?

খাবেন আপনারা ভাত?

আলবাত। আমি সায় দিই আমিনার আমন্ত্রণে। সঙ্গে সঙ্গে তা এসে গেল দু প্লেট। কী পরিচ্ছন্ন তার চেহারা, আর কী বা তার খোসবু!

ঝোলে ভাতে মিলে মিশে সেতারের মত তারে তারে যেন বাজতে লাগলো।

সদ্ ব্রাহ্মণ শৈলবাবুকে ভাতে এবং জাতে মারতে পারলাম বলে আরো একটা ঝঙ্কার ছিল আমার মনে।

খাওয়া দাওয়া সারার পর শৈলবাবু আমিনা সেলিনা আর ওদের তরুণী মাসি রবি-র ছবি এঁকে দিলেন আটোগ্রাফের খাতায়—কলমের আঁচড়। আমাকে দু'চার ছত্র কবিতা লিখে দিতে বলল।

কবিতা আমার মগজে খটিতি আসে না—ওদের কাকাবাবু প্রভাতকিরণের মতন স্বভাব কবি আমি নই। সবিনয়ে জানালাম।

তার পরের দিন ম্যাটিনী মেট্রোয় দেখা করার মক্কো হোলো সেই জলসেই—যেটা আমি রাখতে পারিনি।

তারপরে আজকের এই ...লোকান্ত—একেবারে অকস্মাৎ।

'চলো তোমাদের কিছুটা এগিয়ে দিয়াসি। কী চমৎকার এই গাড়িখানা তোমাদের। চড়বার লোভ হয়।' ওদের গাড়িতে উঠি গিয়ে। 'তোমরা যে দিক দিয়ে এসেছ সেই পথ ধরেই ফিরব আমরা। কিন্তু, এই এলাকার ঘাঁৎঘোঁৎ সব তো তোমাদের জানা নেই। এর কোথায় কোথায় হিন্দু পকেট, আর কোথায় ওৎ পেতে আছে তোমাদের ঐ আড়িয়ারা। আর ঐ যতো জনসংঘের সঙ্গী। বাড়ির ছাদ থেকে বোমা ফেলবে গাড়ির ওপর। অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়তে পারে। আমি সঙ্গে থাকলে সে ভয় নেই।'

সে ভয় নেই? কেন? তুমি কি...তুমি কি...তোমাকে কি ওরা চেনে নাকি? খাতির করে বুঝি খুব?

না, সেরকম কিছু নয়, তবে আমার মনে হয় আমি হচ্ছি অল প্রুফ। কেন জানি না। আমার মনে হয় কোনো আপদ-বিপদ আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না। কেন কে জানে। বলেই কথাটা আমি উড়িয়ে দিই—রাজকন্যেদের তো রাজপথে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই রাজাবাজারে দিয়ে আসি।

সেদিনই সাঁঝ রাতে আর মাঝ রাতে দু দুটো চোট গেল আমার ওপরে।

সন্ধ্যা বেলার অন্ধকারে বেমালুম হয়ে বসে আছি বারান্দায়, সারা বাড়ি ফাঁকা, সবাই পালিয়েছে, একতলা দোতলা তিনতলায় আলো জ্বলেনি, জ্বালাবার লোক নেই কেউ। আমিও জ্বালাতে যাইনি। অকারণ জ্বালা যন্ত্রণায় কে যায়? তাছাড়া

একলাটি চুপচাপ থাকতে হলে অন্ধকারের মতন বন্ধু আর হয় না। একান্ত হলেই অন্ধকার উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

এমন সময় মহল্লার নওজোয়ানরা এসে হল্লা লাগালো। আমাদের সদর দরজার ওপরেই তাদের হামলা।

চোটপাট শুরু হোলো দরজার ওপর।

শক্ত কাঠের মজবুত দরজা—সহজে টলবার নয়।

ওদের একজন বারান্দায় আমার তাক পেয়ে হাঁক ছাড়ল আমার দিকে—এই! কোন্ হো হুঁয়া? কেয়াার খোলো।

কেয়ারি খোলার আদৌ আমার কেন কেয়ার নেই। বসেই রইলাম চুপচাপ।

আমার উদ্দেশে গাল পাড়তে লাগলো ওরা তখন—মনের ঝাল ঝেড়ে। কেওয়ারি খোলো কেওয়ারি খোলো। এমন হট্টগোল বাধালো যে বলবার না।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হলো আমায় বাধ্য হয়ে।

কোঠিমে কোই নেহি. খুলে গা কৌন্? খাড়া হয়ে বলি—নীচামে ভি কোই নেহি উপরমে ভি কোই না। ভাগ গিয়া সব কেই।

তুম্ কাহে নেই খোলতা? তুম তো হ্যায়!

হ্যায় জরুর। লেকিন শহিদ হোনে কা বাস্তে হামারা এত্না কুচ্ছ জরুরৎ নহি। শহিদ হবার জন্য কষ্ট সইতে পার না ভাই। তা ছাড়া, নীচে যা অন্ধকার কে নামবে? কেন, তোমাদের ওপরে আসতে কী হচ্ছে শুনি?'

—কেয়া তকলিফ?'

আমার এই বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের খিচুরি থেকে ওদের কী মালুম হলো ওরাই জানে, 'ধ্যেৎ তেরি!' একবাক্যে এই ধিক্কার দিয়ে দারুণ বিরক্ত হয়ে আমার ত্রিসীমানা ছেড়ে আমায় তালাক দিয়ে তারা চলে গেল সবাই। খাওয়াদাওয়ার কোনো পাট ছিল না। বাসায় ঢোকার আগে বিকেলেই বাহির থেকে নৈশ পর্ব সেরে এসেছিলাম।

এখন আরাম করে শুয়ে পড়লেই হয়।

কিন্তু চৌকিতে শুয়েই যে আরাম পাবো তার জো কি! কপালে না থাকলে শুয়ে শুয়েও চৌকিদারি করতে হয়।

চারধারে যা পরিস্থিতি! দূরে-অদূরে থেকে হরদমই নারায়ে তকদির-এর হাঁকডাক আর আল্লাহো আকবরের ঘোষণা—তাতে চোখের পাতায় ঘুম নামতে চায় না—কান খাড়া হয়ে থাকে সর্বদাই।

ঘণ্টাবাদেক বাদে নীচের থেকে চাপা গলার আওয়াজ আসে। কে যেন কাকে বলছে, বোমটা ঘরের মাঝখানে রেখে ফিউজটা বাধ্য করে রাখ। রাত্ত দুটার পর পুলিসের টহলদারি গাড়িটা চলে যাবার পর এক সময় এসে ওই ফিউজে আগু লাগিয়ে দিবি

বাস! তা হলে আর দেখতে হবে না। তামাম কোঠি উড়ে যাবে এক পলকে। সব খতম হবে বিলকুল।

তার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

উঠে গিয়ে আমার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম না কাউকেই। রাস্তা নির্জন, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার!

বিছানায় এসে পড়লাম তারপর।

বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। একলা আমায় কাবার করতে না পেরে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে সাবাড় করতে একযোগে সহমরণে পাঠাতে চায়।

তলায় রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে পিছনের বস্তি গলে মুক্তারামবাবু রোড দিয়ে পালাবার নেপথ্য পথ একটা ছিল বটে, কিন্তু সামান্য জ্বালাযন্ত্রণায় যেতেও যেমন আমার অনীহা, পালাবার অসামান্য যন্ত্রণার পালাতেও তেমনিতর নিস্পৃহা, তাছাড়া এই রাত্ত দুপুরে এমন আরামের বিছানা ছেড়ে কোথায় যাই? নিজেকেই নিজে ভরসা দিই তখন—দূর! কোথায় যাবি? মা দুর্গা নেই নাকি? সেই দেখবে খন। সে-ই সামলাবে। তুই ঘুমো। চুপচাপ।

তারপরেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

মাঝ রাত্তিরে তলার থেকে একটা আওয়াজ এলো হঠাৎ—ভুস্ করে। ঘুম ভেঙে গেল আওয়াজটায়।

কোনো সাড়াশব্দ নেই অথ তারপর।

বুঝলাম ওদের ব্রহ্মাস্ত্র ঐ বোমাস্ত্র জননীর কৃপাকটাক্ষে ভুস্‌সিভূত হয়ে গেছে।

[ক্রমশ]

ঘরে বাইরে

বিজয়িনী

মহিলা বৎসরের উপযুক্ত খবর বটে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার দলের নেত্রী মনোনীত হয়েছেন। বেশ ভাল রকম লড়াই-এর জিৎ হিসাবে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে চাই। ২৭৬ মোট ভোটের ১৪৬টি পেয়েছেন তিনি। প্রথম দফার ভোট গ্রহণে তিনি হিথ সাহেবকে হারিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। হিথ সাহেব পেয়েছিলেন ১১৯ ভোট, আর শ্রীমতী থ্যাচার পেয়েছিলেন ১৩০। এর পর হিথ সাহেব পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। কনজারভেটিভ দলের মান্যগণ্য মাতব্বরদের মধ্যে কেউই মার্গারেট থ্যাচারের কাছাকাছি ভোটও পাননি। তাঁর পরের ভোট সংখ্যা ছিল ৭৯। হোয়াইটল সাহেব কাজেই বহু পিছনে পড়ে ছিলেন। আগামী নির্বাচনে যদি লেবার দলের পরাজয় হয় তবে শ্রীমতী থ্যাচার হবেন সেখানকার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

শ্রীমতী থ্যাচারের বয়স ৪৯। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতা মুদিখানার মালিক ছিলেন। অবসর নিয়ে স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মার্গারেট অক্সফোর্ডের স্নাতক। বিষয় রসায়ন শাস্ত্র। অক্সফোর্ড ছাড়বার পর তিনি

শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার

কিছুদিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলেন। সেখানে গবেষণা করবার সময়েই অবসরটুকু লাগিয়েছিলেন আইন অধ্যয়নে। ১৯৫৪ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ট্যাক্স আইনের বিশেষজ্ঞ হিসাবে আইন ব্যবসায় করেন।

ছাত্রী হিসাবেই রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৯ সালে তিনি পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে শ্রীমতী থ্যাচার পেনসন ও ন্যাশনাল ইনাস-ওরেন্সের জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯৫১ সালে শ্রীমতী মার্গারেট হিলডা বিবাহ করেন রবার্টস ডেনিস থ্যাচারকে। তাঁদের দুই সন্তান। এক পুত্র এবং এক কন্যা। যমজ। ভ্রাতা ভগ্নী একই সময়ে একই গর্ভে জাত। ডেনিস থ্যাচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেজর ছিলেন রয়াল আর্টিলারিতে। এখন বার্মা ক্যাস্টল এবং অন্যান্য কোম্পানীর ডাইরেক্টর।

সর্বতোভাবে মধ্যবিত্ত সাধারণ সংসারের মেয়ে মার্গারেট উত্তর লণ্ডনের ফিঞ্চলে থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বাগ্মিতায় তিনি সুনাম অর্জন করেছেন প্রচুর। ১৯৭০ সালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলর হয়েছেন।

কনজারভেটিভ পার্টির সম্বন্ধে অনেক ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছেন শ্রীমতী থ্যাচার। শক্ত, কঠিন তেজস্বী পুরুষালী দল বলে রক্ষণশীল দলের যে নাম ছিল তা আর সংরক্ষিত হলো কই? কালের ধারা এমনই পরিবর্তনের প্রবাহ নিয়ে আসে।

I.C.I.W.Y-এর কর্মসূচী

ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর ইণ্টারন্যাশনাল উইমেনস ইয়ার তাঁদের কর্মসূচির একটি ছক বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। বছরের বিশেষ বিষয় হলো, "জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার ও বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক মনের মিল, জাতীয় প্রগতির প্রতি তার দায়িত্ব"—Equality for women in all spheres of life and their responsibilities towards national developments, international understanding and world peace.

'৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪ঠা ডিসেম্বরের মিটিং-এ ডিসেম্বর মাসটি প্রস্তুতির মাস হিসাবে ধরা হয়। তারপর জানুয়ারীতে বিভিন্ন প্রদেশে জনসভা হবার কথা। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আইন যাতে সর্বসাধারণের গোচর হয় তার চেষ্টা করা হবে। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস হিসাবে মানা হবে বলে তার প্রস্তুতির সময়ও এ মাস।

মার্চ মাসের ৮ই আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপিত হবে। সে সূত্রে "Social rights of women in India" —ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিকার হবে তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৮ই মার্চ মহিলা দিবসের বিশেষ ডাকটিকিটও প্রকাশিত হবে। নারীর অধিকার, বিশেষ করে বরপণ সম্বন্ধে সচেতনতা আনা হবে। বরং পণ বা যৌতুককে বিচারালয়ের দৃষ্টির অন্তর্গত অপরাধ বলে গণ্য করার দাবি সরকারের কাছে করা হবে। যৌতুক নিয়ে যে বিবাহ হবে তার সঙ্গে সামাজিক সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করার সপক্ষে আন্দোলন করা হবে। নারীর মর্যাদার প্রতি সামন্ততান্ত্রিক সেকেলে ভাব বর্জন করার জন্য অভিযান চলবে। বিপন্ন নারী যাতে বিনা পারিশ্রমিকে আইনের সাহায্য পায় এবং আশ্রয়হীনা যাতে আশ্রয় পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এপ্রিল মাসের প্রোগ্রাম গ্রামের মেয়ের জন্য। অন্তত আধুনিক যুগের সামান্য মাত্র সুযোগটুকুও তাদের কাছে যাতে যায় তার চেষ্টা করতে হবে। মাতৃমঙ্গল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের কিছু ব্যবস্থা, পরিষ্কার খাবার জল, ক্ষেতে কাজ করবার সময় শিশুদের দেখাশুনোর ব্যবস্থা, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক ইত্যাদির বিরাট এক ফর্দ তৈরী হয়েছে। কার্যে পরিণত হলে অতিশয় আনন্দের বিষয় হবে।

মে মাসটি কর্মী মেয়ে অর্থাৎ Working women-এর জন্য। সস্তা ক্যাণ্টিন, হস্টেল ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই এ-প্রোগ্রামে আছে। জুন-এর জন্য স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও শিশুমঙ্গল। জুলাইতে সমাজের দোষ, পাপ ও ঘুষ অর্থাৎ Corruption-এর মূলে আঘাত করার চেষ্টা হবে। আর হবে কালো টাকা, ভেজাল এবং গোপনে মজুত করার বিরুদ্ধে অভিযান। অগাস্টে শিক্ষা ও সংস্কৃতি। অক্টোবরে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য। নভেম্বরে অনুশীলন ও সেমিনারের সিদ্ধান্ত স্থির করা। সবার শেষে দিল্লিতে হবে ডিসেম্বরে জাতীয় কনফারেন্স।

তালিকাটি মস্ত। এর সামান্য একটু সম্পাদন করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষ এত বড় দেশ যে যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সেখানে পৌঁছোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উৎসাহ যেন তথাকথিত সমাজসেবী ও সমাজের উপর তলায় আবদ্ধ না থাকে—এই আমাদের প্রার্থনা।

খবরের টুকরো

ইজরাইলে বর্ষের বরণীয় পুরুষ মনোনয়নের আয়োজনে মজা হয়েছে। কারণ, জনসংখ্যার মস্ত অংশ এমন পুরুষ খুঁজেই পেলেন না। এমন কি প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিন সাহেবের ভাগ্যে শতকরা ৫·২-এর বেশী ভোট জুটলো না। অনেক অনুশীলন ও গবেষণা এবং প্রশ্ন করার পর জানা গেল যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারকে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' মনোনীত

করাই সেখানকার বেশির ভাগ মানুষের মত। প্রশ্ন যাদের করা হয়েছিল তাদের শতকরা ১৮·৮ই শ্রীমতী গোল্ডার পক্ষে এই রায় দেন।

নির্বাচনের আয়োজন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা পড়লেন বিপদে। বর্ষণীয় পুরুষ খুঁজতে মিললো মহিলার শ্রেষ্ঠত্বের সংবাদ। যাই হ'ক, ভেবে চিন্তে 'ম্যান অ দ্য ইয়ার' নামটা বজায় রেখে তাঁরা জয়ী বলে ঘোষণা করলেন গোল্ডা মেয়ারকে।

সাক্ষাৎকারের সময় অনেকেই বলেছিলেন ইজরাইলের বাইরে কাউকে বরণ করার অনুমতি দিলে তাঁরা ডাঃ কিসিঙ্গারকে মনোনয়ন করবেন। অবশ্য ফোর্ড সাহেবের তেমন জনপ্রিয়তা নেই। বরং অনকে কেউ কেউ পছন্দ করেন। ঘরের বীররা কেউই তেমন পাত্তা পাননি। কাজেই শ্রীমতী মেয়ার 'ম্যান অব দ্য ইয়ার'।

আমাদের দেশে বর্ষশেষোৎসব বা সাক্ষাৎকার হয়নি কিন্তু গত বছর এক বিশিষ্ট সাংবাদিক নববর্ষের প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' হচ্ছেন শ্রীমতী গান্ধী।

শ্রীমতী

॥ বিয়াল্লিশ ॥

মা আর বউদি দুজনে ঠেলে পাঠিয়েছে সোমেনকে দাদার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন তা দেখে আসতে। বৃষ্টি বাদলায় মানুষের দেরি হয়, কিন্তু কে বুঝবে সে কথা। সোমেন তাই খুব বিরক্তির সঙ্গে এসেছে।

মনটা ভাল নেই। গতকাল অণিমা এসেছিল বাসায়। সাদাখোলের শাড়ি পরা, চেহারাটা অনেক ভাল হয়েছে আজকাল। অনেক ধীর স্থির আগের চেয়ে। একটা চমৎকার হ্যান্ডমেড কাগজের কার্ডে ছাপা বিয়ের চিঠি দিয়ে বলল—যেও না সোমেন। সব নিমন্ত্রণে যেতে নেই।

এরকম কথা কখনো শোনেনি সোমেন। কেউ নেমন্তন্ন করতে এসে বারণ করে যায় নাকি!

ঘরে বসে কথা বলার সুবিধে নেই। তাই অণিমার সঙ্গে বেরিয়ে এল সোমেন। কোনো দিন নিজেদের গাড়িতে চড়ে কোথাও অণিমাকে যেতে দেখেনি সোমেন। অণিমার রুচিবোধ বড় প্রবল। গাড়ি আছে—এটা কাউকে দেখাতে চায়নি কখনো। কাল কিন্তু গাড়ি করে এসেছিল। সাদা অ্যামবাসাডার। অণিমার সঙ্গে পিছনের সীটে উঠে বসল। সামনে ড্রাইভার।

কথা হচ্ছিল না। একটা লালরঙা নাইলনের খাপে-ভরা নিমন্ত্রণের চিঠিগুলি সোমেন আর অণিমার মাঝখানে পড়েছিল। অণিমা দরজার কাছে অনেকটা সরে বসেছে। আলগা দূরের মানুষ, প্রায় পরস্ত্রী। সোমেন বলে—আমাকে গড়িয়াহাটায় নামিয়ে দিও অণিমা।

অণিমা উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাদে বলল—পরীক্ষাটা দেবে না?

সোমেন হাসল, বলল—তুমি বড় বেরসিক। পরীক্ষাটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। দিলেও যা, না দিলেও তাই। এখন গ্রাজুয়েট বেকার আছি, তখন না হয় এম-এ পাশ বেকার হবো।

—তা কেন? প্রফেসারীর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

সোমেন হাসল। গড়িয়াহাটা ব্রিজের ঢাল বেয়ে গাড়িটা গড়িয়ে নামছে তখন। অণিমা বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল। যেন অন্যমনস্ক। আসলে তা নয়। চেহারা ভাল হলেও অণিমার মুখে একটা খড়ি-ওঠা বিষণ্ণতার গুঁড়ো মাখানো। সোমেনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নেচে ওঠে। একই সঙ্গে একটা জয়ের আনন্দ ও হারানোর দুঃখ তাকে মুহূর্তের জন্য পাগল করে দেয়। একটু ঝুঁকে সে প্রশ্ন করে—বিয়ের পর কোথায় অণিমা?

অণিমা ভারী চশমার ভিতরে তার ছোটো হয়ে আসা চোখে তাকাল সোমেনের দিকে। বলল—সিন্ধ্রি।

—অনেক দূর।

—দূর! বলে একটু ভাবে অণিমা। পরে হেসে বলে—তেমন দূর নয়। তবে দূরত্বটা রাখাই ভাল।

ব্যগ্র, লোভী সোমেন বলল—কেন অণিমা?

—গড়িয়াহাটা এসে গেল, সোমেন নামবে না?

—আর একটু যাই।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে—চলো।

গাড়ি চলে। খুব মৃদু ইন্টিমেট সুগন্ধীর একটা বাসি গন্ধ গাড়ির ভিতরে। স্নো-পাউডার কখনো মাখত না অণিমা। এখন কি মাখে? মৃদু সুবাস তার চারদিকে। মহীয়সীর মতো দেখাচ্ছে সাদা খোলের শাড়িতে। চওড়া পেটা জরির পাড়। এত দুর্লভ কখনো অণিমাকে দেখাত না। ঠাট্টা-ইয়ার্কি একদম কি ভুলে গেল অণিমা?

—অণিমা, তোমার কাছে টাকা আছে?

অণিমা অবাক হয়ে বলে—কেন?

—ধার দেবে? একটা জিনিস কিনবো?

সোমেন কোনো দিন ধার চায় না। অণিমা ব্যাগ খুলে দেখেটেকে বলে—কত বলো তো!

—জানি না। জিনিসটা শো-কেসে দেখলাম একটা দোকানে, ফেলে এসেছি পিছনে। গাড়িটা ঘোরাতে বলো।

অনিবার্য কারণে 'যুগ যুগ জীয়ে' প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

সম্পাদক, দেশ

গাড়ি ঘুরল। গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে ...সতে একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় ...াল সোমেন। শো-কেসে একটা চওড়া ...পেড়ে বিষ্ণুপুরী শাড়ি। সোমেন নেমে ...য়ে দাম জিজ্ঞেস করল। দেড়শ' টাকা।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে বলল—দেড়শ' ...কা। দেবে?

কি একটু সন্দেহ করলে অণিমা। একটু ইতস্তত করে টাকা বের করে দিয়ে বলল —মাঝে মাঝে পাগলামীর ভূত চাপে, না?

সোমেন তার ভুবনজয়ী মিষ্টি হাসি হেসে বলল—পাগলাই তো।

শাড়িটা কিনে এনে প্যাকেটটা গাড়ির সীটে রেখে উঠে বসল গাড়িতে। বলল—তোমাকে সাদা খোলের শাড়িতে বড় মহীয়সী মনে হয়।

—তাই নাকি?

—বিয়ের দিন ঐ কারণেই তোমাকে না দেখা ভাল। ঐদিন তো তোমাকে রঙীন বনারসী পরাবে, ফুলের সাজ, চন্দন—এ সব তোমাকে মানায় না।

অণিমা সত্যিকারের হাসি হাসল একটু। বলল—সেটা দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত বলে। তোমার সঙ্গে যদি হত তা হলে কী

করছে? শুভদৃষ্টির সময়ে তাকাতে না সোমেন?

এ কথাটায় ঠাট্টা ছিল হয়তো। তারা হাসলও। কিন্তু হাসি কারো ঠোঁটের গভীরে গেল না।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সোমেন নেমে গেল। অণিমা পিছন থেকে বলল—এই, শাড়ির বাক্স পড়ে রইল যে!

সোমেন দরজাটা দড়াম করে ঠেলে দিয়ে বলল—তোমার জন্য। বিয়েতে তো যাওয়া বারণ, তাই আজ দিয়ে রাখলাম।

—যাঃ। এই সোমেন, শোনো, শোনো...

সোমেন শোনেনি। চলে এসেছে।

কাল থেকে সারাক্ষণ মনটা তাই খারাপ। কেমন যেন। পিপাসা পায়, বুক খালি-খালি লাগে। আবার একটা ভুতুড়ে আনন্দে রক্তে আগুন ধরে যায়। মনের এই অবস্থায় একা বসে ভাবতে ভাল লাগে, আর কিছু ভাল লাগে না। কালকেও বিকেলে পড়াতে গিয়েছিল গাব্বুকে। অণিমা বাড়িতে ছিল না। গাব্বুর কাছে একটা সাদা খাম রেখে গেছে। বাড়িতে ফিরে সেটা খুলে দেখেছে সোমেন। প্যাডের একটা কাগজের ঠিক মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—নিলাম। মনে থাকবে। ভুলে যেও। অ।

বাড়িতে একটা টেনশন চলছে আজকাল। সারা দিন সোমেন থাকে না। দুপুরে একটু থাকে, আর রাতে। প্রায় রাতেই মা আজকাল ঘুমোনোর আগে দাদার কথা বলে। দাদার শরীর ভাল নেই। বউদির সঙ্গে গোলমাল হয়ে থাকবে, মনটাও তাই বোধ হয় ভাল থাকে না। বউদি মানুষটা খারাপ নয়, দাদা তো ভালই। কিন্তু দুজন ভালর জাত আলাদা। মা কিন্তু বরাবর দাদার পক্ষে। সোমেনকে রাত জাগিয়ে রেখে মা এক কাঁড়ি কথার হাঁড়ি খুলে বসে। সোমেন বিরক্ত হয়। সংসারের এত সব কথার মধ্যে বারবার ডুব মারে মন। তখন মনে হয়, অণিমা কিংবা রিখিয়ার কথা কত অবাস্তব! সংসারটা এত রোমাঞ্চহীন!

আজ বিকেল থেকে আকাশ ফুঁসছে। বৃষ্টি এল। সোমেন বেরোতে পারেনি। সন্ধ্যেবেলা প্রথমে মা, তারপর বউদি এসে ধরল। দাদা কেন ফিরছে না! সোমেন একটা কবিতার খসড়া তৈরি করছিল, এ সময়ে এই ঝামেলা। অত বড় লোকটা, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সে যাবে কোথায়, তার হবেটাই বা কি! কিন্তু কেউ বুঝল না। বৃষ্টির ধারটা কমতেই তাই সোমেনকে বেরোতে হয়েছে। বউদি ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া যায়নি। গড়িয়াহাটা থেকে ট্রাম ধরে এসেছে। মনে বিরক্তি, রাগ।

কিন্তু এখন অফিসের দরজা পার হয়ে যখন দাদাকে দেখতে পেল সোমেন তখনই বড় চমকে উঠল। খালি গায়ে দাদা দাঁড়িয়ে,

পরণে শুধু আধভেজা ফুলপ্যান্ট, আড়া-আড়ি বুকের ওপর মফলা পেতে। মোটা গোল গণেশ মু্... ভূড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আছে। শরীরটা ঢিলেঢালা, চামড়ায় ভাঁজ। মুখে চোখে একটা ভ্যাবলা বোবা ভাব। বড় বড় চোখে সোমেনের দিকে চেয়ে আছে। চাউনিতে একটা নির্বোধ ভর। দাদার এমন চেহারা কখনো দেখেনি সোমেন। সোমেন কাছে যেতেই বলল—কী হয়েছে? অ্যাঁ! কী হয়েছে?

সোমেন ভ্রূ তুলে বলে—কী হবে!

—কার অসুখ? মা কি অ্যাকসিডেন্ট?

সোমেন বুঝতে পারল না দাদা কি বলতে চাইছে। একটু অবাক হল। বলল—কী বলছ দাদা! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—নিয়ে যাবি?

—মা বউদি সব ভাবছে দেরি দেখে।

এতক্ষণে যেন বা একটু স্বাভাবিক হল চোখ। দু পা ফাঁক করে গম্বুজের মতো দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ অবসন্নের মতো বসে পড়ে বলল—ও।

—চলো। প্রায় আটটা বাজে।

রণেন মাথা নাড়ল। তারপর ভেজা জামা গেঞ্জি তুলে পরতে লাগল। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। দৃশ্যটা দেখে সোমেনের সমস্ত হৃদয় বহুকাল বাদে দাদার দিকে ধাবিত হল একবার। কী হয়েছে দাদার? বহু দিন হয় এই লোকটাকে সে লক্ষই করে নি। লক্ষ করেনি, তার কারণ, রণেন কখনো লক্ষ করায়নি। বরাবর দাদা একটু গম্ভীর মানুষ, একটু চুপচাপ। নীরবে সে সংসারের দায়িত্ব বহন করে। সোমেন একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখছে, এই লোকটা সংসারের অভিভাবক। দু ভাইতে কথা হয় খুব কম। কিন্তু আজও নিজের কোটটা প্যান্টটা, সাধ-আহ্লাদের নানা জিনিস সোমেনকে নিঃশব্দে দিয়ে দেয়। দাদা কখনো কাউকে খারাপ জিনিস দেয় না। বাজার থেকে কখনো সস্তা জিনিস আনে না। সোমেনের ফিরতে রাত হলে চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই দাদা। শান্ত, উদার, স্নেহশীল। দাদাকে কেন এতকাল লক্ষ করেনি সোমেন? দাদার কী হয়েছে?

হাওয়াই শার্টের বোতাম এঁটে রণেন ব্যাগটা তুলে নিল। বলল—ঘোষদা, যাই।

ঘোষ মুখ তুলে বলে—এটি কে? ভাই?

—হ্যাঁ।

ঘোষ মাথা নাড়ল। বলল—যান। বাড়ির সবাই ভাবছে। বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল যেন। আবার মাথা নেড়ে বলে—আমাদেরই ভাবাভাবির কেউ নেই। বাঁচা গেছে।—

বৃষ্টির কলকাতায় জীবাণুর মতো থিকথিক করছে মানুষ, এখনো এই রাত আটটায়। বৃষ্টি কমে গেছে, তবু ঝির ঝির চলছে এখনো। গাড়িবারান্দার তলায় তলায় ভিড় জমে আছে। মানুষের পিন্ড।

রণেন চারদিকে চেয়ে বলে—কি করে যাবি?

—দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি যদি ধরতে পারি।

রণেন মাথা নেড়ে বলল—পারি না।

—তা হলে? মা আর বউদি ভাববে।

রণেন উদাস গলায় বলে—ভাবুক। আয় কিছু খাই। খিদে পেয়েছে।

—খাবে?

দাদার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা সোমেনের নেই। তার বড় লজ্জা করছিল। রণেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গদাই লস্করের মতো হেঁটে বৃষ্টির ছাট উপেক্ষা করে সে ঢুকে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। পিছু পিছু সোমেন। কিন্তু সেখানেও ভিড়। টেবিল খালি নেই। চারদিকে হতাশভাবে চেয়ে রণেন সোমেনের দিকে চেয়ে যেন নালিশ করল—খিদে পেয়েছে।

—বাড়িতে গিয়ে খেও।

অধৈর্যের সঙ্গে রণেন বলে—সে তো অনেক দেরি। বলে সোমেনের দিকে রাগ আর নালিশভরা একরকম চোখে চেয়ে থাকে।

এ ক'দিনেই দাদার ভিতরে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে। সেটা সোমেন এই টের পেল। স্বাভাবিক রণেন এভাবে কথা বলে না, তাকায় না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে সোমেন বলল—শেয়ারের ট্যাক্সি মেট্রোর উল্টোদিকে দাঁড়ায়। চলো, যদি পেয়ে যাই।

রণেন কিছু বলল না। কিন্তু সোমেনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

দু দিন বৃষ্টির পর কলকাতা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখানে-সেখানে কিছু জল দাঁড়িয়ে আছে। তবু রোদ উঠেছে। আকাশ গভীর নীল। দু দিন সাংঘাতিক বৃষ্টি হয়ে গেল। সবাই ঘর-বন্দী। এই দু দিন সোমেন কেবলই শুনেছে দাদার ঘর থেকে দাদা মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে বলছে—দরজা খুলে দাও। জানালা খোলা রাখো।

—বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজে যাচ্ছে। বউদি রাগ করে বলে।

দাদা তখন ভীষণ হতাশভাবে বলে—ওঃ হোঃ হোঃ! ইস্, কী অন্ধকার। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মা প্রায় সারাক্ষণ ঐ ঘরে। এ ঘরে একা সোমেন। বুকের মধ্যে দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দাদার কী হয়েছে? মাঝে মাঝে ও ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসে। দাদা নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে, কিংবা মাথা হাঁটুর ফাঁকে রেখে বসে। ছেলেমেয়ে-দের মুখ করুণ, শুষ্ক। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে বাবার কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে। বেশীর ভাগ সময়েই বাইরের ঘরে খেলা করে। বউদি ভাল করে খায় না। রাতেও বোধ হয় ঘুম নেই। শরীর এ ক'দিনেই শুকিয়ে গেছে। একটা বিপদের আশঙ্কায় থমথম করে ঘরের আবহাওয়া। ঘরে তাই সোমেনের মন টেঁকে না।

সোমেন এ কয়দিন খুব সিগারেট খেল। ভাবল। কেমন যেন মনে হয় এবার সংসারে একটা পরিবর্তন আসবে, ছক পাল্টাবে। সেই আগের মতো নিশ্চিন্ত জীবন আর থাকবে না।

গভীর রাতে একদিন ঘুম ভেঙে শুনল কলের গান বাজছে। খুব আস্তে বাজছে, আর সেই সঙ্গে বাইরের ঘরে কার যেন নড়াচড়ার শব্দ, গভীর শ্বাস আর 'আঃ উঃ শব্দ।'

দরজা খুলে সোমেন অবাক হয়ে দেখে, অদ্ভুত দৃশ্য। আলো জ্বালা হয়নি, তবু জানালা সব খোলা বলে বাইরের আলো এসে পড়েছে। রেডিওগ্রামের চৌকো ব্যান্ডে আলো জ্বলছে, স্থির হয়ে আছে সবুজ ম্যাজিক আই। আর রেডিওর সেই আলোর চৌখুপীর কাছে একটা মাথা অনড় হয়ে আছে। প্রথমটায় আবছায়ায় বুঝতে পারেনি সোমেন। তারপর দেখে, দাদা একটা আন্ডারওয়্যার মাত্র পরে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে। রেডিওর স্পিকারটা নীচুতে। স্পিকারের সঙ্গে কান লাগিয়ে শুনছে রবিঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া গানের রেকর্ড—'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ...'

সোমেন আস্তে করে ডাকল—দাদা!

রণেন মুখটা ঘুরিয়ে তাকে দেখল, তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে বলল—চুপ।

আবার গান শুনতে লাগল। রেকর্ড ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে চালিয়ে দিল। সোমেনের দিকে ফিরেও তাকাল না। বোধ হয় ভুলে গেল যে কেউ তাকে দেখছে। দীর্ঘকাল সে যেন গান শোনেনি। আকণ্ঠ পান করে নিচ্ছে, যেমন চৈত্রের মাঠ শুষে

নেয় বৈশাখের বৃষ্টি। এখন ওর আর কেউ নেই, ঐ গানটুকু, ঐ কাঁপা কাঁপা রিক্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া।

বহুকাল কাঁদে না সোমেন। কোনোকালে তার চোখে জল আসে না সহজে। এখন হঠাৎ হাতের পিঠে চোখ মুছল। গলা, কণ্ঠা অবরোধ করে কান্না উঠে আসে। সোমেন ঘরে এসে অন্ধকার হাতড়ে সিগারেট ধরায়। বসে থাকে। ঘুম হয় না।

দুদিন বৃষ্টির পর রোদ উঠতেই সে বেরিয়ে পড়ল সকালে। যাওয়ার জায়গা অনেক আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় যে যেতে ইচ্ছে করছে তা বুঝতে পারছিল না। বুকের মধ্যে টনটন করে গুপ্ত ব্যথা। একা থাকতে ইচ্ছে করে। মেঘভাঙা রোদে ভ্যাপসা গরম। বাতাস নেই। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ হেঁটে সোমেন যখন আবার বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে যাচ্ছিল তখনই দেখে পূর্বা আগে আগে যাচ্ছে।

সোমেন ডাকল—এই।

পূর্বা চমকে ফিরে তাকিয়েই হেসে ফেলল—ইস, এমন ভয় পাইয়ে দিস না।

—ভয়ের কি?

—রাস্তায় কেউ আচমকা ডাকলে ভয় করে না? তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।

—সে বুঝেছি, নইলে এ পাড়ায় তোর আর কে লাভার আছে!

—গাঁট্টা খাবি। ছ্যাবলা কোথাকার!

—সংবাদ কি শুনি বৃন্দেদূতী।

পূর্বা মুখ ভ্যাঙাল। বলল—জানি না। অনিল রায় তোকে ডেকেছেন।

—কেন?

—বললেন, সোমেনের নাকি চাকরি দরকার! আমার ডিপার্টমেণ্টে একটা পোস্ট খালি আছে, ওকে দেখা করতে বলো।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমার চাকরির দরকার সে কথা ওকে বলল কে?

পূর্বা উদাস গলায় বলে—কে জানে। তোমার তো হিতৈষী আর হিতৈষিণীর অভাব নেই। আমাদের জন্যই কেউ ভাবে না।

সোমেন খুব নাক উঁচু গলায় বলে—কি চাকরি জানিস?

—না। তবে প্রফেসারী নয় এটুকু বলতে পারি।

—এম এ পরীক্ষা দিই নি বলে ঠেস্ দেওয়া হচ্ছে।

—আহা, কী এমন বালিশটা যে ঠেস দেবো?

সোমেন হাসল। বলল—চা খাবি?

—তোর বাসায়? না বাবা, রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়ে ভাল হল। একদিন তোর বাড়ি গিয়েছিলাম, অনেক দিন আগে, তুই ছিলি না। তোর মা সেদিন আমার জাত গোত্র জিজ্ঞেস করে অস্থির ক'রে তুলেছিল। পালিয়ে বাঁচি। আজও ভয়ে ভয়ে যাচ্ছিলাম, নেহাত চাকরির খবর না দিলে নয়।

—আমার চাকরির খবরে তোর অত ইণ্টারেস্ট কেন? সোমেন মিচকে হেসে বলে।

—আহা! বেকার বসে আছিস না।

—থাকলেই কি?

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বাসস্টপে চলে এল। রবিবার। বাস ফাঁকা যাচ্ছে। সোমেন একটা আটের বি থামতে দেখে বলল—ওঠ।

অবাক হয়ে পূর্বা বলে—কোথায় যাবি?

—হাওড়া। তারপর ট্রেন ধরব।

—তোকে নিয়ে আজ পালিয়ে যাচ্ছি।

—ওমা। কেন?

ক্রমশ

চিত্র প্রদর্শনী

সমকালীন চিত্রকলা ক্ষেত্রে যে কয়জন শিল্পী সম্প্রতি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। শহর থেকে দূরে পুরুলিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে থেকে এই শিল্পী গত কয়েক বছর যাবৎ ছাত্রদের শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নীরবে শিল্পচর্চা করে আসছেন। যাঁরা এই শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কন শৈলীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা আকাদমি গ্যালারীতে সম্প্রতি আয়োজিত প্রদর্শনীটি দেখে চমকিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। শহরের কৃত্রিম, জনবহুল পরিবেশ ও সেই সঙ্গে শহরকেন্দ্রিক রচনা রীতি পরিহার করে দূরে থেকে এই শিল্পী এত দিন যাবৎ প্রধানত দেশীয় লোকচিত্র ভিত্তিক ছবি এঁকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পকলা ক্ষেত্রে পরীক্ষা, বিবর্তন তথা অগ্রগতি অপরিহার্য। শিল্পী-জীবনে একই রীতি অবলম্বনে হয়ত বা রস সৃষ্টি করা যায়—রসিকবর্গও তা গ্রহণও করেন। কিন্তু রসিক চিত্ত চায় বৈচিত্র্য। কি সাহিত্যে, কি শিল্পকলায় কি সঙ্গীতে একজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর কাছে সকলেই পেতে চান নতুন ও বিচিত্রতর রসের সন্ধান—তাই সব ক্ষেত্রেই চাই পরীক্ষা ও রস সৃষ্টির নতুন প্রেরণা। নতুনতর রস সৃষ্টি করাই শিল্পী জীবনের ধর্ম ও সেজন্যই চাই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী তথা আত্ম-প্রকাশের উপযোগী ভাষা। শিল্পী হিসাবে রামানন্দও ঠিক সেই পথই অনুসরণ করেছেন। রেখাভিত্তিক দেশীয় লোক-চিত্রেরই তিনি অপূর্ব কৌশলে সরলীকরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, রেখা, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত অবলম্বনে তিনি পরিচিত লোকচিত্রের এবার বিচিত্র সুন্দরতর ও আরও আকর্ষণীয় রূপদান করেছেন। নিজস্ব ভাষায় অতি অল্প কথায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বলিষ্ঠ রেখা মাধ্যমে তিনি প্রাচীন লোকচিত্রের আধুনিক রূপকরণ করেছেন—ফলে, অধি-কাংশ ছবিই হয়েছে অনবদ্য ও সহজবোধ্য। প্রথমেই চোখে পড়ে যায় ডটার অব দি সয়েল—অবশ্য আকাদমির বার্ষিক প্রদর্শনীতেও এটি সকলে দেখে থাকবেন। ছবিটি ইঙ্গিত প্রধান। তুলির মাত্র কয়েকটি বলিষ্ঠ টান, হালকা হলুদ রঙ ও কপালে উজ্জ্বল একটি সিন্দুর বিন্দুর মধ্য দিয়ে শিল্পী পল্লীবালার অনবদ্য সরল রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রেখা প্রধান অজ ও
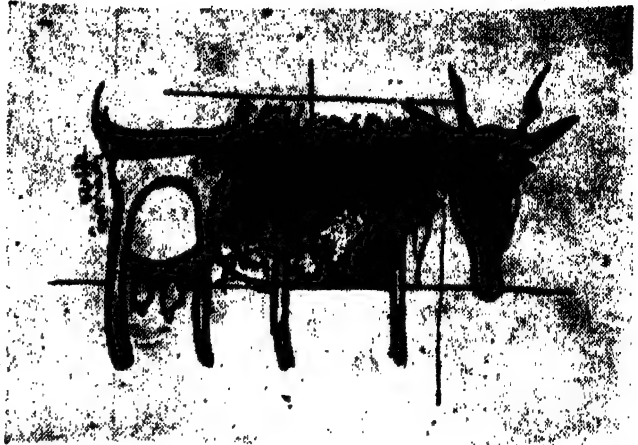
অজ —রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেসটিভ মুডও উল্লেখ্য। আকার সরলী-করণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক ধর্মী। পরীক্ষা-কালে কয়েক স্থলে শিল্পী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রায় বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করেছেন, যেমন বৃত্ত, চতুর্ভুজ ও বলিষ্ঠ রেখা অবলম্বনে আঁকা হলুদ ও ইণ্ডিয়ান রেড প্রধান পেয়ার অব ব্লু আইজ বা তুলির বাঁকা বাঁকা বলিষ্ঠ রেখা প্রধান অ্যাব লিবিটাম। শিল্পী যে ভিন্নতর রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন এই শ্রেণীর নিদর্শনগুলি দেখে তা বোঝা যায়। আর একটি কথা, এ শিল্পীর রচনা দেখা-মাত্র সনাক্ত করা যায়—শিল্পী হিসাবে এটিই তাঁর নির্ভুল পরিচয়পত্র। এই প্রসঙ্গে গভীর লাল ও নীল রঙের কোলাজ ড্রিম পদ্ম, ও বিশেষ করে সুগভীর লাল রঙে আঁকা প্রতীকমূলক স্প্রিং উল্লেখ্য। গ্রামের অতি পরিচিত দৃশ্য পরিমিত রেখা ও গভীর নীল রঙের মধ্য দিয়ে কিভাবে স্বপ্নের মায়ালোকে রূপান্তরিত করা যায় তার প্রমাণ মেলে গসিপ-এ। পরীক্ষামূলকভাবে শিল্পী পোড়ামাটির কাজও করেছেন। বলা বাহুল্য, রিলিফ জাতীয় নিদর্শনগুলিতেও আদিম জাতীয় একটি নিছক সরলতা ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ে লিথো প্রিণ্ট সান-জে-নাহা। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে বেজ, অপূর্ব ফ্লুরিং প্রসেশন, কয়েকটি স্কেচ

পোড়ামাটির নিদর্শন —রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও বিশেষ করে ছোট্ট নিসর্গ দৃশ্য ফার ক্রম দিয়ার উল্লেখ্য। লোকচিত্র অবলম্বনে অনেকেই ছবি আঁকেন, তবে রামানন্দর বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাচীন শিল্পধারার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামের নরনারী শিশুকে যেন সম্পূর্ণ নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন—এক কথায় শিল্পীর মানসকাননে যেন একে একে রূপ-রস-গন্ধ-ভরা নতুন ফুল ফুটে উঠেছে।

*

বিড়লা আকাদমিতে শিল্পী অশেষ মিত্র ও সুজাতা দাসের একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শিল্পী হিসাবে অশেষ মিত্র পরিচিত, তবে এবারের প্রদর্শনীতে তাঁর একটি বিশেষ রূপের পরিচয় পাওয়া গেল। চিত্রকলা বিভাগের যে দুটি শাখা আজ প্রায় অবহেলিত, শিল্পী সেই দুটি ক্ষেত্রেই কাজ করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। অর্থাৎ শিল্পী স্টিল লাইফ ও প্রতিকৃতি এঁকেছেন। বলতে বাধা নেই, দুটি ক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব দাবী করেন। প্রতিকৃতির মধ্যে বি (লেনিন) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষত মুখমণ্ডলে দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু প্রকাশ করার জন্য। এ (টোনিয়া)-র মুখের নিছক সারল্য ও রঙ ব্যবহার রীতি দেখে অনেকে খুশী হন। তবে শিল্পীর স্টিল লাইফ নিদর্শনগুলি দেখার মত, কমপোজিশন রীতিও লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে আপেল, আঙুর, মদের বোতল ও আধ গ্লাস জল কেন্দ্র করে আঁকা ছবির নাম করা যায়। নির্ভুল ড্রয়িং ও রঙ ব্যবহার-চাতুর্যের জন্য সব স্টিল লাইফ নিদর্শন-গুলিই বার বার দেখতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ করে ই, এফ ও এইচ স্টিল লাইফের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। সুজাতা দাসের ছবিগুলি প্রায় বিমূর্ত শ্রেণীর, যদিও ইঙ্গিত প্রধান দু-একটি নিদর্শনও চোখে পড়ে। শিল্পী চাপা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। রঙ ব্যবহার রীতিতে আড়ষ্টভাবে না থাকলেও কয়েক স্থলে শিল্পীর বক্তব্যটুকু যেন স্পষ্ট হয়নি। অপর পক্ষে, প্রতীকমূলকভাবে রচিত দু একটি ছবিতে শিল্পী ইঙ্গিত মাধ্যমে হয়ত বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং দু এক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন—যেমন থ্রি জেনারেশনস। শিশুর দুটি কচি হাত, যুবার বলিষ্ঠ হাত ও সেই সঙ্গে যষ্টি নির্ভর বৃদ্ধের হাতের প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিল্পী তিন পুরুষের পার্থক্য তথা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনার দিক থেকে ইন মেমোরিয়াম ও নীল ও লাল রঙের সুকৌশল ব্যবহারের জন্য শ্যাটারড মুনও উল্লেখ্য।

*

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনীটি দেখে বোঝা যায় যে, দীর্ঘকাল এই কলেজটি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা সকলে নিয়মিতভাবে ঘর বা বাইরে শিল্পচর্চা করে গেছেন। এই কলেজের শেষ বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় ১৯৭১ সালে। অবশ্য সেই তুলনায় এবারকার নিদর্শন সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী-গণ যে নিয়মিতভাবে স্কেচ বা স্টিল লাইফ স্টাডি করেন তার পরিচয় মেলে। বিশেষ করে কমার্সিয়াল বিভাগে কয়েকজন প্রশংসা দাবী করেন। ভাস্কর্য নিদর্শনও অল্প তবে দু একটি মন্দ লাগেনি। তবে গ্রাফিক প্রিন্ট নিদর্শন বিশেষ চোখে পড়েনি। আশা করি আগামী বার্ষিক প্রদর্শনীতে অধিকতর সংখ্যার বিভিন্ন নিদর্শন দেখা যাবে। ফাইন আর্টস বিভাগে জল ও তেল রঙে সকলে কাজ করেছেন, পেনসিল ও কালি-কলমের কয়েকটি স্কেচও চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য অধিকাংশই পরীক্ষামূলক এবং অংকনরীতির দিক থেকে দু-একজন আধুনিক ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রতিমা রায়ের দি এমব্লেম অব লাইফ-এর নাম করা যায়। মাথার খুলি ও শাঁখকে কেন্দ্র করে রচিত ছবিতে শিল্পী সম্ভবত প্রতীকের মধ্য দিয়ে বিবাহ ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী পরিণামের উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রেড্ডির ক্রিয়েশন ও কৃষ্ণ পালের স্টেয়ারকেসও এই সঙ্গে উল্লেখ্য। লাইফ স্টাডিতে সুখেন্দু সাহা লাইফ এ/বি ও কৃষ্ণ পাল (লাইফ) কৃতিত্ব দাবী করেন। আরও একখানি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ঈশ্বর দত্ত পাণ্ডের মিউজিসিয়ান। স্টিল লাইফে দীপঙ্কর দত্ত ও পুলিন চক্রবর্তী প্রশংসা দাবী করেন? শিক্ষার্থী শিল্পী হিসাবে ইলা দে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকজন নারী ধান কুটছেন—এই পরিবেশটুকু শিল্পী সুন্দরভাবে কমপোজিশনে প্রকাশ করেছেন। পল্লীগ্রামের স্বাভাবিক রূপ হিসাবে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রমালা অনেকের চোখে পড়ে। দু-চারটি স্কেচ দেখেও অনেকে খুশী হন, বিশেষ করে সুদর্শন রায়, রামমোহন রেড্ডি, চন্দন নন্দী ও অজিত দাসের। কমার্সিয়াল বিভাগে প্রথমেই হরিমোহন বাগালি [illegible] আকর্ষণ করেন, বিশেষত প্রাচীরপত্র, রেকর্ড কভার ও বিজ্ঞাপন লে-আউটের জন্য (এম টি পি, পপ সঙ এ বি ও ই টি সি)। প্রাচীরপত্রের আবেদনের দিক থেকে দীনেশ দাসের স্মল পক্সও উল্লেখ্য। বিজ্ঞাপন লে-আউট হিসাবে টুরিস্ট ব্যুরো (ইলা দে) ও গরিবী হটাও ব্যাংক (দীনেশ দাস) অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফোল্ডার হিসাবে লোকনাথ কুণ্ডুর হ্যান্ডি ক্র্যাফটস মন্দ লাগেনি। ভাস্কর্য বিভাগে সুনীল দাসের দু-একটি নিদর্শনে সমকালীন চিন্তাধারা ও খোদাই তথা গঠন পদ্ধতির পরিচয় মেলে। এই প্রসঙ্গে টরসো-র (কাঠ) বিশিষ্ট আকারবৈচিত্র্য ও হেড স্টাডির (প্লাস্টার) বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গী দ্রষ্টব্য।

চিত্রপ্রিয়

ভারতের অর্থনীতি

১৯৭৫-৭৬ সালের রেলওয়ে বাজেট

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য যে রেল বাজেট লোকসভায় পেশ করেছেন তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যাত্রী-ভাড়া আগামী বছর আর বাড়ছে না। ১৯৭৫-৭৬ সালে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর উপর শুল্ক পুনর্বিন্যাসের ফলে ৩৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে এবং রেল বাজেটে ২৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হবে। চলতি বছরে রেলওয়ের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ১২৮ কোটি টাকা হবে; গত বছর বাজেট পেশ করার সময় ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৫৩ কোটি টাকা। রেলওয়ে ধর্মঘট, খরচ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেই ঘাটতির পরিমাণ এত বেড়েছে। তার উপর প্রায় ১৬ কোটি টাকা লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিল বাবত আলাদা খরচ ধরার দরুন মোট ঘাটতির পরিমাণ এ বছর ১৪৪ কোটি টাকা হবে। সে ক্ষেত্রে ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য একটি উদ্বৃত্ত বাজেট তৈরি করে সরকার অনেককেই বিস্মিত করেছেন। কিন্তু পণ্য-সামগ্রীর উপর মাসুল বাড়িয়ে যে ৩৯ কোটি টাকা আয়ের কথা বলা হয়েছে তাতে খাদ্যসামগ্রী, আকরিক লোহা এবং আকরিক ম্যাঙ্গানীজ অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তার ফলে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে কিলো প্রতি '২½ পয়সা পরিবহণ খরচ বাড়বে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বাড়তি খরচের বোঝা সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হবে। রেশনের দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম বাড়লে খোলা বাজারেও তার দাম বাড়বে। অবশ্য রেলমন্ত্রী বলেছেন, এ বছর রবিশস্যের ফলন ভাল হওয়ার দরুন কয়েক মাস পরে খাদ্যসামগ্রীর দাম আর বাড়বে না। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পরিবহণ খরচ বেড়ে যাবার দরুন খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়বেই এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর তার প্রভাবও প্রতিকূল হবে। রেল-ওয়ে কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে রেলওয়ের অবদান দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে; এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সাধু। রেলমন্ত্রী আরও বলেছেন যে, কয়লা সরবরাহের অবস্থা উন্নত হবার দরুন বিগত রেল ধর্মঘটের সময় বাতিল করা কয়েকটি ট্রেন আবার চালু করা হবে এবং আশা করা যায় এ বছরে রেলওয়ে অতিরিক্ত এক কোটি

আশি লক্ষ টন মাল বহনে সক্ষম হবে। রেলের যে খরচ বেড়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল রেলওয়ে পরিবহণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয়। রেলওয়ের আর্থিক ভিত সুদৃঢ় করতে হলে রেলের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং বহু ক্ষেত্রে দুর্নীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে বলা হয়েছে, কলকাতার পাতাল রেলের জন্য মোট খরচের পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকার জায়গায় ২৫০ কোটি টাকা হবে এবং এজন্য পাতাল রেলের কাজ নতুন করে পর্যালোচনা করা দরকার। রেল-কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত, পাতাল রেলের কাজ সমাপ্ত করতে যত দেরি হবে তত খরচের পরিমাণ আরও বাড়বে। ১৯৭৪-৭৫ সালে কলকাতার পাতাল রেলের জন্য যেখানে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; এটা কি এই প্রকল্প নতুনভাবে পর্যালোচনা করার প্রথম পদক্ষেপ?

১৯৭৫-৭৬ সালের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আশার বাণী

ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ (National Council of Applied Economic Research), সম্প্রতি ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন তাতে ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চলতি বছরের মতো নৈরাশ্যজনক হবে না বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিষদের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীএম্‌ ভূতলিঙ্গম এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে রবিশস্যের ফলন ভাল হবে এবং কয়লা, বিদ্যুৎ ও রেল পরিবহণের অবস্থা আরও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজও আগামী আর্থিক বছরে আরও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে যদি ১২০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবুও দেশে খাদ্যের চাহিদা মেটানো পুরোপুরি সম্ভব হবে না। দেশে খাদ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা মেটাবার জন্য আগামী বছর অন্তত তিন মিলিয়ন থেকে চার মিলিয়ন টন পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই পরিষদের প্রতিবেদনে ১৯৭৪ সালে শিল্প-উৎপাদন ২ থেকে ৩ শতাংশ বেড়েছে বলে বলা হয়েছে; ১৯৭৫ সালে অবস্থার আরও উন্নতি হবে আশা করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ২ থেকে ৩ শতাংশ শিল্প-উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার কথা বলা যতটা সহজ, প্রকৃত হিসাবের পরিমাপ করা ততটা সহজ নয়; কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১ শতাংশের হেরফের খুব কম পরিমাণ নয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশের মোট আমদানির পরিমাণ ৪২০০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমিত হয়েছে; এই টাকার মধ্যে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ৬০০ কোটি টাকা এবং তেল আমদানির জন্য ১৩০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। অপর দিকে, উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-মন্দা পরিলক্ষিত হলেও ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৩৫০০ কোটি টাকা হতে পারে। তা হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য থেকে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে তেল আমদানির সুবিধা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধার পাওয়া যাবে তা থেকে এই ৭০০ কোটি টাকার ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অবস্থা যে খুব আশাপ্রদ থাকবে তা নয়; তবুও উৎপাদন বাড়াবার প্রয়াসে বৈদেশিক বিনিময়-মুদ্রার অভাব একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

অদূর ভবিষ্যতে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বাড়বে বলে মনে হয় না,—পরিষদের প্রতিবেদন-পত্রে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বৃদ্ধি না হওয়ায় বিনিয়োগ যে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে সে কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে সরকার এবং সরকারী সংস্থাগুলির বিনিয়োগের জন্য ৫০০০ কোটি টাকার চেয়েও কম টাকা পাওয়া যাবে এবং সমস্যা হল, কিভাবে এই সীমায়িত সম্পদের বণ্টন করা হবে। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদের প্রতিবেদনে একটি সুষ্ঠু ও বাস্তব মূল্যনীতি অনুসরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, চলতি বছরে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন শেষ পর্যন্ত ১১০ থেকে ১১১ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে। বস্ত্র ও চিনি উৎপাদনে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। কৃষিখাতে আরও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং রেল, সড়ক ও জল পরিবহণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা দরকার বলে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। কয়লার উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালে ৮৮ মিলিয়ন টন হয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে; ১৯৭৫-৭৬ সালে হয়তো কয়লার উৎপাদন বেড়ে ১০০ মিলিয়ন টন দাঁড়াবে, কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থায় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে বলেও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সম্পর্কিত জাতীয় পরিষদের প্রতিবেদনে ১৯৭৫-৭৬ সালের অবস্থা যতটা আশাব্যঞ্জক বলে চিত্রিত হয়েছে, বাস্তবে তা-ই হবে কিনা সে কথা বলা যায় না। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কিছু বাড়বে ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্প-বিনিয়োগ ও শিল্প-উৎপাদন যে খুব বাড়বে তা মনে হয় না। বর্তমানে যে মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা একটি সাময়িক ব্যাপার নয়। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হলেও এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে জরুরী তা হল দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা। ১৯৭৫-৭৬ সালে উৎপাদন বাড়াবার সক্রিয় চেষ্টা নিশ্চয়ই চলবে। কিন্তু সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার সফল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি; খাদ্যশস্য সংগ্রহনীতিও সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়নি।

সুব্রত গুপ্ত

॥ পনেরো ॥

জানী শুনতেই পায়নি যেন। নাকি, সত্যি সত্যিই শোনেনি! আমার চোখে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলে,

—"উঁ?"

সামান্য হতাশ হলুম। মনে মনে পিছিয়ে এলুম একটু। ও যদি আমার প্রশ্নটি শুনেও না শোনার ভান করে থাকে, তা, অসুবিধে নেই। কিন্তু, যদি সত্যি সত্যিই না শুনে থাকে তাহলে একটু সতর্ক হয়েই আশেপাশের ঝোপ পেটানো উচিত। নিজেকে একলা না রেখে দলবল সমেত প্রশ্নটি করলুম আবার,

—"আমাদের এই বাদামী রং কেমন লাগে তোমার?"

ও একেবারে ঘুম ভেঙে উঠল। অন্য কোনো জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল,

—"ভালো। দারুণ ইন্টারেস্টিং। চামড়া ট্যান করার মত কসরৎ করি আমরা ওখানে। গরমকালে সমুদ্রের বালিতে উপুড় হয়ে খালি গায়ে শুয়ে থাকি। দিনের পর দিন চামড়ায় রোদ লাগিয়ে গায়ের এই ফ্যাকাশে ভাবের ওপর একটু রং চড়াতে চেষ্টা করি। আর, তোমাদের কোনো ব্যাপারই নেই, এমনিতেই অ্যাতো সুন্দর ব্রাউন্ড্ রং—চোখ জুড়িয়ে যায়।"

ওর কথার ধরনে কোনো কিছুর আভাস নেই। গুবরে পোকার সামান্যতম গন্ধও নেই ওর চাউনিতে। সোজা অম্লান মুখে তা কয়ে আমাদের দেশের গাঢ় চামড়ার প্রশংসা করল। নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিলুম। মুহূর্তের মধ্যে ওকে নিয়ে আমার শারীরিক চিন্তা উবে গেল। ভালো করে খোলা চোখে ওকে দেখলুম আবার। সোজা সরল অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। কোনো গ্লানি নেই, কোনো অন্যায়বোধ নেই, সাদাসিধে মনের চেহারাটি স্নিগ্ধ মুখের ওপর ফুটে উঠেছে। ও বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছিল তখন। একেবারেই অন্য কোনো কথা। যার ত্রিসীমানাতেও আমি ছিলুম না, ছিল না কোনো শারীরিক ইচ্ছার বীজ।

কিন্তু, ভেবে দেখলুম, আমিও তো কোনো অন্যায় করিনি। মানুষের মুখের মতোই প্রত্যেকটি শরীর অন্য শরীর থেকে আলাদা। জগৎ সংসারের প্রতিটি নারী ভিন্ন ভিন্ন। গণনায় নির্ভুল হয়তো সকলেরই দুটি হাত, দুটি পা, দু বুক, দুটি চোখ সমান সমান। কিন্তু, তুলনার দাঁড়িপাল্লায় প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা। শিপ্রার সঙ্গে বীথিকার শরীরের কোনো তুলনা চলে না। ঊর্মি বা মধুস্মিতায় কোনো মিল নেই। অর্চনার শরীরের গন্ধ জানীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তুমি যেমন পৃথিবীর একা একটি নারী, রোজমারীও তেমন। সকলেই হয়তো সুন্দর। নানা রূপে, নানা ভাবে। তাছাড়া, তোমাদের স্বর্গীয় ভাষায় সেই, 'একনিষ্ঠ প্রেম কাহাকে বলে' জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিব না। পরীক্ষা পাশের আশায় হয়তো বলিয়া বসিব, 'সোনার পাথর বাটি জাতীয় কোনো ভারী পদার্থ।' সেক্ষেত্রে, আমার হৃদয় যদি শরীরে ভর করে জানীর শরীরের গন্ধ কি রকম জানতে চায়, খুঁজতে চায় অপরিচিত, ভিন্নতর অনুভূতি ওর দেহের ভিতরে—তাতে আমি তো কোনো দোষ খুঁজে পাই না। কারণ, এইরকম খোঁজাখুঁজির ইচ্ছা কমবেশী প্রায় সকলেরই আছে—সেই সঙ্গে আছে ভয়, অন্য প্রাণীর ভয়, সমাজের ভয়, লজ্জাজনিত ধিক্কার বা পরাজিত হবার আতঙ্ক। এইসব ইচ্ছা কারো কারো আপন অজ্ঞাত মস্তিষ্কের কোষে সুপ্ত, কারো দৃপ্ত, কারো ভীত, কারো বা নির্ভীক। অনেক মানুষ-মানুষী এই খোঁজাখুঁজি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যেমন তুমি অথবা রোজমারী,—ইচ্ছা মরে যায় তখন। অনেকে আবার একটি মাত্র শরীরেই খুঁজে পায় সহস্র সুখের ইচ্ছার ছোটাছুটির দরকার হয় না আর। তখনই কি তাকে বলে একনিষ্ঠ প্রেম? [illegible] জানে, আমি তো জানি না। কারণ, আজ অবধি কোনো মানুষীর মধ্যেই আমি অন্য কোনো দ্বিতীয়ার গন্ধ খুঁজে পাইনি। আমার কাছে, প্রত্যেকটি মানুষই আলাদা আলাদা। অদ্বিতীয়া সবাই।

জর্জের বাইরে অন্য কিছু খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হয়তো নেই জানীর। অন্তত, এই মুহূর্তে আমাকে খুঁজে দেখার কোনো ইচ্ছাই ওর নেই। নিজেকে গুটিয়ে নিলুম। শরীরের সব কোষ, প্রশ্বাসগুলি আলগা করে দিয়ে দম ফেললুম যেন। মনে হল, ভাগ্যিস ধড়ফড় করে এগিয়ে যাইনি। তাহলেই, যে নারী এক নয়ের মধ্যে সহস্র সুবাস খুঁজে পেয়েছে ভেবে তৃপ্ত, তার চোখে বড় ছোট হয়ে যেতুম। কারণ, আমার অন্বেষণের সুপ্ত ইচ্ছায় খবর পেয়ে গিয়ে ও হয়তো আমাকে ঘৃণা করত, করুণা করত। সময় দিয়ে ঘষে ঘষে হেঁয়ে যাবার গ্লানি আমাকে ধুতে হত।

গেলাসে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বললুম,

—"দ্যাখো জানী, কি মজার ব্যাপার! তোমরা চাও আমাদের মতো গায়ের রং হোক তোমাদের। আমাদের চামড়ার সাবানের পর সাবান ফুরিয়ে যায় আর ভাবি, ইস্, তোমরা কি ফরসা!"

জানীও গেলাস হাতে তুলে বললে,

—"দূর। ফরসা না ছাই! এটা কি একটা রং—" বলে, নিজের বাঁ হাতের ধবধবে উল্টোপাল্টা দেখাল, "এ তো একেবারে সাদা ক্যানাভাস, কোনো রংই নেই।"

দুজনেই হেসে ফেললুম। বললুম,

—"তবু দেখ, দুনিয়ার কয়েক লক্ষ সাদা চামড়া এখনো আমাদের ডার্টি নিগার বলে। কালো চামড়াকে ঘেন্না করে, নোংরা মনে করে।"

—"সেটা পুরোপুরি পলিটিকাল ব্যাপার। বহুকাল ধরে প্রভু-ক্রীতদাসের সম্পর্ক থেকে ওই ধরনের নোংরা ভাবনা কিছু নোংরা লোকের মধ্যে জমা হয়ে আছে।"

—"কে নোংরা, কি নোংরা—" বলতে বলতে জর্জ ঢুকে পড়ল ঘরে। দুহাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখেছে ছোট কাঠের গুঁড়ি।

জানী হাসতে হাসতে বলল,

—"নোংরা আবার কে, তুমি ছাড়া! সারা ফ্রান্সে তোমার মতো নোংরা লোক দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ফায়ার প্লেসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গিন্নীর ঠাট্টার জবাব দিল জর্জ,

—"কেন ডার্লিং, আমি আবার নোংরা হতে গেলাম কেন! হপ্তায় কম-সে-কম চার দিন চান করি—নোংরা বললেই হলো!"

এ রাজ্যে স্নানের ব্যাপার-স্যাপার এই-রকমই, বউ! সপ্তাহে চার দিন চানও সকলে করতে চায় না বা পারে না। একে তো এই শীতকালের চামড়াছেঁড়া ঠাণ্ডায় স্নানের ইচ্ছেই কমে যায়, তার ওপর সকলের ঘরে ঘরে স্নানের সুবিধেও নেই। স্নান বলতে, মাথা থেকে পা অবধি সর্বত্র জল ঢালতে গেলে পয়সা লাগে। ফলে, বেশির ভাগ

নাকই বেসিনে, মুখহাত ধুয়ে খুশি। দের বেসিনের সুবিধেও নেই, তারা হয়তো প্তাহে একদিন পাবলিক বাথে গিয়ে রিষ্কার হয়। অনেকে আবার তাও করে না পারে না। গায়ে-গতরে এসেন্স মেখে রে বেড়ায়। স্নানের ঘটনা তাদের কাছে বিলাসিতার সমান। দেশে বসে ভাবলেই মন গা ঘিন-ঘিন করে। তবে, এখানে কটা বিরাট সুবিধে, ঘাম ব্যাপারটি প্রায় ই বললেই চলে। হাত তুলে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরলে বিতিকিচ্ছিরি ভেজা গলের জন্যে কলকাতার অনেক সুন্দরীই আমাদের যুবক চোখে নাকচ হয়ে যেত, খানে সে ঝামেলা নেই।

—"না, না! তোমার স্নানের কথা বলছি —" বলে, হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে নী কথা শেষ করলে,

—"ও যখন ছেনি, হাতুড়ি, কাঠের ড়ো, প্লাস্টারের মধ্যে বসে কাজ করে খন দেখলে মনে হয় মিস্তিরি-মজুরের শো ঘর করছি!"

দুজনে যেন সামনে পিছনে পাহারা দিয়ে

ফায়ার প্লেসের সামনে উবু হয়ে সেছে জর্জ। ধিকি ধিকি আগুন তখনো লছে। তার ওপরে এবং চারপাশে কারে কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হল। য়েকবার ফুঁ দিতেই নতুন কাঠগুলি টাপট শব্দে কিছু ফুলকি এবং ধোঁয়া ড়িয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত ঝাড়তে ড়তে জর্জ ঘোষণা করল,

—"এইবার জ্বলবে। সেই কবে কিনে খেছি, এখনো শুকোয়নি ডালগুলো।"

জানীকে বললুম,

—"কই, তোমার পেইণ্টিং দেখাবে না?

জর্জ বললে,

—"ঠিক আছে, চলো শিল্পী! তোমাকে মাদের আতেলিয়ে দেখাই।"

বাইরের দরজার দিকে এগোতেই আমার তঙ্ক হল। বললুম,

—"বাইরে যেতে হবে?"

দরজার হাতলে হাত রেখে জানী বললে,

—"বাইরে, মানে, সামনে উঠোনটুকু রোতে হবে।"

বললুম,

—"কোটটা দাও তাহলে, পরে নিই। ন্ডা লাগে যদি!"

জর্জ এবং জানী দুজনের গায়েই রোহাতা সোয়েটার। আমার হাতকাটা য়েটারটির পেটের কাছে একটু ছেঁড়া ন জামার ভেতরেই পরে নিই।

জর্জ হাসতে হাসতে বলল,

—"উঠোন পেরোতে ঠাণ্ডা লাগলে গামী কালই দেশের টিকিট কেটে ফেল।"

লজ্জা পেয়ে বললুম,

—"না, না, আসলে এখানকার এই তে শরীর তো ঠিক অভ্যস্ত নয়—"

জানী বললে,
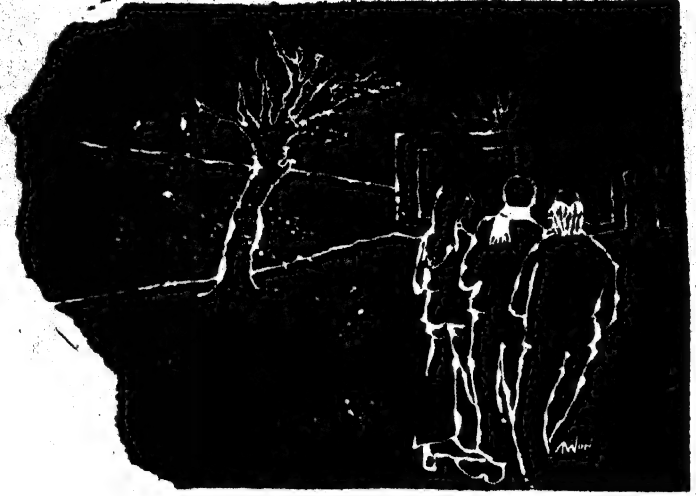
—"দাঁড়াও, কোটটা এনেই দিই। কি দরকার? পট করে ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিপদে পড়ে যাবে বেচারা—"

বলে ও ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বললুম,

—"জামার তলায় অবশ্য আমার একটা গরম সোয়েটার আছে!"

জর্জ আমার পিঠ চাপড়ে বললে,

—"তবে, আবার কি, রাগী যুবক। চলো!"

বলতে বলতে সোফার ওপরে রাখা ওর মাফলারটি আমার গলায় জড়িয়ে দিল। ব্যস্তভাবে বলে উঠলুম,

—"বাস্, বাস্। এখন আর শীতের বাপের সাধ্য নেই আমায় ধরে।"

দরজা খুলতেই শীত এসে নাকে-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তির্ তির্ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টি প্রায় হিম পড়ার মতো। আকাশে ঘন অন্ধকার। বিদ্যুৎ-টিদ্যুৎ চমকানোর ব্যাপার নেই। থিয়েটারের পর্দার মতো নিকষ কালো আকাশ। ওপরে মুখ তুলে তাকাতেই মনে হল, কোনো বিরাটাকার শিল্পী ফ্ল্যাট বুরুশে ল্যাম্প ব্ল্যাক নিয়ে আকাশময় লেপে দিয়েছে। সিমেণ্টে বাঁধানো ছোট্ট উঠোনের বাঁদিকে রাস্তায় বেরিয়ে যাবার গেট। সামনে দেওয়াল। ডানদিকে দশ কদম হাঁটলে লম্বাটে একতলা দুখানি ঘর পাশাপাশি। উজ্জ্বল আলো নেই কোথাও। বসবার ঘরের ঝাপসা আলো এসে পড়েছে উঠোনে। এই এলাকায় পৃথিবী মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা পাখি ডাকছে না, কুকুরের গলাও শোনা যাচ্ছে না, জীবনের সাড়া নেই কাছেপিঠে কোথাও। দেওয়াল ঘেঁষে একটা অচেনা গাছ কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। পাতা নেই, ফুল-ফল সব ঝরে গেছে কঠিন শীতে, বর্ষায়। আগে জানী, পেছনে জর্জ। দুজনে যেন সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে আমাকে শীতটুকু পার করে দিল। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে বাত্তি জ্বালল জানী। তিনজনে ঢুকে পড়লুম ঘরে। জর্জ পেছনের দরজাটি বন্ধ করে দিল আবার। লম্বাটে ঘর। বাঁদিকে অর্থাৎ উঠোনের দিকের দেওয়ালটি

পুরো ফাঁকা। বাইরের অন্ধকার লেগে আছে কাচের গায়ে। ভেতরের আলোয় আমাদের চেহারা দেখাচ্ছে, কাচে কালো আয়নার মতো। সিমেন্টের দেওয়ালে কোনো ছবি টাঙানো নেই। অথচ, কয়েকটি পেরেক ঠোকা রয়েছে। তার মানে একটাই দাঁড়ায়, ওগুলিতে ছবি ঝোলানো থাকে, এখন নেই। লম্বা ঘরটির অপর প্রান্তে ছোট্ট একটি সস্তা কার্পেট। চটের তৈরী বিবর্ণ কার্পেট। না, ঠিক বিবর্ণ বলা যাবে না, রং পড়েছে যেখানে সেখানে। কার্পেটের ওপর তিন পায়ার ঈজেল। ঈজেলে একটি বড় আকারের ছবি। ছবিটির দিকেই প্রথম নজর চলে গেল। বেশ সুখীসুখী ভাবের ছবি। ঝোড়ো, উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে একটি গোলাপী নৌকো। ধূসর আকাশ। নৌকোর একটি সুখী পরিবার গ্রুপ ফোটো তোলার ধরনে, বসে আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বাবা, মা। রঙীন, সুখী একটি সংসার উদ্দাম সমুদ্রের মধ্যে ভেসে চলেছে যেন। বলছে, দ্যাখো, আমরা এই সমুদ্র, এই আকাশকে ভয় পাই না। আমাদের রঙীন নৌকোই আমাদের জীবন। আশে-পাশে যা হবার হয়ে যাক্, আমরা দুলে দুলে সুখে আছি।

সামান্য ডিসটর্টেড চেহারাগুলি। অনেকটা পুতুল-পুতুল ভাব। কোনো ছবিরই কোনো মানে হয় না। নিজের মধ্যে, মনে মনে যা অনুভূত হয়, তাই ছবি। ছবির অর্থ খুঁজতে গেলেই একটি কবিতাকে লণ্ডভণ্ড করা হয়। জিজ্ঞাসার জবাবের খোঁজে কোনো কবিতা বা কোনো শিশুকে যেন মর্গে নিয়ে যাওয়া হল। পোস্ট মর্টেম হবে। ছবি, কবিতার পোস্ট মর্টেম করবেন সমালোচকরা। আমি ওসব বুঝিটুঝি না। একটি ভালো ছবি দেখলেই অনুভূতি আসবে ভেতরে। ব্যাকরণ তো ছবি নয়। অনুভব ছবি অথবা কবিতা। সূর্য ডোবা, সূর্যোদয় দেখতে কেন ভালো লাগে বলতে পারো, বউ! একটি শিশু তার চেয়েও ছোট্ট শিশুকে কোলে শুইয়ে ভিক্ষে করছে দেখলে একটি ছবি দেখা হয়ে যায়। কারণ, তখন সেই দেখার মধ্যে যে কষ্টের বা অস্বস্তির অনুভব—তাই ছবি। ছবি কোথাও কবিতা, কোথাও গল্প, উপন্যাস কখনো কখনো। পেইণ্টিংয়ের বা ক্যানভাসে আঁকা শিল্পসৃষ্টির নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষার ক-অক্ষর গোমাংস হলে ছবি শুধু দেওয়ালেই থেকে যায়, হৃদয়ে আসে না। আধুনিক কালের ভালো ছবি দেখেও, অশিক্ষিতদের বাদ দিচ্ছি, অনেক শিক্ষিত গুণীজন আঁতকে ওঠেন,

—"ও বাবা! এটা কি? [illegible] তো বুঝি না আপনাদের মডার্ন আর্ট-ফার্ট!"

যেহেতু শিক্ষিত, যেহেতু গুণীজন এবং যেহেতু ঘর সাজাবার জন্যে তিনি ঠিকঠাক ফুলের মতো দেখতে ফুলের ছবি বা সীনসীনারি কখনো-সখনো কিনে থাকেন, তাই হেঁ হেঁ করতে হয়। বলা যায় না যে, স্যার, দয়া করে আরো বেশী বেশী ছবি দেখুন। উনিশ শো পঁচাত্তরের হতভাগা শিল্পীদের আর জুতো মারবেন না! কারণ, এ বড় আজব ভাষা, হুজুর! পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে এ ভাষা শেখা ভারী মুশকিল। দেখে দেখে চোখ মন তৈরী হয়। একটি ভালো ছবির রস নিতে গেলে, কবিতার মতোই শিল্প জগতের নিজস্ব ভাষায় সেই রস গ্রহণ করতে হবে আপনাকে, আপন বোধ এবং অনুভূতি দিয়ে।

বাঙালী হয়তো মারাঠি ভাষা বোঝে
রাঠি ভদ্রলোক হয়তো চীনা বা
ী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ। অথচ,
টির আঁকা একটি ছবি মারাঠি, চীনা
াপানীটির কাছে হয়তো অনেক কথা
পারে। আবার, জাপানী বা চীনা
ীর আঁকা কোনো ছবির ব্যথা, বেদনা,
ুঃখ বাঙালী বা মারাঠি লোকটির
বোধের আয়নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে
সেই জন্যেই বউ, শিল্প হচ্ছে গোটা
ংসারের ভাষা। প্রদেশ, দেশ বা মহা-
গণ্ডিতে যে ভাষা আবদ্ধ হয়ে নেই,
া।

মাকে নিয়েও কি আমার কম
গেছে, বাপু! সেই যে, 'এই ছবিটার
ক!' 'ওটার মধ্যে অত বড় একটা গোল
সের?' তোমাকে ছবি বোঝানো আমার
রুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। তবু,
হবে বউ, আমার সঙ্গে গ্যালারী-
ত ঘুরে ঘুরে শেষের দিকে তুমি
একটু রস নিতে পারছিলে।

ন পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা
ি ছবি। মোটামুটি বেশ পাকা হাতের
দেখলেই বোঝা যায়। ইমপ্রেশনিজমের
আঁকা ফিগারেটিভ ছবি। জানীকে

"খুব ভালো ছবি। কিন্তু, আর কই?
ই কটি ছবি রয়েছে স্টুডিওতে?"

নী জর্জের দিকে তাকাল। জর্জ সেই
র হাসি মাখিয়ে বললে,
হুম্ বাবা! বড় বড় শিল্পীদের
এই রকম। আঁকা হতে না হতেই
বিক্রী!"
নীকে জিগ্যেস করলুম,
"মোটামুটি কি রকম দাম করো
এই সব ছবিগুলির?"
নী বললে,
সাত-আটশো থেকে হাজার-বারোশো

বাঃ, মন্দ কি, ভালোই তো!"
বললে,
খদ্দের পেলে তো ভালোই। নিয়মিত
জোটানো যে কি মুশকিল—" বলে,
দিকে ফিরে একটু হাসল। হাসিটি
মন-কেমন। মানে বোঝা ভার।

আঁকার পক্ষে ঘরটির আলো কম
। জানীকে সে কথা বলতেই ও হেসে

রাত্তিরে কে ছবি আঁকবে? দিনের
কাঠের দেওয়াল পেরিয়ে আলো
তবে তো ছবি! তুমি বুঝি রাত্তিরে

ুম,
া ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে।
লাতেও আমার ঘরটিতে প্রচুর আলো
।"

জর্জ বললে,

—"ও। তার মানে, তুমি ন্যাচারাল আলোয় পেইন্ট করো না। আর্টিফিশিয়াল আলোয়!"

—"হ্যাঁ।"

—"তাতে রং বুঝতে অসুবিধে হয় না?"

—"হয় বইকি। তবে, একটা জিনিস ভেবে দেখলে, কৃত্রিম আলোতেই ছবি আঁকা উচিত।"

দুজনে এক সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলে,

—"কেন, কেন?"

—"তার কারণ, যে সব বাড়িতে তোমার আঁকা ছবি টাঙানো থাকবে, সবখানেই প্রায় কৃত্রিম আলো। শহরে আজকাল এমন বাড়ি খুব কমই পাওয়া যায় যাদের দেওয়ালে ছবি দেখার মতো দিনের আলো প্রচুর। সুতরাং যে বা যারা তোমার ছবি দেখবে, তারা বলতে গেলে আর্টিফিশিয়াল আলোতেই দেখবে। সেখানে ন্যাচারাল আলোয় তোমার আঁকা রংয়ের ফারাক হয়ে যাবে অনেক। কিন্তু, তুমি বাতি জেবলে নিজের যে রঙ দিয়ে ছবিটি আঁকলে, গ্যালারী বা ক্রেতার দেওয়ালে তার মোটেই হেরফের হবে না।"

জর্জ গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে আমার সমর্থন করল। জানী বললে,

—"ঘরের মধ্যে বাতি জেবলে ছবি আঁকতে মন কেমন খুঁত খুঁত করে। নীল রঙ সবুজে দেখায়, লেমন হলুদ সাদা—"

হাসতে হাসতে বললুম,

—"ভেবে দেখো, দিনের আলোয় তুমি নীল লাগালে, দর্শকরা গ্যালারীতে ছবিটি দেখে ওই জায়গাটি সবুজ মনে করল—খারাপ লাগবে না তখন?"

জর্জের কাজের জায়গা জানীর পাশের লাগোয়া ঘরটি। একেবারে খালি পড়ে আছে এখন। কিছু কাঠের গুঁড়ো, যত্রতত্র কিছু প্লাস্টার ছাড়া বাকি সব ফাঁকা। জর্জ দু-পাশে দু হাত ছড়িয়ে যেন কৌফিয়তের ভঙ্গিতে বলল,

—"সব বিক্রী হয়ে গেছে—সব!"

বলার ধরনটি স্পষ্ট লাগল না। অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"তার মানে?"

জানী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। জর্জ, মনে হল, কথা ঘুরিয়ে দিল। বলল,

—"আমায় নতুন কাজে বসতে হবে।"

উইকেল পেরিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললুম,

—"তোমাদের টেলিফোনটা কোথায়—একটা ফোন করব।"

জর্জ বললে,

—"কাকে?"

—"একজন বাঙালীকে।"

জর্জ যেন একটু আঁতকে উঠল,

—"প্রাঙ্ক কল।"

—"না। প্যারিসেই।"

ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে দিগেন্দ্রদার টেলিফোন নম্বর চেয়েছিলুম। কলকাতার দিগেন্দ্রনাথ পাল। আমার চেয়ে বয়সে অন্তত আট বছরের বড়। কবিতা লিখতেন কলকাতায়। ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় লিখতেন কলা-সমালোচনা।

বসবার ঘরের পাশে ছোট্ট কুঠুরিতে টেবিলে রাখা টেলিফোন। পকেট থেকে কাগজটি বের করে সাত সংখ্যার নম্বর ডায়াল করতে লাগলুম। রাত প্রায় দশটা। বাড়িতে পাব কিনা কে জানে! এক যুগ বাদে কথা বলব, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে—চিনতে পারলে হয়!

ক্রমশ

চিত্রগত কাহিনী

নীরোদ রায়

আমার আজো মনে আছে, প্রথম দর্শনের দিনই কানাইয়া আমার বিশেষ কৌতূহলের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন তার পোশাকে ছিল দুরোদস্তুর ইয়াঙ্কীর ছাপ। আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে ওর ভাবসাবগুলো লক্ষ করছিলাম। দেখছিলাম য়ুরোপদ্যার একটি নিখুঁত লোকের ক্ষুদে সংস্করণ। ঠিক যেন কেষ্টনগরের ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি কোন পুতুল দেখছি। পুতুলের ভেতর কল-কৌশলে যেন হাত-পা, চোখ-মুখ নড়ছে, কিন্তু কথা বলছে না। ভাবছিলাম, ও কোন্ ভাষায় কথা বলে! আমাদের বাংলা, হিন্দি কিংবা অসমীয়া বুঝবে কিনা। তখন ঠাকুরের কাছেই জানতে পারলাম কানাইয়ার মুখে কোন ভাষাই ফোটেনি আজ পর্যন্ত। কানাইয়া বোবা।

॥ ৩ ॥
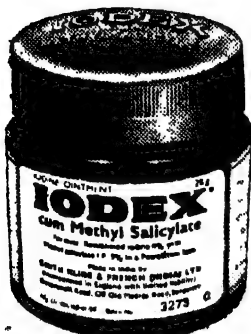
প্রায় তিন ফুটের মত লম্বা। নাম কানাইয়া।

মথুরা-বৃন্দাবনকে লীলাক্ষেত্র করে যে-কানাই শত-সহস্রজনের মনে স্থান করে নিয়েছিল অবলীলাক্রমে, তার তুলনায় মণিপুরের কানাই অন্তত কিছু লোকের মনে স্থান করে নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনেও স্থান পেয়েছিল। তাই আজ দীর্ঘ ২৮ বৎসর পরেও এই ছবিখানা আমার মনকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় মণিপুরের সেই সময়কার পরিবেশে। স্মৃতিপটে যেন দেখতে পাই কানাইয়াকে আমাদের নিত্য সহচর হিসেবে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হামলা-ঝামেলা থেমে গেছে। অবসান ঘটেছে মণিপুর-কোহিমার রণাঙ্গনের ভয়াবহ রূপের। সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সন্ধান করছে একটু সুস্থ আবহাওয়ার। এ সময় আমরা চারজনের একটি দল মতলব এঁটেছিলাম মণিপুর যাবার জন্য। এই ভ্রমণ পর্বের জৌলুস বাড়িয়ে দিতে বহু আকাঙ্ক্ষিত চিত্রাঙ্গদার দেশ দেখার সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে হাতে নিয়েছিলাম মণিপুরের একটি ডকুমেন্টেরী ফিল্ম তোলার দায়িত্ব। আমরা মহাখুশী হলাম স্বপ্ন দেখা তার কলা বেচার আনন্দে।

পুজোর ছুটির মুখেই আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম। ডিমাপুর-কোহিমা-ইমফলের পথের দুধারে তখনো যুদ্ধ-তাণ্ডবের নিদর্শনের ছড়াছড়ি, আর আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বারুদের গন্ধ। আমরা ইমফলে গিয়ে উঠেছিলাম এক হোটেলে। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম রাতের পুরো ঘুমের পর ভোর-বেলা বিছানার পাশেই চা দিয়ে গেল হোটেলের ছেলেটা। শুয়ে শুয়ে একটু আমেজের মুখে মণিপুরের কথা চিন্তা করছিলাম মাত্র, তখনি ঘরের ভেতর এসে খট শব্দ করে মিলিটারী কায়দায় সেল্যুট জানালো এই কানাইয়া। হোটেলের ঠাকুর এসেছিল সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিতে বলে গেল, আপনাদের খুব কাজে লাগবে এই মিনি-সৈনিক। সারাদিনই থাকবে আপনাদের সঙ্গে, যে কাজ বলবেন তাই করবে। সেই থেকেই যে কয়দিন ছিলাম, সর্বক্ষণ আমাদের সহচর হয়ে কানাইয়া ঘুরে বেড়িয়েছে আমার ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে বয়ে। দিনের শেষে হোটেলে ফিরে এলে পর মিনি-সৈনিক সেলাম জানাতো খট করে, আর আমরা তার হাতে তুলে দিতাম দুটো টাকা।

মিনি-সৈনিক কানাইয়া

ভগবান বুঝে-সুঝেই ঘাটতি পূরণ করতে বুদ্ধির 'কোটা' বোবাকে একটু বেশী দিয়ে থাকেন। সেই সুবাদে কানাইয়াকে মনে হল অতি তুখোড়। খুব সহজেই ও নিজেকে আমাদের কাছে অপরিহার্য করে তুলল। স্রেফ ইশারায় কাজ করতো, দাঁড়ালেই বুঝতে পারতো, সিগারেট বের করলেই লাইটার জ্বালিয়ে ধরতো মুখের কাছে। অনেক সময় ওর সিগারেট তুলে দিতো আমাদের হাতে। তাছাড়া মণিপুরী নৃত্যের ছন্দ উপেক্ষা করে কানাইয়া নানা সময়ে তার একক-নৃত্যনাট্যের ভঙ্গীতে যেসব কাহিনী পেশ করতো, তাতেই আমরা বুঝেছিলাম যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের বহু কাজে তার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তখন যুদ্ধের সময় ঐ সব লম্বা লম্বা আমেরিকান-দের পক্ষে কানাইয়া অনেকটা পকেট-এডিশনের কাজ করেছে। ওরকম পাকা-মগজের পোর্টেবল মানুষটি ওদের কাছে নিশ্চয়ই দুর্লভ সম্পদ বিশেষ ছিল।

ইমফলে আমাদের মাঝে মাঝে যে জন্য একটু খারাপ লাগতো, সেটা ছিল শুধু কানাইয়ার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটি কথা বলতে পারতাম না বলে। এদিকে বঞ্চিত হয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথাই জানবার সুযোগ পাইনি। আমাদের সঙ্গে ইমফলের পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে ঠিক যন্ত্রের মতই। ওর প্রাণের আভাস পেতাম না। কিন্তু ফিরবার আগের দিন পথে বেড়াবার সময় হঠাৎ এক সময় আমরা খেয়াল করলাম—কানাইয়া একটু আগে আগে যাচ্ছে, আর মুখে ফাই—ফাই—ফাই গোছের একটা আওয়াজ করছে হাত নেড়ে নেড়ে। বেশ কৌতূহল হল আমাদের। একটু বুঝতে চেষ্টা করার পর এক বন্ধু বললো, ওটা নিশ্চয় কোন প্রেমের গান। কথাটা তখন মেনে নিলাম, কারণ প্রেমহীন কানাই এদেশে চলবে না।

ইমফলে ছিল দিন সাতেকের পালা। দেখতে দেখতে যেন চোখের সম্মুখ থেকে মুছে গেল বর্ণসৌন্দর্যে রূপায়িত রাস-নৃত্য, আর মিশে গেল বাতাসে মৃদঙ্গ-তরঙ্গের মুখরিত ধ্বনি। ফিরবার দিন কানাইয়া এসে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদেরও খারাপ লাগছিল ওকে ছেড়ে আসতে। ভাবলাম এজন্যই বোধ হয় কাল থেকে ওর মনে উদাসী ভাব জেগেছে। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট ওকে দিলাম। নিল হাত পেতে, আর তেমনি বিমর্ষভাবে চলে গেল হোটেল ছেড়ে। একটা সেলামও পর্যন্ত দিল না।

ঠাকুরের বখশিস দিলাম। বললাম বেচারা কানাইয়ার কথা। কিন্তু ঠাকুর একগাল হেসে বললো—'কাল ও বউর হাতে ঠ্যাঙানী খেয়েছে বলেই আজ টাকা নিয়ে সোজা চলে গেছে বাড়ি। বউটা কাজ করে ওকেই খাওয়ায়। আর ও মাঝে মাঝে মদ-ফদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। যাক ছেড়ে দিন ওর কথা।' তারপর আর কিছু বলিনি আমরা।

দীর্ঘ পথ বাসের ভেতর বসে আমরা কানাইয়ার প্রসঙ্গে তুলেছি বহুবার। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের কল্পিত প্রসঙ্গের আলোচনা অসমাপ্তভাবেই শেষ হয়ে গেছে। আবার তুলেছি সম্ভাব্য নতুন প্রসঙ্গ। এভাবেই কানাইয়া আমাদের মনের ভেতর একটা অসমাপ্ত রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে ঠিকই। ওর স্মৃতি অনেকটা অম্ল-মধুর। তবে আমাদের চিরদিনের আফসোস থেকে গেছে যে, কানাইয়ার এতখানি জেনেও তার নিজের মুখ থেকে কিছুই জানতে পারেনি আমরা।

বিশ্ব বিজ্ঞান

মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই-এ অসংলগ্নতা এবং প্রচুর ভুল

বিশ্ব বিজ্ঞান লেখকের নিবেদন, বর্তমান রচনা কোন বিস্তৃত আলোচনা নয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা প্রকাশকের প্রতি আক্রমণও নয়। সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে কয়েকজন শিক্ষাবিদ অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ নতুন আঙ্গিকে আবার দশম শ্রেণীর পরিকল্পনা নিয়ে তড়িঘড়ি মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করার পর গত এক বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের পড়ানও হচ্ছে। এ বছরও অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। নিশ্চয় তাদেরও পড়ান হবে। ওই সব বই-এর অনেকই শুধু অপাঠ্য নয়, প্রচুর ভুলে ভরা। গত বছর ভুল বই পড়ান হয়েছে। হয়ত এ বছরও হবে। তাঁদের প্রশ্ন, পর্ষৎ এ ব্যাপারটি কতটা তলিয়ে দেখছেন?

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন ধরনের প্রায় পঞ্চাশ জন লেখকের বই সংগ্রহ করে ওই সব বই-এর ওপর আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত চেয়ে পাঠাই। বিভিন্ন শ্রেণীর বই। ভৌত এবং প্রাণ বিজ্ঞানের। অনিবার্য কারণে বিশেষজ্ঞদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তবে মোটামুটিভাবে তাঁদের মূল বক্তব্য এক. বেশির ভাগ বই-ই ভুল তথ্যে ভরা। দুই, বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় প্রচণ্ড অসংলগ্নতা। তিন, অনেক নামী লেখকও কোন কোন ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই সঙ্গে দু একটি বই-এর তাঁরা প্রশংসাও করেছেন। তবে তেমন ধরনের বই সংখ্যায় নগণ্য।

ভুলের বহর এবং অসংলগ্নতার আতিশয্য নিয়ে প্রত্যেকটি বই-এর ওপর বিস্তৃত আলোচনা করা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে আপাতত কয়েকটি প্রাণবিজ্ঞানের বই থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এখানে উপস্থিত করা হল।

*

বই-এর নাম **জীবনবিজ্ঞান**। নবম শ্রেণীর পাঠ্য। লেখক: ডঃ তারোকমোহন দাস। প্রকাশক : দি ম্যাকমিলান কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিঃ।

এই বই-এর **২৫** পাতায় **শ্বাসযন্ত্র** প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন : 'আমরা ফুসফুসের সাহায্যে বায়ু শোষণ করি, মাছেরা ফুলকোর সাহায্যে জল থেকে অক্সিজেন শোষণ করে।' বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, শ্বসনের জন্যে অক্সিজেন প্রয়োজন। 'আমরা" অর্থাৎ মানুষ সেই অক্সিজেন গ্রহণ করি বাতাস থেকে, আর মাছ করে জল থেকে। এ কথা না বলে 'ফুসফুসের সাহায্যে বায়ু গ্রহণ করি' এমন একটি স্টেটমেণ্ট অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মনে কি ভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে না?

ওই একই বই-এর ৩৮ পাতায় **বেসাল মেটাবোলিক রেট** সম্পর্কে লেখকের সংজ্ঞা: 'কোন প্রাণী যখন নিশ্চল হয়ে বিশ্রাম করে, সেই সময় তার জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম হারে শক্তি-ব্যয় হয় তাকে বেসাল মেটাবোলিক রেট বলে।' বলা বাহুল্য, এ ধরনের সংজ্ঞা যথেষ্ট ভ্রান্তিমূলক এবং অতিসরলীকরণ। সরলীকরণ করায় আপত্তি নেই। কিন্তু অত্যন্ত মৌলিক এই বিষয়টি নিয়ে যৎসামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। সেটা না করার দরুন এই সংজ্ঞার যথাযথ তাৎপর্য অস্পষ্টই রয়ে গেছে। কারণ, Basal Metabolic Rate বা B M R-এর সংজ্ঞা By this is meant the energy output of an individual under standardized resting condition, i.e., at complete bodily and physical rest, 12-18 hours after a meal and in an equitable environmental temperature 70.6F. (Page 204, Samson Wright' Applied Physiology: Revised by Cyril A. Keele and Eric Neil).

৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'বর্তমানে প্রধানত সাত রকম ভিটামিনের কথা জানা গিয়েছে, A B C D ইত্যাদি...।' ভিটামিনের প্রকারভেদ সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্যও ভ্রান্তিমূলক। কারণ, শারীরবিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, ভিটামিন মুখ্যত দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর ভিটামিন যেগুলি জলে দ্রবীভূত হয়। অপর শ্রেণীর ভিটামিন ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় মাধ্যমে দ্রবণীয়। এ কথা না বলে অসংলগ্নভাবে 'সাত রকম ভিটামিন' এবং তারা A B C D ইত্যাদি বলে ছেড়ে দিলে ভুল তথ্যই পরিবেশন করা হবে। যেমন, ভিটামিন B-কমপ্লেকস বলতে B-1, B-2, প্রভৃতি বোঝালেও, এদের প্রত্যেকটির ভূমিকা কিন্তু স্বতন্ত্র এবং পৃথক পৃথক ভিটামিনের মত। লেখকের এই আলোচনায় খানিকটা দায়িত্বহীনতারও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন

ধরুন, ৪৬ পৃষ্ঠায় উনি লিখেছেন, 'ভিটামিন B-কমপ্লেক্স'। আবার পরের পাতায় 'কয়েকটি প্রধান খাদ্যের ভিটামিন-মান' প্রসঙ্গে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে লিখেছেন 'ভিটামিন বি-২ সমষ্টি'। ভিটামিন বি-২ সমষ্টি বলে কোন কথা বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। জানি না, এটা ছাপার ভুল কী না। তবে পাঠ্যপুস্তকে এমন মারাত্মক ছাপার ভুল নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

৪৮ পাতায় লেখা হয়েছে, 'সোডিয়াম পাকস্থলীর পাচক-রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।' সোডিয়াম থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কীভাবে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব?

তবে ভুলের এভারেস্ট শৃঙ্গের যদি সন্ধান চান তাহলে এই বইটির ৫০ এবং ২২-২৩ পৃষ্ঠা দেখুন। ৫০ পৃষ্ঠায় 'পরিপাক-ক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া'—এর ওপর লেখক একটি তালিকা তুলে ধরেছেন। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে লেখক 'ইনসুলিন'-কে বলেছেন এনজাইম এবং পরিপাক সহায়ক পদার্থ। দেহের কোন অংশে ইনসুলিন সৃষ্ট হয়? লেখকের মতে অগ্ন্যাশয় রসে ইনসুলিন সৃষ্ট হয়। লেখকের বক্তব্য, ইনসুলিন শর্করাজাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

এ ধরনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, উৎসেচক রস বা এনজাইম এবং অন্তঃস্রাবী রস বা হরমোন লেখক এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ইনসুলিন অগ্ন্যাশয় রসে সৃষ্ট হয় না, হয় অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এক ধরনের বিশেষ অংশে। যাদের বলা হয় আইলেটস অভ্ ল্যাংগারহ্যানস। এর কাজ শর্করা থেকে গ্লুকোজ তৈরি নয়, বরং গ্লুকোজ বিপাকীকরণে সাহায্য করে শরীরে গ্লুকোজের মাত্রায় ভারসাম্য রাখা। ইনসুলিনের এই ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্যথা হলে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়।

২২-২৩ পৃষ্ঠায় চর্বি এবং প্রোটিন জাতীয় পদার্থের শ্বাসকার্যে ভূমিকা কী বলতে গিয়ে লেখা হয়েছে: 'এই সকল পদার্থে কার্বন অণুর সঙ্গে অনেকগুলি হাইড্রোজেন-অণু বন্ডের (Bond) সাহায্যে আবদ্ধ থাকে, শ্বাসকার্যের সময় ঐ কঠিন বন্ডগুলি (Carbon bond) ভেঙ্গে হাইড্রোজেনের অণুগুলি মুক্ত হয়। কঠিন বন্ডগুলির (Carbon bond) মধ্যে শক্তি আবদ্ধ থাকে, সুতরাং এই বন্ডগুলি ভাঙবার ফলে শক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে, যেটা শ্বাসকার্যের প্রধান তাৎপর্য।'

জনৈক বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানীকে এই লাইন কয়টি দেখালে তিনি চমকে ওঠেন। খানিকটা হতভম্বের সুরে তিনি মন্তব্য করেন, 'মশায়, ইস্কুলের বই-এ এমন ভুলও থাকে নাকি?' কার্বন বন্ড ভেঙে হাইড্রোজেন অণুকে মুক্ত করতে গেলে শক্তির প্রকাশ ঘটে না। বরং প্রচুর শক্তি দিতে হয়। প্রতি 'মোল'-এর জন্যে দরকার প্রায় ১০০ কিলো ক্যালোরি উত্তাপ। শক্তি মুক্ত হওয়ার এখানে প্রশ্ন ওঠে না। বুঝতে পারছি ভদ্রলোক কী বলতে চান। তিনি যা লিখেছেন, তাতে বরং উল্টোটাই বোঝায়।

ডাঃ দাসের লেখা দশম শ্রেণীর যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও ভুলের ভিড় কম নয়। একটি উদাহরণ: ৬১ পৃষ্ঠায় তিনিই লিখেছেন, 'জনন কোষের সঙ্গে ডিমের মিলন ঘটলে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়, না হলে ঐ অনিষিক্ত ডিম (unfirtilized egg) দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। আমরা বাজারে যে হাঁস মুরগীর ডিম দেখি, তা প্রায় সবই এইভাবে পরিত্যক্ত অনিষিক্ত ডিম।' প্রশ্ন এই, সত্যিই কি তাই? 'অনিষিক্ত ডিম দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়', ডঃ দাস কী ভাবে এটা বললেন? তাই যদি হয়, যে সব ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি হয়, তারাও তো দেহের বাইরেই বেরিয়ে আসে। ওই সব ডিম তা হলে কি অনিষিক্ত?

*

আর একটি বই।

বই-এর নাম: জীবন-বিজ্ঞান। নবম শ্রেণীর পাঠ্য। লেখক: ডঃ হরিদাস গুপ্ত।

প্রকাশক : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।

এই বইটির ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি তালিকায় লেখা হয়েছে এনটারো-কাইনেজ (এনজাইম) ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন খাদ্যকে ভেঙে 'পরিবর্তিত খাদ্য'-রূপে 'অ্যামাইনো অ্যাসিড' তৈরি করে। কী করে এটা সম্ভব হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরির জন্যে দরকার নাইট্রোজেন। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিনে এ বস্তুটি থাকে না। তা হলে ওই দুটি বস্তু থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয় কী ভাবে? বিশেষ এই এনজাইমটি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য :

Enterokinase is an enzyme apparently produced in a small intestine, and it is responsible for converting trypsinogen into active trypsin. (Text Book of Bio-chmeistry by E. S. West, W. R. Todd, H. S. Masu and J. T. Van Bruggen).

৫১ পৃষ্ঠায় লেখা : দৈনিক প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম কোলিন একজন মানুষের দরকার। লেখকের এ তথ্য কতখানি সংগত?

৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা : 'লোহিত রক্ত কণিকার নিউক্লিয়াসের মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত অক্সিজেন শোষণ করতে পারে......।' বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে যেহেতু লেখক মানুষের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন, অতএব নিউক্লিয়াসের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেয়া উচিত ছিল। কারণ, অনেকেই জানেন, পাখি, সরীসৃপ প্রাণী, মাছ এবং একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী উটের লোহিত রক্ত কণিকাতেই নিউক্লিয়াস থাকে। মানুষসহ অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণায় নিউক্লিয়াস থাকে না।

৫৮ পৃষ্ঠায় লেখা : 'মানুষের রক্তে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় পাঁচশত শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে।' আবার ওই একই পৃষ্ঠায় কয়েক লাইন পর লেখা হয়েছে : 'মানুষের এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তে সাধারণত সাত হাজার শ্বেত কণিকা থাকে।' কোনটা সত্যি? বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য পরের সংখ্যাটি তবু কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু প্রথমটি ভুল।

এ ধরনের ভুলের হেতু?

পাণ্ডুলিপিতেই ভুলটি হয়ত ছিল। প্রুফ দেখার সময় ভুলটি সংশোধনও করা যেত। কিন্তু নিছক অন্যমনস্কতা এবং তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই এ ধরনের গলদ প্রশ্রয় পায়।

তবু বলব, টেক্সট বই-এ এ ধরনের গলদ অমার্জনীয়। কারণ বই যারা পড়বে, তারা বিজ্ঞানী নয়। যাঁরা পড়াবেন, তাঁদেরও বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ নন। উভয়ের ক্ষেত্রে এ-সব বই-এর পরিবেশিত তথ্যই পঠন-পাঠনের যখন একমাত্র অবলম্বন, তখন এমন ধরনের ভুল মারাত্মক রকমের ভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে।

মানুষের প্রজনন এবারকার জীব-বিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ডঃ অজিত মেন্দা শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অথবা ডঃ হরেন ঘোষের মত লেখক যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে এই অংশটুকু উপস্থাপিত করেছেন। কোন কোন বই-এ এর কোন উল্লেখই নেই। সম্ভবত সংস্কারবশত তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। এ ধরনের অসংলগ্নতাও অনেকের চোখে পড়বে।

*

ভুলের পাহাড় রচনা করা থাক। বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্যও নয় বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করা। নমুনা স্বরূপ প্রাণ-বিজ্ঞানের দুটি বই-এর কথাই আলোচনা করলাম বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে। আসল কথা নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে

অনেকেই নতুনভাবে স্কুলের বই লিখতে নেমেছেন। এই সব লেখকদের কেউ কেউ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারঙ্গম এবং স্বনামধন্যও বটেন। তাঁদের লেখায় এ ধরনের ত্রুটি থাকলে খুবই আফসোসের কথা। আরও অনেক বই রয়েছে। যাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভুলের মহাভারত লিখতে হয়। ওই সব বই-এর বক্তব্য শুধু ভুলই নয়, অসংলগ্ন, অস্পষ্ট এবং বিক্ষিপ্ত। উপস্থাপনের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নেই। বরং বিচ্ছিন্ন পারম্পর্যে ভরা। যা দেখে মনে হয়, ওই সব বই-এর লেখক কোন কিছু গুছিয়ে না ভেবেই বই লিখতে শুরু করেছেন। লেখার জন্যে যে ধরনের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, যতটা সতর্কতার প্রয়োজন, নিতান্তই তার অভাব।

কেন এমন হলো? কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করেছিলাম।

তাঁদের বক্তব্য : পর্ষৎ ডিসিশন নিলেন ১৯৭৪ থেকে নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পড়ান হবে। তড়িঘড়ি ডিসিশন নেয়ার পর সেসন চালু হলো। প্রকাশকরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নতুন যা পাঠ্যসূচী তাতে পুরনো সব বই-ই বরবাদ। একেবারে নতুন

চ বই লিখতে হবে। এত কম সময়ে
্যাসপুস্তক লেখা অত সহজ ব্যাপার নয়।
াশকরা তাড়াহুড়ো ছুটলেন লেখক
গ্রহে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বই
পয়ে বের করতে হবে। নইলে বাজার
যাবে না। দেখতে দেখতে অজস্র
খকের বই বেরোল। এভাবে বই প্রকাশ
তে গেলে বই-এ ভুল থাকবেই।

ভুলের আরও একটি কারণ, পর্ষৎ এই
ম বুঝি বুঝে উঠলেন, এ যুগটা বিজ্ঞান
ত্তক। এবং যেহেতু আজকের নাগরিকদের
পরিসরের একই ধরনের পরিবেশ এবং
রিস্থিতির মধ্যে বাস করতে হয়, অতএব
কে শুধু বিজ্ঞান পড়বে, অমুক শুধু
নীতি; এ চলতে পারে না। ও'রা ঠিক
লেন, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে
ন বিভেদ-নীতি থাকবে না। অন্তত এ
ত্রে সবাইকে একই ধরনের একই ধাঁচের
অর্জন করতে হবে। বলা বাহুল্য,
জনগ্রাহ্য হিসেবে তারই ফলশ্রুতি
মান ধাঁচের বিজ্ঞান শিক্ষা। এমন
নের বিজ্ঞান শিক্ষা, যেখানে মানুষের
াকা দেখো। শেখ। জান। উদ্দেশ। নিজেকে
খ নাও। উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ
র্কে শেখ। সেই সঙ্গে জেনে নাও,
দের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক।

ফলে, যে কোন শ্রেণীর মাধ্যমিক
ীর বই এখন আর একজন লেখকের
ক সুষ্ঠুভাবে লেখা প্রায় অসম্ভব
ার। কারণ বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের
ন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বর্তমান মাধ্যমিক পাঠ্য-
ীতে। অথচ সময় কম। সুষ্ঠুভাবে
জন বসে যে একখানি বই লিখবেন, তার
য়োগ কোথায়? প্রকাশকরা ব্যস্ত। বেশি
বিলম্ব করলে বাজার ধরা যায় না।
দায় টান পড়ে। হয়ত এর জন্যেই
হুড়ো এবং পরিকল্পনাহীন কাজ করার
ই তাঁদের এত বেশি ভুলে ভরা বই
শ করতে হয়েছে।

শুনেছি প্রকাশিত বইগুলি বিচার করে
ৎ এবার কোন বই চলবে, কোনটি অচল
কথা ভাবছেন। জানি না, এই বিচার
ন হবে কী না। হলে ভালও যেমন।
র মারাত্মকও তেমনি। যদি কোন
শকের বই ছাড় যায়, নিশ্চয় তিনি প্রচুর
র্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

*

অথচ পর্ষৎ যদি তাড়াহুড়ো করে না
র অন্তত আর একটা বছর অপেক্ষা
তেন এমন ব্যাপার হয়ত ঘটত না।
প্রথমত নতুন সিলেবাস ও'রা যা
ড়ায় বের করেছিলেন তার বক্তব্য খুব
পষ্ট। উচিত ছিল এই সব সিলেবাস
নিয়ে লেখকদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে
আলোচনা করা। এ কাজটির জন্যে দরকার
ছিল : এক, বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কয়েকটি
বিশেষ চ্যাপ্টারের উপর প্রথমে কিছু কিছু
লেখা তৈরি করা। দুই, ওই সব লেখার
উপর লেখকদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি
আলোচনাচক্র চালান। তিন, এর পর মাস
চার সময় দিয়ে লেখকদের লিখতে বলা এবং
তাঁদের লেখা পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে
পরীক্ষা করে নেয়া। চার, এর পর সম্পাদনা।
এ কাজেও পর্ষদের ভূমিকা থাকা দরকার।
পাঁচ, অবশেষে পাণ্ডুলিপির অনুমোদন।

এভাবে কাজে হাত দিলে লেখকেরা
বুঝতেন, আসলে কী লিখতে হবে, কতটুকু
লিখতে হবে। প্রকাশকরাও ভাল পাণ্ডুলিপি
হাতে পেতেন। ফলে, এখন ছাপা বই-এর
অনুমোদনের জন্যে যে ঝুঁকি তাঁদের নিতে
হচ্ছে, সেটা নিতে হোত না।

বলা বাহুল্য, শুধু তথ্য এবং তত্ত্বের
পরিবেশনই নয়, ভাল পাঠ্যপুস্তকের জন্যে
দরকার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখতে গিয়ে
পরিভাষাজনিত ত্রুটিও বড় রকমের সমস্যা।
জানি না, অনুমোদনের সময় পর্ষৎ কতখানি
এসব খতিয়ে দেখবেন। আমাদের আশা,
ভাল বই প্রকাশের জন্যে তাঁরা নজর দেবেন।

সমরজিৎ কর

অনেক লোকের অনেক রকমের ছদ্মবেশ থাকে। ব্রিটিশ আমলে আমলাদের শেখানো হয়েছিল—জনসাধারণ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বড় কম্পাউন্ডের বাংলোর ভেতরে বসে অ্যালফনেস চর্চা। আরও অনেক রকম জিনিস। সে সব গত ২৬।২৭ বছরে অচল হয়ে আসছিল। এখনো অবশ্য কয়েকটি জেলায় দেখলাম—জমাদার ক্রোড়ে এস পি তনয় দোলে—এই কাজই নাকি সেই পুলিশের ডিউটি—তবু বলব এখনকার আমলাকে জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি এগিয়ে আসতে হচ্ছে। কেননা, এখন আমলা পিছু জনসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশি। জনসংখ্যার একটা স্বাভাবিক চাপ আছে।

তবু এই আসার ভেতর তাকে নানা ছদ্মবেশ নিতে হয়। সবজান্তা। অসম্ভব দ্রুত বুঝে ফেলার ক্ষমতা। সমস্যা বোঝার সংগে সংগে কাজ ভাগ করে দেওয়া। রূঢ়। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই ভাব। অনেক কিছু।

কিন্তু শিবপ্রসাদ সমাদ্দারকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না—কোন ছদ্মবেশ ছাড়াই একটি লোক তার নিজস্ব সারল্য নিয়েও জনসাধারণের মুখোমুখি হতে পারেন। এই সারল্য খুব সাধারণ—আমি কিছু বুঝি না। আমি হাসি মুখে সব জানতে চাই। বুঝতে চাই। তারপর বুঝে নিয়ে সমস্যার মাথাটা হাতুড়ির এক বাড়িতে ভেঙে দেব। যে কোন বাধা সমতল করে দিতে চাই।

জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ছাত্রের এই ভূমিকাটি কলকাতা কর্পোরেশনের হাসি মুখ অ্যাড্‌মিনস্ট্রেটর শিবপ্রসাদ সমাদ্দার আই এ এস-এর ছদ্মবেশ কিনা আমি জানি না। হতে পারে। নাও হতে পারে। হয়ত এইটাই তার চরিত্র।

খুব ঢিলে ঢালা। হাসি মুখ। ইঁদুর তাড়াতে খাটের নিচে গৃহস্থ ঢোকেন। সমস্যার শিকড় নির্মূল করতে শিবপ্রসাদও অষ্টমী পুজোর রাতে গাম বুট পায়ে বড়তলায় ময়লা গাদায় ঘুরে বেড়ান।

কলকাতা পুরসভা কর্মীদের একটা অনুরোধ করব। আপনারা এই লোকটি সম্পর্কে সাবধান থাকবেন। কোন প্যাঁচ কষলে লোকটির গায়ে লাগবে না। সরল পথের পথিক—কলিকাতার গৃহস্থ শিবপ্রসাদ সমাদ্দার হাসি মুখে একখানি হাতুড়ি হাতে বসে আছেন। সমস্যা ভাই কাছে এসো। এক ঘায়ে তোমার মাথা গুঁড়ো করে দেব। দেবেই। কারণ খুব সরল। এই লোকটি কাজ ভালবাসেন। যে কাজ ভালবাসে তার কাছে যাদবের প্যাটার্নওতের শেষ দিককার দেড়পাতার লম্বা লম্বা অংকগুলো অবলীলায় করে

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ফেলাই মানসিক আরাম। শিবপ্রসাদেরও তাই। বিশ্বব্যাংক, মহাকরণ, কর্মী ইউনিয়ন, কলেজ স্ট্রীট মারকেটে ময়লা পরিষ্কার—সব জায়গায় হোচট খেতে খেতেই বাধার ঔদ্ধত্য জয় করাই তার প্রাণের আরাম। কর্মীদের একটি বিরোধ অবসানের পর যে-হাসি তার মুখে দেখেছি—তা শুধু আগে আরেকবার অন্যভাবে দেখেছি। পুজো সংখ্যার জন্যে মনোমত একটি গল্প শেষ করতে পেরে একজন গল্পকার এমন উদাস, সরল, ক্লান্ত হাসি নিয়ে আমায় বসতে বলেছিলেন।

খুব কঠিন একটা যোগ ব্যায়ামের পর শিবপ্রসাদ বললেন, রোজ সকালে এভাবে আমি শক্তি সঞ্চয় করি। সারাদিনের জন্যে। শীর্ষাসন, শবাসন ঠিকমত হলে সুরেন বাড়ুয্যে রোডে কোন বাধাকে আমার আর বাধাই মনে হয় না।

আমি তখন ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে। আমার ওপরওয়ালা তখন ছিল—এক ইন্দ্রজিৎ সিং। সে আমাকে টরচার করত খুব ভাল উপায়ে। লাঞ্চের সময় ডেকে পাঠাতো। নিজে খেত আর আমায় কোশ্চেন করত। তখন খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ। আমি কলকাতার থেকে একখানা মেঘনাদ বধ কাব্য কিনে নিয়ে গেলাম। রোজ ব্রাহ্ম মুহূর্তে একঘণ্টা আবৃত্তি। চৌদ্দদিনের দিন ইন্দ্রজিৎ সিং বাথরুমে আছাড় খেল। লাঞ্চ-পিরিয়ডে কোশ্চেন আনসার বন্ধ হল।

এই হল শিবপ্রসাদ। কিংবা এই হল গিয়ে তার একটা দিক। ১৯৪৯ সনের আই পি এস পরীক্ষায় প্রথম। আই এ এস পরীক্ষায় দ্বিতীয়। মা সাত বছর

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

ছেলেদের মারা যান। ১৯৪২ সনে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে তৃতীয়। প্রেসিডেন্সি থেকে আই এস সিতেও তৃতীয়। বি এস সি। ব্যাঙ্গালোর থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সেখান থেকেই আই এ এস পরীক্ষার অ্যাপলিকেশন।

বিভূতিভূষণের দৃষ্টি প্রদীপের জিতুর কথা শিবপ্রসাদের খুব মনে পড়ে। মনে আসে Sleepwalking। ভদ্রতা শিখেছি মনীষী সেনের কাছে। ভদ্রতা শিখেছি বিমল সিংহের মত মানুষের কাছে। সেটেলমেন্টের কাজ শেখার সময় সাইকেলে ঘুরেছি। সাধারণ ঘরের মানুষ। সাধারণের কথা তখন আরও ভালভাবে জানতে পেরেছি। উত্তরবঙ্গে খাইডাক, জয়ন্তী, কুমারগ্রাম তখন প্রাগৈতিহাসিক আমলের রাস্তা আর ঘন সবুজ নিয়ে ডাকতো।

তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে শিবপ্রসাদ ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার। গভর্নর তখন লেফটেনান্ট জেনারেল আজম খান। বুড়ো নিজে এসে বন্যা দেখবার জন্যে ডেকে নিয়ে যেত। বাড়ি এসে। অনেক সময় শিবপ্রসাদ পত্নী শিবানীকেও।

ওদের দুই মেয়ে। বড়জন এম এস সি দেবে। ছোটজন স্কুলের শেষ ধাপে। কান ছুলকে দেবার মত একরকম ইংরেজি অনর্গল বলতে পারে।

ডিস্ট্রিক্টের জীবনে মেদিনীপুরের দাগ শিবপ্রসাদের মনে সবচেয়ে বেশি। বদলি হয়ে চলে আসার সময় জুন মাসের দু-এর জেতার পাশকুড়া, মেচেদা রেল স্টেশনে সাধারণ মানুষ ভাব আর ফুল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখনো মেদিনীপুরের অনেক মানুষ তাঁদের ক্ষোভের কথা সরাসরি শিবপ্রসাদকে লিখে জানান।

মোটে সাত মাস রাইটার্সে থেকেছি। সেক্রেটারি বোর্ড অব রেভিন্যু। আর কোনদিন ও-বাড়িতে ঢুকিনি। পেট্রোলিয়াম মিনিস্ট্রিতে তিন বছর। তারপর হাকিকেশে অ্যান্টিবায়োটিকসের জেনারেল ম্যানেজার তিন বছর। তখন জাপানী দেবদূতের সার্কিট হাউসে। আমি ও'র জন্যে নিয়ে যাই সাইগল আর হেমন্তর রেকর্ড। শিবানী নিয়ে যায় নতুন নতুন রান্না। তখন বাংলাদেশের যুদ্ধ।

দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের রিয়াজ কমিশনার হয়ে বসে আছি। রাজ্যপাল ডায়াস বললেন, ডোণ্ট যু থিংক ইওর ট্যালেণ্ট ইজ বিয়িং ওয়েসটেড অ্যাট দেলহি? তাই কলকাতায় আসতে হল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনে। সেখান থেকে ২।১ জায়গায় সামান্য থামাই পানাই করে কলকাতা পুরসভা।

তারপরেই কলকাতার বড় বড় দৈনিকে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপন।

কলকাতা কার? ৩৩ লক্ষ নাগরিকের? না, ৩৩ হাজার ধর্মঘটী কর্মীর?

এ কণ্ঠস্বর কলকাতাবাসীদের পক্ষে নতুন। তাঁরা সাড়া দিলেন। ধর্মঘট হল না। পশ্চিমবঙ্গে কোন প্রশাসকের পক্ষে এটি একটি নতুন ঘটনা। আরও অনেক নতুন ঘটনা তৈরি করেছেন শিবপ্রসাদ। রাজ্য সরকারের কাছে পুরসভার আগেকার দেনার কিস্তি নিয়মিত করে এনেছেন। কর আদায় করেছেন সবচেয়ে বেশি। তিরিশ বছরের ওপর পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী ওয়েজ অ্যাণ্ড মিনস খাতে ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে মহাকরণের কাছে টাকা চাননি। ওয়েজ অ্যাণ্ড মিনসের টাকা এখন পুরসভার হাতে নেই। এত কাণ্ড করেও তিনি পুরকর্মীদের ৫৬ লক্ষ টাকা বোনাস দিয়েছেন।

ব্রিটিশ আমলে দেশকে ভালবাসা ছিল অপরাধ। পুলিসের খাতায় নাম ওঠাই স্বাভাবিক। লাল রঙের উঁচু পাঁচিল দেওয়া সরকারী অতিথিশালায় থাকে এলে তো আর কথাই নেই। চাকরির কপালে অমনি [illegible] পাথর চাপা। দেশ জোড়া সেই বিলিতী জমিদারীতে স্বদেশীয়ানার চৌহদ্দি ছিল শুধু কলকাতা পুরসভা। সরকারী দফতর থেকে খেদানোদের রুটি-রুজির জোগাড় একমাত্র সেখানেই ছিল, তা লোকের দরকার থাক আর নাই থাক। এমন কি গোল ফোকরে চৌকো পেরেক হলেও। নইলে কোথায় যাবে এই নামকাটা সেপাইরা?

সেইজন্যে তখন থেকেই পুরসভার কাজকর্মের চেয়ে লোকজনের পাল্লা ভারি। সে সময় হয়ত তাই দরকার ছিল। খালি চেয়ারের পিঠে ঝোলানো কোট মালিকের হাজিরার সাক্ষী। কেউ তখন দেখেও দেখতে না।

সে যুগের তিনতলা হুডখোলা মোটর গাড়ির কলকাতায় এ সব মানিয়ে যেত। আজকের কলকাতার আকাশে ওড়ে জেট প্লেন।

সেখানে এখন ১১৩২ মাইল শহরতলানি নালি উপচে প্রতি বর্ষায় শহর ভাসায়। শিবপ্রসাদ বললেন, আমার ২৫০ খানা জঞ্জাল লরির ৫০ খানা মোটে চালু। রোজ ১০ কোটি গ্যালন জল যোগাতে পলতায় ২০ টন ফটকিরির নিত্য অনটন। তবু আমি কলকাতাকে চালু রাখব। আমাদের ৩৩ হাজার কর্মীর মধ্যে ২২ হাজার কর্মী চাকরি পান উত্তরাধিকার সূত্রে। এ'রা কেমন কাজের লোক হবেন আমি জানি না। তবু কলকাতা চলবে। আমি চালাব। আমার করার কথা কাজ। আমি তাই করে যাব।

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম। ও'র কাজ দেখেছি। ও'র কাজের কথা ভারতবর্ষে এখন সবাই জানেন। শিবপ্রসাদ বলছিলেন, ১৯৪৮ সালে ফিলেডেলফিয়াও ছিল কলকাতার মতনই। চেষ্টা করলে কি না হয়।

আবেগতাড়িত কর্মনিষ্ঠ একজন বাচাল প্রশাসকের সবকথা আমার কানে বাজছিল না।

আমি ভাবছিলাম পশ্চিমবঙ্গের এখন ক'জন শিবপ্রসাদ দরকার?

(১) ট্রাম ও স্টেটবাসের কর্তা পদে ১ জন করে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

(২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে ১ জন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

(৩) আগামী ভারতীয় অলিম্পিক দলের ম্যানেজার ও কোচ পদে এখনই কয়েকজন শিবপ্রসাদ।

(৪) প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চেক দিলে যাতে ১০ মিনিটের মধ্যে টাকা পাওয়া যায় সেজন্য ওইসব ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে ১ জন করে মোট ১৪ জন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

(৫) হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার পদে ১ জন করে শিবপ্রসাদ।

(৬) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল পদেও ১ জন শিবপ্রসাদ।

(৭) হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার পদে ১ জন করে শিবপ্রসাদ। ট্রেন যদি সময় মত চান।

(৮) বনগাঁর রেল স্টেশনে চালের চোরাচালানী বন্ধ করতে সেখানকার পুলিসের সাব ইন্সপেক্টর পদে ১ জন শিবপ্রসাদ।

(৯) পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারির পদে ১ জন শিবপ্রসাদ। তাহলে অন্তত বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গ কি করতে চায়। এখন বোঝা যায় না।

তাহলে মোট ক'জন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার দরকার? একজন একজন সৎ প্রশাসক পেলে বাঙালী তাকে অনেক কিছু দিতে রাজি আছে। যেমন : ভালবাসা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আলোচনা

বিশ্ব মহিলা বৎসর

একদল রাগী যুবতী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। হাতে তাদের ফেস্টুন, আলকাতরার বালতি ও ব্রাশ, কাঁধে একটা মই আর মুখে শ্লোগান। রাস্তার মোড়ে এসে তারা পাঁচিল-লগ্ন সিনেমা-পোস্টারের গায়ে মইটি রাখলো। তারপর একটি মেয়ে আলকাতরার বালতি ও ব্রাশ হাতে মই বেয়ে উঠে গিয়ে দ্রুত হস্তে পোস্টারের গায়ে আতকাতরা লেপে দিলো, নেমে এলো মই থেকে। এবার সমবেত স্বরে শ্লোগান তুললো : "অশ্লীল ছবি বাতিল কর, বাতিল কর," "নগ্ন নারী দেহ নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না, চলবে না." "অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলছে, চলবে," "সামন্ততান্ত্রিক কৃষ্টি নিপাত্ত যাক, নিপাত্ত যাক." "বিশ্বনারী বৎসর পালন করো, পালন করো"। শ্লোগান-মুখর দলটি আরও এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে অশ্লীল বই ও সিনেমার পত্র-পত্রিকার দোকানের সামনে পথ-সভা করলো। তারপর সিনেমার সামনে গিয়ে পিকেটিং করলো—বক্তৃতার বিষয়বস্তু বলা বাহুল্য, ঐ শ্লোগানগুলোরই ভাব-সম্প্রসারণ। শেষে দলটি দূরে মিলিয়ে গেল।

দৃশ্যটি হায়দ্রাবাদ শহরের। রাগী যুবতীরা "প্রোগ্রেসিভ অরগানাইজেশন অব উইমেন"-র সদস্য—সবাই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রী। তারিখ—২০ থেকে ২৫ জানুয়ারীর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযানের কর্মসূচীর প্রথম দিন। বিশ্ব মহিলা বৎসরের কর্মসূচী। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটির বিভিন্ন অঙ্ক দেখে কিছু ভাবনা খেলে গেল এবং আজ তাদের 'দেশ' মুখীনতার প্ররোচনা জোগাল ১৮ জানুয়ারীর 'ঘরে-বাইরে' বিভাগে শ্রীমতীর ও ৮ ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয় বিভাগে সম্পাদক মহাশয়ের 'বিশ্ব মহিলা বৎসর' নিয়ে আলোচনা। শ্রীমতীর লেখা প্রধানত সংবাদধর্মী—এতে আছে বিশ্বমহিলা বৎসর সম্পর্কীয় কিছু খবরাখবর, দু'একটি নির্দিষ্ট মন্তব্য সহ। সম্পাদক মহাশয় "বিশ্ব মহিলা বৎসর"-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং কিছু মন্তব্য ও আলোচনার অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এদেশের নারীর মুক্তি-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে।

যে রাষ্ট্র সংঘ ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব মহিলা বৎসর হিসেবে পালনের নির্দেশনামা জারি করেছে তার কার্যক্রম দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। সমগ্র মানব জাতির (যদিও সমগ্র ভূখণ্ড রাষ্ট্র-সংঘের এক্তিয়ারভুক্ত নয়) অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ থেকে "মানব জাতির অধিকারের সনদ ঘোষণা" একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ। সেই মানবিক অধিকার ও মর্যাদা অর্থে নারী-পুরুষে কোন প্রভেদ নেই—উভয়েই মর্যাদা ও অধিকারের সমান দাবিদার। আজ যে গুরুত্বপূর্ণ সনদের বয়স দুই যুগেরও বেশী, কিন্তু তার বিভিন্ন ধারা সব দেশে সসম্মানে অনুসৃত হয়েছে কিনা পৃথিবীর দূর ও অদূরের, এমন কি সমসাময়িক ইতিহাস তার সাক্ষ্যদানে নিশ্চয়ই বলবে—আজও মানবিক অধিকার অমর্যাদার ধুলো ঝেড়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি সর্বত্র, জাতি-শ্রেণী-বর্ণগত বৈষম্য-বোধ থেকে মানুষ আজও মুক্তি পায়নি। এই শ্রেণীগত বৈষম্যের একটা দিক আমাদের সমাজ-জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচলিত বিভেদ নীতি। তাই সম্পাদকীয় মন্তব্য সমর্থনীয় : "সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক জীবনে এখনো নারীর যোগ্যতা ও প্রতিভা যে বৈষম্যপ্রবণ রীতি-নীতির বাধায় কুক্ষিগত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে তার অবসান ও অপসারণ চাই।" তারই অবসানকল্পে ১৯৭৫ সালের এই বিশ্ব মহিলা বৎসরে রাষ্ট্রসংঘের 'বিশ্ব নারী অধিকারের সনদ'-এর আবার নতুন করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বের কথা প্রতিটি দেশের কাছে, প্রতিটি নরনারীর কাছে ঘোষিত হচ্ছে। বিষয়টি আর একটু স্বচ্ছ ভাষায় দাঁড়ায়—একটি নির্দিষ্ট দেশে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ত্রিধা-বিভক্ত রাষ্ট্র, সমাজ ও নারীর হাতে। এখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের দুটি প্রাঞ্জল উদাহরণ তুলে ধরা যাক অনেক উদাহরণের মধ্য থেকে ঃ এক, রাষ্ট্রীয় আইন বলে একই যোগ্যতা ও কর্মে নারী-পুরুষের শ্রমের মূল্য সমান বলে কার্যকরী করা এবং দুই, আর এক রাষ্ট্র-প্রণীত আইনে সিনেমা, [illegible] অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী-দেহ এবং তার ছায়ার মূলধনী ব্যবসায় বন্ধ করা। এদেশে এ দুটি আইনের গ্রন্থী ও কার্যধারা বড়ই শিথিল।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে

সমাজের, প্রধানত পুরুষ-শাসিত সমাজের দায়িত্বের ব্যাপারটা একটু জটিল। এ জটিলতার প্রধান কারণ সমাজে ও সংসারে নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার লাভের পথে পুরুষ-শাসিত সমাজের বহুকালের ক্ষুদ্র স্বার্থপর ধ্যান-ধারণা বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই রন্ধনশালা-মাতৃত্ব-সন্তান-পালনের চারদেয়ালী গণ্ডীর বাইরে নারী যখন আপন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ খুঁজে নিতে চাইল পুরুষের সংগে সম-অধিকারে, তখন স্বভাবতই নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম আঘাত পড়লো সেই পুরুষের অনুদার ধারণার অচলায়তনে. পুরুষ-শাসিত সমাজের এতদিনকার অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ফলত লক্ষণীয়, আজও বর্তমান সমাজে নারীর কর্তব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে পুরুষ নারীর পুরো আস্থা বোধ হয় অর্জন করতে পারেনি। সম্পাদক মহাশয়ের লেখায়ও সেই সংশয়ের সুরঃ "পুরুষের মতে যেটা নারীর জীবনের একটি কল্যাণ-প্রসূ অধিকার, সেটা নারীর ধারণায় একটি অবাস্তবতার সুপারিশ বলে বোধ হতে পারে।" তবে একথাও সত্য যে, নারীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন সুপারিশ পুরুষ-মনোনীত হলেই অবাস্তবতার অভি-যোগে বাতিল হয়ে যাবে, এমন অন্ধত্বও গ্রহণীয় হতে পারে না। কারণ, নারী সম্পর্কে আজ সমাজের মনোভাব অনেক পালটেছে, ক্রমেই নারীপ্রগতির পথ প্রশস্ত হচ্ছে, হয়তো খুব দ্রুত হচ্ছে না. কেননা এত কালের অনগ্রসরতার জড়তা কাটাতে সময় কিছু লাগবে. সেখানে পুরুষের ভূমিকা নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষীয় নয়, সহযোগীর হওয়াই মঙ্গলের।

এখন এখানে একটি মৌলিক প্রশ্নে সোচ্চার হওয়া যেতে পারেঃ নারী-প্রগতির প্রবক্তা হিসাবে নারীর নিজস্ব দায়িত্বের স্বরূপটি কী? স্বীকার্য যে, পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার, মর্যাদার এবং স্বাধীন পরিবেশে নারীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিকাশই নারী-প্রগতির লক্ষ্য, কিন্তু কী কী সে অধিকার, কেমন সে স্বাধীন পরিবেশ এবং কীভাবে তার সদ্ব্যবহার করলে নারী সত্তা বিকশিত হতে পারে, পূর্ণ মর্যাদায় নারী জীবন সার্থকতা পায়—সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি প্রগতি-কামী নারীর নিজস্ব দায়িত্বের অঙ্গীভূত এবং সে দায়িত্ববোধে তার প্রাথমিক কর্তব্যটি হবে সমাজের বেদিতে নারীত্বের মর্যাদার ইমেজটির প্রতিষ্ঠা করা। সে ইমেজটি কী? নারী সম্বন্ধে দেহময়তার উপলব্ধি থেকে মন্ময়তার উপলব্ধিতে উত্তরণ। অর্থাৎ নারীর পক্ষে সবচেয়ে অমর্যাদাকর, অশালীন দৃষ্টিতে দেখা, নারীর দেহসর্বস্বতার ইমেজটিকে নিজ হাতে ভেঙে তাকে প্রমাণ করতে হবে—সে তার মনন ও মেধার ঐশ্বর্যে পুরুষেরই সমকক্ষ। জীবনের কর্মযজ্ঞে নারী ভস্মও সরাবে, আবার আগুনও জেলে রাখবে। সে বিদেহী আগুনেরই নাম নারীর মহিমা—যা প্রকৃত প্রগতিশীল নারী-সমাজের চিরকালের অন্বিষ্ট।

এবার আমাদের দেশের নারী-সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। উল্লিখিত নিরিখে বিচার করলে কি বলা যাবে—বর্তমান নারী-সমাজ তাদের পক্ষে অমর্যাদাকর ইমেজটি অপ্রমাণ করে মেধা-মননে মহিমান্বিত ইমেজটি তৈরীতে যত্নবান হয়েছে? এখানে আমার কিছু সংশয় আছে। মনে হয়, এ দেশের মেয়েরা সংসারের চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেও তাদের ঐ স্থূলতার ইমেজের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পায়নি, বরং স্বেচ্ছ বন্ধন আরো বেশী কঠিন হচ্ছে এবং তাকেই নারী-

প্রগতির লক্ষণ বলে চালানো হচ্ছে। অবশ্য তার জন্য পাশ্চাত্যের নারীপ্রগতি আন্দোলনের কিছু প্রভাব অনস্বীকার্য। ওসব দেশে নারী-প্রগতির নামে কিছু এলোমেলো কাণ্ড ঘটে, তা কখনো বিচিত্র পোশাকে কখনো যৌন স্বেচ্ছাচারের রূপে যেমন টপলেস, ব্রা-লেস, সী-থ্রু জামা, জিন পোশাক, কখনো কিছুর প্রতিবাদে বা হঠাৎ নগ্নিকা হয়ে রাস্তায় হাঁটা, মিস্ ন্যুড্ নির্বাচন, অনুচার মাতৃত্ব প্রভৃতি। এদেশেও তাদের কিঞ্চিৎ সলজ্জ সংস্করণ নারী প্রগতির নামে চলছে। অথচ কাকে কে বোঝাবে—মোটেই বসনে ভূষণে নয়, নারী প্রগতি আসলে মননে। আরও পরিতাপের বিষয়—"মননশীলা" অনেক নারীও বসনে-ভূষণেই প্রগতি খুঁজছেন এবং এমন দুই নারীর মধ্যে কথাবার্তায় শাড়ি-গয়নার কথাই প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই "সারা দেশে লিখতে পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা শতকরা ৩৯, অথচ মেয়েদের বেলায় সে সংখ্যা মাত্র ১৮"—বলে 'শ্রীমতী'র এই আফসোসের দরকার আছে কিনা আজ ভাবতে হবে। কারণ নারীর এ শিক্ষা যে নারী প্রগতির অপরিহার্য নিয়ামক নয়, এখনো তার প্রমাণ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

নারী সমাজের আর একটি দুঃখজনক বিষয়—তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও হীনমন্যতা। তার সহজ উদাহরণের দু'একটি প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় এইভাবে—একই ডিগ্রীধারী দুই নারী-পুরুষ ডাক্তারের মধ্যে মেয়েরাই নারী-ডাক্তার সম্বন্ধে কম আস্থাশীল। আর মেয়ে জন্মালে মায়ের চোখেই আগে জল আসে।

যদিও তত্ত্বগতভাবে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে একমত যে, "নারী-সমাজই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে ও বলতে পারবে, কী অধিকার ও কেমনতর অধিকার তার জীবনে প্রয়োজন," কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে বর্তমান নারী-সমাজ কিছুটা বিভ্রান্ত। উদাহরণগতভাবে তাদের দুটি কর্মক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য যেখানে তারা ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার একটি ক্ষেত্র সিনেমা, অপরটি বিজ্ঞাপন। আজকাল ছায়াছবিতে, বিশেষত হিন্দি ছবিতে মেয়েরা যেভাবে নগ্নতার প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে চলেছে তাতে নারী-সমাজ যদি লজ্জা না পায় বা নারীত্বের অবমাননাবোধে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে, পরন্তু এটা প্রগতির লক্ষণ বলে গ্রহণ করে তা হলে তাদের হয়ে কে আর লাঠি ধরবে! কেউ বলবে—এ সব পুরুষ সিনেমা-ব্যবসায়ীর টাকার খেলা? কিন্তু যে সব মধ্যগগনের তারকারা এত দিনে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে তারাও কেন সেই টাকার খেলায় সাপের মত মাথা দোলাচ্ছে, স্থূলতার শিকার হচ্ছে! তাই নগ্ন ছবির পোস্টারে আলকাতরা মাখালে বা সিনেমার সামনে পিকেটিং করলেই শুধু চলবে না, সমস্যার আরো গোড়ায় যেতে হবে। নারী স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে নারীর মর্যাদাবোধের উজ্জীবনের কর্মসূচী নিতে হবে নারী সমাজকে। এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে পারে—এ সব অভিনেত্রীরা নারী সমাজের শতকরা কতজন? এদের প্রভাব কিন্তু দেশের মোট আয়তনের প্রায় সমান এবং আরও দুঃখজনক হল—ছবিতে (পর্দায় ও সিনেমা পত্রিকায়) এদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। এমনকি এ কথা শুনলেও আশ্চর্য হব না যে, নারী-প্রগতির কোন মেয়ে-পাণ্ডাই পুত্র-কন্যা নিয়ে 'ববি' দেখছেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র—বিজ্ঞাপনে আজকাল নারী দেহের যথেচ্ছ ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর হল কলকাতার "স্টেটসম্যানে" একটি পাউডার কোম্পানীর প্রায় নগ্ন দেহের বিজ্ঞাপনকে ঘিরে যে প্রতিবাদের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে নারীকণ্ঠ ছিল খুবই ক্ষীণ: আর আজ তার থেকেও প্রকট বিজ্ঞাপনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, শুধু তার সুফল অনুভূত হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয়ের কিস্তিতে। পাশ্চাত্যের এই বিক্রয়-কৌশল এমন যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এ দেশে যে, মোটর টায়ার, ফাউনটেন পেনের বিজ্ঞাপনেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে মেয়েদের টেনে আনা হচ্ছে। এতে যে মেয়েদের মর্যাদা ধূলি লুণ্ঠিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত এক রিপোর্টে হুঁশিয়ারী করা হয়েছে—

"Advertising is reported to be the most insidious form of mass media perpetuation of the derogatory image of women as sex symbols and as an inferior class of human beings." (Report on the Influence of Mass Communication Media, p 5)

তা ছাড়া প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবসায়ীদের 'মিস' নির্বাচন আরও প্রগতিশীল বিজ্ঞাপনী কৌশল। আর শহর, রাজ্য বা দেশের নামে মিস নির্বাচন তো একটি আড়ম্বর বার্ষিক উৎসব—আমাদের সংস্কৃতির প্রায় অঙ্গীভূত হতে চলেছে। এতে মহিলা সমাজও বোধ হয় গর্বিত, কারণ গত বছর বাংলার শ্যামলী মেয়ে যখন মিস 'ক্যালকাটা' টাইটেল জয় করে নিল তখন নারী-প্রগতির প্রবক্তার কলমেও খুশি উপচে পড়তে লক্ষ্য করা গেল, সেখানে 'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের' জন্য নারীত্বের পরাজয় ঘোষণা করলো না। তা হলে তো বলা যায় —বিমান-বিনোদিনীর বাছিত নারীকে অনেক উঁচুতেই তুলে দেয়—দুটোই যখন দেহের ব্যাপার। অথচ মননের মাধুর্য ... ঐশ্বর্য নিয়েই তো তাকে বলে ... হবে —"আমি নারী, আমি মহিয়সী ..." বিশ্ব মহিলা বৎসরে সে উপলব্ধি ... ই স্পষ্ট হোক।

অরুণ মুখোপাধ্যায়
রাজেন্দ্রনগর, হায়দরাবাদ

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি

আমাদের সাংস্কৃতিক অধোগতি সম্পর্কে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে (দেশ, ২ ফাল্গুন, ১৩৮১) যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তার সঙ্গে একমত হবেন মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী সকল বাঙালী।

সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ ভূমিকা আমাদের নিত্য প্রয়োজনে নেই বলে যাঁরা ঐ ভাষা সর্বপ্রকারে পরিহার করতে চান তাঁরা বাস্তবিকতাবোধের পরিচয় দেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'রাজশেখর বসুর বক্তব্য। তাঁর মতে, 'প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, সংস্কৃতকে সে অর্থে মৃত বলা যায় না। সংস্কৃত বাক্য মরেছে, অর্থাৎ সাধারণে সে ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে বেঁচে আছে, উচ্চারণের বিকার হলেও রূপ বদলায় নি। আমরা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করি না, দরকার হ'লে সংস্কৃত রীতিতেই নূতন শব্দ এবং নূতন সমাসবদ্ধ পদ রচনা করি।...... সংস্কৃত শব্দে ব্যাকরণ অভিধানের শাসন আছে। যদি আমরা মনে করি যে এই শাসন বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় তবে মহা ভুল করব। সংস্কৃত

শব্দে যে সুচিরাগত নিয়মের বন্ধন আছে সকলেই তা প্রামাণিক ব'লে মেনে নিতে পারে, তাতে শব্দ এবং তার অর্থ স্থির থাকে, কিন্তু ভাষার স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র বাধা পায় না। বাংলার তুল্য হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি কতগুলি ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য আছে, এবং সেই কারণেই বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষী অল্পায়াসে পরস্পরের ভাষা শিখতে পারে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশের এই যে শব্দসাম্য আছে তা অবহেলার বিষয় নয়, এই সাম্য যত বজায় থাকে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল।'

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার চর্চা করতে হলে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনেও আমাদের আগ্রহী হতে হবে। যেখানে আমাদের মাতৃভাষার অনাদর প্রকট সেখানে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা উপলব্ধ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে দেশব্যাপী চিৎপ্রকর্ষের সাধনায় মাতৃভাষার সহায়তা অপরিহার্য এবং সেজন্য উপরিউক্ত কারণে, সংস্কৃত ভাষারও। অন্যথায় আমাদের মধ্যে অবিচল থাকবে বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ ও অনাত্মীয় শিক্ষাগত মানসিকতার বহুবিধ বৈগুণ্য এবং দুর্লভ হবে সেই সংস্কৃতিবান, যাঁর অভিধায় স্থান নেই ভাষিক বিকারের ও অসহিষ্ণুতার।

দিলীপকুমার দাস
সোদপুর

গারো গোষ্ঠীর উৎস সন্ধানে

গারো গোষ্ঠীর উৎস সন্ধানে প্রবন্ধ পড়লাম (দেশ, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৫)। এই সম্পর্কে দুই চারটি কথা লিখছি। গারোদের আকৃতি বর্ণনায় আছে, 'কোঁকড়ানো নয়তো ঢেউ খেলানো চুল'। গারোদের প্রতি হাজারে একজনেরও চুল কোঁকড়ানো কিংবা ঢেউ খেলানো আছে কিনা সন্দেহ। আমি গত চার বৎসরে মোট গারো জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশকে দেখেছি। ঢেউ খেলানো চুল কদাচিৎ চোখে পড়ে।

Achick mande শব্দটির উচ্চারণ হবে আচীক মান্দে, মাণ্ডে নয়. যোগীঘোপা হবে যোগীগোপা, কারণ গারো ভাষায় লুকিয়ে রাখা বা কবর দেওয়া মানে 'গোপে ডনা' (gope dona)। তাই যোগীকে লুকিয়ে রাখা জায়গার নাম হবে যোগীগোপা (বিয়াপ)। গারোদের নেতা দুজন নয়, চারজন। তাদের নাম: JaP-jalin (pa), Sukbongi (pa), Sanbasan (Pa) এবং Kotanangre (pa)। Pa (উচ্চারণ ফা) অর্থ নেতা বা পিতা। অবশ্য Jappa-jalinpa, SukPa-Bongipa এভাবেও লেখা হয়।

আরামবিটের নাম আসাম ইতিহাসে আছে। আরামবিটকে আরিমও বলে। উচ্চারণ বিভ্রাটের ফলে এরূপ হয়েছে। মাছামারু গারো ভাষায় হবে matcha du বা matcha bet। শব্দটি একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গারোদের বিশ্বাস এরা দিনে মানুষ রাত্রে বাঘ। দিনে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করে কিন্তু রাত্রে বাঘ হয়ে উৎপাত করে। এদের বিশ্বাস এরকম লোক এখনও আছে। বাঘমেলা পাহাড়ের নামের উৎপত্তিও হয়ত গারো ভাষা থেকে কারণ জায়গাটিকে গারোরা Matcha (বাঘ) Mela বলে। পূর্বের নাম বাঘমেলা হলে বাঘমেলাই বলতো, জায়গার নাম গারো ভাষায় অনুবাদ করতো না।

সিদ্ধব্রত পুরকায়স্থ
হাহিম, আসাম

সাহিত্য সংবাদ

কবিতা ও গান

গানের কাছ থেকে কবিতা সরে এসেছে অনেক দূরে। অনেক দিন পর্যন্ত, বিশেষত ছাপার অক্ষরের প্রসারের আগে পর্যন্ত কবিতাকে নির্ভর করতে হতো সুরের ওপর। সুর ছিল তার প্রচারের যানবাহন। তখন কবিতা ও সঙ্গীত ছিল হরিহরাত্মা আলাদা করে চেনার কোনো উপায় ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীগুলি গান না কবিতা? ছাপার অক্ষরে দেখলে সেগুলিকে গান বলে গণ্য করি, আসরে গায়কের মুখে শুনলে পদাবলী গান।

সুরের প্রত্যক্ষ সাহচর্য পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা অনেকটা সরে আসে জনসাধারণ থেকে। সুরের প্রতি মানুষের টান অনেকটা ইনস্টিনক্টিভ, যে কোনো সুরেলা উচ্চারণের প্রতিই মানুষ খানিকটা আগ্রহী হয়, যে কারণে ফেরিওয়ালারা সুর করে তাদের জিনিসের নাম উচ্চারণ করে। এদিকে ছাপার অক্ষরের ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই এর থেকে রস গ্রহণ করা এখনো সব মানুষের তেমন রপ্ত হয়ে ওঠে নি। ছাপার অক্ষর পড়তে যারা শেখে, তাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক মানুষই এখনো এর থেকে আনন্দ গ্রহণ করতে পারে। কবিতা, সেই জন্যই অনেকটা এখন বিশেষ এক সীমিত শ্রেণীর কাছে আদরণীয়।

অপরপক্ষে কবিদের ছেড়ে দেবার ফলে গানের বাণীগুলি রচনার ভার চলে যায় অকবিদের হাতে। এর ফল সব সময় যে খারাপ হবে, তার কোনো মানে নেই। আমাদের মার্গ সঙ্গীতে, একমাত্র তারানা ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই বাণীর অংশ সামান্য, বড় বড় ওস্তাদরা নিজেরাই তা রচনা করেন এবং সুরের প্রাবল্যে সেগুলি উপভোগে কোনো বাধা হয় না। 'গরজে ঘটা ঘন কারি কারি' কিংবা 'পিয়া কি মিলন কি আশ'—এই সব লাইনের মধ্যে কোনো আহা মরি কবিত্ব নেই, বরং আমাদের মুগ্ধ করে এর সারল্য এবং এর অঙ্গাঙ্গী সুরের মাধুর্য।

সুরের সাহচর্য ছেড়ে কবিতা সরে এলেও, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কবিরা সুরের প্রতি একটি টান বোধ করেছেন। বড় বড় কবিরা আলাদাভাবে লিখেছেন গান, নিজেরাই সুর দিয়েছেন ও গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল—এঁরা সুরকার ও গায়ক হিসেবেও বিখ্যাত। এঁদের কবিসত্তার সঙ্গে এঁদের গায়কসত্তার খুব একটা মিল আছে, এমনও বলা যায় না। এই গানগুলিকে ভারতীয় ঐতিহ্যময় রাগ সঙ্গীতের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যায় না, কারণ এতে তান বিস্তারের সুযোগ নেই এবং গায়ক গায়িকাদের মুন্সীয়ানা দেখাবার সুযোগও কম। অনেকে এই গানগুলির নাম দিয়েছেন কাব্য-সঙ্গীত, অর্থাৎ আবার সেই কবিতা ও গানকে মেলাবার চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের যেমন আধুনিক কবি বলা শুরু হলো, তেমনি পরবর্তী গানকেও বলা হতে লাগলো আধুনিক গান। এখনো এই নাম চলছে। আধুনিক কবিরা যেমন সুরকে একেবারে পরিত্যাগ করেছে, তেমনি আধুনিক গায়করা বর্জন করেছে কাব্যরস। দুটি এখন দুই মেরুতে। আধুনিক কবিতার আদি পুরুষ বলতে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখকে বোঝায়—এঁরা কেউই গান রচনা করেন নি, গায়ক হিসেবেও প্রসিদ্ধি নেই।

আধুনিক কবিতার তুলনায় আধুনিক গান কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার মতে, নজরুল এবং দ্বিজেন্দ্রলালই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গানের জন্মদাতা। রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গানের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা অননুকরণীয় কিংবা অনুকরণ করলেই নির্ঘাত মৃত্যু। নজরুল বা দ্বিজেন্দ্রলালের এমন বৈশিষ্ট্য নেই, বা থাকলেও এঁরা আরও এমন অনেক গান রচনা করেছেন যাতে কোনো কাব্যরস নেই এবং সুরও চটুল। গ্রামোফোন কোম্পানির সুরকার ও গীতিকার হিসেবে নজরুল যে সব অজস্র গান রচনা করেছেন, সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিককার আধুনিক গান। দ্বিজেন্দ্রলালও মঞ্চের জন্য যে কিছু কিছু গান লিখেছেন, সেগুলিকে দ্বিজেন্দ্র গীতি আখ্যা দিলে বেশ ভারিক্কি শোনায় বটে, কিন্তু সেগুলি আধুনিক গানের নিশ্চিত সমগোত্রীয়।

আধুনিক গান এক সময় জনপ্রিয়তা পেয়েছে খুবই, হিন্দী গানের প্রাদুর্ভাবের আগে পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু সম্মান পায়নি। কলেজের জলসায় কিংবা পাড়ার ফাংশানে আধুনিক গানের দারুণ চাহিদা কিন্তু কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনা সভায় কিংবা বড় ধরনের কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে আধুনিক গান পরিবেশনের কথা এখনো কেউ চিন্তাও করে না। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?

জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে অনেক দূরে সরে গিয়ে কবিতা, তথা আধুনিক কবিতা যেমন আরও কঠিন, কঠিনতর হয়েছে—সেই রকমই, জনপ্রিয়তা পেতে পেতে আধুনিক গান ক্রমশ তরল, অতি তরল হতে হতে এখন একেবারেই সুর ও কথার একটা জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। এই সব গান যাঁরা রচনা করেন কিংবা সুরারোপ করেন, তাঁদের কাব্য জ্ঞান নেই বা সুর জ্ঞান নেই—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। জনরুচির চাহিদা মেটাবার জন্য এখন সুরুচির দিকে দৃক্‌পাতও করা হয় না।

আধুনিক গানকে খানিকটা জাতে তোলার জন্য মাঝে মাঝে কিছু চেষ্টা হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক সময় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কিছু কবিতাকে সার্থক গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। সলিল চৌধুরী এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসও আধুনিক কালের উপযোগী আধুনিক। এ ছাড়া তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অবাক হবার কথা—সজনী দাসও কিছু ভালো গান লিখেছেন। তারপর? অনেক দিন এর পর আর এরকম কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

হিন্দী গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা গান বেঁচে থাকার তাগিদেই বোধ হয় আরও নিম্নরুচিতে নামতে চাইছে। এর প্রতিবাদস্বরূপ কিছু কিছু নবীন গায়ক আবার কাব্যসঙ্গীতের প্রসারের চেষ্টায় ঝুঁকেছেন, আধুনিক কবিতার দিকে। খ্যাতিমান আধুনিক কবিদের রচনা বেছে নিয়ে সুরারোপ করে এরা গাইছেন বিভিন্ন জায়গায়। অজিত পাণ্ডে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দের কবিতার গান রেকর্ড করেছেন, আমি শুনেছি। ঋষিণ মিত্র, উৎপল চক্রবর্তী এবং আরও কেউ কেউও এরকম আধুনিক কবিতাকে সুর দিয়ে গাইছেন। জনসাধারণের মধ্যে এর খুব প্রচার হয়নি এখনো, গানগুলিও যে সবক্ষেত্রে খুব সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না। কথা ও সুরে অনেক জায়গায় মেলে নি। আধুনিক গানের কাঁচা সুরে ভাবগর্ভ বাণী বসালে তা শ্রবণ সুখকর হয় না। এঁরা লোকসঙ্গীতের সুরের ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করছেন কেন?

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

১৫ ফেব্রুয়ারির দেশে আপনার 'সাহিত্যের শরীর' রচনাটি পড়লাম সাহিত্য সংবাদ বিভাগে। রচনাটির বেশির ভাগের সঙ্গে একমত হলেও প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্যে সত্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। আপনার অভিমত থেকে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক প্রবন্ধ আর আগের মত (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে বুদ্ধদেব বসু) সৃষ্টিশীল নয় এবং এগুলি বি দ্যা য় ত নি ক প্রয়োজনেই নিয়োজিত। কিন্তু এই অভিমত সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। ইদানীংও, দেখতে পাই, প্রচুর সৎ ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। এবং এগুলি লিখছেন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, অশ্রুকুমার সিকদার-এর মত খ্যাতনামা কবি ও প্রাবন্ধিকেরা। এ ছাড়া কয়েক বছর আগের 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকাতেও বিদগ্ধ সাহিত্যালোচনা দেখা যাবে। আর আবু সয়ীদ আইয়ুব, অন্নদা-শংকর রায়-এর মতো প্রণম্য প্রাবন্ধিকেরাও তো অবিরল লিখে যাচ্ছেন এখনও। গল্প-উপন্যাস বা কবিতার বই-এর চেয়ে তুলনা-মূলকভাবে সংখ্যায় কম হলেও কিছু সুন্দর প্রবন্ধের বই-এরও দেখা পাওয়া যায় ইদানীং যারা কোন অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনকে শুধু সিদ্ধ করে না, পাঠকের অন্বীক্ষু মানসকেও তৃপ্ত করে।

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
গোবরডাঙা

মধুসূদন জীবনের দ্বৈত সত্তা

দুই মধুসূদন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ...ানন্দম্, রামকৃষ্ণ পল্লী, কলকাতা-৫১। ...ম সাত টাকা।

মধুসূদনের জীবনের বিভিন্ন দিক ...য়ে নানা সময়ে লেখা মোট আটটি ...বন্ধের সংকলন 'দুই মধুসূদন'।

মাইকেল মধুসূদন, সেই নীলনয়না ...য়েটি, ক্যাপটেন রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথের ...ধি, বালিকা বিবাহ, নীলদর্পণের ...নুবাদক, বিস্মৃত কবিতা, মাইকেল বনাম ...ধুসূদন—এই আটটি প্রবন্ধের প্রথম, ...ষ্ঠম ও অষ্টম প্রবন্ধের গ্রন্থপরিকল্পনার ...ত্রে রচিত। এই ধরনের বই অনেক ...ময়েই গ্রন্থ হয়ে ওঠে না, হয়ে দাঁড়ায় ...ংকলন। লেখক সেই অস্বস্তি অনুভব ...রেছেন এবং তিনটি প্রবন্ধ যত্ন করে ...ইটির নামকরণের সঙ্গতিরক্ষায় সচেষ্ট ...য়েছেন। নতুন প্রবন্ধের সংযোজন ছাড়াও ...য় প্রতিটি প্রবন্ধের সূচনা ও উপসংহারে ...ধুসূদনের দ্বৈত ভূমিকার কথা মনে ...রিয়ে দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর বইটি ক... ...ণাঙ্গ একটি চরিত্র দিতে চেয়েছেন। ...খের কথা, লেখকের প্রয়াস বহুলাংশে ...র্থক অথচ অন্যদিকে প্রবন্ধগুলি স্বয়ং-...ম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবেও উপভোগ্য বটে।

মধুসূদনের দ্বৈত ভূমিকার কথা ...রিস্ফুট করে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। ...লা যেতে পারে, এই সূত্রেই আপাত-...চ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলি গ্রথিত। বস্তুত, বিষয়টি ...তুন নয়। তবু বহুজনবিদিত ও স্বল্প-...াত বিবিধ তথ্যের সাহায্যে মধুজীবনের ...পেক্ষিত দিকগুলিতে আলোকসম্পাত করে ...লেখক মধুসূদনের জীবনরঙ্গভূমিতে ...সংকোচে প্রবেশ করেছেন।

সংকোচের কারণ ছিল। মধুসূদনের ...ত্যুর পরে একশো বছরেরও বেশি কেটে গেছে। আর এই তাঁর সার্ধশত জন্মবর্ষ। এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর কাছে মধুসূদনের যে জীবননাট্য সর্বাধিক গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে, তাকে অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে খুব কম সমালোচকই দেখতে চেয়েছেন। মধুসূদনের প্রখ্যাত জীবনীকারদ্বয় মধুসূদনের অসংখ্য তথ্য প্রকাশ করে গেলেও পরবর্তীকাল তাঁদের ভাষ্য সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারে নি। মোহিতলাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সাহায্যে তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তি ও সাহিত্যিক, মধুসূদনের উভয় সত্তারই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-আকৃতি তাঁরা লক্ষ করেছেন।

বৈদ্যনাথবাবু ঠিক কী চেয়েছেন আর কী করেছেন, দেখা যেতে পারে। তাঁর বইয়ের নাম : 'দুই মধুসূদন'। কোন্ দুই মধুসূদন? 'একদিকে ব্যক্তি-মধুসূদন, অন্য দিকে স্রষ্টা-মধুসূদন। এই দুই সত্তার মধ্যে' লেখক 'অনেক জায়গায় বৈপরীত্য অনুভব করেছেন।'

কিন্তু বৈপরীত্যের সীমা কি এইটুকুই? যে কোনো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের প্রসঙ্গেই তো ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে স্রষ্টা-সত্তার কিছু-না-কিছু বৈপরীত্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। নন বলেই কি বঙ্কিমচন্দ্র সযত্নে তাঁর ব্যক্তি-জীবনকে আড়ালে রেখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'ই লিখেছেন, জীবনী নয়? এমনকি জীবনীকারকে মৃদু ভর্ৎসনাই করে গেছেন। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে' এ তাঁরই কথা। আবার, পরিহাসের ছলে জানাতে ভোলেন নি, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয়গো'।

বৈদ্যনাথবাবু তাঁর এই বইতে কার্যত 'ব্যক্তি মধুসূদনে'র মধ্যেই যে দ্বৈত সত্তা ছিল, তারই স্বরূপ-নির্ণয়ে সচেষ্ট দেখা গেল। যেমন, গুরু ক্যাপটেন রিচার্ডসনের প্রসঙ্গে কবির প্রথম জীবনের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ও পরবর্তীকালের নিস্পৃহ ভাব, ঋণগ্রহণে-জীবনযাপনে ঋণ পরিশোধে মধুসূদনের বিচিত্র মনোভঙ্গি, বালিকা বিবাহ বিষয়ে কবির তীব্র আপত্তি ও বিদ্রূপ অথচ (লেখকের অনুমান) বালিকা রেবেকা ও বালিকা হেনরিয়েটাকে বয়সের অস্বস্তিকর ব্যবধান সত্ত্বেও বিয়ে করার জন্য তাঁর অপ্রতিরোধ্য উদ্যম : মধুসূদনের ব্যক্তি চরিত্রের এই সব স্ববিরোধিতা উদ্‌ঘাটনে বৈদ্যনাথবাবু সাধ্যমত তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও সেগুলিকে নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। 'সেই নীলনয়না মেয়েটি' ও 'বিস্মৃত কবিতা' অধ্যায় দুটিতে মধুসূদনের স্বল্প-আলোচিত ও উপেক্ষিত ইংরেজী কবিতাবলীর সাহায্যে কবির হারিয়ে-যাওয়া প্রণয়বৃত্তান্ত উদ্ধারের কৌতূহলোদ্দীপক চেষ্টা করেছেন লেখক।

'নীলদর্পণের অনুবাদক' কে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এ বিষয়ে লেখকের সিদ্ধান্ত, মধুসূদন নীলদর্পণের কোনো কোনো অংশের অনুবাদ করেছিলেন। লেখকের উপস্থাপনাটি সুন্দর যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করে নেবেন বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে দু-একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করলে ভালো হতো। প্রথম ও শেষ প্রবন্ধটিতেই লেখক

(সি ১৮১৩০)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১
২। প্রকাশকাল সাপ্তাহিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১
৪। সম্পাদক অশোককুমার সরকার, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :
(ক) মালিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অপরিকুমার সরকারের পক্ষে অলকা সরকার। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১।

আমি অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

[signature]

মার্চ ১, ১৯৭৫ প্রকাশক

গভীরতর সমস্যাটিকে স্পর্শ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। মধুসূদনের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত, স্বেচ্ছাচারিতা—প্রবন্ধ দুটিতে তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাব ও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব-বেদনায় মধুসূদনের জীবন ও কাব্য জটিল।

'মধুসূদনের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে এই আলোচনাগ্রন্থটি প্রকাশিত'—ভূমিকায় জানিয়েছেন লেখক। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিচিত্র তথ্যসন্নিবেশ ও জটিলতাবর্জিত রচনাবৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য। তবে 'সেই নীলনয়না মেয়েটি' প্রবন্ধের সূচনা ও অংশবিশেষ অপ্রয়োজনীয় কথকতায় বিড়ম্বিত। এই জাতীয় রচনাভঙ্গি প্রবন্ধকে জখম করে লেখকের শক্তা জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খুব কমদিন হল না। ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিম মাহাতর নাম দেখেছি আজ থেকে বছর বারো আগে। একসময় পর-পর দেখতাম। গত কয়েক বছরে তেমন ভাবে চোখে পড়ে নি। অনেক তরুণ কবির মতো ইতস্তত উজ্জ্বল পংক্তির ছাপ রেখে তিনি ক্রমশ সরিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে এ-রকম মনে হচ্ছিল। এমন সময় হাতে এল বঙ্কিম মাহাতর প্রথম কবিতার বই : **অনুভব সন্ত্রাবলী** (পরিবেশক : স্টাডি, যাদবপুর, তিন টাকা)। দেখে ভাল লাগল। বই ছাড়া কারো সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, তিনি অধৈর্য হয়ে চটপট বই বার করে ফেলেন নি। বেশ সময় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে কবিতা সম্পর্কে সুস্থির ভাবে কিছু ভেবেছেন নিশ্চিত। গ্রহণ-বর্জনে কিছু দ্বিধা নিঃসন্দেহে কাজ করেছে।

'অনুভব সন্ত্রাবলী'তে অবশ্য বঙ্কিমের প্রথম দিকের রচনাই বেশী। কোনো কবিতায় আলাদা শিরোনামা নেই। ১৩৫টি টুকরো অনুভবের চিহ্ন তিন ফর্মার আয়তনে ধরা পড়েছে। প্রতিটি অনুভবই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটু বেশীদিনের কবি বলে চালাকি ব্যাপারটা নেই বললেই চলে। সহজ অথচ রহস্যময় পংক্তির স্রষ্টা, ছন্দে আস্থাবান, বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী বঙ্কিম মাহাতর কবিতায় নিজস্ব ঢঙটি যে ক্রমশ ফুটে উঠেছে বোঝা যায়। 'স্মৃতি খেলা করে মুগ্ধ চৈতন্যের ভেজানো দুয়ারে'; 'তার কথা মনে পড়ে, তার কথা ছবি হয় তার কথা, মুখ মনে পড়ে', 'অন্ধকারে বড়ো জ্বালা তৃষ্ণা যেন তাতার ডাকাত'—এই জাতীয় নিটোল অথচ একান্ত-নিজস্ব-নয় পংক্তি থেকে তিনি ধীরে-ধীরে পৌঁছচ্ছেন নিজস্ব অনুভূতির জগতে, সেখানে 'শেষ রাত্তিরের জ্যোৎস্না আমার শয্যায় নেমে এলো। পবিত্র কুমারী যেন নম্র নেত্রপাতে হেঁটে যায়।' কিংবা 'বাইরে মসৃণ রোদ ডালিমের ডালে/কত ফল ফলেছে দ্যাখো রে/ওরে বক্ষ দে আমায় গোটা দুই ফল' অথবা 'বাইরে নিম শাখায় [illegible] পোকার ক্রন্দন'--ধরনের পংক্তি [illegible] কলমে ধরা পড়েছে। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের জন্য পাঠক সাগ্রহে অপেক্ষা করবেন।

✻

'বলিদান অথবা মায়ের ডাক', 'খরস্রোতা অথবা বিক্ষুব্ধ যৌবন' এ জাতীয় নামকরণ বাংলা বই থেকে বেশ কিছুকাল আগে উঠে গেছে। এখন যদি কেউ সেই পুরনো প্রথা ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে কেমন লাগে? বোধ করি সেই পরীক্ষাই করেছেন তরুণ গল্পকার কৃষ্ণ মণ্ডল। তিনি তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম রেখেছেন **ভাঙনের ডিঙা কিংবা হরিণের চোখ** (প্রকাশক : একাল, কলকাতা-৩৭, পাঁচ টাকা)।

বস্তুত, 'ভাঙনের ডিঙা'র সঙ্গে 'হরিণের চোখ'এর সাদৃশ্য আধুনিক কবিরাও চট করে খুঁজে পাবেন না। এর যে কোনো একটি নামই গোলমালে ফেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বিশেষত, নামগল্পটি যদি কেউ পড়ে ফেলেন, তাহলে তাঁকে তৃতীয় সমস্যায় পড়তে হবে।

'হরিণের মতো নিজস্ব ছায়ার সন্ধানে' স্বচ্ছ সরোবর জলের দর্পণে' বারংবার গতি ছিল যে রাজীবদার, তাকে নিয়ে এই গল্প। চার ক্লাস অবধি বিদ্যে, ভাষাজ্ঞান না থাকায় কবি বা লেখক না হওয়া, ছবি আঁকার চেষ্টা ছিল না বলে শিল্পী না হওয়া, অভিনয় না করার দরুন অভিনেতা না হতে পারা রাজীবদা ছিলেন এক অফিসের কেরানী। সামান্য মাইনে, প্রমাণের সুযোগহীন রাজীবদার ছিল শুধু এক উদভ্রান্ত মন। সেই মন নিয়ে "নিছক একটা আলেয়ার ছায়ায় রাজীবদা হরিণের মত অরণ্য পেরিয়ে বারবার জলাশয়ে ছায়া দেখত—কিন্তু ছায়াটা ছুঁতে পারত না—আলোর স্বর্গ গড়তে গিয়ে আগুন পেত না।...এইভাবে ডিঙাটা ভাঙনের দিকেই বেয়ে চলে।" অর্থাৎ রাজীবদা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করল। গল্পের মৃত্যু অবশ্য আরও আগেই ঘটে গেছে।

কোমল হাতের ক্রিকেট ঠিক কোমল নয়

যদি বলি আমাদের দেশের পুরুষ ক্রিকেটাররা প্রথম দিকের টেস্ট খেলাগুলিতে যে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি মেয়েরা সেই কৃতিত্ব অর্জন করতে তবে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলা হবে। তবু অনস্বীকার্য প্রথম দিকের সিরিজগুলিতে পুরুষদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা টেস্ট ক্রিকেটে অভিষিক্ত হয়েই সিরিজ ড্র করেছে অস্ট্রেলিয়ার সংগে। আমাদের দেশে সর্ব-প্রথম আয়োজিত মেয়েদের তিনটি টেস্টের কোন টেস্টেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। পুনার প্রথম টেস্ট ছিল উত্তেজনা-হীন। দিল্লির দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিততে পারেনি মাত্র ৩ রানের জন্য। কলকাতার তৃতীয় টেস্ট মাত্র ১২ রানের জন্য জিততে পারেনি ভারতের মেয়েরা। শেষ দুটি টেস্টই ছিল উত্তেজনায় ভরা।

আমাদের দেশের মেয়েরা ব্যাট ও বল হাতে তুলে নিয়েছে মাত্র তিন বছর। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা টেস্ট খেলতে শুরু করেছে ১৯৩৪ সাল থেকে। অর্থাৎ তারা ৪০ বছর ধরে টেস্ট খেলছে ইংলন্ড, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে। সেই অস্ট্রেলিয়া দলের সংগে আমাদের মেয়েরা যে সমান তালে ব্যাট-বলের লড়াই চালিয়েছে এটা আশার কথা। এ থেকে প্রমাণ মেলে সুযোগ ও শিক্ষা পেলে যে-কোন ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব অর্জন করা যায়।

অস্ট্রেলিয়া থেকে যে দলটি খেলতে এসেছিল সে দলের বেশির ভাগ মেয়ে খেলাধুলোর নানা দিকে পারদর্শিনী এবং শরীরচর্চার ছাত্রী। টেনিস, হকি, বাস্কেট-বল, স্কোয়াশ, ভলিবল, অশ্বচালনা এবং গলফ খেলায় অনেকেরই বেশ কিছু দখল

খেলার মাঠে

আছে। ক্রিকেট খেলার কোচিং নিয়েছে বিজ্ঞ প্রশিক্ষকের কাছ থেকে। যেমন ওদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসউওম্যান লিনেট স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিখ্যাত ক্রিকেটার নর্ম্যান ওনীলের ক্রিকেট স্কুলের ছাত্রী। কেউ কেউ ইংলন্ডেও শিক্ষা পেয়েছে।

খেলাধুলোর নানা দিকে অভিজ্ঞ মেয়ে অবশ্য ভারত দলেও ছিল। তবু তুলনায় ওদের মত পটু না, সংখ্যাও কম। কিন্তু ক্রিকেট মাঠের পাল্লায় প্রায় সমান সমান।

সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ এবং ব্যাটিংয়ের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে ইডেনের তৃতীয় টেস্টই উপভোগ্য হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এ টেস্টেই সিরিজের প্রথম সেঞ্চুরি করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাথলিন গারলিক। ওদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসউওম্যান লিনেট স্মিথ যেমন দিল্লি টেস্টে ৯৭ ও ৫২ রান করে দুই ইনিংসে অপরাজিত ছিল কলকাতায় তেমন ক্যাথলিন গারলিক দুই ইনিংসে অপরাজিত ছিল ১৫০ ও ৫১ রান করে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসউওম্যান শান্তা রংগস্বামী —ফটো দেশ

মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত বড় রানের রেকর্ড ইংলন্ডের বেটি স্নোবল-এর। স্নোবল ১৯৩৫-এ ক্রাইস্টচার্চে ১৮৯ রান করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ক্যাথি গারলিকের হাত যেমন জমে গিয়েছিল তাতে হয়তো স্নোবল-এর রেকর্ড ভাঙতে পারত, অস্ট্রেলিয়া ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা না করলে। জয়ের আশাতেই ইনিংস ঘোষণা করা হয়েছিল। তৃতীয় দিনে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল জয়ের জন্য ২১০ মিনিটে ১৯৮ রান করতে। ভারত সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করেছিল। মাদ্রাজের উইকেট কিপার ও ওপেনার ফৌজি খলিলি এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসউওম্যান কর্ণাটকের শান্তা রংগস্বামী যদি রান আউট না হত তবে হয়তো ইডেনেই ভারতের মেয়েদের প্রথম টেস্ট জয় সাধিত হত। তৃতীয় উইকেট জুড়িতে এক সময় ফৌজি ও শান্তার ৫৬ মিনিটে ৫০

ইডেনে মেয়েদের টেস্ট খেলার শেষে দুই ইনিংসে ১৫০ ও ৫১ রানে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ক্যাথি গারলিককে আদর করে কাঁধে তুলছে ভারতের মেয়েরা

রান যোগের মধ্যে পুরুষালী ব্যাটিংয়ের পরিমার্জন মেলে। উল্লেখ্য দিল্লি টেস্টে শান্তা ৯৩ রানে অপরাজিত ছিল।

আক্রমণসম্মত কেতাবী ক্রিকেটে অনেকেই সুনাম কুড়িয়েছে। বলের লাইনে ব্যাট চালাবার প্রয়োজনে নিখুঁত ফুট ওয়ার্কেও। মারার বলটি বেছে নিতেও অনেকে ভুল করেনি। সত্যি কথা বলতে কি কোমল কব্জিতে স্ট্রোক আর বেণী দুলিয়ে বল করলেও সামগ্রিকভাবে মেয়েদের ক্রিকেট ঠিক কোমল বলে মনে হয়নি। সংগ্রাম, শৌর্য, উত্তেজনা সবই ছিল। শুধু কোন মেয়ে একটি ওভার বাউন্ডারি করার কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

কলকাতা টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর :

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস (৫ উইঃ ডিঃ) ৩০১ (ক্যাথি গার্লিক নট আউট ১৫০; মার্গো বস্ ২-৬৮, ডায়না এদুলজি ২-৮৫)।

দ্বিতীয় ইনিংস—(৩ উইঃ ডিঃ) ৭২ (ক্যাথি গার্লিক নঃ আঃ ৫১।

ভারত—প্রথম ইনিংস ১৭৬ (শোভা পণ্ডিত ৪২, শিরিন কিয়াস ২৯, শান্তা রঙ্গস্বামী ২৫, সু চাপম্যান ৩-৩৭, ডেবোরা মার্টিন ২-৩৮)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৫উইঃ ১৮৬ (ফৌজি খলিলি ৪৫, শান্তা রঙ্গস্বামী ৫৫, শোভা পণ্ডিত ২৩, ডায়না এদুলজি ২৩)।

খেলা অমীমাংসিত

টেবল টেনিসের আরও কথা

কলকাতার ত্রৈত্রিংশত্তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জাতিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি বজায় রেখেও ৬২টি দেশের পুরুষ-মেয়ে খেলোয়াড়রা বিশ্বের মাঝে যে মহামিলন ঘটিয়ে গেল, দেশে নিয়ে গেল মিলন ও মৈত্রীর মধু-স্মৃতি—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তুলনায় তা অভূতপূর্ব। আর যে খেলা খেলে গেল? এমন খেলা কোন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় হয় নি। এমন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানও। বিদেশী ক্রীড়া অতিথিরা স্বীকার করে গেছেন সবচেয়ে সফল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং সবচেয়ে নাটকে ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরা ১১ দিনের প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি রয় ইভান্স সহ সবাই ভারতীয় আতিথেয়তায় মুগ্ধ। মেয়ে অ্যাটাশেদের শাড়ির বৈচিত্র্য, সপ্রতিভ আচরণ এবং সমাদর অভ্যর্থনার উল্লেখ করে ইভান্স বলেছেন এর পর বিশ্ব প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশগুলিকে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়তে হবে ভারতকে টেক্কা দেবার জন্য। আমার তো এখন থেকেই মাথাব্যথা। উল্লেখ্য ১৯৭৭-এ পরবর্তী

টেবল টেনিসে চীনের সার্ভিস মাস্টার সু সাও-ফা —ফটো দেশ

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হবে বার্মিংহামে। রয় ইভান্স শ্বেত দ্বীপের (ওয়েলস) অধিবাসী। ১৯৭৯-তে ৩৫তম চ্যাম্পিয়নশিপ হবে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি বিচে অথবা হিউসটনে। তারপর টোকিওয়।

কলকাতার বিশ্ব প্রতিযোগিতার অনেক কথাই বলা হয় নি। প্রথম সারির নামী খেলোয়াড়দের অপ্রত্যাশিত পরাজয়, সোয়েদলিং কাপ ও কর্বিলন কাপে একচ্ছত্র প্রাধান্য অনেক কিছুই।

ভারতের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আগে কিছুই পর্যালোচনা করা হয় নি। দেশে আয়োজিত বিশ্ব প্রতিযোগিতায় তাদের কথাও সেরে নেওয়া যাক।

ভারতের ভূমিকা—বিশ্ব টেবল টেনিসে ভারতের পুরুষ ও মেয়েরা ভাল ফল করার এমন সম্ভাবনা ছিল না। তবু আশা করা যায় নি দুটি বিভাগ থেকেই ভারত দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে নেমে যাবে। সারাজেভো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সপ্তদশ স্থান পাওয়ায় মেয়েরা অবশ্য দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতেই ছিল। অস্ট্রিয়া কর্বিলন কাপে না খেলায় প্রথম ক্যাটাগরির সেই শূন্যস্থানে ভারতের মেয়ে দল খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু গ্রুপের সাতটি খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে হেরে এবং স্থান নির্ণয়ের খেলাতেও বুলগেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে হেরে গিয়ে ১৬টি দলের মধ্যে ষোড়শ স্থান পায়। এর অর্থ আগামী বার্মিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের খেলতে হবে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে, যে খেলার সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কোন সম্পর্ক নেই।

একই অবস্থা ছেলেদেরও। সারাজেভোয় ভারতের পুরুষ দল পেয়েছিল চতুর্দশ স্থান। এবার পেয়েছে পঞ্চদশ স্থান, স্থান নির্ণয়ের খেলায় অস্ট্রিয়াকে ৫—২ ম্যাচে হারিয়ে। স্থান নির্ণয়ের একটি খেলায় হেরেছে ডেনমার্কের কাছে, তার আগে গ্রুপের সাতটি খেলায় চীন, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, ইংলণ্ড, রুমানিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে।

এই ব্যর্থতার মধ্যে একটুখানি আশার আলো জাগিয়েছিল ভারতের খেলোয়াড় নীরজ বাজাজ চীন, জাপান ও হাঙ্গেরীর কাছ থেকে একটি করে ম্যাচ জিতে। জাপানের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শিগিও ইটো, প্রতিযোগিতায় ১৬ নম্বর বাছাই চীনের লী পেং এবং হাঙ্গেরীর ৩ নম্বর খেলোয়াড় জ্যানোস বরজাসিকে হার স্বীকার করতে হয়েছে নীরজের কাছে।

সোয়েদলিং কাপে গ্রুপের বাকি খেলায় ভারতের চারটি জয় ইন্দোনেশিয়ার কাছে। নীরজ জেতে একটিতে, জগন্নাথন দুটি খেলায় এবং বিলাস মেনন একটি খেলায়। ইন্দোনেশিয়া অবশ্য ৫—৪ খেলায় ভারতকে হারায়। বিলাস মেনন মীমাংসাসূচক তৃতীয় গেমে এগিয়ে থেকে রডরাজ আবদুলের কাছে ২১—২০ পয়েন্টে হেরে না গেলে ভারতই ইন্দোনেশিয়াকে ৫—৪ খেলায় হারাত এবং প্রথম ক্যাটাগরিতে থাকতে পারত। ভারত চ্যাম্পিয়ন কামাড জয়ন্তের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপিত না হত আর যদি সে সোয়েদলিং কাপ দলে থাকত তা হলে হয়তো ভারতকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে নেমে যেতে হত না। কামাত জয়ন্ত এবার অত্যন্ত ভাল ফর্মে ছিল। শেল জোহানসনের মত বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়কেও কলকাতায় স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেছিল।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় মনোজিত দুয়া, নীরজ বাজাজ এবং গুদালুর জগন্নাথ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়। অরুণ কুমার, এস ভি অশোক, বিলাস মেনন ও আর হরি মূলে আসে কোয়ালিফাইং খেলায় দুজন করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে। শুধু সুধীর ফাড়কে কোয়ালিফাইং থেকে বিদায় নেয় কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন ইংলণ্ডের ডেস্মণ্ড ডগলাসের কাছে হেরে গিয়ে।

ভারতে যুগ্ম এক নম্বর খেলোয়াড় দুয়ার দুর্ভাগ্যের মূলের প্রথম খেলাতেই ওকে ১১ নম্বর বাছাই হাঙ্গেরীর গ্যাবের গারগেলির মুখোমুখি হতে হয়। হেরেও যায় স্ট্রেট গেমে। নীরজ প্রথম খেলায়

টে গেমে হারে আমেরিকা প্রবাসী
নীয় খেলোয়াড় চুই লিম-মিঙের কাছে।
লনের জগন্নাথ প্রথম খেলায় দক্ষিণ
রিয়ার পার্ক লী-হিকে হারিয়ে দ্বিতীয়
লায় অপ্রত্যাশিতভাবে হারে ক্যানাডার
টেনা এরলের কাছে। কারণ মীমাংসা-
চক পঞ্চম সেটে জগন্নাথ ১৯—০ পয়েণ্টে
গয়েছিল। ওই অবস্থায় সাধারণ ধরনের
জন খেলোয়াড়ের কাছে পরাজয়
পনাতীত। ওই গেমটি জিতলে
ন্নাথকে অবশ্য খেলতে হত চ্যাম্পিয়ন
স্তাভন জনিয়ারের সঙ্গে।

অশোক মেনন মূলের প্রথম খেলায়
রন পোল্যাণ্ডের জেড ফ্রাকজিকের
ছে, অরুণকুমার ১০ নম্বর বাছাই চীনের
সাও-ফর কাছে, বিলাস মেনন দ্বিতীয়
লায় এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়ন ১২
র বাছাই চীনের লিয়াং কো লিয়াংয়ের
ছে এবং আর হরি প্রথম খেলায় ফ্রান্সের
রশোর কাছে পাঁচটি গেম লড়ে।

মেয়েদের মধ্যে মূলে খেলার সুযোগ
র শুধু এক নম্বর ও দুই নম্বর মেয়ে
লজা সালোখে এবং ইন্দু পুরী। ইন্দু
ম খেলায় লুক্সেমবার্গের ক্রিয়ার বার্থিকে
রিয়ে দ্বিতীয় খেলায় হেরে যায়
কাম্বোডিয়ার হামা রিভালোভার
ছ পাঁচ গেম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শৈলজা
ম খেলাতেই রুমানিয়ার ম্যাগালেনা লেসির
ছ স্ট্রেট গেমে হেরে বিদায় নেয়। উষা
সুন্দররাজ, কলাবতী সীতারাম, বিন্দুভূষণ,
রণ ওয়ারদেকার বা পি বৎসলা—কোনো
ই মূলে উঠতে পারেনি। তবে বৎসলার
স প্রথম খেলায় ভারতের প্রাক্তন জাতীয়
ম্পিয়ন প্রিসকা রোজারিওকে পরাজিত
। প্রিসকা এখন অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের
চ এবং এখনো টেবল টেনিস খেলছে।

পুরুষদের ডাবলস, মেয়েদের ডাবলস
মিক্সড ডাবলসে ভারতের কোন জুটির
ফল উল্লেখ করার মত কিছু নয়।

আগেই বলেছি, সোয়েথলিং কাপে চীন,
জাপান এবং হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে নীরজ
ভের একটি করে খেলার জয় ৩৩তম
ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ব্যর্থতার
ন্ধকারের মধ্যে একটুখানি আলোর রেখা।
গত দুই তিন বছর ধরে ভারতের
লোয়াড়রা আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসের
র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। বিদেশ
ক জাপান ও দুই কোরিয়ার দল ভারত
র করেছে। ভারতের দল গিয়েছে বিদেশ
র বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ও কমনওয়েলথ
প্রতিযোগিতায়। তা ছাড়া প্রশিক্ষণও চলছে
ম ... একজন উত্তর কোরীয়
চ তত্ত্বাবধানে। কিন্তু খেলার
র উন্নতির পরিচয় কোথায়? আমাদের
লোয়াড়রা বড়দের সঙ্গে তাল রেখে চলতে

বিশ্ব টেবল টেনিসে ডাবলস খেতাব জয়ের পর হাঙ্গেরীর গ্যাবোর গার্গেলির আনন্দের অভিব্যক্তি —ফটো দেশ

পারছে না মুখ্যত দুটি কারণে। একটি কারণ আক্রমণ ও রক্ষণে সম পারদর্শী হবার মূল নীতিতে ঘাটতি। অপর কারণ শারীরিক পটুতার অভাব। অনেক খেলোয়াড়ের হাতে ভাল মার আছে। যেমন নিয়াজ, দুর্গা, মেনন। আবার জগন্নাথের হাতে আছে আত্মরক্ষার চমৎকার চপ অস্ত্র। কিন্তু বেশীর ভাগের মধ্যে দুটি অস্ত্রের সংমিশ্রণের অভাব। এবং আধুনিক টেবল টেনিসে দুই বিষয়ে পটু না হলে সাফল্য সম্ভব নয়। ভারতীয়দের সার্ভিসও অত্যন্ত দুর্বল। সার্ভিস খেলার এক প্রধান অস্ত্র। চীনের সার্ভিস মাস্টার সু সাও-ফাক আমরা শুধু সার্ভিস থেকে বিস্তর পয়েণ্ট নিতে দেখেছি। লি চিন-শীকেও। সার্ভিস থেকে সরাসরি পয়েণ্ট না এলেও স্পিন মেশানো রকমফের সার্ভিস থেকে প্রতি-পক্ষকে বিপাকে ফেলে বহু ক্ষেত্রে নিজের মারের সুযোগ করে নেওয়া যায়।

নিয়েছিও বহু খেলোয়াড়। কিন্তু ভারতের পুরুষ মেয়ে খেলোয়াড়রা সাদামাটা সার্ভিসে বিপক্ষকে মোটেই বিপাকে ফেলতে পারেনি। উল্টে নিজেরা অসুবিধায় পড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘূর্ণি বলের সার্ভিসে। খেলার এই দিকটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

একলব্য

বিশ্ব-মুকুটধারী ইস্তভান জনিয়ার

এবারকার বিশ্ব টেবল টেনিসে যেমন কোন খেলোয়াড়ের অপরাজিত থাকার গৌরব নেই, তেমন অন্য কোন খেলোয়াড়ের নেই বিশ্বমুকুট লাভের কৃতিত্ব একমাত্র ইস্তভান জনিয়ার ছাড়া। দীর্ঘ ২২ বছর পর জনিয়ার হাঙ্গেরীতে সেন্ট ব্রাইড ভাস নিয়ে গেলেন, টেবল টেনিসে যে হাঙ্গেরীর অনেক গর্ব, অনেক কীর্তি। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ইউরোপের একজন খেলোয়াড় পেলেন পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলসের বিজয়ীর পুরস্কার ১৯৪৭ সালে শেষবার এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বহুমিল ভানা।

ইউরোপের কেন, ১৯৫২ থেকে টেবল টেনিসে যে জাপান ও চীনের পর্যাপ্ত প্রাধান্য, তাদের বেশী খেলোয়াড়ও কি এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে? না, একমাত্র চীনের চুয়াং সে-তুঙ ছাড়া আর কেউই হননি। হাঙ্গেরীর ২৮ বছর বয়সী খেলোয়াড় জনিয়ার এবার নিয়ে তিনটি বিশ্ব খেতাবের অধিকারী হলেন। প্রথম ডাবলসের খেতাব পেয়েছিলেন ১৯৭১-এ নাগোয়া চ্যাম্পিয়নশিপে, নিজ দেশের ক্লাম্প্যারকে সঙ্গী নিয়ে খেলে।

কথা ও খেলাগুলি একে একে স্মৃতি-পটে ভেসে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা জনিয়ার সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিলেন এবং নেতাজী স্টেডিয়ামে জনিয়ার যে খেলা খেলে গেছেন।

সুইডেনের হ্যানস অ্যালসার, যিনি শেল জোহানসনের সঙ্গে দু'বার ডাবলস-এর বিশ্ব খেতাব পেয়েছেন, এখন দেশের কোচ। দু' বছর আগে ছিলেন পশ্চিম জারমানির কোচ। টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের ঠিকুজি কোষ্ঠি সব নখদর্পণে। বিশেষ করে ইউরোপের খেলোয়াড়দের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ক্ষুদিরাম প্র্যাক্টিস হলে সুইডিস খেলোয়াড় দের অনুশীলনের ফাঁকে ওর কাছে সিডেড খেলোয়াড়দের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। জনিয়ার সম্পর্কে বললেন, 'প্রথম পাঁচ-ছয় জনের মধ্যে পড়ে না। তবে পিছিয়ে পড়ে এগিয়ে যাবার অসাধারণ ক্ষমতা। হারা ম্যাচ জিতে যেতে পারে, যদি ভাগ্যের একটু সহায়তা পায়। আর ডাবলসে সত্যিই ভাল। এবারও ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ক্লাম্পারের সঙ্গে খেলে। এখানে অবশ্য ওর জুড়ি হিসাবে খেলবে গ্যাবোর গার্গোলি।'

জাপান টেবল টেনিসের অন্যতম রূপকার, এখন আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসাও কিডো, যিনি ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এসেছিলেন জাপানের দলনেতা হয়ে, বলেছিলেন প্রতিযোগিতার ডার্ক হর্স হচ্ছে হাঙ্গেরীর জনিয়ার। কিডোর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

কিন্তু আর কেউ কল্পনা করতে পারেনি লি চেন-শী, লিয়াং কো-লিয়াং, শী য়েন-টিং, জোহানসন, বেংটসন, সুরবেক, অরলোয়াস্কি প্রভৃতি নামী খেলোয়াড়দের উপর টেক্কা মেরে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হবে ইস্তভান জনিয়ার। প্রথম দিকের খেলার মধ্যেও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের ছাপ ফুটে ওঠেনি। একটি দুটি খেলা নয়, সোয়েদলিং কাপের খেলায় জনিয়ারকে হার স্বীকার করতে হয়েছে পাঁচ জনের কাছে। তার বিরুদ্ধে

ইস্তভান জনিয়ার —ফটো দেশ

বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে ইংলণ্ডে বর্তমান তিন নম্বর খেলোয়াড় ডেনিস নীল, জাপানের কাৎসুয়িকি আবে, চীনের শু শাও-ফা ও লি চেন-শী এবং যুগোশ্লোভিয়ার অ্যাণ্টন স্টিপানসিচ। ব্যাটে-বলে সুর ও শিল্পের ঝঙ্কার তোলায় সিদ্ধহস্ত সুরবেকের মুখোমুখি হলে ফল কি হত বলা শক্ত। সোয়েদলিং কাপে যুগোশ্লোভিয়ার কাছে হাঙ্গেরী ১—৫ ম্যাচে হেরে যাওয়ায় জনিয়ারকে খেলতে হয়নি—সুরবেকের সঙ্গে।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাতেও জনিয়ার হেরে যেতে পারতেন সুইডেনের সাধারণ খেলোয়াড় উইকস্ট্রোয়ম ইনগেমারের কাছে, কিংবা দ্বিতীয় খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার দুই নম্বর জারোশ্লাভ কুনজ-এর কাছে। দু' জনই সুরবেককে পাঁচ গেমে টেনে নিয়ে যায়। শুধু টেনে নেওয়াই নয়, কুনজ জিতেছিল প্রথম দুটি গেম, ইনগেমার মীমাংসাসূচক পঞ্চম গেমে প্রথমে ১৩—৭ ও পরে ২০—১৩ পয়েণ্টে এগিয়েছিল। জনিয়ারের বিদায়ের জন্য চেক খেলোয়াড়ের প্রয়োজন ছিল মাত্র এক পয়েণ্ট। যে স্টিপানসিচের কাছে জনিয়ার সোয়েদলিং কাপে হেরে গিয়েছিলেন ফাইনালে সেই স্টিপানসিচ পর পর দুটি গেম জেতার পর শেষ তিনটি গেম জয়ও কি জনিয়ারের ভাগ্যের পরিচয় নয়?

ভাগ্যের আরও কিছুটা পরিচয় আছে 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘের' হাতে [illegible] হওয়ায়। যেমন শু শাও-ফার সঙ্গে [illegible] হয়নি সুরবেকের হাতে পরাজিত হওয়ায়। সুরবেক বা প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন স্টেলান বেংটসনের মুখোমুখি হতে হয়নি দুজন জাপানের মিৎসুরো কোনোর কাছে হেরে যাওয়ায়। তবু ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তিন জনের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি গেম পিছিয়ে পড়ে বিশ্ব জয়ের সংগ্রামের শৌর্য আছে, টেবিল ক্র্যাফট এবং আক্রমণ ও রক্ষণ-মূলক খেলার পরিচয় আছে। সবচেয়ে বেশি আছে সুপ ড্রাইভের পরিমার্জন। জনিয়ারের ৬ জন শিকারের মধ্যে পর পর রয়েছে সুইডেনের ইনগেমার, চেকোশ্লোভাকিয়ার কুনজ, ক্যানাডার কাটেনো এবং চীনের লি পেং, রাশিয়ার সার্কিস সারখোয়ান, জাপানের কোনো এবং যুগোশ্লাভিয়ার স্টিপানসিচ। এদের মধ্যে শেষ ৪ জন বাছাই তালিকার খেলোয়াড়।

পাতলা গড়নের বিরল কেশ মানুষটি সবচেয়ে সংগ্রামী শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন সম্ভবত লী পেংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে, যে গেমে ২—১০ পয়েণ্টে পিছিয়ে থেকেও টানা ১৭টি পয়েণ্ট নিয়ে ১৯—১০এ এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন ২১—১২ পয়েণ্টে। পরের গেমটি হারিয়ে আবার জিতেছিলেন শেষ দুটি গেম।

টেবল টেনিসে আগেই লিখেছি, হাঙ্গেরীর অনেক কীর্তি। ভ্যাকোর, মেখলোভিটস, জ্যাকাডোস, বার্না, খেলাক সুস, সিডো—সব সাড়া জাগানো নাম। শেষ চ্যাম্পিয়ন সিডো ফাইনাল খেলার সময় বসেছিলেন টেবিলের অনতি দূরে, জনিয়ার দুটি গেমে হারার পর হতাশায় উঠে গেলেন। কিন্তু কী সুন্দর সমাপ্তি। বিশ্ব প্রতিযোগিতার প্রথম গেমে ডেনিস নীলের কাছে হারার পর শেষ গেমটি জিতে বিশ্ব জয়ে কী অভাবনীয় সাফল্য!

মুকুল

'ফ্ল্দ্, ঠাকুরমা' (পরিচালনা : সাধন সরকার) ছবিতে জয়শ্রী রায়

বোমবাই চিত্রজগতে ছোটখাটো একমের কটা অশান্তি ঘটে গেল। ওখানকার ফিলম নডাসট্রির 'ইমেজ' বাঁচাবার জন্য শিল্পীরা ধপরিকর হয়েছিলেন, তাঁদের সংগ্রামের েগে ফিলম প্রোডিউসারস কাউনসিল-ও াগ দেন। নিজের ইমেজ বাঁচাবার চেষ্টা ে-কোন ইনডাসট্রিরই করা উচিত। তবে শল্পীরা যদি মনে করেন যে ফিলম ত্রিকায় গসিপ-কলমে কী বেরোল না বরোল তার উপরই ইনডাসট্রির ইমেজ নর্ভর করে তবে তাঁরা ভুল করছেন। বামবাইয়ে অবশ্য শিল্পী ও প্রযোজকদের ংস্থা ফিলম কাগজের ওই সব খবর বা াসিপ'-এর বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে-ছলেন। ব্যাপারটা বয়কট পর্যন্ত গড়িয়ে-ছল।

* * *

যে-কোন ব্যক্তির ঘরের খবর কেউ টেনে বর করলে তাঁর গোসা হতেই পারে। এ ক্ষেত্রে "কলমনিসট"-এরও একটা নৈতিক ায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত বর পরিবেশনেরও একটা সীমারেখা আছে। সটা অতিক্রম করা হলে প্রতিকারের ব্যবস্থাও আছে। যার সম্বন্ধে লেখা তার প্রতিবাদের অধিকারও আছে। ফিলম স্টারের কথা একটু ভিন্ন। স্টাররা জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় মরীয়া হয়ে ওঠেন। কীভাবে নিজেদের আকর্ষণ ও গ্ল্যামার বাঁচিয়ে রাখা যায় তার জন্য ও'রা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যান। অনেক সময় শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়েও তাঁরা নানা ধরনের চটকদার

মতামতের মন্তাজ

ছবি তুলিয়ে নেন। পত্রিকায় প্রকাশ পাবার জন্যই সে-সব ছবি। বহু আকাঙ্ক্ষিত হবার জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। ও'রা বিশাল দর্শকগোষ্ঠীর মনের মানুষ হতে চান। অতএব তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়ও তখন দর্শকজনের জানবার মতো খবর হয়ে ওঠে। তাঁদের ঘরের খবরও তখন সাধারণ খবর। ফ্যানদের মনোরঞ্জনের জন্য যদি তাঁরা যাবতীয় কাজ শুধু ফিলমের পর্দাতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং সিনেমা পর্দার বাইরে অসংখ্য গুণগ্রাহীর চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কলম ব ক্যামেরার প্রয়োজন বোধ না করতেন তবে কোন সমস্যাই থাকত না। নানাভাবে তাঁরা জনপ্রিয়তা যত বাড়াতে চাইবেন এবং সেটা যত বাড়বে তাঁদের সম্পর্কে বাইরের মানুষের বা ফিলম ফ্যানদের কৌতূহলও তত বাড়বে। অভিনেত্রী কি বহুজনের মানস-প্রেয়সী হয়ে থাকতে চান না? কিংবা অভিনেতার কি বহু ললনার মানস-প্রেমিক হবার বাসনা থাকে না? যদি তাঁরা সেটা না হতে পারেন তবে তো তাঁদের স্টারহুড-ই গেল। একদিকে তাঁরা সকলের হয়ে থাকবেন অথচ তাঁদের ঘরের কথা জানলেও কেউ বলবে না অথবা ফ্যানরা জানতে চাইবে না এমন দাবি খুবই অন্যায়। কাগজে বের হোক চাই না-ই হোক, স্টারের সংবাদ কি ফ্যানদের অজানা থাকে? কোন্ স্টার কী-ভাবে জীবনযাপন করেন কিংবা তাঁর জীবনে কখন কী ঘটল সে সংবাদ ফ্যানরা ঠিকই রাখেন। ফিলমের পত্রিকায় (ফ্যান ম্যাগাজিন-এ) ওই সব খবর বেরোবার নয়

মোটেই। আর যদি ব্যবসার কথাই ধরা যায় তাহলেও বলতে হয়, অতি নোংরা উপাদান এবং নায়িকা বা অন্য অভিনেত্রীর অতি কুৎসিত নাচ দেখিয়ে কি হিন্দী ছবির প্রযোজকরা পয়সা লুটতে চান না? তাঁরা জানেন, দর্শকরা সেটাই চায়। ইনডাস্ট্রির ইমেজ কি তাতে বাড়ে?

• • •

বোমবাইয়ের শিল্পী প্রযোজকদের আন্দোলনের স্লোগান ছিল : ইনডাস্ট্রির ইমেজ নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। আরও কতভাবে যে ইনডাস্ট্রির ইমেজ নষ্ট হচ্ছে সে-বিষয়েও তাঁদের খোঁজ রাখা দরকার। কালো-টাকার খেলার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বোমবাই ইনডাস্ট্রির সাদা-কালো তো এখন ছাড়িয়ে দিয়েছে রঙ। রঙের আড়ালেও যে আর এক রঙিন জগতের নাটক চলেছে, যেটা কখনও কমেডি কখনও ট্র্যাজেডি, সেটা ইনডাস্ট্রির সুনাম না বদনামের কারণ সেটা ইনডাস্ট্রির লোকেরাই বুঝবেন। তবে নাটকের এমন সব অংকও থাকে যেটা সাংবাদিকরা প্রকাশ না করলেও বেরিয়ে পড়ে। জনসাধারণও অন্ধ নন। কোন অভিনেত্রী কী-ধরনের মত জীবন-যাপন করছেন সেটা পথে-ঘাটে-হোটেলেই দেখা যায়। ইনডাস্ট্রির ইমেজ বাঁচাতে হলে তাঁদেরও সুস্থ জীবন-যাপন করা দরকার। যে যেমন খুশি চলবেন (যদি তিনি পাবলিক ফিগার হন) অথচ কেউ কিছু জানবে না বা বলবে না এ তো অন্যায় আবদার। তাঁরা যদি ইনডাস্ট্রি-ভুক্ত হন তবে ইনডাস্ট্রির ইমেজ বাঁচাবার দায়িত্ব তাঁদেরও আছে। অন্যের চাইতে এই দায়িত্ব তাঁদেরই বেশি। বোমবাইয়ের শিল্পীরা এই সত্যটি বিস্মৃত হয়ে বুমেরাং অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা যে তাঁদেরও আঘাত করতে পারে সে ধারণা বোধহয় ছিল না।

প্রণতি ভট্টাচার্য : স্টুডিওর মেক-আপ রুমে

পরলোকে প্রণতি ভট্টাচার্য

'তথাপি'-র সেই বোবা মেয়েটি আর কোনদিন কথা বলবে না। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রণতি ভট্টাচার্য কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন মাত্র ৪৭ বছর বয়সে।

ইদানীং প্রণতি দেবী অভিনয় প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। অভিনেতা অভি ভট্টাচার্যকে বিবাহ করবার পর তিনি বোম্বাইতেই থাকতেন। তাঁর শেষ বাংলা ছবি সম্ভবত "পাড়ি"। ওই ছবির প্রযোজনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

প্রণতি দেবীর প্রথম চিত্রাভিনয় ১৯৫০ সালে, তথাপি ছবিতে। একটি বোবা মেয়ের চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয়, যাঁরা ওই ছবি দেখেছেন তাঁদের আজও মনে আছে। ওই ছবির পর আরও অনেকগুলি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন যার মধ্যে সম্পদ হানাবাড়ি, রাত্রির তপস্যা, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, ভোর হয়ে এলো ইত্যাদি ছবির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও তিনি অভিনয় করেছেন এক সময়। রঙমহলে অভিনীত শেষ লগ্ন এবং কবি নাটকে তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসা পায়।

একজন ভাল অভিনেত্রীর মৃত্যু হলে তখন সেই ক্ষতিটি কারও একার থাকে না, সেটা সমগ্র চিত্রজগতেরই ক্ষতি। তার চেয়েও বড় বেদনা তাঁদের, যাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। অমন খোলামেলা, মিশুক, রুচিপ্রিয় মহিলা আজকাল কমই দেখা যায়।

সেদিন দুজনে

(চলচ্চিত্র ভারতী)

সেদিন ওরা দুজনে—রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা—যেমন ছিল ছবির শেষে আর তেমনটি নয়। এই রোমান্টিক গল্পের পরিশেষে ট্র্যাজেডি—নায়িকার মৃত্যু। এই নাটকীয়তা বোঝাবার জন্য আগে-ভাগে অনেক ঘটনা ও গান আছে। "সেদিন দুজনে" নাম দেখে দর্শক যেন ... ভাবনে যে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান রয়েছে ... থাকাতে ভালই হয়েছে, কারণ এই আ...কের গল্পে কবিগুরুর গান মোটেই মানায় না। কাহিনী ও চিত্রনাট্য (রচনা : সিদ্ধার্থ দত্ত) মোটা নাটক উপভোগের জন্য। এই ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের। সুরারোপিত গান জুতসই হয়েছে। গানগুলি জনপ্রিয় হবে। ওস্তাদজী অসিতবরণ যিনি কখনও হিন্দী কখনও বাংলা বলেন, অতি স্পষ্ট ও পরিশীলিত উচ্চারণ সহ একটি বাংলা রাগপ্রধান গান গেয়েছেন। গানটি অবশ্য গেয়েছেন মান্না দে। ওস্তাদজীর মেয়ে নায়িকা শিখা—আর্থিক অবস্থা ভাল হবার পর ভাল ফ্ল্যাটে গিয়ে পার্টির নাচের সঙ্গে পশ্চিমী ধাঁচের লঘু গান শুরু করে দিয়েছে। আমোদপ্রিয় দর্শক বাংলা ছবিতে মোটামুটি যা চান তা প্রায় সবই আছে। কিন্তু মুশকিল অন্যত্র। পরিচালক অগ্রদূতে এই ছবিতে বাস্তবের তাঁর কাছে প্রমোদের প্রয়োজনটাই বড়। তার শর্তগুলিকে মোটেও আমল দিতে চাননি।

"সেদিন দুজনে"/সুমিত্রা, দেবরাজ

। বোধহয় একটি আধুনিক ফিলম
ার শখও তাঁর হয়েছিল। যে-কারণে
রেশন গ্যাপ-এর ব্যাপারও আছে। তবে
শক্ত জিনিসটা তিনি ঠিক বোঝাতে
নেনি। নায়কের বাবা উৎপল দত্ত নায়ক
াজকে মোটেই দোষের কথা কিছু
নেনি। দেবরাজ যে কেন বাবার উপর
প অথবা কী তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ
ততার কিছুই বোঝা গেল না। দেবরাজ
রোমান্টিক নায়কের মতো চুটিয়ে প্রেম
গেছেন। তাঁর মনোনীত পাত্রী দেখে
যে খুব উষ্মা প্রকাশ করেছেন বা
কে ত্যাজ্যপুত্র করছেন তাও নয়। পুত্র
া থেকেই পিতৃদ্রোহী—কেন বোঝা
কল। পুত্রের এই অবিশ্বাস্য "অ্যাংরি"
া দেবরাজের চেহারায় অভিব্যক্তিতে
পেয়েছে। তবে রোমান্টিক নায়ক
বে তিনি একটু আড়ষ্ট। নায়িকা
া মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এদিক থেকে
টতার কোন ছাপ নেই।

চিত্রনাট্যটি কেমন যেন অসংলগ্ন। কোন
ঘটনা বা দৃশ্য বা সংবাদ সম্পূর্ণ
আগেই 'কাট'। দ্রুত এডিটিং বা
-কাট আধুনিক ফিলমের লক্ষণ হতে
কিন্তু এই নাটকীয় রোমান্টিক ছবির
তদুপরি, আধুনিকতার প্রয়োজনেই
ছবিতে পলিটিকস, পোস্টার, ইলেক-
ছাত্রদের মধ্যে মারামারি ইত্যাদি বিষয়
ছ। এবং যৌন-উপকরণও বাদ যায়নি।
কোনটারই প্রয়োজন ছিল না। নায়কের
শ্মশ্রুধারী রাজনীতি-সচেতন ছাত্র-
ও (সিদ্ধার্থ দত্ত) রয়েছে। তার জেলও
হয়েছে। শিল্পীর অভিনয়-ভঙ্গিও ভাল। কিন্তু এই চরিত্রও কোন পরিপূর্ণতা বা বিশেষ নাট্যভূমিকা পেল না। বাবা ও মার (শমিতা বিশ্বাস) ভূমিকাও খর্বিত। অথচ অভিনয় ওঁদেরও ভাল এবং ওঁদের প্রতি দর্শকের সহানুভূতিও জাগে। সহানুভূতি হারায় শুধু নায়ক। তবে ওই প্রেমের ছবির প্রেমের অংশটুকু দেখার সময়টা ভালই কাটে, বাকি অংশ ক্লান্তিকর।

বোম্বাই বিচিত্রা

কেরল এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ছাড়া জেসুদাস নামটি বিশেষ পরিচিত নয়। গত বছর এক সময়ে পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ত্রিবান্দ্রমে ছিলেন; তখন তিনি ওই অসাধারণ গায়কের গান শোনেন। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজের ছবিতে গান গাইবার জন্য জেসুদাসকে বোম্বাই আসতে অনুরোধ জানান। জেসুদাস সম্প্রতি সেই অনুরোধ রক্ষা করেছেন, "আনন্দ মহল" ছবির জন্য গান গেয়েছেন।

জন্মসূত্রে খৃষ্টান, জেসুদাস ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু — অন্তত লোকে তাই বলে। এই বিষয়টা নিয়ে একটা চাঞ্চল্যকর মামলাও হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি হয় কেরলের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে; গায়কের অনুকূলেই রায় বেরিয়েছিল। ঘটনাটা এই রকম : আল্লেপির একটি মন্দিরে জেসুদাস পূজা করতে যাচ্ছিলেন, তিনি অহিন্দু এই যুক্তিতে তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জেসুদাসের সঙ্গীরা তখন মন্দিরের কর্তৃপক্ষের উপর জোর খাটিয়ে তাঁর প্রবেশাধিকার আদায় করেন। অতঃপর মন্দির-কর্তৃপক্ষ আদালতের শরণ নিলেন। জেসুদাসের উপর ইনজাংশন বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি হল যা আবার অচিরেই প্রত্যাহৃত হয়। অবশেষে বাদিপক্ষের আবেদনক্রমে মামলার বিচার হয় কেরল হাই-কোরটে—সেখানে জেসুদাসের অধিকার স্বীকৃতি পায়। আদালতের এই বিচারকে জেসুদাস তাঁর নৈতিক জয় হিসাবে গ্রহণ করেন।

জেসুদাসের বাবা মালায়লী রঙ্গমঞ্চের মোটামুটি সুখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। জেসুদাসের বয়স যখন অল্প, তখনই ছেলেকে তিনি এক ব্রাহ্মণ সঙ্গীতগুরুর কাছে নিয়ে যান। গুরু প্রথমে খৃষ্টান শিক্ষার্থীকে শিক্ষা করতে রাজি হননি। ছেলেটির গলা শুনে তিনি অবশ্য সংস্কার কাটাতে পেরেছিলেন। জেসুদাসের জীবনে বার বার অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে — প্রথমে প্রত্যাখ্যান পরে স্বীকৃতি।

আকাশবাণীর ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর আগে জেসুদাসের কণ্ঠ মাইক্রোফোনে প্রচারের অনুপযোগী বিবেচনা করেছিলেন। সেই কারণে তখন তিনি বেতার-শিল্পী হতে পারেননি। আর এখন ? আজ জেসুদাসের কোনও অনুষ্ঠান প্রচার করবার সুযোগ পেলে ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের কর্তারা নিজেদের ধন্য মনে করেন। কয়েক বছর আগে কেরল সংগীত-নাটক আকাদমি জেসুদাসকে বৃত্তি দিতে অস্বীকার করে। এ-ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতার অভাবের কথা বলা হয়েছিল। আর এখন ? শুধু এইটুকু বলাই এখানে যথেষ্ট যে, জেসুদাস গত দু বছর ধরে ওই আকাদমিরই সভাপতি।

এবার যে-কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই। হ্যাঁ, জেসুদাস আনন্দ মহল ছবির জন্য গান রেকর্ড করিয়েছেন। হিন্দী ছবির জন্য তাঁর কণ্ঠ দান এই প্রথম। এর পর হিন্দী ফিল্মে তিনি আরও গান করবেন কি ? না করলে বর্তমান লেখক খুবই বিস্মিত হবে। আনন্দ মহল ছবির সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী। বাসু ভট্টাচার্য গানটিকে প্রেতের গান হিসাবে ছবিতে ব্যবহার করবেন। আনন্দ মহল প্রসঙ্গত, বাসু ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় রঙিন চিত্র। প্রথমটির নাম ঘুমহারা কান্নু। সেটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়।

• • •

হিন্দী ছবির নামের বানান ইংরাজী অক্ষরে লেখার ফলে মাঝে মাঝে উচ্চারণের বিভ্রান্তি ঘটে। মানে বুঝতেও কেউ কেউ ভুল করেন। তখন এক মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ আঁধি। কিছুদিন আগে এখানে ছবিটির প্রেস-শো হয়ে গেল। প্রোজেকশনের দায়িত্ব যাঁর উপর ছিল, সেই ভদ্রলোকটি গোয়ার অধিবাসী। হিন্দী ভাষায় তাঁর জ্ঞান যৎসামান্য। তাঁর এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু তাঁকে ছবিটির নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন— "অন্ধী।" এখন অন্ধী উচ্চারণ করলে শব্দটার মানে দাঁড়ায় 'অন্ধ মেয়ে'। আসলে কথাটা এখানে আঁধি, যার মানে ঝড় বা ধুলোর ঝড় বা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। যাই হোক, বন্ধুটি এবার পরিচালকের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। গুলজার শুনে তিনি দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, "ও বুঝেছি। এর আগে গুলজার মূক-বধির চরিত্র নিয়ে ছবি করেছেন, এবার অন্ধ মেয়ের সমস্যা তাঁর বিষয়বস্তু। এসব জিনিস সত্যিই তিনি ভাল বোঝেন।"

সুরঞ্জন

"ভোলা ময়রা" নাটকে তারা ভট্টাচার্য, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ও অজয় গঙ্গো

ভোলা ময়রা

শ্রীরূপা

যে সহজতা আর সরলতা ভোলা ময়রার চরিত্রকে মহত্ব দিয়েছে, এই সংসারের সীমায়িত গন্ডীর ঊর্ধে অসীমের সন্ধান দিয়েছে, সেই সরলতাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারলে "ভোলা ময়রা" নাটকটি (রামমোহন মঞ্চে প্রদর্শিত) একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারত। অষ্টাদশ শতকের ওই ঘটনার মধ্য নাট্যকার সমকালীন সমাজের কিছু সমস্যা মেলাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটিয়েছেন। থর্লচিন্নর জটিরামের চালের চোরাকা কিংবা রাজা নবকৃষ্ণর মুখে দু বৈপ্লবিক কথা বসাবার লোভ সা পারলে ব্যাপারটা পুরোপুরি সে-কা উপযোগী হয়ে উঠতে পারত। নতুবা গুপ্তর পরিচালনায় নাটকের প্র পদ্ধতিতে সরলতার পরিচয় আঙ্গিকের ব্যাপারে মঞ্চের পুরনো এ ক্ষেত্রে অনুসৃত।

তবে নাটকের ওই সব ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে গান। গান দিয়ে নাটক গানে গানে নাটকের বিস্তার, আর মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। বস্তুত একখানি সংগীতসমৃদ্ধ নাটক বাংলা মঞ্চ বহুকাল দেখা যায়নি। সংগী দর্শকের কাছে "ভোলা ময়রা" না আবেদন তাই অনেকখানি।

কবিয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গে দলের মনমোহিনীর যে স ... গান দিয়ে শুরু তার একটি ... এক্কর প ওদের বিবাহে—এবং ... খানেও ভূমিকা মস্তবড়। কবিগানের অ্যানটনি কবিয়ালকে নিয়ে আসা, দীক্ষা দেওয়া, তার কাছে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া গান আর নাটক চমৎকারভাবে মি রসিক-মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। ন ওইসব মুহূর্ত ভোলবার নয়। নাটক খানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু ন নাটকে অন্য এক জটিলতা এনে কিছু নাটকীয়তা প্রদর্শনের লোভ স পারেননি। শেষ পর্বে তাই জটি চক্রান্তে ভোলা ও মনমোহিনীর মধ্যে বোঝাবুঝি নিরাশ্রয়া গুণবতীকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে। জটিরাম মনমোহিনীকে অধিকার করতে চে বাগবাজারের তরুণ সমাজের চেষ্টা সম্ভব হয়নি। ভোলা ও মনমো পুনর্মিলন ঘটেছে তখন। এই প্রস

ীয়তা হয়তো টিকিটঘরের কথা ভেবেই। মহৎ নাটকের প্রতিশ্রুতিও ওইখানেই।

চেয়, শেষ পর্যন্ত রসিক দর্শকের মন জুড়ে থাকে নাটকের গান। এবং সব গানের মধ্যে চারিত্র ভোলা ময়রার ায় তারা ভট্টাচার্য। একটি আশ্চর্য ম্পদের অধিকারী এই শিল্পী। ওঁর বাটের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও কী , কী সুরেলা তাঁর কণ্ঠ। রামপ্রসাদী, টপ্পা কিংবা রাগাশ্রয়ী—সব গানেই সমান দক্ষতা, সমান আকুলতা। "যখন এতটা পথ পার হয়ে/বাকিটুকু পার দাও গো হরি" কিংবা "আকাশ কেন সাগর কেন নীল/মরণ কেন নীল/ নের শিখা কেন নীল" ইত্যাদি গান শুনতে মনে হয় শিল্পী যেন এ- র ঊর্ধ্বে অন্য কোথাও অবস্থিত। এই গ চণ্ডীদাস বসুর গান রচনা ও রাপের ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্য। সুরের াঠি যে তাঁরই হাতে। পাশাপাশি টনির ভূমিকায় পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় এবং মাহিনীর চরিত্রে লতিকা দাশগুপ্তার কথাও উল্লেখ করতে হয়। মন- নীর চরিত্রে গীতশ্রী দেবী দর্শককে করেন তাঁর অভিনয়ে। তাঁর শেষের একটি গান ভাল লাগে শুনতে। ছেলে গণেশের ভূমিকায় শ্রীমান ারও ভাল গান গেয়েছে। জটিরামের চরিত্রে কালীপদ চক্রবর্তী দর্শকদের য় দিতে পেরেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রে গাঙ্গুলি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। তবে রিত্রটি নাটকের বিশেষ কোন প্রয়োজন করেনি। অন্যান্য চরিত্রে দক্ষতা য়েছেন শান্তি ভট্টাচার্য (নবকৃষ্ণ), জি কাশ (রাম বসু), পরেশ দাস শ্বরানন্দ), বাসুদেব পাল (রঞ্জন), বিমল াপাধ্যায় (নায়েব), বেণু সেনগুপ্ত াচাঁদ) প্রমুখ শিল্পীরা।

নিস্তরঙ্গ সমুদ্র

এন কে এনটারপ্রাইজ

আসিফ করিমভয়ের 'দি ডলড্রামারস' অবলম্বনে "নিস্তরঙ্গ সমুদ্র" (ভাষান্তর : কী চট্টোপাধ্যায়) নিঃসন্দেহে একটি দীপ্ত নাটক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জের বিচ্ছিন্নতবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই । যে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে জন্ম নেয় যরতা, দেহবাদী নানা উন্মত্ততা। কিন্তু নাটক সেখানেই থেমে থাকে নি, তার ক ঊর্ধ্বে উঠে চিরকালীন মানবতার ই বলেছে। দেহবাদী মানসিকতা রত হয়েছে দেহাতীত প্রেমের অনু- তে। সেখানেই এ নাটকের সার্থকতা, এ কর মহত্ব।

'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' নাটকে নির্মল ঘোষ ও বীথি গাঙ্গুলি

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের যে মান- সিকতা তার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মূল বক্তব্যের আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন আসিফ করিমভয় তাঁর এই নাটকে। সবার উপরে মানুষই সত্য। আর সে মানুষ আকাশ থেকে পড়ে না, সে মানুষ নিজেকে নিজে তৈরী করে, পাথেয় সঞ্চয় করে তার বিবেকের কাছ থেকে, শিক্ষা গ্রহণ করে পারিপার্শ্ব থেকে, ভালমন্দের সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে অসীমের আহবান শোনে। জৈবক্ষুধা, নানা ভ্রান্তি তাকে আচ্ছন্ন করলেও মুক্তির উপায় সে নিজেই খুঁজে নেয়। 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' নাটকে এই বক্তব্যের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

টনি, রিটা ও লিজার মধ্যে যে ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব তা নিতান্তই জৈব ক্ষুধার তাড়না। ওদের মধ্যে ঝড়ের মত, কিংবা অশান্ত সমুদ্রের মত জো এসেছে তার বিপরীতমুখী জীবনদর্শন নিয়ে। তার আঘাত এইসব দেহবাদী মানুষের বিবেকের দরজায়। ন্যায়-অন্যায়ের সব সীমারেখা ভেঙে দিয়ে সে তছনছ করে দেয় এদের জীবন। ঝড়ের মতই সে একদিন মিলিয়ে যায়—শুধু রেখে যায় একটি স্মৃতিচিহ্ন—যা চিরকালীন মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক —আর একটি অংকুর—রিটার গর্ভে—যা আগামীকালের সংগ্রামী শুভবোধসম্পন্ন মানুষের প্রতীক।

বোধের সঙ্গে বুদ্ধির এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই নাটকের সংলাপে। দর্শকের চেতনাকে যা সারাক্ষণ উদ্দীপ্ত করে রাখে, হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে যাকে উপলব্ধি করতে হয়। প্রযোজনায় আদ্যন্ত সেই গভীরতা এবং বুদ্ধিমত্তা। পশ্চাদ্‌পটে অশান্ত সমুদ্র, বালুকাবেলায় জৈবতাড়িত কটি মানুষ, তাদের জীবনের উজ্জ্বলতা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত, জীবনের গভীরতায় নিমজ্জিত। জীবনের সব রঙ ঝরে গেছে, প্রতীক হিসেবে পাতা ঝরা গাছ, দূরের সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, হেরে-যাওয়া ভেঙে-পড়া একটি মানুষ তখন কুকুরের প্রতীক। হঠাৎ নতুন এক উপলব্ধি, দেহবাদী মাতাল যেখানে নতুন করে হৃদয়ের সন্ধান পায়, আর মানুষগুলি পায় আগামী দিনে বেঁচে থাকার আশ্বাস। তখন নেই শুধু একজন —যে না থেকেও চিরকালের মত বেঁচে রইল—বেঁচে থাকবে—সেটা মানবতার প্রতীক, শুভবোধের-প্রতীক।

চমৎকার প্রয়োগকুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন নির্দেশক নির্মল ঘোষ। শুধু একটি অনুরোধ, সংগীত কেন নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবনের বেসুরো লগ্নে সে কেন সুরে বাজে। একটু বেসুরো বাজবে, বেতালা বাজবে, তারপর আবার তাল মিলবে, ছন্দ মিলবে। ওটাকে নাটকের সঙ্গে একীভূত করে নিলে ভাল হয়। আর শেষের দিকে মরা গাছের ডালে ডালে দু-একটা কচি পাতার আভাস থাকলে কেমন হয়?

চমৎকার অভিনয় করেছেন জো-এর চরিত্রে নির্দেশক নির্মল ঘোষ স্বয়ং। তাঁর অভিনয় সত্যিই উচ্চাঙ্গের। সমানে তাল দিয়েছেন রিটার চরিত্রে বীথি গাঙ্গুলি। তাঁর সংলাপ হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত। লিজার একই সঙ্গে উজ্জ্বল ও সরল রূপটি চমৎকার ফুটিয়েছেন শিবানী ভট্টাচার্য। মাতালের ছোট্ট চরিত্রটিতে অসাধারণ অভিনয় করেছেন কালিদাস গাঙ্গুলি। চোখে জল এনে দেবার মত অভিনয়। টনির চরিত্রে শিবেন বন্দ্যো- পাধ্যায় ভালই, তবে প্রথম দিকে তাঁকে তেমন স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল না। হয়তো তাঁর গুরুভার দেহই এজন্য দায়ী। আর গিটার- বাজনাটা তাঁর শিখে নেওয়া খুবই দরকার। বার বার দর্শকের দিকে পিছন ফিরে গিটার বাজানো বিশ্রী লাগে। অন্যান্য চরিত্রে কামু মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী ও সুশান্ত ভট্টাচার্য চরিত্রানুগ। আলোর কাজ আশ্চর্য রকমের সুন্দর। এ নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে চমৎকার মিলেছে।

রজনীকান্তের গান

সম্প্রতি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে কাকলী আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে নিশীথ সাধু রজনীকান্তের এক-গুচ্ছ গান পরিবেশন করলেন। তেওড়া তালে নিবদ্ধ 'তোমারই দেওয়া প্রাণ' গানটি দিয়ে তাঁর অনু- ষ্ঠানের শুরু। অতঃপর রজনীকান্তের

সাধনসংগীত, স্বদেশী গান এবং হাসির গানের থেকে নির্বাচিত বেশ কয়েকটি গান নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে নিশীথ সাধু একে একে গেয়ে শোনালেন। গানগুলির ফাঁকে ফাঁকে ধারাভাষ্য উপস্থিত করেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রজনীকান্তের গানের অন্তর্নিহিত ভক্তিরস সেদিন শিল্পীর ধ্যাননিবিষ্ট কণ্ঠের আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে বিশেষ মর্মস্পর্শিতা অর্জন করেছিল। পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল সাধনসংগীত পর্যায়ের। কোনো কোনো গানে রাগের ছোঁয়া আছে। কখনো ভূপালির পাঁচটি পর্দায় সুরের আনাগোনা, কখনো কড়ি মধ্যম ছুঁয়ে শুদ্ধ মধ্যমে সরে এসে কেদারার মাধুর্যটি ফুটে উঠছে, কিন্তু রাগের ছবি ফুটিয়ে তোলা রজনীকান্তের গানের লক্ষ্য নয়। সব মিলিয়ে একটা সুগভীর ভাবমাধুর্য, যা নিশীথ সাধুর গানের স্টাইলে সুন্দর আদায় হয়েছে, সেইটুকুই ছিল সেদিনকার আসরে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে', 'বেলা যে ফুরায়ে যায়', 'দেখ দেখি মন' প্রভৃতি গান মনে রাখবার মতন। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, রজনীকান্তের গানে সুরের বৈচিত্র্য কম। সে-কথা মনে রেখে অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ততর হলে সামগ্রিকভাবে তা আরও রসঘন হয়ে উঠতে পারত। নিশীথ সাধুর গানের সঙ্গে পরিমিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রানুষংগের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

কাকলী আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের শুরু হয়েছিল অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। সবশেষে কাকলীর শিল্পীরা 'পশুশালার গল্প' নামে একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করেন।

—আনন্দবর্ধন

হ য ব র ল

(নেপথ্যে)

সুকুমার রায়ের অনবদ্য ফ্যান্টাসি 'হযবরল'। একটি শিশুর ঘুমের ঘোরে উদ্ভাসিত কতকগুলো আজগুবি স্বপ্নকে নিয়ে নাটকের বিস্তার। তাই পর্দা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শেষ স্বপ্নের জাল ঘিরে উদ্ভাসিত দৃশ্যাবলী— যে স্বপ্নের মায়াজালে বিষয়টির গতি আবর্তিত। মঞ্চ কিংবা আলোর কাজ কোনটিরই বিশেষ ত্রুটি চোখে পড়ে না উপরন্তু 'একের পিঠে দুই/চৌকি পেতে শুই' গানটির অনুরণন যেন নাটক শেষ হবার অনেক অনেক পরেও নেশাচ্ছন্ন করে রাখে মন। তবে যার স্বপ্ন নিয়ে এ নাটক সেই 'আমি'র ভূমিকায় শিল্পী সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় যদি আরও একটু তৎপরতার পরিচয় দিত তবে চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত। 'বেড়ালের' ভূমিকায় শিল্পীর অভিনয় অনবদ্য। জমিয়ে তুলছিলেন উধো ও বুধো —তপন লাহিড়ী ও প্রণব চ্যাটার্জি। তেমনি কাবেরী নন্দীর হিজিবিজবিজ, কস্তুরী নন্দীর শ্রীব্যাকরণ সিং, কাজরী দের শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচ নাটকের রসময়তাকে আরো ব্যাপ্তি দিতে সহায়তা করেছে। ন্যাড়ার ভূমিকায় রাণু বোস উতরে গেলেও মাঝে-মধ্যে কেমন যেন একধরনের আড়ষ্টতা দেখা দিচ্ছিল তার মধ্যে। মনে রাখার মতো অভিনয় করে গেছেন কুমীরের ভূমিকায় অঞ্জনা সেনগুপ্ত। কি গানে, কি অভিনয়ে তাঁর রূপারোপ ও নাটকের সম্পদ। ক্রমান্বয়ে এসেছিল আরও কিছু চরিত্র। ব্যাং (অর্পিতা মুখোপাধ্যায়), শজারু, (অতনু দে), প্যাঁচা (এষা লাহা), শেয়াল (প্রবাল নন্দী) ইত্যাদি। আলোর কাজ এক কথায় নাট্যানুগ এবং তদ্রূপ মেক-আপও। তবে শেয়ালের ক্ষেত্রে কেন ততটা নজর দেওয়া হল না তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। নির্দেশনায় অংশে তরুণতপন মিত্রের ভূমিকা যথার্থ রূপদক্ষতারই পরিচায়ক।

নাট্য সমালোচক

বিদ্রোহী সংবাদ

(আঙ্গরা)

মূলত নিরীক্ষাধর্মী এই প্রযোজনা, যেখানে প্রয়োগশৈলীতে অভিনব কিছুর চমৎকারিত্বে নতুন কিছু বলতে চেয়েছেন আলোচ্য নাটকের নাট্যকার-নির্দেশক আশিস দাশগুপ্ত। ত্রিমাত্রিক মাত্রায় আবদ্ধ চরিত্রের দিক থেকে অসীম, ইন্দ্রানী এবং অতীন; আলো—লাল, হলুদ ও সবুজ; শিল্পরীতিতে আলো আবহ ও মঞ্চ—এই তিনের সম্মেলনকে ফর্মের ক্ষেত্রে স্বকীয়তার নিদর্শন রাখার প্রশ্নে প্রযোজনা যদিও উত্তরণমুখী, তথাপি কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে এর বক্তব্য সম্পর্কে।

সমাজের সচ্ছল অংশের মধ্যে থেকে আগত অসীম, যে এই বিদ্রোহে নায়কত্বের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ তার নিজেরই কাছে, সে কিন্তু নিজেই সচেতন নয় কেন এই বিদ্রোহ, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিংবা এই বিদ্রোহের পথ প্রসঙ্গেও। জীবনের কোন মূল্য নেই, সংলাপের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহী অসীমের মুখ দিয়ে এই জাতীয় যে সব কথাবার্তা, বস্তুত তা হতাশারই সূচক নয় কি? অথবা ইন্দ্রানীকে তার কঙ্কাল উপহারের মধ্যে দিয়ে স্পিরিচুয়াল কিছু বলার চেষ্টা বিপ্লবের বাস্তববাদী দিকগুলোকেই কি কনট্রাডিক্ট করে না? অথবা অসীম যখন আবর্তিত জীবনের বাইরে বিদ্রোহের আদর্শ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেনে করে তখন ঐ বিপ্লবী নায়ক তার নিজের জীবনের লক্ষ্য কিংবা গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সচেতন নয় কেন? যেখানে বিদ্রোহী নায়ক নিজেই জানে না কীভাবে কার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে সেখানে এই ধরনের বক্তব্য নাটকের মূল প্রতিপাদ্যকেই এক ধরনের দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। যে বৃদ্ধ রাজার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যাকে বলা হয়েছে একনায়কতন্ত্রের প্রতিভূ কিংবা পাথরের মূর্তি (এখানে যাকে দেখানো হয়েছে কঙ্কালের প্রতীকে) তাকে জীবন্ত করে কৈফিয়ত তলবের ব্যাপার ইত্যাদি কার্যত অর্থহীন—যুক্তিবিহীন।

এতদ্‌সত্ত্বেও টিমওয়ার্কের নৈপুণ্যে, সুদক্ষ পরিচালনাগুণে এবং আন্তরিক নিষ্ঠার প্রতিদানে দর্শকদের বেশ কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন "আঙ্গরা"। হ্যারিকেন [illegible] নায়ক-নায়িকার পার্কে বসে গা[illegible] নীচে কথোপকথন, মধ্যবিত্ত [illegible]কতায় আচ্ছন্ন সাংবাদিক অতীনের ((বাবুল দাশগুপ্ত) একনায়কতন্ত্রের অত্যাচারের ভয়ে পলায়নের দৃশ্য......ইত্যাদি সত্যিই অনবদ্য। নায়িকার স্মৃতি রোমন্থনের মুহূর্তে পেছনে সাদা পর্দায় দীপচিত্রনের মধ্যে দিয়ে সেইসব ভাবনাগুলোকে সিনেমাটিক ভঙ্গীতে তুলে ধরা ইত্যাদি পরিচালকের কুশলী হাতেরই পরিচায়ক। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অসীম (আশিস দাশগুপ্ত) নামের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রানীর (মায়া ঘোষ) তার প্রতি আকু ভালোবাসার প্রকাশ, জীবনের যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের মুখ থুবড়ে পড়ার ব্যাপারটা যে সূক্ষ্ম প্রয়োগনিপুণতায় আঙ্গিকে কিংবা আলোর কাজের বাহাদুরীর মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা দেখা গেছে তাও সপ্রশংস সাধুবাদেরই উপযোগী

—নাট্য সমালোচ

সাহায্য অনুষ্ঠান

সেনট্রাল ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল এর সাহায্যার্থে সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অ ফাইন আরটস মঞ্চে এক সাংস্কৃতিক অনু ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনু ষ্ঠানটির উদ্যোক্তা সেনট্রাল ক্যালকাটা ইয়ু সেনটার। সার্কেল-এর ছাত্রীদের দি সমবেত নাচে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। তা পর মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নজরুলে কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। তার ম এসো প্রিয় আর কাছে, আসলো ধ ফুলের ফাগুন, হে গোবিন্দ রাখ চর বাগিচায় বুলবুলি তুই—উল্লেখ করার মত উপস্থিত সকলেরই সম্ভবত ভাল লেগে ঈশিতা মিত্র ও সুস্মিতা বিশ্বাসের কথ নাচ। এই দুই শিশু শিল্পী উজ্জ ভবিষ্যতের আভাস দিয়েছে। সবশেষে দ মিত্র নির্দেশিত "পাগলা ঘোড়া" নাটক পরিবেশন করেন বহুরূপীর শিল্পীরা।

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

ওয়াম্বেসিরা কুড়িটা বলদ নিয়ে এল -----
অরণ্যদেব বলদ দিয়ে কি করবেন?
দেখাই যাক।

লতা দিয়েই বা কী হবে?
কী জানি।

বাচ্চা, ভয় পেয়েছিস তো? ভয় নেই, জল খা।
জুম্বার গলপ -----

অরণ্যদেবের নির্দেশে লতা দিয়ে তৈরী হল জাল।
আরও বড় জাল চাই?
হ্যাঁ, আরও বড়।

জালটাকে হাতির পেটের তলায় বিছিয়ে দেওয়া হল।
লতার ডগাকে এবার বলদের জোয়ালে বাঁধো।

'যা বললুম, চটপট ওরা করে ফেলল।'

টানো, আরও টানো।
7/14

এবারে জোর লাগাব তো?
না, না, এখুনি নয়।
তাহলে?
আগামী সপ্তাহে: তাহলে কী!

অল্প বিস্তর

স্টেটসম্যান পত্রিকার শতবর্ষ স্মারক উৎসব হয়ে গেল সেদিন। যে ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রের থেকে এর উদ্ভাবনা, স্টেটস-ম্যান এখনও নিঃসন্দেহেই সেই ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া।

*　　*　　*

কানপুরের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা গ্রাফাইট থেকে হীরে বানাবার কৌশল বের করেছেন।

এবার আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ফাইট করার জোর বাড়বে, ধার বাড়বে আর, জেল্লাও বাড়বে—ঐ হীরের মতই।

*　　*　　*

ছাত্র এবং কর্মচারীদের যথাযথ হামলায় (কর্তাদের বিবেচনায় অযথা আর অপর পক্ষের মতে যথোচিত) কল্যাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলছে এখন।

মা সরস্বতীকে তালাক! ছাত্রদের কল্যাণ হোক।

*　　*　　*

মার্চের পর থেকে বিজলীর সরবরাহ বাড়বে, কেন্দ্রীয় শক্তি-মন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ।

অতএব মা ভৈঃ! মার্চ অন্। এবং Be Jolly!

*　　*　　*

শহর সম্পত্তির ঊর্ধসীমা বেঁধে দেওয়ার বিলটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে জানা গেল। শহরের বাড়িঘরও ধরা-চূড়ার সীমা ছাড়িয়েছে!

*　　*　　*

আমাদের রাজভবনের মাথায় এখনো সেই ব্রিটিশ সিংহ তেমনই দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজিত দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কেউ কেউ।

রাজভবনের কদর বাড়াতেই ঐ সিংহ দরকার যে।

*　　*　　*

তকতকে হাওড়া সাবওয়ের মার্জিত মেজের দুজন লোক পানের পিক ফেলে তাকে রংদার করবার চেষ্টা করলে কয়েকজন সহযাত্রী তাদের ঐ অমার্জিত ব্যবহারে বাধা দিয়েছিলেন বলে খবর।

পিক কূজনের স্থলে এখানে কুজনের পিক।

*　　*　　*

হিমালয় এলাকায় এখন বারবার ভূকম্পনের হেতু ভূতাত্ত্বিকরা এই জানিয়েছেন যে, হিমালয় তো বয়সে এখনও নাবালক, মাত্র সাড়ে ছ' কোটি বছর তার বয়স, তাই এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাহাড়ের মাথা এখনো বেশ গরম, সেই কারণেই সে মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ে, মাথা চাড়া দেয়, আর কিছু না।

সন্দেহ হয়, মহাপ্রস্থানী আমাদের নেতাজী ওর মাথায় ভর করেননি ত!

*　　*　　*

এ বছরের দলীয় নির্বাচনে হীথ সাহেবের বিপর্যয় ঘটায় কনজার্ভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব এবার হীথ সাহেবের হাত-ছাড়া হয়ে তাঁর জায়গায় ভোটাধিক্যে নির্বাচিত এক মহিলা সদস্যই দলীয় নেতৃত্ব লাভ করেছেন। ফলে এবার তিনিই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে যে চলছেন, তার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে।

স্বভাবতই মহিলাবর্ষের হেতুই এ বছরে এই মহিলাবর্ষণ বোধ হয়!

*　　*　　*

রিজার্ভ ব্যাংকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা ধর্মঘট করে টেবিলের ঝাড়পোঁছ করছেন না. তাই ব্যাংকের কেরাণীবাবুরা সব হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ফলে কলকাতার তাবৎ ব্যাংকের কাজকর্ম বন্ধ এখন।

বেশ ভাল রকমের ঝাড়ফুঁক দরকার, নইলে এ দৈনিক ব্যাধি সারবার নয়।

*　　*　　*

সরকার বাহাদুর কুমীর চাষের প্রকল্প করতে যাচ্ছেন বলে খবর।

চাষের জন্য কাটা খাল তো এনতার পড়ে আছে, তাতেই ওদের চাষবাস চলতে পারবে।

*　　*　　*

উনিশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে ভারতবর্ষে ভিক্ষুক আর ভবঘুরের সংখ্যা ছিল সাত লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো, খবর দিয়েছেন রাজ্যসভার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅরবিন্দ নিগম।

এ তো নিগমের খবর। আগমের খবর জানা যাবে আগামীতে।

*　　*　　*

শ্রীদারোগা রাইকেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রূপে কংগ্রেসিক মহলের অনেকের পছন্দ বলে শোনা যাচ্ছে।

সত্যি বলতে, বিহার তামাম মুলুককেই দারোগাগিরি করছেন এখন!

*　　*　　*

পুলিসের আ থেকে আরব মাথা টাকা এক গেজেটেড অফিসার ঘরে গিয়ে পকেটে পোরা মাত্রই তা দলা যায় এবং ভদ্রলোক অবলীলায় হতে না পুলিসের পাতে এসে পড়েন।

টাকার কাঁসের থেকে যে হয়ে যায়!

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা
বাংলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-৯২৪৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমা
কলিকাতা সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪০·৪০ টাকা	২০·৮০ টাকা	
		৪৫·৯০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১· টা
	ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে)	৬৮·৮৫ টাকা	৩৫·১০ টাকা	
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬·৯০ টাকা	৪৯·৪০ টাকা	২৪· টা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১·২০ টাকা	৯৬·০০ টাকা	৪৮· টা

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

ভারতীয় প্রতিরক্ষার শক্তি— ... ৬১৫
ব্যঙ্গচিত্র— ... ৬১৬
অলপবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী ... ৬১৬
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত ... ৬১৭
বৈদেশিকী—দেবরাজ ... ৬১৮
ইয়াং সিকিয়াং (কবিতা)—নবনীতা দেব সেন ... ৬১৯
হলুদ স্মৃতি (কবিতা)—শান্তনু দাস ... ৬১৯
ছুটির কবিতা (কবিতা)—অভিরূপ সরকার ... ৬১৯
অনুভব (কবিতা)—আশিস সান্যাল ... ৬১৯
বাংলাদেশে 'অমর একুশে'—সুশীল রায় ... ৬২১
ময়না—মানসী দাশগুপ্ত ... ৬২৫
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর—শিবরাম চক্রবর্তী ... ৬৩৩
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী ... ৬৩৭
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ৬৩৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় ... ৬৪৫
গানের আসর—শাঙর্গদেব ... ৬৪৭
আলোচনা— ... ৬৪৯
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর ... [illegible]
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায় ... ৬৬১
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত ... ৬৬৭
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু ... ৬৬৯
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক ... ৬৭৩
পুস্তক পরিচয়— ... ৬৭৭
খেলার মাঠে—একলব্য ... ৬৭৯
দাবার গ্র্যাণ্ড মাস্টার মুরি আভেরবাক—মুকুল ... ৬৮১
অরণ্যদেব— ... ৬৮২
রঙ্গজগৎ— ... ৬৮৩

প্রচ্ছদ ঃ নৃপেন সেন

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২
শনিবার ১৫ চৈত্র ১৩৮১

ভারতীয় প্রতিরক্ষার শক্তি

'রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন'—রাজা রবি-বর্মার আঁকা সেই ছবিটি আজ আর কোন চিত্রবিলাসী শৌখীন ভদ্রলোকের ঘরে আগের মতো খুব সমাদৃত একটি শোভা নয়। অতীতের অতি জনপ্রিয় এই ছবিটি আধুনিক অভিরুচির ঘর ছেড়ে চলেই গিয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য শহরের পথের পাশে নোনা-ধরা পাঁচিলের গায়ে অজস্র সস্তা ছবির ভিড়ের মধ্যে এই ছবির রঙীন মুখটিকেও দেখতে পাওয়া যায়। চার আনা কিংবা ছ' আনা দাম, এই ছবি আজ মলিন চেহারার গরীব ছবি-পসারীর সামান্য রোজগারের একটি পণ্য মাত্র। অনুমান করলে ভুল হবে না যে, রাজা রবিবর্মার আঁকা ছবি সম্পর্কে আধুনিক অভিরুচির সমাদর ক্ষীণতর হয়ে যাবার কারণেই 'রামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন' ছবিও সমাদর হারিয়েছে। কিন্তু রামায়ণে বর্ণিত 'রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন আখ্যায়িকার তাৎপর্য যা ছিল তাই আছে। একদা সমুদ্রের উপর ভারতীয় রাজশক্তির অবিচল আধিপত্য ছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যেরই রূপক একটি আখ্যায়িকা রামায়ণের কবি কল্পনা করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। যা-ই হোক, রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের কোন স্মৃতি নিহিত থাকুক বা না-থাকুক, ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানী গবেষকের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে, ভারত মহাসাগরের উপর ভারতীয় নৌ-বলের আধিপত্য হাজার বছরের স্থায়িতার পর বিচলিত হয়েছিল।

কিন্তু অতীতের সেই ভারতীয় কৃতিত্বের গৌরব বস্তুত গন্ধধূপের ধোঁয়ার মতো শূন্যতায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। তার সৌরভ আজ আর অনুভব করা যায় না, শুধু কল্পনা করা যায়। ভারত-সমুদ্রের উপর একাধিক বৈদেশিক শক্তির নৌ-প্রাধান্য নির্মাণ করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা ভারতের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তারই একটি সমস্যাকে জাগিয়ে তুলেছে। সমস্যাটা ভারতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকেও জাগিয়ে তুলেছে। সমস্যার [illegible] ভারতীয় প্রতিরক্ষা[illegible] [illegible] উন্নয়ন সম্পর্কে [illegible] আহ্বান দিয়েছেন, সেটা দেশবাসীর [illegible] অনেক উদ্বেগের প্রশমন করতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন, ভারত-সমুদ্রে বৈদেশিক শক্তির নৌ-প্রাধান্য নির্মাণ করবার প্রয়াস ও পদ্ধতির দিকে চোখ রেখে ভারতীয় নৌ-বলের নতুন সংগঠন ও উন্নয়নী রীতি-নীতি উদ্ভাবিত করা হবে। সন্দেহ নেই, এটা বাস্তবতাসম্মত নীতি। একথা সত্য যে, ভারত-সমুদ্রে নৌ-প্রাধান্য স্থাপিত করবার মতো বিজ্ঞান-বল ও সামগ্রী-সম্বল ভারতের নেই। কিন্তু ভারত-সমুদ্রে কোন এক বা একাধিক বৈদেশিক শক্তির নৌ-প্রাধান্যের স্থায়িত্ব ও কার্যকরী ক্ষমতা বিচলিত করবার মতো যোগ্যতা ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পক্ষে অর্জন করা দুঃসাধ্য নয়।

পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রের সরবরাহ পেতে আজ আর কোন মার্কিনী নিষেধের বাধা নেই। মার্কিনের কাছ থেকে অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করবার অবরুদ্ধ সুযোগ অবারিত হতেই ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক আকাঙ্ক্ষা আবার উত্তেজিত হয়েছে। সুতরাং, ভারতীয় প্রতিরক্ষার আসন্ন কর্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা নেই। আর্থিক সঙ্গতির সমস্যা ও প্রশ্ন আছে, তবু ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষার শক্তির দ্রুত উন্নয়নের জন্য ব্যয়বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ না করে উপায় নেই। উন্নত আধুনিকতম প্রকারের অস্ত্র সংগ্রহ করাই পাকিস্তানী ইচ্ছার দাবি ও নীতি। বিদেশীয় পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানের দরদী মুরুব্বী-দের যে চিন্তার ও অভিমতের সংবাদ বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যেও পাকি-স্তানের প্রতি এই উপদেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পাকিস্তান উন্নত প্রকারের অস্ত্র সংগ্রহ করুক; অন্তত ভারতের তুলনায় পাকিস্তানী অস্ত্রের সংগ্রহ বেশী উন্নত না হলে ভারতকে ভবিষ্যতের কোন সংঘর্ষে কাবু করবার সামরিক যোগ্যতা পাকিস্তানের অধি-গত হতে পারবে না। সুতরাং ভারতীয় প্রতিরক্ষার নতুন সতর্কতার প্রয়োজনেও উন্নত প্রকারের অস্ত্রের সংগ্রহ ও উৎপাদন চাই। সামরিক অস্ত্র ও উপ-করণের গুণমানে ও উৎকর্ষে পাকি-স্তানের তুলনায় ভারত পিছিয়ে থাকবে, এমন অবস্থার সামান্য প্রশ্রয়ও ভারতীয় প্রতিরক্ষার বিপদ ভয়াবহ করে তুলবে। [illegible] সৈনিকের [illegible] করতে হলে অস্ত্রসম্ভার [illegible] করতেই হয়।

প্রশ্ন করতে হয়, ভারতীয় প্রতি-রক্ষার বিভিন্ন গবেষণাগার কি অস্ত্র ও উপকরণের কোন নতুন উন্নতি উদ্ভাবিত অথবা আবিষ্কৃত করবার যোগ্যতা রাখেন? বলা বাহুল্য, প্রতি-রক্ষার ভিতরের কোন তথ্যের অবাধ প্রকাশ ও প্রচার সরকারের নীতির অনুমোদিত কাজ নয়। তাই এ ক্ষেত্রে দেশবাসীর অনেক কৌতূহলের প্রশ্ন বৃথাই মুখরিত হবে। কিন্তু দেশবাসী সরকারেরই স্বীকৃতির ভাষণে প্রায়ই দুঃখকর সত্যের উল্লেখ দেখেছেন যে, প্রস্তুতি ও সতর্কতার অভাবই প্রধান কারণ, যে-জন্য আকস্মিক চীনা আক্রমণের সম্মুখে ভারতীয় বাহিনীকে বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছিল। দেশ-বাসীর মন থেকে এই সন্দেহের ছায়া আজও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক বৈরিতার অর্থ পাকিস্তানী চীনা ও মার্কিনী অস্ত্রের সম্মিলিত বৈরিতা। এ ধরনের একটি সম্মিলিত বৈরিতার বিপুল উত্তেজনা ও উন্নত অস্ত্রের করাল উৎসাহের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকে কঠোর কৃতিত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাভূত হবার পর পাকিস্তানের সামরিক মনোবল কিছুটা বিষণ্ণ হলেও আবার যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছে। এরই মধ্যে পাকিস্তান তার স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে আকারে-প্রকারে দ্বি-গুণেরও বেশী বাড়িয়ে নিয়েছে। পাকি-স্তানী বিমানবাহিনীর আক্রমণ-শক্তিকে নতুন দক্ষতায় শাণিত করবার পরি-কল্পনায় ইরানের সাহায্যের রীতি-নীতি এবং অঙ্গীকার ভারতীয় প্রতিরক্ষার পক্ষে একটি নতুন শিক্ষা। ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান দ্রুত করবার চেষ্টায় পাকিস্তান সম্ভবত একটি মিত্রপক্ষ সংগঠিত করতে পারবে বলে আশা করে। একা নয়, একটি মিত্র-পক্ষের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে পরিপুষ্ট হয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ পরিচালিত করবে, এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। পাকিস্তানের সামরিক ব্যস্ততার মধ্যে এমন সম্ভাবনার বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সম্ভাবনার দিকেও চোখ রেখে ভারতীয় প্রতিরক্ষা-শক্তির দ্রুত উন্নতির রীতি-নীতি নিয়ামিত করা চাই।

...মনীদের আগে চাকরি দিতে হবে এই দাবি পশ্চিমবঙ্গেও বেশ সোচ্চার হয়েছে, কিছুতেই নাকি আর তা দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

অবশ্যই দিতে হবে, তবে কিনা, স্থান কাল পাত্র—বিবেচনায়।

• • •

কবে আর তিনি অসার ছিলেন! তবে সেই অভিনেতা কুলচূড়ামণি চার্লি চ্যাপলিনকে এবার রানী এলিজাবেথ স্যার খেতাবে বিভূষিত করলেন।

দ্য গ্রেট ব্রিটেন অব দ্য গ্রেট ডটেম!

• • •

সরকারী চাকুরিয়ারা এর পর থেকে নিয়ম মাফিক কাজ শুরু করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

কাজ না ... যে কাজে তাঁদের নিয়ম, কবে আর তাঁরা সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন!

• • •

নেপালের রাজা অভিষেক গিয়ে ...দের জোগিয়াল যা সব ন্যাকি বলেছেন তাতে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজেনদ্র দোয়াইড ... হয়ে দেখ নকায় কংগ্রেস পরিষদের সদস্য একযোগে প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, জোগিয়াল দেখা যাচ্ছে কিছুতেই ঠিক পথে আসবার নন—তাই তিনি নেপাল ফেরত তাঁর প্রাসাদে যাবার সারাটা পথ জুড়ে তাঁরা বিক্ষোভ জানাবেন স্থির করেছেন।

তাহলে আর কী করে তিনি ঠিক পথে ফেরেন বলুন।

• • •

ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকদের প্রায় দেখা যায়, যে রুমালে মুখ মোছেন তাই দিয়েই

অল্প বিস্তর

নিজের জুতোও মুছে থাকেন—এই নিয়ে এক পত্রদাতা দুঃখ করেছেন।

কিন্তু জুতো যদি মুখের মতন হয় মশাই?

• • •

মার্কিন কর্তারা পাকিস্তানকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র যোগাবেন জানিয়েছেন।

পাক প্রকরে সেসব এই ভারতকেই দেওয়া হবে ত! কেবল একটা পাক আগ্রাসনের ওয়াস্তা মাত্র! আগের বারের দেওয়া ভাবৎ হাতিয়ার যেভাবে আমাদের হাতে চলে এসেছিল মশাই!

• • •

...জার সরকারী কর্মচারীদের সরকার বাহাদুর মাসিক আট টাকা করে ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই মহাকরণ সহ সর্বত্র সরকারী মহাকর্মীরা (মহাকারণিক মহা করণিকও বলা যায়) ক... হয়ে কাজকর্ম সব শিকেয় তুলে দিয়েছেন জানা গেল।

বটে? ভাতার বেলায় অষ্ট টংকা?
তবে কাজের বেলাও এই সব ভংকা!

• • •

মঙ্গলদইয়ে ছাত্র ধর্মঘট—খবরের হেড লাইন!

সরস্বতী বিসর্জনের দাঁড় ... ছেলেদের ঐ দই কদমা!

• • •

ইদানীং শ্রীমোহন ধারিয়া প্রায়ই জয়-প্রকাশের পক্ষে প্রকাশ্য ওকালতি করছিলেন। ফলে, কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রিত্বের চাকরিটি তাঁর খোয়া গেছে।

এমন স্বতঃস্ফূর্ত মন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের অযোগ্য—সত্যিই!

• • •

ভারতীয় নারী কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? ইংরেজি এক সচিত্র সাপ্তাহিকে এহেন এক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখলাম।

নাগরীক শ্রেণীতে তাঁরা অদ্বিতীয়—এতদিন তাই ত জানা ছিল আমাদের!

শিবরাম চক্রবর্তী

দৃশ্যপট

জয়প্রকাশের আন্দোলনের এক বছর

জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের এক বছর হয়ে গেল। এই এক বছরের মধ্যেই এই আন্দোলনের ঢেউ বিহারের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে।

এক বছরের মধ্যে এই আন্দোলনের রূপও অনেকটা পাল্টে গিয়েছে। বিহারে যখন জয়প্রকাশ আন্দোলন শুরু করেন তখন তা অন্তত বাহ্যত ছিল একটা ছাত্র আন্দোলন। যে আন্দোলনের মূল নীতি ছিল শিক্ষা সংস্কার এবং দুর্নীতি দমন। সেই আন্দোলন এখন পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। যেটাকে মোটামুটি ভাবে বলা চলে শ্রীমতী গান্ধীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার একটা ব্যাপক বিরোধী অভিযান।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বিরোধী দল এই আন্দোলনের সঙ্গে বা পাশে এসে সমবেত। তাঁরা প্রায় সব ব্যাপারেই ভিন্ন মত, একটা ব্যাপার ছাড়া। সেই ব্যাপারটা হল শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করা। জয়প্রকাশের আন্দোলন এখন মূলত শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার অভিযান।

জয়প্রকাশের আন্দোলনের এই ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চয়ই আপাতদৃষ্টিতে তার শক্তি অনেকটা বাড়িয়েছে। শাসক দল আর কখনও কোনও বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে এতটা ভয় পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি মনে করি, জয়প্রকাশের আন্দোলনের এই চারিত্রিক পরিবর্তন তার অন্তর্নিহিত শক্তি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। যে আন্দোলনে প্রথম জড়িত ছিলেন শুধু ছাত্ররা ও গ্রামে গ্রামে ছড়ানো গঠনমূলক গান্ধীবাদী কর্মসূচীতে নিযুক্ত কর্মীরা সেই আন্দোলনে এখন নানা পার্টির বহু পরিচিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই প্রধান। যাঁরা মূলত কংগ্রেসী রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভিন্ন নন। যাঁদের অনেকে ক্ষমতায় যখন ছিলেন তখন ছিলেন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ। জয়প্রকাশের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে নতুন কিছু করবার আগ্রহে অধীর ছাত্রদের হাত থেকে 'কামব্যাক' গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছে।

এই কামব্যাক গোষ্ঠীকে দিয়ে আর যাই হোক বৈপ্লবিক কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। এরা এখন যেভাবে আছেন সেইভাবেই যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে সেটা হবে দেশের পক্ষে ভয়াবহ। পাঁচমিশালী সরকার রাজ্যে রাজ্যে বিপর্যয় এনে দিয়েছিল ১৯৬৭ সনের পর। পাঁচমিশালী সরকার কেন্দ্রে বসলে দেশের আরও বড় ক্ষতি হতে বাধ্য। আর এই কামব্যাক গোষ্ঠীর লোকজন যদি একত্র কোনও দল গঠনও করেন তাহলে সেই সরকারের শাসনে দেশে বড় কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। কারণ মূলত কংগ্রেসীদের সঙ্গে এ সব চারিত্রিক কোনও বড় পার্থক্য নেই।

*

জয়প্রকাশের আন্দোলন অবশ্য একটা ভাল কাজও করেছে—কংগ্রেসের কর্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাঁরা যেনতেন প্রকারেণ রাজ্য চালনা করে রেহাই পাবেন না। ১৯৭১ সনের পর রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের কেউ ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। বিরোধীরা একও হতে পারবে না এবং বিরোধীদের বিরোধের সুযোগে কংগ্রেস বরাবরই নির্বাচনে জয়ী হবে। জয়প্রকাশের আন্দোলন কংগ্রেসী কর্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। এই ধারণা নিয়ে বসে থাকলে তাঁরা বিপদে পড়বেন।

অবশ্য কংগ্রেসী নেতারা অবস্থা বুঝলেও যে সেইভাবে ব্যবস্থা নিতে পারবেন তা নয়। যেমন অবস্থা বুঝেও এতদিন বিরোধীরা সেই মত ব্যবস্থা নিতে পারেন নি এবং এখনও পুরোপুরি পারছেন না।

বিহারের দিকেই তাকানো যাক। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড আশা করেছিলেন যে, জয়প্রকাশের আন্দোলনের মুখে বিহার রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু তাঁরা তো পারেন নি। আর শুধু যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি তাই নয়—অনৈক্যের একটা জঘন্য ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন।

জয়প্রকাশের আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে আসলে কংগ্রেসীরাই। রাজ্যে রাজ্যে তারা যদি এত বছর ধরে অপকীর্তির, অযোগ্যতা এবং স্বার্থপরতার ছবি না তুলে ধরতেন তাহলে জনসাধারণ এই ভাবে জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হত না। যে প্রতিবাদ তাঁরা নিজেরা প্রতিদিন জানাচ্ছেন সেই প্রতিবাদের স্পষ্ট রূপ জয়প্রকাশের মুখে শুনেই আজ দেশের এত মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। জয়প্রকাশের আন্দোলনের রাজনৈতিক বক্তব্য যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের অধিকাংশই অনুভব করছেন না। একদিন অনেকটা এই জিনিসই হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বামপন্থীদের আন্দোলনের মধ্যে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ খুঁজে পেতেন তাঁদের নিজেদের প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি। সেই আন্দোলনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে তখন তাঁরা রাজী ছিলেন না।

*

কংগ্রেস নেতৃত্ব জয়প্রকাশের আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের দেওয়া নাম তাই বলতে গিয়ে আর একটা বড় ভুল করেছে।

প্রথম থেকেই কংগ্রেসীরা বলতে শুরু করেছেন, জয়প্রকাশের আন্দোলন ফ্যাসিস্ট আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের আসল রূপ কী সে সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অনেকেরই জ্ঞান নেই একথা সত্যি। কিন্তু তা বলে তাঁরা এতদিন যাঁকে একজন সৎ গান্ধীবাদী শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে জেনে এসেছেন তাঁকে কংগ্রেসী ও সি পি আইয়ের প্রচারের জন্য হঠাৎ এক ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের নেতা বলে ধরে নেবেন এটা মনে করা মূর্খামি।

বরং এই প্রচারের একটা তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমি বিহারে দেখেছি শিক্ষিত বহু মানুষ এজন্য কংগ্রেস ও সি পি আই নেতাদের উপর অত্যন্ত খাপ্পা। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আমি এই জিনিস দেখেছি।

শ্রীমতী গান্ধী এবং সি পি আই নেতৃত্ব হয়ত ভেবেছিলেন, যেভাবে তাঁরা কংগ্রেসের আগের নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন সেইভাবেই বোঝাতে পারবেন যে, জয়প্রকাশ ফ্যাসিস্ট। কিন্তু এর কতটা তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা সম্ভবত তাঁরা এখনও জানেন না। প্রধানমন্ত্রীর মত এত বিচক্ষণ এবং রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে পারদর্শিনী মহিলা এত বড় একটা ভুল করলেন কেমন করে আমি তা এখনও বুঝছি না।

জয়প্রকাশের সঙ্গে যদি প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই আলোচনায় বসতেন, যদি দুর্নীতি দমন বা শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইতেন তাহলে বোধ হয় আজ তাঁকে এভাবে এত বড় বিপদে পড়তে হত না।

কমিউনিস্ট ধাঁচে চলে বা রাজনীতি করে অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ন্যায় অন্যায় যে কোনও পথে পর্যুদস্ত করার মত রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে ভারতে কেউ খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন বলে মনে হয় না। তা যদি করতে হয় তাহলে আগে পুরো ক্ষমতাটা দখল করে নিতে হবে। ভোট বা পার্লামেণ্ট বা মতামত প্রকাশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাখা চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী কি সেই পথে যেতে আগ্রহী? সি পি আই অবশ্য খুবই খুশী হবে যদি তিনি সেই পথ ধরেন। রাশিয়াও নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি তাতে আগ্রহী?

১৭-৩-৭৫

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

নিষ্ফল প্রয়াস

দেবরাজ

গেল বছর ঘুণে-ধরা স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পর্তুগালে নয়া জমানার পত্তন করেন যে ফৌজী পাণ্ডারা তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল জেনারেল আন্তোনিয়ো ডি স্পিনোলার একটা কেতাব। তাঁকেই তাঁরা বসিয়েছিলেন নয়া পর্তুগালের রাষ্ট্রপতির গদিতে। তাঁকে লোকে যে রকম মাথায় তুলেছিল তাতে মনে হয়েছিল তিনি বুঝি হয়ে দাঁড়াবেন পর্তুগালের জেনারেল দ্য গল, দ্য গলের মতো তিনিও বোধ হয় নতুন ছাঁচে পর্তুগালকে ঢালবেন। তাঁর আমলে গণতন্ত্রের দেউলে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি বটে, কিন্তু গণদেবতার বোধন হয়েছিল। তিনি কথা দিয়েছিলেন সত্যিকারের গণতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা চালু করে স্বৈরাচারী রাহুর গ্রাস থেকে দেশকে মুক্তি দেবেন। বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই গণপরিষদ গড়ে তুলে পাকাপোক্ত গণতন্ত্রী সরকার কায়েম করার উদ্যোগ হবে। সে গণপরিষদের সভ্যদের বাছাই করা হবে ভোটাভুটি করে। সে ভোটাভুটির তারিখ পড়েছে ১১ এপ্রিল।

পর্তুগীজ দ্য গল বনা কিন্তু জেনারেল স্পিনোলার বরাতে নেই। পর্তুগালে পালাবদল ঘটিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা অধিকাংশ ফৌজী চাঁই। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই চিন্তাভাবনা বামপন্থী পুরোপুরি না হলেও বাঁ-ঘেঁষা। তাঁরা যেমন চেয়েছেন দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পালটাতে তেমনি সাম্রাজ্যের পাট চুকিয়ে দিতে। দুনিয়াতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যই সবচেয়ে পুরোনো। হাতি-ঘোড়া তলিয়ে গেলেও পাঁচকে পর্তুগাল চেষ্টা করেছে টিঁকে থাকতে। সালাজারের আমলে সংবিধানে একটা ধারা যোগ করা হয়েছিল যে পর্তুগালের কোনও উপনিবেশকে হাতছাড়া করা চলবে না—করলে কাজটা বেআইনী হবে। তার মানে ইচ্ছে থাকলেও কোনও পর্তুগীজ সরকারই বৈধভাবে উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন বলে মেনে নিতে পারবেন না সংবিধান না পালটে। ফৌজী সর্দাররা কিন্তু স্বৈরাচারীদের বানানো সংবিধানকে বেদ-বাইবেলের মতো অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সংগে সংগেই উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। অত তাড়াহুড়ো কিন্তু জেনারেল স্পিনোলা করতে রাজী হননি। তিনি চেয়েছিলেন আস্তে চলতে। সে ধীরে-চলার নীতি ভালো লাগেনি বেশির ভাগ ফৌজী সর্দারের। চাপে পড়ে চাল পালটালেন স্পিনোলা, উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া নিষিদ্ধ করে সংবিধানে যে ধারা ছিল তা তিনি বাতিল করে দিলেন চুয়াত্তরের জুলাই মাসে।

এত করেও ক্ষমতার চাবিকাঠি তিনি নিজের হাতে রাখতে পারলেন না—সেটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো তিন মাস পরে চুয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে। পর্তুগাল এখন কোনও রাজনৈতিক দল শাসন করছে না—দেশ চালাচ্ছেন আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্ট কিনা সামরিক বাহিনীর আন্দোলন। ওটা একটা ফৌজী সংগঠন। এর হর্তাকর্তা ২০০ জন ফৌজী সর্দার। তাঁরা যা করেন তাই হয়। রাখতেও তাঁরা মারতেও তাঁরা। জেনারেল স্পিনোলাকে হটিয়ে তাঁরা রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছেন আরেকজন জেনারেল ফ্রান্সিসকো ডা কোস্টা গোমেসকে। তিনি ছিলেন পর্তুগালে বিপ্লবের আগে স্পিনোলার ওপরওলা ফৌজে। কোনও মতবাদের ওপর তাঁর অচলা ভক্তি নেই। বামপন্থীদের সংগে তাঁর কোনও মনান্তর হয়নি, দক্ষিণ কিংবা মধ্যপন্থীদের সংগেও নয়। প্রধানমন্ত্রী ভাস্কো গনসালভেস বামপন্থী হলেও রাষ্ট্রপতির সংগে তাঁর অবনিবনা হয়নি। নতুন জমানায় বামপন্থী এই অজুহাতে কোনও দলকেই নিষিদ্ধ করেননি সরকার। কম্যুনিস্ট সোস্যালিস্ট দুদলই দিব্যি কাজকর্ম করছে, পাশাপাশি কাজ চালাচ্ছে বাঁ-ঘেঁষা মধ্যপন্থী জনগণতন্ত্রী দল। দেশের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছে তিন দলই। তবে প্রতিপত্তি বুঝি কম্যুনিস্টদেরই বেশী—যদিও এই সেদিন পর্যন্ত সে দলকে কাজ করতে হয়েছে গোপনে।

ঠিক কম্যুনিস্টবিরোধী রাষ্ট্রপতি স্পিনোলা ছিলেন না, কিন্তু কম্যুনিস্টদের বাড়বাড়ন্ত তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর ভয় ছিল দেশটা শেষ পর্যন্ত না লাল হয়ে যায়। ফৌজে বামপন্থী কিছু থাকলেও দক্ষিণপন্থীরও অভাব নেই। যারা দক্ষিণপন্থী নয় তারাও একমাত্র কম্যুনিস্টদেরই বামপন্থী বলে স্বীকার করে নিতে নারাজ। এদের সংগে ঘোঁট পাকালেন জেনারেল স্পিনোলা। তাঁর গদি গেলেও প্রতিপত্তি একেবারে যায়নি। ফৌজে তাঁর ভক্ত ঢের, ফৌজের বাইরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক। সামরিক বাহিনী আন্দোলনের নেতাদের বেশির ভাগই তাঁর বিরুদ্ধে—এ কথা বুঝে পর তিনি খোলাখুলি কিছু করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু তলে তলে মতলব আঁটছিলেন ফৌজে ভক্তদের সংগে যড় করে আবার ক্ষমতা জবরদখল করার। স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র আবার কায়েম করার অভিসন্ধি হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু স্বৈরাচারীরাও পেছন থেকে তাঁকে মদত দিয়েছিল। তাঁর দলবল বিদ্রোহী হলো ১১ মার্চ। তাদের পয়লা সারিতে ছিল বিমান-বাহিনীর লোকেরা। তারা হামলা চালালো আকাশ থেকে বোমা ফেলে খাস লিসবনে গোলন্দাজ ছাউনি আর বিমানবন্দরের ওপরে। তুমুল লড়াই চলেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা। তারপরই সব ঠাণ্ডা।

জিত হলো সরকারী ফৌজেরই—হার মানতে হলো বিদ্রোহীদের। জেনারেল স্পিনোলা তাঁর মতলব ফেঁসে গেল দেখে চম্পট দিলেন সপরিবারে হেলিকপ্টারে চেপে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। সেখান থেকে ব্রাজিল। তাঁর সংগে গেলেন ১৮ জন জেনারেল। তাঁরাই ছিলেন বিদ্রোহের পাণ্ডা। পর্তুগীজ সরকার এঁদের সবাইকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছেন। সেনাবাহিনী থেকে এঁদের সবাইয়েরই নাম খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। দেশে তাঁরা যদি ফেরেন তা হলে তাঁদের ফাঁসিতে লটকাতে সরকার একটুও দ্বিধা করবেন না। মন্ত্রিসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে ও সব কাণ্ড দেখে তাঁরা ঘাবড়াননি। তাঁদের নীতিরও কোনও হেরফের হয়নি। গণপরিষদ গড়বার যে অংগীকার তাঁরা করেছেন তার খেলাপ হবে না, নির্বাচন যেমন ঠিক ছিল তেমনই হবে ১২ এপ্রিল। তবে সব ক্ষমতাই রাজনীতিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া না হতেও পারে। এমন একটা ব্যবস্থা হয়তো হবে যাতে শেষ কথা বলবার অধিকার ফৌজী পাণ্ডাদের হাতেই থেকে যায়।

কিসের ভরসায় বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন জেনারেল স্পিনোলা? কেবল কি কম্যুনিস্ট জুজুর ভয়ে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, না এর পেছনে গভীর কোনও রহস্য আছে? পর্তুগালে স্বৈরাচারীদের ভরাডুবি কেবল পর্তুগালের দক্ষিণপন্থীদেরই ভাবিয়ে তোলেনি, ভাবিয়ে তুলেছে কম্যুনিস্টবিরোধী জংগী জোট ন্যাটোর কর্তাদেরও। পর্তুগাল ন্যাটোর সভ্য। সেখানে কম্যুনিস্ট না হোক, কম্যুনিস্টদরদী সরকার থাকলেও ন্যাটোর বিপদ। পর্তুগালকে তখন তাঁরা গিলতেও পারবেন না, আবার ফেলতেও পারবেন না। পর্তুগালকে ন্যাটো জোটে রাখলেও ফাঁসাদ, না রাখলেও। তাকে রাখলে ন্যাটোর গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে মস্কোর কাছে, না রাখলে পর্তুগীজ ঘাঁটিগুলো হাতছাড়া হওয়ার দরুন জোট ভীষণ অসুবিধেয় পড়বে। লোকের সন্দেহ স্পিনোলাকে ওসকানি দিয়ে তাতিয়েছে আমেরিকা ন্যাটোকে বাঁচাতে। এটাও নাকি সি আই এ-র আর এক কীর্তি। পর্তুগীজ সরকারেরও তাই সন্দেহ। লিসবনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যে স্পিনোলার নিষ্ফল প্রয়াসের পেছনে ছিলেন এই ইংগিতই তাঁরা করছেন।

ইয়াং সি কিয়াং

নবনীতা দেব সেন

বুকের মধ্য থেকে উঠে আসে চীনের প্রাচীর
রুদ্ধ করে দেয় সব। ছায়াপথ, বৃক্ষরাজি. উপত্যকা
ঘন মালভূমি। বুকের মধ্য থেকে উঠে আসে
চীনের প্রাচীর। যুগান্তের অবরোধ।

তবুও ভাসিয়ে নেয় গ্রামের ওপরে গ্রাম
ইয়াং সি কিয়াং।

হলুদ স্মৃতি

শান্তনু দাস

কেমন যেন মনে হ'ত স্মৃতি তুমি সাজিয়ে রাখতে,
যেমন ভোরের সূর্য ওঠে হলুদ নিয়ম গায়ে মাখতে
তেমন আমার দোরগোড়াতে
সকাল থেকে ঝুমুর ঝুমুর
হরবোলার এই শহর দুপুর
ধুলোয় ভরে।

এই ঝড়ে কি কৃষ্ণচূড়ায় ধরে আগুন?
যখন হৃদয় শুদ্ধ সারঙ
সকাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়...
শিশির জমে
বৃন্দাবনে
বুকের খাঁচায় রাসবাড়ি হয়।

সেই তো সময় হলুদ হলুদ
জীবন থেকে সমস্ত সুদ নিংড়ে নিলে
যেইটুকু ছল
সেটাই শিকল তোমার আমার
গোলবাড়ি বা খামার-টামার
যেমন জীবন
রমণ মরণ
পোস্টাফিসের সিলমোহরে প'গড়িঅলা মহাশমন—
যেমন করে স্মৃতি তুমি ভোমরা হয়ে জড়িয়ে রাখতে,
যেমন ভোরের সূর্য ওঠে হলুদ নিয়ম গায়ে মাখতে
তেমন আমার দোরগোড়াতে
সকাল থেকে
ঝুমুর... ঝুমুর...

ঝুমুর ঝুমুর
রাত গড়িয়ে
সকাল
দুপুর

শহর নূপুর
বুকের খাঁচায় রাসবাড়ি হয়॥

ছুটির দিনের কবিতা

অভিরূপ সরকার

লুকিয়ে রেখেছ।
এই তো তোমার ছোট্ট চৌহদ্দি—ওই পূবদিকে
বড় রাস্তা, একটা খোলা মাঠ, নতুন বাড়ি হচ্ছে সেখানে
আর পশ্চিম দিকে ওই তো সরু গলি, যার গা ঘেঁষে
হলদে রঙের দেওয়ালটা খাড়া হ'য়ে উঠেছে।
খুঁজবে ব'লেই তো লুকিয়ে রেখেছ
না হ'লে কেনই বা বুকের মধ্যে এক-মেলা
ধুলো নিয়ে মাঝে মাঝে
শালুকডাঙার মাঠে আহ্লাদী রাধাকেষ্টর কাছে
ফিরে যেতে চাইবে।

পেয়ে যেতেও পার।
কোনো রোববারে হঠাৎ সিন্দুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে
অ্যালবাম ঘাঁটতে ঘাঁটতে
চিঠিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে
প্রথম চুম্বনের ছবি ঘাঁটতে ঘাঁটতে
বাঁশবন ডিঙিয়ে. খিড়কি পুকুরের পাশ দিয়ে,
মুখুজ্জে-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে
ছোট্ট ইস্টিশন, কাঁকর-বিছোনো প্লাটফর্ম—
এইমাত্র ট্রেন ছেড়ে গেল।
এখনও দূর থেকে কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

খুঁজবে ব'লেই তো লুকিয়ে রেখেছ।
না হ'লে কি ক'রেই বা রোজ ভিড়ভরতি রাস্তায়
খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে আটটা প'য়তাল্লিশে বাস ধরবে।

আনন্দভাব

আশিস সান্যাল

রূপে যে ভোলায় আঁখি যেন তার নীরব ভঙ্গিমা
বিচূর্ণ রোদের মতো স্নিগ্ধতায় দূরে অন্ধকারে
ঝরে রোজ শব্দহীন। আমি তার গোপন মহিমা
স্পর্শ করে প্রতিদিন ধ্বনিময় প্রীত অভিসারে

চলে যাই পার হয়ে দ্রুত নীল পার্থিব সারণি
স্বরচিত অন্তরালে। ভালোবাসা যার অন্য নাম—
রূপের পাথারে স্নাত আমি এক প্রসিদ্ধ চারণী
চেয়েছি তোমার কাছে প্রস্তাবিত সেই অভিমান।

চেয়েছি তোমার কাছে ভালোবেসে সেই প্রতিদান
শ্রাবণ মেঘের জলে পরিপূর্ণ নীল সরোবর;
আশ্চর্য রঙের দ্যুতি দিনান্তের শেষ পরিণাম
তোমার নির্দিষ্ট বুকে স্নেহময় পার্বত্য নির্ঝর।

দিগন্তে নীলিমা ছুঁয়ে অবিরাম ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
চেয়েছি তোমার কাছে স্নিগ্ধতার নিজস্ব মহিমা;
রূপের পাথারে স্নাত আমি সেই প্রসিদ্ধ চারণী,
অন্তরে বাহিরে আজ আকাঙ্ক্ষিত তোমার প্রতিমা॥

বাংলাদেশে 'অমর একুশে'

সুশীল রায়

ঢাকার বাংলা আকাদমি কর্তৃক আয়োজিত 'অমর একুশে' অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এ বছর আমরা কয়েকজন সেখানে গিয়েছিলাম। সপ্তাহ-ব্যাপী এই অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞই হয়েছিল।

এখন ১৯৭৫। শতবর্ষই বলা যায়, সেই সময়কার পুরানো কথা আমাদের মনে পড়েছে। ১৮৭২ সালের কথা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে সময়ে ঢাকায় গেলে ঢাকাবাসী তাকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। একটি সনেটে মধুসূদন তার উত্তর দিয়েছিলেন, সে সময়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই যে সেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার উল্লেখ এই সনেটে আছে, তার প্রথম কয়েক ছত্র এই রকম—

> নাহি পাই তব নাম বেদে কি পুরাণে
> কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
> পূর্ব-বঙ্গে! শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
> ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রানী।
> প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে),
> নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।...

অতিথি হয়ে সেই ঢাকায় আমরা গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম সেই পূর্ববঙ্গে, যা কিনা এখন এখন বাংলাদেশ। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এখন এখানে আগের মত বিরাজিত কি না, আগের মত সমাদৃত কিনা এখন বাংলাদেশ। লক্ষ্মী ও পরায়ণতায় পূর্ববঙ্গ এখনো যে পূর্ববং— তার পরিচয় আমরা পেয়ে এসেছি।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দিন এখন একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এইদিনে কয়েকজন তরুণ তৎকালীন পাক-সরকারের হাতে নিহত হয়; তাদের অপরাধ তারা তাদের মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই দিনটি তাই বাংলাদেশে স্মরণীয় দিন। কণ্ঠে-কণ্ঠে এখনো তাই বাজে "আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"।

পাক-শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার পর ১৯৭২ থেকে বাংলাদেশ এই দিনটি স্মরণ করে আসছে শহীদ-দিবস রূপে। এই উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করে আসছে। এ বছর ছিল তাদের চতুর্থ স্মরণসভা। সেই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেসনস। ভিসা ও পাসপোর্ট যাদের ছিল না, উক্ত কাউন্সিলের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীহাইদার তাদের সে সবের ব্যবস্থা করে দেন অল্পসময়ের মধ্যে। আমন্ত্রণ দেরিতে আসায় ও ভিসা-পাসপোর্টের ব্যবস্থাদির দরুণ আমি ১৭ তারিখ সকালে যাই।

শ্রীহাইদার আমাদের প্লেনে তুলে দিয়ে এলেন এবং ঢাকায় গিয়ে কি কি বিষয়ে আলোচনা হবে তার টাইপ-করা একটি তালিকা দিয়ে দিলেন।

ঢাকার বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করলেন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জনাব এমদাদুর রহমান।

দেরিতে পৌঁছনোর দরুণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাদের যোগ দেওয়া হয়নি।

ওখানে গিয়ে যে অনুষ্ঠানসূচী আমরা পেলাম তাতে আলোচ্য বিষয় দেখলাম একেবারে আলাদা। সাহিত্যবিষয়ক কোনো আলোচনার ব্যবস্থা তাতে নেই। যা আছে তা এই—

১৫-২-৭৫ শনিবার

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা।

১৬-২-৭৫ রবিবার, সকাল

"বাংলা প্রচলনে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকা"

১৬-২-৭৫ রবিবার, বিকেল

"বাংলা প্রচলনে অগ্রগতি ও তার প্রতিবন্ধকতা"

১৭-২-৭৫ সোমবার

"বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প"

(সি ২৪৫৫৮)

১[illegible]-২-৭৫ [illegible]

"[illegible] শিকারযন্ত্রের সংস্কৃতিক [illegible]"

১[illegible]

[illegible]র ইতিহাস লেখার সমস্যা"

২[illegible]

[illegible] বাংলার পাঠ্য-[illegible] ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা"

২[illegible]-২-৭৫ [illegible]

[illegible] দ্বিতীয় [illegible] সেমিনারে, পাশাপাশি [illegible]"

সকাল [illegible]—আলোচনা, বাংলাদেশের কবিতা, গণসংগীত, আবৃত্তির আসর।

এই আলোচনা-সঙ্গী-[illegible] আমাদের অনেকেরই নিজেকে মনে হয়েছিল [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] পারবেন [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছি।" কিন্তু সে [illegible] ভার নিয়ে নির্ভাবনা আমাদের দলনেতা অন্নদাশংকর রায়। কে কী বলবেন তিনি তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

বক্তৃতাদির পর প্রত্যেক দিনই একটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ১৫ ও ১৬ তারিখে আমরা যে কয়জন যোগ দিতে পারিনি তাঁদের বঞ্চিত হতে হয়েছে 'জারিগান' ও 'কবিগান' থেকে। যখন শুনলাম এ গান শোনার জন্যে অজস্র মানুষ সমবেত হয়েছিল এবং এ গানও হয়েছিল অতি উচ্চাঙ্গের, তখন বঞ্চনাটা আরও তীব্র বলে মনে হল। কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে, যেমন—নাটক 'বহুরূপীর', 'এখন দুঃসময়', 'নবান্ন' ও কিশোরনাট্য 'মায়াকানন'। 'নবান্ন' অনেক দিনের নাটক, আমরা আগেও দেখেছি। অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'বহুরূপীর' নাটকটির রচনা ও পরিবেশনা অতি উৎকৃষ্ট। অন্যান্য নাটকও অবশ্য তারিফ করার মতন।

এই দুই দিনের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি, কৃতী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কবি জসীমউদ্দীন, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন। জসীমউদ্দীন সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে আসেননি বলে শুনলাম, কিন্তু তাঁর [illegible] অন্যত্র সভায় ও সভার বাইরে দেখা [illegible] এবং [illegible] [illegible] সূত্রে [illegible] আলাপ করবার সুযোগ হয়েছে। [illegible] দিনের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের দুই মন্ত্রী। ১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও ১৯ তারিখে মাননীয় [illegible] জনাব [illegible] আলী। [illegible] দিন [illegible] তারিখ বাংলাদেশের কবিতা [illegible] হয় এ সভায় সভানেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, এবং আসরে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী।

অন্নদাশংকর রায় সহ যাঁরা সময়মত ঢাকায় পৌঁছেছিলেন তাঁরা ছিলেন ধন-মণ্ডীর ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস কমিশনের গেস্ট হাউসে, সেখানে মাত্র ছয়টি ঘর, তাঁরা ছিলেন ছয়জনে। তাঁরা দূরে থাকায় ২১ তারিখে খুষ্টীয় রাত্রের মূল অনুষ্ঠানে, শহীদমিনারে মাল্য অর্পণে যোগ দিতে পারেননি। আমরা যারা দেরিতে গেলাম তাদের থাকার ব্যবস্থা হল রমনার রেস-কোর্সের লাগোয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার-স্টুডেন্ট সেন্টারে। এই পরিবেশটি বেশ ভালো। এখান থেকে গেস্ট-হাউস মাইল তিন দূরে।

এই দূরত্বের দরুন দলনেতার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র হল কেবল খাবার টেবিল ও আলোচনা-সভা। এই অসুবিধার কথা অন্নদাশংকরবাবুও আমাদের অনেকবার বলেন, এমন কি কলকাতায় এসেও বলেছেন। অনেক জায়গা দেখার সুযোগও তাই ঘটেনি। তাঁরাও অবশ্য বঞ্চিত হয়েছেন গভীর রাত্রের অনুষ্ঠান থেকে। কিন্তু ওরই মধ্যে থেকে কিছুটা সুযোগ করে নিতে অবশ্য পেরেছিলাম। অনেক তরুণ কবি-সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসা গিয়েছে। অনেক প্রবীণ মনস্বী ব্যক্তির সান্নিধ্যও লাভ করতে পেরেছি। তরুণদের মধ্যে যাঁদের নাম এখন মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান, সহীদ কাদরি, রফিক আজাদ, মহম্মদ জাহাঙ্গীর, আসাদ চৌধুরী। আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয় অবশ্য ঢাকায় পদার্পণ করেই। অন্যান্যদের সাথে দেখা হল হঠাৎই। ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল ঠাসা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। কখনো টী, কখনো লাঞ্চ, কখনো ডিনার—প্রত্যহ চলেছেই। এই রকম অবস্থার মধ্যে একদিন বিকেলে সভায় শ্রোতার আসনে বসে আছি, এমন সময় একটি ছেলে এসে কানে-কানে বলল, "পিছনে বেলাল চৌধুরী আপনাকে ডাকছেন, এই বক্তৃতাটা শেষ হলেই আসুন।" বেলাল আমার অনেককালের চেনা, অনেক ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে। বক্তৃতাটি শেষ হবার আগেই উঠে চলে গেলাম পিছনের দিকে। সেখানে প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষের নীচে বসে গেছে আসর, এটা যেন আলাদা একটা সভা। সেখানে তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা দলবেঁধে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন। এখানে এসে প্রাণ পাওয়া গেল। তাদের সঙ্গে বসে দেশের ও দশের কথা শুনতে লাগলাম, পাশেই [illegible] চলল, সেখান থেকে আসছে [illegible] লেমন-টী। ঢাকায় দুধের টানাটানি তাই লেবু-চাই চল হয়েছে। কবি কায়সুল হকের সঙ্গে দেখা হয়েছে পরে, তিনি বই উপহার দিলেন, সে সম্বন্ধে একটু অভিমত জানাবারও অনুরোধ জানালেন।

যাঁদের ইন্টেলেকচুয়াল বলা হয়ে থাকে তাঁদের অনেকেই নাকি এবারের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বলে শুনলাম। কিন্তু তাঁরা কারা তা অবশ্য জানা হল না।

তা না হল, কিন্তু দেখা হল হারামণির সংগ্রাহক-সম্পাদক অধ্যাপক মহাম্মদ মনসুর উদ্দীনের সঙ্গে, ইনি এবার সংবর্ধনা পেয়েছেন; বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু মেজাজ এখনো তাজা। স্মৃতিশক্তিও সামান্য নয়, অনেক পুরনো কথা ও পুরনো মানুষের কথা তিনি বললেন। দেখা হল সৈয়দ মুর্তজা আলীর সঙ্গে, এঁর বয়সও হয়েছে যথেষ্ট, ইনি সৈয়দ মুজতবা আলীর দাদা। মুজ-তবার জীবনী সম্বন্ধে অনেক ভুল তথ্য বের হচ্ছে বলে তিনি সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় ভ্রাতা মুজতবার জীবনের বিবরণ লিখেছেন বললেন। বেশ প্রাণবন্ত মানুষ ইনি।

সুতরাং লাঞ্চ-ডিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলেও এই নবীন ও প্রবীণ কবি-সাহিত্য-সেবী ইত্যাদি অনেকের সান্নিধ্যে আসা গিয়েছিল ওই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে, এটাকেই যথাসাধ্য লাভ বলে স্বীকার করে নিতে হল।

তাঁর অনেক বন্ধু ও প্রিয়জন এপারে আছেন, তাঁদের কাছে যেন তাঁর কথা ফিরে গিয়ে বলি এ অনুরোধ জানালেন আসরাফ সিদ্দিকি। অনেক চটুল ও হাল্কা মনের পরিচয় দিয়েছেন অনেকে, ছাত্র ও অ-ছাত্রও। অল্পেই তাঁরা খুশি, হুজুগেই তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের কথায় ও আচরণে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যবোধের ও মনের গভীরতার পরিচয়ও পেয়েছি অনেকের কাছে, যেমন, একজন হচ্ছেন আবুল আহসান চৌধুরী, বয়সে ইনি তরুণ কিন্তু বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, ইনি লালন ফকীর নিয়ে কাজ করছেন, লালন [illegible] সন্তান, তাঁর পদবী কর ছিল [illegible] উদ্ধার করেছেন বলে জানালেন। অন্যজন হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। এই সঙ্গেই মনে পড়ে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা মুসলিম [illegible] কথা, তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা মমতাশ্রী চৌধুরী, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের কন্যা ঊষা (পুরো নাম মনে নেই) ও নওরোজ কিতাবিস্তানের আলমগীর নাসির উদ্দীনের কথা—এঁরাও অধ্যাপনা করেন। এঁদের সকলের মন আছে এবং সেই সঙ্গে আছে মনন।

এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের [illegible] হল-এর কথা। এটি মেয়েদের একটি হস্টেল। [illegible] ছাত্রী এখানে থাকে। বিদেশ থেকে আগত

অতিথিদের এখানে স্বাগত জানানো হল। সম্পাদিকা অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর ভাষণ দিলেন। তারপর অন্নদাশঙ্কর রায় বক্তায় আমাদের কিছু উত্তর দিতে বললেন। সেই প্রতিভাষণ না প্রীতিভাষণের সুর ছিল প্রায় সকলেরই এক। বর্তমান লেখকের জন্ম রাজশাহীতে (বর্তমানে যা বাংলাদেশের অন্তর্গত), তাঁর স্কুলজীবনও কাটে ওখানে, তাঁর মাতুলালয় এই ঢাকারই তেওতা গ্রামে। তবু আমরা 'বিদেশী'—এই কথা বলা গেল।

এটা আক্ষেপও নয়, অনুযোগও নয়। এটা হচ্ছে বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া। এরকম স্বীকৃতির মধ্যে কোনো বেদনা নিহিত থাকে কিনা, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এটা একটা মজারই ব্যাপার। এই রকম মজা জীবনে আছে বলেই জীবন আছে, জীবনের স্বাদ আছে। জাতির জীবনে ও ব্যক্তির জীবনে এ ধরনের ওলটপালট ঘটে থাকেই। সুতরাং, একে দুর্ঘটনা বলা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায়ও এক দিন আমরা মিলিত হতে পেরেছিলাম। সাহিত্য প্রসঙ্গে সেদিন যার যা বলার আছে তা বলার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

ছাত্রদের দাবি সর্বস্তরে, বিশেষ করে উচ্চস্তরে, বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন। বাংলাদেশে এখন আট হাজার বাংলা টাইপরাইটার আছে, এর মধ্যে বাংলা আকাদমির আছে চার হাজার। ছাত্ররা আরও চায়। বাংলা টাইপরাইটারের অভাবে ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠি আসছে এই নির্দেশ দিয়ে যে, বাংলা প্রচলন করুন। ছাত্রেরা এটা প্রহসন মনে করছে। সুতরাং, বাংলা টাইপরাইটারের অভাবের অজুহাত মানতে তারা রাজি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী অবশ্য বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানতে পারলাম।

নৈশভোজে মধ্যাহ্নভোজে ও চায়ে আমাদের অনেকেই আপ্যায়িত করেছেন। জীবনবীমা করপোরেশন নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন ঢাকা ক্লাবে, এক সময়ে এটা ছিল ইউরোপীয়দের আখড়া, সাধারণ মানুষের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ ছিল। এই রাত্রে এখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়েছিল, এখানেই প্রথম পরিচয় হয় সৈয়দ মুর্তাজা আলির ও মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে। বাংলা আকাদমি ভোজ দেন ইফা রেস্তোরাঁয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আমন্ত্রণের পরিবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাসচিব নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন পূর্বাণী হোটেলে এবং সাংহাই রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ দেন সাম্প্রতিক পত্রিকা গোষ্ঠী, এখানে বহু মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু আমন্ত্রিত ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ঢাকা জাদুঘরের অধ্যক্ষ ডঃ এনামুল হক মধ্যাহ্নভোজে ও ডাক্তার মহম্মদ ইব্রাহিম নৈশভোজে আমাদের আমন্ত্রণ করেন। এ ছাড়া ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ডঃ আলাউদ্দিন ও ঐ হাই কমিশনারেরই প্রেস কাউন্সিলার শ্রীঅশোক গুপ্ত চায়ে আপ্যায়িত করেন। আর চায়ে আমাদের ডেকে ছিলেন করোটিয়া কলেজের সুবিখ্যাত ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও গ্রন্থকারের কন্যা খালিদা হাবিব ও তার স্বামী, এখানেই আলাপ হল সেই সংস্কৃত অধ্যাপিকা মুসলিম মহিলার সঙ্গে।

ঢাকার এখন দুই রূপ—পুরাতন ও নতুন। আমরা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি নতুন-ঢাকাতে। ক্রমশই যা বেড়ে চলেছে, বড় হয়ে চলেছে, ছিমছাম পরিপাটি রাস্তা উধাও হয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে। এরই মধ্যে একবার পুরনো-ঢাকা দেখে আসা গেল জেলখানা অবধি। তারপর গিয়েছিলাম উয়ারিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আমন্ত্রণে, তাঁরা শ্রীমা'র জন্মোৎসব পালন করছেন, আমাদের তাঁরা নিয়ে যান। অনেক মানুষের মেলা দেখলাম সেখানে। সেই ভিড়ের মধ্যেই এক ফাঁকে কবি কায়সুল হক প্রায় কানে-কানে বলার মত করে বললেন, "দুদিন থেকে যেতে হবে কিন্তু।" থাকা হয়নি, চলে আসতে হয়েছে পরদিন সকালেই—২২ ফেব্রুয়ারি।

যে নতুন রাস্তার কথা বললাম, সেই প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা ধরে আমরা গিয়েছিলাম সাভারে—যে জায়গায় হয়েছিল গণহত্যা। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। ব্রিজ পার হয়ে, দু পাশের গ্রাম ডিঙিয়ে, কানে বাতাসের বাঁশি বাজাতে বাজাতে। এই রাস্তা ধরে চল্লিশ মাইল গেলে আরিচার ঘাট। মাইলস্টোন দেখছিলাম। যাত্রী বোঝাই বাস চলেছে, সে বাস পিছনে ফেলে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি বাঁয়ে রেখে প্রসন্ন সকালের রৌদ্র ভেদ করে আমরা চলেছি। শীতও তেমন কড়া না, গরমও পড়েনি। সুতরাং হাওয়া বেশ মনোরম লাগছিল। গুড়ের হাঁড়ি বোঝাই গরুর গাড়ি মন্থরগতিতে চলেছে ঢাকার দিকে। দুই পাশে সবুজ গাছ ও সবুজ মাঠ। হঠাৎই দৃশ্য বদল হল। মনে হল যেন পৌঁছে গেছি বীরভূমে—বোলপুরে। দু পাশে শাল গাছ, তাদের চেহারা একটু যেন রুক্ষ।

বিরাট এলাকা জুড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধ তৈরি হচ্ছে সাভারে। যে অংশ তৈরি হয়েছে তার চেহারা বেশ শান্ত। চারদিকে ফুলের গাছ। এরই পাশে, কে-একজন

আঙুলে দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঘটেছিল নৃশংস সেই নরমেধ।

ফেরার সময়ে ঢাকারই উপকণ্ঠে আর-একটি স্মৃতিসৌধ দেখে এলাম। বেপরোয়া পাক-বাহিনী যেখানে হত্যা করেছিল বুদ্ধিজীবীদের।

সবশেষে বলি আসল কথা। যে উপলক্ষে আমাদের আগমন, সেই কথা। ভাষা—শহীদ প্রসঙ্গ। সে শহীদ স্তম্ভ রমনা এলাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি। ২০ ফেব্রুয়ারি রাত্রি বারোটার ঠিক পরে, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারির সূচনালগ্নে, গিয়েছিলাম ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে শহীদবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্যে। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ভলান্টিয়ার। পুলিস নয়। খালি পায়ে আমরা চললাম। আমাদের আগে আগে বাংলা অকাদমির মহাপরিচালক ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ও তাঁর স্বামী ডাক্তার মহম্মদ ইব্রাহিম এবং আকাদমির কয়েকজন কর্মী। শহীদবেদীর অদূরে আমরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ বেজে উঠল হুইসল। গভীর রাত্রি। ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। মোটর-বাহিত সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। টি ভি ক্যামেরা চলছে, অন্যান্য ক্যামেরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধুর পর মালা দিলেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, তারপর বাংলা আকাদমি, তারপর আমরা ভারতীয় প্রতিনিধিরা।

সেখান থেকে পদব্রজে অনেকটা ঘুরে আমরা ইউনিভার্সিটির ফটকে এলে, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ধানমণ্ডীতে বুলবুল সংগীত নৃত্য আকাদমিতে। গভীর রাত্রি উচ্চকিত স্বরে তখন সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা দল বেঁধে গেয়ে চলেছে গান—সে গান অবশ্যই জীবনেরই জয় গান।

এই রাত্রে কেউ ঘুমায় না। শহীদ স্মরণে সকলে নিশিযাপন করে।

সবই বোধ হয় বলা হল, কিন্তু যাঁর কথা বিশেষ বলা হয়নি তিনি হলেন সমস্ত অনুষ্ঠান-আয়োজনের মধ্যমণি শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি আমাদের সমস্ত সময়ের ও যাবতীয় ব্যাপারের ছিলেন সঙ্গী ও সহায়। তিনি কেবল বাংলা আকাদমির মহাপরিচালক নন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া-হল'এর প্রোভোস্ট।

কিন্তু সেসব পরিচয়ের থেকে আমাদের কাছে তাঁর বড় পরিচয়—তিনি যেন ছিলেন সর্বব্যাপারেই আমাদের হোস্ট।
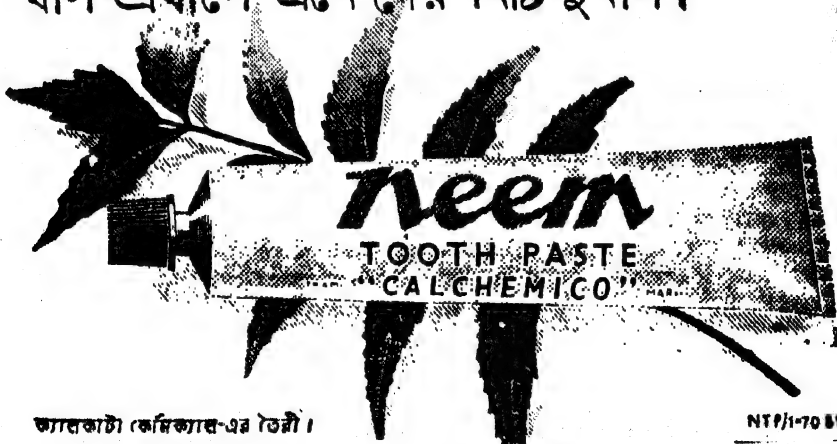
ময়না

মানসী দাশগুপ্ত

সকালবেলা ফোন এল যখন প্রথমে শোভেন একেবারেই বিশ্বাস করেনি। তারপরে কান করে শুনেছে গলার স্বর ঠিক যুধাজিৎ সাহার মতোই, ভুল নেই। কথাও অমন কে-ই বা বলবে ফোনে এভাবে গুছিয়ে, ভেবে ভেবে, এই অবস্থাতেও। তিনিই পারেন শুধু। তিনিই ফোন করছেন যোধপুর পার্কের সাত শ' তের নম্বর বাড়ি থেকে। অরবিন্দবাবু নিজে যেচে তাঁকে বলেছেন, কাউকে যদি ফোন করতে চান, ফোনের ঘর আমি খালি করে দিচ্ছি।—সেই খালি ঘরে বসে প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে, যেভাবে স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধেরা প্রতিটি ভাতের দানা চিবিয়ে থাকেন তেমনি গতিতে উচ্চারণ করছিলেন যুধাজিৎ সাহা। সমস্ত কথার ভিতরে এ কথাগুলিও, কেমন করে ফোন করা সম্ভব হলো তা-ও, তিনিই জানিয়ে দিলেন শোভেনকে।

শোভেন যতক্ষণে এসে পৌঁছতে পারে ততক্ষণে অরবিন্দবাবুদের এলাকা ছেড়ে যুধাজিৎ জয়তীর নিজের ঘরে চলে গেছেন। জয়তীর দেহ এখন এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও নেই। তবু মর্গ থেকে এখানেই ফিরবে সে—আজ হোক চাই কাল হোক। যাকে রোজ যেতে আসতে দেখে তেমন উৎসাহ হয়নি—তাকে একবারে হঠাৎ মৃত দেখবার জন্য পাড়ার কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়ে ঘুরছে জানলার ধার দিয়ে মাঝে মাঝে। নিচের তলার দক্ষিণমুখের এই ঘরে ভাড়া থাকত জয়তী সাহা। যুধাজিৎ-এর নিজের বলতে এই একমাত্র ছোট বোন। ছোট বললে কতকটা বাড়িয়ে বলা হয়, যমজ ভাইবোন ছিলেন দুজনে। যুধাজিৎ এসে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা মাত্র পরেই জয়তীর আবির্ভাব হয়। কত ভাল যে বাসতেন তিনি বোনকে তার প্রমাণ এই যে—সেসব গল্প বারবার বলেও পুরোনো হয়নি তাঁর কাছে। জয়তীর এভাবে একা থাকার খেয়ালকেও বাধা দিতে পারেন নি, ভালবাসা তাঁকে এতই নরম করে রেখেছিল। খুব উদ্বেগ হয়েছে যখন, নিজেই ছুটে এসে দেখে গেছেন।

'গেছেন' কথাটাই ঠিক, এখন থেকে আসবেন না আর। দরকার হবে না বলেই। আজ এসে বসে আছেন শেষবারের মতো শুধু এই কথা জানবার জন্য যে আজ ভোরে শ্রীমতী জয়তী সাহাকে তার নিজের ফ্ল্যাটে যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার কারণ কি?

জয়তীর মধ্যবয়সী দেহ পাওয়া যায় নিজের ঘরসংলগ্ন স্নানঘরে। পড়েছিলেন এমনভাবে যেন হঠাৎ গরম লাগায় উঠে গিয়ে তিনি ঠাণ্ডা মেঝের গায়ে পিঠ ছুঁইয়ে শুয়েছেন। কোনো অস্থাবাতের চিহ্ন ছিল না কোথাও। রক্ত নয়। বিছানা থেকে স্নান-ঘর পর্যন্ত কোনোরকম টানাটানি ধস্তাধস্তির চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাঁর হাত দুখানি ঘাড়ের পিছনে একরকম অবিন্যস্ত পড়ে ছিল। সকালে ঠিকে ঝি দরজা নেড়ে সাড়া না পেলে যখন হাঁক ডাক ওঠে, অনেক তোড় জোড়ের পরে অরবিন্দবাবু নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে এক-ঘর ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফেলে দিলে লোকজন এবং অবশ্যই পুলিশ এসে এভাবেই তাঁকে পায়।

হঠাৎ হৃদপিণ্ড গণ্ডগোল করেছে এই ধরনের একটা বিবরণ চালু করে দিতে পুলিশই যথেষ্ট ইচ্ছুক ছিল। কিছু না, একটু বললে কইলেই ডাক্তার স্বাভাবিক মৃত্যু লিখে দেবেন—এ কথাটা সে এমনভাবে কয়েকবার বললো যে অরবিন্দবাবুর ধারণা হলো এখানি পরীক্ষা করে স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রমাণ না দিলে তাঁর এই ছোট এক-ঘরের

ল্যাট আর তাড়াই খাটাতে পারবেন না। তদন্তের জন্য দেহ নিয়ে গেলে তাই কেন তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। পুলিশের বন্ধুত্ব নিয়ে তাঁর কাজ নেই, সুনাম রাখতে পারলে হয়। —বিষক্রিয়া, বোঝাই যাচ্ছে। —যুধাজিৎ বললেন আধপাকা চুল আর টাকে এলোমেলো হাত বুলিয়ে। —রিপোর্ট না এলেও বুঝতে পারছি। কিন্তু বিষ কীভাবে এলো? বিষাক্ত কোনো খাবার? ওষুধ? শত্রুতা করে দিলেন কেউ?

শোভেন ব্যাকুলভাবে বললো, না, না, তেমন শত্রু কেউ ছিল না তো? তাছাড়া ধরুন, থাকলেও—থাকা খুব অস্বাভাবিক, —তবু থাকলেও কীভাবে দেবে? মানে, উনি পানাসক্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না তো।

যুধাজিতের পূর্বাপর হিসেব করে কথা বলার ঝোঁক তাকেও এ মুহূর্তে প্রভাবিত করেছে অনুভব করে শোভেন কেমন বিড়ম্বিত বোধ করেছে লাগলো ভিতরে ভিতরে। জয়ন্তী সাহা বেতারবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন, ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে এই আকস্মিক শোকে তার মুহ্যমান হয়ে যাওয়ার কথা, অন্য সহকর্মীদের খবর দিয়ে সোজা হাসপাতালে খোঁজ নেওয়ার কথা। যুধাজিতের ডাক শুনে এখন শোভেন না এলেই পারতো। খুব একাগ্র-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে যুধাজিৎ বললেন, এই, এই কথাগুলোই আমি জানতে চাই। আমার চেয়ে বেশি আমার বোনকে কে জানবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দূরে থাকি, এই ইনটিমেট ব্যাপারগুলো জানার জন্যেই তোমাকে আসতে বললাম।

জয়ন্তী সাহার তাবৎ অন্তরঙ্গ সংবাদ সংগ্রাহক নাকি শোভেন? যুধাজিতের দিকে তাকাতেই অস্বস্তি হয় তার। এই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই হয়তো সে বলে, খুব একটা ইনটিমেট কিছু জানবার মতো কী আর—? খুব সরল, সাদাসিধে মানুষ ছিলেন তো জয়ন্তীদি।

প্রৌঢ়তায় গাঢ় হয়ে যাওয়া স্বরে যুধাজিৎ বললেন, মেয়েমানুষেরই গোপন কথা থাকে শোভেন। একদিন বলেছিলাম না তোমায়?

বলেছিলেন বই কি, যুধাজিৎ ছাড়া এমন উদ্ভট কথাবার্তা হঠাৎ আলাপচারীর মাঝখানে কে আর বলবেন, কেনই বা বলবেন। শোভেন কতকটা তাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার মতো করে বলে উঠলো, হয়তো হঠাৎ হার্ট ফেল করলো, থ্রম্বসিস-টিস কিছু। খুব হচ্ছে আজকাল চারদিকে। —বললো এমনভাবে যেন থ্রম্বসিস একটা চালু পোশাকের নাম।

—থ্রম্বসিস? জয়ার? আমরা যমজ ভাইবোন ছিলাম জানো না? একজনের চোখ
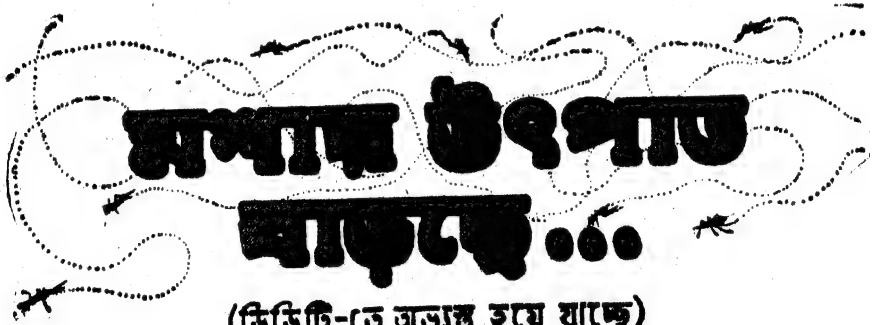
নাচলে আয়েবজনেরও নাচতো। জয়ার প্রস্থানিস হলে আমি টের পাবো না? —বলে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে যুধাজিৎ তাঁর হাতের কাগজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন।

ছোট বড় নানা কাগজ, ইনল্যান্ড, পোস্ট-কার্ড তাঁর সম্মুখে, পাশে, পিছনেও। কখন এসে তিনি জয়ন্তীর চিঠিপত্র খুলে বসেছেন কে জানে। এর ভিতরে আবার দপ্তরগত কোনো কাগজ টাগজ জয়ন্তী রেখে যায়নি তো? যুধাজিৎ এলোমেলো করে ফেললে পরে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ যদি শোভেনকে ডেকে বলেন, ওহে বাপু, তুমি তো ছুটেছিলে খবর পেয়েই ফাইলের আলগা কাগজগুলো তখনি অমনি উদ্ধার করে নিয়ে এলে না কেন?

এ কথা ভেবে আর জয়ন্তীর সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা মনে করে খুব অস্বস্তি হলো শোভেনের আবার। যে যাই বলুক, শোভেন নিজের চোখে দেখেনি এখনো মাটিতে শয়ান জয়ন্তীকে। সংকারও তো হয়নি তার দেহের এখনো। সে এখন—হ্যাঁ, লাশকাটা ঘরে। যদি জয়ন্তী এখনো বেঁচে থাকেন? যদি মর্গে ওরা অনুভব করে দেহ প্রাণহীন নয়? তারপরে তিনি এসে—। শোভেন খুব মৃদুস্বরে জিগগেস করে, আপনি গিয়েছিলেন মর্গে?

—না আমার ছেলে গেছে অরবিন্দবাবুর ছেলের সঙ্গে। অরবিন্দবাবুর ছেলেটি জানে টানে সব, বড়ও তো হয়েছে। ওই বললো, আপনি থাকুন।

—অরবিন্দবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

সে অনেকদিন হয়ে গেল যখন ঘর ভাড়া দেওয়ার পরে একা জয়ন্তী সাহাকে থাকতে দেখে অরবিন্দবাবু এবং তাঁর পরিবারের বয়স্ক কিছু সদস্য তাকে তুলে দেওয়ার সমীচীনতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। জয়ন্তী সাহার চরিত্রদোষ তো ছিলই না, স্বভাবে কিংবা ভাবে-ভঙ্গিতে এমন কোনো রহস্য ছিল না যে তাঁকে মোহময় সন্দেহের যোগ্য করে তুলবে। যদিও তিনি বেতার-বাণীর মতো সরব প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তবু তঁকে ভুলে থাকতে অসুবিধে হয়নি কারো খুব বেশি। প্রাচীনেরা জানতেন, বিয়ে থাওয়া হয়নি, বাপ টাকা রেখে যাননি বোধ হয়। চেহারাও তো বিশেষ কিছু না, ঐ স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে করে খাচ্ছে। নবীনেরা জেনে গিয়েছিল, চাকরি একটা করেন বটে জয়ন্তী সাহা, কিন্তু কাউকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া কিংবা প্রোগ্রাম পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মহিলা যথেষ্ট চৌকস নন। আর, যে একাকিনী মহিলার ঘরে বয়স্ক পুরুষ বলতে আসেন কেবল তার দাদাভাই, তার দিকে নবীনদের নজর পড়বারই কথা নয়, তবু যে মাঝে মাঝে একটি দুটি অল্পবয়সী মেয়ে উঁকি দিত জয়ন্তীর ঘরে তার কারণ বোধ হয় শোভেনের যাতায়াত। অবশ্য শোভেন তা ভাবে না, খুব বিনয়ী ছেলে শোভেন, সুশ্রী কোনো চোখের দৃষ্টি তার মুখে যদি পড়ে সে তখনি অনুমান করতে চেষ্টা করে তার মুখে কিছু লেগে রয়েছে কিনা।

অরবিন্দবাবুর খোঁজে গিয়ে শোভেন যার কাছে এসে দাঁড়াল সে জয়ন্তীর ঘরে মাঝে মাঝেই আসা তরুণীদের একজন,—অরবিন্দবাবুর ছোট মেয়ে মণিমেলা। শোভেনকে দেখেই তার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। পরিবর্তে শোভেনের ভাবান্তর না দেখে সে আঁচলের কোণ অনাবশ্যক দাঁতে কেটে বললো, কি রকম হঠাৎ না? কাল সকালেও ঠিক রোজকার মতো কাগজ মুখস্ত করছিলেন এ সময়ে।

—মুখস্ত করছিলেন?

—ভীষণ মন দিয়ে পড়তেন যে। বাবা চাইতে পাঠাতেন তো একবার দেখে নেবেন বলে, অফিসে বেরোবার আগে দিয়ে যেতেন। তার আগে পর্যন্ত চাইতে এলেই বলতেন, দাঁড়াও, আমার পার্সোনাল কলামটা দেখা শেষ হয়নি। পার্সোনাল কলাম, বিজ্ঞাপন সব খুঁটিয়ে পড়তেন।

—অফিস থেকে ফিরে কাল বেরোন নি।

—আমি জানি না। আমি ছটার শোতে সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা দেখতে গিয়েছিলাম।

—ও।

—বাবা বলছেন হার্ট অ্যাটাকই। খুব—মানে, একটু মোটা হয়ে যাচ্ছিলেন তো ইদানীং। তাতে নাকি ওরকম হঠাৎ হয়।

—হতেই পারে।—শোভেন সায় দিলো।

—যুধাজিৎদার সঙ্গে কথা হয়নি তোমার বাবার?

—হয়েছে। উনি শোনেন নাকি কিছু? নিজেই কি সব বলে গেলেন অনেকক্ষণ। এখন বসে রসে কাগজ পত্র ঘাটছেন।

—হ্যাঁ। কি জন্যে কে জানে।

—আমি জানি।

শোভেনের মুখের চেহারা একটুখানি

শান্ত হয়ে গেল। বললো, কী জানো?

মণিমেলা থমকে গেল যেন। তারপর আস্তে আস্তে জিগগেস করলো, খুব বন্ধু ছিলেন আপনারা, না?

মণিমেলার সংগে খানিক গল্প করে শোভেন ফিরে এল যুধাজিতের কাছে। অরবিন্দবাবু বেরিয়েছেন কোথায় তাঁর চেনা কোন আইনজীবীর পরামর্শ নিতে। যুধাজিতের ঐ প্রায়-শব্দহীন জেরা সকলকেই প্রভাবিত করছে। অরবিন্দ জানতে পেরেছেন তদন্ত রিপোর্টে যদি বলে মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তাহলে তাঁকে বাড়িওয়ালা হিসেবেও কতখানি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হবে।

[illegible] একবার অরিন্দমের দিকে যাই।

যুধাজিৎ সাড়া দিলেন না। অল্প পরে শোভেন আবার ফিরে না এলে হয়তোই খবর নিতে পারতো। কিন্তু সে এল খবর নিতে আর একবার। পুলিশের কাছ থেকে খবর এখনো আসেনি, দেহও না। কার সন্ধান পেয়েছেন অরবিন্দবাবু যিনি পুলিশের বড়কর্তাকে চেনেন। ঠিক লোক-টিকে ধরে ঘটনাপ্রবাহ ত্বরান্বিত করবার জন্য অরবিন্দবাবু খেয়েই বেরিয়ে গেছেন, তদ্বির তদারকে কখনো দেরি করতে নেই। যুধাজিৎ ঘরেই বসে আছেন তেমনি; খাওয়ার জন্য সময় দেবার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। কিন্তু অরবিন্দবাবুর স্ত্রী মেয়েকে দিয়ে খাবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সংগে বলে দিয়েছিলেন যে—যুধাজিৎ যেন ভুলে না যান [illegible] আত্মা কত কষ্ট পাবে যুধাজিৎ শরীরকে কষ্ট দিচ্ছেন দেখলে। মণিমেলা বসে খাওয়াচ্ছিল যুধাজিৎকে।

—আত্মা কত কষ্ট পাবে!—শোভেনকে শুনিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন যুধাজিৎ। তারপরে বললেন, সংকারের আগে কি আত্মা শরীর থেকে বিযুক্ত হয়? আর, আত্মঘাতীর সংকার হবেই বা কী!

শুনে মণিমেলা আর শোভেন পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখল একবার। আত্মহত্যার কথা সকালে যুধাজিৎ বলেন নি। চিঠিতে পত্রে তবে কি কিছু পাওয়া গেছে? মেঝেতে একধারে সরিয়ে রাখা কাগজের স্তূপে আপনা থেকেই একবার চোখ পড়ে গেল শোভেনের। অন্য পাশে ডালা খোলা স্যুটকেসে আরো কাগজ পত্র দেখা যাচ্ছে জয়তীর শাড়ি কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে। এ সব কাগজ শুধু তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে চান যুধাজিৎ তাই নয়, খুব তাড়াতাড়িও দেখে নিতে চান। এত তাড়া কেন?

মণিমেলা স্পষ্টতই অন্য কথা ভাবছিল। যুধাজিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ, আর কিছু লাগবে না তখন সে বাইরে এসে দাঁড়াল। শোভেন এসে একটু পরে তার কাছে দাঁড়াতেই মণিমেলার ভাবনা আকস্মিক প্রশ্নের আকার নিল, আপনি চিঠি লিখেছিলেন জয়তীদিকে?

—আমি? —ভাবতে চেষ্টা করলো শোভেন। একত্রে এতদিন কাজ করলে ছোট-খাট স্লিপ কিংবা কার্ড কাউকে পাঠানো একেবারেই বিচিত্র নয়। সেভাবে হয়তো সেও জয়তীকে লিখে থাকবে কখনো কিছু। কিন্তু তাকে চিঠি বলা যায় কি?

মণিমেলা আস্তে আস্তে বললো, চিঠি লিখে কেউ কেউ মনে রাখে না, মোটেই না?

কী ব্যাপার—বলে উঠতে ইচ্ছে করল শোভেনের। না বলে সে সিগারেট ধরিয়ে ফেললো একটা। একটু পরে ভেবে চিন্তে বলল, হাঁ এ রকম হতে পারে। সেটা খুব স্বাভাবিকও তো?

—স্বাভাবিক? তা হবে। যুধাজিৎদা মোটের ওপর সেই সব চিঠি খুঁজছেন।

—আমার চিঠি?

—আপনার? না, আপনার একার নয়। অন্যদেরও, মানে—যার যার হতে পারে, সকলের। —তার এ অর্থহীন বাক্যবন্ধ অনুরূপ অর্থহীন হাসিতে ঢেকে ফেললো মণিমেলা। সেই নিভ্রান্ত বোকা-বোকা হাসি-মুখ মেয়েটির দিকে চেয়ে কেমন করে যে শোভনের মনে হলো, যুধাজিৎ একটা জাল গেঁথে তুলছেন। ঠিক কাকে ঘিরে কী ভাবে—কথাটাকে মনের ভিতরে পড়তে দিল না সে।—যুধাজিৎদা কী করছেন দেখা যাক—বলে খুব তাড়াতাড়ি মণিমেলার পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল।

—আর কতক্ষণ দেখবেন?

—এই আর কয়েকটা। —বলে যেন অপ্রতিভ মুখে ব্যাখ্যা করলেন যুধাজিৎ, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না কি না।

শোভেন জিগগেস করলো না, কী খুঁজছেন তিনি।

যুধাজিৎই হঠাৎ বললেন, তুমি সায়েন্স পড়েছ?

—ঐ আর কি, বি এস সি পাশ করতে হলে যা পড়তে হয়।

—তুমি যদি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাও সেটাকে নিয়ে কী করবে? মনে মনে গুছিয়ে গাছিয়ে ধরে নেবে ব্যাপারটা এই রকমই যেন হয়েছিল, কেমন? তারপর, সেই রকম ঘটনায় সাক্ষ্যপ্রমাণ যেমন যেমন থাক দরকার তেমন তেমন থাকছে কিনা মিলিয়ে নেবে? নেবে তো? এখন ধরে নিয়ো—বলে তিনি কথা থামিয়ে দিলেন।

শোভেন শুকনো গলায় বললো, ক' ধরে নিয়েছেন?

—কিছু একটা, যাই হোক। এখন, আমি যা ধরে নিয়েছি তাই ঠিক কি না সেটা বুঝে নেবার জন্যে প্রমাণ খুঁজছি [illegible]হরের গণ্ডগোল এসে পড়বার আগে আমায় সে কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে, না পারলে এতক্ষণে সমস্ত চেষ্টাই এলিয়ে যাবে। সেই জ[illegible] তাড়াতাড়ি করছি।—এ সব কথা বিস্তারি[illegible] বলতে গিয়ে তাঁর দেরি হয়ে গেল এ খেয়া[illegible] হলো তাঁর বলতে বলতেই। তাই যেন রা[illegible] য়োগ করলেন, সরকারী অফিসে বাজে কা[illegible] করি, কিন্তু আমার ভিতরে একজ[illegible] বৈজ্ঞানিক আছে সে কথা জয়া জানতো।

শোভেন বসে বসে যুধাজিতের দে[illegible] সরিয়ে ফেলা কাগজ ফিরে দেখতে শু[illegible] করে দিল। জয়তী সাহার জার্নাল লেখ[illegible] অভ্যাস ছিল না। কাগজপত্র যা আছে [illegible] এলোমেলো তাকে আর স্যুটকেশে। সকা[illegible] যুধাজিৎ অনেকখানি সময় দিয়েছেন শ[illegible] এ সমস্ত তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে ফেলতে —নইলে পড়ে কোনো লাভ হবে না তে[illegible]

ধরো তুমি পড়লে "তোমার সঙ্গে আর দেখা করা সম্ভব নয়।" আর, তার পরই পড়লে "কালকেই. দেখা করাই চাই।" ভুল করে ভাবলে একই লোককে লেখা যখন এ দুই চিঠি, এর ভিতরের কথাটা এখনো চলছে, ঐ তো মিটমাট হয়ে গেল। অথচ যদি দেখ কালকেই দেখতে চাওয়া চিঠির ডাক-ছাপ হচ্ছে নয়ই সেপ্টেম্বর উনিশশোতেৰট্টি, আর অন্যটা লেখা হয়েছে উনিশশো পঁয়ষট্টির বাইশে ডিসেম্বর, তার পরে কোনো চিঠিই ও সূত্রে নেই, তখন?

—পেয়েছেন এ রকম চিঠি?

—না। যুক্তিটা শুধু বোঝাচ্ছি তোমাকে।

—ও।—বলতে বলতে ফের নিজের ভাগের কাগজে মন দিল শোভেন। বুধাজিৎ বললেন, এগুলোতে কিছু নেই। সম্ভবত এই নীল খামগুলি—বলেই তিনি আঁট করে সুতোয় বাঁধা ছোট একটি বাণ্ডিল চিঠি খুলে ফেললেন। শোভেন সাড়া দিল না। মন দিয়ে নিজের কাজ করছে সে। জয়ন্তী সাহার পত্র লেখক লেখিকাদের ভিতরে রহস্যময় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সব চিঠির আরম্ভেই নানা রকম "যু" চিহ্ন, অন্তে ও সম্বোধনে এদের সঙ্গে জয়ন্তীর সম্পর্ক নির্দেশিত। প্রায়ই তাকে তার ভাইপো ভাইঝি, বউদিদি কিংবা পিসীমা চিঠি লিখছেন। কাকে কার স্নেদপুরে যেতে হবে, কার গায়ে বেশ ঝেড়ে ঘাম বেরিয়েছে, —এই সব সংবাদে সে পত্রগুলি ভারবান। শুধু যে কটি চিঠি স্বয়ং বুধাজিৎ লিখেছেন সে কখানা পড়বার মতো। দেখা যাচ্ছে তাঁর নানারকম তত্ত্ব আর উদ্ভট চিন্তা প্রকাশের পথ ছিল চিঠি।

...ছোটবেলায় যখন একা একা শুতাম ছাদের দুদিকের ঘরে দুজনে, মনে আছে? —অনেক স্বপ্ন দেখতাম। তুমি কি লক্ষ্য করেছ, ওটা ছোট বড়র ব্যাপার নয়। একা ঘরে ঢের বেশি আর অনেক রঙীন স্বপ্ন আসে। তুমি একা থাক ভাবলে আমার মন এত খুশি থাকে তার কারণই তাই। এখন তুমি আসবে—বেড়াতেই এলে না হয়,—তখন বেশ অনেকগুলো স্বপ্ন আনবে।

কিংবা

পশুদিন একটা বউ-কথা-কও কিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম হঠাৎ. কিনলুম না। কেন জান রত্না? অনেকদিন আগে থেকে আমার ঠিক করা আছে তোমার বিয়ের শাড়ি কিনতে যব যেদিন সেদিন বউ-কথা-কও কিনবো। ঘরের কর্ত্রী শুনলে হাসবেন তাই তাকে বলিনি. পাখি টুনি ভালো বাসেন না যেমন।

চিঠিতে মানুষকে অনেকটা [illegible] লেখায়—এ কথা শোভেনের কই কখনো [illegible]

হয়নি আগে। আজ এই চিঠি থেকে চোখ ফুরিয়ে নিয়ে নিয়ে যুধাজিৎকে না দেখলে মনেও আসত না তার এমন কথা।

যুধাজিৎকে খুব ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আর কিছু পড়ছিলেন না তিনি এখন। নীল খামগুলো আঙুল দিয়ে দিয়ে নাড়ছিলেন কেবল, যেন ছেঁড়া কাগজ।

—কী পেলেন নীল খামে?

—ওগুলোতে? বুঝতে পারছি না।

—সে কি?—বলে শোভেন সেদিকে হাত বাড়াতে যেতেই যুধাজিৎ তাড়াতাড়ি নীল রঙের স্তূপটিকে আগলে নিয়ে বললেন, এ সব ওর কিছু না। এগুলো আসলে—বোধ হয় রয়ে গিয়েছিল। দৈবাৎ।

শোভেন কঠিন এবং নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করলো, দৈবাৎ? বৈজ্ঞানিক কি দৈব বিশ্বাস করে?

—দৈব বিশ-সা-স? আরে না। না। সে দৈব নয়।—তাঁর মুখচোখের চেহারা কেমন যেন ঠেকছে। আর কেউ এখন এ ঘরে এলে ভাল হয় ভেবে শোভেন অরবিন্দবাবুদের কাউকে ডাকতে যাচ্ছিল. দরজার ধারে গিয়ে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে মণিমালা এ ঘরের দিকেই চেয়ে আছে। তাকে এক পলক দেখে নিয়ে শোভেন যুধাজিৎকে লক্ষ্য করে বললো, আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসবেন না কি? এ দরজায় তালা দিয়ে তাই চলুন না।

এ ধরনের প্রস্তাব যুধাজিৎকে তাঁর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেয়। তিনি বললেন, রিপোর্টটা না আসা পর্যন্ত আমার এখানেই থাকার ইচ্ছে, তাই উচিত।

—আপনার মতের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ তাহলে পেয়ে গেছেন—বলবে না বলব না ভেবেও এ কথা মুখে এসে গেল শোভেনের।

যুধাজিৎ হঠাৎ রাগ করে বলে উঠলেন, তুমি কতদিন কাজ করেছ হে জয়ার সঙ্গে. কতটুকু চিনতে তাকে তুমি?

শোভেন গায়ে মাখল না তাঁর রাগ কিন্তু সরে এল দরজা ছেড়ে ভিতরের দিকে, যুধাজিতের কাছাকাছি।—বছর দশেক তো হলোই, বেশীও হতে পারে। উনি আমার দিদির মতো ছিলেন।

—'মতো', 'মতো' ছিলেন। একখানা চিঠি লিখে তার জন্মদিনে খোঁজ নাওনি পর্যন্ত কখনো।

শোভেন ছেলেমানুষের মতো বলতে লাগল, না না, কার্ড পাঠিয়েছি নিশ্চয়, উনি ফেলে টেলে দিয়েছেন হয়তো পরে।—এতে যুধাজিতের চোখের ভাব একটুও নরম হচ্ছে না দেখে সে জুড়ে দিল, তা ছাড়া এসেছি গেছি তো, অফিসেও দেখা হয়েছে।

—আসে না যায় না কে? ওটা [illegible] নয়। তোমাদের ভিতরে কোনো টান হয়নি। —যেন টান না হলে রাগারাগি করবার কিছু আছে এমনভাবে চোয়াল শক্ত করে বললেন কথাটা যুধাজিৎ।—এগারো বছর, এগারো বছর ধরে বাইরে বাইরে সে। অথচ কোনো একটা গল্পও জমা নেই কোথাও, এর কোনো মানে হয়? এত খালি? এত, এত খালি?

শোভেন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলো এবার যুধাজিৎ যথার্থ শোকার্ত হয়েছেন। বোনের মৃত্যু নয়, মৃত বোনের জীবনে রহস্যের অভাব তাঁকে নিতান্ত বিমূঢ় করেছে। এরকম শোক সকলের না হতে পারে. কিন্তু যুধাজিৎ সাহকে সকলের একজন ভাবা যায় না। কোনমতে নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্য সে জিগগেস করলো, ওই নীল চিঠিগুলি কার?

নিজের বাঁ হাতের তর্জনী অর

বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে ভগা নিজের দুই গালে ছুঁইয়ে রেখে অন্যমনস্কভাবে যুধাজিৎ বললেন, তারার। মানে, ওগুলো আমার চিঠি তারাকে লেখা, ওর লেখা চিঠি ওকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি কবে, ছিঁড়ে করে ফেলবার আগেই। আমি খুব কেয়ার খেলেছি বরাবর।

—এগুলো জয়ন্তীদিকে—

—জানি না কে দিল। তারাই হবে। ওর ক্লাস মেট ছিল তো তারা। এইটা নিয়ে—আসলে ব্যাপারটা চলেছিল অনেক-দিন। জয়া বরাবরই জানত। আমার সব-গুলো ব্যাপারই জানত ও। কিন্তু কি রকম ওর ধারণা হয়েছিল, অন্য সবগুলো যা হোক তা হোক, এই তারারটা,—এ থেকে বিয়ে-টিয়ে কিছু হবে। অথচ বিয়ে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেটা জয়াকে আমি বোঝাতেও পেরেছিলাম শেষে। প্রথম প্রথম সে যা কাণ্ড, তারাকে নিয়ে একে-বারে—যাকগে, এ সব কিছু নয়। জয়ার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই।

শোভেন তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দিল যুধাজিৎকে। যুধাজিৎ এমনিতে পছন্দ করেন না এ সমস্ত ইয়ার্কি, আজ অন্যমনস্কের মতো নিলেন। শোভেন নিজের সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বারান্দার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মণিমালা। শোভেন জিগগেস করলো, বেরোলে না আজ কোথাও?

—কেমন ইচ্ছেই করছে না। রাগ কর-ছিলেন কেন উনি, আপনার চিঠি পাওয়া গেছে বুঝি? বেশি বেশি?

আড়ি পাতছিলে কেন তুমি? আড়ি পাতা অভ্যাস করেছ বুঝি?

এ রকম হালকা কথা বলার সময় এখন নয়। এখনো লাশকাটা ঘর থেকে জয়ন্তীর শবদেহ ফেরেনি। শোভেনের ভাষার চাপলো মণিমালা হাসে না। শুধু পুনরাবৃত্তি করে, বলুন না, অনেক চিঠি লিখেছিলেন নাকি আপনি ওঁকে? যুধাজিৎদার ধারণা আপনি জিল্ট করেছেন বলেই নাকি জয়ন্তীদি—

—তোমার সঙ্গে এত আলোচনা হলো কখন?

—ঐ যে আপনি যখন খেতে গেলেন।

—তুমি কি বললে?

—আমি? আমাকে উনি জিগেস কর-ছিলেন যে আমারও তাই মনে হয় কি না।

—তার পর?

—আমি বলেছি, আমার মনে হয়।—বলে মণিমালা আঁচলের কোণ দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছে ফেলতে লাগল।

শোভেন খানিকক্ষণ চিন্তিতভাবে দেখল তাকে। তারপর বললো, খুকুমণি, আজকের কাগজটা খুঁজে পাবে? জয়ন্তীদি সকালে যেটা মুখস্ত করছিলেন?

খুকুমণি ডাকে মণিমালা কান্না থামিয়ে ফেলেছিল। শুকনো গলায় বললো, এনে দিচ্ছি।

বেলা পড়ে এলেই আজকাল হিম হিম হাওয়া দেয়। শোভেন জোরে সিগারেটে টান দিল একবার। এক পেয়ালা চা পেলে ভাল হতো। আজ কি জয়ন্তী সাহার দেহ নিয়ে শ্মশানে যাওয়া সম্ভব হবে?

আসার সময়ে শোভেন বলে এল, কাল আমি আর এখানে আসব না যুধাজিৎদা। পি জি-তেই যাব সোজা। যদি এদিকে কাজ থাকে, ফোন করে দেবেন একটা?

যুধাজিৎ বাড়ি যাবেন কি যাবেন না এ নিয়ে কথা উঠেছিল একবার দুবার। থানার কর্তৃপক্ষ খুব সাহায্য করছেন। অরবিন্দ-বাবু যে এতদিন রয়েছেন যোধপুর পার্কের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে, সেটা কিছু মিছে মিছি যায় নি। থানার বড়বাবু থেকে শুরু করে সকলেই এ গোলমালটা মিটিয়ে দিতে চান। ওঁর বাড়িকে কেন্দ্র করে কোনো গোলমাল ঘোরাতে দেওয়ার ইচ্ছে কারোর নেই। যুধাজিৎ বাড়ি যেতে চাইলে যাবেন, কেউ তাঁকে নজরবন্দী করে রাখছে না। কিন্তু যুধাজিৎ নিজে থেকেই রয়ে গেলেন।

—আমার মেথডটা অন্য।—নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শোভেন নিজেকে বললো।—আমার মনে যে ধারণা এসেছে সেটা সত্যি কিনা তার প্রমাণ আমি নেব আসল ঘটনা জানা গেলে।—হাতের খবরের কাগজ খানাকে সে যত্ন করে রেখে দিল নিজের ড্রয়ারে।

সিগারেট ধরিয়ে সে টানতে ভুলে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। এখন হঠাৎ মনে পড়ায় বার দুই-তিন শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল সিগারেটটা। খুব অদ্ভুত তার এই প্রমাণ করতে চাওয়া, অন্য কারো কাছে নয়, নিজের কাছে। নিজের কাছেই প্রমাণ নিতে বসেছিলেন যুধাজিৎ সাহা-ও। এক-একটা জন্ম আর এক-একটা মৃত্যু এরকম মামলা সাজায়, স্পষ্ট করে বিচারের মুখো-মুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, যে এল কিংবা যে গেল তাদের নয়। অন্যদের, যারা ছিল, যারা রইল। নিজের চুলে এলোমেলো হাত বুলোলো শোভেন।

ওভাবে দেখলে মেয়েদের তুলনায় জয়ন্তীদি কম কথা বলতেন। তা-ও যতটুকু বলতেন, কান করে সর্বদা শোনেনি শোভেন। মনে করা শক্ত, এর ভিতরে কোনদিন তারা বলে কোনো নাম উঠেছিল কিনা। মনে আনতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা স্মৃতিতে এল শোভেনের। একদিন জয়ন্তীদিকে বিরক্ত করবার ইচ্ছেয় অফিসের নন্দী পাকামি করে বলেছিল, শোভেনের এবার বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার, কি বলেন মিস সাহা? জয়ন্তীদি কেমন খাপছাড়াভাবে বলেছিলেন, অন্তরে আনন্দময়ী আছেন হয়তো ওর, কে জানে? তাকে ফেলে আর কাউকে বসানো, ওরে বাবা!

কেউ আমল দেয়নি কথাটাকে। পাগল পাগল কথা। একা ঘরে সেই কথা আজ শোভেনকে অনেকক্ষণ বিষন্ন, চিন্তামগ্ন করে রেখে দিল।

রাত্রে তার দেরী হয়েছিল ঘুমোতে। হয়তো স্বপ্নে ক্লান্তিও জমেছিল। সাধারণত সে সকালেই ওঠে। আজ দিনের রোদ অনেকক্ষণ উঁকি দিয়ে গেল তার ঘুমন্ত ঘরে। যুধাজিতের ফোন এসে শোভেনকে জাগাল। অরবিন্দবাবু রিপোর্ট বের করে ফেলেছেন, অনুমতিপত্রও। দেহ আনতে যেতে হবে এবার।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে জয়ন্তীর। খুব অব্যবস্থিত চিত্ত মানুষের মতো শোনাল যুধাজিতের গলা। —মস্তিষ্কের ব্যাপারটা বোঝা খুব মুশকিল।

—হৃদয় হলে বোঝা যেত।

—অ্যাঁ?

—না, কিছু না, বলছি বোঝা মুশকিল। —বলে শোভেন রেখে দিল ফোন। তারপর তুলে রাখা কাগজ নামিয়ে এনে খুললো ব্যক্তিগত স্তম্ভের পাতা।

তাদের প্রিয় শিক্ষিকা দুরারোগ্য ব্যাধি সহাস্যে বহন করে শান্তভাবে মারা গেছেন কাল ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শোক প্রকাশ করে দু ছত্র প্রাসঙ্গিক ইংরেজি কবিতা তুলে দিয়েছে।

আর পৃথকভাবে ঐ একই বিদ্যালয়ের সহকর্মী-কর্মিনীরা জানাচ্ছেন :

মিত্র, তারা—যাকে সকলে ভালবাসতেন, চলে গেছেন বীরের মতো নিঃশব্দে একা রোগ যন্ত্রণা বয়ে।

॥ আটত্রিশ ॥

লালিকে টুক করে কী একটা নিজের মুখের মধ্যে ফেলতে দেখে আমার টনক নড়ল।

'কী খেলি ওটা?' ওকে শুধাই।

'ও একটা জিনিস।'

'একটা যে, তা দেখেছি। একটা ছাড়া দুটো নয় তাও দেখলাম।' আমি বলি— 'তবে জিনিসটা কী, তাই আমি জানতে চাইছি। কোনো আচার টাচার?'

'আচার হলেও কোনো সদাচার নয়।' সে কয়, 'সব জিনিসই কি শুনতে হয়?'

'বল্ না শুনি।' আমি সাধতে থাকি।

'সব জিনিসই কি শোনা চাই তোমার?' যে বলে ঃ সব কথাই কি বলা যায়? বলা যায় সবাইকে?'

'যায় না? ব্যস্, আমিও তাহলে তোকে আর কোনো কথা বলব না।' আমার রাগ হয়ে যায়।

'আর গোসা করতে হবে না মোশাই!' সে বলে, 'একটুখানি খইনি ডাললাম মুখে...।'

'বিউনির ডাল?' অবাক হয়ে যাই ঃ 'বিউনির ডাল কি কেউ খায় নাকি আবার চিবিয়ে? শখ করে মুখে ফ্যালে আবার ওই ডাল মিছরির মতন? এক ডাল ওই—!'

'আহা, তাই বললাম বুঝি?' লালি নাক সিঁটকোয় ঃ 'বিউনির ডাল চিবুতে যাব কোন দুঃখে? তা কি তোমার কোনো নেশার জিনিস নাকি?'

'ও বুঝেছি।' এবার আমি হদিশ পাই। 'জর্দা কে দোক্তা কিছু হবে তবে।'

'দোক্তা তো খায় কেরানীর বউরা।' সে মুখ বাঁকায় ঃ 'আর জর্দা—বড়ো বনেদী বাড়ির গিন্নীবান্নীর দল।' সে বলে ঃ 'একেলে মেয়েরা ওসবের ধারে কাছেও যায় না।'

'একেলে মেয়েরা তো সিগ্রেট খায় শুনেছি।' আমি বলি ঃ 'তুইও তাই খেতে পারিস। কিন্তু তাও বলি, তুই তাহলে একেবারে অখাদ্য হয়ে যাবি। অন্তত আমার কাছে তো বটেই। আমি তাহলে আর কোনোদিন তোকে খাচ্ছি না...খাব না তোর।'

'তাহলে তো বেঁচে যাবো। যাক্। তোমার ব্রহ্মাস্ত্র তাহলে জানা রইলো' আমার। যদি কখনো তোমার হাত থেকে ছাড়ান্ পেতে চাই...।

'সেই ভালো। যদি আমায় ছাড়াতে চাস তাহলেই সিগ্রেট খাস—? তা না হলে খাবিনে, কেমন তো?'

'খেয়ে দেখেছিলাম একবার। কেমন সুবিধের নয়। খেলে দারুণ কাশি হয়। কাশির ধমকে মারা যাই আর কি!'

'ওমা! তোরও অভিজ্ঞতা দেখছি তাহলে আমার মতই। বটে?' শুনে আমি খুশি হই ঃ 'সেইজন্যেই ছেড়ে দিয়েছিলিস?'

'ছাড়লাম কবে আর? ধরলামই না তো। ধরলে তো ছাড়বার কথা—? ধরলাম কবে? আমার তোলা—ধরা আর ছাড়া—এক কথায়, ধরেই ছাড়া।'

একই কথা। যাক্ গে, এখন ওটা কী খেলি তাই ক।' আমি বলি ঃ 'না শোনা অব্দি আমার স্বস্তি হবে না। মাথা ধরে যাবে। পেট কামড়াবে—ওই জন্যেই।'

'ওই জর্দার মতই একটা জিনিস ধরো না। তবে জর্দা নয়।'

'জর্দা তো খায় গিন্নিবান্নীরা যতো—পর্দানাসিনরাই যতো জর্দানাসিন—তাই বললি না? তবে এটা কী খেলি তুই? জর্দা নয় যখন, কী তখন?'

'আমাদের বস্তির মেয়েরা যা খায়। এটাও বেশ মজার নেশাই ভাই। তার ওপরে—দোক্তা জর্দার চেয়ে সস্তাও বটে।'

'আহা, শুনিই না গো।'

'খইনি।'

'খইনি?' খ শুনেই আমি থ। 'কোনো কাজ না থাকলে লোকে খই ভাজে বলে শুনেছি, তা, তুই এখন ওই খইনি ভাজতে লেগেছিস?'

'ভাজলাম কখন? মুগের নাকি যে ভাজতে যাবো। সে একটু অবাক হবার ভাব দেখায়।

'মুগের ডালও না যে ভাজতে যাবি। তা জানি। তবে অনেকক্ষণ ধরে তোকে হাতের ঐ কসরতটা করতে দেখলাম তো?'

'কসরত কিসের, ডলছিলাম না? খইনি আগে বেশ করে ডলে নিতে হয় তা জানো? নইলে ওটা ঠিক মতন তৈরি হয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডলবার পরে—তার পরেই ওইটা মুখের মধ্যে ডালবার। বুঝেচ?'

'ডলবার পরেই ডালবার। বুঝেচি বেশ।' আমি বলি, 'তোদের ওই বস্তির মেয়েদের মতই-হুবহুব। ডলো আর ডালো।'

'বস্তির মেয়েদের নিন্দে কোরো না তুমি। তোমাদের পানদোক্তা খাওয়া যেখানে সেখানে যখন তখন পিক ফেলা মেয়েদের চেয়ে ঢের ভালো তারা।'

'তা ভালো।' আমি একপটে মেনে নিই। 'তা ওই বস্তির তুই আরো কী কী ভালো ভালো জিনিস সব খেতে শিখেছিস শুনি?'

আমি শুধাই ঃ 'তাড়িও খেতে শিখেচিস নিশ্চয়?'

'এত তাড়াতাড়ি সব জেনে নিতে চাও বুঝি? মদ খাই কিনা তাও জানতে চাইবে বোধ হয়? মদ খেতে শিখেছি কি না সেটা জানবে না?'

'জানালে জানব। জেনে বাধিত হব।'

'আমাদের বস্তির মেয়েরা তোমাদের ওই সুবোধ বালক গোপালের মতই। যাহা

পায় তাহাই থাক—'

'তাহলে খেয়েছিস আলবাত। খেতে আর বাধা কোথায়? কিসের বাধা?'

'না, অস্বীকার করব না। আমার বোন কালী একবার কোত্থেকে পেয়েছিল যেন। কে যেন দিয়েছিল ওকে। আধ বোতল দিয়েছিল আমাকে। তার থেকে চেখে দেখেছিলাম খানিক—।'

'কী রকম খেতে?'

'ওই তোমার সিগ্রেটের মতই। নুইসের মত তেমন। খেলে পরে গলা জলে যায়। ভালো না।'

'দেশী না বিলিতি?'

'তা জানিনে। আমার [illegible] মার্কামারা। কালী মার্কা বোতল দেখলাম।'

'দিশী ঠোলাই—জেনো রে! ও খেলে তিকার পড়ে যায় জানিস? তোর মা তোদের শাসন করে দেননি?'

'মোর টাইম কোথায়? মা নিজের [illegible] মা আমাদের [illegible] ।'

'তা বটে। আজকাল যা, এসব হচ্ছে [illegible] মেয়েদের খাওয়ানোই [illegible] মানুষ করার দায়িত্ব হচ্ছে [illegible] বাবার কাজ।'

'আমাদের বাবাই নেই। জন্ম থেকেই দেখিনি বাবাকে। বাবাই তো ছেলে-মেয়েদের চরিত্র শোধরায়। বাবা নেই, শোধরাবে কে বলো? বাবাই তো শোধরাবার।'

'সে কথা ঠিক।' আমি স্বীকার যাই: 'আমার বাবা যেমন শুধরেছিলেন। আমাকে শুধরাতে গিয়ে শুধরে গেলেন নিজেই...'

'কীরকম শুনি?' সে শুধায়।

'সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে সংসঙ্গে মিশে—সাধু সন্নিসিদের সঙ্গকে কি আর অসৎসঙ্গ বলা যায়? গাঁজা টানতে শিখেছিলেন তো? সংসারে ফিরে এসে যে যা করেও সে অভ্যেস যায়নিকো বাবার। সমানে টানতেন গাঁজা।'

'তাই নাকি?'

'বেদম টানতেন। আর, ঐ গাঁজাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। গাঁজা গুলি আফিং চরস তামাম, এমনকি হয়তো কোকেনও খেয়ে থাকবেন খেয়ে থাকেন যদি—কোনো নেশাই তাঁর বাকী ছিল না।'

'বলো কী গো?'

'হ্যাঁ। আফিং খেতেন তিনি তলে তলে। এক ভরির কম তো নয়। রোজ রোজ। রোজ বিকেলে সন্ধ্যের মুখটায় খাওয়া চাই-ই তাঁর।'

'তোমার মা তাঁকে শোধরাবার চেষ্টা করেননি?'

'শোধরাবে মা! তাহলেই হয়েছে। সত্যি মিথ্যে জানিনে। বামুনপাড়ায় গুজব ছিল, [illegible] টানে না, প্রাণের মায়াতেই পালিয়ে ছিলেন বাবা। ওই হিমালয়ের দিকেই ফেরার হয়েছিলেন। রাগের মাথায় এক চ্যালা কাঠের বাড়ি বসিয়ে আমার আগের মাকে সাবাড় করে তিনি কেটে পড়েছিলেন। আমিও শুনেছি কথাটা। সেই কথাটা শোনার পর থেকেই আমার মা বাবার সামনে সর্বদাই ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতেন, তিনি তাঁকে গায়ে পড়ে শোধরাতে যাবেন আবার?'

'তা বটে।'

'শুনেছিলাম যে হাতের চ্যালাকাঠটা ফেলে দিয়েই তিনি গেরুয়া নিয়ে সদ্গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন—সোজা সেই লছমন ঝোলা নাকি, বদরিকাশ্রমের দিকেই।'

'ভাগ্যি ফেলেই গুরুর খোঁজ পড়লো তাঁর?' লালি হাসে।

'গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিলো কিনা! জেলার থেকে পুলিস সাহেব স্বয়ং আসছেন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে খবর পেয়েছিলেন......আগে ভাগেই।'

'পেয়েছিলেন গুরু?'

'কোথায় গুরু! সদ্গুরু যদি কোথাও থাকে তো সেই হিমালয়ের গহনের নয় তো নৈমিষারণ্যের গর্ভে। তাই বলতেন বাবা। আর যারা সব ওই ছাই মেখে সাধু সেজে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাবা বলতেন, তারা সবাই গাঁজার টানে সন্নিসী। বিনে পয়সায় খাঁটি ছানা দিধে, ভক্তের পদসেবা, আর গাঁজার মৌতাত সব মিলে যায়—এই সবের জন্যেই।'

'তোমার বাবার গুরু খোঁজা ব্যর্থ হয়েছিল তাহলে?' আরো হাসে লালি।

'সার্থক হয়নি যে, সে আমার বাপের ভাগ্যি। সত্যি কথাটা কী, তিনি কারুর চ্যালা হবার জন্য জন্মাননি। সে পাত্রই ছিলেন না! হননি যে তার জন্য আমি ধন্য। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে সংসারী হয়ে গেরুয়া ছাড়লেও তিনি গাঁজা ছাড়তে পারেননি। মাঝে মাঝেই দম মারতেন ছিলিমে। আর তার ধোঁয়ায় বেদম হয়ে পড়তেন মা।'

'তবুও তিনি ছাড়তেন না?'

'কিন্তু সেই ধোঁয়ার চোটে আমার চোখ মুখ কপালে উঠে যেত নাকি। তখন তো আমি মার কোলে, মা বাবাকে গিয়ে দেখাল একদিন—দ্যাখো, তোমার গাঁজার ধাক্কায় ছেলেটার কী দশা হয়েছে। তাই না দেখে বাবা সেই মুহূর্তেই ছেড়ে দিলেন গাঁজা। আর সেই যে ছাড়লেন আর কক্ষনো তিনি ছোঁননি ঐ গাঁজার ছিলিম।'

'ভীষণ ভালোবাসতেন তো তোমাকে!'

'তা এক-আধটু বাসতেন বোধ হয়।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি: 'জীবনে যা একটু ভালোবাসা পেয়েছি তা ওই বাবার। কিন্তু সেকথা নয়, যেকথা কইছিলাম...... সেই অপোগণ্ড অবস্থাতেই আমি বাবার একটা মস্ত বদভ্যাস ছাড়িয়ে ছিলাম, কেমন শুধরে দিলাম বাবাকে—আমার অজান্তেই ঐ গাঁজার টান থেকে।'

'গাঁজা ছাড়া সোজা নয় গো! শুনেছি গাঁজা খেয়ে মানুষ রাজার হালে থাকে। মনে মনেই যদিও—এমনি তার মৌতাত!'

'শুধুই কি গাঁজা। তাল তাল আফিং খেতেন বাবা। বড় বড় গুলি করা থাকতো একটা কৌটোয়—চারানা, আটানা, ছরিখানেক মাপের। যেটা খুশি খেতেন, যখন খুশি। একদিন আমি হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে না, সেই কৌটোর দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম—কী মিষ্টি গন্ধ যে ভাই আফিমের! একটা গুলি নিয়েই না যেই মুখে পুরতে যাচ্ছি, বাবা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেই সব গোলাগুলি সমেত রুপোর কৌটোটা এক টানে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়... তার পরে আর খাননি কোনোদিন আফিং।'

'আফিমের নেশা নাকি কিছুতেই ছাড়া যায় না। এক বেলার জন্যেও নয়। এমন কি খেতে একটুখানি দেরি হলেও হাই উঠতে থাকে, প্রাণ আইঢাই করে, ছটফট করে মানুষ—ও নেশা ছাড়া ভারী দায়।'

'ছেড়ে দিলেন বাবা এক কথায়। অসাধারণ মনের জোর ছিল তাঁর। যোগটোগ করতেন কি না। অষ্টাঙ্গ যোগ না কী যেন?

'মানে তোমার ঐ অষ্টং কষ্টং?' লালি শুধোয়: সবাই করে। আগে বাবার বয়স হলে সব মিঞাই ঐ অষ্টং কষ্টং অং বং-এ যায়। আগড়ম বাগড়ম আওড়ায়।' লালি বলে আর হাসে খালি।

'অষ্টং কষ্টং নয় রে, অষ্টাঙ্গ যোগ। ভারী কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেখানে আমি করতে গিয়ে কতোবার যে উল্টে পড়েছি। ঐ যোগাভ্যাসে—এক রকমের [illegible] কড়া রকমের মনোযোগ তো। তার সঙ্গে দেহেরও যোগসাজস থাকে। ঐসব যোগ যাগে মনের জোর নাকি বাড়ে দারুণ।' আমি জানাই: 'একদিকে তাঁর সেই অষ্টাঙ্গ যোগ আরেক দিকে তাঁর এই যতো রকমের নেশা......গাঁজা গুলি আফিং টাফিং সব নিয়ে তাও প্রায় আট রকমের নেশাই হবে—সব তিনি ছেড়ে দিলেন একটার পর একটা—আমার পাল্লায় পড়ে। তাঁর সেই অষ্টাঙ্গ যোগে আর এই আট রকমের নেশার বিয়োগে—যোগে বিয়োগে কাটাকাটি হয়ে গেল শেষটায়। অকাট্য এক আমিই রইলাম।'

'তুমি তো বাপু দেখছি এক সর্বনেশে ছেলে ছিলে।'

'তা ছিলাম। শেষ পর্যন্ত ছিল তাঁর শুধু তামাকের নেশা। রুপো বাঁধানো হুঁকো ছিল, লম্বা নল লাগানো আলবোলাও দেখেছি। আরাম করে অম্বুরি তামাক খেতেন—আহা! কী যে তার খোশবাই! গন্ধেই প্রাণ তর হয়ে যায়? আমার ধাক্কায় সেই নল-লাগানো আলবোলাও তালগোল পাকিয়ে গেল একদিন

'সেদিকেও তুমি হাত বাড়িয়েছিলে বুঝি?'

'হয়ত নয়, মুখ। বাবা তখন ঘরে ছিল না। আমি তখন বেশ বড়ো হয়েছি, ছ-সাত বছরের হবো বোধ হয়, বাবার অসাক্ষাতে হুঁকো টেনে দেখছিলাম—কী রকম খেতে না জানি! গুড়ুক গুড়ুক করে টানছিলাম হুঁকোটা ধরে। আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে এসে পড়লেন বাবা। দেখেই না—জানলা দিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন রাস্তায়। হুঁকো আলবোলা নলটল সব সমেত। নল বাহাদুর গবাক্ষ পথে বিলকুল nil হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। আর কোনোদিন তাদের দেখা গেল না বাড়িতে।'

'এই সব করেছিলে তুমি ছোটবেলায়?'

'আমি করিনি, হয়ে গেছল। কিছুই আমায় করতে হয় না কখনো, সব আমার হয়ে যায়। কেমন করে, কেন যে, তা আমি জানি না। এমন কি, এখন অবধি কিছুই আমি করিনি, বলতে কি। একটুও কিছু করা হয়নি আমার। করতেও হয়নি আমাকে। সব আমার হয়ে গেছে।—আপনার থেকেই। এর যে কী রহস্য, তা আমি বলতে পারব না।'

'তাহলেও তুমি কিছু কম সর্বনেশে নও।' না বলে সে পারে না : 'তোমাকে শোধরাতে গিয়ে তোমার বাবাকেও শুধরে যেতে হলো শেষটায়।'

'বাবাকে ভালো করার কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না আমার, বিশ্বাস করো তুমি। স্বপ্নেও আমি ভাবিনি যে আমার বাবাকে আমায় শোধরাতে হবে। বাবার ওপর বাবাগিরি ফলাতে চাইনি আমি—কিন্তু ফলালাম না? কী করে যে কী হয়ে যায় কে জানে।'

'মিচকে শয়তান। দুষ্টুর শিরোমণি ছিলে তুমি।' সে জানায়।

'খোদার ওপর খোদকারি করতে আমি চাইনি কখনো, কিন্তু খোদার কী মর্জি কে জানে! আমার কাটালির সামনে পড়ে নতুন করে খোদাই হতে হলো ওনাকে! ওনাকেও।'

'কিন্তু নেশা তো খালি টানের জিনিস নয়, প্রাণের জিনিস।' লালি বলে, 'অত সব ছেড়েছুড়ে তোমার বাবা বেশ ভেঙে পড়েছিলেন বোধ হয়?'

'ভাঙবেন কি, একটু মচকালেন না পর্যন্ত। এমনি ছিল তাঁর মনের জোর, তবে মনে হয়—' আমরা ধারণা ব্যক্ত করি : 'ভাঙতেন হয়ত কিন্তু ভাঙ ধরলেন না শেষটায়? ঐ ভাঙের জন্যেই মচকালেন না আর। ভাঙ খেয়ে ভোম্ হয়ে থাকতেন সর্বক্ষণ।'

'আর তুমি?...ওখানেও তোমার হাত বাড়াতে যাওনি?'

'কেন যাব? না চাইতেই বাবার প্রসাদ পেতুম যে! ভাঙের মানে জানিস? সিদ্ধি। সিদ্ধি মানে সমাধি লাভ। ভাঙ খেলে তাই হয়ে যায়। তাই তাঁর খোরার তলানি যা পড়ে থাকত তার একাধটু আমি পেতাম। তাই খেতাম।'

'খেয়ে তুমিও ভোম্ হয়ে যেতে তো?'

'ঐটুকুন খেয়ে কখনো ভোম হওয়া যায় নাকি! কিন্তু বেশ আগ্রহতো খেতে। কী সব থাকত ঐ ভাঙে তা জানিস? পেস্তা কিসমিস আখরোট বাদাম—দই দুধ ক্ষীর—কতো কী! অনেকক্ষণ ধরে পাটায় পিষে পিষে বানানো হত জিনিসটা। অতো কুসুমার না করেই না হত সিদ্ধি।'

'রাগ করতেন না তোমার মা?' [illegible]

'না। বলতেন এ নেশা অনেক ভালো। এতে শরীর ভাঙে না। কোনো নেশাই ভালো নয় মা বলতেন তবে এটা হলো পিত্তর... মদের ভালো। এতে শরীর [illegible] না ভালোই হয় উলটে। এ নেশায় কেমনো... কম্প নেই, ভাঙচুর নেই, শুধু কেবল তা খেয়ে চুর হয়ে থাকা। বসে থাকা ঐ ভোম

ম্যাদাম সিপিলা এস্ক্যাপে ভাষণ দিচ্ছেন

ঘরে বাইরে

হেল্‌ভি সিপিলার সঙ্গে হঠাৎ দেখা

সাক্ষাৎকার বললে সবটুকু বলা হয় না। বাকী দুনিয়া বাদ দিয়ে একান্তভাবে আমার জন্য দু'ঘণ্টা দেবেন এমন কথা কল্পনাও করি নি। ESCAP অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-এর বৈঠক বসেছে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে। ESCAP হচ্ছে ECAFE-র উত্তরাধিকারী। ECAFE-র অন্তর্গত Far East কথাটিতে নাকি Colonial বা ঔপনিবেশিক গন্ধ আছে। দূর প্রাচ্য বলে যে দেশগুলি অভিহিত তারা কেনই বা আর কোনও ভূখণ্ডের হিসাবে দূর প্রাচ্য বলে নিজেদের মানবে?

নাম যাই হোক, বেশ গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স সন্দেহ নেই। সেই কনফারেন্সে এসেছেন শ্রীমতী হেলভি সিপিলা। খবর পেলাম শেষ মুহূর্তে। তখন আমি নূতন দিল্লিতে। ২৬-শে সকালে শ্রীমতী সিপিলা পৌঁছেছেন এবং সোজা গেছেন সভার অধিবেশনে। অধিবেশন উদ্বোধন করলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বেলা তখন বারোটা বাজে। হেলভি মাত্র দু' দিনের অতিথি। তাও আবার পুরো দু'দিনও নয়। কি করে দেখা পাবো ভাবছি। রাষ্ট্রসংঘের দফতরে খবর পেলাম সাড়ে বারোটা থেকে সওয়া একটা অবধি হেলভি সিপিলা হোটেলে থাকবেন। সেখানে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। হুড়মুড় করে ছুটলাম হোটেলে। নেমেই দেখি সামনে রাষ্ট্রসংঘের গণ্যমান্য কর্মচারী একজন দাঁড়িয়ে। পূর্বপরিচিত বলে সাহস করে বললাম, শ্রীমতী সিপিলার সঙ্গে কি করে দেখা করি বলুন তো? সহৃদয় বন্ধুর মত তৎক্ষণাৎ তিনি যোগাযোগ করলেন টেলিফোনে। শ্রীমতী সিপিলা ক্লান্ত। বিমান থেকে সোজা সভা তারপর সবে ফিরেছেন হোটেলের কামরায়। মালপত্র খুলতে বসেছেন। আমার আকুল আগ্রহ আর বন্ধুটির সনির্বন্ধ মিনতিতে মন ভিজে গেল মহিলার। বললেন, 'আসছি নীচে, বসুন পাঁচ মিনিট'। ঠিক পাঁচ মিনিটে নেমে এলেন মহা VIP হেলভি সিপিলা। তাঁর কথা আমরা দেশে আগেই আলোচনা করেছি। তিনি এখন সার্বজাতিক মহিলা বৎসর ও মহিলা কনফারেন্সের মহাসচিব। ছবি দেখেছি কিন্তু সামনাসামনি তিনি আরও সুন্দরী, আরও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ছাপা কাপড়ের জামায় উত্তর ইউরোপের টিউলিপ ফুল আঁকা। কালো বড় চামড়ার ব্যাগ, কালো জুতো। চটপটে চলন, সহজ, অকৃত্রিম, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মহিলা। কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নেই। কথা দিয়েছিলাম অল্পই নেবো তাঁর সময়। দু'চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো মাত্র 'ঘরে বাইরে'র পাঠিকাদের তরফ থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "Equality অর্থাৎ মেয়েদের সমান অধিকার বলতে আপনি কি বোঝেন? মেয়েরা তো কাজে ও দায়িত্বে প্রায় পুরুষের

স্কন্ধে ঘাড়ে নিয়েছে। ঘর সামলিয়ে তারা বাইরে কাজ করবে—এই কি সাম্য?"

"মোটেই নয়। সাম্য মানে সত্য সাম্য। মেয়েরা যেমন ঘরের সঙ্গে বাইরে যোগ করে নিয়েছে, পুরুষেরাও তেমন বাইরের সঙ্গে ঘরের দায়িত্ব ভাগ করে নেবে তবেই তো সমান অধিকার সার্থক হবে"।

আবার প্রশ্ন করলাম, "মেয়েরা কি নিজেরাই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে চান"?

"দীর্ঘকালই তো লক্ষ। মেয়েরা রাজনীতি অর্থনীতি সর্বত্র পুরুষের বিচার করা ব্যবস্থা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। কেন এমন হবে? মেয়েরা কেন নিজেরা বিচার করে দেখবে না তাদের নিজেদের জন্য অথবা সন্তানের জন্য কি বর্জন আর কি অর্জন। এই যে জগতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী আর রণ-সম্ভারের স্তূপ গড়েছে এও তো পুরুষদের কাজ। হাতিয়ার বানিয়েছে তারা এবং হাতিয়ার দিয়ে মানুষকে নাকালও করছে তারা। নারী যদি সমান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তবে পুরুষের এই দ্বন্দ্ব কলহ বিরোধ আর স্বার্থের রেষারেষি যাবে অনেকটাই কমে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে এত জগৎজোড়া আলোড়ন সত্ত্বেও তার সম্মান, খ্যাতির ও গৌরব প্রধানত বা মুখ্যত পুরুষের উপর নির্ভর করে। কোথায় কটি মেয়ে আর নিজের যোগ্যতার জন্য সমাদর পান? VIP-র পত্নী না হয়ে VIP হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল বললেই হয়।"

উত্তরে হেলভি সিপিলা মজার অভিজ্ঞতা কয়েকটি বললেন। সুইজার-ল্যাণ্ডের একটি হোটেলে আজ প্রায় বছর দশেক ধরে তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন। Monsieur Sipila অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সিপিলা নামে তাঁর বিলটি আসে প্রত্যেকবার। তিনি মানী লোক বা VIP। বিল যারা বানায় তারা ভাবতেই পারে না VIP আবার মেয়ে হয়"। বাধা দিয়ে বললাম, "তারা কি তোমাকে দেখেও এরকম বানায়?"

"আহা, বিল যারা বানায় তারা আমাকে দেখে কবে? তারা জানে গুরুত্বপূর্ণ পদাধি-কারী একজন এসেছেন। কাজেই আমি মঁশিয়ো সিপিলা। এমন দেশে কিছু-দিন আগে মেয়েরা যখন ভোটা-ধিকার পেলেন, কি তাদের উৎসাহ আর আনন্দ। দলে দলে এগিয়ে এসেছে সমাজের সকল ক্ষেত্রে আর রাজনীতিতে। তবে হোটেলের বিল লেখা কেরানী পর্যন্ত বোধ হয় পৌঁছতে সময় নেবে।"

আর একটি গল্পও কৌতুকে ভরা। একবার তাঁর বর্তমান কর্মস্থান নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে VIP Lounge অর্থাৎ মানী মানুষের বিশ্রাম বা অপেক্ষা করার কামরায় নিয়ে যেতে এসেছিল একটি মেয়ে। সে শুধু শুনেছে যে পদস্থ কেউ আসছেন। তাঁর যোগ্য সমাদর করা দরকার। শ্রীমতী হেলভি সিপিলা পৌঁছা-নোতে মেয়েটির মুখ যেন কেমন অবাক বিস্ময়ে ভরে গেল। VIP কি মেয়ে হয়? একটু সময় লাগলো সামলে নিতে। এগিয়ে এলো সে। স্বীকার করলো অকপটে যে সে এক মানী পুরুষের কথাই ভেবেছিল। মানী মানুষ যে মেয়ে হতে পারে তা তার আগে জানা ছিল না।

হেলভি সিপিলা মনে করেন দুনিয়ার এ মনোভাব বদলাবে। এজন্য একটি যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাস বদলাতে সময় লাগবে বটে কিন্তু পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি হয়েছে অনেক আগে। এখন Imple-mentation-এর অভিযান। অধিকার কার্যে পরিণত করতে হবে। নূতন জীবনযাত্রার বিরোধাদির মীমাংসা সম্পাদন করতে হবে। সাধারণ মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে বইকি! এই তো সেদিন তাঁর ছেলে-মেয়েরা একটি পত্রিকা এনে দেখালো। পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে মানী মেয়েদের স্বামীদের উপর!! এতদিন VIP পুরুষদের বউরা পেতেন প্রচার। এই প্রবন্ধে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীমতী সিপিলার স্বামীর সম্বন্ধেও লেখা হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "পশ্চিমের মেয়েরা কি এখনও sex object বা যৌন আকর্ষণের পাত্রী মাত্র রয়েছে?"

—"জীবনযাত্রা এখন দিনে দিনে এত কঠিন হয়ে উঠছে যে বাস্তবকে মুখোমুখি রেখে এসব বাতুলতা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে এসেছে। সমাজ নারীকে আর sex object ভাববার মত অবসর পাচ্ছে না।"

আবার প্রশ্ন করলাম, "মেয়েদের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণে অনেকের আশংকা সংসার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্তানের যত্ন যথেষ্ট হয় না।"

—"একেবারে বাজে কথা বই নয়। বহু মা আছেন অনন্ত অবসর সত্ত্বেও সংসার গোল্লায় দিয়ে আলস্যে দিন কাটান। ছেলেমেয়ে জাহান্নমে গেল বা স্বামী হয়রান হলো বা নাকাল হলো তাতে তাদের আসে যায় না। কাজেই নারীর সমান অধিকার দাবীর বিরুদ্ধে এটা কোন কারণই নয়।"

পরিবার পরিকল্পনা আর একটি বিরাট ক্ষেত্র যেখানে নারীর মর্যাদার বিশেষ প্রয়োজন। নারী সন্তান ধারণ করে। পুরুষ তো করে না। এক সময় দরিদ্র সমাজে সন্তানকে economic assets বা সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হতো। বিশেষ পুত্র সন্তান ছিল বিভব। এখন সন্তান আদরের জিনিস। লালন পালনের আনন্দ ও দায়িত্ব আছে। কিন্তু সম্পত্তি জ্ঞান করার জন্য অধিক সন্তান প্রসব করার প্রয়োজন নেই। নারীর উপার্জন ক্ষেত্র প্রশস্ত হলে সমাজ একথা আরও ভাল করে বুঝবে। তার জন্য মনোভাবের পরি-বর্তন দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজন।

—"আপনার নিজের জীবনে পুত্র কন্যা-দের বা স্বামীর আপনার কর্মজীবন সম্বন্ধে মনোভাব কি? তারা আপনার দূরে প্রবাসকে কি ভাবে নেন?"

—"রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল আমাকে কর্মভার গ্রহণ করতে বললেন, আমি না বলতে পারিনি। সারা জীবন নারী প্রগতির জন্য কাজ করে, শেষে যেদিন এমন পরম সুযোগ এল সেদিন আমি আগ্রহে পদটি বরণ করলাম। আর আমার পরিবার? তারা সবাই আমার মত নারীর সাম্যে বিশ্বাসী। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে ডাক্তার হয়েছে। বিয়ে করেছে একটি ডাক্তারকে। একেবারে সব দিকের সাম্যের প্রতীক তারা।"

"কলকাতায় চলুন। দেখবেন ভারত-বর্ষের আর একটি অঞ্চল।"

—"এবারে যে সময় নেই। পরের বারে যাবো। গত বছরে শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে-ছিলাম। শ্রীলংকাতেও মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এজন্য ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কা আমার খুব ভাল লাগে। আশ্চর্যের কথা যে উন্নতির পথযাত্রী দেশ অর্থাৎ developing countries-এ নারী জাগরণ সহজে এসেছে। তথাকথিত ধনী ও উন্নত দেশ তিল তিল করে যে স্বীকৃতি সম্ভব করতে পারেনি, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে তা এসেছে অনায়াসে। চট্ করে।"

হোটেলের স্নান করার ছোট্ট পুকুরের পাশে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে কত গল্প হলো। কোথায় বা পাঁচ মিনিটের কথা। ঘণ্টা দুই কেটে গেল। ঐ পুকুরেরই নীলাভ জলের মত তাঁর চোখ চক চক্ করে উঠলো নারীর ভবিষ্যতের আলোচনা করতে। উঠবার আগে শেষ কথাটি আবার বললেন। বললেন, "ভারতবর্ষের নারী মহিলা বর্ষ প্রচুর কর্মশক্তি দিয়ে আরম্ভ করেছেন। এ শক্তির সার্থক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা আগে দরকার। কেরলায় নিরক্ষরতা কম বলে সেখানে পরিবার পরিকল্পনা বেশী কৃতকার্য হয়েছে।"

দেখলাম মহিলা উচ্চ পদাধিকার মাত্র করেন নি। সুদূর ভারত সম্বন্ধে পর্যন্ত খুঁটিনাটি খবর রাখেন অনেক।

শ্রীমতী

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

খুব ভোরবেলা। এখনো আকাশে ঝিলমিল করছে নক্ষত্র। পুবের দিকে আকাশটা একটু ফিকে ফিরোজা। ভুতুড়ে সব গাছের ছায়া। ভোর ভোর বেলায় এখন একটু জুড়িয়ে যাওয়া মিঠে ভাব চারদিকে। বহেরুর খামার ছেড়ে ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেলছেন আলের ওপর। এ রাস্তাটা ভাল নয়, তবু অনেক তাড়াতাড়ি হয় ইস্টিশন। কলকাতামুখো প্রথম গাড়িটা এতক্ষণে বর্ধমান ছেড়েছে। ঘুর পথে বড় রাস্তায় গেলে ধরা যাবে না।

পিছনে বহেরু দাঁড়িয়ে। উঁচু বাঁধের মতো ঢিবি, খামারের শেষ সীমানা। তার ওপর আলিসান ছায়ামূর্তি। আজকাল বড় সন্দেহের বাতিক। কাল থেকে ব্রজগোপালকে পাখি পড়া করে বলছে—চলে যাবেন না ঠাকুর, আসবেন কিন্তু।

চলে যাওয়ার কি তা ব্রজগোপাল বোঝেন না। চলে তিনি যাবেন কোথায়? কিন্তু বহেরুর ঐ এক ভয় ঢুকেছে আজকাল। কর্তা বুঝি বউ-ছেলে সংসারের টানে এইটা ভাঁইেন বুঝি আবার উড়িয়ে যান। পাগুলে কথা সব। গেলেই কি আটকাতে পারে বহেরু? পারে না, তবু কাঙাল ভিখিরির মতো কেবলই হাত কচলে ঐ কথা পাড়ে। ব্রজগোপাল বিরক্ত হন। তোর সঙ্গে আমার গূঢ় সম্পর্কটা কি, না কি দসখৎ লিখে দেওয়া আছে! আবার ফেলতেও পারেন না বহেরুকে। কদিন আগেই এ সংসারে ও ছিল কর্তাব্যক্তি হাঁক ডাকে চারদিক কাঁপত। কিন্তু বয়সে পায় মানুষকে, ভোগে পায়, গাছগাছালির পোকামাকড়ের মতো কর্মফলেরা এসে কুট কুট করে খায়। সেই ক্ষয় ধরেছে বহেরুকে। আমান মানুষটা তখনো খাড়া হয়ে দাঁড়ালে দশাসই, কিন্তু তার আগুনটা নিভে গেছে। ছেলেরা শকুনের মতো নজর রাখছে। কদিন বাদে গন্ধ বিশ্বসে বহেরুতে তফাৎ থাকবে না।

টর্চ বাতিটা একবার ঘুরিয়ে ফেললেন ব্রজগোপাল। বহেরু এখনো দাঁড়িয়ে। একা। একটু কি যেন বুকে বেঁধে। ওবেলাই ফিরে আসবেন তবু মনে হয় এই যে যাচ্ছেন, আর হয়তো ফিরবেন না।

পরশু চিঠিটা এসেছে। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। ভিত পুজোও সারা। তবু কাজ আটকে আছে। ননীবালা লিখেছেন—তুমি একবার এসো। রণোর বড় শরীর খারাপ। মাথাটার একটু গণ্ডগোল হয়েছে বুঝি। আমার মন ভাল নেই।

এমন কিছু একটা আন্দাজ করেই এসেছিলেন ব্রজগোপাল সেবার। মাঝখানে বহুকাল যাওয়া হয়নি। জোর একটা বর্ষা গেল। চারধারে চাষের উৎসব লেগে গিয়েছিল। সে উৎসব ছেড়ে কোথায় যাবেন?

ফ্যাকাসে আয়নার মতো জল জমা ক্ষেত পড়ে আছে চিত হয়ে। তাতে চিকচিকে অঙ্কুর। পায়ের নীচে আঠালো জমি, কাদা, জল। দুর্গম রাস্তা। ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেলে হাঁটেন। উঁচুতে তোলা কাপড়, পায়ে রবারের জুতো, বগলে ছাতা। চারদিকে ঘাস, ফসল, জমির একটা নিবিড় উপস্থিতি। কাছেই হাতের নাগালে তারাভরা আকাশ। অন্ধকারে, বাতাসের স্পর্শ মায়ের হাতখানার মতো। গম্ভীর মায়া মাখানো এই বিশালতা। মনের মধ্যে একটা প্রণাম তৈরী হয়ে যায় আপনা থেকেই। বুড়ো বামুনের গায়ের গন্ধ যেন চারদিকে ছড়ানো। আয়ুর বেলা ফুরিয়ে এল। টের পান, অলক্ষ্যে বৈতরণীর কুলকুল শব্দ ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। যত এগিয়ে আসে শব্দ, তত মায়া বাড়ে। তবু সেই আবছায়া নদীর শব্দ আসে, আসে। আর ততই মনে হয়, লতানে গাছ যেমন আঁকুশী দিয়ে যা পায় আঁকড়ে ধরে, তেমনি এই শরীর পৃথিবীর মাটি বাতাসে আবহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে আঁকুশী। বাপ-পিতেমোর কাছ থেকে পাওয়া প্রাণ, এই ব্যস্ত জীবন, এ ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে করে?

হাঁটতে হাঁটতে পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে এল। নিবে যাচ্ছে নক্ষত্রেরা। বেলদার বাজারের কাছে ব্রজগোপাল টিউবওয়েলে জুতোজোড়া আর কাদা মাখা পা দুখানা ধুয়ে নেন। চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে ভোরেই, দিন মজুর আর কামিনরা বসে ধোঁয়াটে চা খাচ্ছে, সঙ্গে সস্তা বিস্কুট। আসাম-চায়ের কড়া লিকারের গন্ধে জায়গাটা ম' ম' করে। মানুষজনের দিকে একটু,

চেয়ে থাকেন ব্রজগোপাল। বুকের মধ্যে বড় মায়া। মানুষেরা সব বেঁচে থাক।

অফিসের ভীড় শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। বাসটাও ফাঁকা রাস্তায় চল্লিশ মিনিটে ঢাকুরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সংকুচিত ব্রজগোপাল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। একটু সকাল সকালই এসেছেন ইচ্ছে করে। বেলায় এলে দুই ছেলেকে পাওয়া যায় না।

দরজা খুলল বীণা। দেখে খুশী হল না বিরক্ত হল তা বোঝা গেল না। চেহারাটা কিছু রোগা হয়ে গেছে, হনুর হাড় উঁচু হয়ে আছে শ্রীহীনভাবে। মুখে হাসি ছিল না। একটু তাকিয়ে রইল, যেন চিনতে পারছে না। তারপর সরে গিয়ে বলল—আসুন।

ঘরে ঢুকতেই এক বদ্ধ চাপা ভাপসা ভাব। বাসি ঘরদোরের গন্ধ। পরিষ্কার দেখতে পান পর্দার ফাঁক দিয়ে এখনো বিছানায় মশারি ফেলা। সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি। ঠিকে ঝিয়ের বাসনমাজার শব্দ আসছে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় সব। খারাপ অভ্যাস।

সোফার ওপর একটু হেলান দিয়ে বসলেন। কলকাতার এইসব বাক্স-বাড়িতে এরা দিনের পর দিন কি করে থাকে তা আজকাল ভাবতে বড় অবাক লাগে। এ শহরে যারা আছে, ব্যাপারি-ফড়ে-দালাল তারা চিবিয়ে চিবিয়ে রস নিংড়ে নিচ্ছে অহরহ। পড়ে আছে একটা ছিবড়ে শহর। কলকাতার প্রতি মানুষের মোহ আছে, মায়া নেই। মায়া জন্মায় বড় অদ্ভুতভাবে। যেখানে জনপদে মানুষ চাষ করে, গাছ লাগায়, গৃহপালিত পশু পাখিকে ভুক্তাবশিষ্ট দেয়, যেখানে মাটির সঙ্গে সহজ যোগ, মায়া সেখানে জন্মায়।

ব্রজগোপাল বললেন—কেউ ওঠেনি এখনো?

বীণা বলে—মা উঠেছেন। জপ করতে বসলেন এইমাত্র। আর কেউ ওঠেনি, মোটে তো সাতটা বাজে।

গোবিন্দপুরে সকাল সাতটা মানে অনেক বেলা। ব্রজগোপাল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—রণো?

—ওঠেনি। ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। নিজে থেকে না উঠলে ডাক্তার ডাকতে বারণ করেছে।

—হয়েছে কি?

বীণার ভিতরের রাগ আর ক্ষোভ চাপা ছিল। হঠাৎ যেন এই প্রশ্নে সেটা আগুনের মতো উসকে উঠল। একটু চাপা গলায় বলল —হবে আর কি! বংশের রোগ।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হল। মেয়েটা বলে কি? বংশের রোগ! তাদের বংশে কারো কোনো মানসিক রোগ ছিল বলে

তিনি [illegible] রণোকেই [illegible] ভারপ্রাপ্ত [illegible] দেখা [illegible] ছেলেবেলার [illegible] পর। বীণার দরে [illegible] অন্যমনস্ক ব্রজগোপাল [illegible] —বংশের রোগ। সে কী রকম?

বীণা উত্তর দিল না। বাথরুমের দরজায় [illegible] দিল—কতদিন বলেছি নকালবেলায় বাথরুম বেশীক্ষণ আটকে রাখবে না।

ব্রজগোপাল অসহায়ভাবে একা বসে থাকেন। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেবল ছোটো নাতিটা বোধ হয় এইমাত্র উঠে 'মা' বলে কাঁদছে। বীণা পলকে দৌড়ে গেল। ব্রজগোপাল শুনলেন গুমুর গুমুর দুটো তিনটে কিল ছেলের পিঠে বসিয়ে বীণা বলল—কত দিন বলেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁদবে না। কোন্ মা মরা ছেলে যে কাঁদতে বসেছো? বাবা ঘুমোচ্ছে দেখছো না! ছেলেটা ভয়ে চুপ করে গেল।

ব্রজগোপাল শুনলেন। কিছু করার বা বলার নেই। চুপচাপ বসে থাকা। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের সময়ের অনুসারে একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। এতটা সকালে না এলেই হত। বংশের রোগ। কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারেন না তিনি। বউটা এ কথা বলল কেন? তাদের বংশে কার ঐ রোগ ছিল?

বসে বসে ভাবছিলেন ব্রজগোপাল। বড় ছেলের ঘর থেকে একটা কোঁকানির শব্দ এল। বিকট 'উফ' করে কে যেন পাশ ফেরে। বোধ হয় রণোই। বীণা চাপা স্বরে বলে—উঠছো কেন? শুয়ে থাকো?

রণোর গলার স্বর পাওয়া গেল—উঠবো না! কটা বাজে?

গলার স্বরটাই অন্যরকম। কেমন অবাকভাব, শিশুর মতো। ব্রজগোপাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন।

বীণা বলে—বেশী বাজেনি। আর একটু ঘুমোও।

রণো বলল—ঘুম হবে না। বাথরুমে যাবো।

বীণা ধমক দিয়ে বলে—আঃ। এখন উঠবে না।

আবার একটা কঁকিয়ে ওঠার শব্দ পান ব্রজগোপাল, তখন ব্রজগোপাল একটু কাশলেন। ইঙ্গিতবহ কাশি। রণো যদি শুনতে পায়, ঠিক বুঝবে যে বাবা এসেছে।

রণেন শুনল। জিজ্ঞেস করল—বাইরের ঘরে কে?

বীণা চাপা স্বরে কী যেন বলে।

রণোর স্বর শোনা যায়—বলোনি কেন এতক্ষণ?

একটা বড় শরীর বিছানা থেকে উঠল, শব্দ পেলেন ব্রজগোপাল। পর মুহূর্তেই [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] —বাবা!

ব্রজগোপালের এ বয়সে [illegible] একটু [illegible] স্বাভাবিক। হঠাৎ যেন বা [illegible] ব্রজগোপাল [illegible] সেই ছোট রণোকে দেখতে পান। যেভাবে শিশু পুত্রের দিকে হাত বাড়ায় বাপ তেমনি হাত বাড়িয়ে বললেন—আয়।

রণেন দৌড়ে এল না। কিন্তু এক পা দু'পা করে কাছটিতে এসে পাশে বসল। ব্রজগোপালের মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রবল উৎকণ্ঠাভরে বলল—কেমন আছো?

এটা নিছকমাত্র কুশল প্রশ্ন নয়, এর মধ্যে যেন বা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন [illegible] আছে। ব্রজগোপাল [illegible] আলতো হাত রেখে বললেন—বাপকু সোনা, কেমন আছো বাবা?

বাপকু সোনা [illegible] বেলায় ডাকতেন [illegible] অব্যবহারে নামটা ভুলে গিয়েছিলেন। এক্ষুনি মনে পড়ল।

রণেনের ঠোঁট দুখানা একটু কাঁপে। পরমুহূর্তে দুহাতের পাতায় মুখ ঢেকে মাথা নাড়ে প্রবলভাবে। অর্থাৎ ভাল নেই।

[illegible] বাবার [illegible] আমি তোমার কাছে যাব।

[illegible] হঠাৎ সে একটু [illegible] গেছে।

ব্রজগোপাল ছেলের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন—তোমারই সংসার আটকে কেন থাকবে? ওসব বাজে কেউ আটকে রাখেনি।

বীণা [illegible] করে এ ঘরে এক দু'পাটি [illegible] দেখে বলল—বাথরুমে [illegible] গেছে। যাও।

রণেন মুখ তুলে বীণার দিকে তাকাল [illegible] ভয়। বলল—যাই।

—যাও। ব্রজগোপালও বললেন। হাত ধরে তুলে দিলেন ছেলেকে। বাথরুমের দিকে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলেন রণেন খুব ধীরে থপ থপ করে হেঁটে যাচ্ছিল, গায়ে যেন জোরবল নেই। প্রকাণ্ড শরীরের ভার যেন টানতে পারছে না।

কাল রাতে সোমেন যখন এল তখন তার সঙ্গে চুলদাড়িওলা রোগা এক সাহেব

বুগড়ায় মুলেজোরায় অনেক সাহেব দেখেছেন ননীবালা। কী সুন্দর সাজপোশাক, কেমন ঝলমলে চেহারা। কিন্তু এ কী একটা সাহেবকে ধরে এনেছে সোমেন? রোগা, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, সারা গায়ে ধুলোময়লা, চোখে মুখে ভীতু-ভীতু ভাব।

এসেই বলল—মা, আজ রাত্রে ম্যাক্স আমার কাছে থাকবে।

শুনে কপালে চোখ তুলেছিলেন ননীবালা। সাহেব মানুষরা বাংলা টাংলা বোঝে না, তাই তার সামনেই ননীবালা বলে ফেলেছিলেন—ও মা! সে কিরে, ওরা খৃস্টান...

সোমেন গলা নামিয়ে বলে—ও কিন্তু বাংলা জানে।

ননীবালা সামলে গেছেন। কিন্তু ছেলের [illegible] অবাক। হিন্দু বাড়ির অন্দর-মহলে কেউ সাহেবসুবো ধরে আনে? [illegible] না হলেও [illegible] নিলেন, [illegible] তেমন, [illegible] [illegible] খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন নেই, দুবেলা দুটো ডাল ভাত কি একটু মাছের ঝোল মাত্র রান্না হয়। এ দিয়ে কি অতিথিকে খাওয়ানো যায়! বীণাও খুশী হয়নি সাহেব দেখে। কেবল নাতি-নাতনীরা ঘুরে ঘুরে ফিরে সাহেব দেখছিল।

সাহেব হলেও ছেলেটা ভালই। এ বাড়ির কেউ যে তাকে দেখে খুশী হয়নি তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় বাইরের ঘরে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। চোখে মুখে ভারী ভালো-মানুষী আর ভয় মাখানো। মা-বাবা ছেড়ে কত দূরে পড়তে এসেছে। দেখেশুনে বুকের ভিতরটা আহা করে উঠল ননীবালার।

রান্নাঘরে ঢোকে আর ঢোকামনি ননীবালা, বাইরের ঘরেই সোমেনের পাশে ঠাঁই করে খেতে দিলেন। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বেশ খেল। ঝিঙে পোস্ত, মুগের ডাল আর ট্যাংরার ঝোল। কোনো আপত্তি করল না। মাঝে মাঝে নীল রঙের চোখটা যখন তুলে তাকাচ্ছিল তখনই টের পাওয়া যাচ্ছিল যে বাঙালী ঘরের ছেলে নয়, নইলে তাবৎ ভাব বাঙালীর মতো। এতক্ষণ কথা বলেনি, বোবার মতো চুপ করে ছিল। খেতে বসে প্রথম কথা বলল—মা, ঝিঙে পোস্ত খুব ভাল হয়েছে।

মা! ননীবালা বড় অবাক। সাহেব ছেলেটা তাকে মা বলে ডাকছে! ননীবালা বিস্ময়টা সামলে নিয়ে বলেন—মা বলে ডাকছো বাবা? কার কাছে শিখলে—

ছেলেটা হেসে বলল—এখানে সবাই ডাকে। মেয়ে মাত্রই মা। আমার দেশে এরকম ডাকে না। আমি এ দেশে শিখেছি।

ননীবালা নিবিষ্টভাবে রোগা ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকেন। ছেলেটা চেহারার যত্ন করে না, চুলদাড়িতে কেমন জঙ্গল হয়ে আছে মুখ। একটু যত্ন করলে গোপালের মতো চেহারাখানা চোখ জুড়িয়ে দিত।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—মা বলে ডেকোনা বাবা, তাহলে ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে। বলে একটু চুপ করে থেকে বলেন—মা হওয়ার জ্বালাই কি কম! সামনের জন্মে ছেলে হয়ে জন্মাবো, তাহলে আর মা হতে হবে না।

ছেলেটা চোখ তুলে বলে—আবার জন্ম হবে? ঠিক জানেন?

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—জন্মাবো না? কর্মফল যতদিন না কাটে—

ম্যাক্স দুঃখিতভাবে বলে—আমরা খৃস্টানরা জন্মাই না, আমরা মাটির নীচে শুয়ে থাকি, টিল দ্য ডে অব জাজমেণ্ট।

ননীবালা ফাঁপরে পড়ে বললেন—সাহেবরা জন্মায় না! তাহলে এত সাহেব জন্মাচ্ছে কোথা থেকে বাবা?

সোমেন বেদম হাসতে গিয়ে বিষম খেল। সঙ্গে বীণাও। ননীবালা বিরক্ত হয়ে বলেন—ওতে হাসার কি! সাহেবরা হয়তো জন্মায় না, কিন্তু আমরা হিন্দুরা ঠিক জন্মাই।

এইভাবে ছেলেটার সঙ্গে দিব্যি আলাপ সালাপ হয়ে গেল। সাহেব হয়ে নেই-আঁকড়ে ভাব। দু চোখে সব সময়ে কী যেন খুঁজছে, কী যেন দেখছে। সোমেন রণেন যেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাওয়া সবজান্তা ভাব, চোখের আলো নিবে যাওয়া রকম, ও তেমন নয়। ওর মনের কোনো আলিস্যি নেই।

ননীবালা নিজের বিছানায় সোমেনকে শুতে দিলেন, সোমেনের বিছানায় ম্যাক্স। ওরা নাকি রাত জেগে গল্প করবে। ননীবালা তাই বাইরের ঘরের সোফা কাম-বেড-এ বিছানা পেতে নিলেন। সোফা-কাম-বেড-এ বড় অস্বস্তি, মাঝখানের দাঁড়াটা বড় পিঠে লাগে। এক কাৎ-এ শুয়েছিলেন, হঠাৎ মাঝরাতে দেখেন, আধো অন্ধকারে রণেন অণ্ডারপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় রেডিওর সামনে বসে। আস্তে রেডিও ছেড়ে গান শুনছে। ঐরকমই সব করে আজকাল। উঠে বসে ছেলেকে ডাকলেন। সাড়া দিল না। থাক শুনুক। কিন্তু ননীবালার আর ঘুম হল না।

ননীবালার জপ সারতে একটু সময় লাগে। জপ করতে করতেই সংসারের নানান শব্দের দিকে কান রাখেন। রাখতে হয়। আজও শব্দ পেলেন। মানুষটা এসেছে। জপ তাই জমল না। সময়টা পার করে দিয়ে উঠেই প্রথমে ছোটো ছেলেটাকে ঠেলে তুলে দিলেন—ওঠ, ওঠ, তোদের বাপ এসেছে।

সোমেন উঠল। বসে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই আর অ্যাশ-ট্রে সরিয়ে চৌকির তলায় ঠেলে দিতে দিতে বলল—এ ঘরে উঁকি দেয়নি তো।

ননীবালা লক্ষ্য করে বললেন—দিলেই কি। বয়সের ছেলে, বিড়িটা সিগারেটটা তো খাবেই। ওতে লজ্জার কি! বালিশ বিছানাটা বরং তুলে ফেল তাড়াতাড়ি, বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো উনি পছন্দ করেন না।

এইটুকু বলে ননীবালা এ ঘরে এলেন। মুখ টুখ ধুয়ে রণেন এসে আবার বাপের কাছে বসেছে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গী। ব্রজগোপালের চোখমুখের ভাব কিছু দৃঢ়, কঠিন। একটু চাপা, তীব্র স্বরে বলছেন বলো, আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, কাম-লোভ-জিৎ বশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অস্তি-বৃদ্ধি-যাজন-জৈত্র পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত শক্তি-সংবৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর, অমর, আমার গ্রহণ কর, আমার প্রণাম লও।

রণেন বলল। ব্রজগোপাল আবার বলালেন। আবার রণেন বলল, ব্রজগোপাল ছেলের দিকে তীব্র চোখ চেয়ে বলেন— কথা-গুলো মনের মধ্যে গেঁথে নাও। রোজ সকালে নিজেকেই নিজ বলবে। সারাদিন বলবে। বলতে বলতে ওর একটা পলি পড়ে যাবে মনের ওপর। বুঝেছো?

রণেন মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ননীবালা স্বামীর দিকে চেয়ে ছিলেন। সেই পাগল। চোখে চোখ পড়তেই বললেন—ওটা শেখাচ্ছো ওকে?

ব্রজগোপাল স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু যেন সামলে গেলেন। দীপ্তিটা চোখ থেকে নিবে গেল। বললেন—ও হচ্ছে অটো সাজেশ্যান। স্বতঃ অনুজ্ঞা। যখন মানুষের কেউ থাকে না তখন এই অনুজ্ঞা থাকে। এই চালিয়ে নেয় মানুষকে।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—ওর কে নেই? আমরা ওকে বুক বুক করে রাখি।

ব্রজগোপাল এক লহমায় উত্তর দিলেন না। একটু ভেবে চিন্তে বললেন—আছে। সবাই আছে।

—তবে?

—তবু কেউ নেই।

কথাটা ঠিক বুঝলেন না ননীবালা। তবু ইঙ্গিতটা ধরে নিলেন। এই সকালে ঝগড়া করতে ইচ্ছে যায় না। নইলে কটা কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এখন, বলা যেত। বলা যে যায় না তার আরো কারণ আছে। জমিটা কিনেও অনেক টাকা বেঁচে গেছে ননীবালার। বাড়ির ভিতটা উঠে যাবে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ননীবালা অবাক হয়ে দেখেন, সাড়াশব্দে কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছে সাহেব ছেলেটা। কোনো সংকোচ নেই, বেশ ব্রজগোপালের পাশটিতে বসেছে। ব্রজগোপাল তাকে অটো সাজেশান শেখাচ্ছেন।

বীণার সঙ্গে ননীবালার একটা জায়গায় বড় মিল। ননীবালা জানেন যে এ হচ্ছে পাগলের বংশ। বংশের ধাত অনুযায়ী কম-বেশী পাগলামী এদের সবার। স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁর এই কথাটা আজ আবার মনে হল।

মাঝরাতেই ঠিক একবার ঘুম ভেঙে যায় ব্রজগোপালের। 'ঝিঁঝিঁ' ডাকছে। চোরের পায়ের মতো হালকা পায়ে কে হেঁটে যায়, ব্রজগোপাল জানেন, শেয়াল। ঘুম ভাঙলেই মনের বিষন্নতা টের পান। ঘুমের মধ্যে কার একটা শ্বাস যেন মুখে এসে লেগেছিল। কেউ নয়। ঘুমের মধ্যে কত কী মনে হয়।

তাঁতী লোকটা আজকাল তাঁতঘরে জায়গা নিয়েছে। এখন এ ঘরে বহেরু শোয়। ঘরে শোয়া কোনোকালে অভ্যাস নেই বহেরুর। শীতকালটা ছাড়া। বড় ভয়ে ধরেছে আজকাল ওকে। কেবলই বলে—কত পাপ করেছি, কতজনার কত সর্বনাশ। কে এসে ঘুমের মধ্যে চুপিয়ে রেখে যায়, কি নলীটা কুচ করে কেটে দেয়, কে জানে!

মেঝের ওপর পোয়ালের গাদিতে চটের গদী, তার ওপর শতরঞ্চী, বালিশ-টালিশ নেই। পড়ে আছে। ছেলেরা বড় হয়েছে, খোকা ছাড়া পেয়ে এসে জুটেছে। বহেরু আর শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। কেবল এই ঘরে এসে ঘুমোয়। তার ভাবখানা—বামুনকর্তা তো সারারাত জেগেই থাকেন। চোখে চোখে রাখবেনখন।

তা ঠিক। ব্রজগোপাল জেগেই থাকেন আজকাল। বড় ঘুমের সময় আসছে। একটা আবছায়া নদী, তার পরপারে দেখা যায় না, ঘোর কুয়াশায় ঢাকা। সেই নদীর শব্দ পান। উঠে বসেন নিঃশব্দে মাঝরাতে। মশারির বাইরে মশাদের বিপুল কীর্তন। নীলদাঁড়াটা সোজা করে বসেন। বীজমন্ত্রের ধারা নেমে উঠে সারা শরীর আর সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে। নাসামূলে ঈষৎ গভীরে তেসরা তিল। সেখানে মরাল দেখা। বুড়ো মানুষের মাভৈঃ মুখ।

ধ্যানের মধ্যেই ব্রজগোপাল হাসেন। হারিয়ে যান।

তবু হারিয়ে যাওয়াও যায় না। সে তো বর্ম নয়।

ক্রমশ

চিত্র প্রদর্শনী

আকাদমি গ্যালারীতে শিল্পী গীতশ্রী রাহা তাঁর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সময়ে আঁকা ৩৬টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন এবং নৃত্য ও সঙ্গীতে সুনাম অর্জন করেন। চিত্রকলার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এবং অবসরকালে তিনি ছবিও আঁকতে শুরু করেন। নিষ্ঠা ও উৎসাহ থাকলে যে এক-দিন ফললাভ করা যায় তা শিল্পীর কয়েকটি ছবি দেখে বোঝা যায়। অবশ্য অধিকাংশ নিদর্শনই শিক্ষার্থীসুলভ—তা সত্ত্বেও কয়েকটি অনেকের চোখে পড়ে। প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি থেকে শুরু করে প্রদর্শনীতে প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত অনেক ছবি দেখা যায়। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরম। অবগুণ্ঠনের জালে ঢাকা যুবতী নারীর মুখের কিয়দংশ সুকৌশলে প্রকাশ করে শিল্পী বক্তব্যটুকু চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। নীল রঙের স্তর মাধ্যমে রচিত অজন্তার প্রতিলিপিও মন্দ লাগেনি। এই প্রসঙ্গে নীল ও সবুজ রঙপ্রধান একাকীও অনেকের চোখে পড়ে। নিসর্গ দৃশ্যাদির মধ্যে প্রশংসনীয় রঙ ব্যবহার রীতির জন্য গ্রামবাংলা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ছবির মধ্যে পটের দুর্গা ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা উল্লেখ্য।

*

আকাদমি গ্যালারীতেই আয়োজিত ভিন্নধর্মী দুটি প্রদর্শনী দেখে অনেকে আনন্দলাভ করেন। শিল্পী সুনীতা তালুকদার আকাদমি পরিচালিত স্টুডিওর ছাত্রী—প্রদর্শনীতে জল রঙ, টেম্পারা ও প্যাস্টেলে আঁকা ২৭টি নিদর্শন দেখা যায়। শিক্ষার্থী হলেও এই শিল্পীর ড্রয়িং ও রঙ ব্যবহার পদ্ধতি প্রশংসা দাবি করে। এই প্রসঙ্গে পাইনট্রিজ-এর নাম করা চলে। ড্রাইব্রাশে আঁকা দীর্ঘাকার তরু-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে শিল্পী যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। দু-একটিতে ভ্যান গগের এক্সপ্রেসানিস্টিক রীতির অনুকরণ ধরা পড়ে, যেমন গ্রেভইয়ার্ড-এ। সুকৌশলে তুলির টানের জন্য দুটি নৌকাকে কেন্দ্র করে রচিত টু ইজ কম্প্যানি অনেকের চোখে পড়ে। তবে রিফ্লেকসান-এর জন্য এই বালিকাশিল্পী কৃতিত্ব দাবি করেন—বিশেষ করে লাল ও বাদামী রং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তব্যটি প্রকাশ করার জন্য। কালিকলমে আঁকা একটি প্রতিকৃতিও মন্দ লাগেনি। অপরপক্ষে, শিল্পী যতীন দাস একটি সুপরিচিত অথচ উপেক্ষিত বিষয়-বস্তু অবলম্বনে ছবি এঁকেছেন। রাস্তায় বা পাড়ায় পাড়ায় সাধারণত যেসব মালিক-বিহীন কুকুর ঘুরে বেড়ায়, শিল্পী তাদেরই বিভিন্ন স্কেচ করেছেন। সব-গুলিই বড় ও ইমপ্রেসানিস্টিক, মনে হয় অতি দ্রুতভাবে আঁকা। তবে দু-চারটি দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী দ্রুত তুলি চালনায় দক্ষ—বিশেষত বলিষ্ঠ কয়েকটি টানের মধ্য দিয়েই শিল্পী একাধিক কুকুরের ঝগড়া-মারামারি, দলবদ্ধভাবে অন্য একটি কুকুরকে তাড়া করা বা দলবদ্ধভাবে আক্রান্ত হয়ে কোনও ভিন্ন অঞ্চলের কুকুরের ভীত আত্মসমর্পণের করুণ মুখভঙ্গী—সব দৃশ্যই শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। সব-চেয়ে বড় কথা, স্থিরচিত্রশিল্পী তাঁর ক্যামেরার ক্লিকের মধ্য দিয়ে যে দৃশ্যটি ধরে ফেলেন এই অপরিচিত শিল্পী তাঁর অনুসন্ধানী চোখ ও তুলির দু-চারটি বলিষ্ঠ টানের মধ্য দিয়েই সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তটি রূপায়িত করেছেন। এই শিল্পীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আশা করি ভবিষ্যতে, শিল্পী জীবনের চলমান পথের অন্যান্য স্কেচ দেখার সুযোগ দেবেন।

*

আলিয়ঁস ফ্রাঁসে গ্যালারীতে শিল্পী অঞ্জু চৌধুরী দুক্রেন তাঁর একটি গ্রাফিক প্রিন্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জাতীয় প্রিন্টের ২৯টি নিদর্শন দেখা যায়। কয়েক বছর আগে যাঁরা এই

ফর্মস, আর্থ —অঞ্জু চৌধুরী দুক্রেন
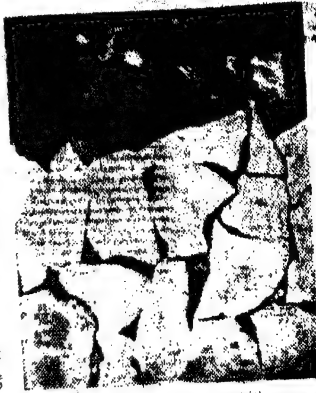
তরুণী শিল্পীর ছবি দেখেছেন তাঁরা তাঁর সাম্প্রতিক নিদর্শন দেখে খুশী হবেন। বিশেষত প্রায় প্রত্যেকটি প্রিন্টেই ইনট্যাগ্লিওর আধুনিকতম প্রয়োগ পদ্ধতি, খোদাই রীতি ও সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহার প্রণালী ধরা পড়ে। লক্ষণীয় এই যে, বিদেশে শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও শিল্পী নিছক বিমূর্ত রচনা করেননি, কয়েকটিতে আকার প্রাধান্যও চোখে পড়ে। যেমন ফর্মস, আর্থ-এ। শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। সবচেয়ে বড় কথা, নানা রঙ হাল্কাভাবে ব্যবহার করেও যে রসসৃষ্টি করা যায় শিল্পী তা প্রমাণ করেছেন, যেমন লে প্যাম্পস এঁ অতমে—হলুদ লাল ও সবুজ রঙের মোটিফ জাতীয় ছোট ছোট আকার দ্রষ্টব্য। খোদাই পদ্ধতি ও একই রঙের তারতম্য ব্যাখ্যার জন্য ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন কনট্রাস্ট অনেকের চোখে পড়ে। দু-একটি প্রিন্টে যেন আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য

—জোফিন মুছালা

ফুটে উঠেছে, যেমন ১৫ নংটি। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে চাপা সবুজ রঙে প্রকাশিত [illegible] আন্ডারপ্লো, গভীর [illegible] বুকে অতি সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ [illegible] প্রজ্বলিত লাইট ও লাল রঙ-[illegible] ছোট্ট উল্লেখ্য।

*

বর্তমান যুগের সামাজিক জীবনে যেন মানুষের পারস্পরিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ আজ যে কোনও কারণেই হোক, আত্মীয়-স্বজন তথা সমাজের অন্যান্য লোকের সঙ্গেও যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুক বজায় রাখতে পারছে না—এক কথায় জীবন যেন আজ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, সামাজিক জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যেন কেমন সম্পর্ক-বিহীন বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। U S I S কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাঁদের গ্যালারীতে আয়োজিত একটি একক প্রদর্শনীতে শিল্পী জোফিন মুছালা সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছেন। রচনাবলীর মধ্য দিয়ে শিল্পীর চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। শিল্পীর ছবি পরিচ্ছন্ন, ড্রয়িং বলিষ্ঠ। অঙ্কনরীতিতে সাররিয়ালিজম-এর প্রভাব ধরা পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পী ইংগিত ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। এই প্রসংগে প্রথমেই দি লস্ট উইংস-এর নাম করা যায়। সম্ভবত প্রতীকের মধ্য দিয়েই তিনি সমকালীন জীবনের বিচ্ছিন্নতার আভাস দিয়েছেন। প্রতীকপ্রধান ছাইরঙ ভিত্তিক হাইটও অনেকের চোখে পড়ে। সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ

রেখা ও কারুকার্যের জন্য শিল্পীর ড্রয়িং নিদর্শনের [illegible] পড়ে, যেমন ১৫নং।

*

পাঁচ বছর আগে কলকাতায় মার্কেট স্কোয়ারে যখন চারুকলা মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয় তখন অনেকেই এটিকে শিল্পীবৃন্দের খেয়াল বলে অভিহিত করেছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আয়োজিত এবারের মেলায় যাঁরাই গেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে খেয়াল তো নয়ই, উপরন্তু এই চারুকলা মেলার মাধ্যমে তরুণ শিল্পী-উদ্যোক্তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে—অর্থাৎ চিত্রকলার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ আজ অনেক সচেতন হয়েছেন। এবারকার মেলায় পরিচিত-অপরিচিত ১৫০ জন শিল্পীর ১৫০টি বিভিন্ন শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। শুধু তাই নয়, পটচিত্র ও ভাস্কর্য নিদর্শন
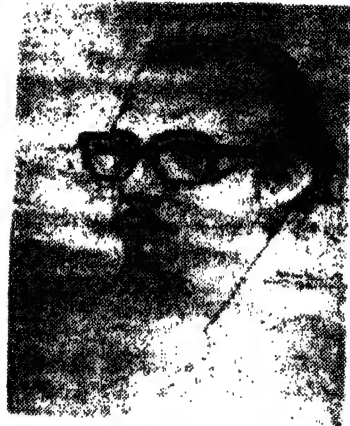
মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে চারুকলা মেলায় শিক্ষার্থী-শিল্পীর আঁকা জনৈক দর্শকের প্রতিকৃতি

সমেত ৫০টি ছবি মেলায় বিক্রী হয়। মেদিনীপুরের হবেন চিত্রকরের প্রাচীন পটচিত্র ছিল একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই শিল্পীর পূর্বপুরুষগণ রচিত ২০০ বছরের পুরানো রামলীলা পটচিত্রটি দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। প্রতিদিনই, বিশেষত ছুটির দিনে উন্মুক্ত মেলাপ্রাংগন দর্শক সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে ও দেশী-বিদেশী অনেক দর্শকই মাত্র ৫ ও ১০ টাকার বিনিময়ে ১২ জন শিক্ষার্থী শিল্পীর দ্বারা ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে পেনসিল ও প্যাস্টেলে আপন আপন প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেন। বস্তুত, এবারে দর্শকদের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেবার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। চিত্রকলার প্রসার বিষয়ে জন-

মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে চারুকলা মেলায় শিক্ষার্থী-শিল্পীর আঁকা জনৈক শিল্পীর প্রতিকৃতি

সাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাগণ নিয়মিত আলোচনাচক্রেরও ব্যবস্থা করেন। পিকাসোর শিল্পকলা বিষয়েও আলোচনা হয় এবং অহিভূষণ মালিক ও লেখক যথাক্রমে চারুকলা মেলার উদ্দেশ্য ও সমকালীন ছবি ও বিক্রয়-সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া আত্মপ্রকাশ ও কবিসেনা গোষ্ঠীর উদ্যোগে কবি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। শুধু তাই নয়, অনেক শিল্পী পরিবেশিত চা-মিষ্টান্ন খেয়ে সকলেই খুশী হন এবং আত্মপ্রকাশ ও কবিসেনা গোষ্ঠী পরিচালিত বইয়ের স্টলে সাহিত্য ও চিত্রকলাবিষয়ক অনেক বইও বিক্রী হয়। আর একটি আকর্ষণ ছিল ২২ পল্লী শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কয়েকজন শিশু শিল্পীর নির্বাচিত রঙবাহার ছবি। এবারে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম—সকলেই আপন আপন প্রতিকৃতি আঁকাতে বিশেষ আগ্রহী। শিল্পীবৃন্দ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে শহরের মধ্যভাগে যদি একটি ছোট স্টুডিও স্থাপন করে নিয়মিতভাবে স্বল্প মূল্যে প্রতিকৃতি আঁকার ব্যবস্থা করেন তাহলে শুধু যে লুপ্তপ্রায় প্রতিকৃতিশিল্প আবার জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা নয়, উপরন্তু দেশের শিল্পীবৃন্দও নিয়মিত অর্থ উপার্জনের একটি স্থায়ী পথের সন্ধান পাবেন। আরও একটি কথা। উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন একই স্থানে মাত্র একবারের পরিবর্তে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও বছরে অন্তত দুবার এই চারু-কলা মেলার আয়োজন করেন। জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁরা যে অভাবনীয় সাড়া ও সহযোগিতা পাবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

চিত্রপ্রিয়

বাণী, সুর, এমন কি গায়কও অভিন্ন ব্যক্তি। চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী নানা পর্যায়ের বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তারা, রামপ্রসাদ, কালী মির্জা, নিধুবাবু, কমলাকান্ত, শ্রীধর কথক, প্রভৃতির পর রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, হালফিল নজরুল পর্যন্ত এই ধারা ও রীতি কখনো বয়সের কারণে কখনো অবস্থা বিশেষে তাঁরা স্বয়ং গান না করলেও রচনাকার ও সুরকার একাধারেই ছিলেন। রবীন্দ্র রচিত কোন বাণীতে একালের কোন সুরকার সুরযোজনা করলে তা রবীন্দ্রসংগীত রূপে গ্রাহ্য হবে কোন্ যুক্তিতে? আধুনিক কালেই এই অদ্ভুত ও কৃত্রিম শ্রম বিভাগ ঘটেছে—একজন কবিতার মতন কিছু লিখে দিলেন, তাতে সুরারোপ করলেন অপর ব্যক্তি, আর গাইলেন তৃতীয় জন!

প্রভাতকুমারের এ প্রশ্নটি খুব পুরানো—'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানেই কি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুর আরোপিত হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বেশ ক'টি গানের সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া—একথা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের সকলেরই জানা। স্বয়ং কবির 'জীবন স্মৃতি' ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকও তার সাক্ষ্য বর্তমান—'১—চিহ্নিত গানগুলির সুর আমার পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত' (গানের বহি। ১৮৯৩)। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতেও আছে—'আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান রচনা হইত।' রবীন্দ্রনাথের সেই গানগুলি শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে নেই, তাঁর নিজের 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কাল মৃগয়া' প্রভৃতিতেও রূপ নিয়েছে। সে যুগের রবীন্দ্রসঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। একই সাঙ্গীতিক পরিবেশে তাঁরা অন্তরঙ্গ ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ১২ বছরের বয়োকনিষ্ঠ হলেও। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত গানের সুর ও ছক অনুসরণেও আরো রবীন্দ্রসঙ্গীত লক্ষণীয়। যথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হে অন্তরযামী তুমি হে'—রবীন্দ্রনাথ 'এ পরবাসে কে', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সে প্রেম কোথা রে এখন'—রবীন্দ্রনাথের 'গানের ঝর্নাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায়', ইত্যাদি। অবশ্যই সে যুগের এমনি সাময়িক প্রভাবের জন্য বিশাল রবীন্দ্রসঙ্গীত ধারার মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হবার নয়। গঙ্গোত্রী থেকে উৎসারিত যে স্রোত বিপুল প্রসারে সাগর সঙ্গমে প্রবাহিনী, তার যাত্রাপথে বিলীন হয়ে আছে কত জটিনী, নির্ঝরিণী। কিন্তু গঙ্গা আদ্যোপান্ত গঙ্গোদকেরই পুণ্য স্রোতস্বতী।

এখন প্রভাতকুমারের উত্থাপিত আর একটি প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা ও 'গীতাঞ্জলি' কবিতায় কবির নিজেরই সুর সংযোগের কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিছু সংখ্যক কবিতাকে কেন গানে পরিণত করতে চেয়েছেন, তা প্রভাতকুমারের তুল্য যাঁরা দীর্ঘকাল কবিকে নিকট থেকে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছেন, বিশেষ তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে, তাঁদের পক্ষে বোঝা সহজ। এই অনন্যা, লোকোত্তর প্রতিভা নিরন্তর সৃজনশীল বলে তাঁর জীবনে অলস বা বন্ধ্যা সময়ের স্থান ছিল না। যেমন অবনীন্দ্রনাথের—বয়সের ভারে, স্থবিরতায় অঙ্কন বন্ধ হয়ে গেল, লেখাও থেমে এল, তখন আরম্ভ হল ফেলা-ছড়া জিনিসপত্র থেকে তাঁর এক রকমের শিল্প-সৃষ্টি : কাটাম কুটুম। অবনীন্দ্রনাথের তখনকার কথায় রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের বলতেন, দেখছিস অবনের

আর্টিস্ট মন। থামতে পারছে না। একটা না একটা করছেই।' এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো অনেক বেশি সত্য, যিনি দেহত্যাগের একদিন মাত্র আগে পর্যন্তও ছিলেন সৃজনশীল। সজ্ঞানে অত বড় অস্ত্রোপচার সহ্য করেও, তিরোধানের অন্তিম পর্বে তন্দ্রা-জাগরণের রহস্য লোক থেকেও মুখে মুখে শেষ কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন। সেই অন্তিম ক্ষণের বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর শরীর যখন অনিবার্য ভাবে ভঙ্গুর হতে থাকে, তখনকার যে সব সময়ে অন্য প্রকার সৃষ্টিকর্ম বন্ধ থাকত, তিনি বসতেন আপন কবিতায় সুর যোজনা করতে। কিন্তু তা অনেক সময়ে সার্থক সঙ্গীত হত না। রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি, বাণী ও সুরে অঙ্গাঙ্গী মধু মিলন—তার পরিবর্তে এসব ক্ষেত্রে দেখা যেত শুধু সুরে আবৃত্তি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যময় সৌকুমার্য, সুরের অনবদ্য আবেদন এখানে অনুপস্থিত। স্পষ্ট কথায়, 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ইত্যাদি যথার্থ গান নয়, সুরে আবৃত্তি মাত্র। দুয়ের পার্থক্য বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মমজ্ঞ শ্রোতাদের তা বোঝানোও নিষ্প্রয়োজন। 'কৃষ্ণকলি'-র বিভিন্ন কলিতে সুরের কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও এই সুরাবৃত্ত কবিতাটি কথকতারই সগোত্র। 'কৃষ্ণকলি' সঙ্গীত হলে তাবৎ কথকতাও সঙ্গীত। কিন্তু টানা সুরে আবৃত্তি করা কথকতা গান নয় বলেই গুণী কথকরা আখ্যায়িকার মাঝে মাঝে পৃথক গান শুনিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গীতের আস্বাদ দেন। পূরণ করেন গান শোনবার আকাঙ্ক্ষা। শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মহাশয় চিন্তা করে দেখেননি, গীতধর্মী কবিতা হলেই তাকে সুর সংযোগে গানে উত্তীর্ণ করা যায় না। তাই শেষ প্রশ্ন প্রকাশ করেছেন—'গীতধর্মী যে সব কবিতা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে রয়েছে সেগুলিকে যথাযথ সুরতালাদি প্রয়োগ করে পুরো গানের মর্যাদা সহ গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা?'

যায় না। এবং অন্তর্ভুক্ত করা অন্যায়, অনুচিত। কারণ, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অপর কোন সুরকার এখন নতুন করে তাঁর কোন বাণীতে সুরারোপ করলে তা রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে গণনীয় হবে না এবং সেহেতু গীতবিতানেও স্থান পেতে পারে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ না হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন ঐকান্তিক অনুরাগী রূপে আমার নিবেদন এই যে—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাতে সুর সংযোগ করেননি, তেমন কিছুই আর যেন গীতবিতানের নতুন নতুন সংস্করণে সংযোজনা করা না হয়। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ ও সঙ্গীত ভবন দুয়েরই গুরুতর দায়িত্ব আছে রবীন্দ্র ঐতিহ্য যথাযথ সংরক্ষণের।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৩

বাংলা সাহিত্যে ভোজন বিলাস

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ সংখ্যার 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্রীশৈলেনকুমার দত্তের 'বাংলা সাহিত্যে ভোজনবিলাস' লেখাটিতে একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়লো। 'ওগগৎ ভত্তা রম্ভঅ পত্তা' শীর্ষক পদটি তিনি চর্যাপদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আসলে কিন্তু পদটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থের অন্তর্গত।

কমল গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৮

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি

৪২ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা দেশ-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপরোক্ত শিরোনামায় যে যুক্তিনিষ্ঠ, সময়োচিত প্রসঙ্গ চর্চিত হয়েছে সেটির সূত্র ধরে আমার কয়েকটি বিনীত ভাবনা উপস্থাপিত করতে চাই।

আকাশবাণীর তরফে 'কিছুক্ষণের জন্য' সংস্কৃত ভাষায় প্রাত্যহিক সংবাদ প্রচারে—বলা হয়েছে—কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নাসিকাকুঞ্চন করেছেন। যুক্তি ও'দের এই—ভাষা হিসেবে সংস্কৃত মৃতা।

কেউ-বা আর একটু গলা উঁচিয়ে রাষ্ট্রনীতিক ধুয়ো তুলে বলেছেন—সংস্কৃত ভাষা বস্তুত হিন্দুর ধর্মকর্মের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের ভাষা, অতএব, এক অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়েছেন তাঁরা—সেকুলার রাষ্ট্রে এমন ভাষার প্রশ্রয় দিলে ধর্মনিরপেক্ষতার হানি করা হয় নাকি।

ব্যাপারটা ত্রৈলোক্যনাথের হাসির গল্পকেও ছাড়িয়ে গেল দেখছি!

ভাষাগত ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সভ্যতার চলমান ইতিবৃত্তকে যাঁরা এই সব নির্বোধ, বিকৃত ও হাস্যকর যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে অসম্ভ্রম জানান নিজেদেরই পরম্পরাগত বনিয়াদকে।

সংস্কৃত মৃতা; একথা—সকলের উপ-লব্ধি করা কর্তব্য—প্রথম বলেছিল সাম্রাজ্যবাদী বণিক ইংরেজ। বলেছিল নিজেদের বণিকী ও শাসকীয় স্বার্থ ও সামগ্রিকভাবে ইংগ-সংস্কৃতির সার্বিক বিস্তারের দীর্ঘ ও গভীর পরিকল্পনা মস্তিষ্কে রেখে। সেদিনের চতুর ইংরেজ জেনেছিল, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজিয়ানার অনুপ্রবেশ না ঘটালে দীর্ঘকালীন সাম্রাজ্য-সুখ ব্যাহত হবে, ধ্বসে পড়বে গথিক স্তম্ভের বাহ্যিক, ভাসমান আড়ম্বর। অতএব ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিকে অভ্যন্তর হতে আঘাতে আঘাতে দীর্ণ করো, তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ ইংরেজ-ও ইংরিজি-নির্ভর করে তোলো—এই ছিল তাদের শীতল মস্তিষ্কের হিংস্র পরি-কল্পনা। ধূর্ত ব্রিটন (Briton) টের পেয়েছিল, ভারত-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি পরম্পরা ও ঐতিহ্যগতভাবে যে কেন্দ্রীয় ভাষার উপর দাঁড়িয়ে—সেটি সংস্কৃত। প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী ও ধাত্রী এই সংস্কৃত। ভারতভূমির অধিকাংশ লোকাচার, ধর্মবোধ এবং সেটি আরও বৃহৎ—আত্মশক্তির জাতীয় ঐকতান'—সব ঐ মূলভাষা সংস্কৃতের দ্বারাই গ্রথিত, সিঞ্চিত ও সম্বর্ধিত। তাই ইংরেজ নিজের সাম্রাজ্যবাদী অভী-প্সাকে এই পন্থায় ভাবিত এবং নিজের সর্ব-বিধ শক্তিকে সংস্কৃত ভাষার বিপক্ষে ধাবিত করল। শাসকীয় (administrative), বুদ্ধি বৃত্তিগত (intellectual) ও কূটনৈতিক (diplomatic), সমস্ত সামর্থ্য ও কৌশলকে সংহত করে ইংরিজি ভাষার সৈন্যপত্যে ভারত-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ শুরু হল, মূল লক্ষ্য সংস্কৃত।

এবং এক আশ্চর্য প্রত্যূষে অকস্মাৎ চতুর্দিক হতে সুপরিকল্পিতভাবে রব তোলা হ'ল—কার্যকরী ভাষা হিসেবে, চিন্তার ভাষা হিসেবে সংস্কৃত আর বেঁচে নেই, সে মৃতা।

তারপর 'ঢের দিন কেটে গেল, ঢের অভিজ্ঞতা জীবনে জড়িত হ'য়ে গেল', তবু আজও, স্বরাজ প্রাপ্তির রজত জয়ন্তী বর্ষ পরে, অনেক স্বদেশীয় শ্রীমুখ হতে ইংরেজ শাসকদের শেখানো সেই শয়তানী ও ছিটগ্রস্ত যুক্তিই সংক্রামক হাঁচি কাশির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে শুনি যখন, তখন আর শুধু বিস্ময় বা ক্ষোভ নয়, ক্রোধ ও লজ্জাও জন্ম নেয়।

এবং ভেবে চমৎকৃত হই, যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রণী দেশের মানুষেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বকীয় মনন-ভূমিতে গভীর শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নব নব পদ্ধতির মূল্যায়ন নিয়ে ব্যাপৃত, সেই সময় এই হতভাগ্য স্বদেশেই সংস্কৃত-দ্রৌপদীর বস্ত্র নিয়ে কি বিকৃত টানাটানিই না চলছে! ওদেশী ম্যাক্স-মূলারের বিদেহী সত্তাও হয়তো লজ্জায় নতশির হয়ে উঠছে এদেশের এই নির্বুদ্ধি প্রত্যক্ষ ক'রে।

স্বকীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি উদাসীন আমাদের হৃদ্‌বৃত্তির সুপ্ততা ও শুদ্ধতা আর কবে জাগ্রত হবে?

রাজেন উপাধ্যায়
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

সীতা দেবী

গত ২৫ মাঘ ও ২ ফাল্গুনের দেশ-এ সাহিত্য সংবাদ ও আলোচনা বিভাগে 'সীতা দেবী' শিরোনামায় শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র ও শ্রীমতী শ্যামশ্রী লালের যে দুটি রচনা পর পর ছাপা হয়েছে তাতে তাঁরা, আমি যে ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে প্রবাসীর ভার নিইনি, এমন কি প্রবাসীর কাজে আর যোগই দিইনি, এই তথ্যটি প্রকাশ করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কিন্তু নলিনীবাবুর রচনাটিতে তথ্য সংক্রান্ত কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল, ভুল বলেই সেগুলির সংশোধন প্রয়োজন।

আমার সম্বন্ধে নলিনীবাবু লিখেছেন, "বিবাহের পরেই প্রবাসীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সস্ত্রীক চলে যান তিনি ব্রহ্মদেশে"—এটা ঠিক নয়। বিবাহের পরে নয়, সীতা দেবীর পাণিপ্রার্থী হব স্থির করেই আমি প্রবাসীর কাজে ইস্তফা দিই। বিবাহ স্থির হবার — একলাই ব্রহ্মদেশে চলে যাই এবং সেখানে স্থানসংস্থানের কিছু ব্যবস্থা করে এক বছর পর ফিরে এসে বিবাহ করি। আমার ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনাগুলি নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে না তা জানি, কিন্তু তাদের এই পৌর্বাপর্যের গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি। সেই কারণে, এবং কথাটা উঠেছে বলে, এতখানি লিখতে হল।

এই প্রসঙ্গেই নলিনীবাবু লিখেছেন, "সুধীরবাবুর ব্রহ্মদেশে যাওয়ার আগে এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে আসার পরে" প্রবাসীর ভার বহনের কাজে রামানন্দের "প্রধান সহযোগী ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।" এতেও একটু ভুল আছে। আমি দেশে ফিরে আসি ১৯৩০ সালে, আর চারুবাবু প্রবাসীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে যান তার পাঁচ ছয় বৎসর আগে। কলকাতায় ফিরে এসে তিনিও প্রবাসীর কাজে আর যোগ দেননি।

"সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর যৌথ রচনার প্রসঙ্গে" নলিনীবাবু লিখেছেন, "সংযুক্তা দেবী এই ছদ্মনামেও মাঝে মাঝে এই দুই বোনের রচনা প্রকাশিত হত।" বস্তুত উদ্যানলতা উপন্যাসটি তাঁদের একমাত্র রচনা যা ঐ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ'দের সম্বন্ধে নলিনীবাবু এরপর লিখেছেন, "নিজেদের বাংলা উপন্যাসের দুই ভগ্নীকৃত অনুবাদও একদা প্রকাশিত হয়েছিল।" এটাও ঠিক নয়। শ্রীমতী শান্তা দেবী অনুবাদের কাজে কোনো হাত লাগাননি, তাই তাঁদের কোনো রচনার "দুই ভগ্নীকৃত" অনুবাদও কোনো সময়েই প্রকাশিত হয়নি।

"একদা" কথাটি এই প্রসঙ্গে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাও অত্যন্তই বিভ্রান্তিকর একদা নয়—সুনিয়মিতভাবে না হলে প্রায় সমস্ত জীবন ধরেই সীতা দেবী অবসর সময়ে ইংরেজীতে অনুবাদের কা করে গিয়েছেন। প্রথমে তাঁর সোনার খাঁ উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন একজ ইংরেজ, যেটি Cage of Gold নামে হয়ে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ঐ কাজ তিনি নিজেই করেছেন, অন্যের হাতে ছে দেননি। কেবল জীবনের শেষ ধাপে এ পুণ্যস্মৃতি বইখানি ইংরেজীতে অনু করার ভার দিয়েছিলেন শ্রীমতী শা দেবীর কন্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী লালের উ' তখন লিখতে কষ্ট হত।

সংযুক্তা দেবী ছদ্মনামে দুই বো লেখা উপন্যাস উদ্যানলতা এবং তাঁর নি উপন্যাস পথিক বন্ধু তিনি অনুবাদ ক Garden Creeper এবং The Kn Errant নাম দিয়ে। এ দুটিই গ্রন্থা প্রকাশিত হয়। দুই বোনের লেখা ক গল্পের সীতা দেবীর করা অ

Tales of Bengal নামে Humphry Milford-এর Eastern Series-এর প্রথম বই হয়ে বেরিয়েছিল। এগুলি তাঁর বিবাহের আগেকার কথা। বিবাহের পর তিনি বহু বৎসর ধরে তাঁর বহু গল্পের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, যেগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, বই হয়ে বেরোয়নি। তাছাড়া তাঁর আরও তিনটি উপন্যাস, পরভৃতিকা, বন্যা এবং ক্ষণিকের অতিথি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন, His Mother's Image, The Waters of Destiny এবং Travellers in the Night নাম দিয়ে। এগুলিও পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সুধীরকুমার চৌধুরী
৩৫, লেক টেম্পল রোড
কলিকাতা-২৯

সুন্দরবন প্রসঙ্গে

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকার্তিকচন্দ্র শাসমলের লিখিত 'সুন্দরবন' শীর্ষক রচনাটি পড়ে ভাল লাগল।

খুব বিলম্বে হলেও, উপেক্ষিত সুন্দরবনের উপর বর্তমানে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। সেই জন্য উন্নয়ন বিষয়ক নানা রকম পরিকল্পনার কথাও ভাবা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ ও ব্যাপক পরিকল্পনা রূপায়ণ সময়সাপেক্ষ, এবং তার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু, সেই সঙ্গে কিছু ছোট ছোট কর্মসূচী,—যা অল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে রূপায়ণ সম্ভব সে বিষয়ে সত্বর যত্ন নেওয়া দরকার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এই অঞ্চলের যান-বাহন সমস্যা।

নানা নদী-নালাবহুল সুন্দরবনে নৌকাই বহুল ব্যবহৃত এবং প্রয়োজনীয় যান-বাহন। কিছু ছোট ছোট মন্থরগতি লঞ্চ চলাচল করে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এবং ঐ লঞ্চগুলিতে এত বেশী যাত্রী ও মাল ঠাসা হয় যে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা খুবই থাকে। তদুপরি অধিকাংশ লঞ্চই বিগত ৪০ দশকের—এবং নড়বড়ে।

ঝড়বহুল এবং নদী-নালাপূর্ণ এই অঞ্চলে যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যতদূর জানা আছে, বেকার যুবকেরা, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদে'র কাছে এই অঞ্চলে লঞ্চ চালাবার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন এবং উক্ত পর্ষদের কাছে 'Margin money'-র জন্য আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু পর্ষদ সেই পরিকল্পনা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন। শহরে বেকার যুবকেরা বাস, মিনিবাস ইত্যাদির জন্য সরকারের কাছ থেকে 'Margin money' এবং জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্কগুলি থেকে টাকা সাহায্য পায়। অথচ, 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ' এ বিষয়ে এত উদাসীন কেন—সেটি ঠিক বোঝা যায় নি। এই পরিকল্পনায় অন্তত কিছু বেকার যুবকের রুজি রোজগার করা সম্ভব হত। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের একান্ত প্রয়োজনীয় যান-বাহন সমস্যারও সুরাহা হত।

সুন্দরবন প্রসঙ্গে সরকারী বন দপ্তরকে আর একটি বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যখন জঙ্গলে 'কুপ', হয় অথবা মধু সংগ্রহকারীরা মধু সংগ্রহে যখন জঙ্গলে যান, তখন কাঠুরে বা মধু-সংগ্রহকারীদের এক বা ততোধিক কুকুর সঙ্গে রাখার জন্য নির্দেশ দিন। তাহলে, এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘ যে হারে মানুষ মারে, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

দলে কুকুর থাকলে বাঘের আগমন পূর্বাহ্নেই জানা যাবে। প্রথম দিকে জঙ্গলে অনভ্যস্ত কুকুরদের আচরণ কিছুটা বিশৃঙ্খল হবে। কিন্তু জঙ্গলের সাথে সামান্য পরিচয় হয়ে গেলে, ঐ দলবদ্ধ কুকুর সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মত কার্যকরী হবে।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য, চৈত্র-বৈশাখ মাসে সাঁওতালদের জঙ্গলে শিকার দেখার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, বিভিন্ন গৃহপালিত কুকুরগুলি জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্র আত্মকলহ ভুলে দলবদ্ধ হয়ে কি দুর্জয় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এবং শিকারের প্রতি ধাবিত হয় বা শিকারের অবস্থান জানিয়ে দেয়।

রণজিৎ ভট্টাচার্য
গড়িয়া-২৪ পরগণা

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মূলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/72 BEN

আধুনিক গাছপালার মধ্যে প্রাচীনকালের অতিকায় প্রাণীর প্রতিমূর্তি

বিশ্ব বিজ্ঞান

ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের প্রাচীন কাহিনী

আজ থেকে ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে এমন কি কারণ ঘটেছিল যার জন্য পৃথিবীর বুক থেকে অতিকায় নিরামিষাশী সরীসৃপের দল হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?

হয়ত অনুমান। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্য এই, ওই সময় পৃথিবীর পরিবেশ-মণ্ডলের তাপমাত্রা হঠাৎ কমতে থাকে। আর সেই সঙ্গে উদ্ভিদ জগতে শুরু হল অভিনব এক পরিবর্তন। এতদিন পৃথিবীর বুকে রাজত্ব চলছিল অপুষ্পক-শ্রেণীর গাছপালার। বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের বলা হয় ক্রিপটোগ্যামস। কিন্তু তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এবং ব্যাপক হারে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল নানারকম সপুষ্পক গাছপালা অ্যানজিও-স্পারমস বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। যাদের বীজ ফলের মধ্যে ঢাকা থাকে। জৈবিক বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ এই সময়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তখন থেকেই হঠাৎ অতিকায় নিরামিষাশী সরীসৃপদের মধ্যে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দিয়েছিল। এবং পৃথিবীতে দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার পর তারা দ্রুত অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। অতিকায় নিরামিষাশী সরীসৃপদের অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, কিউ-এ অবস্থিত রয়েল বোটানিক গার্ডেনসের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবো-রেটারি ফর বায়োকেমিক্যাল সিস্টেমেটিকস-এর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ টি সোয়াইন।

ডঃ সোয়াইনের বক্তব্য, ওই সময়ের আগে পৃথিবীর বুকে যে সব গাছপালার আবির্ভাব ঘটে, তাদের রাসায়নিক গুণাগুণ হয়ত ভিন্ন ধরনের ছিল। ওইসব গাছ-পালা খেয়েই অতিকায় সরীসৃপরা দীর্ঘকাল টিকে থাকে। কিন্তু নতুন ধরনের ফুল-ফোটা গাছের ভিড় যখন বাড়তে লাগল, বিপদ ঘটল তখনই। হতে পারে, অনিবার্য কারণে সরীসৃপরা খাবারের জন্যে নতুন স্বাদের এই গাছপালার ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এর ফলে তাদের শরীরে এমন ধরনের জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে যার ফলে তাদের স্বাভাবিক শারীর-বৃত্তীয় কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এবং অবশেষে জীবজগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে সরীসৃপরা ঠিক যে ধরনের খাবার খেত বলে অনুমান করা হচ্ছে, নিজের মতবাদ পরীক্ষা করার জন্যে ডঃ সোয়াইন কয়েকটি কচ্ছপকে ঠিক সেই ধরনের খাবার খাইয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্য সত্যিই বিপত্তি ঘটায়। তাদের বিষক্রিয়ায় শরীরের জীবরাসায়নিক কাজকর্মের পরিবর্তন ঘটে। এমন পরিবর্তন, যা তাদের পঙ্গু করে দিতে পারে। এবং দ্রুত জৈবিক বিবর্তন ঘটিয়ে অবলুপ্তির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।

*

অনেকেই হয়ত জানেন, আজ থেকে প্রায় ২২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল 'মেসোজোয়িক এরা' বা মধ্য-ভূতাত্ত্বিক যুগ। ঠিক ওই সময়ে পৃথিবীর পরিমণ্ডল থেকে কয়লা-অধ্যুষিত জলাভূমির নানারকম উদ্ভিদ এবং প্রাণীর চিরপ্রস্থানের পালার সূচনা। পরিবর্তে বিশেষ ধরনের ফার্ন গাছ মোচার মত ডগাওয়ালা উদ্ভিদ

ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর পুরনো গাছের খাবার খাইয়ে ভূমধ্যসাগরীয় কচ্ছপটির ওপর পরীক্ষা চালান ডঃ সোয়াইন

সাইক্যাডস বা বৃক্ষজাতীয় ফার্ন এবং অধুনা অবলুপ্ত আরও নানারকম গাছ-পালার আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং ওই একই সময়ে আবির্ভাব ঘটে নানা রকম উভচর প্রাণীর এবং সরীসৃপের। এই সব উদ্ভিদ এবং প্রাণী খুব কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর শুকনো স্থলভাগের ওপর বেঁচে থাকার মত করে নিজেদের তৈরি করে নেয়। পরবর্তী প্রায় তিন কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করার পর এই সব প্রাণীর বেশ বড় রকমের একটি অংশ বিবর্তনের ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। তবে বিক্ষিপ্ত এবং মুষ্টিমেয় হিসেবে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছিল আরও নয় থেকে দশ কোটি বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় আট নয় কোটি বছর আগেও তাদের প্রতিপত্তি কতকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। বলা বাহুল্য, ঠিক এই সময় থেকেই সপুষ্পক উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখির মধ্যে তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রবণতা খুব বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। পাইন এবং পাইন জাতীয় গাছ ছাড়া তখন সপুষ্পক গাছ ছিল প্রায় ২০০০০০ রকমের।

সপুষ্পক গাছের সবচাইতে বড় সুবিধে, খুব কম সময়ে এরা ব্যাপক বংশ বিস্তার করতে পারে। কারণ এক একটি গাছে প্রচুর ফল জন্মায়। বাতাস, পশু, পাখি জলের স্রোত প্রভৃতির সাহায্যে ওই সব ফল বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানে ছড়িয়ে পড়ে সেখানেই নতুন বংশ-ধররা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর শুকনো স্থলভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদে ভরে যায়। ততক্ষণে খড়িমাটির যুগেরও (Cretaceous period) পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। সেটা আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের পুরানো কাহিনী। অদ্ভুত ব্যাপার এই, প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ঠিক এই সময় অতিকায় নিরামিষাশী সরীসৃপরাও পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ডঃ সোয়াইন বলেছেন, না। এটা এমন কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। এর অনেক আগে থেকেই ওই সব সরীসৃপের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ধীর গতিতে। অবশেষে দ্রুত। কিন্তু ব্যাপক হারে যখন তারা নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করল তখন পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার রকমের ফলধরা গাছ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, সপুষ্পক গাছের বিস্তার ওই সব সরী-সৃপের অবলুপ্তি ঘটায় নি তো?

*

অতিকায় সরীসৃপের অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা এ পর্যন্ত নানারকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনই হয়ত এর জন্যে দায়ী। কারণ দানবাকৃতি ওই সব সরীসৃপ কোলড ব্লাড বা ঠান্ডা রক্তের প্রাণী (অবশ্য কারোর মতে সবাই যে তাই, তা হয়ত ঠিক নয়)। বেঁচে থাকবার জন্যে তাদের উষ্ণতর পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। তখন পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার মত ছিল না। আবহাওয়ার উত্তাপও বর্তমানের তুলনায় অনেকটা বেশি ছিল। এবং সে উষ্ণতা সর্বত্রই প্রায় সমান। তা সে নিরক্ষীয় অঞ্চলই হোক অথবা মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, প্রায় ৮ কোটি বছর আগে অতিকায় সরীসৃপ রাজত্বের পরিসমাপ্তির সূচনা। আর ঠিক ওই সময় পৃথিবীর আবহাওয়ার তাপমাত্রা হঠাৎ কমতে শুরু করে। তবে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ওই সময় ৫০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের কোন কোন অঞ্চলে ওই সব অতিকায় প্রাণী যে বিচরণ করত বিজ্ঞানীরা তার প্রমাণ পেয়েছেন। এ থেকে মনে হয় ওরা যখন নিজেদের অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে উপনীত, পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চল তখনও উষ্ণতর অবস্থাতেই রয়ে গেছে। এবং অঞ্চল বিশেষে উষ্ণতার মধ্যে খুব বেশি একটা তারতম্য ঘটে নি।

আবহাওয়া মণ্ডল ছাড়াও অতিকায় প্রাণীদের বিলুপ্তির কারণ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেছেন, দারুণ খাদ্যাভাবে তারা নিঃশেষিত হয়েছে। কারোর মত পারস্পরিক সংঘর্ষে তারা মারা গেছে। এই সব বক্তব্যের কোন কোনটি যুক্তি নির্ভর। কোন কোনটি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে নি। কিন্তু একটা ব্যাপার অনেকেই লক্ষ করেন নি। সেটা হল ঠিক যে সময়ে তাদের বিলুপ্তি ঘটে সেই সময় উদ্ভিদ জগতে সপুষ্পক উদ্ভিদের জোয়ার চলেছে। ওরাই [illegible] তাদের জীবনে ডেকে আনে মৃত্যুর বিভীষিকা।

কীভাবে?

ডঃ সোয়াইনের বক্তব্য, আধুনিককালের সরীসৃপেরা দৈনিক কতটা খাবার খেতে পারে, প্রথমে সেটা আমরা হিসেব কষে বের করে নিই। সেই হিসেবের ওপর গণনা চালিয়ে দেখা গেছে, আদিমকালের পাঁচ টন ওজনের এক একটি সরীসৃপের লাগত দৈনিক প্রায় ২০০ কিলোগ্রামের মত উদ্ভিজ্জ খাবার। যার অর্থ খাবার উৎপাদনের জন্যে সরীসৃপ প্রতি জমির দরকার হত বছরে প্রায় কুড়ি বর্গ কিলোমিটার। ওই জমিতে সপুষ্পক অপুষ্পক নানা ধরনের গাছই জন্মে থাকবে। এবং খিদের তাড়নায় দু ধরনের গাছই তারা খেয়ে থাকবে। ফলে দৈনিক অতিমাত্রায় বিষাক্ত বস্তু তাদের উদরস্থ করতে হয়েছে।

গাছপালার মধ্যেও তখন জৈবিক বিবর্তন চলছিল নতুনতর আঙ্গিকে। পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব দৃঢ়তর করার জন্যে নিজেদের শরীরে তখন তারা নানারকম রাসায়নিক যৌগের সংশ্লেষণ করতে থাকে। পর্যায়ক্রমে ওই সব রাসায়নিক যৌগ তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বিবর্তন ঘটায়। পরিবর্তে সৃষ্ট হয় নতুন প্রজাতির গাছপালা। প্রাণীদেহের ওপর ওই সব রাসায়নিক যৌগের কোন কোনটির প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী।

যেমন ধরুন, ট্যানিনস এবং অ্যাল-কলয়েডস নামে দুই শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। প্রায় সব রকমের সপুষ্পক গাছ-পালার মধ্যেই এই দুই শ্রেণীর যৌগ পাওয়া যায়। গোড়ায় যে সব সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে থাকত

কনডেন্সেড ট্যানিনস।' প্রাণী দেহের ওপর এদের প্রতিক্রিয়া কিছুটা কম। কিন্তু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে যে সব সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে সংশ্লেষিত হতে থাকে আর এক ধরনের ট্যানিনস। যাদের বলা হয় 'হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিনস।' শেষোক্ত এই রাসায়নিক যৌগগুলি সহজে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ট্যানিনরা প্রাণীদেহে প্রোটিন পরিপাকে বাধা দেয় এবং এনজাইম বা উৎসেচক রসের কাজকর্মকে ব্যাহত করে যকৃৎ-এর রোগ ঘটায়।

এবং অ্যালকলয়েড শ্রেণীর কোন কোন যৌগ শারীরবৃত্তের ক্ষতিসাধন করে। যেমন, Strychinine নামে এক ধরনের অ্যালকলয়েড অত্যন্ত বিষাক্ত। মরফিন নামে আর এক ধরনের অ্যালকলয়েড মানসিকতায় বিপর্যয় ঘটায়। আবার অ্যালকলয়েড গোষ্ঠীর কোন কোন যৌগ প্রজননের ব্যাপারে ক্ষতি করে এবং বংশগতির বৈকল্য ঘটায়।

ডঃ সোয়াইন ভূমধ্যসাগরের এক জাতের কচ্ছপ এবং কয়েক শ্রেণীর সরীসৃপকে কয়েক ধরনের ট্যানিন এবং অ্যালকলয়েড খাইয়ে দেখেছেন, ওই সব রাসায়নিক যৌগ তাদের খাওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে।

*

আজ থেকে ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে হয়ত এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল অতিকায় সেই সরীসৃপরা। তার প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া কোন কোন জীবাশ্মের মধ্যেই পাওয়া গেছে। ওই সব জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ওদের কারোর কারোর হাইপোথ্যালামাস অস্বাভাবিক রকমের বড়। হাইপোথ্যালামাস মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের নীচের এবং পাশের অংশ, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার যেখানে জোড়া থাকে তার পেছনের দিকে এর অবস্থান। কোন কোন অতিকায় প্রাণীর দেহাবশেষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বিষাক্ত অ্যালকলয়েডও পাওয়া গেছে। আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, খড়িমাটির যুগের কিছু কিছু ডাইনোসরস-এর ডিম্ব পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, ওই সব ডিমের খোলা ওদের চেয়েও প্রাচীন যুগের ডাইনোসরদের ডিমের খোলার চেয়ে অনেক পুরু। প্রচুর ডি ডি টি ছড়ানর ফলে ইদানীং কোন কোন পাখির ডিমের খোলা যেমন পুরু হতে দেখা যায়, ওদের ব্যাপারটাও যেন কতকটা তেমনই। বিশেষ ধরনের অ্যালকলয়েড অথবা ভিন্নতর কোন রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে ডাইনোসরদের ডিমের খোলা ক্রমান্বয়ে পুরু

অতিকায় মাংসাশী প্রাণীর শেষ বংশধর ট্রাইঅ্যানোসরস। এরা লম্বায় ছিল প্রায় পনের মিটার। দাঁতের দৈর্ঘ্য কুড়ি সেন্টিমিটার

হতে থাকে। যে সব ডিম থেকে পরে আর বাচ্চা ফুটতে পারেনি।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা হয়ত দাঁড়িয়েছিল এই রকম। গোড়ার সপুষ্পক গাছগুলি কনডেন্সেড ট্যানিন সংশ্লেষণ করত। নিরামিষাশী সরীসৃপরা খিদের তাড়নায় যখন তাদের সাবাড় করতে থাকে, তখন জৈবিক বিবর্তনের পদ্ধতি অনুসারে পরবর্তীকালে ওই সব উদ্ভিদের বংশধররা আত্মরক্ষার জন্যে আরও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিষাক্ত হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিন সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ওই একই কারণে বিষাক্ত অ্যালকলয়েড সংশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করেছিল। কিন্তু বুভুক্ষার বড় কিছু বুঝি নেই। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধির ফলে অতিকায় প্রাণীদের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে উঠল। সেই সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান সীমিত হয়ে এল। উপায় না দেখে তারা ওই বিষাক্ত গাছগাছড়া খেয়েই জীবন ধারণ করতে লাগল। আর এই খাবারই তাদের ওপর টেনে আনল যবনিকা। বংশ পরম্পরায় তারা দুর্বল হয়ে উঠল। নানা রকম রোগে ভুগতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত।

কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন, যারা নিরামিষাশী, তারা না হয় বিষাক্ত গাছপালা খেয়ে মারা গেল। কিন্তু সবাই তো আর নিরামিষাশী ছিল না? তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাণী মাংসাশীও ছিল। তারা অবলুপ্ত হল কেন?

ডঃ সোয়াইনের উত্তর : তারা নিজেরা হয়ত বিষাক্ত গাছপালা খেতো না। কিন্তু যে সব প্রাণীদের খেয়ে জীবন ধারণ করত, তাদের অনেকেই তো নিরামিষাশী। ফলে পরোক্ষভাবে মাংসাশী প্রাণীরাও বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হত।

হয়ত এটাই ঠিক। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পারস্পরিক সহঅবস্থানের তাগিদই শেষ পর্যন্ত অমন বিপর্যয় টেনে নিয়ে এসে থাকবে।

এবং এ ধরনের ঘটনা থেকে একটিমাত্র শিক্ষাই পাওয়া যায়। বাঁচার তাগিদে এখনকার মানুষ কতভাবেই না চেষ্টা করছে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে বছরের পর বছর আমরা লক্ষ লক্ষ টন অজৈব সার ব্যবহার করছি। এই সব সারের কোনটি কতখানি প্রয়োজন তার সুস্পষ্ট হিসেব জানা যায়নি। কম সার ব্যবহার করলে উৎপাদন ব্যাহত হয় ঠিকই। কিন্তু উদ্বৃত্ত অজৈব সার মাটিরও ক্ষতি করতে পারে। কীটসেবী কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করার দরুন জলের এবং মাটির উদ্ভিদ ও প্রাণী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্প উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাতাস, মাটি এবং জল ক্রমেই বিষাক্ত হচ্ছে। যদি এইভাবে চলতে থাকে, বর্তমান পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীরাও শেষ পর্যন্ত দ্রুত জৈবিক বিবর্তন ঘটিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ওই অতিকায় প্রাণীদের মতই যে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে যাবে না, কে বলতে পারে?

সংশোধন : ১ মার্চ বিজ্ঞানবিজ্ঞান পর্যায়ে রচনার ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সাইক্লোট্রন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'যার কাজ বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক কণা, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন... সংঘর্ষ ঘটান।' ইলেকট্রন হবে না। কারণ সাইক্লোট্রনে ইলেকট্রনের ত্বরণ ঘটান হয় না। ওই ধরনের চুম্বক ইলেকট্রনের ত্বরণের জন্যে বিভাট্রনে ব্যবহার করা হয়।

ওই পৃষ্ঠাতেই সাইক্লোট্রনের গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'সাইক্লোট্রনের মধ্যে থাকে ...... চৌম্বক ক্ষেত্রের

দিকেরও পরিবর্তন ঘটে।' এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যেও বিভ্রান্তি থেকে গেছে। সাইক্লোট্রনে থাকে ডি সি বা অপরিবর্তী চুম্বক। যার কাজ আয়নদের বৃত্তাকার পথে চালিত করা। কিন্তু ওই সব কণার ত্বরণের জন্যে সাইক্লোট্রনের মধ্য অংশে থাকে একটি ধাতব চোঙ। চোঙটি সাধারণত দুটি অংশে বিভক্ত। যাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় 'ডি'; কারণ ওদের দেখায় ইংরেজী D অক্ষরের মত। এই অংশ দুটিকে পরিবর্তী তড়িৎ-বিভব উৎসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে পর্যায়ক্রমে অর্ধাংশ দুটি একবার হয় ধনাত্মক, পরের বারে ঋণাত্মক। এখানকার তড়িৎ-বিভবের কম্পাঙ্ক বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পর্যায়ে পড়ে।... আয়ন-উৎস থেকে আহিত কণাদের সাইক্লোট্রনের কেন্দ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং ধাতব অর্ধাংশ দুটির তড়িৎ-বিভবে পরি-বর্তন ঘটিয়ে কণাগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কলকাতার লবণ-হ্র সাইক্লোট্রনটির বিশেষত্ব এই যে, এ বিশেষ ধরনের চুম্বকের সাহায্যে বে সংখ্যক কণাদের একই সঙ্গে গতি বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

সমরজিৎ ক

॥ আঠারো ॥

একেবারে সিনেমার নায়কের মতো ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালেন ভদ্রলোক। গাঢ় বাদামী রংয়ের মাফলার গলায় জড়ানো। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে। এ কে? আমাদের দিগেনদা! হতেই পারে না। মনের মধ্যে দ্রুত প্রশ্নোত্তরগুলি ছোটাছুটি করছে। আমি সেই যে 'দিগেনদা' হাঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আর নড়ন-চড়ন নেই। ভদ্রলোক খুব মাপা কদমে হেঁটে আসছেন আমার দিকে। ওঁর সারা মুখে, শরীরে, চলার ধরনে কালীঘাট রোডের দিগেন্দ্রনাথ পালমশাইকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি আমি। মাংসল মুখে চামড়ার রং কাশ্মীরী আপেলের মতো টকটকে। ফোলা ফোলা গাল দুটিতে সেই রঙ গাঢ়তর। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। চোখে চশমা নেই। অনেক কষ্টে টের পেলুম, দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছে। আপাদমস্তক প্যারিসিয়ে। ফেল্ট টুপি থেকে শুরু করে বুট জুতো অবধি মঁসিয়ে দিগেঁ পল। কাছাকাছি আসতেই খেয়াল হল, আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ বন্ধ করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলুম। স্বাভাবিক হব কোত্থেকে বউ! আমার স্মৃতির খাতায় একটি মুখের হিসেবে সাংঘাতিক গরমিল ধরা পড়ে গেছে। সেই পুরু চশমা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িভর্তি মুখ, কলার ছেঁড়া জামা এবং ফটর্ ফটর্ হাওয়াই চটির ছবি রবার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলতে বেশ সময় লাগল।

কাছাকাছি আসতেই মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল একটি বলদের মত প্রশ্ন,

—"দিগেনদা, আপনার চশমা লাগে না আজকাল?"

খুব ভারী গলায় আমাকে বাধা দিলেন,

—"কনট্যাক্ট লেনস আছে।" তার পরেই ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন,

—"এখানে সাড়ে এগারোটায় থাকার কথা না তোমার! এখন কটা বাজে?"

মুখ কাচুমাচু করে বললুম,

—"ভেতরেই ছিলুম। সময়ের খেয়াল ছিল না—দারুণ সব ছবি—"

আবার একই প্রশ্ন, একই স্বরে,

—"এখন কটা বাজে?"

—"বারোটা প্রায়।"

—"না। প্রায় নয়। বেজে গেছে।"

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন দিগেনদা। রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,

—"এই জন্যেই তোমাদের, মানে, বাঙালীদের কিস্সু হয় না, হবেও না। সময়ের জ্ঞান না থাকলে জীবনে উন্নতি হওয়া অসম্ভব।"

আহা রে, দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছে!

দাঁত চেপে, ঠোঁটের সিগারেট ঠোঁটেই ঝুলিয়ে জ্ঞান দিতে লাগলেন। প্যারিস এবং কলকাতার ফারাক বোঝাতে লাগলেন। একটিও কথা না বলে পাশাপাশি হেঁটে চললুম। অসাবধান্ত পা ফেলে চারজনে হাঁটি-ছিলুম সেদিন। পাশাপাশি। আমার বাঁ দিকে কলেজের বন্ধু প্রিয়ব্রত, ডান দিকে দিগেনদা, তারপরে উঠতি কবি বিমল সেন। আকণ্ঠ না হলেও বেশ মেজাজ হয়েছে। দু জনার পুরো দুটি বোতল এবং একটা ফাইল শেষ। দিগেনদা খাওয়াচ্ছিলেন। সেদিনকার 'সেবক'-এ ওঁর নতুন কবিতা বেরিয়েছে। বেশ ভালো কবিতা। দিগেনদার পকেট খালি হয়ে গেল। কিন্তু, ওই যে বললুম, মেজাজ হয়েছে! ছোট্ট একটা পেঁয়াজের কুচি মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে দিগেনদা বললেন,

—"আর একটা ফাইল হলে জমত!"

আমরা তিনজনে পকেট ঝেড়েঝুড়ে সিকি-আধুলি মিলিয়ে আরেকটা ফাইল আনালুম। তারপর চারটে গেলাস-ফেরত পয়সায় আরো খানিক মদ আনিয়ে সোজা বোতলে মুখ লাগিয়ে খাওয়া হল। তাতেও হল না। দিগেনদা বললেন,

—"চ! শালা বেঁটে খচ্চরকে ধরি।"

বিমল বললে,

—"কোন্ বেঁটে খচ্চর দিগেনদা?"

আলাপনীটোলা থেকে বোধ হয় ফুটপাথে পা রেখে দিগেনদা ঘুরে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন,

—"কবিদের পৃথিবীতে বেঁটে খচ্চর একটিই আছে। সেবকের সহ-সম্পাদক নেতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ।"

পরে জেনেছিলুম, আসলে ভদ্রলোকের নাম নিত্যানন্দ বসু। আদরে, সোহাগে বা তাচ্ছিল্যে মোটামুটি কাঠামোটুকু রেখে হরে-দাম মানুষের নাম পালটে দিতেন দিগেনদা।

বিমল বলল,

—"অ! নিতাইদা। তা এত রাত্তিরে কি আর পাবেন ওঁকে?"

আদর করার জন্যে। নিজস্ব অভিনব সুরভি দিয়ে আপনাকে
মুগ্ধ করার জন্যে। বিশেষভাবে মিশ্রিত হ্যালোর জন্যে
আপনারই হ্যালো!

হ্যালো
ভেইল অব লাভ
ট্যাল্ক

নীচের কুপনটি কেটে নিন।

ইংরিজিতে আপনার নাম ও ঠিকানা ভরে এটি কুপনে দেওয়া ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দিন। তাহলে আপনি একটি স্পেশ্যাল ডিসকাউন্ট ভাউচার পাবেন। এই ভাউচারটি নিয়ে আপনার ডীলারের কাছে গেলে তিনি আপনাকে হ্যালো ভেইল অব লাভ ট্যাল্কের একটি ইকনমি সাইজ প্যাক দেবেন — নির্ধারিত দামের চেয়ে ১.৫০ টাকা কম দামে!

এই অভিনব উপহার কেবল সীমিত সময়ের জন্যে। কাজেই শিগগির করুন, আজই আপনার কুপনটি ডাকে পাঠিয়ে দিন।

COUPON

To
Halo Veil of Love Talc D.O.
C/o Colgate-Palmolive (India) Pvt. Ltd.
4, Canal West Road, Calcutta 700 015.

Dear Sirs,
I would like to have my Halo Veil of Love Talc discount voucher sent to :

Name ______________________

Address ______________________

____

HT.G.2.BN

[illegible] হয়ে [illegible] দিগেনদা [illegible] [illegible] বলতে [illegible],

—"[illegible], একই নিয়ম, যা পেয়েছি [illegible] আছো।" বলেই [illegible] কাটলেন,

"আলোআঁধারিতে [illegible] কোলায়
[illegible] দিয়ে কাঁধে,
নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ
চিরকাল বসে থাকো।"

আমি বললুম,

—"টাকা বাকি আছে নাকি?"

এক গাল হেসে দিগেনদার জবাব,

—"সেই সকাল থেকে বাকি পড়ে আছে তারা। চল, নিয়ে আসি।" বলে হাঁটতে লাগলেন।

সেবক আপিসের পুরনো বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালুম। গেট পেরিয়েই বিহারী দারোয়ানজী উবু হয়ে বসে তোলা উনুনে রুটি সেঁকছে। দাড়ি-গোঁফ-মাথা চকচকে করে কামানো। সামান্য মুখ তুলে আমাদের দেখে নিল। গ্রাহ্য করল না। দালানের এক তলায় মাঝারি ঘরে জনা-পাঁচেক লোক টেবিলে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছে, লেখালেখি করছে। কাউকেই চিনি না আমি। এদের মধ্যে নিত্যানন্দবাবু কোন্‌টি বোঝবার চেষ্টা করছি। ঘরে ঢোকার দরজার মুখোমুখি বেশ বড়-সড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে সোজা হেঁটে চললেন দিগেনদা। মাথা-ভর্তি সাদা চুল আর ফর্সা গোলগাল মুখ নিয়ে বসে যে ভদ্রলোক কাজ করছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। দিগেনদা আগে আগে, আমরা তিনজন পেছনে। টেবিলের এপাশে সাজানো তিনটি চেয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে দিগেনদা বললেন,

—"নিতাইদা, এলুম!"

চশমার পেছনে ভুরু কুঁচকেই ছিলেন ভদ্রলোক। ঠিক সেইভাবেই বললেন,

—"তা তো দেখতেই পাচ্ছি!"

বলার ধরনে বুঝলুম, আমাদের এই সময়ে আসাটা ওঁর পছন্দ হয়নি। আমরা তিনজনে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালুম। যতই মদ্যপান করি না কেন, এ রকম অভ্যর্থনায় একটু দমে যাওয়া স্বাভাবিক। যত হলেও দিগেনদার একটু নাম-টাম আছে বাজারে। তাঁর সঙ্গে এই ধরনের তাচ্ছিল্য জড়িয়ে কথা বলা আমাদের কারুরই পছন্দ হল না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম আমরা। দিগেনদা কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। নিতাইবাবু আবার কাগজপত্রে চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বললেন,

—"কি ব্যাপার? অ্যাতো রাত্তিরে!"

আমরা দিগেনদার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। ওঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল, উনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন,

—"রাত্তির আর কোথায় নিতাইদা। আপনি তো এখনো কাজ করছেন আপিসে বসে।"

"এই যে! এই সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ কবিতা—"

মুখ না তুলেই নিতাইবাবুর জবাব,

—"আমরা হলুম কাগজের লোক, আমাদের কি আর দিন-রাত্তির আছে!"

—"কবিদেরও নেই দাদা!" দিগেনদার গলার স্বর কি একটু জড়ানো মনে হল! নিতাইবাবু বোধ হয় ধরে ফেলেছেন, সন্ধ্যের পর এখন চার মাতালের প্রবেশ। দিগেনদা মনে হয়, এ রকম তৈরী অবস্থায় সেবক আপিসে এর আগেও দু-একবার এসেছেন।

'কবিদেরও দিন-রাত্তির নেই' কথাটা এমনভাবে কানে লেগে গেল, বলার ইচ্ছে হল 'শিল্পীদেরও নেই'। এবং বোধ হয় বলেও ফেলেছি, খেয়াল নেই, নইলে অমন বিচ্ছিরি চোখ করে নিতাইচরণ আমার দিকে তাকাবেন কেন!

দিগেনদা বললেন,

—"একটু দরকার ছিল নিতাইদা।"

কাগজে কলম ঘষতে ঘষতে নিতাইবাবুর গম্ভীর গলা,

—"কি দরকার?"

দু পাশে তাকালুম। যারা টেবিলে বসে কাজ করছিল, তাদের সকলেরই চোখ আমাদের দিকে এখন। শুধু এই ঘরটি ছাড়া চারদিকের আর কোনো ঘরে আলো নেই। কোনো মেশিনের একটানা ঘটর-ঘট্-ঘট্ শব্দ ভেসে আসছে। দিগেনদা বললেন,

—"কয়েকটা টাকা চাই নিতাইদা!"

একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ করে নিতাইবাবু বললেন,

—"টাকা? কোথায় টাকা? কিসের টাকা!"

—"কেন, আমার কবিতার!"

ভুরু কুঁচকে অবাক গলায় নিতাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

—"কোন্ কবিতা?"

—"কোন্ কবিতা, কি বলছেন নিতাইদা? আজকের সেবকে আমার কবিতা বেরোয়নি?"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন দিগেনদা। দু-পাশের টেবিল ঘেঁটে আজকের কাগজ খুঁজে বের করলেন। আবার নিতাইবাবুর কাছে ফিরে এসে পাতা উল্টে দেখালেন,

—"দেখুন দাদা, এই যে! এই সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ কবিতা। আপনি না পড়ে থাকলে আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিচ্ছি—"

নিত্যানন্দ মুচকি হেসে বললেন,

—"না হে দিগেন, আবৃত্তি করতে হবে না। আমি পড়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে দিগেনদা [illegible] জিজ্ঞেস করলেন,

—"কেমন কবিতা? বলুন আপনি! নিজেই বলুন।"

ভদ্রলোকের মুখে তেমনি মিটিমিটি হাসি। এই ধরনের হাসি দেখলেই হাড়পাঁজর জ্বলে যায় আমার। বুঝি, মাল খুব কঠিন। বললেন,

—"বেশ ভালোই তো!"

—"তবে?"

—"তবে কি?"

—"বলছিলুম, আমার সম্মানমূল্য কই?"

এইবারে হো হো করে হেসে উঠলেন নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ। আশেপাশের রিপোর্টাররাও ফিক্ ফিক্ করে হাসছেন। দিগেনদা খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

—"এতে হাসির কি হল দাদা! আমি সম্মানমূল্য পাব না?"

—"পাবে দিগেন, নিশ্চয়ই পাবে। সময়মতো পেয়ে যাবে।"

—"সময়মতো মানে?"

—"আগে ভাউচার তৈরী হোক, ওপরওলার স্যাংকশান হয়ে আসুক—"

দিগেনদার গলায় ঝাঁঝ মিশলো এবার,

—"অত সব ফর্মালিটি-ফিটি আমি বুঝি না। কবিতা ছাপা হলে দেন তো মোটে দশটি টাকা। তার জন্য, অত সব ফর্মালিটির দরকার নেই। কবিতা ছাপা হয়ে গেছে—এখন, সেবক কোম্পানীর দশটি টাকায় আমার ন্যায্য অধিকার।"

আমরা তিনজনে ঘরের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দিগেনদাকে এখন বোঝাতে যাওয়া মুশকিল যে, কবিতা ছাপা হবার সংগে সংগেই গরম গরম টাকা দেওয়া সেবকের পক্ষে অসম্ভব। শুধু সেবক কেন, প্রায় সব পত্রিকাওয়ালাদেরই এক ব্যাপার। নিতাইবাবু বলেছেন হক্ কথা, হিসেব-পত্তর হবে, কেরানীবাবু ভাউচার তৈরী করবেন, নানা কর্তাব্যক্তির অটোগ্রাফ পড়বে সেই ভাউচারে, তবে সেই চিরকুটটি দেখে ক্যাশ-বাবু তাঁর বাক্স খুলে টাকা দশটি বের করে দেবেন। একটা নিয়মকানুন বলে ব্যাপার তো থাকতেই হবে! কিন্তু, এ কথা তো নিঃসন্দেহে পরিষ্কার যে, টাকাকটি পেলে আমাদেরও এখন সুবিধে হয়। গালা দেওয়া বোতলগুলি চোখের সামনে নাচছে।

খুব মিষ্টি করে মাতাল কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন নিতাইবাবু,

—"তোমার ন্যায্য অধিকার তো অস্বীকার করছি না ভাই! কিন্তু, আপিসের নিয়মকানুন তো আমি ভাঙতে পারি না। তা ছাড়া, অ্যাকাউণ্টস সেকশন বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচটায়। কেউ নেই ও ঘরে। ক্যাশের চাবিও তো আমার কাছে থাকে না—"

ধর্মপুত্তুরের মত সব কথাই ভদ্রলোক নির্জলা সত্যি বলে গেলেন, তা মনে হল না। দিগেনদা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর, হঠাৎ বেশ গলা তুলে বললেন,

—"ও-সব আমি কিস্সু শুনবো না। দিগেন পালের কবিতা আপনারা ছেপেছেন। সেই কবিতার দাম দশ টাকা। আমি, শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল স্বয়ং আপনার সামনে দাঁড়িয়ে—টাকাটা ছাড়ুন।" বলে নিতাইবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—"চেঁচিও না দিগেন! কাল সকালে এসে অ্যাকাউণ্টস থেকে টাকা নিয়ে যেও—আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

সহ-সম্পাদক খুব রাগী গলায় কথা কটি বলে কাজে মন দেবার ভান করলেন। যেন আজকের মতো ওঁর কথা বলা শেষ হয়ে গেল! দিগেনদাও নাছোড়বান্দা। টেবিল ঘুরে ওঁর কাছে চলে গেলেন। দাদু-দিদিমারা যেভাবে নাতির থুতনি নাড়িয়ে আদর করে, ঠিক সেইভাবে নিতাইবাবুর থুতনি ছুঁয়ে বললেন,

—"কাল সকালে অ্যাকাউণ্টস থেকে আমার নামে টাকাটা আপনিই নিয়ে নেবেন দাদু! এখন আপনার পকেট থেকেই টাকাটা দিয়ে দিন তা হলে, আমাদের খুব দরকার।" বলে, এতক্ষণে আমাদের দিকে হেসে তাকিয়ে মাথা দোলালেন। তার আগেই নিতাইবাবুর মুণ্ডু পেছনে সরে গেছে। বেঁটে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন,

—"কি হচ্ছে কি দিগেন! এটা মাতলামোর জায়গা নয়!"

ভদ্রলোকের ফর্সা গোল মুখটি রাগের চোটে টকটকে চৌকো হয়ে গেছে। তেমনি মৃদু হাসিমুখে দিগেনদা জানতে চাইলেন,

—"তা হলে, নিতাইদা, এখন আমরা কি করব?"

—"কিচ্ছু করার নেই। এখন যেতে পারো।"

—"তা হলে, টাকাটা দিন দাদা!"

আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন দিগেনদা।

—"আমার কাছে কোনো টাকা নেই।"

'তাহলে' শব্দটি দিগেনদার বোধ হয় খুব ভালো লেগে গেছে। একই সুরে বললেন,

—"তাহলে, আর আমরা যাব কোথায়?"

চেয়ারে বসতে বসতে নিতাইবাবু খুব রাশভারী গলায় বললেন,

—"দ্যাখো দিগেন, কাজের সময় এখন

বিরক্ত করো না। অনেক মাতলামো হয়েছে, এখন যাও। নইলে আমি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হব।"

ঠিক তখনই সেই বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটল। আমাদের দিগেনদা শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি ধারণ করে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। সেবক আপিসের সহ-সম্পাদক নিত্যানন্দ বসু কিছু বুঝে উঠবার আগেই কবি তাঁর বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলেন। ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি মেখে, ঢুলু ঢুলু চোখে দিগেনদা কীর্তনের সুরে গাইলেন,

—"তাহলে আমি নাচ দেখাব!"

বলে, দু-হাত ওপরে তুলে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগলেন।

নিতাইবাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছিটকে সরে গেলেন। ও'র মুখের এখন যা চেহারা, তা কচিৎ কখনো মানুষের মুখে দেখা যায়। বিস্ফারিত দুটি চোখ। সাদা গোল মুখটি পুরোপুরি চৌকো। পাকা চুলগুলি খাড়া খাড়া দেখাচ্ছে। শ্বেত ভল্লুকের লোমে যেন আগুন ধরে গেছে। কি করবেন ঠিক করতে কয়েক মুহূর্ত চলে গেল। ডান পাশের রিপোর্টার দুজন উঠে দাঁড়িয়ে চাপা উত্তেজিত গলায় বলছেন,

—"এ কি কাণ্ড! এটা কি মাতলামোর জায়গা নাকি! ছিঃ ছিঃ!"

বাঁ পাশের বৃদ্ধটি তাঁর যুবক সহ-কর্মীকে চাপা ধমক দিলেন,

—"অলোক, তুমি হাসছো? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কাগজের মান-সম্মান আর রইল না।"

ঘটনাটি আচমকা হলেও আমরা তিন-জনে সামলে নিয়েছি। নিরে, দিগেনদার নাচের তালে তালে হাততালি দিচ্ছি। নিতাই-বাবু গলা কাঁপিয়ে চেঁচালেন,

—"কৈ-লা-স!"

পেছন থেকে সাড়া এল,

—"যাই হুজুর।"

পেছনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার নিতাইবাবুর অসহায় চিৎকার,

—"শিগগির আয়!"

দিগেনদা ও'র দিকেই ঘুরে ঘুরে কোমর দোলাচ্ছেন। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর পা ঠুকে ঠুকে তাল রাখছেন।

নিতাইবাবুর 'কৈলাস' ডাক শুনে আমাদের হাততালির আওয়াজ কমে গেছে। দিগেনদা যথারীতি নির্বিকার মুখে তুরীয় ভাব ধারণ করে নেচে চলেছেন। দরজার দিকে চোখ রেখেছি আমরা। নিত্যানন্দর মুণ্ডু মুহুর্মুহু ঘুরছে জানলা এবং দরজার দিকে। ওরই মধ্যে এক একবার হাঁ করে অপলক চোখে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করছেন।

আমার নেশা মোটামুটি কমে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি এবার একটা হাতাহাতি হবে। নিতাইবাবুর ইজ্জতের সওয়াল। দিগেনদাও বোধ হয় টাকাটি না নিয়ে এখান থেকে নড়তে চাইবেন না। আমাদের চোখে গোটা ব্যাপারটি অভিনব ঠেকছে। এমন আশ্চর্য দৃশ্য জীবনে বহুবার দেখা যায় না।

কোমরে গামছা-জড়ানো কৈলাসের গতর দেখা দিল দরজায়। সেই দারোয়ান, গেটের কাছে যে রুটি সেঁকছিল। দারোয়ানজীর থলথলে বিশাল বপু বেয়ে ঘাম ঝরছে। উনুনের সামনে বসে থাকা অথবা ছুটে আসার জন্যে সারা গায়ে কুলকুল ঘাম। ভূত দেখার মতো দিগেনদার গৌরাঙ্গ বা নটরাজ মূর্তি দেখল এক সেকেণ্ড। কোমরের গামছা খুলে চোখ, মুখ, নেড়া মাথা মুছে আবার গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকল। ভাবখানা, দাড়িওয়ালা ক্যাঙ্গারুকে চশমা পরে নাচতে সে কখনো দেখেনি।

নিতাইবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,

—"হাঁ করে দেখছিস কি হারামজাদা! গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দে!"

দিগেনদা নিতাইবাবুর দিকে চোখ রেখে নাচ দেখাচ্ছিলেন বলে, কৈলাসকে দেখতে পাননি। এবার ফিরে তাকাতেই তাঁর ভাবের পরিবর্তন হল। একেবারে নিমাই সন্ন্যাসের ধরনে কৈলাসের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে সুর করে গাইলেন,

—"এসো হে—ভুবনমোহন—"

থপ্‌থপে গুটি গুটি পায়ে কৈলাস দিগেনদার দিকে এগোচ্ছিল। দিগেনদার ভাব পাল্টাতেই একটু থমকে দাঁড়াল। জুলজুলে চোখে কবিকে ভালো করে দেখে নিয়ে আর এক পা এগোতেই,

—"আর কত দূরে রাখিবি মোরে"—

বলে দিগেনদা এক লাফে টেবিল থেকে নেমে কৈলাসের মুখোমুখি। কিছু বোঝবার আগেই দু-হাত বাড়িয়ে কৈলাসকে জাপটে ধরে তার মসৃণ গালে, কপালে, মাথায়, মুখে চকাস্ চকাস্ শব্দে চুমু খেতে লাগলেন। লজ্জায়, আতঙ্কে অথবা দিগেনদার দাড়ির খোঁচায় কৈলাসের 'ছেড়ে-দে-মা—' গোছের করুণ গলা আজো মনে আছে,

—"রাম-রাম! হেই বাবুজী, ছোড়িয়ে দিন! রাম-রাম, হেই বাবুজী—"

সেই দিগেনদা আমার সামনে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। টুপিটি খুলে টেবিলে রাখতেই মাথা-জোড়া টাক চকচক করতে লাগল। রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগেই ঠোঁটের সিগারেট ফেলে দিয়েছিলেন। খুব মার্জিত মাপা বিলিতি কায়দায় মেনু-কার্ডের ওপর চোখ বোলাচ্ছেন এখন।

আহা রে! দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছেন!

মনে মনে ঠিক করলুম, কালীঘাট রোডের কফি হাউস বা খালাসীটোলার সেই বাঙালী কবি কতদূর ফরাসী হয়ে যেতে পারেন, জেনে যেতে হবে!

ক্রমশ

পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার দ্বিতীয় বছর

পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার এক বছর পূর্ণ হচ্ছে আগামী ৩১শে মার্চ। ১লা এপ্রিল থেকে যোজনার দ্বিতীয় বছর আরম্ভ হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ইতিমধ্যেই যোজনাটির দ্বিতীয় বছরের জন্য ৫৯৬০ কোটি টাকা যোজনা বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হল ৩১৫৪ কোটি টাকা; রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত এলাকার অংশ হল ২৮০৬ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে ১১১৬ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার দ্বিতীয় বছর শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও যোজনাটির চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাইনি। ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনায় আর্থিক সম্পদের যে ফাঁক থেকে যাবে তার পরিমাণ হবে ৪৬৪ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬২৫ কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতির যে তীব্র রূপ আমরা গত দুই বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি তা পঞ্চম পাঁচসালা যোজনা কার্যকরী হবার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। যে-সব তথ্যের ভিত্তিতে ও যে মূল্যস্তরের ভিত্তিতে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার খসড়া তৈরি হয়েছে তার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন করে খসড়া যোজনাটিকে ঢেলে সাজানো দরকার। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি, এবং তার ফলে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার কাজ যেভাবে এগোচ্ছে তা আদৌ সন্তোষজনক নয়। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা-খাতে ৩১৫৪ কোটি টাকার যে বরাদ্দ করেছেন তাতে অতিরিক্ত বাজেট সম্পদের পরিমাণ হল ৫৯৬ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ২৫৫৮ কোটি টাকা খরচ হবে কেন্দ্রীয় যোজনা খাতে এবং তা হবে এভাবে—সাধারণ সেবাস্রোত-বাবদ ৯ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় ৮ কোটি টাকা), সামাজিক এবং সমষ্টিগত সেবা বাবদ ৩৫৫ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় ৩৫২ কোটি টাকা), সাধারণ অর্থনৈতিক সেবামূলক কাজ বাবদ ৪৯ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় ৩৮ কোটি টাকা) কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কাজ বাবদ ২২৭ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় ২১৬ কোটি টাকা) শিল্প এবং খনি বাবদ ১২২১ কোটি টাকা। (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনা ৭২৯ কোটি টাকা), জল এবং শক্তি উন্নয়ন বাবদ ১১৭ কোটি টাকা (১৯৭৪—৭৫ সালের যোজনায় ৯৯ কোটি টাকা) এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৫৮০ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় ৬১০ কোটি টাকা)। সাধারণ অর্থনৈতিক সেবামূলক কাজের ভিতর কৃষি-সমবায় এবং সমবায়মূলক সার তৈরির কারখানা বাবদ যে ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে ৪৯ কোটি টাকা ওই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অপরদিকে জল ও শক্তি উন্নয়ন বাবদ যে ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে রাজ্য যোজনাগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে Rural Electrification Corporation-কে যে ৪০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা ধরা হয়নি। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রথম বছরে কেন্দ্রীয় যোজনায় ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২০৫৫ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় বাজেটে যোজনা-বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে , যোজনা খাত বহির্ভূত ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে খাদ্যসামগ্রী ও শক্তি এই দুটি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষি খাতে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৩ কোটি টাকা থেকে ২৭০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে সার উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ যেখানে ১৯২ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে ১৯৭৫-৭৬ সালের বিনিয়োগ আরও ৮৪ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। কয়লা শিল্প বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের ১৪১ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে ২২৯ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

পঞ্চম যোজনার দ্বিতীয় বছরেও প্রথম বছরের সব সমস্যাগুলিই আমরা দেখতে পাচ্ছি। মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা তো আছেই; তাছাড়া আছে বেকার সমস্যা। খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও দেশ এখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি। আমদানি-রপ্তানির ফাঁক এখনও খুবই বেশি। এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য যেভাবে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনাটিকে ঢেলে সাজানো উচিত তা এখনও করা হয়নি; শুধু একটি আর্থিক বছরে কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাকে মাপকাঠি করে যোজনার মূল্যায়ন করা চলে না। সম্প্রতি শিল্প ক্ষেত্রে যে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সরকার তা স্বীকার করেন না। সরকারের মতে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার প্রভাবেই জিনিস-পত্রের দাম ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারী মাসে খানিকটা কমেছে। মুদ্রা-স্ফীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষের (যাঁদের হাতে বর্ধিত ক্রয়শক্তির পরিমাণ খুব বেশি নয়) চাহিদা চূড়ান্ত পর্যায়ে আর বাড়তে পারে না। সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর জন্য সাধারণ মানুষের চাহিদাও প্রতিহত হয়। এভাবে যে ক্রেতা-প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় তার ফলে জিনিস-পত্রের দাম খানিকটা কমে। আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম যা কমেছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তা খুবই সামান্য। ১৯৬১-৬২ সালের গড় পাইকারী মূল্য সূচী ১০০ ধরলে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই মূল্যসূচী ছিল ৩২৮·২; এ বছর ২৫শে জানুয়ারী তা কমে দাঁড়ায় ৩১৪·৭; এখনও মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা যথেষ্ট বেশি। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যে জিনিসটির খুব প্রয়োজন তা হল উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু সম্প্রতি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে-ক্রমহ্রাসমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সক্রিয় প্রচেষ্টা সরকারের দিক থেকে আশা করা হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে তা আশানুরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। যোজনায় শিল্পখাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হল সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শিল্প বিনিয়োগ বাড়বার পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে কিনা তা-ও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। যোজনা খাতে যে অর্থ ব্যয় হবে তার সংস্থান করার জন্য সরকারকে আবার ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় নিতে হবে। তাতে দেশের মূল্য-স্তরে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব হবে না। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন। কিন্তু কৃষিজাত উৎপাদন বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সুষ্ঠু বণ্টনের এবং ন্যায্য দাম নির্ধারণের জন্য কী সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সে সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলেননি।

সুব্রত গুপ্ত

॥ সাতাশি ॥
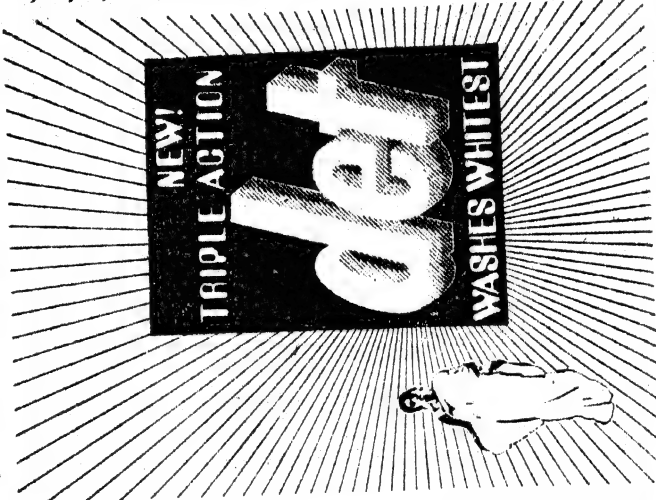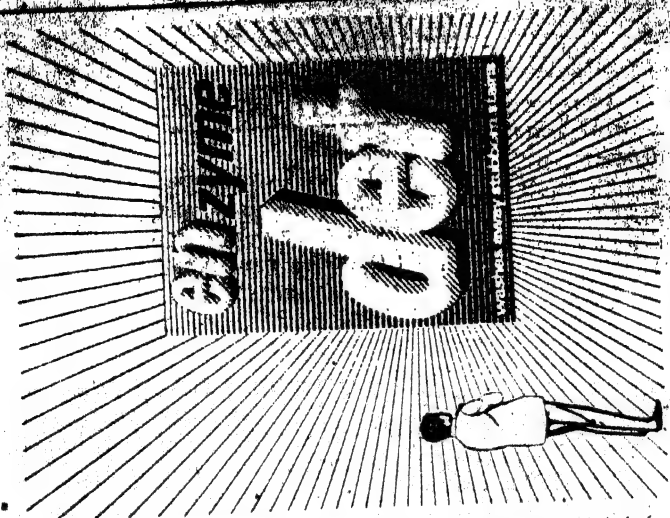
ত্রিদিবেশ জয়ার সঙ্গে হাসবে কী না, স্থির করতে পারে না, এবং ওর আনন্দিত হওয়া উচিত কী না, তাও সম্যক ধারণা করতে পারে না। কিন্তু ওর বাস্তব রূপের জয়া, জয়ার হাসির মতোই ভেঙে যেতে থাকে, এবং মনে হয়, জয়ার এই অদ্ভুত আচরণ, সম্ভবত তার নিজেরও অজ্ঞাত। শিউলির সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে কেমন রহস্যময়ী হয়ে ওঠে, আবার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করে, ত্রিদিবেশের সঙ্গে জি বি-তে যাওয়ার। ত্রিদিবেশ কী বলবে, সহসা ভেবে পায় না। জয়া এখনো ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে, হাসি দমনের চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, শরীর কাঁপে, এবং প্রকৃতই যেন তার শাড়ির লাল ফুলগুলো নতুন করে ফুটতে ফুটতে ডাগর হয়ে ওঠে, এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে স্তন। যে-কারণে স্খলিত হয় দক্ষিণ আঁচল, লাল জামায় অতি উচ্ছ্রিত পীন বুক হাসে। ত্রিদিবেশের চোখে চকিতে ভেসে ওঠে কাঁটাতারের তীক্ষ্ণ বেড়া, রক্ত পটভূমির বুকে, কোনো একটা চেনা ছবি। কেন এই মুহূর্তে জয়ার লাল জামায় ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া পীন বুকের দিকে তাকিয়ে সেই ছবি জেগে ওঠে, ও জানে না।

'কী, ভয় পেয়ে গেলেন?' জয়া ভুরু কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করে, এবং যেন অতি যত্নে স্খলিত আঁচলের লাল পাড় দিয়ে বুক ঢেকে দেয়।

ত্রিদিবেশ অবাক স্বরে বলে, 'কিসের ভয়?'

'আপনার সঙ্গে জি বি-তে যেতে চাইলাম বলে?' জয়ার চোখে কৌতুকের দ্যুতি।

ত্রিদিবেশ বিব্রত হাসে, বলে, 'ভয় পাবো কেন? আপনি কি সত্যি জি বি-তে যাবেন?'

'আহ্, আপনি আপনি করবেন না তো।' জয়ার ঘাড়ে ঝাঁকুনি লাগে, নাকের ডগা কুঁচকে ওঠে, ঠোঁট ফুলে ওঠে পলকের জন্য, বলে, 'আমার মোটেও ভালো লাগে না।' জয়ার মুখ গম্ভীর দেখায়।

ত্রিদিবেশের মনে অন্য জিজ্ঞাসা, কিন্তু প্রসঙ্গের পরিবর্তনে, ও দ্বিধান্বিত চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। জয়া নিষেধ আরোপ করার মতো করে বলে, 'আপনি করে আর বলবেন না কিন্তু।' কিন্তু জি বি-তে যাবার কথা আর বলে না।

ত্রিদিবেশ ঈষৎ হাসে, বলে, 'তা হলে জি বি-তে যাবার কী হবে?'

'আপনি তো ভয় পাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে যেতে।' বলতে বলতে জয়া টেবিলের ধারে, আলমারির কাছে সরে যায়।

ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে বলে, 'না তো!'

'না তো আবার কী, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ভয় পাচ্ছেন।' জয়া আলমারির একটা পাল্লা খোলে, এবং আবার বলে, 'আপনি একলাই যান, আমি আর যাবো না। মেজদাকে বলবেন, আমি কলেজে যাইনি, বাড়িতেই ছিলাম।'

ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না, জয়ার কথার কী জবাব দেওয়া যায়। ওর ভয়ের কথা, জয়া কেন এতো জোর দিয়ে বলে, যা আদৌ সত্যি না। কিন্তু প্রতিবাদ নিরর্থক বোধ হয়। ও জয়ার শেষের কথার জবাব দেয়, 'বলবো। আমি তা হলে এখন বেরিয়ে পড়ি।'

জয়ার মুখে আলমারির দিকে তাকিয়ে, কিছু বলে না। ত্রিদিবেশ বিস্ময় ও বিভ্রান্তি বোধ করে, কারণ, জয়াকে ও বুঝতে পারে না। একবার জয়াকে দেখে, ও দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'শিউলিদি আপনার থেকে বড়, না?' জয়ার স্বরে জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়।

ত্রিদিবেশ থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। জয়ার মুখ ওর দিকে ফেরানো, যে-মুখে এখন গাম্ভীর্য নেই, চোখের তারায় কৌতুকের ছটা, এবং ঠোঁটের কোণে যেন মৃদু হাসি, রেখায় উদ্যত। প্রশ্নের আকস্মিকতায়, ত্রিদিবেশ বিস্মিত ও অতি বিভ্রান্ত, বলে ওঠে, 'না তো! কেন?'

'আমি সেইরকম শুনেছি।' জয়া বলতে বলতেই, মুখে হাত চাপা দেয়, যেন উদ্যত হাসি দমন করে, এবং যেন পরিহাসের ছলেই জিজ্ঞেস করে, 'রাগ করছেন না তো?'

ত্রিদিবেশ হাসে, কারণ রাগ না, কেমন একটা অপমান বোধ ওর মনকে, উত্তেজিত না করে, বিব্রত করে তোলে। জয়ার ভাবা ও ভঙ্গির মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে একটি নির্দোষ অভিব্যক্তি বর্তমান, যদিচ তা আদৌ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। ও বলে, 'না, রাগ করবো কেন। আমি এখন যাচ্ছি।' ও দরজার দিকে মুখ ফেরায়।

'আমি মনে করেছি, শিউলিদি বড় বলে, তাকে আপনি ভয় পান।' জয়া বলে ওঠে, এবং আলমারির কাছ থেকে সরে আসে।

ত্রিদিবেশ ভেজানো দরজার একটি পাল্লা খুলে জয়ার দিকে ফিরে তাকায় এবং কোনো জবাব না দিয়ে একটু হাসে। ওর মনে হয়, জয়ার চোখে ও ঠোঁটের হাসিতে কৌতুকের রঙ। ও চৌকাঠে পা বাড়াতে উদ্যত হতেই,

জয়া প্রশ্ন করে, 'আপনি শিউলিদির ছবি কখনো এ'কেছেন?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'অনেক।'

'অনেক? কী রকম?' জয়া বলতে বলতে দরজার কাছে এগিয়ে আসে এবং আবার জিজ্ঞেস করে, 'শুধু পোর্ট্রেট, না অন্য কিছু?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'অনেক রকম। যখন যে-রকম ভালো লেগেছে। ওর রান্না করা, সেলাই করা, ঘুমিয়ে থাকা, চুল-বাঁধা—নানান রকম। কেন?' ওর জিজ্ঞাসার কোনো বিস্ময় বা কৌতূহল নেই।

'এমনিই। আশ্চর্য তো!' জয়া বলে ওঠে এবং হঠাৎ ওর মুখে লাল ছটা লেগে যায়. জিজ্ঞেস করে, 'ন্যুড ছবিও এ'কেছেন নাকি?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'আঁকতে চেয়েছিলাম, ও রাজী হয়নি, লজ্জা পায়।'

জয়া ত্রিদিবেশের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং তৎক্ষণাৎ আবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'অন্য কারোর ন্যুড এ'কেছেন?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'না। বিদেশের ছবি থেকে নকল করে এ'কেছি।'

জয়া কোনো কথা বলে না এবং এমন অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সে ত্রিদিবেশকে দেখে না। ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে বলে, 'যাচ্ছি।' এবং চৌকাটের বাইরে পা দেয়।

'ত্রিদিবেশদা, শুনুন, আবার কবে আসবেন?' জয়া ব্যস্ত স্বরে বলে, এগিয়ে আসে দরজার কাছে।

এতোদিন এ বাড়িতে যাতায়াতের মধ্যে, এরকম প্রশ্ন এই প্রথম। এখানে আসা যাওয়া প্রশ্নের অতীত। প্রয়োজন বা ইচ্ছা হলেই আসা যায়, ইন্দ্রনাথের সেই রকম ঢালাও অনুমতি। ত্রিদিবেশ জয়ার আচরণে ও ভাবায় এখন আর বিস্মিত হয় না, খানিকটা অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'যে কোনো সময়েই এসে পড়বো।'

'আসবেন কিন্তু।' জয়া দরজার পাল্লায় হাত রেখে বলে।

ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে বারান্দা থেকে উঠানে নামে। সমস্ত বাড়ি এখনো স্তব্ধ। ও সদর দরজার কাছে গিয়ে কাঠের ভারি হুড়কো শব্দ না করে খোলে। এবং একবার ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের ঘরের দরজার দিকে তাকাবে ভেবেও, না তাকিয়ে লোহার গজাল পোঁতা ভারি আর বড় পাল্লা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। শীতের দুপুরের নির্জন পাড়ার রাস্তা। ত্রিদিবেশ পায়ের দিকে তাকায়. চটির চাপে ফাটা ঘায়ে ব্যথা অনুভূত হয়, ও পা টেনে টেনে চলে, যেন চাপ না লাগে এবং এখনো ওর চোখের সামনে জয়ার মুখ—স্পষ্টতই সেই মুখে একটা সন্দেহ ছায়া। জয়ার 'আসবেন কিন্তু' বলার মধ্যে যেন সেই সন্দেহের সুর, ত্রিদিবেশ হয়তো আর আসবে না। এই রকম বলার কী অর্থ? ত্রিদিবেশের চোখে মুখে কি সেই রকম কোনো অভিব্যক্তি জেগেছিল? ত্রিদিবেশ জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে একটা আহত বিষণ্ণতা ওর প্রাণ জুড়ে। জয়ার কথাবার্তা আচরণ তার জন্য দায়ী। জয়ার অকারণে পা ধোওয়া, অন্যরকমভাবে না জানিয়ে বাইরের বাড়িতে থাকা এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মধ্যে আর এক জয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। ত্রিদিবেশের মনে সেই অনুভূতি এখনো তীব্র, জয়া যেন ওর সঙ্গে এক ধরনের নিষ্ঠুর রঙ্গ করছিল, যার মধ্যে অপমান আর বিদ্রূপ জড়িয়েছিল। অভূতপূর্ব জয়ার সেই উক্তি, শিউলি বয়সে বড়, অতএব ত্রিদিবেশ তাকে ভয় পায়। জয়াকে ওর অচেনা লাগে, আলাদা একটি মেয়ে অথচ একান্ত বাস্তব কিন্তু অতি অপ্রত্যাশিত।

ত্রিদিবেশের মনের বিষণ্ণতা, দুঃখে রূপান্তরিত হতে থাকে। ও বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে, পথ বদলায়, এবং একটি সরু গলির ভিতর দিয়ে পূব দিকে অগ্রসর হয়। পকেট থেকে দুমড়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই বের করে একটি সিগারেট ধরায়। দুঃখের অনুভূতির মধ্যে ওর ধারণা হয়, জয়ার আচরণ পূর্বনির্দিষ্ট না। সম্ভবত জয়াও জানে না, তার বাস্তব ভাবনা চিন্তা থেকে তার আচরণ কথাবার্তা ভিন্ন, এবং কেন, তাও নিশ্চয় জয়ার অজ্ঞাত। কিন্তু প্রসঙ্গ উঠলে, জয়া নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতো। *তার প্রতিবাদের কথা ত্রিদিবেশ ভোলে নি।*

গলির শেষ প্রান্তে কয়েকটি বস্তির পরেই, শীতের শেষ বেলার রোদ মাখা মাঠ, আর গাছপালা এবং রেল লাইন দেখা দেয়। এক পাশে কারখানার বয়লারের ছাইয়ের বিশাল ডাঁই, পাহাড়ি টিলার মতো উঁচু। সেখানে সব রকম বয়সের মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, কয়লার টুকরো খুঁজে খুঁজে চুপড়ি ভরতি করে। দু তিনটি কুকুর, আর ছোট শিশুরা ছাইয়ের ঢিবিতে খেলা করে। মা ছাই খোঁচায় কয়লার সন্ধানে, শিশু মায়ের খোলা বুকে মুখ রেখে ক্ষুধা মেটায়। ত্রিদিবেশ ঢিবির পাশ দিয়ে, রেললাইনের ধারে যায় এবং হঠাৎ ওর মায়ের কথা মনে পড়ে। মা এবং বাড়ির কারোর সঙ্গেই বহুকাল ওর দেখা সাক্ষাৎ নেই। এখন বিশেষ করে মায়ের কথাই মনে পড়ে কিন্তু মায়ের মুখটা ও কিছুতেই স্পষ্ট মনে করতে পারে না। শাদা থান পরা, মায়ের মুখের আদলটা কেবল চোখের সামনে ভাসে। অনেক সময়েই খোলামেলা জায়গায় এলে, মায়ের কথা ওর মনে পড়ে। তবু মায়ের মুখটা কখনোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। মায়ের চোখ মুখ নাক চিবুক, সবই আলাদা আলাদা করে চোখের সামনে ভাসে, কিন্তু সব মিলিয়ে, সেই বিশিষ্ট মুখটি ভেসে ওঠে না। ত্রিদিবেশের কথা কি মায়ের কোনো সময়ে মনে পড়ে? কথাটা মনে হতেই, বুকে যেন একটা খোঁচা লেগে যায় এবং ও হঠাৎ হেসে উঠে, হাত দুটো আকাশের দিকে বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু চোখ দুটো মুহূর্তেই ছলছলিয়ে ওঠে।

মামার মুখ নির্বিকার ও গম্ভীর। গৃহত্যাগের অনেক আগে থেকেই ত্রিদিবেশের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ, যদিচ প্রকৃতপক্ষে ও কখনোই মামার ঘাড়ের বোঝা ছিল না। যে-বাড়িতে ত্রিদিবেশ থাকতো, পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে তার মালিক মা। মামার আলাদা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ভগ্নীর বাড়িতেই বাস করেন, কারণ তিনি চিরকুমার। ত্রিদিবেশের ভরণপোষণের দায় ছিল, ওর মা আর দাদাদের। দাদাদের মুখ মানেই, বিরক্ত ক্রুদ্ধ, এবং এখন মায়ের মুখ অস্পষ্ট হলেও মামা আর দাদাদের মুখ অবিকল চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড় বউদির মুখও মনে পড়ে, একটি অতি সুখী মুখ, লাল তাঁর কালো চুলের সিঁথি এবং তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁট, দুই পায়ের আলতা। ভালবাসেন দাদাকে, স্নেহ করেন সন্তানদের এবং আর যার যা প্রাপ্য তা মেটান নিয়মমাফিক। ত্রিদিবেশকে করুণা করতেন, এবং কখনো কখনো মানুষ হবার জন্য উপদেশের সঙ্গে আট আনা বা একটি টাকা দান করতেন। ত্রিদিবেশের বুকের মধ্যে আবার একটা ঢেউ লাগে, ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকা[illegible]। ওর মুখে রোদ লাগে, সূর্যের দিকে [illegible]কিয়ে থাকতে কষ্ট হয় না। মা কি [illegible]ন ছাদে বসে, এই শেষ রৌদ্রটুকু গায়ে লাগায়? বাড়ি থেকে রেল লাইনটা অনেক দূরে।

ত্রিদিবেশ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অবশিষ্টাংশ ফেলে দেয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, ইন্দ্রনাথের পুরো হাতা টুইলের সার্টের হাতা দিয়ে চোখ মোছে। প্রতিটি পদক্ষেপেই স্টেশন এগিয়ে আসে কিন্তু গাড়ি কখন, জানা নেই। জেনারেল বডির সভা বিকাল চারটেয়। উপস্থিত থাকা পার্টির বিশেষ নির্দেশ প্রতিটি সভ্যের। ত্রিদিবেশ মাথায় হাত ঘষে এবং নাকের কাছে এনে গন্ধ শোঁকে, অনুভূতি আমোদিত হয় এবং হঠাৎ হুগলির রেল সেতুর সেই ভয়ংকর স্বপ্নের বিষয় মনে পড়ে। কেন এই স্বপ্ন এবং তারপর কী? কিছুই না, শিউলির বা ছেলের নীচে পড়ে যাবার কোনো ব্যাপার নেই এবং ওর ঘাড়ের

ওপরে গ্যাড়িটার হুমড়ি খেয়ে পড়াও অবাস্তব কারণ সমস্ত ঘটনাটাই স্বপ্ন। কিন্তু কী ভয়াবহ, বিশেষত রাখাল আর রশীদের সেই লাফিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া, যার নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই সম্ভব না। কারণ এটা, কাঁচরাপাড়া বা ইছাপুরের বা এমন কি উল্টোডাঙার রেল সেতুও না, তার থেকে অনেক—অনেক উঁচু। কিন্তু মোহন হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তার বদলে, ছেলে কোলে শিউলির আবির্ভাবই বা কেমন করে হয়েছিল। ত্রিদিবেশ অবাক হয়, কারণ রেল গাড়িতে ছাড়া, হুগলি সেতুর ওপর দিয়ে ও কখনো হেঁটে যায় নি। যাওয়া যায় না, কারণ, সেতুর দুই পারে, চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরী থাকে।

ত্রিদিবেশকে চমকিয়ে দিয়ে এঞ্জিনের হুইসল্ বেজে ওঠে। ও সামনে তাকিয়ে দেখতে পায়, আপ গাড়ি দ্রুত বেগে এগিয়ে আসে। প্ল্যাটফরম এমন কিছু দূরে না, তথাপি ও দৌড়ায় কারণ এখনো টিকেট কেনা বাকী। ও দৌড়ুতে দৌড়ুতেই পয়সার জন্য পকেটে হাত দেয়, কিন্তু প্ল্যাটফরমের মাঝামাঝি পৌঁছুতেই গাড়ি টিনের শেডে ঝমঝম প্রতিধ্বনি তুলে, ধোঁয়া ছড়িয়ে ঢুকে পড়ে। আপ প্ল্যাট-ফরমের প্রায় শেষ প্রান্তে বুকিং অফিস এবং সেখান থেকে টিকেট কিনে এ গাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। ত্রিদিবেশ ওর হাতের পয়সার দিকে তাকিয়ে সহসা নিজেকে অতি দীন বোধ করে এবং অপরাধের থেকেও অবজ্ঞা বিনা টিকেটে যেতে মনে মনে ভয় পায়, তথাপি দু আনা পয়সা, বাঁচাবার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে সামনের দরজা খোলা কামরায় উঠে পড়ে। বসবার আসনের সন্ধানে, ভিতরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হতেই কালো কোট একেবারে মুখোমুখি। মোটা বেঁটে ফরসা টাক মাথা কালো কোট চেকারটির চোখ দুটি নরম মাংসে ঢাকা, হাতে পেন্সিল। ত্রিদিবেশ তৎক্ষণাৎ, যেন ভল্লুকের থেকেও হিংস্র কোনো জানোয়ারের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু তার আগেই টুইলের সার্টের হাতায় টান পড়ে এবং গলার কলার কাঁধের কাছে নেমে যায়, একটি নিচু কঠিন স্বর শোনা যায়, 'বাবু কমনে চাঁদু, ইদিকে আসো।' ত্রিদিবেশের মনে হয়, জ্বলন্ত লোহশলাকা ওর শ্রবণে বিদ্ধ হয়, লজ্জায় নুয়ে পড়ে, কালো কোটের মুখোমুখি হয়ে শব্দ করে 'অ্যাঁ?'

'কিছু না, বলি, গাড়িতি উঠে আবার যাওয়া হতিছে কমনে?' ফরসা মুখের মাংস ঢাকা চোখ দুটো, ছুরির ফলার মতো চিক চিক করে ওঠে, কিন্তু লাল টকটকে মোটা ঠোঁটে হাসি, বলে 'বাবা কমনে? মাল কি আছে বার কর দিনি।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। ত্রিদিবেশের বুকের কাছে থরথর করে কাঁপে—ভয় না, লজ্জায় এবং ও কাঁটাতি অন্যেশরথে দেখে নেয় সকলের মুখ। দু একজনের কৌতূহলিত দৃষ্টি এদিকে, বাকীদের কোনো উৎসাহ বা লক্ষ নেই। ও তাড়াতাড়ি মুঠো বাড়িয়ে খুলে ধরে এবং বলে 'শ্যামনগরে যাবো।'

কালো কোট পয়সাগুলোর দিকে তাকায়, মোটা তর্জনী দিয়ে, নেড়ে চেড়ে গোনে এবং মাত্র একটি আনি রেখে বাদ-বাকী সব তুলে নিয়ে, কোটের পকেটে ফেলতে ফেলতে বলে, 'যাও, বাঁস পড়লা।' বলে অতি নির্বিকার ভাবে অন্য দিকে এগিয়ে যায়।

সমস্ত ঘটনাটি ঘটে যায় কয়েক পলকের মধ্যে। ত্রিদিবেশের মস্তিষ্ক এই মুহূর্তে চিন্তারহিত, যেন আকস্মিক আঘাতে অবশ।

'দেখি দাদা, যেতে দিন, বাথরুমে যাবো।' বলে একজন মধ্যবয়সী লোক ত্রিদিবেশের ঘাড়ে হাত দিয়ে এগিয়ে যায় এবং ধুতির কোঁচাটি এমনভাবে তুলে ধরে যেন মূত্রত্যাগে উদ্যত হয়ে, বাথরুমের দরজা খোলে। ক্রমশ

শরৎ রচনাবলী

(জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শরৎ সমিতি শিল্পীর সমগ্র রচনাবলী মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করছেন। প্রতি খণ্ডের আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা সাতশত। একটি করে আর্ট প্লেট। ঝরঝরে লাইনোটাইপে ছাপা। সুন্দর কাপড়ের মজবুত বাঁধাই ও সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। কেবল গ্রাহকদের জন্য পাঁচ খণ্ডের সহজ কিস্তিতে দেয় মোট মূল্য একশত টাকা। বর্তমান বছরের জুন/জুলাই থেকে পুস্তক বিতরণ করা শুরু হবে এবং আশা করা যায় ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সবক'টি খণ্ড বিতরণ করা সম্ভব হবে। বিশদ বিবরণ ও গ্রাহক হবার আবেদন পত্রের জন্য নীচের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন অথবা নাম ঠিকানা ও ২৫ পয়সার স্ট্যাম্প সহ ৯″×৪″ আকারের খাম পাঠান। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫।

সম্পাদক
শরৎ সমিতি
৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলকাতা ২৯

শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলকাতা ১২

প্রাণতোষ দাশ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৯

অভিনব বিশেষ উপহার !

তরকারি কাটার জন্যে
এই চমৎকার
স্টেনলেস স্টীলের ছুরিটি
মাত্র ২.৭৫ টাকায়
পাবেন

পেপ্সোডেন্ট (ইকনমি) কিনলেই
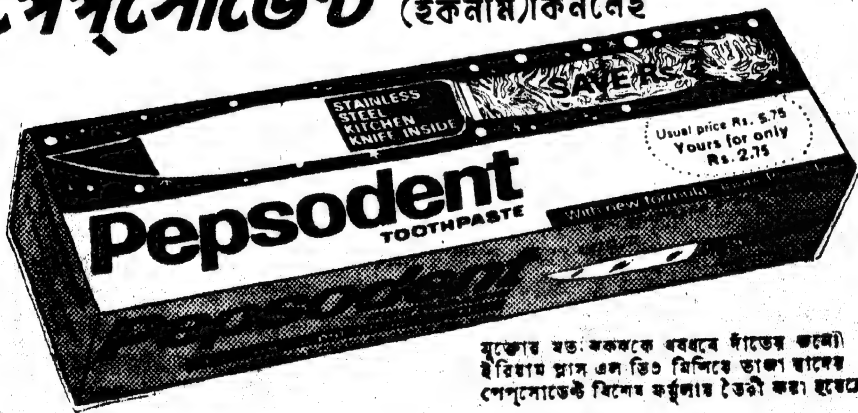
মুক্তোর মত ঝকঝকে ধবধবে দাঁতের জন্যে
ইরিয়াম প্লাস এল জি৩ মিশিয়ে তাজা স্বাদের
পেপ্সোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী করা হয়েছে।

পেপ্সোডেন্ট
ঝকঝকে ধবধবে দাঁতের জন্যে
(হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী)

শিগ্‌গীর। স্টক থাকতে থাকতে নিয়ে যান।

প্রচলিত স্টকও পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা ও বিহারে দেওয়া হচ্ছে

HT-HLP-8236

গত বৎসর এই সময়টায় বাংলা সাহিত্যে পর পর ইন্দ্রপতন হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ ঢাকা থেকে খবর এলো, সৈয়দ মুজতবা আলী আর নেই। আমরা তখন সংবাদপত্র অফিসে বসে ছিলাম; অকস্মাৎ এই সংবাদে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। গভীর শোকের প্রকাশ সরব হয় না।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে শেষ কয়েক বছর কলকাতাতেই দেখেছি। শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর তিনি কিছুদিন ছিলেন বোলপুরে বাড়ি ভাড়া করে। তারপর প্রায় পাকাপাকিভাবে কলকাতায় পার্ক রোডে। কখনো কেউ তাঁর বাড়িতে পাঁচ দশ মিনিট সময় হাতে নিয়ে গিয়ে পার পায়নি। সৈয়দ মুজতবা আলীর ঘরে সময় পাখা মেলে উড়তো। তাঁর জীবনে বোধ হয় নৈরাশ্যের কোনো স্থান ছিল না। বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় ন' মাস ধরে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রী-সন্তান-আত্মীয় পরিজনদের সংবাদ জানার জন্য, সেই সঙ্গে তাঁর জন্মভূমির ভাগ্য সম্পর্কেও। কিন্তু তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সার্থক চেলা, ব্যক্তিগত উদ্বেগকে কখনো বাইরে আসতে দেননি, তখনো হাস্য পরিহাসে বাইরের লোককে মাতিয়ে রাখতেন। মনে আছে, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের কাছাকাছি একটা হোটেলে আমরা কয়েকজন বসেছিলাম আলী সাহেবের সঙ্গে। সন্ধ্যার একটু পরে সংবাদপত্র অফিস থেকে একজন সংবাদ নিয়ে এলো, ঢাকায় শেখ মুজিব বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেছেন! শোনা মাত্র আমরা নানা রকম আলোচনায় লেগে গেলুম। পাকিস্তানী সামরিক শক্তির সঙ্গে নিরস্ত্র বাঙালীরা কতখানি লড়তে পারবে ('প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো')—এই সব আলোচনার মধ্যে আলী সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, বাঙালীকে কেউ কখনো হারাতে পেরেছে? ইতিহাসেই দেখো না—মোগল পাঠানদের আমলেও বাঙালীরা কতবার স্বাধীন হয়েছে ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল ইতিহাস আলোচনা। আলী সাহেব ছিলেন কলকাতার একটি প্রধান স্তম্ভ। নগরের গৌরব তাঁর শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের নিয়ে। আজকাল খবরের কাগজ পড়লে মনে হয় যেন রাজনৈতিক নেতারাই একমাত্র নাগরিক—কিন্তু আমরা জানতাম আলী সাহেব ছিলেন প্রথম সারির নাগরিকদের একজন।

শেষের দিকে তাঁর লেখা অনেক কমে এসেছিল ঠিকই। তবু একটা কথা মনে পড়ে, শেষ দিকে প্রায়ই তিনি বলতেন, গৌতম বুদ্ধের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। আধুনিক কালে গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত মূল্য অনেকেই ভুলে গেছে। হায়, সেই রচনাটি আমরা পড়তে পারলাম না।

সাহিত্য সংবাদ

সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যুবার্ষিকীতে কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে একটি স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গত বছর, ওই ঘটনার পরের মাসেই আর এক বজ্রপাত। ১৮ই মার্চের সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়ে একজন সহকর্মী জানিয়ে গেল, বুদ্ধদেব বসু নেই। সকালে প্রথম চোখ মেলেই এত বড় দুঃসংবাদ আমি আগে কখনো শুনিনি, ভবিষ্যতেও যেন শুনতে না হয়।

সৈয়দ মুজতবা আলী তবু মাঝে মাঝে রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে সে রকম কোনো কথা ঘুণাক্ষরেও শুনিনি। রীতিমতন সুস্থ, তাজা মানুষ, আর কি হাসির জোর! আর সেই রকমই অদম্য তাঁর কর্মক্ষমতা। সেই মানুষই মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিসে চলে গেলেন সব-কিছু ছেড়ে।

এক সময় প্যারিস বলতেই যেমন বোঝাতো জাঁ কক্‌তোর শহর, সেই রকম কলকাতাও ছিল বুদ্ধদেব বসুর। ছাত্র বয়েসে ঢাকা ছেড়ে আসার পর তিনি সেই যে কলকাতায় এসেছিলেন, তারপর আর নড়েননি। মাঝখানে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কলকাতাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শহর। বেশ একটু কুঁড়ে ধরনের লোক, বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতেন কদাচিৎ। খুব কম সভা-সমিতিতেই দেখা যেত তাকে। নিজের বাড়িতে আড্ডা জমলে তিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অন্য কারুর বাড়িতে আড্ডা দিতে গেছেন, এমন আমি কখনো দেখিনি—কদাচিৎ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা জ্যোতির্ময় দত্তের বাড়িতে ছাড়া।

বিদেশে থাকার সময়েও তাঁর মন পড়ে থাকতো কলকাতায়। অনেকের কাছে লেখা বহু চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। যে-মানুষ দুই-তৃতীয়াংশ বিশ্ব ঘুরে এসেছেন বেশ কয়েকবার, তিনিও মনে করতেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়েদের দেখা যায় শেষ বিকেলের দিকে কলকাতার গড়িয়াহাট-রাসবিহারীর মোড়ে।

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বুদ্ধদেব তাঁর লেখা নিয়ে পরিশ্রম করে গেছেন। সেই দিনই সদ্য সমাপ্ত করেছেন তাঁর 'মহাভারতের কথা'র পরিমার্জন ও প্রুফ সংশোধন। তাঁর এই প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারটা যে কি বিপুল পরিশ্রমের ছিল, যাঁরা দেখেননি বুঝতে পারবেন না। কিংবা পারবেন, বালজাকের জীবনী পড়লে। এ ছাড়াও তাঁর টেবিলের ওপর পাতা ছিল একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, তাঁর স্মৃতিকথার তৃতীয় খণ্ড, নতুন একটা পরিচ্ছেদের সংখ্যাটা শুধু লেখা—তার নিচের অংশ সাদা। আর শেষ হলো না। আমার ধারণা, তাঁর প্রাপ্য ছিল অন্তত আরও পনেরো বছর আয়ু এবং আমাদের প্রাপ্য ছিল আরও পনেরোখানা বই।

লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। এই মাসেই তাঁর জন্ম-তারিখ। কয়েক বছর আগে তিনিও চলে গিয়েছিলেন দুম্‌ করে। লেখক হিসেবে যেমন ছিলেন অক্লান্ত, অধ্যাপক হিসেবেও ছিলেন সমান জনপ্রিয়। আমি তাঁকে এই দুই রূপেই দেখেছি। মৃত্যুর মাত্র দু-দিন আগে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। গাড়িতে একসঙ্গে গিয়েছিলাম অনেকখানি রাস্তা, সরস গল্পে আগাগোড়া মুগ্ধ করে রেখেছিলেন আমাদের। তখন ধারণাও করতে পারিনি, তাঁর মাথার মধ্যে বাসা বাঁধছে এক তীব্র যন্ত্রণা, যা হরণ করে নিয়ে যাবে তাঁর প্রাণ।

৩০শে মার্চ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে সকালবেলা অবন মহলে একটি স্মরণসভা হচ্ছে।

সনাতন পাঠক

উত্তরবঙ্গ লেখক সম্মেলন

গত ৭—৯ মার্চ বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তিনদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ডঃ অমিয়কুমার সেন, ডঃ সুধীর করণ, আশিস সান্যাল প্রমুখ। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অশ্রুকুমার সিকদার, ডঃ বিমলেন্দু দাস, নিশীথরঞ্জন আচার্য, কালিদাস ভট্টাচার্য, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী প্রমুখ।

আসানসোলে কবি-সম্মেলন

কবিতাপত্র গঙ্গোত্রী পরিষদ (আসানসোল শাখা) ও স্থানীয় বিকাশ-এর উদ্যোগে ২রা মার্চ ভুরাণ্ড ইনস্টিটিউটে একটি কবি সম্মেলন হয়ে গেল। বাংলা, বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তরুণ কবিরা এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রথম অধিবেশনে গান, কবিতাপাঠ ছাড়া মধুসূদনের ১৫০ বছর পূর্তিতে কথিকা পাঠ করেন—ডঃ সুশীল রায়। কবির গান ও 'বীরাঙ্গনা' নৃত্যনাট্য লীলা রায়ের পরিচালনায় পরিবেশিত হয়। সমাগত দর্শকদের সঙ্গে আমন্ত্রিত কবিদের পরিচয় করিয়ে

সেন গঙ্গোত্রীর মূল সম্পাদক শান্তনু দাস।

বৈকালিক অধিবেশনে কবিতা পাঠ করেন—দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, অনন্য রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গৌতম গুহ, মৃণাল বসুচৌধুরী, পলাশ মিত্র, ভোলানাথ শীল, শান্তি সিংহ, প্রফুল্ল মিশ্র, মতি মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল অধিকারী, হরিপদ দে, প্রদীপ রায়চৌধুরী, দিলীপ পাত্র, নলিনীরঞ্জন মিত্র ও শান্তনু দাস প্রমুখ কবিরা। এছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বীরভূম, বিহার, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ১০০ জন কবি বিভিন্ন স্বাদের কবিতা শোনান। মঞ্চ পরিচালনা করেন—তরুণ রায়চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল জনপ্রিয় শিল্পী গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেনের মনমাতানো রবীন্দ্র নজরুল রজনীকান্ত, পুরাতনী সঙ্গীতের আসর। এ অনুষ্ঠান বহু কাল শ্রোতাদের স্মৃতিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় দিন ৩রা মার্চ সন্ধ্যায় আসানসোল ক্লাবের মুক্তাঙ্গনে স্থানীয় কবিদের সঙ্গে আলোচনা কবিতা পাঠ ও মাত্র গঙ্গোত্রী পরিষদের উপস্থিতিতে রোটারী ক্লাব আয়োজিত নৈশ ভোজসভায় আলোচনা করেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

শহর কলকাতা থেকে শতাধিক মাইল দূরে দুদিন ব্যাপী কবিতার এরকম বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হওয়া একটি বিরল ঘটনা।

চিঠিপত্র

কবিতা ও গান

৮ মার্চের সংখ্যায় সাহিত্য-সংবাদে সনাতন পাঠক লিখেছেন,—গানের থেকে কবিতা সরে এসেছে অনেক দূরে। আধুনিক যুগের এই ছাড়াছাড়ির ফলে, সনাতন পাঠক মন্তব্য করেছেন,—(১) কবিতা অনেকটা সরে এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে, (২) গানের বাণীগুলি রচনার ভার চলে গেছে অ-কবিদের হাতে।

সনাতন পাঠক ঠিকই বলেছেন গানের কাছ থেকে আধুনিক কবিতা সরে এসেছে অনেক দূরে। আধুনিক কবিতার সঙ্গেও গানের মুখ দেখাদেখি নেই। তবে সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দকে এ প্রসঙ্গে আধুনিক কবি না বলাই ভালো। আধুনিক কবিতার নিরিখে তাঁরা প্রাচীনপন্থী মুক্ত কবি। সুধীন্দ্রনাথের উটপাখি, বুদ্ধদেবের কঙ্কাবতী, জীবনানন্দের বনলতা সেন সার্থক সুরকারের স্পর্শে সহজেই গান হয়ে উঠতে পারে, যেমন হয়েছে পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সলিল চৌধুরীর নিষ্ঠায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা।

কেন এই অনতিক্রমনীয় দূরত্ব? তার কারণ কবিতা ও গানের যে চিরন্তন সমধর্মিতা তা থেকে আধুনিক কবিতা বিচ্যুত। গানের তিনটি উপকরণ,—তাল, সুর ও অলঙ্কার। কবিতারও তিনটি উপকরণ,—ছন্দ, মিল ও অলংকার। উপকরণে উপকরণে মিল হলেই কবিতা গান হবার সুযোগ পায়। আধুনিক কবিরা তিনটি উপকরণই ত্যাগ করেছেন।

ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ একাত্তর বছর বয়সে গদ্য-কবিতা রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন (পুনশ্চ)। তবু আশি বছর বয়সের 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তিনি মিলকে ত্যাগ করেননি (ঐ মহামানব আসে), ছন্দকে পরিহার করেননি (তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি)। আর অলংকার? কাব্যলক্ষ্মীকে দিনে দিনে যে অতুল অলঙ্কারে তিনি সাজিয়েছিলেন, তাতে বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর শুভ্রতনুও হিংসায় পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল।

ছন্দ মিল অলংকার কাব্য শিল্পের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হায়, আধুনিক কবিতার সঙ্গে অলঙ্কার কোথায়,—শুধু তো দুর্বোধ্য শব্দ শৃঙ্খল!

কীসের শৃঙ্খল আসলে? সনাতন পাঠকের মতে, অভিমান আর অহংকারের। গান কেমন? একাকী গায়কের নহে তো গান,—গাহিতে হবে দুই জনে। লিরিক কবিতার অঙ্গনেও পাশাপাশি অন্তত দুজনের আসন। তুমি আর আমি। তুমিই উত্তম পুরুষ, তোমার পরে আমি। আমার প্রভু আর আমি, আমার প্রেমিক আর আমি, আমার সমাজ আর আমি, আমার বিশ্বপ্রকৃতি আর আমি। কিন্তু আধুনিক কবি একাসনে আসীন। আমি শুধু আমি, আমি ছাড়া আর কেউ নয়। নিছক অহং নিয়েই অহংকার। সনাতন পাঠক বলেছেন, কঠিন বর্মের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখছে আধুনিক কবিতা। কীসের বর্ম? কবির আমিত্বের বর্ম।

সনাতন পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন, গানের বাণীগুলি রচনার ভার অ-কবিদের হাতে চলে যায় নি। আধুনিক গীতি রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করে করে তাঁদের কবিত্ব শক্তির সমালোচনা না করেও আমার সঙ্গে বলতে পারি, তারা কবি। এবং কবি বলেই তাদের কাব্য সুরের স্পর্শ পায়।

নিভৃত কক্ষে একলা শ্রোতাকে গভীর রাতের রেডিয়ো যে গান মোহিত করছে, প্রেক্ষাগৃহে এক হাজার দর্শক যে গান প্লে-ব্যাকে শুনে তৃপ্তির সঙ্গে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে, কনফারেন্সের গলদঘর্ম ভিড়ে ঠেসাঠেসি বসে পাঁচ হাজার শ্রোতা প্রিয়শিল্পীর গলায় যে গান শুনে শিহরিত হচ্ছে, গ্রামোফোন ডিসকে ছাপা হয়ে যে গান শত শত কপি বিক্রী হচ্ছে,—সে গানের বাণী, রচয়িতা অ-কবি হবেন কেন? এই 'যুগ-যন্ত্রণার' যুগেও যে গান অগণিত লোককে দুঃখের কথা বলে কাঁদায়, খুশির কথা বলে হাসায়, আর ভালবাসার কথা বলে মেলায়—সে গান যিনি লিখেছেন তিনি কবি নন?

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—২৯।

দিব্যকরুণা। প্রকাশক : শ্রীঅশোকনাথ দন। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅরবিন্দ স্থান, ...রাচল, বিরাটী, কলি-৫১; শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ সেক্সপীয়ার সরণী, কলি-১৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

দিব্যভাবনা থেকে আসে দিব্যস্বপ্ন আর মহাসঙ্গে জীবন ধন্য হয় দিব্যকরুণায়। শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেক চূড়ামণিতে তিনটি দুর্লভ বস্তুর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়। দিব্যকরুণায় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার পাঁচজন মহাসঙ্গীর দিব্যানুভূতির অন্তরঙ্গ কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন কবি নিশিকান্ত, বিদ্যাবতী কোকিল, হৃদয়, জীবেন্দ্র, মতীন দাস।

কবি নিশিকান্তের নাম বাঙালী পাঠক সমাজে পরিচিত কিন্তু তাঁর জীবনঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে এই বই। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সান্নিধ্যে যাঁর জীবন শুরু পণ্ডিচেরীতে শ্রীমার চরণ বুকে চেপে ধরে তাঁর মহাপ্রয়াণ। এর মাঝে যে জীবন, সে জীবন শুধু সাধনার, শরীরের উপর মনের প্রভুত্বের ইতিহাস, দিব্যকরুণার উদ্ভাস। অসুস্থ শরীরে মাঝে মাঝে কবি যে স্মৃতিচারণা করে গেছেন সেই শ্রুতিলিখনের উপর নির্ভর করে এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের স্মৃতি সংযোজনায় কবি নিশিকান্ত পরিচ্ছেদটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় বড় দ্রুত শেষ হয়ে গেল। নিজের জীবন সম্পর্কে কবির নিজের বর্ণনা এমন একটা অনাসক্ত সত্যভাষণের রূপ নিয়েছে, যা আমাদের দীর্ঘ দিনের সংশয়—আত্মজীবনী লেখা সম্ভব নয়—সেই সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করেছে। কবি নিশিকান্তের হাতে প্রকৃত অহংশূন্য আত্মজীবনী নিদারুণ খুলত।

কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অলকানন্দা' (জানুয়ারী ১৯৪০) পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত পত্রে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "অলকানন্দা.....পড়ে বিস্মিত হলুম।...ভাষা এবং ছন্দের মধ্য দিয়ে তুমি যে বাণী শিল্প রচনা করেছ, রসজ্ঞমাত্রেরই কাছে তা সমাদৃত হবে।" নিশিকান্ত সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা কবিগুরুর এক চিঠি থেকে—

> **এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই**
>
> দেশ পত্রিকার আগামী সাহিত্য সংখ্যায় এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই-এর তালিকা প্রকাশ করা হবে। পুস্তক-প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁরা যেন ১৯৭৪ সালের মে মাস থেকে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকা আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরে পাঠিয়ে দেন। বইয়ের সঙ্গে লেখকের নাম, বিষয়, দাম ও প্রকাশের তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

'এ পরিণত লেখনীর রচনা ছন্দের তরঙ্গভঙ্গের উপর দিয়ে ভাবে ভরা ভাষা পাল তুলে দিয়ে চলেছে নিরাপদে।'

কবির নতুন জীবন শুরু হয় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার চরণসান্নিধ্যে। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবি নিশিকান্ত পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। প্রথমে আশ্রমের ডাইনিং রুমে রান্নার কাজ করেছিলেন, তারপর কিছুদিন আশ্রমস্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক। এরপর শুধু কাব্যসাধনা ও শিল্পসাধনা একটানা পনের বছর। কবির আঁকা অসংখ্য ছবি আশ্রমের আর্টগ্যালারী ও ডাইনিংরুমে শোভা পাচ্ছে। ছবিতে রঙ প্রয়োগ সম্পর্কে কবির নিজস্ব একটা দর্শন ছিল : সব রঙেরই একটা নিজস্ব বাণী আছে, তার ভাব আছে। মনটাকে নীরব করে কোন একটা রঙের দিকে যদি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাক তাহলে শুনতে পাবে সেই অনাহত বাণী। একটি ফুল যেমন করে কথা বলে তার রঙে, বিন্যাসে, ছন্দে, সুষমায়—এও অনেকটা সেইরকম।... আমি অনেক সময় কবিতায় যা বলতে চেয়েছি অথচ বারবার চেষ্টা করেও পারিনি, সেটা হঠাৎ একটা তুলির টানে, রঙের বর্ণকম্পনে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।'

প্রথম দিকে কিছু চিত্রধর্মী কবিতা লিখেছিলেন, যেমন, 'তিন রঙা ছবি/মজুরে চাই/সবুজ বসুজ মাঠ/তারই মাঝে চরে/অলস পাটল গরু/দাঁড় কাক তার পিঠে বসে আছে চিক্কণ কালো।' পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত কবিতাই ছিল শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাকে ভগবান ভগবতী রূপে প্রত্যক্ষ করে তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য—অন্য কোন ভাব কোন আবেগ-স্পন্দন সেখানে স্থান পায়নি। সেই কারণেই প্রথম দিকে যে কবিতা কবির কলম থেকে ঝরেছে, যেমন : ছয় মাস আগে কলেজ ছেড়েছ?/শেলী পড়েছ তো, কবি ব্রাউনিং?/ঘরের কোণের হার্মোনিয়ামটা তোমার বুঝি/বাজাতে জান তো?/গাওতো একটা নজরুল ইসলাম। সেই একই কলমের পরিবর্তী ভিন্ন প্রকাশ : মরণ বাসরে খেলিতে এসেছি জীবন খেলা/মর্ত্যের জীব —তবু আকণ্ঠ অমৃত চাই/শ্মশানের বুকে সাধনা আমার নিশীথ বেলা/শবাসনে বসে

পদে পদে আমি বিস্ময়ের পাই। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের কবিতাগুলি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—'আমার পক্ষে এ-সব বড় বেশি যৌগিক'। অবশ্য পরে তাঁর মত পাল্টেছিল। কবির প্রায় সমস্ত কাব্য পড়ে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং অদ্ভুত প্রশংসায় বারে বারে লিখেছেন, ভেরি ফাইন; এক্সিডিঙ্গলি বিউটিফুল, ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড অরিজিন্যাল।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শান্তিনিকেতনে 'তপতী' নাটকের মহড়া চলছে। এমন সময় বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু-সংবাদ এসে পৌঁছল। এই নিদারুণ সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কি পরিমাণ বিচলিত হয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষের বর্ণনায় পাই তার পরিচয়ঃ "বারবার তিনি তাঁর পাঠের খেই হারাতে লাগলেন। বহু-বার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহড়া বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন—সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,/হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ॥...এ গানটিতে যে তাঁর অন্তরের কি তীব্র বেদনার প্রকাশ, আজ সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না।"

গানটির পিছনের এই প্রেরণা যিনি, তাঁকেও কি সকলে সেভাবে জানেন? শুধু যতীন দাসের কথা কেন, বহু বিপ্লবী সম্বন্ধেই আজ আমাদের অনেকের ধারণা বেশ অস্পষ্ট। তরুণকুলের সঙ্গে এঁদের পরিচয় সেভাবে ঘটেনি, ঘটানো হয়নি। সন্তোষকুমার অধিকারী রচিত **শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন** (জে এন ঘোষ অ্যান্ড সনস্‌, কলকাতা-১২, চার টাকা) গ্রন্থটি হাতে পেয়ে কথাটি বিশেষভাবে মনে পড়ল।

বোঝা যায়, যতীন দাসের জীবন সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ লেখার ইচ্ছে ও উপকরণ সন্তোষবাবুর ছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কিত অনেক বই ঘেঁটেছেন তিনি, যতীন্দ্রনাথের সহচর ও বিপ্লবী জীবনের বন্ধুবান্ধবদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে যোগাড় করতে চেয়েছেন কিছু অজ্ঞাত অপ্রকাশিত তথ্য, তৎকালীন পত্রপত্রিকার আশ্রয় নিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিধানসভার বিবরণী থেকে আকর্ষণীয় আলোচনা ও বিতর্কের অংশের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করে-ছেন। এর ফলে বইটির গ্রন্থমূল্য নিশ্চিত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গি, এই গ্রন্থে, কিছুটা সাদামাটা ধরনের। এমন বর্ণময় রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনী পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি কোথাও যেন জমে উঠল না। তথ্যের ভারও কিছুটা মুক্ত করা যেত, যদি পাশাপাশি ইংরেজী ও তার বাংলা অনুবাদ না দিতেন। ইংরেজী উদ্ধৃতির—সত্যি কথা বলতে কি—কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সন্তোষবাবুর অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ। এই স্বাচ্ছন্দ্য মূল গ্রন্থে কেন নেই, বোঝা গেল না। তা সত্ত্বেও, শুধু বিষয়গৌরবেই বইটি নিশ্চিত আদৃত হবে।

*

সুনীল চৌধুরীর 'পাহাড় পাহাড় খেলা' বইটি নিয়ে কিছুকাল আগে এই স্তম্ভেই আলোচনা হয়েছে। অনুরূপ বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থ প্রাণেশ চক্রবর্তীর **রক ক্লাইম্বিং** (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২, চার টাকা)। সুপরিচিত পর্বতারোহী ও অভিজ্ঞ শৈলারোহণ শিক্ষক প্রাণেশবাবুর বইয়ের নামটি ইংরেজীতে দেওয়া হল কেন জানি না। 'পাহাড়ে চড়া'-র মতো সরল অনুবাদেই তো দিব্য কাজ চলে যেত। দ্বিতীয় কথা, তাঁর এই বইটি 'শৈলারোহণ সম্পর্কীয় বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তক' কিনা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। কেননা, সুনীল চৌধুরীর বইটির প্রকাশকালও আশ্বিন ১৩৮১।

অবশ্য এ সবই বাইরের ব্যাপার। প্রাণেশবাবুর বইতেও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শৈলারোহণের প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে তিনি বেশ গুছিয়ে লিখেছেন, ছবির সংখ্যাও প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে পাহাড়ে নাক না ঘষলে যে পাহাড়কে জানা যায় না—বিখ্যাত পর্বতারোহীর এই বিখ্যাত উক্তি তিনি নিজে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। না হলে সাইকেল কিংবা সাঁতার শেখার বইও হয়তো তরতর করে বেরুতে থাকবে।

*

গঙ্গোত্রী পরিষদ (আসানসোল শাখা) ও বিকাশ পত্রিকার উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত কবি সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ **প্রান্তিক** বেশ রুচিবান সংকলন। যতি মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মিত্র ও শক্তি গড়াই-এর প্রবন্ধ ছাড়াও 'মাইকেল মধুসূদন : বিভিন্ন ভাবনা' নামে ডঃ সুশীল রায়ের একটি প্রবন্ধ এই সংকলনে রয়েছে। কবিতা লিখেছেন অনেকে। ইতস্তত নাম : দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, পরমানন্দ সরস্বতী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, নীল নন্দী, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিরুল ইসলাম, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, হরিপদ দে, কমল চক্রবর্তী, প্রদীপ রায়চৌধুরী, দিলীপ পাত্র, পলাশ মিত্র, শান্তনু দাস। সম্পাদনা করেছেন প্রফুল্ল মিত্র, প্রফুল্ল অধিকারী ও আরও কয়েকজন।

*

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত **ফল ও সব্জী সংরক্ষণ** (প্রাপ্তিস্থান : ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-১, দু টাকা পঁচিশ পয়সা) গ্রন্থে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত। স্কোয়াশ ও সিরাপ জ্যাম, জেলি ও মারমালেড, ফল ও সব্জীর মোরব্বা, আচার-চাটনি ও সস্‌, ফল ও সব্জী শুকনো, কৌটো ও বোতলে সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় বেশ প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

খেলার মাঠে

বিশ্ব হকির শীর্ষাসনে আবার ভারত

বার বার ব্যর্থতার পর ভারত আবার বিশ্ব হকির বিজয় মুকুট পেয়েছে. কুয়ালালামপুরে আয়োজিত বিশ্ব হকির ফাইনালে পাকিস্তানকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। এককালে হকি-দুনিয়ার অজেয় যোদ্ধা ভারত পর পর দুটি অলিম্পিক এবং পর পর দুটি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তো হয়নি, তিনটি ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। পাঁচটি এশিয়ান গেমসের মধ্যে একবার মাত্র সোনা জিতেছে, ৯ বছর আগে ব্যাংককের মাঠে। তাই দীর্ঘ নয় বছর পরে এই কৃতিত্বপূর্ণ জয় ব্যর্থতার গ্লানি অনেকখানি মুছে দিয়ে ভারতকে আবার বিশ্ব হকির শীর্ষাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ জয়ের একটি পৃথক মূল্যও রয়েছে। কেননা ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে বিশ্ব হকির মান ছিল অনেক নীচু। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। সারা বিশ্ব থেকে বাছাই করে একটি দল গড়লেও সে দলকে ভারত হেলায় হারাতে পারত। কব্জির পেলবতায়, প্রথা-প্রকরণে এবং খেলার রূপসৌন্দর্যে ভারতীয় হকি রূপকথার বস্তু হয়ে উঠেছিল। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, জাফর, দারদকার, অ্যালেন, টাপসেল, বাবু, বলবীর প্রভৃতি হয়ে উঠেছিলেন রূপকথার রাজপুত্তুর। কিন্তু এখন পৃথিবীর অনেক দেশ হকি খেলায় অসাধারণ উন্নতি করেছে। প্রথম সারির দলগুলির মধ্যে নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের ভেদরেখা বেশি নেই। তাই সহজতর ক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শীর্ষসম্মান লাভের মূল্য অনেক বেশি। বিশেষ মূল্য ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে পরাজিত করা, ১৯৬০ সাল থেকে যে পাকিস্তানের বিশ্ব হকিতে আধিপত্য। তাই এবারকার গৌরব-জনক জয় যেন ইতিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। সারা দেশে বয়ে গেছে জাতীয় জয়ের আনন্দ। লোকসভা থেকে পথ-সভায় খেলোয়াড়দের প্রশস্তি। প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে পুরনারী এবং রাষ্ট্রপতি থেকে রাস্তার মানুষ পর্যন্ত বিজয়ী খেলোয়াড়দের জন্য গর্বিত। অধিনায়ক অজিত পাল সিং সহ একাদশ খেলোয়াড় আজ জাতীয় বীর।

কুয়ালালামপুরে বসেছিল বিশ্ব কাপ হকির তৃতীয় আসর। ১৯৭৩-এ ইংল্যান্ড নিজেদের দেশে আয়োজিত দ্বিতীয় বিশ্ব-কাপ জয় করায় এবং ১৯৭২-এ পশ্চিম জার্মানী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হকি ক্ষেত্রে এশিয়ার প্রাধান্য খর্ব হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তৃতীয় বিশ্বকাপ জয় করে শুধু দেশের নষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেনি, এশিয়ার হৃত প্রতিষ্ঠাও ফিরিয়ে এনেছে। এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান এবং আয়োজনকারী দেশ মালয়েশিয়ারও অবদান আছে। প্রথম চারটি স্থানের মধ্যে তিনটি স্থানই এশিয়ার তিনটি দেশের।

এই লেখার সংগে বিশ্ব হকিতে আট বছরের আবর্তনের যে চার্ট দেওয়া হল তা থেকে দেখা যাবে হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া কিভাবে এশিয়ার দেশ-গুলির উপর প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব কাপের খেলার ফল থেকেও দেখা যাবে ইউরোপের হকি শক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। পাকিস্তান হারাতে পারেনি পোল্যান্ড ও হল্যান্ডকে। ভারত হারাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়াকে। দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার কাছে তো গ্রুপ লীগে ভারতকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়েছে। তাছাড়া ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তানও ভারতকে কম বেগ দেয়নি। সেমিফাইনালে মালয়েশিয়া তো দুবার প্রথম গোল করে এগিয়ে যায়। এবং নির্দিষ্ট সময়ের খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। অতিরিক্ত সময়ে ভারত একটি গোল করে ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে পাকিস্তানও প্রথম গোল করে বিরতি সময়ে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল করে ভারত হয় হকির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সুতরাং অসাধারণ সংগ্রামী শক্তির পরিচয়ে ভারত বিজয় মুকুট পেয়েছে। যে প্রতিযোগিতায় কোন দলেরই অপরাজিত থাকার গৌরব নেই সে প্রতিযোগিতা জয়ের মধ্যে অবশ্যই কঠিন প্রতিজ্ঞা এবং মরণপণ সংগ্রাম আছে।

কুয়ালালামপুরে এবারের বিশ্বকাপে নাটকীয়তাও কম নেই। যেমন অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ লীগের খেলায় ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেল ১—৩ গোলে। আবার স্থান নির্ণয়ের খেলায় ওই ইংল্যান্ডকেই ৩-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চম স্থান পেল। নিউজিল্যান্ড হারল ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেনের কাছে। আবার স্থান নির্ণয়ের খেলায় ওই স্পেনকেই হারাল ২—১ গোলে। মালয়েশিয়া ১-২ গোলে পাকিস্তানের কাছে এবং ২-৩ গোলে ভারতের কাছে পরাজয়ের মধ্যে অসাধারণ লড়াইয়ের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু স্থান নির্ণয়ের খেলায় শোচনীয়ভাবে হেরে গেছে পশ্চিম জার্মানীর কাছে ০-৪ গোলে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিসে আমরা যেমন অপ্রত্যাশিত ফলের বহর দেখেছি বিশ্ব হকিতেও তেমন অনেক অপ্রত্যাশিত ফল ঘটে গেছে। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফল নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড

বিশ্ব হকির আট বছরের আবর্তন

	১৯৬৮ মেক্সিকো অলিম্পিক	১৯৭১ বার্সিলোনা বিশ্বকাপ	১৯৭২ ম্যুনিখ অলিম্পিক	১৯৭৩ আমস্টার্ডাম বিশ্বকাপ	১৯৭৫ কুয়ালালামপুর বিশ্বকাপ
ভারত	তৃতীয়	তৃতীয়	তৃতীয়	দ্বিতীয়	প্রথম
পাকিস্তান	প্রথম	প্রথম	দ্বিতীয়	চতুর্থ	দ্বিতীয়
পঃ জার্মানী	চতুর্থ	পঞ্চম	প্রথম	তৃতীয়	তৃতীয়
হল্যান্ড	পঞ্চম	ষষ্ঠ	চতুর্থ	প্রথম	নবম
স্পেন	ষষ্ঠ	দ্বিতীয়	সপ্তম	পঞ্চম	অষ্টম
অস্ট্রেলিয়া	দ্বিতীয়	অষ্টম	পঞ্চম	×	পঞ্চম
মালয়েশিয়া	পঞ্চদশ	×	অষ্টম	একাদশ	চতুর্থ
নিউজিল্যান্ড	সপ্তম	×	নবম	সপ্তম	সপ্তম
ইংলণ্ড	দ্বাদশ	×	ষষ্ঠ	ষষ্ঠ	ষষ্ঠ
আর্জেন্টিনা	চতুর্দশ	দশম	চতুর্দশ	নবম	একাদশ
জাপান	ত্রয়োদশ	নবম	×	দশম	×
কেনিয়া	অষ্টম	চতুর্থ	ত্রয়োদশ	দ্বাদশ	×
ফ্রান্স	দশম	সপ্তম	দ্বাদশ	×	×
বেলজিয়াম	নবম	×	দশম	অষ্টম	×
পোল্যান্ড	×	×	একাদশ	×	দশম
ঘানা	×	×	×	×	দ্বাদশ
মেক্সিকো	ষোড়শ	×	ষোড়শ	×	×
পূর্ব জার্মানী	একাদশ	×	×	×	×
উগান্ডা	×	×	পঞ্চদশ	×	×

ও মালয়েশিয়ার কাছে ১৯৭৩-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল্যাণ্ডের পরাজয়। আবার হল্যাণ্ডকে হারিয়ে যে স্পেন এবার ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেই স্পেনের বিরুদ্ধে হল্যাণ্ডের ৩-০ গোলে জয়।

আগামী দিনের আন্তর্জাতিক হকিতে এমন ফল আরও দেখা যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরজা এখন অনেক কঠিন। সুতরাং বিশ্ব জয়ীর সম্মান ফিরে পেলেও এই সম্মান বজায় রাখার জন্য ভারতকে আরও জোর প্রস্তুতি চালাতে হবে। নিজেদের ঘরোয়া কোন্দল মিটিয়ে ফেলে বাস্তবমুখী পরিকল্পনায় এবং প্রশিক্ষণে সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়দের সুপটু করে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু পাকিস্তানই আমাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সারা বিশ্ব হকি খেলায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। না হলে যে দক্ষিণ আমেরিকায় হকির বিশেষ কদর ছিল না, ফুটবলেই যার সমৃদ্ধি, সেই দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনার কাছে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়? আফ্রিকার দেশগুলিও হকি খেলায় এগিয়ে যাচ্ছে। কোন খেলায় না জিতলেও ঘানা সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। গত সপ্তাহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মারডেকা স্টেডিয়ামে ৪৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল মহাসংগ্রামের স্মৃতি নিয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খেলায় ভারতের জয় ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফল। খেলায় ভারতের যেমন আধিপত্য ছিল, যেমন সারা খেলায় ভারত পেয়েছে ৬টি শর্টকর্ণার, পাকিস্তান পেয়েছে মাত্র একটি, তবু আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের উত্তেজনা, সৃজনাত্মক কল্পনা এবং শক্তি ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে খেলাটি স্মৃতি হয়ে আছে। পাকিস্তানের সপক্ষে বলা যেতে পারে, দুজন নামী খেলোয়াড়, অধিনায়ক আবদুল রসিদ এবং শানাওয়াজকে তারা দলে পায়নি আহত থাকায়। রসিদ কুয়ালালামপুর যেতেই পারেনি। আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ক্ষিপ্রপদ লেফট আউট সমিউল্লা ফাইনালে ১০ মিনিটের বেশি খেলতে পারেনি পড়ে গিয়ে কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায়। সেমিফাইনালে চোট লাগায় ভারতের এক নম্বর গোলরক্ষক ফার্নাণ্ডেজও অবশ্য ফাইনালে খেলতে পারেনি। ফাইনালে ভারত দলে খেলেছিল—অশোক দিওয়ান, আসলাম শের খাঁ ও সুরজিৎ সিং; বীরিন্দার সিং, অজিতপাল সিং (অধিনায়ক) ও মহিন্দর সিং; ফিলিপস, অশোককুমার, শিবাজী পাওয়ার, গোবিন্দ ও হরচরণ সিং।

ভারত দলে আর ছিল—লেসলি ফার্নাণ্ডেজ, মাইকেল কিনডো, ওঙ্কার সিং, ভি ভাস্করন, এইচ জে এস চিমনি, পি ব্রি ভূমিরাজ ও কুলদীপ সিং। ম্যানেজার

ভারতের হকি অধিনায়ক অজিত পাল সিং

অলিম্পিকের প্রাক্তন অধিনায়ক বলবীর সিং। কোচ ছিলেন জি এস বোধি।

কুয়ালালামপুর বিশ্বকাপে প্রথম থেকে দ্বাদশ স্থানাধিকারীদের মধ্যে প্রথম ছয়টি দেশ ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে সরাসরি খেলার অধিকার পাবে। প্রথম ৯টি দেশ খেলার অধিকার পাবে চতুর্থ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায়। চতুর্থ বিশ্বকাপের আসর বসবে আর্জেণ্টিনার বুয়োনেস আয়ারসে, ১৯৭৮ সালে। এতদিন দু বছরের ব্যবধানে বিশ্বকাপ হকির খেলা হয়েছে। এর পর থেকে হবে ৪ বছরের ব্যবধানে, বিশ্ব ফুটবলের মত।

তৃতীয় বিশ্ব কাপের সামগ্রিক ফল দেওয়া হল।

এ গ্রুপ

পাকিস্তান—২ : পোল্যাণ্ড—২
পাকিস্তান—৩ : হল্যাণ্ড—৩
পাকিস্তান ২ : নিউজিল্যাণ্ড—০
পাকিস্তান ২ : মালয়েশিয়া—১
পাকিস্তান—৫ : স্পেন—০
মালয়েশিয়া—০ : নিউজিল্যাণ্ড—০
মালয়েশিয়া—০ : স্পেন—০
মালয়েশিয়া—৩ : পোল্যাণ্ড—১
মালয়েশিয়া—২ : হল্যাণ্ড—১
নিউজিল্যাণ্ড—২ : হল্যাণ্ড—১
নিউজিল্যাণ্ড—০ : স্পেন—১
নিউজিল্যাণ্ড—৩ : পোল্যাণ্ড—২
স্পেন—৪ : পোল্যাণ্ড—১
স্পেন—০ : হল্যাণ্ড—৩
পোল্যাণ্ড—২ : হল্যাণ্ড—১

বি গ্রুপ

ভারত—২ : ইংলণ্ড—১
(ফিলিপস)
ভারত—১ : অস্ট্রেলিয়া—১
(গোবিন্দ)
ভারত—৭ : ঘানা—০
(সুরজিৎ, গোবিন্দ, আসলাম মহীন্দার—৩, অশোককুমার)
ভারত—১ : আর্জেণ্টিনা—২
(হরচরণ)
ভারত—৩ : পশ্চিম জার্মানী—১
(ফিলিপস, মহীন্দার, শিবাজী পাওয়ার)
পশ্চিম জার্মানী—৪ : আর্জেণ্টিনা—২
পশ্চিম জার্মানী—৩ : ঘানা—২
পশ্চিম জার্মানী—২ : অস্ট্রেলিয়া—২
পশ্চিম জার্মানী—৩ : ইংলণ্ড—০
অস্ট্রেলিয়া—৯ : ঘানা—০
অস্ট্রেলিয়া—১ : ইংলণ্ড—৩
অস্ট্রেলিয়া—৩ : আর্জেণ্টিনা—০
ইংলণ্ড—৩ : আর্জেণ্টিনা—৩
ইংলণ্ড—৬ : ঘানা—১
আর্জেণ্টিনা—২ : ঘানা—১

লীগ টেবল 'এ'

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পাকিস্তান	৫	৩	২	০	১৪	৬	৮
মালয়েশিয়া	৫	২	২	১	৬	৪	৬
নিউজিল্যাণ্ড	৫	২	১	২	৫	৬	৫
স্পেন	৫	২	১	২	৫	৯	৫
হল্যাণ্ড	৫	১	১	৩	৯	৯	৫
পোল্যাণ্ড	৫	১	১	৩	৮	১৩	৩

লীগ টেবল 'বি'

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ভারত	৫	৩	১	১	১৪	৫	৭
পঃ জার্মানী	৫	৩	১	১	১০	৯	৭
অস্ট্রেলিয়া	৫	২	২	১	১৬	৬	৬
ইংলণ্ড	৫	২	১	২	১০	৭	৫
আর্জেণ্টিনা	৫	২	১	২		১২	৫
ঘানা	৫	০	০	৫	৪	২৭	০

সেমি-ফাইনাল

পাকিস্তান—৫ : পঃ জার্মানী—১
ভারত—৩ : মালয়েশিয়া—২
(শিবাজী পাওয়ার, আসলাম, হরচরণ)

ফাইনাল

ভারত—২ : পাকিস্তান—১
(সুরজিৎ, অশোককুমার) (মহম্মদ সরিদ)

৩য়, ৪র্থ স্থানের খেলা

পঃ জার্মানী—৪ : মালয়েশিয়া—০

পর্যায়ক্রমে স্থান : ১। ভারত, ২। পাকিস্তান, ৩। পশ্চিম জার্মানী, ৪। মালয়েশিয়া, ৫। অস্ট্রেলিয়া ৬। ইংলণ্ড, ৭। নিউজিল্যাণ্ড ৮। স্পেন, ৯। হল্যাণ্ড, ১০। পোল্যাণ্ড, ১১। আর্জেণ্টিনা, ১২। ঘানা।

একলব্য

দাবার গ্রাণ্ডমাস্টার য়ুরি আভেরবাক

'এ দেশের কোন কোন জিনিস আপনার ভাল লাগল?'

দাবার গ্রাণ্ডমাস্টার এবং সোভিয়েট দাবা ফেডারেশনের সভাপতি য়ুরি আভেরবাকের সরল উত্তর : 'কোনারকের সূর্যমন্দির, এই প্রাচীন দেশের শিল্পের সৌন্দর্য এবং মানুষের ব্যবহার।' একটু থেমে মুখে হাসি নিয়ে বললেন, 'আর দেখেছি ভাল লেগেছে তরুণদের মধ্যে দাবা খেলার আগ্রহ দেখে।'

—'কিন্তু এ আগ্রহ কি সোভিয়েট রাশিয়ার আগ্রহের তুলনায় সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর মত নয়?'

—'নিশ্চয়ই। দাবা আমাদের জাতীয় খেলা। আমাদের দেশের সর্বত্র দাবা। পথে, ঘাটে, ক্লাবে, স্কুলে, কলেজে রেস্তোরাঁয় রেডিওর, টেলিভিশনে—সর্বত্র। শহরে গ্রামে অসংখ্য দাবার ক্লাব রয়েছে। এই সব ক্লাবের সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩০।৩২ লাখের মত। খুব ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েরা দাবা খেলা শুরু করে। খেলায় পাঁচ বছর পূর্ণ হলেই তাদের একজন গ্রাণ্ডমাস্টারের অধীনে রেখে উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রচুর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সে তুলনায় ভারতে প্রতিযোগিতার সংখ্যা নগণ্য। দাবা খেলার উন্নতির জন্য প্রয়াসও কম। কিন্তু যে ভারত দাবার জন্মভূমি, যে দেশ থেকে আমরা খেলাটাকে নিয়েছি, সেই দেশে খেলার আগ্রহ বাড়ছে এটা দেখে আমি সত্যিই খুশি। দশ বছর আগে আর একবার আমি এ দেশ সফর করে গেছি। তখন এত আগ্রহ দেখিনি।'

য়ুরি আভেরবাক ভারতে এসেছিলেন ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি বিনিময় পরিকল্পনার মাধ্যমে। কলকাতায় আসার আগে তিনি ভুবনেশ্বরে এক সঙ্গে ২৫ জনের বিরুদ্ধে খেলে ২০ জনের বিরুদ্ধে জয়ী হন। ৫ জনের সঙ্গে খেলা ড্র হয়।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে খেলা হয় তিনদিন। ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সঙ্গে ২৬ জনের বিরুদ্ধে খেলে জয়ী হন ২০ জনের বিরুদ্ধে, ৫ জনের সঙ্গে ড্র করেন, পরাজিত হন একটি গেমে কে মজুমদারের কাছে। পরের দিন ঘাটতি দাবার ১১ জনের সঙ্গে খেলে ১১ জনের বিরুদ্ধেই জয়। শেষ দিন ২৬ তারিখে এক সঙ্গে ২১ জনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আভেরবাকের জয় ২৬টি খেলায়, দুটি খেলার ফল অমীমাংসিত। একটি খেলায় শুধু পরাজয় স্বপন দাসের কাছে।

—'তা হলে ভারতের খেলোয়াড়রাও রুশী গ্রাণ্ড মাস্টারকে পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে?'

'নিশ্চয়ই। সেটাই তো আমার আনন্দ।'

—'ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে এটা কি আপনার ব্যাক্তিগত মত নয়?'

—মোটেই না। সত্যিই মিডল অফ দি গেমে বেশ কিছু খেলোয়াড় চমৎকার চাল দিয়েছে। অনেকের মধ্যে দুর্বলতা দেখেছি গেমের সূচনায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণে এবং বই পত্র, ম্যাগাজিন পড়ে ওটা কাটিয়ে উঠতে পারলে ভারতের কিছু খেলোয়াড়ের পক্ষে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন অসম্ভব নয়।'

পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী হলেও আমরা জানি য়ুরি আভেরবাকের বয়স হয়েছে। ৫০ পার হয়ে গেছেন। বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টানা সাড়ে ছ' ঘণ্টা বোর্ডে বোর্ডে ঘুরফিরে এক সঙ্গে ২৬ জনের বিরুদ্ধে চাল দিতে তাঁর বিশাল দেহ গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। তবু পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে বোর্ডে গজ-মন্ত্রী-নৌকো-বোড়ের অবস্থান চট করে দেখে নিয়ে তিনি চাল দিয়ে যাচ্ছিলেন।

পরে দাবার ডেমনেস্ট্রেশনে এবং আলোচনাচক্রে তিনি ধৈর্য-স্থৈর্য এবং স্বাস্থ্যের উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। বললেন, ইনডোর গেম হলেও দাবা খেলায় অসাধারণ দমের দরকার এবং এই দমের জন্য দরকার সুস্বাস্থ্যের। আমি খেলোয়াড় জীবনে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করেছি, প্রচুর ভলিবল খেলায় যোগ দিয়ে দম বাড়িয়েছি। দাবা খেলার উপকারিতা সম্পর্কে গ্রাণ্ডমাস্টার বললেন, ছোটবেলা থেকে দাবা খেলা শিখলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, চিন্তাক্ষমতা বাড়ে। বোর্ডের চালে ভুল না হবার যেমন সম্ভাবনা বাড়ে, তেমন সম্ভাবনা বাড়ে জীবন-যুদ্ধের চালে ভুল না হবার।

বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ববি ফিশারের সঙ্গে একটি খেলায় তার বিচার ভুলের একটি নজিরও বোর্ডের উপর দেখিয়ে দিলেন আভেরবাক। খেলাটি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। তখন আভেরবাকের বিশ্বজোড়া নাম ডাক। খেলাটি ড্র হয়েছিল। যে চালটি দিলে তিনি হয়তো খেলায় জিততে পারতেন তখন সেটি তাঁর উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। চালটির মধ্যে অবশ্যই একটু ঝুঁকি ছিল। বললেন, খেলা জয়ের জন্যও ঝুঁকির প্রয়োজন আছে। জীবন সংগ্রামের ঝুঁকির মতই।

মা.

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক সঙ্গে য়ুরি আভেরবাকের ২৬ জনের বিরুদ্ধে খেলার দৃশ্য

অরণ্যদেব

"দু মাস ধরে তো সেই বাচ্চা-হাতির সেবা-শুশ্রূষা করলুম..."

ক্র্যাক!
ক্র্যাক!
"একদিকে হাতির সেবা করি, আর অন্যদিকে তাড়াই তার শত্রুদের..."

"তারপর ঠিক করলুম, তক্তাগুলো একে একে খুলে নেব।"
শান্ত হয়ে থাক, নড়িস না।

"ওয়াম্বেসিরা জড় হয়ে সব দেখছে..."
খোঁড়া পা না সারলে ও বাঁচবে না...
অরণ্যদেব সেজন্যে খুব কষ্ট পাবেন।

"খুলে দিলুম বেড়ার খুঁটিও"
?

"জুমবা প্রথমে বুঝতে পারছিল না যে, ও মুক্ত..."
??
যা রে, জুমবা!

"হঠাৎ সে ছুটে পালাল। তাই দেখে ওয়াম্বেসিরাও খুশী।"
ভাল হয়ে গেছে!
বিদায়, জুমবা! আর কখনো তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না...

ভাগ্যিস জুমবা ভাল হয়ে উঠেছিল,
কিন্তু *ওয়াকারু বাবা, জুমবার সঙ্গে ফের কবে তোমার দেখা হল?
সেও এক আশ্চর্য
বলো, বলো!
*অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকারু

সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি 'জন অরণ্য'-র কাজ শুরু করেছেন। ছবির স্যুটিং-এ নির্দেশ দিচ্ছেন শিল্পী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ডানদিকে ছবির সহকারী পরিচালক সুহাসিনী মুলে. ('ভুবন সোম' ছবির নায়িকা) ফটো—সেন

মতামতের মন্তাজ

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে ফিলম ইনডাসট্রিরও কিছু করণীয় আছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত যোগও কিছু ছিল—সেটা নিউ থিয়েটার্স-এর ইতিহাস ঘাটলেই জানা যায়। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের আরও কিছু ঘটনার কথাও শোনা যাছে। বাংলা সিনেমার আদি যুগ থেকে যাবৎ শরৎচন্দ্রের অনেক কাহিনীর চিত্ররূপ তৈরি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। অতএব শরৎচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প কীভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় এসেছে।

• • •

রাজ্য সরকার অবশ্য চুপচাপ বসে নেই। মুখ্যমন্ত্রী চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছেন যে সরকার শরৎচন্দ্রের কাহিনীর ভিত্তিতে চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। পরিকল্পনাটি অভিনব। তিনজন বিশিষ্ট পরিচালক শরৎচন্দ্রের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে ছবি তৈরি করবেন। ছোট আকারের তিনটি ছবি নিয়ে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চিত্র প্রযোজনা করছেন রাজ্য সরকার। তিনজন পরিচালক হলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও পূর্ণেন্দু পত্রী। সত্যজিৎবাবু আগ্রহের সঙ্গে "মহেশ" গল্পটি বেছে নিয়েছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী করছেন "অভাগীর স্বর্গ"। মৃণাল সেন কোন্‌টা নেবেন? শোনা যাচ্ছে, শেষোক্ত পরিচালক এই কর্মসূচীতে ছবি বানাতে খুব একটা রাজি নন। উপযুক্ত গল্পের অভাবই কি কারণ? সম্ভবত নয়, শরৎচন্দ্রের আরও ছোট কাহিনী আছে যা এখনও ছবি হয়নি। হয়ত শোনা কথাও সত্য নয়। মৃণালবাবু এমন একটি চমৎকার সরকারী পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন। এই তিনজন পরিচালক মিলে যে ছবি করবেন তার একটা বিশেষ শিল্পমান থাকবে বলেই আশা করা যায়। সেটা বিদেশেও আদরণীয় হবে। বিদেশের চলচ্চিত্রেও দেখা যায়, বিশিষ্ট পরিচালকরা একই ফিলমে একত্র হয়েছেন। তাঁদের ছোট ছোট ছবি একটি পূর্ণাঙ্গ ফিলমের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। শরৎ-জন্মশতবার্ষিকীতে পশ্চিম বাংলা সরকারও যে এরকম একটি ছবি করছেন সেটা খুবই প্রশংসার যোগ্য। এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হওয়া দরকার। সময়ও বেশি নেই। পরিচালকদেরও তৈরি হতে হবে। এই ছবি ছাড়াও সরকার শরৎচন্দ্রের উপর ছোট ছোট প্রামাণিক চিত্র তৈরির দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

স্থানীয় ফিলম ইনডাসট্রি কী করবেন? রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে চলচ্চিত্রশিল্পের তরফে কিছুই হয়নি একথা বলব না। তবে আরও কিছু করার ছিল। অন্তত ইনডাসট্রির তরফে একটি ছবি হতে পারত। সেটা রবীন্দ্রনাথের জীবন বা সাহিত্যকর্মের উপর অল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র হলেও ক্ষতি ছিল না। সত্যজিৎ রায় একটি ছবি অবশ্য করেছিলেন, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে। চিত্রপ্রযোজকদের মধ্যেও রবীন্দ্র-কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরির তেমন কোন তৎপরতা অবশ্য দেখা যায়নি। সারা দেশ জুড়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিরাট আয়োজন হয়েছে। অতএব ফিলম ইনডাসট্রি আলাদাভাবে কিছু করেনি বলে সেটা খুব দোষের বা ক্ষতির কারণ হয়নি। সারা দেশের কর্মযজ্ঞে ফিলম ইনডাসট্রিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু শরৎ-শতজয়ন্তীতে চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে বিশেষ কিছু না করলে সেটা নজরে পড়তে পারে। কিছু একটা করা দরকার। কী করা যায়? অতীত যুগ থেকে এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে যত ছবি হয়েছে সেগুলি সারা বছর ধরে বিভিন্ন হলে দেখানো যেতে পারে। অতীতের কিছু ছবির

নতুন প্রিন্ট তৈরি করাও হয়ত খুব প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্পের তরফে ওই সব ছবির প্রিন্ট তৈরির ব্যবস্থা হলে ভাল। ই-আই-এম-পি-এর তরফে একটি আরকাইভ বা ফিল্ম লাইব্রেরি গঠন করলে কেমন হয়? এই লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে তৈরি সব ছবির মিনি-প্রিন্ট

"শঙ্খবিষ" ছবির সেটে দীপংকর দে ও আনোয়ার হোসেন ফটো—দেশ

সংগ্রহ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী ভিত্তিক ছবিকে যে-সব প্রযোজক প্রতিষ্ঠান বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁদের কিছু ছবিকে করমুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা দরকার। শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে তৈরি আরও কিছু বিশিষ্ট ছবির করমুক্তির জন্য আবেদন করা যায়। এ-ব্যাপারে সরকারও সহানুভূতি এবং স্বীকৃতি-দানের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। চলচ্চিত্র শিল্পের তরফে একটি নতুন ছবি তৈরি হলে কেমন হয়? কিংবা কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনীচিত্র? করবার অনেক কিছুই আছে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সরকার যেমন সক্রিয় তেমনি চলচ্চিত্র শিল্প সংস্থাও উদ্যোগী হতে পারেন। তবেই কথাশিল্পীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

শুটিং চলছে

নায়ক দীপংকর দে ওই মুহূর্তে, এক নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-র একটি ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসছেন। একটু আগে জেল থেকে বেরিয়েছেন। তখন ও'র নাম রাহুল। কিছু অসামাজিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার দরুণ রাহুলের জেল হয়েছিল। অথচ এক সময়ের ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। রাহুল তার বাবার কথা ভাবছিল। বাবা, হৃষীকেশ আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। গঙ্গাকে নিয়ে কেচ্ছার চক্রান্ত করেছেন। সব খবরই পেয়েছিল রাহুল। তাই সে আর বিলম্ব করেনি। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছে এখানে।......ইতিমধ্যে আলো করা হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলে আবার ফ্লোরে ফিরে এলাম। শুটিং জোন-এ প্রবেশ করলেন দীপংকর, বাংলাদেশ থেকে আগত প্রখ্যা অভিনেতা আনোয়ার হোসেন, দিলীপ ক দিলীপ সেন, পরিতোষ রায় প্রমুখ। সে বাংলা মদের দোকান। বিরাট জোন। সা সারি বোতল সাজানো। কাউণ্টার। মাং ওপরে টিমটিম করে অল্প পাওয়ারের এক বালব্ জ্বলছে। টেবিল-চেয়ারগুলো সব নড়বড়ে। এখানে স্থানীয় মদো-মাতালদে আড্ডা। ওই যে দেখুন, প্রিন্স অফ ময়লা ওরফে শানু চাটার্জী ওরফে আনোয়ার চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে আসর বসিয়ে এই অঞ্চলে নতুন মুখ। কে বাবা! প্রি দুই ভুরু ঈষৎ কুঁচকে যায়। এদিকে রা মদ খেয়ে বুঁদ। মাথাটা নুইয়ে দুই আঙ একটা একটা করে ছোলা সংগ্রহ করছে মুখে দিচ্ছে। মুখটা চিন্তাভাবনায় বিক্ষত। মনের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব। সব থেকে একটা মানুষের চেহারা স্পষ্ট হ এই মানুষটা কি গঙ্গার মত মেয়েকে সা জটিল আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পার এই প্রশ্ন 'শঙ্খবিষ' ছবির। সৈয়দ মু সিরাজের কাহিনী এবং মঙ্গল চক্রব চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে পরিচালনা কর রথীশ দে সরকার। স্বাধীনভাবে চালনার ক্ষেত্রে নবাগত। কাহিনী নির্বা তিনি কিছুটা সাহসের পরিচয় দিয়ে ছকে বাঁধা বিষয়বস্তু নয়। বিতর্কের তারণাও হতে পারে। যেমন, একটি মে ঘিরে বাপ-ছেলে মুখোমুখি, জীবনের মুখী সমস্যার আয়নায়। কনটেন্টের ফর্মের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে চালক বিশেষ উৎসাহী নন। জীব প্রকাশে পিছুপা নন। আজকের এই গতি...স্পিড চান দর্শকেরা। পরি দর্শকদের সারাক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে চান। কিভাবে? প্রশ্ন করা হলে বললেন : ঘটনার পর ঘটনা আছে। এক ঘটনা প্রচণ্ড নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি

পারে। চিত্রনাট্যের বিস্তার সেইভাবেই। শুরুতে ক্রাইম ছবির গন্ধ থাকলেও থাকতে পারে। আসলে সমাজের কিছু গভীর সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে।......

শট টেকিং-এর ফাঁকে ফাঁকে আনোয়ার বাংলাদেশের কথা বলছিলেন। প্রচুর পরিমাণে ছবি হচ্ছে। ছবি রিলিজের সমস্যা নেই। তৈরী হলেই রিলিজ হতে পারে।

কি রকম চলে?

ছবির মেরিট অনুযায়ী। কোন ছবি এক সপ্তাহে উঠে যায়। কোন ছবির আবার জুবিলি হয়।

কোয়ালিটি সম্পর্কে কিছু বলুন।...

বলার মত কিছু নেই। কোয়ানটিটি ভাল, কিন্তু কোয়ালিটির তেমন উন্নতি হয়নি। একদিক থেকে বলা যায় শিল্পের অবস্থা ভাল।

এই ছবিতে কাজ করতে তাঁর বেশ ভালই লাগছে। এই তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা নয়। আগে এসেছিলেন সুভাষ দত্ত-র একটি ছবির আউটডোর শুটিং করতে। এ ছাড়া ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম প্রচেষ্টায় রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' ছবিতে কাজ করেছেন, তার শুটিং অবশ্য হয়েছে ও-পারেই। ভবিষ্যতে এ-পারের একাধিক ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন আনোয়ার হোসেন।

এই কুশলী অভিনেতার সংগে কাজ করে দীপংকর মুগ্ধ। দীপংকর, বর্তমান বাংলা ছবির প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নায়কদের অন্যতম। কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য', স্বদেশ সরকারের 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', ইন্দর সেনের 'অসময়' এবং আরও অনেক ছবিতে। প্রত্যেকটি ছবিতেই ভিন্ন, ভিন্নতর চরিত্র। এই ছবি 'শঙ্খবিষ'-এর রাহুল তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জীবিত করছে। গঙ্গার ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন আরতি ভট্টাচার্য। হৃষীকেশ : বিকাশ রায়। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন : বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং সোমা দে। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে : আশু দত্ত, প্রসাদ মিত্র ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এপ্রিল মাসে গান রেকর্ডিং। কণ্ঠ দেবেন মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। বি আর মুভিজের নিবেদন। প্রযোজনা করছেন : বিকাশ চ্যাটার্জি।

* * *

বিগত তেসরা মার্চ কলকাতায় কলাকুশলীরা দাবি দিবস পালন করেছেন। অল ইণ্ডিয়া কনফেডারেশনের ডাকে সাড়া দিয়েছেন স্থানীয় কলাকুশলীদের প্রতিটি সংস্থা। এই দাবি দিবস একযোগে প্রতিপালিত হয় ভারতের বিভিন্ন চলচ্চিত্র শিল্প-কেন্দ্রে। স্থানীয় কলাকুশলীরা সমর্থনে কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

* * *

'অন্য পৃথিবী'-র সেটে হট-হাউসে ক্লোজ-ডোর কথাবার্তা চলছে বিকাশ রায়, দিলীপ রায় ও পার্থ মুখার্জির মধ্যে ফটো দেশ

এই পৃথিবীতে হট হাউসের অভাব নেই, তবুও 'অন্য পৃথিবী'র জন্য একটা হট হাউস নির্মাণ করা হয়েছে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। তিন দিকে প্রাচীর। একদিক ওপেন। ভেতরে নানারকম কারুকাজ। বাইরের কিছু অংশে কাচ ব্যবহার করা হয়েছে। ঘর বলতে শুটিং জোন। এখানে একটা আরাম চেয়ারে বসে মদ্যপান করছেন বিকাশ রায়। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন দিলীপ রায়। অকস্মাৎ ঝড়। দরজা খুলে ঢুকল এক রাগী ছোকরা। তাকে তাড়া করতে করতে এল কতিপয় লোকজন। তারা আবার কর্তাব্যক্তির নির্দেশে ফিরে গেল। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। একেবারে ক্লোজ-ডোর কথাবার্তা। পরিচালক গুরু বাগচী। রাগী ছোকরার ভূমিকায় পার্থ মুখার্জি। শট শেষ হতে সেট লাইট জ্বললো। কিছু বিরতি। ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ করা হবে। অতএব পরিচালককে প্রশ্ন করা হয় : 'ছবির পজিশন কি রকম?' উত্তর : 'শেষ পর্যায়ের শুটিং চলছে।' 'এই সেটটি...হট হাউস কেন?' এই ছবি 'অন্য পৃথিবী' (আগে নাম ছিল 'সৃষ্টিছাড়া')-তে হট হাউস একটা নাইট ক্লাব। এটা তার একটা অংশ। পার্সোনাল চেম্বার। এখানে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকতে পারে না। ওসব পার্ট চুকে গেছে। সারারাত ধরে মধ্য কলকাতার একটা নাইট ক্লাবে শুটিং করা হয়েছে।

বার্তাবহ

বোম্বাই বিচিত্রা

পত্র-পত্রিকার একটি সংবাদ দেখা যাচ্ছে, বি আর চোপরা তাঁর নিজের ব্যানারের বাইরে একটি ছবি পরিচালনা করতে চলেছেন। সংবাদে বলা হয়েছে, অন্য সংস্থার জন্য চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর ক্ষেত্রে এই প্রথম। সংস্থাটি হল রোশন ফিল্মস। সংশ্লিষ্ট চিত্রের প্রযোজক ভি ডি কালরা; কাহিনী-রচয়িতা কমলেশ্বর।

প্রায় কুড়ি বছর আগে বি আর চোপরা অনুরূপ একটি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ঘটনাটা এই রকম : মাদ্রাজের একটি সংস্থার (নারাসু স্টুডিওজ) জন্য জ্ঞান মুখার্জি সিতারোঁ সে আগে নাম একটি ছবি পরিচালনা করতে করতে হঠাৎ গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। তখন প্রযোজকদের পক্ষ থেকে জ্ঞান মুখার্জিকে ওই কাজ ছেড়ে দিতে বলা হয়। তিনি তাই করেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। নারাসু স্টুডিওজ তখন জ্ঞান মুখার্জির সহকারী গুরু দত্তকে ওই ছবি শেষ করতে অনুরোধ জানান। ছবিটির আট রিল তৈরি ছিল, গুরু দত্তকে রাশ প্রিন্ট দেখানো হয়। গুরু দত্ত দেখে শুনে বলেন, তোলা অংশের কিছুই প্রায় রাখা যাবে না; যদি তাঁকে প্রয়োজন মতো নতুন করে শুটিং করার এবং ইচ্ছামতো অদল-বদল করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই তিনি ওই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারেন। প্রযোজকদের কাছে এই শর্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত

"শুভ সংবাদ" (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে রাজশ্রী বসু ও শিপ্রা মিত্র

হয়নি, প্রস্তাবটি অতএব কার্যকর হল না। দাক্ষিণী চিত্র সংস্থাটি পড়লেন বিপদে এদিকে পরিবেষকরা ওই ছবি শেষ করার জন্য কেবলই তাঁদের তাড়া দিচ্ছেন। এই সময় প্রযোজকদের মনে পড়ল বি আর চোপরার কথা। তিনি তখন মধ্যপ্রদেশে নয়া দওর ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করছিলেন। উক্ত চিত্র-সংস্থার পক্ষ থেকে কে বেঙ্কটেশন মধ্য-প্রদেশের বিশেষ লোকেশনটিতে গিয়ে বি আর চোপরার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে সিতারো সে আগে ছবির পরিচালন-ভার নিতে রাজি করান। চোপরার সম্মতিক্রমে নারাসু স্টুডিওজ খবরটি বিভিন্ন সিনেমা-পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত করেন। স্থির হয়, নয়া দওর-এর আউটডোর শুটিং শেষ হলেই বি আর চোপরা মাদ্রাজে যাবেন।

এইবার রঙ্গস্থলে এলেন দিল্লির ভি ভি পুরী, যিনি বি আর ফিল্মসের যাবতীয় ছবির জন্য টাকার জোগান দিয়ে আসছিলেন। তিনি বললেন, চোপরার সঙ্গে তাঁর পাকা যে চুক্তি রয়েছে তার শর্ত অনুসারে চোপরা অন্য কোনও সংস্থার ছবিতে হাত দিতে পারেন না। বি আর চোপরা দেখলেন, কথাটা ঠিক, তখন কী আর করেন, নারাসু স্টুডিওজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। "সিতারো সে আগে"র প্রযোজকরা আবার সংকটে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরলেন সত্যেন বোসকে। কাজটা তিনিই চালিয়ে দিলেন। ছবি শেষ হবার পর প্রযোজকরা কী বলেছিলেন, জানি না; তবে গুরু দত্তের শর্তে রাজি না হওয়ার জন্য তাঁদের আপসোস করার যথেষ্ট কারণ ছিল।

কথাবার্তার সময় সত্যেন বোস তৈরি আট রিলের প্রতি দৃশ্য অপরিবর্তিত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ছবির শুটিং সমাপ্ত হওয়ার পর দেখা গেল, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়কৃত অংশের মধ্যে একখানি গান ছাড়া আর সবই বাদ গিয়েছে। সত্যেন বোসের হাতে বদলে গিয়েছে গোটা চিত্র-নাট্যটাই!

* * *

মহারাষ্ট্রের নতুন বাজেটে (১৯৭৫-৭৬) পেশার উপর কর বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সিনেমার যাবতীয় শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মী এই করের আওতায় আসবেন। 'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' এই দুই শ্রেণীতে পেশাদারদের ভাগ করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমোক্ত শ্রেণীর পেশাদারদের প্রত্যেককে বছরে ১[illegible] টাকা কর দিতে হবে; দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর উপর জন প্রতি বছরে ২৫০ টাকা কর ধার্য হওয়ার কথা। মহারাষ্ট্রে এই ধরনের করের প্রস্তাব আগে শোনা যায়নি। সারা দেশের কোন রাজ্যেও এ পর্যন্ত অন্তত, সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে অনুরূপ কর দিতে হয়নি। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে কীভাবে এই পেশা-কর আদায় করা হবে, বোঝা যাচ্ছে না।

একদিকে রাজ্য স্তরে এই পেশা-করের প্রস্তাব, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে তো ফিল্মের উপর আবগারি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব—এখানকার সিনেমা-মহলে বিক্ষোভ এবং উদ্বেগের লক্ষণ বেশ স্পষ্ট।

সুরঞ্জ

ভাবমণ্ডিত মণিপুরী

ঝাভেরী ভগিনীবৃন্দের নাচে রবীন্দ্রনাথের পদাবলী ব্যবহার কলকাতার মানুষের কাছে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার ধন। কিংবদন্তী প্রায় ঝাভেরী ভগিনীবৃন্দের দুজনকে— রঞ্জনা এবং দর্শনা—আমরা পেয়েছিলাম মণিপুরী নর্তনালয়ের এক প্রভাতী অনুষ্ঠানে, ৯ই মার্চ একাডেমী হলে। কবিগুরুর "ভানুসিংহের পদাবলী" অবলম্বনে নৃত্য ব্যতীত নর্তনালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের পরিবেষণায় আমরা রাস-নৃত্য দেখেছিলাম।

ঝাভেরীদের প্রসঙ্গে কোন কিছু বলা মানেই চূড়ান্ত প্রশংসা উচ্চারণ করা। মজাটাই এই যে, ওই চূড়ান্ত প্রশংসাও বড় সাবলীলভাবে মুখ গড়িয়ে বেরিয়ে আসে। মণিপুরী নাচকে তার শাস্ত্রের আয়ত্তিতে রেখে এতখানি ব্যাপ্তি আর কেউ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ মণিপুরী নাচের যেটা ধ্রুপদী ভাব, যেটা শাস্ত্ররূপ, সেটাই অনুভবের স্তর বেয়ে বেয়ে এত সবলভাবে মনে এসে আছড়ে পড়ে যে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা মনে একটা ছিল এইবার। কারণ স্বল্পজানা বাংলা ভাষার, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ওই বোনেরা কী দাঁড় করান, এই প্রশ্ন যে কোন বাঙালীরই একবার না একবার ভাবতে ইচ্ছা করবেই।

কিন্তু সেই মুগ্ধই হয়েছি। ভানুসিংহের পদগুলিকে যে মূর্ছনা দিয়েছেন ঝাভেরী বোনেরা, যে পরিমিতিবোধের ভেতর তার বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং যে ধরনের ব্যাখ্যায় পেশ করেছেন কিছু কিছু পদ, তাতে ভাল লাগা, ভালবাসা জাতীয় দুর্লভ অনুভূতিগুলো অনেক দর্শকেরই মনে সহজে এসে গেছে। ইদানীং রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নামে যে এক ধরনের নাচগান চালু হয়েছে তার সঙ্গে এই নাচের মৌলিক পার্থক্য এই যে ওগুলো যেখানে শেষ, অর্থাৎ দেখায়, এই নাচের শুরু সেইখানে, অর্থাৎ ভাবনায়। আর সেটা এই জন্যই সম্ভব যে ঝাভেরীরা কবির পদকে মন্ত্রের শুচিতা এবং কবিতার প্রসার দেন। ভাব নিয়েই ও'দের কারবার, ভাবের ভাষাই ও'দের মণিপুরীর সুর্দ এবং আসল। নৃত্যরূপে রবীন্দ্রনাথকে এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধা দেখান অসম্ভব। দর্শনার অভিনয়ে কৃষ্ণ, কিংবা রঞ্জনার পরিবেষণায় রাধিকাকে যদি আলোচনায় বাঁধতে চাই তবে আমি এই ভাবনার রূপটিকে একটা দর্শনীয় বস্তুর স্তরে নামিয়ে আনব।

বরং সুবিধে উদ্দাম যুবক নারান সিংহের মৃদঙ্গ চলনের কথা বলা। মৃদঙ্গ নিয়ে সে প্রায় শিবের নাচ। দুরূহ তালে মৃদঙ্গবাদন এবং সেই সঙ্গে দিগ্বিদিকে শরীর আবর্তিত করা, অর্থাৎ শরীরকে সম্পূর্ণরূপে নাচের ভাষায় পরিণত করা, দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। শাড়ং নর্তনে ছয় পদের প্রবন্ধে রঞ্জনা, দর্শনা, শান্তিবালা এবং ব্রততী সুন্দর ভাব এবং চলনের যোগাযোগ দেখিয়েছিলেন। তবে দর্শনা, কলাবতী এবং শান্তির মৃদঙ্গবাদন আরো কিছুক্ষণ চললে ভাল লাগত। কিছুটা দায়সারা ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এই নিবেদনটি।

তবে সবচেয়ে ভাল ভাল কথা আমার বলা উচিত গোষ্ঠলীলা নৃত্যে নর্তনালয়ের ছোট ছোট মেয়েদের কাজ সম্পর্কে। শিশুরা এমনিতেই সুন্দর। নাচলে বোধ হয় আরো সুন্দর। তাও আবার কৃষ্ণবেশে যদি অতগুলো শিশু একত্র হয় তবে সে দৃশ্যের কি সত্যিই কোন বর্ণনা হয়? সম্ভবত গোষ্ঠলীলা নাচটি নাচ বলে মনেই হত না যদি না তা স্টেজে হত। এত স্বাভাবিক দেখিয়েছিল পুরো ব্যাপারটা যে একবারও মনে হয়নি এরা পরিশ্রম করে কিছু করছে। ওদের গুরুদের কৃতিত্ব এই যে, নাচকে ও'রা ক্রীড়ার স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

—নৃত্যসমালোচক

"প্রিয় বান্ধবী" (পরিচালনা : হীরেন নাগ) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

হবু রাজার দেশে

(সর্জন)

হবু রাজার দেশে সবাই চোর। সেখানে জবুথবুদের বাস। গবু মন্ত্রীর পরামর্শে হবু রাজার আশ্চর্য আবিষ্কার "হবু নিদ্রামণি বটিকা" প্রজাদের নিয়মিত সেবন করানো হয় যা ক্ষিদের যন্ত্রণা দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে। ওই দেশে এসে পৌঁছন কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব যাঁর উপস্থিতি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে। সর্জন নিবেদিত "হবু রাজার দেশে" নাটকটি রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত হলেও নাট্যকার (শক্তি বিশ্বাস) সমকালীন এক মর্মান্তিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে যে আঘাত করতে চেয়েছেন সেটি আদৌ অস্পষ্ট নয়। কমেডির ভঙ্গিতে নাটকের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু স্যাটায়ারের তীব্রতাটুকুও স্পষ্টই অনুভূত। ক্ষুৎপীড়িত মানুষের কাছে এ নাটকের আবেদন অনেকখানি। নাটকের পরিণতিতে বিদ্রোহ এবং রাজার পরাজয়। নাটক তখন নাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আবরণটিও তখন অন্তর্হিত।

নাটকের প্রয়োগ-পরিকল্পনা বাহবা পাবার মত। নির্দেশক (শান্তনু রায়) নাটকের আদ্যন্ত গতিবেগ বজায় রেখেছেন। কমেডির মধ্যে থেকে ব্যঙ্গের রূপটি স্পষ্ট করে দিতে পেরেছেন। এবং একটি মুহূর্তে হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় এই রূপক নাট্যের অংশীদার হয়ে গেছি আমরা সবাই। প্রত্যেকেই আমরা তখন একটি মর্মান্তিক বাস্তবের মুখোমুখি। নির্দেশনার সবচেয়ে বড় সার্থকতা এইখানেই। হবু রাজার চরিত্রে নির্দেশক শান্তনু রায় নিজেই অভিনয় করেছেন। চরিত্রোচিত মেজাজটি তিনি অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। অত্যন্ত সাবলীল তাঁর অভিনয়। গবু মন্ত্রীর ভূমিকায় মলয় দত্ত একটি সার্থক টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আকৃতি এবং অভিনয়ের ভঙ্গি একটি বিশেষ শ্রেণীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের ভূমিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সহজ ভঙ্গিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর চরিত্রটিতে রূপকের মোড়ক নেই, অতি বাস্তব ওই চরিত্র। প্রভাতভূষণ-কৃত আবহ-সংগীত নাটকের বক্তব্য প্রকাশে প্রচুর সহায়তা করেছে। আর ভাল হয়েছে আলোকসম্পাতের কাজ।

—নাট্য-সমালোচক

[illegible]

[illegible] অনুষ্ঠান উপলক্ষে [illegible] সংগীত [illegible] তাঁদের [illegible] উৎসব [illegible] করেন। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এবারকার সারা রাত্র আসরে গান গেয়েছেন গিরিজা দেবী এবং জগদীশ প্রসাদ। খুব অল্প সময় নিয়েও গিরিজা দেবী আহির ভৈরোঁ খেয়ালটি পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তোলেন। শিল্পী যেমন সুন্দর রূপবোধের পরিচয় রেখেছেন বিস্তারে, তেমন রেখেছেন মেওয়াজী কণ্ঠের, তান, সরগমের প্রয়োগে। পূর্বী চঙয়ে পরিবেশিত যোগীয়া ঠুমরীটি এবং শেষের ভৈরবী টপ্পাটিও শ্রুতিনন্দন করে তুলতে কোন ত্রুটি রাখেননি শিল্পী। তবলায় শংকর ঘোষ তাঁকে যথোচিত সাহায্য করেন। জগদীশ প্রসাদ স্বর্গত গোলাম আলী খাঁ সাহেবের ঢংটি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগ রূপায়ণে তিনি প্রায়শই শৃঙ্খলাহীন। ফলে তাঁর মালকোষ বিস্তার বড় অসম্বন্ধ লেগেছে। দ্রুত অংশে বরং কিছুটা পারিপাট্য ছিল। তরুণ তবলিয়া অরুণ ঘোষালের সংগতের মেজাজ সুন্দর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গায়কের কাছ থেকে তিনি আশানুরূপ সুযোগ পাননি। আসরে সরোদ শুনিয়েছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ছায়া তাঁর হাতে খুব নম্র রূপ নেয়। বুদ্ধদেবের গতের বন্দিশটি বড় মেজাজী। বাজিয়েছেনও খোশ মেজাজে। শিল্পীর সংগে শংকর ঘোষের অনবদ্য সংগতের কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। আসরে কোন সারেংগী বাদক ছিলেন না। কিন্তু মোহনলাল শর্মার অসাধারণ মিষ্টি হারমোনিয়ম সে কোথাও তা স্মরণ হতে দেয়নি।

নাচের অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন উর্মিলা নগর। কথকের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনেও নিজের বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু শিল্পী তাঁর প্রয়াসে [illegible] কৌশিক [illegible] যে গভীর [illegible] এবং যে সমস্ত [illegible] উপলব্ধি, নিখিল তা পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন সেদিন। সহযোগিতায় ছিলেন শান্তাপ্রসাদ। সুখের বিষয়, তখন তাঁর সংযম ফিরে আসে।

পুরন্দরীক

এক মঞ্চে তিন জাদুকর

ভবচক্র, শৈলেশ্বর ও এল কে রায়— এই তিনজন জাদুকর প্রায় সন্ধ্যা দু' ঘণ্টার ইন্দ্রজাল পরিবেশন করলেন একই মঞ্চে। গত ৯ মার্চ মহীশূর অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে রাজা বসন্ত রায় রোডে অ্যাসোসিয়েশন হলে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। মঞ্চমায়ার পরিচিত খেলাগুলি মুখ্যত ভবচক্র ও এল কে রায় ভাগাভাগি করে দেখালেন। শৈলেশ্বর-এর ভূমিকা ছিল কৌতুক রসের মাধ্যমে জাদু-সৃষ্টি।

ভবচক্র সেদিন সব খেলাই মোট মুটি পরিচ্ছন্নভাবে দেখালেন। বিশেষভাবে মনে থাকে, মণিবন্ধ-কর্তন, রুমাল-রহস্য, গ্রামোফোন রেকর্ডের রঙ পরিবর্তন, অগ্নি-ভক্ষণ এবং 'সলিড থ্রু সলিড'। ইলিউশন বক্স দেখাতে গিয়ে তিনি অনিবার্যভাবেই হুডিনির নাম উল্লেখ করলেন। অ্যারেকটু পৌঁছিয়ে, খেলাটির প্রবর্তক মেসকেলিনের নাম উচ্চারণ করতে কী বাধা ছিল বোঝা গেল না।

এল কে রায়ের প্রদর্শনভঙ্গিতে দক্ষতা ও দাপট সুন্দর মিশেছে। বিশেষত, তাঁর কনজিউরিংয়ের হাত যে নিখুঁত, তার নির্ভুল প্রমাণ রাখলেন। শূন্য থেকে পর-পর জ্বলন্ত সিগারেট চয়ন করে স্বতঃস্ফূর্ত [illegible] যে [illegible] জাদুমঞ্চে [illegible] বহুমুখী [illegible] করে [illegible] লাগে।

শৈলেশ্বর এরেসি [illegible] নির্দোষ আমোদ সৃষ্টি করতে। [illegible] বেশে তাঁর মঞ্চাবির্ভাব। জাদুদণ্ডের এক প্রান্তে রাখা গুমটানা বোতলটিকে ফুলের স্তবক বানিয়ে, কাগজ কুঁচিয়ে পরমুহূর্তে জোড়া দিয়ে, দু'-হাত দড়িকে টেনেটুনে হস্ত বিশেক লম্বা করে, টাইটিকে টানতে-টানতে আভূমিলম্বিত করে—তিনি এক-পর-এক এমন সব কাণ্ড ঘটাতে লাগলেন [illegible] একাধারে মজাদার অথচ অলৌকিক সপ্রতিভ, সুঅভিনেতা, দক্ষ এই তরু জাদুকর প্রমাণ করলেন, সামান্য বুদ্ধি খ[illegible] করে পরিচিত খেলাকেও কেমন চমক বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপে পরিবেশন করা যা[illegible] শৈলেশ্বর সেদিন মঞ্চে ছিলেন খু[illegible] অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যে-রেশ রে[illegible] গেলেন তার সৌরভ স্থির থাকবে বহুদি[illegible]

—বিশেষ প্রতিনি[illegible]

গ্রামোফোন রেকর্ডে মীরার ভজন

গ্রামোফোন রেকর্ডে লতা মঙ্গেশকরে[illegible] গাওয়া একগুচ্ছ মীরার ভজন 'চলা ওহি দে[illegible]' একটি এল-পি রেকর্ডে সম্প্রতি প্রকাশি[illegible] হয়েছে। ওই পর্যায়ে এটি তাঁর দ্বিতী[illegible] রেকর্ড। সংগীত নির্দেশনায় আ[illegible] হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। এই রেকর্ড প্রক[illegible] উপলক্ষে বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটে[illegible] একটি অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমতী লতা [illegible] গানের রেকর্ডটি আনুষ্ঠানিকভাবে অ[illegible] করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেবারে[illegible] মহারাণা শ্রীভগবৎ সিং-এর [illegible]। প্রসংগত উল্লেখ্য সংগীতসাধিকা মীরাবাঈ এ[illegible] মেবারেরই মহারানী ছিলেন।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
[illegible]
[illegible]
৫ পয়সা
বাঙলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসি[illegible]
কলিকাতা		৪০.৮০ টাকা	২০.৮০ টাকা	×
সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪৫.৯০ টাকা	২৩.৪০ টাকা	১১·[illegible] টাক[illegible]
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮.৮৫ টাকা	৩৫.১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬.৯০ টাকা	৪৯.৪০ টাকা	২৪·[illegible] টা[illegible]
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের লনডন মাধ্যমে	১৯১.২০ টাকা	৯৬.০০ টাকা	৪৮·[illegible] টা[illegible]

৫ এপ্রিল, ১৯৭৫॥ ৮০ পয়সা
COOCH BEHAR
সাধনা দশন
সাধনা টুথ পেষ্ট
সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
SADHANA DASAN
TOOTH POWDER

এখন! প্রত্যেকটি দিনেই কিশোরী থাকার আনন্দ উপভোগ করুন

নতুন টীন-এজ* স্যানিটারী ন্যাপকিন

আপনার কৈশোর লালিত শরীরের গঠন অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নেবার মত —বিশেষভাবে চিকন

আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে —বিশেষভাবে নিরাপদ

আপনার জীবনে কৈশোরের কয়েকটা বছর হ'ল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়।

এবং নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন আপনাকে প্রত্যেকটি দিনের আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেয়।

নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন অন্যান্য স্যানিটারী ন্যাপকিনের মত নয়।

এগুলি চিকন, সুদৃঢ় আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আপনার কৈশোর লালিত শরীরের গঠন অনুযায়ী ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেবার মত যথেষ্ট চিকন।

এবং নরমভাবে ও নিরাপদভাবে রক্ষা করবার মত যথেষ্ট সুদৃঢ়।

তাই যে কোন কিশোরীই নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবতে পারে—এমন কি কষ্টের ঐ দিনগুলি যদি কাজকর্মের দিন হয়, তা'হলেও।

নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিনের ওপর নির্ভর করুন। এগুলি আপনার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী।

সেরা বিশোষক নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন

বিশেষ ধরনের শুষে নেবার বাড়তি শক্তি সম্পন্ন এমন এক জিনিষ দিয়ে তৈরী যার জন্য সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরের স্তরের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। ফলে সব এক জায়গায় জমে থাকে না। গোলাপী এক রক্ষাকবচ এর সম্পূর্ণ তলা আর চারপাশ ঘিরে থাকে। তাই কাপড়ে দাগ লাগারও ভয় নেই।

বিন্যাসযোগ্য নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন বিন্যাসযোগ্য সাইজে পাওয়া যায়, যাতে আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি **টীন-এজ** বেল্ট।

ফ্লাশ করার যোগ্য নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন সহজেই ফেলে দিতে পারা যায়, কেননা একে ফ্লাশ করলেই জলের মধ্যে সব অদৃশ্য।

সুন্দর গোলাপী নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন একমাত্র গোলাপী স্যানিটারী ন্যাপকিন যা এখন বাজারে পাওয়া যায়।

কেয়ারফ্রী* স্যানিটারী ন্যাপকিনের প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে

Carefree
SANITARY NAPKINS

Johnson & Johnson*

জনসন অ্যাণ্ড জনসন* একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে

OBM 4795-BEN

*কেয়ারফ্রী এবং টীন-এজ হ'ল ইউ এস এ-র জনসন অ্যাণ্ড জনসন-এর ট্রেডমার্ক।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

জাতীয় জনপদ, ভূপোভা— ... ৬৯৫
ব্যঙ্গচিত্র— ... ৬৯৬
অল্পবিস্তর—শিবরাম চক্রবর্তী ... ৬৯৬
দৃশ্যপট—নবারুণ গুপ্ত ... ৬৯৭
বৈদেশিকী—দেবরাজ ... ৬৯৮
রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা— ... ৬৯৯
টুল (কবিতা)—সুভাষ মুখোপাধ্যায় ... ৭০০
কণ্ঠ হৃদ (কবিতা)—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ... ৭০০
বামন্তের প্রার্থনা (কবিতা)—শঙ্খ ঘোষ ... ৭০০
একটি মশালের অবসান—রঞ্জন ... ৭০১
গালিবের গজল থেকে—আবু সয়ীদ আইয়ুব ... ৭০৩
সূর্য চলে গেলে—তুলসী সেনগুপ্ত ... ৭০৯
বিশ্ববিজ্ঞান—সমরজিৎ কর ... ৭১৭
যাও পাখি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ৭২১
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর—শিবরাম চক্রবর্তী ... ৭২৭

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
একটি নাইজেরী আবেদন-পত্র—নিখিলকুমার নন্দী	...	৭২৯
আলোচনা—	...	৭৩২
মুখ চাই মুখ—মিলন মুখোপাধ্যায়	...	৭৩৩
ভারতের অর্থনীতি—সুব্রত গুপ্ত	...	৭৪৫
যুগ যুগ জীয়ে—সমরেশ বসু	...	৭৪৮
চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		৭৪৯
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	...	৭৫২
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৭৫৩
বিদেশী বই—প্রিয় শর্মা	...	৭৫৫
পুস্তক পরিচয়—	...	৭৫৭
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৭৫৯
ক্রিকেটে এবারের পঞ্জী—মুকুন্দ	...	৭৬১
অরণ্যদেব—	...	৭৬২
রঙ্গজগৎ—	...	৭৬৩

প্রচ্ছদ : সমীর দত্তগুপ্ত

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩
শনিবার ২২ চৈত্র ১৩৮৯

জাতীয় সম্পদ, ভূশোভা

স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষা জাতীয় কর্তব্যের একটি প্রধান বিষয় বলে যদি স্বীকৃত হয়ে থাকে, তবে কর্তব্যের বিধি আজও কেন প্রচলিত করা হলো না? প্রচারিত একটি সংবাদে এই মর্মের প্রশ্ন ভাষিত হয়েছে। বস্তুত সংবাদটিই হলো এই প্রশ্নের একটি বিস্তারিত কথন। প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষার উদ্দেশে একটি পরিকল্পনা বিহিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি একসময় উৎসাহিত হয়েছিলেন, এবং এই উৎসাহের মূলে ছিল প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের সাড়া। কিন্তু কার্যত পরিকল্পনাটি যেন সরকারী অনুৎসাহেরই মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন কর্মবিধি প্রচলিত হয়নি, এবং প্রচলিত করবার কথাটাও কেউ আর আলোচনা করেননি। সংসদেও কোন বেসরকারী ব্যক্তি স্থানিক ভূশোভার সংরক্ষা দাবি করে কোনদিনও কোন প্রস্তাব তোলেন নি। সুতরাং ধারণা করতে হয় যে, ভূশোভার সংরক্ষা জাতীয় কর্তব্যের একটি প্রধান বিষয় বলে স্বীকৃত হলেও জাতীয় কর্তব্যের সাড়া জাগেনি। স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী কোন পণ্য নয়। শালবনের সব শালগাছ কাঠের কারবারীর কাছে বিক্রী করে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু শালবনের শোভা বিক্রী করে দেওয়া সম্ভবই নয়। নিসর্গের শোভা ও সৌন্দর্যকে পণ্যসামগ্রীর মতো বিক্রী করা সম্ভব নয় বলেই সেটা কোন সম্পদ নয় বলে মনে করা চলে না। সেটা জাতির জীবনের পক্ষে একটি বিশুদ্ধ অমূল্য সম্পদ। এবং স্থানিক নিসর্গের শোভা ও সুন্দরতা যদি কোন অপঘাতে বিনষ্ট হয়, তবে সেটা হবে জাতিরই জীবনের একটি অমূল্য ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলবার দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির ঘটনা।

এই দুর্ভাগ্য এবং ক্ষতির চিহ্ন দেশের অনেক স্থানের প্রকৃতিক চিত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। নতুন শহর ও উপশহর এবং কারখানা ও শ্রমিক-বস্তির ব্যাপক বিস্তারের ফলে বনের উচ্ছেদ হয়ে চলেছে, নদীতটের শোভা ও পরিসর খণ্ডিত করে কারখানা ও বস্তির ভিড় গড়ে উঠছে, বাজার বসাবার জন্য খোলা মাঠের প্রশস্ততা কেটে-ছেঁটে খর্ব করে দেওয়া হচ্ছে; এরকম শোচনীয় দৃশ্য দেশের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। ইকোলজির পণ্ডিতেরা ইদানীং একটু বেশী সরব হয়েছেন, তাই একটি নীতির কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়—প্রকৃতি তথা নিসর্গ-রূপের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার নীতি। মানুষের জীবনের বসতি যদি প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে থাকতে না পারে, তবে সেই বসতি গুণে-ধর্মে ও রূপে বস্তুত বাজারে পরিণত হবে। তার মধ্যে অনেক উল্লাস এবং অনেক আগ্রহ ও ব্যস্ততার কোলাহল থাকলেও মানুষের জীবনের সহজ আনন্দের সম্বলগুলি জীর্ণ ও বিকৃত হয়ে যাবেই যাবে। বাল্মীকির রামায়নের রামচন্দ্র স্বর্ণময়ী লংকাপুরীর ঝলমলে রূপের দিকে তাকিয়ে লক্ষণকে বলেছিলেন—লক্ষণ, এই স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমার জননী এবং জন্মভূমিই আমার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী। স্বর্ণময়ী লংকাপুরী সম্পর্কে রামচন্দ্রের এই অরুচির একটি বড় কারণ কল্পনা করতে পারা যায়। যদিও কবি বাল্মীকি স্পষ্ট করে কিংবা ব্যাখ্যা করে বলেননি, তবু অনুমান করা চলে যে, রামচন্দ্র সেই লংকাপুরীর রূপের মধ্যে নিসর্গ-শোভার অবরোধ দেখতে পেয়েছিলেন। লংকাপুরীর শোভার সবই সোনার শোভা। এর তুলনায় অনেক সুন্দর হলো সরযূতটের সেই অযোধ্যার শোভা, যেটা নিসর্গের অকুণ্ঠিত রূপের প্রসন্ন প্রকাশ। যেখানে তরুলতার শ্যামলতা, আকাশের বিস্তারিত নীলিমা এবং সূর্যোদয়ের রক্তিম ছবিকে বিকৃত অথবা বিড়ম্বিত করে সোনার আতিশয্য ঝলমল করে না।

ব্রিটেনে ভূশোভার সংরক্ষার জন্য একটি 'জাতীয় ট্রাস্ট' আছে। নিসর্গ-শোভার হানি হয়, এমন কোন ঘটনার প্রকোপ নিরাকৃত করাই এই ট্রাস্টের প্রধান কাজ। আমাদের দেশে দেখা যায়, বৈষয়িক স্বার্থের তাগিদে ভূশোভার উপর বলাঘাত করতে কেউ কোন অভিরুচির বাধা বোধ করেন না, এবং সরকারও বাধা দেবার কোন নীতির তাগিদ বোধ করেন না। রেল-লাইন কিংবা সড়কের খোয়া-পাথর সরবরাহ করবার সরকারী ঠিকাদার বাজি ডিনামাইট দিয়ে ছোট পাহাড়ের মাথাটা উড়িয়ে দিলেও কোন আইনের শাসন ছুটে এসে কৈফিয়ত দাবি করবে না। খোলা মাঠ ময়দান ও পার্কের জন্য পৌরসভার আচরণে মমতার খুবই অভাব দেখা যায়। সাম্প্রতিক একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, হাওড়ার জনসাধারণ সভা করে খোলা মাঠ ও খেলার মাঠ দাবি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রবক্তার বিবৃতিতে অযোধ্যা পাহাড়ের স্থানিক ভূশোভার সংরক্ষা এবং পর্যটকের আকর্ষণের উপযোগী ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা মুখরিত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কার্যত কিছুই হয়নি। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানের বিশিষ্ট নিসর্গ-শোভা যদি রিক্ত অথবা বিনষ্ট হয়, তবে পর্যটকের আকর্ষণ সম্ভব করবার জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করবার সুযোগ ক্ষীণতর হয়ে যেতে বাধ্য। একথা সত্য যে, কোন কোন স্থানের নিসর্গ-শোভা কারও আচরণের অথবা ইচ্ছার প্রকোপে বিনষ্ট হবার নয়। টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের শোভা কেউ বিকৃত করতে পারবে না। কিন্তু এ ধরনের চির-সুরক্ষিত নিসর্গশোভার হিসাব বাদ দিয়েই বলতে হয় যে, স্থানিক নদী বন ঝর্ণা ও পাহাড়ের বিশেষ শোভার সম্বল অবহেলায় অথবা অপঘাতে বিকৃত ও রিক্ত হয়ে যেতে পারে। 'অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি'—পশ্চিমবঙ্গের নিসর্গে মুক্ত প্রান্তরের শোভা একটি বিশিষ্ট রূপের সম্বল। কিন্তু অবারিত মাঠের রূপ খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত করে মানুষের বসতির বিস্তার সরকারী অনুমোদনেই পরিচালিত হচ্ছে। স্থানিক ভূশোভার প্রতি এ ধরনের অবাধ তুচ্ছতা ও বৈষয়িক প্রয়োজনের যথেচ্ছাচার কোন সভ্য সরকারের পক্ষে এবং সমাজেরও পক্ষে সহ্য করা উচিত নয়। ব্রিটেনের ন্যাশনাল ট্রাস্ট দেশের ল্যান্ডস্কেপ-এর সংরক্ষার জন্য যেমন একটা চেষ্টা ও সতর্কতা জাগ্রত করে রেখেছে, তেমনই আমাদের দেশেও ভূশোভার সংরক্ষার জন্য আইনের দ্বারা অনুমোদিত একটি সংস্থা চাই।

নতুন বাজেটে বছরের শেষে সরকারী আর্থিক ঘাটতি দাঁড়াবে চার শো পঁচিশ কোটি টাকা মাত্র। চার শো বিশের ওপর ঘাটতি এই পাঁচ আবার কিসের? প্রশ্ন তুলেছেন একজন।

আমাদের পঞ্চম লাভের। বোধ করি।

• • •

হাওড়া শহরের পঞ্চাননতলার জঞ্জালে ভর্তি একটি রাস্তার নীচে প্রকাশ এক পরিবার বেমালুম দেখা গেল সেদিন।

যাই, দুর্ঘটনা হয়নি ত! পাঁচতলা বাড়িগুলি এখনও।

• • • •

এক আসরে তিন ধারার তিন নেতা—সংবাদপত্রের চিত্রে কংগ্রেস (সং)-এর শ্রীঅতুল্য সেন, কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং জনসংঘের শ্রীহরিপদ ভারতীকে একাসনে উপবিষ্ট দেখা গেল।

এর ভেতরে আসল ধারাটি কোথায়?
—সেই সুশীল ধারা!

• • •

এবার পাগলদের সুচিকিৎসার হেতু হাসপাতালগুলিতে মেডার কিওর-এর ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রকাশ।

এতদিন ত মড়ক মারী মন্বন্তরই পাগলদের (সেই সাথে গরিবকেও) সারাবার

শ্রীস্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সেদিন আমার বিয়ের এক বন্ধু এসে সহানুভূতি জানালেন, ম্যারেজ ইজ নাথিং বাট এ হেডেক্। আমি তাঁর জবাবে বলেছিলাম, বাট ওয়াইফ ইজ দ্য অ্যানাসিন। কেমন, ঠিক হয়নি আমার জবাবটা?

মোটে অ্যানাসিন? সীন আফটার সীন—এই তো জানি।

• • •

শ্রীসুবিমল বাগচি : 'সেদিন বাসের হ্যান্ডেলে ঝুলতে থাকা একটি যুবককে

অল্প বিস্তর

জিজ্ঞেস করলাম, এটা কত নম্বর বাস? যুবের অধিকারী (সম্ভবত ইউনিভার্সিটি স্কুলে বাংলা পড়ে) রাগ করলো কিনা বুঝলাম না, জবাব দিলো 'সীমিত খচ্চর।' সে কি লিমিটেড বি-কেয়ার বলল, নাকি, খচ্চর বলে গাল দিয়ে গেল আমাকেই? বলতে পারেন?'

আও হয়—ওও হয়!

• • •

অধ্যাপক শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় এম এ পি এইচ ডি (হায়দ্রাবাদ) : সম্প্রতি কোনো এক পশুপ্রজনন কেন্দ্রের বার্ষিক রিপোর্ট তার এক জায়গায় হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে—'এ কেন্দ্রের পশুজননবিত্তরা প[...] পঞ্চাশটি গাভীকে গর্ভবতী করতে পা[...] শুনে মন্ত্রীমশাই মন্তব্য করলেন—এ দেশের প্রধান সমস্যা।

কেবল সাম্প্রতিক বা সাম্প্রদায়িক[...] সমস্যাটি পাশবিক হওয়া বিশেষ গরুর বলেই গুরুতর [...]রি।

• • •

শ্রীসোমেন সিংহরায় : 'নারী প্র[...] এই বৎসরে এই মফস্বল শহরের মহিলা হোস্টেলের সরস্বতী প্র[...] বিসর্জন উৎসবে হস্টেলের সদস্যারা ম[...] দিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে মাকে [...] গিয়েছেন—খবর রাখেন তার?'

সরস্বতী দুর্দশাগ্রস্তা হলেন।

• • •

শ্রীপ্রভাত সেন শর্মা : 'প্রজাপতি [...] করেছে—আসামী হয়েছি আমি। [...] ফেব্রুয়ারি দিন পড়েছে/সাক্ষী থেকো [...]

• • •

শ্রীকার্তিক দত্ত : 'বাংলাদেশে [...] দিলো এক শত কুড়ি টাকা (স[...] প্রকাশ)। তা হলে লঙ্কায় বাংলা[...] কিনলো কত?'

বাজারদর যেমন!

শিবরাম চক্র[...]

দৃশ্যপট

বিদেশী হাত

বেশ কিছুদিন এই বিষয়ে চুপচাপ থাকার পর প্রধানমন্ত্রী আবার ভারতে বিদেশী ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। পুলিসের ইনসপেকটর জেনারেলদের এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে সম্প্রতি হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বেড়েছে এবং তার পেছনে বিদেশীদের হাত আছে।

প্রধানমন্ত্রী এবার অবশ্য স্পষ্ট করে বলেন নি যে কোন্ বা কোন্ কোন্ বিদেশী শক্তির কথা তিনি বললেন। সে প্রসঙ্গ তিনি এবার উহ্য রেখে গিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে আমেরিকার কথা বলেছিলেন। শোনা যায় মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগারকেও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাঁর খবর আছে, সি আই এ তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। শংকরদয়াল শর্মা যখন কংগ্রেস সভাপতি তখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান সি আই এ সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ বেশ প্রকাশ্যেই এনেছিলেন।

সম্প্রতি আবার বিরোধীরা কে জি বি নামক রুশ গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলছেন। গুজরাটের গোপন কংগ্রেস অধিবেশনে চারজন রুশের উপস্থিতি নিয়ে বেশ কিছুটা হইচই হয়ে গেল। হইচই হয়ে গেল সেই দুজন রুশ কূটনীতিবিদকে নিয়েও যাঁরা ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন অফিসারের কাছ থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে কার্যত ধরা পড়েছেন।

✻

বিভিন্ন বিদেশী গোয়েন্দা চক্র যে এদেশে সক্রিয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সক্রিয় যেমন মার্কিন গোয়েন্দা চক্র, সক্রিয় তেমনি রুশ গোয়েন্দা চক্র, সক্রিয় তেমনি পাক গোয়েন্দা চক্রও। অন্যান্য কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা চক্রও সক্রিয়।

কিন্তু প্রশ্ন এই সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে নয়—প্রশ্ন হল, কে কতটা সক্রিয় এবং কে কি উদ্দেশ্যে সক্রিয়? পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই কূটনীতিবিদের বেশে বিদেশী গোয়েন্দারা কাজ করেন। এটাও কোনও ব্যতিক্রম নয়। আমাদের যে দূতাবাসগুলি বিদেশে আছে তারও অনেকগুলিতে আমাদের গোয়েন্দাবাহিনীর লোকেরা কূটনীতিবিদের বেশে আছেন। এবং যেসব দেশে তাঁরা আছেন সেইসব দেশের সরকারও মোটামুটি নির্ভুলভাবে সেই খবর রাখেন।

এই যে ধরুন কলকাতা শহর—এখানেরও একটা ছোট্ট দেশের দূতাবাসে বিভিন্ন প্রধান তিনি সেই দেশের প্রাক্তন ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিস। এই খবর আমাদের দেশের সরকার খুব ভালভাবেই জানেন। কিন্তু তবু তা নিয়ে কেউ হইচই করেন না। কারণ, আমাদের সরকার জানেন যে ওই দেশ তাঁদের দেশের বর্তমান সরকারের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এই ভদ্রলোককে এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাঁকে এখানে পাঠান নি। তাই বলছিলাম, কে কোন্ উদ্দেশ্যে কিভাবে এখানে সক্রিয় সেইটাই সবচেয়ে গুরুত্ব প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নে এসেই বোঝা যায় আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী কত ব্যর্থ।

কারণ, সামান্য কয়েকজন নিচু শ্রেণীর পাকিস্তানী চর ছাড়া আমরা এখনও কোনও বড় বিদেশী গুপ্তচরকে ধরতে পারি নি। বিদেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে কিন্তু বহু বিদেশী গুপ্তচর ধরা পড়েছে। এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগও প্রমাণ করা গিয়েছে। আর আমরা এ ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সম্প্রতি রাশিয়া এবং অন্য একটি পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশের তিনজন কূটনীতিবিদকে মোটামুটি ধরেছিলাম। কিন্তু কূটনৈতিক চাপে আমরা চুপি চুপি তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। কিছুদিন আগে দুজন মার্কিন গোয়েন্দা ধরা পড়েছে কলকাতা বন্দরে। পুলিসের হাতে নয়, আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর কর্তাদের পারদর্শিতারও নয়—দৈবক্রমে। তাদেরও চুপি চুপি ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বহু কর্তা ব্যক্তি সক্রিয়। শোনা যায়, সম্প্রতি একজন বেশ বড় রাজনৈতিক নেতা এদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য দিল্লিতে চিঠি লিখেছেন। যে পুলিস অফিসার এই মামলা চালাচ্ছেন তাঁকেও নানাভাবে ভয় দেখান হচ্ছে।

আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতার জন্যই আমরা বহু জিনিস শুনি এবং জানি কিন্তু তা ধরতে পারি না। যেমন ধরুন, আমরা মোটামুটি জানি রাশিয়া কিভাবে এদেশে টাকা ছড়ায়। কারণ তাঁরা সেটা প্রায় খোলাখুলিই করেন। কিন্তু আমরা জানি না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সি আই এ এদেশে কিভাবে টাকা বিতরণ করে—যদিও আমাদের সরকার সমেত অনেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে সি আই এ এদেশে টাকা ছড়ায়।

আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর এই ব্যর্থতার জন্যই আমাদের সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই বোকা প্রমাণিত হন। বিদেশীরা যখন স্পষ্ট প্রমাণ চান তখন তাঁরা কোনও জবাব দিতে পারেন না। সম্প্রতি এই রকম একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের পিটার বার্জেকে নিয়ে। সংসদে যখন বার্জেকে নিয়ে প্রচণ্ড হইচই পড়ে, তখন তখনকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেন : বার্জেকে সরিয়ে নিতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জবাব দেন : আপনারা দেখান পিটার বার্জে কি অন্যায় বা অসঙ্গত বা বে-আইনী করেছে; না হলে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর খবর পিটার বার্জে সি আই এ-র লোক। সেই খবর জানত আমাদের পররাষ্ট্র দফতরকেও জানিয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রমাণ চাওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী পিছিয়ে গেল।

✻

আবার কমিউনিস্টরা হাকে-ডাকে সি-আই-এ সি-আই-এ বলে বলে যা কমিউনিস্ট বিরোধীরা কিছু না জেনে যে [illegible]

[illegible]

[illegible]

বিভিন্ন নাস্তিকতার বিভ্রান্ত।

যেমন ধরুন, চীন-ভারত সংঘর্ষের ব্যাপারটা। আমরা তখন শুনেছিলাম ক্রেমলিনের কলকাঠি ছিলেন, কমিউনিস্ট প্রভাবিত। তাই এই সংঘর্ষে ভারতের এমন শোচনীয় বিপর্যয় হয়েছিল। এখন কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন কথা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে, জেনারেল কল এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক অফিসারের সহযোগিতায় সি আই এ-ই ভারত-চীন সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। শোনা যায়, শ্রীমতী গান্ধীও এখন এই কথা বিশ্বাস করেন।

তারপর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে বহু রাজনীতিবিদ এবং পুলিস অফিসারও অপরকে বিদেশী চর বলে রটিয়ে দেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের একজন তরুণ মন্ত্রী সম্পর্কে রাজ্যের একজন সর্বশক্তিমান রাজনৈতিক নেতাকেও বলতে শোনা গিয়েছে, ও সি আই-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আর একজন প্রদেশ কংগ্রেস [illegible] সম্পর্কে তিনিই বলেন, ও কে জি বি-র [illegible] এজেন্ট।

এ ধরনের অভিযোগ হয়ত সাময়িকভাবে কারো স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এই সব কাজে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পায় না। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হলে মুখে না চেঁচিয়ে বিদেশী চরদের প্রমাণ সহ ধরা প্রয়োজন। না হলে এই ফাঁকা চিৎকারের সুযোগে বিদেশী চরেরা তাদের লক্ষ্যমত ভারতের ক্ষতি করেই যাবে।

২৬-৩-৭৫।

নবারুণ গুপ্ত

[illegible]

[illegible]

কর্তার ইচ্ছে

[illegible] গণতন্ত্র [illegible] বাদশাতন্ত্র [illegible] [illegible] রাজতন্ত্র [illegible] [illegible] ইরানের শা। [illegible] তিনিই। [illegible] দেশ-বিদেশে [illegible] [illegible] [illegible] ইরানের [illegible] কিন্তু [illegible] তত্ত্বটা তাঁর নয়। ইরানের শা [illegible] তেলের দাম নিয়ে [illegible] সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, তেল-বেচা টাকায় আঁশাল নিজের দেশে সবটা খরচ না করে গরিব দেশগুলোর উন্নতির জন্যে খানিকটা দান করতে চাইছেন। নজরে পড়ছে তাঁর সংগে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে অনেক দেশই। তাঁর দেশে গণতন্ত্র নেই বলে গণতন্ত্রী দেশগুলো তাঁকে একঘরে করেনি। বরং তাঁকে নেমন্তন্ন করছে। সে সব নেমন্তন্ন তিনি রাখছেনও। গণতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশেও কিন্তু শা চাল পালটাননি। লোকের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বাদশা ফকির বনার ইচ্ছে তাঁর নেই।

তেল বিক্রির টাকা যা রাজকোষে জমছে তা খরচ করবার অধিকার তাঁর অবাধ। সে টাকাটা তিনি কিন্তু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর আমলে ইরানের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, লোকের সুখসুবিধে বেড়েছে। নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে ইরানে, ভূমি সংস্কার করে কৃষির উন্নতির চেষ্টাও চলছে। গাঁয়ের লোকেদের মুখেও হাসি ফুটেছে, শহুরে লোকেদের মুখেও। এক কথায় তেল বেচার মুনাফা দিয়ে দেশের আর্থিক বনিয়াদ পাকা করার ব্যবস্থা করছেন ইরানের শা। তাঁর দাবি তিনি দেশে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তবে সে বিপ্লব লাল নয়, সাদা। সাদা বিপ্লব ইরানে যুগান্তর এনেছে গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে, লোকের জীবনে, অর্থনীতিতে এ কথাই প্রচার করা হচ্ছে শার তরফ থেকে। কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। শা দেশের লোক কিংবা দুনিয়াকে ধাপ্পা দেন নি। অবস্থা ফিরেছে ইরানের বাসিন্দাদের। তার জন্যে বাহবা শার নিশ্চয়ই পাওনা। তিনি টাকাটা নিয়ে নয়ছয় করলে তো হলে তাঁকে রোখবার কেউ তো আর ছিল না।

তবে যুগান্তর যা ঘটেছে তা অর্থনীতিতে। রাজনীতিতে তার কোনও ছোঁয়াচ লাগেনি। সেখানে সাবেকী চালই চলছে। শা এখনও শাহান শা। বছর দেড় [illegible] [illegible] গণতন্ত্রে [illegible] স্বাধীন [illegible] [illegible]—যেখানে আইনসভায় [illegible] ঠাঁই পাবে—এমনতর গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর কী মত? জানতে চাওয়া হয়েছিল ও রকম গণতন্ত্র ইরানে পত্তন করার কোনও ইচ্ছে কি তাঁর আছে? কথাটা তিনি সোজাসুজি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, স্পষ্টই তিনি বলেছিলেন—ও ধরনের গণতন্ত্র আমি চাই না। কী করবো আমি অমন গণতন্ত্র নিয়ে? ও জিনিস আমি আদৌ বরদাস্ত করতে পারবো না। সে মত তাঁর আজও বদলায় নি। রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশের লোককে স্বাধীনতা দিতে তিনি নারাজ। ইরানে সংবিধান একটা আছে, আইনসভাও, নির্বাচনও হয় আইন মাফিক, রাজনৈতিক দলও আছে। কিন্তু সে সবই ঠাট। সবই মেকী। খাঁটি জিনিস কোনোটাই নয়।

রাজনৈতিক দল বলতে যা বোঝায় তা ইরানে ছিল না, থাকতে পারে না। তার জন্যে দরকার যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাই তো ইরানে নেই। শা অবিশ্যি চতুর লোক, দেশের লোককে ভোলাবার জন্যে তিনি পিটুলিগোলা জল দিয়ে তাদের দুধের স্বাদ মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন। আইনসভা, মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দল সবই ইরানে তিনি রেখে দিয়েছেন, কিন্তু সে সবই ঝুটো। ১৯৫৩ সনে তিনি তাঁর রাশ একটু আলগা করেছিলেন। তার সুযোগ নিয়ে ডঃ মোসাদেক হয়ে উঠেছিলেন সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে আবার নিজের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনেন শা। সেই থেকে অমনতর কাঁচা কাজ আর তিনি করেননি। ইরানী সংসদ মজলিশের টিকি তাঁর হাতের মুঠোয়, মন্ত্রিসভারও। ফৌজ, আদালত, গুপ্তচরবাহিনী সবের ওপরই তাঁর কড়া নজর, সবই তাঁর একান্ত বশংবদ। বাঁধা সড়ক ছেড়ে কারুর নড়ার জো টি নেই। সবার ওপর চোখ রাখছে তাঁর গোয়েন্দারা। লোকে বলে ইরানের গুপ্তচরসংস্থা সাভাক মার্কিন সি আই এর থেকে কিছু কম যায় না।

বিলেত-আমেরিকার দেখাদেখি দু দলের রাজনীতি চালু করার বন্দোবস্ত করেছিলেন শা বছর পনেরো আগে। বিলেতে আমেরিকায় পালা করে দুটো দল দেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুটো দল—ইরান [illegible] পার্টি [illegible] শাসক দল, আর [illegible] পার্টি [illegible] বিরোধী দল। [illegible] শার হাতে [illegible]—শাসক দলও, বিরোধী দলও। বিলেতে [illegible] বিরোধী দল হচ্ছে মহামান্য সম্রাট [illegible] মহামান্য [illegible] বিরোধী পক্ষ। ইরানে দু দলই ছিল সম্রাটের একান্ত বশংবদ। খেলাটা দিব্যি জমেছিল। সব ভণ্ডুল করে দিলেন বিরোধী দলের মুখ্য সচিব ডঃ আলিনাকি কানি ১৯৭২ সনে গণতন্ত্রী বিরোধী নেতার কায়দায় প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে, তারই সংগে দেশের লোকের অভাব অভিযোগ মজলিশে তুলে ধরে। সংগে সংগে খেল খতম। ডাঃ কানিকে ইস্তফা দিতে হলো স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার অজুহাতে। বিরোধী দল থেকে ইস্তফা দেবার হিড়িক পড়ে গেল। সে দল ইদানীং ছিল না বললেই হয়।

তবে এতদিন পর্যন্ত ঠাট বজায় ছিল। তাও গেছে ২ মার্চ। তাঁর প্রাসাদে একটা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে শা জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলের পাট ইরান তুলে দিয়েছে, পুরোনো শাসক দলও সংগে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেছে। তাদের জায়গায় গড়া হয়েছে একটা নতুন দল—তার গালভরা নাম জাতীয় রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন। এখন ইরানে এই একটিমাত্র দলই থাকবে। যারা বাদশা আর সংবিধান মানে, শার শ্বেত বিপ্লবে যাদের বিশ্বাস আছে তারা সবাই হবে নতুন দলের সভ্য। যারা হবে না তারা সবাই দেশের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক। তাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা যে [illegible] তার আভাস পাওয়া গিয়েছে। [illegible] লোক ধন্যি ধন্যি করছে শাকে দেশকে তিনি ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন বলে। বিপদ যে কী তা অবিশ্যি কেউ জানে না। তবে নতুন বিধান না মেনেই বা উপায় কী? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে, প্রবল প্রতাপ শাহান শার বিরুদ্ধে কথা কইবে? নতুন দলের মুখ্য সচিব, রাজনৈতিক দপ্তরের বড়কর্তা, আর কর্মপরিষদের সভাপতি একাধারে হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোভেদা দু বছরের জন্যে—করেছেন শা নিজেই। তিনি শার পেয়ারের লোক। যেমন শা চালাবেন তেমনই চলবেন হোভেদা। তবে এর পর ইরানকে একদলীয় দেশ বলা ভুল হবে। দলের বালাই ওখানে নেই।

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

টিঁকে থাকার গূঢ়কথা

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার ২৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২২৪৫ খ্রীস্টাব্দের [illegible] এখনকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী[illegible]এর একান্ত সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করব। সাক্ষাৎকারটা এই রকম হবে :

আমি : মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আমার পাঠকদের কথা চিন্তা করে আপনি যে আপনার মূল্যবান সময় এতটা নষ্ট করতে রাজি হয়েছেন, এতেই আমরা ধন্য।

মুখ্যমন্ত্রী : সাংবাদিকদের ফেস্ করতে আমি ভালোবাসি। তাই আপনার জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে রেখেছি।

আমি : আমি যে আপনাকে এরকম একান্ত পরিবেশে পাব, এ আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি।

মুখ্যমন্ত্রী : আপনি এর আগে কয়েকবার ঘুরে গিয়েছেন জানি।

আমি : ও কিছু নয়। নোট বই-এ তারিখগুলো লেখা আছে। এই দেখুন, ১৯৭৫ সালের ২০ মারচ প্রথম আসি। কেন না তার ঠিক আগের দিন আপনি বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন কংগ্রেস ২৭০ বছর ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু সেদিন আপনাকে ধরতে পারিনি।

মুখ্যমন্ত্রী : কেন, আমি কি দিল্লি গিয়েছিলাম ?

আমি : না স্যার, আপনি সে সময় দেবকান্ত বরুয়ার সঙ্গে চুপিসাড়ে বসে একটা গোপন বৈঠক করছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী : তাই বুঝি স্যার। ২৭০ বছর আগের কথা তো। ঠিকঠাক মনে থাকে না। তা পরে একদিন এলেই পারতেন ?

আমি : এসেছিলাম বৈ কি স্যার! অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এসেছিলাম। বস্তুত গত ২৬৯ বছর ধরে বছরে দুবার করে চেষ্টা করেছি। তা ধরুন মোট ৫৩৮ বার ঘুরে গিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী : বটে! এতদিন ধরে ঘুরছেন! তা আপনার বেশ ধৈর্য আছে তো।

আমি : আমার চাইতে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনও লোকের ধৈর্য আরও অনেক বেশী। ১৯৭৫ সালে যারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমা রেখেছিলেন, তাঁদের বংশধররা এখনও সে টাকা ব্যাংক থেকে তোলেন নি।

মুখ্যমন্ত্রী : বড়ই আশ্চর্য! কেন বলুন তো।

আমি : স্যার, আপনি যে বলেছিলেন না, আপনার আমলেই পাতাল রেল চালু হবে, সেই রেলের প্রথম জার্নিতেই নতুন টিকিট-দর চড়বে বলে জানা পঁচিশ পয়সার [illegible] অপেক্ষা করে আছে। আর জানেন তো স্যার, কলকাতায় নতুন কিছু এলেই তাতে ব্ল্যাক শুরু হয়। কাজেই পাতালের টিকিটের ব্ল্যাকের দর যে কত উঠবে, তাতো বলা যায় না। রূপদর্শীর ডিপজিটের টাকাটায় তাই স্যার ওরা হাত দিচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী : তার মানে আমার উপর জনগণের বেশ আস্থা আছে, কি বলেন ?

আমি : সে কি স্যার আর বলতে। শুধু স্যার পাতাল রেল নয়, হাওড়ার দ্বিতীয় সেতু, ফরাক্কার জল, কলকাতা কলঙ্কের উন্নয়ন, পল্লীতে বিদ্যুৎ, বেকারদের কর্মসংস্থান, সব ব্যাপারেই আপনার উপর জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে। স্যার এইবার আপনি কিছু বলুন।

মুখ্যমন্ত্রী : লিখে নিন, ভারবাটিম ছাপাবেন।

আমি : ২৭০ বছর ধরে তো সেই কাজই করছি। একদিনও গড়বড় কিছু পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী : না মশাই, আপনারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারেন। বড্ড ডেস্‌ট্রাকটিভ্ সমালোচনা করেন আপনারা। প্রেসের যদি গঠনমূলক মনোভাব না থাকে তো দেশের উন্নতি কী করে হবে ?

আমি : কিন্তু এখন তো স্যার সব প্রেসই গঠনমূলক হয়ে গিয়েছে। ২৭০ বছর আগে কোনও কোনও কাগজ ঐসব চ্যাংড়ামি করত বটে। কিন্তু অনেক আগেই স্যার তারা সজুত হয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী : বেশ তবে লিখুন। ২৭০ বছর আগে আমি যখন বলেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ২৭০ বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন থাকবে, তখন অনেকেই উপহাস করেছিলেন। কিন্তু আমরা টিঁকে আছি। শুধু আমরাই যে টিঁকে আছি তাই নয়, আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম গুলোও টিঁকে আছে। আমার দল এবং আমার এম এল এদের জন্য আমি গর্বিত, কেননা তাঁরাও টিঁকে আছেন। এবং জনসাধারণও টিঁকে আছেন। জনসাধারণ আমাদের ভালবাসেন, আমরা ধন্য।

আমি : স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? যদি ফ্র্যাংকলি উত্তর দেন।

মু. মঃ অফ কোর্স। নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। আমার তো গোপন কিছুই নেই।

আমি : স্যার, এই যে বললেন না, আপনার দল এবং [illegible] দীর্ঘ [illegible] টিঁকে আছেন এবং আপনি গর্বিত। আপনার এই গর্বের কারণ কী?

মু. ম: এই [illegible] পারেন কি? [illegible] হোক, আমরা [illegible] বিভ্রান্তি দূর করার জন্য [illegible] হবে আমাকে একথা বলতে হবে। [illegible] আপনি এটাকে [illegible] হিসাবেই [illegible] করবেন। আমার দল এবং [illegible] এরা যে টিঁকে আছেন সে শুধু [illegible] পূর্বসূরীগণ, অর্থাৎ আমার নেতাদের বিচক্ষণতার জন্য। আমার গর্বের ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে কিনা বলুন?

আমি : নিশ্চয়। আমারও স্যার সেই রকমই একটা ধারণা হয়েছিল। আপনার মুখ থেকে তার সমর্থন পেয়ে নিজের বুদ্ধির উপর আস্থা বেড়ে গেল। আচ্ছা স্যার, এবার বলুন তো, জনসাধারণ টিঁকে আছে কেমন করে ?

মু. ম : আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাতে জনসাধারণের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা কল্পতরু। দেদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। উই আর নট মাইজারস্।

আমি : বলেন কি স্যার, শুধু আশার আশায় জনসাধারণ ২৭০ বছর আপনাদের ভোট দিয়ে আসছে ?

মু. ম : ভোটের কথা এর মধ্যে তোলা অবান্তর। ভোটের ব্যাপারটায় আমরা আর সেই মান্ধাতার আমলে পড়ে নেই। পদ্ধতি প্রকরণ অনেক আধুনিক করে ফেলেছি। আমরা আর ভোটার ইন্‌টেন্‌সিভ্ অনিশ্চিত ভোট ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি না। আমরা সিওর সাকসেসে বিশ্বাসী। আমরা এখন তাই অটোভোটার যন্ত্র ব্যবহার করি। বামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে জনগণ এখন খুব হ্যাপি। আমি আর আমার দলের লোকেরা গত ২৭০ বছর ধরে গ্রামে যাচ্ছি। ২৭০ বছর ধরে দেখে আসছি, সেখানে নিরাশার কোনও চিহ্ন নেই। সকলের মনেই আশা। অনেকদিন পরে গ্রামের মানুষ এমন সরকার পেয়েছেন, যা তাদের এত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা আর কোনও সরকার দিতে পারেনি। আশা কিছু করতে পারবেন তারা —এই আশাতেই সকলে তাদের চারপাশে ভিড় করে থাকেন। আর কোনও প্রশ্ন ?

আমি : না স্যার, অনেক ধন্যবাদ। এইটে হজম করতেই অন্তত আরও ২৭০ বছর লাগবে।

টুল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আপিসবাড়ির দেয়ালে,
সিঁড়ির কোণগুলোতে
ঝাঁঝরির আগে পিছে,
কার্নিসের ঢালে

লাল ফিতের নকলে
চাপা-পড়া ফাইলের কথা
মক্কেলদের মনে করিয়ে দেয়
পানের পিক।

এ-নেতা সে-নেতার শ্রাদ্ধ করতে থাকে
উঠোন জুড়ে
বি-এ পাস
থুথু।

টিফিনের সময়কার
অক্ষরযুক্ত ঠোঙার কাগজের মত
আর নিরক্ষর শালপাতার মত
অসংখ্য বেকার

এ-দাদা সে-দাদার পায়ে আঠার মত লেগে
পানের পিক আর থুথু দিয়ে
আরও একটা প্রজন্ম বরবাদ করতে
করজোড়ে প্রার্থনা করছে

ঘরের ভেতর একটা ম্যাছি-মারা চেয়ার
কিংবা নিদেনপক্ষে
বারান্দায় ব'সে ঢুলবার জন্যে
একটা টুল ॥

কষ্ট হয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার ভিতরে কাঁদে
বর্ণচোরা শিশু এসে মৃত্যুর আহ্লাদে
কাঁদে, কথা বলে. কাঁদে।
কুয়াশা, মেঘের ফাঁদে চাঁদ
মানুষেরই যেন অপরাধ
মানুষেরই শুধু অপরাধ !

দৃষ্টি ও দর্শন আছে বলে
মানুষের উচ্ছিষ্ট কম্বলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা
অস্তিত্ব পোড়াচ্ছে কনীনিকা
ক্ষার করে বুকে দেবে বলে......
মানুষেরই মায়ার কম্বলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা

ঐ সমস্ত আমাদের দেখা
এ সমস্ত আমাদের লেখা।

মানুষের ভিতরে পাহাড়ে
মলিন হেমন্ত মুখখানি
জানি জানি, এ খবরও জানি

তবু কাঁদে, তবু কেন কাঁদে
আমার-কাঁদুনে-শিশু ভিতরে, আমাকে ?
কষ্ট হয় ॥

বাবরের প্রার্থনা

শঙ্খ ঘোষ

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয় ?
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা !

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান :
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের ?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের !

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

একটি মশালের অবসান

রঞ্জন

যখন হোক, যেখানে হোক, যে কারণে হোক, একটি মানুষের মৃত্যু হলে আমার মনের ঘরে একটি মোমবাতি নির্বাপিত হয়, এমন উদ্ধত দাবি আমায় নাহি সাজে। অভ্যাসবশে, ব্যাপক দুর্দশার নিষ্ঠুর আতিশয্যে, নিত্যবর্ধমান দারিদ্র্যের বিশালতার সম্মুখে এমন হৃদয় বিরল যা অনুভূতিতেও সাড়া দিতে পারে। কলকাতার রাস্তার ভিখারীরা তো শহরের নিঃশব্দে গৃহীত সজীব আসবাবের অংশবিশেষ। কে খবর রাখে আর্জেন্টিনার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত অনামা লোকদের, বা চিলিতে ভূমিকম্পে নিমজ্জিত সহস্র নির্দোষ সাধারণ প্রাণীর। আমাদের হৃদয় সংকীর্ণ না হলেও স্বল্পপরিসর হতে বাধ্য। নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। নিকট পরিবেশেও মায়া, মমতা, অনুকম্পা পরিমিত হতে বাধ্য। হৃদয়টা তো লক্ষ-টনী জাহাজ নয়। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী, নিজেরই সামান্য ধানে গিয়াছে ভরি। আমাদের বর্তমান সমাজে আপনজনকে ভালোবাসাই এক দুর্বহ দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার হাতে নাই ভুবনের ভার। ভার নিতে গেলে ভুবনের উপকার হবে সামান্যই; আমার সর্বনাশ অনিবার্য। এতদবস্থায় সহানুভূতির সংকোচন অপরিহার্য। যা পরিহার্য তা হচ্ছে লঘুচিত্ত ঔদাসীন্য। তাতে স্বীয় মানবতারই অবমাননা। আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই আত্মপ্রীতির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

অধুনা পরলোকগত মদীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এই রকমের আপাতদার্শনিক আলোচনার অন্ত ছিল না। চাঁদপুরে কালীবাড়ির চায়ের দোকানে, চট্টগ্রামে গাছের তলায়, কলকাতায় ময়দানে। শিক্ষক হলেও, মতদ্বৈধ ছিল তাঁর কানে মধু। এই প্রধানত নৈয়ায়িক তর্কে বিরতি হলো যখন আমি কলকাতায় চলে এলাম দেশবিভাগের অনেক আগে। ঠিক কি কারণে জানিনে, সুরেশবাবু এলেন দেশবিভাগের কয়েক বছর পরে। সময়ের ব্যবধানে সান্নিধ্যের বিরতি ঘটেছিল বইকি। আমি চৌরঙ্গীতে একটা ফ্ল্যাটে, সুরেশবাবু সপরিবার সুদূরে বেহালায়। সংযোগ সীমায়িত না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু চিন্তাবিনিময়ে দূরত্ব কোন বাধা হয়নি। দীর্ঘকাল মফঃস্বলবাসী হলেও তাঁর মন ছিল প্রধানত নাগরিক। আমি নগরবাসী হলেও কৈশোরের গ্রামগুলি বিস্মৃত হইনি। দেখা হলেই শিক্ষক-ছাত্রের পূর্ব সম্বন্ধ অনায়াসে পুনঃস্থাপিত হতো। উভয়ের ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল সর্বদা অগ্রে। অথচ দুয়েরই পীড়াদায়ক অস্তিত্ব ছিল। সেতুবন্ধনের প্রধান সূত্র ছিল ছাত্রের শ্রদ্ধা আর শিক্ষকের স্নেহ। তবু দেশবিভাগ ও দূরত্ব অন্তরঙ্গতায় যে ক্ষীণতা এনে দিয়েছিল তার আশু প্রতিকার সহজ তো নয়ই, সম্ভবও ছিল না।

*

স্বাধীনতার সহযাত্রী দেশবিভাগের যেকটি বিষময় আনুষঙ্গিক দিক এখনো বহুলাংশে অনালোচিত রয়ে গেছে। পাঞ্জাবের কথা স্বতন্ত্র। এক দিকে হিন্দু বা শিখ নেই বললেই চলে, অন্য দিকে মুসলমানের দেখা মেলাই ভার। এই অস্ত্রোপচারে আনানুষিকতার অবধি ছিল না, উভয় পক্ষেই। কিন্তু নিত্য বৈরিতার রক্তাক্ত তিক্ততা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্যের বদলে হলো রাজনৈতিক হোমিওপ্যাথি। একটা প্রদেশ শুধু দ্বিখণ্ডিত হলো না, শুধু হিন্দু আর মুসলমানরা বিভক্ত হলো না, দ্বিধাবিভক্ত হলো গোটা হিন্দু সমাজ আর মোটামুটি মুসলমান সমাজ। ওদের একটা রকমের সামগ্রিক সত্তা ছিল। জমি শুধু ভাগ হলো না,—ওটা সামান্য ক্ষতি,—ভাগ হলো হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে। এই বৃহত্তর ক্ষতির মূল্যায়ন এখনও শুরুই হয়নি। ভূমি নিয়ে জীবন চলে, সাংস্কৃতিক ভূমা নিত্য

সংকুচিত হয়েছে উভয় বঙ্গে। প্রতিকারের পথ দেখিনে। কলকাতা থেকে সাহেদ সুরাবর্দী বা শহীদুল্লার বিদায় আমাদের বঞ্চিত করেছে; পূর্ববঙ্গ থেকে সুরেশ চক্রবর্তী ও অন্যান্য অসংখ্য শিক্ষকের নির্বাসন এই অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে দীন করে ফেলেছে। সমৃদ্ধি ছাড়াও একটা সমাজ সভ্য থাকতে পারে, সংস্কৃতি ছাড়া নয়। সুরেশবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতির একটি সক্রিয় ক্যাটালিস্ট।

ক্ষতি হলো পূর্ব পাকিস্তানের। লাভ সামান্যই হলো পশ্চিমবঙ্গের। দেরি হয়ে গেছে। অন্যত্র মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও তার সঙ্গে সমান [illegible] না [illegible] তাঁরা ছিল না [illegible] [illegible]। তার উপায় ছিল নানাবিধ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা। সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনধারার অবশিষ্ট ক্ষীণস্রোতের সঙ্গে তার আন্তর আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে। পূর্বপরিচিতদের অনেকেই গত। যাঁরা জীবিত তাঁদের ভাবা ভিন্ন। যে কলকাতার সংস্কৃতি সুরেশবাবু একদিন, বছরের পর বছর, পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রেখেছিলেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন, সেই কলকাতাতেই তিনি হলেন তিমির পরদেশী। আত্মোৎসাহ ও উদ্যোগের সাফল্য থাকলেও তর্কের মাধ্যম যে একেবারেই আলাদা। তিরিশ বছরেরও কম সময়ে এই দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে বাঙালীদের, হিন্দুদের, মুসলমানদের। সুরেশ চক্রবর্তী ছিলেন এই তিনের প্রতীক। তাঁর এই ত্রিবিধ বুদ্ধি ও আবেগের আয়ু দীর্ঘ হতে পারতো না। হলোও না।

*

তবু মানব না যে, তাঁর বিরাশি বছরের দীর্ঘ জীবন ব্যর্থ। সত্য বটে, তাঁর জাগতিক সাফল্য ছিল অতীব সামান্য। অর্থার্জনে ছিল একাধারে অনীহা আর অক্ষমতা। বিদ্যার্জনে ও বিদ্যার প্রসরণে আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কোনো সৎ শিক্ষকের পক্ষে এর চাইতে মহত্তর কর্তব্যনির্ধারণ আমি কল্পনা করতে পারিনে। একজন মাস্টারমশাইকে কি বিচার করতে হবে তাঁর বাড়ি, গাড়ি বা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স দিয়ে? তাঁর জমার খাতায় থাকে শুধু কয়েকটি ছাত্র। শিক্ষকের সম্পত্তি শুধু ওই। আর কয়েকটি সার্থক চিন্তাধারার সূত্রপাত ও বপন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ হয় কখনো জানতেন না এই একটি ব্যক্তি, সুরেশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র-চিন্তাধারা কতখানি ব্যাপ্ত করেছিলেন এবং জীবিত করেছিলেন পূর্ববঙ্গের এক সামান্য সওদাগরী উপশহরে। ফ্রয়েড বা বের্গসঁ কি করে জানবেন চাঁদপুরে তাঁদের নাম ও ভাবনা কে ছড়িয়ে দিয়েছিল? বার্ট্রান্ড রাসেলের বই ইস্কুলে আমায় কে প্রথম [illegible] দিয়েছিল? সুরেশবাবুই আমাদের প্রথ[illegible] শেখালেন যে, উত্তর পরে মিললেও মিল[illegible] পারে; প্রথমে চাই প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। [illegible] বৈপ্লবিক উন্মাদনা একটা ছোট [illegible] কূপমণ্ডূক প্রতিরোধ উত্তেজিত ক[illegible] বইকি। কিন্তু সামাজিক সমঝোতা [illegible]ল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অর্থ বা অন্য কোনো লাভের প্রত্যাশায় কখনো কারো সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এমন দৃষ্টান্ত আমার অজানা।

আমার মুগ্ধ শিক্ষক সুরেশ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন। ছাত্রকেও যেতে হবে। হৃদয় থেকে একটি মোমবাতি নিবে গেল। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রের মনে লোকটি এমন কয়েকটি মশাল জেলে দিয়ে গেছেন সেগুলি সহজে নিববে না বলে আশা করব। বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে আজ ব্যাপক নৈরাশ্যের বিস্তর কারণ আছে। তবু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, হতাশা সুরেশ চক্রবর্তীর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গী ছিল না—আমার এই অক্ষম স্মৃতি সত্ত্বেও। জীবিতের প্রতি সুবিচার দুরূহ; মৃতের যোগ্য সম্মান সাধ্যাতীত। দুর্ভাগা, চিত্রগুপ্তের সঙ্গে সুরেশবাবুর অন্তিম তর্কটা অশ্রুত রইল।

গালিবের গজল থেকে

আবু সয়ীদ আইয়ুব

প্রথম শেরটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ব্যঞ্জনা গভীর এবং বিস্তীর্ণ, এতখানি ব্যঞ্জনাশক্তি মাত্র কয়েকটি শব্দকে দান করার চেষ্টা নিশ্চয় প্রশংসনীয়, সফল হলে সমাদরনীয়। তবে সে সাফল্য কতক পরিমাণে নির্ভর করে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতার উপর, নিষ্ক্রিয় সংবেদনশীলতা যথেষ্ট নয়।

চোখ এখানে সবকটি ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, উপরন্তু সেই মনেরও প্রতীক যে মন ইন্দ্রিয়বাহিত বার্তা গ্রহণ করে, সংগৃহীত করে, এবং একটি সুসমঞ্জস অর্থশৃঙ্খলা রচনা করে। আমরা যখন জগতের দিকে—বিশেষত মানব জগতের দিকে—তাকাই তখন এমন অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করি যা কুৎসিত কদর্য ও বীভৎস। আরো পীড়িত বোধ করি অদূর ভবিষ্যতে কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও প্রতিকারের কোনো পথ দেখতে না পেয়ে। এই পরিব্যাপ্ত অমঙ্গল কি তবে চিরন্তন? নৈরাশ্যে মন ভরে ওঠে—বিশেষত কবির মন, যাঁর পরিশীলিত সংবেদনা অতি প্রখর। সব কবির কথা বলছি না, তবে গালিবের মন এমনি এক নৈরাশ্যবাদী ছাঁচে ঢালাই করা ছিল। দুঃখ সাধনায় তিনি যেন একপ্রকার অবচেতন আনন্দ পেতেন।

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হলে চারিদিককার ঘনান্ধকারে আমরা কোনো ভূগর্ভস্থ নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীতে পরিণত হতাম। কিন্তু গালিব বলছেন এই নৈরাশ্যের মধ্যে একটা মানবিক মহিমা আছে যার তুলনা জড়জগতে কোথাও নেই। নৈরাশ্য জাগে প্রত্যাশা ও প্রত্যক্ষের, আদর্শ ও তথ্যের সংঘাতে ("Between the idea/ And the reality/Falls the Shadow") আমরা চৈতন্যবিশিষ্ট জীব হিসাবে শুধু প্রত্যক্ষ করি না, প্রত্যক্ষ বিষয়ের নৈতিক এবং নান্দনিক মূল্য বিচারও করি। সে বিচারের মূল্যমান অতিশয় উচ্চ। এও কি নিয়মবদ্ধ জড়প্রকৃতির দান? ভাবতে গেলে ধাঁধা লাগে। সে যাই হোক, এই মূল্যবোধই, এই যে আমরা সারা দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার যদি কোনো পরম স্রষ্টা বা বিধাতা থাকেন তবে তাঁকেও ধিক্কার দিচ্ছি ("আমার মুখে ছাই কিন্তু তুমিও তো মাতাল, হে ভগবান"—উমর খৈয়াম) সে ধিক্কারই আমাদের মহিমান্বিত করে তোলে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে।

দ্বিতীয় পংক্তিতে "হেমন্তহীন বসন্ত" পরোৎকর্ষের (perfection-এর) কাব্যিক ভাষান্তর। আমাদের আহত দৃষ্টির ঘন নৈরাশ্য এমন একটি দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পায় যার লেশমাত্র কার্যকারিতা গালিব কোথাও দেখতে পান না, তবু জোর দিয়ে বলেছেন—এই ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসটিই (আহ্‌-এ বেতাসীর) পরোৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। Perfection-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'পূর্ণতা'ও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় 'সুন্দর' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'শাপমোচন'-এর কুরূপ রাজা বলছেন, "অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।" রবীন্দ্রনাথ অবশ্য [illegible] বেদনায় (দীর্ঘশ্বাসের) ব্যর্থতার উপর জোর দিচ্ছেন না। সুন্দরের আহ্বান আমাদের সৌন্দর্য-সাধনায় প্রবৃত্ত করতে পারে, সে সাধনা অন্তত আংশিকভাবে সফল হতে পারে।

সৌন্দর্যসাধনার অর্থ এখানে কেবল শিল্পরচনাই নয়, বরঞ্চ বৃহত্তর অর্থে জীবনরচনা। গান্ধী একবার বলেছিলেন, —আমার জীবনই আমার কবিতা। কোন্ কবির কোন্ কবিতা এমন বিচিত্র উপাদানে সুসম্বদ্ধ, এমন বিভিন্ন ভাবনায় বেদনায় এষণায় ঐকতান? গান্ধী চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু মোচন করতে। সে সাধনায় তিনি ব্যর্থ হলেন। তবু এই ব্যর্থতার মধ্যেই রচিত হল তাঁর আপন জীবনের অপূর্ব কবিতা—কত ধৈর্যে, কত যত্নে, কত আত্মনিপীড়নে, কত আঘাতে-সংঘাতে তা আমরা সবাই জানি।

কবিতা অথবা সাধারণভাবে শিল্প-রচনার মূল্যকেই যাঁরা পরম এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে ঘোষণা করেন, তাঁদের কথা আমি ঠিক বুঝি না। তাঁরা কেন ভুলে যান যে জ্ঞানীও তাঁদের নিকট-আত্মীয়; অন্তত সম্পর্ক একটু দূরের হলেও খুব বেশি দূরের নয়। এঁদের সকলেরই মূল-প্রেরণা একই, এঁরা চলেছেন ভিন্ন পথে একই আহ্বানে সাড়া দিতে—অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। প্রত্যেক চিন্তায় কল্পনায় অনুভূতিতে—সর্বোপরি জীবনচর্যায় বিশুদ্ধতাই তো অন্বেষণ।

ছবি দেখার জন্য চোখ তৈরী করতে হয় যেমন, গান শুনবার জন্য কান তৈরী করতে হয় যেমন, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের—বিশেষত পদার্থ ও জীব-বিজ্ঞানের সৌন্দর্যস্বরূপ দেখার জন্য মন তৈরী করতে হয়। রীতিমত বিজ্ঞানচর্চা আবশ্যক নয়, সেটা অনেকের পক্ষে সম্ভবও নয়; তবে যে-কবি প্রথম থেকেই মনের অনেকগুলি দরজা জানালায় খিল দিয়ে রাখেন তিনি নিজের এবং অনুরাগী পাঠকদের পরম বিকাশের সম্ভাবনাকে খর্ব করেন। আর কিছু যদি না থাক অন্তত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বদশার প্রতি শ্রদ্ধাটুকু আবশ্যিক থাক। ইয়েট্সের ভাষায় যদি "আমরা তোমার দর্শন পাওয়ার যোগ্য নই আমি/তুমি অন্তত আমার চেয়ে দেখো, আমার প্রতীক্ষা চেয়ে দেখো।" বিজ্ঞান মানুষের কাজে লাগে সেটা তার একটা দিক, মহত্তর দিক হচ্ছে যে তা আমাদের মনশ্চক্ষুকে উদ্ভাসিত করে, মানসিক রসবোধকে তৃপ্ত করে। এবং আমরা যখন কোনো মহান চরিত্রবান মানুষের সম্মুখে দাঁড়াই তখন সুন্দরের আর এক রূপ দেখি।

গালিবে ফেরা যাক। মানবজীবনের দুঃখ দৈন্য পরাজয় হতাশা যে কত তীব্র ও পরিব্যাপ্ত সে বিষয়ে গালিব খুবই সচেতন, এতই সচেতন যে কখনো কখনো বলেছেন—তাঁর কণ্ঠে কোনো সঙ্গীত নেই, আছে শুধু পরাজয়ে ভেঙে পড়ার একটি আওয়াজ। তবে এটাই তাঁর শেষ কথা নয়। অমঙ্গল থেকে উত্তরণের দুটি উপায় তাঁর জানা ছিল। গভীরতম ট্র্যাজেডির মধ্যে কমেডি

আবিষ্কার, কদ্রুপতনের সঙ্গে তুলনাকে বা কৌতুকরস মিশিয়ে দেওয়ায় রসায়নিক দক্ষতা। দ্বিতীয় উপায় — অত্যধিক অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করার শক্তি-অর্জন (শের ৩২)। মোটের উপর গালিব ছিলেন বিশুদ্ধ কবি অর্থাৎ একান্ত ধ্যানী মানুষ।

পক্ষান্তরে, ইকবাল মানবজীবনের সব দুঃখকে গ্রহণ করেছেন একটি চ্যালেঞ্জরূপে।/ নিস্তরঙ্গ জীবনকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, "ঈশ্বর তোমাকে কোনো তুফানের মুখোমুখি করে দিন/তোমার সাগরের ঢেউয়ে উত্তালতা নেই।" আরো বলেছেন, "সঙ্কটাপন্ন মন (সেটাই কবির প্রশংসিত মন) এমন বাগান ভালোবাসে না যেখানে বাঘ ওৎ পেতে নেই"। নীট্‌শের live dangerously উপদেশটা মনে পড়ে যায়। ইকবাল সচেতন-ভাবেই নীট্‌শের প্রভাব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে। তেমনি সচেতনভাবে তিনি তাঁর কাব্যকে নীতিশিক্ষাবাহী (ডাইড্যাকটিক) করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর বিশ্বাস প্রত্যেক সার্থক কবি একজন ছোটখাট পয়গম্বর, আল্লার বাণী মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর উপরেও ন্যস্ত। ইকবাল যেখানে সামাজিক দুর্দশা ও অমঙ্গলের চিত্র এঁকেছেন সেখানে একটি মঙ্গললোকের কল্পচিত্রও তাঁর মনশ্চক্ষের সামনে উপস্থিত। সাধারণভাবে তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে যাত্রা করবার শক্তি সঞ্চয় করা এবং পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা। তাঁর সর্বজনবিদিত কবিতার ("চীন ও আরব হমারা, হিন্দোস্তাঁ হমারা") শেষ পংক্তিতে নিজের রচনাকে সেই তূর্য-ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছেন যার ডাক শুনে কাফেলা আবার রওয়ানা হয় মরুভূমির বিপদসংকুল পথে।

তবে গালিবের কাব্যে কর্মী মানুষের জন্য কোনোই প্রেরণা নেই বললে ভুল বলা হবে; আছে, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে এবং বস্তুতান্ত্রিক ভাষায়। তাঁর একটি সুন্দর ফারসী শের এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'জিজ্ঞাসা করলাম—'একটি ধূলিকণার পক্ষে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছানো কি সম্ভব?' সে বললো, 'অসম্ভব প্রায়'/জিজ্ঞাসা করলাম—'তবু কি আমি চেষ্টা করে যাব?' সে বললো, 'তাই সঙ্গত'—।" ধর্মবিষয়েও গালিবের মত সত্যসন্ধানার পথ দেখিয়ে দেয়; সমস্ত আচারবিচার এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে ওঠার নির্দেশ রয়েছে তাঁর কাব্যে: "আমি একেশ্বরবাদী, সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করাই আমার নীতি।/ ধর্মসম্প্রদায়গুলি লুপ্ত হলে সত্যধর্মের উপাদান হয়ে যাবে।"

আর একটি লক্ষণীয় প্রতিতুলনা এই যে ইকবাল ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিতার ('শিকওয়াহ') বিষয় জগৎব্যাপী মুসলিম সমাজের উত্থান ও পতন। দ্বিতীয় অনুবাদে প্রথম ছিল হায় শতশত [illegible] উত্থানের ইতিহাসের চিত্রের পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বর্তমানকালের সারা পৃথিবীর মুসলিম সমাজের অধঃপতন লাঞ্ছনা ও বিপর্যয় [illegible] চিত্র। অন্যদিকে ঈর্ষান্বিত তুলি দিয়ে [illegible] করেছেন আধুনিক ইয়োরোপের সমৃদ্ধি ও লক্ষ্মীলাভের অধ্যায়। আল্লাহ্ যেন মুসলিম সমাজের উপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ করুণা ও প্রীতি প্রত্যাহার করে অকৃপণ হস্তে দান করেছেন পশ্চিম ইয়োরোপের সমুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে। ইকবালের 'শিকওয়াহ' বা 'অনুযোগ' পুঞ্জীভূত হয়েছে দুটি চমকপ্রদ দুঃসাহসিক পংক্তিতে—"কভী হমসে কভী গৈরোঁসে শনাসায়ী হৈ/বাত কহনে কী নহী—তূ ভী তো হরজাঈ হৈ।" (কখনও আমাদের সঙ্গে কখনো অন্যদের সঙ্গে তোমার ভাব/কথাটা মুখে আনতে নেই—তুমিও তো হরজাঈ)। "হরজাঈ" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'সর্বব্যাপী ও সর্বত্রগামী', কিন্তু চলতি-ভাষায় কথাটা 'বহু পুরুষের শয্যাগামিনী' অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এই আশ্চর্য স্পর্ধা নারী-প্রেমের বেলায় যেমন, ঈশ্বর-প্রেমের বেলাতেও তেমনি উর্দুকাব্যে "শোখী" নামে ঐতিহ্যসম্মত ও অনুমোদিত। সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মপ্রসঙ্গে খুব সহিষ্ণু বলা যায় না। কোনো ইতিহাসের বইতে হজরৎ মুহম্মদের রেখাচিত্র মুদ্রিত হলে কিংবা তাঁর কথা বলতে গিয়ে সামান্যতম অসম্মান-সূচক বাক্য কেউ উচ্চারণ করলে খুনখারাবির ব্যাপার হয়ে ওঠে। অথচ যিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে "হরজাঈ" বললেন তিনি কোথাও কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন বলে তো শুনিনি।

গালিবের কবিতাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা যায়, এবং সে ব্যক্তি কবি স্বয়ং। তবু সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক বলে গালিবকে অভিহিত করা যায় না। প্রায় সবত্রই তিনি নিজেকে এঁকেছেন অত্যন্ত সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ রূপে, এমন লক্ষ কামনা-বাসনায় পীড়িত যার অত্যধিক অংশই বাস্তবিক সম্ভাব্যতার সীমানা ছাড়িয়ে। এ কথা তাঁর জানা আছে, তবু সাধারণ মানুষের মতো তিনিও চাঁদের পানে হাত বাড়ান এবং নাগাল না পেলে নিজের দুর্বিধিকে অভিসম্পাত দেন। তাই গালিব যখন একান্ত নিজের পরাজিত পর্যুদস্ত অবদমিত হৃদয়ের কথা বলেন তখন পরোক্ষে তিনি সব সাধারণ মানুষের দুঃখের কথাই বলছেন।

অধিকাংশ সমালোচক ও সাহিত্য-রসিকের মতে উর্দু ভাষার দুই শ্রেষ্ঠ কবি গালিব ও ইকবাল অনেক দিক থেকে এই কবিদ্বয় প্রায় বিপরীত ধর্মী, তবে একটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে [illegible] মিল দেখা যায়। তাঁদের কাব্যজীবনে একটি বড় অংশ—কাব্যে ব্যবহৃত [illegible] দুই কবির মধ্যেও [illegible] উর্দু নয় ফারসী ভাষায়। গালিব ১৪/১৫ বছর বয়সে কাব্য-রচনা শুরু করেছিলেন এবং স্বভাবতই তখন তাঁর মাতৃভাষা উর্দুতেই কবিতা লিখতেন। কিন্তু ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮২৭ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত) তিনি পারসী ভাষাকেই আত্মপ্রকাশের মুখ্য বাহন করেছিলেন।

উর্দু ভাষার প্রত্যাবর্তন ঘটে প্রধানত দুটি কারণে। এক,—তিনি দেখলেন যে তাঁর অবহেলিত উর্দু ভাষার গজলগুলিই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, বয়স যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি তখন দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে; এবং ঐ সময়ে জওকের মৃত্যুর পর তিনি রাজকবি (মালেকুশ-শুয়ারা) পদে বহাল হলেন। বাহাদুর শাহ জফর নিজে উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতেন। অনেকটা তারই প্ররোচনায় গালিব পারসী ছেড়ে উর্দুর দিকে পুনরায় মনোযোগী হলেন।

তবে প্রথম বয়সে এবং শেষ বয়সে তাঁর কাব্যের বাহন উর্দু হলেও সেটা এক অভিনব উর্দু। তিনি শুধু যে বহুল পরিমাণে পারসী শব্দ ব্যবহার করতেন তাই নয়, অন্য কয়েকজন কবিও তা করেছেন। গালিব তাঁর উর্দু কবিতায় পারসী শব্দবন্ধ ইডিয়ম, অবয় অবলীলাক্রমে টেনে এনেছেন। ফলে তাঁর রচনা প্রায়শঃই ভিন্ন দেশীয় গন্ধে মৃদু সুরভিত। হালের কোনো কোনো বাঙালী লেখক ও বক্তা যেমন নির্বিচারে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশ মেশান তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। উর্দুর সঙ্গে পারসী ভাষার প্রাণের মিল অনেক বেশি। তাই স্বীকার করতে দোষ নেই যে কবি গালিবের উর্দু চলিত উর্দু নয়, এক প্রকার মিশ্রিত কিন্তু শক্তিশালী ভাষা যা তাঁরই সৃষ্টি এবং বৈশিষ্ট্য। 'কবি গালিব' বলছি এই জন্য যে উর্দু গদ্যের ইতিহাসে গালিবের অবদান সকলের স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেছে। রামমোহনের মতো তাঁকে গদ্যের স্রষ্টা বলা যায় না, উর্দু গদ্য আরো প্রাচীন। তবে গালিব উর্দু গদ্যকে আশ্চর্য গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। অনেকের মতে তিনি আধুনিক উর্দু গদ্যের জন্মদাতা।

আমার অনূদিত শেরগুলি গালিবের উর্দু গজল থেকেই সংকলিত। কেবল একটি শের পারসী থেকে নেওয়া : 'আমার নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে কালের গতি রুদ্ধ/যত দিনগুলি মিশকালো তার প্রভাতই বা কী সন্ধ্যাই বা কী!"

(১)

আহত [illegible] নৈরাশ্যের [illegible] বাড়ে না [illegible];
হেমন্তহীন বসন্ত বিরহী দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নেয়॥

(২)

প্রতি পলকের [illegible] আমার কাছে
স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে;
আমার [illegible] পিষে এসে [illegible]
ঝাঁকিয়ে তোলে আরো জোরে॥

(৩)

সুর আছে ভেসে যাও সুরের স্রোতে;
সুরা আছে, ভুলে যাও সব কিছু;
রূপের প্রেমে পাগল হয়ে যাও, সাধুতা থাক অন্যদের জন্য॥

(৪)

ধর্মকর্ম আর সাধুতার পুণ্যফল অপর্যাপ্ত—আমি জানি;
তবে মনটা যে সেদিকে যেতে চায় না।

(৫)

মদ স্পর্শ করবে না বলে শপথ করেছ, গালিব;
তোমার শপথের উপর কিন্তু একটুও ভরসা করা যায় না॥

(৬)

গালিব, মদ তো ছেড়েছি, তবু এখনও, কচিৎ কখনও,
পান করি মেঘলা দিনে আর জ্যোৎস্না রাতে॥

(৭)

এ কেমন বন্ধুত্ব যে বন্ধু হয়েছেন উপদেষ্টা;
কেউ যদি উপায় বলে দিত, ব্যথার ব্যথী হোতো কেউ॥

(৮)

দুঃখ প্রাণঘাতী কিন্তু কেমন করে রক্ষা পাবে আমার হৃদয়;
প্রেমের জ্বালা নাও যদি থাকত, জীবিকার গ্লানি তো থাকতই॥

(৯)

আমার ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে কালের গতি রুদ্ধ;
যে দিন মিশকালো তার প্রভাতই বা কী, সন্ধ্যাই বা কী॥

(১০)

মৃত্যু ছাড়া জীবনযন্ত্রণার আর কী ওষুধ আছে, আসাদ;
প্রদীপকে তো যেমন করে হোক জ্বলতেই হবে
ভোর হওয়া পর্যন্ত॥

(১১)

আসাদের প্রাণের উপর কালের কশাঘাত মৃদুই,
আমি তো আরও কঠিনের প্রত্যাশায় রয়েছি॥

(১২)

বছরের পর বছর যদিও আমি জীবিকার
উৎপীড়নে নাজেহাল হয়েছি,
তোমার ভাবনা মন থেকে সরে যায় নি এক দিনও॥

(১৩)

কানে আর আসে না কোনো বার্তা,
চোখ দেখতে পায় না তার রূপ—
একটি তো হৃদয়, তাও হতাশায় এমন বিক্ষত।

(১৪)

একটু সামলে নিতে দাও, হে নৈরাশ্য, এ কী প্রলয়কাণ্ড।
বন্ধুর ধ্যানের যে অঞ্চলপ্রান্তটুকু আমার হাতের মুঠোয় ছিল
তাও ফসকে যাচ্ছে॥

(১৫)

প্রেমেই জীবনের স্বাদ পেলো আমার মন;
ব্যথার ওষুধ পেলো, এমন ব্যথা পেলো যার ওষুধ নেই॥

(১৬)

দেখো তার কথার চমৎকারিত্ব, সে যা বলে—
আমার মনে হয় এও যেন আমার হৃদয়েরই কথাই ছিল॥

(১৭)

লক্ষ শত বাসনা এমন যে, প্রত্যেকটির জন্য প্রাণ যায় যায়;
অনেক বাসনা আমার পূর্ণ হল, তবুও কম হল॥

(১৮)

আমার আগ্রহের পাগলামি দেখো, বার বার আমি
নিজেই যাই ওদিকে, আর নিজেই হয়রান হয়ে ভাবি—[illegible]॥

(১৯)

আজ আমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের কথা তাঁকে
বলতে যাচ্ছি তো, তবে দেখুন কী কথা মুখ ফুটে বলি॥

(২০)

জীবন তো এমনিতেও কেটে যেত,
কেন তোমার পথের কথা মনে এল?

(২১)

আমার বুকে মৃত্যুশেল হানবার পর নিষ্ঠুরতা-বর্জনের
শপথ নিল সে—
হায়রে ঐ ত্বরিত-অনুতাপশীলার অনুতাপ।

(২২)

মানলাম যে গালিব কিছুই না, তবু
একেবারে বিনা খরচায় পেয়ে যাও তো মন্দই বা কী?

(২৩)

তুমিই জানো, অপরের সাথে তোমার কতখানি ঘনিষ্ঠতা;
আমারও খবর যদি নাও মাঝে মাঝে তো দোষ কী?

(২৪)

বাঁচা-মরার ভেদ থাকে না প্রেমে,
তাকে দেখেই বেঁচে আছি, যে সর্বনাশার জন্য প্রাণ যায়॥

(২৫)

একটু কেঁদে নিতে দাও, ভর্ৎসনা কোরো না বন্ধু;
কোনো এক সময়ে তো হৃদয়ের ভার হালকা করবে মানুষ॥

(২৬)

হায়, কেন কাঁদতে গেলাম তার কাছে?
আমি কি জানতাম, বন্ধু, এতে বুকের জ্বালা
আরো বেড়ে যাবে॥

(২৭)

কটুবাক্যে কাজ হাঁসিল করতে চাও গালিব?
নির্দয় বললে সে তোমার উপর সদয় হবে কেন?

(২৮)

কিছু তো দাও, হে অবিচারের চূড়ান্ত প্রতীক—
দীর্ঘশ্বাস ফেলবার, মর্মবেদনা জানাবার অনুমতিটুকু অন্তত॥

(২৯)

আর কত কাল এ উপযাচক হৃদয় সংকোচে নত হয়ে থাকবে?
হে ঈশ্বর, প্রার্থনার করপুট উঁচু করে
তুলে ধরবার সাহস দাও আমাকে।

(৩০)

না চাইতেই যদি দেন তিনি তো তার স্বাদই আলাদা;
সেই ভিখারী শ্রেষ্ঠ, হাত পাতার অভ্যাস হয় নি যার॥

(৩১)

মঞ্জুর হবে যদি নিশ্চিত জানো তবে প্রার্থনা কোরো না,
অর্থাৎ এক প্রার্থনাহীন হৃদয় ছাড়া আর কিছু চেও না।

(৩২)

সব মেনে নিতে শিখবো আমিও,
উদাসীনতাই যদি তোমার অভ্যাস হয় তো হোক॥

(৩৩)

পেরে উঠবার শক্তি সঞ্চয় করতেই হবে, গালিব;
অবস্থা সঙ্গীন, এবং প্রাণ প্রিয়॥

(৩৪)

বুকে মিলনের আগ্রহ, প্রিয়ার স্মৃতি পর্যন্ত বাকি নেই;
এমন আগুন লাগল এ ঘরে যে যা ছিল ছাই হয়ে গেল॥

(৩৫)

সাকীর চোখ আর ঘুরে ঘুরে, কারও চোখে বিস্ময় জাগায় না,
সুরাপাত্র ঘুরে ঘুরে কারও তৃষ্ণা মেটায় না;
আমার মজলিশে, গালিব, বাকী আছে শুধু আকাশের
অর্থহীন চক্রগতি॥

(৩৬)

ধর্মবিশ্বাস আমাকে ধরে রাখে, অবিশ্বাস আমাকে টানে;
আমার পিছনে রয়েছে কাবা; সামনে প্রতিমার বেদী॥

(৩৭)

এমন ভাবে, গালিব, জীবন কেটেছে যে,
আমি ভুলেই গেছি আমার মনেও ঈশ্বরের স্থান ছিল॥

(৩৮)

সব আছে, না কিছুই নেই, গালিব!
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী? নাকি কোনো ব্যাপারই নেই?

(৩৯)

গোলাপের কলিগুলি পাপড়ি মেলেছে বিদায় জানাবার জন্য;
হে বুলবুল, চলো এবার, চলে আসছে বসন্তের দিন॥

মূল উর্দু শের

(১)

উরুজ-এ না-উম্মীদী-এ চশম্-এ জখম্ চর্খ কেয়া জানে,
বহার-এ বে-খিজা অজ্ আহ-এ বেতাসীর হৈ পয়দা॥

(২)

হর কদম দুরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝসে;
মেরী রফ্তার-সে ভাগে হৈ বয়াবাঁ মুঝসে॥

(৩)

মগ্মহ্ হৈ, মহ্ব্-এ সাজ রহ্; নশহ হৈ, বেনিয়াজ রহ্;
রিন্দ-এ তমাম্-এ নাজ রহ্; খলক্কো পারসা সমঝ॥

(৪)

জান্তা হুঁ সবাব-এ তা'অত ও জুহদ্,
পর তবীয়ৎ উধর নহীঁ আতী!

(৫)

তুনে কসম ময়কশীকী খাঈ হৈ, গালিব;
তেরী কসম-কা কুছ এতিবার নহীঁ হৈ॥

৬

গালিব, ছুটী শরাব, পর অবভী কভী কভী
পীতা হুঁ রোজ-এ অবর ও শব-এ মাহ্ তাব-মেঁ॥

৭

য়েহ কহাঁ-কী দোস্তী হৈ কেহ্ বনে হৈঁ দোস্ত নাসেহ্;
কোই চারহ্সাজ হোতা, কোই গমগুসার হোতা॥

৮

গম-অগরচেহ্ জাঁ-গুসল হৈ, পে কহাঁ বচে কেহ দিল হৈ;
গম-এ ইশ্ক্ গর নহ্ হোতা, গম-এ রোজ্গার হোতা॥

৯

নওমীদী-এ মা গর্দিশ-এ অয়াম নহ্ দারদ্,
রোজে কেহ্ সিয়হ্ শুদ সহর ও শাম নহ্ দারদ্॥

১০

গম-এ হস্তীকা অসদ কিসসে হো জুজ মর্গ ইলাজ,
শমা হর রংগ-মেঁ জলতী হৈ সহর হোনে তক॥

১১

জমানহ্ সখৎ কম-আজার হৈ বজান-এ অসদ,
বগরনহ্ হম তো তবক্কো জিয়াদহ্ রখতে হৈঁ॥

১২

গো মৈঁ রহা রহীন-এ সিতম্হা-এ রোজ্গার;
লেকিন তেরে খয়াল সে গাফিল নহীঁ রহা॥

১৩

গোশ মহজুর-এ পয়াম ও চশম মহরুম-এ জমাল;
এক দিল তিস পর য়েহ না-উমীদবারী, হায় হায়॥

১৪

সম্ভলনে দে মুঝে, অয় না-উম্মীদী, কেয়া কয়ামৎ হৈ,
কেহ্ দামান-এ খয়াল-এ য়ার ছুটা যায়ে হৈ মুঝসে॥

১৫

ইশ্ক্সে তবীয়ৎনে জীস্ত্কা মজা পায়া;
দর্দকী দবা পায়ী,দর্দ-এ বেদবা পায়া।

১৬

দেখনা তক্রীরকী লজ্জৎ কেহ জো উস্নে কহা,
মৈনে য়েহ্ জানা কেহ্ গোয়া য়েহ-ভী মেরে দিলমেঁ হৈ॥

১৭

হজারোঁ খ্বাহিশেঁ অয়সী কেহ্ হর খ্বাহিশপে দম নিকলে,
বহুৎ নিকলে মেরে অরমান লেকিন ফিরভী কম নিকলে॥

১৮

বারে দিবানগী-এ শওক্ কেহ্ হরদম মুঝকো
আপ জানা উধর অওর আপ-হী হৈরাঁ হোনা॥

(১৯)

আজ হম অপ্নী পরেশানী-এ খাতির উনসে
কহনে জাতে তো হেঁ পর দেখিয়ে কেয়া কহ্তে হৈঁ

(২০)

জিন্দগী য়ুঁ-ভী গুজর-হী জাতী,
কিঁউ তেরা রাহ্গুজর য়াদ আয়া॥

(২১)

কী মেরে কতল্কে বাদ উসনে জফাসে তওবহ্—
হায় উস জুদ-পশীমাঁকা পশীমাঁ হোনা॥

(২২)

ম্যঁনে মানা কেহ্ কুছ নহীঁ গালিব;
মুফ্‌ৎ হাথ আয়ে তো বুরা কেয়া হৈ?

(২৩)

তুম জানো তুমকো গৈর্‌সে জো রস্‌ম্ ও রাহ হো;
মুঝকো ভী পুছতে রহো তো কেয়া গুনাহ্ হো॥

(২৪)

মুহব্বত মেঁ নহীঁ হৈ ফর্ক জীনে অওর মরনে-কা।
উসীকো দেখকর জীতে হৈঁ জিস কাফির-পে দম নিকলে॥

(২৫)

রোনে সে অয় নদীম মলামৎ নহ কর মুঝে,
আখির কভী তো উক্‌দা-এ দিল বা করে কোঈ॥

(২৬)

নহ্ কর্‌তা কাশ নালহ্, মুঝকো কেয়া মালুম থা হমদম,
কেহ্ হোগা বা'অস-এ অফ্‌জাইশ-এ দর্দ্-এ দরূঁ বোহ্‌ভী॥

(২৭)

নিকালা চাহ্‌তা হৈ কাম কেয়া তানোঁ সে তু গালিব?
তেরে বেমেহের কহ্‌নে সে বোহ্ তুঝপর মেহেরবাঁ কিঁউ হো?

(২৮)

কুছ তো দে অয় ফলক-এ না-ইন্‌সাফ—
আহ্ ও ফারিয়াদ-কী রুখ্‌সৎ-হী সহী॥

(২৯)

তা চন্দ পস্তফিৎরতী-এ তবা-এ আরজু;
য়া রব, মিলে বুলন্দী-এ দস্ত-এ দোয়া মুঝে॥

(৩০)

বেতলব দেঁ তো মজা উসমেঁ সিবা মিলতা হৈ:
বোহ্ গদা জিসকো নহ্ হো খু-এ সবাল, অচ্ছা হৈ॥

(৩১)

গর তুঝকো হৈ য়কীন-এ ইজাবৎ, দোয়া নহ্ মাঙ্গ,
য়ানি, বেগৈর-এ এক দিল-এ বে-মুদ্দোয়া নহ্ মাঙ্গ॥

(৩২)

হম্-ভী তস্‌লীম-কী খু ডালেংগে,
বেনিয়াজী তেরী আদৎ-হী সহী॥

(৩৩)

তাব লায়েহী বনেগী, গালিব,
বাকেয়া সখত্ হৈ অওর জান অজীজ॥

(৩৪)

দিলমেঁ শওক্-এ বসল্ ও য়াদ-এ য়ার তক বাকী নহীঁ;
আগ ইস ঘরমেঁ লগী অয়সী কেহ্ জো থা জল গয়া॥

(৩৫)

নহ্ হৈরৎ চশম্-এ সাকী-কী, নহ্ সোহবৎ দওর-এ সাগর-কী;
মেরী মহফিলমেঁ গালিব গরদিশ্-এ অফলাক বাকী হৈ॥

(৩৬)

ঈমাঁ মুঝে রোকে হৈ তো খীঁচে হৈ মুঝে কুফ্র্।
কা'বহ্ মেরে পীছে হৈ, কলীসা মেরে আগে॥

(৩৭)

জিন্দগী অপ্‌নী জব ইস শকলসে গুজরী, গালিব,
হম্-ভী কেয়া য়াদ করেংগে কেহ্ খুদা রখতে থে॥

(৩৮)

হস্তী হৈ নহ্ কুছ্ অদম হৈ, গালিব!
আখির তো কেয়া হৈ, অয়া নহীঁ হৈ?

(৩৯)

আগোশ-এ গুল কুশাদহ্ বরায়ে বিদা হৈ
অয় অন্দলীব চল, কেহ চলে দিন বহার-কে॥

২৮৬
১৬৫
১৩৫

এগুলি কোনও জাদুকরী নম্বর নয়—কেলভিনেটরের নম্বর—কেলভিনেটর রেফ্রিজারেটরের ধারণশক্তি লিটারে ধার্য করার জন্য নম্বরগুলি ব্যবহৃত। তার মানে, প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের কেলভিনেটর পাওয়া যায়। আপনার পরিবারের উপযুক্ত সাইজ বেছে নিন। বহু কারণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ কারণ যা দিয়ে কেলভিনেটর পরিবারকে খুশি করে।

৬৫

সব নম্বরগুলিই পরিবারকে খুশি করে—পরিবারের সংখ্যা যাই হোক।

স্পেন্সার্স
১৮৬৫ সাল থেকে
আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত

স্পেন্সার অ্যাণ্ড কোং লিঃ,
১৫৩, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ—৬০০ ০০২
১১-এ আলিপুর রোড, দিল্লী—১১০-০০৬
স্পেন্সার বিল্ডিং, ফোরজেট স্ট্রীট,
বোম্বাই—৪০০ ০৩৬
ডায়মণ্ড হারবার রোড,
খিদিরপুর, কলকাতা—৭০০-০২৩

সবচেয়ে বড় কথা, যে কেলভিনেটর-মালিকের খুশি হবার যথেষ্ট কারণ আছে; কেন না, তাঁরা একবার জিনিস কিনে ডবল ফায়দা লাভ করেন। প্রত্যেক কেলভিনেটর রেফ্রিজারেটরের ওপর সুবিখ্যাত স্পেন্সারদের সার্ভিস-গ্যারান্টী থাকে। সারা ভারতে বিস্তৃত স্পেন্সারদের কাছ থেকে তাদের দ্বারা বিক্রীত রেফ্রিজারেটরের জন্য অবিলম্বে, উপযুক্ত ও সৌজন্যতাপূর্ণ বিক্রয়-পরবর্তী সার্ভিস পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। আর ঐ নিশ্চয়তাই প্রমাণ করে যে, খরিদ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রেতা আপনাকে ভুলে যান না—এবং কেলভিনেটর সম্বন্ধে এটাই হ'ল সবচেয়ে আনন্দের কথা।

কেলভিনেটরের অন্যান্য আকর্ষণ :—

- ভেতরের জায়গার সদ্ব্যবহার
- সিঙ্গল-মোল্ড লাইনিং
- দরজাতে ম্যাগনেটিক গ্যাসকেট
- পোলারস্ফীয়ার কম্প্রেসার
- সৌখীন, ছিমছাম গড়ন

FOCUS.SC.2391 BN (b)
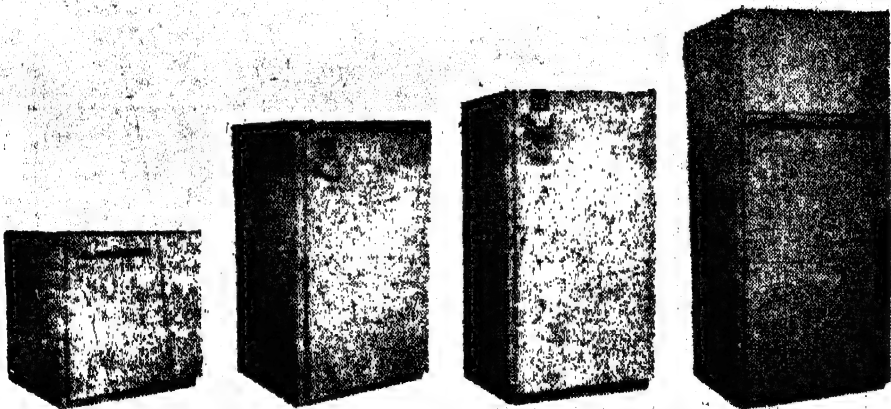
দেখা মাত্রই পছন্দ হয়—স্পেন্সারের কেলভিনেটর

স্পেন্সার অ্যান্ড কোং লিঃ
৭০ ডায়মণ্ডহারবার রোড
খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

স্পেন্সার অ্যান্ড কোং লিঃ
৫, ইস্টার্ন মার্কেট বিল্ডিংস
ভুবনেশ্বর-১

সূর্য চলে গেলে : তুলসী সেনগুপ্ত
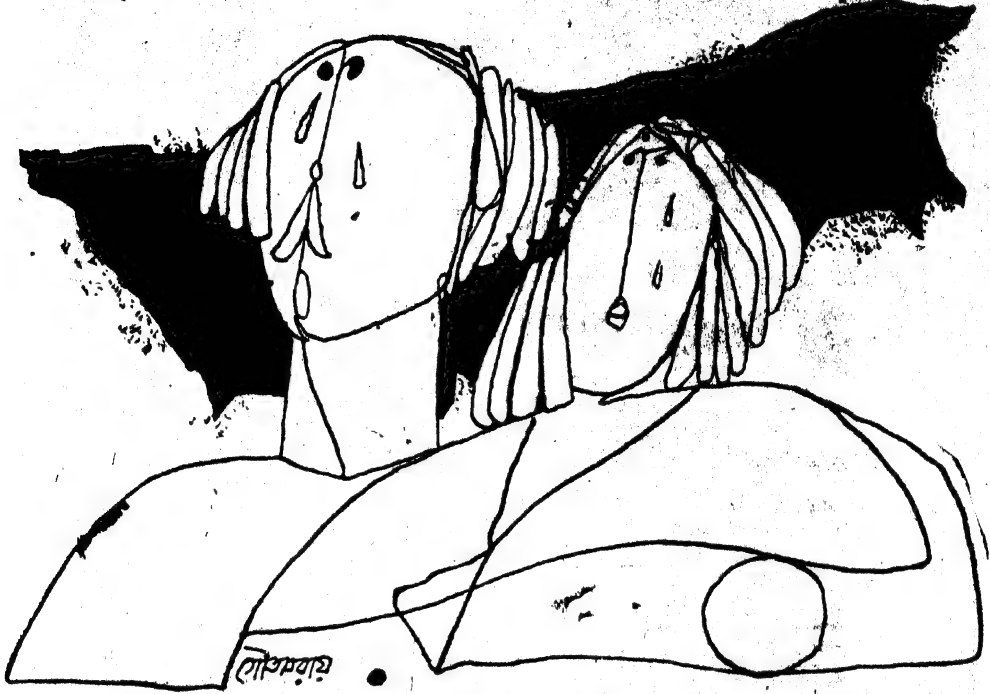
লীলাবতীর সকাল থেকেই মন খারাপ। রান্নাঘরে সেই কোন সকালে ঢুকেছে, টুক-টাক কাজ, এটা ওটা করেই যাচ্ছে মুখ বুজে। অন্যদিন এত বেলা অব্দি মুকুন্দকে শুয়ে থাকতে দেখলে, কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারতো না ও। কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত একটা কথাও মুখ ফসকে বেরিয়ে আসেনি লীলাবতীর। মাথার নিচের বালিশ সরিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে থেকে লীলাবতীর কথা ভাবল অনেকক্ষণ মুকুন্দ। হিসেব করে দেখল, এই মাঘে পঞ্চাশে পা দিল ও। আর লীলাবতী? চল্লিশ থেকে বছর পঁচিশের যে কোন একটা কিছু ভাবা চলে ওর সম্পর্কে। মুকুন্দ বুঝতে পারল, লীলাবতী মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে কেন! সূর্যকে নিয়ে কলকাতার বাবুরা গতরাত্রে চলে গেছে। মাস-খানেকের কাজ। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে সূর্য, আলোঝলমল একখানা মুখ নিয়ে। গৌরবে, গর্বে উন্নত সূর্যকে ঠিক এই মুহূর্তে চোখের সামনে দেখতে পেল মুকুন্দ। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়েও সারা শরীরে কেমন যেন এক অবসাদ এই প্রথম টের পেল। অথচ, অন্য-অন্য দিন সেই কোন রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেতো, লীলাবতী ঘুম চোখে উঠে দরজা বন্ধ করে ফের এসে শুয়ে পড়ত। পাশের ঘরটা সূর্যর। সারস পাখির মত ঘাড় উঁচু করে প্রায় রোজই মুকুন্দ সূর্যর ঘরটায় উঁকি দিয়ে যায়। রোজই এক দৃশ্য ওর চোখে পড়ত। ছোট্ট তক্তোপোশটায় কোণাকুণি বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে সূর্য। ওর অমনধারা ভঙ্গি দেখে না হেসে পারে না। চোখে পড়ে মাথার বালিশ দু-পায়ের মাঝখানে রেখে, শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে পরম প্রশান্তিতে ডুবিয়ে রাখে যেন সূর্য। তা দেখে মনের অবসাদ যায় দূর হয়ে, খুশির পাখনা মেলে দ্রুত পা ফেলতে ফেলতে কারখানার দিকে এগিয়ে যায় মুকুন্দ। কিন্তু আজ? আজ সারা বাড়িটা জুড়েই যেন এক নৈঃশব্দ্যের শীতলতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এইবার নিজের মনটাকে হাতড়ে দেখবার চেষ্টা করল মুকুন্দ! দেখল, সূর্য নেই, মাত্র তো এক রাত্তির! বুকের মাঝখানটা কেমন যেন একটা চিড়, কেমন যেন একটা ফাঁকা গহ্বর রচিত হয়েছে। ভাবতেই মনটা মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ অসহায় হয়ে উঠল মুকুন্দর। কেমন একটা জেদাজেদি ভাব মেজাজটাকে তিরিক্ষি করে দিতে লাগল। ঠিক সেই সময় পাশের মিলটার কাজের ভোঁ বাজলে পর একমুহূর্তও আর শুয়ে থাকতে মন চাইল না মুকুন্দর। বিছানা ছেড়ে উঠে পাতকুয়োর দিকে ধীরে ধীরে এগোল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই দেখল, লীলাবতীর চোখ দুটো ভীষণ ফুলো, সারা শরীরের রক্ত মুখে উঠে এসেছে এই [illegible] মুখ নিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

মুখে হাতে জল দিয়ে [illegible] কাঠ-কয়লায় দাঁতটুকো ঘুরিয়ে নিয়ে [illegible] মুকুন্দ। এক সময় রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে ছোট্ট পিঁড়ি টেনে নিয়ে লীলাবতীর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'শরীলটা আইজ খুব বেজুত ঠেকে গো সুখাদের মা, তা তোমারও শরীরটা ক্যামনে খারাপ ঠেকতিছে?'

লীলাবতী সে কথার উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে মুকুন্দর কপালে ঠেকায়। অস্ফুটে বলে, 'না, জ্বর নাই।'

'[illegible] আজ একটু [illegible] বানাও দিলি। কেন খালি ডাক্তারের কাছে যাইয়া সার্টিফিকিট জোগাড় করতি হবে?'

লীলাবতী বলে, 'একদিনের জন্যি কি সার্টিফিকিট লাগে নাকি?'

'আর কইয়ো না: শালার কি যে হইতেছে, কিছুই বুঝি না। আজ এটা চাও, কাল ওটা

লাগবি; গরমেণ্ট মাইনসেরে লিয়ে কী যে তিম্নানাচন নাচাতিছে না, কী কব।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটু উত্তাপ পেয়ে খুশী মনে বলে উঠল মুকুন্দ, 'সুযিয়াটা নাই, সারা বাড়িটা কীর'ম শ্মশান শ্মশান বোধ হতিছে।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে থাকে মুকুন্দ, 'বুঝলে সুযির মা, ও খুব একজন মানিগন্যি মানুষ হবে বলে দিলাম। তুমি দেইখে নিও।'

লীলাবতী নিজেও সামান্য চা নিয়েছিল। পেয়ালাতে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিয়ে কেমন ফ্যাকাশে চোখে তাকাল মুকুন্দর দিকে। ''বাব্বা, আমার খুব ভয় করতিছে', ধীর গলায় বলে উঠল লীলাবতী।

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যই যেন বলল মুকুন্দ, 'না না ভয়ের কী আছে। সুয্যি তো আর বোকা হাবলা না......' বলেই উজ্জ্বল এক জোড়া চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে লীলাবতীর দিকে।

'তুমিও তো কম চালাক ছিলা না; বুদ্ধি তো তোমার ঘটেও ছিল, সেই তুমিও তো......

লীলাবতীর কথাটাকে শেষ করতে দিল না মুকুন্দ, বাধা দিয়ে বলে, 'জানো সুযির মা, গেরামদেশের মানুষ আর শহরের মানুষ, তার তফাৎই অনেক। আর তা ছাড়া, সুয্যি আমাদের লেখাপড়া শিখছে, মুখ্যুরে ঠকায় সবাই কিন্তু আমাদের সুয্যিরে...... না না, ও তুমি অকারণ চিন্তা করতিছ।' কী মনে করে উঠে পড়ল মুকুন্দ।

লীলাবতী ধীর গলায় শুধোয়, 'তা তুমি কি চললা নাকি এখনই ডাক্তারের ওখানে'.

'ক্যান, কও দিনি'।

'এট্টু বাজারে যাতি হবে, চাইল রইয়েছে। ডাইল তরকারি কিছু নাই।'

'তা এট্টু আগে কতি হয়'।

সে কথায় লীলাবতী গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'সুয্যি থাকলি তো কথাই ছিল না—না পারো আমিই যাই'।

মুকুন্দ নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। এক মুখ হাসি নিয়ে বলে, 'কোন দিন কথা, তুমিই ঘরে রান্দোবা রা, আমি কারখানার কাম করতি যাই।' বলেই প্রাণখোলা হাসি হাসল মুকুন্দ।

লীলাবতীর এতক্ষণের থমথমে গম্ভীর মুখটায় এই প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল। মুকুন্দর দিকে অনেকক্ষণ অপলকে চেয়ে থেকে বলে, 'একবার আয়নায় নিজের মুখটা দ্যাখো দিনি। এত বড় বড় দাড়ি, দেখলি, উত্তরাদির জগা পাগলা বলে ভুল হয়।'

মুকুন্দ পিঁড়িটাকে টেনে লীলাবতীর আরও কাছে এগিয়ে বসল। অনেক দিন পর এমন মুখোমুখি বসা, ওরে সুযি নেই;

তাই বুঝি মুকুন্দর বুকে কিসের একটা ছলাং ছলাং শব্দ ওঠে। ডান হাতটা বাড়িয়ে লীলাবতীকে ছুঁয়ে বলে, 'তোমার মুখ দেখলিই বুঝি আমি ক্যামন আছি। তোমার চোখের সুখ দুঃখের ছায়া দেখতি পাই।'

কপট রাগে গম্ভীর হয়ে ওঠে লীলাবতীর গলা। 'যাও ঢং করতি হবে না। মুপতা ডাকি খেউড়ি করগে যাও।'

ঝাঁক ঝাঁক ছেলেমানুষি ভিড় করতে থাকে সে সময় মুকুন্দর মাথায়। বলে, 'চৈত্র যৌবন রাখতি পারি সোহাগ দিলি পর. আহাহা, কত দিন সোহাগ দ্যাও না কও দি'নি বউ, হলি কি তুমি পর?'

রহস্যময়ীর মতো তাকায় লীলাবতী। অকারণেই কিনা কে জানে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

মুকুন্দ বলে, 'হ্যাঁ গো, সুয্যির মা, মনে পড়ে, সেই, সেই সব দিনগুলোর কথা। তুমি সারাদিন রান্ধোবাড়ো, আমি সারাদিন কাম করি, গায়ের ঘাম ঝরায়ে শুকনা মাটি নরম করি, বাড়ি আলি পর পাখার হাওয়ায় শেতল কর আমার শরীল-মন, মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা'।

সে কথায় মনের চোখে অনেক ছায়া পড়ে লীলাবতীর। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

এককালে পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটোর দিকে নজর পড়ে মুকুন্দর। দেখে, সে ঠোঁটে লাবণ্য নেই, কেমন খরখরে শুকনো। চোখের কোণে কালসিটে দাগও এড়ায় না তার। আর মুহূর্তে দাউ দাউ করে ওঠে বুকের ভেতরটা—কেমন সব হারানোর বেদনায় অস্থির হয়ে পড়তে থাকে। তবু সব কিছুকে অস্বীকার করে বলে, 'যাই কও সুয্যির মা, বিয়ার আগের দিনগুলো বড় মধুর ছিল। ছিল কিনা কও?'

লীলাবতী বলে, 'সেই ছল করি তুমি জল খাতি আসতা মোদের বাড়ি।' বলেই খিলখিল করে হাসল। কিছুক্ষণ পর ফের বলতে থাকে, 'খরগোসের মত তোমার চোখের মণি এদিক-ওদিক বন্‌বন্‌ কইরে ঘোরতো: এই বুঝি ধরা পড়, এই বুঝি সব্বনাশ হইয়ে গেল, এমনভাব...'

'যাই কও, তোমার বাবা বড় নিদ্দয় ছিল। কী খাটানোই না খাটাইতো, সারা দিন খাটলি পর দ্যাড়টা টাকা দিত, তাও কত দরকষাকষির পর, কও তোমার বাবা নিদ্দয় ছিল কিনা, কও?'

লীলাবতী বলে, 'তা জানি না। তবে বাবা তোমারে খুব স্নেহ কইরতেন'।

'স্নেহ কইরতেন না ছাই। আসলে তুমি না থাকলি, আমি কবে অন্যত্র চলি যাতাম'।

সে কথায় হি হি করে হাসল লীলাবতী। বলে, 'জানো বাবা বোধ হয় বুঝতি পাইরেছিল'।

'তা আর পাইরবে না। লোক ঠকাতি ঠকাতি চোখ জোড়া পাকা কইরে ফেইলেছিল তোমার বাবা।' হাসল মুকুন্দ। কিছুক্ষণ পর কী মনে করে ফের বলতে থাকে, 'যাই বল না ক্যান, ওই যে বলে না, কারো সব্বনাশ, কারো পোষ মাস, আমারও হইয়েছিল তাই...... ভাগ্যিস পাকিস্তান হইয়েছিল, নাইলে তো তোমার বিয়া হইত ওই শালা ভাড়িখোর পচা মণ্ডলের সংগে।'

লীলাবতী উত্তর দেয়, 'ভালই হইত। পাটরাণী কইরে রাখতো পচা মণ্ডল, জানো, অর কত টাকা!'

সে কথায় ভীষণ রেগে গেল মুকুন্দ। বলে, 'অমন ট্যাকায় আমি পেচ্ছাব করি। ও শালা পচা মণ্ডল আগের জন্মে শকুন ছিল।'

মুকুন্দকে রাগতে দেখে লীলাবতীর কেন যেন ভালই লাগল। ও আরও রাগুক, এটাই যেন দেখতে চায় সে। বলল, 'শকুনই থাউক আর খচ্চরই থাউক, ও কেষ্ট বর্মণের মাইয়ারে তো মাথায় কইরা রাখছে—কত গয়না, কত শাড়ি।'

মুকুন্দ লীলাবতীর চোখে চোখ রেখে বলে, 'আর তোমারে আমি পায়ে ঠেলছি না।' চুপ করে গেল মুকুন্দ। স্থির চোখে দূরের আকাশটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে নিজের মনেই বলতে থাকে, 'সাঁচা সুয্যির মা, তোমারে আমি এটুও সুখ দিতে পারি নাই; ভাবলিপর মাথাটা আমার গরম হইয়া যায়। দেইখো সুয্যি বড় হবে, আমাদের দুঃখ কষ্ট যাইবে, কিছু থাকবে না।'

মুকুন্দর দিকে পরম মমতায় তাকাল

লীলাবতী। অনেক দিন পর ওর প্রশান্ত বুকে সেই অনেককাল আগেকার মত জড়িয়ে মাথা রাখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কেমন যেন দ্বিধা সঙ্কোচে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকে। পরে ধীর শান্ত গলায় বলে, 'কার সাথে কার তুলনা। পচা মণ্ডল হচ্ছে গিয়ে ভাগাড়ের শকুন, আর তুমি, তুমি হচ্ছোগো ওই আকাশের সুর্যির বাবা—' মুহূর্তেই সব সঙ্কোচ দূরে হয়ে গেল লীলাবতীর। মুকুন্দর বুকে মাথা রেখে বলে, 'সুয্যি তাড়াতাড়ি ফিরলে বাঁচি।'

তাড়াতাড়ি কোথা দূরের কথা, পাঁচ মাস পার হয়ে ছ' মাসে পড়ল, সুয্যির সঠিক কোন সংবাদই পেল না মুকুন্দ। সেই বোশেখ মাসে কলকাতার বাবুদের সঙ্গে চলে গেল ও, কলকাতায় পৌঁছে মাত্র একখানা পৌঁছনো সংবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেয় নি। এখানকার যে যখন কলকাতায় যায়, মুকুন্দ তাদের সঙ্গে দেখা করে সূর্যর খোঁজ নিয়ে আসতে বলে, কেউ বলে, 'সময় পেলে খোঁজ নেবো।' কেউ বলে, 'মুকুন্দ তুমি তো বড্ড ছেলে ন্যাওটা, সূর্য কি তোমার বোকা হাবলা ছেলে যে, হারিয়ে যাবে।' কথাগুলো শুনে মুকুন্দর চুপসে-যাওয়া মন মুহূর্তের জন্য কিসের গর্বে ফুলে ওঠে, ধূসর বিবর্ণ মনের আকাশে রং-বেরং-এর প্রজাপতি পাখনা মেলে উড়তে শুরু করে। কিন্তু সেই সুখের আবেগ বেশীক্ষণ তার মনে স্থির থাকে না। লীলাবতীর সপ্রশ্ন চোখের মণি দুটো হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে মুকুন্দ।

তবুও নিজেকে ধরা দেয় না। সহজ হাসি খুশীভরা মন নিয়ে হাল্কা পায়ে বাড়িতে ঢোকে মুকুন্দ। বেশ কিছু দিন ধরেই লক্ষ করেছে ও, লীলাবতী এখন আর আগের মত আচরণ করে না, ছুটে এসে সূর্য সম্পর্কে জিগ্যেস করে না। কঠিন মুখ তুলে চেয়ে থাকে। বুকের ভেতরটা ছাত ছাত করে ওঠে মুকুন্দর। কিভাবে যে প্রলেপ দেয়া যায় সে ভাষা জানা নেই তার। তাই ইচ্ছে করেই কারখানা থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরে, কোন কোন দিন একা একা এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে বাড়ি আসে। নয়তো বা কোন কোন দিন বুড়ো বটতলায় একাকী নিঃসঙ্গ সময় কাটায়।

আর লীলাবতী অকারণে ঘর-বার করে। বাড়ির পাশের কাঁটাগাছ ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল সাফ করে। ছোট খুর্পির হাতে নিয়ে বসে উত্তরের দিকের ছোট্ট জমিটার মাটি খোঁড়ে। দেখতে দেখতে সূর্য মাঝ আকাশে উঠে এলে পর বা হাতের চেটো দিয়ে চোখ ঢেকে এদিক-ওদিক কী যেন খোঁজে।

মুকুন্দ বাড়ি এলে পর লীলাবতী জিগ্যেস করে, 'তোমার কী হয়েছে, কও দি'নি? রোজ রোজ রাইত হয় ফিরাত?'

ফ্যাকাশে হাসে মুকুন্দ। বলে, 'ওভার-টাইম হইতেছে জোর। এই সুযোগ হাতছাড়া করাত নাই।'

'ক্যান, এত ওভারটাইমের ধুম লাগল ক্যান? দ্যাশে কী আর জন-মুনীশ নাই?'

সে কথায় বিজ্ঞের হাসি হাসল মুকুন্দ। বলে, 'নতুন লোক নিতি গেলি অনেক হ্যাপা, তাই...ও তুমি বোঝবা না।'

লীলাবতীর দু চোখের সাদা জমিতে জল টলটল করে। মুখে কিছুই বলে না। কোন কথার মধ্যে না গিয়ে আপন মনেই ঘর গুছোতে শুরু করে।

মুকুন্দ বলতে থাকে, 'চলো না, কইলকাতায় গিয়ে সুয্যির খোঁজ করে আসি।'

কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল লীলাবতী। মুকুন্দ দেখল, লীলাবতীর ঠোঁট দুটো কেমন যেন থিরথির করে কাঁপছে। ঘন-কালো চোখের পাতা দুটো দেখতে দেখতে ভিজে গেল। মুকুন্দ এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াতেই, লীলাবতীর বুকের মাঝখানটা কি রকম যেন গুমরে করে উঠলো প্রথমটায়, তারপর কী রকম একটা সরু চিকন শব্দ বের করে কেঁদে উঠলো।

মুকুন্দ এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কোত্থেকে একজাতীয় অসাধারণ শক্তি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সারা শরীরের মাংসপেশীগুলো অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠলে পর লীলাবতীকে ধমক দেবার সুরে বলে, 'বলি এ সব কী হতিছে, অ্যাঁ? কথা নাই বাত্রা নাই হ্যাক হ্যাক করে কান্দনের কী হলো! দ্যাখো, ওই সব ফ্যাচ-ফোঁচ আমার ভাল লাগে না, হ্যাঁ।'

লীলাবতী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'চলো খাতি চলো।'

মুকুন্দ কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ধীর পায়ে ওকে অনুসরণ

করতে গিয়েও কিসের এক বাধায় চুপ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রান্না ঘরে গিয়ে রুটি তরকারি ও জলের গেলাস ঠিক করে মুকুন্দর অপেক্ষায় বসে রইল লীলাবতী। দূরে কিসের একটা শব্দ হতেই গাছের ডালে বসে থাকা কাকগুলো একযোগে কা কা করে উঠলে এক ধরনের অস্বস্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকল। সূর্যর কথা বারবার মনে আসতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঠেলে বেরুলে মায় দুই সূর্যর নামটা নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে ফেলতে থাকে সে। এক এক সময় মনে হয়, এই বুঝি সূর্য এসে হাজির হয়।

মুকুন্দ এসে বলে, 'কিছু মনে ক'রো না সূর্যর মা। মাথাডার মধ্যি কী রকম যেন সব চিড়িক পড়ে। কী বলতে কী বইলে ফেলি।'

লীলাবতী নিরুত্তর বসে থেকে কেবল শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে মুকুন্দর দিকে।

রুটি আর তরকারি কোন রকমে খামচা খামচি করে খেয়ে পর পর দু গেলাস জল খেল সে। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলে, 'নানাজন নানান কথা কয়, শুনে মনটা দিন দিনই'...কথাটা শেষ করতে পারে না ও। কেমন যেন এক ধরনের যন্ত্রণা আর বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকে সে সময়। 'শালার নরেন শা' বলে কিনা, সূয্যি কইলকাতার মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছে। বেজন্মার ব্যাটা, মেয়েছেলে দেখেছিস কখনও'...বলেই হাঁপাতে থাকে মুকুন্দ। ট্যাঁক থেকে বিড়ির কৌটো বের করে একটা বিড়ি মুখে দিয়ে ফস্ করে দেশলাই জ্বালল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে থাকে ফের, 'আসুক সূয্যি ফিরে, তখন শোরের বাচ্চার পাছায় মারবো দুই লাথ। শালার নরেন শা সেও কী না এখন সতী সাজে......,শালার বাপের ঠিক নাই, তার আবার কথা,' বলেই আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বিড়িটায় টান দিতে গিয়েই দেখে বিড়িটা নিবে গেছে। রাগে সারা শরীর কাঁপতে থাকে মুকুন্দর। দরজার বাইরে পোড়া বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'নাও খাইয়ে নাও, রাত করে লাভ কী!'

পাশাপাশি শুয়ে লীলাবতী আর মুকুন্দ। রাত বেড়ে চলে। ঘুম নেই ওদের চোখে। নিঝুম রাতে দূরে রেল স্টেশনের ইঞ্জিনের সান্টিং-এর শব্দ কানে আসে। ঝিঁঝির, রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানির শব্দও শুনতে পায় ওরা। শীত শীত করছিল মুকুন্দর। লীলাবতীকে বলে, 'একটা কাঁথাটাঁথা গায়ে দিয়ে দাও না, শীত করতিছে।'

কোন উত্তর না দিয়ে অভিজ্ঞ মানুষের মত ওর কপালে হাত ছোঁয়াল লীলাবতী। একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের শাড়ির আঁচলটা মুকুন্দর গায়ের ওপর আলতোভাবে বিছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এরকম করে কদ্দিন চলবে, বলতি পারো?'

ওর তরফ থেকে কোন একটা প্রশ্নই যেন সে সময় আশা করছিল মুকুন্দ। কিন্তু এরকম তীক্ষ্ম ধারাল প্রশ্ন নয়, নেহাতই একটা সাধারণ প্রশ্ন লীলাবতীর তরফ থেকে হোক, এটাই চেয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় বুকের ওপরের পাথরটা আরও শক্তভাবে চেপে বসল। একটা গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'জানি না; ঘুমুতি চাই, সে শালাও তো আসে না।'

'রোজই তো তুমি জেগে থাক', আমি টের পাই।

'আমিও টের পাই, তুমি......'

এবার মুখোমুখি ঘুরে শুলো ওরা দুজন। যেন বহু বছর, বহু যুগ পর এমন মুখোমুখি ঘুরে শোওয়া। মুকুন্দ ডান হাত দিয়ে লীলাবতীকে বুকের কাছে টেনে আনলো। ওর রোগা শুকনো ঠোঁট দুটোর ওপর রাখলো নিজের ঠোঁট জোড়া। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের মাঝে সে স্বাদ, সেই প্রথম যৌবনের স্বাদ পেলো না। কেমন নোনা, বিস্বাদ, খারখার লাগল। লীলাবতীর শরীরটা ভীষণ ঠাণ্ডা, যেন ঠিক মরা মানুষের শরীর। ভয় নয়, ভীষণ রাগ হলো মুকুন্দর। ইচ্ছে হলো, জোর করে ধাক্কা দিয়ে লীলাবতীকে তক্তাপোশে থেকে ফেলে দেয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের ভেতর থেকে কিরকম এক মসৃণ, পেলব আলো, লীলাবতীর মুখের ওপর পড়েছে দেখতে পেয়ে বোবা হয়ে গেল মুকুন্দ। ওর মুখের ওপরও কী এই আলো পড়েছে? যদি পড়ে তাহলে কী, মুকুন্দর মনের বিরক্তির কী যন্ত্রণার ভাবটা লীলাবতীর চোখে পড়েছে। ভাবলো, না, লীলাবতীর চোখ অত ধারাল

নয়। বড় সরল, সহজ লীলাবতী। অত ঘোর প্যাঁচের মধ্যে কখনই যেতে পারে না সে। বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলে পর ধীর গলায় বলে মুকুন্দ, 'হ্যাগো, তোমার কাছে সুখুর একটা ছবি আছে না?'

'সে তো সেই ছোট্ট বেলার ছবি। অন্নপ্রাশনের পর তুমি ওরে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলে. সেইখান থিকাই তো তুলে এনেছিলে ছবিডা'।

'হউক। কাইল তুমি দিও দিদি এই ছবিডা। পুলিসের লোক ওই ছবি দেখেই ঠাহর করতি পারবে।'

'কাইল ক্যান; এখনই দি।' বলেই উঠে পড়লো লীলাবতী। বিয়ে করেছিলো বাপমায়ের অমতে। তাই বিয়ের সময় কিছুই পায়নি। পরে কারখানায় চাকরিটা পাকা হলে পর মুকুন্দ শেয়ালদা বাজার থেকে একটা টিনের বাক্স কিনেছিল। ওর পীড়াপীড়িতেই দোকানদার বাক্সটার গায়ে লিখেছিল, 'সুখে থাকো'। মনে পড়তেই মুকুন্দ একটা ঘন নিঃশ্বাস ফেলে নিস্পন্দ পড়ে রইল।

অনেকদিনের ছবি, তাই নজর এড়াতে এড়াতে ছবিটা বাক্সটার একেবারে নিচে চলে গেছে। সমস্ত কাপড়-চোপড় ব্যস্ত হাতে টেনে টেনে নামিয়ে খবরের কাগজে মোড়া ছবিটা বের করলো লীলাবতী। হ্যারিকেনের আলোটাকে উস্কে দিয়ে মুকুন্দ কাগজের মোড়ক খুলে ছবিটা দেখতে থাকল। ঝুঁকে পড়ে লীলাবতীও দেখতে থাকল ছবিটা। একই সঙ্গে দুজনেই বলে উঠলো, 'কী দুষ্টু চোখ সুখুটার'।

লীলাবতী ছবিটার দিকে চেয়ে বললো, 'পরান মণ্ডলের মা অরে কেষ্টঠাকুর বলে ডাকত'।

'আর ঐ সুদাম ঘোষ বলতো...' কথাটা শেষ না করে হি হি করে হাসতে লাগল মুকুন্দ। মুকুন্দর হাসির কারণটা যেন বুঝতে পেরেছে, তাই লীলাবতীও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

'যাই কও, সুখুর মা, সুদাম ঘোষ লোকটা সব সময় রসে টইটুম্বুর থাকতো। সুখিরে দেখে বলেছিল, 'বোঝলা মুকুন্দ, বড়ো হলি ছেলে তোমার অনেক মাগী মচকাবে, বলে দিলাম'। একটু থেমে ফের হাসতে হাসতে বলে, 'যেমন তোমারে মচকেছি আমি, ও শেয়ালের বাচ্চা কলকাতায় কি লটরপটর করছে, কে জানে'? কথাকটি বলেই গম্ভীর হয়ে গেল মুকুন্দ। সেই সঙ্গে লীলাবতীও।

পরের দিন সকালবেলা ছবিটাকে প্যান্টের পকেটে পুরে কারখানার উদ্দেশে পা বাড়াল মুকুন্দ। যেতে যেতে ছবিটাকে পকেট থেকে বের করে দেখলো বার কয়েক। সুখ যে ওদের মাঝখানে এত বড় একটা জায়গা জুড়ে থাকবে তা কি ভাবতে পেরেছিল কখনও! নিজের ছেলেবেলার কথা কেমন যেন মনে পড়ে গেল। বাপ-মার ওপর রাগ করে সেও তো হাঁটু ভাঙা দুদিন ঘুরে ছিল। পরে এক সময় প্রচণ্ড খিদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘরে ফিরে এসেছিল। সে সময় বাপ-মা তার ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার তো করেনই নি, উপরন্তু কেমন এক বিশেষ যত্ন করেছিলেন। নিজেকে সে ভীষণ অপরাধী মনে করেছিল। এখন এই মুহূর্তে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, আজ সে আর লীলাবতী যেমন কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, সে সময় তাদেরও তাই হয়েছিল। কিন্তু সুখ তো রাগ করে যায়নি। ও তো কলকাতার বাবুদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গেছে। দলের বাবুটার নাম যেন কী! মনে করতে চেষ্টা করলো মুকুন্দ। রাজীব না রাজেনবাবু? না না, ও ধরনের নাম নয়। কেমন একটা চমক দেয়া উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নাম। নামটা কী? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না। মুকুন্দ ভাবল, এই তো কাল কী পরশুও এই নামটা তার ঠোঁটের গোড়ায় ছিল। এখন কেন সে মনে করতে পারছে না!

ভোঁ বাজলো কারখানাটায়। আজও দেরী হয়ে গেল। মুখটা কেমন শুকনো, খরখরে। টিনের কৌটো বের করে একটা বিড়ি ধরাল। শালার ম্যানেজারের খিস্তি যখন খেতেই হবে, তখন দেরী করে গেলেই চলবে। বেশ একজাতীয় তৃপ্তির স্বাদ এ মুহূর্তে অনুভব করতে পারলো মুকুন্দ। সর্মান্তপুর প্যাসেঞ্জারটা এই সময় এঁকে বেঁকে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে গেল। হিসেব করে দেখল, এখন সকাল সাড়ে দশ। ট্রেনগুলোর ভেতরে এত লোক, কোথায় যায় সব? দেশ ছেড়ে আসার পর সেই যে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে মুকুন্দ তারপর থেকে আজ প্রায় কুড়ি বাইশ বছর পার হয়ে গেল, কোথাও যায়নি ওরা। সুখু একবার পুরী যেতে চেয়েছিল! সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল মুকুন্দ, 'বুঝলি সুখু, তোকে আমি দার্জিলিং নিয়ে যাবো। ক্যামুন করে সুয্যি ওঠে তা দ্যাখায়া আনবো।' মুহূর্তের মধ্যে পুরী সে কথায় গুরুত্ব দিয়ে ডাগর চোখ দুটো মেলে ধরে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সুয্যি ক্যামন করে ওঠে বাবা?'

হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল মুকুন্দ, 'ভগমানের হাতে একটা মেশিন আছে, লাটাই-এর মতন দেখতি সেই মেশিন। যেমন, লাটাইয়ে সুতো গোটায়, সুতো ছেড়ে দ্যায়, তেমনি করে ভগমান ওই মেশিনডারে ঘোরায়। ফলে পাহাড়ের গা ঘেঁষে সুয্যি ওঠে, উঠতি উঠতি আবার পশ্চিমে ঢলে পড়ে, তখন আর এক ভগমান ওই সুয্যিডারে নিয়ে লোফালুফি করে—ফুটবলের মত শট্ মাইরে সুয্যিডারে বিলাত পাঠাইয়ে দ্যায়...'।

বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইতো তখন সুখুর। মাথার ভেতর থেকে তখন পুরীর কথা, সমুদ্রের ঢেউ-এর কথা হারিয়ে যেতো। মুকুন্দর গা ঘেঁষে বসে গাঙের গন্ধ নিতো। বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই কী রকম ফাঁকা হয়ে গেল। পা দুটো অসম্ভব ভারী, মাথার ভেতরে অনেক রকমের শব্দ বন বন লাটুর মত পাক খেতে লাগল। কি মনে করে জিগা গাছটার নিচে বসে হাঁপাতে থাকল মুকুন্দ।

কারখানায় আর যাওয়া হলো না তার। সময়ের কাঁটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে। গাছের নিচের ছোট্ট ছায়াটা সরে গিয়ে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে ভরে গেল। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী কেমন চোখে মুকুন্দর দিকে চেয়ে থেকে এগিয়ে গেল কোন কথা না বলে। পা পুড়ে যাচ্ছিল রোদ্দুরে। কী মনে করে উঠে পড়লো সেখান থেকে। এই দীর্ঘ সময় সে এখন কিভাবে কাটাবে? বাড়ি ফিরে যাবে কী না ভাবল একবার। লীলাবতীর কথা মনে পড়তেই একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ওকে ছুঁয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে লীলাবতীর জন্য অসম্ভব এক কষ্টে ছেয়ে যেতে লাগল মনটা। অবশেষে বাড়ির দিকেই পা বাড়াল মুকুন্দ। ওকে এই অসময়ে দেখতে পেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল লীলাবতী। মুকুন্দ পকেট থেকে সুখুর ছবিটা বের করে বলল, 'এটা যেখানে ছিল সেইখানেই রেখে দাও সুখুর মা! এতদিনে সুখু অনেক পাল্টে গ্যাছে'।

মুকুন্দ দেখতে পেলো, লীলাবতীর প্রসারিত হাতটা তখন অসম্ভব কাঁপছে।

আপনার সুন্দর চুল প্রকৃতির দান...
হেলোর যত্নে এ সৌন্দর্য রাখুন অম্লান

কেবল হেলো শ্যাম্পুগুলিতেই আছে নিখুঁত সুষম ফর্মুলা—
ঠিক আপনার মত চুলের যত্নের জন্যে

HSR. GL 74

হেলো কসমেটিক শ্যাম্পু
এই বিশিষ্ট সুষম ফর্মুলা ব্যবহার করে দেখুন—আপনার চুল কত বেশী নরম, রেশমের মত চিকন হয়ে ওঠে।

হেলো এগ শ্যাম্পু
বাড়তি গুণে সমৃদ্ধ এগ প্রোটিন যুক্ত এক বিশেষ ফর্মুলা—আপনার চুলে প্রাণ আর রূপের সঞ্চার করে।

হেলো লেমন-ফ্রেশ শ্যাম্পু
আপনার চুলকে করে তোলে সহজাত সৌন্দর্যে দীপ্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল।

হেলো কনসেন্ট্রেট শ্যাম্পু
রাশি রাশি সমৃদ্ধ ফেনার জন্যে একটুখানিই যথেষ্ট। ফলে চুল নরম থাকে, আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে।

স্বাভাবিক সুস্থ চুল চান তো—আজই যত্ন নিতে শুরু করুন হেলো দিয়ে

অপুষ্ট শিশু এবং ভিটামিন বি-৬

শিশু বিজ্ঞান

অপুষ্ট শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ভিটামিন বি-৬-এর অভাব। উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-৬ না পেলে, ওই সব শিশুর দেহ স্বাভাবিক হারে বেড়ে উঠতে পারে না। তারা মানসিকতার দিক দিয়েও স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ে। এমন কি জড়বুদ্ধি সম্পন্নও হয়ে যেতে পারে। শিশুপুষ্টির ক্ষেত্রে ভিটামিন বি-৬-এর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটির কথা সম্প্রতি প্রমাণ করেছে অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুক ইউনিভার্সিটি ক্লিনিকের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টি-বিজ্ঞানী ডঃ লোথার রিনকেন এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ। অস্ট্রিয়ান পেডিয়াট্রিক সোসাইটি এই আবিষ্কারের জন্যে ডঃ রিনকেনকে ক্লেমেনস ফন পিরকুয়েট পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

ভিটামিন বি-৬-এর আর এক নাম অ্যাডারমিন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির প্রয়োজন হলেই বিশেষ এই ভিটামিনটির ডাক পড়ে। শিশু যখন ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের পেটের মধ্যে থাকে তখন ভিটামিন বি-৬-এর অভাব ঘটলে সেই ভ্রূণ যথাযথ পুষ্ট হতে পারে না। এবং জন্মের পর এই ভিটামিনটির অভাব ঘটলে শিশুর দেহ ঠিকমত বেড়ে উঠতেও পারে না। উল্লেখ্য, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশুর যে ওজন থাকে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পাঁচ মাস পর সেই ওজন বেড়ে দাঁড়ায় তার প্রায় দ্বিগুণের সমান। ভিটামিন বি-৬-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—রক্তের লোহিত কণিকায় লোহার রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটানর ব্যাপারেও এই বস্তুটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ডঃ রিনকেনের আবিষ্কার : ভিটামিন বি-৬-এর অভাব ঘটলে ভূমিষ্ঠ শিশুদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয়। নবজাতক বা জাতিকার ওজন ২৫০০ গ্রামের কম হওয়াটা বিপজ্জনক। ওই ধরনের শিশুদের অনেক সময় বাঁচিয়ে রাখাই দায় হয়ে পড়ে। যদিও বা বাঁচিয়ে রাখা যায়, বিপদ কিন্তু কাটে না। সামান্য কারণেই তারা অসুস্থ হয়। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শীর্ণ দেহ এবং অস্থিসার। সেই সঙ্গে এসে জোট বাঁধে রক্তাল্পতা রোগ। একটু বয়েস বাড়লেই তাদের মধ্যে একে একে নানা বাঁধে আরও কিছু কিছু উপসর্গ। তখন তাদের কথার জড়তা। পরিষ্কার করে পড়তে পারে না। বোকাটে হয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ে। কখনও বা নানা রকম মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সব শিশুর ওজন জন্মের সময় কম থাকে তাদের গড়ন স্বাভাবিক শিশুর মত করে তুলতে সাত বছরেরও বেশি সময় লাগে। কখনও বা তাদের একেবারেই স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হয় না। ফলে পরবর্তী জীবনটি তাদের কাটে নিয়মিত মানসিক অবসাদ এবং নানা রকম রোগের শিকার হিসেবে। অসমর্থ দেহ এবং মন নিয়েই তখন তাদের বেঁচে থাকা। ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং মন কখনই তারা আর ফিরে পায় না।

ডঃ রিনকেন এ ব্যাপারে মায়েদেরই দায়ী করেছেন বেশি। তাঁর বক্তব্য, সন্তান ধারণ করার পর দেখা যায়, অনেক মেয়ে [illegible] যেগুলি। ফলে গর্ভধারণ-কালীন অবস্থায় যেভাবে হোক উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-৬ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার এমনও হতে পারে, মা হয়ত ভিটামিন বি-৬ বঞ্চিত খাবার খাচ্ছেন না। এ সব ক্ষেত্রে সন্তানসম্ভবা মায়েদের দৈনিক তিন মিলিগ্রামের মত ভিটামিন বি-৬ খাওয়া দরকার। এতে করে ওজন এড়ান সম্ভব হতে পারে। অবশ্য এমনও হতে পারে, সন্তান ধারণ করার পর কোন মা হয়ত উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-৬ খাচ্ছেন, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, ওই মায়ের শরীরে এমন কিছু জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে যা এই ভিটামিনের ক্ষমতা অকেজো করে দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার।

শরীরে ভিটামিন বি-৬-এর ঘাটতির

শতকরা [illegible] হয়ে ওঠে [illegible] চায় [illegible] একশ বছর আগে এ বয়সে [illegible] বছর বয়েসের আগে সচরাচর ঘটত না।

ডঃ [illegible] বলেছেন, [illegible] ইউরোপেই যে এমন ঘটনা ঘটছে তা নয়। পৃথিবীর সব দেশেই ঘটছে। [illegible] যুদ্ধ এবং [illegible] সময় [illegible] রোগের প্রাদুর্ভাব [illegible] মেয়েদের [illegible]

এক নম্বর

কয়েক সপ্তাহ আগে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির কাজ শেষ করেছেন সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞানীরা। মস্কো থেকে এ পি এন জানিয়েছেন, [illegible] এই দূরবীনের আলোক সংগ্রাহক দর্পণটির ওজন ৪২ টন। ব্যাস ৬ মিটার। মার্কিন দেশের প্যালোমার পর্বতের ওপর বসান ৫ মিটার ব্যাসের সংগ্রাহক-দর্পণবিশিষ্ট দৈত্যাকার দূরবীনের চেয়ে নতুন এই দূরবীনের মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা প্রায় দেড় গুণ বেশি। এর দর্পণটিকে তৈরির জন্যে প্রথমে নিতে হয়েছিল ৭০ টন ওজনের একটি দৈত্যাকার কাচের টুকরো। দূরবীনটির মুখ্য পরিকল্পক বাগদ্রাত আইওআন্নিসিয়ানির মতে, এত বড় কাচের খণ্ড নিয়ে পৃথিবীতে এর আগে আর কোনোও কাজ করা সম্ভব হয়নি। ৭০ টন সেই কাচের পিণ্ডকে ঘষে ঘষে অনেক সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। ৭০ টন কাচের পিণ্ড থেকে ঘষে পুরো ২৮ টন কাচ বাদ দেওয়ার কথা যেন ভাবাই যায় না। এই ঘষার কাজটির জন্যে দরকার হয়েছিল প্রায় ১৫০০০ ক্যারেটের মত হীরে। উল্লেখ্য, ইউরোপের বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস-কোপ বা আলোক-দূরবীনটি বসান হয়েছিল ক্রিমিয়ার ১৯৬০ সালে। নতুন এই দূরবীন তার সে গৌরব ম্লান করল। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সুদূরতম গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি এবং জন্মরহস্য জানার ব্যাপারে এটি যথেষ্ট সাহায্য করবে।

না। মানসিকতা অবদমিত হয়ে পড়ে। গত তিন দশক পৃথিবীতে ব্যাপক কোন যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষ না হওয়ার দরুন মোটামুটি-ভাবে খাবারের অভাব হয়নি। এ ছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে দুরারোগ্য ব্যাধিরা এখন দূর অস্ত্। সন্তান প্রসবের সময় আগে যত বেশি ক্ষতি পোহাতে হত, এখন তত হয় না। ফলে জন্মমুহূর্তের দুর্বলতার হাত থেকেও এখনকার শিশুরা অনেকটা রেহাই পেয়েছে। এখনকার শিশুদের ভাল স্বাস্থ্য, বড় গড়ন এবং দ্রুত মানসিক উন্মেষ হয়ত এ সবের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

সমরজিৎ কর

এভারেডী
ডবল এ্যাকশন
৯৫৫
EVEREADY
TRADE MARKS
DOUBLE ACTION
955
টর্চের জন্ত আদর্শ
ট্রানজিসটারের জন্ত নিরাপদ

॥ ছেচল্লিশ ॥

পুরোনো জুতো জোড়া
ড়ে গেছে। পাটনা-পট্টিতে বেশী
ছু নেই। অন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস যখন
তত তখনো ওর কিছু শৌখিন জিনিস
ম। ক্যামেরা, একটা টেপ রেকর্ডার,
ী কিছু স্যুট ঘড়ি। তার বেশির ভাগই
হয়ে গেছে। রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকত
লেটা কিংবা ধর্মশালায়, শ্মশানে। সেই
য়েই গেছে। বাকি যা ছিল তা বিলিয়ে
য়েছে কাঙালদের। এখন ওর যা কিছু
ম্পত্তি তা একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা
গে এঁটে যায়।

সোমেনের বাড়িতে দু রাত্তির কাটিয়ে
লবেলায় ব্যাগটা গুছিয়ে নিল ম্যাক্স।
মেন তাকিয়ে দেখছিল। একটা দাঁত
জার ব্রাশ। একটা বাড়তি পায়জামা, একটা
ড়োর গামছা, একটা গেঞ্জী, একটা
াবি দুটো ডায়েরী আর তিনটে কি
টে ডট পেন। বুক পকেটে পাশপোর্ট
ক একটু প্লাস্টিকের ফোল্ডারে, তাতেই
জা আছে কিছু টাকা, গায়ের পাঞ্জাবির
কটে একটা রুমাল, কিছু খুচরো পয়সা
লাই আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট,
প্যাকেট সস্তা-চুয়িং-গাম। বাস। এত
ল্প একটা লোকের চলে কি করে! ম্যাক্স
উঞ্ছবৃত্তি শিখল কোথায়?

মাকে বলল—মা, চললাম। বউদিকে
ল, বউদি আসি। দাদার কাছ থেকেও
দায় নিল। বাচ্চাদের কাছ থেকেও।

সোমেন, ও খানিক দূর এগিয়ে দেবে
ল সঙ্গে চলল। রাস্তায় নেমেই ম্যাক্স
ড়া স্যান্ডেল জুতো জোড়া পা থেকে
লে সোমেনকে দেখিয়ে বলল—
ল ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সোমেন বলল—আমার বাড়তি এক-
জোড়া আছে, পরে যাও।

ম্যাক্স মাথা নাড়ল, নো। এই ভাল।
ারতবর্ষের সঙ্গে এই শেষ কটা দিন আর্থ

কন্ট্যাক্টে থাকি। ইট ওয়াজ ইজ এ গুড
কান্ট্রি।

সোমেন ভারতবর্ষ কি তা জানে না।
শুনেছে, এ এক মহান দেশ, সে এক সমৃদ্ধ
সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু সোমেনের
কোনো ধারণা নেই, সে কিছু বোধ করে
না। তবু ম্যাক্স যখন ঐ কথা বলল তখন
তার বুকের মধ্যে এক ঘুমিয়ে থাকা
দেশপ্রেম যেন আধো জেগে উঠে একটু
অস্পষ্ট কথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমেন বলল—কোথায় যাবে?

খালি পায়ে বেলা কলকাতার অকারণের
রোজে পীচের ওপর হাঁটতে হাঁটতে ম্যাক্স
একটু অন্যমনস্কভাবে বলে, কলকাতায়
যখন প্রথম এলাম তোমাকে বলেছিলাম, এখানে
ভিখিরি আর অভাগাদের দেখে আমি পাগল
হয়ে যাই। প্রথম কয়েক মাস আমি লেখা-
পড়া করতে পারিনি; আমি খুব অবাক
হয়ে যাই দেখে যে, এই রকম জঘন্য
যেখানকার সামাজিক অবস্থা, সেখানে
যুবক যুবতীরা প্রেম করে বেড়ায় সিনেমা
দেখে, সাজপোশাক করে। বড়লোকেরা
নির্বিকারভাবে বিদেশী গাড়ি চড়ে ঘুরে
বেড়ায়। আর কেউ কেউ দেশের অবস্থায়
দুঃখিত হয়ে চায়ের দোকানে বসে মাথা-
গরম করা তর্ক করে। ঐ অবস্থায় আমি
পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতাম, একজনও
ভারতীয় আছে কি না যে দেশের
জন্য কিছু ভাবছে বা করছে। অনেক খুঁজে
আমি একজনকে পেয়েছিলাম। সত্যিকারের
একজন ভারতীয় এবং দেশপ্রেমিক। মাদার
টেরেসা। আমি আজকাল তোমাদের
জন্মান্তরে বিশ্বাস করি সোমেন। আমার
মনে হয় মাদার টেরেসাই হচ্ছেন মেরী
ম্যাকডেলীন, আর আমরা যত হতভাগা
আছি সবাই তাঁর খৃষ্ট। আমি তক্ষুনি তাঁর
দলে ভিড়ে যাই। সে সময়ে আমি তাঁর

ব্রীজের গোড়া পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল সোমেন। আর কাছে উঠল না। খালি পায়ে ব্রীজের চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল—আজ বড় ভাল দিন, না?

রেলিঙের ধার ঘেঁষে উঠে দাঁড়াচ্ছিল ম্যাক্স। নীল আকাশের গায়ে ওর মাথা। সোনালী বড় বড় চুল হাওয়ায় উড়ছে। সোমেন সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটুক্ষণ। হঠাৎ আবেগে চোখে জল আসে, গলা রুদ্ধ হয়ে যায়। সে নিজে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেনি।

রিখিয়ার জন্য রেডটা পকেটের মুখে রেখে দিল সোমেন। ফেলল না। স্ট্রাইকার ভুল জায়গায় লেগে ঘুরে চলে গেল অন্য দিকে।

রিখিয়া নিবিষ্ট মনোযোগে চেয়েছিল গুটিটার দিকে। সোমেন পারল না দেখে মুখ তুলে বলল—ইস্‌, পারলেন না! বলে একটু হাসল।

সোমেন মাথা নাড়ল দুঃখিতভাবে। স্ট্রাইকার এগিয়ে দিয়ে দেখল রিখিয়ার মুখখানা। ও কি এখনো বালিকা! লাল গুটিটার জন্য কী শিশুর মতো লোভ ওর! বয়সকালের আগুনগুলি এখনো জ্বলে ওঠেনি ওর ভিতরে! শৈশবের তুষ ঢেকে রেখেছে সেই তাপ। বড় ছেলেমানুষ। পকেটের মুখে আলগা হয়ে বসে আছে গুটিটা, রিখিয়ার দিকে চেয়ে হাসছে, টোকা লাগলেই পড়ে যাবে।

রিখিয়া স্ট্রাইকার বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে।

সোমেন গম্ভীরভাবে বলল—দেখো, ডবল ফাইন কোরো না।

রিখিয়া টোকা দেওয়ার মুহূর্তে থেমে মুখ তুলল। ভ্রূ কোঁচকাল। স্ট্রাইকারটা সরিয়ে দিয়ে বলল—খেলব না আপনার সঙ্গে।

—কেন, কী হল?

—ডবল ফাইনের কথা বললেন কেন? এখন ঠিক আমার ডবল ফাইন হবে।

এই বলে গম্ভীর রিখিয়া নিজের হাতের নোখ দেখতে লাগল। মুখখানা কান্নার আগেকার গাম্ভীর্যে মাখা।

সোমেন খুব শান্ত গলায় বলে—হলেই বা কি! যখনই হোক রেডটা তুমি ঠিক ফেলতে পারবে।

রিখিয়া সতেজ গলায় বলে—আমার জন্য 'রেড' বসে থাকবে, না? আর একটা চান্স পেলেই তো আপনি ফেলে দেবেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলল—কোনোদিন পারিনি। আমার রেড অ্যালার্জি আছে, নার্ভাস হয়ে পড়ি।

লম্বা সোফার ওপর একটা মেয়ে শুয়ে এতক্ষণ কাগজের স্টেটসম্যান, ফেমিনা, ফিল্ম ফেয়ার আর ইলাস্ট্রেটেড উইকলি একগাদা নিয়ে ডুবেছিল। সে সোমেনকে ফিরেও দেখেনি এতক্ষণ। বোঝা যায়, ও বড় ঘরের মেয়ে। ফর্সা আদুরী-আদুরী চেহারা, চোখে বিশাল ফ্রেমের চশমা, পরনে বেলবটম আর কামিজ, রিখিয়ারই বয়সী। ওর বন্ধু-টন্ধু কেউ হবে। এবার সে মুখের সামনে থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে বলল—অবজেকশনেবল। রেড অ্যালার্জি কথাটা ভীষণ অবজেকশনেবল।

অবাক হয়ে সোমেন বলে—কেন?

মেয়েটা তার গোলপানা মুখটায় বিরক্তি ঘেন্নার ভাব ফুটিয়ে যেন বাথরুমের গন্ধ শুঁকে বলল—ইট স্টিংকস উইথ ব্যাড পলিটিক্স। আপনি রি-অ্যাকশনারী।

সোমেন অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখছিল। উত্তর দেবে কি দেবে না, তা ঠিক করতে পারছিল না। অতটুকু মেয়ে!

রিখিয়া তার ডান হাতটা নাড়ছিল, আঙুলগুলো টেনে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল রেড ফেলার আগে। সোমেনের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল—মধুমিতা না ভীষণ [illegible] আছে। ও [illegible] ছিল, আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়েছে।

সোমেন ঘাড়টা কাত করে বলে—আঃ! আজকাল সবাই দেখছি পলিটিক্স করতে আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়। আন্ডারগ্রাউন্ডে কি আছে?

মেয়েটা হাতের ম্যাগাজিনটা সশব্দে বন্ধ করে টেবিলে রেখে সিগারেটের প্যাকেট তুলে বসে। পর্দাটা উড়ে এসে ঝুলে পড়ে। বুকের ওপর থেকে বেণীটা পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—মোটেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাইনি, অপরাজিতা। সবাই জানে সে সময়ে আমি বাপির সঙ্গে জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জাস্ট এ স্টিংকিং লাই।

সোমেন বুঝল, মেয়েটা স্টিংক কথাটা ব্যবহার করতে ভালবাসে। ও বোধ হয় ওর চারদিকে একটা পচা পৃথিবীর দুর্গন্ধ পায় সব সময়ে। এতক্ষণ মেয়েটার গোলপানা মুখ আর আদুরী চেহারার মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন হঠাৎ তার ফর্সা মুখে রাগের একটা আগুনে রঙ যখন ফুটে ওঠে, দুটো ভ্রূ যখন দুটি নিক্ষিপ্ত তীরের মতো মুখোমুখি পরস্পরকে চুম্বন করে

তারে, ক্যারমের বোর্ডের মতো, একটি লিমা মেতে উঠেছে, তখনই তার ক্যারুম বাঁধনের সেইসব মুহূর্তে উঠল। মেয়েটা যে ঠিক ঐ মেয়েদের মতোই নয়, তা চেহারা পরেই কেমন যেন দিল। সোমেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যজনের চেয়ে কয়েক পলক বেশী চেয়ে রইল সে।

তখন ঋিখিয়া হঠাৎ গম্ভীর মুখে স্ট্রাইকারটা বোর্ডে রেখে বলে উঠে—'রেড' ফেলেছি কিন্তু।

সোমেন চোখ সরিয়ে এনে বলে—ও! হ্যাঁ!

ঋিখিয়া গম্ভীর মুখেই বলে—তখন ফাইন হলে কী হবে?

সোমেন বলে—দুটো সাদা গুটি উঠবে, আর রেড।

ফের স্ট্রাইকার থেকে হাত সরিয়ে ঋিখিয়া বলে—মোটেই না।

—তবে?

—একটা সাদা গুটি, আর রেড।

সোমেন মাথা নাড়ে—উঁহু, দুটো সাদা আর রেড।

ঋিখিয়া কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—ইস্, বললেই হল! এই মধুমিতা, তুই বল তো! রেড আর স্ট্রাইকার পড়লে......

মধুমিতা আবার শুয়ে পড়েছে, একটা হাঁটুর ওপর অন্য পা নির্লজ্জভাবে তোলা, মাথার নীচে একটা হাত, অন্য হাতে ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের আড়াল থেকেই বলল—জানি না। ক্যারম নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

ঘরে আর কেউ নেই। ঋিখিয়া আর কার কাছে নালিশ করবে! নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে সে অসহায়ভাবে সোমেনের দিকেই তাকাল। সোমেন মৃদু হেসে বলল—আচ্ছা আচ্ছা। একটা সাদা, আর রেড।

ঋিখিয়া হাসল না, খুশিও হল না। থমথমে মুখ। স্ট্রাইকারটা ফের সরিয়ে দিয়ে বলে—আগে কেন বললেন না!

বলেই হঠাৎ মধুমিতার দিকে ফিরিয়ে বলে—তুই বুঝি অ্যাকশন করিসনি! স্কুলের ক্লাসরুমে যাও সে-ক্লাবের টেনিসের ছাপ দিয়েছিল কে?

মধুমিতা একবার অবহেলাভরে তাকিয়ে বলে—তাতে কি! ওটা বুঝি অ্যাকশন! তা হলে ক্যারম খেলাটাও অ্যাকশন। যাঃ!

ঋিখিয়া চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। সোমেন অপেক্ষা করে। ঋিখিয়া কি ভেবে হঠাৎ নীচু হয়ে স্ট্রাইকার বসিয়ে পাকা ফলের মতো পকেটের মুখে ঝুলে থাকা রেডকে ফেলার জন্য টোকা দিল। সোমেন অবাক হয়ে দেখল, ঋিখিয়া ঠিক ডবল ফাইন করেছে। পট্ পট্ করে রেড আর স্ট্রাইকার চলে গেল পকেটে।

দুঃখিত সোমেন ঋিখিয়ার দিকে তাকাল না। রেড আর সাদা গুটি তুলে চমৎকার

এখন! ডিপিঁর জেলী ক্রিস্টালে ফলের সত্যিকারের
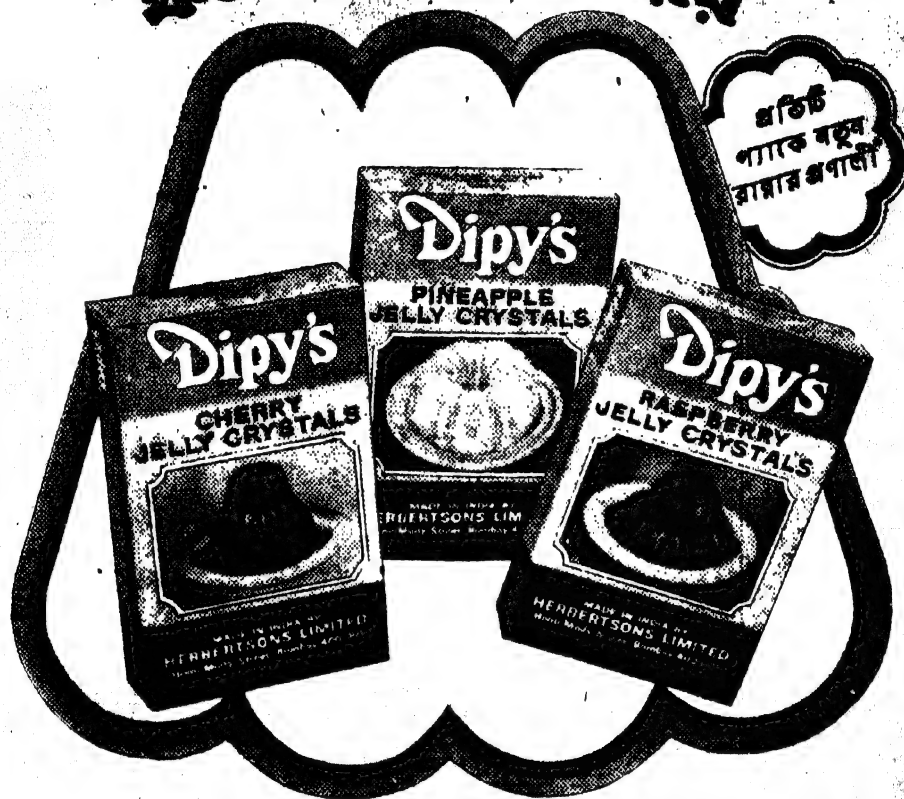
স্বাদগন্ধ আস্বাদন করুন!

সম্পূর্ণ ভরসা করে ডিপিঁর জেলী পরিবেশন করুন—কারণ, এখন তাতে পাবেন ফলের সত্যিকারের মুখরোচক স্বাদগন্ধ। প্রকৃতির শক্তি সীমিত—শুধু বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ ফল। কিন্তু ডিপি আপনাদের প্রিয় ফলের স্বাদগন্ধ জেলী ক্রিস্টালে সঞ্চিত করে রাখে, যাতে বছরের সব সময়ে আপনি তা পেতে পারেন। ডিপিঁর রকমারি জেলী ক্রিস্টাল এখন পাওয়া যাচ্ছে ছ'টি ফলের স্বাদগন্ধে—রাসবেরী, স্ট্রবেরী, চেরী, পাইনঅ্যাপেল, লেমন ও অরেঞ্জ।

ডিপিঁর

• শুধু বোম্বাই, দিল্লী ও কলকাতায় স্টক থাকা পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

॥ [illegible] ॥

দাঙ্গার চরম অবস্থায় বিদেশী ...করা কলকাতায় মিলিটারি নামাতে বাধ্য ছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবদুষ্ট দেশী ...লসের ওপর ততটা আস্থা রাখা যাচ্ছিল কেননা, হিন্দু এলাকায় হিন্দু পুলিসের ...ক্রিয়তায় তাদের চোখের সামনেই ...লিমরা নিহত হচ্ছিল আর মুসলিম ...রাগুলিতে মুসলমান পুলিসের সহায় ঠিক না হলেও, নিদারুণ অপক্ষপাতে ...রো ঘায়েল হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও তার ...না প্রতিকার ছিল না।

এমত অবস্থায় কেল্লার থেকে সম্প্রদায় ...পেক্ষ গোরা সোলজারদের নামানো হল ...তার।

সাঁজোয়া গাড়ি করে পরের পর তারা রাজপথে পাড়ি দিয়ে যেত—নির্বিচারে ...ন ছুঁড়তে ছুঁড়তে, কত যে হতাহত হত ইয়ত্তা হয় না। তাদের সামনে ...লে আর রক্ষা নেই। অলিগলির পথে ...জোয়া গাড়ি ঢোকে না। সেখানে তার ...কজন মিলে গাড়ি থেকে নেমে বন্দুক ... টহল দিয়ে যেত—কারণে অকারণে এ...ল ছুঁড়তে ছুঁড়তেই।

একদিন বিকেলে আমার ঘরের আধ...ন্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ার পরিস্থিতি পর্য...শ করছি এমন সময়ে গলির এক ...ণের থেকে বন্দুক হাতে কয়েকটি লাল ...র আবির্ভাব দেখা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ...র সব বারান্দার থেকেই কৌতূহলীর ঘরের ভেতরে অন্তর্হিত হয়েছে, আমি ...তু ভেতরে সেঁধোবার কোনো প্রয়োজন ... করিনি। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ...বিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে ...দের বন্দুকভ্রষ্ট, সম্ভবত আমার ...দেশেই নিক্ষিপ্ত একটি গুলি ছুটে... ...গে আমার কানের পাশ ঘেঁষে পিছনের ...লে এসে বিদ্ধ হোলো।

এই রকমই হয়ে থাকে। এরকমটাই হবার। ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে বেশ জানা ছিল আমার। গোলা গুলি ইত্যাদি সব রগ ঘেঁষে চলে যাবার, যাগত হবার কোনো কারণ না ঘটিয়ে।

পরছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে এখনো আমি মাঝে মাঝে বারান্দার সেই নামমাত্র ছিদ্রটুকু লক্ষ্য করি। আর মনে মনে তারিফ করি নিজের। হুম্, কী নির্ভীকই না ছিলাম তখন।

নিজের বাহাদুরি নিয়ে নিজেকে বাহবা দিতে বাধা কিসের!

কেবল নিজের বাড়ির আওতায় দাঁড়িয়ে নয়, যাওয়া আমার পথেও কতোবার যে ওদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সওয়ার বাহিনী সাঁজোয়া গাড়ি [illegible] দিয়ে বেরিয়ে [illegible] যে কোনটা এসে পড়ত তার কোনো [illegible] [illegible] ছুঁড়তে আসতো, দূরে থেকে তাদের দেখা মাত্রে পথিকরা সব অদৃশ্য হয়ে যেত। যে যেখানে পারে, সুবিধে মতন সটকে পড়ত ইতস্তত।

কিন্তু ঐ [illegible] একবারো আমায় পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। ওদের সামনে দিয়েই যেখানে যাবার আমি চলে গেছি ঠিক। পালিয়ে যেতে হয়নি আমার।

একবার তো—একেবারে ওদের মুখো-মুখিই পড়ে গেলাম।

মহাজাতি সদনের এধার দিয়ে সামনের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু উৎরে বড়বাজার পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছিলাম। এদিকে মেছোবাজার স্ট্রীটের মোড় ঘুরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুয়ে এসে পড়ল মিলিটারি গাড়িটা—প্রায় সামনাসামনিই বলা যায়—একেবারে আমার এক ফার্লং-এর ভেতর। রাস্তার দু ধারের লোকজন দেখতে না দেখতে বেপাত্তা। কে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল তার কোনো হদিশ নেই।

আমি কিন্তু থামলাম না। পালাবার

তো কথাই নেই, যেমন বাগবাজার, রাস্তা ভেদ করে ওখানের কড়াইবাবে [illegible] উত্তীর্ণ হলাম। আনাচে কানাচে [illegible] অলিতে গলিতে আঁকাবাঁকা রাস্তায় [illegible] উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যারা আমার এই হঠকারিতা দেখছিল, পদেপদে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত কি হতাহত দেখবার আশা ছিল যাদের, শেষ পর্যন্ত তাদের কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে।

তেমন কিছুই হল না। সাঁজোয়া গাড়িটা আমাকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, আসছিল যেমন, আমার পাশ কেটে বেরিয়ে গেল তেমনিই।

আমার দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠায় আমি নিজেই চমৎকৃত। কিন্তু সত্যি বলতে, সাহসিক আমি ছিলাম না কখনই! নির্ভীক তো নয়ই। পুলিশের গুলিতে ভয় না থেকেও সামান্য আরসোলা থেকে অন্যান্য ভূতকে পর্যন্ত মানুষ ভয় আমার। তবুও অমন বেপরোয়া মৃত্যুর সামনে অটল ঠিক না থাকলেও ওই সময় আমি থেকে গেছি।

না, নির্ভীক আমি ছিলাম না, কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলাম ঠিকই।

এমন কি, সেদিনকার ঐ নকশাল হামলার হিড়িকেও......

আমার পাড়ারই চেনামুখের ছেলেদের দেখেছিলাম সামনেকার দেওয়ালে নকশালী ইস্তাহার লটকাতে দস্তুরমতন লাল সেলাম বাজিয়ে। তারুণ্যের স্বভাবসুলভ উদ্দীপনা বলেই সেটা মনে করেছি।

তখন কলকাতার এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় অবাধ খুন জখমের পাল্লা চলছিল। বেপাড়ায় পা বাড়াতে স্বভাবতই ভয় হত সবাইকার। বিবেকানন্দ রোড বাগবাজার ইত্যাদির অকুস্থানে গিয়ে পড়লে নাকি রক্ষা ছিল না।

[illegible] আমাদের মেরে হচ্ছে [illegible] না হয় [illegible] করেনি তা নয়। [illegible] নিভীক না হলেও [illegible] নিশ্চিন্তই ছিলাম [illegible] কি!

[illegible] আর কিছু না, [illegible] স্বচ্ছন্দ নির্বিবাদ নিরাপদ [illegible] ছোট-বেলাতেই মা আমার শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুই যদি কারো কোনো ক্ষতির চেষ্টা না করিস, কায়মনোবাক্যে কারো কিছু হানির কারণ না হোস তাহলে তোরও কেউ ক্ষতির চেষ্টা করবে না, করলেও, তোর কোনো হানি হবে না। তুই দেখে নিস।

আমি সেটা দেখে নিয়েছি। জীবন-ভোরই দেখছি।

মা বলেছিলেন, তুই যদি কারো ক্ষতি চাস সেটা আসলে তোর নিজের ক্ষতি চাওয়া হবে। তুই ছাড়া আর কেউ তোর ক্ষতি করতে পারে না।

আমরা যখন পরের মন্দ চাই, তাতে পরের এমন কিছু মন্দ হয় না, কিন্তু সেই মন্দ ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রতিহত হয়ে নিজেকেই প্রতিঘাত করে, আর মনের পরি-বেশই তো পরিবেশ, মনের মতই পরিবেশ সৃষ্টি করে, আর তাইতেই মন্দ হয়ে যায়। ভালোর বেলাও ঠিক সেই কথাই। পরের ভালো চাইতে গেলে, চেষ্টায় বাক্যে আর প্রয়োগকর্মের ফলে মনোরূপ, অনুরূপ যোগাযোগ সব হতে থাকে আর তারই যোগ-সাজসে অনিবার্যভাবেই তোর ভালো না হয়ে পারে? নিজের ভালো চাস যদি তো সর্বদা সব রকমে পরের ভালোটা চাইবি। তাহলেই তোর ভালো হবে। সবার ভালো হোক সব ভালো হোক এই হোক তোর জপমন্ত্র।

[illegible] মনে [illegible] সবার [illegible] সেই [illegible] কোনো [illegible] কোনোভাবেই। [illegible] এবং সব [illegible] নানান অসুবিধা ছিল।

কিন্তু মার প্যাঁচটা খাটাতে গিয়েই, তার প্যাঁচেই কি না কে জানে, দেখতে দেখতে চার দিকের কুজ্ঝটিকা কেটে গেল। আলোর উদ্ভাস দেখতে পেলাম। অল্প চেষ্টাতেই সাফল্য ফলতে লাগলো তারপর। আপনাআপনিই, সবাই আমার সুহৃদ হয়ে গেল যেমন!

এর রহস্যটা, মার জবানিতেই জেনেছি, শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে সাক্ষাৎ জগন্মাতার বাণীতেই উদ্‌গীত হয়ে আছে নাকি।

শুম্ভ নিশুম্ভ দেবী দুর্গার সহিত সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিল, সামনা-সামনি তুমি একলা এসো না, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। সম্মুখ সমরে আসছো কী ছচ্ছ তোমার? এতজনাকে সঙ্গে নিয়ে না লড়লে এতক্ষণ আর দেখতে হত না।

হয়েছিল কি, সেই যুদ্ধে মার সঙ্গে লড়ছিল ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি নানান শক্তিরা, সেগুলি তো মারই অন্য রূপ, অনন্য মায়েরই অগণ্য বহু প্রকাশ। কিন্তু ব্যাটা অসুর সে তত্ত্ব বুঝবে কি! তার তলবে মা তখন বললেন, ও, এই কথা! ওসব শক্তিকে আমি এখুনি সংহরণ করছি। বলামাত্রই, ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী প্রভৃতি শক্তিরা এসে মার মধ্যে মিলিয়ে গেল। দেবী দুর্গা বললেন, দেখলে তো, আমি ছাড়া আর কেউই নেইকো কোথাও? 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' আমার অপরা দ্বিতীয় কে আবার?

সেই মার মতই আমরাও। [illegible] দুনিয়াতেও আমি ছাড়া আর কে [illegible] নেই। ভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রত্যয়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এক এবং অদ্বিতীয়—একমেবা-দ্বিতীয়ম্—এই আমিই। সেই সোহম স্বামী!

আমিই আমাকে আঘাত করি পরের মাধ্যমে। পরের অনিষ্ট করি নিজের অনিষ্ট সাধনায়। অপরকে মারবার ইচ্ছা নিজের মৃত্যু ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। আমারই মৃত্যু-ইচ্ছা অপরের মারণেচ্ছার মধ্যে লীলায়িত হয়।

আত্মরক্ষার এই কৌশলেই আমি অব-লীলায় ভাবং আপদ-বিপদ কাটিয়ে এসেছি।

অমৃতস্য পুত্রাঃ পরম অমৃত পিতার অমৃতোপম সন্তান আমাদের একমেবা-দ্বিতীয়ম মায়ের মতই আমরাও একান্তই দ্বিতীয়রহিত।

ক্রমশ

একটি মাইকেলী আবেদনপত্র

নিখিলকুমার নন্দী

যে মনস্বী মহাকবি মধুসূদন দত্তের জন্মসার্ধশতাব্দী ও মৃত্যুশতবর্ষ স্মরণে ১৯৭৪-৭৫ সুচিহ্নিত, তাঁর একটি অত্যুজ্জ্বল আবেদন 'চাকরির দরখাস্ত' আজ থেকে একশ' পনের বছর আগে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের যথোচিত সুপারিশসহ কুচবিহাররাজের কাছে পাঠান হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'মধুস্মৃতি'-র লেখক স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ সোম ইংরেজীতে লেখা মূল দরখাস্তের অংশ বিশেষ যে-মন্তব্যসহ পেশ করেন তা হল : মধুসূদনের কলিকাতা পুলিশ কোর্টে কাজ করিবার সময় কুচবিহার রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এই পদপ্রার্থী হইয়া কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ (এখানে দরখাস্তটি বিশ্বস্ততম বঙ্গানুবাদে উপস্থাপিত হচ্ছে—লক্ষণীয় যে কবির পক্ষে প্রার্থিত পদটি বিচিত্র : পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট; পত্রের বয়ান, শর্ত ও প্রত্যাশা—তার ভাব-ভাষা-ভঙ্গি বিচিত্রতর, কিন্তু সর্বতোভাবে মধুসূদনসুলভ, মাইকেলী-তর্জমায় তা যথাসাধ্য সুরক্ষিত হয়েছে :

মহামহিমবর	কলকাতা পুলিস
কুচবিহার-মহারাজা	২৭শে জানুয়ারি
সমীপেষু	১৮৬০

সুপ্রিয় রাজাসাহেব,

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে দেখছি যে, মহামহিম মহোদয় একজন ম্যাজিস্ট্রেট চান। এই কার্যাপলক্ষে আমার সামর্থ্য প্রমাণের সুযোগদানে মহাশয় অনুমতি দিন। মহোদয় জানেন যে, আমি কয়েক বছর ধরে কলকাতা পুলিশে সংশ্লিষ্ট আছি এবং ফৌজদারি বিষয়গুলি বেশ ভালই বুঝি। বেতন যদি অনস্বীকার্য হয়, অর্থাৎ মহামহিম রাজন্যের পক্ষে প্রদেয় ও আমার ন্যায় ভদ্রলোকের গ্রহণীয়, তা হলে, প্রার্থনা করি, আমায় লিখবেন; আমি যাত্রা করব। মহোদয়ের জানা থাকে যে, আপনার দেশে যেতে হলে আমায় এখানকার সব উন্নতি সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হবে; তাই সে ক্ষেত্রে আপনার দিক থেকে প্রস্তাবটি আমার পক্ষে প্রোৎসাহিত হওয়ার মতো যথেষ্ট লোভনীয় হওয়া আবশ্যক। আপনার স্বয়ংশাসিত রাজ্যের এলাকা জুড়ে এক বছরের মধ্যে আমি এমন এক পুলিশী প্রশাসন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হব যে, মহোদয় ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা লাভ করবেন। তবে আমাকে মহোদয়ের পক্ষে এই রাজোচিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া চাই যে, কোন প্রকার নীতিবিবর্জিত দরবারি চক্রান্ত প্রসূত বিদ্বেষ হেতু কখনও মুহূর্তের বিভ্রান্তবশে বহিষ্কার করা হবে না। মহোদয় নিঃসন্দেহে জানেন যে, এহেন গুরুত্বপূর্ণ পদ কোন বিদ্বান নীতিবুদ্ধিমান ভদ্র ব্যক্তিরই প্রাপ্য এবং অনুরূপ ব্যক্তিমাত্র যে নিতান্ত উদার শর্ত ছাড়া এ দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত হবেন, তা-ও আপনার অবিদিত নয়। সবিজ্ঞাসহ ইতি—

মহোদয়ের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতঃ
মাইকেল এম এস দত্ত

[illegible] কবির বিভিন্ন চিঠিপত্রে আমরা যে [illegible] পাই [illegible] ও তাঁর [illegible] (কেশব [illegible] বিভিন্ন [illegible] ও [illegible] রাজনারায়ণের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন) পুনঃ পুনঃ পাঠে চমৎকার ও অমূল্য রসধারা উপভোগের এই বিশেষ আবেদন-পত্রটির দিকে বর্তমান লেখকের মনোযোগ একাধিক কারণে আকৃষ্ট হয়েছে।

পত্রটি পাঠ করলেই মনে হয় যে, মধুসূদন পত্রটি প্রার্থনাকালে আন্তরিকতা-হীন ছিলেন না, কেনই বা থাকবেন; কিন্তু সচরাচর-পদপ্রার্থীর মতো অত্যুৎসাহী ও ব্যাকুলচিত্তও ছিলেন না। চাকরিপ্রার্থীর কাতরতা ও বিনীত বিগলিত ভঙ্গি এখানে আদৌ অনুপস্থিত। অবশ্য মহারাজা যে সুপারিশকারী বিদ্যাসাগর ও [illegible] মধুসূদনের স্নেহ-প্রীতিভাজন ছিলেন—গোটা পত্রপাঠে তা সুস্পষ্ট। সর্বোপরি মধুসূদন এর চেয়ে আর কী ভাবেই বা চাকরির দরখাস্ত করতে পারতেন—যিনি আত্মসম্মানপূর্ণ, অহংসচেতন, নাটকীয় [illegible] পুরুষ। তাঁর মতো ইতিপূর্বেই

'বিখ্যাত', ডাকসাইটে 'বিত্তবল', প্রতিভা-সমুজ্জ্বল 'অমুদণ্ডী' মাইকেল এম এস দত্ত আজানুকম্পন অনুগ্রহ-প্রার্থনার ভঙ্গিতে সামন্তরাজের কাছে সাগ্রহ-সকরুণ চাকরির উমেদারি করবেন, এ জিনিস অসম্ভব, অবাস্তব, কল্পনাতীত। অথচ মধুসূদনের পক্ষে এ সময়ে বৃহত্তর পদ ও অর্থসংগতির সন্ধান খুবই স্বাভাবিক ও সমীচীন। মাদ্রাজে দীর্ঘকাল 'অনাথ' বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষকতা করে, পুত্রকন্যাসহ বিদেশিনী স্ত্রীর সঙ্গে সংসার নির্বাহে অভিজ্ঞতায় সাংবাদিকতা, পত্রিকা-সম্পাদনার শ্রম-আগ্রহ-সত্ত্বেও, তিনি কলকাতা ফিরলেন রিক্তহস্তে। অধিকন্তু দ্বিতীয়া বিদেশিনী স্ত্রী হেনরিয়েটার নিত্যদিন, দায় ও দায়িত্ব।

অতএব এখানে এসেই তিনি পুরনো প্রভুত্ব বন্ধুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অনুকম্পিতার জন্যে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, হয়েছেন; বেলগাছিয়া থিয়েটারে ইংরেজি 'রত্নাবলী' ও 'শর্মিষ্ঠা'-ঘটিত অপেরা, নাম-যশ তার প্রমাণ; ইতিপূর্বে জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে প্রথমে কলকাতা লালবাজার পুলিশ কোর্টের কেরানি ও পরে 'দোভাষী'র পদলাভ তার প্রমাণ; পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে, যদিচ কোন আশু নিষ্পত্তির সুনিশ্চয়তা নেই। তদুপরি 'শর্মিষ্ঠা' নাট্যাভিনয় ও 'তিলোত্তমা'-ঘটিত অমিত্রাক্ষর সাফল্যের পর পাইকপাড়া রাজাদের কাছে তিনি ইতিমধ্যেই দুটি প্রহসনের বায়না পেয়েছেন, পাথুরিয়াঘাটা 'মরকতকুঞ্জে'র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে 'তিলোত্তমা'র মুদ্রণব্যয়ের আশ্বাস। অথচ তিনি চাকরি করছেন রেভারেন্ড লঙ-এর

তত্ত্বাবধানে—সেই ব্যবস্থায়, যা ছিল—'সো শ্রাড্ লি দি চাইল্ড অ্যান্ড দি ইংলিশ রেস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট...অ্যা এক্সেপশনাল ম্যান টু টার্ন অ্যান এডুকেটেড হিন্দু ইনটু এ মিয়ার মেশিন অ্যান্ড টু মেক হিম মিয়ারলি অ্যান ইমিটেটর......এ কাম্পট'। মধুসূদনের কাজ এতদূর দীনহীন না হলেও তাঁর কৃতিত্ব, গুণাবলী, মেধার তুলনায় এ-কাজ যে তাঁর আদৌ অযোগ্য, তার যথাযথ বর্ণনা দিয়েছিলেন স্বগত কিশোরীলাল হালদার, যে ১৮৯৩, দি নাশনাল ম্যাগাজিনে: (তর্জমা বর্তমান লেখকের): 'বায়রন ও স্কটের মতো যিনি কবিতা লিখতে সক্ষম, সমীচিত সামর্থ্য ও সাফল্যে যিনি ইংরেজিতে পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তেমন ব্যক্তির জন্য কিনা এহেন কর্ম উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল। নিঃসন্দেহে গুণসম্পন্ন এই মানুষটির কোন গুণগ্রাহী তথা প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক মিলল না। অথচ তাঁর কয়েকজন সমকালীন তাঁর প্রতিভা ও ক্ষমতার এক-দশমাংশেরও অধিকারী না হয়ে একই সময়ে সরকারী দাক্ষিণ্য ও পোষকতার রৌদ্রস্নান করছিলেন। কিন্তু এর থেকে কোন পরিত্রাণের উপায় নেই: চাকরির অভিশাপ এমনিই; স্নেহ-সুপারিশ-ক্রমেই 'পাত্র' নির্বাচন (তথা 'পদস্থতা') ঘটে।' একই দেশ-কাল-পাত্রের সুস্পষ্ট চেহারা, অমোঘ চিত্র মধুসূদনের দুরবস্থার সমকালীন ১৮৬০ একুশে জানুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক বিপ্লুত হরিশ মুখোপাধ্যায় বিবৃত করেছিলেন: 'রাজনৈতিক ক্ষমতায় অনুপস্থিতি ও সেই সঙ্গে জীবনোন্নতির অনটন, তার পথ ও উপায়হীনতা এদেশীয় সকলের স্ব স্ব যাবতীয় গুণাবলী বস্তুগতভাবে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে।...যতদিন পারিতোষিক আয়ত্তে, ততদিন আশা আকাঙ্ক্ষা কুলপ্লাবী, কর্মোদ্যম প্রচুর ও তৎপর...মন সম্প্রসারণশীল, চিত্ত ঊর্ধ্বগামী, কিন্তু উন্নতি-সম্ভাবনা যখন রুদ্ধ, তখন সমস্তই ক্রমে অসার ও শূন্য। বাঙালী কৃতিকীর্তির লক্ষ্য উন্মুক্ত দেখে ধাবিত হয়....বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে (অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতায়) দ্যাখে: দ্বার বন্ধ, শক্তিস্ফূর্তি শিথিল, নত ও বিগতপ্রায়। মেধা ও মননশক্তির ক্ষয় হতে থাকে কেরানিগিরির ঘষটানিতে অথবা অন্যতর পথ বিপথ চলার হীন ছলনায়, চতুর প্রযত্নে। দুষ্টতর প্রভাবে—প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত স্বকীয়তা উৎকণ্ঠায় বিনষ্ট হতে থাকে, অথচ সুযোগ পেলে একই মৌলিক শক্তি ও মননক্ষমতা বৃহত্তর মহত্তর জীবন-যুদ্ধে না জানি কত বিস্ময়কর কীর্তির সফলতা স্বাক্ষরিত করতে পারত!...' এই মন্তব্য মধুসূদনের জীবনে কতভাবেই না সত্য হয়ে উঠেছে, প্রকাশিত হয়েছে দীপ্যমান কবিতায়, নাটকে, প্রহসনে সর্বত্র। তাই এহেন অবস্থায় তাঁর মত আত্মপ্রত্যয়ী, আশাবাদী, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বপ্নের (স্বপ্ন যথার্থই অতীতের ও ভবিষ্যতের—অন্তত স্বপ্নে তাঁরা মানুষ নন, না) মেধাবীর পক্ষে তৎকালীন সেই চাকুরে জগতে পদস্থতায় সন্তুষ্ট থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের জানা ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যেমন শেষ ছিল না বিদ্যা ভাঙিয়ে বিত্ত ও প্রতিপত্তি সন্ধানেরও কোনো অন্ত ছিল না—পথ থেকে পথান্তর পরিভ্রমণে, পদ থেকে পদান্তর প্রার্থনায়ও।—তাঁরই ভাষায়: 'অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ/বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।'—সেদিন তিনি ব্যক্তিগত 'অর্থলোভে' ভ্রমণকে দেশকালের অনুযোগ্য "বন্দরে বন্দরে" যথা বাণিজ্যের তরী বলে সমতুল্য, যথা শিক্ষিতজনমানসজাত বর্ণনাই করেছেন। কারণ নেপোলিয়নের উক্তিমত 'দোকানদারের জাত' এসে এদেশে বণিকের মানদণ্ড অচিরকালে অক্লেশে 'রাজদণ্ডে' পরিণত করেছে, 'পোহালে শর্বরী', 'সুবর্ণ পাথর অন্ধকারে', আর সেই বেনেতি কারবারের স্ফীত কলেবর রাজ্য সাম্রাজ্য প্রয়োজনে দেওয়ান-বেনিয়ান নবাব ও নব্য শিক্ষিত কেরানি থেকে দারোগা-ম্যাজিস্ট্রেট তথা মধ্যবিত্ত কেরানি ও আমলা শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে (যে-বৈশ্য রাজতন্ত্রী 'রথের রশি', তার লাভ-লোকসানের জের আজো আমরা টানছি, টেনে চলেছি—অবিশ্রাম গলদঘর্ম গড্ডল প্রবাহে-'চর্মবদল' হয়েছে মাত্র—অবশ্য ইতিহাসেরই বিধানে, 'কালের যাত্রায়'।)—রূপোর চাকা ও চাকতিটিকে এমনই তারা অমোঘ করে তুলে অব্যর্থ বেগে তখন চালিয়ে দিয়েছিল যে সে যুগের মনস্বী রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে মধু-বঙ্কিম সকলেই 'কালের যাত্রী' দলের সম্মুখ সারির নেতৃস্থানীয়রা, সরবীন্দ্রনাথ, স্ব স্ব ভঙ্গি, ভাবে ও উপায়ে বিদ্যাকেই বিত্ত ও প্রতিপত্তির উপকরণ করেছিলেন, জীবন-যৌবন-ধন-মান সম্মোচ্চারিত ওতপ্রোত অনুষ্ঠানে ধ্রুবপদ হয়েছিল। সাধে কি আঠারশ পঁয়ষট্টি সালে ভার্সাই থেকে মধুসূদন গৌরদাসকে লেখেন? (তর্জমা: বর্তমান লেখক) 'তুমি জানো সাহিত্যিক জীবন-যাপনের পক্ষে অনুকূল যথেষ্ট পুঁজিপাটা আমার নেই—বাঁচার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কর্মেও আমি নিযুক্ত নই (বিদ্যাসাগরকে লেখা সমকালীন আরেক চিঠিতে যাকে তিনি 'প্রফেশনাল ফুটিং' বলেছেন—যে বিত্তগত 'স্ট্যাটাস', বস্তুগত 'কেরিয়ারের' যথোপযুক্ত তাঁর 'লোভ' মোহ-বাসনাশা ও প্রার্থনা যেমন কাব্যে নাটকে এই দরখাস্তপত্রেও তেমনি ধ্বনিত—তদবধি এই তো তাঁর শ্রেণী-চরিত্রের মর্মকথা—মর্মব্যথাও বলা যায়) আমি যে

নিতান্তই দরিদ্র—সম্ভবত সর্বসময়ের দারিদ্র্যকে মানতে পারি এমন অনহংকৃত আমি নই, বরং কিরীটী। টাকা—টাকা থাকলে তুমি বড়ো মানুষ, নইলে তুমি সবার কাছেই নগণ্য। আমরা জাতি হিসাবে এখনো অধঃপতিত। আমাদের মধ্যে বড়োমানুষ কারা? চোরবাগান ও বড়বাজারের ভদ্রমানুষরা! টাকা করো ভায়া, টাকা করো'... ইত্যাদি এবং একই পত্রে দুর্মর কাব মধুসূদন অনন্য আবেগে লিখছেন: 'অবশ্যই আমি এখনো রোমান্টিক রয়েছি, তুমি আমার সে-স্বভাব জানো; আমি কিছু কবি তো বটে, আর কল্পনাশক্তির আতিশয্য মানুষকে বাস্তব পৃথিবীর পক্ষে অযোগ্য ও দরিদ্র করে তোলে। আমার স্বপ্ন-দেখা ফুরোয়নি, বাসনাশাও অব্যাহত, অস্পষ্ট আতুর ব্যাকুলতাগুলিও আছে—তেমনিই আছে; কিন্তু আমি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অনেক বেড়েছি' এবং 'আমি আগের মতো সেই বেপরোয়া ভাবনাচিন্তাহীন আবেগতাড়িত লোক আর নই'...ইত্যাদি। কিন্তু ১৮৬০ সনের জানুয়ারিতে তিনি 'জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়' ১৮৬৫-র মতো, 'আত্মবিলাপ' কবিতা ও পত্রাবলীই প্রমাণ, 'অনেক বাড়েননি'; বেপরোয়া ভাবনাচিন্তাহীন, আবেগতাড়িত লোক তো রয়েছেনই এবং স্বপ্ন দেখা ফুরোয়নি, বাসনাশাও অব্যাহত' বটেই—পূর্বোক্ত দেশ-কাল-পাত্রে, 'ব্যবস্থায়' ও তাঁর মতো মানুষের পক্ষে কেনই বা তা না হবে—তাই সেদিন ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬০ ঐ বিচিত্র পদ লাভ তথা লোভনীয় আর ও আরো আরো অর্থ-লাভ যশো লাভের জন্য বুঝি তিনি তখন অতটা ব্যগ্রতা নিয়ে (আতুরতা নিয়ে অবশ্যই নয়—মাইকেলী ইংরেজিতে 'অ্যাস-ওরড্‌লি নট') কুচবিহার রাজের দ্বারস্থ হয়েছিলেন—এবং অতি অবশ্যই তাঁর মতো আত্মপ্রত্যয়ী, ঋজু পুরুষের ভাবে-ভঙ্গিতে, শর্তে ও প্রত্যাশায়। এমনকি সবিশেষ লক্ষণীয় এই যে, 'কোন প্রকার নীতিবিরহিত দরবারি চক্রান্ত প্রসূত বিদ্বেষহেতু' বে-মুহূর্তের-বিজ্ঞপ্তি বলে বহিষ্কার তিনি এই পত্রে আশংকা করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রাগন্তিম কালে পঞ্চকোটে সেখানকার রাজার 'লিগ্যাল অ্যাডভাইসার' হয়ে গিয়ে অল্পদিনেই হাতে হাতে ফলতে দেখেছিলেন—'পূর্ব সত্য দর্শন' ও তার পরিহাস বা জীবিতত্বের আয়রনি এমনি! যা হোক, ঐ একটিমাত্র আবেদনপত্রে আমি আপাতত তাঁর দেশ-কাল-সমাজের ও তাঁর নিজের এই মন ও মানচিত্র সংক্ষেপে পাঠ করলাম। এ বিষয়ে আলোচ্য ও বক্তব্য আরও আছে। তা বারান্তরে পাঠ্য ও প্রদর্শনীয়।

তবে এই সঙ্গে মধুসূদনের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ও 'প্যাট্রন' বিদ্যাসাগরের পত্র, সংযুক্ত সুপারিশটি সবিশেষ উল্লেখ ও নিরীক্ষাযোগ্য মনে করি। তিনি 'রূপ-বাহাদুর সমীপেষু' লিখেছিলেন: 'একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম। দেখিও যেন অভাবে উড়িয়া না যায়।' এটি যাঁর প্রসঙ্গে লেখা ও যাঁর লেখা, তাঁদের মর্জি মেজাজ-মনোভাব, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব স্মরণে রাখলে এই ভাব-ভাষা-বক্তব্যের শ্লেষ, ঔচিত্য ও সঙ্গতি সম্পর্কে কোন অধিকন্তু মন্তব্য, আশা করি, বাহুল্য হবে।

যে কোন কারণেই হোক, কুচবিহাররাজ ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেননি। বিদ্যাসাগর হেন বিরাট পুরুষের সুপারিশ সত্ত্বেও না। তাতে মাইকেলের যে ক্ষতিই হোক, মধুসূদন ও বাংলা সাহিত্যের লাভ হয়েছে কারণ তখন এ উপলক্ষে নবজাগ্রত বাঙালির আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠ, তৎকালীন সমাজ চিন্তা বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র 'কল্লোলিনী' কলকাতাকে ত্যাগ করে তথা ব্যারিস্টারি-চৈতন্যের অবকাশকালে তাঁর তখনো অসমাপ্ত তিলোত্তমা ও প্রকল্পিত প্রহসনদ্বয় এবং অসাধিত পদ্মাবতী-মেঘনাদবধ-ব্রজাঙ্গনা ইত্যাদি ব্যতীত, পাণ্ডববর্জিত এ বিদ্যাবুদ্ধে কুচবিহারে শুধু 'অগ্নি স্ফুলিঙ্গটুকু' টিপটিপ উজ্জ্বল ও প্রজ্বলিত, বড়োজোর কেউকেটা হয়ে উঠত না, 'মহতীর মশাল' হয়ে জ্বলত না—জাতির তিমির হানিবারে; আমরা 'সম বিদ্বজ্জন' মাইকেলকে পেতাম, সম্পূর্ণশ্রী মধুসূদনকে পেতাম না।

আলোচনা

রবীন্দ্র-কবিতা ও গীতবিতান

আপনার সাপ্তাহিকের ১লা মার্চ, ১৯৭৫-এর সংখ্যায় "গীতধর্মী রবীন্দ্র-কবিতা ও গীতবিতান" পড়ে আনন্দ পেলাম। এই আলোচনায় লেখক অত্যন্ত সঙ্গত কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। আশা করা যায় এগুলি নিয়ে বহুধাবিস্তৃত আলোচনা আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকবে এবং তা থেকে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান আমরা পাব।

যে-সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার মধ্যে কোনো কোনোটি নিকট অতীতে পত্রান্তরে আলোচিত হতে দেখেছি। আমাদের মনেও প্রায়ই প্রশ্ন জেগেছে "রবীন্দ্রসংগীত" সংজ্ঞার মধ্যে কোন্ কোন্ গান আসবে? প্রথমেই বলা যায়—যে গানের বাণী ও সুর দুই-ই কবি-কৃত, সে গান রবীন্দ্র-সংগীত বটেই। কিন্তু যার বাণী কবি-কৃত, সুর অন্যের, তা কি রবীন্দ্রসংগীত নয়? "গীতবিতান" পরিশিষ্টের "গ্রন্থপরিচয়ে" এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। বলা হয়েছে যে, যে গান কবির দেওয়া সুর বহন করে, তা-ই কেবল গীতবিতানের অঙ্গীভূত।

কিন্তু সেই সঙ্গে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে গীতবিতান-অন্তর্গত সেই সব "রবীন্দ্র"-সঙ্গীতের যাদের সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া। আবার লোক-প্রচলিত নানান গানের থেকে নেওয়া সুরে আরোপ করে কবি যে-সব গান বেঁধেছিলেন তাদেরও গীতবিতানে গান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, বিলিতী সুরের হুবহু আরোপকেও গীতবিতানে বর্জন করা হয়নি। উদাহরণ, একটি করে মাত্র দেওয়া যেতে পারে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে— যথাক্রমে—'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন', 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'আমার সোনার বাংলা'...। আবার এরই পাশাপাশি বলা হয়েছে—বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গানকে রবীন্দ্রসংগীত বলে স্বীকার করে গীত-বিতানে সন্নিবিষ্ট করা গেল না, কারণ তাদের সুর কবি-প্রদত্ত নয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গানের সঙ্গে পংকজকুমার মল্লিক-সুরারোপিত "দিনের শেষে ঘুমের দেশে"-র উল্লেখ করা হয়েছে। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ"-এরও উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে— "দিনের শেষে" তবে কি সংগীত? "পংকজ-সংগীত"? তা যদি হয় তবে "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু" "জ্যোতিরিন্দ্র-সংগীত" নয় কেন? "আমার সোনার বাংলা" রবীন্দ্রসংগীত, না "গগন হরকরা-সংগীত"? হিন্দী গান-ভাঙা গানগুলি রবীন্দ্রসংগীত, না অন্য কিছু? অথচ, এদের সকলকে গীতবিতানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, আর ঠিক উলটো যুক্তি দিয়ে "দিনের শেষে"র মতো একটি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্ররচনাকে গীতবিতানে গান বলে স্বীকার করা হয়নি, যদিও সুর-সম্পদে তা কয়েক যুগ ধরে রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয় বাঙালীকে মোহিত করে আসছে, যে-কোনো স্বীকৃত রবীন্দ্র-সংগীতের মতোই। তা হলে নিরিখটা কি? যদি কবির দেওয়া সুর থাকলে রবীন্দ্র-সংগীত হয় তা হলে "সংগচ্ছধ্বম্..." (ঋগ্বেদ) অথবা "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্ম্মা" (সুকুমার রায়) রবীন্দ্র-সংগীত নয় কেন? আবার যদি বাণীই শুধু কবি-কৃত হলে চলে তা হলে "সোনার বাংলা" বা "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু", অথবা গান-ভাঙা সুরে "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে" ইত্যাদির মতো "দিনের শেষে" প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ও সার্থক গান রবীন্দ্রসংগীত নয় কেন—রবীন্দ্রসংগীতের রক্ষাকর্তারা এ-সব প্রশ্নের উত্তর গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়ে দেন নি, বরং একই আলোচনায় পরস্পরবিরোধী যুক্তির অবতারণা করেছেন, নিজেদের সংকলনপদ্ধতির সারবত্তা প্রমাণ করার জন্যই হয়তো। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা অবশ্যই প্রয়োজন।

অরুণাভ সেনগুপ্ত
কলকাতা-৯

বিশ্ববিজ্ঞান

গত ৮ই মার্চ তারিখের "বিশ্ববিজ্ঞান" পর্যায়ে 'মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই-এ অসংলগ্নতা এবং প্রচুর ভুল' সম্বন্ধে রচনাটি খুবই আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করলাম। 'বিশ্ববিজ্ঞান' লেখকের এই নির্ভীকতা এবং তাঁর সুচিন্তিত পাঁচটি মন্তব্যের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীসমর[illegible] কর মহাশয়কে এই সাহসিকতার জন্য অভিনন্দন জানাবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শারীরবৃত্তের সংযোগে জীবন বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন জীববিদ্যা শিক্ষায় সত্যই খুব উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পরি-বর্তন। শিক্ষাবিদ মাত্রেই জীবন বিজ্ঞানের আবির্ভাবকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবেন। "পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড" কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যক্রমের নির্দেশাবলীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম।

(1) "Life science is to be studied in the school with the idea to have a correct perspective of human-being in relation to the environment and other forms of different patterns of life as examplified by the plants and animals. The common, as well as different, phenomena of life in relation to the structural and behavioural peculiarities are to be intregrated in such a manner as to depict a composite and corroborated picture in which man himself forms the central figure."

(2) "Life functions are to be delt with reference to plants, animals and human beings to emphasise on the similarities in the living organism."

পাঠ্যক্রম অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানুষের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির উপর খুব একটা জোর না দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে পুস্তকে আলোচনা থাকবে। নবম ও দশম শ্রেণীর পুস্তকে মানুষের শারীরবৃত্তির পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের শারীরবৃত্তির পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক বা সমন্বয় সাধন করাই বোধহয় পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ ও বিজ্ঞানসম্মত। তবে অভাব,

'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক পাঠ্যক্রমের খুঁটিনাটি বিষয়ে সময়োচিত এবং যথোপযুক্ত স্পষ্ট নির্দেশ। 'বিশ্ববিজ্ঞান' লেখকের সঙ্গে আমিও একমত যে সময় না নিয়ে তাড়াহুড়া করে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করতে গেলে কর্তৃপক্ষের, লেখকদের এবং প্রকাশকদের এই ব্যাপারে কাজের মধ্যে ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে সমরজিৎবাবুর পাঁচটা 'Suggestions' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত। তবে, আরও প্রশ্ন ওঠে, পুস্তক লেখকের লেখায় কেন তথ্যগত ভুল থাকে? এই ভুল কি তাড়াহুড়ো বই লেখার জন্য, না তাঁদের অজ্ঞতার জন্য? প্রায় পঁচিশ খানি 'জীবন বিজ্ঞান' বই মোটামুটি পড়ে দেখলাম। সত্যই অনেক বই-এ তথ্যগত ভুল ও প্রচুর অসংলগ্নতা। উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কি প্রাণীবিদ্যায় বা শারীরবিদ্যাতেও পারদর্শী হবেন? যেখানে বিজ্ঞানের প্রসার খুবই দ্রুত, যেখানে উদ্ভিদ বিদ্যায় বা প্রাণীবিদ্যায় বা শারীর বিদ্যায় ডিগ্রীধারী ব্যক্তি তাঁর নিজের 'Subject'-এ প্রতিটি শাখার বিষয়বস্তুতে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন না, সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন 'Subject'-এ বিশেষজ্ঞের ভান করে কি করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন? পূর্বে যে 'জীববিদ্যা' শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেটা শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে (Botany and Zoology) সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে শারীর বিদ্যা (Physiology) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শারীর-বস্তু ব্যতীত জীবনবিজ্ঞান হয় না। এ সত্য এতদিনে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। তাই শারীর বৃত্তে বিশেষজ্ঞ ছাড়া আদর্শ 'জীবন বিজ্ঞান' পুস্তক রচনা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। এ সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সতর্ক দৃষ্টি রাখলে ভুল ত্রুটির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

বর্তমান দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে 'জননের' অন্তর্ভুক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য। জীবন বিজ্ঞানে 'জনন' সম্বন্ধে বলতে হলে মানুষের জননের আলোচনা করতেই হবে, বাদ দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অংশ বাদ দিলে জীবের জন্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায় না। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন পড়বে, অথচ মানুষের জননের মৌলিক তথ্যগুলি পড়লেই নৈতিক চরিত্রের 'অবনতি ঘটবে'—এ ধারণা অমূলক। বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞানে পারদর্শী শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট বিজ্ঞানসম্মতভাবে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি হিসাবে জনন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানলাভ একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিদ্রূপ ইঙ্গিত এবং অসত্য জ্ঞান দান দুই-ই অত্যন্ত দূষণীয়।

এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিজ্ঞ জীবন

বিজ্ঞানীদের লিখিত নির্ভুল "জীবন বিজ্ঞান" পাঠ করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চলুক। এটাই আমাদের কামনা।

ডঃ অবনীকুমার সিংহ
কলিকাতা-৩৭।

॥ ২ ॥

মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই-এ অসংলগ্নতা এবং ভুলের খুবই প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গত আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত কর বিশ্ববিজ্ঞানে (দেশ ৮ই মার্চ ১৯৭৫) একটি অতিপ্রচলিত ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। ডঃ হরিদাস গুপ্তের 'জীবন-বিজ্ঞানের' সমালোচনায় লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী উটের লোহিত রক্তকণিকাতেই নিউক্লিয়াস থাকে" (পৃঃ ৪১৯)। এমন একটা ধারণা বহুদিন ধরে আমাদের অনেকের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও কথাটা মোটেই ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণ ভুল ও অবাস্তব। কেননা অন্যান্য সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ন্যায় উটের লোহিত রক্তকণিকাতেও কোনও নিউক্লিয়াস থাকে না। এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত স্তন্যপায়ী প্রাণী-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে জেড ইয়াং-এর সঙ্গে মতবিনিময় ছাড়াও আমি ব্যক্তিগত-ভাবে উটের রক্ত অনুসন্ধান করে দেখেছি, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত উটের লোহিত রক্তকণিকাতেও কোনও নিউক্লিয়াস নেই। তবে অন্যান্য স্তন্যপায়ীর রক্তকণিকার ন্যায় উটের লোহিত কণিকা আকৃতিতে ঠিক গোলাকার নয় বরং অনেকটা ডিম্বাকৃতি। এই বক্তব্যের সপক্ষে কিছু তথ্য Jollie-র "Chordate Morphology" বই-এর সাম্প্রতিক সংস্করণেও পাওয়া যাবে। বইটির প্রকাশক Reinhold Pub. Company U S A.

ডঃ সমর চক্রবর্তী
জীববিজ্ঞান বিভাগ,
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ,
আগরতলা।

শিল্পী যামিনী রায়

গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'চিত্র-প্রদর্শনী', শীর্ষক রচনাটি পড়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। আমি একজন চিত্রশিল্পী নই, শিল্প-সমালোচকও নই। কিন্তু কেন জানি না, শিল্পী যামিনী রায়ের আঁকা ছবি দেখলেই আমি যেন কি রকম বিমুগ্ধ ও বিমনা হয়ে যাই। তাঁর চিত্রশিল্পকলার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে চিত্রপ্রিয় যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি যে সত্যাশ্রয়ী ও যুক্তিনির্ভর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবু, 'অধিকন্তু ন দোষায়',—১৯৫৩ সালে আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক আর্ট গ্যালারী'তে প্রদর্শিত যামিনী রায়ের ছবিগুলি সম্বন্ধে সেখানকার ও সে সময়ের কতকগুলি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকদের উক্তি এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

শিল্পী যামিনী রায়ের এই চিত্র-প্রদর্শনীটি নিউ ইয়র্ক শহরে সে সময় এতই সমাদর লাভ করে ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, এই প্রদর্শনী দেখাবার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই শিল্পীর ছবিগুলির প্রায় অর্ধেকের উপর বিক্রয় হয়ে যায়। তাঁর আঁকা এই ছবিগুলি দেখে নিউইয়র্কের বিখ্যাত পত্রিকা 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সে সময়কার বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক স্টুয়ার্ট প্রেস্টন মন্তব্য করেন—

"The singular quality of Indian art is its emphasis on three-dimensionality, and Roy, though limited by the two dimensions of the canvas and further limiting himself by painting absolutely with neither shadows nor modelling, yet contrives to suggest maximum solidity and volume in his figures by the supple strength of contour alone. His calligraphic power is most impressively evident in the brush drawings of figures....Roy's art is totally disciplined and thrives on its good humour and on its clear sense of form."

তা ছাড়া 'নিউজ উইক' পত্রিকার শিল্প-সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেন—"Roy's paintings reflect the peace he has made with himself and with the world. Flat, bright figures painted in the conventional forms of Bengalese artisans reveal his reverence for the dignity of India and Hindu lore. Roy usually grinds his own pigments and normally paints in tempera. His drawings are composed of simple and economical lampblack lines. All express his belief that there is no evil in good-humourede men and women."

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া।

বিশ্ব মহিলা বর্ষ

গত ৮ই মার্চ, ১৯ সংখ্যক 'দেশ'এর আলোচনা স্তম্ভে শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিশ্ব মহিলা বর্ষ' সংক্রান্ত সুদীর্ঘ পত্রটি মনযোগ সহকারে পড়লাম। এতে 'ঘরে-বাইরে', সম্পাদকীয় এবং রাষ্ট্র-সংঘে প্রকাশিত রিপোর্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি পরিষ্কার বোঝা গেল না। তিনি নারীর মননশীলতা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, কিন্তু পরিতাপ করেছেন,...অনেক নারীও বসন ভূষণেই প্রগতি খুঁজছেন এবং এমন কি নারীর মধ্যে কথাবার্তায় শাড়ি-গয়নার কথা প্রাধান্য পাচ্ছে।' এই মননশীলতার ব্যাখ্যা কি? মনে হয় শ্রীমুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে 'মননশীলতা' ও 'শাড়ি-গয়না'র অহি-নকুল সম্পর্ক রয়েছে। যে নারী মননশীল বা intelectual তিনি বোধকরি সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মতো শাড়ি-গহনা সম্পর্কে উদাসীন থাকলেই 'মহিয়সী নারী'র পর্যায়ে পড়তেন বলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস। তিনি বলেছেন 'একই ডিগ্রীধারী দুই নারী-পুরুষ ডাক্তারের মধ্যে মেয়েরাই নারী-ডাক্তার সম্বন্ধে কম আস্থাশীল।' শ্রীমুখোপাধ্যায় এই জাতীয় মেয়েদের স্ট্যাটিস্টিক্স, নিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণায় মেয়েরাই, বিশেষত অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে-বধূরাই (এদেশীয় ভাষায় দেহাতী) নারী-চিকিৎসকের কাছে তাদের কথা অকপটে ও নিঃসঙ্কোচে বলে থাকেন এবং সে ক্ষেত্রে মনে হয়না তাঁরা নারী ডাক্তারের প্রতি আস্থাশীল নন। আর সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে ছেলে হলে

মায়ের, মেয়ে হলে বাপের মুখে হাসি ফুটবে সে মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা ফ্রয়েড করে গেছেন, যদিও তা তর্কসাপেক্ষ! শ্রীমুখোপাধ্যায় কি করে মনে করেন যে 'ছায়াছবিতে বিশেষত হিন্দি ছবিতে মেয়েরা যেভাবে নগ্নতার প্রতি-যোগিতায় পাল্লা দিয়ে চলেছে, তাতে নারী সমাজ লজ্জা না পেয়ে প্রগতির লক্ষণ বলে মনে করে?' প্রতিবেদন কি শুধুই মেয়েদের একচেটিয়া? তাতে করে কি কয়েক লহমায় সবকিছুর পরিবর্তন হবে? নাকি প্রতিবাদ না করলেই সেটা প্রগতিশীলতায় দাঁড়াবে? তাঁর বিশ্বাস যে এইজাতীয় ছবির পোস্টারে আলকাতরা মাখালে বা সিনেমার সামনে পিকেটিং করলেই চলবে না, সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। কিন্তু 'গোড়া'য় যাবার পথ তিনি দেখিয়ে দিতে পারলেন কই? আমার বক্তব্য এই জাতীয় ছবি দেখা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলেরই বর্জন করা উচিত।

মোটর-টায়ার ফাউণ্টেন পেনের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের আবির্ভাবে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হলো। কিন্তু তিনি বোধকরি গালপাট্টা ও লম্বাচুল সমন্বিত, বেল-বটম পরিহিত পুরুষের ছবি বিজ্ঞাপনে (কিংবা জীবন্ত অবস্থায় রাস্তায়) দেখেননি? সেটি কি খুবই দৃষ্টি-সুখকর? তিনি কটি মেয়েকে ব্রা-লেস অথবা টপলেস অবস্থায় দেখেছেন?

পরিশেষে আমি তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলি যে নারী প্রগতির পথ খুব দ্রুত প্রশস্ত হচ্ছে না। কেননা এখনও মেয়েদের বাল্যাবস্থা থেকেই প্রতিমুহূর্তে সচেতন করিয়ে দেওয়া হয় যে তারা নারী, পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের দৈহিক সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশী। মেয়েদের ত্যাগ-স্বীকারের শিক্ষায় পাঠ দেওয়া হয়, যেহেতু তারা একদিন পরের ঘরে যাবে। তারা এখনও সন্ধ্যার পর একা-একা রাস্তায় চলাফেরা করতে ভয় পায় ঐ একই কারণে যে তারা 'মেয়েমানুষ'—এই বোধটা তাদের মজ্জায় গিয়ে মিশেছে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে এবং শ্রীমুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন '......সেখানে পুরুষের ভূমিকা নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষীয় নয়, সহযোগীর হওয়াই মঙ্গলের।'

তপতী রায়চৌধুরী
নিউ দিল্লি-৫

॥ ২ ॥

বিশ্ব নারী বর্ষে, এই বিষয়ে এখনও আপনার পত্রিকায় পর্যাপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয় নি তবে আলোচনা বিভাগে এ সম্বন্ধে শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি যথেষ্ট চিন্তাপ্রসূত। এ বয়সের পুরুষ অনেকেই নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে, নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমরাও ভাবছি। আমার মনে হয় বিশ্ব নারী বর্ষ নারীর আত্মসমীক্ষার বৎসরও বটে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে নারী-স্বাধীনতা কিংবা Women lib নিয়ে অপ্রমত্ত বাড়াবাড়ি দেখে ভয় হয় আমরাও ধীরে ধীরে ওই অসুস্থ মানসিকতার শিকার হয়ে না পড়ি!

বহু শতাব্দীর পরাধীনতা নারীর অন্তরে এমন এক হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছে যে, নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাটাকেই বুঝছেন। বেশভূষা, জীবিকা এবং পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা প্রমাণ করতে গেলে আজকের বিশ্বনারী বর্ষ আমাদের সামনে যে সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শরীর নিয়ে মাতামাতি এই হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রকৃত শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি শুধু নয়) এবং আমাদের সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ (সেটা আসবে প্রকৃত শিক্ষালাভ থেকে) এর প্রতিষেধক।

আর সত্যিকারের নারী প্রগতি তখনই সম্ভব হবে যখন নারী তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজের সহযোগিতা ও সাহায্য অনায়াসে অর্জনে সক্ষম হবে। কিন্তু তার আগে নারীকে স্থির করে নিতে হবে সে সমাজের কাছে কি চায়। নিজের লক্ষ ও উদ্দেশ্য স্থির করে নিতে পারলে নারী স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎকট মাতামাতির প্রয়োজন হবে না।

বিশেষ করে আমাদের দেশের শিক্ষিতা নারীদের কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। অনেক শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও অনেক সংস্কার তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন না। যেমন একজন 'ডক্টরেট' করা মহিলা কোন কারণেই তাঁর থেকে কম ডিগ্রিধারী একজন প্রতিষ্ঠিত যুবককে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেন না। নিদেনপক্ষে স্বামী হিসাবে একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তাঁর চাই। তাঁরা এই মানসিকতায় পৌঁছাতে পারেন

না যে তাঁরই পিতা-পিতামহ অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি ও ডিগ্রি নিয়ে সারাজীবন একজন নিরক্ষরা স্ত্রীর সংগে সুখে বসবাস করে গেছেন, তবে তিনি কেন তাঁর থেকে দু' একটা কম ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষিত মস্তিষ্কত নির্ভরশীল মানুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারবেন না? পুরুষ-শাসিত সমাজ একদিন শিখিয়েছিল নারীর সকলের বড় ঐশ্বর্য তার শরীর। আজ পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভে আমরা বুঝতে পারছি শারীরিক বল, mental abilities প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই আমরা পুরুষের থেকে হীন নই।

আরও একটা কথা, পণপ্রথা, নারী দেহ নিয়ে অশালীন প্রচার, এ সবের বিরুদ্ধে নারীকে রুখে দাঁড়াতে হবে—এটা নারীকে উপলব্ধি করতে হবে—এ সবই তার জন্য অসম্মানজনক। অনেক দিনের অবহেলায় যে সম্মানবোধ ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে জাগিয়ে তুলতেই হবে—আমরা নিজেদের ছোট করেছি বলেই ছোট হয়ে গেছি, এবং সব থেকে বড় দুঃখ হলো—আমরা আজ বুঝতেও পারছি না কিসে আমাদের অসম্মান।

কেশওয়ার জাহান
কলকাতা-১৯

মুখ চাই মুখ

চিত্রভানু রায়ের চিঠির (১৫ই মার্চ) জবাবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, 'জানী' বানান 'Jeanne' (অথবা, ও'র আন্দাজ-মাফিক ইংরাজী, ইতালীয়ান, স্প্যানিশ ইত্যাদি কোনোটাই) নয়, নিতান্তই সাদামাটা JANI, যদিচ রচনায় চরিত্রের নাম নিশ্চয়ই proper noun এবং তার উচ্চারণ নিয়ে কচকচি বাহুল্য মাত্র, তথাপি পত্রলেখকের আক্ষেপে নিবেদন এই যে, জানী বোয়া-গুন্তিয়ের (Boiguntier) নামে একটি ফরাসী মহিলা নগরীতে বর্তমান যাঁর সংগে অধমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং যাঁকে পরিচিত তাবৎ ফরাসী ভাষাভাষীরা 'জানী' বলেই সম্বোধন করেন।

শ্রী রায়ের দ্বিতীয় উক্তি—আমি নাকি ফরাসী রান্নার 'নিন্দে' করেছি—নিতান্ত হাস্যরসাত্মক! অনুগ্রহ করে আর একবার উক্ত পরিচ্ছেদটি পড়লে সম্ভবত নিজেই বুঝতে পারবেন।

মিলন মুখোপাধ্যায়
বোম্বাই-৫০

॥ ২ ॥

গত ১৫ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রভানু সেনের চিঠি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমেই বলে রাখি, ফরাসী ও বাংলা ভাষার উচ্চারণ-রীতি ও ধ্বনিতে পার্থক্য থাকায় একটি শব্দ অপর ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব, অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে। চিত্রভানুবাবু ফরাসী monsieur শব্দের উচ্চারণ লিখেছেন 'মঁসিয়ো'। ফরাসী শব্দে 'm' ও 'n'-এর উপস্থিতি নাসিক্যধ্বনি আনয়ন করলেও এক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এবং এর উচ্চারণ হবে অনেকটা 'ম্যসীয়ো' (স-এর উপর জোর পড়বে)। 'Jeanne' শব্দের 'J'-এর উচ্চারণ সম্পর্কে চিত্রভানুবাবু লিখেছেন ইংরাজী measure বা pleasure-এর 'জার'-এর মত। কিন্তু তা নয়, ফরাসী 'Z'-এর উচ্চারণ হল measure বা pleasure-এর 'জার'-এর মত। যেমন—সেজান (Cezanne)। ফরাসী 'J'-এর সমধ্বনিবিশিষ্ট বর্ণ বা শব্দ বাংলায় নেই। কৌতূহলী পাঠকদের পারী (Paris) হতে প্রকাশিত ফরাসী ভাষা শিক্ষার বই La Francais Et La Vie দেখতে অনুরোধ করি। একই সংখ্যায় 'মুখ চাই মুখ' রচনায় কয়েকটি ভুল উচ্চারণ দেখলাম। তবে proper noun-এর উচ্চারণে বেশী খুঁতখুঁতে না হওয়াই ভাল, কারণ Paris-কে বাংলায় 'পারী' লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যদিও ফরাসী 'R' এবং বাংলা 'র'-এর উচ্চারণজনিত পার্থক্য দুস্তর।

সত্যপ্রিয় বড়ুয়া
কলকাতা-৯

আলোচনা বিভাগ

'দেশ' পত্রিকায় 'আলোচনা' বিভাগটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য পেশ করতে আশা করি অনুমতি দেবেন। বর্তমানে এই বিভাগে একমাত্র কিছু বর্ণনা ও জীবনীমূলক প্রবন্ধ, বিশ্ববিজ্ঞান ও সাহিত্য-আলোচনার উপর পাঠকদের মতামত ও সমালোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 'দেশ' পত্রিকার যা প্রাণস্বরূপ—সেই ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতার উপর কোন "সমালোচনা" চোখে পড়ে না বললে বোধ হয় বাহুল্য হবে না। এর কারণ কি পাঠকরা এইসব রচনায় একেবারে নির্লিপ্ত অথবা সমালোচনা পাঠাতে আগ্রহী নন?

আমার মনে হয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস ও কবিতার অনেক বেশী সমালোচনা প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। কারণ, সম্ভবত বর্তমানে এইটেই একমাত্র পত্রিকা যা বাংলা সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান রূপটির প্রকৃত প্রতিবিম্ব ও ধারক—বহুলপ্রচারিত তো বটেই। অনেক অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি এতেই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং এরই মাধ্যমে পাঠকদের অভিরুচি, তৃষ্ণা ও দাবি লেখকদের কাছে পৌঁছবার একমাত্র উপায়। তা ছাড়া 'সমালোচনার'-র একটা নিজস্ব ভূমিকাও আছে মহত্তর সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে। একটু পিছিয়ে দেখলে লক্ষ করা যাবে, ত্রিশ-চল্লিশ বছর কিংবা তারও আগে যখন এই সমালোচনা-ই কয়েকটি নামী সাহিত্যপত্রিকার অন্যতম মুখ্য বিষয় ছিল, তখনই বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ এসেছিল—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, প্রভাতকুমার প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখকরাও এর থেকে বাদ পড়েননি, উপরন্তু এঁরাও মুক্তকণ্ঠে এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে গিয়েছেন। বর্তমানে লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার কোন অবকাশ বা সংযোগ নেই—সুতরাং লেখকরাও নিশ্চয়ই যাদের জন্য তাঁদের এই প্রয়াস সেই পাঠকদের রুচি, চাহিদা ও মতামত জানবার জন্য খুবই আগ্রহী। উন্নততর সাহিত্যসৃষ্টিতে এটা মূল্যবান সোপান নিঃসন্দেহে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সমালোচনা পাঠানোর ব্যাপারে সচেতন পাঠকদের দায়িত্ব অনেক অস্বীকার করি না, তবু সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহদান প্রাথমিকভাবে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অনিমেষ মিত্র
বর্ধমান

॥ উনিশ ॥

ধবধবে পোশাক পরা ওয়েটার এসে দাঁড়াল। আ লা কার্ত দেখতে দেখতে দিগেনদা জিগ্যেস করলেন,

—"কি খাবে?"

বললুম,

—"এদের খাবারের ভালোমন্দ আমি কিছুই বুঝি না, দিগেনদা। আপনি যা খাবেন! আমিও তাই।"

বিশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে দিগেনদা ওয়েটারকে অর্ডার দিলেন—কড়াইশুঁটির সুপ, আলুসেদ্ধ আর শুয়োরের মাংস। ওয়েটার চলে যেতেই দিগেনদার দিকে সামান্য ঝুঁকে বললুম,

—"দাদা গো, চাট্টি ভাত পাওয়া যেত না!"

চিড়িয়াখানার কোনো কিম্ভুতে জন্তুর দিকে তাকালে যেমন চোখ হয়, সেই চোখে আমায় দেখলেন দিগেনদা। সামলে নিয়ে হে-হে করলুম,

—"মানে, ভাত পেটে গেলে, মনে হয়, যাক, পেটটা ভরল!"

'তোমাকে দিয়ে কিস্সু হবে না' গোছের মাথা নেড়ে বললেন,

—"এখানে যখন এসেছো, ওই ভেতো অভ্যেসটি ছাড়ো। এদের মতো কর্মঠ হতে গেলে শুকনো খাবার খাওয়া প্র্যাকটিস করো।"

সত্যি বলছি বউ, ভেতরে ভেতরে আমার কেমন রাগ হচ্ছিল। যদিও যুক্তি-সংগত কোনো কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছিল, এত পরিচিত একটা মানুষ এমন একখানা অচেনা মুখ করে বসে আছে কি করে! লোকটা কি তারকেশ্বর, কলকাতা, নিজের যৌবন, যৌবনের আয়োজন সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে! অতীতের সেই সব শেকল-ছাড়া আগুন-মাখা দিনরাত্রিগুলোকে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছে? তা কি করে হয়! মানুষ বুড়িয়ে যায়। রাশভারি চেহারায় অভিজ্ঞতা জমে জমে মস্তিষ্কের, হৃদয়ের ওজন বাড়ে হয়তো। কিন্তু অতীত, বিশেষ করে ছেলেবেলা থেকে যৌবন, যত তেতোই হোক, স্মৃতির মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা অসম্ভব। পুড়িয়ে ফেলতে চাইলেও তা তো নিশ্চিহ্ন হবার নয়। তাছাড়া আমি একটা জলজ্যান্ত মানুষ দিগেনদার ফেলে আসা উদ্দাম যৌবনের স্মৃতি গায়ে মেখে বসে আছি সামনে—মনেই হচ্ছে না, এই ভদ্রলোক কোনোকালে যুবক ছিলেন, কলকাতার যুবক ছিলেন। সেই অধ্যাপকের গল্পটা মনে পড়ছে, সেই যে বউ, এক ভদ্রলোক—নামটা ধরে নাও অবনীবাবু—সেই অবনীবাবুর একদিন খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেল। দোতলায় শোবার ঘরে খাটে শুয়েছিলেন। খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে হাই তুলে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শহরতলীর এই বাড়ির সামনে বেশ ফাঁকা মাঠের মাঝখানে রাস্তা। এত ভোরে জনপ্রাণী নেই কোথাও। দূর থেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন এক ভদ্রলোক। কাছাকাছি আসতেই অবনীবাবু চিনতে পারলেন, এখানকার কলেজের ফিলজফির প্রফেসর। ট্রেনে করে শহর থেকে পড়াতে আসেন এখানে। শীতের সকালে ঝকঝকে স্যুট-টাই পরে, হাতে ব্রীফকেস নিয়ে গম্ভীর মুখে হেঁটে আসছেন। ধবধবে সাদা চুল পরিপাটি, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। বেশ রাশভারী চেহারা। অবনীবাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ির সামনের জমিটুকুতে বাগান। ফুল-টুল ফুটে আছে। পেয়ারা গাছের ডালে বাড়ির ছেলে-ছোকরারা দড়ি বেঁধে দোলনা মতো বানিয়েছে। অধ্যাপক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে খুব সাবধানে বেড়া টপকে বাগানে ঢুকে পড়লেন। অবনীবাবু জানালা থেকে সামান্য সরে এসে লক্ষ্য রাখলেন, কি ব্যাপার! ফুল-টুল চুরি করবার তাল বোধ হয়। মনে মনে ভাবলেন, তা থাকগে, সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকমশাই—যদি এক-আধটা ফুল নেবার ইচ্ছে হয় নিন, তাই নিয়ে চেঁচামেচি করার

(সে ৭৫)

হুঁকোয় [illegible] করে চাদর [illegible] থাচ্ছিলেন। [illegible] তুলে হুম্, হুঙ্কার [illegible],

—"কে?"

স্যুপের প্লেটটা চামচ নাড়তে নাড়তে বললুম,

—"নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ।"

—"সে কে?"

—"সেই [illegible] ভুলে গেলেন, আমাকে? টোলার দরজার খোলা চাবিকাঠি নিয়ে কাঁকে নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ চিরকাল বলে থাকে?"

এতক্ষণ পরে এই প্রথম দিগেনদার চোখদুটি চকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলুম। [illegible] মুহূর্তের জন্যে [illegible] রোগা হয়ে গেলেন দিগেনদা। [illegible] অবিন্যস্ত চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি এবং পুরু চশমার আড়াল থেকে সেই পুরনো উজ্জ্বল চোখে আমায় দেখলেন। [illegible] কয়েক সেকেণ্ড। তারপরেই [illegible] সেই আবার মলিন নিভে গেল। চামচ থেকে স্যুপ খেতে একটুকুও শব্দ হল না। বাঁ হাতে ন্যাপকিন চেপে [illegible] করে [illegible] মাপা হাসলেন। আমাদের দিগেনদা রেগে গেলে চিৎকার করতেন, [illegible] চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন লেখা কবিতা আবৃত্তি করতেন, হা হা শব্দে হেসে আশেপাশের লোককে চমকে দিতেন।

বললেন,

—"সেবকের নিত্যানন্দ [illegible] কথা বলছো? মনে আছে বইকি!"

প্রাচীন আগুন আর একটু [illegible] দেবার জন্যে বললুম,

—"সেই দারোয়ানজি তো তারপর থেকে আপনাকে দেখলেই দৌড়ে পালাতো—কি চুমুটাই খেয়েছিলেন!"

আবার একটু মৃদু হাসি,

—"সব ছেলেমানুষি ব্যাপার। কাজকম্ম না থাকলে লোকে যা করে আর কি!"

সমবয়সী হলে দিগেনদার চোয়ালে একটা ঘুষি মারতুম!

খাবারের সঙ্গে সাধারণত বিয়ার বা ওয়াইন খাওয়া এখানকার প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে। দিগেনদা কিছুই নেননি। বললুম,

—"মদ্যপান কি ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে?"

জবাবে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, যার সারার্থ হল, উক্ত তরলীয় পদার্থটি একেবারে চলাই মঙ্গল, কারণ ইউরোপে আসিয়া ভারতীয়রা হ্যাংলাদের মতো লক্ষ ইত্যাদি খাইয়া সময় নষ্ট করে। মত্ত অবস্থায় সেলেরাগলনা করিয়া বিদেশীদের চক্ষে ছোট হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই করিতে পারে না।—

দিগেনদার কোনো কথাই আর কানে ঢুকছে না আমার। মাথার মধ্যে একটা ভাবনা

একটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন...

খেলা করছে তখন। কি করে কথাটা পাড়বো? হোটেলে অতগুলো পয়সা গুনে দেবার বদলে দিন-কয়েক যদি দিগেনদার বাড়িতে মাথা গোঁজা যেত—কলকাতায় বাইরে বেড়াতে গেলে, সেখানে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে ওঠার মধ্যে অপরাধ কিছু নেই। অন্য পক্ষের সামান্য বা যথেষ্ট অসুবিধে হলেও তাঁরা বলে থাকেন,

—"আরে! কি বলছো যা-তা! অসুবিধে? আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। বরং উল্টে তুমি যদি হোটেলে গিয়ে ওঠো তা হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। এ শহরে বেড়াতে এসেছো—আমরা এখানে রয়েছি—আর তুমি গিয়ে কিনা হোটেলে উঠবে। ছি-ছি, এসব কথা ভাবাও অন্যায় —চলো, চলো—এই কুলি, হাঁ করে দেখছিস কি, বাবুর বাক্স-বেডিং তোল—"

এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে দিগেনদা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করেননি, মন্টু, আমি কোথায় উঠেছি। কি করে এই দূরে

[illegible] এসে উপস্থিত হয়েছি—আমার কোনো [illegible] নেই। [illegible] বেশী [illegible] মন্টু? [illegible] দিগেনদা [illegible] হোটেলে। [illegible] না [illegible]?

—"দিগেনদা, [illegible] আলাপ করিয়ে দেবেন না?"

[illegible] উচ্চারণ করে ফেলেছি। একটু [illegible] দিলেন,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! [illegible] এখন একটু ব্যস্ত আছে [illegible]—[illegible] এক্সিবিশন, [illegible] তারিখে— এখনো সব [illegible] হয়নি—"

বলতে বলতে [illegible] ওভারকোটের পকেট থেকে একতাড়া কার্ড বের করলেন। একটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—"আট তারিখ [illegible] দেখো, অনেকের

নতুন আলাপ করিয়ে দেবো।"

—"বউদি ছবি আঁকেন বুঝি?"

—"শুধু আঁকেন নয়, এখানকার আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে ওর বেশ নাম-ডাক।"

—"ও'র সঙ্গে কি আপনার এখানেই আলাপ হয়েছে এসে, না—"

—"ইন্ডিয়ায়, মানে কলকাতায় ওর প্রদর্শনীর সমালোচনা করেছি—সে অনেক কাল আগের কথা—" চোখদুটি ঘোলাটে হয়ে এল দিগেনদার, মনে হল যেন একটা দমকা বাতাস চেপে কথা শেষ করলেন,

—"প্রায় আট-ন বছর হয়ে গেল।"

কার্ডটির দিকে তাকিয়ে বললুম,

—"আট তারিখ? সে তো এখনো মাস-খানেক বাকি, দিগেনদা!"

—"শিল্পীর কাছে এক মাস কি একটা সময় বাকি! হুশ্ করে বেরিয়ে যাবে। ছবি কমপ্লিট করা ছাড়াও পাবলিসিটি, কার্ড বিলি—অনেক কাজ বাকি।"

এর পর হঠাৎ মধ্যখানে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—"তুমি ছবি-টবি আঁকছো আজকাল?"

—"নিশ্চয়ই। সেই সুবাদেই তো আসা এখানে।"

বাস্, আর কোনো প্রশ্ন নেই দিগেন-দার। যে সমালোচক আমার প্রথম প্রদর্শনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি এখন বোবা হয়ে রইলেন। দিব্যি এড়িয়ে গেলেন আমার ছবি-আঁকার ব্যাপারটি। বললেন,

—"তারপর, কলকাতার খবর-টবর সব ভালো!"

দিগেনদার স্ত্রীর নাম কার্ডে বেশ বড় অক্ষরে ছাপা—দমিনিক। শুধু দমিনিক, কোনো পদবী-টদবীর বালাই নেই।

বললুম,

—"আপনার বাড়ি যাব দিগেনদা।"

বোধ হয় চোখের ভুল আমার, উনি কি একটু চমকে উঠলেন, পরক্ষণে সঙ্গেই কেমন সামলে নিয়ে বললেন,

—"যাবে বৈ। নিশ্চয়ই যাবে। দু-দিন সবুর কর। ঘর-দোরের যা অবস্থা—"

আমি একেবারে বলে পড়লুম,

—"আপনার ঘরদোর দেখায় বিশেষ আগ্রহ নেই আমার। আমি বউদির পেইন্টিং দেখব।"

নিমরাজি দিগেনদার সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলুম। ফিনফিনে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি। প্যারিসের এই শীতকেলে বৃষ্টিতে গত কটা দিন ভিজে ভিজে ঘোলা হয়ে গেছে। শরীর, মন, দৃষ্টিশুদ্ধ সব যেন প্যাচপেচে। ইউরোপের এরা সব এত 'সুর্য-সুর্য' করে কেন এই কদিনেই টের পেয়ে গেলুম, বাপ্রে। তুমি তো এত 'বিষ্টি-বিষ্টি' করে পাগলাটে, ভিজতে ভালোবাসো, এখানে এখন থাকলে তুমিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে।

প্যালে রয়্যাল স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দিগেনদাকে বললুম,

—"প্যারিসের এই একঘেয়ে বিরক্তিকর বৃষ্টি আপনার ভালো লাগে?"

—"ভালো লাগা-না-লাগার কোনো ব্যাপার নেই। সব সয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও তোমাদের কলকাতায় এক-ঘেয়ে বৃষ্টি হয় না!"

শুনলে তো বউ, 'তোমাদের কলকাতা'। প্যারিস হল গিয়ে 'আমাদের প্যারী' আর কলকাতা হয়ে গেছে পর। 'তোমাদের' শব্দটি ছুঁড়ে দিয়ে চেনা বাঙালী কবি দিগেন পাল পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে যেন কয়েক গজ দূরে সরে গেলেন। এতক্ষণ যে অনুভূতিটাকে ঠিকমত বুঝতে পারছিলুম না, এইবার সেটা একটা বিশ্রী মুখ করে উঁকি মারল। মনে হল, এখানকার স্যাঁৎ-সেঁতে বৃষ্টির মতোই হয়ে গেছেন মঁসিয় দিগেঁ পল। আস্তে আস্তে এই দিগেঁ পলটিকে ঘৃণা করতে শুরু করলুম বোধ হয়। ঠিক ঘৃণাও নয়, একটা কষ্ট। উজ্জ্বল স্মৃতির শরীরে কেমন সূক্ষ্ম একটা বেদনা-বোধ। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, বউ! আসলে, সবকিছু মিলিয়ে সেই কথা-গুলোই ঘুরে ঘুরে আসছে, আহা রে! দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছেন!

জিগ্যেস করলুম,

"কলকাতার পত্র-পত্রিকায় আর আপনার লেখা-টেখা দেখি না। কবিতা লেখা কি ছেড়ে দিয়েছেন?"

—"না, ছাড়িনি। তবে, ঠিক সময় করে উঠতে পারি না। তাছাড়া, ফরাসী ভাষা ভ্যারাটো ইন্টারেস্টিং—একবার এর মধ্যে ঢুকে পড়লে, অন্য কিছু ভালো লাগে না—"

—"বাংলা, মানে, আপনার মাতৃভাষা—"

বাধা দিলেন দিগেনদা,

—"ওটা তাই বাংলা ভাষা—আমি

করছি না, তবে, সব যোগাযোগ
ড়ে গেছে।"
র সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে
ামতে দিগেনদা নিজের মনেই
বাধ হয়,
কোন কবিতা লিখি না।" চাপা
ক কটি দূরে থেকে ভেসে এল।
াড়িতে পাশাপাশি বসে হঠাৎ কি
চোখের কোলে তাকিয়ে খুব
ুগোস করলুম,
ীমার কি খবর, কেমন আছেন?"
া ভেবে চোখের কোলে তাকালুম,
আশা করে খুব আস্তে প্রশ্নটি
তাই হল। দিগেনদার চোয়াল
পড়ল। ভয়ংকর শূন্য চোখে
আমার দিকে। কোথায় যেন
তৃপ্তি পেলুম। বেশ আরাম হল
কাথাও। তোমাকে গুছিয়ে বলতে
বউ, তবু, মনে হল, বুকের মধ্যে
ড় পাথর জমছিল দিগেনদার এক
ায় এক একটি জবাবে। হঠাৎ যেন
রটা নড়ে উঠল। কিংবা, ধরো,
ক শরীর দিয়ে বোঝাতে গেলে
য়, শরীরে কোথাও চুলকোচ্ছিল
ছতেই চুলকোতে পারছিলুম না,
একটু চান্স পেয়ে অল্প একটু
লুম। চুলকুনিতে আরাম হল

র দণ্ডে সামলে নিলেন দিগেনদা,
াসীমা, মনে হয়, মা'র কথা

দিকে চোখ রেখে মাথা নেড়ে
, হ্যাঁ। মাসীমার মুখটি ভাল করে
ড়ছে না। ইট-পাঁজর বেরুনো
র পটভূমিতে একটি সাদা থান পরা
াথায় ঘোমটা, দু' হাতে দু' কাপ
হাজির,
যাচ্ছ, মানে, তোমাদের দিগেনদা
ই করে না। বলে, কবিতা লিখব।
াকরির কথা তোমাদের কিছু বলে-

ল জর্জের ওখান থেকে টেলিফোন
সময় আমি আবার ভাবছিলুম,
র মা প্যারিসে বসে ওভারকোট
য়ে আগুন পোয়াচ্ছেন। ম'সিয়র
লের ভাবভঙ্গি থেকে মনেই হয় না
ক বলে গিয়ে, সেই 'গর্ভধারিণী'
কালীঘাটের শ্যাওলা-ধরা ঘরে দু'
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
ীমা যে এখনো বেঁচে, এ ব্যাপারে
হ হয়ে গেছি। কি করে জানো
যদি, উনি পৃথিবীতে বেঁচে না
, তা হলে, আমার প্রশ্নের জবাবে
হয়তো খুব দুঃখিত গলায়
জানিয়ে দিতেন, অথবা মুখটি
রুণ করে আমার দিকে তাকাতেন।

চোয়াল ঝরলে পড়ত না ম'সিয়ের, এমন ভয়ংকর শূন্য চোখে চাইতেন না আমার দিকে। আসলে, মনে হয়, উনি নিজেই জানেন না ভালো" করে—মা বেঁচে গেছেন কি না, মরে আছেন।

—"ভালোই আছেন। মানে, বয়েস হয়ে গেছে তো, এই বয়সে যত ভালো থাকা যায় আর কি—"

—"কলকাতায় গিয়েছিলেন লাস্ট কবে?"

—"এখানে এসে আর যাওয়া হয়নি, মানে, সময় করে ওঠা মুশকিল, দূর তো কম নয়—"

ইত্যাদি, ইত্যাদি। '—বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হইতে স্থূলেতে, অর্থাৎ কিনা, লাগল ঠ্যালা পঞ্চভূতের মূলেতে—' বুঝলে তো বউ, ন'-

দশ বছর দেশের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ভদ্রলোকের। বলছেন,

—"তবে, যোগাযোগ তো আছে, চিঠি-পত্তর—"

—"কলকাতা থেকে শেষ চিঠি পেয়েছেন কদ্দিন হল?"

নিরীহ প্রশ্নটির জবাবে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে, ভুরু কুঁচকে বললেন,

"অত জেরা করার কি হয়েছে হে ছোকরা। নিজের মেশিনে তেল লাগাও।" মুখ ফিরিয়ে আবার বললেন,

—"চলো, উঠে পড়ো। 'এতোয়াল' এসে গেছে।"

ক্রমশ

ভারতের অর্থনীতি

...গ্লুলির নিয়ন্ত্রণমূলক ঋণদান সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহল ও ...র্ভ ব্যাংকের মধ্যে মতপার্থক্য

...জার্ভ ব্যাংকের মুদ্রানিয়ন্ত্রণনীতির ...া হ্রাস করা যায় কিনা তার সম্ভাবনা ...বিবেচনা করার জন্য বেসরকারী ...ীমহল থেকে অনুরোধ এসেছে। ... ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ডেপুটি ... ডক্টর আর কে হাজারী ... কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ...hants' Chamber of Commerce ...-বাণিজ্যের নানাবিধ অসুবিধা এবং ...তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির বিভিন্ন ...র দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ...কারী বাণিজ্যমহল থেকে অভিযোগ ...য়ে যে ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে ...াদের বেশী margin money রাখতে অথচ সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হচ্ছে না। তাছাড়া ...তন শিল্পগুলির ঋণ পাবার ক্ষেত্রেও ... অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র এবং ...টের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে যে ...ত্ত ব্যাংকগুলির শাখা সম্প্রসারণ ... ধীরগতিতে চলছে সেদিকেও ডক্টর ...ীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।

...শ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির শাখা ...রণ যে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে কারণ প্রসঙ্গে ডক্টর হাজারী এখানকার ... রাজনৈতিক দল কর্তৃক যে অঞ্চলে ...র শাখা খোলা হবে সে-ই অঞ্চলের ...দেরই সেই ব্যাংকে কাজে নিয়োগ ... হবে,— এ-ধরনের আন্দোলনের ... করেন। কোন ব্যাংকের কাজ চালাতে ... উপযুক্ত দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর ...জন। স্থানীয় বেকার যুবকগণ যদি ...র কাজ চালাবার মত উপযুক্ত শিক্ষিত ...ন তবে ব্যাংকের পক্ষে কাজ চালানো ...ল। নতুন শাখায় প্রথমেই যে কর্মখালি ... তা নয়; যখন যেমন কর্মখালি হবে সেভাবে উপযুক্ত স্থানীয় লোক পাওয়া ... কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ... থেকেই যদি এমন আন্দোলন চলতে ... যে স্থানীয় যুবকদের নিয়োগ-পত্র না ... হলে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে ব্যাংকের ...খুলতে দেওয়া হবে না—তবে ব্যাংকের ...ও শাখা-সম্প্রসারণ কর্মসূচী নিয়ে ...য় যাওয়া কঠিন হয়। নতুন শাখা ...র ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক কোন ...জ্যিক ব্যাংককেই প্রয়োজনীয় অনুমতি ... থেকে বিরত থাকেনি বলে ডক্টর ...রী জানান। ব্যাংকের ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে ...নে যে কড়াকড়ি আছে তার সমর্থনে ... হাজারী কয়েকটি বক্তব্য রেখেছেন। ...মতে কোন মুদ্রা সম্পর্কিত নীতি-ই ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষা করতে পারে না। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে আমাদের দেশে মোট ৪৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল। যখন মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বাড়তে আরম্ভ করেছিল, তখনও সুদের হার আপেক্ষিক-ভাবে কমই ছিল। ব্যাংক থেকেও তখন ঋণ পেতে বিশেষ অসুবিধা হত না। সুদের হার বাড়ানো হয়েছে ১৯৭৪ সালের ৩১শে মে তারিখে। মুদ্রাস্ফীতির চরম তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে। কিন্তু মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতির কঠোরতার ফলে এবং সেই সঙ্গে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী অন্যান্য নীতির যৌথ প্রভাবে জিনিসপত্রের দাম এখন কিছু কমের দিকে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ যেমন সীমিত করতে হচ্ছে তেমনি ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও যতটা কমানো যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে ঘাটতি অর্থসংস্থান এবং ব্যাংকগুলি কর্তৃক ঋণ সম্প্রসারণের প্রভাব একই—উভয়ক্ষেত্রেই পরিণতি হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

রপ্তানির জন্য আরও বেশি করে ঋণের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ী মহলের দাবি ডক্টর হাজারী নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঋণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত হবার আগে গড়ে সাড়ে তিন মাসের জন্য রপ্তানি ঋণের সুবিধা দেওয়া হত, পরে তা কমিয়ে তিন মাস করা হয়। ডক্টর হাজারী প্রশ্ন করেন, ভারতে যখন ঋণের টাকাটাই সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বলে মনে করা হচ্ছে তখন ভারতীয় টাকার সাহায্যে বিদেশী ধনী দেশগুলিকে তাদের আমদানির অর্থসংস্থান করতে দেওয়া হবে কেন? ভারত থেকে জিনিস আমদানি করার ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের পুরো সুযোগ বিদেশীরা নিয়ে থাকেন। বিদেশে এখন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি অনেক শিথিল করা হচ্ছে এই যুক্তির উত্তরে ডক্টর হাজারী বলেন, ভারতে সুদের কাঠামো বরাবরই বিদেশের সুদের তুলনায় কম। মুদ্রাস্ফীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা জিনিস-পত্রের দাম মোটামুটিভাবে আরও নীচু পর্যায়ে স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত সুদের হার কমাবার কোন সম্ভাবনা ডক্টর হাজারী বাতিল করে দেন। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ব্যাংক থেকে নিয়মিতভাবে ঋণ পাচ্ছে না এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন, হিসেব করে দেখা গেছে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়েছে এ-ধরনের ৩৩ শতাংশ ফার্ম প্রকৃত পক্ষে উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করে না। গত চার বছরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি যথেষ্ট ঋণ দিয়েছে। ঋণের সুবিধা পেয়েছে এ-ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির একটি বড় অংশ উৎপাদন বাড়াবার কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। যারা উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে তাদেরও উচিত ব্যাংকের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করা। ক্ষুদ্রায়-তন শিল্পের ক্ষেত্রে এখন মূলধনের সমস্যা তত গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ হল বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বল্পতা, কাঁচামালের অভাব, জিনিসপত্র বিক্রি থেকে টাকা পেতে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি সমস্যা।

বিভিন্ন কোম্পানি যে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে, তাদের আমানত প্রাপ্তির পরিমাণ আশাব্যঞ্জক নয়। কোম্পানি আইন বোর্ডের নির্দেশে তাদের আমানত সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এমন খবরও পাওয়া গেছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমানতকারীদের নিয়মিত সুদ দেওয়া হয়নি, এবং এমনকি আসল টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ-ধরনের অভিযোগ রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে এসেছে বলেই বাইরে থেকে আমানত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ-মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে ডক্টর হাজারী জানান। ব্যবসায়ীমহলের যুক্তি হল, ব্যাংকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না বলেই কোম্পানিগুলি আমানত সংগ্রহের জন্য এত আগ্রহী। বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রেতা-প্রতিরোধের ফলে কাপড়ের দাম কিছু কমেছে, হয়তো আরও কমবে। কাপড়ের মিলের মালিকদের হয়তো এজন্য

দুশ্চিন্তার কারণ আছে। কিন্তু এজন্য ব্যাংকগুলি কাপড়ের মিলের মালিকদের মজুত কাপড়ের বিপক্ষে ঋণ দেবে না বলে তিনি জানান। তবে কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক আরও ঋণ দেওয়ার সুবিধাদি অনুমোদন করতে প্রস্তুত বলে ডক্টর হাজারী জানান। কারণ, কয়লা হল শক্তির উৎস এবং দেশের স্বার্থেই এই শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। চা-শিল্প একটি শ্রম-নিবিড় শিল্প। রপ্তানির ক্ষেত্রে এই শিল্পকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যে-সব শিল্প রপ্তানির ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে সেগুলি হল চিনি, ইস্পাত এবং বৈদ্যুতিক সামগ্রী শিল্প।

ব্যবসায়ী মহল যদিও মনে করছেন যে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শিল্পক্ষেত্রে মন্দার সৃষ্টি করছে, তবুও রিজার্ভ ব্যাংকের অভিমত হল, জিনিসপত্রের দাম যে এখন কমের দিকে যাচ্ছে তা হল মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী, নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির পরিণতি। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে।

সুব্রত গুপ্ত

॥ অন্টআশি ॥
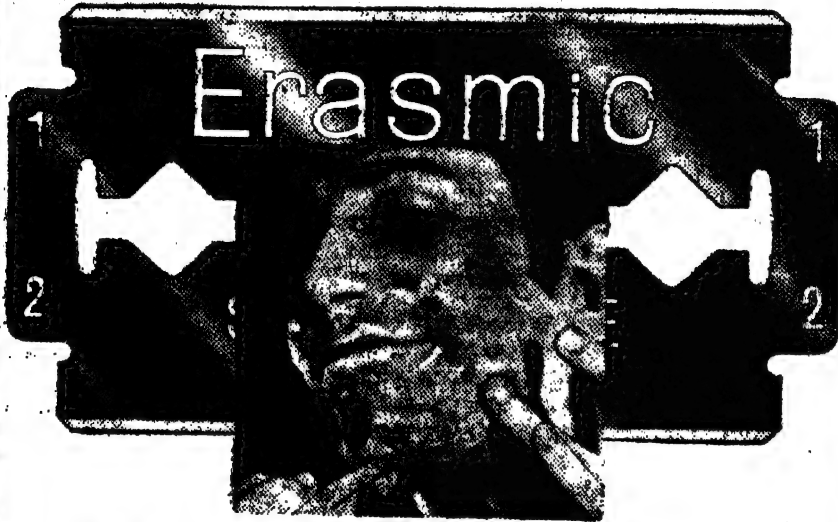
বিস্ময়কর, কেউ ত্রিদিবেশের দিকে
কয়ে হাসে না, টিটকারি দেয় না বা
চোখ ভরা ধিক্কার নিয়ে কেউ ওর দিকে
ক্ষ্য করে না, যা অত্যন্ত প্রত্যাশিত।
টাই স্বাভাবিক, টিকেট চেকার বিনা
কেটের যাত্রীর জামা চেপে ধরে, অপমানকর
া বলে, যখন পয়সা আদায় করে অন্য
াত্রীরা তখন তাকিয়ে থাকে, হাসে, এবং
তা কী করে, কিন্তু সকল যাত্রীই যেন
গ্রাবের ভঙ্গিতে সমুদ্যত বাথরুমের দিকে
টে যাওয়া যাত্রীটির মতো, নির্বিকার।
কলে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। ত্রিদিবেশ
ান্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে টলে, চারদিকে
াকিয়ে কিছুটা স্বস্তিও বোধ করে এবং
িনের এই পরিবেশকে অচেনা বোধ হয়।
রেলগাড়ির নিয়মিত যাত্রী না, প্রয়োজন
য় না, তথাপি ও একান্ত অনভিজ্ঞ না।
িকেট না কাটার ঝটিতি সিদ্ধান্ত নেওয়ার
ান্য অত্যন্ত অনুশোচনা আর অপমানের
স্ট ওকে কিছুতেই সহজ হতে দেয় না,
এবং বারে বারে মনে হতে থাকে,
আকস্মিকতা কী কুৎসিৎ! খড়ের গাদায়,
গু মেশানো, খড়ের ডাঁটার মতোই সরু
লকলকে অতি বিষধর কালনাগিনীর
মতো। সহসা মনে হয় চেকারের চেপে ধরা
শরীরের অংশে নিজেরাই দাঁত বসিয়ে দেয়,
অথবা কামড়িয়ে দেয় নিজের হাত।

এক রাশ ধোঁয়া ঢোকে কামরার মধ্যে,
ছড়িয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এবং
ধোঁয়ার সঙ্গে ছাই কয়লার টুকরো ঝাপটা
দিয়ে আসে, যে-কারণে চোখ বন্ধ করতে হয়।
গাড়ির গতির মন্থরতার সঙ্গে সমস্ত
গাড়িটাই যেন উত্তর দিকে ঢালু হয়ে পড়ে।
ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাংক
চেপে ধরে পতন সামলায়। বাইরে এঞ্জিন
থেকে তিন বার হুইসলের শব্দ ভেসে
আসে, এবং কয়েক বারই বিরতি দিয়ে দিয়ে
তিন বার করে শব্দ ভেসে আসার মধ্যে,
কামরার মধ্যে, কে একজন চিৎকার করে
ওঠে, 'কোন্ শালা আবার চেন টানলো
দেখ।'

'আরে ও তো রোজই আছে।' আর
একজন বলে, 'দ্যাখ, এখানে রেল লাইনের
ধারে হয় তো কারোর শ্বশুরবাড়ি আছে।
মিছিমিছি হাঁটবে? চেন টেনে নেমে যাবে।'

যাত্রীর মন্তব্যে অনেকেই হেসে ওঠে,
এবং অন্য একজন গলা চড়িয়ে মন্তব্য করে,
'এতো তাড়া? তর সইছে না, একেবারে
গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েই বউকে গিয়ে
ধরবে নাকি?'

ত্রিদিবেশের সামনেই আসনের ওপর
জোড়াসন ভঙ্গিতে আসীন এক বয়স্ক লোক
বলে ওঠে, 'তা ধরুক, নিজের বউকে বই তো
নয়। তবে দরজায় হুড়কোটা যেন লাগায়।'

এই মন্তব্যে হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে
ওঠে এবং এই অতি স্পষ্ট হাসি ঠাট্টাও যেন
ত্রিদিবেশের কাছে অর্থহীন রহস্যময় বোধ
হয়, কারণ মাঝপথে চেন টেনে গাড়ি
থামিয়ে কোনো যাত্রীর নেমে যাওয়ার বিষয়
ওর কাছে অবাস্তব এবং অসম্ভব। এবং
অতঃপর কেউ তার শ্বশুরালয়ে গিয়ে স্ত্রী-
সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে বা এমন কি
দরজা বন্ধ করতে ভুলে যেতে পারে, সবই
কেমন অসম্ভব ইতর কেচ্ছার মতো শোনায়,
যে-কারণে ও হাসতে পারে না। অথচ ওর
দু পাশে সকলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে এ-ওর
গায়ে ঢলে পড়ে। সব থেকে আশ্চর্য লাগে,
বয়স্ক লোকটিকে দেখে, যার বয়স অনুমান
ষাটের কাছে পিঠে, তোবড়া মুখ, কয়েকটি
দাঁত এবং সারা মাথায় কয়েকটি মাত্র সাদা
চুল। তার হাসি নির্গত হয় যেন নাভিমূল
থেকে এবং বুকে গলায় জমানো নিষিক্ত
শ্লেষ্মার ঝিল্লিরবে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে
আরক্ত হয়ে ওঠে তার চোখ দুটো।

গাড়ি লাইনের ওপর স্থির হয়ে যায়,
বাইরে বাঁ দিকে একটি কারখানার শেড এবং
পাঁচিল। সত্যি কি কেউ চেন টেনে গাড়ি
থেকে নেমে যায়? কামরার মধ্যে সে বিষয়ে
কারোর কোনো কৌতূহল নেই এবং কে
যেন উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু খুড়োদা,
বউ যদি বাপের বাড়ি না এসে থাকে?'

বয়স্ক লোকটি স্বর চড়িয়ে বলে, 'সেটা
বুঝবে শাশুড়ি শালীরা। জামাইয়ের ঠ্যাপা
বলে কথা।'

নানা স্বরের উচ্ছ্বসিত হাসি প্রবলতর
হয়। ত্রিদিবেশের মনে পড়ে যায়, চটকলের
কেরানীদের চায়ের দোকানে অশ্লীল হাসি
ঠাট্টা কথাবার্তা, কখনো কখনো বাবার সঙ্গে
কারখানার কর্তার মিস্তিরিদেরও থাকে। অবশ্য
এখন যেমন চটকল না কারখানা, স্কুলের
সময় না, অতএব তাদের সঙ্গে এদের
মেলানো যায় না, কিন্তু ভাষা ভঙ্গি প্রায়ই
যেন অবিকল।

একজন চিৎকার করে জিজ্ঞাসার সুরে

বলে, 'কী হলো চেকারদা, আপনি কিছু বলছেন না কেন?'

রিসিভেশ ঘাড় ফিরিয়ে কামরার অন্য প্রান্তে তাকায়, যেখানে কালো কোট পরা ফর্সা বেঁটে মোটা লোকটি সকলের সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলে। হাতে তার পেন্সিল, কিন্তু সে যেন টিকেট চেক করে না, বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে হেসে হেসে নানান কথা বলে। সে এদিকে ফিরে বলে, 'যা জবাব আপনারাই তো করছেন, আমি আর কী করব। তবে শ্বশুরবাড়িতে বউ না থাকলেই বা কী? শুনেছি, শ্বশুরবাড়ির কুকুর বিড়ালও সুন্দর।'

হাসি আবার নানা স্বরের কলরোলে এবং একটি স্বরের চিৎকার, 'খালি শুনেছেন চেকারদা, দেখেন নি কোনোদিন?'

চেকার মুখ ফিরিয়ে ঝুঁকে নিচু হ[…] পড়ে একজন যাত্রীর মুখের কাছে। কি[…] বলে, কিছু শোনে, মাথা ঝাঁকায়। বয়[…] লোকটি বলে, 'চেকারের এখন এদিকে ক[…] দেবার সময় নেই। রাত্রে বউ শাড়ির কোঁ[…] পেতে বসে থাকবে, ওকে পকেট থেকে মা[…] ঢালতে হবে।'

'তা না হলেই হাঁপিয়ে জাম।' একজ[…]

পবয়স্ক যুবক পাশ থেকেই তৎক্ষণাৎ
। ওঠে।

এখন স্বর যেহেতু উচ্চ না, হাসি
মাবদ্ধ থাকে আশেপাশে কয়েক জনের
া। বাইরে থেকে হুইসেলের শব্দ ভেসে
স, গাড়িটা দুলে ওঠে এবং নানান যান্ত্রিক
দের মধ্যে আবার চলতে আরম্ভ করে।

'এই যে, বসো না ভাই, দাঁড়িয়ে থাকবে
তাক্ষণ?' বয়স্ক লোকটিরই স্বর।

ত্রিদিবেশের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে খোলা
জার বাইরে। স্বর শুনে ও মুখ ফিরিয়ে
কায়, বয়স্ক লোকটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়
এবং চাদর জড়ানো ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে
বার ব'ল, 'ব'লামা ভাই, বসো।' বলে সে
জেই খানিকটা সরে, জায়গা করে দেয়।
য়গার তেমন অভাব নেই, ত্রিদিবেশ
তেই কুণ্ঠিত, তথাপি বয়স্ক লোকটির
ায় ও না বসে পারে না, কারণ ভয় হয়,
র কথা না শুনলে ওকে বিড়ম্বনা ভোগ
রতে হতে পারে। এদের সকলের কথাবার্তা,
চরণ ভাবভঙ্গি এই রকম ভয় ধরিয়ে দেয়।
বলতে পারে বা না পারে এবং কি তার
রিণতি ঘটতে পারে, কিছুই অনুমান করা
য় না। ত্রিদিবেশ অনেকটা আত্মসমর্পণের
ঙ্গিতে বসে।

'চেকারটা কি অনেকগুলো পয়সা নিয়ে
য়েছে নাকি?' বয়স্ক লোকটি হঠাৎ
জ্ঞেস করে।

ত্রিদিবেশের কাছে অপ্রত্যাশিত এই
জ্ঞাসা এবং ও যুগপৎ ভীরু ও বিচলিত
য়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি ব'ল, 'না না। আসলে
ামার খুব তাড়া ছিল, টিকেট কাটতে
ায়েও...।'

'আরে ধুরসসা, গুলি মারো টিকেটে।'
য়স্ক লোকটি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'টিকেট
নেই, সে তো বুঝতেই পেরেছি। আমার
ক টিকেট আছে? এক বছর ডেলি
্যাসেঞ্জারি চালিয়ে দিলাম। লড়াই যদ্দিন
লে, চালিয়েও যাবো, না কী বলিস রে
বণ্টা?'

পাশের যুবকটি কোমরের বেষ্টনী থেকে
একটি সরু দীর্ঘ থলি থেকে পয়সা বের
রতে করতে বলে, 'তা বলতে পারিনে
ড়োদা। লড়াইয়ের জমানায় বিনি টিকেটে
সোলা যেরম হাত পাকিয়েছি, আর কি
টিকেট কাটতে হাত সরবে?'

ত্রিদিবেশের মুখোমুখি একজন বলে,
দরকারই বা কী। শ্যালদার গেটে পয়সা দিয়ে
মালটা পার করব, গাড়িতে চেকারকে কিছু
দেবো। এরকমটা চললেই হলো।'

ত্রিদিবেশ অভিভূত হয়ে পড়ে। বয়স্ক
লোকটি এক বছর টিকেট কাটে না, অথচ
দৈনিক যাত্রী। অথচ প্রথম আলাপেই ওর
ব্যস্ততা নিতান্ত লজ্জা বাঁচাবার কারণে,
টিকেট না কাটতে পারার জন্য ওর অতি
অনিবার্য ব্যস্ততার কথা জানালো, যা
এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় এবং বয়স্ক
লোকটি আবার বলে, 'তুমি বললা না. যদি
বেশি পয়সা নিয়ে থাকে, ডেকে আদায় করে
দেবো।'

ত্রিদিবেশ অতি ব্যস্ততায় মাথা নেড়ে
বলে, 'না না, বেশি নেয়নি।'

'আমরা তো তবু দিই। কল ফ্যাকটরির
লোকেরা তাও দেয় না।' বয়স্ক লোকটি
বলে, 'আমাদের তো তাদের মত করলে হবে
না, আমাদের সঙ্গে অনেক মালপত্তর থাকে,
বুঝলে না? আমরা ব্যবসা করে খাই।'

ত্রিদিবেশের চোখের সমুখেই যা বিরাজ
করে অথচ মন দিয়ে দেখার সুযোগ আসে
না, এখন তা ওর চোখে পড়ে। সমস্ত
বাংকগুলো নানাবিধ মালপত্রে ঠাসা।
বাজারের [illegible] তরকারি যা, দেখলেই
বোঝা যায়, মুদী ও মনিহারি মালপত্রে
ঠাসা, কাগজের বড় বড় ঠোঙায় যা শিল্প-
[illegible] এবং ত্রিদিবেশ এখন
বুঝতে পারে, [illegible] অসময়ের এই
গাড়ির অধিকাংশ যাত্রীরাই দূরে গ্রামীণ
অঞ্চলের মানুষ, ছোটখাটো দোকানদার
ব্যবসাদার যারা প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায়
যায় মাল কিনতে। সম্ভবত এ কামরার
সকলেই তা না, মনে হয় অধিকাংশই সম-
গোত্রীয়। কিন্তু ত্রিদিবেশ গাড়ির চেন টানার
কথাটা ভুলতে পারে না, এবং এখন অনুশ-
শোচনার কষ্ট, অপমানের আঘাত অনেকটা
কম অনুভূত হয়, ও জিজ্ঞেস করে, 'মাঝ
পথে চেন টেনে সত্যি কেউ নেমে গেল
নাকি?'

'তা ছাড়া আবার কী!' বয়স্ক লোকটি
তার মোটা ঠোঁট ফাঁক করে বলে, [illegible]
ফাঁকে তার [illegible] দাঁত
দৃষ্ট হয়, 'এ তো আকছার হচ্ছে, সব
গাড়িতেই প্রায় হয়। কল ফ্যাকটরির
লোকেরাই ওসব করে।'

সেই ছেলেটা, পাশের যুবক, যে আমার
পয়সা, আনি দু আনি এবং সিকি সরু
দীর্ঘ থলি থেকে বের করে আলাদা আলাদা
গোনে, সে বলে, 'ওদের ওভারটাইমের
পয়সার কথাটা ভাবো? টাকায় টাকা না,

টাকায় দু' টাকা। ওদের গরম হবে না তো কি গরম তোমার আমার হবে?'

'ভায়াকে তাই বলছি।' বয়স্ক লোকটি বলে, 'জিজ্ঞেস করছে কি না, সাঁত্য কেউ চেন টেনে নেমে গেল কি না? তা, ও যাদের কাজ, তাদের কথাই বলছি। তা ভায়ার কি এ পথে চলাচল নেই?'

ত্রিদিবেশ মাথা নেড়ে বলে, 'বিশেষ না।'

'সেই জন্যেই। চলবে?' বলে বয়স্ক লোকটি চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে একটি বিড়ি বাড়িয়ে ধরে।

ত্রিদিবেশ একবার দ্বিধার চোখে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকায় এবং তার ভ্রূকুটি চোখের দিকে তাকিয়ে ও প্রায় এক রকম ভয়ে চমকে উঠে বিড়িটি হাতে নেয়। লোকটি চাদরের ভিতর হাত দিয়ে, সম্ভবত জামার পকেট থেকে আর একটি বিড়ি এবং দেশলাই বের করে নিয়ে বলে, 'আমরা ভাই তোমাদের মত লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক নই, তবে জানবে সিগারেটের থেকে বিড়ি অনেক ভালো।'

হঠাৎ এই রকম একটি আকস্মিক প্রসঙ্গে ত্রিদিবেশ অবাক হয় এবং ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, ও ভদ্রলোক না, শিক্ষিত কখনোই না। কিন্তু জ্বলন্ত শিখা ওর সামনে এগিয়ে আসে। ও তাড়াতাড়ি বিড়ি মুখে নিয়ে ধরায়। বয়স্ক লোকটি জ্বলন্ত কাঠি নিচে ফেলে দিয়ে বলে, লড়াইয়ের জমানায় সবাই আজকাল সিগারেট ফোঁকে। কল ফ্যাকটরির বাবুদের তো কথাই নেই। সুসালা, জুতো পালিশ-ওয়ালা ছোঁড়াগুলোও দেখি সিগারেট ফোঁকে। মিলিটারি চলে গেলে তখন কি চুষবে বাবা? বাপের ইয়ে?'

গাড়ি ইস্টিশনে দাঁড়ায়, লোকজন সামান্য ওঠা-নামা করে। ত্রিদিবেশ কৌতূহলিত চোখ ফিরিয়ে চেক্যারকে খোঁজে। চেকার সুদীর্ঘ কামরার অন্য প্রান্তের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি দরজার দিকে।

'জমানাটাই বদলে যাচ্ছে, বুঝলে ভায়া? লেখাপড়া করে ওসব আর বোঝা যাবে না।' বয়স্ক লোকটি বলে।

ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়। ঠাট্টা বিদ্রূপে মজলিসী সরস ভাষায় যে অতি প্রগলভ, সে যেন কেমন বদলিয়ে যেতে থাকে, বলে, 'এখন না হয়, যুদ্ধের সময়, কলকারখানায় খুব কাজ চলছে, ওভারটাইম পেটাচ্ছে, বায়স্কোপ থিয়েটার দেখছে, আর সিগারেট খাচ্ছে, তারপরে? লড়াই যখন থেমে যাবে? তখন কী হবে?' কথা শেষ করেও তার ভুরু নাচতে থাকে, মাথা ঝাঁকাতে থাকে, যেন ত্রিদিবেশের কাছে জবাব দাবি করে।

ত্রিদিবেশ অস্বস্তি বোধ করে, কিছু বলে না। বয়স্ক বলে, 'চুরি করবে, ডাকাতি করবে। দেশটা চোর ডাকাতে ছেয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।' অনেকটা দৈববাণীর মতো সে শেষের কথা উচ্চারণ করে।

বিড়িতে কয়েকবার ঘন ঘন টান দিয়ে নিবন্ত আগুনকে জাগিয়ে তোলে, এবং আবার বলে, 'এখনই বা গাঁয়ে ঘরে কি হচ্ছে? টাকার খেলা! অভাবী ঘরে গিয়ে দেখ, একটা সোমত্থ বউ ঝি নেই, সব রোজগারে বেরিয়ে গেছে। মড়ক থেকেই শুরু, আকালে কে মরতে চায়? কিন্তু বাবুগিরি করছে কারা? শালারা আবার প্যান্টলুন পরে, চকচকে জুতো পরে, ওরা সব গাঁয়েরই ছেলে তো? নিজেদের মা-বোনদের বের করে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কতো দিন? লড়াই কি থামবে না ভেবেছে? সুয্যি শালা ইস্তক অস্ত যায়, লড়াই থামবে না? থামবে। তখন? তখন এরা কী করবে? এই কল ফ্যাকটরির লোকেরা, আর ফোঁপর দালালেরা? কোথায় থাকবে তখন মিলিটারি সাহেবরা—বাবারা? আমাদের ঘরে সিঁদ কাটবে তো? না কি, কাটবে না?' আবার তার ভুরু নাচে, ঘাড় নড়ে।

ত্রিদিবেশ আবার অস্বস্তিবোধ করে এবং অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই ঘটনা এবং প্রসঙ্গ কোন্ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে ও কিছুই অনুমান করতে পারে না। গাড়ি ইতিমধ্যে আবার ইস্টিশন ছেড়ে চলতে আরম্ভ করে, ধোঁয়ার সঙ্গে কয়লা আর ছাইয়ের গুঁড়ো ঝাপটা দিয়ে আসতে থাকে।

'রাত বিরেতে ব্ল্যাক আউটে এসব গাড়িতে চলাফেরা করবে, দেখবে চোরাই মাল পাচার হচ্ছে, আর মেয়েমানুষের কারবার চলছে।' বয়স্ক লোকটি আবার বলে, 'পুলিস জানে না? রেল কোম্পানি জানে না? সবাই সব জানে। টাকা টাকা টাকা, সব ওই টাকা! দেখলে না, চেকার শালা তোমার হাত থেকে কেমন থাবা দিয়ে পয়সা নিয়ে নিল? ওই রকম ভাবে নিচ্ছে সবাই। নিতে হলে ওরকম ভাবেই নিতে হবে, নেবেও। যুদ্ধ তো কী হয়েছে? এ তো কিছু না, তুমি দেখবে, পরে কী হয়, কি দিনকাল আসছে।'

ত্রিদিবেশের মনে হয়, গাড়ি অতি দ্রুতগামী এবং ওর আর বয়স্কর আশেপাশে সকলেই কেমন অন্যমনস্কভাবে অলস এবং অন্তর্লীন। বয়স্কর কথা কেউ শোনে না, অতএব কেউ কোনো জবাব দেয় না।

'ঝাঁটি বাবলার কাঁটা বেচে তুমি বড়-লোক হয়েছ, না?' বয়স্কর স্বরে জিজ্ঞাসা এবং ভ্রূকুটিতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ত্রিদিবেশ অবাক বিভ্রান্ত স্বরে শব্দ করে, 'অ্যাঁ?'

বয়স্ক বলে, 'দেখেছি তো, বাবলা কাঁটা বেচে টাকা করতে। কাগজের আলপিনের বদলি। তা বামুনের ঘরে লেখাপড়া জানা ছেলে হয়ে, তুমি বউকে তাদের হাতে তুলে দিলে কেমন করে? না, এক লাখ পিন, দু' লাখ হয়ে যাবে! এই নিজের চোখেই দেখা। টাকা ভাই, টাকা টাকা টাকা!'

'লোকটা নিজের মেয়ে আর ছেলের বউয়ের কথা ভুলতে পারে না।' ফিসফিস স্বর শোনা যায়।

ত্রিদিবেশ ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে পাশের যুবকের দিকে তাকায়। যুবক চোখের ইশারা করে হাসে। গাড়ির গতি কমে আসে, আর হুইসলের শব্দ জোরে আসে, তীক্ষ্ণ জোরালো স্বরের হুংকার।

ক্রমশ

হাওড়া সোসাইটি অব ফটোগ্রাফারস-
উদ্যোগে হাওড়ার সেন্ট টমাস গির্জা
ন ১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক রঙীন
াইড প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গত
বছর যাবৎ হাওড়ার এই সংস্থাই সমগ্র
ণয়ার মধ্যে নিয়মিতভাবে পৃথিবীর নানা
শর রঙীন স্লাইড প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান
র স্থিরচিত্র-জগতে একটি বিশেষ স্থান
ধকার করেছে: অবশ্য মাত্র গত বছরে
লিপিনস-এ এই-জাতীয় একটি প্রদর্শনী
। এবারে ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন
টি দেশ থেকে মোট ৯৮৩টি স্লাইড
সে। তাদের মধ্য থেকে মাত্র ২২০টি
র্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়। উন্নত
মেরা, ডার্করুমের আধুনিকতম নানা
শিল অবলম্বনে, বিদেশী স্থিরচিত্র
ল্পীগণ প্রধানত বিমূর্ত সমাবিমূর্ত ও
রিয়ালিস্টিক কমপোজিশনের ওপর
ধান্যদান করেছেন। ফলে, এক দিকে
মন নতুনত্ব ও নানা উজ্জ্বল রঙ বৈচিত্র্য
খা যায়, অপর দিকে, ক্ষেত্রবিশেষে, তেমন
ন্নমতার আভাস ধরা পড়ে। অপর পক্ষে,
য়কজন বিদেশী স্থিরচিত্রশিল্পী
াভাবিক অর্থাৎ ক্যানডিড আকার ও
পলাবণ্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন;
মন কি এ-দেশের অনেক শিল্পীও সেই
থ অবলম্বন করেছেন। ফলে, নিছক
িচিত্ত বস্তু বা স্বাভাবিক দৃশ্যই এঁদের
তে নতুনতর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।
থমেই চোখে পড়ে মার্গারেট বার্নস-এর
ালা সিলভার গ্রে। একটি ছোট্ট বিড়াল-
নার কচি ও সুন্দর মুখখানি শিল্পী
শেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ক্যামেরায় ধরে
েছেন। বার্নহার্ড অ্যালবার্ট-এর (পশ্চিম
ার্মানী), উইনটার ইভনিং-এর পরি-
শটুকু দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। নিজের
ীবন বিপন্ন করে তাৎক্ষণিক মুহূর্তটুকু
ভাবে ক্যামেরায় ধরা যায় তার একটি
ষ্ঠ নিদর্শন এক্সপ্লোসান। সোরেনসেক
বিক-এর (আমেরিকা) তোলা বিরাট
স্ফোরণের এই রঙীন স্লাইডটি অনেকের
ন গাঁথা থাকবে। অন্যান্য স্লাইডের মধ্যে
র্লস স্যাক্রাম্যান্টোর (ব্রাজিল) গির্জার
তরে তোলা কমুনহাও, লুসিয়ানো
াস্টারিনোর (আর্জেন্টিনা) পেন্তাগোনো
ার্ল ভার্টেনিয়াল-এর (আমেরিকা)
ানাসকুরাম কস, গার্ড মেসারশ্মিড্ট-এর
পশ্চিম জার্মানী) বেই ম্যাফেনার্ড,
দিক্যাবিও ইতালোর (ইটালি) এই মেয়ার,
অ্যানটোনিও মেন্ডানোর (স্পেন) পুয়েবলো,
সু হুয়াল চুঙ-এর (তাইওয়ান) হ্যাপি টাইম
ও মাইকেল ডুয়ার্ট-এর (বেলজিয়াম)
ম্যানেকুইন উল্লেখ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন
স্থান থেকে আগত ১৯৬টি স্লাইডের মধ্যে
মাত্র নির্বাচিত ২২টি স্লাইড প্রদর্শিত হয়।
এগুলির মধ্যে এস পলের তোলা মর্নিং
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে
রঙীন ক্যানডিড নিদর্শন হিসাবে। এর
পরেই ভাল লাগে প্রদীপ সেনের দার্জিলিং
ল্যান্ডস্কেপ—স্লাইডটির কমপোজিশন অংশ-
টুকুও লক্ষণীয়। অপরাপর স্লাইডের মধ্যে
পি কে দে-র ফ্রস্ট প্যাটার্ন ও সুমিত বসুর
রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড-এর নাম করা চলে।
এই প্রদর্শনীর জন্য উদ্যোক্তাদের যে সারা
বছরব্যাপী পরিশ্রম করতে হয় তা জানি
এবং সে জন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদার্হ।
তবুও তাঁদের কাছে অনুরোধ অন্তত
কয়েক দিনের জন্যও যেন তাঁরা কলকাতায়
এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

*

একদিন ছিল, অন্তত আমাদের শৈশব-
কালে, যখন মা-ঠাকুমা-দিদিমা রাত্রে
বিছানায় ছোট্ট ছেলে-নাতি-নাতনীকে
কোলের কাছে টেনে নিয়ে নানা রূপকথা
বলে যেতেন। কোন্ দৈত্য এক দেশের
রাজকন্যাকে পাতালপুরীতে বন্দী করে
রেখেছে...অন্য দেশের রাজপুত্র সেই কথা
শুনে সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল হাতে পক্ষিরাজ
ঘোড়ায় চেপে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে
চললেন রাজকন্যার সন্ধানে...। ছেলে
মেয়েরা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করত—তারপর?
তারপরে অবশ্য তারা ঘুমিয়ে পড়ত—হয়তো
বা স্বপ্নে দেখত রাজপুত্র দৈত্যকে মেরে
ফেলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করলেন।
কাল্পনিক রূপকথার মধ্য দিয়ে শিশু মনে
সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার
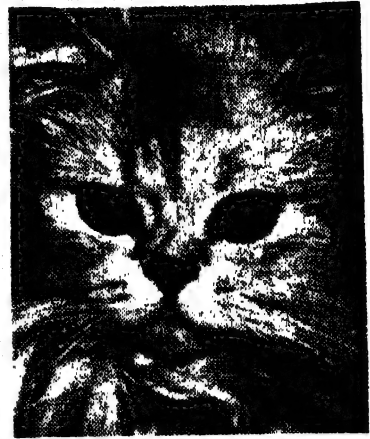
সিলভার গ্রে —মারগারেট বার্নস
(কালো-সাদা প্রতিলিপি) (আমেরিকা)

সংকল্পটুকু যেন গড়ে উঠত। এই-
জাতীয় দেশে প্রচলিত নানা রূপকথাই রঙ
ও রেখার মধ্য দিয়ে দেখা গেল অ্যাকাডেমি
গ্যালারীতে আয়োজিত পরিচিত শিল্পী
গোপেন রায়ের বিরাট প্রদর্শনীতে। অবশ্য
ছবিগুলি পুরানো, অর্থাৎ আগে আঁকা।

প্রসেশান —রথীন সাহা

গোপেন রায় মুখ্যত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য ছবি এঁকেছেন এবং ছবির মধ্য দিয়ে যেন তাদের মধ্যে রূপকথার পুনঃ প্রচলন হয়, সম্ভবত এটিই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ছবি বিক্রি করা বা শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সুদীর্ঘকাল তিনি যে অনবদ্য রঙের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সংরক্ষণ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সোনার কাঠি রুপোর কাঠি, পাতালপুরী, ঘুমন্ত-পুরী, সাতভাই চম্পা, শিয়াল পণ্ডিত, রাজা ও টুনটুনি, ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী ও স্বপ্নমাসী অবলম্বনে আঁকা রঙীন শিল্পসম্ভার দেখে কেবল যে ছেলেমেয়েরাই খুশী হয়েছে তা নয়, এমন কি আমাদের মত প্রবীণ ব্যক্তিরাও যে অল্পকালের জন্য ফেলে-আসা শিশুজগতে ফিরে গেছেন, প্রদর্শনীতে কয়েকজনের আগ্রহ দেখে তাও প্রমাণিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সহজবোধ্য, রঙীন চমৎকার ছবির মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি কাহিনী ও পরিবেশ যেন চোখের সামনে শিল্পী উপস্থাপিত করেছেন। আর একটি আকর্ষণ ছিল নানা-জাতীয় আধুনিক পুতুল। নতুনতর মাধ্যম ব্যবহার ও আকার বৈচিত্র্যের দিক থেকে এগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, এই বিচিত্র শিল্প-সম্ভার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মূল্যবান সম্পদ ও এগুলির সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি দেশের সরকার বা বেসরকারী কোনও প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে অবিলম্বে অগ্রণী হবেন।

*

শিল্পী রথীন সাহা অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১৪টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে যোগদান করলেও একক প্রদর্শনী হিসাবে এটিই শিল্পীর প্রথম প্রচেষ্টা। শিল্পী প্রধানত আধুনিক রীতিতে কাজ করেছেন, রঙ ব্যবহাররীতি পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত, যদিও দু-এক ক্ষেত্রে তিনি মাত্রা অতিক্রম করেছেন। কয়েকস্থলে ছবির অংশবিশেষের ওপর সজাগ দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে সেটি ঠিক রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি; যেমন—বোট। ওপরের অংশ বিষয়ে সচেতন হলে ছবিখানি আরও সুন্দর হত, সন্দেহ নেই। শিল্পীর রচনারীতি মিশ্র শ্রেণীর। দু-এক স্থলে তিনি প্রতীক মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, এবং সাফল্য লাভও করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রসেশান-এর নাম করা যায়। খয়েরের লম্বা লম্বা টান ও ছোট ছোট সাদা চতুর্ভুজ অবলম্বনে শিল্পী প্রতীক তথা ইঙ্গিতে মিছিলে যোগদানকারী দল ও প্রতিবাদ-পতাকার সামগ্রিক বিক্ষোভ-রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে মনে হয়, ব্রাউন ও কোনো রঙের পরিবর্তে অংশ-বিশেষে লাল রঙের আভাস থাকলে ছবিটি আরও বক্তব্যপ্রধান হত। লাল রঙ প্রধান গণেশ-এর ভাস্কর্যজাতীয় রূপ অনেকের চোখে ধরা পড়ে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ফিশারম্যান ও কমপোজিশন উল্লেখ্য।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সংগীত শ্যামলা-র ছাত্রছাত্রীদের একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিশু-শিল্প আজকাল বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এই প্রদর্শনীতে কয়েকটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুখের বিষয়, প্রদর্শনীটি দেখে বোঝা যায় যে, এই সংস্থায় আপন খুশিমত ছবি আঁকার সুযোগ যেমন দেওয়া হয়, তেমন ভাল ভাল ছবির প্রতিলিপি আঁকতেও কর্তৃপক্ষ বাধা দেন না। যাদের কাজ ভাল লাগে তাদের মধ্যে শশী শ্রেষ্ঠ (দি মুন), [illegible] দেশাই (সিস্কেপ), লতা অরোরা (চীনা ছবির প্রতিলিপি), নীনা কাকার (ওয়াইল্ড হর্সেস, তেলরঙ, সম্ভবত প্রতিলিপি), স্নিগ্ধা ওয়াহি (সানসেট) এবং ছোটদের মধ্যে হেমন্ত পিণ্ডা (ভিলেজ), সরোজ চৌরিপাল (পিকিং ফ্লাওয়ারস), ও শীলা লোহিয়া (দি সুইট গার্ল)-এর নাম করা চলে।

*

কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আগামী অক্টোবর মাসে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। এ বিষয়ে যাঁরা উৎসাহিত তাঁরা যেন সরাসরি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

চিত্রপ্রিয়

বাজেট ও আমরা

নানা নারী প্রতিষ্ঠানের অভিমত
হ করে দেখলাম, তাঁরা অনেকে মনে
ন, নারী মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট টাকার
থা বাজেটে হয়নি। গণ্যমান্য শিক্ষিত
থ বিভিন্ন বৃত্তিধারী নারীর বেশ বড়
ট অংশ ভাবছেন, এ বছর মহিলা
র হিসাবে অন্তত তাঁদের ধারণা ছিল,
ও একটু বেশী অর্থ তাঁদের মঙ্গলের
চ বরাদ্দ থাকবে। সরকার সেখানে
ন বদান্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম
ন। মেয়েরা তাই আপসোস করছেন।
নারী-সমাজের উন্নতির জন্য যে সব
কল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে পঞ্চ-
র্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্মসূচী
তার বাইরের সব সংকল্প মিলে অর্থ
াৎ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে
চার কোটি বাইশ লক্ষ টাকা।
লারা বলছেন, এ তো সমুদ্রে জলবিন্দুর
। অথচ মহিলা সমাজের উন্নতির জন্য
সব কার্যক্রম ঠিক হয়েছে তা খুবই
ভাবনাময়। বাষট্টি লাখ টাকা রাখা
য়েছে ক্রিয়ামূলক বা functional
eracy প্রোগ্রামের জন্য। আগামী বিত্ত
দরে তিন হাজার কেন্দ্র স্থাপন করার
য়োজন হচ্ছে। এ সব কেন্দ্রে পনেরো
ক পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েদের স্বাস্থ্য,
ষ্টি, শিক্ষা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশু
লন, শিল্প এবং পৌর বিজ্ঞান সম্বন্ধে
্যক শিক্ষা দান করা হবে। বাজেটে
ভাব্য ব্যয়ের খসড়ায় ৪৮ লাখ টাকা
র্দ করা হয়েছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত
থচ যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েদের, বিশেষ করে
ম্রী-অঞ্চলের মেয়েদের উপার্জনের
যোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য। এ অর্থের
শীর ভাগ খরচ হবে প্রাপ্তবয়স্ক
হিলাদের সংক্ষিপ্ত এবং বৃত্তিগত
ক্ষায়। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে
বচ্ছাসেবী সংস্থা আর কল্যাণ কর্মী
মিতিগুলিকে যাতে তারা অভাবগ্রস্ত ও
রীরিক অসুবিধাগ্রস্ত মেয়েদের জন্য
ছাট ছোট উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করতে
ারেন। মেয়েরা শিক্ষা সমাপন করে ঐ
ৎপাদন কেন্দ্রেই কাজ করবেন। প্ল্যানের
ন্তর্গত ষাট লাখ টাকা রাখা হয়েছে
র্মী কন্যাদের আবাস অর্থাৎ হস্টেল
ত্যাদি ব্যবস্থার জন্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
দি হস্টেল তৈরী করতে চান তবে এই
াকার সাহায্য নিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের জন্য
াখা হয়েছে এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা।
সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের দায়িত্ব মহিলা ও
শিশুদের মঙ্গল সাধন। পর্ষদের নিজস্ব

ঘরে বাইরে

খরচার জন্য আছে ৪৬ লক্ষ টাকা। ভারতীয় সোস্যাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন পাবেন দু লাখ টাকা। সোস্যাল হেলথ বা সমাজের নৈতিক সুস্থতার জন্য এই সংস্থা কাজ করেন। নৈতিক বিপদ থেকে নারীকে বাঁচানো ও তার পুনর্বাসন ব্যবস্থার কিছু দায়িত্ব এরা নেন।

দু কোটি আশি লাখ টাকা আন্ত-র্জাতিক মহিলা বৎসরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-গুলি প্রচারের জন্য খরচ করা হবে। পুস্তিকা, প্রদর্শনী ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য বিশেষ করে বরাদ্দ হয়েছে এই অর্থ। সব দিক বিবেচনা করে মহিলা-সমাজ ক্ষুব্ধ। এত বড় বিরাট দেশের হিসাবে অর্থ বরাদ্দ নেহাৎ যৎসামান্য।

এ তো গেল ব্যাপক ব্যবস্থার কথা। অন্দরে সে যেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সেখানে সে কি ভাবছে? অনেকের মত এবার বাজেট কড়া বা উগ্র নয়। কিন্তু অন্তঃ-শুল্ক অথবা আবগারী শুল্ক অর্থাৎ excise duty-কে নিয়েই এবার বাজেটের মুখ্য আদায়ের ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতিতে বিদেশের আমদানী স্পর্শ করা বিপজ্জনক। আমাদের কর গরীবের বিড়িকেও বাদ দেয়নি। তার উপর চীনা-মাটির বাসন, কাচের জিনিস থেকে শুরু করে প্রসাধন সামগ্রী ও অঙ্গরাগ, চিনি, চা, কাপড় বহু জিনিসে কর বসানো হলো। করের বোঝা প্রসাধন সামগ্রীতে গতবারও বর্তিয়ে ছিল। মাথা-ধরা থেকে নিয়ে শ্রান্তি ক্লান্তি অপনোদনের উপাদান চায়ের পেয়ালাটুকুতেও সরকার বার বার হাত দিচ্ছেন। আমার প্রতিবেশী কমলা ভট্টাচার্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সংসার চালিয়ে, ছেলেমেয়ে সামলিয়ে, স্কুলের পাঠ পড়িয়ে কষ্টের লাঘব করেন বহু কাল্পনিক

সাহিত্য সংবাদ

আনন্দ পুরস্কার

বছর সাহিত্যের জন্য আনন্দ পুরস্কার
ম শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী এবং শ্রীশক্তি
াধ্যায়। পুরস্কার দুটির একটির নাম
কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার এবং
চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার।
টির অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

ই পুরস্কার ঘোষণার কয়েক দিন
শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। উনি
আমাকে চিনতে পারেন নি। তারপর
ন, ও তুমি নাকি। দ্যাখো, আমার
শক্তিটা একেবারে গেছে। বয়েসও
সাতাশি বছর হলো কিনা!

নে আমি স্তম্ভিত! শিবরাম
র্তীর বয়েস সাতাশি বছর? সাতাশি
র লোক ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ায়?
রেস্টে একা ওমলেট খায়? ওঁর বয়েস

শিবরাম চক্রবর্তী

। আমি প্রতিবাদ জানাতেই উনি
ন, তা হবে না কেন? মনে করো,
র জন্ম যদি হয় আঠারো শো সাতাশি
ছিয়াশিতে।

জন্মটা কি একটা মনে করার ব্যাপার?
তো একটা পাকাপাকি ঘটনা। শিবরাম
র্তীর বয়েস কেউ জানে না। কারুর
র ধারণা সত্তর-বাহাত্তর, আমার ধারণা
-বাহাত্তর। সদা হাস্যময় একজন
র, যিনি সব সময় অপরের প্রশংসা
জন্য ব্যগ্র। শিবরাম চক্রবর্তীর মুখে
কোনোদিন পরনিন্দা শুনেছে কি?
দিন সিল্কের জামা ছাড়া অন্য কোনো
ও তাঁকে পরতে দেখিনি।

শিবরাম চক্রবর্তীর পাঠক তিন প্রজন্মের। তিনি শুধু একজন লেখক নন, তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একটা বিশেষ রকমের বাক-রীতিই শিবরামীয়। চায়ের দোকানে, ট্রামে বাসে, আড্ডাখানায় যুবকরা এক বিশেষ ধরনের রসিকতা করলেই অন্য কেউ বলে উঠবে, তুই যে শিবরামের মতন কথা বলছিস রে! একজন লেখকের জীবিতকালেই এ রকম প্রবাদ-প্রসিদ্ধি সারা পৃথিবীতেই বিরল।

শিবরাম চক্রবর্তীর আর একটি বড় গুণ তিনি অবিরল লিখতে পারেন। সরস রচনা ক্রমাগত লিখে যাওয়ার জন্য অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর নির্মল হৃদয়ের জন্য। এখনো প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি একাধিক রচনা লেখেন, এ রকম লিখে যাচ্ছেন বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে, আমার জন্মেরও আগে থেকে।

শিবরাম চক্রবর্তীর এই সম্মান পুরস্কারে আমরা তাঁকে আমাদের প্রবল খুশীর কথা জানাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও ইতিমধ্যেই কিংবদন্তীর পুরুষ। বহু সত্য-মিথ্যে কাহিনী তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলার তরুণ সমাজে ছড়িয়ে আছে এবং ক্রমশই আরও ছড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পর এত বেশী সংখ্যক কবিতা সম্ভবত আর কোনো প্রধান কবি লেখেন নি এবং এত বেশী জনপ্রিয়তাও আর কেউ পান নি। বিশুদ্ধ শব্দের পূজারী এই কবি বাংলা কবিতাকে এক নতুন রূপ দিয়েছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে লিখতে শুরু করেছিলেন গল্প। তখন লিখতেন স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামে। পরে এক সময় রূপচাঁদ পক্ষী নামে 'দেশ' পত্রিকায় অনেকগুলি রম্য রচনা লিখেছেন। তাঁর স্বনামে প্রকাশিত উপন্যাসও চার পাঁচটি। তবে কবিতাই জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

তাঁর প্রথম দিককার কবিতা প্রকাশিত হয় অগ্রণী ও কৃত্তিবাস পত্রিকায়। তারপর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বাঙালী পাঠকদের মধ্যে। শব্দ ব্যবহারের অসম্ভব দক্ষতায় তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দেন। ছন্দের সার্থক ব্যবহার এবং অনায়াসে ছন্দ ভাঙা—এই দুটিই তিনি পারেন সমান অবলীলায়। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে, ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো; সোনার মাছি খুন করেছি; অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে; পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি; জ্যোৎস্নায় অরণ্যে পোস্টম্যান; প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই; শ্রেষ্ঠ কবিতা।

মাঝে মাঝে তিনি কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা' অন্যতম। তাঁর 'উইক এণ্ড' নামের বইটি টুরিস্ট গাইড হিসেবে একটি প্রয়োজনীয় বই।

ইদানীং তিনি ঝুঁকেছেন অনুবাদের দিকে। পর পর অনুবাদ করেছেন কালিদাসের মেঘদূত, ওমর খৈয়ামের রুবায়েত এবং মীর্জা গালিবের কবিতা (আয়ান রশীদের সঙ্গে)। এখন হাত

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দিয়েছেন কালিদাসের কুমারসম্ভব অনুবাদে এবং শুনেছি, ভগবদ্‌গীতায়।

পুরস্কার জিনিসটাকে আমরা খুব একটা মূল্য দিই না সব সময়। এতে কোনো লেখকের সম্মান বাড়ে না বা কমেও না। তবে টাকা পয়সার ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা মনে করি, এই রকম বড় কোনো পুরস্কার শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। এবং এই মাত্র জানতে পারলুম, শিবরাম চক্রবর্তী এর আগে আর একটাও পুরস্কার পান নি! আশ্চর্য কাণ্ড!

সনাতন পাঠক

ক্ষত খুব সহজেই দূষিত হয়ে ওঠে

তা সুরক্ষিত রাখতে

নতুন

ব্যাণ্ড-এইড পট্টি লাগান

ব্যাণ্ড

তাড়াতাড়ি
আরামের জন্য এখন এটি
মার্কিউরোক্রোম
ঔষধিযুক্ত

ধুলো আর ময়লা নিয়েই তো বাচ্চাদের জগৎ।
কিন্তু তাদের ক্ষতস্থানে কোনক্রমেই ধুলোময়লা লাগতে দেওয়া উচিৎ নয়।

সব রকমের সামান্য কাটা, ছড়ে যাওয়া বা ঘসটানি লাগার ক্ষেত্রে ব্যাণ্ড-এইড* পট্টি লাগান, যেটি এখন মার্কিউরোক্রোম ঔষধিযুক্ত—কাটা চামড়ার ক্ষতে আরাম আনতে ও উপশমে সাহায্য করতে এটি প্রমাণিত এন্টিসেপটিক।

এর থেকে বেছে নিন : কাটা ও ঘসটানিতে লা[illegible] স্ট্যাণ্ডার্ড স্ট্রিপ। আঘাত একটু বেশী হ'লে লার্জ স্ট্রিপ। ক্ষত খুব গুরুতর হলে জায়েন্ট স্ট্রিপ নিন। ফোস্কা ও ব্রণর জন্য স্পটস্। যেখানে পট্টি লাগানোর অসুবিধে, তার জন্য প্যাচেস্। সব কিছুই পাওয়া যাবে ৫টির স্ট্রিপে।

জমিয়ে তোল খেলার আসর
ব্যাণ্ড-এইড* পট্টি হবে দোসর

নতুন

ব্যাণ্ড-এইড* পট্টি

ক্ষতের ময়লা ও আরামের ক্ষেত্রে বিখ্যাত না[illegible]

A Johnson & Johnson product

*TRADEMARK © J & J

OBM-4314-BE[illegible]

সারা পৌঁছানোর সময় [illegible] ভবিষ্যতের
জী সমাজের চিত্র দিয়ে [illegible] L
n Toffler তাঁর Future Shock-এ
বিভাগে এ সংক্রান্ত পর্বে আলোচিত
ছে) আমাদের পরিবর্তনের জন্য
ী থাকতে বলেছেন। যদি প্রস্তুত না
ক তবে ভবিষ্যতের ধাক্কা আমরা
লাতে পারবো না এই ছিল তাঁর
ধানবাণী। David Bell-এর Post
lustrial Society পুস্তকের বক্তব্যও
পসমৃদ্ধির পরবর্তী অবস্থা নিয়েই।
বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা ধরেই
রছেন যে শিল্পসমৃদ্ধি আমাদের চাই-ই—
কিছু নতুন তাই ভাল, যা কিছু বড়
বরণীয়। সুতরাং যদি কোন অসুবিধা
স্থিত হয় তবে সেটাকে মানিয়ে নেবার
য ব্যক্তির। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য
র কিন্তু আলাদা। টেইলর শিল্প-
দ্ধির সংগে সংগে যে পরিবর্তন আসছে
ভাল বলে মনে করেন না। তাঁর স্বদেশ
টেনে এবং পশ্চিমী দুনিয়ায় যে পরিবর্তন
সছে এবং আসছে তা তাঁকে গভীরভাবে
লিত করেছে। তিনি তাই এ ব্যাপারে
নর্বিবেচনার দাবি করেছেন। বলছেন,
বার চিন্তা করো আমরা যে পথে যেতে
চ্ছি সেটা আমাদের কাম্য কি না।

গর্ডন টেইলর বলছেন যে, আজ
শ্চমী দুনিয়ায় এই ধারণা ক্রমশই দানা
ধছে : কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে।
জকের তরুণেরা কেন এত অশান্ত, কেন
রা আর জীবনে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না।
গে লোকের বিশ্বাস ছিল দারিদ্র্যই সমস্ত
খের কারণ। আজ পশ্চিমী দুনিয়ায়
রিদ্র্য (এখানে অন্নকষ্ট এবং অন্যান্য
নৈতিক ব্যাপারের কথা বলছেন টেইলর)
র দূর হয়েছে। কিন্তু সুখ আসেনি।
ম্যুনিজমে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের
শ্বাস ছিল শ্রমিকরা মালিক হলেই সমস্ত
সুবিধা দূর হবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা
য়নি।

মানুষ নতুন নতুন উপকরণের অভাব
রী করেছে। নতুন মডেলের গাড়ি
ই, নতুন ঢঙের বাড়ি চাই, নতুন ছাঁদের
মা চাই, একটার বদলে দুটো গাড়ি চাই।
ধারণ টি ভি-র বদলে রঙীন টি ভি চাই।
ঙ্গে সংগে নষ্ট হয়েছে আমাদের সমাজ-
জীবন। আগে গ্রাম আর পাড়া ছিল সমাজ-
জীবনের কেন্দ্রস্থল আজ আর তা নেই।
ম আর পাড়া মানুষকে একটা ভরসা
ত। গ্রামের ডাকঘর কিংবা পাড়ার মুদি-
নায় যে কেনাবেচা চলত তা শুধু নিছক
বসা ছিল না তাতে লাগতো আত্মীয়তার
র। আজ এই আত্মীয়তার স্ফূর্তি আর
ই। সুপার মার্কেটে পাড়ার মুদিখানা
থেকে অনেক বেশী জিনিস পাওয়া যায়,
কিন্তু দোকানীর সপ্রেম ব্যবহার মেলে না।
পারিবারিক জীবনেও এ ঢেউ এসে লেগেছে।
পরিবারে বাবার সময় নেই ছেলেমেয়েদের
সঙ্গে কথা বলার, ইচ্ছা নেই তাদের সংগে
সময় কাটানোর। মা-ও একই পথের পথিক।
শিশুপালন পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছে, বাচ্চাকে
শুধু খাবার সময় খাবার দেবে তাকে নিয়ে
মাখামাখি করবে না। এর ফলে ছেলেমেয়েরা
যেভাবে মানুষ হচ্ছে তাতে শিশু অপরাধের
মাত্রা বাড়ছে। সংগে সংগে বাড়ছে আত্ম-
হত্যার গড় হিসাব, মানসিক অসুস্থতার
হার।

আজকের চাকুরীস্থলও অনেক বেশী
নীরস, অনেক প্রাণহীন। আজকের তথা-
কথিত, মালটি ন্যাশনাল করপোরেশনগুলি

Rethink by Gordon Rattray Taylor.
Pelican Books 70p

আয়তনে বৃহৎ হয়ে একটা দেশের অর্থ-
নীতিকে প্রায় গ্রাস করছে। কিন্তু তারা
সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে খুব কম।
আজ তাই ইউরোপ আমেরিকায় নদীতে
মাছ মরে যায়, হাওয়া দূষিত হয়ে রোগ
বৃদ্ধি করে। মানুষ নিজেকে যন্ত্রের দাস
বলে মনে করে।

গর্ডন টেইলর তাই বলছেন, আমাদের
চাই প্রয়োজনভিত্তিক সমাজ। আমরা চাই
না উপকরণ-ভিত্তিক সমাজ। টেইলর বলছেন,
সমাজে দুটো দিক আছে। এদের তিনি
বলেছেন পিতৃশাসিত (প্যাট্রিস্ট) এবং
মাতৃক (ম্যাট্রিস্ট)। পিতৃশাসিত সমাজে
বিশ্বাসীরা খুব গোঁড়া, তারা শৃঙ্খলার
ওপর খুব জোর দেন। এই সমাজে যৌন
ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি থাকে এবং উন্নতির
প্রধান সোপান হিসাবে এঁরা দেখে নেন
কঠোর পরিশ্রমকে। এখানে নারীর স্থান
খুব নীচুতে। মাতৃক সমাজ এর উল্টো।
এখানে সমাজ অনেক উদার—বিশেষ করে
যৌনতা বিষয়ে। এই সমাজে [illegible]
উন্নতিই প্রধান। এরা অনেক [illegible]
কম শ্রমশীল এবং ভবিষ্যতের দিকে এদের
নজর বেশি। টেইলর বলছেন দোলনার
দুলুনির মতো সমাজ একবার এদিকে আবার
অন্যদিকে [illegible] এবং [illegible]
ইতিহাস থেকে [illegible] পিতৃ-
শাসিত সমাজ কেমন [illegible] এসেছে আবার
পরেই এসেছে মাতৃক সমাজের প্রায়
উচ্ছৃঙ্খলতা। 'হিপি' শব্দটি আবিষ্কারের
আগেও হিপি সমাজ ইউরোপে ছিল।

গর্ডন টেইলর মধ্যপন্থী। তিনি কোন
সময়ই উগ্রপন্থা চান না। তাঁর লক্ষ্য
সমন্বয়। তিনি মনে করছেন সমাজ বর্তমানে
মাতৃক অবস্থার দিকে ঝুঁকছে। তিনি চান
সংমিশ্রণ। অর্থনীতি সমাজব্যবস্থা সব
ব্যাপারেই তিনি মধ্যপন্থাকে শ্রেষ্ঠ পন্থা
বলে মেনে নিয়েছেন। যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে
তার আপত্তিও এইখানেই। যন্ত্র সমাজের
নিয়ামক হোক এটা তিনি চান না। সমাজ
নিয়ন্ত্রণ করবে যন্ত্রকে। আজকে যারা যন্ত্র
এবং কর্মপিস্তুতিদের জয়গানে মুখর তারা
সমাজকে ভেঙেচুরে দিতে চলেছে এই
সাবধানবাণীই তিনি উচ্চারণ করেছেন।

সামাজিক মতবাদেও তিনি মধ্যপন্থী।
তিনি বলেন, পুঁজিবাদ বিশ্বাস করে :
মানুষ আসলে খারাপ আর সাম্যবাদ মনে
করে, মানুষ আসলে ভাল। টেইলর এ দুটোর
কোনো একটিকেই পুরো সত্য বলে মেনে
নিতে নারাজ। তিনি চান মানুষ উগ্র মতবাদ
ছাড়ুক। মানুষ তার নিজের পারিপার্শ্বিক
সম্বন্ধে আরো সচেতন হোক। সমাজ আরো
বেশী গ্রাম এবং পাড়া-ভিত্তিক হোক। একটা
সমাজকে আলাদা করে যে সব চিহ্ন দিয়ে
চেনা যায় সেগুলি অক্ষত থাকুক
(এই প্রসংগে কোকা কলোনাইজেশন
সম্বন্ধে কিছু কঠিন কিন্তু মনোজ্ঞ
উক্তি তিনি করেছেন)। ক্ষমতার
বিকেন্দ্রীকরণ তিনি অত্যাবশ্যক মনে
করেন। আর প্রয়োজনীয় মনে করেন
মানসিক অসুখের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে
জোরদার করা। যে সমাজের কথা টেইলর
ভাবছেন তার নাম তিনি দিয়েছেন
Para-primitive society.

বইটা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন
বিলাতী কোন সর্বোদয় নেতার লেখা
পড়ছি। আমাদের দেশে সর্বোদয় সম্বন্ধে
আগ্রহ বেশী নেই তবে সাহেবরা আগ্রহী
হলে হয়তো আমরাও হব। বইটিতে যে
সমাজের বর্ণনা আছে তা ভারতীয় সমাজ
নয়। ভারতে শিল্পোন্নয়ন কিছুটা হলেও
ভারত ইংলণ্ড আমেরিকা যে অর্থে শিল্প-
সমৃদ্ধ সে অর্থে শিল্পসমৃদ্ধ নিশ্চয় নয়।
[illegible] বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের
[illegible] প্রথম কথা
[illegible] কথা
[illegible] কিছু
[illegible] দ্বিতীয়ত আমরা শিল্প-

সমৃদ্ধির পথ নিশ্চিত ভাবে বেছে নিয়েছি, তবু এখন কি ভাবে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছব তাই নিয়েই। কিন্তু শিল্পসমৃদ্ধির জন্য পশ্চিমীরা যে চরম মূল্য দিয়েছে আমাদের কি তা দিতেই হবে? আমরা কি আমাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে কোকা-কলোনাইজেশন বরণ করবো? আমাদের পরিবার প্রথার পরিবর্তন হচ্ছে। যৌথ পরিবার প্রথা আজকের দিনে সম্ভব নয়। কিন্তু পরিবর্তন মানেই কি বিসর্জন? আমাদের দেশে দারিদ্র্য সর্বব্যাপী। এই দারিদ্র্য দূর করতে আমাদের হবেই। পশ্চিমীজগত তাদের দেশবাসীর মুখে অন্ন জুগিয়ে তবে এইসব ভাল ভাল চিন্তা করছে। আমাদেরও প্রধান দায়িত্ব আট কোটির মুখে অন্ন যোগানোর, তারপর মানুষের মতো বেঁচে থাকার [illegible]। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছে [illegible] ভুলে [illegible] সমস্যাকে [illegible] চলবে না। সবাই আমাদের কাম্য নয়।

প্রিয়

ক্রিকেটে এবারের পদ্মশ্রী

খেলা এবং খেলায় [illegible] ভারত সরকার এ বছর [illegible] দুজনকে সম্মানিত করেছেন। ভারতীয় [illegible] টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] রাজকুমার খান্না পেয়েছেন পদ্মভূষণ খেতাব। পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি ক্রিকেটার এবং বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক সমিতির সদস্য পঙ্কজ রায়।

সরকারের খেতাব বিতরণের ব্যাপারটা ক্রিকেটের মতই অনিশ্চিত। পঙ্কজ রায় টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ১৪ বছর আগে, প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকেও সাত আট বছর। পঙ্কজের চেয়ে কীর্তিতে খাটো এবং বয়সে ছোট অনেকের ক্ষেত্রে সরকারী সম্মান বিতরণে বিলম্ব ঘটেনি। এমন কি টেস্ট ক্রিকেটে অভিষিক্ত হয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্ট সেঞ্চুরির সুবাদে পদ্মশ্রী খেতাব পেয়ে গেছে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথও। আর ভারতীয় ক্রিকেটে যার অবদান সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণীয় সেই পঙ্কজ রায়ের ক্ষেত্রে এত দেরি! এই দেরির ব্যাপারে এক বন্ধু রসিকতা করে বলছিলেন আরে পঙ্কজ নামেই তো—যে পঙ্কে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ পদ্ম। আর শ্রী-র দিক দিয়েও তো ওর কিছু কমতি নেই। পদ্মশ্রী খেতাবে আর ওর কতটুকু শ্রী বাড়বে? বাংলার পঙ্কে জন্মেছে বলেই সরকারী 'শ্রী' যোগ হতে দেরি হয়ে গেল।

হ্যাঁ, বাংলা ক্রিকেটের উষর ভূমিতে প্রস্ফুটিত বিরল পদ্ম হচ্ছেন পঙ্কজ রায়। সহজাত প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ নয়। কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁর নিষ্ঠ সাধনা এবং নৈরাশ্যের সঙ্গে সংগ্রামে সবচেয়ে সফল বাঙালী ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়। টেস্ট ক্রিকেটে প্রবীর সেন, পুটু চৌধুরী, সুধাংশু (মন্টু) ব্যানার্জী ও সুটে ব্যানার্জীর পর পঞ্চম বাঙালী। কিন্তু কীর্তিতে প্রথম। ওর রেকর্ডের ধারে কাছেও কেউ আসতে পারেনি। ভারতীয় ক্রিকেটে কীর্তি অনেক পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের চেয়ে অনেক বেশি। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের যে একটি মাত্র বিশ্ব রেকর্ড তার অংশীদার।

পঙ্কজের ক্রিকেট জীবন সম্পর্কে একটি বর্ষ-পঞ্জীতে এই রকম লেখা আছে—

বাংলার খেলোয়াড়। জন্ম কলকাতায় ৩১-৫-২৮ তারিখে। চশমাধারী ডান হাতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান, যার হাতে আছে মনোহারী জোরালো স্ট্রোক। ব্যাক কাটের মারে বাহার বেশি। আউট ফিল্ডের নির্ভরযোগ্য ফিল্ডার। রণজি ট্রফিতে বাংলার পক্ষে প্রথম খেলা ১৯৪৬-৪৭এ উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরি। অপরাজিত ১১২ রান। তারপর রণজি ট্রফিতে সেঞ্চুরি ২২ টি। তার মধ্যে একই ম্যাচের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি আছে দুইবার। সর্বোচ্চ রান—১১৩, ১৯৫৮-৫৯ এ বিহারের বিরুদ্ধে।

১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত একটি খেলা বাদে সব খেলায় বাংলার অধিনায়ক। তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক। মোট ৪৩টি টেস্ট—ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১৪টি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৯টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯টি, নিউ জিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮টি। সফর—ইংলন্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ৫টি সেঞ্চুরি সহ ৪৩টি টেস্টে ২৪৪২ রান। গড় ৩২.৫৪। ক্যাচ ১৬টি। টেস্টে সর্বোচ্চ রান ১৭৩, ১৯৫৫-৫৬ সিরিজে মাদ্রাজে নিউ-জিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে; যে রানের সুবাদে

পঙ্কজ রায়

বিনু মানকড়ের সঙ্গে প্রথম জুটির বিশ্ব রেকর্ড ৪১৩। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পাঁচ হাজারের উপর রান। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল এবং সিলভার জুবিলি ওভারসীজ দলের বিরুদ্ধে বে-সরকারী টেস্ট এবং প্রচুর প্রতিনিধিমূলক খেলা। ১৯৫২য় ইংলণ্ডের নর্দার্ন ক্রিকেট লীগে র‍্যাকপুলেও খেলা এক বছর। ফুটবলে রাইট ইন হিসাবে খ্যাতি। সফরকারী বরমা দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব।

এই পরিসংখ্যানের মধ্যে পঙ্কজের ক্রীড়াজীবনের অনেক কিছুর উল্লেখ নেই। প্রথম শ্রেণীর প্রথম খেলায় যেমন সেঞ্চুরি করেছিলেন, তেমনি প্রথম প্রতিনিধিমূলক খেলায় সেঞ্চুরি করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, বাংলার গভর্নরের দলের পক্ষে। নেই তাঁর ক্লাব ও কলেজ ক্রিকেটে বড় বড় রানগুলির উল্লেখ। উল্লেখ নেই একটি গৌরবময় ভূমিকারও। ভারতের প্রথম

[illegible] টেস্ট ক্রিকেট [illegible] ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে [illegible] ভারত [illegible] বিজয়ী হয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে একটি নতুন [illegible] টেস্টের ইনিংস [illegible] রানই। এবং [illegible] রান)। ঐ টেস্টে ইংলণ্ডের [illegible] ছিলেন অবশ্য ডোনাল্ড কার।

অধিনায়কের সম্মান [illegible] পঙ্কজকে উপেক্ষা করার কথাও পরিসংখ্যানে নেই। এবং লেখা নেই ১৯৫৯এ অধিনায়ক দত্ত-জিরাও গাইকোয়াড়ের অসুস্থতায় লর্ডস টেস্টে অধিনায়কত্ব করার কথা। যে টেস্টে মে, কাউড্রে, ব্যারিংটন, ইভান্স, ট্রুম্যান স্ট্যাথামের তারকাখচিত ইংলন্ড দলও হেরে যেতে পারত, ভাগ্য একটু সহায় থাকলে। কিংবা ভারতের ফিল্ডারদের হাতের মধ্য দিয়ে ভাগ্য গলে না গেলে। ১০০ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টি উইকেট পড়ে যাবার পর দুটি লোপ্পা ক্যাচ পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় ফিল্ডারদের দুই বড় হাতের মধ্যে থেকে। পঙ্কজ আমাকে বলেছেন, সহ খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকৃত এবং ঈর্ষামিশ্রিত অক্ষমতায় জন্যই ঐ টেস্ট জিততে পারিনি।

ক্রিকেটে পঙ্কজের প্রতিষ্ঠার মূলে আছেন তিনজন সুহৃদ। প্রথম স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রধান পরিচালক এবং ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকপাল এম দত্তরায়। দ্বিতীয় বিজয় মার্চেন্ট। তৃতীয় ইংলণ্ডের প্রাক্তন উইকেট কিপার জর্জ ডাকওয়ার্থ। এম দত্তরায়ই পঙ্কজকে বার বার টেস্টে খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন, ইংলণ্ডে পর পর ৪টি টেস্ট ইনিংসে শূন্য করার পরও। বিজয় মার্চেন্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন ইনিংস সূচনা করার। এবং ১৯৫১-৫২য় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দুজনে ইনিংস সূচনা করে মার্চেন্ট সরে গিয়েছিলেন পঙ্কজের পথ পরিষ্কার করতে। আর প্রথম টেস্টে মাত্র ১২ রানের পরিসরের মধ্যেই এম সি সি দলের ম্যানেজার ডাকওয়ার্থ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—ছেলেটির জন্য টেস্ট ক্রিকেটের অনেক সম্মান অপেক্ষা করছে।

পঙ্কজের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ইনিংস কোনটি? আমি বলব, একটি নয়, দুটি। এবং টেস্ট খেলায়ও নয়। ১৯৬৩তে ইডেনে রনজির কোয়ার্টার ফাইনালে হায়দরাবাদের দুই ইনিংসের দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন বর্বর বোলার [illegible] [illegible] মাথার [illegible] উড়িয়ে দিতে [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] বোলার [illegible] [illegible] সেঞ্চুরির সুবাদে

ঙ্গ
জগৎ

জাতীয় পুরস্কারের নীতি রীতিমত ধাঁধা। গতবার তো নতুন পরিচালকদের ছাড়া আর সব ছবিকেই প্রায় বাতিল দেওয়া হল। বিচারকদের তরফে ানো হয় যে, নতুন প্রতিভাকে স্বীকৃতি রাই বিচারকদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং, ানো প্রতিভার অসাধারণ ছবিও গ্রাহ্য না। বার্ষিক জাতীয় পুরস্কারের সময় বার এসেছে। এবারের নীতি আরও ধিগম্য। এই বছর কাহিনীচিত্রের জন্য টি নতুন অ্যাওয়ারড-এর কথা ঘোষণা া হয়েছে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের যে কাহিনী- ত্রর "জনসাধারণের কাছে আবেদন আছে, স অ্যাপিল), যার পুরোটাই আমোদ াল টাইম এনটারটেনমেনট) এবং যার নমূল্য (অ্যাসথেটিক ভ্যালু) রয়েছে" ন ছবিকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া

তামতের মন্তাজ

ব। সরকারের পরিকল্পনা বোধ হয় সুস্থ ারশিয়াল ছবি বা উপভোগ্য চিত্রকেও ীকৃতি দেওয়া। অথবা এই ঘোষণার দ্বারা াই বোঝায় যে, যে ছবি বকস-অফিসে ল অথচ সুস্থ প্রমোদ-পূর্ণ সেটাকেই রস্কার দেওয়া হবে। এখানে নন্দনতত্ত্বের াটা আসে কোথা থেকে? অ্যাসথেটিক লা যদি কোন ছবির থাকেই তবে তো টা শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবেও গণ্য হতে রে। অতএব এই নতুন পুরস্কারের কোন ক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

* * *

হয়তো অ্যাসথেটিক কথাটি জুড়ে দিয়ে রস্কারের আওতা থেকে এক শ্রেণীর ারশিয়াল ছবিকে আলাদা করা হয়েছে। র্থাৎ যে ধরনের ছবি দেখার জন্য খুব ড় হয় অথচ যাতে রুচির বালাই থাকে সে সব ছবিকে সরকার স্বীকৃতি দিতে রাজ। অথচ সরকার চান জনপ্রিয় ছবি রি হোক। সে কারণেই এই বিশেষ ীকৃতির ব্যবস্থা। এই অ্যাওয়ারড নগদ কার নয়। কারণটা বোধ হয় এই যে, ছবি বকস-অফিসে খুব ভাল চলে তার যোজককে নগদ টাকায় পুরস্কার না লেও ক্ষতি নেই। সরকারের কাছ থেকে ীকৃতি বা সম্মান পেয়ে প্রযোজকরা যদি তাই সুস্থ আমোদ-চিত্র তৈরির কাজে নোনিবেশ করেন তবে খুবই আনন্দের থা। সুস্থ উপভোগ্য ছবি তৈরির সুস্থ হযোগিতা আরম্ভ হতে পারে। কিন্তু

"সংসার সীমান্তে" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে সন্ধ্যা রায়

অ্যাসথেটিক গুণসমন্বিত উপভোগ্য ছবি তো শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবি করতে পারে। শিল্প-গুণান্বিত সুখভোগ্য ছবি তো বড় পরিচালকরাও করতে পারেন, করেছেনও। সেক্ষেত্র বিচারের পদ্ধতি কী হবে? বিশেষ

অ্যাওয়ারডের একটি শর্ত এই যে, ছবিটির "মাস অ্যাপিল" থাকা চাই। অর্থাৎ যে ছবির বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে জনসাধারণের কাছে এমন ছবিই এই স্বীকৃতির যোগ্য। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? অনেক

অ্যাপ্তভেঞ্চার) [illegible] ছবি। [illegible] সুরেন) [illegible] নবম [illegible]। কিন্তু [illegible] হঠাৎ ভূ [illegible] প্রায় [illegible] মঞ্চ [illegible] তাঁদের (অভিনেতা) [illegible] জন্য। [illegible] কাহিনী এগিয়ে নিয়ে [illegible] সুন্দর। কিন্তু হায়, [illegible] ছবিতেও সেই [illegible]!

শুটিং চলছে

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর একটি ফ্লোরে এখনই মেহ্ফিল জমবে। সুরা আর সুরার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হয়েছে। তদুপরি আছে হারমোনিয়াম। একটা কার্পেটের ওপর ছাড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছেন শিল্পীরা। সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী, প্রেমাংশু বসু, তরুণ মিত্র প্রভৃতি। এঁরা সবাই অপেক্ষা করছেন। এদিকে শুটিং জোনের সমস্ত আলো জ্বলেছে। ক্যামেরা চালু হয়েছে। সাউন্ড বুম, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। এমন সময় পর্দা সরিয়ে মাসীর ভূমিকায় ছায়া দেবীর আগমন।... মাসী এসে গেছে...মাসী এসে গেছে... পরিবেশ বেশ সরগরম হয়। বিলম্বিত মদের বোতল খোলা হয়। সমিত হারমোনিয়াম হাতের নাগালের মধ্যে এনে গান গাইবার উদ্যোগ করেন। আরতি, ইঙ্গিতে চোখ রাখেন। মাসী প্রারম্ভেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। মাল খাওয়া স্ফূর্তি করা—ঠিক আছে। কিন্তু মাতলামি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। এই উপদেশাম্তে মাতাল-দের আত্মসম্মানে ধাক্কা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কেউ আকস্মিক সমর্থন করলেন। কেউ বিরোধিতা করলেন। লেগে গেল যুদ্ধ। থামাতে হয় মাসীকেই। তিনি আর কি করেন এহেন পরিস্থিতিতে, লেকচার দেন। আগে আমাদের এখানে বসে কতরকম আলোচনা হত। কত বড় বড় কবি এখানে বসে গান বেঁধেছেন। কতরকম চর্চা হয়েছে। দেশের কথা। দশের কথা।...

কথায় কথা আসে।...সোনাগাছি কাল্-চারের একটা সেন্টার ছিল। এর বিরাট ঐতিহ্য আছে। এখানে জাতিভেদ নেই। ক্যাসি-জম কমিউনিজম্-এর মারপিট নেই। ইন্টেলেকচুয়াল নন-ইন্টেলেকচুয়াল সবাই একই উদ্দেশ্যে একটা কমন প্ল্যাটফরম থেকে এসেছে।...মানুষের ঐক্য। সেখান থেকে কালচার।

এই দৃশ্য "হারমোনিয়াম" ছবি থেকে।

"হারমোনিয়াম" ছবির মেহ্ফিলের দৃশ্যে সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা
ফটো—দেশ

টেক করা হল। পরিচালক তপন সিংহ শট টেকিং-এর প্রতিটি মুহূর্তে সজাগ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওঁর। কোন কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না। সেটের খুঁটিনাটি, কন্টিনিউটি, শিল্পীদের হাঁটা চলা ফেরা পর্যন্ত খেয়াল রাখেন। বলতে গেলে পুরোপুরি অ্যাবজর্ভ হয়ে কাজ করেন। নিজেকে কন্‌সেনট্রেট করেন বিষয়বস্তুর মধ্যে।

এ ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য পরিচালকের নিজস্ব রচনা। উপলক্ষ হারমোনিয়াম। আসলে তিনি সমাজের চেহারা অংশত তুলে ধরতে সচেষ্ট, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যতদূর বোঝা গিয়েছে তা এই, একটি পুরানো হারমোনিয়াম হাত ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। প্রথমে এক মধ্যবিত্ত বাড়িতে। একই পাড়ার ঘটনা। গানের মাস্টার, উক্ত হার-মোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখাতে শেখাতে ছাত্রীকে নিয়ে দে চম্পট। সঙ্গে সঙ্গে হার-মোনিয়াম বিক্রি হয়ে যায়। রতনের চোখে পড়ে। সে শ্যামার জন্য কিনে নিয়ে আসে। হারমোনিয়াম আসে এই রেড-লাইট এরিয়ায়। রতন, শ্যামা আর মাসী—এক সময় এরা একই গ্রামে ছিল। ভাগ্য অন্বেষণে এক জায়গায় মিলিত। মাসীর তত্ত্বাবধানে শ্যামা গা-গতর বিক্রি করে পেট চালায়। এরই মধ্যে রতনের দিন গুজরান হয় কোনমতে। শ্যামা-র জন্য রতনের অনুভব নিরুচ্চার।...অতঃপর হারমোনিয়াম ফিরে আসছে...

সামগ্রিকভাবে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশে এ ছবির অন্তর্নাটক শিল্পিত হতে পারে নৈর্ব্যক্তিক জীবন-ভাষ্যে। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক চিত্রে বৈচিত্র্য শব্দে স্তব্ধতায় এই গল্প বলতে চান। কোথাও কোথাও তীব্র শ্লেষ—সময়ের পরি-প্রেক্ষিতে যা পজিটিভ। তাই বলে পরি-চালকের ভূমিকা সমাজ সংস্কারকের নয়। তাঁর মতে চলচ্চিত্রকার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবেন, চরিত্রের তাৎপর্য বিবৃত করবেন। কিন্তু কোনটা মন্দ এ বিধান দেবেন না। কারণ চলচ্চিত্র তাঁর কাছে শিল্প-রচনার মাধ্যমে, সমাজ সংস্কারের যন্ত্র নয়। শিল্পের যা কিছু দায় সত্য কথনে। সংস্কার সাধনে নয়।...

'হারমোনিয়াম'-এর শুটিং এর মধ্যে কমপক্ষে কুড়ি দিন অতিবাহিত। অবশিষ্ট আর মাত্র কয়েকদিন। প্রযোজনা করছেন প্রতাপ আগরওয়ালা, আর এ জালান। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন : স্বরূপ দত্ত, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, সোনালী গুপ্ত, দেবিকা দাশ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, সন্তু মুখো-পাধ্যায়, দিলীপ বসু, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রাহক : বিমল মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশক : সুনীতি মিত্র। সম্পাদক : সুবোধ রায়।

সংগীত পরিচালক শ্রীসিংহ নিজেই। ছবিতে গানের সংখ্যা একাধিক। নেপথ্য-কণ্ঠ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, মন্ত্রী স্নেনগুপ্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৈমন্তী শুক্লা। এছাড়া ছায়া দেবী স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন...ছল করে জল আনতে আমি যমুনাতে যাই...যমুনাতে যাই।......

* * *

এগারোই মার্চ। দিনটি বিশেষ হল এই কারণে, সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি 'জন অরণ্য'র অন্তর্দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু করলেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও'র ফ্লোরে অবশ্য কোন রকমের চাঞ্চল্য ছিল না। এইমাত্র লাঞ্চ ব্রেক শেষ হয়েছে। তখনও শিল্পীরা মেক-আপ রুম ছেড়ে আসেন নি। ফ্লোরের মধ্যে [illegible] পরিচালক শট টেক করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই প্রস্তুতি-

"The play was not merely an echo of the forgotten past. The statements made and the emotions evoked have a very special relevance to current conditions in our country to-day. The rule of the privileged few continues merrily at the expense of the land slaves and wage slaves."
— Frontier, 4.1.75.

"রঙীন পর্দায় যারা এই নাটক (স্পার্টাকাস) দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই অভিভূত হয়ে যাবেন এর মঞ্চ সাফল্য দেখে। অনেকের মনে সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকতে পারে নাটক হিসাবে এর গুরুত্ব কতটা মঞ্চে প্রকাশিত হবে? সে সন্দেহ দূরীভূত হয় এ নাটক দেখে।" —যুগান্তর ২৪।৩।৭৫

চেতনার সাহসিক প্রযোজনা

আবার রঙ্গনায়

১১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬।৩০টায়

সূত্র : হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস
নাটক/প্রয়োগ : অরুণ মুখোপাধ্যায়
আবহ সংগীত : হিমাংশু বিশ্বাস
মঞ্চ : সুবিমল রায়
আলো : দীপক মুখোপাধ্যায়
ধ্বনি : শ্রীপতি দাস
মঞ্চসজ্জা : পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : রবি ঘোষ
মঞ্চ নির্মাণ : রজলাল শর্মা

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে
'মারীচ সংবাদ'-এর অভিনয়
৪ এপ্রিল — আগরপাড়া
৫ এপ্রিল — দুর্গাপুর
৬ এপ্রিল — চুঁচুড়া

চেতনা
১০/১, সাহাপুর মেন রোড, কলি-৩৮

"বাঘবন্দী" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে পার্থ মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

পর্দায় দেখার পরও নিশ্চিত একটা কৌতূহল থেকে যায়। সেটের খুঁটিনাটি ডিটেলস্-এর কাজটি তাঁর ছবিতে পরিবেশ রচনা করে। প্রতিটি শট কম্পোজিশনে তিনি যে স্টাইলটি ধরে রাখেন তা গল্পের মেজাজকে করে অভিজ্ঞ। পরপর সাজানো একটি সিন বা সিকোয়েন্স মনের মধ্যে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। সেটা শুধু পর্দায় দেখে নয়, অনেকসময় শুটিং দেখে। তাঁর ছবির শুটিং দেখা, সমগ্র পরিবেশের মধ্যে যেন ধীরে ধীরে নিজেকে একাগ্র করে ফেলা।

এর মধ্যে একদিন ফ্লোরে এসে দেখি গ্রীল দেওয়া বারান্দার শেষ প্রান্তে ক্যামেরার বসে বিস্তারিত করছেন সিচুয়েশান। ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একজায়গায় স্থির হচ্ছে। সেখান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে একটা ডাইনিং টেবল। এখানে শিল্পীরা আসছেন। গৃহকর্তার ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (এলাটীজ)। সুব্রত, বড় ছেলে : দীপঙ্কর দে। ওর স্ত্রীর ভূমিকায় : মিলি চক্রবর্তী। প্রধান চরিত্র সোমনাথ, সমস্যাসংকুল সমসাময়িক পরিস্থিতির আবর্তে একজন যুবক, নির্বাচিত নতুন শিল্পী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্র রূপায়িত করবেন উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, আরতি ভট্টাচার্য এবং কয়েকজন নতুন শিল্পী।

শংকরের উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। বলা বাহুল্য সংগীত পরিচালনাও করবেন তিনি। চিত্রগ্রহণ করছেন : সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশক : অশোক বসু। সম্পাদনা করবেন দুলাল দত্ত। ইনদাস ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করছেন : সুবীর গুহ।

বার্তাবহ

বোম্বাই বিচিত্রা

ফিল্মের উপর নতুন আবগারি শুল্কের প্রস্তাবে চলচ্চিত্র-প্রযোজকরা যে বিপন্ন বোধ করছেন, সে খবর সকলেই জানেন। প্রযোজকদের এক প্রতিনিধিদল বোম্বাই থেকে গিয়েছিলেন নয়া দিল্লি। প্রস্তাবিত শুল্কের হার কমানো সম্পর্কে কিছু ভাসা ভাসা সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্বল করে সেই প্রতিনিধিদল ফিরে এসেছেন। চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা ওই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ছবির নতুন 'রিলিজ'ও তাই এক রকম বন্ধ থাকছে। তবে যে কোনও ছবির প্রথম পনেরটি 'প্রিন্ট' এই আবগারি শুল্কের আওতার বাইরে। সেই কারণে প্রো[illegible] কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী [illegible]রেটরি থেকে কোনও ছবির পনেরটি প্রিন্ট বার করে আনা চলবে। এই নির্দেশের সুযোগ নিয়েছেন বি আর চোপরা এবং শক্তি সামন্ত। বি আর চোপরার জমীর এবং শক্তির সামন্তের অমানুষ বোম্বাইয়ে ২১ মার্চ মুক্তি পেয়েছে। অমানুষ ছবির (হিন্দী সংস্করণ, অবশ্যই) মাত্র ১৩টি প্রিন্ট রিলিজ করার কথা ছিল, সুতরাং শক্তি সামন্তকে কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি। মুশকিলে পড়েন বি আর চোপরা। তিনি জমীর ছবিটির জন্য আগেভাগে ২৫টি সিনেমা-হল 'বুক' করে রেখেছিলেন, গণ্ডগোল সেইখানে। পঁচিশটি প্রিন্ট যাতে তাঁকে দেওয়া হয়, এই মর্মে তিনি কাউন্সিলের কাছে আবেদন পেশ করেছিলেন, সেটা গ্রাহ্য

হয়নি। [illegible] নিলেন।

[illegible] প্রিন্ট নিয়ে [illegible] ছবিটি চালানোর [illegible] করা হল। পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে সোজাসুজি পাঁচটি প্রিন্ট দেখানো হয়। বাকি কুড়িটি প্রেক্ষাগৃহের জন্য রইল দশটি প্রিন্ট—সেই সব হল-এর ক্ষেত্রে রিল-ভাগাভাগির ব্যবস্থা। এই সব প্রেক্ষাগৃহের সিনেমা-প্রদর্শনীর সময়-সূচীরও দরকার মতো অদল-বদল করতে হয়। এক সিনেমা থেকে অন্য সিনেমায় সময়মতো ছবির রিল পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বেশ কিছু স্কুটার ক সর্বক্ষণ তৈরি থাকতে হয়েছে। এই ব্যবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট জটিল। তদুপরি কখন কোন হল-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়, কেউ তো বলতে পারে না, তা ছাড়া ছিল ট্রাফিক-জ্যাম-এর সমস্যা। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের হিমসিম খেতে হয়েছে, আর কী!

এদিকে সিনেমা-মহলের অধিকাংশই এক রকম ধরেই নিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম উক্ত শুল্কের ব্যাপারে তেমন-কিছু রেহাইয়ের ব্যবস্থা করবেন না। ভবিতব্যকে মেনে নেবার জন্য মনে মনে অনেকেই তৈরি হচ্ছেন।

নয়া দিল্লীতে চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদলের সংগে সরকারী কর্তাদের যে আলোচনাসভা বসে সে সম্পর্কে একটা মজার গল্প শোনা গিয়েছে। অর্থমন্ত্রী এবং সরকারী অফিসারদের সংগে কথাবার্তা বলার জন্য ওই প্রতিনিধিদলকে নাকি মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়। ওঁরা সদলবলে অর্থ-মন্ত্রকের অফিস-কামরায় ঢুকে প্রথম সাত-আট মিনিট নাকি নিজেদের মধ্যেই আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে যান। কীভাবে বক্তব্যটা পেশ করা দরকার, আলোচনা তাই নিয়ে। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। যেই দেখলেন দশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত, তিনি চট করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সেটাই বৈঠক-ভংগের ইংগিত। প্রতিনিধিদল হতাশ চোখে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে আলোচনার জন্য অর্থ-মন্ত্রীর কাছে আর একটি তারিখ প্রার্থনা করলেন। এপ্রিলের শেষের দিকের একটি তারিখ নাকি দেওয়া হয়েছে। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—এইভাবে পয়লা নম্বর বৈঠকের সমাপ্তি।

পরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী আই কে গুজরালের সংগে ওঁদের কিছু কথাবার্তা হয়। ইনডিয়ান মোশন পিকচার প্রোডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীরাম বোহরা নাকি সেই আলোচনাসভায় বলেন, ছয় মাসের জন্য সরকার চালানোর ভার চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের দেওয়া হোক না [illegible] যায়। [illegible]

এর পরের [illegible] সরকারী [illegible] এবং [illegible] আশা করেন। ভাবা যায়?

সুরঞ্জন

ভ্রম সংশোধন

৯৫ মার্চের দেশ পত্রিকায় বোম্বাই চিত্রিতায় মল্লিকা সারাভাইয়ের মাতা হিসেবে মঞ্জুলা সারাভাইয়ের নাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মায়ের নাম মৃণালিনী সারাভাই।

বসন্ত বন্দনা

বসন্তের বন্দনা ছাড়াও বসন্তবন্দনা রেকরডের (এইচ এম ভি/কলম্বিয়া) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেটা হল নতুন প্রতিভা আবিষ্কার। অথবা পুজোয় রেকরডে যাঁদের গান থাকতে পারত অথচ থাকে না (কেন বোঝা মুশকিল) তাঁদের গান পরিবেশন। গ্রামোফোন কোম্পানির পলিসি যাই হোক, বছরে শ যত যে ভাল কিছু মেলে সেটাই বড় লাভ। রেকরডের তালিকায় সব রকমের গানই আছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান আবশ্যিক নিবেদন হিসাবে রাখা হয়েছে। যাঁরা গেয়েছেন শিল্পী হিসাবে তাঁদের কদর আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের শিল্পীরা হলেন গীতা ঘটক (মাঝে মাঝে তব দেখা পাই/যে ফুল ঝরে), বাণী ঠাকুর (অনেক দিয়েছ নাথ/মুখখানি করো মলিন) এবং অর্ঘ্য সেন (তোমার কথা হেথা কেহ/কেন সারাদিন ধীরে ধীরে)। রবীন্দ্রসংগীতের চারিত্র্য ও অনুভূতি প্রকাশের শিক্ষা ও সংযম গীতা ঘটক এবং অর্ঘ্য সেনের গানে রয়েছে। বাণী ঠাকুরের 'অনেক দিয়েছ নাথ' প্রাণ-দীপ্ত।

দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীদের গান নিয়ে কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (আমি চেয়ে থাকি দূরে সান্ধ্য গগনে/আমরা মলয় বাতাসে), শর্বাণী সেন (হীরা কি আঁধারে জ্বলে/গগনভূষণ তুমি) এবং বন্দনা সিংহ (এসো এসো বঁধু/এসো প্রাণ সখা) দ্বিজেন্দ্র-গীতির আসরে নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। বন্দনা অপেক্ষাকৃত নতুন, কিন্তু তাঁর এবারকার দুটি গানের পর এই বিভাগে তাঁর অধিকার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন রইল না। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান সুখশ্রাব্য।

নজরুলের গানের শিল্পী দুইজন—অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ও ইলা বসু। শেষোক্ত শিল্পী আরও আগে থেকে নজরুলের গান যদি নিয়মিত করতেন তবে শ্রোতাদের পাওনা আরও বেড়ে যেত। তাঁর গলা ও ঢঙ যেন [illegible] অলংকরণও চমৎকার। ই-পি রেকরডে তাঁর চারটি গান (বখন আমার গান [illegible]/তোমার আঁখির কসম/আলো [illegible] কাননে/নদীর নাম সই অঞ্জনা) খুবই আদরণীয় হবে। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের গানের সুনাম আছে। সুপার সেভেন রেকরডে তাঁর ছয়টি গানের মধ্যে (মহুয়া বনে/ফুল ফাগুনের/বেদিয়া বেদিনী/এ বাঁশি বাসরে/থৈ থৈ জলে/আমি ফুল ছেড়ে চলিলাম) 'আমি ফুল ছেড়ে চলিলাম' চমৎকার।

লোকসংগীতের নতুন শিল্পী আর্য চৌধুরী রেকরডে গাইবার আগেই জনপ্রিয় হয়েছেন। বিভিন্ন আসরে তাঁর গান শুনে শ্রোতারা সন্তুষ্ট এই কারণে যে, তাঁর গায়নভঙ্গিতে গ্রামের মেজাজটি সম্পূর্ণ

পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চারণে এবং চঙে লোক-সংগীতের স্বভাব আছে। এই প্রথম রেকর্ড তাঁর চারটি বিভিন্ন আঙ্গিকের গানে (এমন কঠিন নারী রে সুবল/ছেলে ঘুম যায়/সাঁজেমের মা/দশ ব্যাটার বাপ) শহুরে সফিসটিকেশনের আঁচ নেই। লোক-সংগীতকে যতদিন তিনি স্বধর্মে রাখতে পারবেন ততদিনই তাঁর গানের আদর হবে।

বসন্ত বন্দনায় আধুনিক গানের দুই প্রধান শিল্পী সুদাম বন্দোপাধ্যায় ও ললিতা ধরচৌধুরীর গান পুজোয় শোনা গেল না বলে ক্ষোভ ছিল, তবু ভাল একটু বিলম্বে শোনা গেছে। সুদামের এবারের দুটি গানই (আমার বসন্তের পথ চাওয়া/সুখ বলে কিছু নেই) জনপ্রিয় হবে বিশেষ করে সুরের (ভি বালসারাকৃত) জন্য। সুদাম গেয়েছেনও দরদ দিয়ে। নচিকেতা ঘোষের সুরে গাওয়া ললিতা ধরচৌধুরীর গান (প্রেম করারই ছল করে/এসো পান্থ) সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। ললিতার মিষ্টি গলা এবং আধুনিক গানে তাঁর সহজ ব্যুৎপত্তি অনেক দিন ধরেই প্রশংসিত। বসন্তবন্দনায় এন শিল্পী কিছুটা উপেক্ষিত। তাঁর একটি আলাদা রেকরডও হতে পারত। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর স্বপ্না দাশগুপ্তার (আমি অনামিকা/আমি যদি পুতুল হতাম) গান ভাল লাগল। কৌশিক বসু (যেন নূপুর নেই/ শুনবে না কেউ) মান্না দের প্রভাবমুক্ত হলে আরও ভাল গাইতে পারতেন। সুশীল চক্রবর্তী ও অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৌতুক নকশাটি (জে পি ডি ডি) বেশ মজার।

শিশুদের জন্য একটি চমৎকার উপহার—এক যে ছিল শেয়াল। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর সংগীত পরিচালনা এবং ভাস্কর বসুর রচনা শিশুদের মন জয় করার মতোই হয়েছে। তার উপর রয়েছে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতী মুখোপাধ্যায়, চিত্রপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মজুমদার প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক গান।

রবীন্দ্রসংগীতের এল-পি

রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হিসাবে ডঃ চিত্রলেখা চৌধুরীর সুনাম আরও বাড়াবে হিন্দুস্থানের একটি এল-পি রেকরডের জন্য যাতে কবিগুরুর বারোটি গান রয়েছে—আনন্দধারা বহিছে ভুবনে/কেমনে কি ভাষায় রে/আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/পাছ চেয়ে বসে আমার মন/আসা যাওয়ার পথের ধারে/বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল/এনেছ ওই শিরীষ বকুল/মম অঙ্গনে স্বামী/তোমার খোলা হাওয়া/প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি/ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে/কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে। গানগুলি বিভিন্ন অঙ্গের এবং বিভিন্ন ভাবের। শ্রীমতী চৌধুরী রবীন্দ্রসংগীতের সাধনলভ্য ছাড়পত্রটি পেয়েছেন। তিনি উপলব্ধির সঙ্গে গানগুলি গেয়েছেন বলেই শ্রোতার উপলব্ধির দরজাও খুলে দিতে পেরেছেন। ব্যাকরণে খুঁত আছে কি নেই সেটা পণ্ডিতের ও আচার্যের বিচার্য। শিল্পীর সব কটি গানই যে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করে সেটাই বড় কথা। রবীন্দ্রনাথের গানই শুধু তিনি নিবেদন করেছেন। তার সঙ্গে নিজস্ব অভিনয় বা আতিশয্যের কোন মাত্রা তিনি যোগ করেননি। যে কারণে চিত্রলেখার গা[illegible]মনস্ক করে না, প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

ভক্তিগীতি রেকর্ড

একটি ঈপি রেকর্ডে কীর্তন-রস-সাগর রথীন ঘোষ ও সহশিল্পীদের গাওয়া 'নদের নিমাই' ভক্তিরসের শ্রোতাকে খুশি করবে। সুরের সঙ্গে ভাবের একটি নিবিড় সংযোগ ঘটেছে শিল্পীর গাওয়ায়। ও'রই পরিচালনায় আর একটি রেকর্ডে শুক্লা হাজরার গাওয়া 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' ১ম ও ২য় খণ্ড সুরারোপ ও গাওয়ার দিক থেকে অনুপম। ধর্মপ্রাণ শ্রোতার কাছে ভোলানাথ বিশ্বাসের শ্যামাসংগীত দুটি আদরনীয় হবে। আধুনিক গানের তালিকায় গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দুখানি গান শিল্পীর পূর্ব খ্যাতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতীর আধুনিক গানে অন্যান্য শিল্পীরা হলেন অঞ্জু চক্রবর্তী, শমীর মুখোপাধ্যায়, কুমার প্রশান্ত এবং নিমাই ঘোষ ও ডলি চ্যাটার্জী। হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে মিতালী করের ছড়া গানের রেকর্ডটিও উল্লেখের দাবি রাখে। দিলীপ কুমার রায়ের কণ্ঠে রজনীকান্তের দুখানি গান ভাবরসে সমৃদ্ধ। শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দিতে পারে তরুণ কৌতুক শিল্পী মলয় রাহার কৌতুক-নকশা রেকর্ডটি। দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের দুখানি ব্যঙ্গগীতিও উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রিক গিটারে সুভাষচন্দ্র বসুর বাজানো দুখানি রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের বিশেষ খুশি করবে। শিল্পীর হাতটি বেশ মিষ্টি পরিচালনা করেছেন সমা[illegible]ন্ত।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যালমানাক—১৯৭৪-৭৫

শ্রীবাগীশ্বর ঝা সম্পাদিত উক্ত বর্ষপঞ্জীতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যাবতীয় তথ্য সযত্নে সন্নিবেশিত। ভারতের তিনটি বড় চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র—কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের চলচ্চিত্র জগতের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ই এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে প্রায় সব কটি প্রদেশের সিনেমা শিল্প (প্রদর্শন) সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিশদভাবে জানানো হয়েছে। ভারতবর্ষের তাবৎ শিল্পী, কুশলী, পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকের ঠিকানার সঙ্গে আরও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ষপঞ্জী যেমন একদিকে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাবে, তেমনি যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত তাঁদের সকলেরই বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগবে। ১২০০ পৃষ্ঠারও বেশি এই সংকলনের প্রকাশক শট পাবলিকেশনস (৩বি, ম্যাঙ্গো লেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩)। দাম—চল্লিশ টাকা।

ভারতে ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা
বাংলাদেশে ১·২৫ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

		বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা		৪০.৮০ টাকা	২০.৮০ টাকা	×
সডাক	ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়)	৪৫.৯০ টাকা	২৩.৪০ টাকা	১১.৭০ টাকা
	ভারতের বাহিরে (জাহাজ ডাকে)	৬৮.৮৫ টাকা	৩৫.১০ টাকা	×
বিমান ডাকে	ভারতে	৯৬.৯০ টাকা	৪৯.৪০ টাকা	২৪.৭০ টাকা
বিমান যোগে	ইউরোপ দেশসমূহে আমাদের এজেন্ট মাধ্যমে	১৯১.২০ টাকা	৯৬.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা